ছোটদের

বুক অব নলেজ

ছোটদের বুক অব নলেজ

দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

আমাদের কথা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নানা ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের ঐতিহ্য আমাদের দীর্ঘকালের। বড়দের জন্যে যেমন আমরা অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছি, ছোটদের জন্যেও তেমনি আমরা এযাবৎ নানা ধরনের অসংখ্য গ্রন্থ সুলভ মূল্যে প্রকাশ করে ছোটদের হাতে তুলে দিয়েছি। ছোটদের জন্যে প্রকাশিত আমাদের বিপুল গ্রন্থভাণ্ডারের সঙ্গে **এবার আমরা সংযোজিত করলাম এক অসাধারণ বিশ্বজ্ঞানকোষ—"ছোটদের বুক অব নলেজ"।**

বস্তুতঃ দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য বাঙালী ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষানুরাগী ও চিন্তাশীল সমাজ, ছোটদের উপযোগী একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বজ্ঞানকোষ গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে আমাদের অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। তাঁদের সে অনুরোধে সাড়া দিয়ে এবার আমরা নানা অসুবিধের মধ্যেও 'ছোটদের বুক অব নলেজ' নাম দিয়ে এই বিশ্বজ্ঞানকোষখানি প্রকাশ করলাম। **এই উপলক্ষে সকলকেই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।**

বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় লাভের পূর্বে বিশ্বজ্ঞানকোষের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু তথ্য জেনে রাখা খুবই দরকার। বিশ্বজ্ঞানকোষের সংজ্ঞা কি, কবে এর জন্ম হল, সমাজে এর প্রভাব কতখানি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় জ্ঞানকোষ প্রথম কবে রচিত হয়, এই ধরনের নানা প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হতে পারে। এইজন্যেই বিশ্বজ্ঞানকোষের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি আলোচনা এখানে প্রকাশ করা হল এবং এইসঙ্গে **মূল গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু, ভাষা, চিত্রসম্পদ প্রভৃতির সামান্য আভাস দেওয়া হল।**

মানুষ চিরন্তন জ্ঞানপিপাসু। তার জ্ঞানপিপাসার অন্ত নেই। সে চিরদিন অজানাকে চায় জানতে, অচেনাকে চায় চিনতে আর অ-ধরাকে চায় ধরতে। এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকিয়ে তার বিস্ময়ের সীমা নেই। বিশ্বচরাচরের জল স্থল অন্তরীক্ষের মধ্যে টাঙ্গানো রয়েছে অনন্ত রহস্যের অদৃশ্য পর্দা। মানুষ তার সীমাহীন কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে দুঃসাহসিকতার কুঠারাঘাতে সেই অদৃশ্য পর্দা যুগে যুগে ছিন্ন করে খুলে দিয়েছে, জ্ঞানরাজ্যের আশ্চর্য স্বর্ণদ্বার। চরিতার্থ হয়েছে মানুষের জ্ঞানপিপাসা।

সভ্যতার আদিম প্রভাতে মানুষের পৃথিবী ছিল গণ্ডিবদ্ধ। তখন তার জ্ঞানরাজ্যের পরিধিও ছিল সীমিত। কিন্তু সভ্যতার বিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানরাজ্যের পরিধি হয়েছে বিস্তৃত ও ব্যাপক। প্রাচীনকালে ছোট ছোট গ্রাম, শহর কিংবা নিজের দেশ ছিল মানুষের পৃথিবীর সীমারেখা। কিন্তু আধুনিক যুগে সমগ্র পৃথিবীটাকেই মানুষ নিজের দেশ করে নিয়েছে। এখন সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখা বা জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে। এখন জ্ঞান বলতে বোঝায়—বিশ্বজ্ঞান। আধুনিক যুগে জ্ঞানার্জন করবার মতো কত বিচিত্র বিষয় যে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মানুষ

তার যুগ-সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, অসামান্য মননশীলতা, প্রচণ্ড কর্মক্ষমতা ও দুঃসাহসিক কাজ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে এযাবৎ জল-স্থল-আকাশের কত যে অসংখ্য বিচিত্র বিষয় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

কোন্ সে অতীত যুগে জ্ঞানপিপাসু মানুষ জ্ঞানানুশীলনের পথে সেই যে যাত্রা করেছিল, সেই যাত্রা এখনও শেষ হয় নি, ভবিষ্যতেও শেষ হবে না। সে যাত্রা নিত্য কালের।

জ্ঞানরাজ্য মহাকাশের মতোই আদি অন্তহীন এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত। কত বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞানার্জন করা যেতে পারে, তা বলে শেষ করা যায় না। লক্ষ লক্ষ মানুষের, হাজার হাজার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনায় এখন পর্যন্ত যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে, একটি মানুষের পক্ষে সমগ্র জীবনের একনিষ্ঠ সাধনায়ও তা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। জ্ঞানভাণ্ডারের মহা মূল্যবান্ রত্নরাজি ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য দেশী-বিদেশী গ্রন্থের মধ্যে। একজন মানুষের পক্ষে সে সকল গ্রন্থ পাঠ করে বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান আহরণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অথচ এদিকে মানুষের জ্ঞানপিপাসাও প্রচণ্ড। বিশ্বজ্ঞান আহরণ করার জন্যে তার আকুলতাও সীমাহীন।

মানুষের এই সুতীব্র বিশ্বজ্ঞান পিপাসাকে কিছুটা চরিতার্থ করার জন্যেই রচিত হয়েছে 'জ্ঞানকোষ' জাতীয় গ্রন্থ। এই 'বিশ্বজ্ঞানকোষ' জাতীয় গ্রন্থই ইংরেজী ভাষায় Encyclopedia (এন্সাইক্লোপিডিয়া) নামে বিখ্যাত। জ্ঞানকোষকে বিশ্বজ্ঞানকোষ বা সংক্ষেপে বিশ্বকোষও বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানরাজ্যের নানা স্থানে যে সকল মূল্যবান্ জ্ঞাতব্য বিষয় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে, জ্ঞানকোষের পাতায় পাতায়, সেগুলিরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করা হয়। সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য পরিচয় দানই জ্ঞানকোষের মূল উদ্দেশ্য। এক কথায় বলা যায়, **জ্ঞানকোষ হচ্ছে বিশ্বজ্ঞানের আকর গ্রন্থ।**

'জ্ঞানকোষ' সর্বপ্রথম কোথায় এবং কখন সংকলিত হয়েছিল, তা সুনিশ্চিত করে বলা যায় না। প্রাচীনকালেও যে অনেকগুলি জ্ঞানকোষ রচিত হয়েছিল, তার অনেক প্রমাণ আছে। এই সকল প্রাচীন জ্ঞানকোষের মধ্যে 'বার্রো' রচিত জ্ঞানকোষখানিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়ে থাকে। 'বার্রো' জীবিত ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ১১৬ বছর আগে। তিনি জাতিতে ছিলেন রোমক।

ইংরেজী ভাষায় 'জ্ঞানকোষ' রচনায় প্রথম পথ দেখান উইলিয়াম ক্যাক্সটন [১৪২২-৯১ খ্রীঃ]। ১৪৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি "মিরর অব দি ওয়ার্ল্ড" নামে যে জ্ঞানকোষ রচনা করেন, তা ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। **এই জ্ঞানকোষ রচনার সূত্রাবলম্বনেই পরবর্তী কালে রচিত হয় সুবিখ্যাত জ্ঞানকোষ "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা"।** ১৭৬৮-৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই জ্ঞানকোষ তিনখণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর ক্রমশঃ এই মহাগ্রন্থের ২৪ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর এই মহাগ্রন্থের বিভিন্ন নতুন নতুন খণ্ড প্রকাশ করে চলেছেন।

ফরাসী ভাষায় রচিত বিখ্যাত জ্ঞানকোষের নাম 'আসিক্লোপেদি' [১৭৫১-৭২

খ্রীঃ]। ফরাসী সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব রূপায়ণে এই জ্ঞানকোষের অবদান অসামান্য। যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লব অনেকাংশে ফরাসী জ্ঞানকোষ আন্দোলনেরই অবদান। জাতি ও সমাজের চিন্তাধারার উপর জ্ঞানকোষের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক।

আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও জ্ঞানকোষ সংকলনের কাজ অনেককাল আগেই শুরু হয়েছে।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালেই সংস্কৃত ভাষায় 'কোষ' জাতীয় অনেকগুলি গ্রন্থ হয়েছিল। তবে এগুলির অধিকাংশই 'শব্দকোষ' বা অভিধান জাতীয়। **দ্বাদশ শতাব্দীতে চালুক্য বংশীয় রাজা সোমেশ্বর ভুলোকমল্লের নির্দেশে 'মানসোল্লাস' নামে যে কোষগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তাকেই সংস্কৃত ভাষায় প্রথম জ্ঞানকোষ বা "বিবিধ-বিদ্যা সংগ্রহ" গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়।**

রাজা রাধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষায় 'শব্দকল্পদ্রুম' নামে যে কোষগ্রন্থ ৩৬ বছর ধরে (১৮২২-৫৮ খ্রীঃ) ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, তাকে অভিধান ও বিশ্বকোষের সমন্বয় বলা যেতে পারে। প্রচুর অর্থব্যয়ে সম্পাদিত এই কোষগ্রন্থ তৎকালে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

বাংলা ভাষায় প্রথম জ্ঞানকোষগ্রন্থ রচিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী 'বিদ্যাহারাবলী' নামে দুই খণ্ডে জ্ঞানকোষ রচনা করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় "সংক্ষিপ্ত সদ্বিদ্যাবলী" নামে একটি জ্ঞানকোষ সংকলিত হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "বিদ্যাকল্পদ্রুম" বা "এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলিন্‌সিজ" নামক গ্রন্থের ১৩টি কাণ্ড প্রকাশ করেন।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম যথার্থ সুসম্পূর্ণ জ্ঞানকোষের নাম 'বিশ্বকোষ'। নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় ২২ খণ্ডে এই মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেকালের বহু মনীষী বিশ্বকোষের সংকলনকার্যে নগেন্দ্রনাথকে নানাদিকে সাহায্য করেছিলেন।

বাংলা ভাষায় যতগুলি কোষগ্রন্থ আছে, তাদের অধিকাংশ রচিত হয়েছে স্বাধীনতার পূর্বে। আশা করা গিয়েছিল, স্বাধীনতার পরে এদিকে বাঙালী মনীষীদের দৃষ্টি পড়বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পর ২৫ বছর কেটে গেলেও অদ্যাবধি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক 'ভারতকোষ' ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানকোষ রচিত হয় নি। ['ভারতকোষ' এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ।] বস্তুতঃ কোষগ্রন্থ সংকলনের কাজটি অত্যন্ত দুরূহ—এই কাজ একদিকে যেমন প্রচুর ব্যয়সাধ্য অন্যদিকে তেমনি প্রচুর সময় ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। জ্ঞানরাজ্যের পরিধি প্রতি মুহূর্তেই বিস্তার লাভ করছে। সেই বিশাল জ্ঞানরাজ্যের প্রতিটি বিষয়কে একত্র সন্নিবেশ করে সকলের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ সন্দেহ নেই।

বাংলা ভাষায় এযাবৎ যতগুলি জ্ঞানকোষ রচিত হয়েছে তার সবগুলিই বড়দের জন্যে। ছোটদের জন্যে প্রকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানকোষ এযাবৎ রচিত হয় নি বললেই চলে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত "শিশু-ভারতী" ছোটদের জ্ঞানকোষের অভাব কিছুটা মেটালেও এখন তাহা সহজলভ্য নয়। **বর্তমানে বাংলা ভাষায় ছোটদের**

উপযোগী কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানকোষ নেই বললেই চলে। এর ফলে বাঙালী ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠির সন্ধান পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলা ভাষায় ছোটদের উপযোগী একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৃত জ্ঞানকোষের অভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে, তাদের জ্ঞানপিপাসার চাহিদা মেটাতে আমরা এবার **"ছোটদের বুক অব নলেজ"** নামে সুবিশাল জ্ঞানকোষ প্রকাশ করলাম। এই গ্রন্থ প্রকাশনার মাধ্যমে ছোটদের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করার দীর্ঘকালের অসুবিধা অনেকাংশে আমরা দূর করতে পারব, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

"ছোটদের বুক অব নলেজ" একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বকোষ। দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, অধ্যাপক ও পণ্ডিতদের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সাধারণতঃ এই জাতীয় গ্রন্থ বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ছোটদের পক্ষে নানা কারণে বিভিন্ন খণ্ড সংগ্রহ করা খুবই অসুবিধেজনক। বিশ্বের জ্ঞানবৈচিত্র্য একটি মাত্র খণ্ডের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকলে তাদের পক্ষে জ্ঞানলাভের অনেক সুবিধে হয়। এই দিকে লক্ষ্য রেখে "ছোটদের বুক অব নলেজ"-কে একটি খণ্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বের জ্ঞানবৈচিত্র্য এই একটি খণ্ডের মধ্যে এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যে কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যে ছোটদের আর অন্য কোন গ্রন্থের সন্ধানে বিব্রত হতে হবে না। জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয় ও বিবরণ এর মধ্যে এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে ছোটরা এগুলি পড়ে বড় হয়ে সে সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত ও বিশদভাবে জ্ঞান লাভ করার অনুপ্রেরণা পাবে।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে **"ছোটদের বুক অব নলেজ"** গ্রন্থখানিকে নানাভাবে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় করে তোলা হয়েছে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যার এক সর্বাধুনিক সর্বাঙ্গসুন্দর প্রদর্শনী। হাজার পাতার এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে পৃথিবী, সাগর, গাছপালা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, মহাকাশ, যানবাহন, এঞ্জিনীয়ারিং, খেলাধুলা, শারীরবিজ্ঞান, লিপি ও মুদ্রণ, ভূগোল, ইতিহাস, বিশ্ব-সাহিত্য, চারুকলা, সংগীত, রঙ্গালয়, সিনেমা, শিল্পবাণিজ্য, স্বাধীনতা সংগ্রাম, নদনদী, ডাকটিকিট, দেশবিদেশের ছড়া প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত মনোজ্ঞ সরস আলোচনা। আলোচনাগুলি যাতে ছোটদের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক হয়, সম্পাদকমণ্ডলী সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। তাঁরা বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান করেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন নি।

প্রতিটি বিষয়কে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে তাদের সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক রূপরেখাটি তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'খেলাধুলা' সম্পর্কিত বিষয়টির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে শুধু যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খেলাধুলার কথা আলোচনা করা হয়েছে, তা নয়; এখানে বিশ্বের প্রতিটি খেলার পরিচয়-দানের সঙ্গে সঙ্গে কি করে সেগুলি খেলতে হয়, এবং সেই সব খেলায় কারা কারা শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়েও সচিত্র এবং সরস আলোচনা করা হয়েছে।

এসব ছাড়াও এই গ্রন্থে এমন অনেক বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে, যেগুলির মধ্য দিয়ে ছোটরা ছেলেবেলাতেই নতুন নতুন আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও বড় বড় কাজ করবার

অনুপ্রেরণা লাভ করবে। আজ যারা ছোট, আগামীকাল তারাই বড় হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের ধারার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং দেশগঠনের দায়িত্বও বহুলাংশে তাদেরই উপর পড়বে। ছেলেবেলা থেকেই যাতে তারা যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমুখী, সংস্কারমুক্ত ও দেশ-প্রেমিক হতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আলোচ্য গ্রন্থে অনেক বিষয় নির্বাচিত হয়েছে। তাদের দুঃসাহসিক কাজে প্রেরণা দানের জন্যে আলোচনা করা হয়েছে পর্বত অভিযান, মেরু অভিযান, মহাকাশ অভিযান ও নানা ভৌগোলিক আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক কাহিনী। ছোটদের সাধারণ জ্ঞান বাড়াবার জন্যে সংকলিত হয়েছে "ছবিতে সাধারণ জ্ঞান" শীর্ষক বিষয়টি। মৌমাছি কেন গুনগুন করে? দুধ টকে যায় কেন? কুকুর শোবার আগে গোল হয়ে ঘোরে কেন? মুদ্রার ধারে খাঁজ কাটা থাকে কেন? উড়ন্ত চাকী কি? মানুষের চোখের উপর ভুরু থাকার সুবিধে কি? সকালে আমাদের ঘুম ভাঙে কেন? এই ধরনের অসংখ্য বিচিত্র জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হয়েছে ছবির সাহায্যে। **আলোচ্য গ্রন্থে কত বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে, তা বুঝতে পারা যাবে সূচীপত্রের দিকে তাকালে। মোটের উপর বলা যায়, আমাদের প্রকাশিত এই জ্ঞানকোষ গ্রন্থখানি বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত সর্বাঙ্গসুন্দর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপরেখা।**

ছোটদের পক্ষে বিশ্বজ্ঞান বিশেষ করে আবহবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পথে প্রধান বাধা হচ্ছে—ভাষা। ভাষা যদি দুরূহ, দুর্বোধ্য ও ছোটদের উপযোগী না হয়, তবে ছোটদের জন্যে গ্রন্থরচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। **"ছোটদের বুক অব নলেজ"** গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলী এইদিকে গভীরভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। এই গ্রন্থের প্রতিটি বিষয় যাতে ছোটরা পড়ে অতি সহজেই বুঝতে পারে, সেজন্যে তাঁরা সহজ সরল সুন্দর ও সরস ভাষায় সকল কিছু বর্ণনা করেছেন। শারীর-বিজ্ঞানের মতো কঠিন বিষয়কেও কিরূপ সহজ ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, তার সামান্য কিছু নিদর্শন এখানে তুলে ধরা হল—

"লোকে বলে 'প্রথমে দর্শনধারী, তারপরে গুণবিচারী'। আর মানুষের দিকে তাকালেই প্রথমেই চোখে পড়ে আমাদের শরীরের সাধারণ ত্বক্। কেউ বা দিব্যি গৌরবর্ণ অর্থাৎ ফরসা, কেউ বা দিব্যি কালো। কিন্তু ত্বক্ বা চামড়া তো আর কেবল আমাদের শরীরের আবরণই নয়, বলতে গেলে এ আমাদের শরীরের একটা যন্ত্র। কত কাজই না একে করতে হয়! ত্বক শরীরের ক্ষতিকারক ক্লেদ বার করে দেয়, শরীরের তাপ রক্ষা করে, আরও কত কি কাজ করে।"

ভাষার সরলতা, সৌন্দর্য ও সহজবোধ্যতার দিকে যেমন লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তেমনি তার মধ্যে সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা যাতে বজায় থাকে সেদিকেও বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

এই গ্রন্থের আর একটি সম্পদ হচ্ছে—এর বিপুল চিত্রসম্ভার। হাজার পাতার এই গ্রন্থের প্রতিটি পাতা এক বা একাধিক প্রামাণ্য চিত্র দ্বারা শোভিত। প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে ছোটদের মনে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার জন্যে পাতায় পাতায় ফটোগ্রাফ প্রকাশ করা হয়েছে।

'ছোটদের বুক অব নলেজ' গ্রন্থখানি যে বাংলা ভাষায় এক অসাধারণ বিশ্বজ্ঞানকোষ

গ্রন্থ, সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এই ধরনের অজস্র চিত্রসম্পদে সমৃদ্ধ, বিষয়-বৈচিত্র্যে অতুলনীয় ও ভাষা-সৌষ্ঠবে মনোরম স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানকোষ ইতিপূর্বে শুধু বাংলা ভাষায় কেন, কোন ভারতীয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয় নি। এই দিক দিয়ে 'ছোটদের বুক অব নলেজ' পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করতে পারে। এই গ্রন্থ সংকলনকালে অনেকেই আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ৺**তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (ঔপন্যাসিক), অধ্যাপক মিলন দত্ত, অধ্যাপক হেমকান্ত বসু, অধ্যাপক শান্তিময় রায়, শ্রীঅমলেন্দু সেন, অধ্যাপক দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সমরেশ ঘোষ, শ্রীবিমল দত্ত, শ্রীননীগোপাল আইচ, শ্রীরবিদাস সাহারায়, শ্রীশ্যামাপদ দত্ত, অধ্যাপক অম্বরীষ রাহা, অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্ল হোড় রায়, শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়, ৺প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণ দেবনাথ, শ্রীপ্রভাত কর্মকার, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, শ্রীমধুসূদন মজুমদার ও দৃষ্টিহীন প্রমুখ বিশিষ্ট সুধী ও শুভানুধ্যায়িবৃন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ও মূল্যবান্ পরামর্শ ছাড়া এই বিশাল গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হত না।**

আমরা এই বিশ্বজ্ঞানকোষখানি ছোটদের হাতে তুলে দিতে পেরে যথার্থই গর্বিত। যাদের জন্যে বিপুল পরিশ্রমে ও অজস্র অর্থব্যয়ে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে, আশা করা যায়, তাদের কাছে এটি যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে। ছোটদের সমাদরের মাধ্যমেই এই গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

দেব সাহিত্য কুটীর

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

প্রথম যখন এই গ্রন্থ বাহির হয়, তখন ছিল ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। সামনেই ছিল পূজোর মরশুম। বইয়ের দাম খুব সুলভ করা যায়নি, তার কারণ ছিল অনেকগুলি। তাই এর পরিচালকমণ্ডলীর মনে ছিল অনেক সংশয়, বইটি বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে না দেরি হবে।

কিন্তু আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করলাম, মাত্র তিন মাসের মধ্যে এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেল। বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে পটু-অপটু হাতে চিঠি আসতে শুরু হল, **'বুক অব নলেজ'** আর আছে ? 'না' বলে উত্তর দিতে হয়েছে আমাদের।

ছেপে বার করে দেব বললেই তো এই সুবিশাল গ্রন্থ বের করা যায় না। তার প্রধান অন্তরায় কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা। প্রাণপণ চেষ্টা করে আমরা এক বছরের মধ্যে আবার এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আমাদের পূর্ব এবং বর্তমানের পরিশ্রমকে আমরা সার্থক বলে বোধ করছি, কারণ বাংলার ছেলেমেয়েদের এই গ্রন্থটি ভাল লেগেছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে আরও অনেক নতুন কিছু তথ্য সংযোজিত হল। আশা করা যাচ্ছে প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণটিও বাংলার ছেলেমেয়েদের কাছে প্রিয় হতে পারবে।

দেব সাহিত্য কুটীর

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তৃতীয় সংস্করণে বহু নতুন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। কিছু পুরোনো অংশ অনাবশ্যকবোধে বাদও দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অনেক বিষয়ে আগাগোড়া পরিবর্তন করা হয়েছে। তথ্যগত ভুল শুধরে বইটিকে কালোপযোগী করা হয়েছে। সার্কাসের কথা, ম্যাজিকের কথা, ডুবুরীদের কথা, দমকলের কথা, দেশলাইয়ের কথা, ম্যাজিকের কথা এ সংস্করণের নতুন সংযোজন। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্র, দেশবিদেশের খাদ্য ও দেশবিদেশের শাস্তির ব্যবস্থা এই তিনটি নতুন অধ্যায় এতে যোগ করা হয়েছে। তাছাড়া খনি ও খনিজসম্পদ অধ্যায়ে কয়লা ও খনিজ তৈল সম্বন্ধে নতুন খবর দেওয়া হয়েছে। সংবাদ পত্রের কথা নতুন করে লেখা হয়েছে। আর কৃষি ও কৃষিসম্পদের কথার মধ্যে চা-সম্বন্ধে নতুন তথ্য দেওয়া হয়েছে। বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও কৌতূহলোদ্দীপক করার জন্য অশেষ যত্ন লওয়া হয়েছে। যাদের জন্যে এই বই তারা যদি এর উপযোগিতা বুঝে একে আদর করে গ্রহণ করে তবে আমাদের সব পরিশ্রম সার্থক হবে।

নতুন ছবি অনেকগুলি যোগ করে বইটির পাঠ্যবিষয় আরো মনোহর করা হয়েছে। ছবিগুলির বিবরণও ছেলেমেয়েদের জ্ঞান-তৃষ্ণা মেটাবে।

বর্তমানে কাগজের অগ্নিমূল্য, তার উপর কাগজ দুষ্প্রাপ্য। তা সত্ত্বেও বহু ব্যয়ে আমরা এই সংস্করণের সব ব্যবস্থা করে বইটি প্রকাশ করে এ দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও জ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছি। ব্যয়ের তুলনায় যৎসামান্য মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছি।

আগেকার দুটি সংস্করণ যেমন আদরের ও আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে আশা করি এই নতুন সংস্করণটি সেই রকম সমাদর পাবে।

দেব সাহিত্য কুটীর

চিত্রসূচী

(তিন রঙা)

- **লিপি ও মুদ্রণের কথা—**

উইলিয়াম ক্যাক্সটনের ছাপাখানায় লোকের ভিড়

- **ধর্মের কথা—**

নীরোর আদেশে রোম নগর আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে

- **ফটোগ্রাফির কথা—**

পর্বতের উপর থেকে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হচ্ছে

- **ভৌগোলিক আবিষ্কারের কথা—**

১। পাখির ঝাঁক দেখে কলম্বাস বুঝলেন কাছেই কোথাও ডাঙা আছে
২। উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একদল ইওরোপীয় উত্তর আমেরিকার একস্থানে সমবেত হচ্ছে

- **মেরু অভিযানের কথা—**

মেরু অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে শ্বেত ভল্লুকের লড়াই

- **গানবাজনার কথা—**

যমপুরীতে অর্ফিউস্ ও ইউরিডিসী

- **দেশবিদেশের ঘরবাড়ি—**

এস্কিমোদের বাসভবন—ঈগলু

- **নানারকম শখ ও খেয়াল—**

সেন্ট বার্ণার্ড কুকুর

- **যানবাহনের কথা—**

১। বেলুনে চড়ে আকাশে ওঠা
২। নানা রকমের যানবাহন

- **দেশবিদেশের বেশভূষা—**

আপাদমস্তক পোশাক দিয়ে ঢাকা আরবীয় সেনা

- **নৃত্যকলার কথা—**

জাঁকজমকপূর্ণ বেশভূষা পরে জাপানীদের নৃত্য

- **বিশ্বসাহিত্যের কথা—**

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্য বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে

- **রঙ্গালয়ের কথা—**

উন্মুক্ত স্থানে গ্রীসের রঙ্গালয়

ইতিহাসের কথা—

১। হাতির দল নিয়ে হানিবলের রোম-বিজয়ে যাত্রা
২। রোম সাম্রাজ্যের পতন
৩। গজনীর মামুদ ভারতের একটি দুর্গ ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে
৪। পলাশীর যুদ্ধ
৫। ক্লিওপেট্রা জুলিয়াস্ সীজারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন
৬। লীগ অব নেশনস্ থেকে ইউ. এন. ও.

ভূগোলের কথা—

১। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আগ্নেয়গিরি
২। আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা স্রোত বেরিয়ে আসছে

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা—

ফসফরাস থেকে আলোর সৃষ্টি

অস্ত্রশস্ত্র—

রেড ইণ্ডিয়ানরা এই ভাবে ল্যাসোর সাহায্যে বুনো ঘোড়া ধরত

দেশবিদেশের শাস্তির ব্যবস্থা—

প্রাচীন রোমে এইভাবে অপরাধীদের সাজা দেওয়া হত

দমকলের কথা—

আগেকার দিনের ঘোড়ায় টানা দমকল

সূচীপত্র

আমাদের পৃথিবী

বিষয়	পৃষ্ঠা

সাগরের কথা

বিষয়	পৃষ্ঠা

জীবজন্তু কীটপতঙ্গ ঃ

মানুষ ঃ

গাছপালা

জীবজন্তু কীটপতঙ্গ

জীবজন্তু কীটপতঙ্গ

যানবাহনের কথা :

এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা :

মানুষ

খেলাধুলার কথা :

মহাকাশ

শরীর-বিজ্ঞানের কথা :

ছবিতে সাধারণ জ্ঞান :

মহাকাশ অভিযান

বিষয়	পৃষ্ঠা

লিপি ও মুদ্রণের কথা :

ভূগোলের কথা :

যানবাহনের কথা

১০

এঞ্জিনিয়ারিং-এর কথা

খেলাধুলার কথা

... ফটোগ্রাফির কথা

চারুকলা

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কথা

মেরু-অভিযানের কথা

২৬

দেশবিদেশের বেশভূষা

ইতিহাসের কথা :

সিনেমার কথা

ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা :

শিল্পবাণিজ্য ও প্রচারব্যবস্থার কথা :

বিশ্বসাহিত্যের কথা

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী :

মনীষীদের ছেলেবেলা :

নোবেল প্রাইজের কথা

ইতিহাসের কথা

দেশবিদেশের শাস্তির ব্যবস্থা

ডুবুরীদের কথা

দেশলাইয়ের কথা

সংবাদপত্রের কথা ঃ

অস্ত্রশস্ত্র

ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা

শিল্পবাণিজ্য ও প্রচারব্যবস্থার কথা

ভারতের মঠ ও মন্দির

আদিম যুগের মানুষ।

আমাদের পৃথিবীঃ-

[আদিম যুগের মানুষ।]

আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে। সৃষ্টির প্রথম দিকে এই পৃথিবীতে না ছিল গাছপালা, না ছিল জীবজন্তু। কোটি কোটি বছর কেটে যাবার পর গাছপালার সৃষ্টি হয়। তার পরে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের জীবজন্তুর। সকলের শেষে আসে মানুষ।

সে যুগের মানুষ এ যুগের মানুষের মতো ছিল না। নানা যুগে মানুষের চেহারা নানা আকার ধারণ করেছে। এমনি এক যুগে মানুষদের দেখতে ছিল কতকটা গরিলার মতো, হাতগুলো ছিল দেহের তুলনায় লম্বা, মুখের চেহারা বানরের মতো।

সে যুগের মানুষেরা বনে-জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতের পাদদেশে ঘুরে বেড়াত। তারা কাপড়জামা পরতে, রান্না করতে, চাষবাস করতে, পশুপালন করতে জানত না।

ছবিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের দু জন মানুষকে দেখা যাচ্ছে। তাদের পরনে কাপড় নেই। দেখলে বুঝতে পারাই যায় না তারা মানুষ, না গরিলা।

তাদের গায়ে ছিল অসীম শক্তি। তারা পাথর ছুড়ে ছুড়ে পশু শিকার করত। সেই পশুর কাঁচা মাংসই ছিল তাদের খাদ্য।

॥ পৃথিবীটা কি করে হল ॥

অসীম শূন্যে ছোট বড় আকারের অনেক কিছু জিনিসই চলে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে একটাতে মানুষরা বাস করে। তারই নাম পৃথিবী।

পৃথিবী নামটা কী করে হল। সে বিষয়ে একটা গল্প আছে। পৃথু বলে একজন রাজা ছিলেন। তিনি দেখলেন যে পৃথিবীটা বড় অসুবিধের জায়গা। তিনি উঁচুনীচু জায়গা সমান করে দিয়ে, খানাখন্দ ভরাট করে, খাল-নালা কেটে, এটাকে বাসের যোগ্য করে তুললেন। তাঁর নামেই এর নাম হল 'পৃথ্বী' বা 'পৃথিবী'।

একেবারে সেই আদ্যিকাল থেকেই দেশে দেশে মানুষরা ভেবে আসছে যে পৃথিবীটা কবে আর কী করে সৃষ্টি হয়েছিল।

আগেকার দিনে তো বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নি, তাই তখনকার লোকে এ সম্বন্ধে নানারকম কল্পনা করে নিয়েছিল।

খ্রীষ্টানদের ধর্মশাস্ত্র বাইব্‌ল। তাতে আছে, আগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল জল ছিল। ভগবানের ইচ্ছায় মাটির পৃথিবী তৈরী হল—তাঁর ইচ্ছায় ছ'দিনে জীবজন্তু, মাছ, পাখি ও সবশেষে মানুষ তৈরী হয়েছিল। জাপানীদের প্রাচীন বই কো-জি-কি। তাতে বলে যে, ইজানাগি নামে এক দেবতা সারা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী জলের মধ্যে তাঁর বর্শার ফলাটা ডুবিয়ে তুলে নিতেই তা থেকে জলের ফোঁটা পড়ে পড়ে জমে যেতে লাগল। সেইগুলোই হল পৃথিবীর যত দ্বীপ আর দেশ। আমাদের পুরাণে বলে, পৃথিবীব্যাপী জলরাশির মধ্যে সাপেদের রাজা অনন্তনাগ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিলেন, আর ভগবান্ বিষ্ণু তাঁর উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁর নাভি থেকে একটি পদ্মফুল উঠেছিল। তার উপর বসেছিলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হঠাৎ দেখলেন যে বিষ্ণুর কানের ময়লা থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুটো দৈত্য বেরিয়ে তাঁর দিকে তেড়ে আসছে। ব্রহ্মার ডাকে বিষ্ণু ঘুম ভেঙে উঠে দৈত্য দুটোকে মেরে ফেললেন। সেই দৈত্য দুটোর মেদ দিয়ে পৃথিবী তৈরী হল। মেদ থেকে তৈরী বলে তার নাম হল 'মেদিনী'।

নরওয়ে দেশের গল্পেও বলে যে পৃথিবীটা একটা দৈত্যেরই মৃতদেহ—তার নাম ছিল য়ীমির। আবার, চীন দেশের লোকেরা ভেবে ভেবে বের করেছিল যে পৃথিবীটা হচ্ছে প'আম্‌কু নামে একজন দেবতার মৃতদেহ। তিনি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারাগুলিকে বানিয়ে ক্লান্ত হয়ে মারা পড়লেন, আর তাঁর শরীর পৃথিবী।

বিষ্ণু ঘুম থেকে উঠে দৈত্য দুটোকে মেরে ফেললেন

এরকম একটা না একটা গল্প পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আছে। কোনওটার কোনও যুক্তি বা প্রমাণ নেই—সবই মনগড়া গল্প।

এ যুগের বিজ্ঞানীরা এসব কাল্পনিক মত মানেন না। তাঁদের অনেকের মতে সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত অনন্ত মহাকাশে ঘুরন্ত একটা মস্ত বড় আগুনের গোলা ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে জমে গিয়ে এই পৃথিবীটার স্থষ্টি হয়েছিল। বর্তমান অবস্থায় আসতে পৃথিবীকে কোটি কোটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাসের মতের নাম নীহারিকা-বাদ (Nebular Hypothesis). লাপ্লাস বলেন, একটি ঘূর্ণমান নীহারিকার একটি অংশ সূর্য এক জ্বলন্ত গ্যাসের গোলা। ঘুরপাক খাওয়ার চোটে তার ধারের অংশ খসে গিয়ে পৃথিবী ও অন্যান্য উপগ্রহের স্থষ্টি হয়েছে। এ মতের বহু ত্রুটি ধরা পড়ল।

অনেক কাল পরে ইংরেজ বিজ্ঞানী জেম্‌স্ জীন্‌স্ এবং হ্যারল্ড জেফ্রিস বললেন যে, একটা বিরাট তারা মহাশূন্যে হঠাৎ সূর্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল। সেটা যখন সূর্যের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল তখন তার টানে সূর্যের গায়ে একটা বিরাট জোয়ার তুলেছিল। সেটা শেষ পর্যন্ত একটা পেটমোটা চুরুটের আকারে সূর্য থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। সেটা পরে খান খান হয়ে পৃথিবী ও আর সব গ্রহের স্থষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এ মতেরও খুঁত বার করলেন অন্যান্য বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বললেন, এ মত যদি মানা যায় তো গ্রহগুলির তো সূর্যের কাছে কাছে থাকার কথা—কিন্তু তা তো হয়ই নি—তারা বহু দূরে দূরে

ঘূর্ণমান নীহারিকা থেকে সূর্য-গ্রহাদির স্থষ্টি

ছড়িয়ে রয়েছে যে! জীন্‌স্ ও জেফ্রিসের মতবাদকে বলে জোয়ারী মত (Tidal Theory).

এবার এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানী হয়েল তাঁর মত নিয়ে। তিনি বললেন যে, মহাশূন্যের দিকে তাকালে অনেক যুগ্ম-নক্ষত্র (জোড়া তারা) দেখা যায়। পূর্বে সূর্য ও আর একটা নক্ষত্র এইরকম যুগ্ম অবস্থায় ছিল। প্রচণ্ড বেগে আবর্তনের ফলে বহু কোটি বৎসর পূর্বে নক্ষত্রটাতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। তার ফলে নক্ষত্রটার কতক অংশ থেকে যায়, আর বাকী অংশ বহু শত কোটি মাইল দূরে গিয়ে পড়ে। সূর্যের অংশ ও সেই নক্ষত্রের অংশ থেকে আমাদের সৌর জগতের গ্রহ ও উপগ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদকে বলা হয় যুগ্মতারকাবাদ।

॥ পৃথিবীর সৃষ্টি হল কবে ॥

পৃথিবীটা যে কতদিন আগে তৈরী হয়েছিল—মানে, পৃথিবীর বয়স এখন কত—নানা ধর্মের লোকেরা তারও এক-একটা মনগড়া হিসেব করেছিল। ইহুদী ধর্মে আর খ্রীষ্টধর্মে পৃথিবীর বয়স হাজার পাঁচেক বছরের কাছাকাছি। ওদিকে হিন্দু ঋষিরা ধ্যান করে যা জেনেছিলেন, তাতে পৃথিবীর বয়স দাঁড়ায় ১৯৭ কোটি বছর।

অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ আর যুক্তি দিয়ে জানতে চেষ্টা করতে লাগলেন যে পৃথিবীর বয়স কত।

একশ বছর ধরে দিস্তা দিস্তা কাগজে হিসেব কষা হল, কিন্তু তাঁদের এক-একজনের হিসেব হল এক-এক রকম। কয়েকজন হিসেব করতে বসলেন, একেবারে প্রথমে যে জ্বলন্ত গ্যাস ছিল, তা কতদিনে জুড়িয়ে জমাট বেঁধে এখনকার অবস্থায় আসতে পারে। তাঁদের হিসেবের ফলে দাঁড়াল ১৫০ থেকে ৩০০ কোটি বছর। লর্ড কেলভিন অন্য এক দিকে হিসেব করে বললেন যে, পৃথিবীর বয়স ২৭৫ কোটি বছর। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর লরেন্স কুল্প্ ও ডক্টর জর্জ এল বেট্ বললেন, পৃথিবীর বয়স ৪৮০ কোটি বছর। এই রকম নানা মুনির নানা মতের

সৌর জগতের গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি

কারণ এই যে যতই নতুন নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে, পৃথিবীর বয়স ততই বেশী বলে মনে করতে বাধ্য হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

আজকাল কতকগুলো পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা মেপে তা থেকে পৃথিবীর বয়সের হিসেব করা হচ্ছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হচ্ছে এমন কতকগুলো মৌলিক পদার্থ যাদের ভিতর থেকে অনবরত তেজ বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে সেগুলো ভেঙে ভেঙে কোটি কোটি বছর ধরে আস্তে আস্তে অন্য এক মৌলিক পদার্থে পরিণত হচ্ছে। এইভাবে ইউরেনিয়াম নামে তেজস্ক্রিয় ধাতু ক্রমে সীসা হয়ে যাচ্ছে। সীসা কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থ নয়, তাই তার আর পরিবর্তন হয় না।

কাজেই পৃথিবীর বুকে কোন পাথরের স্তরে ইউরেনিয়ামের আর সীসার পরিমাণ যদি ঠিকভাবে বার করা যায়, তা থেকেই জানা যাবে পদার্থের এই

সীসায় পরিণত হতে কতদিন লেগেছিল এবং তা থেকেই মোটামুটি জানা যাবে পৃথিবীর বয়স কত।

॥ পৃথিবীর ছেলেবেলা ॥

পৃথিবীটা যখন প্রথম হল তখন সে ছিল সূর্যের মতোই একটা জ্বলন্ত গোলা। সেটা অবশ্য সূর্যের চেয়ে ঢের ঢের ছোট ছিল।

ছোট জিনিস তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে যায়, তাই পৃথিবী সূর্যের চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে লাগল।

অনেক অনেক বছর কেটে গেল, পৃথিবীর দাউ-দাউ করে জ্বলাটাও কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সেই আগুনের গোলাটা থেকে অনেক হালকা গ্যাস বেরিয়ে মহাকাশে মিলিয়ে গেল। তবে কয়েক রকমের গ্যাস পৃথিবীর গায়ের উপর জড়িয়ে রইল। আর, আসল আগুনের গোলাটা ঠাণ্ডা হয়ে তরল হয়ে এল। 'ঠাণ্ডা' বলা হল বটে, কিন্তু তখনও গলানো লোহার চেয়েও সেটা গরম, তার গা থেকে আলো বেরোচ্ছে। বহুকাল পরে সেই আলোটাও আর রইল না, পৃথিবী নিভে গেল। দুধ জুড়িয়ে গেলে যেমন তার উপর একটা সর পড়ে, পৃথিবীর উপর তেমনি ক্রমশঃ একটা পুরু সর জমতে লাগল। সেটা জমে কঠিন হয়ে হল ভূ-ত্বক্, অর্থাৎ পৃথিবীর ছাল বা খোসা।

এটা তো উপরের ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা একরকমই ছিল। কিন্তু তরল হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারী জিনিসগুলো তলিয়ে যেতে লাগল। সবটাই তরল, সবটাই ফুটছে টগবগ করে। সকলের উপরে মোটা সরটা থাকায় ভিতর থেকে ভাপটা বেরিয়ে যেতে পারছে না, তাই ভিতরটা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

ভাপটা অবশ্য বেরোবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে খুবই। পৃথিবীর খোসাটা সব জায়গায় সমান পুরু ও শক্ত নয় বলে জায়গায় জায়গায় সরটা ভিতরের ভাপের ঠেলায় বারবার ভেঙে যাচ্ছে, আবার জমে উঠছে। যেখানে সেটা উপরের স্তরকে ঠেলে উঁচু করছে সেখানে পাহাড় তৈরি করছে। এমনি ঠেলাঠেলি, ভাঙাগড়া অনেক দিন ধরে চলতে লাগল পৃথিবীতে।

ভাঙা-গড়ার কাজে অবশ্য ভাঙার চেয়ে গড়ার কাজ হল বেশী। উপরকার খোসাটা ক্রমেই পুরু হয়ে শক্ত হয়ে আসতে লাগল।

পৃথিবীটা পুড়ে পুড়ে যতরকমের গ্যাস বেরিয়েছিল তার খানিকটা পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছিল। তার মধ্যে জলীয় বাষ্পও ছিল। সেগুলি ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। সেটাই এবার গলে গিয়ে জল হয়ে পড়তে লাগল। পৃথিবীর তপ্ত বুকে নেমে এল প্রথম বৃষ্টি।

বৃষ্টি নামল বটে, কিন্তু পালাতে আর পথ পায় না। পৃথিবীর শক্ত পিঠটা তখন একটা গনগনে তপ্ত খোলার মতো। তাতে পড়তে না পড়তে সব জল আবার বাষ্প হয়ে আকাশে ফিরে গেল। সেখান থেকে আবার জল হয়ে নীচে পড়ল, আবার বাষ্প হয়ে উঠে এল। এমনি চলল বহুকাল।

ইতিমধ্যে পৃথিবীটা ক্রমেই জুড়িয়ে আসছিল, তার উপর ক্রমাগত জলের ছিটে খেতে খেতে সে আরো তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। কাজেই তার উপরকার খোসাটা ক্রমেই বেশী পুরু আর শক্ত হতে লাগল।

এখন আর পৃথিবী বৃষ্টির জলের সবটাকে বাষ্প করে দিতে পারে না। অনেকটা জলই তার বুকে জমে থেকে যায়। উঁচু জায়গায় পড়লে সেখান থেকে গড়িয়ে নীচু জায়গায় নেমে যায়। পাথুরে খোলাটার গা তাতে ক্ষয়ে মিহি পলিমাটি হয়ে সেই জলের সঙ্গে মিশে যায়। জলের সঙ্গে সেই পলিমাটি গড়িয়ে নেমে এসে জমা হয় খানাখন্দে। সেগুলো ভরে উঠলে জল আরো উঁচু হয়! তখন এখানে ওখানে উঁচু ডাঙার পাথরগুলো শুধু তার উপর জেগে থাকে।

ওদিকে বৃষ্টি পড়ে আকাশে জলের বাষ্প যায় কমে, আর পৃথিবীর উপরকার পর্দার মতো ঘন কুয়াশা ফিকে হয়ে আসে। তখন রোদ এসে পড়ে পৃথিবীর গায়ে। সূর্যের তাপ তখন খুব বেশী, তাতে জল চোঁ-চোঁ করে শুকোতে থাকে। শুধু বড় বড় গর্তের

এখানে ওখানে পাথরগুলো জেগে থাকে

মধ্যে জমে-থাকা বিশাল জলভাগ অটুট থেকে যায়। সেইগুলোই সমুদ্র।

॥ পৃথিবীর উপরটা কি রকম ॥

বাতাস, জল আর পাথর নিয়ে এই পৃথিবী। এর মধ্যে বাতাস সব থেকে হালকা, তাই বাতাস রয়েছে সকলের উপরে। পৃথিবীর কেন্দ্রের আকর্ষণে বাঁধা পড়ে বাতাস পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারে না। বাতাস একটা অদৃশ্য মোটা চাদরের মতো পৃথিবীর চারদিক্ ঘিরে রয়েছে। এই বাতাস পৃথিবীরই অংশ। একে বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলে বায়ুমণ্ডল (atmosphere). এই বায়ুমণ্ডল মোটামুটি দু' শ' মাইল পুরু। নীচের ঘন বাতাস ক্রমে হালকা হতে হতে উপরে উঠতে উঠতে শেষে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

বাতাসের চেয়ে ভারী আর পাথরের চেয়ে হালকা হচ্ছে জল। তাই বাতাসের নীচেই জল। জলের একটা গভীর স্তর পৃথিবীর বুক ছেয়ে রয়েছে। সব জায়গায় তার গভীরতা সমান নয়। যেখানে যেখানে তার তলা থেকে পাথুরে অংশটা মাথা তুলেছে সেগুলো হল দ্বীপ, দেশ ইত্যাদি। যেখানে পাথুরে অংশের মাঝে মাঝে জল দেখা যায় তাদের বলে হ্রদ। পৃথিবীর তিন অংশ জুড়ে জল রয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে বারিমণ্ডল (hydrosphere). সাগর, মহাসাগরগুলি এরই অংশ।

এই জলের নীচেই পৃথিবীর আসল পাথুরে অংশটা। তার নাম শিলামণ্ডল (lithosphere). এই বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও শিলামণ্ডলকে নিয়ে আমাদের এই পৃথিবী।

॥ পৃথিবীর ব্যাস ॥

পৃথিবীর যে কোন জায়গা দিয়ে যদি একটা কাঠি তার ঠিক মাঝখান দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় ভাবে চালিয়ে দেওয়া যায় তো সে কাঠিটার দৈর্ঘ্য হবে ৭৯২৬·৬৮ মাইল, মোটামুটি আট হাজার মাইল। এর মধ্যে উপরকার বারিমণ্ডলটা হবে গড়ে আড়াই মাইল পুরু—বাকী সবটাই শিলামণ্ডল।

॥ ভূত্বক্ ॥

একটা আপেলকে মাঝখান দিয়ে যেমন করে কাটে তেমনি করে যদি পৃথিবীটাকে কেটে ফেলা যেত তো দেখা যেত যে সকলের উপরের শক্ত খোসাটা ২০ থেকে ৪০ মাইল পুরু। এর নাম ভূত্বক্ (crust of the earth). এটা শিলা বা পাথর দিয়ে গড়া। এর মধ্যে কাদা আছে, বালি আছে, খড়ি আছে, নুড়ি আছে—বিজ্ঞানীদের ভাষায় এ সবের নাম শিলা (rock). এই উপরের খোসাটা বারে বারে ভিতরকার তরল পদার্থের ধাক্কায় ভেঙেচুরে গিয়েছে বহুবার। ভাঙা জায়গাগুলোর মধ্যে তরল পাথর উঠে এসে জমে শক্ত হয়ে গিয়েছে। এইসব পাথরকে বলে আগ্নেয় শিলা (igneous rock). এগুলি থেকেই আর সব শিলার উৎপত্তি হয়েছে। এদের নানারকম শ্রেণী আছে। যেমন গ্র্যানাইট, ব্যাসল্ট ইত্যাদি।

এই সব আগ্নেয়শিলা আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যেতে

নুড়ি-পাথরদেরও সঙ্গে নিয়ে যায় সমুদ্রের দিকে

লাগল প্রধানতঃ জলের ও বাতাসের জন্যে। জল ও বাতাস অনবরত এইসব আগ্নেয়শিলার উপর বয়ে যেতে যেতে তাদের রূপান্তর ঘটাতে লাগল। তার উপর রোদের তাপ আর বরফের সংস্পর্শে পাথর ফাটতে লাগল। পাথরের সবচেয়ে বড় শত্রু হল জল।

॥ পলি-পাথর ॥

পাথরের উপর জোরে বৃষ্টির জল পড়লে তাতে একটু একটু করে পাথর থেকে কণা খসতে থাকে। সেই কণা পাথরের বুক ধুইয়ে নেমে যায় সমুদ্রের দিকে। নুড়ি-পাথরদেরও সঙ্গে নিয়ে যায় সমুদ্রের দিকে। জলের স্রোতের আর নুড়ি-পাথরের ঘষা লেগে পাথর আরও ক্ষয়ে যায়, সেই কণাগুলোও চলে জলের সঙ্গে। তাকে বলে পলি (sediment). সেই পলি জলের তলায় থিতিয়ে যায়—তা' জমতে জমতে উঁচু হয়ে ওঠে, চড়া পড়ে—ক্রমে হয়তো এমনি করে একটা দেশই গড়ে ওঠে।

এই যে পাথরের কণা, এ-ই হল মাটি। এ-ও আবার জমে পাথর হয়। অনেক উঁচু হয়ে পলি জমলে সেই চাপে আর পৃথিবীর ভিতরকার তাপে সেই পলিমাটি শক্ত হয়ে শিলা হয়ে যায়। আগুনে-পাথরের জলে-ধুয়ে-যাওয়া কণাগুলো জমে হয় আরেক ধরনের শিলা। একে বলা যেতে পারে পলিপাথর। এর ভাল নাম পালল-শিলা (sedimentary rock).

কাদা জমে যে শিলা হয় তাকে বলে শেল (shale), তা' শক্ত হলে হয় স্লেট (slate). বালি জমে হয় বেলে-পাথর (sandstone). পলি-পাথরের মধ্যে শামুক-ঝিনুকের খোলা পুড়ে, গুঁড়িয়ে চাপ বেঁধে গিয়ে হয় চুনা-পাথর (limestone). আর এক রকমের পোকার খোলা জমে হয়ে যায় খড়ি (chalk).

আগুনে পাথর থেকে যেমন পলি-পাথর হয়, তেমনি পলি-পাথর চাপে ও তাপে বদলে গিয়ে হয় রূপান্তরিত শিলা (metamorphic rock). চুনা-পাথর রূপান্তরিত হলে হয় মার্বল, বেলে পাথর হয় কোয়ার্টজাইট (quartzite). গ্র্যানাইটের মতো একরকম রূপান্তরিত শিলা আছে, তাকে বলা হয় নাইস (gneiss).

॥ খনিজ পদার্থ ॥

এসব নানা ধরনের জিনিস ভূত্বকের মধ্যে থাকে। তাদের নাম খনিজ। এই খনিজগুলো মানুষের মস্ত বড় সম্পদ্।

পৃথিবীতে প্রায় দু হাজার রকমের খনিজ আছে। তাদের অনেকগুলোর ভিতর ধাতু আছে—যেমন সোনা, রুপা, লোহা, তামা, সীসা, পারা, টিন, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। তাছাড়া আছে কয়লা, পেট্রল, লবণ, অভ্র ইত্যাদি। সবচেয়ে দামী পাথর হীরা, চুনি, পান্না, নীলা, পোখরাজ, গোমেদ ইত্যাদিও খনিজ পদার্থ।

খনিজ যে মাটির তলাতেই আছে এমন নয়। আর সবই যে খাঁটি অবস্থায় আছে এমনও নয়।

সব চাইতে চেনা খনিজ হল কয়লা। দেখতে কালো

পাথরের মতো কিন্তু আসলে ওটা গাছেরই রূপান্তর। ৩০ কোটি বছর আগে এসব ছিল গাছ। বড় বড় বন পলি চাপা পড়ে প্রচণ্ড তাপে আর চাপে ওরকম মূর্তি ধরেছে। যেখানে কয়লা খুব বেশী তাপ আর চাপ পেয়েছে, সেখানে সেটা হীরা হয়ে গিয়েছে। হীরার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল কোহিনূর। নামটার মানে 'আলোর পাহাড়'। পূর্বে কোহিনূরের ওজন ছিল ১৮৬ ক্যারাট—এটির বর্তমান ওজন ১০৬ ক্যারাট।

পৃথিবীর অভ্যন্তর

॥ পৃথিবীর ভিতরটা ॥

পৃথিবীর উপরের খোসাটা ২০-৪০ মাইল পুরু। তার ভিতরটাতে কি আছে?

পৃথিবীর ভিতরটা সাংঘাতিক গরম। মাটির তলায় নামলে প্রতি ৬০ ফুটে ১ ডিগ্রী করে তাপ বেড়ে যায়। সেই হিসেবে ৪০ মাইল নীচে যেখানে খোসাটার শেষ হয়েছে সেখানে তাপ ৩৫০০ ডিগ্রীরও বেশী হবার কথা। আর পৃথিবীর একেবারে মাঝখানে প্রায় ৪০০০ মাইল নীচে তাপ এর ১০০ গুণ। কিন্তু সেখানে কোনদিন কোন মানুষ যেতে পারে নি—সেখানে যাওয়া অসম্ভব।

আকাশের দিকে রাত্রে তাকিয়ে থাকলে কখনও কখনও দেখা যায় যে তারার মতো একটা জিনিস খানিক ছুটে মিলিয়ে গেল। আমরা একে বলি 'তারা খসা'। কিন্তু আসলে ওগুলো তারা নয়, উল্কা। এগুলো পুড়তে পুড়তে কখনও কখনও পৃথিবীতে এসে পড়ে। তাকে বলে উল্কাপিণ্ড। একই সূর্যের গা থেকে পৃথিবীও হয়েছিল আর উল্কারও সৃষ্টি। কাজেই, উল্কাপিণ্ডে যা যা বস্তু আছে, পৃথিবীতেও সেই সেই বস্তু আছে নিশ্চয়। তাই উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করে জানা যায় যে পৃথিবীর ভিতরে কি কি থাকবার কথা।
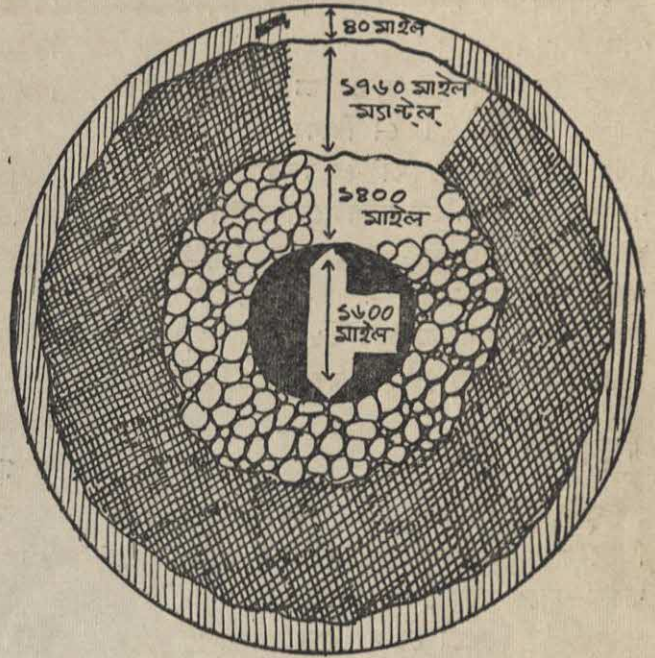
পৃথিবীর ওজন

পৃথিবীটা যখন তরল ছিল তখন ভারী জিনিসগুলো তাদের ওজন হিসেবে কমবেশী তলিয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে হালকা শিলার স্তরটা সকলের উপরে উঠে শক্ত হয়ে ২০-৪০ মাইল পুরু হয়ে জমে গিয়েছে। তার নীচে ভারী শিলার স্তরটা ১৭৬০ মাইল—এর নাম ম্যান্ট্‌ল্ (mantle). এটা একেবারে শক্ত বা থকথকে ঘনও হতে পারে। তার তলায় আরও প্রায় ১৪০০ মাইল পর্যন্ত রয়েছে আরও ভারী তরল শিলার স্তর। তারপর খুব ভারী জিনিসের একটা প্রকাণ্ড গোলা। সেটার ব্যাস ১৬০০ মাইল। এটা নিরেট ও শক্ত বলে অনুমান করা হয়।
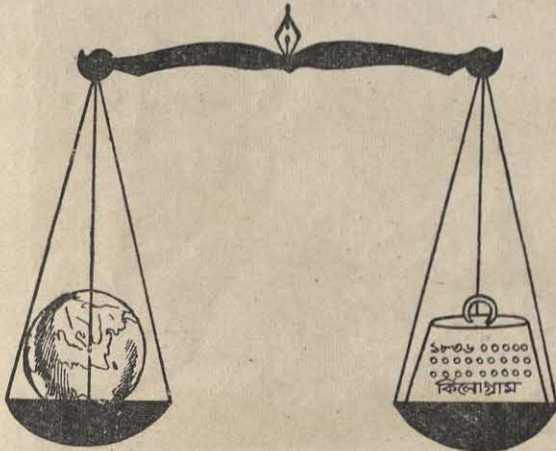
পৃথিবীর এই মাঝখানটাতে গিয়ে জমেছে যত লোহা আর নিকেল।

পৃথিবীর ওজন কত তা-ও বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বার করে ফেলেছেন। সে হিসেব দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারা দিয়ে করা হয় নি। এত বড় দাঁড়িপাল্লা পাওয়া সম্ভব নয়। আর পাওয়া গেলেও কোথায় দাঁড়িয়ে ওজন করা হবে সেটাও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াত। সে হিসেব বার করা হয়েছে মাধ্যাকর্ষণের হিসেব থেকে। সেই হিসেবে পৃথিবীর ওজন ৬৬ কোটি টন, অর্থাৎ ১৮৩৬-এর পর ২৩টি শূন্য দিলে যত হয় তত কিলোগ্রাম।

॥ ভূমিকম্প ॥

পৃথিবীর উপরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু ভিতরের গরমটা আজও ফুঁসছে—চেষ্টা করছে বেরিয়ে যাবার—মাঝে মাঝে বেরিয়েও যাচ্ছে।

পৃথিবীর ভিতরে যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, তাদের গা থেকে অনবরত তেজ বেরিয়ে ভয়ানক তাপের সৃষ্টি করছে। তার ফলে কাছাকাছি সব জিনিস গরম হয়ে ফেঁপে উঠছে। তার ফলে ঠাণ্ডা জিনিস জমে ভারী হয়ে নীচে নেমে আসছে আর কোথাও গরম জিনিস ফেঁপে হালকা হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। এর নাম পরিচলন স্রোত (convection current). এছাড়া পৃথিবীটা ঘুরছে বলে ভিতরের জিনিসগুলোর অনবরত চেষ্টা চলছে কি করে ছিটকে বাইরে চলে যাবে। আমাদের পায়ের তলায়, অনেক নীচে, এই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড চলছে, অথচ আমরা সব সময়ে তা টের পাই না, কেননা আমরা পৃথিবীর যে খোসাটার উপর আছি সেটা বেশ মজবুত। কিন্তু এই খোসাটা সর্বত্র সমান মজবুত নয়। যেখানে খোসাটা পুরু আর মজবুত সেখানে ভিতরের গোলমাল বোঝা যায় না। কিন্তু যেখানে সেটা তত মজবুত নয় সেখানে সেটা একটু নড়ে-চড়ে, কেঁপে-টেপে সামলে নেয়। আর খোসা যেখানে কমজোরী সেখানে খোসাটা ফেটে, ধ্বসে, বসে যায়। পৃথিবীর ভিতরেও ফাট ধরে, তাকে পণ্ডিতেরা বলেন ফল্ট (fault). বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলে 'স্রংস' বা 'চ্যুতি'।

পৃথিবীর ভিতরকার তরল পাথরকে বলে ম্যাগমা (magma). এই ম্যাগমা ফাটলের পথ ধরে উপরে উঠে আসতে থাকে। মধ্যপথে ম্যাগমা জমে পাথর হয়ে যেতে পারে আবার বরাবর উঠে এসে খোসার নীচে ধাক্কা মারতেও পারে। খোসা নরম হলে তাকে ভেদ করে উপরে উঠে আসে। তখন তাকে বলা হয় লাভা (lava). লাভার সঙ্গে ধোঁয়া ও আগুন বেরোয়। এসব লাভা বরাবর যে পথে বেরোয় সেখানে গড়ে ওঠে আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরির মুখটাকে বলে ক্রেটার (crater).

পৃথিবীর ভিতরকার নড়াচড়ার ফলে পৃথিবীর উপরটা কেঁপে ওঠে। তাকে বলে ভূমিকম্প।

পৃথিবীর যেসব জায়গা কমজোরী, বিজ্ঞানীরা তা খুঁজে বের করেছেন। এই সব জায়গাতেই ভূমিকম্প বেশী হয়। পাশাপাশি একসঙ্গে এরকম যত জায়গা সেগুলোকে নিয়ে এক-একটি ভূকম্প-বলয় (seismic belt) কল্পনা করা হয়। আমাদের এদেশে প্রধান ভূকম্প-বলয় হল আসাম, বিহার ইত্যাদির উত্তরাংশ। প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে অর্থাৎ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, জাপান আর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি নিয়ে এইরকম আরেকটি ভূকম্প-বলয় আছে।

এই ভূমিকম্প পৃথিবীর গড়ে ওঠার ব্যাপারে খুব

ভূমিকম্পের ফলে পাহাড় গড়ে উঠেছে

গুরুত্বপূর্ণ! এই ভূমিকম্প পৃথিবীকে নানা রূপ দিচ্ছে নিরন্তর। হিমালয় পাহাড় এমনি ভূমিকম্পের ফলে গড়ে উঠেছে।

পৃথিবীর ভিতরের যে অংশটাকে ম্যান্ট্‌ল্ বলে, সেখান থেকে অর্থাৎ ৩০।৪০ মাইল নীচে থেকেই ভূমিকম্পের ধাক্কাটা উঠে আসে।

ভূমিকম্পের ধাক্কা কোথা থেকে আসে তা মাপবার জন্য বিজ্ঞানীরা সাইজমোগ্রাফ (seismograph) নামক যন্ত্র তৈরি করেছেন। এই যন্ত্রে ভূমিকম্পের জন্মস্থান ও বেগের হিসেব রেখায় আঁকা হয়।

সমুদ্র আটলান্টিস দ্বীপটাকে গ্রাস করেছিল

॥ কয়েকটি বড় বড় ভূমিকম্পের কথা ॥

পৃথিবীর ছেলেবেলায় যেরকম সব সাংঘাতিক ভূমিকম্প হত, আজকাল আর সেরকম হয় না। একালে বড়জোর দু'-পাঁচশো মাইল জায়গা কেঁপে ওঠে, দু'-চারটে শহর-টহর ধ্বসে যায়—তাও কালে-ভদ্রে এতটা হয়। কিন্তু সেকালে যখন-তখন গোটা পৃথিবীটা ধড়ফড় করে উঠত, দু' একটা মহাদেশ টুকরো-টুকরো হয়ে যেত কিংবা হয়তো জলের তলায় তলিয়ে যেত।

আটলান্টিক মহাসাগরের পুবধারে ইওরোপ আর আফ্রিকা, পশ্চিমধারে উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকা। দু'ধারের উপকূল রেখা ভাল করে দেখলে মনে হবে যে, গোটা উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকাকে এপারে ঠেলে নিয়ে এলে তা' ইওরোপ আর আফ্রিকার গায়ে এসে প্রায় খাঁজে-খাঁজে বসে যাবে। যেন এরা একই জিনিসের আলাদা দুটো টুকরো।

পণ্ডিতেরা বলেন যে, সত্যিই তাই। এরা সবাই একসময় একই সঙ্গে ছিল। তারপর কবে কোন্ এক অতীত যুগে ভয়ংকর এক ভূমিকম্প হয়ে উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকা কয়েক হাজার মাইল দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে; মাঝখানকার গর্তটায় জল জমে হয় আটলান্টিক মহাসাগর। এ হল গিয়ে জার্মান পণ্ডিত হেবেগেনারের মত (Wegener's Theory).

'আটলান্টিক' নামটির মধ্যে একটি কাহিনী আছে। এখানে নাকি অতি প্রাচীনকালে আটলান্টিস (Atlantis) নামে একটি দ্বীপ বা মহাদেশ ছিল, তাই সমুদ্রটির নাম হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর। গ্রীক মহাপণ্ডিত প্লেটো (Plato, খ্রীঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭) লিখে গিয়েছেন যে, অধিবাসীদের পাপের ফলেই আটলান্টিস দ্বীপটাকে সমুদ্র গ্রাস করেছিল। জুল্ ভার্নের 'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ্‌স্ আণ্ডার দ্য সী' বইয়ে আছে যে ক্যাপটেন নেমো ডুবো-জাহাজে যেতে যেতে জলের তলায় আটলান্টিস

হুহু করে সেই লাভা নেমে এসে ঢুকল পম্পিয়াই, হার্কুলেনিয়াম আর স্ট্যাবিঙ্গি শহরে

আজ থেকে চার-পাঁচ কোটি বছর আগে। তার অনেক আগে থেকেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দক্ষিণ দিক্‌টা জুড়ে বিপুল একটা ডাঙা ছিল, তার নাম এখন দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ড। ঐ সময় বহুকাল ধরে ভূমিকম্প হয়ে সেটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। আজকের দক্ষিণ ভারত তারই একটা ছোট্ট টুকরো।

কিন্তু এ সব কাণ্ড যত সাংঘাতিকই হোক না কেন, মানুষের তাতে কিছুই এসে যায় নি—কারণ, মানুষ তখনও পৃথিবীতে আসেই নি। একালের ভূমিকম্প অত বিরাট না হলেও মানুষের বড়ই অনিষ্ট করেছে বারবার।

একালের, মানে গত দু'-হাজার বছরের ভূমিকম্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাচীনতম ঘটনা হচ্ছে পম্পিয়াই (Pompeii)-এর ধ্বংস। ইটালীতে বিসুবিয়স আগ্নেয়গিরির কোলে ছিল এই সুন্দর শহরটা। ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে একদিন ঘুমন্ত বিসুবিয়স জেগে উঠল। মাটি কেঁপে উঠে, বজ্রগর্জনে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল ধোঁয়া, আগুন আর

দ্বীপটাকে আবিষ্কার করেছিলেন। তবে সেটা নেহাতই গল্পের কথা।

এই যে আমেরিকার মতো আস্ত একটা মহাদেশ ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া, এ ব্যাপার আরও কতবার হয়েছে, সে কথা কে বলবে? একে ভাল বাংলায় বলে মহী-সঞ্চরণ (Continental Drift). আর একটা এরকমের কাণ্ডের কথা যা আমরা জানি, সেটা ঘটেছিল

লাভার স্রোত। হুহু করে সেই লাভা নেমে এসে ঢুকল পম্পিয়াই, হার্কুলেনিয়াম আর স্ট্যাবিঙ্গি শহরে। রাশিরাশি ছাই উড়ে এসে গাদা হয়ে জমল তার উপরে। মানুষ পশু বড় একটা কেউ রক্ষা পেল না। অনেক বাড়িঘর সেই লাভা আর ছাইয়ের তলায় চাপা পড়ে রইল। ক্রমে তার কথা মানুষে ভুলে গেল। আবার সেখানে মানুষের বসতি হল।

এর প্রায় সতের শো বছর পরে একটা কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে হারানো পম্পিয়াইয়ের খোঁজ পেয়ে গেল এক গরিব চাষী। তারপর আজ দু'শো বছর ধরে আস্তে আস্তে খুঁড়ে বের করা হয়েছে পুরো শহরটাকে। শহরের অনেক ভেঙে গেছে, কিন্তু অনেক কিছুই আস্ত আছে।

ক্রাকাতোয়া (Krakatoa) দ্বীপে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, একালে এমন বিরাট ভূমিকম্প আর হয় নি। জাভা আর সুমাত্রার মাঝখানে সুণ্ডা প্রণালীতে ছিল ক্রাকাতোয়া বলে একটা দ্বীপ। ভূমিকম্পে এই দ্বীপের বেশির ভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানেও

লাভার স্রোত নেমে আসছে

কাছাকাছি সব দ্বীপ জলে ভেসে গেল, বড় বড় জাহাজ সেই বানে ভেসে চলে গেল

ব্যাপারটা হয়েছিল আগ্নেয়গিরিরই জন্যে। সে এক অবর্ণনীয় কাণ্ড! তার শব্দ শোনা গিয়েছিল তিনহাজার মাইল দূরে, তার ছাইয়ে অনেক মাইল পর্যন্ত আকাশ অন্ধকার হয়ে রইল অনেক দিন, তারপর দূরদূরান্তের বনজঙ্গল সেই ছাইয়ের তলায় চাপা পড়ে গেল। সমুদ্র তোলপাড় হয়ে কাছাকাছি সব দ্বীপ জলে ভেসে গেল, বড় বড় জাহাজ সেই বানে ভেসে চলে গেল ডাঙার মধ্যে বহুদূরে। এত করেও যেন হল না। শেষে দ্বীপের বেশির ভাগ একেবারে খানখান হয়ে উড়ে গেল আকাশে। তাতে এক জাভাতেই লোক মারা গিয়েছিল ছত্রিশ হাজার।

এর আগে ১৭৭৫ সালে এক ভূমিকম্পে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। তাতে ১৫,০০০ বাড়ি পড়ে যায়, আর ৩০,০০০ লোক মারা যায়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে সান-ফ্রান্সিস্কো শহরটার এক জায়গা ফেটে গিয়ে একটা পাশ ১৪ হাত বসে গেল। তারপর ১৯০৮-এ হল দক্ষিণ ইটালীতে আর সিসিলি

দ্বীপে এক ভয়ানক ভূমিকম্প। লোক যে তাতে কত মরল, তার ঠিক নেই —৭০ হাজার থেকে দেড় লক্ষ পর্যন্ত বলে অনুমান করা হয়। মেসিনা আর রেজিও বলে দুটো শহরের অবর্ণনীয় ক্ষতি হল।

তবে, আধুনিক কালে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছিল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের এক ভূমিকম্পে। জাপানে ছোটখাট ভূমিকম্প প্রায় লেগেই আছে। তার মধ্যে ১৯১৪ সালে একটা বড় গোছের কাণ্ড হয়ে তিনটা শহর ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর এল সেই ভয়ংকর দিন—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। সারা জাপান প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল। তারপর জায়গায়-জায়গায় মাটি ফেটে আগুন বেরিয়ে সেই আগুন শহরে গ্রামে হুহু করে ছড়িয়ে পড়ল। ওদিকে সমুদ্রও তোলপাড় হয়ে উঠল, তার জল পাহাড়প্রমাণ উঁচু হয়ে এসে কত জায়গা, কত মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল!
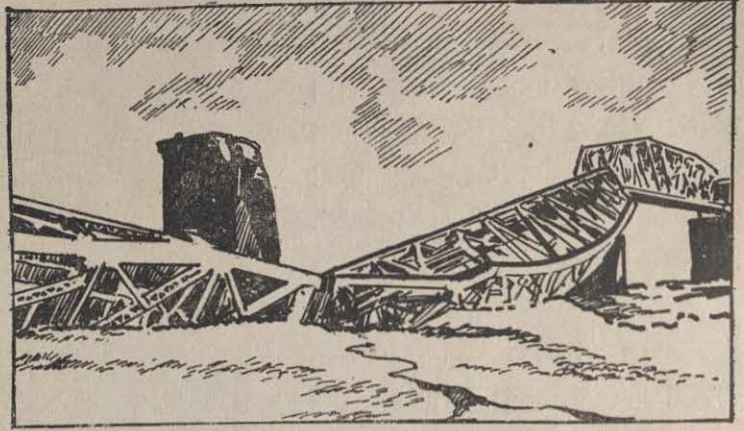
এই ভূমিকম্পটা স্থায়ী হয়েছিল মোটে আধ মিনিট সময়। কিন্তু তাতেই গোটা ইয়োকোহামা শহরটা আর টোকিওর অর্ধেকটা ভগ্নস্তূপে পরিণত হল। মানুষ মারা গেল দু'লাখেরও বেশী। ধনসম্পত্তি নষ্ট হল এক হাজার কোটি টাকা দামের। এমন ক্ষতি আর একালের কোন ভূমিকম্পে হয় নি।

বিহারে একটি প্রলয়ংকর ভূমিকম্প হয় ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসে। তাতে মুঙ্গের, মজঃফরপুর প্রভৃতি শহরে বিপর্যয় ঘটে যায়।

॥ পৃথিবীর জীবনের নানা যুগ ॥

একজন ছিল, সে লক্ষ আর কোটির নীচে কথা কইত না। দিল্লী বেড়িয়ে এসে সে বললেঃ লক্ষ মাইল ঘুরে এলুম, রেলে যা ভিড় তা ধারণা করতে পারবি না তোরা—কোটি কোটি মানুষের চাপে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড় হয়েছিল, লক্ষ কোটি টাকা দিলেও এ শর্মা আর রেলে চড়েছে না।

ভূমিকম্পে সেতু ধ্বংস

পৃথিবীর জীবনের কথা বলতে যাচ্ছি, এবার আমারও সেই দশা হবে। খালি কোটি আর কোটি বছরের কথাই বলব। বুঝতেই পার যে সংখ্যাগুলো একেবারে সঠিক কিছু নয়—যা বলব, তার দু'দশ কোটি এদিক্-ওদিক্‌ও হতে পারে।

প্রথমেই ধর, পৃথিবীটা হয়েছিল, ৫০০ কোটি বছর আগে। এই কলকাতা শহরের সব লোকের বয়স যোগ দিলেও এর পাঁচ ভাগের এক ভাগও হবে না। অঙ্কে লিখতে হলে শূন্য লাগবে ন'টা—৫০০,০০,০০,০০০।

একেবারে প্রথম দিকে যতদিন ধরে পৃথিবীর উপরটা ঠাণ্ডা হতে হতে শক্ত হচ্ছিল, আর তার অবস্থা এখনকার মতো হয়ে আসছিল, ততদিন তার উপর কোনও জীব থাকা সম্ভব ছিল না। জীব বলতে গাছপালা আর প্রাণী দু-ই বুঝতে হবে।

আজ থেকে ২৫০ কোটি বছর আগে, হয়তো পৃথিবীতে প্রথম জীব দেখা দিয়েছিল। তাদের চিহ্ন প্রায় পাওয়া যায় নি বললেই হয়।

মোটে ৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যেসব জীব এসেছে, তাদের কথা আমরা অনেকটা সাজানো-ভাবে জানতে পেরেছি।

সাড়ে চারশো থেকে আড়াইশো কোটি বছর পর্যন্ত ২০০ কোটি বছর ধরে জীব ছিল না বলে পণ্ডিতরা এর নাম দিয়েছেন অ্যাজোইক (Azoic) অর্থাৎ প্রাণ-

হীন যুগ। একে আর্কিওজোইক (Archaeozoic) যুগও বলে।

তারপর যখন প্রথম জীব দেখা দিয়েছিল, তখন শুরু হল ইওজোইক (Eozoic) যুগ। মানে, 'প্রথম জীবনের' যুগ। মোটামুটি ১৯০ কোটি বছর জুড়ে এই যুগটা চলেছিল। এ যুগে, বিশেষতঃ এর শেষের দিকে, হয়তো প্রচুর জীবের উৎপত্তি হয়েছিল। তবে, সেগুলো সবই একেবারে নীচুস্তরের জীব, সবই জলের জীব, যেমন স্পঞ্জের মতো প্রাণী আর শ্যাওলা (algae) জাতের উদ্ভিদ্। ডাঙার প্রাণী আর উদ্ভিদেরা এসেছিল এর অনেক পরে।

সাড়ে চারশোর মধ্যে ৩৯০ কোটি বছরের কথাই বলা হয়ে গেল। এই সময়কার জীব সম্বন্ধে এখনও তেমন খবর পাওয়া যায় নি বলেছি। তারপর থেকেই জীবদের খবর জানা যাচ্ছে। একথা বললেই কথা উঠবে—কি করে ?

॥ জীবাশ্ম ॥

যেভাবে বিজ্ঞানীরা সে-সব দিনের জীবের কথা জানতে পারেন, তা বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

বেশির ভাগ জীবের শরীরে খানিকটা নরম আর খানিকটা শক্ত অংশ থাকে। কেঁচোর মতো কারো কারো অবশ্য সবটাই নরম হতে পারে, কিন্তু সবটাই শক্ত কারও হয় না। গাছের ফুল পাতা নরম, কিন্তু গুঁড়িটা শক্ত। শামুকের গায়ের মাংস নরম, কিন্তু তার উপরকার খোলাটা শক্ত।

এখন হয় কি, গাছ বা শামুক মরে গেলে তার নরম অংশগুলো তাড়াতাড়ি পচে খসে শেষ হয়ে যায়, তার আর চিহ্ন থাকে না। কিন্তু শক্ত অংশগুলো আরও কিছুকাল টিঁকে থাকে। এই সময়টার মধ্যে তার উপর যদি এমন কিছু চাপা পড়ে যায় যাতে ওর গায়ে আর হাওয়া না লাগে, তাহলে সেটা সেই অবস্থায় লাখ লাখ কেন, কোটি কোটি বছরও ঠিক থাকে, নষ্ট হয় না। তবে, হয়তো জমে পাথরের মতো হয়ে যায়। এগুলোকে বলা হয় ফসিল (fossil). বাংলায় 'জীবাশ্ম' বলা যায় (জীব+অশ্ম অর্থাৎ পাথর)।

শরীরের শক্ত অংশগুলি চাপা পড়ে যাবার সম্ভাবনা নদী আর সমুদ্রেই বেশী—যদিও কিছুকিছু ফসিল এমন জায়গাতেও পাওয়া যায় যেখানে কোনদিন সমুদ্র ছিল না। সমুদ্রের জলে, একটা মাছ মরে গেল। সেটা অমনি গিয়ে পড়ল সমুদ্রের তলায়। যদি ডাঙার কাছের কোন জায়গায় এরকম হয়, তাহলে আস্তে আস্তে তার উপর পলিমাটি জমতে থাকবে। নদীর জলের সঙ্গে সর্বদা পলিমাটি এসে সমুদ্রে পড়ে কিনা! যতদিনে ওটা সম্পূর্ণ চাপা পড়বে, তার অনেক আগেই মাছের নরম অংশগুলো পচে গলে যাবে, শুধু শক্ত কাঁটাটা চাপা পড়বে। পলি জমে জমে উঁচু হতে থাকবে, তার মধ্যে মধ্যে স্তরে স্তরে জমতে থাকবে আরও সব জীবের দেহের শক্ত অংশ। যে যত আগে মরেছে, তার চিহ্নটা নীচে পড়ে থাকবে। উপরে থাকবে যে যত পরে মরেছে।

এদের কি তাহলে নদীর আর সমুদ্রের তলা খুঁড়েই বের করতে হয় ? না, তা কেন ? পলি জমে উঁচু হতে হতে সে জায়গাটা ক্রমে ডাঙা হয়ে যায় যে! তখন সেই ডাঙা থেকেই খুঁড়ে খুঁড়ে সেই সব হাড়গোড় পাওয়া যায়।

নানাভাবে ডাঙা হতে পারে। বহুকাল ধরে একটু একটু করে পলি জমতে জমতে উঁচু হয়ে জলের উপর চড়া জেগে উঠতে পারে। কিংবা, লক্ষ লক্ষ বছরে পৃথিবীতে যে অসংখ্য ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে, তার কোনওটার ধাক্কায় ঐ হাড়টাড় সুদ্ধ পলিমাটির বোঝা (সেও হয়তো ততদিন জমে পাথর হয়ে গিয়েছে) জলের উপর উঠে যেতে পারে। এরকম অসংখ্য জায়গায় হয়েছে। যেমন, হিমালয় পাহাড়টা। একসময় ওখানে ছিল শুধু জল। তারপর ভিতরকার ধাক্কায় সমুদ্রের তলাটা বেঁকেচুরে উপরে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে শেষে হয়ে দাঁড়াল ঐ বিরাট পাহাড়।

মাটি খুঁড়ে দেখলে দেখা যাবে যে একরকম পাথরের একটা স্তরের নীচে আর একরকম পাথরের স্তর, তারও নীচে অন্য একরকম পাথরের স্তর রয়েছে। তার মধ্যে ঐ সব হাড়, শক্ত খোলা

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন জীবের ফসিল

ইত্যাদি জমে ফসিল হয়ে আছে। যত নীচের স্তরে পৌঁছানো যাবে, তার মধ্যে ততই নতুন নতুন ধরনের ফসিল দেখতে পাওয়া যাবে। নীচের ফসিল মানেই বেশী পুরানো ফসিল, বেশী আগেকার দিনের জীবের শক্ত অংশ। সেটাকে যদি উপরের স্তরে দেখা না গিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, আগেকার দিনের এক এক ধরনের জীব শেষ হয়ে গিয়েছে, তার বদলে অন্য দল এসেছে।
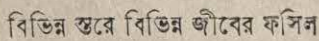
এখন, ঐ যে স্তরগুলোর কথা বলা হল, সেগুলো কোন্‌টা কত বছর আগেকার, সে কথা পণ্ডিতেরা বার করতে পারেন। কাজেই, কোন্ স্তরের ফসিলগুলো যে কত বছরের পুরনো, তাও আন্দাজ করা যায়। তারপর, জীবটার চেহারা কেমন ছিল, সে কথাটা ফসিল দেখে অনুমান করতে হয়। পুরো হাড়গোড় একসঙ্গে পাওয়া গেলে এ কাজটা একটু সহজ হয়। তা না পাওয়া গেলেও পণ্ডিতরা পেছপা হন না। অনেক বিচার করে, অনেক কষ্ট করে তার একটা চেহারা ঠিক করে নেন।

বারবার 'হাড়গোড়' বলছি বটে, কিন্তু ফসিল যে শুধু হাড়-গোড়েরই হয়, তা নয়। দাঁত, নখও ফসিল হতে পারে। কলকাতার মিউজিয়ামে গেলে দেখা যাবে, গাছের গুঁড়ির ফসিল রয়েছে। অবিকল যেন গাছটা, তবে জমে পাথর হয়ে আছে। আমেরিকার অ্যারিজোনা অঞ্চলে পুরো একটা ফসিলের বন আছে—কবে কোন্ সুদূর অতীতে আগ্নেয়গিরির ছাইয়ে চাপা পড়ে অনেক গাছ সেখানে জমে কাচের মতো হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য পাতা-টাতা কিছু নেই, শুধুই সারিসারি গাছের গুঁড়ি। শেওলা তো নরম গাছ, অথচ একরকম শেওলার ফসিল পাওয়া গিয়েছে। এদের গা থেকে চুনের মতো একরকম জিনিস বেরোয়। সেটা শক্ত হয়ে শেওলাগুলোকে চাপা দেয়, তাতেই তারা বেশ টিকে গিয়েছে।

শুধুই কি ফসিল? অনেক জায়গায় পাথরে ছাপ দেখে কত জীবের কথা জানা গিয়েছে। একেবারে প্রথমে যে মাছ ছিল কবে নরম মাটিতে তার ছাপ পড়েছিল, সেই নরম মাটি জমে পাথর হয়ে সেই ছাপটাকে স্পষ্ট ধরে রেখেছে। ঐরকম আর একটা পাথরে ছাপ দেখে জানা যায় যে, কোটি কোটি

বছর আগে একদল তারা মাছ এক ঝাঁক ঝিনুককে খেতে এসে কি করে যেন চাপা পড়ে গিয়েছিল। তাদের শরীরের কোন চিহ্ন এখন আর নেই, কিন্তু তাদের পুরোপুরি ছাপ নিয়ে মাটিটা পাথর হয়ে রয়েছে। ঠিক যেন একখানা নারকেলের সন্দেশের ছাঁচ। আবার, প্রায় ৪০ কোটি বছর আগেকার একরকম মাছি একটা গাছের আঠায় আটকে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। মাছিটা সুদ্ধ আঠাটা পাথর হয়ে যায়। তাই আস্ত মাছিটা পাওয়া গিয়েছে।

এই সব দেখে পৃথিবীর গত ৬০ কোটি বছরের কথা জানা গিয়েছে। এই ৬০ কোটি বছরকে বলে ভূতত্ত্বের কাল (Geological Time), কারণ ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাল করে জানা গিয়েছে এই সামান্য কয়েক কোটি বছরেরই কথা। পণ্ডিতেরা একে যে কয়েকটা যুগে ভাগ করেছেন, সে সম্বন্ধে বড় বেশী মতভেদ নেই। কিন্তু কোন্ যুগটা কবে শুরু হয়ে কবে শেষ হয়েছিল, তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। কাজেই, পৃথিবীর প্রথম দিন থেকে যত সব তারিখের কথা, তা একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক নাও হতে পারে। যেমন, যাকে ৬০ কোটি বছর বলা হয়েছে, সেটা ৫০ কোটি বছর হওয়াও অসম্ভব নয়।

ষাট কোটি বছর আগে যে যুগ শুরু হয়েছিল, তাকে বলা হয় প্যালিওজোইক (Paleozoic) যুগ। মানে, 'প্রাচীন-প্রাণ' যুগ (ভাল কথায়, পুরাজীবীয় যুগ)। এটা চলেছিল ৩৭ কোটি বছর ধরে, অর্থাৎ, প্যালিওজোইক যুগ শেষ হয়েছে ২৩ কোটি বছর হল। একে প্রথম (Primary) যুগও বলা হয়।

এযুগের ছ' ভাগ। সবচাইতে পুরোনো হল ক্যামব্রিয়ান (Cambrian) আমল—৬০ কোটি বছর আগে এর আরম্ভ, ৫০ কোটি বছর আগে এর শেষ। তারপর হল অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician) আমল, ৫০ থেকে ৪২ই কোটি বছর পর্যন্ত। তারপর, ৪২ই থেকে ৪০ই কোটি বছর পর্যন্ত চলেছিল সিলিউরিয়ান (Silurian) আমল। এরপর যে আমল, তাকে বলে ডিভোনিয়ান (Devonian), ৪০ই কোটি বছর আগে তার শুরু, ৩৪ই কোটি বছর আগে তার শেষ। তারপর, ৩৪ই থেকে ২৮ কোটি বছর আগে পর্যন্ত চলল কার্বনিফেরাস (Carboniferous) আমল। সকলের শেষে এল পার্মিয়ান (Permian) আমল। ২৩ কোটি বছর আগে এটা শেষ হওয়ার সঙ্গে প্যালিওজোইক যুগ শেষ হল। শুরু হল মেসোজোইক (Mesozoic) বা দ্বিতীয় (Secondary) যুগ। বাংলায় বলে মধ্য-জীবীয় যুগ।

মেসোজোইক যুগ ২৩ কোটি বছর আগে আরম্ভ হয়ে ৬ কোটি ৩০ লাখ বছর আগে শেষ হয়েছিল। এই ১৬ কোটি ৭০ লাখের মধ্যে প্রথম ৪ কোটি ৯০ লাখ বছরকে বলে ট্রায়াসিক (Triassic) আমল। তারপরের ৪ কোটি ৬০ লাখ বছর হল জুরাসিক (Jurassic) আমল। শেষ ৭ কোটি ২০ লাখ বছরকে নাম দেওয়া হয়েছে ক্রেটেশাস (Cretaceous) আমল।

এরপর এল কেনোজোইক (Cainozoic, Kaino-

বরফের স্তূপ গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসতে লাগল

zoic বা Cenozoic) যুগ। এটা হল তৃতীয় (Tertiary) যুগ। ভাল বাংলায় বলা হয় নবজীবীয় যুগ। এটা ৬ কোটি ৩০ লাখ বছর আগে আরম্ভ হয়েছে। এর প্রথম ভাগকে বলে প্যালিওসীন (Paleocene), তা চলেছিল ৫০ লাখ বছর। তারপর হল ইওসীন (Eocene), ২ কোটি ২০ লাখ বছর। তারপর ওলিগোসীন (Oligocene), ১ কোটি ১০ লাখ বছর। এরপর মাইওসীন (Miocene), ১ কোটি ২০ লাখ বছর। সবশেষে প্লাইওসীন (Pliocene), তাও ১ কোটি ২০ লাখ বছর। এইভাবে ৬ কোটি ২০ লাখ বছর চলে তৃতীয় যুগ শেষ হয়ে গেল।

কাজেই আমরা এসে পড়ছি ১০ লাখ বছর আগেকার কথায়। তখন আরম্ভ হল চতুর্থ (Quaternary) বা আধুনিক (Recent) যুগ। এর আবার দু'ভাগ। প্রথম দিক্‌টাকে বলে গ্লেশিয়াল (Glacial), আর শেষের দিক্‌টাকে বলে পোস্ট-গ্লেশিয়াল (Post-Glacial) কাল। এদের আমরা তুষার-কাল আর তুষারোত্তর (মানে, তুষারের পরের) কাল বলতে পারি।

এই যে তুষার-কাল (Ice Age), এর নাম এইজন্য হয়েছে যে এই সময়ে পৃথিবীর অনেকখানি অংশ তুষারে মানে বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ২০ কোটি, ৫০ কোটি আর ৭০ কোটি বছর আগেও কয়েকবার এরকম হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে শীত বাড়তে থাকে, বরফ জমতে থাকে। তারপর সেই বরফের চাঁই গড়াতে গড়াতে এসে পৃথিবীর অনেকটা ঢেকে ফেলে। হয়তো সেই বরফের ঢাকনাটা কয়েক মাইল পুরু হয়ে পৃথিবীর বুকে চেপে বসে থাকে লক্ষ লক্ষ বা হাজার হাজার বছর। কত জীব তাতে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর বরফ হটে যেতে আরম্ভ করে, পৃথিবীর আবার সুদিন আসে। আবার নতুন নতুন ধরনের জীব দেখা দেয়।

তৃতীয় যুগের শেষে আবার একবার পৃথিবী বরফে ছেয়ে যেতে আরম্ভ হল। সেটাই শেষ তুষার-কাল, তাই শুধু তুষার-কাল বললে আমরা এই সময়টাকেই বুঝি। তখন, মানে, আজ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে, বরফের স্তূপ গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসতে লাগল দেশ-মহাদেশ জুড়ে। একে বলে গ্লেশিয়ার (Glacier) বা হিমবাহ। তার প্রবল চাপে কত পাহাড় গুঁড়িয়ে গেল, সেই গুঁড়ো মাটি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর বুকে। বরফের ধাক্কায় কত জায়গায় গর্ত হয়ে গেল, পরে সেগুলো হল হ্রদ। এইরকম আরও কত কি! তারপর কয়েক লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বরফে চাপা পড়ে রইল। শেষে শীত কমতে লাগল, বরফ সরে যেতে থাকল। এখনও গ্রীনল্যাণ্ড আর দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলে তার কিছু কিছু থেকে গিয়েছে। হাজার হাজার ফুট উঁচু বরফের বোঝা আজও চেপে রয়েছে সে-সব জায়গায়।

পণ্ডিতেরা আগে বলতেন যে, পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষ দেখা দেয় বোধহয় এই তুষার কালের মাঝামাঝি। একেবারে ঠিক আমাদের মতো না হলেও কতকটা মানুষ বলে চেনা যায়, এমন একজাতের প্রাণী প্রথম দেখা যায় বোধহয় পাঁচ-ছ' লক্ষ বছর আগে। কিন্তু এখন আফ্রিকার নানা জায়গায় বিজ্ঞানীরা এমন সব মানুষের হাড়গোড় পেয়েছেন, যারা এর চাইতেও অনেক আগেকার দিনে পৃথিবীতে থাকত। তার আগে প্রায় আড়াইশো কোটি বছর ধরে কত রকমের প্রাণী পৃথিবীতে এসেছে আর পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর বয়স যদি ধরা হয় এক বছর, তাহলে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে এক ঘণ্টাও নয়!

॥ আমাদের দেশটা আগে কেমন ছিল ॥

পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ নিয়ে যে বঙ্গভূমি, আগেকার দিনে তা ছিল না। লাখ পাঁচেক বছর আগে এর সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতবর্ষের কোনও কোনও জায়গা বেশ প্রাচীন কালেও ছিল। আরাবল্লী পাহাড়ের বয়স ২৪০ কোটি বছর। পূর্বঘাট অঞ্চল ১৬০ কোটি বছরের, এমনকি হাজারিবাগের অভ্র খনির এলাকাটাও ১০০ কোটি বছরের পুরোনো। এইসব জায়গা নিয়ে এখনকার ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমিটা খুব প্রাচীন। উঁচু, অথচ মাথাটা কতকটা সমতল, এমন জায়গাকে বলে মালভূমি।

প্যালিওজোইক যুগের গোড়ার দিকে বিরাট একটা ডাঙা ছিল পৃথিবীর দক্ষিণ অংশ জুড়ে। দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, এমন কি দক্ষিণ মেরু অঞ্চল পর্যন্ত ছিল তার মধ্যে। এই যে বিপুল দক্ষিণ মহাদেশ, এর তো তখন নাম দেবার কেউ ছিল না। এখন সেটা নেই, তবু পণ্ডিতেরা এর নাম রেখেছেন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড (Gondwanaland).

এই মহাদেশটা খুব মজবুত ছিল বলতে হবে।
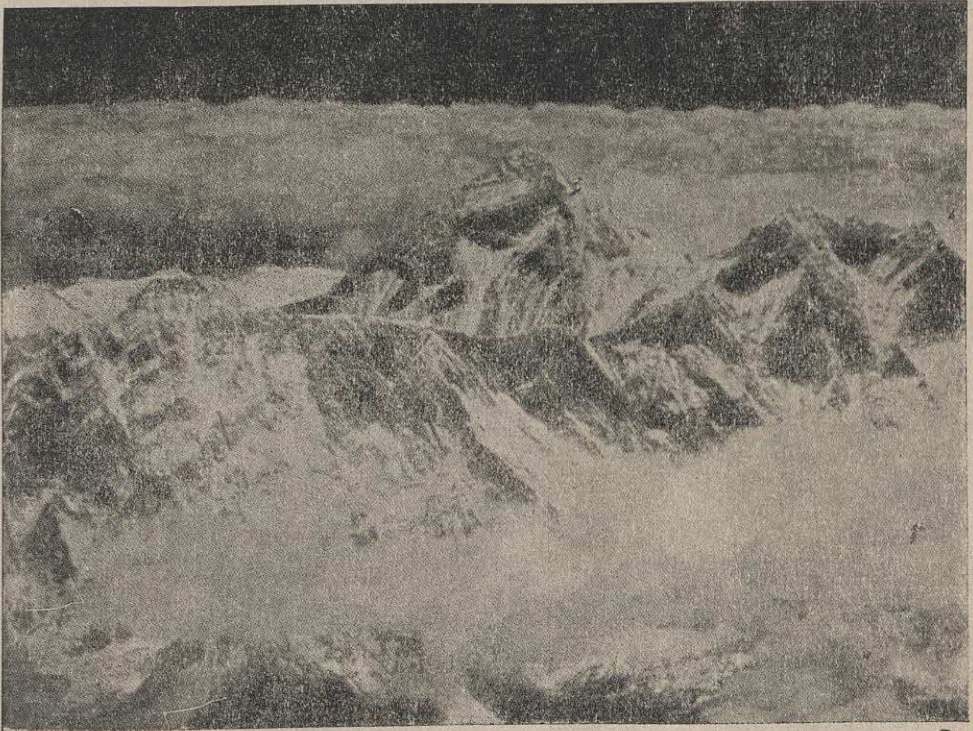
হিমালয়

নইলে কি আর এটা তৃতীয় যুগের গোড়ার দিক্ পর্যন্ত টিকতে পারত ? কিন্তু বড় রকমের গোলমাল বেধে গেল সেই সময়ে—প্রায় ছ' কোটি বছর আগে।

তখন দাক্ষিণাত্যের মালভূমি তো ছিল—কিন্তু কোথায় ছিল উত্তর ভারত, কোথায় বা ছিল হিমালয় পাহাড়! সেখানে তখন শুধু জল আর জল—ভূমধ্যসাগর থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত এক সমুদ্র। তার নাম এখন রাখা হয়েছে টেথিস সাগর (Tethys Sea). গ্রীকদের আদি দেবতা ঔরানস (স্বর্গ)-এর ছোট মেয়ের নাম ছিল টেথিস—তারই নামে এই নাম দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় যুগ আসতে না আসতেই মহা ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে গেল এখানটাতে। দাক্ষিণাত্যের এক বিরাট অংশে ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত শুরু হল। পাতাল থেকে উঠে এসে গলানো পাথর ছড়িয়ে পড়ল কয়েক লক্ষ বর্গমাইল জায়গা নিয়ে। হাজার হাজার ফুট উঁচু হয়ে জমে শক্ত হয়ে গেল সেই লাভার স্রোত।

বরফের স্তূপ নেমে আসছে

এইবার অতদিনের পুরোনো গণ্ডোয়ানা মহাদেশটি ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যেতে শুরু করল। তার অনেক টুকরো জলে তলিয়ে গেল, বাকী টুকরোগুলো আলাদা আলাদা দেশ মহাদেশ হয়ে গেল। এটা আনুমানিক ৪-৫ কোটি বছর আগেকার কথা।

তারপর টেথিস সাগরের পালা। তার দক্ষিণে পাকা পাথরের দেশ দাক্ষিণাত্য মালভূমি উত্তরে সরে যেতে লাগল। টেথিসের তলায় নরম পলিপাথরের স্তরে লাগল ধাক্কা। সেও সরে যেতে পারত, কিন্তু তার ওধারে ছিল তিব্বত-চীন—যার বনেদ খুবই শক্ত, তা তাকে ঠেসে ধরে রইল। একটা কাগজের একধার যদি দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে অন্য ধারটাকে ঠেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা যেমন কুঁকড়ে দুমড়ে উঁচুনীচু হয়ে যায়, সেইরকম হল টেথিসের মেঝের অবস্থা। উঁচু জায়গাগুলো হল হিমালয় পর্বতশ্রেণী। তার এপাশে হয়ে গেল প্রকাণ্ড একটা খাত। টেথিস সাগরের চিহ্ন বিশেষ রইল না।

হিমালয় থেকে নতুন নতুন নদী পলি নিয়ে এসে ঢালতে লাগল সেই খাতে। সেই পলিগুলো পাথর হয়ে জমতে লাগল। বিরাট এক নদী পুব থেকে পশ্চিমে বয়ে যেতে লাগল—আজকাল তার নাম রাখা হয়েছে ইন্দোব্রহ্ম (Indobrahm). সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র তখনও হয় নি।

পরের ধাক্কাটা এল এর এক কোটি দেড় কোটি বছর বাদে। হিমালয় আর একটু উঁচু হল, আরও নতুন নতুন পলিপাথরের স্তর পাহাড় হয়ে গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল। এইভাবে থেকে থেকে ৪।৫ বার ধাক্কা খেয়ে খেয়ে হিমালয় তার এখনকার চেহারা পেল বোধ হয় ৫।৬ লাখ বছর আগে।

এর আগেই তো তুষার কাল আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সারা উত্তর দিক্ ঢেকে দিয়ে বরফের স্তূপ নেমে আসতে লাগল। ক্রমে হিমালয়ের পশ্চিম দিক্‌টা তার তলায় চাপা পড়ে গেল। তার এদিকে বরফ আর এগোল না।

হিমালয়ের দক্ষিণে যে খাতটা, সেটা নদনদীর পলিতে ভরাট হয়ে আসছিল। এর মধ্যে, বোধ হয়

৫।৬ লাখ বছর আগে, এই জায়গাটায় ভূত্বক্ ওলট-পালট হয়ে গেল। খাতটা এমনভাবে উঁচু-নীচু হয়ে গেল যে পুরোনো ইন্দোব্রহ্ম নদীটা আর রইল না, তার জায়গায় বইতে লাগল তিন দিকে তিনটে নদনদী—সিন্ধু, গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র। তাদের বয়ে-আনা পলি জমতে জমতে ক্রমে গড়ে উঠল পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার আর এই বঙ্গভূমি।

হিমবাহ

এদের আর আসামের যে অংশটা একেবারে হিমালয়ের কোলঘেঁষা, এই সামান্য ক'বছরে তেমন পাকাপোক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। তাই এই লাইন ধরেই ভারতের বেশির ভাগ ভূমিকম্প হয়। ভিতরকার ধাক্কাধাক্কি তো আছেই, হিমালয়ও মধ্যে মধ্যে একটু গা ঝাড়া দেয়।

নদনদী, হিমবাহরা (গ্লেসিয়ার) মিলে হিমালয়কে সর্বদা ক্ষইয়ে হালকা করে দিচ্ছে, সেই পলি এসে জমে জমে ঐ পলি-পড়া জায়গাগুলোকে ভারী করে তুলছে। হতে হতে এমন হয় যে হিমালয়কে একটু নড়েচড়ে টাল সামলাতে হয়—কেননা তার ভিতটা এখনও তেমন পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে নি। তার সব চোটটা গিয়ে পড়ে সেই কমজোরী জায়গাগুলোর উপর। সেটা কেঁপে ওঠে, ফেটেও যায়—যেমন হয়েছিল ১৯৩৪-এর বিহারের ভূমিকম্পে।

এরকম হতে পারে এইজন্যে যে ওখানে ভূত্বক্ দুর্বল। কিন্তু দাক্ষিণাত্য বড় শক্ত ঠাঁই। তার বনেদ বড় পাকা পাথরে গড়া। সে হিমালয়ের মতো ছেলেমানুষ নয়, ভিতর থেকে ধাক্কা খেয়ে মাথা তোলে নি। ৬০ কোটি বছরেরও অনেক আগে থেকে তা গড়ে উঠেছিল লাভা জমে জমে। তার পর কোটি কোটি বছর ধরে জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে তার নরম জায়গাগুলোয় নীচু সমতল ভূমি হয়েছে, আর শক্ত জায়গাগুলো উঁচু হয়ে থেকে গিয়েছে। দাক্ষিণাত্যের পাহাড়গুলি হল এইসব কম-ক্ষয়ে-যাওয়া উঁচু জায়গা। তাই এদের মাথা হিমালয়ের মতো ঢালু নয়, কতকটা চেপটা ধরনের। নীচের আর পাশের দিক্ থেকে ঠেলে কুঁচকে দিলে উঁচু জায়গাগুলোর মাথা ঢালু বা গড়ানে হয়।

এর পরও কত যুগযুগান্ত পার হয়ে চলে গেল, ছোটবড় কত পরিবর্তনই না হয়ে গেল ভারতের মাটিতে। যুগযুগ ধরে গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের আনা পলিমাটি জমে জমে শেষে গড়ে উঠল বঙ্গভূমি। আজও চলছে সেই খেলা। গঙ্গা-মেঘনার মোহানায় নতুন নতুন চড়া পড়ছে, ডাঙা আস্তে আস্তে সামনের দিকে বেড়ে চলেছে, সমুদ্র একটু একটু করে হটে যাচ্ছে। লক্ষ বছর পরে হয়তো সেখানে নতুন এক দেশ দেখা দেবে! যাকে বাংলাদেশ বলা হয়, সেই ভূখণ্ডে দক্ষিণে সমুদ্রে এইরকম একটি বিস্তীর্ণ জায়গা সমুদ্রের বুকে জেগে উঠেছে।

প্রাণের আবির্ভাব

পৃথিবীর প্রথম যুগের গাছপালা

পৃথিবীতে যখন সর্বপ্রথম প্রাণীর আবির্ভাব ঘটল তখন তার খাদ্য হিসাবে বায়ু, লবণ ও জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই রকম খাদ্য খেয়ে যারা বাঁচতে পারে তারা হচ্ছে গাছপালা।

কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে গাছপালার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল।

॥ প্রাণ কি ॥

এখন বুঝতে হবে, প্রাণ কি। প্রাণ একটা শক্তি —যেমন চুম্বক একটা শক্তি, কিংবা তাপ, আলো, বিদ্যুৎ এক-একটা শক্তি। বিজ্ঞানীরা তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, চৌম্বক শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন—সেগুলো তাঁরা সৃষ্টিও করতে পারেন। কিন্তু কি করলে যে প্রাণের সৃষ্টি করা যায় তা তাঁরা এখনও ধরতে পারেন নি। তাঁরা জানতে পেরেছেন যে চুম্বক-শক্তি থাকতে হলেই লোহা থাকা চাই, তেমনি কার্বন বলে যে মৌলিক পদার্থ আছে তাকে ছাড়া প্রাণকে দেখা যায় না। কিন্তু যে-কোনও কার্বন হলেই চলবে না। সেই কার্বন যদি প্রোটোপ্লাজম (protoplasm)-এর কার্বন হয়, তবেই সেখানে প্রাণ দেখা দেবে। কাজেই এতকাল গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা প্রাণের বাসা খুঁজে পেয়েছেন। যেখানে প্রোটোপ্লাজম সেখানেই প্রাণ, যেখানে প্রাণ সেখানেই প্রোটোপ্লাজম। সেটা কি, তা একটু বাদেই বলছি।

॥ প্রাণের লক্ষণ কি ॥

প্রাণের লক্ষণ কি? প্রাণের লক্ষণ, খাদ্য খেতে পারা, খেয়ে বেড়ে ওঠা, নিজের শরীর থেকে ঠিক নিজের মত আরও জীব সৃষ্টি করতে পারা, বাইরে থেকে অক্সিজেন নেওয়া, দেহ থেকে অদরকারী জিনিস বের করে দেওয়া, আর মরে যাওয়া। জড় পদার্থ এর কোনটাই করতে পারে না।

॥ পৃথিবীতে জীব এল কি করে ॥

আমরা দেখেছি, জীব থেকে জীব হয়। জড় থেকে জীব হয় না। কিন্তু একেবারে প্রথমে পৃথিবীতে তো জীব ছিল না, সবই ছিল জড় পদার্থ। তা থেকে প্রথম জীব হলো কি করে? এ ধাঁধার উত্তর আজও জানা যায় নি। পৃথিবীর জন্মের পর একশো কোটি বছর পর্যন্ত জলে, স্থলে, আকাশে প্রাণের চিহ্ন মাত্র ছিল না। পৃথিবীটা সেই সময়ে এত প্রচণ্ড গরম ছিল যে কোন রকম প্রাণের তখন বেঁচে থাকবার সুযোগ ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে গরমটা কমতে থাকল। অন্য নানা দিক্ দিয়ে অবস্থা প্রাণের অনুকূল হয়ে এল।

॥ প্রথম প্রাণ-স্পন্দন ॥

তখন চারিদিকের প্রাণহীন জড়ের মধ্য থেকে জেগে উঠল প্রাণের স্পন্দন—কিন্তু ডাঙায় নয়, জলে

সমুদ্রের তলায়, শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে। সে প্রাণকণা ছিল ছুঁচের আগার মতো খুব ছোট্ট—এক কণা আঠার মতো তাদের চেহারা! সেই আঠাটুকুই হলো প্রথম প্রোটোপ্লাজম। তারা সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়াত। কিন্তু কোথা থেকে এল তারা? জড় পৃথিবীর মধ্য থেকে কি করে জন্মাল তারা? আগেই বলেছি যে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে কথা আজও জানা যায় নি।

সেই প্রথম প্রাণকণা থেকেই, সেই আঠার মতো জীবটুকু থেকেই, পৃথিবীতে এখনকার প্রায় ২০ লক্ষ রকম জীবের উৎপত্তি হয়েছে।

॥ প্রোটোপ্লাজম ॥

প্রোটোপ্লাজম হল প্রাণের বাসা। প্রোটোপ্লাজম খুব নরম। এর মোটামুটি ছুটি অংশ। মাঝখানটা একটু ঘন ডেলা, তার নাম নিউক্লিয়াস। আর সেটাকে ঘিরে একটু পাতলা আঠা, তার নাম সাইটোপ্লাজম (cytoplasm). সবটুকু প্রোটোপ্লাজম একটি খোপের মধ্যে থাকে। সেই খোপটিকে বলে কোষ (cell).
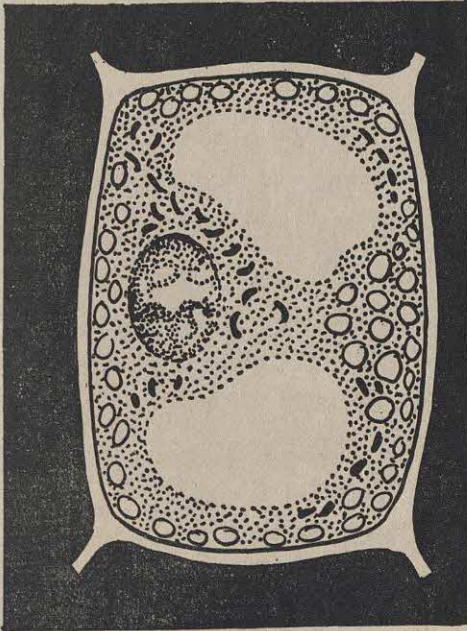
প্রোটোপ্লাজম

সব জীবের শরীরেই কোষ থাকে। যে যত বড় তার শরীরে তত বেশী কোষ। আবার মাত্র একটি কোষ নিয়েও জীব আছে। তাদের বলে এককোষী জীব। কোষগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। মাটিতে, বাতাসে, জলে এরকম এককোষী জীব লাখে লাখে ঘুরে বেড়ায়।

॥ এককোষী জীব ॥

এককোষী জীবও নানারকমের আছে। এদের মধ্যে অ্যামীবা (amoeba)-র চেহারা ভারী মজার।
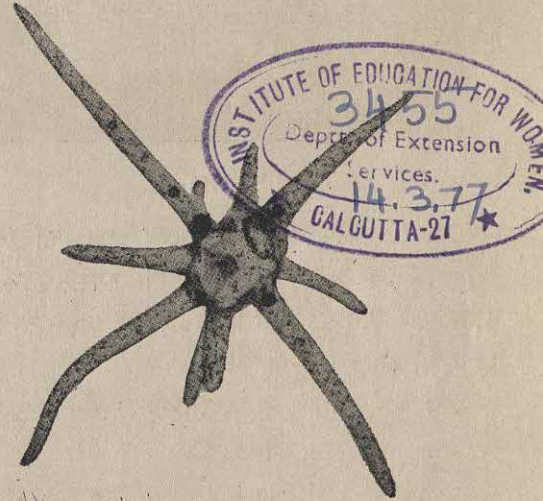
অ্যামীবা

তার কোষটির আকার ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। হঠাৎ সে একদিকে বেড়ে গেল, তার ভিতরের প্রোটোপ্লাজম তখন অন্য অংশটায় গড়িয়ে চলে এল। যে জায়গাটা সে ছেড়ে এল সে অংশটা গুটিয়ে গেল। সারাক্ষণ এক একটা অ্যামীবা এমনি করে এদিক্-ওদিক্ চলা-ফেরা করে। কখনও হয়তো তার নিউক্লিয়াসটা ছুভাগ হয়ে ছুপাশে সরে গেল, কোষের মাঝখানে একটা দেওয়াল পড়ে গেল; তারপর মাঝামাঝি ছুভাগ হয়ে এক-একটা অ্যামীবা ছুটো হয়ে গেল। আবার সেই ছুটোর মধ্যে পরিবর্তন হতে লাগল। এমনি করে হাজার হাজার অ্যামীবার সৃষ্টি হতে থাকে। এছাড়া সমুদ্রের জলে ডায়াটম (diatom) বলে একরকম

ডায়াটম

সর্পাকৃতি কলসীগাছ
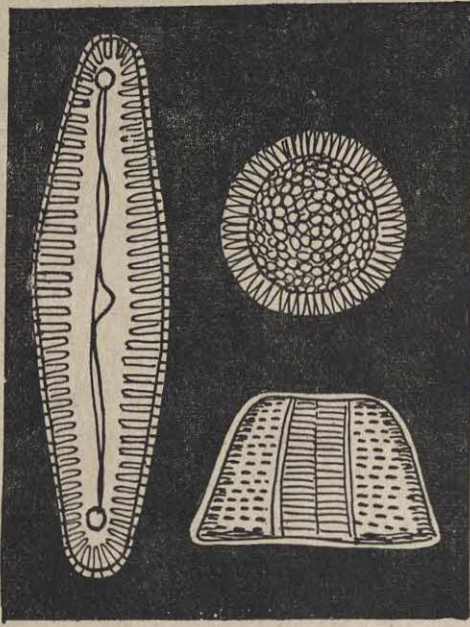
এককোষী জীব আছে। এদের খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না। সেগুলো কাচের মতো স্বচ্ছ ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। সেই ঢাকনার উপর খুব সূক্ষ্ম সব কারুকার্য করা।

এককোষী জীবদের মধ্যে দুটি শ্রেণী। একরকম হল গাছ, অন্যরকম হল প্রাণী।

গাছেদের কোষের চারদিকে দেওয়াল থাকে। সেটা সেলুলোজ বলে একটা পদার্থে তৈরী। প্রাণীদের কোষ সাধারণতঃ দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকে না, এক রকম প্রোটিন দিয়ে ঘেরা থাকে।

এদের খাদ্যেরও তফাত আছে। প্রাণীদের খাদ্য জীবের দেহ, যাতে প্রাণ ছিল এমন কোন জিনিস। গাছ জল বা মাটি থেকে রস ছেঁকে খায়।

॥ আমিষখেকো গাছ ॥

প্রাণীরা নড়ে বেড়াতে পারে, কিন্তু গাছেরা তা পারে না। এটা মোটামুটি ঠিক। কিন্তু এমন জীব আছে যারা প্রাণীদের মতো চলাফেরা করতে পারে কিন্তু অন্য সব দিক্ দিয়ে গাছের মতো। ডায়াটম এই জাতের। সী-স্কোয়ার্ট (sea-squirt) বলে একরকম প্রাণী আছে যাদের কোষের দেওয়াল গাছের মতো সেলুলোজ দিয়ে তৈরী আর এরা রীতিমতো আমিষখেকো। আবার, যারা পুরোপুরি গাছই, আর কিছু নয়, তাদের মধ্যেও আমিষখেকো আছে, যেমন কলসীগাছ (pitcher plant). পরে এদের কথা বলা হয়েছে।

॥ জীব আর জড়ের তফাত ॥

জীব ও জড়ের তফাত চোখে দেখেই বলা যায়। এখানে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে। এর পাখি ও তার বাচ্চারা, ফড়িং, কাঠবিড়ালী, ব্যাঙ, কদমফুলের গাছ, ঘাস, ব্যাঙের ছাতা—এগুলো জীব, পুকুরপাড়ের মাটি, জল, শানবাঁধানো ঘাট—জড়। জীব ও জড়ের মধ্যে স্পষ্ট কতকগুলো তফাত আছে। জীব হলেই তার দেহে প্রোটোপ্লাজমের কোষ থাকবে। জড় পদার্থে তা থাকবে না।

প্রোটোপ্লাজম সব সময়ই চঞ্চল, কিছু না কিছু সে করছে। তার খাওয়া চাই, সে খাবার যোগাড় করে খায়। খাওয়া মানে হচ্ছে বাইরে থেকে কোন জিনিস নিজের মধ্যে নিয়ে এসে তাকে ভেঙে নতুন

জীব ও জড়

প্রোটোপ্লাজম তৈরি করা। তাতেই সে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু জড় পদার্থ বলে এত বড় হিমালয় পাহাড়টা কোনরকম খাদ্য না খেয়ে এতকাল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

খাবার থেকে নতুন নতুন প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয় বলে প্রাণীর শরীর বেড়ে ওঠে। ছোট্ট একটা গাছ পুঁতে দিলে সেটাও আপনা থেকেই বড় হয়। জড় পদার্থের এসব কোন বালাই নেই। বাইরে থেকে কেউ তাকে নষ্ট না করলে সে চিরকাল একভাবে থাকবে।

প্রোটোপ্লাজমের আর একটা গুণ হচ্ছে চেতনা (irritability). তাই সব জীবেরই চেতনা আছে। বাইরে কি আছে কিংবা কি হচ্ছে তা বুঝে এরা চলতে পারে। এককণা খাদ্য কাছে পেলে অ্যামীবা পর্যন্ত তার শরীরের একটা দিক্ বাড়িয়ে সেই খাদ্য ভিতরে টেনে নেয়।

এছাড়া প্রোটোপ্লাজমের আর একটি কাজ হল বংশবৃদ্ধি বা নিজের মতো অন্য জীবের সৃষ্টি। এ ক্ষমতা না থাকলে জীব বেশী দিন জগতে টিকতে পারত না।

সেই যে একেবারে প্রথম জীব, তারা যদি নতুন কোনও জীব তৈরি করে রেখে যেতে না পারত তা হলে তারা মরে গেলেই সব জীব শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তা হয় নি। এককোষী অ্যামীবা পর্যন্ত নতুন নতুন অ্যামীবা সৃষ্টি করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

॥ ভাইরাস জীব না জড় ॥

কি কি লক্ষণ থাকলে তাকে জীব বলা হবে আর কি কি লক্ষণ না থাকলে তাকে জড় বলা হবে তা বেশ জানা গেল।

কিন্তু অদ্ভুত একরকম জীব নিয়ে বিজ্ঞানীরা মহা সমস্যায় পড়ে গেছেন। এই জীবের নাম ভাইরাস (virus). জীব বলছি এই কারণে যে তাদের জড় বলায় অসুবিধা আছে। আবার পুরোপুরি জীব বলাও ঠিক হবে না।

এরা অসম্ভব ছোট। যে সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণের সাহায্যে ডায়াটমের খোলের উপরকার কারুকার্য দেখা যায়, তাতেও এদের দেখা যায় না। তবু বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, এরা আছে।

ইংরেজী ১৮৯২ সালের কথা। তামাক গাছের পাতায় একরকম রোগ হয়। তা নিয়ে পরীক্ষা চলছিল। এক বিজ্ঞানী মনে করলেন, কোনরকম ব্যাকটিরিয়াম (একরকম জীবাণু বা অতি সূক্ষ্ম চেহারার জীব) এই রোগের কারণ। কিন্তু পরীক্ষা করে জানা গেল, এ কাজ ব্যাকটিরিয়ামের নয়। যারা একাজ করেছে, তাদের দেখা পাওয়া গেল

ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ

না। তবু, সেই অচেনা অজানা জিনিসটা যে আছে, তা আরও ভাল করে বোঝা গেল এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে। যেরকম ভয়ানক তাপে সবরকম জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়, সেই তাপের মধ্যেও সেই অদৃশ্য জিনিসটার কাজ চলছে দেখা গেল।

তার যখন কাজ চলছে, তখন সেটাকে জীবিত বলা যেতে পারে। ক্রমে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, পোলিও প্রভৃতি সাংঘাতিক অসুখ এই অদৃশ্য ভাইরাসেরাই সৃষ্টি করে। কিন্তু কিছুতেই তাদের ধরা-ছোঁয়া যায় না বলে কোনও যন্ত্র চালানো যায় না তাদের উপর। তবু অদৃশ্য এই শত্রুদের মোকাবিলা করার চেষ্টা মানুষ ছাড়ল না।

অবশেষে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ভি. কে. জোওরিকিন ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ (electron microscope) নামে এক অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কার করলেন। সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে কোন জিনিসকে বড় জোর তার ১,০০০ গুণ বড় করে দেখা যায়। কিন্তু এই অণুবীক্ষণে দেখা যায় দেড় লক্ষ গুণ বড় করে। আর যাবে কোথা—এই অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে গেল ভাইরাসরা। এক এক রোগের ভাইরাসদের এক এক রকম চেহারা।

ভাইরাসদের সম্বন্ধে এখন অনেক কিছু জানা গিয়েছে। ভাইরাসদের চেতনা আছে। তারা কাজও করে যাচ্ছে (প্রায়ই অবশ্য আমাদের তাতে ক্ষতি হয়)। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার—ভাইরাসে প্রোটো-প্লাজম নেই। তাদের বাচ্চা হয় কিন্তু তা তাদের নিজেদের গা থেকে নয়। তারা কোন উপায়ে কোন জীবের কোষের মধ্যে ঢুকতে পারলে—সেই কোষটাই নতুন নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করতে থাকে। এরা তাহলে জড় না জীব? এদের জীবের মতো মৃত্যু নেই—এরা জড়ের মতো অমর।

এখন বহু পণ্ডিত সন্দেহ করছেন যে এরা জড় ও জীবের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে। হয়তো জড় থেকে ভাইরাস আর ভাইরাস থেকে জীব হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব ও গাছপালা

প্রাণের আবির্ভাবঃ

[প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব ও গাছপালা]

এখন সারা পৃথিবী জুড়ে দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য রকমের গাছপালা ও জীবজন্তু।

কোটি কোটি বছর আগেও পৃথিবীতে গাছপালা ও জীবজন্তু ছিল। কিন্তু সে-সব গাছ ও জীবজন্তু এখনকার দিনের মতো ছিল না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিচিত্র ধরনের গাছপালা ও প্রকাণ্ড জীব ছিল। সেই সব গাছপালা ও জীবজন্তু লুপ্ত হয়ে গেছে।

তখনকার দিনে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায়ই অগ্ন্যুদ্গম হত। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দূরে সে-যুগের একটা আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুদ্গম হচ্ছে।

বিচিত্র সব গাছপালায় ভরা বনাঞ্চল ছবিতে দেখা যাচ্ছে। একটা পাখি উড়ছে, তার নাম টেরোডাকটিল। দুটো জানোয়ার রয়েছে। দূরেরটির নাম স্টিগোসরাস, কাছেরটির নাম ইগুয়ানোডন।

॥ সমুদ্রের সৃষ্টি ॥

সৃষ্টির আদিম যুগে পৃথিবীটা জুড়িয়ে গিয়ে শক্ত হবার সময়ে তার উপরটা কুঁচকে গিয়ে যে নীচু জায়গাগুলো হয়েছিল সেগুলোতে বৃষ্টির জল জমে জমেই সমুদ্র হয়েছে।

॥ সমুদ্র কত বড় ॥

সমুদ্র একটাই। কিন্তু ডাঙা জমিগুলো এক জায়গায় নেই। তারা এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। সবসুদ্ধ ডাঙা হচ্ছে ১৫ কোটি বর্গ কিলোমিটারের মতো আর জল আছে পৃথিবীর উপর ৩৬ কোটি বর্গ কিলোমিটার জুড়ে। মানে পৃথিবীর বুকের ওপর শতকরা ৭০·৮ ভাগ জুড়ে আছে সমুদ্র।

হিন্দুমতে সাত সমুদ্র, ইংরেজীতে বলে Seven Seas. কিন্তু ভূগোলে পৃথিবীর সব সমুদ্র জুড়ে যে বারিমণ্ডল তাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে মহাসাগর (Ocean). ওদের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, অতলান্তিক ও ভারত মহাসাগর প্রায় সমান সমান। তবে এই দুটো মিলেও প্রশান্ত মহাসাগরের চাইতে একটু ছোট। উত্তর মেরু মহাসাগর আর দক্ষিণ মেরু মহাসাগর আরও অনেক ছোট। সব মিলিয়ে মহাসাগরগুলোতে জল আছে ৩৫ কোটি ঘন মাইল। সে যে কতটা, তা আর একভাবে বলা যেতে পারে। ডাঙার ওপর থেকে সব মাটি পাহাড় চেঁচে সমুদ্রে ফেললেও সমুদ্রের খুব অল্পই বুজে যাবে, কেননা তাহলেও সমুদ্রের গভীরতা থাকবে ১২০০ ফুট।

॥ সমুদ্র নোনা কেন ॥

পৃথিবীর সেই আদিকাল থেকে ডাঙার উপর থেকে জল গড়িয়ে নদী বেয়ে সাগরে এসে পড়ছে। তার সঙ্গে আসছে পলি—ঐ পলি সমুদ্রের তলায় জমছে। জমে জমে নদীর মুখের কাছে চড়া জেগে উঠছে। এই চড়া জমির সামিল হয়ে ডাঙার পরিমাণ বাড়ছে আর সমুদ্র যাচ্ছে কমে।

ডাঙার মাটি-পাথরে যা যা আছে, পলির সঙ্গে সে সবই এসে পড়ছে সমুদ্রের জলে। তার সঙ্গে এসে পড়ছে প্রচুর নুন। তাই সমুদ্রের জল এত নোনা যে

তা খাওয়াই যায় না। সমুদ্রপথে কোথাও যেতে হলে খাবার জল সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

সমুদ্রের সব অংশে নুনের ভাগটা সমান নয়। যেখানে বেশী নদী এসে সমুদ্রে পড়ছে না কিংবা মরুভূমি কাছে আছে বলে যেখানে জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায় সেখানে জল একটু বেশী নোনা হয়। আবার বিষুবরেখার কাছে বেশী বৃষ্টি হয় বলে, বা মেরুর কাছে যেখানে ঠাণ্ডায় বেশী জল উড়ে যায় না অথচ অন্য জায়গা থেকে জল আসে, সে সব জায়গায় নুনের ভাগ কম। তা ছাড়া কঙ্গো বা নাইজারের মতো নদীর মুখে যতদূর পর্যন্ত নদীর মিঠা জল এসে সমুদ্রে প্রবেশ করছে ততদূর পর্যন্তও জলে নুন কম পাওয়া যাবে।

খুব বড় বড় নদীর মুখে এমনও হয় যে, সেখান থেকে বহু দূর সমুদ্রের জলে নুন মোটেই নেই। যেমন, অ্যামাজন নদীর মোহানা থেকে ২০০ মাইল পর্যন্ত আর নোনা জল নেই, আগাগোড়াই মিঠা জল।

॥ সমুদ্রে মিঠা জলও আছে ॥

অন্য নানা কারণে সমুদ্রের আরও অনেক জায়গায় মিঠা জল দেখতে পাওয়া যায়। সে সব জায়গা ডাঙা থেকে বেশী দূরে নয়—তাদের মিঠা জল আসে ডাঙা থেকেই। অস্ট্রেলিয়াতে বৃষ্টির জলের অনেকটা মাটিতে বসে যায়। মাটির তলায় গিয়ে সে জলটা একটা ঢালু পাথরের স্তরে পৌঁছে সটান সমুদ্রের তলা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। মিঠা জল নোনা জলের চেয়ে হালকা। তাই সেটা উপরের নোনা জলকে সরিয়ে উপরে উঠে আসে। আমেরিকায় ফ্লোরিডার উপকূলের কাছে সমুদ্রেও জলের নীচে এইরকম মিঠা জলের ফোয়ারা থাকায় সেখানেও সাগরজল মিঠা।

॥ রত্নাকর ॥

সাগরকে বলে রত্নাকর, তার মানে দামী দামী জিনিসের খনি। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম থেকে আরম্ভ করে সোনা, রুপো, তামা, সীসা, দস্তা ইত্যাদি ধাতু, ক্যালসিয়াম, আর্সেনিক, ম্যাগনেসিয়াম, ব্রোমিন,
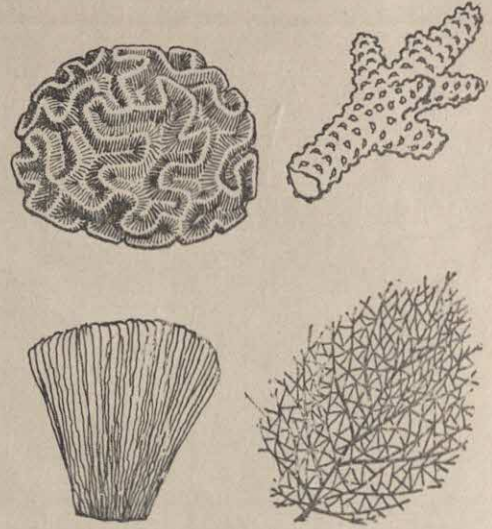
বিভিন্ন আকারের প্রবাল

আয়োডিন ইত্যাদি যত মৌলিক পদার্থ, সবই সাগরে পাওয়া যায়। তবে এর বেশির ভাগই বের করে নেওয়া শক্ত। যেমন ধর, সোনা। প্রতি ঘন-মাইল সাগর জলে সোনা আছে প্রায় ১৭$\frac{1}{2}$ কিলো। তাহলে ৩৫ কোটি ঘন-মাইল জলে সোনার পরিমাণ হবে প্রায় ৬০০ কোটি কিলোগ্রাম। কিন্তু তা বের করে নিতে যে খরচ পড়বে, এত সোনার দামেও তা পোষাবে না।

সমুদ্রের জল থেকে আমাদের খাবার নুনের বেশির ভাগই আসে। বড় বড় দানাওয়ালা নুনকে বলে করকচ।

॥ সমুদ্র কত গভীর ॥

সমুদ্রের তলাটা সমতল নয়, ডাঙার মতোই উঁচুনীচু। এর তলায় পাহাড়ও আছে। সমুদ্রতল জলের উপর থেকে কত নীচে তা মেপে দেখা হয়েছে। প্রথম ডাঙার কাছাকাছি থেকে মাপতে শুরু করলে দেখা যায় যে প্রায় সর্বত্র ৬০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত সমুদ্রতল ক্রমে ঢালু হতে হতে গিয়েছে। তারপরই হঠাৎ গভীরতা তাড়াতাড়ি বাড়তে বাড়তে ১০০০, ১২০০, ১৫০০, ২০০০ ফুট হয়ে যায়। অল্প ঢালু অংশের নাম মহী-সোপান (continental shelf), তারপরের বেশী ঢালু অংশকে বলে মহীগাত্র

(continental slope). এটা যেখানে শেষ হয়েছে সেটাই হচ্ছে মহাদেশটার বা ডাঙাটার গোড়া, তারপরেই সমুদ্রের আসল খাদ।

বিনা পোশাকে ডুবুরীরা ১০০—১৫০ ফুট পর্যন্ত জলের তলায় নামতে পারে। যন্ত্রের পোশাক ও বিশেষ রকমের অক্সিজেন-যোগান দেওয়া নলের সাহায্যে সমুদ্রের অনেক গভীরে মানুষকে নামানো যায়। পরে সে কথা বলা হয়েছে।

ডাঙা থেকে দু-তিনশ' মাইল পর্যন্ত দূরের সমুদ্রের তলাকার কাদা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে তাতে পলিমাটি, বালি, কাঁকর, জীবজন্তুর হাড়, শামুক, ঝিনুকের খোলা পাওয়া যায়। ডাঙা থেকে ৩০০ মাইলের পর আর পলিমাটি পাওয়া যায় না। সেখানের কাদা অন্য ধরনের। সেখানে জমে সমুদ্রের তলাকার আগ্নেয়গিরি থেকে উগরে-ফেলা ছাই—ফলে কাদাটা লালচে। তার মধ্যে বহু ক্ষুদ্র জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়। তারা এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাদের দেখা যায় না।

এখানে ঠিক ডাঙার মতো পাহাড় আছে, মাঝে মাঝে বড় বড় ফাটলও আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়াম দ্বীপের ২০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দ্য মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চ নামক স্থান সবচেয়ে গভীর। এখানে সমুদ্র ৩৬,১৯৮ ফুট গভীর। ডাঙার সবচাইতে উঁচু জিনিস যে হিমালয়ের এভারেস্ট শিখর, সেটাকেও গোড়াসুদ্ধ উপড়ে এনে এখানে ফেললে সেটা তলিয়ে যাবে। এর কাছেই মেরিয়ানাস দ্বীপপুঞ্জের কাছে সমুদ্র ৩৫,৬৪০ ফুট গভীর। আর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মিণ্ডানাওয়ের কাছে সমুদ্র ৩৪,৫৭৮ ফুট গভীর। তবে গড়ে সমুদ্র ১২০০ ফুট গভীর।

॥ প্রতিধ্বনি দিয়ে গভীরতা মাপা ॥

দড়ির মাথায় একটা ভারী কিছু বেঁধে জলের তলায় নামিয়ে তা দিয়ে জল মাপা হত আগে। ভারী বস্তুটার নাম প্লামেট (plummet). কিন্তু তাতে অনেক সময় লেগে যায়। সারা সমুদ্রের গভীরতা এভাবে জরিপ করা দারুণ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার।

ব্যাথিস্কাফ
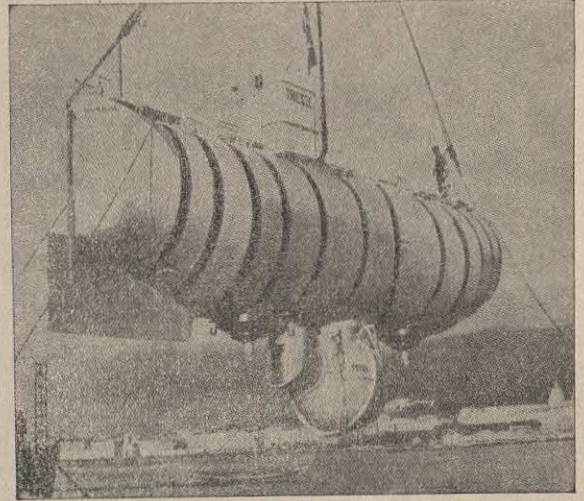
পণ্ডিতরা ভেবে ভেবে একরকম যন্ত্র বার করলেন। সেই যন্ত্র দিয়ে সমুদ্রের কোনও জায়গায় শব্দ করলে প্রতিধ্বনি সমুদ্রের তলায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। শব্দটা গিয়ে ফিরে আসতে কত সময় লাগল ঐ যন্ত্রের কাঁটা তা নির্দেশ করে। তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে শব্দ যাওয়ার সময় পাওয়া যাবে। জলের মধ্যে শব্দের গতি সেকেণ্ডে ৪৭০০ ফুট। এবার হিসেব করা সহজ যে সেখানটাতে সমুদ্র কত গভীর।

॥ সমুদ্রের তলায় নামা ॥

মুক্তো তোলবার জন্যে ডুবুরীরা সমুদ্রে নামে। বিনা পোশাকে তারা ৫০ থেকে ১৫০ ফুট পর্যন্ত নামতে পারে। আর, বিশেষ পোশাক পরে, অক্সিজেন নিয়ে তারা প্রায় ৬০০ ফুট পর্যন্তও নেমে ঘুরে আসতে পারে।

উইলিয়াম বীব (Beebe) একটি যন্ত্র তৈরি করেন। তার নাম দেওয়া হয় ব্যাথিস্ফীয়ার (bathysphere). সেই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে ৩০২৮ ফুট সমুদ্রের নীচে নেমেছিলেন। তারপর পিকার্ড তৈরি করলেন ব্যাথিস্কাফ (bathyscaphe)। তাঁর ছেলে তাঁর তৈরী যন্ত্রের সাহায্যে ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে গুয়াম দ্বীপের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে সটান নেমে গেলেন ৩৫,৮০০ ফুট নীচে।

॥ মুক্তোর কথা ॥

প্রধানতঃ মুক্তোর জন্যেই মানুষকে সমুদ্রের তলায় নামতে হয়। মুক্তো কোন প্রাণী নয়। সমুদ্রের এক রকম ঝিনুকের মধ্যে এর জন্ম। সেই ঝিনুকের নাম শুক্তি (pearl oyster). শুক্তির মধ্যে যে ভাবে মুক্তো জন্মায় সে এক মজার ব্যাপার। শুক্তির মুখ যখন খোলা থাকে তখন তার মধ্যে মিহি এককণা বালি ঢুকে গেলে তার নরম শরীরে বড় কষ্ট হয়। তখন শুক্তির শরীর থেকে এক রকম রস বেরিয়ে সেই বালির কণাকে ঢেকে দেয়। সেই রসটা শুকিয়ে মোলায়েম হয়ে গেলে শুক্তির শরীরে আর যন্ত্রণা হয় না। সেই বালির কণার উপরে গড়ে-ওঠা ছোট্ট গোলাকার বস্তুটিই মুক্তো।

মুক্তো যত নিটোল গোল হবে তত তার দাম। সাদা মুক্তোর চেয়ে গোলাপী বা কালো মুক্তো কম দেখা যায় বলে তাদের আদর আরো বেশী। কালো মুক্তো প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েক স্থানে ক্বচিৎ পাওয়া যায়। সাদা মুক্তো পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর, সিংহলের কাছে ভারত মহাসাগরে আর জাপানের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে পাওয়া যায়। খালি গায়ে ডুবুরীরা একদমে যতটা জলের তলায় যাওয়া সম্ভব, ততটা নেমে মুক্তো তুলে আনত—কিন্তু তাতে কটাই বা মুক্তো পেত!

মুক্তোর খোঁজে ডুবুরী

শুক্তির মধ্যে মুক্তো

সবচেয়ে দামী মুক্তো হচ্ছে 'বেরেসফোর্ড-হোপ' নামে মুক্তো—সেটা লণ্ডনে আছে। তার ওজন দশ তোলা।

বিজ্ঞানীরা মুক্তো তৈরির চেষ্টা করছেন। আসল মুক্তো তো বেশী পাওয়া যায় না। তাঁরা শুক্তি তুলে তার মধ্যে বালির কণা ঢুকিয়ে তাকে জলের তলায় রেখে দেন। পরে তিন-চার বছর বাদে তাদের কোন-কোনটায় মুক্তো জন্মায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুক্তিগুলো মরে যায়। এইভাবে জোর করে তৈরি করানো মুক্তোর ইংরেজী নাম cultured pearl. এর দাম আসল মুক্তোর তুলনায় কম।

সমুদ্রের তলায় মানুষ নানা কারণে নামে। এক দুর্গমকে সুগম করা—বাহাদুরি দেখানো, দুই নানা প্রয়োজনে নামা। যেমন, শুক্তি তোলা, স্পঞ্জ তোলা বা ভারী জাহাজ জখম হয়ে জলের তলায় তলিয়ে গেলে তাকে আবার মেরামত করে নেবার জন্যে তুলে আনা।

॥ সমুদ্রের নীচে জলের চাপ ॥

ডাঙায় আমরা হাওয়ার অল্প চাপের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াই। সমুদ্রের তলায় নামলে তখন জলের চাপের তলায় পড়তে হবে আমাদের। প্রতি ৩৩ ফুট জলের তলায় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৬⅔ কিলোগ্রাম করে চাপ বাড়তে থাকে। উইলিয়ম বীব যেখানে নেমেছিলেন সেখানে তাঁর মাথার উপর ৮৫০০ কিলোগ্রাম জলের চাপ পড়েছিল। তবে তিনি বাঁচলেন কি করে? আগেই বলা হয়েছে, এই চাপ সহ্য করবার মতো লোহার পোশাক তিনি পরে নিয়েছিলেন। জলের চাপের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই জলের তলায় নামার বিশেষ পোশাক বা যন্ত্র মানুষের দরকার।

॥ সাগর-জলে রঙের খেলা ॥

জলের তলায় যত নামা যাবে ততই রং বদলাবে। নদীর মোহানার কাছে সমুদ্রের জল ঘোলা, মহী-সোপানের উপর জলটা ফিকে সবুজ, আরো গভীরে গেলে জলটা ঝকঝকে গাঢ় নীল দেখায়। পঞ্চাশ ফুট নামলে সূর্যের লাল আভা দেখাবে হলদে। দুশো ফুটের কাছাকাছি নীল ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না। তারপরে ক্রমশঃ সব কালো দেখাবে। সূর্যের আলোর কোন রংই ১৫০০ ফুটের নীচে পর্যন্ত পৌঁছয় না।

সাগরের ঢেউ

॥ অশান্ত সাগরে ঢেউ ॥

ঢেউ ওঠে প্রধানতঃ হাওয়ার ধাক্কায়। ঝড়ের সময় ঢেউ ওঠে খুব উঁচু হয়ে। হাওয়ার ধাক্কায় জল সরে গেলে সেখানটা নীচু হয়—আর তার পাশের জল সেখানটায় এসে পড়ে। তারপর সেটাও হাওয়ার ধাক্কায় উঁচু হয়। এমনি করে ঢেউ উঠতে, পড়তে থাকে।

॥ ৎসুনামি ॥

হাওয়া ছাড়াও ঢেউ হতে পারে। সমুদ্রের তলায় যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে তার ধাক্কায় জলে প্রচণ্ড ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়। এ ঢেউ অনেক উঁচু—এর নাম 'টাইডাল ওয়েভ' (tidal wave). জাপানীরা একে বলে 'ৎসুনামি' (tsunami). সাধারণতঃ প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলেই এই সর্বনেশে ঢেউয়ের উৎপত্তি হয়।

॥ ঢেউয়ের কাজ ॥

ঢেউ জলের তলায় প্রাণী আর গাছদের অক্সিজেন যোগান দেয়। ঢেউয়ের ঝাপটায় হাওয়ার অক্সিজেন জলের সঙ্গে মিশে নেমে যায় সমুদ্রের তলায়। তাইতে বাঁচে জলের জীব।

॥ সাগরের জোয়ার ভাঁটা ॥

আকাশে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে হচ্ছে চাঁদ। তার টানে সাগরে জোয়ার-ভাঁটা হয়।

ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর এক এক জায়গা চাঁদের ঠিক তলায় আসছে। অমনি সেখানে চাঁদের টান পড়ছে আর সাগর উথলে উঠছে। পৃথিবী আর একটু ঘুরলে তার পাশের জায়গায় টান পড়ছে আর অমনি সেখানে সমুদ্র উথলে উঠছে। জল যতক্ষণ ফুলতে থাকে, ততক্ষণ জোয়ার (flow tide), আর যতক্ষণ নামতে থাকে ততক্ষণ ভাঁটা (ebb tide).

এক ভরা জোয়ারের বারো ঘণ্টা বাদে আরেক ভরা জোয়ার আসে। দিনে দুবার জোয়ার, দুবার ভাঁটা হয়। পৃথিবী ও

জোয়ার - ভাঁটা
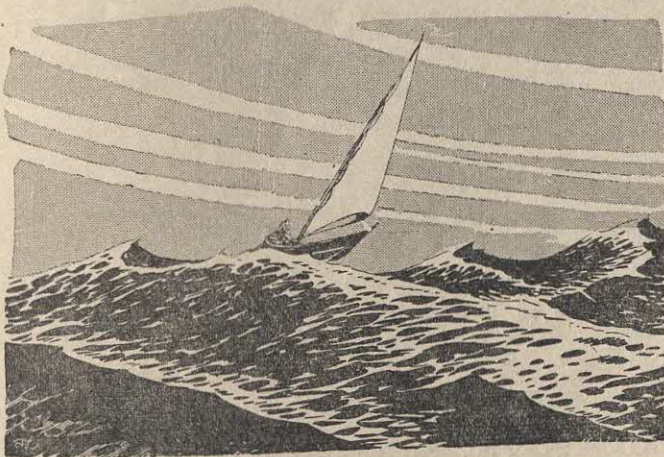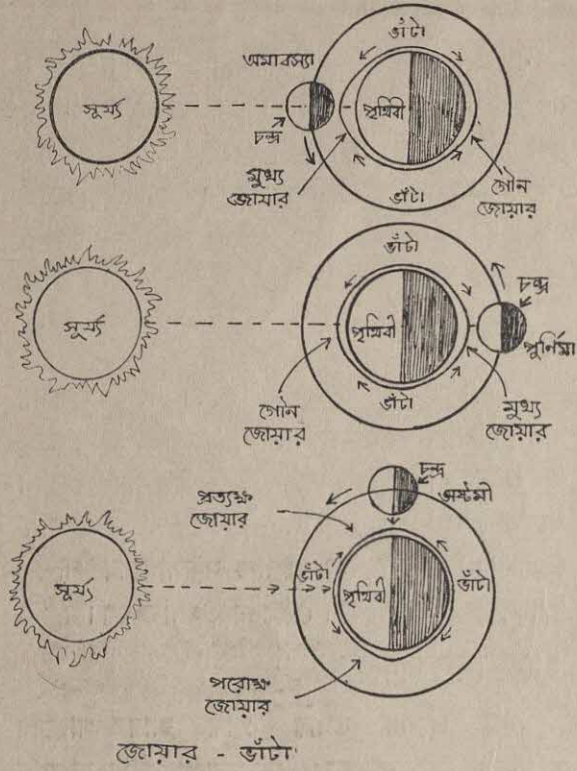
চাঁদ কেউ থেমে নেই। এজন্য প্রতিদিন জোয়ার ও ভাঁটার সময় ৪৫-৫০ মিনিট করে পিছিয়ে যায়।

চাঁদ যেমন পৃথিবীকে টানে সূর্যও তেমনি টানে। এটা বোঝা যায় পূর্ণিমা, অমাবস্যা আর দুই অষ্টমী তিথিতে। অমাবস্যার দিন সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীর একই পাশে এক লাইনে এসে যায় আর একসঙ্গে সমুদ্রকে টানে। তখন টান বেশী থাকার জন্যে জোয়ার জোরালো হয়। এর নাম ভরা কটাল (spring tide). দুটো অষ্টমী তিথিতে চাঁদ সোজাসুজি টানে আর সূর্য টানে পাশে থেকে। তাই তত জোর জোয়ার হয় না। একে বলে মরা কটাল (neap tide).

সমুদ্রের জোয়ারের জল নদী-খাল-বিলের পথে ডাঙার ভেতর বহুদূর পর্যন্ত উঠে আসে, তারপর নেমে যায়। এই হচ্ছে নদীর জোয়ার-ভাঁটা। সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গাতেই নদীতে জোয়ার বা ভাঁটা হতে পারে, যেমন কলকাতায়।

॥ বান ডাকা ॥

জোয়ারের জল হঠাৎ উঁচু হয়ে নদীর মধ্যে ছুটে এলে তাকে বলে 'বান'।

যেখানে নদী বা উপসাগরের মুখটা চওড়া ও তার পরে হঠাৎ সরু হয়ে গিয়েছে আর তার দু'পাড়ই উঁচু, সেখানে দু-বেলাই বান (bore) আসে। মুখ দিয়ে বেশী জল ঢুকে পড়ে, অথচ এগিয়ে যাবার পথ সরু, সেজন্যে এরকম হয়।

সবচাইতে বেশী উঁচু বান দেখা যায় কানাডার ফাণ্ডী (Fundy) উপসাগরে। সেখানে জোয়ারের জল ৫২ ফুট উঁচু হয়ে বান ডাকে, আবার ভাঁটার সময়ে জল ৫২ ফুট নেমে যায়।

॥ সমুদ্রের হাওয়া ॥

সমুদ্রের ধারের জায়গাগুলো দিনের বেলা রোদে তেতে গেলে সেখানকার হাওয়া গরম হয়ে উপরে উঠে যায়, আর সমুদ্র থেকে তখন হাওয়া আসতে থাকে ডাঙার দিকে। একে বলে সমুদ্রবায়ু (sea-breeze). আবার রাত্রিবেলা ঠিক উলটো ব্যাপার হয়—ডাঙার দিক থেকে হাওয়া সমুদ্রের দিকে যেতে থাকে সারা রাত। একে বলে স্থলবায়ু (land breeze).

তাপের তফাত হলে যেমন সমুদ্রের দু' জায়গার মধ্যে জলের স্রোত বয়, তেমনি নানামুখী হাওয়ার তাড়া খেয়েও জল চলতে থাকে সমুদ্রের ভিতর। তাই সমুদ্রে নানা দিকে নানা রকম স্রোত চলতে দেখা যায়।

॥ সমুদ্রস্রোত ॥

সমুদ্রের উপরের জলের স্তরের তাপ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। কিন্তু শতাধিক ফুট নামলে পরেই জল ঠাণ্ডা হতে হতে ১৫০০ ফুট গভীরতায় জল বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়। উপরের স্তরে তাপ বদলাচ্ছে, কিন্তু নীচের স্তরে তাপ বদলাচ্ছে না। এই দুই স্তরের মাঝামাঝি একটা স্তর আছে যেখানে তাপ ঘন ঘন বদলাচ্ছে।

জল গরম হলে ফেঁপে হালকা হয়ে যায়। আর ঠাণ্ডা হলে ঘন হয়ে ভারী হয়ে যায়। গরম জল উপরে ওঠে, ঠাণ্ডা জল নীচে নামে। কাজেই এই ওঠানামায় একটা গতির সৃষ্টি হয়। এ গতি কখনো অবস্থাবিশেষে উপর-নীচে, কখন বা পাশাপাশি চলে।

সমুদ্রের জলের মধ্য দিয়েই এভাবে বিশাল বিশাল নদী বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত নদনদী মিলে সমুদ্রে প্রতি সেকেণ্ডে মোট ২০ লক্ষ টন জল এনে ঢালছে। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এমন একটা স্রোত আছে যা এক সেকেণ্ডে ১০ কোটি টন জল নিয়ে ছুটে চলেছে।

॥ একটি সমুদ্র-স্রোতের কথা ॥

এর নাম হচ্ছে গাল্‌ফ্ স্ট্রীম (Gulf Stream). মেক্‌সিকো উপসাগরে (Gulf of Mexico) এর উৎপত্তি। তাই এর এই নাম।

আটলান্টিক মহাসাগরে বিষুবরেখার কাছের জল গরমে তেতে গিয়ে যখন গতিশীল হয় আর তার উপর আয়নবায়ু তাদের ক্রমাগত তাড়া দেয় তখন পৃথিবীটা পুব দিকে ঘুরে যাচ্ছে বলে সমস্ত গরম জলটা উত্তর-পশ্চিম দিকে ছুটে যায়। সেখানে মেক্‌সিকো উপসাগর। এর উত্তরে ডাঙা, পশ্চিমেও ডাঙা—কাজেই যাবার পথ নেই। যাবে কোথা সে জলস্রোত? এর উপর বিরাট মিসিসিপি নদী প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ টন জল এনে ঢেলে দিচ্ছে ঐ উপসাগরে। এই সব মিলে উপসাগরের জল ন' ইঞ্চি উঁচু হয়ে উঠে পুব দিকে গিয়ে পড়ছে আটলান্টিক মহাসাগরে। সেখানে অন্য একটা স্রোতের সঙ্গে মিলে সে আরো বড়ো হয়ে ছুটছে উত্তর দিকে। তাই তার নাম হল গাল্‌ফ্ স্ট্রীম।

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে আর একটু উত্তরে, উত্তর মেরু-সাগর থেকে আসে একটা বরফগলা ঠাণ্ডা জলস্রোত। একে বলে ল্যাব্রাডর স্রোত (Labrador Current). তার গায়ে লাগবার আগেই গাল্‌ফ্ স্ট্রীম ডাইনে ঘুরে যায়। পৃথিবী ঘুরছে বলে সমুদ্রস্রোত-গুলো কতকটা গোল হয়ে চক্কর দেয়। যেখানে গাল্‌ফ্ স্ট্রীম আর ল্যাব্রাডর স্রোত কাছাকাছি আসে সেখানে ভারী কুয়াশা জমে। এর নাম গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক (Grand Bank). এখানে খুব মাছ পাওয়া যায়, বিশেষ করে কড্ মাছ।

তারপর, পশ্চিম থেকে পুবে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে গ্রেটব্রিটেনের কাছাকাছি এসে উত্তরে ঘুরে এই গরম জলের স্রোতটা উত্তরমেরু সাগরে গিয়ে মেশে। এই গরম জলের স্রোতটা পাশে আছে বলে বিলেত দেশটায় শীত তত বেশী হয় না।

॥ সার্গাসো সাগর ॥

আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে একটা মজার জায়গা হচ্ছে সার্গাসো সী (Sargasso Sea). এটা সার্গাসাম বলে একরকম আগাছায় ভরতি প্রায় ৫০০ মাইল জায়গা। আগেকার দিনের পালতোলা জাহাজ এই জঙ্গলে বড় বিপদে পড়তো। কলম্বাসকে এই পাঁচশো মাইল যেতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

সার্গাসাম

॥ অন্য দুটো বিখ্যাত স্রোত ॥

প্রশান্ত মহাসাগরে দুটো বিখ্যাত সমুদ্র-স্রোত আছে। একটার নাম জাপান স্রোত (Japan Current). জাপানী ভাষায় কুরো-সিউও (Kuro Siwo), এর মানে কাল-স্রোত। জাপানের কাছেই সাইবীরিয়া। সে একরকম বরফের দেশ। কিন্তু জাপান সাইবীরিয়ার মতো ঠাণ্ডা নয়। তার কারণ জাপানের অন্য পাশ দিয়ে কুরো-সিউওর গরম জলের স্রোত চলে। এখানেও প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশের পাশ দিয়ে আছে পেরু স্রোত বা হামবোল্‌ট্ কারেণ্ট (Humboldt

Current). এটা ঠাণ্ডা জল নিয়ে দক্ষিণ মেরুসাগর থেকে উঠে আসছে বিষুবরেখার দিকে। তাতে থাকে অজস্র প্ল্যাঙ্কটন, যা হচ্ছে মাছেদের প্রিয় খাদ্য। তাই কোটি কোটি মাছ আসে তা খেতে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশটাতে এর ঠিক উলটো ব্যবস্থা। এখানে একটা ঠাণ্ডা জলের স্রোত আসে। আবার মাছ খেতে আসে লাখে লাখে পাখি।

পেরুর কাছাকাছি তাদের বাসের দ্বীপগুলিতে বহু বৎসর ধরে বিষ্ঠার পাহাড় জমেছে। সেই বিষ্ঠা বা guano খুব ভাল সার। তা বিক্রি করে পেরু বছরে ঢের টাকা পায়।

॥ টাইটানিকের দুর্ঘটনা ॥

গাল্ফ্ স্ট্রীম আর ল্যাব্রাডর স্রোতের মাঝখানে যে কুয়াশাভরা গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কের কথা বলা হয়েছে, সেখানে একবার একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

সেই ঘটনা ঘটেছিল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে।

টাইটানিক জাহাজ ডুবছে

ইংল্যাণ্ডে তৈরী টাইটানিক (Titanic) নামের প্রকাণ্ড একখানা জাহাজ সেই প্রথমবার আমেরিকা যাচ্ছিল। গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কের কাছে এসে গভীর রাত্রে তার সঙ্গে ধাক্কা লাগে একটি ভাসন্ত হিমশৈলের। কুয়াশার জন্যে আগে থেকে কিছু দেখা যায় নি। সেই বরফের পাহাড়ের ধাক্কায় ভেঙে গিয়ে ৪ ঘণ্টার মধ্যে এতবড় জাহাজ তলিয়ে গেল। ২২০০ যাত্রীর মধ্যে দেড় হাজার জনই ডুবে মরল।

॥ হিমশৈল ॥

এই ভাসমান হিমশৈল (iceberg) রীতিমতো একটা পাহাড়ের মত বড়। ৩০ মাইল পর্যন্ত লম্বা হিমশৈল দেখা গিয়েছে। সাত মাইল লম্বা আর ৩½ মাইল চওড়া হিমশৈল একবার দেখা গিয়েছিল। সেটা উঁচু ছিল ৬০ ফুট। ৪০০ ফুট উঁচু হিমশৈলও দেখা গিয়েছে।

জলের উপর হিমশৈলের যতটা অংশ জেগে থাকে, জলের তলায় থাকে তার আটগুণ বড় একটা অংশ। গলতে শুরু করলে হিমশৈল উলটে যেতে পারে। তাতে জাহাজের দারুণ ক্ষতি হতে পারে। সেজন্যে জাহাজকে হিমশৈল থেকে খুব সতর্ক থাকতে হয়।

এগুলো বহু দূর থেকে ভেসে আসে। গ্রীনল্যাণ্ড দ্বীপে সাংঘাতিক উঁচু হয়ে বরফ জমে। শেষে তা নিজের ভারে পিছলে নেমে আসে আর গিয়ে পড়ে সমুদ্রে। তারপর ল্যাব্রাডর স্রোতে পড়ে ভাসতে ভাসতে দক্ষিণে চলে আসে। বছরে দেড় থেকে দু হাজার হিমশৈল এতটা দূর পর্যন্ত এসে তারপর গলে যায়।

॥ সমুদ্রের প্রাণীর খাদ্য ॥

ডাঙায় যেমন, সমুদ্রেও তেমন অনেক রকমের গাছ আর প্রাণী আছে। ডাঙার জীব থেকে তারা অনেক দিক্ দিয়েই আলাদা ধরনের। আবার, খাদ্য কেমন পাওয়া যায়, জল কত গভীর, ঠাণ্ডা না

সাগরের তলায় নেমে ডুবুরীরা ফটো তুলছে

সাগরের কথাঃ

[সাগরের তলায় নেমে ডুবুরীরা
ফটো তুলছে।]

পৃথিবী সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ। এর পরিধি পূর্ব-পশ্চিমে ২৪৯০২·৩৯ মাইল, উত্তর-দক্ষিণে ২৪৮৬০·৪৯ মাইল।

এই বিরাট পৃথিবীর সবটাই ডাঙা নয়। বরং এতে জলের ভাগই বেশী। এর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল।

স্থলভাগে বাঘ, সিংহ, ভালুক, সাপ, বাইসন, হাতি, উট, জিরাফ, জেব্রা, গরিলা, বেবুন, ময়ূর, পেঙগুইন, পান্ডা প্রভৃতি নানা জীব দেখতে পাওয়া যায়। জলে ভরা বহু সহস্র মাইল বিস্তৃত সাগর পৃথিবীর স্থল-ভাগকে ঘিরে রয়েছে। স্থলভাগের মতোই সাগর নানা জীবজন্তুতে ভরা। সাগরের গভীর জলে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের জীবজন্তু বাস করে। সাগরে কত রকমের মাছ যে আছে, তা বলে শেষ করা যায় না।

এখানে ছবিতে অক্টোপাস, হাঙগর, শংকর মাছ ও আরো নানা রকমের মাছ দেখা যাচ্ছে। মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। সাগরের তলায় নেমে মানুষ সেই সব জীবজন্তু দেখে এসেছে, তার আলোকচিত্র নিয়েছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে, নিরাপদ খাঁচায় করে দুজন ডুবুরী সাগরের তলায় নেমে ক্যামেরার সাহায্যে অতল সাগরের নানা রকম জীবজন্তুর আলোকচিত্র গ্রহণ করছে।

অক্টোপাস, হাঙগর প্রভৃতি জীব ভারী হিংস্র। এদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই ডুবুরী দুজনকে খাঁচার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে নামতে হয়েছে।

গরম, কতটা নোনা, ইত্যাদি অনুযায়ী এক-এক জায়গায় এক-এক রকম গাছ আর প্রাণী সমুদ্রের জলে দেখা যায়।

সূর্যের আলো নইলে গাছেদের খাওয়া চলাই মুশকিল। কাজেই সূর্যের আলো জলের ভিতর যতদূর যায়, তার নীচে আর গাছ হয় না। অনেক মাছ এই গাছ খায়, কাজেই তারাও গাছের কাছাকাছি থাকে। আবার সেই মাছ খেয়ে বাঁচে অন্য অনেক মাছ, কাজেই তারাও বেশী দূরে যায় না। তাই, সমুদ্রের বেশির ভাগ জীবই থাকে মোটামুটি উপরের দিকেই।

জলের অনেক নীচে যেখানে অন্ধকারের রাজত্ব, সেখানে যারা থাকে, তাদের মধ্যে বড়রা না হয় ছোটদের ধরে খেতে পারে, কিন্তু ছোটরা খায় কি? মনে হয় যে তাদের খাদ্য নেমে আসে উপর থেকে। উপরে যারা মরে যায়, তাদের দেহ তলিয়ে নীচে চলে যায় তো! ওরা বোধহয় তা-ই খেয়ে বাঁচে। কিন্তু, সে আর কতটুকু? তাই গভীর জলে প্রাণী কম।

॥ প্ল্যাঙ্কটন ও ডায়াটম ॥

উপরকার জলের বেশির ভাগ জীবের খাদ্যই হচ্ছে প্ল্যাঙ্কটন (plankton)। এ একটা জিনিস নয়, অনেক রকম গাছ আর প্রাণী মিলিয়ে এই নাম। এরা নিজের শক্তিতে চলে না, সমুদ্রের সব জায়গায় ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে বেড়ায়। খালি চোখে হয়তো তাদের দেখতেই পাওয়া যাবে না—এতই ছোট সেগুলো। তবে গভীর রাতে যখন এদের ঝাঁক ভাসতে থাকে, তখন ঢেউয়ের মাথায় মাথায় জোনাকির মতো ঝিকমিক করতে থাকে।

ঝাঁকের মধ্যে আছে অসংখ্য কাঁকড়া, চিংড়ি, রাবণ-ছাতা (জেলি ফিশ) ইত্যাদি নানা জাতের প্রাণীর শূক (larva). আরও ভাল করে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে লাখে লাখে উদ্ভিদের কণাও আছে তার সঙ্গে। এই সব মিলেই হয় প্ল্যাঙ্কটন।

উদ্ভিদের কণাগুলোর মধ্যে এক জাতের হল ডায়াটম (diatom). এদের একটা মাত্র কোষ (cell) নিয়ে একটা কণা। সেটা আবার প্লাস্টিকের মতো স্বচ্ছ একটি কৌটোর মধ্যে থাকে। সেই কৌটোর গায়ে কত সুন্দর সুন্দর কারুকার্য থাকে—ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তা দেখলে অবাক হতে হয়। হেরিং ইত্যাদি অনেক মাছের প্রধান খাদ্যই হল এই ডায়াটম।

॥ লাখে লাখে ডিম পাড়া ॥

বেশির ভাগ জলের প্রাণীই এক-একবারে হাজারে হাজারে ডিম পাড়ে বলে প্ল্যাঙ্কটনের জন্যে শূকের অভাব হয় না। কেননা, ডিম থেকেই তো শূক হয়। একটি লিং মাছের পেটে একবার ২,৮০,০০,০০০ ডিম পাওয়া গিয়েছিল। ইলিশ একবারে ১৫ লক্ষ ডিমও ছাড়ে। একটা কড্ মাছ বছরে ৮০ লক্ষ, আর হেরিং ৫০,০০০ ডিম পাড়ে। শুক্তির তো কথাই নেই—সে পাড়ে ৮ কোটি। এত লাখে লাখে মাছ অনবরত এইভাবে ডিম পেড়ে যায়। তার প্রায় সব ডিমই জলের প্রাণীদের পেটে যায় বলেই রক্ষে। তা না হলে গোটা সমুদ্রটাই ওদের ডিম ও বাচ্চায় ভরে যেত।

॥ সমুদ্রজলের গাছপালা ॥

পুকুরে যে ধরনের গাছপালা হয়, সমুদ্রেও অনেকটা সেই ধরনেরই সব গাছ, লতা, পানা, শেওলা ইত্যাদি হয়। আবার, চোখে দেখা যায় না এমন এককোষওলা উদ্ভিদ্‌ও আছে। অন্য গাছপালাগুলোর মধ্যে কেউ বা ফিকে সবুজ, কেউ বা ঘন সবুজ। আবার যে সার্গাসামের কথা আগে বলা হয়েছে, তাদের রং ঘন মেটে। খুব নীচে নেমে বেগুনী রংও দেখা যায়। লোহিত সাগরে আছে লাল রঙের শেওলা। লাল শেওলার জন্যে লোহিত সাগরের জল লালচে দেখায়। সেজন্যেই ওর ঐ নাম।

সমুদ্রের গাছপালার চেহারাও নানারকম। জলে-ডোবা পাথরের গায়ে হাতখানেক উঁচু একরকম গাছ হয়, দেখতে যেন টবের পাম গাছটা। আর এক রকম আছে, দেখলে মনে হবে ব্যাঙের ছাতা। ছোট

এক ইঞ্চি গোল একরকম পানা ঢেউয়ে ঢেউয়ে নেচে বেড়ায়, তাকে দেখতে ঠিক কদমফুলের মতো।

আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরে ডাঙার কাছে প্রচুর কেল্‌প্ (kelp) লতা হয়। এরা লম্বায় ২০০ ফুটেরও বেশী হতে পারে। তার মধ্যে একরকম আছে, তার নাম 'দানবের জুতোর ফিতে' (devil's shoelace). সেগুলো এমনভাবে জড়াজড়ি করে লম্বা হয়ে জলের উপর পাক খায় যে দেখলে মনে হবে মস্ত লম্বা একটা সাপ।

কেল্‌প্ মানুষের অনেক উপকারে আসে। জাপান, চীন, ইংল্যাণ্ডে কেল্‌প্ থেকে নানারকম সুখাদ্য তৈরী হয়। তাছাড়া, কেল্‌প্ থেকে আয়োডিন পাওয়া যায়।

॥ সাগর-জলের প্রাণী ॥

প্রাচীনকালে যখন সাগরের জীবজন্তুদের কথা সঠিকভাবে জানা যায়নি, তখন অনেক অদ্ভুত প্রাণীর কথা প্রচলিত ছিল। যেমন আমাদের দেশে তিমিঙ্গিল আর তিমিঙ্গিলগিল। তিমিঙ্গিল নাকি তিমিকে গিলে খেত, আর তিমিঙ্গিলকেও গিলে খেত তিমিঙ্গিলগিল। আবার ইওরোপের নাবিকরা বলত যে তারা একরকম সমুদ্রদানব দেখেছে, যে লম্বায় দু' কিলোমিটার, আর সে তার শুঁড় বাড়িয়ে জাহাজের মাস্তুলের আগা ধরে টেনে জাহাজ ডুবিয়ে দিত। এসব কথা অতিরঞ্জিত হলেও এ কথা ঠিক যে সমুদ্রে যে কত রকমের আর কত আশ্চর্য জীব থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। পুরীতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে যে সমুদ্রতীরে বালির উপর কত অসংখ্য রকমের ঝিনুক, শামুক, শঙ্খের খোলা পড়ে আছে, এরা সবাই সমুদ্রের জীব। কত কাঁকড়া ঘুরছে। হয়তো বা কোথাও স্বচ্ছ, থলথলে খানিকটা জিনিস পড়ে রয়েছে, ঢেউ তাকে ডাঙায় তুলে দিয়ে সরে গিয়েছে। এ হল রাবণ-ছাতা বা জেলি ফিশ (jelly fish). জেলেদের জালেও এটা ওঠে, তার সঙ্গে আসে হয়তো দু'একটা তারা-মাছ (star fish) —ছবিতে যেমন তারা আঁকা হয়, তেমনি গড়ন তার। এগুলো মানুষে খায় না, কিন্তু খাবার মতো মাছও তো কত ওঠে। একরকম মাছ আছে, তার নাম 'কই ভোলা', ওজন হয় প্রায় পাঁচ মন!

নানারকমের তারা-মাছ

॥ হাঙ্গর ॥

সাগরের বোধহয় সবচাইতে সাংঘাতিক হিংস্র প্রাণী হাঙ্গর। এদের কোনও কোনও জাত মানুষ-খেকো। যে সব হাঙ্গর মানুষকে আক্রমণ করে না, তারাও মাছ খেয়ে জেলেদের বড় ক্ষতি করে। অবশ্য হিংস্র নয় এমন হাঙ্গরও আছে। কোন কোন হাঙ্গর আবার মানুষের পোষও মানে। এক জাতের হাঙ্গর ৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এরা এত লোভী যে জাহাজ থেকে খালি টিন ফেলে দিলেও না দেখেশুনে গিলে ফেলে। অনেক হাঙ্গরেরই মুখ সামনে নয়, নীচের দিকে। সবচাইতে মজার দেখতে, কিন্তু
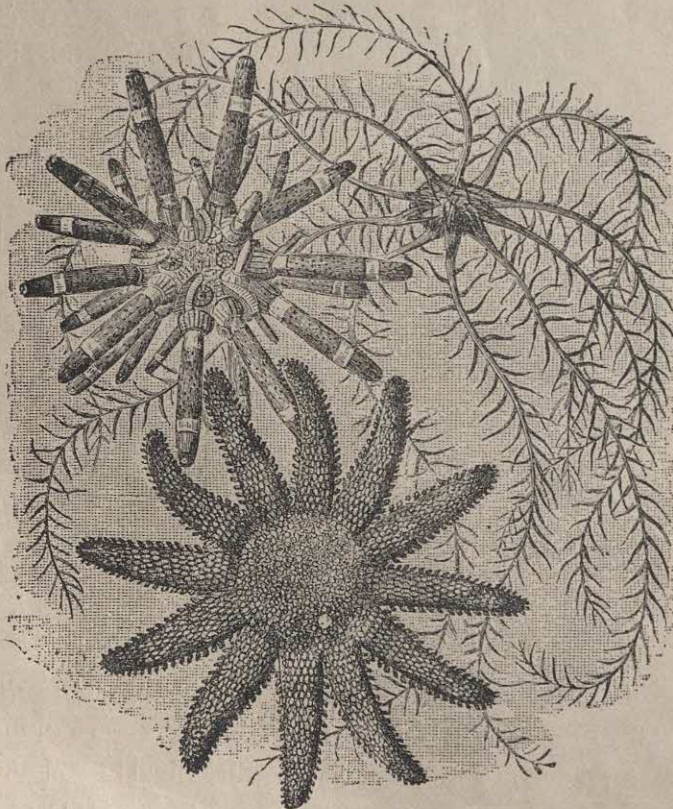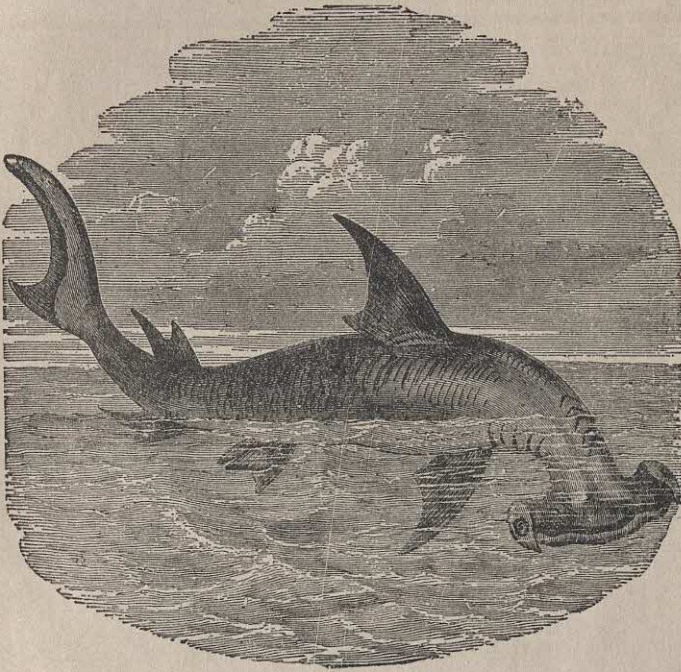
ভয়ানক হিংস্র হাতুড়ি-মাথা হাঙ্গর

ভয়ানক হিংস্র হচ্ছে 'হাতুড়ি-মাথা হাঙ্গর' (hammer-head shark). হাতুড়ির মাথাটা যেমন বাঁটের আগায় আড়াআড়ি ভাবে থাকে, এর মাথাও এর শরীরের আগায় সেইভাবে বসানো। তার দু-পাশে দুটো চোখ।

॥ উড়ুক্কু মাছ ॥

উড়ুক্কু মাছ (Flying Fish) প্রকৃতপক্ষে ওড়ে না। তারা লাফ দিয়ে জল থেকে ওঠে ও পাখনায় ভর করে কিছুদূর পর্যন্ত হাওয়ায় ভেসে চলে। তারা কখনও কখনও প্রায় সিকি মাইল পর্যন্ত বাতাসে ভেসে চলতে পারে। তাদের শূন্যে ভেসে চলার সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৪০ মাইল।

জাহাজ থেকে জলের প্রাণী খুব বেশী দেখা যায় না। কয়েক বছর আগে ইওরোপের ছ'জন লোক 'কন্‌টিকি' নামের একটি ভেলায় চড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়েছিল। উড়ুক্কু মাছেরা উড়ে এসে তাদের ভেলায় পড়ত। সারা রাস্তাই অনেক জীবজন্তু কন্‌টিকির সাথী হয়েছিল। লোভী হাঙ্গরই তার মধ্যে বেশী। হাঙ্গরের লেজ ধরে টেনে ভেলায় তোলা তাদের একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গভীর রাত্রে ঢেউয়ের উপর প্ল্যাঙ্কটন আলো দিত, সমুদ্রের নীচতলার বাসিন্দা অক্‌টোপাস আর স্কুইডেরা জলের উপর চোখ তুলে তাদের দেখত।

॥ সমুদ্রের আর কয়েকটি বাসিন্দা ॥

স্কুইডদের গায়ে একটা লম্বা খোল থাকে, গাধার টুপির মতো। চলবার সময় তারা হুস করে পিছন দিকে
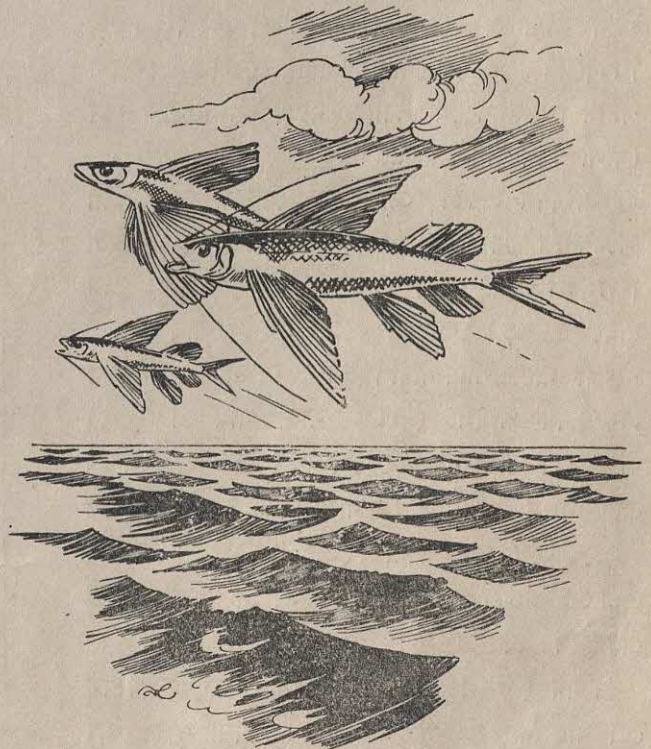
উড়ুক্কু মাছ পাখনায় ভর করে বাতাসে ভেসে চলেছে

অক্‌টোপাসের কবলে ডুবুরী

ছিটকে যায়। আর অক্‌টোপাসেরা বড় ভয়ানক। একটা ঢিপির মতো মাথা থেকে একপাশে দুটো চোখ বেরিয়ে রয়েছে, আর বেরিয়েছে আটটা শুঁড়। সেই শুঁড় দিয়ে কাউকে জড়িয়ে ধরলে জোর করে ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব। শুঁড়গুলোর নীচের পিঠে অনেকগুলো করে চুষবার যন্ত্র আছে, তাই দিয়ে ওরা শিকারের রক্ত চুষে নেয়। আবার, বেগতিক দেখলে শরীর থেকে কালো কালির মতো রস ছিটিয়ে জল ঘোলা করে পালিয়ে যায়।

একদিন একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার ছুটে এসে অনেকক্ষণ ধরে 'কন্‌টিকি' ভেলাটাকে দেখল। ভেলাটা ছিল ৪৫ ফুট লম্বা, কিন্তু এই জন্তুটা ছিল তার চাইতেও বড়। ব্যাঙের মতো বীভৎস তার মুখটা, খয়েরী গায়ে সাদা-সাদা ছিট। তার সামনে চলছিল এক ঝাঁক পাইলট (pilot) মাছ, আর তার গায়ে আটকে ছিল অসংখ্য রেমোরা (remora) মাছ। এটা হাঙর আর তিমির মাঝামাঝি একরকম প্রাণী —একে বলে হোয়েল-শার্ক (whale-shark). লম্বায় এরা ৬৫ ফুট পর্যন্ত হয়। মাছ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে এরাই সব চাইতে বড়।

তিমি (whale) অবশ্য এদের চেয়ে বড়, তিমি তো মাছ নয় স্তন্যপায়ী জলজন্তু। তারা সমুদ্রে সব জায়গায় থাকে না। সাধারণতঃ তাদের দেখা যায় খুব ঠাণ্ডার জায়গায়—যেমন, মেরুসাগরে। তিমি আসলে মাছ নয়। মাছেরা ডিম পাড়ে, তিমিরা তা করে না। মানুষের মতো তাদেরও বাচ্চা হয়, বাচ্চারা মায়ের দুধ খায়।

নীল তিমি (blue whale) বলে এক জাতের তিমি ১০০ ফুটের মতো লম্বা হয়। পৃথিবীতে জলে স্থলে এদের চাইতে বড় প্রাণী আর নেই। ওজনে এরা ১০০ টনেরও বেশী হতে পারে, অথচ ডাঙায় সবচেয়ে বড় হাতির ওজনও ৫ টনের বেশী দেখা যায় না। সাধারণতঃ হাতির ওজন ২½-৩ টনই হয়।

বেশির ভাগ তিমির গলার ফুটো কিন্তু ছোট। তাই তাকে কুচো মাছ আর জলজন্তু খেয়েই থাকতে হয়। কোন কোন জাতের তিমির দাঁত থাকে, কারু বা মুখে থাকে শ'দুই ঝাঁজরার মতো হাড় (baleen). হাঁ করে জল মুখে নিয়ে সেই ঝাঁজরায় ছেঁকে তারা খাবার মুখে নেয়।

মাছ নয় বলে এরা ২০-২৫ মিনিটের বেশী জলে ডুবে থাকতে পারে না। জল থেকে উপরে উঠে নিঃশ্বাস নিয়ে জলে ডুব দেয়, তারপর সময় হলে

তিমির মাথার ফুটো দিয়ে ফোয়ারার মতো জল উঠছে
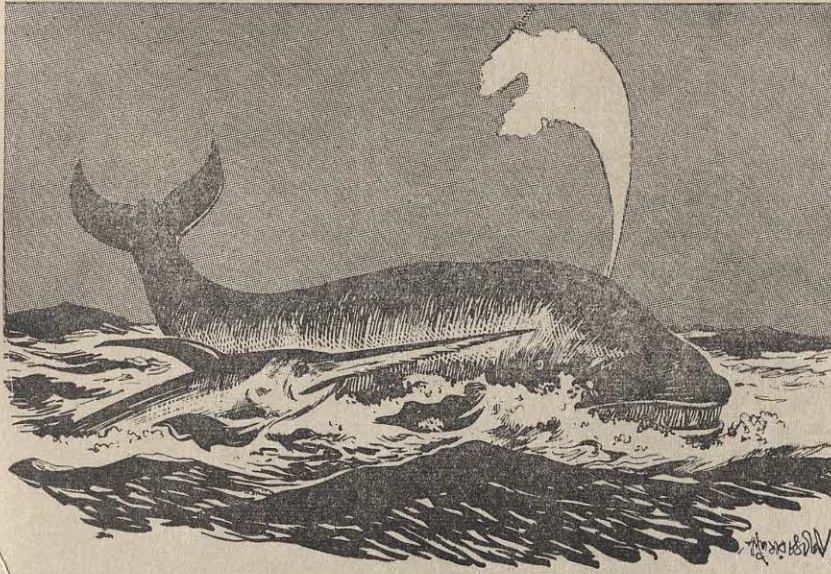
তরোয়াল মাছ তিমিকে আক্রমণ করেছে

দম ছাড়বার জন্যে আবার উপরে উঠে আসে। দম ছাড়বার জন্যে এদের মাথায় ফুটো আছে। উপরে এসে জলের তলায় থাকতে থাকতেই এরা দম ছেড়ে দেয়, তখন ফোয়ারার মতো জল উঠতে থাকে সেখানে।

এই ফোয়ারা দেখেই তিমি-শিকারীরা তিমির খোঁজ পায়। তিমির মুখের সেই হাড়ের ঝাঁজরা, আর তার মাথাভরা তেল, গায়ের চর্বি আর পেটের একরকম সুগন্ধি জিনিস (ambergris)—এ সবের লোভে আগে প্রতি বছর দলে দলে শিকারী জাহাজ মেরু সাগরে যেত।

তিমি শিকারের সব চাইতে ভাল গল্প হচ্ছে হার্মান মেলভিল-এর লেখা 'মোবী ডিক' (Moby Dick). তিমি-শিকারী একটা জাহাজ কি করে সারা সমুদ্রে বিশেষ একটা সাদা তিমিকে খুঁজেছিল, তারপর মানুষে আর তিমিতে লড়াই হয়ে দু'পক্ষই কেমন করে শেষ হয়ে গেল—সেই চমৎকার গল্প আছে এতে।

ছোট একজাতের তিমিকে বলে নারওয়াল (narwhal). মজা এই যে তাদের মুখে একটাই দাঁত থাকে, সেটা সোজা একটা বর্শার মতো বেরিয়ে থাকে তার মুখের সামনে। তা দিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করা চলে, চিবোবার কাজ চলে না।

তবে ওস্তাদ বলতে হয় তরোয়াল মাছকে (sword fish)। দাঁত নয়, তার উপরের শক্ত ঠোঁটটাই লম্বা সরু হয়ে অনেকটা এগিয়ে থাকে তার মাথার সামনে। এই দিয়ে তারা শত্রুকে চুঁ মারে। একবার হয়েছে কি, সমুদ্রে একটা জাহাজ দেখে এক তরোয়াল মাছের বড়ই রাগ হল। অমনি তেড়ে এসে তাতে মেরেছে এক চুঁ। আর জাহাজের তলার কাঠ ফুটো হয়ে তার ঠোঁট গিয়েছে আটকে, আর ছাড়াতে পারে না! তখন আর কি, বেচারা সেই অবস্থায় জাহাজের সঙ্গে আসতে বাধ্য হল, শেষে বন্দরে এসে ধরা পড়ল। অনেক সময় তরোয়াল মাছ তিমিকে পর্যন্ত আক্রমণ করে।

হাতির মতো একজোড়া দাঁত থাকে সিন্ধুঘোটকের

প্রবাল দ্বীপের উপর পাখির ঝাঁক

তবে ঠিক হাতির মতো একজোড়া দাঁত আছে সিন্ধুঘোটকের (walrus). এরাও খুব ঠাণ্ডার দেশে সমুদ্রে থাকে, তবে এরা ডাঙ্গায়ও ওঠে। বিরাট দেহ, ওজনে এক টনেরও বেশী হয়। ছোট মাথা, মুখের দু'পাশে দুই গজদন্ত, ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয় সে দুটো। এদেরই জাত-ভাই আছে সীল (seal). তাদের ওরকম গজ দাঁত নেই। এক জাতের সীল (Fur seal) আছে, তাদের পেটের চামড়ায় নরম লোম হয়। তার জন্যে আগে বছরে হাজার হাজার এই জাতের সীল মারা হত। এই লোমওলা নরম চামড়া জামায় ও ভ্যানিটি ব্যাগে ব্যবহৃত হত।

আর একজাতের সীলকে বলে সিন্ধু-সিংহ

লেজটাকে গাছে জড়িয়ে বিশ্রাম করছে সী-হর্স

(sea-lion). সিংহের সঙ্গে এদের মিলের মধ্যে শুধু এদের ঘাড়ে সামান্য লোম থাকে। আর এক জাতের নাম সিন্ধু-হস্তী (sea-elephant), তাদের মুখে ছোটখাট একটা শুঁড় থাকে। এরা লম্বায় ১২-১৩ হাত পর্যন্ত হয়।

এদের সকলেরই চারখানা পা পাখনার মতো। সবাই ঠাণ্ডার দেশে থাকে, বাচ্চা পাড়ে, বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায়। অনেক সময়, বিশেষ করে বাচ্চা হবার সময় ডাঙ্গায়ও উঠে আসে। এরা ডাঙ্গায়ও চলতে পারে তবে হেঁচড়ে হেঁচড়ে।

সিন্ধুঘোটক কিন্তু সমুদ্রের জীব নয়, আবার ঘোটকের বা ঘোড়ার সঙ্গে তার মিলও নেই। কিন্তু একরকম সমুদ্রের প্রাণী সত্যিই আছে, যাদের মুখটা দেখতে বেশ খানিকটা ঘোড়ার মতোই। তাদের নাম সী-হর্স (sea-horse). এরা বেশির ভাগই গরম দেশের সমুদ্রে অল্প জলে থাকে। লম্বায় বড় জোর ফুটখানেক লম্বা হয়। এরা খাড়া হয়ে চলে, আর জলের তলায় গাছ-টাছ পেলে তাতে লেজটাকে জড়িয়ে দিয়ে বিশ্রাম করে। কুমীরের লেজের মতো এদের লেজটার গড়ন। মা যখন ডিম পেড়ে দেয়, বাপ

তখন সেগুলো বুকের থলিতে রেখে তা দেয়। এ এক মজার জীব।

॥ স্পঞ্জ, খড়ি, প্রবাল ॥

আজকাল স্পঞ্জের (sponge) বেশী ব্যবহার নেই। স্পঞ্জ হচ্ছে একরকম সামুদ্রিক জীবেরই নরম, ফাঁপা, হালকা কঙ্কাল। অসংখ্য ফুটো থাকায় এক তাল স্পঞ্জকে চেপে ধরলে সেটা ছোট হয়ে যায়, ছেড়ে দিলেই আবার গোলগাল হয়ে যায়। ঐ ফুটোর ভিতর দিয়ে যে জল ঢোকে তারই সঙ্গে ভেসে-আসা খাদ্যকণা খেয়ে স্পঞ্জ বেঁচে থাকে। খাদ্য গ্রহণ করার পর শরীরের একটা বড় ফুটো দিয়ে সে জল বের করে দেয়।

খড়িকে (chalk) চা-খড়িও বলে। সমুদ্রে এক জাতের অতি ছোট পোকা থাকে। তাদের গা থেকে চুনের মতো বেরোয়। কোটি কোটি পোকার গায়ের সেই চুন হাজার হাজার বছর ধরে জমে জমে সমুদ্রের ধারে খড়ির পাহাড় জেগে ওঠে। ইংলণ্ডের ডোভার-এর খড়ির পাহাড় (Chalk Cliffs of Dover) বিখ্যাত।

আর এক ধরনের অতি ছোট পোকার গা থেকেও এক রকম চুনের মতো বেরিয়ে জমে জমে পাহাড়, দ্বীপ ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। তাদের নাম প্রবাল (coral). প্রশান্ত মহাসাগরে এরকম দ্বীপ অসংখ্য। জ্যান্ত অবস্থায় অনেক প্রবাল একসঙ্গে গায়ে গায়ে লেগে থাকে, তখন তাদের নানারকম সুন্দর রং হয়। মরে গেলে সেই চুনের কঙ্কালটা পড়ে থাকে, সেটার রং প্রায়ই সাদা। তার চেহারা অনেক রকম হয়।

অনেক সময় প্রবালগুলো জমে যে দ্বীপ হয়, সেটা হয় একটা আংটির মতো গোল, তাকে বলে প্রবাল-বলয় (atoll). মাঝখানে প্রবাল জমে না, গোলাকার একটা হ্রদের মতো হয়ে জল থাকে। প্রবাল দ্বীপে অসংখ্য পাখিরা এসে ভিড় জমায়।

লাল রঙের প্রবাল কেটে পালিশ করে গয়নায় লাগানো হয়। চলতি কথায় তাকে পলা বলে। পলা-বসানো আংটি, পলা-বসানো হার অনেকে পরে।

জলের তলায় পোশাক-পরা ডুবুরী

॥ বিচিত্র প্রাণীর দল ॥

এ ছাড়া সমুদ্রে আরও কত বিচিত্র প্রাণী। কোনটা দেখতে ফুলের মতো, কোনটা কাঁটার মতো, কোনটা শশার মতো, কোনটা ছাতার মতো, আর কত রকম! কত বিচিত্র তাদের রং, তেমনি বিচিত্র তাদের

চালচলন। সমুদ্রগামী জাহাজের নীচে সেঁটে থাকে ঝিনুকের মত একরকম জীব, তাকে বলে বার্নাকল।

॥ গভীর জলের মাছ ॥

এতক্ষণ যাদের কথা হল, তারা প্রায় সবাই আলোর রাজ্যের প্রাণী। আলোর দেশ ছাড়িয়ে আরও নীচে যারা থাকে, তাদের কথা এবার বলা হচ্ছে।

গভীর সমুদ্রে ৬০০০ থেকে ১৫,০০০ ফুট পর্যন্ত জলে ডুবুরী নামিয়ে নীচেকার প্রাণীর নমুনা তুলে এনে তাদের কথা অনেক জানা গিয়েছে। বীব্, পিকার্ড, ইভে-কস্তো (Yves-Costeau) প্রভৃতি কেউ কেউ যন্ত্রে ঢুকে নীচে নেমে স্বচক্ষে কিছু কিছু দেখেও এসেছেন। ডুবুরীরা জলের তলায় গিয়ে নানাভাবে নানা বিবরণ সংগ্রহ করেছে।

জলের অত নীচে চাপ খুব বেশী, সে কথা আগে বলেছি। গভীর সমুদ্রের অন্ধকার রাজ্যের মাছেদের শরীর সেই চাপ সইবার মত করেই তৈরী। তারা ওপরে অল্প-চাপের কম গভীর জলে উঠে আসে না। এলে বিপদে পড়ে, হয়তো বা ফেটেই যায়।

অন্ধকারে চলতে হলে একটা টর্চ বা লণ্ঠন নিতে হয়, নয়তো লাঠি কিংবা হাত বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে চলতে হয়। অন্ধকারে সাগরতলের বাসিন্দা-দেরও এই দু'রকম ব্যবস্থাই আছে।

তাদের কোনটার গা থেকে, কিংবা মাথা থেকে, অথবা লেজ থেকে জোনাকির মতো আলো বেরোয়। কারও বা লম্বা শুঁয়া কিংবা দাড়ি-গোঁফের মাথায় বাতি জ্বলে। কারও বা দাঁতগুলো আলোয় জ্বলজ্বল করে। কুড়ুলমাছের (hatchet fish) গায়ের দু'পাশে সবুজ আর বেগুনী আলো জ্বলে। ছোট একজাতের স্কুইডের গায়ে শত শত আলোর রং ক্রমাগত বদলে চলেছে—লাল, ধূসর, নীল।

গভীর জলের বিচিত্র আকারের মাছ

আর যাদের আলো নেই, তাদের চোখও নেই। তাদের পাখনা সরু লম্বা হয়ে ছড়িয়ে থাকে। তাই দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে তারা চলে-ফিরে বেড়ায় আর আহার যোগাড় করে।

অত গভীর জলে গাছপালা হয় না বলে এইসব গভীর জলের জীবদের বড় খাওয়ার কষ্ট। যে যখন যা পায়, তাই ধরে খায়। যাদের আলো আছে, তারা সেই আলোয় কাছের শিকার দেখতে পায়, আবার শিকারও সেই আলো দেখে কাছে চলে আসে।

তাতে আবার উলটোটাও হয়। সেই আলো দেখেই অন্য মাছেরা তাদের খোঁজ পেয়ে তাদেরই খেতে আসে। এদের হাত এড়াবার জন্যেও নানা ব্যবস্থা আছে। কেউ বা আলো নিবিয়ে দিতে পারে, শত্রু এসে পড়লে আলোটা নিবিয়ে চম্পট দেয়। কেউ বা আলো জ্বেলে ও নিবিয়ে তাকে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়। আবার একজাতের চিংড়ি আচমকা এমন জোরে আলো জ্বেলে দিতে পারে যে শত্রু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, অমনি সে আলো কমিয়ে পালায়। আর যাদের গায়ে বড় বড় কাঁটা আছে, ঐ কাঁটার জন্যেই তাদের প্রাণ বেঁচে যায়। খিদেয় নিতান্ত অস্থির না হলে কে তাদের খেতে যাবে? কেউ কেউ আবার বৈদ্যুতিক শক্ দিতেও ওস্তাদ। শক্ খেয়ে পালাবার পথ খুঁজতে হবে। এদের বলে ইলেকট্রিক ফিশ। ইলেকট্রিক ঈল (বৈদ্যুতিক বান মাছ) এই জাতের, কিন্তু অগভীর সমুদ্রের জীব।

এদের বেশির ভাগেরই গায়ের রং হয় ঘোর কালো, বড় জোর লালচে কালো। তবে এমনও আছে যাদের কোনও রং নেই, একেবারে কাচের মতো তাদের শরীর। ভিতরে হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপছে, রক্ত চলছে, খাবার

হজম হচ্ছে—এসবই বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। যারা বোম্বাই-এ সামুদ্রিক প্রাণীর সংগ্রহশালা (অ্যাকোয়েরিয়াম) দেখেছে তারা এ রকম প্রাণী দেখে থাকবে।

কত অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারাও হয় এদের। কুড়ুল মাছের কথা আগে বলা হয়েছে। তার চেহারাটা কুড়ুলের মতো, আর চোখ দুটা তার মাথার উপর দুটো নলের আগায় বসানো। কারও দাঁত এত বড় বড় যে মুখ বন্ধ হয় না—তারা যেন দাঁত খিঁচিয়েই আছে। প্রায় সকলেরই মাথা বড়, কারও কারও হাঁ বাকী দেহটার চাইতেও ঢের বড়—বলা চলে যে তাদের দেহের প্রায় সবটাই একটা মুখ। ঐরকম একখানা হাঁ করে নিজের চাইতে বড় কোনও কিছুকে গিলে ফেলতে তাদের কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু খাবারটা যাবে কোথায়? তারও ব্যবস্থা আছে। এরা নিজের পেটটাকে দরকারমতো অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে নিতে পারে।

সাগরের নীচে নেমে সাগরের উপরের মানুষদের বই পড়ে শোনাচ্ছে

এদের মধ্যে কেউ কেউ দেখতে বড় সাংঘাতিক। কিন্তু এরা আকারে বড় হয় না, অন্ধকার সমুদ্রে আজ পর্যন্ত বড় কোনও প্রাণীর খোঁজ পাওয়া যায় নি। যাদের কথা বলা হল এরা মোটে চার ইঞ্চি থেকে বারো ইঞ্চি লম্বা।

বেথাপ্পা গড়নের শয়তান মাছ

গভীর সমুদ্রের আর একটা প্রাণীকে বলে শয়তান মাছ (devil fish). তাকে দেখতে বড় বিশ্রী। তার মস্ত মাথাটা বেখাপ্পা গড়নের, মুখটা উপর দিকে তোলা, খাবার জন্যে হাঁ করেই রয়েছে। মুখে বড় বড় দাঁত—দেখলে মনে হয় যে শিকার ধরবার একটা ভীষণ ফাঁদ। কিন্তু মজা এই যে বড় চেহারার এরকম একটা মেয়ে শয়তান মাছের গায়ে যেখানে সেখানে লেগে থাকে দশ-বিশটা পুরুষ শয়তান মাছ—তারা আকারে খুবই ছোট। তারা এমনভাবে ওর গায়ে

এঁটে লেগে থাকে যে তারা জন্মের মতো ওর সাথী হয়ে থাকে—এক মুহূর্তের জন্যেও ওকে ছেড়ে যায় না। শেষে তাদের মুখচোখ ইত্যাদি লোপ পেয়ে যায়, তারা বড় মাছটারই শরীরের অংশ হয়ে যায়, তার শরীরের রস পেয়েই তারা বেঁচে থাকে। তারপর, তার সঙ্গেই মরে।

॥ সাগরতলায় ডুবুরী ॥

আজকাল জলের তলায় নামা খানিকটা সহজ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের নানা অনুসন্ধান-কার্য চালাবার জন্যে প্রায়ই জলের তলায় ডুবুরী নামাতে হয়। সেই সব ডুবুরী অনেক সময়ে জলের তলায় গাছপালা, পাথর ইত্যাদির ছবি তুলে আনে। তাছাড়া অনেক বড় বড় জাহাজ দুর্ঘটনার ফলে জলে ডুবে যায়। তাদের এক একটা তৈরি করতে বহু লক্ষ টাকা খরচ পড়ে। কাজেই সে সব তুলে আনবার ব্যবস্থাও শিক্ষিত ডুবুরীরা করে থাকে। ছোটখাট মেরামত জলের তলাতেই সেরে নিয়ে নানা উপায়ে জাহাজটাকে ভাসিয়ে তোলে। এ সব ব্যাপার আজকাল মোটেই বিপজ্জনক নয়। বিজ্ঞান মানুষকে স্থল, জল ও আকাশের রাজা করে দিয়েছে। কেউ কেউ আবার তেল-রং ও ক্যানভাস সহ জলের তলায় নেমে বেশ জাঁকিয়ে বসে জলের তলাকার অদ্ভুত গাছপালা ও বিচিত্র সব জানোয়ারের ছবি আঁকে। কিংবা জলের তলায় নেমে ডুবুরী সেখানে বসে বই পড়ে জলের ওপরকার মানুষকে শোনায়। ব্যাপারটা খুব চমকপ্রদ। ভয় নেই, তাদের নিরাপদে থাকবার ব্যবস্থা বিজ্ঞান করে দেয়। তাই বাহাদুরি দেখাবার জন্যে মানুষ এসব করে।

এ অবস্থায় যদি হঠাৎ অক্টোপাস বা ঐ রকম ভয়ংকর কোন জলজন্তু এসে হাজির হয়, তখন কিন্তু সত্যিকারের বিপদ। দুঃসাহসী ডুবুরীরা এ বিপদের ঝুঁকি নেয়। নির্ভীক লোক তো দুনিয়ায় কম নেই!

তাছাড়া এদের সঙ্গে টেলিফোন থাকে। এরা সেই টেলিফোনে উপরে খবর পাঠিয়ে সাহায্য চেয়ে নেয়। আর মুহূর্তে সাহায্যও এসে যায়।

কাজেই জলের তলাটা এখন যেন একটা নতুন বেড়াবার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরকম কত মজার ব্যাপারই না পৃথিবীতে ঘটছে!

———

॥ পৃথিবীতে গাছ আগে এসেছে ॥

প্রাণ কাকে বলে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। যাদের প্রাণ আছে, বিজ্ঞানীরা তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যারা সাধারণতঃ নিজেরা চলতে পারে না, তারা হল এক শ্রেণী—তাদের বলা হয় উদ্ভিদ্ বা গাছপালা। আর, যারা চলতে পারে, তারা হল প্রাণী।

পণ্ডিতরা মনে করেন যে পৃথিবীতে কোনও প্রাণী দেখা দেবার অনেক আগেই প্রথম গাছপালারা দেখা দিয়েছিল।

॥ বিচিত্র উদ্ভিদ্-জগৎ ॥

এমন বহু 'গাছপালা' আছে যাদের দেহ তৈরী হয়েছে কেবল একটিমাত্র কোষ দিয়ে, শিকড় নেই, পাতা নেই, ফুল নেই, কিছু নেই। তারা এত ছোট যে খালি চোখে তাদের দেখা যায় না ; দেখতে গেলে মাইক্রস্কোপের অর্থাৎ অণুবীক্ষণের সাহায্য লাগে। আবার অন্য দিকে এত বড় বড় সব গাছ আছে যাদের দেখতে গেলে আমাদের মাথা কাত করে তাকাতে হয়। কারোর আয়ু কয়েকটা দিন, আর কারোর আয়ু হাজার, দু'হাজার বছর।

বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩,৫০,০০০ জাতের গাছের পরিচয় পেয়েছেন ও তাদের বিবরণ লিখে গেছেন। আরও কত যে গাছপালা সমুদ্রের অতলে ও অরণ্যের গভীরে লুকিয়ে আছে তারই কি কোন আন্দাজ করতে পারি আমরা !

॥ গাছপালার শ্রেণী-বিভাগ ঃ প্রাচীন যুগে ॥

গাছপালার শ্রেণী-বিভাগ করবার চেষ্টা নানাদেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে। গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টট্ল্ (৩৮৪-৩২২ খ্রীঃ পূঃ) বলেছিলেন যে গাছেদের তিনটি শ্রেণী—ওষধি (herb), গুল্ম (shrub) আর বৃক্ষ (tree)। সহজেই বোঝা যায় যে এ কথা ঠিক নয়, সম্পূর্ণও নয়। সেই রকম আমাদের দেশে প্রাচীনকালের চরকমুনির শ্রেণী-বিভাগ (বনস্পতি, বানস্পত্য, ওষধি, বীরুধ্), আর অমরসিংহের শ্রেণী-বিভাগও (বৃক্ষ, লতা, ওষধি, তৃণ, তৃণগুল্ম)-ও আজকাল আর মেনে নেওয়া চলে না।

॥ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গাছের শ্রেণী-বিভাগ ॥

ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শ্রেণী-বিভাগের কাজ প্রথম করেন ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnæus), সুইডেনের এক উদ্ভিদ্‌বিদ্। তাঁর আসল নাম ছিল Carl von Linne. তাঁর তৈরী শ্রেণীবিন্যাসের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে অন্যান্য শ্রেণীবিন্যাস করার চেষ্টা হয়েছে। তিনি

মহীরুহ (The Monkeypod Tree)

প্রথমেই সমস্ত গাছগাছড়ার চলতি দেশীয় নাম বরবাদ করে তার বদলে প্রতিটি গাছের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন ল্যাটিন ভাষা থেকে শব্দচয়ন করে। কারণ, সেকালের শিক্ষিতদের সকলেরই এ ভাষা জানা ছিল। লিনিয়াসের নামকরণ আজও অসংখ্য গাছগাছড়ার নামের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

গড়ন হিসেবে বিজ্ঞানীরা সব উদ্ভিদ্‌কে প্রধানতঃ চারটি শ্রেণীতে ফেলেছেন। সে চারটে বিভাগ হল (১) থ্যালোফাইটা (Thallophyta), (২) ব্রায়োফাইটা (Bryophyta), (৩) টেরিডোফাইটা (Pteridophyta) এবং (৪) স্পারম্যাটোফাইটা (Spermatophyta). ব্যাঙের ছাতা হচ্ছে থ্যালোফাইটের, শ্যাওলা হল ব্রায়োফাইটের, আর ফার্ণ হল টেরিডোফাইটের দৃষ্টান্ত। এদের কারুই ফুল বা বীজ হয় না, এদের বলা হয় ক্রিপটোগ্যাম্‌স্‌ (Cryptogams). আর, স্পারম্যাটোফাইট কথাটার অর্থই হচ্ছে 'যাদের বীজ ধরে'—তারা হল ফ্যানারোগ্যাম্‌স্‌ (Phanerogams).

আধুনিক কালে অবশ্য উদ্ভিদ্‌-জগৎকে আরও বেশী ভাগে ভাগ করা হয়েছে ভিতরকার চেহারার উপর নির্ভর করে; তা হলেও পুরোনো নিয়মে শ্রেণীবিন্যাসেরই চলন বেশী। জর্জ বেন্থাম ও যোশেফ হুকার দ্বারা উদ্ভাবিত শ্রেণীবিন্যাসই আমরা ভারতবর্ষে ব্যবহার করি। ইংল্যাণ্ডেও এটাই ব্যবহৃত।

॥ গাছের কাছে আমরা অনেক রকমে ঋণী ॥

সবুজ গাছপালারা তাদের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়ায় বাতাস থেকে অপকারী কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নেয়, আর পাতার ছিদ্রপথে বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই অক্সিজেন যে-কোন প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। আর এইভাবে সেটা যোগায় সবুজ গাছপালারা। তারা হাওয়ার কমে-আসা অক্সিজেন ক্রমাগত পরিপূরণ না করলে পৃথিবীর অক্সিজেন অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে যেত। অনিষ্টকর কার্বন-ডাই-অক্সাইডে আকাশ-বাতাস ভরে উঠত, আর সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেত। এছাড়া গাছপালা মানুষের এবং সেইসঙ্গে প্রাণিকুলের প্রধান খাদ্য। আমিষভোজী প্রাণী যারা গাছপালা খায় না, তারা খায় গাছপালাখেকো প্রাণীদেরই।

আমেরিকার মরুভূমির একধরনের গাছ
(The Joshua Tree)

॥ উদ্ভিদ্-জগতের দান ॥

আমাদের খাদ্য-তালিকা উদ্ভিদ্-জগতের দানে ভরা। নানান রকম তেল আমরা ব্যবহার করি খাদ্য হিসেবে, আর ব্যবহার করি সাবান, রঙ, বার্নিশ প্রভৃতি নানা কাজে। সমস্ত মসলাপাতি, যেমন ধনে, জিরে, লঙ্কা,
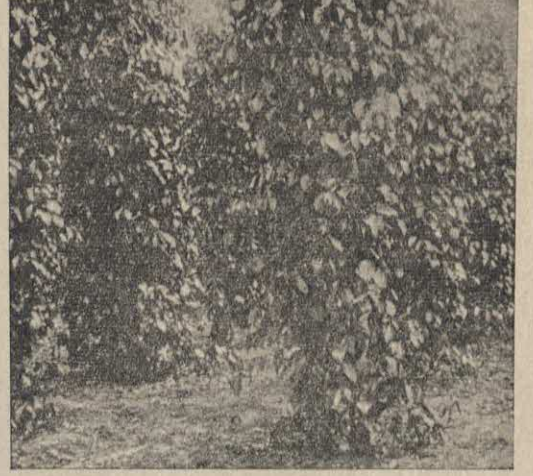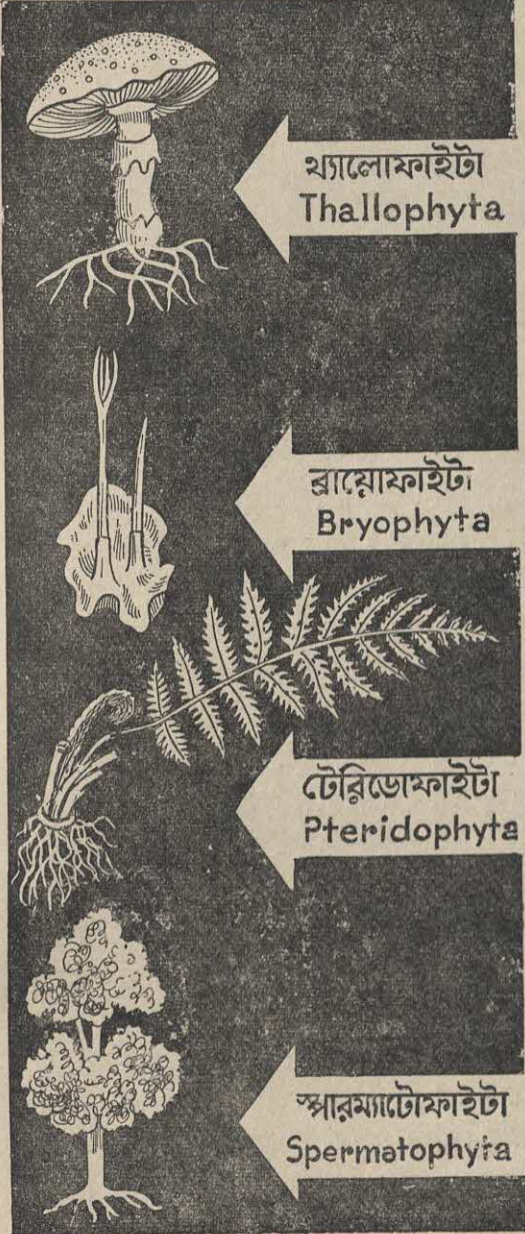
উদ্ভিদের থ্যালোফাইটা ইত্যাদি শ্রেণীবিন্যাস

গোলমরিচ গাছ অন্য গাছ বেয়ে ওঠে

হলুদ, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচ প্রভৃতির সরবরাহ আসে উদ্ভিদ্-জগৎ থেকে। চিনি পাই আখ বা বীট থেকে। এও উদ্ভিদের দান। চা, কোকো, কফি আমাদের শ্রান্তি দূর করে। এসবও আসে উদ্ভিদ্ থেকে।

কাঠ, বাঁশ, পাতা, দড়ি সবই পাওয়া যায় গাছপালা থেকে। একমাত্র কাঠ দিয়েই আসবাবপত্র, নৌকো, দরজা, জানালা ইত্যাদি বহু জিনিস তৈরী হয়।

পোশাক পরিচ্ছদের জন্যে যে প্রয়োজনীয় তুলো তা পাই গাছ থেকে। আগেকার দিনে শীত ও তাপ থেকে বাঁচতে যে বল্কল ব্যবহৃত হত তা তো গাছেরই ছাল! এখনকার যে নকল সিল্ক ও রেয়ন তা কাঠ থেকে তৈরী হয়, এবং অতি আধুনিক কালের যে নাইলন আর টেরিলিন সে-সবও গাছপালা থেকে তৈরী হয়। গাছ থেকে আমরা পাই পাট ও অন্যরকম আঁশ। নানা ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার হয়ে থাকে।

কতরকম ওষুধের জন্যে আমরা গাছপালার উপর নির্ভর করি। কুইনাইন আসে সিনকোনা গাছের ছাল থেকে। অতি আধুনিক কালের নানা অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ওষুধ, যে-সব চিকিৎসা-জগতে বিপ্লব এনেছে বলা চলে, সেই সব ওষুধ যেমন, পেনিসিলিন,

গাছ থেকে দারুচিনি অর্থাৎ ডালচিনি ছাড়ানো হচ্ছে

স্ট্রেপটোমাইসিন, অরিওমাইসিন এসব নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্ থেকে পেয়ে থাকি।

জ্বালানির জন্যে কাঠ আর কয়লা, লেখবার জন্যে কাগজ, বিভিন্ন কাজের জন্যে রবার, রজন, কর্ক প্রভৃতি কত যে জিনিস উদ্ভিদ্-জগৎ থেকে পাচ্ছি তার শেষ নেই।

॥ উদ্ভিদ আরও নানা ভাবে উপকার করে ॥

উদ্ভিদ্ আমাদের আরও অন্যভাবে সাহায্য করে। গাছপালা মাটির ক্ষয় রোধ করে থাকে। মুষলধারায় যখন বৃষ্টি নামে তখন তা সোজা মাটিতে আঘাত না করে আঘাত করে গাছের ডালপালায়। মাটির নীচে গাছের অসংখ্য শিকড় মাটিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকে আর সেই সঙ্গে মাটিকে আলগা করে রাখে। জলের চোট থেকে মাটিকে বাঁচাবার জন্যে নদীর পাড়ে বা খেলার মাঠে দূর্বাঘাস লাগিয়ে দেওয়া হয়, কেননা দূর্বার শিকড় হয় খুব বেশী। বৃষ্টির জলের অনেকটাই এই আলগা পথে মাটির নীচে আশ্রয় নেয়। ফলে মাটির নীচে জলের সরবরাহ বেড়ে যায়।

॥ অপুষ্পক সবুজ উদ্ভিদ্ ঃ শেওলা (Algae) ॥

[পৃথিবীর পুরোনো বাসিন্দাদের অন্যতম শেওলার স্থান উদ্ভিদ্-জগতের নীচু মহলে। কিন্তু নীচু মহলে হলেও এদের রঙ বড় বড় গাছপালার মতোই সবুজ। এদের রঙ সবুজ বলে নিজেদের খাবার এরা তৈরি করে নিতে পারে।]

শেওলার (alga, বহুবচনে algae অ্যাল্‌জি) শিকড় নেই, ডাঁটা নেই, পাতা নেই, ফুল বা ফল কিছুই নেই। খুবই সরল চেহারা এদের। এদের মধ্যে এককোষী শেওলা আছে, যাদের সংখ্যা খুব অল্প নয়। আবার মোটামুটি বড় চেহারার শেওলাও আছে, যাদের বাস সমুদ্রের গভীরে। এসব বড় জাতের শেওলার নামমাত্র শিকড় আছে। এই দিয়ে তারা মাটি, পাথর বা নুড়ি ইত্যাদি আঁকড়ে ধরে থাকে।

শেওলার সবুজ রঙ তো থাকেই, তাছাড়া অন্য নানারকম রঙিন কণিকাও থাকে শেওলায়। সমুদ্রের শেওলায় লালচে বা বাদামী রঙের ছটা থাকে। অন্য রঙিন কণা বেশী মাত্রায় থাকলেও সবুজ রঙটা তখন ঢাকা পড়ে যায়। রঙের হিসেবে শেওলাকে নানাভাগে

ভাগ করা হয়। পুরো সবুজ ছাড়া নীলাভ সবুজ, জলদেটে সবুজ, বাদামী ও লাল রঙের শেওলারও দেখা পাওয়া যায়।

সব শেওলাই জলে, কিংবা জল যেখানে জমে থাকে এমন সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। নদী, নালা, পুকুর আর সমুদ্রে যেমন শেওলার দেখা পাওয়া যায়, তেমনি ভেজা পাথরের গায়ে, পাহাড়ের খাঁজে যেখানে জল জমে আছে তেমন জায়গায়, গাছের ভেজা গুঁড়িতে, এমন কি ভিজে দেয়ালেও শেওলা জন্মায়। শেওলা বাসা বাঁধে। জমাট বরফের উপর আবার উষ্ণ প্রস্রবণেও শেওলাকে বাসা বাঁধতে দেখা যায়। তার মানে সব রকম অবস্থাতেই এরা থাকতে অভ্যস্ত।

ডায়াটমের কথা আগে সমুদ্রের কথায় বলা হয়েছে। সেও একরকম অদ্ভুত শেওলা। চেহারা এদের নানান আকৃতির—গোল, চতুর্ভুজ, ত্রিকোণাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি। রঙ কারোর সবুজ, কারোর বা খয়েরী-সোনালী।

শেওলার বংশবৃদ্ধির সব চাইতে সহজ উপায় হল একটি কোষ ভেঙে দুটি হয়ে যাওয়া।

॥ শেওলা কি কি উপকার করে ॥

জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে শেওলার ব্যবহার হয়। নানা জাতের শেওলা আছে যারা জলকে নির্মল করে তোলে। ইওরোপ, আমেরিকা ও জাপানে নানান ধরনের শিল্পে (প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুতের কারখানা-ইত্যাদিতে) নানারকমের শেওলার ব্যবহার হয়। একরকম সামুদ্রিক শেওলা থেকে পাওয়া যায় আগার-আগার (agar-agar), জীবাণু পরীক্ষার জন্ত ল্যাবরেটরী ও হাসপাতালে এর বহুল প্রচলন; অন্য অনেক কাজেও এটা ব্যবহৃত হয়। সুপ বা জেলী বানাতে, আর কাগজ পালিশ করতেও এ জিনিস লাগে। পশুদের খাদ্য হিসেবে শেওলা শুকিয়ে রাখা হয়।

॥ অপুষ্পক, অ-সবুজ উদ্ভিদ্ ঃ জীবাণু ॥

ভাইরাস-এর কথা বাদ দিলে, আমাদের জানা সব চাইতে ছোট জীব হল জীবাণু (Bacterium, বহুবচনে Bacteria)। জীববিজ্ঞানীদের মতে এদের আবির্ভাব সব চাইতে আগে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম এদের দেহ—এক একটা কোষ, এক একটা উদ্ভিদ্। সেই একটি কোষের মধ্যে ধরা আছে খানিকটা প্রোটোপ্লাজম যাকে ঘিরে একটি পাতলা আবরণ থাকে আর তার উপর থাকে শক্ত কোষ-প্রাচীর।

রবার তৈরির জন্ত হিভিয়া গাছের রস বার করা হচ্ছে

অন্যান্য উদ্ভিদের মতো এদের সবুজ কণিকা বা ক্লোরোফিল (Chlorophyll) নেই, তাই এদের বাঁচার জন্ত নির্ভর করতে হয় অন্যের তৈরী খাদ্যবস্তুর উপর। যখন এরা নির্ভর করে পচা গলা খাবারের উপর তখন

তাদের বলে গলিতজীবী (Saprophyte), আর যখন নির্ভর করে জীবন্ত উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর উপর তাদের তখন বলে পরজীবী (Parasite).

॥ আকৃতি-অনুযায়ী জীবাণুদের ভাগ ॥

আকৃতি-অনুযায়ী তিন ভাগে জীবাণুদের ভাগ করা হয়েছে। ছোট বলের মতো আকৃতি যে সব জীবাণুর তাদের বলে ককাস (Coccus), লম্বা লাঠির মতো আকার হলে তাদের বলে ব্যাসিলাস (Bacillus), আর বাঁকানো বা প্যাঁচানো আকৃতি হলে বলে স্পাইরিলাম (Spirillum). জীবাণুদের অনেকেই গতি-সম্পন্ন এবং এজন্য তাদের এক বা একাধিক সরু চুলের মতো অঙ্গ থাকে যাকে বলে ফ্লাজেলা (Flagella).

॥ জীবাণুদের বংশবিস্তার ॥

বংশবিস্তারের ব্যাপারটা জীবাণুদের বেলায় বেশ সোজা। কোষবিভাগের দ্বারাই চলে বংশবৃদ্ধি ; একটি কোষ ভেঙে হয় দুটি এবং সেই একই ধারায় চলতে থাকে কোষবিভাগ।

॥ জীবাণুদের বাঁচবার চেষ্টা ॥

প্রতিকূল অবস্থার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে জীবাণুরা তাদের আকৃতির পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। কঠিন আবরণের মধ্যে কোষের যাবতীয় পদার্থকে একটি রেণুতে (spore) পরিণত করতে এদের কোনই অসুবিধে নেই। এই রেণুর বেঁচে থাকার ক্ষমতা আরও বেশী। খুব বেশী শীত বা গ্রীষ্ম এর কোন ক্ষতি করতে পারে না। বছরের পর বছর এই রেণু ঘুমন্ত অবস্থায় কাটিয়ে দেয়, বা হাওয়ায় ভর করে চলে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে। তারপর যখন পায় অনুকূল পরিবেশ তখন জেগে উঠে শুরু করে নতুন তৎপরতা। আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, বেশির ভাগ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর রেণুতে পরিণত হবার ক্ষমতা নেই।

॥ জীবাণুরা কি কি উপকার করে ॥

সব জীবাণুই অপকারী নয়। জীবাণুরা কি কি উপকার করে এবার তার হিসেব নেওয়া যাক। মস্ত বড় যে উপকার জীবাণুরা করে তা হল মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌কে গলিয়ে পচিয়ে উদ্ভিদের খাদ্য করে তোলা। গাছের গোড়ায় যে সার দেওয়া হয় জীবাণুরাই তা গাছের খাদ্যের আকারে তৈরি করে দেয়।

দুধ থেকে দই তৈরির ব্যাপারটা জীবাণুর তৎপরতায় ঘটে। মাখন ও চীজ তৈরির জন্য দায়ী কয়েক প্রকার জীবাণু। চীজের সুন্দর গন্ধ জীবাণুই এনে দেয়। ভিনিগার তৈরী হয় আর এক ধরনের জীবাণুর দ্বারা। পাট গাছ পচিয়ে আঁশ আলাদা করে দেয় জীবাণুরা। তাছাড়া চামড়া, চা, তামাক প্রভৃতি শিল্পে জীবাণুর প্রয়োজন। মটরজাতীয় গাছের শিকড়ে এক অদ্ভুত ধরনের জীবাণু বাসা বাঁধে। এরা বাতাস থেকে মূল্যবান্ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে সবুজ গাছপালাদের তা পৌঁছে দেয়।
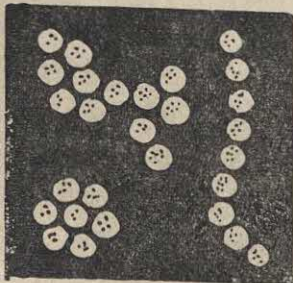
ককাস
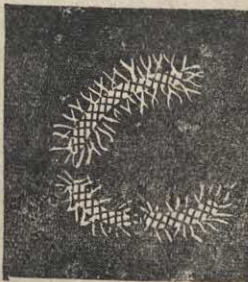
স্পাইরিলাম

ব্যাসিলাস
(মাথায় ফ্লাজেলা)

॥ অপুষ্পক, অ-সবুজ উদ্ভিদ্‌ ঃ ছত্রাক ॥

উদ্ভিদ্‌-জগতে সমস্ত অ-সবুজ গাছপালার স্থান ছত্রাক বা 'ফানজাই' (Fungi, একবচনে fungus) শ্রেণীতে। যে জীবাণুদের কথা এতক্ষণ বলা হল, তারাও এই শ্রেণীভুক্ত।

একদিকে ছোট এককোষী ছত্রাক যাদের খালি চোখে দেখা যায় না, অন্যদিকে মোটামুটি বড় চেহারার সব ছত্রাক বড় গাছের ডালে বা গুঁড়িতে বাস করে, অনায়াসে তাদের দেখা যায়। একদিকে ঈস্ট এবং পেনিসিলিন তৈরী হয় তেমন উপকারী ছত্রাক, অন্য দিকে শস্যের প্রভূত ক্ষতি করে এমন ছত্রাকেরও অভাব নেই। চলতি কথায় ছত্রাককে বলা হয় 'ছাতা'। ভিজে হাওয়া লাগলে পাঁউরুটিতে ছাতা গজিয়ে ওঠে, এ সেই 'ছাতা'।

এককোষীদের বাদ দিলে ছত্রাকের চেহারা এক রকমের খুব সরু সুতোর মতো অতি সূক্ষ্ম জিনিস দিয়ে গড়ে ওঠে, তাকে বলে মাইসেলিয়াম (Mycelium). এর রং সাদা বা বাদামী ধরনের। মাইসেলিয়ামের মধ্যে একরকম রঞ্জক কণা থাকে। সেগুলো থাকার ফলে ছত্রাক নানা রঙে রঙীন হতেও পারে।

ছত্রাকের আক্রমণ এড়িয়ে চলা অসম্ভব। রুটি-মাখন বাসি হলে বা ফল বেশী দিন ফেলে রাখলে দেখা যাবে তাদের গায়ে নানান রঙের ছোপ ছোপ দাগ, এগুলো সবই ছত্রাক।

॥ উপকারী ছত্রাক ॥

উপকারী আর অপকারী, দু ধরনের ছত্রাকই আমাদের সর্বদা ঘিরে রেখেছে। রুটি-বিস্কুটের কারখানায় ঈস্ট (Yeast) নামের ছত্রাক অতি প্রয়োজনীয়। ঈস্টের প্রয়োজন মদ তৈরির কারখানাতেও। শর্করাকে অ্যালকোহল (alcohol) ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ঈস্টের আছে। রুটি-বিস্কুট ফোলাবার ও ফাঁপাবার জন্যেই বেকারীতে ঈস্টের চাহিদা।

ঈস্ট খেজুর রসকে মদ বা তাড়িতে পরিণত করে। ঈস্ট থেকে ভিটামিন বি$_2$ (B_2) বা রিবোফ্লাভিন পাওয়া যায়। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে এটি একটি মূল্যবান্‌ ভিটামিন।

এক ধরনের ছত্রাক থেকে আজকের দিনের 'বিস্ময়কর ওষুধ' পেনিসিলিন পাওয়া গেছে। এই ছত্রাকের নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটাম (Penicillium notatum).

মাইসেলিয়াম (Mycelium)
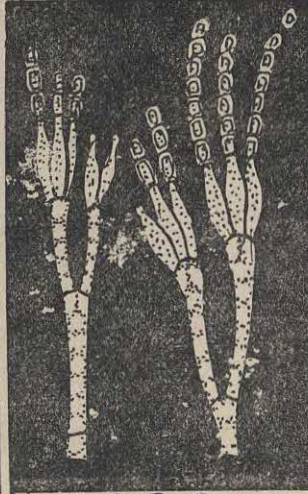
পেনিসিলিয়াম (Penicillium)
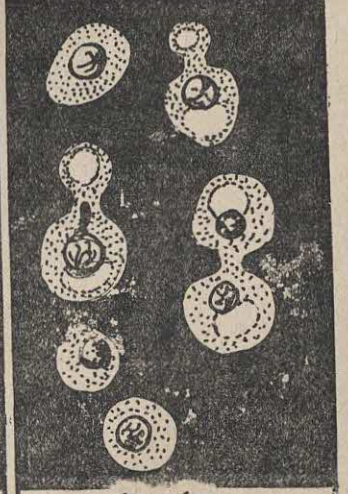
ঈস্ট (Yeast)

বহু রকমের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো এর আবিষ্কারও হঠাৎ হয়েছে। ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং নামে এক জীবাণু-বিশেষজ্ঞ কিছু জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে এল এক ধরনের ছত্রাক জীবাণুদের বাড়তে দিচ্ছে না। পরীক্ষায় দেখা গেল সে-ছত্রাক লেবুজাতীয় ফলের গায়ে জন্মায়। এই থেকে আবিষ্কৃত হল পেনিসিলিন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিন বিজ্ঞানী ফ্লেমিং, ফ্লোরী ও চেন নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে একত্রে সম্মান লাভ করেন।

'পেনিসিলিন' আবিষ্কার নতুন ভাবে উৎসাহিত করল অন্যান্য বিজ্ঞানীদের। সন্ধান চললো আরও কি বিস্ময় এসব ক্ষুদে উদ্ভিদ্‌রা সঞ্চিত রেখেছে। আবিষ্কৃত হল—স্ট্রেপটোমাইসিন, যক্ষ্মার ওষুধ। ক্রমে আরও সব নানান জীবাণু আর ছত্রাক খুঁজে বের করা হল, তৈরি হল আরও সব ওষুধ। এই রকম অনেক ওষুধই, যেমন অরিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন, টেরামাইসিন প্রভৃতি এখন আমাদের চেনা, হালে আরও নতুন ওষুধ বের হয়েছে, যেমন এরিথ্রোমাইসিন ও টেটরাসাইক্লিন। এরকম আরও হয়তো আছে, তাই বিজ্ঞানীরা নানাভাবে সে-সবের খোঁজ করছেন।

এইসব অদ্ভুত উপকারী ছত্রাকের পাশাপাশি রয়েছে প্রভূত ক্ষতিকারক সব ছত্রাক যারা আমাদের খাদ্যশস্য নষ্ট করে।

॥ বিপজ্জনক ছত্রাক ॥

গত শতাব্দীতে আয়ারল্যাণ্ডে সমস্ত আলুর ফসল বিপজ্জনক এক ছত্রাকের আক্রমণে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং দেশে দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ। আমাদের প্রয়োজনীয় ফসলের যে নানারকম রোগ হয় তার বেশির ভাগই হয় ছত্রাকের আক্রমণে।

ব্যাঙের ছাতা (mushroom) বোধ হয় আমাদের সব চাইতে চেনা ছত্রাক। মরা গাছের গোড়ায়, পচা জিনিস-জমানো মাঠের কিনারায়, জঙ্গলের এখানে সেখানে হামেশাই ব্যাঙের ছাতা দেখা যায়। ইওরোপ, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি দেশে রীতিমতো চাষ করে
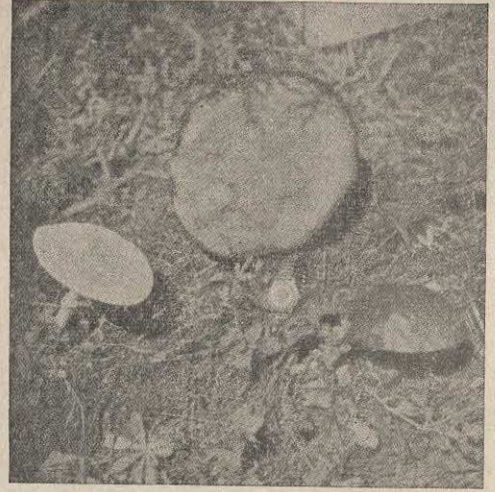
ব্যাঙের ছাতা

ব্যাঙের ছাতা খাদ্য হিসাবে বাজারে বিক্রি হয়। কিন্তু সব ব্যাঙের ছাতাই খাওয়ার উপযোগী তো নয়ই বরং অনেক ব্যাঙের ছাতাই বেশ বিষাক্ত, খেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বড় গাছের গুঁড়িতে বা ডালে দেখা যায় ব্র্যাকেটের আকারে বড় বড় ছত্রাক। এইসব ছত্রাক কাঠ নষ্ট করে ফেলে। দীর্ঘ দিন গাছের গায়ে আটকে থেকে, গাছের ভিতরে মাইসেলিয়াম ঢুকিয়ে দিয়ে আর বড় গাছের খাবার খেয়ে নিয়ে গাছের ক্ষতি করে। এ রকম ছত্রাক বেশ শক্ত ধরনের, প্রায় কাঠেরই মতো শক্ত। একবার বড় গাছে ঠাঁই করে নিতে পারলে ওখান থেকেই রেণু ছড়িয়ে নতুন ছত্রাকের জন্ম দেয়, আর ছত্রাকের সংখ্যা যখন হয়ে পড়ে অসংখ্য তখন গাছ আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

॥ অপুষ্পক আধা-সবুজ উদ্ভিদ্‌ ঃ লাইকেন ॥

শেওলা আর ছত্রাকের মিলিত অবস্থা হল লাইকেন (Lichen). লাইকেনের দেহ গঠিত হয় ছত্রাকের সূক্ষ্ম তন্তুর সঙ্গে শেওলার সবুজ কোষের সংমিশ্রণে। সবুজ কোষগুলো সারা গা জুড়ে জায়গায় জায়গায় ছড়ানো থাকে। সবুজ ক্লোরোফিল থাকার জন্যে শেওলা অংশটি খাবার তৈরি করে আর তার

থেকে ভাগ পায় অ-সবুজ অংশ। ছত্রাক অংশটি জল সংগ্রহ করে শেওলার সবুজ অংশকে রক্ষা করতে ও তাকে সরস রাখতে সাহায্য করে। একের সাহায্যে অপরে বাঁচে একে বলে মিথো-জীবিতা (Symbiosis).

লাইকেন (Lichen)

॥ লাইকেন কি কি উপকার করে ॥

লাইকেন জন্মায় গাছের গায়ে, পাথরের খাঁজে খাঁজে বা পাথরের উপরে। এসব জায়গায় বড় গাছ জন্মাতে পারে না। লাইকেনকে বলা হয় 'অগ্রগামী উদ্ভিদ্'। লাইকেনই প্রথম এসে অন্য উদ্ভিদের আসার পথ তৈরি করে রাখে। প্রাকৃতিক কারণে যখন পাথর গুঁড়িয়ে ভেঙে পড়ে তখন সেখানে একের পর এক লাইকেনের দেহাবশেষ জমা হতে থাকে। তার ফলে মাটি উর্বরা হয়। সেই উর্বরা মাটিতে অন্য গাছের ভালভাবে বেড়ে ওঠার সুবিধা হয়।

সাইবেরিয়ার বরফ-ঢাকা তুন্দ্রা অঞ্চলের বল্গা হরিণের খাদ্য একমাত্র লাইকেন।

॥ আরও অপুষ্পক ও সবুজ গাছপালা ॥

একদিকে থ্যালোফাইটা শ্রেণীর ছোট ছোট সরল গাছপালা, অন্যদিকে বীজ থেকে উৎপন্ন ফুল ফল ধরে এমন সব গাছপালা। আর এই দুয়ের মাঝে

গাছের গুঁড়িতে ছত্রাক
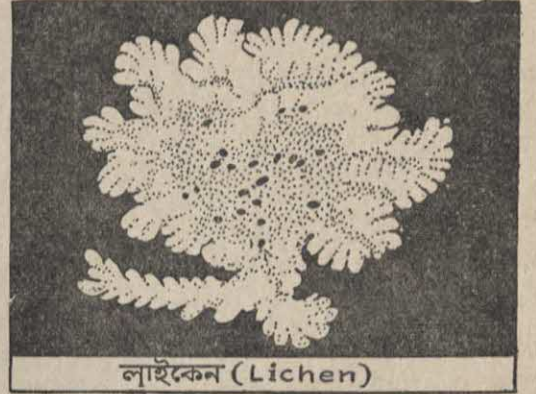
'ব্রায়োফাইটা' (Bryophyta) ও 'টেরিডোফাইটা' (Pteridophyta). এদের চেহারা আর তেমন সহজ সরল নয়। ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা উভয়ই অপুষ্পক গাছপালা, কিন্তু এদের বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি উন্নত ধরনের।

পৃথিবীতে এমন একটা অবস্থা ছিল যখন সর্বত্র জোলো, সেঁতসেঁতে বনভূমি, মাঠ, জঙ্গল সবই ঢাকা ছিল এই ধরনের গাছপালায়। এখনকার দিনে এই সব গাছপালার যে-সব বংশধর দেখা যায় তাদের চেহারা তেমন বড়সড় নয়, তাও মাত্র কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গাতে এদের দেখা যায়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর আগে এরাই ছিল সংখ্যায় বেশী তো বটেই, আকারেও অনেক বড়।

এখনকার বড় বড় গাছপালার মতোই ছিল তাদের আকৃতি। এদের গুরুত্ব পুরোনো দিনের গাছপালার বংশধর বলে ততটা নয়। এদের গুরুত্ব, এই জন্য যে, পৃথিবীর সেই 'কার্বনিফেরাস' যুগের এসব প্রাচীন গাছপালাই কয়লা হয়ে গিয়ে সেই সুদূর অতীতের সৌরশক্তি সঞ্চয় করে রেখে গেছে। সেই সৌরশক্তিই আমরা ব্যবহার করছি কলে কারখানায়, আর উন্নত করছি নিজেদের অবস্থা। যখনই কয়লা আর তেল পোড়াচ্ছি তখনই সেই সৌরশক্তি ব্যবহার করছি। এদের গুরুত্ব অন্য আর এক কারণে, এদের জীবনপ্রণালী লক্ষ্য করেই আমরা আন্দাজ করতে পারি পরে 'বীজজ' শ্রেণীর

গাছ বা স্পারমাটোফাইটা (Spermatophyta) ধীরে ধীরে কেমন করে এই পৃথিবীতে এল।

॥ ব্রায়োফাইটা ॥

মস (Moss) বা শেওলা এবং মসজাতীয় গাছপালারা ব্রায়োফাইটা শ্রেণীভুক্ত। বনভূমি যে ভেলভেটের মতো নরম আর ছোট ছোট গাছে ঢাকা থাকে, মস হল সেই সব গাছ। আরও অনেক রকম গাছই এই শ্রেণীতে আছে। ব্রায়োফাইটা যেমন পাওয়া যায় পার্বত্য অঞ্চলে তেমনি মরুভূমির বুকেও। এরাই সম্ভবতঃ প্রথম উদ্ভিদ্ যারা মাটির উপর বাস করতে এসেছে জল ছেড়ে (অবশ্য পুরোপুরি জলে বাস করে এমন মস্‌-ও এ দলে আছে)। আকৃতি কারোরই বড় নয়। এদের শিকড় বলতে কিছু নেই, তবু শিকড়ের মতো একটা জিনিস আছে। তাই দিয়ে কোনক্রমে জল টেনে পাতায় পৌঁছায়। খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে এসব গাছ জন্মায় বলে স্পঞ্জের মতো জল ধরে রাখার একটা সুবিধা এদের অনেকেরই আছে।

মসজাতীয় গাছপালার এখনকার অবস্থা দেখে বোঝা যায় না যে এককালে এরাই পৃথিবীকে প্রাণিদেহ ধারণের উপযোগী করে তুলেছে। প্রাচীন উদ্ভিদেরা ভূপৃষ্ঠ ছেয়ে রেখেছে আর মস-জাতীয়রা গাছপালার আগমন সম্ভব করেছে। এরা নিজেদের দেহের মধ্যে খাদ্যভাণ্ডার সঞ্চিত রেখে গেছে।

॥ টেরিডোফাইটা ॥

লক্ষ লক্ষ বছর আগে সারা পৃথিবীময় ছিল টেরিডোফাইটার আধিপত্য ; বনজঙ্গল ছেয়ে রাখত

উত্তর আমেরিকার একজাতীয় ফার্ন
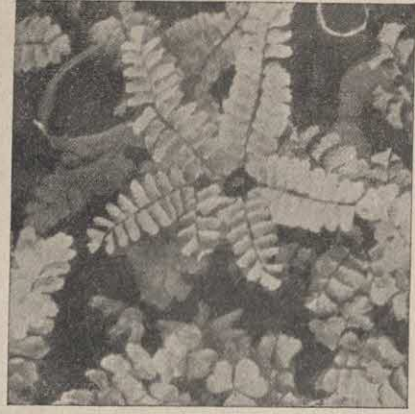
মেড্‌ন্‌হেয়ার ফার্ন (the maidenhair fern)

এরাই ; আর বিশাল বিশাল আকৃতি তখন তাদের, এখনকার বড় গাছপালাদের মতোই। ট্রী ফার্ন (tree fern) আজও দেখা যায় এখানে ওখানে, তাদের মাপ উচ্চতায় এখন ১০-১৫ ফুটের বেশী নয়, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর আগে এদের উচ্চতা হতো ৩০।৪০ ফুট।

কয়লা ও তেল অপর্যাপ্তভাবে সঞ্চিত রেখে গেছে সেদিনকার টেরিডোফাইটা শ্রেণীর গাছেরা অর্থাৎ ফার্ন জাতের গাছেরা। কি পরিমাণ ফার্নজাতের গাছ সেদিন জলাভূমি আর বনকে ঢেকে রেখেছিল তার একটা আন্দাজ হবে যদি কি পরিমাণ গাছ থেকে, কি পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায় তার হিসেব মেলে। হিসেবে দেখা গেছে, ৩০ ফুট চাপ-বাঁধা উদ্ভিদ্ থেকে কয়লা পাওয়া যায় মাত্র ২০ ফুট আয়তনের। সেদিনকার বিরাটাকার টেরিডোফাইট-দের দেহাবশেষই আজকের কয়লা।

টেরিডোফাইটার মধ্যে ফার্ন আমাদের বেশ পরিচিত। তার মধ্যে কালীঝাঁপ ফার্ন (Maidenhair Fern) ফুলের তোড়া বাঁধতে ব্যবহৃত হয় বলে সবচাইতে বেশী চেনা। ফার্ন নানা জাতের। এদের নানারকম সুন্দর সুন্দর পাতা হয়, পাতার পিছনে রেণুর (spore) পুঁটলি থাকে। মাটির নীচে এদের কাণ্ড। ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা জায়গা ফার্ন পছন্দ করে। পাতার সৌন্দর্যের জন্যেই এর বেশী ব্যবহার। ফার্নজাতীয় গাছের আরও উপকারিতা আছে। হাওয়াই দ্বীপে ট্রী-ফার্নের সিল্কজাতীয় আঁশ ব্যবহার হয় গদি ও তোশক তৈরির

জন্য। কয়েক প্রকার কাণ্ড খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় নিউজিল্যাণ্ডে। কয়েক ধরনের কাণ্ড থেকে ওষুধ পাওয়া যায়। পশুদের গা থেকে পোকামাকড় তাড়াতে এই ওষুধ কার্যকর। ট্রী-ফার্নের পাতা দিয়ে কোথাও কোথাও ঘর ছাওয়া হয়। লাইকেন আর ব্রায়োফাইটার মতো অন্য গাছের জন্যে মাটি তৈরি করাও টেরিডোফাইটাদের কাজ।

এতক্ষণ যে ধরনের গাছপালার আলোচনা করা হল সে-সবের মধ্যে টেরিডোফাইটা শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌ই সব চাইতে বেশী উন্নত কিন্তু তা হলেও এর ফুল ফোটে না, ফল ধরে না, তাই বীজও হয় না।

॥ সপুষ্পক গাছপালা ॥

আজকের পৃথিবীতে যে গাছপালার সমারোহ, যে-সব গাছপালা আমাদের ঘিরে রেখেছে আর সব সময়ে যাদের চোখে পড়ে, তারা বেশির ভাগই উন্নত শ্রেণীর গাছপালা।

এইসব উন্নত গাছপালাদের আমরা উল্লেখ করি 'বীজজ' বা 'স্পারমাটোফাইটা' (Spermatophyta) বলে। এদের ফুল ও ফল হয়। বীজজ (অর্থাৎ বীজ থেকে জন্মায় এমন) গাছপালার ডাল, পাতা, শিকড় প্রভৃতি এক এক অংশ এক এক ধরনের কাজ করে। শিকড়, কাণ্ড, পাতা দিয়ে গাছের প্রতিদিনের জীবনধারণের কাজ চলে, অন্যদিকে ফুল

লেডি ফার্ন (the lady fern)

জিম্‌নোস্পারম্‌ অ্যান্‌জিওস্পারম্‌

বংশধারা বয়ে নিয়ে যাবার দুরূহ কাজে অর্থাৎ ফল ও বীজ তৈরির কাজে ব্যস্ত।

॥ জিমনোস্পারম্‌ ॥

স্পারমাটোফাইটার মধ্যে দুটি ভাগ। একদিকে "জিমনোস্পারম্‌" (gymnosperm) বা অনাবৃত বীজ-যুক্ত গাছ, যেমন বিলিতি ঝাউ। জিমনোস্পারম্‌ অনেক প্রাচীন বীজজ গাছ কিন্তু এদের বীজ ফলের মধ্যে থাকে না, বীজগুলো বাইরে থাকে। এগুলো বাদে আর যে-সব সপুষ্পক গাছপালা (অর্থাৎ যাদের ফুল ফোটে) তাদের বলা হয় অ্যানজিওস্পারম্‌ (angiosperm), অর্থাৎ আবৃত-বীজ গাছ।

পৃথিবীতে একটা সময় গেছে, যখন নানাজাতের জিমনোস্পারমে পৃথিবী পূর্ণ ছিল, কিন্তু আজ তাদের অনেকগুলোই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জিমনোস্পারম্‌ শ্রেণীর অনেক গাছের রস শুকোলে ধুনো হয়। পাইনজাতীয় গাছ বলতেও এদেরই বোঝায়।

ফুল এদের ক্ষেত্রে খুব সাদাসিধে। আমাদের চেনা বা দেখা ফুলের মতো চেহারাও এদের নয়, তবুও তা ফুল-ই।

জিমনোস্পারমের মধ্যে "জীবন্ত ফসিল" (living fossil) নামে পরিচিত একটি গাছ আছে। এই গাছ একটি দলের একমাত্র জীবন্ত প্রতিনিধি। এই জাতীয় সব গাছই অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। গাছটির

নাম জিংকো বাইলোবা (ginkgo biloba). কনান ডয়েলের 'লস্ট ওয়ার্লড্' বইয়ে এই জিংকো গাছের কথা আছে।

চীনদেশের এক গভীর অরণ্যে একদা কয়েকজন ভিক্ষু এই গাছের আকৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে এই গাছটিকে তুলে নিয়ে আসেন ও তাঁদের মন্দির-প্রাঙ্গণে রোপণ করেন। কিন্তু তাঁরা সেদিন জানতেও পারেন নি যে একটি প্রাচীন ও সুদুর্লভ গাছ তাঁরা নিয়ে এসেছেন। ক্রমে ক্রমে গাছটি চীন-জাপানেই বেশী ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও গাছটি দেখতে পাওয়া যায়। দার্জিলিং-এর বোটানিক্যাল গার্ডেনে এই গাছের দেখা মিলবে।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অনেকখানি অংশই আজও জিমনোস্পার্ম্ জাতীয় গাছে ভরা। তাদের মধ্যে পাইন (সরল বা চীড়), জুনিপার, অ্যাবিস, থুজা, ক্রিপটোমেরিয়া ইত্যাদির নাম করা যায়। গাছগুলো প্রায়ই বেশ বড় আকারের, লম্বা আর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। পাতাগুলো প্রায়ই সরু সরু লম্বা সূচের মতো কিংবা পাতলা আঁশের মতো।

পাইনজাতীয় গাছ

জুনিপার গাছ, তার শাখা, দু-ধরনের পাতা ও ফল

গাছ-অনুযায়ী ছোট কিংবা বড়, শক্তমতো এক-ধরনের ফল এসব গাছে হয় যাকে বলে 'কোন্' (cone), আর যেসব গাছে কোন্ হয় তাকে বলে 'কনিফার' (conifer). পাইন-এর কোন্ দেখতে যেন কাঠের তৈরী আনারসটি। বিভিন্ন কোনের পাতার উপরই সাজানো থাকে ডিম্বক বা ওভিউল (ovule), আর পরাগকোষ বা pollen sac. পরাগ রেণুগুলো হয় অসংখ্য, আর খুব হালকা। হাওয়ায় ভর করে এগুলো বহুদূর চলে যেতে পারে।

আয়ু, উচ্চতা আর বেড়ের জন্য পৃথিবীতে এক-জাতীয় কনিফার গাছ বিখ্যাত। এরা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কালিফোর্নিয়ার রেড উড ট্রী বা সেকোয়া (Redwood Tree, Sequoia). এদের মধ্যে একটির উচ্চতা ৩৬৭·৮ ফুট, বেড় ৪৪ ফুট আর গাছটির বয়স তিন হাজার বছরেরও বেশী।

॥ সব চাইতে উন্নত গাছপালা, সপুষ্পক অ্যানজিওস্পার্ম্ ॥

সব চাইতে উন্নত গাছপালা অ্যানজিওস্পার্ম্ (angiosperm). বংশবৃদ্ধির উপায় হিসেবে এদের ফুল ফোটে, বীজ থাকে ফলের মধ্যে। কত বৈচিত্র্যই না দেখা যায় এই সব গাছপালার ডালপালা, পাতা প্রভৃতিতে।

গাছপালার জগতে বৈচিত্র্য সর্বক্ষেত্রে। গাছের আয়ু হয় নানান রকমের। কোন গাছ কম দিন বাঁচে, আবার কোন কোন গাছ খুব দীর্ঘায়ু হয়। হাজার হাজার বছর বেঁচে আছে এমন গাছও অনেক আছে। ধান, গম, যব এবং অনেক চেনাজানা ফুলগাছ একটা ঋতুতেই জন্মায়, বাড়ে, ফুল ফোটায়, বীজ সৃষ্টি করে আর মরে যায়। এদের বলে বর্ষজীবী (annual) গাছ। সংস্কৃতে এদের বলে ওষধি।

॥ উদ্ভিদের দেহ কি দিয়ে তৈরী ॥

অসংখ্য জীবন্ত কোষ দিয়ে উদ্ভিদের দেহ তৈরী। একটি কোষ যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখা হয়, তাহলে দেখা যাবে তার চারপাশটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, এর নাম কোষপ্রাচীর বা cell wall. মাঝখানটা প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (protoplasm) বলে একটা ঘন আঠাল জিনিসে ভরতি। তার দুই অংশ। মাঝখানে ঘন গোল চেহারার বা ডিমের মতো দেখতে একটা জিনিস, তার নাম নিউক্লিয়াস (nucleus), আর কোষ-

গাছের কোষে কি কি থাকে

ভরতি যে জলীয় আঠার মতো জিনিস তার নাম সাইটোপ্লাজ্‌ম্ (cytoplasm). কোষের কাজ চালায় নিউক্লিয়াস, আর কাজগুলি করে সাইটোপ্লাজ্‌ম্।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে জট-পাকানো দড়ির মতো বা ধুলোর সারির মতো একটা জিনিস চোখে পড়বে, এর নাম ক্রোমোজোম (chromosome) ; নতুন কোষ সৃষ্টির আগে এদের জট খুলে দুভাগে এরা দুধারে চলে যায়। এদের ভিতর একরকম সূক্ষ্মকণা থাকে, তাদের বলে জীন (gene). এরাই বংশপরম্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে চালান করে দেয়। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আবার থাকে এক বা একাধিক নিউক্লিয়োলাস্ (nucleolus, বহুবচনে nucleoli).

কোষ বিশেষে আরও থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন্ত কণিকা। এদের নাম প্লাসটিড (plastid). এরা বর্ণহীন বা বর্ণযুক্ত দুইই হতে পারে। যখন বর্ণহীন, তখন এই কণিকাদের নাম লিউকোপ্লাস্ট (leucoplast). যখন কণিকাগুলো সবুজ রঙের হয় তখন তাদের বলে ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast). এদের সবুজ রঙ হয় ক্লোরোফিল (chlorophyll) বা পত্রহরিৎ বলে

রেড উড ট্রী, তার শাখা ও ফল

একটা জিনিসের জন্য। এই পত্রহরিৎই হাওয়া থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ধরে এনে গাছের খাবার বানায়। অন্যান্য রঙ ফুলেই বেশী দেখতে পাওয়া যায়, যেমন লাল, হলদে, কমলা প্রভৃতি। তাদের বলে 'ক্রোমোপ্লাস্ট' (chromoplast).

এ ছাড়া, সাইটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে থাকে মাইটোকণ্ড্রিয়া (mitochondria), রাইবোজোম (ribosome) এবং গল্‌গি-বডিজ (golgi-bodies) বলে কতকগুলি সূক্ষ্ম জিনিস। তাদের চেহারাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের, কাজও আলাদা আলাদা।

কোষ যখন বেশ বড়সড় হয়ে ওঠে তখন কোষের মধ্যে কতকগুলো গহ্বরের সৃষ্টি হয়। সে গহ্বরগুলো জলভরা থাকে, নানারকম খনিজ লবণও এতে থাকে। আর এতে খাদ্যবস্তু মজুদ থাকে। এদের বলে ভ্যাকুয়োল (vacuole).

একটিমাত্র কোষ থেকেই উদ্ভিদ্ তার জীবনযাত্রা শুরু করে। উদ্ভিদ্ যখন বড় হতে আরম্ভ করে, তখন একটি কোষ ভাগ হয়ে হয় দুটি। তারপর তা থেকে আবার ভাগ হয়ে হয় চারটি—এমনি ভাবে অসংখ্য কোষ মিলে গড়ে ওঠে একটি গোটা উদ্ভিদ্।

॥ শিকড় ॥

গাছের বড় শিকড় অজস্র ছোট শিকড়ের জাল ছড়িয়ে ও তলায় অনেকখানি নেমে গিয়ে মাটির
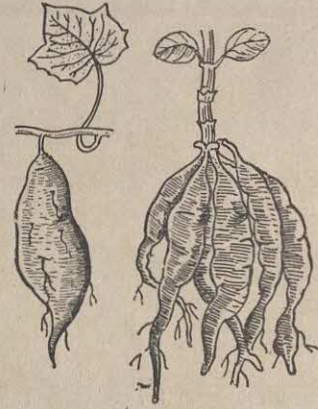
মুলো গাজর শালগম

মিষ্টি মূল শতমূলী

উপর গাছকে খাড়া করে রাখে, আর মাটির সঙ্গে আটকেও রাখে। মাটি থেকে গাছের জন্য খাদ্য রসও তারাই সংগ্রহ করে। শিকড়ের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ; আর নানান ধরনের কাজের দায়িত্ব শিকড়ের উপর।

গাছের তৈরী খাবার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে শিকড়ের মধ্যে। তখন অবশ্য শিকড় বলে তা চিনতে অসুবিধে হয়, কেন না শিকড়ের চেনা চেহারাটা তখন আর দেখা যায় না, তার একটা অন্য রকম আকার হয়ে যায়। মুলো, গাজর, শালগম, মিষ্টি মূল, শতমূলী এগুলো শিকড়ের একটা পরিবর্তিত রূপ, খাদ্য সঞ্চয় করে এরা মোটা হয়।

মাটির নীচে পরিবর্তিত রূপের শিকড় ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তিত শিকড় মাটির উপরেও দেখা যায়। এ শিকড়গুলো বেরোয় উদ্ভিদের নানা অঙ্গ থেকে; যেমন পাতা, কাণ্ড ইত্যাদি। কেয়া গাছের তলার দিকে যে বাঁকা শিকড়, বট-অশ্বত্থের যে ঝুরি, রাঙাআলু, পান গাছের কাণ্ড থেকে বেয়ে ওঠবার যে শিকড়, কিংবা অর্কিডের বায়বীয় শিকড়, এ সবই শিকড়, কিন্তু মাটির ওপরে বেরোয় বলে এগুলো অস্থানিক মূল (adventitious root) নামে পরিচিত।

সুন্দরবন অঞ্চলে লবণাক্ত জলা জায়গায় দেখা যায় যে অনেক আগা-সরু খুঁটি জলের ওপর মাথা তুলে রয়েছে। সেগুলি সুঁদরি আর গরান গাছের শেকড় থেকে বেরিয়ে-আসা অস্থানিক মূল। এদের (breathing roots) শ্বাস নেবার শিকড় বলে।
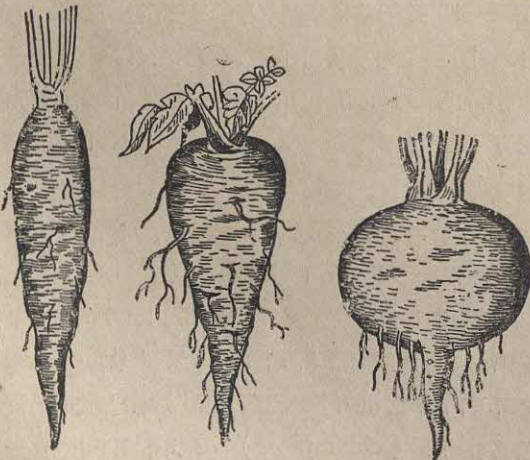
নানা রকমের পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ

গাছপালার কথাঃ

[নানা রকমের পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ]

সাধারণতঃ দেখা যায়, জীবজন্তু কীটপতঙ্গ গাছপালা খেয়ে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন সব গাছও আছে যারা কীটপতঙ্গ খেয়ে থাকে। কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগে। কিন্তু জলে ও ডাঙ্গায় এমন বহু অদ্ভুত গাছ আছে যারা নিয়মিত পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের বলা হয় পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ।

(১) ছবিতে একটা বিচিত্র গাছের ফুল দেখা যাচ্ছে। এ-রকম ফুল সচরাচর দেখা যায় না। এই ফুলের মধ্যে এক রকম মধু বা আঠাল রস থাকে। কোন পতঙ্গ সেই ফুলের মধ্যে গেলে সেই আঠাল রসে তার পা আটকে যায়।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পতঙ্গ মধু খেতে গিয়ে মধুর আঠায় আটকে গেছে। এইভাবে পতঙ্গ মধুতে আটকে যায়, আর পালাতে পারে না। গাছ পতঙ্গের রস চুষে খায়।

(২) ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এক ধরনের বিচিত্র গাছের গায়ের আঠাল রসে একটা পতঙ্গ আটকে গেছে। এইভাবে পতঙ্গের পা ও পাখনা গাছের আঠাল রসে আটকে যায়। তখন গাছ তার রস চুষে খায়। এইভাবে পতঙ্গের মৃত্যু হয়।

(৩) মালয়েশিয়া এশিয়ার অন্তর্গত একটি দেশ। এর বনেজঙ্গলে নানা বিচিত্র ধরনের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। ছবিতে যে গাছটিকে দেখা যাচ্ছে সেটি একটা পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ। একে বলা হয় রাক্ষুসে কলস উদ্ভিদ। পোকামাকড় এই কলসের মধ্যে ঢুকলে সেখানকার আঠাল রসে পড়ে মরে যায়। গাছ তাকে ধীরে ধীরে হজম করে ফেলে।

কেয়া গাছের অস্থানিক মূল

শিকড়ের সব চাইতে দায়িত্বপূর্ণ কাজ মাটি থেকে রস টেনে কাণ্ড মারফত পাতায় পৌঁছে দেওয়া।

শিকড় দিয়ে টানা রস কিভাবে লম্বা লম্বা গাছের ডগায় পৌঁছে যায় সেটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা মনে করেন অনেকগুলো মিলিত প্রক্রিয়া এর জন্য দায়ী।

॥ শিকড়ের ভিতরকার চেহারা ॥

শিকড়ের ভিতরকার চেহারা কি রকমের তা দেখতে গেলে খুব পাতলা করে আড়াআড়িভাবে শিকড়ের একটা পাত কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় এনে দেখতে হবে। যার বীজ বা আঁটির মধ্যের অংশ দু'ভাগে থাকে (যেমন আম, ছোলা), তেমন গাছকে

বটগাছের ঝুরি
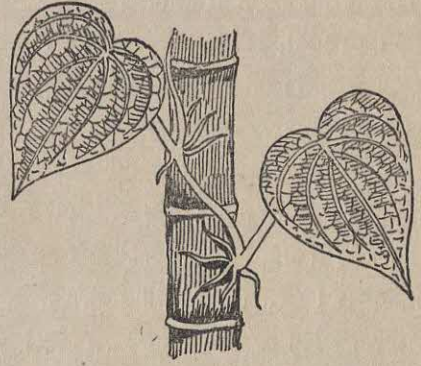
পান লতার অস্থানিক মূল

বলে দ্বিবীজ-পত্রী। একটা দ্বিবীজ-পত্রী গাছের শিকড়ে দেখা যাবে, একেবারে বাইরের দিকে একসারি ইটের মতো কোষ, যার নাম এপিব্লেমা। তার মাঝে মাঝে এককোষী মূলরোমের দেখা পাওয়া যাবে। এর তলায় ফাঁক ফাঁক কয়েক সারি কোষ, গোল গোল চেহারার, তাদের একত্র নাম কর্টেক্স (cortex). এই কর্টেক্সে জমা থাকে শিকড়ের যাবতীয় খাদ্য।

কর্টেক্স-এর শেষে এনডোডারমিস (endodermis) ও পেরিসাইকল্ (pericycle). শিকড়ের মধ্যাংশে বড় বড় শক্ত চেহারার কোষগুলোর একসঙ্গে নাম জাইলেম (xylem). জাইলেমের মধ্যেকার নল বেয়েই রস উঠে যায় উপরে। জাইলেমের সঙ্গের ছোট ছোট কোষ, শিকড়কে শক্ত হতে সাহায্য করে। জাইলেমকে ঘিরে আছে যে লম্বা লম্বা চেহারার কোষগুলো সেগুলোর একসঙ্গে নাম ক্যামবিয়াম (cambium), আর ক্যামবিয়ামের পরে, পেরিসাইকলের দিকে থাকে ফ্লোয়েম (phlcem) বলে একটা অংশ।

ফ্লোয়েমের কাজ হল পাতায় তৈরী খাবার নীচের দিকে নামিয়ে আনা। ক্যামবিয়াম অনবরত নতুন কোষ তৈরি করে চলে—ভিতর দিকে জাইলেমের, আর বাইরের দিকে ফ্লোয়েমের কোষ। একটা বুড়ো গাছের শিকড়ে অনেকগুলো জাইলেম

শ্বাস নেবার শিকড়

ও ফ্লোয়েমের স্তর দেখা যাবে; বছর বছর ক্যামবিয়াম এগুলো তৈরি করে, আর শিকড়কে মোটা করে তোলে।

॥ গাছের কাণ্ড ॥

কাণ্ড শিকড় আর পাতার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। শিকড় দিয়ে টানা রস কাণ্ড-মারফত এসে পৌঁছয় পাতায়। আবার পাতায় তৈরী খাবার কাণ্ড-মারফত নেমে আসে ডালপালায় ও শিকড়ে। কাণ্ডর

ফুল, ফল, শাখা, কাণ্ড, প্রধান মূল, শাখামূল
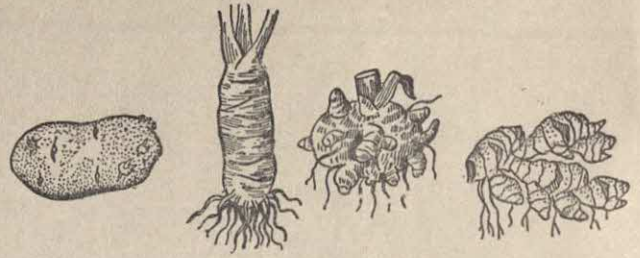
আলু মানকচু ওল আদা

কাজ হচ্ছে প্রতিটি পাতা যাতে পর্যাপ্ত রোদ পেতে পারে, সেভাবে তাদের সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে রাখা এবং যে ফুল থেকে ফল হবে, তাকেও সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা। খাদ্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য কাণ্ডের আকার বদলে যায়, আর তা তখন আশ্রয় নেয় মাটির তলায়। তাকে বলে কন্দ। আদা, আলু, পেঁয়াজ, ওল, মানকচু প্রভৃতি সেই রকমের কন্দ। এদের গায়ে অনেক কুঁড়ি থাকে যা থেকে নতুন গাছ জন্মাতে পারে। এইভাবে গাছ জন্মানোকে বলে অঙ্গজ জনন (vegetative multiplication).

কাণ্ডতে আরও বিভিন্ন রকমের রূপান্তর ঘটে, বিশেষ ধরনের কাজের জন্য ও নানারকমের সুবিধার জন্য এরকম হয়। যেমন বেল গাছের কাঁটা কাণ্ডরই রূপান্তরিত চেহারা। আত্মরক্ষার জন্য কোন কোন লতা যে আঁকড়ি বেয়ে অবলম্বন জড়িয়ে ধরে তাও কাণ্ড। অবশ্য সব আঁকড়িই (tendril) কাণ্ড নয়। ফণিমনসার মোটা মোটা পাতার মতো চেহারাটা কিন্তু আসলে কাণ্ড, আর পাতাগুলো এখানে রূপান্তরিত হয়েছে কাঁটায়। কাণ্ডর পরিবর্তিত রূপের আরও বহু উদাহরণ আছে।

॥ কাণ্ডের ভিতরকার চেহারা ॥

একটি দ্বিবীজ-পত্রী গাছের কচি ডালে আমরা তিনটি সুনির্দিষ্ট অংশের দেখা পাব। বাইরের "ছালের" অংশ (bark), তার তলায় অবস্থিত "কাঠের" অংশ (wood) থেকে আলাদা। ছাল বলতে এক্ষেত্রে আমরা একেবারে বাইরের অংশকে বলছি না, এটা আরও অনেকগুলো টিস্যুর মিলিত নাম।

কাণ্ডর একেবারে মাঝখানে তৃতীয় অংশের নাম পিথ (pith). বড় বড় গাছে পিথকে আলাদা করে চেনা যায় না ; কেন না খুব অল্প জায়গাই এরা দখল করে, কিংবা কাঠের অংশের সঙ্গে মিশে থাকে।

'ছাল' আর 'কাঠ' এ-দুই অংশের মাঝখানে কোমল ও লম্বা চেহারার কয়েক সারি কোষের তৈরী একটি টিস্যু থাকে, যার নাম ক্যামবিয়াম। কোষ-বিভাগের দ্বারা ক্যামবিয়াম কাণ্ডের আকার বৃদ্ধি করে।

কচি ডাল যে আবরণে ঢাকা থাকে, তাকে বলে এপিডারমিস। এর কাজ আঘাত লাগা থেকে আর অসুখ-বিসুখের হাত থেকে গাছকে রক্ষা করা। পরে এপিডারমিসের স্থান, অধিকার করে কর্ক (cork). এগুলো তৈরী হয় কতকগুলো মৃত কোষ থেকে। সে কোষগুলোর মধ্যে এক ধরনের পদার্থ থাকার দরুন বাইরের জল ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। শিশি-বোতলের ছিপি এই 'কর্ক' থেকেই তৈরী হয়।

কাণ্ড বৃদ্ধি পেয়ে আকৃতিতে বাড়তে থাকার সময় বাইরের কর্কে চাপ দেয় ; আর এ চাপ সহ্য করতে না পারার দরুন এই কর্ক জায়গায় জায়গায় ফেটে যায়। এই ফাটল মেরামত করে বুজিয়ে রাখে এক ধরনের কোষ। ক্যামবিয়ামের মতো নতুন কোষ তৈরি করতে পারে বলে, এদের নাম কর্ক ক্যামবিয়াম (cork cambium).

করটেক্সের নীচের দিকে, 'ছাল' অংশের একেবারে শেষ প্রান্তে যে কোষগুলো সেগুলো ফ্লোয়েম। তৈরী খাবার নামিয়ে আনা এদের কাজ। একটা কাণ্ডের বেশির ভাগ অংশই 'কাঠ' বা জাইলেম। প্রাকৃতিক ঋতু পরিবর্তন যে দেশে খুব স্পষ্ট, যেমন আমাদের দেশ, সেখানে ক্যামবিয়াম সারা বছর একই রকম তৎপর থাকে না। এ তৎপরতা ঋতু অনুযায়ী বাড়ে বা কমে। বসন্তকালে গাছে অনেক নতুন নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে। তখন অনেক বেশী কাঁচা মাল পাতায় পৌঁছে দেবার প্রয়োজন হয়। তাই সে সময় ক্যামবিয়ামের
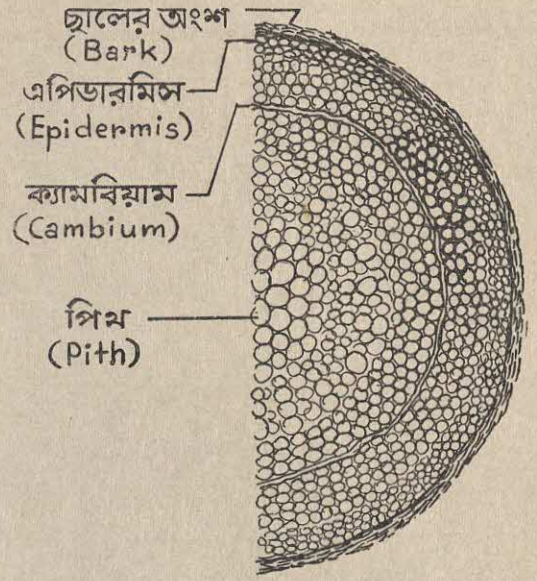
তৎপরতা বেড়ে যায় তার ফলে ক্যামবিয়াম বড় বড় ছেঁদাওয়ালা অনেকগুলো নালিকার সৃষ্টি করে। আর শীতকালে পাতা যখন ঝরতে থাকে, ক্যামবিয়াম সৃষ্টি করে ছোট ও সরু নালিকা। ফলে দু'ধরনের কাঠের সৃষ্টি হয়—বসন্তকালে বসন্তকালীন কাঠ ও শীতকালে শীতকালীন কাঠ।

পাশাপাশি দু'ধরনের কাঠ মিলে এক বছরের তৈরী কাঠের পরিমাপ নির্দেশ করে, যাকে বলা হয় বার্ষিক বলয়রেখা (annual ring). বার্ষিক রেখা গুনে একটা গাছের বয়স মোটামুটি নির্ণয় করা যায়। গাছ কাটার পরই সেটা নির্ণয় করা সম্ভব।

॥ পাতা ॥

উদ্ভিদের পক্ষে তার জীবনধারণের অনেকগুলো দায়িত্বই পাতার উপর থাকে।

পাতার তিনটি অংশ—ফলক, বোঁটা ও গোড়া।

যে-সব পাতায় বৃন্ত বা বোঁটা আছে তাদের বলে সবৃন্তক পাতা, আর যে-সব পাতায় বৃন্ত নেই তাদের বলে অবৃন্তক পাতা। আম, জাম, কাঁটাল, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের পাতা সবৃন্তক। শিয়ালকাঁটা, আকন্দ প্রভৃতি গাছের পাতা অবৃন্তক।

পাতার বিভিন্ন অংশ

পাতার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে খাবার তৈরি করার কাজটাই বোধহয় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি পাতা এক একটি যন্ত্রের মতো অতি কুশলতার সঙ্গে তাদের অভ্যন্তরে এই কাজটা করে চলেছে। শিকড় দিয়ে আসছে খনিজ পদার্থ-মেশানো রস, পাতার ছিদ্রপথে আসছে কার্বন ডাই-অক্সাইড আর সূর্যরশ্মি থেকে শক্তি। এই সবের সাহায্যে পাতা খাবার তৈরি করে। উদ্ভিদ্ ছাড়াও প্রাণি-জগতের প্রতিটি প্রাণী এই খাবারের অংশ গ্রহণ করে।

সবৃন্তক আমপাতা

পাতায় খাদ্য তৈরির জন্য যা সব চাইতে প্রয়োজনীয় তা হল ক্লোরোফিল (chlorophyll) নামের সবুজ কণিকা। একে পত্র-হরিৎও বলা হয়। এরা পাতার সবুজ রঙের জন্য দায়ী ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে।

সাধারণভাবে পাতার রঙ সবুজ। কিন্তু পাতায় সবুজ ছাড়া অন্য রঙও আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাই। শীতের হাওয়ায় যখন গাছপালা পাতা হারিয়ে রিক্ত হতে থাকে, তার আগে পাতায় দেখা দেয় হলদে রঙ, কমলা রঙ। শীতের শেষে বসন্তের সমাগমে নতুন নতুন কচি পাতার একটা সুন্দর হালকা লাল রঙের বাহার দেখা যায় অনেক গাছেই।

আলো, তাপ ও আর্দ্রতার জন্যে পাতার রঙের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

॥ পাতা ঝরে যায় কিভাবে ॥

পাতার বোঁটার গোড়ায় একসারি কোষ তৈরী হয়; তাদের বলে "এবসিসন লেয়ার" (abscission layer). কোষের সারি তৈরী হয়ে যাবার পর কোষের প্রাচীর ডাল আর পাতার বোঁটার মাঝে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে। তখন পাতাগুলো ধরা থাকে মাঝের সামান্য অংশ দিয়ে। একটু নড়াচড়া করলে, কিংবা একটা দমকা বাতাস দিলে পাতাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে তলায় ঝরে পড়ে। পাতা ঝরে গেলে, ডালের পাতা-লেগে-থাকা জায়গাটাতে একসারি কর্ক কোষ তৈরী হয়ে যায় ও পাতার দাগটা ঢেকে যায়।

চিরহরিৎ (evergreen) অর্থাৎ সারাবছরই যার পাতা থাকে এমন গাছপালা ভাগে ভাগে পাতা ঝরায়। গাছে নতুন পাতা আসে বসন্তে, তখন পুরোনো বছরের পাতা ঝরে পড়ে।

অবৃন্তক আকন্দ পাতা

॥ পাতার ভিতরকার চেহারা ॥

একটা পাতার টুকরো নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেললে দেখা যাবে যে একেবারে উপরে একসারি ইটের মতো কোষ, যার কাজ ভিতরকার জলের অপচয় বন্ধ করা, নাম এপিডারমিস। চকচকে পাতায় এপিডারমিসের উপরেও একটা পাতলা আবরণ দেখা যায়, তাকে বলে কিউটিক্ল্ (cuticle). এপিডারমিসের তলায় কতগুলো লম্বা আর সরু ধরনের কোষ, বেশ ঠাসাঠাসি করে সাজানো, এগুলোকে বলে প্যালিসেড লেয়ার (palisade layer). এরই মধ্যে অসংখ্য ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যাবে, যার মধ্যে আছে ক্লোরোফিল। প্যালিসেড লেয়ারের নীচে কয়েক সারি গোল গোল চেহারার কোষ আলগাভাবে সাজানো থাকে, এর নাম স্পঞ্জী লেয়ার (spongy layer). এখানেও ক্লোরোফিল থাকে, তবে সে ক্লোরোফিল তুলনায় একটু কম আর তার রঙটাও হালকা।

পাতার একেবারে নীচে থাকে আর একসারি এপিডারমিস কোষ (lower epidermis). নীচের এপিডারমিস, উপরের এপিডারমিসের তুলনায় একটু ভিন্ন রকমের। নীচের এপিডারমিসের কোষের সারির মাঝে মাঝে ছিদ্র থাকে, যার নাম স্টোমা (stoma বহুবচনে stomata) বা বায়ুপথ। এগুলো বেজায় ছোট। পাতার চেহারা-অনুযায়ী এদের সংখ্যা এক ঘন ইঞ্চিতে ৬০,০০০ থেকে ৪,৫০,০০০। এই ছিদ্রপথেই জল বাষ্পাকারে বের হয়ে যায়, প্রয়োজন-অনুসারে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন যাওয়া-আসা করে। পাতার উপরদিকেও স্টোমা থাকে, তবে সংখ্যায় অনেক কম। বেশির ভাগ স্টোমাই থাকে নীচের দিকে।

এ ছাড়া পাতার অভ্যন্তরে দেখা যাবে জাইলেম ও ফ্লোয়েম।

সূর্যের আলোর সাহায্যে পাতার ক্লোরোফিল, জল আর কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর সঙ্গে রাসায়নিক
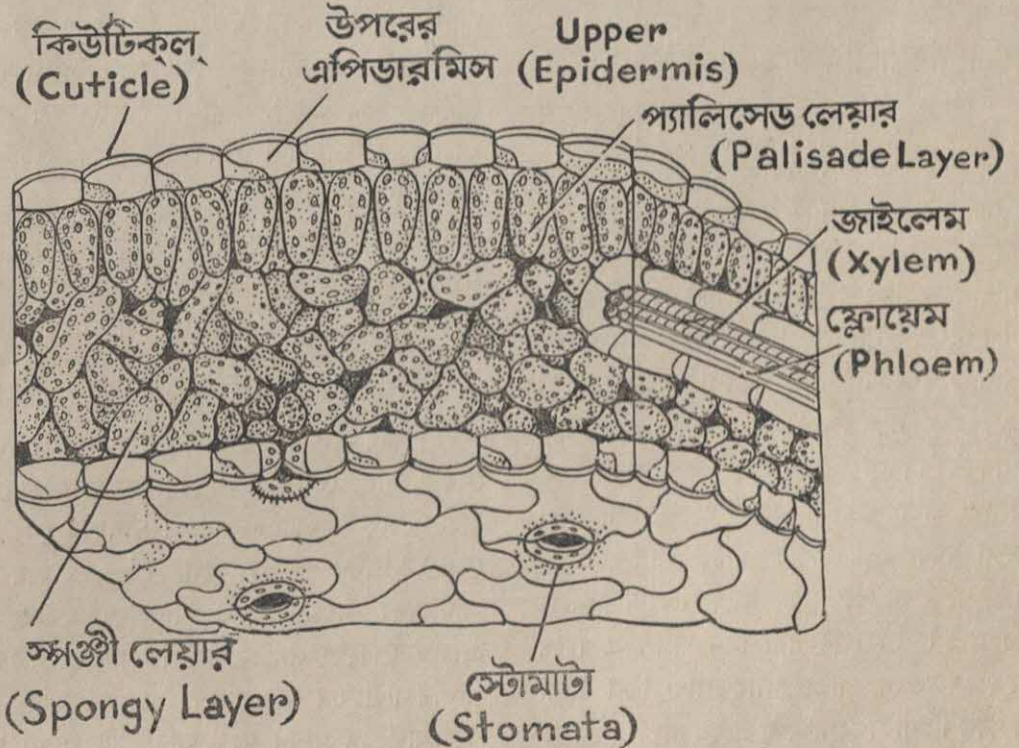
পাতার ভিতরকার চেহারা

ক্রিয়ায় যে খাদ্য প্রস্তুত করে ও বাই-প্রডাক্ট বা ফাউ হিসাবে স্টোমাটার ছিদ্রপথে যে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়, সেই পুরো প্রণালীর নাম অঙ্গার আত্তীকরণ (carbon assimilation) বা সালোক-সংশ্লেষ (photo-synthesis).

সালোক-সংশ্লেষের কাজের প্রধান দুটি উপাদান জল আর কার্বন ডাই-অক্সাইড।

সালোক-সংশ্লেষ চলার সময়ে এত তাড়াতাড়ি আর এত বেশী পরিমাণে খাদ্য তৈরী হতে থাকে যে পাতারা তা গাছের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দিতে পারে না। তাই বেশির ভাগই শর্করা তৈরী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শ্বেতসারে পরিণত করে ফেলে। দিনের শেষে পাতায় পাতায় প্রচুর শ্বেতসার জমে ওঠে।

আলো ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সালোক-সংশ্লেষের কাজও বন্ধ হয়ে যায়। দিনে তৈরী খাবার সারারাত ধরে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেবার কাজ চলতে থাকে।

॥ সবুজ গাছপালা কিভাবে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করে ? ॥

সবুজ গাছপালারা শিকড়ের ছোট ছোট চুলের মতো সরু মুখ দিয়ে মাটি থেকে জল পান করে। প্রত্যেক ঢোঁকে তারা শুধু জলই পান করে না, সেই সঙ্গে নানারকম ধাতব লবণও খায়। এই সব লবণ জলের সঙ্গে গোলা অবস্থায় থাকে। এই লবণ এরা গাছের পাতায় পাঠিয়ে দেয়। পাতা সেগুলো কাজে লাগায়। শিকড়ের সরু সরু চুলের মতো অংশ দিয়ে গাছ জল পান করে কিন্তু খাদ্য খেতে পারে না। সবুজ গাছপালার আহার তৈরি করে তাদের পাতারা। গ্রীষ্মকালে যখন প্রচুর রোদ থাকে আর একটুও হাওয়া বয় না তখন মনে হয় গাছের পাতারা আলস্যে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখেছেন যে তখন পাতাগুলোর মধ্যে চলে নানা ধরনের কাজ। পাতাগুলো শুধু গাছের নয়, পৃথিবীরও খাদ্যের কারখানা। জীবজন্তুরা এদের তৈরী খাদ্য
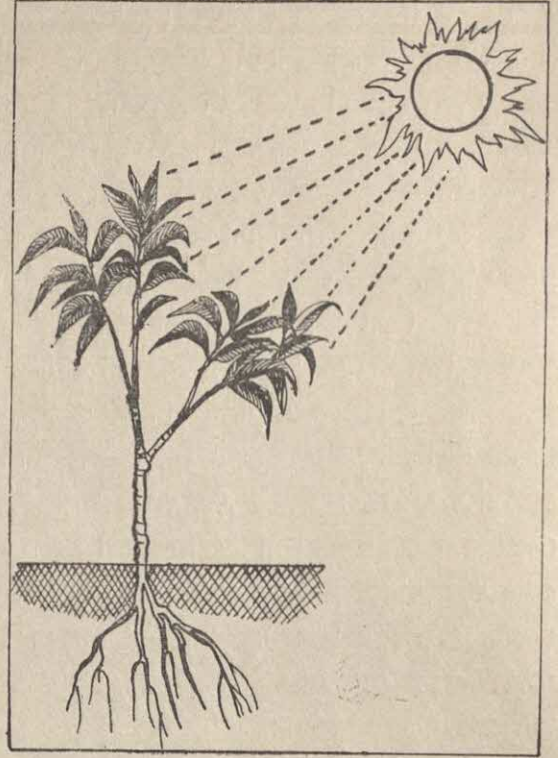
খেয়ে বেঁচে থাকে। যে উপায়ে পাতারা খাদ্য তৈরি করে তাকে বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলে সালোকসংশ্লেষ (photo-synthesis). আলো থেকে যে শক্তি তাতেই এ কারখানা চলে। অন্ধকারে এই কাজ বন্ধ থাকে।

গাছের পাতায় ক্লোরোফিল (chlorophyll) বলে সবুজ কণা আছে। তারা হাওয়া থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড দিয়ে গাছের খাদ্য তৈরি করে।

॥ শ্বাসকার্য বা রেসপিরেশন ॥

হাওয়ার সঙ্গে অক্সিজেন গ্যাসকে দেহের ভেতরে নেওয়া, আর, দেহের উৎপন্ন দূষিত গ্যাসকে দেহের বাইরে ছেড়ে দেওয়াকে বলা হয় শ্বাসকার্য (respiration). উদ্ভিদ্ জীবন্ত বলে, বেঁচে থাকার জন্য আমাদেরই মতন তাকেও শ্বাসগ্রহণ করতে হয়। প্রতিটি কোষেই শ্বাসগ্রহণের কাজ হচ্ছে, সেটা চলছে পাতার সাহায্যে। শ্বাস-গ্রহণের সময় স্টোমাটার ছিদ্র-পথে অক্সিজেন প্রবেশ করে, আর সেই পথেই কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প বের হয়ে আসে।

শ্বাসগ্রহণকালে কোষেরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন কাজ চালাবার শক্তি অর্জন করে। সালোক-সংশ্লেষ ও শ্বাসগ্রহণ-প্রক্রিয়া একেবারে বিপরীতধর্মী। সালোক-সংশ্লেষ দিনের বেলায় চলে, কিন্তু শ্বাসগ্রহণের কাজ চলে দিনে রাত্রে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে।

॥ ট্রান্সপিরেশন বা প্রস্বেদন ॥

খাদ্য তৈরি করা ছাড়াও কোষগুলোকে স্ফীত রাখবার জন্য, সক্রিয় রাখবার জন্যও জলের প্রয়োজন। বাড়তি জল স্টোমাটার ছিদ্রপথে বাইরের বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে বের হয়ে আসে। অপ্রয়োজনীয় এই জল বের করে দেবার নাম ট্রান্সপিরেশন বা প্রস্বেদন।

॥ পতঙ্গভুক্ গাছপালা ॥

উদ্ভিদের স্বাভাবিকভাবে খাদ্য গ্রহণের উপায় সালোক-সংশ্লেষ। এছাড়া কিছু কিছু উদ্ভিদ্ আছে যাদের খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থাটা একটু অন্য ধরনের। পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ্ (insectivorous plants) ছোট ছোট পোকামাকড়, যেমন পিঁপড়ে ইত্যাদি আর খুব বড় হলে ফড়িং বা প্রজাপতি, এই ধরনের কীটপতঙ্গ ধরে তাদের দেহের প্রোটিনজাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। তবে খাবার সংগ্রহের এটাই তাদের একমাত্র উপায় নয়, বাড়তি খানিকটা সুবিধা মাত্র ; কেন না, গাছগুলো সবুজ বলে সালোক-সংশ্লেষের দ্বারাও এরা খাদ্য তৈরি করে নেয়।

পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের নানারকম চেহারা। পোকা ধরার কৌশলটা থাকে পাতায়। পাতার চেহারায় সেজন্য রকম রকম বৈচিত্র্য ঘটে। দেখতে বিভিন্ন রকমের হলেও, একটা ব্যাপারে সব পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের মিল আছে। এরা সবাই সাধারণভাবে পোকা ধরার কৌশল প্রয়োগ করে, আর ধরার পরে পরিপাক করার জন্য এক ধরনের রস বের করে।

"কলসী গাছ" (pitcher plant বা nepenthes) বলে পরিচিত এক রকমের পতঙ্গভুক্ গাছ আসামের খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারো পাহাড় অঞ্চলে খুব দেখতে পাওয়া যায়। গাছের প্রতিটি পাতার ডগায় এক
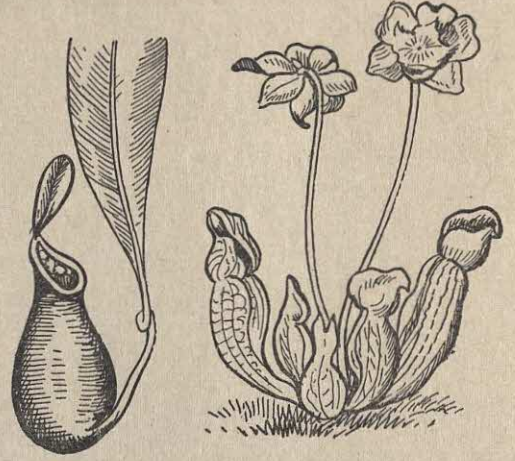
নানা ধরনের পতঙ্গভুক্ গাছ

একটি ছোট কলসীর মতো চেহারা তৈরী হয়। আসলে পাতার নানা অংশই রূপান্তরিত হয়ে এই চেহারার সৃষ্টি করে। কলসীগুলোর মাথায় একটা করে ঢাকনি থাকে, যেগুলোর রঙ সুন্দর গোলাপী। কলসীর মুখটা খুব মসৃণ, আর ভিতরের দিকে থাকে গা-ভরতি অনেকগুলো মোলায়েম ও সূক্ষ্ম চুলের মতো জিনিস। তাদের মুখগুলো নীচের দিকে নামানো থাকে। কলসীর ভিতরের গায়ে থাকে কতকগুলো গ্রন্থি, যা থেকে রস বের হয়ে কলসীটা খানিকটা ভরা থাকে। পোকামাকড় ঢাকনার গোলাপী রঙে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসে বসতে গেলে কলসীর মুখ থেকে পিছলে ভিতরে পড়ে যায়। আর দেয়ালের খাড়াই বেয়ে উপরে উঠে আসতে পারে না।

জলে যে পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ্ দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে নাম করা যায় মালাক্কা ঝাঁজি (aldrovanda), ব্লাডারওয়ার্ট (bladderwort) বা ইউট্রিকুলারিয়া (Utricularia)। পার্বত্য অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় বাটারওয়ার্ট বা পিংগুইকিউলা (butterwort or pinguicula), তাছাড়া ভেনাসেস ফ্লাইট্র্যাপ (Venus's fly-trap) প্রভৃতিও পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ্।

॥ পরজীবী (Parasite) ॥

উন্নত শ্রেণীর গাছপালার মধ্যে কিছু গাছ আছে যারা নিজেদের খাবার তৈরি করতে পারে না। কেউ

পরজীবী উদ্ভিদ্ স্বর্ণলতা

পুরোপুরি নির্ভর করে অন্য গাছের তৈরী খাবারের উপর, যেমন স্বর্ণলতা (cuscuta). এদের চেহারা সুতোর মতো ; সবুজ রঙ নেই, এমন কি পাতাই নেই। তাই এদের বলে পুরো পরজীবী (total parasite). যারা নিজেরা খানিকটা খাবারও তৈরি করে নেয় এবং বাকীটার জন্য নির্ভর করে অন্য গাছের উপর তাদের বলে আংশিক পরজীবী (partial parasite). আমাদের পরিচিত চন্দন গাছ, যার থেকে সুগন্ধি কাঠ পাওয়া যায়, তা আংশিক পরজীবীর উদাহরণ। অন্য গাছ থেকে খাবার সংগ্রহ করে নেবার জন্য পরজীবীদের বিশেষ এক ধরনের শিকড় হয়, যার নাম হস্টোরিয়া (haustoria). চলতি কথায় পরজীবীকে বলে পরগাছা।

॥ মৃতজীবী (Saprophyte) ॥

পচা-গলা উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর উপর নির্ভর করে যারা বাঁচে তাদের মৃতজীবী বা শবজীবী বলে। ছত্রাক আর জীবাণুর মধ্যে এদের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। উচ্চ শ্রেণীর গাছদের মধ্যেও মৃত-জীবী গাছ আছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েক জাতের অর্কিড (যেমন রাস্না) ও মনোট্রপা ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। তবে এরা নিজেরা সরাসরি পচা-গলা জিনিস থেকে জৈবিক খাদ্য গ্রহণ করে না ; এক জাতের ছত্রাক তাদের শিকড়ে অবস্থান করে এ কাজে তাদের সাহায্য করে।

॥ পরাশ্রয়ী (Epiphytes) ॥

একটা গাছের উপর, অন্য গাছ জন্মালেই যে সে গাছ বড় গাছের খাদ্য চুরি করবে এমন ভাবা ভুল। প্রচুর অর্কিড আছে, যারা অন্য গাছকে আশ্রয় করে জীবন-ধারণ করে। কিন্তু এরা নিজেদের খাদ্য নিজেই তৈরি করে নেয়। এদের নাম তাই পরাশ্রয়ী (epiphytes). পরাশ্রয়ী গাছের শিকড় দেখা যায় দু'রকমের— একরকম ছোট ছোট শিকড় যা দিয়ে আশ্রয়স্থলকে আঁকড়ে ধরে ; আর অন্য রকমের শিকড় হয় লম্বা লম্বা, সে-সব হাওয়ায় ঝোলে। হাওয়ায় ঝোলা বায়বীয় শিকড়ের গায়ে একটা স্পঞ্জজাতীয় আবরণ থাকে, যার মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য বায়ুমণ্ডল থেকে জল সংগ্রহ করে রাখতে পারে। তাছাড়া, বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেনও সংগ্রহ করতে পারে।

বট, অশ্বথ প্রভৃতি বড় বড় গাছ কখনও কখনও খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছের উপর আশ্রয় করে পরাশ্রয়ী হিসেবে জীবন শুরু করে।

॥ ফুল ॥

ফুল প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি। ফুলের রূপে ও
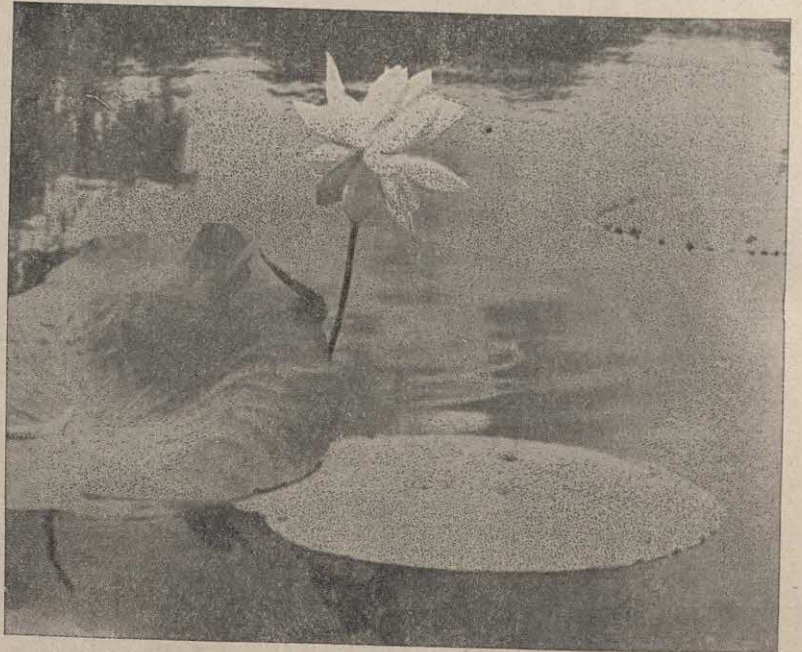
পদ্ম ফুল

গন্ধে কে না মুগ্ধ হয়! তাছাড়া কত বিচিত্র ফুলই না পৃথিবীতে আছে।

কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুলের মূল্য সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য নয়। উদ্ভিদের বংশবিস্তার করার জন্যই ফুলের সৃষ্টি। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে যায়, সৃষ্টি হয় ফল আর বীজের। বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয় আর একটি নতুন জীবন।

ফুল আসলে ডাল বা শাখারই অংশ। শাখার পাতাগুলো অদ্ভুতভাবে রঙে আর চেহারায় পরিবর্তিত হয়ে ফুলের বিভিন্ন অংশ সৃষ্টি করে।

বোঁটার উপর স্তরে স্তরে সাজানো থাকে চারটি অংশ। কুঁড়ির একেবারে বাইরের দিকে সবুজ রঙের যে আচ্ছাদন, তার নাম বৃতি বা ক্যালিক্স (calyx). তার অংশগুলিকে বলে বৃত্যংশ (sepal). এদের কাজ কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের বাকী অংশকে রক্ষা করা। দ্বিতীয় স্তরে থাকে দলমণ্ডল বা করোলা (corolla). এর অংশ হচ্ছে দল বা পাপড়ি (petal). এগুলোই নানান রঙে রাঙানো থাকে, অবশ্য সাদা পাপড়ি-ওয়ালা ফুলেরও অভাব নেই। পাপড়ির রঙে বা ফুলের গন্ধে বা ফুলের মধুর লোভে আকৃষ্ট হয়েই কীটপতঙ্গ ফুলের কাছে ছুটে আসে।

ফুল থেকে ফল ও বীজ হবার জন্য ফুলের প্রধান ও প্রয়োজনীয় অংশ হল দুটি—পুংস্তবক বা অ্যানড্রিসিয়াম (andrœcium) এবং স্ত্রীস্তবক বা গাইনিসিয়াম (gynœcium). এই দুটি অংশ থাকে ফুলের মাঝখানে। পাপড়ির পরে ভিতর দিকের সারিতে পুংস্তবক আর একেবারে ফুলের মাঝখানটাতে স্ত্রীস্তবক থাকে। পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবকে যথাক্রমে সাধারণতঃ কতকগুলি পুংকেশর (stamen) ও একটি গর্ভকেশর (pistil) থাকে। প্রতিটি পুংকেশর সাধারণতঃ সরু সুতোর মতো একটা জিনিস ও তার মাথায় একটা দানার মতো জিনিস দিয়ে তৈরী। দানার মতো জিনিসটি পরাগধানী (anther). তার মধ্যে আর গায়ে থাকে পরাগ বা ফুলের রেণু (pollen grains). রেণুর রঙে পরাগকোষ রঙীন দেখায়।

গর্ভকেশরের চেহারায় তিনটি ভাগ দেখা যায়।

হোগলা গাছের বিচিত্র ফুল

মাথাটা দানার মতো আর আঠালো, নাম গর্ভমুণ্ড (stigma). একে ধরে রেখেছে যে সুতোর মতো অংশটি, তার নাম গর্ভদণ্ড (style), তার তলার দিক্‌টা বেশ ফুলো; তার নাম ডিম্বকোষ বা ডিম্বাশয় (ovary). এর মধ্যে থাকে এক বা একাধিক ডিম্বক (ovule), যা পরে বীজে রূপান্তরিত হয়।

সব ফুলেই এই চারটি অংশের দেখা মেলে না। একটি বা দুটি অংশ না থাকলে, সেই ধরনের ফুলকে অসম্পূর্ণ ফুল বলে। পুংকেশর ও গর্ভকেশর একই ফুলে না থেকে বিভিন্ন ফুলেও থাকতে পারে—যেমন, পেঁপে গাছে। আবার, একই গাছে না ফুটে ভিন্ন ভিন্ন গাছেও দু'জাতের ফুল ফুটতে পারে।

যদি কোন ফুলের পুংকেশরের রেণু সমজাতীয় ফুলের গর্ভকেশরের মুণ্ডে এসে পড়ে, শুধু তাহলেই ফুল থেকে ফল হতে পারে।
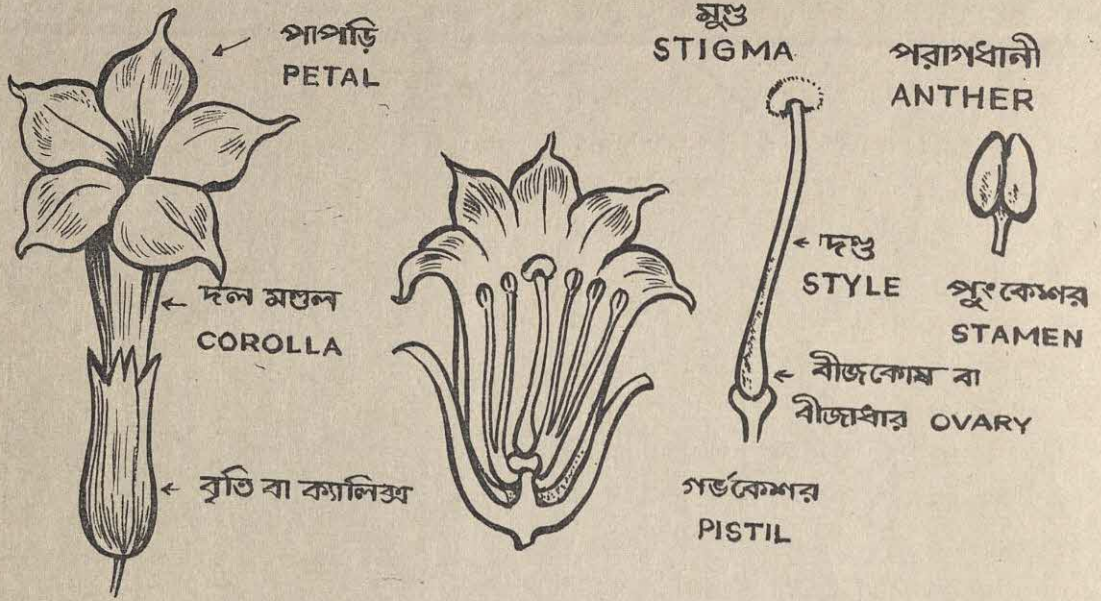
ফুলের নানা অংশ

ফুলের রেণু যখন পেকে ওঠে, তখন পরাগধানী ফেটে গিয়ে রেণু বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। জল, বাতাস, কীটপতঙ্গেরা তখন তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে গর্ভমুণ্ডে। পরাগধানী থেকে বাইরে এসেও পরাগগুলো জীবিত থাকে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত, আর সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পরাগের গর্ভমুণ্ডে এসে পৌঁছনো দরকার। পরাগের গর্ভমুণ্ডে এসে পৌঁছনোর নাম পরাগ-সংযোগ (pollination). পরাগ-সংযোগ যাতে হয়, তার জন্য কীটপতঙ্গদের আকর্ষণ করবার জন্যেই ফুলের নানান রঙ, সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ, আর মধুর ভাণ্ডার। এদেরই লোভে তারা এসে জড়ো হয় ফুলের কাছে; এ-ফুল থেকে, সে-ফুলে যাওয়া-আসার ফাঁকে পরাগ-সংযোগের কাজ নিজের অগোচরে তারা করে চলে। সাধারণতঃ যে সব ফুল রাত্রে ফোটে তার রঙ হয় সাদা আর গন্ধে ভরপুর। কারণটা আন্দাজ করে নিতে অসুবিধা নেই—পোকামাকড়কে হদিস দিয়ে দেওয়া, কাছে ডেকে নেওয়া। অন্ধকারে রঙ দেখা যায় না কিন্তু গন্ধ পাওয়া যায়।

যেসব ফুলের রূপ নেই, গন্ধ নেই, মধুর সঞ্চয় নেই, পোকা-মাকড় তাদের কাছে ঘেঁষে না। এইসব ফুলের পরাগসংযোগ হাওয়ার দ্বারা হয়ে থাকে।

জলজ উদ্ভিদ্ পরাগসংযোগের জন্য জলের স্রোতের উপর নির্ভর করে।

পরাগ এইরকম নানা উপায়ে গর্ভমুণ্ডে এসে পৌঁছয়।

॥ ফল আর বীজ ॥

ফলের মধ্যে বীজ তৈরী হয়ে অঙ্কুরিত হবার অপেক্ষায় থাকে। উপযুক্ত জল, আলো, উত্তাপ, বাতাস প্রভৃতি না পেলে এই বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

যে গাছে বীজ জন্মায়, তারই কাছাকাছি সব বীজ পড়লে বড় গাছের ছায়ায় এবং অল্প জায়গার সামান্য খাদ্যের উপর নির্ভর করতে গিয়ে অনেকগুলো বীজই অঙ্কুরিত হলেও বেঁচে থাকতে পারে না। তাই নানা জায়গায় বীজকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। দূরপথে যাবার সময়ে বীজ যাতে নষ্ট না হয়, শুকিয়ে না যায়, তার জন্যে বীজের একটা আবরণ থাকে, যাকে বীজত্বক্ (seed coat) বলে।
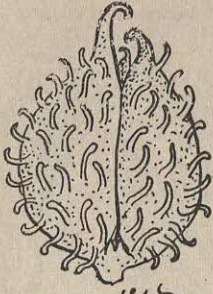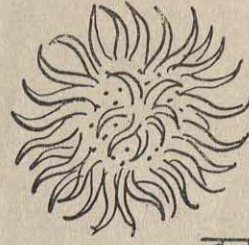
এই আবরণে ঢাকা অংশে থাকে বীজপত্র বা কটিলিডন (cotyledon). অনেক সময়ই খাদ্য সঞ্চিত থাকে বীজপত্রে; আর থাকে একটি জীবন্ত ছোট্ট গাছ ঘুমন্ত অবস্থায়। তাকে বলে ভ্রূণ (embryo).

॥ বীজ ছড়ানো ॥

বীজ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে জীবজন্তু, বাতাস ও জলের সাহায্য নেয়।

চোরকাঁটা, বাঘনখ, বনওকড়া প্রভৃতির বীজ জীবজন্তুর গায়ে লেগে যায়। তারপর সেগুলো জীবজন্তুর গায়ে-লাগা অবস্থায় দূরদূরান্তরে চলে যায়।

দোপাটি, মটর, চটপটে, অপরাজিতা ইত্যাদির ফল পাকলে ফেটে তার ভিতরকার বীজ ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে।

কতকগুলো বীজ দূরান্তরে যেতে বাতাসের উপর নির্ভর করে। সেগুলো শুকনো, হালকা আর ছোট ছোট হয়। ধুলোর কণার মতো ছোট্ট বীজেরও অভাব নেই। এমন বীজ বাতাসে ভর করে অতি সহজে দূরে চলে যায়।

পোস্ত, শেয়ালকাঁটা, পপিফুল প্রভৃতির বীজ বেশ ছোট। বীজগুলো তৈরী হয়ে থাকে ফলের মধ্যে আর বাতাসের ঝাপটায় ফলের মাথার ছিদ্রপথে কয়েকটা করে বের হয়ে বাতাসের টানে দূরে চলে যায়।

কিন্তু যে বীজ তত ছোট নয় বা তেমন হালকাও নয়, তাদের ভেসে যাবার উপায় হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি থাকে, এই রকম আকৃতির সাহায্যে তারা বাতাসে ভর করে উড়ে যায় অনেক দূরে। বীজের মাথার দিকে বা সর্বাঙ্গে একরাশ হালকা চুলের মতো জিনিস লাগানো থাকে। এদের সাহায্যে বীজ প্যারাসুট যেমন করে বাতাসে ভাসে তেমনি করে বাতাসে ভেসে যেতে পারে। শিমুল তুলোর বীজে অসংখ্য সরু সরু আঁশ থাকে; এই আঁশগুলো তাকে দূরে পোঁছে দেয়। পাখি যেমন ডানায় ভর করে ভেসে যায়, অনেক বীজের তেমনি ধরনের ছোট বড় ডানার আকৃতি থাকে। শালের বীজ, সজনের বীজ,
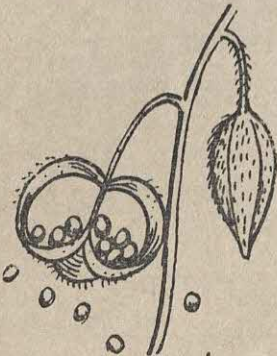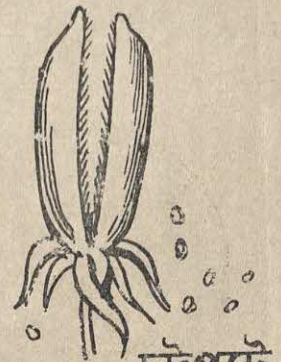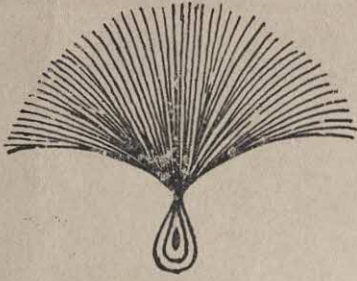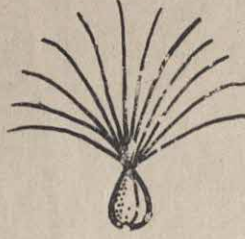
মাধবীলতার বীজ এবং অন্যান্য বহু বীজে এই ধরনের ডানার মতো অংশ থাকে।

সমুদ্র-সৈকতে জন্মানো কতকগুলো আগাছা বাতাসের উপর নির্ভর করে বীজ ছড়াবার সুন্দর একটা উপায় অবলম্বন করে। ফল ও বীজ তৈরী শেষ হলে ডালগুলো ভিতরের দিকে গুটিয়ে এসে একটা গোল চেহারা করে ফেলে, পরে গাছের কাণ্ড থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সেটা হাওয়ার বেগে বলের মতো গড়িয়ে চলে। গড়িয়ে চলার পথে পথে বীজ ছড়িয়ে পড়ে ও কালক্রমে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।

জলের উপর নির্ভর করে যে বীজ (বা ফল) এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভেসে যায় সে সব ফলে বা বীজে ভেসে থাকার উপযোগী ব্যবস্থা করা থাকে। অনেকদিন ধরে জলে ভাসলেও যাতে কোন ক্ষতি না হয় কিংবা সমুদ্রের নোনা জলে বীজ নষ্ট হয়ে না যায়, সেই সঙ্গে যাতে জলের উপর ভাসতে অসুবিধে না হয় সেজন্য নারকেলের উপর ছোবড়ার আস্তরণ থাকে। সুপারিরও আছে তেমনি ব্যবস্থা। পদ্মফুলের চাক-ভরতি বীজ, কিন্তু চাকটা হালকা। জলে ভাসতে ভাসতে চাকটা পচে ওঠে আর বীজ জলের নীচে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া জলজ উদ্ভিদের বীজে অনেক সময়ই স্পঞ্জ-জাতীয় একটা আবরণ থাকে।

দূর-দূরান্তরে পৌঁছে বীজ অঙ্কুরিত হবার মতো অবস্থার জন্যে অপেক্ষা করে। অবশ্য উপযোগী অবস্থা হলেই যে বীজ সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হতে থাকবে এমন কোন কথা নেই—কেন না, অনেক বীজই অনেকটা সময় ঘুমিয়ে থাকে, বীজ তৈরী হবার পর খানিকটা সময় সে জিরিয়ে নেয়। সে সময়টাকে বলে সুপ্তাবস্থা বা নিষ্ক্রিয়তার কাল (period of dormancy).

বীজের সুপ্তাবস্থা বা নিষ্ক্রিয়তার কাল নানা উদ্ভিদে নানা রকম। কোন গাছের বীজের সুপ্তিকাল হয়তো সামান্য কয়েক দিন, আবার অন্য গাছের বীজের সুপ্তিকাল হয়তো বেশ কয়েক মাস অথবা কয়েক বছর। অনেকগুলো শস্যবীজই বীজ তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হতে পারে, তার মানে এদের সুপ্তিকাল বলে কিছু নেই। কিন্তু অনেক বীজই বছর ঘুরে না এলে অঙ্কুরিত হবার ক্ষমতা পায় না।

বীজের আবরণে বা ফলের আশ্রয়ে থাকলেও ভ্রূণের (embryo) শত্রু অতিরিক্ত শুষ্কতা, উত্তাপ ও শৈত্য।
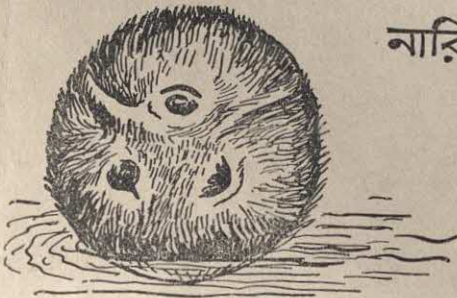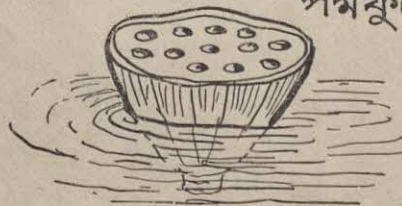
এগুলো যখন থাকে না বরং অঙ্কুরিত হবার মতো অবস্থা হয় তখন ভ্রূণের ঘুম ভাঙে। অঙ্কুরিত হবার সময়ে জল, বাতাস বা অক্সিজেন ও তাপ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে সব বীজের পক্ষেই দরকার। খুব কম বা খুব বেশী উত্তাপ, জল বা বাতাস কোনটাই বীজের পক্ষে ভাল নয়। গাছবিশেষে এই তিনটি জিনিসের প্রয়োজন কম বা বেশী হতে পারে।

সাধারণতঃ বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার জন্যে আলোর দরকার। শুধু কয়েক ধরনের গাছের ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদগমের পক্ষে প্রয়োজন জল, অক্সিজেন এবং অন্ধকার। টমেটো ও ধুতরোর বীজ অন্ধকার ছাড়া অঙ্কুরিত হয় না।

অঙ্কুরিত হবার জন্য যা যা দরকার, তা না পেলে অনেক বীজই বহুকাল ধরে ঘুমিয়ে থাকে। এমনও দেখা গিয়েছে যে হাজার হাজার বছরের পুরনো শস্যের দানা থেকে গাছ হয়েছে। তার মানে, বীজের ভ্রূণ এতকালেও মরেনি, শুধু ঘুমিয়ে ছিল।

॥ উদ্ভিদের আত্মরক্ষা ॥

[প্রাণিজগতের তুলনায় উদ্ভিদ্-জগৎ প্রকৃতির দুর্বল সৃষ্টি। তাই প্রকৃতি তাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষার উপায় করে দিয়েছে। তারা আত্মরক্ষার

ফণিমনসার কাঁটা গোলাপের কাঁটা
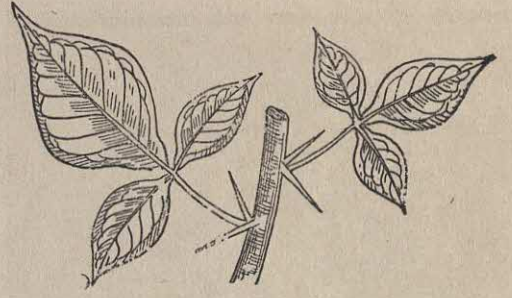
বেলগাছের কাঁটা

উপায় হিসেবে এমন কতগুলো ব্যবস্থার অধিকারী, যা না থাকলে বেঁচে থাকার সংগ্রামে উদ্ভিদ্ হোত পরাজিত।]

আত্মরক্ষার জন্য প্রাণিজগতের যে প্রধান অবলম্বন দৌড়ে পালানো বা লুকিয়ে থাকা, সে সুবিধা থেকে উদ্ভিদ্ বঞ্চিত। শত্রুর পিছনে তাড়া করে যেতেও তারা পারে না। একটি জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বলে, তাদের আত্মরক্ষার যা কিছু ছোটখাট 'অস্ত্রশস্ত্র' তাদের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে থাকে। অবশ্য একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এই যে ছোটখাট 'অস্ত্রশস্ত্র' যা উদ্ভিদ্‌রা দেহে ধারণ করে আছে তা তারা নিজেদের ইচ্ছেয় সংগ্রহ করতে পারে নি। প্রকৃতি তাদের এমন কয়েকটি 'হাতিয়ার' দিয়েছে যা থাকার দরুন কোন-না-কোন উপায়ে তারা লাভবান্ হয়েছে। তবু বনের পশুর অবাধ চলাফেরায় তাদের পায়ে পায়ে কত যে উদ্ভিদ্ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে তার সীমা নেই।

উদ্ভিদের দেহে নানা রকমের কাঁটা হচ্ছে তাদের আত্মরক্ষার একরকম হাতিয়ার। ফণিমনসার কাঁটা, গোলাপের কাঁটা, বেগুন পাতার কাঁটা, শেয়ালকাঁটার কাঁটা, বেলগাছের কাঁটা এসবই বনের পশুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাদের সাহায্য করছে।

আবার বিছুটির ডাঁটা, পাতা ও ফলে এক ধরনের ছোট ছোট চুলের মতো শুঁয়ো দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলো বিষাক্ত পদার্থে ভরা থাকে। কোন প্রাণীর ছোঁয়া লাগলে সেই শুঁয়োগুলোর ডগায় চাপ পড়ে ভেঙে গিয়ে বিষাক্ত রস প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে। তার ফলে প্রাণীর শরীর জায়গায় জায়গায় ফুলে ওঠে ও
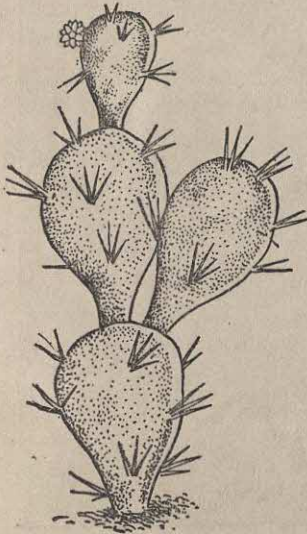
খরগোশ বিছুটি গাছের কাছ থেকে পালাচ্ছে

জ্বালা করে। এক-আধবার এ ধরনের বিষের শুঁয়ো লেগে গা জ্বালা করার পর প্রাণীরা আর ওদিক্ মাড়াতে চায় না।

তামাক, পুনর্নবা, ভেরেণ্ডা প্রভৃতির পাতায় এক ধরনের আঠা লেগে থাকে। পশুরা পাতা খেতে গেলে চটচটে আঠা তাদের মুখে লেগে অস্বস্তির কারণ ঘটে, ফলে এ ধরনের গাছের থেকে তারা দূরে থাকে।

বিষাক্ত দ্রব্য কম বেশী অনেক গাছেই থাকে। করবী, কলকে, বট, অশ্বত্থ, কাঠগোলাপ প্রভৃতি গাছে একরকমের ঘন সাদা আঠা (latex) থাকে, যার জন্য প্রাণীরা ওসব গাছের পাতা খেতে চায় না। তামাকের নিকোটিন, আফিঙের মরফিন, সিনকোনার কুইনিন প্রভৃতি গাছপালাদের বাঁচতে সাহায্য করে। অবশ্য মানুষ, এসব বিষাক্ত ও তেতো জিনিস থেকে বহু উপকারী ওষুধ তৈরি করে থাকে।

ওল, কচু প্রভৃতি গাছে থাকে সূক্ষ্ম সূঁচলো ক্যালসিয়াম অক্স্যালেট-এর (calcium oxalate) দানা। তার চেহারা ছুঁচের মত। কচু খেলে সেই গোছা-গোছা ছুঁচ (raphudes) মুখের ভিতর বিঁধে যায়, তাইতে মুখ, গলা চুলকোয়। গাছপালার তেতো স্বাদ, বিশ্রী গন্ধ ইত্যাদিও গাছকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

পশুপাখিদের ভয় দেখিয়ে কিছু উদ্ভিদ্ বাঁচার সুবিধা করে নেয়। এসব ক্ষেত্রে উদ্ভিদের কোন কোন অংশের চেহারা হয় চেনাশোনা জন্তু-জানোয়ারদের মতো, আর তা দেখে ভুল করে অথবা ভয় পেয়ে প্রাণীরা সেদিকে এগোয় না। উদ্ভিদের এ ধরনের অনুকরণের নাম 'মিমিক্রি' (mimicry) বা অনুকৃতি। শিলং-দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে কয়েক জাতের কচু দেখতে পাওয়া যায়। তাদের রঙ সাপের গায়ের মতো। শুধু তাই নয়, ফুলের মঞ্জরীকে ঘিরে যে পাতা তার চেহারাটা হয় ফণাধরা সাপের মতো—এদের নাম সাপফুল। এগুলোকে দেখে ভয়ে পশুপাখিরা দূরে থাকে।

আম, জাম প্রভৃতি বড় বড় গাছে একরকমের পিঁপড়ে বাসা বাঁধে। কিন্তু এইসব পিঁপড়ে অন্য কোন প্রাণী গাছের কাছে এলে কামড়ের চোটে অস্থির করে তাদের দূরে সরিয়ে দেয়। গাছ আর

সাপফুল দেখে পাখি ভয় পেয়ে গেছে

পিঁপড়ের এই অদ্ভুত সম্বন্ধকে বলে (myrmecophily) অর্থাৎ 'পিঁপড়ের ভালবাসা'।

আত্মরক্ষার এইসব ছোট ছোট ব্যবস্থার সঙ্গে আরও আছে গাছের ছাল, যা গাছকে আঘাত ও অসুখ-বিসুখের হাত থেকে রক্ষা করে রেখেছে।

॥ গাছপালার অসুখ-বিসুখ ॥

যে কোন প্রাণীর মতোই গাছপালারও অসুখ হয়। আর অসুখ যখন দাঁড়ায় গুরুতর তখন তা থেকে তাদের মৃত্যুও হয়। সাধারণভাবে গাছপালার রোগ প্রতিরোধ করবার সহজাত ক্ষমতা থাকে একটা। গাছের সুস্থতা নির্ভর করে অনেক কারণের উপর। প্রয়োজনীয় ও পরিমাণমতো খাদ্যসামগ্রী থাকলে এবং জল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠিক ঠিক থাকলে, গাছের রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা বেশী থাকে। কিন্তু কোন কারণে, অবস্থার পরিবর্তন হলে তার প্রতিরোধ-ক্ষমতা কমে আসে আর তখনই নানা কারণে গাছের রোগ হতে পারে।

ছোটখাট গাছপালার ক্ষেত্রে প্রতিরোধ-ক্ষমতা থাকে কম, তাই অতি সহজে আর অতি তাড়াতাড়ি এক গাছ থেকে অন্য গাছের রোগ হতে থাকে।

গাছের অসুখ করলে পাতার স্বাভাবিক রঙ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে, কিংবা পুরো গাছটারই রঙ বদলে যেতে পারে। গাছের নানান অঙ্গে ছিট ছিট দাগ দেখা দিতে পারে।

পাতা কিংবা ডগা নেতিয়ে পড়তে পারে। অসময়ে পাতা ঝরে যেতে পারে। কিংবা এমনও হয়, হয়তো পাতা ঝরার সময় যেটা, সে-সময়ে পাতা ঝরল না। পাতা ঝরা গাছের একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। পুরোনো পাতা ঝরে পড়লে নতুন তাজা পাতা গজায়।

রোগের কারণে একটা গাছ বেঁটে হয়ে যেতে পারে। আবার অস্বাভাবিক ভাবে কোন অংশের বেড়ে ওঠাও রোগের লক্ষণ। গাছের কোন অংশে হয়তো অদ্ভুত একটা পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, যেমন একটা এই ধরনের লক্ষণের উদাহরণ —ফুলের পাপড়ির পাতায় পরিবর্তন।

পরজীবী অর্কিড গাছ বড় গাছের রস শুষে খাচ্ছে

কোন কোন ক্ষেত্রে পরজীবী গাছ অন্য বড় গাছের একটা অঙ্গ অধিকার করে বসে গাছের রস শুষে খেতে থাকে। তার ফলে গাছের নানা অসুখ করে।

পাতায় ছোট ছোট ছিদ্র হওয়া গাছের রোগের একটা লক্ষণ। গাছের গায়ের ফুটো থেকে যখন রস ঝরতে থাকে তখন বুঝতে হবে গাছ অসুস্থ হয়েছে।

গাছের অসুখের কারণ হিসেবে জীবাণু ও ছত্রাকের নাম করা হয়েছে। ছত্রাকের তুলনায় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গাছপালার অসুখ-বিসুখ সাধারণতঃ অনেক কম হয়। ছত্রাকের দ্বারাই আক্রান্ত হয়ে গাছপালা বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদের আক্রমণে ধান, গম, যব, ভুট্টা, আখ, আলু প্রভৃতি আমাদের অতি প্রয়োজনীয় কতরকম খাদ্যশস্যেরই ক্ষতি হচ্ছে। কোন ছত্রাক এসে পাতাকে আক্রমণ করে, হয়তো কেউ শিকড়ে

এরোপ্লেন থেকে নীচের শস্য ক্ষেতে কীটনাশক ওষুধ ছড়ানো হচ্ছে

আক্রমণ চালায় আর কেউ বা তৈরী শস্যে এসে জুড়ে বসে। ক্রমশঃ তাদের আক্রমণে মাঠ-ভরতি সব গাছেরই অসুখ হয়। কখনো বা ছত্রাকের আক্রমণে শস্য হয়ে ওঠে বিষাক্ত, খাওয়ার অযোগ্য। জীবাণুর আক্রমণেও গাছ অসুস্থ হতে পারে।

জীবাণু ও ছত্রাক ছাড়া, অনেক ছোট ছোট পোকামাকড় গাছের গোড়ায় বা শিকড়ে এসে বাসা বাঁধে। তারা গাছে ডিম পাড়ে। সেই সব ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বের হয়, তখন গাছের খুব ক্ষতি হয়। কোন গাছ আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে যদি মরে যায়, তাহলে পোকামাকড় অন্য গাছে গিয়ে নতুন করে বাসা বাঁধে। এছাড়াও গাছপালার অসুখ হয় ভাইরাসের আক্রমণে। ভাইরাস খুব দ্রুত রোগ ছড়ায়।

গাছপালার অসুখের মূলে যে জীবাণু, ছত্রাক প্রভৃতির আক্রমণ, তারাই যে এজন্য দায়ী সেটা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন মাত্র একশ বছরের কিছু আগে—১৮৫৩ সালে।

॥ অসুস্থ গাছের চিকিৎসা ॥

গাছপালাকে সুস্থ রাখতে আজকাল চাষ-চলার সময়ে নিয়মমতো জীবাণুনাশক ও কীট-নাশক ওষুধের ব্যবহার করা হয়। তার ফলে ছত্রাক, জীবাণু ও কীটগুলো গাছকে আক্রমণ করার সুযোগ পায় না। ইওরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা রাশিয়ায় যেখানে বিরাট বিরাট এলাকা জুড়ে চাষবাস চলে, সেখানে চাষের জমিতে গাছপালার উপর ওষুধ ছিটিয়ে দেবার জন্য এরোপ্লেনের ব্যবহার করা হয়।

॥ মেণ্ডেলের অবদান ॥

গাছের বংশকে কী করে ক্রমে ভাল করা যেতে পারে, সে বিদ্যাকে বলে সুপ্রজনন-বিদ্যা (genetics). এ নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা যিনি করেন তাঁর নাম গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল (Gregor Johann Mendel, ১৮২২—১৮৮৪ খ্রীঃ)।

মেণ্ডেল ছিলেন অস্ট্রিয়ার ব্রুন গির্জার এক পাদরী। গির্জারই ধারে এক বাগানে ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল, এই দীর্ঘ আট বছর তিনি মটরশুঁটির গাছ নিয়ে অজস্র গবেষণা করেন। একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির গাছের মধ্যে পরাগ-সংযোগ ঘটিয়ে কি করে উন্নত ধরনের গাছ সৃষ্টি করা যায়, পরীক্ষা করে করে মেণ্ডেল তার কতকগুলি নিয়ম (Mendel's law) বের করলেন।

মটরশুঁটির গাছ ও মেণ্ডেল

মেণ্ডেলের আবিষ্কার সংক্ষেপে এই যে, বাপের আর মায়ের গুণ আর দোষ সন্তানের মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ পায় ('dominant characters'), কতকগুলি চাপা থাকে ('recessive characters'). এর বাঁধাধরা নিয়ম আছে। সেই নিয়ম অনুসারে কাজ করলে ইচ্ছামত কোনও দোষকে বা গুণকে বাড়িয়ে তোলা, কিংবা চেপে দেওয়া সম্ভব। তার ফলে একেবারে নতুন নতুন ধরনের গাছ জন্মানো যেতে পারে।

মেণ্ডেলের আবিষ্কারই আজকের জেনেটিক্স্ বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি এবং আরও অবাক্ হবার মতো ঘটনা এই যে মেণ্ডেলের সেদিনের আবিষ্কার আজও প্রায় তেমনিই আছে।

॥ নতুন ধরনের গাছপালা সৃষ্টি ॥

সুপ্রজনন বিদ্যার সাহায্যে মানুষ আজ নকল উপায়ে—কখনো তাপ কমিয়ে-বাড়িয়ে, কখনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে, নতুন আর উন্নত ধরনের উদ্ভিদের সৃষ্টি করতে পারছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুথার বারব্যাঙ্ক (Luther

আবার ফুল ফুটবে, ফল ধরবে
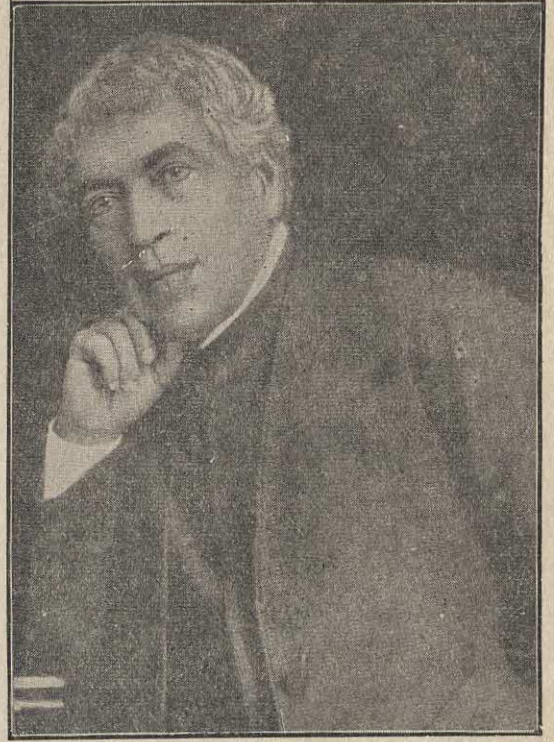
জগদীশচন্দ্র বসু

Burbank, ১৮৪৯—১৯২৬ খ্রীঃ) মোট ২২০টি নতুন বা উন্নত জাতের গাছপালা, ফুল, ফল তৈরি করতে সমর্থ হন। তাঁর এই অদ্ভুত প্রতিভার জন্য তাঁকে 'Plant Wizard' বা 'গাছের জাদুকর' বলে উল্লেখ করা হয়।

এ কাজে অপূর্ব সফলতা অর্জন করেন রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক আই. ভি. মিচুরিন (I. V. Michurin, ১৮৫৫—১৯৩৫ খ্রীঃ)। তিনি বহু সমালোচনা সহ্য করে, সারা জীবন নতুন ও উন্নত ধরনের বহুরকমের ফল সৃষ্টি করেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি "প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না, সে দাক্ষিণ্য আমাদের জয় করে নিতে হবে।"

মিচুরিনের উদ্ভাবিত পন্থার অনুসরণে রাশিয়ার চেষ্টা হয়েছে দূরবর্তী জাতের সংমিশ্রণে নতুন বর্ণসংকর গাছ সৃষ্টির। বারো মাস গম ফলবে এমন গাছ তৈরির এবং বারো মাস মটরশুঁটি ধরবে এমন বড় বড় গাছ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে।

এইসব গাছ ভবিষ্যতের গাছপালাকে সৃষ্টি করবে, আবার জেগে উঠবে আলো-ঝলমল এক নতুন প্রভাত।

কলিকাতার বসু বিজ্ঞান-মন্দির

॥ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥

জগদীশচন্দ্র বসু পৃথিবী-প্রসিদ্ধ বাঙালী বিজ্ঞানী। ১৮৫৮ সালে ঢাকা জেলার রাঢ়িখাল গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তিনি গবর্নমেণ্ট থেকে বৃত্তি পান। তড়িৎ-বিষয়ে তিনি গবেষণা করেন এবং মার্কনি রেডিও আবিষ্কার করার আগেই তিনি বিনা তারে সংকেত পাঠাবার উপায় আবিষ্কার করেন।

তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি গাছপালার অনুভূতি-সম্বন্ধে গবেষণা।
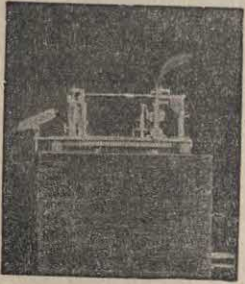
জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্র

মানুষের মতো গাছও হাসে, কাঁদে, ঘুমায়, মানুষের মতো দেহে ব্যথা পায়, পুষ্টিকর খাদ্য পেলে ভালভাবে বেড়ে ওঠে। জগদীশচন্দ্র এসব তাঁর তৈরী যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন।
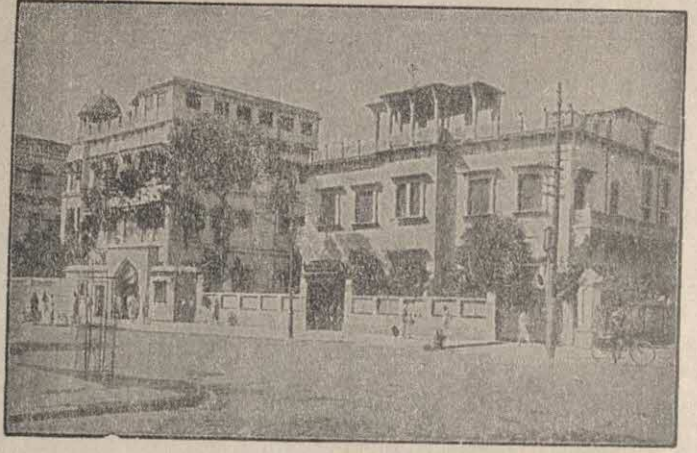
তিনি কলিকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে নিজের বাড়ির ঠিক পাশেই একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার নির্মাণ করেন। এই গবেষণাগারের নাম 'বোস ইনস্টিটিউট' (Bose Institute) বা বসু বিজ্ঞান-মন্দির। দার্জিলিঙে ও ফলতায় এর দুটি শাখা-গবেষণাগার আছে।

জগদীশচন্দ্র গাছের আহার ও গাছের হৃৎস্পন্দন নিজের তৈরী যন্ত্র দ্বারা সকলকে দেখান। যন্ত্রটির নাম 'ক্রেস্কোগ্রাফ' (crescograph), এরূপ আরও যন্ত্র তিনি তৈরি করান।

তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী বলা হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

জীবজন্তু কীটপতঙ্গ

॥ জীবজগতের আদমশুমারি ॥

কত প্রাণী আছে পৃথিবীতে? ভ্যসমাজেস আদমশুমারি বা মানুষ গোনার রীতি আছে, কিন্তু প্রাণীর সংখ্যা কে গুনবে? তবে পণ্ডিতেরা খুঁজে খুঁজে কত জাতের প্রাণী আছে তার একটা মোটামুটি হিসেব বার করেছেন। এ পর্যন্ত তাঁরা প্রায় দশ লক্ষ জাতের প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন। এর মধ্যে পোকামাকড়ই আছে প্রায় আট লক্ষ জাতের। মাছ আছে ৩০ হাজার জাতের, উভচর ৩ হাজার জাতের, সরীসৃপ ৬ হাজার জাতের, পাখি ৯ হাজার জাতের আর স্তন্যপায়ী জীব ৩ হাজার জাতের। এরা ছাড়াও অনেক আছে। এখনও অনবরত নতুন নতুন জাতের প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, ভবিষ্যতে হয়তো আরও পাওয়া যাবে। এদের মধ্যে অতিকায়—প্রায় একশ' ফুট লম্বা আর কয়েক হাজার কিলোগ্রাম ওজনের প্রাণীও যেমন আছে, তেমনি আছে চোখে দেখা তো

সমুদ্রের তলার মাছ

প্রবালসমূহের মধ্যে এক ঝাঁক মাছ

দূরের কথা, খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না এমন খুবই ছোট প্রাণী। এই সব প্রাণী এত ছোট যে কয়েক লক্ষ একত্র করলেও দু' আঙ্গুল দিয়ে টিপে তুলতে কষ্ট হবে।

॥ আশ্চর্য বৈচিত্র্য ॥

আকৃতিতে ও চালচলনে প্রাণীদের মধ্যে কত না তফাত! কেউ সারাজীবনই কাটিয়ে দেয় জলে—কেউ লোনা জলে, অর্থাৎ সমুদ্রে বা সমুদ্রেরই মতো বিরাট বিরাট হ্রদে, কেউ বা মিষ্ট জলে, অর্থাৎ খালবিল, পুকুর বা নদীতে। কেউ থাকে ডাঙ্গায়। কেউ বা দরকার মতো জলে ও ডাঙ্গায়—দু' জায়গাতেই থাকতে পারে। কারো ছোটবার ক্ষমতা অসাধারণ,—রেলগাড়ির মতো বেগে একটানা হাজার মাইল ছুটে যাওয়াও কারো কারো পক্ষে অসাধ্য নয়। আবার কেউ বা গাছের মতো একটা পাথর বা গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে পড়ে রইল তো রইলই, সারাজীবনে আর নড়ে-চড়ে বেড়াবার তার কোন লক্ষণ নেই।

আকৃতিতেও নানারকম বৈচিত্র্য। চোখ-মুখ প্রায় সকলেরই আছে (অবশ্য চোখ নেই এমন প্রাণীও অনেক আছে), কিন্তু তাও সকলের চোখ এক জায়গায় নয়। নাক-কানও অনেকেরই আছে, কিন্তু নাক-কান নেই এমন প্রাণীও আছে প্রচুর। কারো গা ভরতি বড় বড় লোম, কারো বা লোমের বদলে আঁশ কিংবা পালক, কারো বা চামড়ার ওপর এ সবের কোনটাই নেই। কারো গায়ে অসংখ্য লম্বা লম্বা কাঁটা। কারো বা সারা শরীর শক্ত খোলা বা বর্ম দিয়ে আঁটা, কারো বা ও-সব বালাই নেই, আর শরীরটাও এমন থলথলে যে দেখলে মনে হবে বুঝি একতাল জেলি। কারো চারটে পা, কারো বা পা দুটো; বাকী দুটো হাত বা পাখা বা ডানা। কারো একদম পা-ই নেই, তার বদলে আছে ডানা, কিংবা কিছুই নেই। আবার কারো বা পায়ের সংখ্যা ৬টি বা ৮টি। অনেক পা-ওয়ালা প্রাণীরও অভাব নেই। কারো বা চেহারা এমন কিম্ভূতকিমাকার যে দেখে বোঝাই যায় না সেটা কোন জীবন্ত প্রাণী, না পাথর, না ফুল, না আর কিছু!

এক ধরনের প্রাণী—গায়ে কাঁটা।
এদের বলা হয় কাঁটাচুয়া (hedgehog).

॥ কেন শ্রেণীবিভাগ দরকার ॥

এই এত জাতের বিভিন্ন প্রকৃতির প্রাণীকে কিন্তু বিজ্ঞানীরা ঠিক চিনে রেখেছেন। কার সঙ্গে কার মিল, কে কোন্ দলের, কে কি খায়, কার জীবনযাত্রা কি রকম—সমস্ত খুঁটিনাটি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই আশ্চর্য রকম সফলও হয়েছেন।

বিজ্ঞানীরা সমস্ত প্রাণিজগৎকে নানা শ্রেণীতে সাজিয়ে নিয়েছেন এবং তারই ফলে এক এক জাতের প্রাণীকে এক এক দলে ফেলে তাদের খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য, চালচলন সহজেই বার করে ফেলতে পেরেছেন।

এতক্ষণ আমরা এক-এক ধরনের প্রাণীকে এক এক জাতের প্রাণী বলে উল্লেখ করেছি। চলতি কথায় "জাত" বলতে সাধারণ লোকে যা বোঝে সেই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

॥ শ্রেণীবিভাগের আধুনিক রীতি ॥

গোটা প্রাণিজগৎকে প্রথমেই যে দুটি বড় বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাদের বলা হয় মেরুদণ্ডী (vertebrate) আর অমেরুদণ্ডী (invertebrate). মেরুদণ্ডকে চলতি কথায় বলা হয় শিরদাঁড়া। এই শিরদাঁড়া হাড় দিয়ে তৈরী, কাজেই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হাড়ওয়ালা প্রাণীও বলা যেতে পারে। আর, অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের হাড় না থাকায়, তাদের হাড়ছাড়া প্রাণী বললেও ভুল হবে না। শুদ্ধ বাংলায়

মেরুদণ্ডী প্রাণী

এ ছাড়া আবার পণ্ডিতেরা প্রথমে প্রাণীগুলোকে ২২টা পর্বে (phylum-এ) ভাগ করে নিয়েছেন।

এককোষ-বহুকোষ হিসেবে এককোষেদের মোটে একটি ফাইলাম, বাকী ২১টিই বহুকোষ প্রাণীর ফাইলাম। আবার, মেরু-দণ্ডী-অমেরুদণ্ডী হিসেবে ২১টাই অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নিয়ে, বাকী মাত্র ১টা মেরুদণ্ডীর ফাইলাম। আধুনিক বিজ্ঞানে মেরুদণ্ডীদের ফাইলামটিকে বলা হয় কর্ডাটা (chordata). শরীরের মাঝখানে ঐ মেরুদণ্ড থাকে, ক্ষেত্রবিশেষে তেমন শক্ত না হলেও এটা বেশ মজবুত। একে বলা হল নোটোকর্ড, আর যে সব প্রাণীর এই নোটোকর্ড আছে তারাই কর্ডাটার দলে পড়ে। বলা বাহুল্য, বাকী ২১টা ফাইলামের কারোরই নোটোকর্ড নেই।

বলতে গেলে এই দুই শ্রেণীর প্রাণীকে অস্থিক আর নিরস্থিক প্রাণীও বলা যেতে পারে।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা সকলেই নীচু জাতের প্রাণী। আমাদের চারদিকে যত পোকামাকড় দেখতে পাই, তারা প্রায় সকলেই অমেরুদণ্ডী অর্থাৎ হাড়ছাড়া প্রাণী। সমুদ্রেও এদের সংখ্যা অগুনতি। তবে সমুদ্রের কোন কোন প্রাণী হাড়ছাড়া হলেও আকারে সব সময়ে নেহাত ছোট হয় না এবং স্বভাবেও তারা অসম্ভব হিংস্র হতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যেতে পারে—অক্টোপাস। এরা নাকি সময় সময় হাতির চেয়েও আকারে অনেক বড় হয়। তারা এই হাড়ছাড়া দলের মধ্যে পড়ে। হাড়ওয়ালা প্রাণীরা এদের চাইতে উঁচু জাতের জীব।

প্রাণিজগৎকে অন্য আর এক ভাবেও ভাগ করা হয়েছে—এককোষ (protozoa) আর বহু-কোষ (metazoa).

॥ প্রথম প্রাণী প্রোটোজোয়া ॥

প্রথমেই শুরু করতে হয় প্রোটোজোয়াদের নিয়ে। প্রোটোজোয়া মানে প্রথম প্রাণী অর্থাৎ পৃথিবীতে যখন প্রাণীর আবির্ভাব হল তখন এরাই এসেছিল
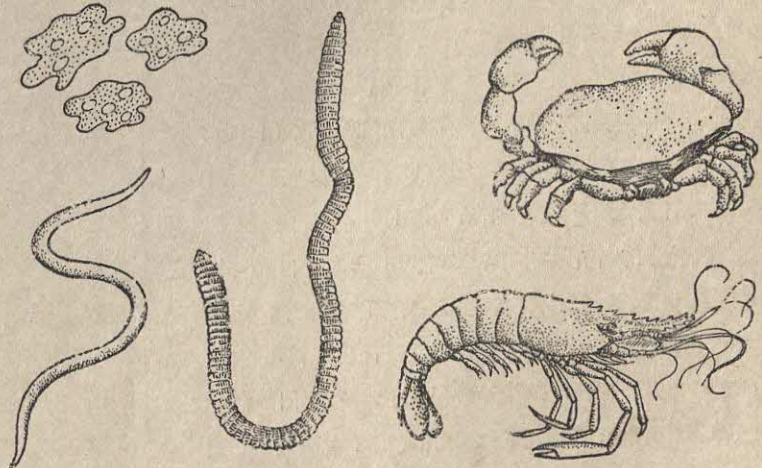
অমেরুদণ্ডী প্রাণী

সব প্রথম। এদের শরীর মাত্র একটি কোষ দিয়ে তৈরী। আমাদের, অর্থাৎ বড় বড় প্রাণীদের শরীর অজস্র কোষ দিয়ে তৈরী হয়। তেমন তেমন বড় প্রাণীর শরীরে লক্ষ লক্ষ—এমন কি কোটি কোটি কোষও থাকতে পারে। কতকগুলি এই ধরনের কোষ একত্র হয়ে গড়ে ওঠে এক একটি টিস্যু। যে প্রাণীর মাত্র একটা কোষ থাকে তাকে বলা হয় এককোষী প্রাণী।

ঐ কোষের মধ্যে থাকে খানিকটা থলথলে জেলির মতো জিনিস। তাকে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম। প্রাণীই হোক, আর উদ্ভিদ্ই হোক—সবাইকারই এই জিনিসটি থাকা চাই। এর কথা আগে বলা হয়েছে।

প্রোটোপ্লাজমের দুটি অংশ। খানিকটা অংশ বেশ ঘন, ওকে বলা হয় নিউক্লিয়াস, বাকীটাকে বলা হয় সাইটোপ্লাজ্‌ম্। কোন কোন প্রোটোজোয়ার শরীরে একের বেশী নিউক্লিয়াস থাকতে পারে। তা ছাড়া কোষের মধ্যে কিছু ফাঁকা জায়গাও থাকে। সেগুলো দরকারমতো জল, খাবার ইত্যাদি দিয়ে ভরতি করা থাকে।

প্রোটোজোয়াদের জলে, স্থলে, হাওয়াতে—সব জায়গায়ই দেখা পাওয়া গেছে।

প্রোটোজোয়াদের মধ্যে অ্যামীবাই (amoeba) বোধ হয় প্রথম প্রাণী। কিন্তু আশ্চর্য, ওরা যখন তখন চেহারা বদলাচ্ছে। এই হয়তো দেখা গেল গোল, পরক্ষণেই চেপটা ডিমের মতো হয়ে গেল। আবার একটু পরেই সে চেহারাও বদলে গিয়ে হয় চৌকো নয়তো বাঁকাচোরা কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধরল। এই থেকে থেকে চেহারা বদলানো দেখেই ওরা যে উদ্ভিদ্ নয়—প্রাণী, তা বুঝতে পারা যায়।

প্রোটোজোয়া নানান জাতের আছে। কোন কোন জাতের প্রোটোজোয়ার গায়ে সুতোর মতো শুঁড় লাগানো থাকে। ঐ শুঁড় দিয়ে জল নেড়ে নেড়ে ওরা দিব্যি চলাফেরা করতে পারে। কেউ কেউ আবার শরীরটাকে গুটিয়ে গোল দানার মতো করে ফেলতে পারে। তখন তাদের শরীরের জলীয় অংশটুকুও উবে যায় এবং ওরা শুকনো ধুলোর মতো বাতাসে উড়তে থাকে এবং ঐ অবস্থায় বহুদিন বেঁচে থাকে। তারপর একদিন সময়মতো আবার যেমন ছিল তেমন রূপ ধরে।

॥ স্পঞ্জ ॥

স্পঞ্জ একটি মজার জীব। এরা রবারের মতো নরম, এদের সারা গা এমন ফোঁপরা যে তার মধ্যে একটু জল ঢেলে দিলে সমস্ত জল সেই অসংখ্য ছিদ্রের মধ্যে শুষে যায় এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা সেই ভাবেই থাকে। নড়াচড়ারও বালাই এদের নেই। জলের তলায় একটা ডুবোপাথরের গায়ে আটকে রইল তো সারা জীবন সেই ভাবেই কাটিয়ে দেয়।

বেশির ভাগ স্পঞ্জই সামুদ্রিক প্রাণী, তবে নদীতেও কেউ কেউ বাস করে। অনেক সময় এরা দল বেঁধে বাস করে। শুধু দল বেঁধে বললে ঠিক বলা হবে না,—একটার সঙ্গে আর একটার গা এমনভাবে জুড়ে যায় যে সমস্তটা মিলে একটা বিরাট এলাকা গড়ে ওঠে—যাকে বলা যায় স্পঞ্জের এলাকা। খোলসের ভিতর থাকে চটচটে আঠার মতো প্রাণীটি। কখনো কখনো এরা নানারকম বিচিত্র আকারের হয়ে ওঠে।

স্পঞ্জের জীবনযাত্রা ভারি অদ্ভুত। এদের সারা গা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য ফোকর আর নালী,—কোনটা সরু, কোনটা বেশ চওড়া। প্রত্যেকটি ফোকরের মধ্যে আছে খুব সরু সুতোর মতো শুঁড়। ঐ শুঁড় ক্রমাগত

স্পঞ্জ

নাড়িয়ে নাড়িয়ে স্পঞ্জ তার আশেপাশের জলে ঢেউ তুলে তা ক্রমাগত টেনে নেয় তার ফোকরের মধ্যে। সেখান থেকে সেই জল সরু সরু নালার ভিতর দিয়ে বয়ে চলে। সেই জলে থাকে অসংখ্য খুদে খুদে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ্। এরা এত ছোট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। সমুদ্রে এরকম খুদে প্রাণী বা উদ্ভিদ্ অসংখ্য আছে। এদের বলা হয় প্ল্যাঙ্কটন (plankton). জলের সঙ্গে এই প্ল্যাঙ্কটনগুলো যখন স্পঞ্জের শরীরের সরু সরু নালার ভিতর চলে আসে তখন স্পঞ্জ সেগুলো শুষে নেয়। এই প্ল্যাঙ্কটনই হচ্ছে স্পঞ্জের খাবার।

অত্যন্ত সাদাসিধে শরীরের গড়ন হওয়ায় স্পঞ্জ জলের তলায় প্রায় চিরকাল বেঁচে থাকে। ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেও ও মরবে না, প্রত্যেকটা টুকরো থেকেই এক-একটা করে নতুন স্পঞ্জ গজিয়ে উঠবে।

॥ প্রবাল জিনিসটা কি ? ॥

স্পঞ্জের কথা বলতেই মনে পড়ে প্রবালের কথা, যারা বিরাট বিরাট এলাকা জুড়ে থাকে।

প্রবাল (coral) সাধারণতঃ সাদা হলেও লাল প্রবালও দেখা যায়। তা গহনাতে পরা হয়। চলতি কথায় তার নাম পলা। পাথরের মত দেখতে বলে একে পাথর বলেই মনে করে অনেকে।

ঘর সাজাবার জন্যেও সাদা প্রবালের নানা আকারের সুন্দর সুন্দর ঝাড় অনেকের বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায়।

ওগুলো পোকার খোলস বা আরও সহজ করে বললে বলা যায় পোকার বাসা। জন্মাবার সময় অন্যান্য সামুদ্রিক পোকাদের মতো প্রবাল কীটেরাও থাকে নরম—প্রায় কাদার মতোই নরম। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সমুদ্রের জল থেকে নিজেদের থাকবার জন্য একরকম খোলস বানাতে শুরু করে। খোলস-গুলো খড়িমাটি বা চুনাপাথর জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী। এই খোলসগুলোই হচ্ছে প্রবালকীটের বাসা।

জীবন্ত প্রবাল

এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রবাল কীট দল বেঁধে বাস করে আর বাসা তৈরী হলে কিংবা তৈরি করার সময়েই একটার সঙ্গে একটা জুড়ে নিয়ে সমস্ত মিলে একটানা একটা বিরাট খড়িমাটির মত জিনিসের চত্বর তৈরি করে। একেই বলা হয় প্রবাল উপনিবেশ। তারপর এক সময়, যখন পোকাগুলো মরে যায়, তাদের দেহের নরম কাদাটে অংশগুলো নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু শক্ত খোলস তো নষ্ট হয় না। সেগুলো জমাট বাঁধতে বাঁধতে ক্রমে শক্ত পাথরের মতো হয়ে যায়। এগুলি চুনাপাথর।

জলের নীচে জমতে জমতে এক সময় ঐ প্রবাল-উপনিবেশ মাথা তুলে জলের উপর চরের মতো জেগে ওঠে। মাইলের পর মাইল জমাট প্রবাল। অস্ট্রেলিয়ার পুবে সমুদ্রে ১২০০ মাইল লম্বা এক প্রবাল প্রাচীর আছে (Great Barrier Reef). তখন আর তাকে চর বলা চলে না, দ্বীপই বলতে হয়। এমনিভাবে ছোট্ট ছোট্ট কতকগুলি সামুদ্রিক পোকা গড়ে তোলে পৃথিবীর বুকে নতুন নতুন ডাঙ্গা—নতুন নতুন দেশ।

প্রবালের এরকম চড়া বা চর লম্বা হয়ে পড়লে তাকে বলে (Reef). আবার তা সমুদ্রের খানিকটা জলকে ঘিরে রাখার মত আকারেও গড়ে ওঠে, তাকে বলে প্রবাল বলয় (coral atoll). তাছাড়া, প্রবাল দিয়ে গড়া দ্বীপ তো অনেক আছে।

॥ মিডিউসা ॥

সাগরে আর এক রকমের অদ্ভুত চেহারার প্রাণী আছে, তাদের নাম মিডিউসা (medusa). এদের দেখতে অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মতো। এদের নীচের দিক্‌টা শেওলার মতো। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি জলের ঝাঁজি বা কোন উদ্ভিদ্। এরা কিন্তু প্রাণী। এদের শরীর বড় নরম; স্পঞ্জের মতো দেখতে। জোরে ঢেউ লাগলে এদের শরীর ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়। এজন্য এরা ঢেউয়ের জায়গা থেকে দূরে থাকে। এদের দেখতে নানা আকারের ও রঙের হয়। সমুদ্রের তলায় অন্ধকারে এরা থাকতে ভালবাসে।

॥ সমুদ্রের তলায় জীবন্ত বাগান ॥

কত বিচিত্র চেহারার, বিচিত্র রঙের, বিচিত্র আকারের প্রাণী সমুদ্রে ঘোরাফেরা করছে, তাদের সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করতে একবার এক বিজ্ঞানী বিরাট একটা বলের মতো গোলাকার

মিডিউসা

সমুদ্রের তলায় নামছেন

ইস্পাতের ঘর তৈরি করে তার মধ্যে বসে সমুদ্রের অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছিলেন। তাতে বাতাস ঢুকতে পারে না, জল ঢুকতে পারে না। তাতে শুধু নিঃশ্বাস নেবার জন্য অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। ঘরের সামনের দিকে ছিল একটা জানলার মতো স্বচ্ছ পুরু পর্দা। এই পর্দা এমন জিনিস দিয়ে তৈরী যা প্রচণ্ড চাপেও ভেঙে পড়ে না। সেই জানলার সামনে বসে কখনও স্বাভাবিক আলোয়, কখনও জলের মধ্যে তীব্র আলোর সার্চ-লাইট ফেলে তিনি দিনের পর দিন সমুদ্রের নীচের শোভা দেখতেন।

শোভাই বটে। পৃথিবীর উপর আমরা বাগান তৈরি করি, রকমারি গাছ লাগাই, ফুল ফোটাই আর আশ্চর্য হয়ে সেই বাগানের সৌন্দর্য দেখি।

একটা বুনো মহিষ চিতাবাঘের সামনে এসে পড়েছে

জীবজন্তু কীটপতঙ্গঃ

[একটা বুনো মহিষ চিতাবাঘের সামনে এসে পড়েছে।]

পৃথিবীর নানা জায়গা নানা ধরনের বন-জঙ্গলে ভরা। সেইসব বনে জঙ্গলে অনেক রকমের জীবজন্তুর বাস। এদের মধ্যে অনেক জানোয়ার হিংস্র।

এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটা চিতা বাঘ একটা বুনো মহিষের সামনে এসে পড়েছে। চিতা বাঘ হিংস্র। কিন্তু বুনো মহিষ হিংস্র নয়।

বুনো মহিষ হিংস্র না হলেও বনের সব পশু এদের ভারী ভয় করে। কারণ এদের গায়ে অসীম ক্ষমতা।

বুনো মহিষ ইওরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। সেই সব জায়গায় চিতা বাঘও দেখা যায়।

চিতা বাঘ বুনো মহিষকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। কারণ সে জানে, বুনো মহিষের আক্রমণে তার প্রাণ যেতে পারে। বুনো মহিষের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, সে চিতা বাঘকে দেখে এতটুকু ভয় পায় নি।

কিন্তু সমুদ্রের নীচেকার এই বাগান, তার যেন তুলনা নেই। রঙে রঙে ঝলমল সেই বাগান। অসংখ্য রঙবেরঙের জলজ গাছের ছড়াছড়ি সেখানে আর তারই মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে কত বিচিত্র চেহারার বিচিত্র রঙের প্রাণী।

আশ্চর্য কারিকুরি সেই রঙের সঙ্গে মেশানো। পৃথিবীর যে কোন শিল্পী তা দেখলে অবাক্ হয়ে যাবেন। ফুলের মতো দেখতে হলেও ওগুলো হচ্ছে জ্যান্ত প্রাণী। বিজ্ঞানীরা ওদের নাম দিয়েছেন 'সী-অ্যানিমোন'। ওদের ঐ চোখ-ঝলসানো পাপড়িগুলো কিন্তু আসলে মোটেই পাপড়ি নয়, অতি সাংঘাতিক জিনিস। ঐগুলোই হচ্ছে ওদের শিকার ধরার অস্ত্র। রঙের জৌলুসে আকৃষ্ট হয়ে কোন ছোট জলজ প্রাণী ওদের কাছে এসে পড়লেই পাপড়িগুলো সজোরে তাকে আঁকড়ে ধরবে, তারপর টেনে নিয়ে আসবে মুখের কাছে। তারপর খেয়ে ফেলবে।

অনেকে আবার অন্য প্রাণীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে সকলে একযোগে শিকারে বেরোয়। যোগী কাঁকড়া (hermit crab) নামে সমুদ্রে একরকম কাঁকড়া আছে। বিধাতা এদের সমস্ত শরীরটা খোলা দিয়ে ঢাকবার ব্যবস্থা করেছেন, বাকী রেখেছেন শুধু লেজটা। সেখানটা একদম ফাঁকা। আর শত্রু-দেরও যত আক্রোশ ঐ লেজের উপর। তারা জানে ঐখানটা ঘায়েল করতে পারলেই তাকে কাবু করা যাবে। যোগী কাঁকড়াদের তাই সর্বদাই ভাবনা, কি করে লেজটুকু সকলের আড়াল করে রেখে বাঁচানো যায়। এ কাজে এদের প্রধান সহায় হচ্ছে সী-অ্যানিমোন। সুযোগ পেলেই ওরা কোন একটি সী-অ্যানিমোনকে লেজের উপর বসিয়ে নেয়। ফলে তু'পক্ষেরই সুবিধে। যোগী কাঁকড়ার লেজটা সী-অ্যানিমোনের শরীরে ঢাকা পড়ায় শত্রুর হাত থেকে সে নিশ্চিন্ত। আর সী-অ্যানিমোনও পরম আরামে তার পিঠে চড়ে বেড়ায়। ঐ যোগী কাঁকড়ার পিঠে চড়ে সে সহজেই এধার ওধার বেড়িয়ে বেড়াতে পারে—নিত্য নূতন শিকারও ধরতে পারে।

সমুদ্রের নীচে শামুক, ঝিনুক, শাঁক, কড়ি আরও

যোগী কাঁকড়ার পিঠে সী-অ্যানিমোন

কত রকম ছোটবড় প্রাণী আছে। তাদের কোনটা দেখতে কদম ফুলের মতো, কোনটা বলের মতো, কোনটা টবের মতো, কোনটা কাঁটাঝোপের মতো, কোনটা ছাতার মতো, কোনটা পালকের মতো, কোনটা বা আকাশের তারার মতো।

গভীর সমুদ্রের তলায় আর এক রকম প্রাণীর দেখা মেলে। তারা নিজেরাই শরীর থেকে আলো বার করতে পারে। কেউ কেউ আবার, শুধু আলো নয়, বৈদ্যুতিক শকও মারতে পারে।

॥ চেহারা বদল ॥

এই সব ছোটখাট প্রাণীদের অনেকেই প্রাচীন-কালের প্রাণীদের বংশধর। এরা সকলেই অমেরুদণ্ডী বা হাড়ছাড়া প্রাণীদের দলে পড়ে। আর পৃথিবীতে হাড়ওয়ালা প্রাণীরা এসেছে অনেক পরে। এক সময়ে পৃথিবীতে এই হাড়ছাড়া প্রাণীদেরই ছিল পুরোপুরি রাজত্ব। এদের সবাই যে খুব ছোট ছিল তা মনে করবার কারণ নেই, শামুক-ঝিনুক-গেঁড়ি-গুগলি জাতের কোন কোন প্রাণীও হত

আকারে দৈত্যের মতো বড়। এখনও এরকম দানবাকৃতি নীচু স্তরের হাড়ছাড়া জানোয়ার যে নেই তা নয়; যেমন —অক্টোপাস, স্কুইড ইত্যাদি। পাথরের ভাঁজে ভাঁজে এদের অনেকের পাথুরে কঙ্কাল বা কঙ্কালের টুকরো পাওয়া গেছে। অনেকের কঙ্কাল পাওয়া না গেলেও দেহের ছাপ পাওয়া গেছে এবং তাই দেখেই পণ্ডিতেরা ঐসব সিদ্ধান্তে এসেছেন।

ডারউইন

শুধু তাই নয়, তাঁদের আর একটা সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাণীদের চেহারা, স্বভাব আর জীবনযাত্রার প্রণালী ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে একটু একটু বদলাতে বদলাতে ক্রমে একটি প্রাণী সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটি প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে ক্রমবিকাশ বা 'ইভলিউশন'। চার্লস ডারউইন (১৮০৯—১৮৮২ খ্রীঃ) নামে এক বড় পণ্ডিত এই মতবাদ প্রথম প্রচার করেন। শুধু প্রচার করেন না, নানা রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে তাঁর মতের প্রতিষ্ঠাও করেন।

॥ এযুগের হাড়ছাড়া দানব অক্টোপাস ॥

হাড়ছাড়া সামুদ্রিক প্রাণীদের কথা বলতে গেলে অক্টোপাসের কথাও অবশ্যই বলতে হবে। হাড়ছাড়া যেসব দানবাকৃতি প্রাণী এখনও সমুদ্রে বিভীষিকার মতো ঘুরে বেড়ায় তাদেরই একটি হচ্ছে অক্টোপাস। নেহাতই নীচু স্তরের প্রাণী —শামুক-ঝিনুকেরই জাতভাই এই অক্টোপাস। এরা মোলাস্কা (mollusca) জাতের প্রাণী। মোলাস্কা জাতের বেশির ভাগ প্রাণীরই উপরের খোলা আছে, কিন্তু অক্টোপাসের নেই। ওদের যে অমানুষিক শক্তি তাতে ওরা খোলা ছাড়াই আত্মরক্ষা করতে পারে।

অক্টোপাস হচ্ছে সেফালোপড (cephalopoda) শ্রেণীর জীব। তার মানে ওদের পা মাথা থেকে বেরিয়েছে। আসলে কিন্তু এগুলো পা না বলে শুঁড় বলাই ভাল। প্রত্যেক অক্টোপাসের এই রকম আটটা করে শুঁড় আছে; তাই থেকেই নাম হয়েছে অক্টোপাস
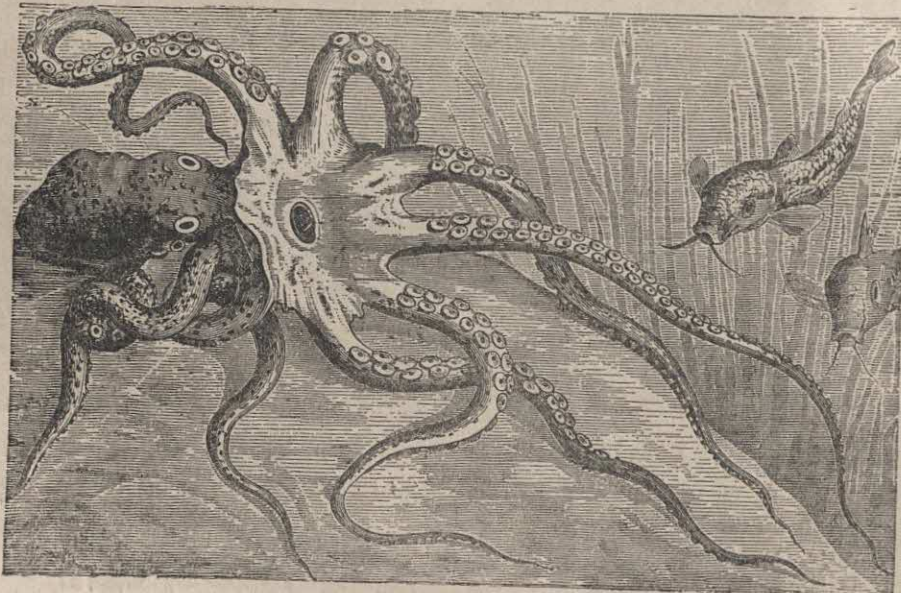
অক্টোপাস

বা আটপেয়ে। এই শুঁড়কে বিজ্ঞানীরা বলেন টেণ্টাক্‌ল্‌স্ (tentacles). এক-একটা শুঁড়ে অসংখ্য পেশী, তাই এদের জোরও অসম্ভব।

এই শুঁড়ই হচ্ছে অক্টোপাসের শিকার ধরার হাতিয়ার। শিকারকে আক্রমণ করে অক্টোপাস তাকে অজগর সাপের মতো আটটা শুঁড় দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরে প্রচণ্ডভাবে চাপ দিতে থাকে। অসম্ভব শক্তি সেই চাপে। তার উপর প্রতিটি শুঁড়ে আছে অসংখ্য চোষক (sucker), মানে, চুষবার যন্ত্র। সেই চোষক দিয়ে অক্টোপাস শিকারের গায়ের মাংস ছিঁড়ে নেয়, রক্ত চুষে নেয়। এক একটা শুঁড়ে ৩০০ চোষকও দেখতে পাওয়া গেছে।

এরা পুরোপুরি আমিষভোজী। আটটা শুঁড়ের মাঝখানে রয়েছে মাথা, দুটো ড্যাবডেবে চোখ, টিয়া পাখির মতো বাঁকানো মুখ, যা দিয়ে মাংস কুরে কুরে খাওয়া যায়।

অক্টোপাসের আর একটা মজা, ওদের গায়ের এক জায়গায় আছে একটা থলি যার মধ্যে থাকে কালো রঙের একরকম কালি বা রস। শত্রুর হাত থেকে পালাতে হলে ওরা ঐ কালি সজোরে জলের মধ্যে ছিটিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক কালি-গোলা জলে অন্ধকার হয়ে যায় আর ওরাও সেই ফাঁকে সরে পড়ে।

॥ হাড়ছাড়া ডাঙ্গার প্রাণী ॥

হাড়ছাড়া প্রাণী যেমন জলে আছে তেমনি ডাঙ্গাতেও নেহাত কম নেই। আগে যে ২১টা অমেরুদণ্ডী ফাইলামের কথা বলা হয়েছে সেগুলির মধ্যে অনেক-গুলিরই বাস ডাঙ্গায়। এদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী হচ্ছে আর্থ্রপডা (Arthropoda) বা 'সন্ধিপদ' প্রাণী। সন্ধিপদ মানে যাদের পায়ে গাঁট বা সন্ধি থাকে। চিংড়ি থেকে শুরু করে কাঁকড়া বিছে, মশা, মাছি, মৌমাছি, বোলতা, প্রজাপতি, পিঁপড়ে প্রভৃতি আমাদের অনেক পরিচিত পোকামাকড়ই এই দলে পড়ে।

॥ মৌমাছি ॥

মৌমাছি হচ্ছে সামাজিক জীব। দল বেঁধে কেমন চমৎকার চাক বেঁধে এরা বাস করে—দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। অনেক দূর থেকে ফুলের মধু সংগ্রহ করে এনে এরা চাকের মধ্যে জমিয়ে রেখে দেয়। চাকে রাখবার আগে সে মধুকে লালা মিশিয়ে ঘন করে নেয়। মধু ছাড়া এরা মোমও তৈরি করতে পারে আর সেই মোম দিয়েই তৈরী হয় ওদের চাক। চাকে তিন রকম মৌমাছি আছে—একটি স্ত্রী বা রানী, পুরুষ এবং কর্মী। রানীর প্রায় একমাত্র কাজ ডিম পাড়া। পুরুষরা তো কোন কাজই করে

কর্মী-মৌমাছি রানী মৌমাছি পুরুষ মৌমাছি

না। কাজ যা করার তা করে কর্মী-মৌমাছিরা। আসলে এরাও একরকম স্ত্রী-মৌমাছি, তবে এদের ডিম পাড়বার ক্ষমতা নেই। কোন্ মৌমাছি রানী হবে সেটা নির্ভর করে তার খাওয়া-দাওয়ার উপর। বিশেষ একরকমের ভালো খাবার (royal jelly) তার জন্য বরাদ্দ করা থাকে। তাই খেয়েই সে অন্যান্য কর্মী-মৌমাছিদের চাইতে আকারে বড় হয়ে রানীতে পরিণত হয়। মধু সংগ্রহ, চাক তৈরি করা, চাকে মধু রাখা, বাচ্চাদের খাওয়ানো, লালন-পালন সমস্তই কর্মী-মৌমাছিদের করতে হয়। দরকার হলে এরা হুল ফুটিয়ে লড়াইও করে। তবে চাকের অধিকার নিয়ে নতুন রানী-মৌমাছির সঙ্গে পুরোনো রানীরও কখন কখন লড়াই হয়। যে জেতে সেই চাকের উপর কর্তৃত্ব করে, যে হারে সে প্রাণে বেঁচে থাকলে কিছু কর্মী-মৌমাছি নিয়ে অন্যত্র ঘর বাঁধতে পালিয়ে যায়।

॥ পিঁপড়ে ॥

পিঁপড়ে পতঙ্গ জাতের প্রাণী এবং সম্ভবতঃ কীটপতঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান্। কেউ কেউ তো এমন কথাও বলেন যে প্রাণিজগতে মানুষের পরেই বুদ্ধিতে পিঁপড়ের জুড়ি নেই। কথাটা ঠিক হোক আর নাই হোক, পিঁপড়েদের অনেক চালচলন সভ্য মানুষকেও অবাক্ করে দেয়।

পিঁপড়েরাও সামাজিক জীব এবং দল বেঁধে বাসস্থান তৈরি করে একসঙ্গে হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ পিঁপড়েকেও বাস করতে দেখা যায়। আমরা যাকে পিঁপড়ের গর্ত বলি সেটাই হচ্ছে পিঁপড়ের বাসা। এই সব বাসাকে একটা গ্রাম বা শহর বলা চলে।

পিঁপড়েদের গরু—অ্যাফিড

সেটা লম্বা চওড়ায় সিকি মাইল পর্যন্ত জুড়ে থাকে। অতটুকু ছোট পিঁপড়ের পক্ষে অত বড় একটা বাসা তৈরি করার কথা শুনলে তো অবাক্ হবারই কথা! একজন বিজ্ঞানী বলেন ঐ একটা বাসাতে তিনি পাঁচ লক্ষ পিঁপড়েকে বাস করতে দেখেছেন। ৪০।৫০ তলা পিঁপড়ের বাসাও দেখতে পাওয়া গেছে। অনেক সময় আবার গাছের পাতা জুড়েও ওরা বাসা তৈরি করে। কাঠপিঁপড়েরা একাজে খুব ওস্তাদ।

পিঁপড়েরা আমাদের মতো "গরু" পুষে থাকে। পিঁপড়েদের এই গরু হচ্ছে অ্যাফিড নামে উকুন-জাতীয় একরকম পোকা। পিঁপড়েরা এই সব পোকার ডিম খুঁজে নিয়ে আসে, তারপর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে সেগুলিকে লালনপালন করে। এদের শরীরের পিছন দিকে আছে দুটি করে সূক্ষ্ম নল। নলের তলায় সুড়সুড়ি দিলেই নলের ভিতর থেকে একরকম মিষ্টি রস বেরিয়ে আসে। সেই রসই হচ্ছে পিঁপড়েদের "গরুর দুধ"।

পিঁপড়েদের মধ্যে মিস্ত্রী-পিঁপড়ে, সৈন্য-পিঁপড়ে, চাষী-পিঁপড়ে প্রভৃতি আরও নানা রকমের পিঁপড়ে আছে। তাদের এক এক দলের উপর এক এক ধরনের কাজের ভার থাকে।

আফ্রিকার জঙ্গলে একরকম দুরন্ত রাক্ষুসে পিঁপড়ে বাস করে। তাদের নাম "ড্রাইভার অ্যান্ট"। শুধু সংখ্যায় অনেক বলে এরা যে কোন জানোয়ারকে মেরে তার মাংস খুবলে খুবলে খেয়ে শেষ করে ফেলে। সামনে বড় বড় নদী পড়লেও এরা থেমে যায় না। পরস্পর জড়াজড়ি করে বড় বড় নদী এরা অক্লেশে সাঁতরে পার হয়ে যেতে পারে।

॥ কাঁকড়া বিছে ॥

কাঁকড়া বিছের লেজের আগায় বাঁকা হুলে সাংঘাতিক বিষ থাকে। ওরা কামড়ায় না, এই হুল ফুটিয়ে দেয়। তার ফলে আমরা দারুণ যন্ত্রণা পাই। পাহাড়ের সাংঘাতিক কাঁকড়া বিছের কামড়ে লোকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়।

কাঁকড়া বিছেরা গুবরে পোকা, ঝিঁঝিঁপোকা ও

মাঝখানে কাঁকড়া বিছে। দু'পাশে দু'রকম কেন্নো

মাকড়সাকেও আক্রমণ করে। ছোট ছোট ব্যাঙ বা ইঁদুররাও এদের হাত থেকে রক্ষা পায় না। কাঁকড়া বিছেরা শীতের সময়ে উপোস করে থাকে, পাঁচ-ছয় মাস পেটে কিছু পড়ে না।

ফরাসী প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ফেবার (Henri Fabre) মাসের পর মাস বিছেদের হালচাল পর্যবেক্ষণ করে এদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। স্ত্রী-বিছে পুরুষ-বিছের সঙ্গে কিছুদিন থাকবার পর তাকে ঠুকরে ঠুকরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে।

অনেকরকম বিছে দেখতে পাওয়া যায়। তেঁতুলে বিছেগুলো ঠিক চেপটা রেলগাড়ির মতো। কেন্নোর মতো এদের অনেক পা হয়। এরা খুব দ্রুত চলাফেরা করে আর আড়ালে, অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে।

॥ মাকড়সা ॥

মাকড়সাকে বাস্তুকার বা এঞ্জিনীয়ার বলা হয়। এদের তাঁতীও বলা চলে। এদেরও বিষ থাকে। বিছের মতো এদের হুল নেই। মা মাকড়সা একটা ছোট্ট নরম কৌটায় করে ডিম বয়ে নিয়ে বেড়ায়। বাচ্চা হলে সবাই মায়ের পিঠের উপর থাকে। সাত আট মাস বাচ্চারা কিছু খায় না। কি করে কিছু না খেয়ে এরা এতকাল কাটিয়ে দেয় তা একটা রহস্য। এক সময়ে এরা বড় হয়। তখন তাদের মায়ের গা ছেড়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে হয়। তখন তাদের মা তাদের ছেড়ে দেয়। তারা যদি ঠিক সময়ে মায়ের গা ছেড়ে চলে না যায় তো রাক্ষুসী মা তাদের খেয়ে ফেলে। বাচ্চারা বড় হয়ে গাছে বা বাড়ির ছাদে বা অন্য কোন জায়গায় উঠে যায়। তারপর ফিনফিনে জাল বুনে ফেলে। এই জাল হচ্ছে তাদের শিকার ধরার ফাঁদ। মাছি আর ছোট ছোট পোকা এই জালে পড়ে চটচটে আঠায় আটকে যায়। তখন তারা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে।

জলেও অনেকরকম মাকড়সা থাকে। কিন্তু মাত্র একরকম জাতের মাকড়সা জলেও জাল বোনে। অন্য যারা জলে থাকে তারা পাথরের ফাঁকে বা প্রবাল প্রাচীরে বাসা বাঁধে। ভাঁটার সময়ে
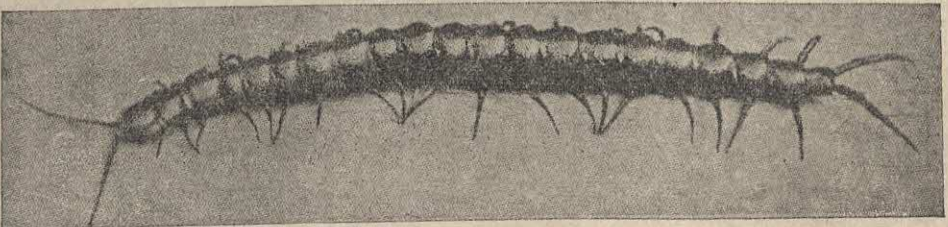
তেঁতুলে বিছে

মাকড়সার জাল

এরা বাইরে এসে সামুদ্রিক পোকা বা ছোট ছোট মাছ খায়।

এক জাতের জল-মাকড়সা পাতায় পাতায় জুড়ে এক রকম ভেলা তৈরি করে জলের উপর দিব্যি ভেসে বেড়ায়।

একরকম পাখি-ধরা রাক্ষুসে মাকড়সা আছে। এরা আকারে বেশ বড় হয়—লম্বায় ছ সাত ইঞ্চি। এদের গায়ে চুলের মতো লোম হয়। এরা ছোট ছোট পাখি এবং ইঁদুর প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীবদের বাচ্চা ধরে খায়। এদের বিষ খুব ভীষণ। পাখি বা জানোয়ার ধরে তার গা ফুটো করে এরা রক্ত শুষে খেয়ে নেয়। এদের লোম গায়ে লাগলে জ্বালা করে এবং যে জায়গায় লাগে সেই জায়গাটা ফুলে ওঠে।

দক্ষিণ আমেরিকায় ট্যারান্টুলা (tarantula) নামে একরকম ভয়ংকর বিষাক্ত মাকড়সা আছে। এদের কামড়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরা শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে আক্রমণ করে। এই মাকড়সা চার হাজার বিভিন্ন জাতের হয়ে থাকে।

॥ মাছি ও মশা ॥

মশা হুল ফুটিয়ে আমাদের রক্ত চুষে নেয়। শুধু অ্যানোফিলিসজাতীয় স্ত্রী-মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। সার রোনাল্ড রস (Sir Ronald Ross) এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। কলকাতার তখনকার পি. জি. হাসপাতালে বসে তিনি এ কাজ করেন, সে কথা ঐ হাসপাতালের উত্তরদিকের ছোট দরজায় লেখা আছে। আর, পায়ে গোদ হয় কিউলেক্স্ জাতের মশা কামড়ালে। মশার শরীরে আগে ম্যালেরিয়া বা গোদের জীবাণু প্রবেশ না করলে তার কামড়ে অসুখ হয় না।

পাখি-ধরা মাকড়সা

মাছি রোগজীবাণু ছড়ায়। এদের পায়ে বুরুশের মতো লোম থাকে। তাতে করেই এরা জীবাণু বহন করে বেড়ায়। পচা-গলা ফল, মাছ, জীবজন্তুর দেহে

মাছির ডিম

মাছিরা ডিম পেড়ে যায়। তাই থেকে মাছির জন্ম হয়। মাছি পাখায়, গায়ে, মুখে, পায়ে সব জায়গায় সব সময় জীবাণু বয়ে বেড়ায়।

মাছির শূককীট

আমাদের ঘরে দোরে যে মাছিদের সর্বক্ষণ দেখা যায় তারাও অনেক জাতের হয়। কোনও জাতের মাছি আবার শরীর থেকে রক্ত চুষেও খায়।

॥ প্রজাপতি ও মথ ॥

প্রজাপতি আর মথ (moth) দুটো আলাদা জাতের পতঙ্গ, কিন্তু আমরা কখনও কখনও ভুল

মাছির মূককীট

করে মথকেও প্রজাপতি বলি। কিন্তু দুয়ের মধ্যে তফাত আছে—তা মোটামুটি এই ঃ

প্রজাপতি দিনে উড়ে বেড়ায়, আর মথ উড়ে বেড়ায় রাতে। প্রজাপতি কখনও রাতে উড়ে বেড়ায়

পূর্ণাঙ্গ মাছি

না। তবে অনেক মথ দিনেও উড়ে বেড়ায়। প্রজাপতিদের শুঁড় (antennæ)-এর আগাটা মোটা,

প্রজাপতি ও তার শূককীট

ঠিক যেন ব্যায়াম করার মুগুর কিন্তু মথদের শুঁড় সরু। কিন্তু বারনেট (burnet) মথের শুঁড় প্রজাপতির শুঁড়ের মতোই।

স্থির হয়ে কোন কিছুর উপর বসলে প্রজাপতির ডানাগুলো পিঠের উপর খাড়া হয়ে থাকে। আর মথরা বসলে তাদের ডানা দুপাশে সমান হয়ে ছড়িয়ে থাকে, পিছনের ডানা দুটো সামনের ডানা দুটোর সঙ্গে জোড়া থাকে। কিন্তু এ তফাতও সবক্ষেত্রে খাটে না। স্কিপার (skipper) প্রজাপতিদের বসবার সময় তাদের ডানা মথদের ডানার মতো ছড়িয়ে পড়ে।

ডারউইন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মেঘের মতো প্রজাপতিদের উড়ে আসতে দেখেছিলেন। এদের নাম ম্যারিপোসা। তারা ১২০০ (বার শত) মাইল দূর থেকেও উড়ে এসেছে, দেখা গেছে।

প্রজাপতি ও মথেরা আশ্চর্য উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে। যে-সব পোকা প্রজাপতির ডিম খেতে ওস্তাদ তাদের চোখে ধুলো দেবার ব্যবস্থা এরা করে থাকে। এরা দেখতে ভারী সুন্দর। কতরকম রং, কত সুন্দর কারুকার্য এদের ডানায়। সেইজন্যে, ডাকটিকিট সংগ্রহ করবার মত প্রজাপতি সংগ্রহ করবার শখও অনেকের আছে।

মথ বা প্রজাপতি ফুলের মিষ্টি রস মাত্র পান করে। এরা শক্ত কোন আহার গ্রহণ করে না। কোন কোন জাতের মথ বা প্রজাপতির শরীরে চুষে নেবার উপযোগী কোন যন্ত্রই নেই।

মথ ও প্রজাপতিদের বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে লেপিডোপ্টেরা (Lepidoptera).

॥ গুটিপোকা ॥

চীনদেশে চার হাজার বছর ধরে সিল্কের বা রেশমের ব্যবসা চলছে। রেশম তৈরী হয় একজাতের পোকার গুটি থেকে, তাকে বলে গুটিপোকা। দেড় হাজার বছর আগে দুজন পারস্যদেশীয় ফকির চীন থেকে রেশমের গুটিপোকা চুরি করে এনেছিলেন। তাঁরা ফাঁপা বাঁশের মধ্যে ভরে সেগুলো ইওরোপে নিয়ে যান। সেগুলো থেকে ইটালি ও ফ্রান্সে গুটিপোকার চাষ শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইওরোপের গুটিপোকাদের এক রকম রোগ হয়েছিল। তার ফলে দেশের এক বড় শিল্প ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াল। এই রোগ নিরাময়ের কাজে হাত দিলেন ফ্রান্সের লুই পাস্তুর। তিনি এর আগে গুটিপোকার গুটি (cocoon) দেখেন নি এবং এ পতঙ্গের হালচাল তিনি কিছুই জানতেন না। তিনি সটান চলে গেলেন হেনরী (ফরাসী ভাষায় উচ্চারণ 'আঁরি') ফাব্র-এর কাছে। তিনি একটি গুটি দেখতে চাইলেন।

গুটিটি নিয়ে তিনি তা কানের কাছে নিয়ে নেড়ে বললেন, "এর ভিতর থেকে একটা শব্দ আসছে, এর ভিতর কি আছে ?"

ফাব্র বললেন, "chrysalis."

পাস্তুর বললেন, "তার মানে ?"

ফাব্র বুঝিয়ে দিলেন, "মথ হবার আগে সে যে-অবস্থায় পৌঁছেছে এটা হচ্ছে সেই অবস্থা।"

লুই পাস্তুর

(১) বাইসনে কুকুরে লড়াই।
(২) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

জীবজন্তু কীটপতঙ্গঃ

[(১) বাইসনে কুকুরে লড়াই। (২) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।]

(১) বাইসন গবাদি পশুজাতীয় জীব-বিশেষ। তবে গবাদি পশু যেমন গৃহ-পালিত জীব, এরা তা নয়। এদের বনে-জঙ্গলে, মাঠেময়দানে দেখতে পাওয়া যায়। ইওরোপ ও আমেরিকার নানা জায়গায় এদের দেখা যায়। হিংস্র জন্তুরা এদের প্রায়ই তাড়া করে। তা ছাড়া পাহাড়ের কোলের জঙ্গল থেকে বুনো কুকুরের দল এসে এদের প্রায়ই জ্বালাতন করে। একা থাকলে বাইসনকে বিব্রত হতে হয়। তবে একা থাকলেও বুনো কুকুরেরা প্রায়ই এদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। এদের গায়ের জোর ভীষণ। দলে ভারী থাকলে তো কথাই নেই, কুকুরেরা আক্রমণ করতে সাহসই করে না। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকটা কুকুর একটা বাইসনকে জ্বালাতন করছে। বাইসনটা শিং দিয়ে গুঁতিয়ে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করছে।

(২) পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপ-সাগরের ধারে বিস্তৃত এলাকা নিয়ে সুন্দর-বন। এই সুন্দরবনের লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলে যে ভয়ংকর বাঘ বাস করে তাকে বলা হয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। ভারতের নানা স্থানে ও এশিয়া মহাদেশের কোথাও কোথাও বাঘ দেখা যায়। কিন্তু এই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো শক্তিশালী ও সুশ্রী বাঘ আর পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় না।
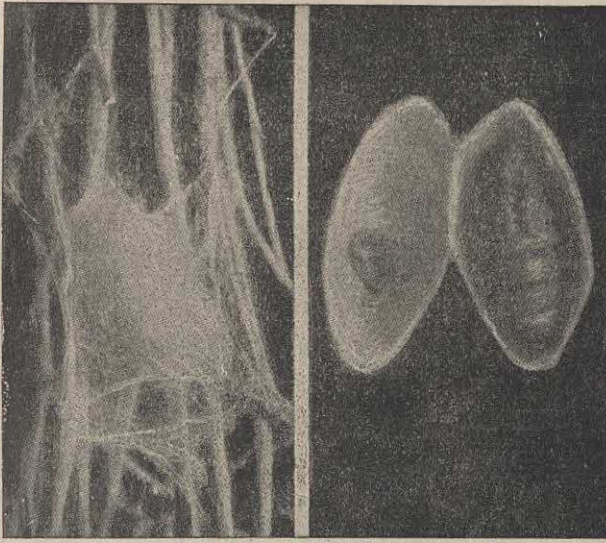
গুটিপোকার গুটি

বিজ্ঞানী পাস্তুর অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রত্যেক কোকুনেই কি এমনি chrysalis আছে?"

ফাব্‌র্ বললেন, "এই chrysalis-কে বাঁচাবার জন্যেই প্রজাপতি এই কোকুন বোনে।"

তারপর সব কিছু বুঝে নিয়ে পাস্তুর গবেষণা করে গুটিপোকার ব্যাধি সারিয়ে রেশম-শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

॥ পঙ্গপাল ॥

পঙ্গপাল একজাতীয় ফড়িং। কৃষি-ফসলের এত বড় শত্রু আর পৃথিবীতে নেই। অনেক রকমের কীট শস্যের ক্ষতি করে কিন্তু পঙ্গপাল সব খেয়ে শেষ করে দেয়। কোটি কোটি পঙ্গপাল উড়ে এসে যেখানে পড়ে সেখানকার গাছপালার পাতা সবই এরা একদিনে খেয়ে শেষ করে ফেলে। শত শত টন খাদ্যশস্য উজাড় করতে এদের বেশী সময় লাগে না। ডানার ক্ষমতা এদের অসাধারণ। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ভারতে কিংবা দক্ষিণ রাশিয়া থেকে কেনিয়া—ষাটটি দেশের উপর দিয়ে আকাশ অন্ধকার-করা ঝাঁকে ঝাঁকে এরা উড়ে আসতে পারে। এরা তিন ইঞ্চির চেয়ে বড় আকারের হয় না।

২·৫ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত একটি ঝাঁকে ১০০ কোটি পঙ্গপাল থাকে। এদের একদিনের আহার হ'ল ৩০০ টন খাদ্য।

১৯৫৮ সালে পূর্ব আফ্রিকায় যে ঝাঁকটি এসেছিল তারা ১০০০ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে ফেলেছিল আর তাতে ছিল ৪০,০০০ কোটি পঙ্গপাল। এরা ১,২০,০০০ টন খাদ্যশস্য শেষ করে ফেলেছিল।

শরীরের পিছনের ভাগ দিয়ে মাটিতে গর্ত করে এরা ডিম পাড়ে।

এরা এত ক্ষতি করতে পারে যে তার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়ে যায়। দক্ষিণ আমেরিকায় একবার একটি দেশ তার শত্রু এক দেশকে ছারখার করবার কাজে পঙ্গপালদের লাগিয়েছিল। বিপুল এক ঝাঁক পঙ্গপাল তাদের বাসা ছেড়ে ওড়বার আগেই সমস্ত জায়গাটাকে ঘিরে সাংঘাতিক এক আগুন জ্বালানো হল—শুধু একটা দিক খোলা রইল, সেদিকেই শত্রুদের দেশটা। তিনদিকে আগুন দেখে পঙ্গপালরা সেদিকেই উড়ে গেল। তারপর যা হল, তা আর বলতে হবে না।

॥ জোনাকি ॥

জোনাকির একরকম নিজস্ব আলো থাকে। রাতের আঁধারে এই আলো জ্বলে আর নেভে।
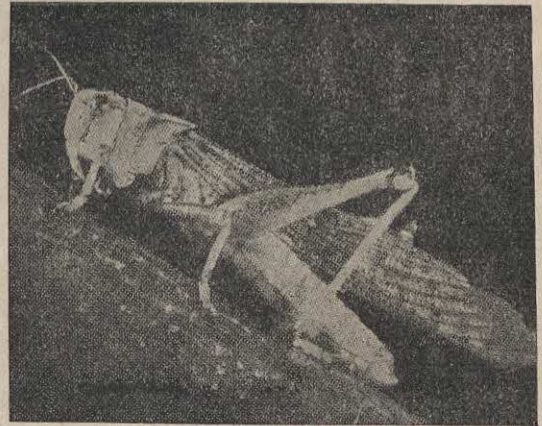
পঙ্গপাল

পঙ্গপাল মাটিতে গর্ত করে ডিম পাড়ছে

বাতাসের ধাক্কায় এরা যখন অন্ধকার রাতে ওঠানামা করে তখন ভারী সুন্দর দেখায়।

বাবুই পাখিরা তাদের বাসায় গোবর এনে তাতে জোনাকি পোকা গেঁথে রাখে। তাতে তাদের বাসায় রাতে বিনা খরচায় আলো জ্বলে।
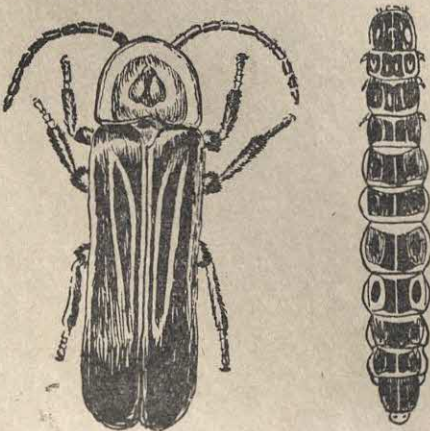
জোনাকি

॥ আরো অদ্ভুত সব পোকা ॥

লেডি-বার্ড পোকা

'লেডি-বার্ড' পোকা শীতকালে কোথাও লুকিয়ে থাকে। পরে বসন্তকাল এলে দেখা দেয়। এদের গায়ে কালো কালো ফোঁটা দেওয়া থাকে।

এক রকম পোকা (Boll Weevil) আমেরিকার কাপাস তুলো গাছে দেখতে পাওয়া যায়। এরা শীতকালে ঘুমায়, তারপর জেগে উঠে কাপাস তুলো গাছের পাতা খেতে থাকে। আমেরিকায় তুলো গাছের এরা পরম শত্রু।

॥ প্রথম হাড়ওয়ালা প্রাণী—মাছ ॥

সবার আগে যেসব অস্থিক বা হাড়ওয়ালা প্রাণী পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল তাদের বংশধররা কিন্তু আজও টিকে আছে। এই প্রাণী আর কেউ নয়—মাছ।

প্রাচীনকালে মাছেদের শরীরের অনেকটাই—বিশেষ করে মাথার দিক্‌টা থাকত খোলা দিয়ে ঢাকা। বাইরের গড়নটার একালের মাছের সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল থাকলেও হুবহু একালের মতো ছিল না।

বেঁচে থাকতে হলে সকলকেই শ্বাস নেবার জন্য বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয়। মাছেদেরও তা করতে হয়। বাতাসের মধ্যেই প্রধানতঃ অক্সিজেন

বেশী থাকলেও কিছু অক্সিজেন জলে-গোলা অবস্থায়ও পাওয়া যায়, আর মাছেরা,—শুধু মাছ কেন, ঐরকম জলের জীবরাই, —এই জলে-গোলা অক্সিজেনই শ্বাস-গ্রহণের জন্য ব্যবহার করে। হাওয়া থেকে অক্সিজেন নিতে হলে একরকম যন্ত্র চাই, তাকে বলে ফুসফুস (lungs). ডাঙ্গায় প্রাণীদের অক্সিজেন নেবার এই ফুসফুস আছে কিন্তু মাছেদের তা নেই। জল থেকে অক্সিজেন নেবার জন্যে তাদের থাকে কানকো বা ঝিল্লী। এই কানকোর সাহায্যেই ওরা জলে-গোলা অক্সিজেন টেনে নিতে পারে। ফুসফুস না থাকায় ডাঙ্গায় তুললেই মাছ মরে যায়। তবে কই-জাতীয় কয়েকটি মাছ ডাঙ্গায় তুললেও বেশ খানিকটা সময় বেঁচে থাকতে পারে। এর কারণ, কানকো ছাড়াও ওদের একটা করে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। তবে দুই-এক জাতের মাছের (lung-fish) ফুসফুসও দেখা যায়। সেটা সাধারণ নিয়ম নয়—কানকো
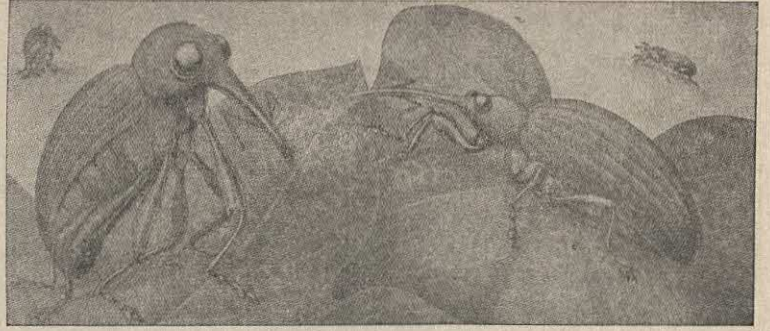
আমেরিকায় তুলো গাছের শত্রু পোকা

ছাড়া মাছের শরীরে থাকে একটা বাতাস-ভরা থলি, যাকে আমরা বলি মাছের পটকা। এই পটকাই মাছকে জলে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

মাছের মধ্যে অনেক কিম্ভূতকিমাকার মাছও দেখা যায়, যেমন 'চারচোখো' মাছ। অ্যাংলার (Angler) মাছেরা ছিপ দিয়ে মাছ ধরবার মতো কায়দায় মুখের কাছে ভুলিয়ে নিয়ে আসে শিকারকে। 'লণ্ঠন' মাছ থাকে সমুদ্রের একেবারে নীচের দিকে, সেখানে গভীর অন্ধকার। এদের দেহের দুপাশে সারি সারি
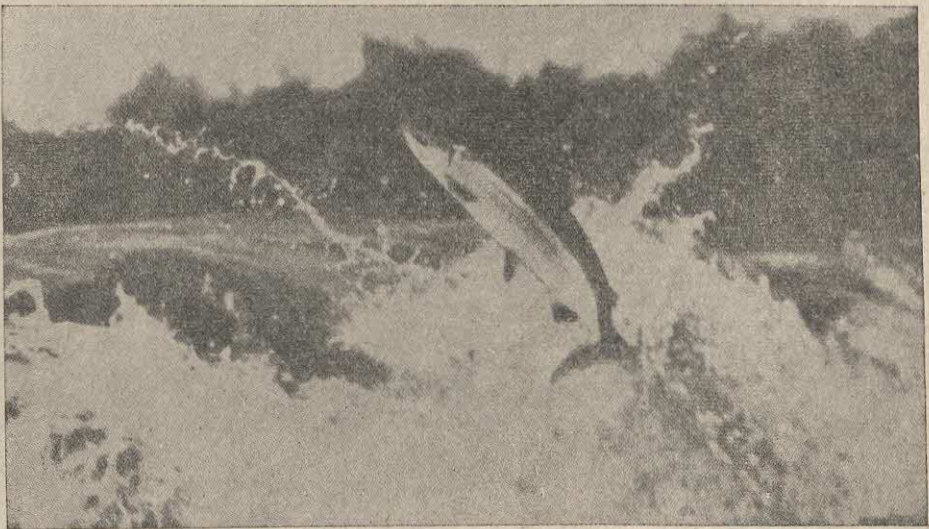
মাছ জলের উপর উঠছে
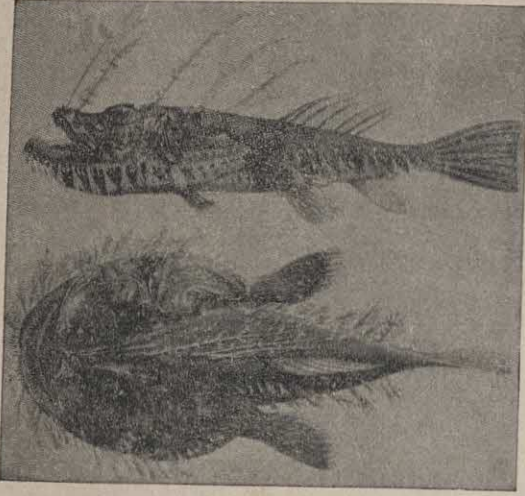
নেপচুন্‌স্‌ ফিশারম্যান (একধরনের মাছ)

গভীর সমুদ্রের বিচিত্র মাছ

কতকগুলো টর্চের বালবের মতো জিনিস বসানো; থেকে থেকে সেগুলো জ্বলে ওঠে আর তারই আলোয় মাছ দিব্যি জলের তলায় সব কিছু দেখে নিতে পারে। কোন কোন লণ্ঠন মাছের আবার শুধু একটাই লণ্ঠন সম্বল। কোন কোন মাছ আবার বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। বৈদ্যুতিক বান মাছ (ইলেক্‌ট্রিক ঈল) এই জাতীয় মাছ। এই জাতের কোন কোন বান মাছ ৫০০ ভোল্টের বিদ্যুৎও তৈরি করতে পারে। উড়ুক্কু মাছ বা ফ্লাইং ফিশ লাফ দিয়ে জলের উপরে ওঠে ও ডানায় ভর করে ওড়ার মতো বাতাসে ভেসে চলে। কোন কোন মাছ পাখিদের মতো বাসা বেঁধে সেই বাসায় ডিম পাড়ে। বাসা অবশ্য বাঁধা হয় জলের তলায়।

অ্যাংলার ফিশ

মাছেদের সম্বন্ধে আর একটি বড় কথা, সমুদ্রের মাছেরা অনেক সময়েই ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।

॥ হাঙ্গরের কথা ॥

হাঙ্গর বলতেই আমরা অত্যন্ত খল এবং হিংস্র-স্বভাবের প্রাণীই বুঝি। কেউ কেউ তো ওদের নামই দিয়েছে "সমুদ্রের আতঙ্ক"। হাঙ্গরকে ইংরেজীতে বলে শার্ক (shark). ঐ থেকে শার্ক কথাটারই অন্য অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে—ধূর্ত, শয়তান। কিন্তু সব হাঙ্গরই হিংস্র নয়। নিজেদের চাইতে আকারে অনেক বড় জানোয়ারকে আক্রমণ করতেও তাদের বাধে না। তিমি, অক্টোপাস সকলের মাংসই তাদের কাছে প্রিয়। এরা লম্বায় এক একটা প্রায় ৩০।৪০ ফুট পর্যন্ত হয়। বাঘা-হাঙ্গরের (tiger shark) গায়ে বাঘের মতো ডোরা কাটা থাকে, তাই ঐ নাম। শেয়াল-হাঙ্গরের লেজটা খুব বড় হয়, আর সেই লেজের ঝাপটায় শত্রুকে কাহিল করে ফেলে।

॥ জলের প্রাণী ডাঙ্গায় এল ॥

পৃথিবীতে এক এক সময় এক এক রকম আবহাওয়া এসে পড়ে। কখনও হয়তো চলে অবিরাম
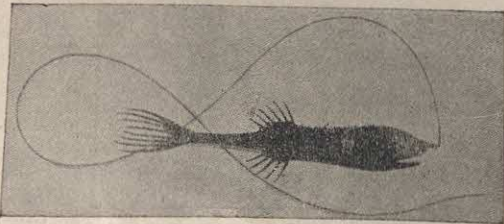
বর্ষণ, কখনও অবিরাম তুষারপাত, আবার কখনও বা শুরু হয় প্রচণ্ড খরা। অবশ্য এই সময়গুলো দু-চার-দশ বছর নয়। এক একটা যুগ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলতে পারে। এই রকম এক খরার যুগে যখন অনেক জায়গায় জল শুকিয়ে শুকনো খটখটে বা কাদাটে হয়ে গেল তখন বাঁচার তাগিদেই অনেক জলের জীবকে ধীরে ধীরে ডাঙ্গায় উঠে আসতে হল এবং ক্রমবিকাশের ফলে তাদের দেহের কলকবজা ডাঙ্গার উপযোগী হয়েই গড়ে উঠল।

প্রথম প্রথম যারা এল তাদের পুরোপুরি ডাঙ্গার বাসিন্দা বলা যায় না, তারা হচ্ছে উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়ান (amphibian). এরা কখনও জলে, কখনও ডাঙ্গায় থাকত।

॥ ব্যাং ॥

প্রথম যুগে উভচর প্রাণীর সংখ্যা নিশ্চয় খুব বেশী ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে তারা আবার বদলাতে বদলাতে অন্য ধরনের প্রাণী হয়ে গেল ; তবে এখনও পৃথিবীতে কিছু কিছু উভচর প্রাণী দেখা যায়। আমাদের পরিচিত ব্যাংই এই রকম প্রাণী।

ব্যাং যখন প্রথম ডিম থেকে বেরোয় তখন সে পুরোপুরি জলচর প্রাণী। তাকে আমরা বলি ব্যাঙাচি। দেখতে প্রথমটা সে প্রায় চুনো মাছের মতোই। পা বলে কিছু নেই, থাকার মধ্যে আছে এক লেজ। তখন সে মাছের মতো কানকো দিয়েই জলে-গোলা অক্সিজেন শ্বাসরূপে গ্রহণ করে। এই ব্যাঙাচি কিন্তু বেশী দিন ঐ রকম থাকে না। কিছুদিন পরেই ওদের চেহারা বদলাতে শুরু হয়। কানকো চামড়ায় ঢাকা পড়ে, সেখানে ফুসফুস গজাতে থাকে। লেজের দুপাশে প্রথমে দেখা দেয় এক জোড়া পা, তারপর সামনের দিকে আর এক জোড়া। তারপর লেজটা খসে যায়, লম্বা মুখটাও থ্যাবড়া হয়ে আসে, তখন আর তার জলে থাকলে চলে না, ডাঙ্গায় উঠে সোজা বাতাস থেকে নিঃশ্বাস নিতে হয়। তখন সে পুরোপুরি স্থলচর প্রাণী হয়ে যায়।

ব্যাং

ব্যাংও অবশ্য নানা জাতের হয়। জল ছেড়ে এলেও কেউ কেউ বেশির ভাগ সময় জলের তলায় থাকতেই ভালবাসে ; যেমন, সোনা ব্যাং। কেউ ভালবাসে সেঁতসেঁতে ডাঙ্গা ; যেমন, কুনো ব্যাং, কোলা ব্যাং। বেশির ভাগ ব্যাংই পোকামাকড় ধরে খায়, তবে আমেরিকায় বুলফ্রগ নামে একরকম বড় জাতের (৭-৮ ইঞ্চি লম্বা) ব্যাং আছে তারা পাখি, মাছ, ইঁদুর, এমন কি বাগে পেলে ছোট ছোট সাপ ধরেও খায়। উভচর প্রাণীরা অনেকেই সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়। এই সময় ওদের দেহ খুব নিস্তেজ হয়ে পড়ে, প্রাণটা শুধু ধুকধুক করে। শীতের শেষে আবার ওরা যেন নতুন জীবন পেয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সরীসৃপের মধ্যেও এরকম দেখা যায়। এই ঘুমকে বলে শীতস্তম্ভ (hibernation).

॥ সরীসৃপ ॥

সত্যিকার প্রথম স্থলচর প্রাণী হচ্ছে সরীসৃপ বা রেপটাইল (reptile) অর্থাৎ টিকটিকি, সাপ, কচ্ছপ, গিরগিটি এদের পূর্বপুরুষেরা। তবে কোন কোন সরীসৃপ আজও জলের মায়া ছাড়তে পারে নি ; যেমন, কুমির।

বিজ্ঞানীদের এই রকম ধারণা যে, প্রধানতঃ মাছ এবং কিছুটা উভচর থেকেই ক্রমবিকাশের ফলে সরীসৃপের জন্ম। জলে চলাফেরার কাজে দরকার হয় পাখনা, মোড় ফিরবার জন্য দরকার হয় লেজ। ডাঙ্গায় কিন্তু পাখনা কোন কাজে লাগে না। পরবর্তী কালে সেইগুলিই হয়ে দাঁড়ায় পা।

নানারকম ডাইনোসর

মাছ থেকে সরীসৃপে রূপান্তরিত হবার আগে দুয়ের মাঝামাঝি কিছু জীবও যে জন্মেছিল তাতে সন্দেহ নেই। একেবারেই তো লাফ দিয়ে পরিবর্তনটা হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়। উভচর নিশ্চয়ই এই মাঝামাঝি দলে পড়ে। কিন্তু এর একটা চমৎকার নমুনা পাওয়া গেছে ইক্‌থিওসরস্ (Icthyosaurus)-এর মধ্যে। যাকে বাংলায় বলা যায় মৎস্য-সরীসৃপ।

সে প্রাণীটি অবশ্য এখন আর পৃথিবীতে নেই—হয়তো কয়েক কোটি বছর আগেই লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু ওর ফসিল পাওয়া গেছে, আর তাই থেকেই জীবটির স্বরূপ কিছুটা আন্দাজ করা গেছে। এদের চেহারা ছিল কতকটা মাছের মতো, কতকটা কুমিরের মতো।

মাছেদের যুগের পরেই এল পুরোপুরি সরীসৃপের যুগ। যাকে ইংরেজিতে বলে 'রেপটাইল এজ'। সে একদিন গেছে। মানুষ তখন কোথায়? মানুষের আবির্ভাব হয়েছে তার বেশ কয়েক কোটি বছর পরে। তখন পৃথিবীতে এই সরীসৃপেরাই রাজত্ব করত ডাঙ্গার উপর। তাদের মধ্যে কতক ছিল অতিকায় সরীসৃপ। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন ডাইনোসর (dinosaur) বা দানব-সরীসৃপ। ওদের মধ্যে শান্ত-স্বভাব নিরামিষ-ভোজী ডাইনোসররা আকারে বড় হত সত্তর-আশি ফুট বা তার চেয়েও লম্বা। নিরামিষভোজী ডাইনোসরের, ফসিল কঙ্কাল পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা ল্যাটিন শব্দ থেকে এদের নানা নাম দিয়েছেন ; যেমন ডিপ্লোডোকাস, ব্রণ্টোসরস, ইগুয়ানোডন, স্টিগোসরস। এদের কারো কারো গলা এত লম্বা ছিল যে উঁচু উঁচু গাছের মগডালের পাতাও অনায়াসে গলা বাড়িয়ে খেতে পারত।

মাংসাশী ডাইনোসররা (যেমন অ্যালোসরস, টিরানোসরস) আকারে একটু ছোট হলেও স্বভাবে ছিল দুর্দান্ত। ওদের অতিকায় ধারাল দাঁত, তীক্ষ্ণ নখ থেকেই ওদের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মাটি খুঁড়ে এই সব ডাইনোসরের পুরো কঙ্কালও কোন কোন জায়গায় পাওয়া গেছে। যেখানে পুরো কঙ্কাল পাওয়া যায় নি সেখানেও টুকরো টুকরো ভাঙ্গা কঙ্কাল জুড়ে নিয়ে পণ্ডিতেরা আসল জীবটির চেহারার একটা আভাস দিয়েছেন। নিরামিষাশীদের তুলনায় 'একটু ছোট' হলেও, এদের অনেকেই এখনকার হাতির চাইতে বড় হত। কেউ কেউ হাতির মতো চার পায়ে ভর
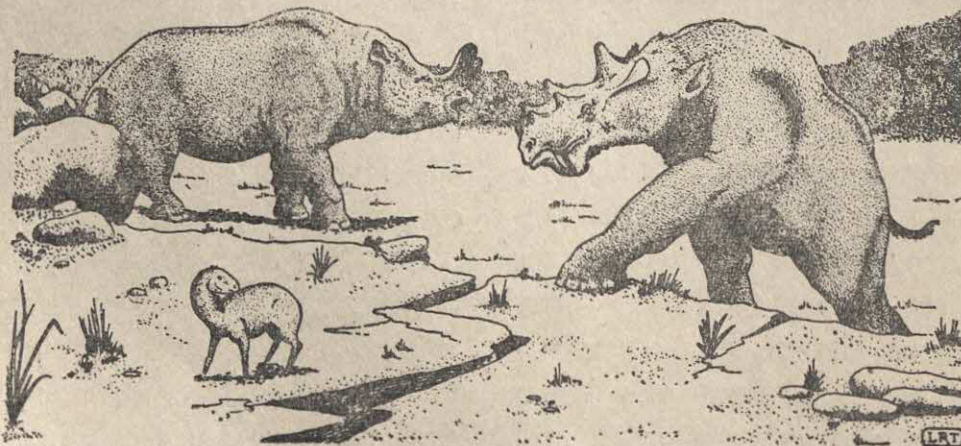
প্রাগৈতিহাসিক গণ্ডার

ব্রণ্টোসরস

দিয়েই চলত কিন্তু অনেকেই পিছনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলত—ক্যাঙারুর মতো এদের সামনের পা দুটো হত ছোট—অনেকটা হাতের মতো। সির‍্যাটোসরস, সিটিওসরস, মেগালোসরস, টির‍্যানোসরস—কত রকম নাম দেওয়া হয়েছে এই সব অতিকায় মাংসাশী ডাইনোসরদের। সির‍্যাটোসরসদের নাকের ডগায় ছিল গণ্ডারের খড়্গের মতো একটা শিং। কারো বা থাকত এক বা একাধিক শিং। স্টিগোসরসের সারা পিঠ জুড়েই ছিল খাড়া বড় বড় তিনকোনা হাড়, পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা। তবে এই স্টিগোসরস হিংস্র ছিল না; তাছাড়া এদের মাথাটা শরীরের তুলনায় এত ছোট হত যে তাতে মনে হয় ওদের বুদ্ধি বলে তেমন কিছু ছিল না। মগজ থেকেই তো বুদ্ধি গজায়, আর এটুকু মাথায় আর কতটুকু মগজ আঁটতে পারে।

॥ এ যুগের সরীসৃপরা ॥

সেই অতিকায় সরীসৃপদের যে-সব এখনও টিকে রয়েছে তারা কিন্তু আকারে নেহাতই ছোটখাট। টিকটিকি, গিরগিটির কথা তো আগেই বলেছি। বহুরূপীও ওদের দলে পড়ে। তবে কিছু কিছু অতিকায় গিরগিটি এখনও কোন কোন জায়গায় অল্পস্বল্প দেখা যায়। তাদের দেখে তাদের পূর্বপুরুষদের কথা মনে পড়ে; যেমন, ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি কোমোডো দ্বীপের গিরগিটি, যাদের বলা হয় কোমোডো ড্রাগন। লম্বায় এক-একটা ১০।১২ ফুট পর্যন্ত হয়। এরাও মাংসাশী এবং সেই কারণেই বেশ হিংস্র। বুনো ছাগল, শুয়োর, এমন কি বাগে পেলে এরা হরিণ ধরেও খেতে ছাড়ে না। পাখি আর তাদের ডিম এদের প্রিয় খাদ্য।

অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে মনিটর (Monitor) নামে আর এক জাতের অতিকায় গিরগিটি দেখতে পাওয়া যায় যারা লম্বায় অত বড় না হলেও পাঁচ-ছ' ফুট পর্যন্ত হয়। এরা কুমিরের ডিম খেতে খুব ভালোবাসে এবং তারই লোভে পড়ে অনেক সময়ে কুমিরের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। কুমির ওদের ধরে খেয়ে ফেলে।

কুমিরও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী এবং আকারেও নেহাত ছোট নয়। মিশরের নীল নদে তিরিশ ফুট লম্বা কুমিরও হামেশাই দেখা যায়। ক্রোকোডাইল জাতীয় কুমির আকারে সবচেয়ে বড়, হিংস্রও খুব। বাগে পেলে যে কোন বড় জন্তুকেই ডাঙ্গা থেকে টেনে নিয়ে যায়। মানুষের মাংসও খুব ভালোবাসে।

অ্যালিগেটর আর এক জাতের বড় কুমির। আমাদের দেশে দেখা যায় না, দেখা যায় চীন এবং আমেরিকায়। ক্রোকোডাইলের মতো এরা অত বড় না হলেও কুড়ি ফুট লম্বা অ্যালিগেটরও দেখা গেছে। এরা সাধারণতঃ মানুষ-খেকো নয়, তবে বড় বড় যে কোন জন্তুকেই আক্রমণ করে। ঘড়িয়াল হচ্ছে ছোট কুমির। আমাদের দেশের নদীনালায় প্রচুর
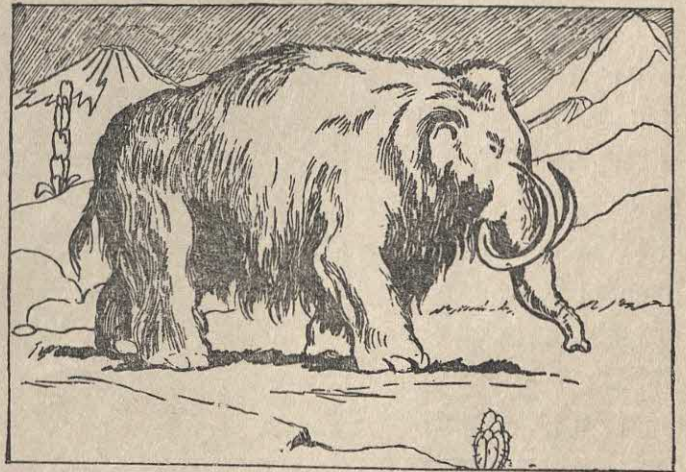
ম্যামথ

বহুরূপী

আছে। এরা মানুষ-খেকো নয়,—মাছ-খেকো, তাই এদের আর এক নাম মেছোকুমির। অন্য কুমিরদের মুখ যেমন ক্রমে সরু, এদের তা নয়। এদের লম্বা মুখটা আগাগোড়া একভাবে সরু।

॥ বিভিন্ন শ্রেণীর সাপ ॥

সরীসৃপদের একদল পা হারিয়ে সাপ হয়ে গেছে।

সব সাপকেই আমরা ভীষণ ভয় করি। কিন্তু মজা এই যে, অধিকাংশ সাপেরই বিষ নেই এবং থাকলেও, সকলের বিষ মারাত্মক নয়। কিন্তু কোন্‌টা বিষধর, কোন্‌টা নয়—সঠিক জানা আমাদের পক্ষে শক্ত। তাই সব সাপ থেকেই দূরে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিষধর সাপের মধ্যে শঙ্খচূড়, গোক্ষুর বা গোখুরা, কেউটে, চন্দ্র-বোড়া প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র এবং এদের কামড়ও মারাত্মক। গোক্ষুর সাপ যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে তখন তার ঠিক মাথার নীচে খানিকটা জায়গা ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ে। চলতি কথায় ওকে বলে সাপের ফণা ধরা। ঐ ফণার পেছনে গোরুর পায়ের খুরের মত একটি দাগ থাকে। ফণা ধরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের চোয়াল থেকে দুটো লম্বা দাঁত বেরিয়ে পড়ে। মুখ বন্ধ করলে এ দুটো আবার চোয়ালের সঙ্গে মিশে যায়। এই দাঁত দুটোকেই বলে বিষ-দাঁত।

আর একটি বিষধর সাপের কথা এখানে বলা হচ্ছে—সেটি ঝুমঝুমি সাপ (rattle snake). এরা যখন পাথুরে রাস্তা দিয়ে চলে তখন এদের লেজের ডগার খোলা আলগা কয়েকখানা হাড় পাথরে ঠোক্কর লেগে একটা খটখট আওয়াজ হয়—ইংরেজিতে যাকে বলে র‍্যাটলিং (rattling). সেই থেকে ওর নাম হয়েছে র‍্যাটল সাপ। আমাদের দেশে এ ধরনের সাপ নেই। আমেরিকায় এই ধরনের সাপ দেখতে পাওয়া যায়।

সবচেয়ে বড় জাতের সাপকে আমরা বলি অজগর অর্থাৎ যে সাপ ছাগল গিলে খায়। সত্যি একটা ছাগল গিলে খাওয়া অজগরের কাছে কিছুই কঠিন নয়। ছাগল কেন, তার চেয়েও বড় জানোয়ার—শুয়োর, হরিণ, বাঘ, মানুষ—সবই সে গিলে খেতে পারে।
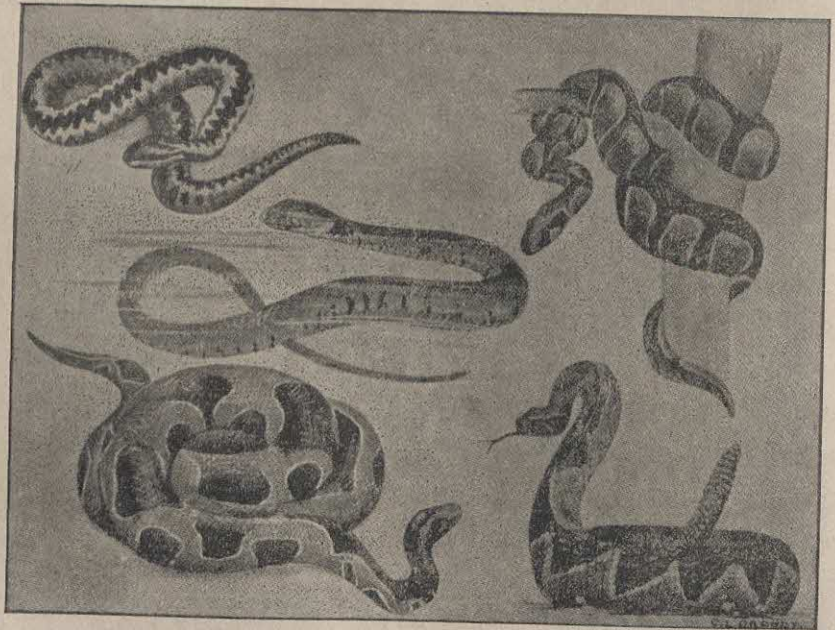
নানাধরনের সাপ

ঈগল পাখির বাঁদর শিকার।

জীবজন্তু কীটপতঙ্গঃ

[ঈগল পাখির বাঁদর শিকার।]

পৃথিবীর বনেজঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে, মাঠেময়দানে কত যে পাখি আছে তা বলে শেষ করা যায় না। এই সব পাখির কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কোনটা হিংস্র, কোনটা নিরীহ। সব পাখির মধ্যে ঈগল খুব শক্তিশালী। এরা আকারেও বেশ বড় হয়। ঈগল হিংস্র পাখি। Golden Eagle, Twany Eagle, Spotted Eagle, Lesser Spotted Eagle ইত্যাদি নানা জাতের ঈগল আছে। এক শ্রেণীর ঈগল ভেড়া, ছাগল, বাঁদর ইত্যাদি মেরে খায়। মেয়ে-ঈগলই শিকার ধরে।

এখানে দেখা যাচ্ছে, একটা ঈগল ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বাঁদর ধরে তার দেহে নখর বসিয়ে দিয়েছে। যতক্ষণ না রক্ত বেরিয়ে গিয়ে বাঁদরটি মারা যায় ততক্ষণ ঈগল তাকে শক্ত করে ধরে রাখছে। বাঁদর তার সকল শক্তি দিয়ে ঈগলের কবল থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারে নি (১ম ছবি)। ২য় ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বাঁদরটি মারা গেছে। ঈগল তাকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ৩য় ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ঈগল পাখা বিস্তার করে রণমূর্তি ধারণ করেছে। পাছে আর কোন জীব তার শিকারে ভাগ বসায়, তাই সে এইভাবে সকলকে ভয় দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে এক দল পুরুষ-ঈগল সেখানে এসে হাজির হবে। মেয়ে-ঈগলটি তার সঙ্গী পুরুষ-ঈগলদের নিয়ে শিকারটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। এইভাবে ঈগল ভেড়া, ছাগল ইত্যাদিও মেরে খায়।

অজগর নানা জাতের আছে। আমাদের দেশে ময়াল (Python) এই জাতের সাপ। লম্বায় এরা ২০।২৫ ফুট হয়। সেই অনুপাতে মোটাও হয়। আমেরিকায়—বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকায় আমাজন অঞ্চলে অ্যানাকোণ্ডা (anaconda) নামে এক জাতের অজগর সাপ আছে, যারা লম্বায় আরও বড়, ৩০।৩২ ফুট পর্যন্ত হয়। সেই তুলনায় মোটাও হয়। শিকার সামনে পেলে অজগর সাপ বিদ্যুদ্বেগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; তারপর সারা শরীর দিয়ে তাকে পেঁচিয়ে ধরে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। প্রচণ্ড তার শক্তি। সে চাপে যে-কোন জানোয়ারের দম বন্ধ হয়ে যায়, হাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়েও যেতে পারে। শিকারকে কাবু করে অজগর সাপ তাকে আস্ত গিলে ফেলে।

॥ সরীসৃপ থেকে পাখি ॥

সাধারণ সরীসৃপের পা আছে, সাপের তা নেই। সাপেরা সাধারণ সরীসৃপের মতো না হলেও বিজ্ঞানীরা শ্রেণীবিভাগ করার সময় ওদের সরীসৃপদের দলেই ফেলেছেন। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আছে রেপটাইল হাউস (reptile house) বা সরীসৃপ-গৃহ। সেখানে ঢুকলে দেখা যাবে কুমিরের সঙ্গে একই ঘরে নানারকম সাপও রাখা হয়েছে। কিন্তু এই সরীসৃপ থেকেই ক্রমে আর এক ধরনের প্রাণীর সৃষ্টি
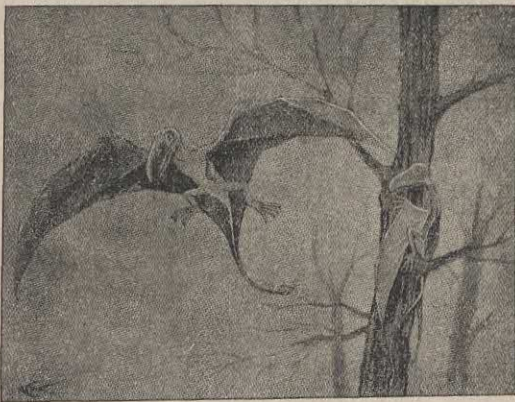
টেরোডাকটিল

বাচ্চাসহ পাখি

হয়েছে যারা সরীসৃপ থেকে একেবারেই আলাদা। এরাই হচ্ছে পাখি—বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'এভিজ' (Aves).

তখনও তারা সরীসৃপ,—পুরোপুরি পাখি হয় নি। পাখা গজালেও তা পাখির মতো পালকের ডানা নয়—অনেকটা বাদুড়ের মতো চামড়ার পর্দা দিয়ে জোড়া। মুখে দাঁতও ছিল, যদিও ঠোঁট ক্রমে ছুঁচলো হয়ে আসছিল। লম্বা লেজও ছিল। এদের আমরা উড়ুক্কু সরীসৃপ বলতে পারি। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন টেরোডাকটিল (Peterodactyl).

এই টেরোডাকটিলরাও অনেকেই আকারে বিরাট হত। পাখা ছড়িয়ে দিলে সে পাখা ২৫।৩০ ফুট লম্বা হত। এদের অনেকে যে মাংসাশী ডাইনোসর (dinosaur)-এর মতোই হিংস্র ছিল তা তাদের বড় বড় ধারাল দাঁত দেখলেই বোঝা যায়। তাদের বিরাট ফসিল (fossil) বিজ্ঞানীরা অনেক উদ্ধার করেছেন। এই সব টেরোডাকটিলরাই যে পাখির পূর্বপুরুষ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তারপর ১৪ কোটি বছর ধরে পক্ষিজগতে কত না ওলটপালট হয়েছে। আজ পৃথিবীতে ৩০ হাজার জাতের পাখির হিসেব পাওয়া যাবে।

বেশির ভাগ পাখিই দেখতে খুব সুন্দর এবং অনেকেরই কণ্ঠস্বর বেশ মিষ্টি। তাই আমরা পাখির ডাককে বলি পাখির গান। ছোটবড় নানান জাতের পাখি আছে। স্বভাবেও তাদের মধ্যে অনেক তফাত।

কেউ থাকে জলে, কেউ স্থলে, কেউ লোকালয়ে, কেউ গভীর জঙ্গলে, আবার কেউ বা উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় বাসা বাঁধে। বাসাও অনেক রকমের—কোনটা ঝুড়ির মতো, কোনটা পুঁটলির মতো, কোনটা মৌচাকের মতো, কোনটা গোল বলের মতো। কারও বাসা বলতে এক একটা কাদার ঢিবি। ডিম পাড়ার সময় বেশির ভাগ পাখিই বাসা তৈরি করে সেখানে ডিম পাড়ে। কেউ কেউ আবার বাসা বাঁধতে জানে না। সাধারণতঃ খড়কুটো, ঘাস, পালক, কাদা আর মুখের লালা হচ্ছে এই বাসা তৈরির জিনিস। বাবুই পাখির বাসা বেশ উলটানো বোতলের মত নিখুঁত, সেখানে তলা দিয়ে ঢুকতে হয়। গ্রেব পাখির বাসা আবার নৌকোর মতো জলে ভাসে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য বাসা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বাওয়ার বার্ড বা কুঞ্জ পাখির। বাসা তো নয়, যেন এক একটি কুঞ্জবন। সে বাসা সাজাবার জন্য লতাপাতা, ফুল, শামুক, ঝিনুক, ভাঙ্গা পাথর কত জিনিসই না ওরা ব্যবহার করে। অনেক সময় এজন্য লোকালয়ে গিয়ে তারা রঙচঙে কাগজ, কাপড়ের টুকরো, ফেলে দেওয়া দিয়াশলাই বাক্সও নিয়ে আসে।

পাখি সাধারণতঃ উঁচু জায়গায়, যেমন গাছের ডালে, পাহাড়ের উপরে, বাড়ির ছাদে বাসা বাঁধে। আবার, অনেক পাখি মাটিতেও বাসা করে তাতে ডিম পাড়ে।

'ঈগল পাখি পাখির রাজা'। ঈগল খুব হিংস্র পাখি। আকারেও বেশ বড় এবং এদের গায়ে

পাখির বাসা ও ডিম
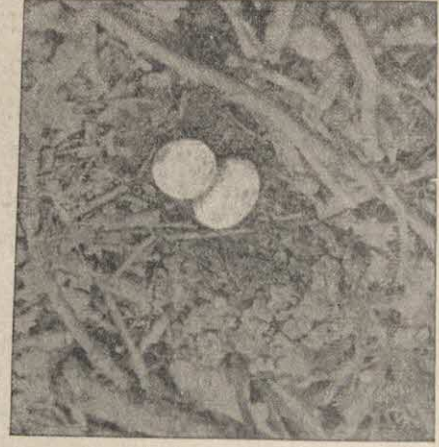
মাটিতে পাখির বাসায় ডিম

ভয়ানক শক্তি। উপর থেকে ছোঁ মেরে ভেড়ার পাল থেকে একটা আস্ত ভেড়াকে নখে বিঁধিয়ে তুলে নেওয়া এদের পক্ষে অতি সহজ কাজ। এরা সর্বভুক্। যে কোন জানোয়ারকেই বাগে পেলে ধরে খেতে ছাড়ে না। একবার একটা পোষা ঈগল একটা আস্ত বাঁদর খেয়ে ফেলেছিল, সেটাও ছিল পোষা। সবচেয়ে বড় জাতের ঈগল হচ্ছে সামুদ্রিক ঈগল। এরা পাখা ছড়ালে ১০।১২ ফুট জায়গা ঢাকা পড়ে। মাছই এদের প্রধান খাদ্য।

॥ ধনেশ পাখি ॥

আসামের জঙ্গলে ধনেশ পাখি (hornbill) দেখতে পাওয়া যায়। শরীরের তুলনায় এদের ঠোঁটটি প্রকাণ্ড। ঠোঁটের উপর আবার একটা উলটানো খাঁড়ার মতো অংশ লাগানো থাকে। ওড়িশায়ও (উড়িষ্যায়) এ পাখি দেখতে পাওয়া যায়। ওদেশে এ পাখির নাম "কুচিলা খাঁই"। এ পাখির ঠোঁট ও হাড় থেকে নানা রকম ওষুধ তৈরী হয়। বেদেরা এ পাখির হাড় বিক্রি করে।

এখনকার পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে উটপাখি (ostrich)। ওরা অবশ্য উটের মতো অত উঁচু

তবে তারা তেমন উন্নত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর পর লেমুর জাতীয় প্রাইমেটিজরা দেখা দেয় এবং তার পর একে একে দেখা দেয় বানর, বনমানুষ বা এপ এবং শেষকালে মানুষ।

একমাত্র মানুষ আর বেবুন ছাড়া প্রাইমেটিজ জাতের সমস্ত প্রাণীকেই গেছো প্রাণী বলা চলে। অন্যান্য প্রাণীদের চাইতে এদের দেহের গঠনের তফাত সহজেই নজরে পড়ে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে মুখের ছুঁচলো ভাব কমে গিয়ে কেমন একটা থ্যাবড়া ভাব এসে গেছে। চোখ দুটিও মাথার দুই দিকে না বসে সামনাসামনি সোজা ভাবে বসানো। চারটে পা'র সামনের দুটো হাতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর আগে আর কোন জানোয়ারই এদের মতো সামনের পা দুটোকে হাতের মতো ব্যবহার করতে পারে নি।

লেমুর (lemur) প্রাইমেটদের (Primate) দলে থাকলেও অন্যান্য প্রাইমেটদের থেকে ওরা একটু অন্য রকম। মাদাগাস্কারে এদের প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়।

বানর, যাকে চলতি কথায় আমরা বলি বাঁদর,
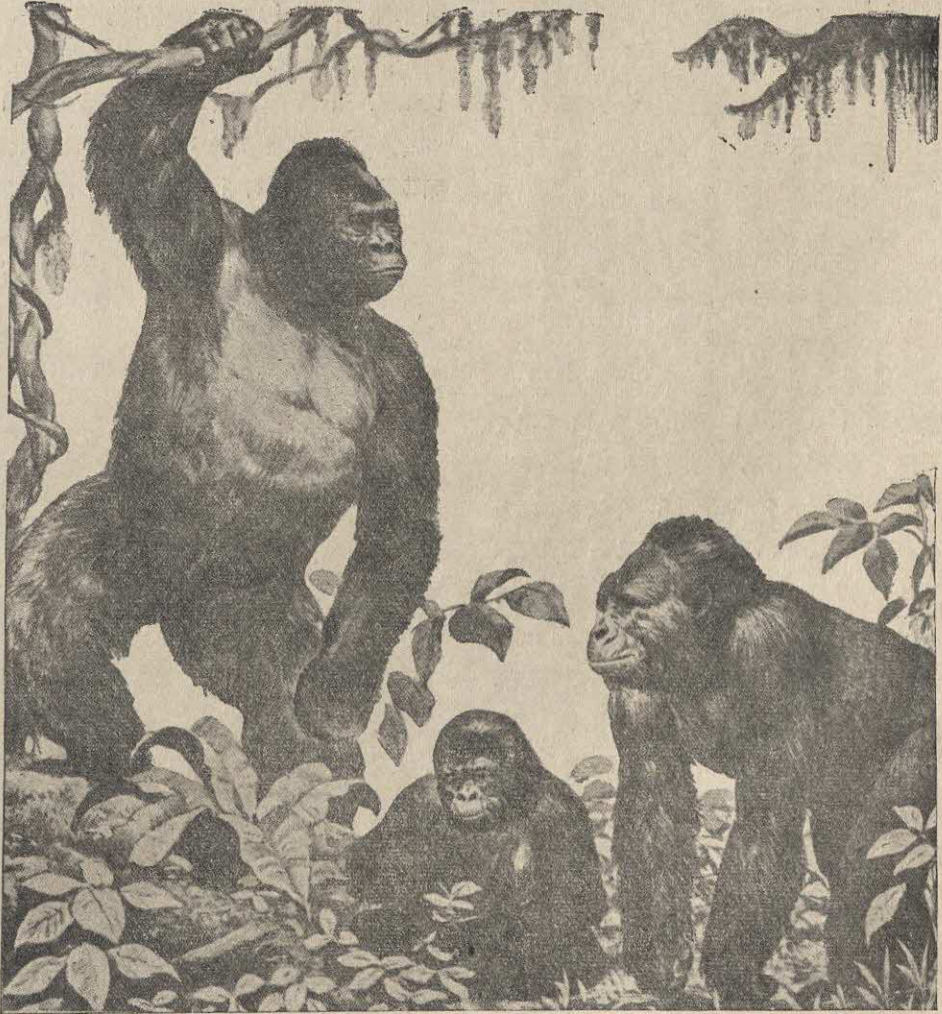
গরিলা পরিবার

গিবন বা উল্লুক

আমাদের খুবই পরিচিত প্রাণী। আকার ও চালচলনে মানুষের সঙ্গে ওদের বেশ খানিকটা মিল দেখা যায়। বিশেষতঃ মানুষের অনুকরণ করতে ওদের জুড়ি নেই। বাঁদর সাধারণতঃ নিরামিষভোজী, তবে পোকামাকড়ও ধরে খায়। পৃথিবীর সব জায়গায়ই নানা জাতের বাঁদর দেখতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় কয়েক ধরনের অদ্ভুত বাঁদর আছে। মারমজেট (marmoset) বাঁদর লম্বায় মাত্র ছ ইঞ্চি। ক্যাপুচিনও ছোট্ট বাঁদর। ওরা আবার রোদ একদম সহ্য করতে পারে না। লম্বা লেজওয়ালা বাঁদরের মধ্যে আমেরিকার মাকড়সা-বাঁদর বা স্পাইডার-মাংকি (spider-monkey) উল্লেখযোগ্য। তেমনি আর এক রকম বাঁদর আছে, তাদের বলে হাউলিং-মাংকি (howling-monkey). এরা অসম্ভব চেঁচাতে পারে।

বাঁদর তার পা হাতের মতোই ব্যবহার করতে পারে। পাগুলো দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরা তার কাছে কিছু নয়। ওদের পায়ের পাতার তলার দিক্‌টা ঠিক হাতের তালুর মতো, পায়ের আঙ্গুলগুলোও হাতের আঙ্গুলের মতো। এদের চারটে পা-ই হাতের মতো, তাই এদের চতুর্ভুজ বলে। এই কারণেই বাঁদর গাছের উপর এত সহজে ঘোরাফেরা করতে পারে।

এক রকম বাঁদর আছে যাদের লেজ নেই। ওদের আমরা বলি উল্লুক। ইংরেজীতে বলে গিবন (gibbon). উল্লুকরা কিন্তু বেশ চালাক এবং চটপটেও।

লেজ নেই এরকম বড় জাতের বাঁদরকে আর বাঁদর বলা হয় না—বলা হয় বনমানুষ। এরা আবার তিন জাতের—শিম্পাজী (chimpanzee), ওরাং-উটাং বা ওরাং-উটান (orang-outang, orang-utan) আর গরিলা (gorilla)। এদের মধ্যে শিম্পাঞ্জীই সবচেয়ে চালাক, যদিও আকারে সব চাইতে ছোট। দাঁড়ালে ৩।৪ ফুটের বেশী হবে না। কুচকুচে কালো চেহারা; হাত দুটো এত লম্বা যে দাঁড়ালে প্রায় মাটিতে গিয়ে

শিম্পাঞ্জী

একজন মৃত ক্রো-মানি'অঁ মানুষকে সমাধি দেওয়া হচ্ছে।

মানুষঃ

[একজন মৃত ক্রো-মানিঅ' মানুষকে সমাধি দেওয়া হচ্ছে।]

প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রাইমেটীজ, অস্ট্রালোপিথীসীন, জিন্‌জান্‌থ্রপাস, হোমো হ্যাবিলিস, পিথিকান্‌থ্রোপাস ইরেক্টাস, সিনান্‌থ্রোপাস, নিয়্যানডারটাল মানুষ পৃথিবীতে ছিল। নিয়্যানডারটালদের পরে যে-মানুষ পৃথিবীতে আধিপত্য করে তার নাম ক্রো-মানি'অ' মানুষ।

সর্ব যুগেই মানুষ জন্মায় ও মরে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষের জন্ম হত, মৃত্যু হত।

মানুষ মরে গেলে তার প্রিয়জনেরা শোকার্ত হয়। তাদের কেউ কেউ মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করে, কেউ নদীতে ভাসিয়ে দেয়, কেউ শবদাহ করে, কেউ কেউ উন্মুক্ত স্থানে মৃত-দেহটি রেখে দেয়। পাখিতে সেই মৃতদেহ খেয়ে ফেলে।

ক্রো-মানি'অ' মানুষদের কেউ মারা গেলে তার প্রিয়জনেরাও মনে ব্যথা পেত। তারা মৃতদেহকে সমাধিস্থ করত।

এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্রো-মানি'অ' মানুষেরা একজন মৃত ক্রো-মানি'অ' মানুষকে সমাধি দিচ্ছে। হাতির দাঁত, বর্শা, মৃতের নানারকম প্রিয় জিনিস, নানাপ্রকার খাদ্য ইত্যাদি মৃতের পাশে রেখে সমাধি দেওয়া হচ্ছে। যে মানুষটি মারা গেছে সে যে অনেকেরই প্রিয় ছিল তা মৃতদেহের চারপাশে লোকসমাগম দেখে বুঝতে পারা যায়।

ঠেকে। আফ্রিকার জঙ্গলে এরা থাকে এবং সেখানে ফলমূল, গাছের কচিপাতা, পোকামাকড় এই সব খায়। কিন্তু পোষা শিম্পাঞ্জীরা মানুষের অনুকরণে সব কিছুই খেতে শিখেছে এবং মানুষের খাদ্যই যেন তাদের বেশী প্রিয়। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় শিম্পাঞ্জীর খাওয়া অনেকেই দেখেছে। চা, পাঁউরুটি, কলা, ডিমসিদ্ধ, আপেল, শশা—সবই আছে তার মধ্যে। এমন কি দর্শকদের পাল্লায় পড়ে একটি শিম্পাঞ্জী সিগারেট খেতেও শিখেছিল।

শিম্পাঞ্জী ভয়ানক অনুকরণপ্রিয় জীব। মানুষকে যা করতে দেখবে তাই সে করবে। শেখালে তো কথাই নেই। প্যান্টকোট পরে চেয়ার-টেবিলে বসে ছুরি-কাঁটা দিয়ে খানা খাওয়া, সার্কাসে সাইকেল চালানো, সিনেমায় অভিনয় করা সবই সে নিঁখুতভাবে করতে পারে।

ওরাং-উটান শিম্পাঞ্জীর চেয়ে আকারে বড়, বুদ্ধিতেও নেহাত কম নয়। এরা অবশ্য আফ্রিকার জীব নয়—এরা থাকে বোর্নিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে। সেখানকার ভাষায় ওরাং-উটান কথাটার অর্থ হচ্ছে 'জঙ্গলের লোক'। স্যাঁতসেঁতে জলা-জঙ্গলই এদের বেশী প্রিয়। সেখানেই ছোট ছোট পরিবার একসঙ্গে বাস করে। ঈষৎ বেগুনী রং, বুড়োটে চেহারা। কিন্তু চালচলনে শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে বেশ মিল আছে। ওরাং-উটানকে গেছো প্রাণী বললেই ঠিক বলা হবে। গাছের উপর এ ডাল থেকে ও ডালে তরতর করে ছুটে চলে কিন্তু মাটিতে হাঁটতে হলে তাদের আর সে চটপটে ভাব দেখা যায় না। এরা পায়ের আঙ্গুল সন্তর্পণে ফেলে প্রায় টলতে টলতে হাঁটে।

মানুষের সঙ্গে যে জানোয়ারের মিল সবচেয়ে বেশী, সে হচ্ছে গরিলা। এরাও আফ্রিকার বাসিন্দা —বাস করে গভীর বনে। লম্বায় এরা মানুষেরই প্রায় সমান, কিন্তু এদের বুকের ছাতি মানুষের তিনগুণ। এদের গায়ে অসম্ভব জোর। মুখটা অবশ্য কদাকার—কুচকুচে কালো। এদের সারা গায়ে লম্বা লম্বা লোম। চলবার সময় সাধারণতঃ চার পায়ে

ওরাং-উটান

হাঁটে, তবে ঈষৎ কুঁজো হয়ে দুপায়েও চলতে পারে। যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন খাড়া হয়েই দাঁড়ায়।

গরিলার ঐ বীভৎস জোয়ান চেহারা আর হালচাল দেখে গরিলাকে যতটা গোঁয়ার-গোবিন্দ মনে করা হয় আসলে ততটা গোঁয়ার ওরা নয়। ওদের না ক্ষেপালে গায়ে পড়ে বড় একটা মানুষকে ওরা আক্রমণ করে না। তবে রাগালে তো সে উগ্র স্বভাব ধরবেই। তাদের গায়ে এত জোর যে একবার একটা গরিলা একটা রাইফেল বন্দুকের নল মুচড়ে ভেঙে দিয়েছিল। গরিলার একটা স্বভাব সে দমাদ্দম নিজের বুকে কিল মারে। ওটা তাদের রেগে যাবার লক্ষণ নয়, বুকে কিল মারা ওদের একটা স্বভাব।

কোন কোন গরিলা স্যাঁতসেঁতে জঙ্গল পছন্দ করলেও এক জাতের গরিলা পাহাড়ী অঞ্চলে বাস

করে। এরা অনেকটা ভবঘুরে জীব আর অসম্ভব এদের খিদে। যেখান দিয়ে যায় সেখানকার গাছ-পালা, লতাপাতা ইত্যাদি তছনছ করে খেয়ে সাবাড় করতে করতে এগিয়ে চলে। সেই জন্যই বোধ হয় এক জায়গায় বেশী দিন ওরা থাকতে পারে না।

জঙ্গল থেকে গরিলা ধরে এনে বেশী দিন বাঁচানো কঠিন—বিশেষ করে সে যদি বয়স্ক গরিলা হয়। তবে খুব শৈশবে, ভালো করে জ্ঞান হবার আগেই, যদি তাদের ধরে এনে পোষা যায় তবে তারা পোষ মানে এবং বেঁচেও যায়। অল্প কয়েকটি চিড়িয়াখানায় যে সামান্য কয়েকটি গরিলা আছে তারা সব এই ভাবে শৈশবে ধরে-আনা গরিলা। এখন কেবল আফ্রিকাতেই অল্প কয়েকটি অঞ্চলে অল্প কয়েকটি গরিলা দেখা যায়, আর কোথাও নয়। প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা না নিলে এদের বংশও হয়তো ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যাবে।

॥ ইয়েতি ॥

এবার এমন একটি জীবের কথা বলব, যে-জীব সত্যিই আছে কিনা তা নিয়ে খুব মতভেদ আছে। পূর্ব হিমালয়ের উঁচু জায়গার লোকেরা বলে যে লোমে-ঢাকা মানুষের মত একরকম জীব ইয়েতি (Yeti) নাকি হিমালয়ের বরফ-ঢাকা অঞ্চলে থাকে। পাহাড়ীরা, এমন কি সাহেবরাও, অনেকে তাদের দেখেছে, কিংবা তার পায়ের ছাপ দেখেছে। কিন্তু তাকে দেখবার জন্য কিংবা ধরে আনবার জন্য যত বৈজ্ঞানিক অভিযান হিমালয়ে গিয়েছে, তাতে কখনও ইয়েতি আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ইয়েতির মাথা বলে একটা জিনিস হিমালয়ের একটা মঠে ছিল, পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সেটা নানা রকম প্রাণীর হাড় চামড়া দাঁত দিয়ে তৈরী একটা জাল জিনিস। এক সাহেব এর নাম দিয়েছিলেন The Abominable Snowman, অর্থাৎ ঘৃণ্য তুষার মানব। কিন্তু কে বলতে পারে যে ইয়েতি সত্যিই আছে, না নেই?

মানুষ

॥ প্রথম মানুষ কি করে এল ॥

প্রথম মানুষ কে? হিন্দুদের শাস্ত্রে বলে, প্রথম মানুষের নাম ছিল মনু, তাই আমাদের 'মানব' বলা হয়। আবার, তা থেকেই এসেছে 'মানুষ' কথাটা। অন্য ধর্মের শাস্ত্রে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে আদম। তাই থেকে মানুষের আর এক নাম 'আদমী'।

তা, মনুই হোন বা আদমই হোন, তিনি এলেন কোত্থেকে? খ্রীষ্টানদের শাস্ত্রে বলে, ভগবান্ তাঁকে পৃথিবীর ধুলো থেকে তৈরি করেছিলেন—তাঁর কোনও বাবা-মা ছিল না।

॥ ডারউইনের আবিষ্কার ॥

সে যা-ই হোক, অনেক দিন পর্যন্ত প্রায় সব দেশের লোকই এই জেনে নিশ্চিন্ত ছিল যে, ভগবান্ একদিন প্রথম মানুষকে তৈরি করে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ পণ্ডিত চার্লস ডারউইন একখানা বই প্রকাশ করলেন, তার নাম Origin of Species. তাতে তিনি দেখালেন যে, গোড়ায় একেবারে অন্য কিছু থেকে আরম্ভ করে, কোটি কোটি বছর ধরে ক্রমাগত বদলাতে বদলাতে তবেই এখনকার মানুষেরা এখন তাদের যা দেখছি তাই হয়েছে। হঠাৎ একদিনে তারা তৈরী হয় নি। আর, শুধু মানুষ নয়—যুগযুগান্তর ধরে কোনও প্রাণী বা গাছপালা একভাবে নেই, অবস্থা-অনুসারে তারা ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। আর, যারাই সেভাবে বদলেছে, তারাই টিকে আছে—যারা তা পারে নি, তারা লোপ পেয়ে গিয়েছে।

॥ মানুষের পূর্বপুরুষ ॥

তখন ভারী একটা হইচই পড়ে গেল—এ কখনও হতে পারে? অবশ্য ডারউইন তাতে দমলেন না। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল তাঁর আর একটি বই Descent of Man. তাতে তিনি দেখালেন যে, লক্ষ লক্ষ বছর আগে আজকালকার মানুষের মতো কোনও

ছয় কোটি বছর আগের ফসিল

চার কোটি বছর আগের ফসিল

প্রাণী ছিল না—সেই সময়কার একেবারে অন্য ধরনের এক জাতের প্রাণী থেকেই কতকগুলো একটু একটু করে বদল হতে হতে এখনকার মানুষ হয়েছে। আরও একটা কথা এই যে, সেই একই জাতের প্রাণীর মধ্যে অন্য কতকগুলো বদলাতে বদলাতে হয়েছে এখনকার বানর আর বনমানুষ।

কিন্তু এখন আর ডারউইনের মত না মেনে উপায় নেই। লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটি কোটি বছর আগেকার খবরও যতই পাওয়া যাচ্ছে, ততই দেখা যাচ্ছে যে ডারউইনের মতই ঠিক।

॥ প্রথম মানুষ কেমন দেখতে ছিল ॥

অনেক আগেকার দিনের মানুষের হাত পা মুখ দাঁত জিভ চামড়া সবই পুরোপুরি এখনকার দিনের মানুষের মতো ছিল না। তবে কি রকম ছিল, আর ক্রমে ক্রমে কি কি পরিবর্তন হতে হতে আজকের মতন হল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

আগেকার দিনের নানা প্রাণীর দাঁত আর দেহের নানা জায়গার হাড় থেকেই সব কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য অত পুরোনো দিনের হাড় আর হাড় নেই, একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে, তাকে বলে 'ফসিল' (fossil). নানা দেশে মাটির নীচে এই সব ফসিল পাওয়া গিয়েছে। কোথাও কোথাও পুরোপুরি কঙ্কালও পাওয়া গিয়েছে বটে, কিন্তু তা খুবই কম। প্রায়ই একটি প্রাণীর খুলি, দু'একখানা হাড়, কিংবা দু'চারটে দাঁত দেখেই বিজ্ঞানীরা সেই প্রাণীটির চেহারা আর চালচলন সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেরেছেন।

অনেক দেখে শুনে বিজ্ঞানীরা ঠিক করেছেন যে, পাঁচ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যেসব প্রাণী ছিল, তাদের মধ্যে একজাতের প্রাণী ডিম পাড়ত না। তাদের বাচ্চা হত। তারা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াত বলে তাদের বলা হয় স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের আবার একটা দল গাছে চড়া আর গাছে থাকা অভ্যেস করেছিল। এরা কেউ কেউ চার পায়ে গাছে গাছে ছুটোছুটি করত, কেউ কেউ বা ডাল ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলাফেরা করত।

॥ প্রাইমেটীজ ॥

এদেরই মধ্যে একদল হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষ। তারা এক-সময় গাছে থাকা ছেড়ে দিয়ে মাটিতে চলাফেরা করতে লাগল। যারা তখনও গাছে থেকে গেল, তাদের থেকেই ক্রমে ক্রমে বানরেরা এসেছে, শুধু বানর নয়—গরিলা, শিম্পাঞ্জী,

প্রথম দিককার মানুষ

ওরাং-উটান ইত্যাদি লেজছাড়া বনমানুষরাও। লেজহীন বানরদের সাধারণ নাম হচ্ছে এপ্ (Ape). এদের আর মানুষদের একসঙ্গে নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রাইমেটীজ' (Primates).

মানুষের পূর্বপুরুষ কবে গাছে চলাফেরা ছেড়ে মাটিতে নেমে চলতে ফিরতে থাকে তার একটা মোটামুটি আন্দাজ করা হয়েছে। সেটা বোধহয় আড়াই কোটি বছর আগেকার কথা। মানুষের সেই পূর্বপুরুষের নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রোকনসাল' (Proconsul). অবশ্য এই প্রোকনসাল মোটেই মানুষের মতো ছিল না, বরং কতকটা গরিলার মতো ছিল বলা যেতে পারে।

তারপর, এই প্রোকনসাল থেকেই আস্তে আস্তে এমন সব প্রাণী দেখা দিতে থাকে, যাদের সঙ্গে আজকালকার মানুষের একটু একটু মিল দেখা যেতে থাকে। তাদের বলা যেতে পারে 'প্রায়-মানুষ'। নানা সময়কার প্রায়-মানুষের চিহ্ন পৃথিবীর নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে।

॥ এশিয়ায় প্রথম মানুষের কঙ্কাল ॥

তার মধ্যে যেগুলি প্রথম দিকে পাওয়া গিয়েছিল, সে সবই এশিয়া মহাদেশের নানা জায়গায়। তা থেকে একসময় বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, প্রথম মানুষও নিশ্চয় এই এশিয়ারই কোনও জায়গাতে দেখা দিয়েছিল। তারপর এই ভারতবর্ষেরই হিমালয়ের দক্ষিণ অংশে শিবালিক পাহাড়ে খুব পুরোনো কালের মানুষের কাছাকাছি চেহারার এক প্রাইমেটের হাড় পাওয়া গেল। তখন মনে হল যে হিমালয়েই প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঐ হাড় যার, তার নাম রাখা হল 'শিবপিথেকাস' (Sivapithecus) অর্থাৎ শিবালিকের বানর। তবে, সেটাকে প্রায়-মানুষ বলা চলে না, সেটা তারও আগেকার প্রাণী।

॥ আফ্রিকায় প্রথম মানুষ ঃ অস্ট্রালোপিথীসীন ॥

কিন্তু পরে আফ্রিকার নানা জায়গায় আরও ঢের বেশী পুরোনো প্রায়-মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেল।

অস্ট্রালোপিথীসীন

প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকার এক চুনাপাথরের খনিতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এক জাতের প্রায়-মানুষের হাড়গোড় পাওয়া গেল। তাদের নাম দেওয়া হল 'অস্ট্রালোপিথীসীন' (Australopithecene—মানে, দক্ষিণী বন-মানুষ)। এর কয়েক বছর বাদে একটি স্কুলের ছেলে একটা পাথর ভেঙে তার মধ্যে আর একটা মানুষের খুলি পেল। তাই শুনে এক বিজ্ঞানী ছুটে এলেন সেটা দেখতে। সেটা একটা অস্ট্রালোপিথীসীনের প্রায় নিখুঁত একটা খুলি। খুঁতের মধ্যে এই যে তার চারটি দাঁত নেই। বিজ্ঞানী খোঁজ করে করে

ক্রো-ম্যানিওঁ মানুষ

দেখে বোঝা যায় কার কত বুদ্ধি। বুদ্ধি কম বলেই অন্য সব প্রাণীর তেমন উন্নতি হয় নি, কিন্তু বুদ্ধি বেশী, আর তাকে খাটিয়েছে বলেই প্রায়-মানুষ আজ মানুষ হয়ে উঠেছে।

প্রথম মানুষের বুদ্ধির একটা পরিচয় পাই অস্ত্রের ব্যবহারে। অন্য কোনও প্রাণী আজও অস্ত্র চালাতে শেখে নি, কিন্তু প্রথম মানুষেরা বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছিল যে পাথর ছুড়ে শত্রু মারা যায়। আরও বুদ্ধি খাটিয়ে সেই পাথরকে চেঁচে ধারালো কিংবা ছুঁচলো করে তাকে আরও সাংঘাতিক অস্ত্র করে তোলা হল ক্রমে ক্রমে। এই অস্ত্রের জোরেই তারা বেঁচে গেল। তাদের চেয়ে ঢের বড় বড় জন্তুরা তাদের ভীষণ শিং নখ দাঁত নিয়েও তাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হল। এইভাবে শুরু হল মানুষের সভ্য হবার ইতিহাস।

মানুষ সভ্য হতে আরম্ভ করল, অর্থাৎ, বাইরের জিনিসকে নিজের কাজে লাগাতে আরম্ভ করল। বাইরের জিনিসকে মানুষের কাজে লাগাবার কৌশল যে-জাতি যত

আঁকতেও পারত তারা। তা দেখে জানা যায় যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোমওয়ালা গণ্ডার আর ম্যামথ হাতি, বল্‌গা-হরিণ, বাইসন আর বুনো ঘোড়া ছিল তাদের প্রধান শিকার। পাথর আর হাড় দিয়ে তারা শিকার করবার যেরকম অস্ত্র তৈরি করত, সেরকম অস্ত্রও ঢের পাওয়া গিয়েছে।

বিজ্ঞানীরা মানুষকে বলেন, 'হোমো সেপিয়েন্‌স্' (Homo Sapiens), মানে, বুদ্ধিমান্ মানুষ। এই বুদ্ধিই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় লক্ষণ। আর সেই বুদ্ধি থাকে মগজে আর মগজের খোল হল মাথার খুলি। সেই খুলি

গুহাচিত্র—বাইসন
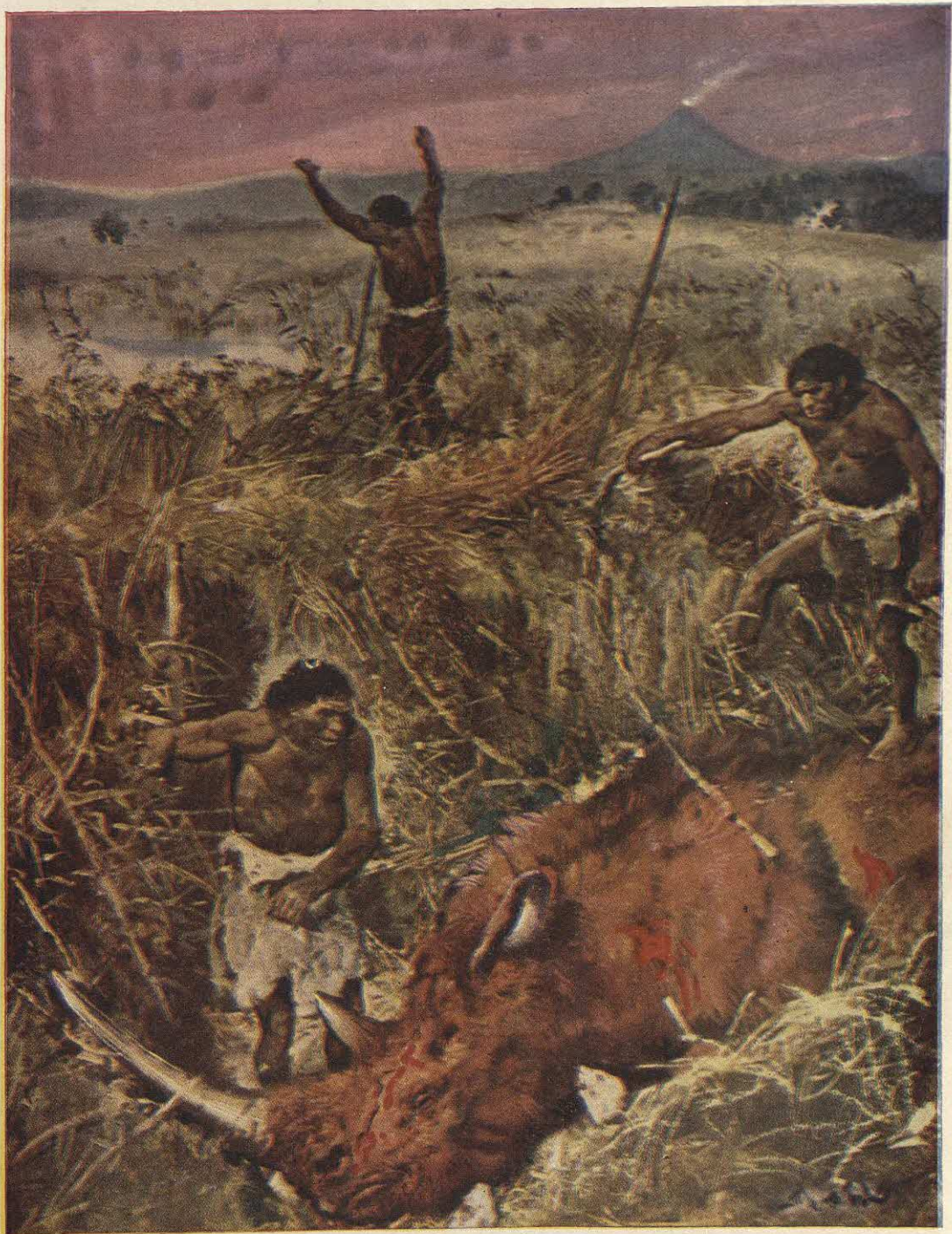
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ গণ্ডার মেরেছে খাবে বলে।

মানুষঃ

[প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ গণ্ডার মেরেছে খাবে বলে।]

আদিম যুগের মানুষদের সঙ্গে এখনকার যুগের মানুষের চেহারার অনেক পার্থক্য। সে যুগের মানুষের চালচলন, আচারব্যবহার ইত্যাদিরও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। নানা যুগের মধ্য দিয়ে মানুষ তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। এমনি এক যুগের নাম প্রস্তর যুগ।

এই যুগের জীবজন্তুদের চেহারার সঙ্গে আজকালকার জীবজন্তুর বেশ পার্থক্য দেখা যায়। অনেক জীবজন্তু তো বিলুপ্ত হয়েই গেছে।

এখানে ছবিতে একটা গণ্ডারকে দেখা যাচ্ছে। গণ্ডারটির দুটো খড়্গ। বর্তমান কালের গণ্ডারের গায়ে লোম থাকে না। কিন্তু এই গণ্ডারটির গায়ে বড় বড় লোম রয়েছে।

প্রস্তর যুগের গোড়ার দিকে মানুষ অস্ত্রের ব্যবহার জানত না। বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার সময় ক্ষুধার তাড়নায় তারা পশু শিকার করত। তাদের মনে ছিল অসীম সাহস, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। এই ছবিতে তিনজন প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষকে বড় বড় ঘাসের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তারা পাথর ছুড়ে ছুড়ে একটা প্রকাণ্ড লোমশ গণ্ডারকে মেরেছে। এরি মাংস খেয়ে তারা ক্ষুধা মেটাবে।
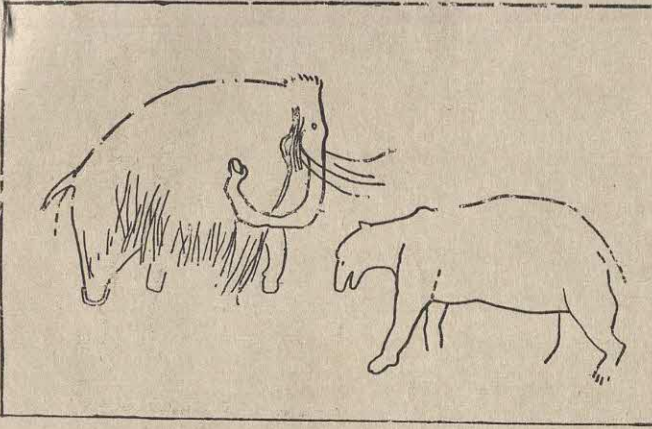
ম্যামথ হাতি ও সে যুগের ভালুক—প্রাচীন গুহাচিত্র

আবিষ্কার করতে পারে, তাকে তত বেশী সভ্য বলা হয়।

॥ স্টোন এজ্—প্রস্তর যুগ ॥

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে কয়েকটা যুগে ভাগ করা হয়েছে। তার প্রথমটাকে বলা হয় প্রস্তর যুগ (Stone Age); কেননা, অস্ত্র হিসেবে পাথরের ব্যবহারই এ যুগের মানুষেরা প্রথম শেখে।

॥ পুরাতন প্রস্তর যুগ ॥

কিন্তু তারা কবে প্রথম পাথর ব্যবহার করেছিল, তা শুধু আন্দাজেই বলা যেতে পারে। সে হয়তো এক লক্ষ বছর আগেকার কথা। তখন থেকে প্রস্তর যুগের শুরু। নিয়্যানডারটাল আর ক্রো-ম্যানিয়ঁরা এর গোড়ার দিকের মানুষ। প্রস্তর যুগের প্রথম দিকটাকে বলা হয় পুরাতন প্রস্তর যুগ (Old Stone Age বা Palaeolithic Age).

ইওরোপে বোধহয় আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে পুরাতন প্রস্তর যুগ শেষ হয়ে গেল। এতদিন ইওরোপের অনেক স্থানই বরফে ঢাকা ছিল, এবার বরফ গলে গিয়ে সেই সব স্থান বড় বড় গাছের জঙ্গলে ছেয়ে যেতে লাগল। নানা কারণে আগেকার দিনের অধিকাংশ প্রাণীই মরে লোপ পেয়ে গেল। মানুষের শিকার কমে গেল, মাংস জোটানোই হল মুশকিল। মানুষ তখন নদী, সমুদ্র ও হ্রদে মাছ ধরবার দিকে মন দিল। মানুষ নৌকো তৈরি, ঘর তৈরি, এমন কি মাটির থালা-বাসনও তৈরি করতে শিখল। এই সময়ে মানুষ কুকুর পুষতেও আরম্ভ করল।

॥ নতুন প্রস্তর যুগ ॥

এইবার আরম্ভ হল যে-সময়টা বিজ্ঞানীরা তার নাম রেখেছেন নতুন প্রস্তর যুগ (New Stone Age বা Neolithic Age)। এ সময়কার সবচেয়ে বড় ঘটনা হল জমি চাষ করা। যে সব গাছ আপনা থেকে হয়, তার ফল পাতা শিকড়ই এতদিন মানুষ খেত, কিন্তু এখন মানুষ দেখল যে বীজ থেকে গাছ হয়, তাই সে নিজেই সুবিধেমতো জায়গায় বীজ পুঁতে ক্ষেত করতে লাগল। ক্রমে মানুষ খাবার জন্যে জীবজন্তু পুষতে লাগল। এই দুটো আবিষ্কারের ফলে তাকে আর খাবারের সন্ধানে ঘুরতে হত না, মানুষ এক জায়গায় ঘর বেঁধে বাস করতে শিখল। নতুন নতুন শস্যের চাষ হতে লাগল; তা রান্না করে খাবার নানা কৌশলও বেরোল। এমন কি, পরে মানুষ সোনা আর তামা দিয়ে গয়না তৈরি করতেও শিখেছিল।

তবু, এই নতুন প্রস্তর যুগের লোকে সেই পাথরের অস্ত্রই ব্যবহার করত। পালিশ-করা, হাতল-লাগানো,

অস্ত্রের জোরেই তারা বেঁচে গেল

নানা ধরনের নতুন নতুন অস্ত্র এ সময়ে তৈরী হতে লাগল বটে, কিন্তু সবই পাথরের। তাই এই সময়টাকেও প্রস্তর যুগই বলে, তবে 'নতুন প্রস্তর যুগ'।

॥ তাম্র যুগ ॥

পাথরের ব্যবহার জেনে নিয়েই মানুষ চুপ করে বসে থাকে নি। চেষ্টা করতে তারা ধাতু আবিষ্কার করতে লাগল, আর তা ব্যবহারও করতে লাগল। ধাতুর মধ্যে প্রথমেই তারা পেল তামা। যখন তারা তামার অস্ত্রশস্ত্র আর বাসনকোসন বানাতে লাগল, তখন মানব-সভ্যতায় এল যাকে বলে তাম্র যুগ (Copper Age). এই যুগে আর কোনও ধাতুর কথা মানুষে জানত না, এবং কোথাও কোথাও তামার সঙ্গে পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারও পাশাপাশি চলতে লাগল। যেমন, ভারতবর্ষে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় এই অবস্থা ছিল।

॥ ব্রোঞ্জ যুগ ॥

তারপর মানুষ যখন তামা আর টিন (রাং) মিশিয়ে ব্রোঞ্জ ধাতু দিয়ে অস্ত্র তৈরি করতে শিখল, তখন মানুষের ইতিহাসে ব্রোঞ্জ যুগ (Bronze Age) এল। সেটা প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। মানুষ তখন থেকে তাড়াতাড়ি সভ্য হতে লাগল। চীনে, ভারতের সিন্ধুনদের তীরে, টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর ধারে সুমের, অ্যাসীরিয়া, ব্যাবিলনিয়ায়, আর নীলনদের তীরে মিশরে বড় বড় শহর আর রাজ্য গড়ে উঠল। মিশরে পিরামিড হয়েছিল সেই ব্রোঞ্জ যুগেই। কিন্তু সব দেশের লোক ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শেখে নি। তাদের কেউ কেউ শুধু তামার ব্যবহারই করে যাচ্ছিলো। কেউ কেউ বা প্রস্তর যুগেই থেকে গেল। পৃথিবীতে এখনও এমন সব অসভ্য জাতি আছে, যারা এখনও প্রস্তর যুগের মানুষের মতো জীবনই যাপন করছে।

লোহা গলে বেরিয়ে আসছে

॥ লৌহ যুগ ॥

ব্রোঞ্জের পর লোহা। বোধহয় সাড়ে তিন কি চার হাজার বছর আগে মানুষ লোহার কথা প্রথম জানতে পারে। মাটিতে লোহা মিশে আছে, এমন কোনও জায়গায় কেউ হয়তো আগুন জ্বালিয়েছিল, তাইতে লোহাটা গলে বেরিয়ে আসে। মানুষের তো চেষ্টার শেষ নেই! সে এই নতুন জিনিসটা দিয়ে অস্ত্র তৈরি করে দেখে যে, চমৎকার জিনিস। লোহা ঢের শক্ত, তা দিয়ে বানানো অস্ত্র অনেক ভাল। তাই, ব্রোঞ্জ ছেড়ে মানুষ ধরল লোহার অস্ত্র। মানুষের ইতিহাসে আর এক নতুন যুগ এল—তাকে বলা হয় লৌহ যুগ। (Iron Age).

সেই লৌহ যুগই এখনও চলছে।

॥ নানা রঙের মানুষ ॥

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, পৃথিবীর পাঁচটা অঞ্চলে প্রথমে পাঁচ শ্রেণীর আলাদা আলাদা রঙের মানুষ ছিল। এশিয়ায় হলদে, আফ্রিকায় কালো, ইওরোপে সাদা, অস্ট্রেলিয়াতে বাদামী আর আমেরিকায় তামাটে-লাল। এদের নাম যথাক্রমে দেওয়া হয়েছিল মঙ্গোলিয়ান, নিগ্রো, ককেশিয়ান, অস্ট্রালয়েড আর আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান।

আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান

॥ নেগ্রিটো ॥

বিজ্ঞানীরা অনেকে মনে করেন যে, একেবারে গোড়ায় পুরাতন প্রস্তর যুগে ভারতে 'নেগ্রিটো' (Negrito) বলে এক ধরনের মানুষ ছিল। প্রস্তর যুগের আগেকার প্রায়-মানুষের কোনও চিহ্ন এদেশে পাওয়া যায় নি, কাজেই এদের নিয়েই আমাদের এ দেশের মানুষের কথা আরম্ভ করতে হচ্ছে। এরা ছিল কুচকুচে কালো। এদের চেহারা বেঁটে, নাক থ্যাবড়া আর চুল কোঁকড়া। এরা গাছের ফল আর শেকড় খেত। পশুপাখি মারতে পারলে কিংবা মাছ ধরতে পারলে তাও খেত। আসল নেগ্রিটো জাতের মানুষ আজকাল ভারতে আর নেই, অন্য নানা জাতের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তবে তাদের কাছাকাছি, প্রায় তাদের মতোই, দু' চারটি জাত এখনও ভারতে দেখতে পাওয়া যায়। তবে বাংলা দেশে নয়—সুদূর দক্ষিণ ভারতে। তাদের নাম পুলিয়া, কাডার, উরুলা, মালাসার ইত্যাদি।

এরা এখনও অসভ্য জাত বলে পাহাড়ে থাকে। এরা পুরাতন প্রস্তর যুগের মতো আজও তেমনি করেই খাবার যোগাড় করে—নতুন কোনও উপায় শেখে নি। এরা চাষ করতে জানে না, তবে ভাত খেতে শিখেছে। বনের পশুপাখি কিংবা মধু নিয়ে গ্রামের চাষীদের দিয়ে তার বদলে চাল নিয়ে আসে। টাকাকড়ির ব্যবহার এরা জানে না।

এরা কাঠে কাঠে কিংবা পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালায়, তাতে মাংস পুড়িয়ে খায়। তবে, মালাসাররা কাঁচা বা পচা মাংসও খায়, তাদের আগুনের দরকার হয় না। মাংস ছেঁড়বার সুবিধের জন্যে, কিংবা ভাল দেখাবে বলে, এরা ঘষে ঘষে দাঁতের আগা ছুঁচালো করে নেয়।

॥ প্রোটো-অস্ট্রালয়েড ॥

ভারতে আদিম নেগ্রিটো মানুষদের সুখে দুঃখে একরকম দিন চলে যাচ্ছিল। তারপর নতুন প্রস্তর যুগের মানুষদের দল বাইরে থেকে ভারতে ঢুকতে লাগল। এরাও বেঁটে জাতের মানুষ। এদের মাথা লম্বাটে, নাক ছোট আর চেপটা। তখন এদের রং পরিষ্কারই ছিল। বিজ্ঞানীরা এদের বলেন 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড' ধাঁচের মানুষ। এদেশে তো আগেকার বাসিন্দা নেগ্রিটোরা চাষ করতে জানত না—এরাই এদেশে প্রথম চাষের কাজ আরম্ভ করে।

নেগ্রিটোরা এদের আক্রমণে পিছিয়ে পড়তে লাগল। এরা ক্রমে সারা দেশটায় ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পরে এদের বংশধররাও নতুন নতুন জাতের আক্রমণে হটে পড়েছিল। তাই আজকাল তাদের

নেগ্রিটোরা হটে যেতে লাগল

বংশধরদের ভারতে শুধু কয়েকটা জায়গাতেই দেখা যায়। এরা এখন নানা নামের নানা জাতে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে ক'টা নাম—সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, কোল, ভীল, গোঁড় বা গোণ্ড্। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ছোটনাগপুর, মধ্য-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু ও অন্যান্য স্থানে এইরকম আরও অনেক জাত আছে। তাদের সকলের নাম ঐরকম নয়, যেমন—বেঞ্চু, বোঢ্রা, কুড়ুম্বা, জুয়াং ইত্যাদি।

॥ জুম চাষ ॥

এদের চাষ করবার নিয়মও আলাদা। সে নিয়ম বড় অদ্ভুত। প্রথমে বনে আগুন লাগিয়ে খানিকটা জমি ঠিক করা হয়, পোড়া ছাই তাতে পড়ে থাকে। তারপর একটা ছুঁচালো লাঠি কিংবা লোহার ফলা দিয়ে জমি একটু খুঁচিয়ে গর্ত করে তাতে কয়েক রকম শস্যের বীজ পুঁতে দেয়। ব্যস, আর কিছু করা নেই, কোনও চেষ্টা-যত্ন নেই! একে কোথাও বলে 'জুম', কোথাও 'দাহি', আবার কোথাও বা 'বেওরা'। এতে ফসলও ভাল হয় না, জমির উর্বরতা-শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়।

॥ সাঁওতাল ॥

একটা বিষয়ে এ সব জাতই এক। নাচগান আর বাজনা এদের বড়ই প্রিয়। ছেলেমেয়েরা মিলে যখন-তখন সুখে দুঃখে ঢোলক বাজাবে, গান গাইবে আর নাচবে।

এদের মধ্যে সাঁওতালরা আমাদের সবচাইতে বেশী চেনা। এরা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান্, সরল, সত্যবাদী, নির্ভীক হয়, কিন্তু রাগ

সাঁওতাল

আর জেদটা এদের একটু বেশী। নিজেদের এরা বলে হড়, অর্থাৎ মানুষ। সাঁওতাল পুরুষদের বলে 'মাঝি', যদিও 'মাঝি' কথাটার আসল মানে হল 'সর্দার'। আর মেয়েরা হল 'মেঝেন'। মাঝিরা নেংটি পরে থাকে, কিন্তু বড় চুল রাখে আর তা পরিপাটী করে আঁচড়ায়, আর তাতে কাঠের চিরুনি গুঁজে রাখে। এদের ঢোলককে বলে মাদল। বাঁশি বাজাতে আর তীর-ধনুক চালাতে এরা খুব ওস্তাদ।

মেঝেনরা একখানা খাটো মোটা কাপড় পরে আর একখানা গায়ে দেয়। তাদের গায়ে প্রায়ই উলকি দিয়ে ছবি আঁকা থাকে। গায়ের চামড়ার মধ্যে ছুঁচ ফুটিয়ে রং ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে আঁকা ছবিকে উলকি বলে। খোঁপায় ফুল গুঁজতে এরা খুব ভালবাসে।

একটা ভাঙ্গা ডাল নিয়ে হাটে বসে থাকে

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে এদের বেশী বাচবিচার নেই। লাল পিঁপড়ে, ইঁদুর, কাঠবেড়াল, গোসাপ—সবই এরা খেতে ভালবাসে। মহুয়ার মিষ্টি ফল এদের খুব প্রিয়। তবে, এরা নিজেরা মদ তৈরি করে নেয় এবং বেশী করেই মদ খায়।

সাঁওতালদের বিয়ের কয়েকটা মজার নিয়ম আছে —বর আর কনে যদি দু'জনেই মত দেয়, তবে বিয়ে হয়। বর যখন বিয়ে করতে কনের বাড়ি আসে, তখন নিয়ম হচ্ছে এই যে, কনের ভাই তাকে ঘাড়ে করে বিয়ের আসরে নিয়ে যাবে। সেখানে কনেকে একটা ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে বরের চারদিকে ঘোরাতে হয়। বিয়ের পর ভোজ হয়—ভাত, শুয়োরের মাংস আর মহুয়া দিয়ে। বর-কনে পরদিন চলে যায়।

কিন্তু কনের যদি বিয়েতে মত না থাকে, তখন বর একদিন আচমকা তার মাথায় সিঁদুর দিয়ে পালায়। এরকম হলে কনের বাপ গাছের একটা ভাঙ্গা ডাল হাতে নিয়ে হাটে গিয়ে বসে থাকে। তা দেখে সকলে বুঝতে পারে যে কি হয়েছে। তখন সভা বসে, দোষীর বা বরের জরিমানা হয়। বর সেটা দিয়ে দিলে, আর কনের বাপকে কিছু টাকা দিলে, পরে তার সঙ্গেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়।

অবশ্য, এ সব নিয়ম ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছে। সাঁওতালদের মধ্যে অনেকে লেখাপড়া শিখে সভ্য হচ্ছে। অনেকে খ্রীষ্টান হয়ে সাহেবী চালচলন ধরেছে। তাদের চালচলনে বাঙালী বা বিহারীর সঙ্গে বিশেষ তফাত নেই। তবে, নামের পদবী দিয়ে অনেক সময় বোঝা যায়। যেমন—কিসকু, মুরমু, হাঁসদা, হেমব্রম, সোরেন, টুডু, মাঁড়ি।

এরা দেবতাকে বলে বোঙ্গা, আর এদের দেবীর নাম হল বুঙ্গি। তা ছাড়াও আরও অনেক কিছুর পুজো করে এরা। শুয়োর কিংবা মুরগি বলি দিয়ে, মাদল বাজিয়ে এদের পুজো হয়।

॥ মেডিটারেনিয়ান ॥

প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদের পরে যারা ভারতে এসে বসবাস করেছিল তারাও বাইরে থেকে এদেশে আসে। এরা ছিল 'মেডিটারেনিয়ান' (Mediterranean) বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতের মানুষ। ইওরোপের দক্ষিণে যে ভূমধ্যসাগর (মেডিটারেনিয়ান সী), তারই চারপাশে এরা থাকত। তাছাড়া পশ্চিম এশিয়ার অনেকখানি জুড়েও এদের বসবাস ছিল। এদের মাথা ছিল লম্বাটে, নাক মাঝারি গোছের। হয়তো পশ্চিম কিংবা মধ্য এশিয়া থেকে এরা ভারতে এসেছিল।

সাঁওতাল, কোল ও ভীলদের পূর্বপুরুষরা ক্রমশঃ এদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে দূরে চলে যেতে লাগল। এরা তাদের চাইতে সভ্য ছিল। ভারতে এরাই প্রথম ধাতুর পাত্র আর অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে—সে-ধাতু হল তামা। এরা ইটের বাড়ি তৈরি করল, পথঘাটওলা শহর গড়ে তুলল, চাষের ক্ষেতে খাল কেটে জল এনে চাষ করতে লাগল, দেশকে রক্ষা করবার জন্যে দুর্গ তৈরি করল নানা জায়গায়। এদের এই সব চিহ্ন মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে।

সিন্ধু নদের কাছে মোহেন-জো-দরো বলে এক জায়গায় বিশেষ করে তাদের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। সেখান থেকে দূরে অন্য অনেক জায়গাতেও তারা চিহ্ন রেখে গিয়েছে, যেমন—হরপ্পা, চান্‌হুদরো আর লোথাল। মোহেন-জো-দরো আবিষ্কার করেছিলেন বাঙালীর গৌরব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক (১২৯২—১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)। কেউ কেউ মনে করেন যে এসব হচ্ছে সেই মেডিটারেনিয়ান জাতের লোকদের তৈরি। তাদের সভ্যতাকে নাম দেওয়া হয়েছে সিন্ধু-সভ্যতা বা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা (Indus Valley Civilization). এটা এখন থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার বছরেরও আগেকার সভ্যতা।

॥ প্রোটো-ড্রাভিডিয়ান ॥

কিন্তু চিরকালের যা নিয়ম—এরাও টিকল না। এদের কোনও কোনও জাত ধ্বংস হয়ে গেল, কেউ বা শত্রুদের অধীন হয়ে রইল, কোনও কোনও জাত বা তাদের সঙ্গে মিশে গেল। তবে, অনেকে এসব না করে বনে পাহাড়ে পালিয়ে গেল। এদের বেশির ভাগ দক্ষিণ ভারতে গেল। এদের সবাইকে এখন 'দ্রাবিড়' জাতি বলা হয়। অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরল, মহীশূরে মোটামুটি সবই দ্রাবিড় জাতির লোক। তবে আসল দ্রাবিড় জাতি এখন নেই বললেই হয়। এই দ্রাবিড় জাতির পূর্বপুরুষরা তো মেডিটারেনিয়ানদের শাখা। সেই শাখাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'প্রোটো-ড্রাভিডিয়ান' (Proto-Dravidian).

॥ আলপাইন ॥

প্রোটো-ড্রাভিডিয়ানদের পরে আসে আলপাইন (Alpine) জাতের মানুষের দল। ইওরোপের আল্‌প্‌স্ পাহাড়ের আশপাশে এদের কতকগুলি দল থাকত বলেই এদের এই নাম। এরাও সাদা রঙের মানুষ এবং ককেশিয়ান (Caucasian) জাতেরই মধ্যে। এদের গড়ন ছিল মাঝামাঝি, খুব লম্বা বা বেঁটে নয়। নাক বড়ও হত, আবার মাঝামাঝিও হত। আর মাথা হত চওড়া। ভারতে এরা কিন্তু আল্‌প্‌স্

আর্যদের আগমন

পাহাড়ের ওদিক্ থেকে আসেনি মধ্য-এশিয়া থেকে, পামির উপত্যকা পেরিয়ে এরা ভারতে এসেছিল।

কারু কারু মতে, আমরা বাঙালীরা, আর গুজরাটী এবং মারাঠীরা এই আলপাইনদের বংশধর। তবে, আমরা কেউ আর আসল আলপাইন নই, আরও অনেক জাতের সঙ্গে মেলামেশায় শেষে এইরকম দাঁড়িয়েছি।

॥ ককেশিয়ান-নর্ডিক ॥

ক্রমে ক্রমে আমরা প্রায় ৪০০০ বছর আগেকার কথায় এসে পড়েছি। এবার ককেশিয়ান জাতের নর্ডিক (Nordic) শাখার মানুষের দল মধ্য-এশিয়া থেকে বেরিয়ে এল। কয়েকটা দল গেল এখনকার ইরান বা পারস্য দেশে, বাকীগুলো ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণের গিরিপথ দিয়ে এসে পড়ল ভারতে। এদের রং ফরসা, দেহ লম্বা, নাক খাড়া, চোখ নীলচে রঙের আর চুল সোজা কিংবা ঢেউখেলানো। এদের আদি বাসস্থান ছিল ইওরোপ আর এশিয়ার উত্তর-ভাগে। এদের মধ্য থেকে যারা বেরিয়ে ভারতে আর ইরানে চলে এল, তারা নিজেদের বলত 'আর্য', মানে, মাননীয়।

আর্যরা স্বভাবে ছিল যাযাবর অর্থাৎ ভবঘুরে—যারা এক জায়গায় বেশী দিন থাকে না। তারা পশুপালন করত, আর সেগুলোকে চরাবার জন্যে দেশে দেশে ঘাসের জমি খুঁজে বেড়াত। তবে, তারা ঘোড়ায় চড়ত, আর লোহার ব্যবহারও শিখেছিল, কিন্তু দ্রাবিড়রা এ দুটো জিনিস শেখেনি। তারা আর্যদের বাধা দিতে পারল না। বেশির ভাগই দক্ষিণ ভারতে পালিয়ে গেল। বাকী সব আর্যদের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। আর্যরা এদের বলত অনার্য (মানে, আর্য নয়)। আজকালকার পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী আর উত্তর প্রদেশের লোকেরা সেই আর্যদের বংশধর। তবে, তারাও খাঁটি আর্য নয়।

আর্যরা গুছিয়ে বসবার পরও ভারতে অন্য অন্য জাতের লোক অনেক এসেছে—কেউ শত্রুভাবে, কেউ বা বন্ধুভাবে। হলদে রঙের মঙ্গোল বা মঙ্গোলিয়ানরা এসেছে প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব
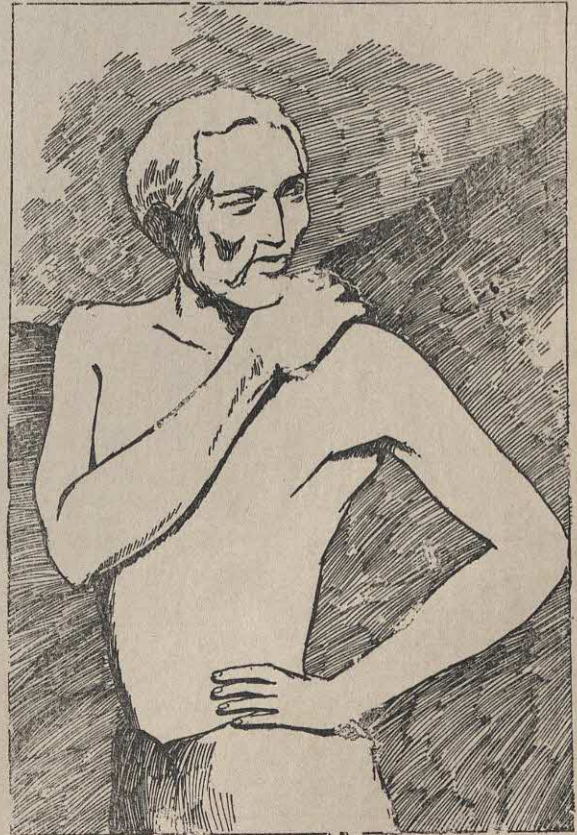
গারো—মিশ্রিত মঙ্গোলিয়ান জাত

দিক দিয়ে। তাদের চুল সোজা, চোখ ছোট, আর দু-চোখের মাঝের দূরত্ব কম, গালের হাড় উঁচু। এ ছাড়া, উত্তর-পশ্চিম দিয়ে এল ব্যাকট্রিয়ান, গ্রীক, শক, হূন, তুর্কী বা মোগল ও পাঠান। জলপথে এল আফ্রিকার কালো কাফ্রী হাবসী, আরব পারস্যের লোক ও ইহুদীরা। সব এসে মিশে যেতে লাগল, তাতে নতুন নতুন হাজার জাতের উদ্ভব হল।

আসামের পাহাড়িয়া জাতগুলির মধ্যে এইরকম মিশ্রিত মঙ্গোলিয়ান জাত দেখা যায়। তার মধ্যে নাগা, গারো, কুকী, খাসিয়া, মিশ্‌মী, আবর, মিজো, সিন্টেং, দাফলা, মিকির—আরও কত জাত আছে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায় এদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টান হয়েছে, অনেকে সভ্য ও শিক্ষিত হয়েছে। এদের সকলের রং আর পরিষ্কার নেই, তবু খাসিয়াদের রংই কিছু ফরসা আছে।

খাসিয়া আর সাঁওতালেরা আমাদের কাছাকাছি থাকে, তবু আমাদের সঙ্গে তাদের কত তফাত! পৃথিবীতে শত শত জাত আছে, সব বিষয়েই তাদের মধ্যে নানারকম বৈচিত্র্য !

॥ যাযাবর ॥

আবার এমন জাতও আছে যারা কখনও বাসাই বাঁধে না, কেননা তারা কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গে তাদের তাঁবু কিংবা গাড়ি থাকে, তাতে চড়ে নতুন নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এদের বলে যাযাবর জাত (Nomad)। আমাদের দেশের বেদে জাতটা এইরকম। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে তাঁবু ফেলে আড্ডা গাড়ে; তাকে বলে বেদের 'টোল'। রাশিয়ার তৃণ-ভূমিতে কিরঘিজ আর কালমুক বলে যাযাবর জাত আছে। কিরঘিজদের যে বড় বদনাম, তা তাদের নাম থেকেই বোঝা যায়। কেননা, 'কিরঘিজ' মানেই 'পশু-চোর'।

যাযাবর জাত—জিপ্‌সী

॥ জিপ্‌সী ॥

সব চাইতে বিখ্যাত যাযাবর জাত হল জিপ্‌সী। এদের চেহারা ভারী সুন্দর। কলকাতার গড়ের মাঠে মাঝে মাঝে এদের টোল ফেলতে দেখা গিয়েছে। এখানে অনেক সময় এদের বলা হয় 'ইরানী'। পশ্চিম এশিয়া, ইওরোপ এমন কি আমেরিকারও অনেক জায়গায় এদের দেখা পাওয়া যায়। রং ফরসা হলেও এদের চোখ আর চুল সাহেবদের মতো কটা নয়, আমাদের মতো কালো।

এরা নাচ, গান, বাজনায় বড় ওস্তাদ। এরা হাত দেখতেও পারে। এই সব করে এরা রোজগার করে দেশে দেশে

ঘোরে। এদের আর একটা বিদ্যা আছে—বড় বিদ্যা, মানে, চুরি।

॥ বুশম্যান ॥

আফ্রিকার এক যাযাবর জাতের লোককে ওদেশে বলে 'গরু চোর'। তারা নিজেদের বলে সান (San), কিন্তু তারা কালাহারি মরুভূমির কাঁটা ঝোপের দেশে থাকে বলে সাহেবরা তাদের বলে 'বুশম্যান' (Bushman) অর্থাৎ ঝোপের মানুষ। তাদের এই নামটাই বেশী চলে।

বুশম্যানরা দেখতে বেঁটে, গড়ে তারা মোটে ৪ ফুট ৭ ইঞ্চি উঁচু—আমাদের একটি দশ বারো বছরের ছেলের মতো। এরা তত মিশকালো নয়। বনের ফলমূল খেয়ে, শিকার করে, আর চুরি-চামারি করে এরা পেট চালায়।

॥ পিগ্‌মী ॥

আফ্রিকার পিগ্‌মীরাও ছোট্ট মানুষ। এরা থাকে মধ্য-আফ্রিকার গহন বনে। এরা সবাই অসম্ভব বেঁটে। খুব ঢ্যাঙা হলেও ৫ ফুটের বেশী হয় না, সাধারণতঃ ৪ ফুট ৪ ইঞ্চিই এদের উচ্চতা। এক আধজন সাড়ে তিন ফুট পর্যন্তও হয়।

কিন্তু এরা বেশ ভাল শিকারী। বিষ-মাখানো বর্শা আর তীর নিয়ে এরা শিকারে বেরোয়। তা দিয়ে এরা হাতি পর্যন্ত মারে।

আফ্রিকায় আরও অনেক জাত আছে, তারা কালো বটে, কিন্তু সবাই বেঁটে নয়। তাদের মধ্যে নিগ্রো বা কাফ্রীরাই বেশী। নিগ্রোদের চুল হয় পশমের মতো কোঁকড়া। তাদের নাকের হাড় চাপা, নাক চওড়া, ঠোঁট পুরু, আর গায়ে লোম কিংবা মুখে গোঁফদাড়ি প্রায় নেই বললেই হয়। আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে নিগ্রোদের সাধারণভাবে বলা হয় বাণ্টু। বাণ্টুদের মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত হচ্ছে জুলু (Zulu) জাতটা। এরা খুব সাহসী যোদ্ধা জাত। অনেকদিন পর্যন্ত এরা যুদ্ধ করে করে সাহেবদের হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা বাঁচিয়ে চলেছিল। জুলুদের শেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন সেটিওয়েও। সবচেয়ে বিখ্যাত বীর রাজা ছিলেন চাকা (Chaka)।

আফ্রিকায় আর এক জাতের কাফ্রী আছে, তাদের

বুশম্যান

বলা হয় নিয়াম-নিয়াম, মানে, রাক্ষস। সত্যিই এরা সুযোগ পেলে মানুষ খেত। সাহেবদের আওতায় এসে সে-অভ্যেসটা আজকাল ক্রমেই কমে আসছে।

॥ বেদুঈন, তুয়ারেগ, মঙ্গোল ॥

বেদুঈন কথাটার মানে 'মরুভূমির সন্তান'। মরুভূমিতে থাকা কত কষ্ট, তবু অনেক জাত যে কেন মরুভূমিকে আঁকড়ে পড়ে থাকে, তা বলা শক্ত। আরব দেশের মরুভূমির এই সব জাতকে বেদুঈন বলে। মরুভূমিতে তো চাষ চলে না, কাজেই এদের জীবিকা হল পশুপালন। আর, পশু থাকলেই ঘাসপাতা চাই, মরুভূমির ধারে ধারে তাদের তা খুঁজে বেড়াতে হয়। তাই বেদুঈনরাও যাযাবর। ছাগল, ভেড়া, উট আর ঘোড়াই এদের সম্পত্তি। এদের ঘোড়া পৃথিবীতে বিখ্যাত আর এরা ঘোড়ায় চড়তে খুব ওস্তাদ। সুবিধে পেলে, একটু-আধটু ডাকাতিও এরা করে থাকে।

এইরকম, পৃথিবীর অন্যান্য মরুভূমির ধারে-ধারেও যাযাবর স্বভাবের লোকের দেখা পাওয়া যায়।

আফ্রিকায় সাহারা মরুভূমির উত্তরে তুয়ারেগ জাত আর এশিয়ার গোবি মরুভূমির মঙ্গোল জাতও যাযাবর ও পশু-পালক জাত।

মরুভূমির মানুষরা এমন পোশাক পরে, যাতে দেহের যতটা সম্ভব ঢাকা থাকে ও রোদ আর বালির ঝাপটা না লাগে। আরবের বেদুঈনরা পা পর্যন্ত ঝোলানো আলখাল্লা আর মাথা-ঘাড়-ঢাকা

বেদুঈন

কালো কাপড়ের টুপি পরে। তুয়ারেগরা নাকও ঢাকে। তাদের আপাদমস্তক মুড়ি-দেওয়া শরীরের মধ্যে থেকে শুধু চোখ-দুটিই একটু দেখা যায়। মঙ্গোলদের মাথায় থাকে কোণ-তোলা কানঢাকা চামড়ার টুপি, পায়ে চামড়ার উঁচু বুট জুতো, আর গায়ে ঝোলা আলখাল্লা। এরা ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরী নীচু তাঁবুতে থাকে। সেই তাঁবু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে নেই—না খুললেও হয়। কর্তা, গিন্নী, ছেলেমেয়েরা তাঁবুতে ঢুকে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাঁবুর ছাদে তাদের মাথা ঠেকে যায়। তখন তারা যেখানে খুশি সেখানে তাঁবুকে নিয়ে যেতে পারে।

॥ এস্কিমো ॥

আমেরিকার উত্তরে, বিশেষতঃ গ্রীনল্যাণ্ড দ্বীপে থাকে এস্কিমো (Eskimo) জাতের মানুষরা। 'এস্কিমো' মানে 'কাঁচা মাংসখেকো'—এ নামটা তারা জানে না। তারা নিজেদের বলে 'ইন্নুইট', যেমন সাঁওতালরা নিজেদের বলে 'হড়'। দুটো কথারই অর্থ 'মানুষ'। অনেক জাতই মনে করে যে শুধু তারাই মানুষ।

এস্কিমোরা বেঁটে, মোটাসোটা হয়। এদের নাক চ্যাপটা, চুল কালো আর সোজা। রংটা আসলে হালকা বাদামী, কিন্তু এরা এত নোংরা যে এদের রীতিমতো ময়লাই দেখায়। শীতের দেশে নোংরা না থেকে উপায় নেই। এরা একেবারেই স্নান করে না। পরস্পরের গা চেটে পরিষ্কার করে নেয়।

বরফের দেশে সাদা ভালুক, শেয়াল, খরগোশ, দু'চার রকমের পাখি আর বল্‌গা হরিণ (reindeer) থাকে। আর বরফের সমুদ্রে থাকে সীল আর নানা-রকম মাছ। এস্কিমোরা এই সবই শিকার

এস্কিমোদের বরফের ঘর 'ইগ্‌লু'। এরা এই ঘরে থাকে।
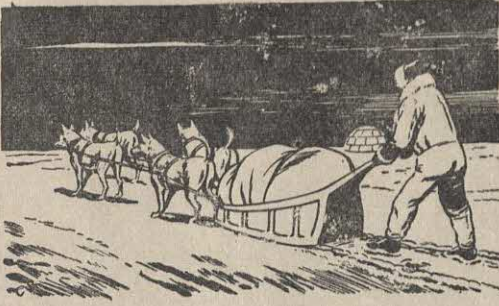
কুকুরে-টানা এস্কিমোদের গাড়ি স্লেজ বা স্লেড

করে। তারা এদের চর্বি ও মাংস খায়, চামড়া দিয়ে তাঁবু আর পোশাক তৈরি করে, নাড়ীভুঁড়ি দিয়ে সুতোর কাজ চালায়। বেশী চর্বি খায় বলে তাদের বেশ নাদুসনুদুস চেহারা হয়।

এদের সীল শিকার করার এক অদ্ভুত পদ্ধতি আছে। বরফের মধ্যে নীচে জল পর্যন্ত একটা গর্ত খুঁড়ে এরা তার পাশে বর্শা উঁচিয়ে ঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে থাকে। উপরে উঠবার সুড়ঙ্গ পেয়ে নীচে থেকে সীলটা সেই গর্ত বরাবর উঠে আসে। অমনি এস্কিমোরা সেটাকে বর্শা দিয়ে গেঁথে মেরে ফেলে। তারপর বাড়িতে নিয়ে এসে সেটাকে কেটে খেয়ে ফেলে।

ওদের নৌকোর নাম কায়াক। নৌকোগুলো খুব হালকা কাঠের ফ্রেমের ওপর সীল বা বলগা-হরিণের চামড়া দিয়ে ছেয়ে তৈরী। সেজন্য তাতে জল ঢুকতে পারে না। এই নৌকো চড়ে ওরা বরফের মাঝখান দিয়ে যে নদী বয় তা পার হয় ও শিকার করতে যায়।

সবচেয়ে মজার হচ্ছে তাদের ঘর। শীতকালে তারা বরফের চাঁই দিয়ে ঘর তৈরি করে—উপুড়-করা বাটির মতো সেগুলোর চেহারা। শীতের মধ্যে বরফের ঘর। বাইরে এত ঠাণ্ডা যে বরফও তার তুলনায় গরম। সেই ঠাণ্ডাটাকে বরফের দেওয়াল একটু আটকায়। এই ঘরকে বলে ইগ্‌লু (Igloo). বরফের চাঁই দিয়ে তৈরী নীচু একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে তাতে ঢুকতে হয়। ভিতরে চর্বির বাতি জ্বলে, ঘরটাতে হাওয়া ঢোকে না বলে গরম। ভিতরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার, কেননা দরজার ফাঁক ছাড়া ধোঁয়া বেরোবার, কি হাওয়া আসবার, আর কোনও পথ নেই।

তবু এরা সহজে নিজের দেশ ছাড়ে না। সেই দেশের অবস্থা অনুসারে নিজেদের হালচাল বদলে নেয়, নানা নতুন ব্যবস্থা করে নেয়। তারপর হয়তো তাদের মধ্য থেকে এক-আধটা দল কোনও কারণে অন্য দেশে চলে যায় এবং অন্য জাতের সঙ্গে মিশে যায়। চিরকাল সব দেশে এটা হয়েছে, আজও হচ্ছে। তাতে নতুন নতুন জাত গড়ে উঠছে। তাদের চেহারা, ভাষা, পোশাক, খাদ্য, চালচলন—সবই ক্রমশঃ একটু একটু করে বদলে যায়। তবু, যতই বদলাক, তারা মানুষই থেকে যায়।

এস্কিমো জননী

॥ মহাকাশ কাকে বলে ॥

সারা বিশ্ব জুড়ে তো বটেই, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে একটা জায়গা—তারই নাম মহাকাশ, ইংরেজীতে একেই বলে স্পেস্ (space). শুধু গ্রহ, তারা, চন্দ্র, ধূমকেতু, ছায়াপথ কেন, আর যা কিছু যেখানে আছে, কিংবা থাকতে পারে, এই মহাকাশেই তা সব রয়েছে। তার আদি নেই, অন্ত নেই। অঙ্কে লিখেও তার মাপ বোঝানো যায় না।

সেই অসীম অনন্ত মহাকাশের একটা অংশ আমরা মাথার উপর দেখতে পাই। তাকেই বলে আকাশ। পৃথিবী ঘুরছে আর সরেও যাচ্ছে বলে আমাদের মাথার উপরের আকাশও বদলে যাচ্ছে। আবার এক দেশ থেকে যে আকাশ দেখা যায়, দূরের অন্য দেশ থেকে ঠিক সেই অংশটা দেখতে পাওয়া যায় না। এমন কি আমরা নিরক্ষরেখার উত্তরে থেকে কখনই তার দক্ষিণের আকাশের বেশির ভাগ দেখতে পাই না। দক্ষিণের লোকেরাও উত্তরের আকাশের অনেক তারা কখনও দেখতে পায় না। কিন্তু এই আকাশ, মহাকাশের যেটুকু আমাদের চোখে পড়ে, তার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত মাপলে দেখা যাবে যে সেটুকুই প্রায় ১৪ কোটি আলোক-বর্ষ।

॥ মহাকাশ মাপবার মাপকাঠি —আলোক-বর্ষ ॥

ইঞ্চি, গজ বা মাইল যেমন মাপ, আলোক-বর্ষ সেই-রকম একটা মাপ। ইংরেজীতে একে বলে লাইট-ঈয়ার (light-year). মহাকাশে দূরত্ব মাপতে গেলে মাইল-গজ চলবে না। সে এত ছোট মাপ যে ঝিনুক দিয়ে মহাসমুদ্রের জল মাপার মতোই তা হবে হাস্যকর মহাকাশে দূরত্ব মাপতে আরও ঢের বড় মাপের দরকার। এই মাপার ব্যাপারে সব চাইতে যে-মাপটা বেশী চলে তা হচ্ছে আলোক-বর্ষ। এক আলোক-বর্ষে হয় প্রায় ছ' লক্ষ কোটি (৬০,০০,০০,০০,০০,০০০) মাইল।

'আলোক-বর্ষ' কথাটি এসেছে এইভাবে। আলোর একটা বাঁধাধরা গতি আছে। আলো যেখানে জ্বলে,

গ্যালিলিও

সেখান থেকে সে সেই গতিতে ছুটতে থাকে। অন্য জায়গায় পৌঁছতে আলোরও একটা সময় লাগে। তবে, গতিটা খুব বেশী বলে ছোট জায়গায় সেটা বুঝতে পারা যায় না। এক বলতে যতটুকু সময় লাগে, আলো ততক্ষণে ১,৮৬,২৮৪ মাইল অর্থাৎ ২,৯৯,৮৬০ কিলোমিটার চলে যায়। প্রতি সেকেণ্ডে ঐ রকম বেগে ছুটলে এক বছরে আলো প্রায় ৬০,০০,০০,০০,০০,০০০ মাইল যেতে পারে।

॥ মহাকাশ-চর্চার ইতিহাস ॥

ভারতীয় বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন 'চলাপৃথ্বী স্থিরভূমি'। আগেকার দিনে লোকে জানত যে সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। দেড় হাজার বছর আগে ভারতের বিজ্ঞানী আর্যভট (জন্ম ৪৭৬ খ্রীঃ) লিখে গিয়েছেন যে পৃথিবী নিজে পাক খাচ্ছে, আর এগিয়ে যেতে যেতে সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসছে। এ ছাড়া তিনি আরও লিখে গিয়েছেন যে সব গ্রহই সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে। তাদের ঘোরার পথ গোল নয়, ডিমের আকারের। তাদের আর চাঁদের নিজের আলো নেই, সূর্যের আলোতেই তাদের আলো।

আর্যভটের আগেকার এক বিজ্ঞানীর লেখা 'সূর্য-সিদ্ধান্ত' বইয়ে গ্রহদের গতি সম্বন্ধে সঠিক হিসেব আছে। আর্যভটের ঢুশো বছর পরে ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর মাপ বের করেছিলেন। তাঁরও চারশো বছর পরে ভাস্করাচার্য তাঁর 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' বইয়ে লিখলেন যে পৃথিবী গোল।

ইওরোপে প্রথমে কয়েকজন গ্রীক বিজ্ঞানী এ ধরনের কথা বলেছেন। তার অনেক পরে কোপার্নিকাস (Copernicus, ১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীঃ) বলেছিলেন যে পৃথিবীই ঘুরছে। কিন্তু টাইকো ব্রাহী (Tycho Brahe) বললেন, না, সূর্যই ঘুরছে। কোপার্নিকাস তাঁর কথা তখন প্রমাণ করতে পারেন নি।

কোপার্নিকাস

॥ দূরবীন আবিষ্কার ॥

হল্যাণ্ড দেশের এক-জন বিজ্ঞানী ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে দূরবীন আবিষ্কার করলেন। তাঁর নাম লিপারশে (Lippershey). গ্যালিলিও (Galileo, Galilei, ১৫৬৪—১৬৪২ খ্রীঃ) নামে একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী এই দূরবীনের সাহায্যে আকাশ দেখলেন। লিপারশে পেটমোটা কাচের দ্বারা ছোট জিনিসকে বড় দেখাবার কৌশল আবিষ্কার করলেন। গ্যালিলিও সেই কাচ চোঙের মধ্যে ভরে আকাশে অনেক কিছু দেখলেন। চাঁদের গায়ে গর্ত, সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ, খালি চোখে দেখা যায় না এরকম শত শত তারা তাঁর দূরবীনে ধরা পড়ল। দূরবীনে আকাশ দেখে গ্যালিলিও বললেন যে কোপার্নিকাসের কথাই সত্য। তিনি বললেন যে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে পৃথিবীর এক বছর লাগে আর তার নিজের চারদিকে একবার পাক খেতে লাগে এক দিন—তাতেই দিন ও রাত হচ্ছে।

॥ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি করে হল ॥

খুব অল্প কয়েক বছর হল, বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সব মত খাড়া করেছেন তার একটা মতবাদের নাম হচ্ছে মহা-বিস্ফোরণবাদ (Big Bang Theory). তাতে বলে যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু আছে, প্রথমে সেই সবই এক সঙ্গে একটি বিরাট দানা বেঁধে মহাকাশে ছিল। তাকে একটা প্রকাণ্ড পিণ্ড বললেই হয়। তার ব্যাস কমপক্ষে দশ কোটি মাইল হবে। সেই পিণ্ড ফেটে গিয়েই ছোট ছোট অসংখ্য পিণ্ড মহাকাশে ছড়িয়ে পড়েছে, যার একটা
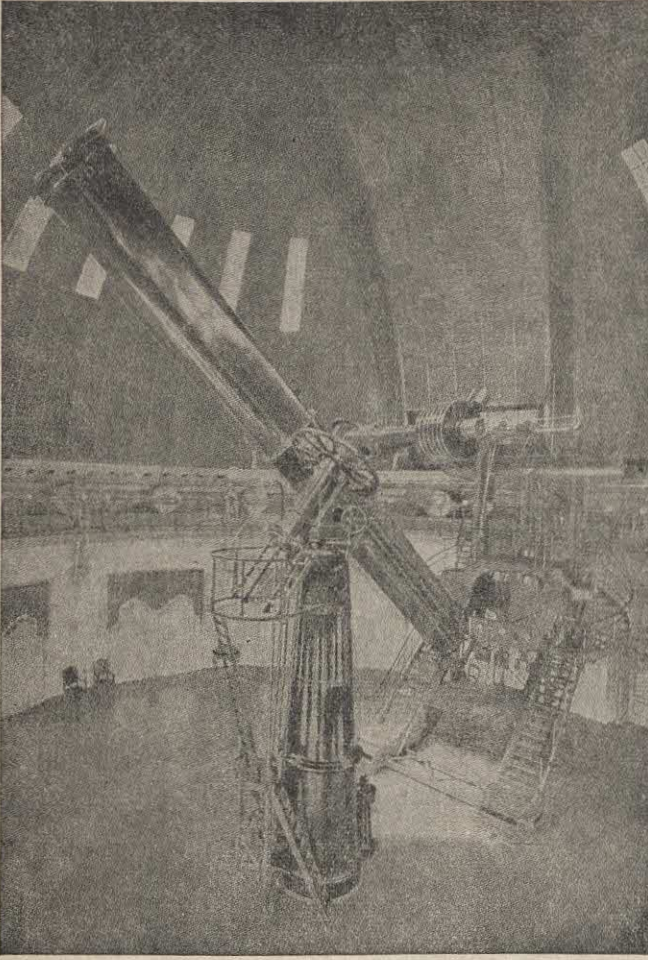
লিক মানমন্দিরের বিখ্যাত দূরবীন

পিণ্ড আমাদের এই পৃথিবী। এটা হয়েছিল নাকি ১০০০ কি ২০০০ কোটি বছর আগে। টুকরোগুলো ঘুরতে ঘুরতে মহাশূন্যে ছুটতে লাগল। আর তাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়তে লাগল।

॥ ছায়াপথের দল ॥

অনন্ত মহাকাশে ছড়ানো বিরাট পিণ্ডের ফেটে যাওয়া টুকরোগুলোকে নিয়ে এক একটি ছায়াপথ (galaxy). মহাকাশে অন্ততঃ এক হাজার কোটি ছায়াপথ আছে। এক-একটা ছায়াপথে হাজার হাজার কোটি তারা আছে। এই সব ছায়াপথের একটার ভিতরে পৃথিবী রয়েছে, তার মধ্যে আমরা আছি। ছায়াপথ বলতে আমরা সাধারণতঃ সেটাকেই বুঝি। এটাকে আমাদের ছায়াপথ বলা যায়, কেননা এরই মধ্যে এক পাশে সূর্য আর তারই প্রায় গায়ে গায়ে আমাদের এই পৃথিবী। এর নাম আকাশগঙ্গা বা হরিতালিকা, ইংরেজীতে Milky Way.

॥ মানমন্দির ॥

৪০০০ বছর আগে যখন কোন রকম যন্ত্রপাতি ছিল না, তখনো একদল মানুষ ছিলেন যাঁদের বলা হত জ্যোতিষী বা জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁরা খালি চোখে দেখেই অঙ্ক কষে আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কথা জেনেছিলেন।

উঁচু জায়গা থেকে আকাশ দেখবার সুবিধা হয়। জ্যোতিষীরা এজন্যে উঁচু বাড়ি বা মাচা বা মন্দির তৈরি করে তার উপর উঠে আকাশ দেখতে শুরু করেন। এই রকম আকাশ দেখার জন্য বিশেষভাবে তৈরী বাড়িকে বলে মানমন্দির।

গ্রীক বিজ্ঞানীদের আলেকজাণ্ড্রিয়ায় (২১০০ বছর আগেকার) মানমন্দির ছিল। হাজার বছর আগে আরবরা বাগদাদ, দামাস্কাস ইত্যাদি জায়গায় ভাল ভাল মানমন্দির তৈরি করেছিলেন।

সাড়ে পাঁচশো বছর আগে মধ্য এশিয়ায় সমরখন্দ শহরে বিখ্যাত মোঙ্গল জ্যোতিষী উলুগ বেগ একটি প্রসিদ্ধ মানমন্দির তৈরি করেছিলেন।

এরকম মানমন্দির নয়াদিল্লীতে একটা আছে। অম্বরের রাজা জয়সিংহ ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই মানমন্দির আর জয়পুর, কাশী ও উজ্জয়িনীতেও এরকম কয়েকটি মানমন্দির তৈরি করেছিলেন। এদের নাম 'যন্তর-মন্তর'। এই সব অদ্ভুত আকারের বাড়িগুলিই আকাশ দেখবার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই-সব মানমন্দির খুব উঁচু করে তৈরি করা হতো। উপরটা

আধুনিক মানমন্দির

সবচেয়ে ভাল ও বড় মানমন্দিরগুলো সবই আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এক ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যেই মাউন্ট হ্যামিলটন, মাউন্ট উইলসন আর মাউন্ট পালোমারে তিনটি মানমন্দির আছে। এদের মধ্যে শেষেরটাতে যে দূরবীন আছে সেটাই এখন পৃথিবীতে সবচাইতে বড়। তার কাচখানার ব্যাস ২০০ ইঞ্চি, সেটা ২৫ ইঞ্চি মোটা আর ওজনে ২০ টন অর্থাৎ প্রায় ৫৪৫ *মণ। ঐ কাচ দিয়ে যখন দূরবীনটা তৈরী হল তখন সেই দূরবীনটাকে ১৩৭ ফুট উঁচু একটা গম্বুজওয়ালা ঘরে বসানো হল। তাতে খরচ পড়লো সবসুদ্ধ ৬০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা। ঐ দূরবীনটাতে ২০০ কোটি আলোক-বর্ষ (১২ কোটি-কোটি-কোটি মাইল) দূরের জিনিসও দেখা যায়।
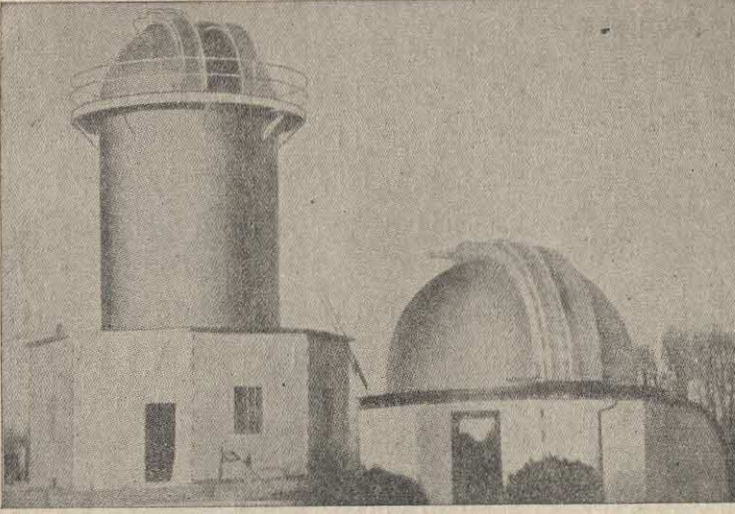
গম্বুজের মতো করে ঠিক উপরের মাঝ বরাবর ফাঁক রাখা হত। গম্বুজের মধ্যে বসে রাত্রে উপরকার ফাঁক দিয়ে আকাশের যেটুকু দেখা যেত সেখানকার তারাদের গতিবিধি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেখতেন আর অঙ্ক কষে তাদের চলার হিসেব বার করতেন।

আজকালকার মানমন্দিরের চেহারা আর ওরকম নয়। সেখানে থাকে বড় বড় দূরবীন ও আরও কত রকমের যন্ত্র। দক্ষিণ ভারতে কোদাইকানালে ও ভারতের অন্য কয়েকটি জায়গায় এরকম আধুনিক মানমন্দির আছে। ইংল্যাণ্ডের সব চাইতে বিখ্যাত মানমন্দির হল 'দি নিউ রয়্যাল গ্রীনিচ' (The New Royal Greenwich) মানমন্দির। এটি বহুকাল ধরে গ্রীনিচ বলে একটি জায়গায় ছিল, এখন সেটিকে তুলে আনা হয়েছে হার্স্টমনসো (Hurstmonceuse) গ্রামে।

॥ ছায়াপথ ॥

মাউন্ট পালোমারের দূরবীনে একশো কোটি ছায়াপথ দেখা গিয়েছে। এগুলো দুরকমের হয়।
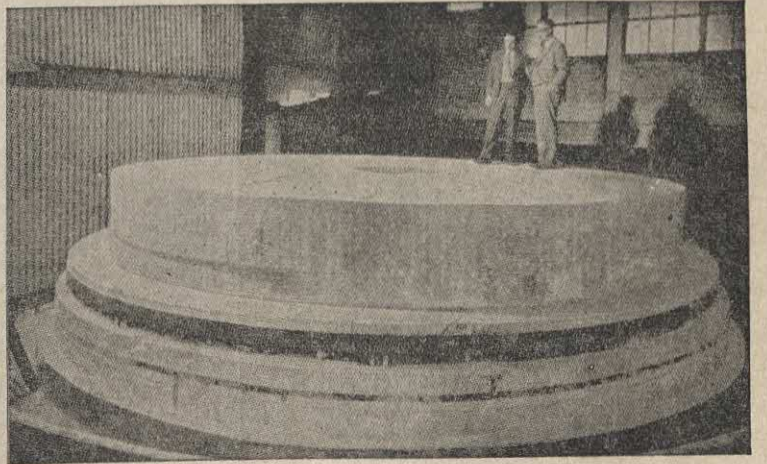
২০০ ইঞ্চি ব্যাস, ২৫ ইঞ্চি পুরু দূরবীনের কাচ

কতকগুলো হল কোটি কোটি জ্বলন্ত তারার ঝাঁক, অন্যগুলো শুধুই জ্বলন্ত গ্যাসের রাশি। প্রথমে যখন এরা ছিটকে বেরিয়ে আসে তখন তো সবই জ্বলন্ত গ্যাস ছিল, তারপর কিছু কিছু জমাট বেঁধে জ্বলন্ত তারা হয়েছে।

এদের চেহারা চার পাঁচ রকমের হয়। কেউ বা ডিমের মতো (elliptical), কেউ বা প্যাঁচালো স্প্রিং-এর মতো (spiral). ভাল কথায় তাদের বলে কুণ্ডলিত ছায়াপথ। এরা চরকি বাজির মতো ঘুরতে ঘুরতে মহাশূন্যে ছুটে চলে।

খুব কাছের কয়েকটি ছায়াপথের দূরত্ব মাপা গিয়েছে। সবচাইতে কাছে হল 'ম্যাগেলানিক ক্লাউড' (Magellanic Clouds)—পৃথিবী থেকে ২ লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরে। অ্যাণ্ড্রোমিডা (Andromeda) প্রায় ২০ লক্ষ, বৃহৎ ঋক্ষমণ্ডলের ছায়াপথ (Ursa Major) প্রায় ৮০ লক্ষ, আর কন্যা রাশির (Virgo) ছায়াপথ প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরে।

আমাদের ছায়াপথের একাংশের কোটি কোটি তারা

॥ আমাদের ছায়াপথ ॥

সকলের চাইতে কাছে যে ছায়াপথ তাকে আমরা বলি আকাশগঙ্গা বা হরিতালিকা। এর মধ্যেই আছে আমাদের পৃথিবী। ইংরেজীতে আমাদের এই ছায়া-পথকে বলে মিল্কি ওয়ে (Milky Way)—মানে দুগ্ধ-সরণি। এটা একটা বিশাল লম্বা মেঘের সাদা ফালির মত দেখতে, আকাশের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছে। আসলে এটা একটা চাপ-বাঁধা ধোঁয়াটে জিনিস নয়—বহু দূরে দূরে ছড়ানো ২০-৩০ হাজার কোটি তারার একটা ঝাঁক, দূর থেকে ঐ রকম দেখায়।

॥ তারা, গ্রহ, উপগ্রহ ॥

আকাশে চন্দ্র ও সূর্য ছাড়া আর যা কিছু দেখা যায় তাকেই আমরা বলি 'তারা'। এদের মধ্যে যাদের নিজের আলো আছে, তারাই সত্যিকারের তারা বা তারকা (star) ; যেমন, ধ্রুবতারা। সূর্যও একটি তারা ছাড়া আর কিছু নয়। এরা নিজেরাই জ্বলছে। অন্য-গুলো এরকম নয়। তাদের যে আলো তা হচ্ছে কোন তারার থেকে পাওয়া আলো। সেই আলো তাদের গায়ে পড়ে তাদের উজ্জ্বল বা আলোকিত করে রেখেছে। এরা হচ্ছে গ্রহ (planet) ; যেমন পৃথিবী, শুকতারা (আমরা একে 'তারা' বললেও আসলে এটা একটা গ্রহ—শুক্র গ্রহ)। আকারে এরা ঢের ছোট। আবার, গ্রহদের সঙ্গে আরও ছোট যারা থাকে তাদের বলে উপগ্রহ (satellite) ; যেমন, চাঁদ। উপগ্রহদেরও নিজের আলো নেই, তারার আলোয় তারা চকচক করে। এ ছাড়া আকাশে উল্কা আর ধূমকেতু আছে। তাদের আমরা কখনও কখনও দেখতে পাই।

॥ সূর্যও একটি তারা ॥

সূর্যও একটি তারা। সূর্যও জ্বলছে এবং আলোটা তার নিজেরই। মনে হয় এত যার তেজ সেই সূর্য নিশ্চয়ই অন্য তারাদের চেয়ে আকারে বড়। কিন্তু সত্যিসত্যি তা নয়। বলতে গেলে, অন্য প্রায় সব তারাই তার চেয়ে অনেক অনেক বড়।

তবু যে সূর্যকে বড় দেখায় তার কারণ এই যে, আর সব তারার চেয়ে সূর্য আমাদের অনেক কাছে আছে। অন্য তারারা দূরে দূরে—বহু দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে আছে বলে তাদের কাউকে কাউকে ছোট দেখায়, কাউকে বা দেখাই যায় না।

বুঝিয়ে বলতে হলে বলা যায় যে, পৃথিবী থেকে সূর্য মোটে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে, আর পৃথিবীর সব চাইতে কাছের তারাটি (সূর্য বাদে) প্রায় ২৬ লক্ষ কোটি মাইল দূরে। তার নাম আলফা সেণ্টরাই। এর অনেক বেশী দূরের তারাও আমরা দেখতে পাই। অথচ, দেখলে মনে হয় যে তারা সবাই চাঁদের সমানই দূরে। তাছাড়া চাঁদকে তারাদের চাইতে ঢের বড়ও দেখায়। তার একমাত্র কারণ এই যে চাঁদ অতি ছোট হলেও পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের জিনিস, পৃথিবী থেকে মোটে ২,৩৮,০০০ মাইল দূরে। কিন্তু খুব ছোট যে তারাটি সেটিও হয়তো চাঁদের চাইতে কয়েক লক্ষ গুণ বড়।

॥ তারার ঝিকিমিকি ॥

হাওয়ার মধ্য দিয়ে আসতে হয় বলে তারার আলো কাঁপে। হাওয়া সব সময়ে বইছে। তার এক-এক জায়গা এক-এক রকম গরম। তারা থেকে যে সামান্য আলো আসে, তাতে সেই আলোর কিছুটা ফিরে যায় বলে আমরা তারার আলোকে ঝিকমিক করতে দেখি।
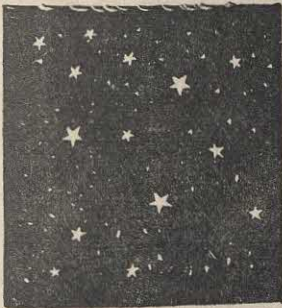
রাতের আকাশে তারার ঝিকিমিকি

এই ঝিকিমিকি দেখেই বোঝা যায় যে কোন্‌টি সত্যিই তারা, আর কোন্‌টি তারা নয়। চাঁদের আলো, গ্রহদের আলো—এরা কাঁপে না। এই দিয়ে চেনা যায় এরা তারা নয়। কিন্তু এদের আলোও তো হাওয়ার ভিতর দিয়েই আসছে, তবে কাঁপে না কেন? চাঁদ ও গ্রহ সকল তারাদের চাইতে অনেক কাছে আছে বলে এদের থেকে অনেকটা বেশী আলো হাওয়া ভেদ করে আসে। তাই তা থেকে খানিকটা আলো ফিরে গেলেও ক্ষতি হয় না, আমরা একটানা আলোই দেখতে পাই।

॥ নতুন তারার জন্ম ॥

সব তারাই চিরকাল ঝিকমিক করে না। এদেরও জ্বলা একদিন শেষ হয়। এই সব নিভে-যাওয়া তারাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার জ্বলে উঠতে পারে। নিভে গেলেও কোন তারা থেমে যায় না। সে যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটতেই থাকে। তার ভিতরে তখনও দুর্দান্ত গরমে কী যে সব কাণ্ডকারখানা চলতে থাকে তা বলবার নয়! তার ঠেলায় একদিন হয়তো দড়াম করে সেটা ফেটে যায় আর তাতে আবার আগুন জ্বলে ওঠে।

কিংবা হয়তো বা দুটো নিভে যাওয়া তারার মধ্যে ধাক্কাই লেগে যায়। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার, আর তাতে প্রচণ্ড শব্দ হয়। তার ফলে আগুন জ্বলে ওঠে, আমরাও তা দেখতে পাই।

এত দূরে বসে এত বড় ব্যাপারটার শুধু এইটুকু দেখা যায় যে, আকাশের যে জায়গায় কোন তারা ছিল না, সেখানে হঠাৎ দপ করে একটা আলো জ্বলে উঠল, মানে, একটা নতুন তারা দেখা দিল। তা হলেই বোঝা গেল যে, ওখানে যা ছিল তা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। সেটা একটা নিভে-যাওয়া তারা। ভিতরকার তাপে আর চাপে ফেটে গিয়ে, কিংবা অন্য কোন নিভে-যাওয়া তারার ধাক্কা খেয়ে একটা নতুন তারা বা নোভা (Nova) জন্ম নিল।

॥ নানা রকমের তারা ॥

তারাদের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৫,০০০ তারা দেখা গিয়েছে, যারা একা নয়। তাদের একটি বা তার বেশী সাথী আছে। কিন্তু আমরা সবকটিকে মিলিয়ে একটি তারাই দেখতে পাই। এই জোড়া তারা বা যুগ্ম তারা (binary star)-এর মধ্যে এমন অনেক আছে, যাদের মধ্যে একজন সাথী ঘুরতে ঘুরতে অপর তারাটির

সামনে এসে পড়ে, আর আমরা ঐ আড়ালের তারাটির আলো সবটা দেখতে পাই না। তারপর সামনেকার সাথী ঘুরতে ঘুরতে সরে গেলে আবার দুজনকার আলো আগেকার মতো উজ্জ্বল হয়ে যায়। এরকম যাদের হয়, তাদের বলে অস্থির তারা (variable star). কেননা, অন্য যে সব তারা আছে, তাদের আলো কমে বাড়ে না, তাদের বলে স্থির তারা (fixed star). 'স্থির' মানে কিন্তু আলোটা স্থির ; তারাটা কিন্তু চলতেই থাকে।

সিটাস (Cetus) নক্ষত্রপুঞ্জে মীরা বা মাইরা (Mira) বলে যে তারাটি, সেটি আসলে ৫টি তারার একটি ঝাঁক। ঐ একই কারণে তারও আলো কমে বাড়ে। দক্ষিণ আকাশে এটি একটি বেশ উজ্জ্বল তারা।

লাইরা (Lyra) নক্ষত্রের আর একটি মজার তারা আছে, সেটি হচ্ছে এক-জোড়া তারা (double binary). দুটো তারা কাছাকাছি ঘোরে, তার উপর আবার এ-জোড়াটা ও-জোড়াটাকে ঘিরে চক্কর দেয়।

॥ মহাকাশে কত তারা ॥

তারাদের সংখ্যা করা যায় না। দূরবীন চোখে দিয়েও মানুষ এ পর্যন্ত প্রায় দশ কোটি তারা দেখেছে। তারপর আর চোখে দেখা যায় না। দূরবীনে ক্যামেরা লাগিয়ে ১০০ কোটি তারার ছবি তোলা হয়েছে। তারও ওধারে কত হাজার হাজার কোটি তারা আছে। খালি চোখে আমরা সবসুদ্ধ প্রায় ছ'সাত হাজার তারা দেখতে পাই। তাও আবার একসঙ্গে অতগুলোও নয়। আকাশের যতটা আমরা একসঙ্গে দেখতে পাই, ততটাতে মোটামুটি ২৫০০ কি বড় জোর ৩০০০ তারা দেখা যায়।

॥ তারা আর নক্ষত্র ॥

তারা আর নক্ষত্র বলতে আমরা একই জিনিস বুঝি। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় এদের মধ্যে একটু তফাত করা হয়েছে। তারারা আকাশে প্রায় একা একা থাকেই না, কয়েকটা মিলে দল বেঁধে থাকে। দলের মধ্যে যে যেখানে আছে, সে সব সময়ে সেখানেই থাকে। এই যে বাঁধা দল, একেই বলে নক্ষত্র বা তারকাপুঞ্জ অথবা তারকামণ্ডল (Constellation). দলটার একটা নাম থাকে। যেমন সপ্তর্ষি মণ্ডল (Great Bear) একটা দলের (নক্ষত্রের) নাম, আর 'ধ্রুবতারা' একটা তারার নাম। ধ্রুবতারা যে দলে, তার নাম ইওরোপীয়েরা দিয়েছেন 'লঘু সপ্তর্ষি' (Little Bear) নক্ষত্র। এদের সবকটা মিলে একই চেহারা বজায় রাখে, অথচ, সবাই মিলে ছুটে চলে। এমন নক্ষত্রও আছে যারা এক সেকেণ্ডে ১০০০ মাইল চলে যায়।

॥ তারাদের দূরত্ব আর গতি ॥

এত জোরে ছোটার ব্যাপারটাও আমাদের চোখে পড়ে না—তারাগুলো আমাদের থেকে এতই দূরে। সূর্য ছাড়া আমাদের সবচাইতে কাছের তারা হচ্ছে কিন্নর (আলফা সেন্টোরাই—Alpha Centauri). এই তারাটি আছে ৪⅓ আলোক-বর্ষ, মানে ২৬,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল দূরে।

তারা আর নক্ষত্রদের চিনতে হলে আগে আরও একটা কথা জেনে নিলে সুবিধে হয়। ওরা তো সরে সরে যায়, তাই একই নক্ষত্রকে এক এক ঋতুতে, এক এক মাসে, এমন কি এক এক ঘণ্টায় আকাশের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় খুঁজতে হয়।

ধ্রুবতারাকে রোজ সারারাত ঠিক এক জায়গায় দেখা যায়। ঠিক তার বরাবর নীচেই হল পৃথিবীর উত্তর মেরু। ইংরেজীতে তাই একে বলে Pole Star বা Polaris (মেরু তারা) বা North Star (উত্তর তারা)। যে স্থান বদলায় না তাকে বলে ধ্রুব, তাই বাংলায় একে বলে ধ্রুবতারা।

॥ নক্ষত্র আর তারা চেনা ঃ ধ্রুব, সপ্তর্ষি আর লঘু সপ্তর্ষি ॥

সপ্তর্ষি সাত তারার একটি নক্ষত্র। দেখতে প্রায় একটি জিজ্ঞাসার চিহ্নের বা খড়েগর মতো।

সপ্তর্ষিকে চৈত্র-বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায় উত্তর আকাশে খুব উপরে দেখতে পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণে সে ক্রমেই পশ্চিমে সরে আসে, শেষে ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত তাকে

আকাশে দেখাই যায় না। পৌষ মাসে তাকে উত্তর-পুব আকাশে দেখা যায়, তারপর যতদিন যায়, ততই পশ্চিমে সে সরে যায়।

পুরাণের মতে উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুবর নামে হয়েছে ধ্রুবতারা। সাতজন ঋষিও আকাশে সপ্তর্ষি নক্ষত্র হয়ে রয়েছেন। তাঁদের নামেই সপ্তর্ষির সাতটি তারার নাম—বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য আর ক্রতু। ইওরোপীয় নাম Ursa Major. এর ইংরেজী মানে হচ্ছে Great Bear বা 'বড় ভালুক'। ভালুকের চাইতে একটি প্রশ্ন চিহ্নের চেহারার সঙ্গেই এর বেশী মিল। এই সপ্তর্ষিকে নিয়ে সপ্তর্ষি মণ্ডল আর সপ্তর্ষিমণ্ডলের মতো আর একটি নক্ষত্র-মণ্ডল আছে। এর নাম ছোট ভালুক (Ursa Minor বা Little Bear). এর আর এক নাম লিট্‌ল্ ডিপার (Little Dipper).

আকাশে একেও দেখতে পাওয়া যায়। একেও দেখতে প্রশ্ন চিহ্নের মতো, তবে একটু আকারে ছোট। এরও মাথাটা চৌকো, কিন্তু লেজটি সামনের দিকে বাঁকানো। আমাদের দেশে এর নাম হচ্ছে লঘু সপ্তর্ষি ; আর এক নাম শিশুমার, মানে, শুশুক। লঘু সপ্তর্ষির শেষ তারাটি হচ্ছে স্বয়ং ধ্রুবতারা।

সপ্তর্ষিকে চিনলে ধ্রুবতারাকে সহজেই খুঁজে বার করা যায়। সপ্তর্ষির মাথার তারা দুটিকে মনে মনে একটা লাইন দিয়ে যোগ করে সেই লাইনটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে গেলেই সেটা ধ্রুবতারার পাশ দিয়ে যাবে। ধ্রুবতারাকে চেনবার এই আর একটা উপায়। সপ্তর্ষি যে অবস্থায় থাকুক না কেন, এ লাইনটা ধ্রুবতারার পাশ দিয়ে যাবেই।

অরুন্ধতী (Alcor) বলে একটি অস্পষ্ট তারা আছে। অরুন্ধতী ছিলেন বশিষ্ঠ ঋষির স্ত্রী, তাই আকাশেও তিনি বশিষ্ঠের (Mizar) পাশেই আছেন। বশিষ্ঠ তারাটি সপ্তর্ষি নক্ষত্রের নীচের শেষ তারাটির উপরে রয়েছে।

॥ ক্যাসিওপীয়া, অ্যাণ্ড্রোমিডা আর পার্সিয়ুস ॥

ধ্রুবতারার যে পাশে সপ্তর্ষি রয়েছে, তারই উলটো পাশে খানিকটা দূরে পাঁচটি উজ্জ্বল তারা W-এর
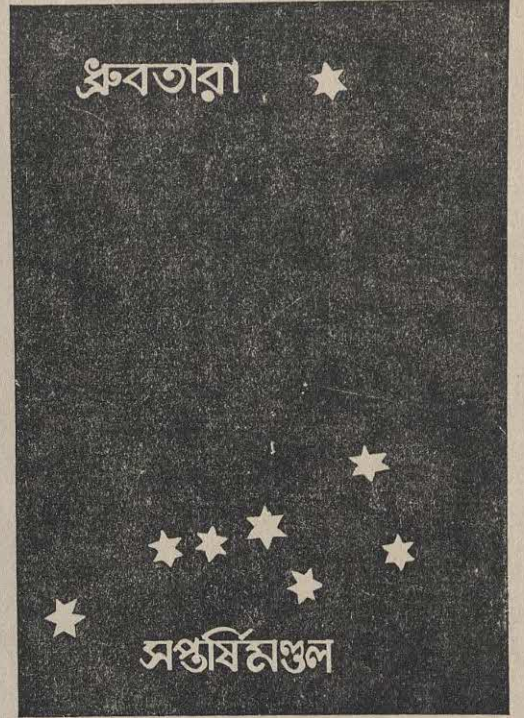
ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডল

আকারে সাজানো রয়েছে। এর নাম হচ্ছে ক্যাসিওপীয়া (Cassiopeia). এ নামটি গ্রীকদের দেওয়া। একে শীতকালে উত্তর আকাশে আমাদের আকাশ-গঙ্গার গায়ে দেখতে পাওয়া যায়। আর একটু উত্তরে আকাশ-গঙ্গার ঠিক বাইরে পুবে মন্দিরের মতো করে সাজানো কয়েকটি তারা আছে। ওদের নাম সিফিউস নক্ষত্র (Cepheus). তাদের অন্য পাশে পার্সিয়ুস (Perseus).

ক্যাসিওপীয়ার একেবারে এক মাথায় যে তারাটি, সেটি হচ্ছে বীটা (Beta)-ক্যাসিওপীয়া, মানে, ক্যাসিওপীয়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারা।

এবার ধ্রুব থেকে বীটা-ক্যাসিওপীয়ার লাইন ধরে এগিয়ে গেলে এমন এক জায়গায় পৌঁছনো যাবে যেখানে আকাশের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বারটি তারা একটি চতুষ্কোণ তৈরি করেছে। ঐগুলি হচ্ছে পেগাসাস (Pegasus) নক্ষত্র। একে যদি একটি

ঘুড়ি বলে মনে করা হয় তবে দেখা যাবে যে তিনটি স্পষ্ট তারা সেই ঘুড়ির লেজের মতো করে সাজানো রয়েছে ; তার মাঝেরটির গায়ে আর একটি তারা। এই লেজটিই অ্যাণ্ড্রোমিডা (Andromeda). নক্ষত্র লেজটি গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে তার সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে সাজানো কয়েকটি তারা দেখা যায়—সেটি পার্সিউস (Perseus) নক্ষত্রের এক মাথা।

॥ কৃত্তিকা ও রোহিণী ॥

এখন পার্সিউস ধরে আর একদিকে এগিয়ে গেলে তারই মাঝবরাবর, একটু উপরে, আমাদের দৈত্য-তারাকে (Algol) পাওয়া যায়। আরও এগিয়ে গিয়ে পার্সিউসের ও-মাথার প্রায় পাশেই দেখতে পাওয়া যায় সাতটি নক্ষত্রকে। এর ভাল নাম কৃত্তিকা (Pleiades). 'সাত ভাই' নাম হলেও খালি চোখে এতে ছ'টি তারা দেখা যায়। হিন্দু পুরাণ মতে বশিষ্ঠ ছাড়া আর যে ছয় ঋষি সপ্তর্ষিতে আছেন, এঁরা তাঁদের স্ত্রী। গ্রীক পুরাণে বলে যে এই ছ'জন হচ্ছেন চন্দ্রদেবী ডায়ানা (Diana)-র ছয় সখী।

কৃত্তিকার একটু নীচেই দেখা যাবে উজ্জ্বল লাল রঙের তারা রোহিণীকে (Aldebaran).

॥ কালপুরুষ ॥

রোহিণীর কাছেই বিরাট কালপুরুষ বা ওরায়ন (Orion). নক্ষত্র এর তারাগুলো এমনভাবে সাজানো যে দেখলে বেশ একটা মানুষের চেহারা বলে মনে হয়। দেহটি চৌকো, ডান হাতটি উপরে তোলা, বাঁ হাতে স্পষ্ট একটি ধনুক, কোমর থেকে তলোয়ার ঝুলছে, ডান পা-খানা হাঁটুর কাছে বাঁকা, আর বাঁ পা-টি সোজা। গ্রীকদের পুরাণে ওরায়ন বলে একজন বড় শিকারী ছিলেন। তাঁর নামেই নক্ষত্রটির নাম রাখা হয়েছে।

শীতের সন্ধ্যায় সেই ওরায়ন বা কালপুরুষকে পুব আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। আবার বৈশাখ-

কালপুরুষ

জ্যৈষ্ঠ মাসে সন্ধ্যাবেলা দেখা যায় সে পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। এর ডান কাঁধের উজ্জ্বল বড় তারাটির নাম আর্দ্রা (Betelgeuse). বাঁ পায়ের শেষ তারাটিও খুব ঝকঝকে, তার নাম হচ্ছে বাণরাজা (Rigel). এটি কালপুরুষের মধ্যে সবচাইতে উজ্জ্বল।

কালপুরুষের কোমরের বেল্ট বা কোমরবন্ধনী থেকে তিন-তারার যে তলোয়ারটি ঝুলছে, তার মাঝখানকার তারাটির পিছনে একটি নীহারিকা (Nebula) দেখা যায়। সে অনেক দূরের একটা আলাদা জিনিস, কিন্তু আমরা তাকে ওখানে দেখি বলে তার নাম হচ্ছে কালপুরুষের নীহারিকা (Great Nebula of Orion).

॥ নীহারিকা বা নেবুলা ॥

মহাকাশের নীহারিকারা হচ্ছে আকাশ-জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের মতো গ্যাসের পিণ্ড ; মহাবেগে ঘুরতে

ঘুরতে ছুটছে। বলা যেতে পারে যে, এরা হচ্ছে সেই সব ছায়াপথ (Galaxy), যাদের মধ্যেকার গ্যাস জমে এখনও তারা হয়ে যেতে পারেনি। এমনও হয়েছে যে বড় দূরবীন বেরোবার পর দেখা গেছে, যাকে নীহারিকা বলে মনে হত, তাতে তারা আছে। তবু তার পুরনো 'নীহারিকা' নামই থেকে গেছে। আসলে কিন্তু তাদের ছায়াপথ বলাই ঠিক। আমাদের আকাশগঙ্গার মধ্যেও নীহারিকা আছে, তাদের তো খালি চোখেই দেখা যায়।

এদের চেহারার কিছু ঠিক নেই। অ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রের ভিতর দিয়েও একটা নীহারিকা দেখা যায়। সেটার চেহারা যেন স্প্রিং-এর মতো প্যাঁচানো (Spiral), যেমন এক-একটা ছায়াপথের হয়। সেটা এত বড় যে তাতে আমাদের সৌরজগতের মতো হাজার দুয়েকের থাকবার জায়গা হতে পারে। আর, সেটা আমাদের এখান থেকে প্রায় ন'-লক্ষ-আলোক-বর্ষ দূরে। এই নীহারিকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আলো যেতে প্রায় ৫০ হাজার বছর লাগে।

কালপুরুষের কোমরবন্ধনীর নীহারিকা

কালপুরুষের নীহারিকাটির চেহারা দেখে তার আর এক নাম দেওয়া হয়েছে হর্সহেড (Horse-head). সেও সাংঘাতিক বড়, অথচ অ্যাণ্ড্রোমিডার নীহারিকার মতো অত দূরে নয়। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব ১২০০ আলোক-বর্ষ। তাই তাকে খালি চোখেও দেখা যায়, আবছা একটুকরো ধোঁয়ার মতো।

॥ বৃষ আর রোহিণী ॥

কালপুরুষের বাঁ হাতের ধনুকটি বাগানো রয়েছে বৃষ (Taurus) নক্ষত্রের দিকে। এই বৃষকে দুটি তিন কোনা শিং-এর মতো করে সাজানো তারা দেখে চেনা যাবে। তার সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটিই রোহিণী (Aldebaran).

॥ কুকুর তারা—লুব্ধক আর সরমা ॥

ওরায়নের দুটি শিকারী কুকুর ছিল, দুটি তারাকে এই দুই কুকুর কল্পনা করা হয়েছে। তারাও তার সঙ্গে আছে। তার ডান পায়ের কাছে—একটি উপরে, অন্যটি নীচে। বড়-কুকুরটিকে (Canis Major) চেনা যাবে তার উজ্জ্বলতাকে লক্ষ্য করে। সেটি শুধু ঐ নক্ষত্রের নয়, সব আকাশের সব তারার মধ্যে উজ্জ্বলতম তারা। তাকে আমরা বলি লুব্ধক, ইংরেজীতে বলে Dog-Star,

স্প্রিং-এর মতো পাকানো নীহারিকা

ব্রাইডাল ভেল নীহারিকা

আর তার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে সিরিয়াস (Sirius). সে এমন ঝকমক করছে যে তাকে আর খুঁজতে হবে না। আমাদের থেকে তার দূরত্ব ৮৪ আলোক-বর্ষ।

ছোট-কুকুর (Canis-Minor) নামক তারাকে একটু উপরে দেখা যাবে। আর্দ্রা, লুব্ধক আর তাকে যোগ করে লাইন টানলে একটি ত্রিভুজ তৈরী হয়। সেই তারাটির নাম সরমা বা প্রশ্বা (Procyon). এ তারাটিও খুব উজ্জ্বল।

॥ কয়েকটি খুব উজ্জ্বল তারা ॥

আকাশের উজ্জ্বলতম তারাগুলিকে বলে প্রথম মানের তারা (Stars of the first Magnitude). এরা হচ্ছে (লুব্ধককে নিয়ে) মোটে কুড়িটি। লুব্ধক, তার পরই অগস্ত্য (Canopus), কিন্নর (Alpha Centauri), অভিজিৎ (Vega), ব্রহ্মহৃদয় (Capella), স্বাতী (Arcturus), বাণরাজা (Rigel), সরমা বা প্রশ্বা (Procyon), শূলতারা (Achernar), বীটা সেণ্টোরাই (Beta Centauri), আর্দ্রা (Betalgeuse), শ্রবণা (Altair), আল্‌ফা ক্রুসিস (Alpha Crucis), রোহিণী (Aldebaran), পুনর্বসু (Pollux), চিত্রা (Spica), জ্যেষ্ঠা (Antares), ফোমালহট (Fomalhaut), কৃষ্ণসখা (Deneb) এবং মঘা (Regulus).

॥ চাঁদের সাতাশ স্ত্রী ॥

প্রথম মানের তারাদের মধ্যে ছ'টি হচ্ছে স্বাতী, আর্দ্রা, শ্রবণা, রোহিণী, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা—এই ছ'জন

হিন্দু পুরাণের মতে চন্দ্রদেবের স্ত্রী। শুধুই কি এই ক'টি? চন্দ্রের নাকি আরও ২১টি স্ত্রী আছে—তাহলে হয় মোট ২৭ জন। এই ২৭ জনের নামে সাতাশটি তারা আছে।

ভারী সুন্দর সুন্দর তাদের নামগুলি—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু (Pollux), পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী (Denebola), হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা (Altair), ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা (Markab), উত্তর-ভাদ্রপদা আর রেবতী।

পূর্ণিমার চাঁদ

আকাশে চাঁদের উপর নজর রাখলে দেখা যায় যে, সে এক বছরের মধ্যে পরপর অশ্বিনী থেকে রেবতী পর্যন্ত সাতাশ তারার মধ্য দিয়ে ঘুরে আসে। সারাবছরে চাঁদকে আমরা একটা পথ ধরে ঘুরে আসতে দেখি। চাঁদ সেই পথের যেখানেই আসুক, সেখানেই তার কাছে এই সাতাশজনের একজনকে দেখা যায়। তবে, পাশাপাশি দেখা গেলেও কোনও তারা সত্যিসত্যি চাঁদের কাছে বা পাশে থাকতে পারে না, অনেক দূরে পিছনে থাকে। যেমন, স্বাতী তারাটি হল এখান থেকে ৪০ আলোক-বর্ষ দূরে। আর, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব তার অনেককোটি ভাগের এক ভাগ।

॥ সূর্যের রাশিচক্র ॥

পৃথিবী থেকে দেখতে মনে হয় সূর্যও চলছে, আর ঘুরতে ঘুরতে ঐ রকম পরপর কতকগুলো নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের দিকে তাকানো যায় না, আর দিনের বেলা কোনও নক্ষত্রকে দেখাও যায় না, তাই সূর্য কার কার ভিতর দিয়ে যায়, সেটা চোখে দেখা যায় না, হিসেব করে জানতে হয়। প্রতি বাংলা মাসে সূর্য একটা না একটা নক্ষত্ররাজ্যের সামনে দিয়ে চলে যায়। এই নক্ষত্রদের প্রত্যেকটাকে বলে রাশি (Sign), এইভাবে বারো মাসে বা এক বছরে বারোটা নক্ষত্র তার পথে পড়ে বলে মনে হয়। সূর্য যতক্ষণ এক একটা রাশির মধ্য দিয়ে যেতে থাকে, হিন্দুরা ততক্ষণকে এক একটা মাস বলে ধরেন। আর, সূর্য যখন মাসের শেষে এক রাশি ছেড়ে অন্য রাশিতে সংক্রমণ করেন (মানে, চলে যান), সেই যাওয়াকে বলে সংক্রান্তি।

পরপর গোল করে সাজানো বারোটা রাশিকে একসঙ্গে বলা হয় রাশিচক্র (Zodiac). এই বারোটা রাশি বা বিশেষ নক্ষত্রদের নামগুলো হচ্ছেঃ মেষ (Aries), বৃষ (Taurus), মিথুন (Gemini), কর্কট (Cancer), সিংহ (Leo), কন্যা (Virgo), তুলা (Libra), বৃশ্চিক (Scorpio), ধনু (Sagittarius), মকর (Capricornus), কুম্ভ (Aquarius) এবং মীন (Pisces). সূর্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে থাকে, মানে, এক ধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত যায় বলে মনে হয়। তারপর জ্যৈষ্ঠে বৃষ রাশিতে। এইভাবে ক্রমে চৈত্রে মীনরাশিতে এলে বছর পূর্ণ হয়।

অন্য অনেক নক্ষত্রের মতো রাশিগুলোরও এক একটা মূর্তি কল্পনা করে নাম দেওয়া হয়েছে। বারোটার
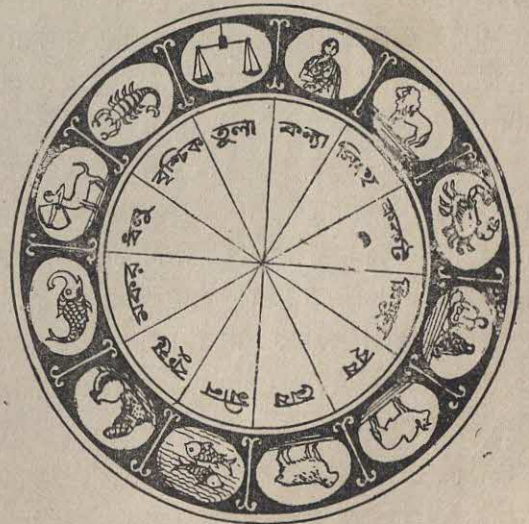
রাশিচক্র

মধ্যে সাতটার নাম নানারকম প্রাণীর, দুটো নাম কন্যা (মেয়ে) আর মিথুন (স্বামী-স্ত্রী), আর বাকী তিনটে তিনরকম জিনিসের—তুলা (দাঁড়িপাল্লা), ধনু (ধনুক) আর কুম্ভ (কলসী)।

সপ্তর্ষির মাথার দু'টো তারার লাইন একদিকে বাড়িয়ে দিলে ধ্রুবতারাকে পাওয়া যায়। সেই লাইনটাকেই অন্যদিকে বাড়িয়ে দিলে সিংহরাশি (অর্থাৎ সিংহ নক্ষত্রকে) পাওয়া যাবে। লাইনটি যেখানে গিয়ে তার গায়ে ঠেকবে, সেখানে কোনও তারা নেই। কিন্তু একধারে ত্রিভুজের আকারে সাজানো তিনটি তারা দেখা যাবে, সেইটি হল সিংহমশায়ের মুখ। তার মধ্যে একটি তারা বেশ বড়, তার নাম উত্তর-ফল্গুনী (Denebola). অন্য ধারে আবার একটি প্রশ্ন চিহ্ন, লাঙ্গল বা তেলের পলার মতো দেখতে তারার দল—সেটি হল তার খাড়া লেজ আর একটি পা। পায়ের শেষে খুব উজ্জ্বল তারাটিই হল মঘা (Regulus).

বৃশ্চিক মানে কাঁকড়া-বিছে। তার সঙ্গে বৃশ্চিক-রাশির একটু মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার সময় এই নক্ষত্রটি দক্ষিণ আকাশে, আকাশগঙ্গার একটু উপরে দেখা দেয়। এটি কাত করে ধরা, লম্বা হাতলওলা একটা হকি-স্টিকের মতো—স্টিকের মাথাটাকে কাঁকড়া-বিছের লেজের হুল বলে মনে করা যেতে পারে। হাতলের গোড়া থেকে এক লাইন তারা নেমেছে। আর, হাতলের প্রায় মাঝামাঝি একটি প্রথম মানের তারা রয়েছে, তার রং লাল। এর নাম জ্যেষ্ঠা (Antares).

মকর একটি কাল্পনিক জীব। মকর গঙ্গার বাহন। গঙ্গাদেবীর ছবিতে তাকে আঁকা হয় একটা শুঁড়ওয়ালা মাছের মতো করে। আবার, মকররাশির যার ইওরোপীয় নাম Capricornus, তার মানে হচ্ছে 'শৃগালের শিং'। মকররাশির তারাগুলোকে লাইন টেনে জুড়ে দিলে বরং মনে হবে যে একটা কোনাচে ধরনের ট্যারাবাঁকা মুকুট উলটে রয়েছে। তাকে অবশ্য চওড়া আর খাটো একটা শিংও বলতে পারা যেতে পারে। আশ্বিন মাসের সন্ধ্যায় দক্ষিণ আকাশে খুব উঁচুতে খুঁজলে একে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোনও বড় তারা নেই।

বৃষরাশি কালপুরুষের কাছের তারা। তার একপাশে উজ্জ্বল যে তারাটি, সেটি চাঁদের রোহিণী। বৃষরাশির তিনকোনা দুটি শিং আর মুখের খানিকটা আছে, বাদবাকী নেই।

॥ তারার রং ॥

তারাদের সকলের রং কিন্তু একরকম নয়। কোনও কোনও তারা যে লালচে রঙের, তা ভাল করে না দেখলেও বোঝা যায়। লক্ষ্য করে দেখলে স্পষ্ট কয়েক রঙের তারা চোখে পড়ে।

রঙের তফাত হয় তাপের জন্যে। যে তারা যত ঠাণ্ডা, সে তারা তত বেশী লাল রঙের হয়। সবচাইতে গরম তারারা নাকি হয় নীল রঙের।

অনবরত তাপ ছড়াতে ছড়াতে তারাদের তাপ কমে যায়, তখন তাদের রংও বদলে যায়। তাই, যেসব তারার বয়স কম, সেগুলো নীল, সাদা ইত্যাদি রঙের হয়। লালচে আর লাল তারাগুলি হচ্ছে পুরোনো তারা। এদের মধ্যে যারা উজ্জ্বল, বুঝতে হবে যে তাদের আয়তন খুব বড়।

॥ সূর্য ॥

যত তারা আছে, তাদের মধ্যে সূর্য আমাদের সব চাইতে কাছে। শুধু চাঁদ, আর মঙ্গল বুধ শুক্র এই তিনটে গ্রহ সূর্যের চাইতে আমাদের কাছে।

॥ সূর্য কতটা গরম ॥

অনেকে মনে করতেন যে সূর্যটা আগে হয়েছিল, পরে পৃথিবী তার গা থেকে খসে এসেছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে সূর্য আর পৃথিবী একবয়সেরই হবে—প্রায় ৫০০ কোটি বছর বয়স হয়েছে দুজনেরই। ছোট বলে পৃথিবীর উপরটা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, সূর্য বড় বলে তা হয়নি। এখনও সে পুরোপুরি একটা জ্বলন্ত গ্যাসের গোলা হয়েই আছে। বেশির ভাগেই হাইড্রোজেন গ্যাস, তবে কিছু কিছু হিলিয়াম গ্যাস, অক্সিজেন গ্যাস, কার্বনও আছে। তাছাড়া, লোহা ইত্যাদি সবরকম ধাতুও আছে বলে জানা যায়, অবশ্য সব কিছুই গ্যাস হয়ে

আছে। লোহা এত শক্ত জিনিস, তাও একেবারে গ্যাস হয়ে গিয়েছে—সূর্য এতই গরম।

কী ভয়ানক গরমে যে এরকম হয়েছে, তার ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সূর্যের উপরের তাপ ৬,৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (সেলসিয়াস)। এও তো কিছুই নয়, একেবারে ভিতরে সূর্যের তাপ নাকি পৌনে তিন কোটি ডিগ্রী।

অত তাপ আসে কোথা থেকে? মনে করা হয় যে, সূর্যের মধ্যে সূক্ষ্ম কণাগুলো ছুটোছুটি করতে করতে অনবরত ধাক্কা খাচ্ছে, আর তাতেই সূর্য এত গরম হয়ে উঠছে।

সেই তাপ আর আলো সূর্য থেকে ক্রমাগত বেরিয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। তার খানিকটা—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঠেকে ফিরে কিংবা শুষে যায়। বাকী তাপটুকু পেয়েই পৃথিবীর সব প্রাণীর সব কাজ চলে যাচ্ছে।

॥ সূর্য কত বড় ॥

সূর্য তাহলে কত বড়? সূর্য আকাশগঙ্গার অন্তর্গত একটি মাঝারি গোছের তারা, তারই মধ্যে একপাশে তার ঠাঁই। সেই তুলনায় সে বেশী বড় নয়। তবে, সব তারার চাইতে সে আমাদের কাছে আছে বলে তাকে বেশ বড় দেখায়। আর, সত্যি সত্যিই সে পৃথিবীর চাইতে ঢের বড়। তার ব্যাস হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০০ গুণ—৮,৬৫,০০০ মাইল। চেহারাখানা এত বড় যে ১৩ লক্ষ পৃথিবী তার মধ্যে থাকতে পারে। কিন্তু হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে সে পৃথিবীর চেয়ে মোটে ৩,৩৩,৪৩২ গুণ ভারী।

চেহারা হিসেবে সূর্যের ভার তাহলে কমই বলতে হয়। সূর্য গ্যাসে তৈরী, তাই সে একটু হালকা। কিন্তু সে গ্যাস একেবারে হাওয়ার মতো হালকা নয়, ভয়ানক জমাট ঘন গ্যাস। আর সব তারার মতো সূর্যও ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, আর ঘন হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে শেষে সে লাল হয়ে যাবে, অবশেষে ফ্যাকাশে হয়ে নিভে যাবে। সে-অবস্থা কেউই দেখতে পাবে না। কেননা, তার ঢের আগেই, সূর্যের তাপ একটু কমে গেলেই সব মানুষই মরে যাবে, পৃথিবীতে কোন প্রাণী বেঁচে থাকবে না। যাই হোক, সে কথা ভেবে আজই ভয় পাবার কোন কারণ নেই, কেন না সূর্য আরও কয়েক হাজার কোটি বছর ধরে জ্বলবে।

॥ সূর্য কত জোরে ছোটে ॥

সূর্য কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। তার মাথাটা একেবারে খাড়া নয়, একটু সামনে ঝুঁকে থাকে। এক পাক ঘুরতে তার পেটের কাছটার লাগে ২৫ দিন। তা ছাড়া সে নাকি তার দলবল নিয়ে এক সেকেণ্ডে ১২ মাইল, অর্থাৎ দিনে ১ লক্ষ মাইলের চেয়ে কিছু বেশী জোরে এগিয়ে চলেছে লিরা বা লায়রা (Lyra) নক্ষত্রের অভিজিৎ তারার দিকে। কেউ কেউ বলেন সূর্য চলেছে হার্কিউলিস নক্ষত্রের একটি তারার ('মিউ হার্কিউলিস') দিকে। যা-ই হোক, দিক্‌টা প্রায় একই। আবার এ কথাও জানা গিয়েছে যে, সূর্য আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের ঠিক মাঝখানকার বিন্দুকে প্রদক্ষিণ করছে। সেকেণ্ডে ১২০ থেকে ১৭০ মাইল বেগে ছুটে ছুটে ২০ কোটি বছরে তার একবার ঘোরা হয়। খালি চোখে তো সূর্যের দিকে তাকানো যায় না। গ্রহণের সময় আমরা ভুসো কালি-মাখা কাচ দিয়ে সূর্যকে দেখি। তাতেও মনে হয় যে সেটা একটা
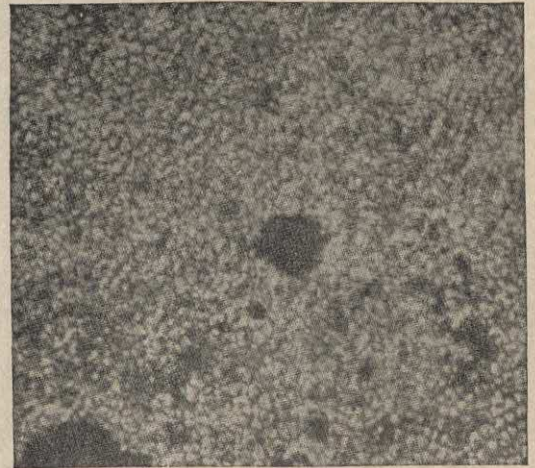
সূর্যের পিঠ ঠিক মৌচাকের মতো দেখতে ;
আসলে এগুলি গ্যাসপুঞ্জ

ভয়ংকর আগুনের গোলা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো আরও বেশী জানতে চান। অথচ সাধারণ দূরবীন দিয়ে তার দিকে দেখা উচিত নয়। গ্যালিলিও খালি চোখে দূরবীন দিয়ে দেখতে গিয়ে কিছুদিনের জন্য অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই, নানা কৌশল করে, অনেক রকমের যন্ত্রপাতি দিয়ে সূর্যকে দেখা হয়েছে।

॥ সূর্য কি দিয়ে তৈরী ॥

দেখা গিয়েছে যে, সূর্যের সারা গায়ে যেন চাল ছড়ানো রয়েছে। এগুলো আসলে হচ্ছে বিরাট বিরাট গ্যাসের রাশি। এই সমস্তটাকে বলে সূর্যের আলোকমণ্ডল (photosphere). এটাকে আগাগোড়া ঘিরে রয়েছে কয়েক হাজার মাইল চওড়া আগুনের শিখা। এই আগুনের বেড়াটাকে বলে বর্ণমণ্ডল (chromosphere). একে ঘিরে বহুদূর পর্যন্ত রয়েছে কম উজ্জ্বল আলোর একটা জায়গা, তা হচ্ছে ছটামণ্ডল (corona). আর, বর্ণমণ্ডলের মধ্যে কয়েকটা জায়গায় দেখা যায় যেন আগুনের ঘূর্ণিঝড় উঠেছে। লকলক করে সেই আগুনের শিখা (solar prominence) উঠছে। সেই আগুনের শিখার এক একটাকে আড়াই লক্ষ মাইল পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। মানে, পৃথিবী থেকে অমন আগুনের শিখা বেরোলে তা চাঁদকে জ্বালিয়ে দিত।

সূর্য থেকে আগুনের শিখা বেরোচ্ছে।
এই শিখা আড়াই লক্ষ মাইল পর্যন্ত উঁচু হয়

॥ সূর্য কত দূরে ॥

সূর্য আমাদের থেকে খুব বেশী দূরে নয়। ঘুরতে ঘুরতে আমাদের নিয়ে পৃথিবীটা সূর্যের যখন সব চাইতে কাছে আসে, তখন সূর্যের দূরত্ব হয় ৯,১৪,৪৭,৩০০ মাইল। আর যখন সব চাইতে দূরে চলে যায়, তখন ৯,৪৫,৫৯,৩০০ মাইল। তাই মোটের উপর বলা যায় যে, সূর্য আমাদের থেকে গড়ে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ৩ হাজার মাইল দূরে।

॥ সূর্যের রং ॥

সূর্যের রং প্রথমে হয় তো নীল বা সাদা ছিল। তারপর, তেজ বেরিয়ে বেরিয়ে সে এখন হলদে তারার দলে এসেছে। ভোরে আর সন্ধ্যায় কিন্তু তাকে লাল দেখায়। সেটা তার নিজের রং নয়।

ভোরে আর সন্ধ্যায় সূর্যের আলো তেরছাভাবে পৃথিবীতে পড়ে বলে তার লাল আলোটাই আমাদের চোখে এসে পড়ে। এই লাল রং সূর্যের আলোর মধ্যে মেশানো সাতটি রঙের একটি। ভোরে আর সন্ধ্যায় শুধু এই রঙের আলোই বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত (refracted) হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ে।

॥ সূর্যের কলঙ্ক ॥

একটা আশ্চর্য কথা এই যে, এমন যে ভয়ংকর জ্বলন্ত সূর্য, তাতেও নাকি চাঁদের মতো কালো কালো দাগ আছে। দূরবীন দিয়ে গ্যালিলিও-ই প্রথম সেগুলোকে দেখেন। পরে দেখা গেল যে সেগুলো ক্রমেই ডানদিকে সরতে সরতে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার কিছুদিন বাদে বাঁদিকে দেখা দেয়। তাতেই প্রমাণ হ'ল যে সূর্য ডানদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এই কালো দাগগুলোকে বলে সৌর-কলঙ্ক বা সান্-স্পট্স্ (sun-spots), মানে—সূর্যের গায়ের দাগ। এরা হচ্ছে সূর্যের কম গরম জায়গা। এখানকার তাপ ৬৫০০ থেকে ৮০০০ ডিগ্রী। তাই এদের কম উজ্জ্বল বা কালো বলে মনে হয়। এক সময় হয়তো একটিও কলঙ্ক দেখা যায় না, আর এক সময় হয়তো অনেকগুলো দেখা যায়। এরা কি করে যে হয়,

আর কেন যে বাড়ে কমে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা রকম মত প্রকাশ করেছেন। তবে এরা প্রায়ই জোড়ায় জোড়ায় থাকে। একটা জিনিস দেখা গেছে যে ১১ বছর অন্তর সৌর-কলঙ্ক খুব বাড়ে।
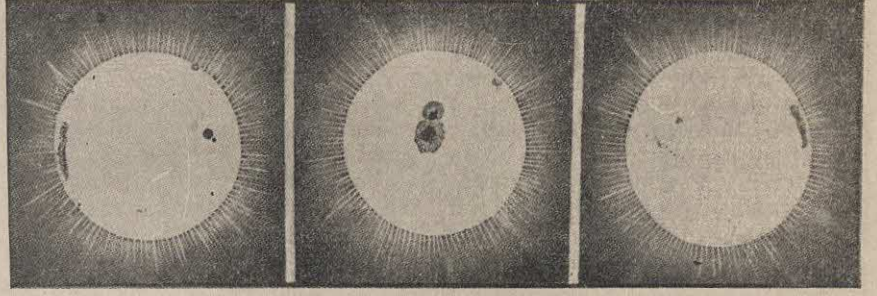
সূর্য যে ডানদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে তা এই ছবি তিনটির সৌর কলঙ্ককে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে

এদের থেকে এমনিতেই আলাদা একরকমের তেজ মহাকাশে ছিটকে বেরিয়ে আসে। সেই তেজ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধাক্কা দিলে মেরুজ্যোতি (aurora) জ্বলে ওঠে। তারপর, সৌর-কলঙ্ক যখন সংখ্যায় বেড়ে যায়, সেই তেজটা এসে বায়ুমণ্ডলের উপরকার স্তরগুলোকে তছনছ করে দেয়। তখন তারা বেতার-তরঙ্গদের পৃথিবীতে ফেরত পাঠাতে পারে না বলে পৃথিবীর রেডিওর ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যায়। আরও নীচে পৃথিবীর বুকেও এসে সেই তেজ আমাদের বিদ্যুতের যন্ত্রে গোলযোগ ঘটায়; এমন কি, গাছপালারও ক্ষতি করে। কেউ কেউ মনে করেন যে ১১ বছর অন্তর এই সৌর-কলঙ্কের উৎপাতেই ফসল কম হয়, এমন কি, দুর্ভিক্ষও হয়।

সূর্যের কলঙ্ক

॥ সূর্যগ্রহণ ॥

কখনও কখনও সূর্যের খানিকটা জায়গা কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হতে দেখা যায়। তাকে সূর্যগ্রহণ বলে। গ্রহণ হলে সূর্যের আলো কমতে থাকে। তা দেখে আগেকার দিনে লোকেরা বড় ভয় পেত।

সূর্যকে আড়াল করে চাঁদ। মেঘ চলতে চলতে সূর্যকে যেমন ঢেকে ফেলে আবার সরেও যায়, চাঁদও তাই করে। তবে, মেঘের কোনও নিয়ম নেই, কিন্তু চাঁদ একটা নিয়মে চলে বলে সে নিয়মমতো পৃথিবীর সামনে এসে সূর্যকে আড়াল করতে পারে। একমাত্র অমাবস্যার দিনেই চাঁদ পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে আসে বলে অমাবস্যার দিনেই এটা হতে পারে। বছরে দুই থেকে পাঁচবার এরকম হতে পারে। একে বলে সূর্যগ্রহণ।

সূর্যগ্রহণ কখনও পৃথিবীর সব জায়গা থেকে এক সময় দেখা যায় না। সূর্যগ্রহণের সময় চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, কিন্তু চাঁদ ছোট বলে তার ছায়া

মেরুজ্যোতি
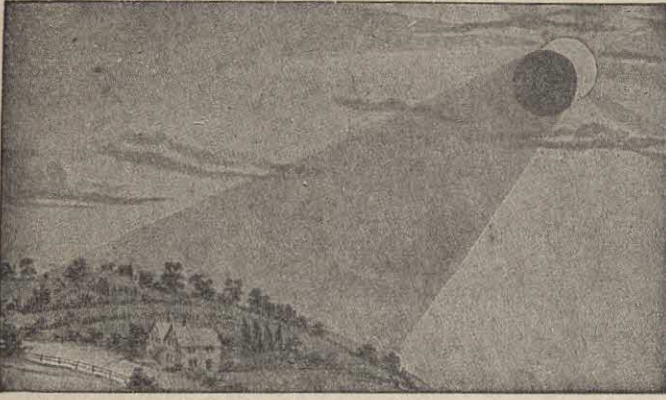
সূর্যগ্রহণ

পৃথিবীর সবটাতে পড়ে না। যেখানে যেখানে পড়ে, শুধু সেখান থেকেই দেখা যায় যে সূর্য আড়ালে পড়ছে, অন্য জায়গায় তা হয় না। তাই হয় তো কোনও দিন দিল্লীতে গ্রহণ দেখা গেল কিন্তু কলকাতায় সেটা দেখা গেল না।

সূর্যের গ্রহণ হতে হলে চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়া চাই। ছায়াটা ২,৩২,০০০ থেকে ২,৩৬,০০০ মাইল পর্যন্ত লম্বা হয়।

সূর্যগ্রহণ তিন রকমের হয়। সূর্যের সবটা ঢাকা পড়লে তাকে বলে পূর্ণগ্রাস (total eclipse). সে দেখতে ভারী সুন্দর। কালো মখমলের মতো রঙের গোল সূর্য, তাকে ঘিরে মুক্তোর মতো ছটামণ্ডলের আলোর মালা। ঐ সময়েই ছটামণ্ডল দেখে সূর্যের অনেক খবর জানা যায়। কিন্তু সময় পাওয়া যায় বড় কম। পূর্ণগ্রাস বড় জোর ৭½ মিনিট থাকে। যেবার যেখানে পূর্ণগ্রাস দেখা যায়, সেবার সেখানেই দু পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও নানাদেশ থেকে বিজ্ঞানীরা ঐ ছটামণ্ডলকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে আগে থেকে চলে আসেন।

পূর্ণগ্রাস খুবই কম হয়। বেশির ভাগ গ্রহণই খণ্ডগ্রাস (partial eclipse). তখন খানিকক্ষণের জন্যে সূর্যের খানিকটা অংশ অন্ধকার হয়ে যায়।

আবার একরকম গ্রহণ আছে, তাতে চাঁদটা সূর্যের ঠিক মাঝখানটাকে আড়াল করে, আর আলোকমণ্ডলের এক ফালি আলো একটা বালার মতো হয়ে থাকে। এরকম হলে তাকে বলে বলয়গ্রাস (annular eclipse).

সূর্যগ্রহণে যেমন চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, তেমনি পৃথিবীর ছায়াও কখনও কখনও চাঁদে পড়ে চাঁদের গ্রহণ হয়। হিন্দু শাস্ত্রে আছে যে এ দুটোই হয় একটা গলাকাটা দৈত্য রাহুর জন্যে। সে চাঁদ সূর্যকে খেয়ে ফেলে, তখন তাদের দেখা যায় না। কিন্তু রাহুর গলাটা কাটা বলে চাঁদ আর সূর্য কাটা গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে—চিরকাল এই চলছে।

॥ সৌরজগৎ ॥

মহাকাশের আয়তনের তুলনায় তেমন বড় না হলেও সূর্যের নিজের একটা রাজ্য আছে, তাকে বলে সৌরজগৎ (solar system). কতকগুলো গ্রহ, গ্রহ-কণিকা, উপগ্রহ, ধূমকেতু আর উল্কা নিয়ে তার রাজত্ব।

গ্রহগুলো তাকে ঘিরে ঘুরে চলেছে। ইংরেজীতে তাই তাদের বলে প্ল্যানেট (planet), মানে—যারা ঘুরে বেড়ায়। এ পর্যন্ত এরকম ৯টির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। তাদের নাম হল ঃ বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো। এদের ইংরেজী নাম যথাক্রমে Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto.
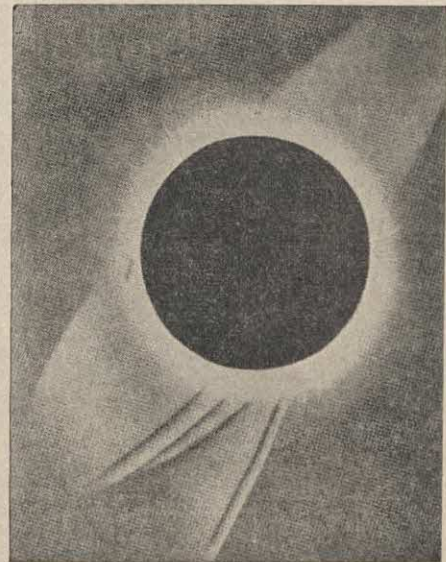
পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ
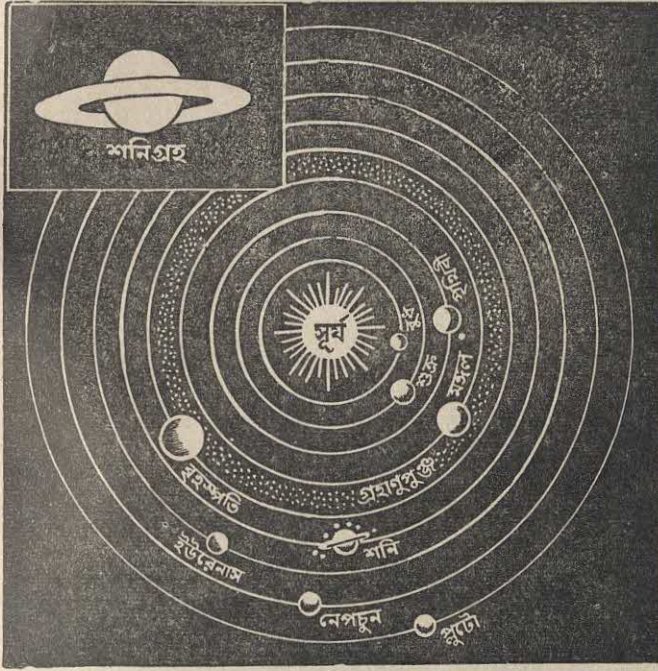
সৌরজগৎ (উপরে শনিগ্রহকে আলাদা দেখানো হয়েছে)

কিছুকাল হলো বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে আরও একটি গ্রহ আছে। এই দশম গ্রহটিকে চোখে না দেখলেও তার নাম তাঁরা দিয়েছেন—ভাল্‌কান (Vulcan).

আমাদের পঞ্জিকাতেও বলে যে গ্রহ ন'টি—নবগ্রহ। কিন্তু তাদের নাম আলাদা : রবি (সূর্য), সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু আর কেতু। কিন্তু, যারা সূর্যকে ঘিরে ঘোরে, আজকাল গ্রহ বলতে শুধু তাদেরই—অর্থাৎ প্ল্যানেটদেরই বোঝায়। রবি, সোম, রাহু, কেতু সে হিসেবে 'গ্রহ' নয়। অন্য পাঁচটি ঠিক আছে। উপরে শনিগ্রহকে আলাদা দেখানো হয়েছে। আমাদের পঞ্জিকার নবগ্রহ, আর বিজ্ঞানীদের ন'টি গ্রহ পুরোপুরি এক নয়।

॥ সূর্যের টান ॥

গ্রহরা সবাই কেউ কাছে, কেউ দূরে থেকে সূর্যকে ঘিরে ঘুরেই চলেছে। প্রত্যেকের পথ আলাদা। প্রত্যেকের এই পথকে বলে তার কক্ষ (Orbit). পথের কোনও চিহ্ন অবশ্য আকাশে নেই। কিন্তু থাকলে গোলমতো দেখাত। পুরোপুরি গোল নয়, একটু লম্বাটে গোল, ডিম যেমন হয়। সেইজন্যে সূর্য থেকে কোনও গ্রহের দূরত্ব সব সময় সমান নয়। সূর্য ঠিক তার মাঝখানে নয়, একটু এক ধারে।

কিন্তু ছুটন্ত গ্রহগুলোর তো সোজা চলে যাবার কথা। তবে তারা চলতে চলতে মোড় ফিরে গোল হয়ে ঘোরে কেন ? ঢিল ছুড়লে তা তো সোজা চলে যায় ! তা ঠিক। কিন্তু, আঙুলে দড়ি দিয়ে বাঁধা ঢিল কখনও সোজা চলে যেতে পারে না—চলতে হলে তাকে গোল হয়েই ঘুরতে হয়, ঐ আঙুলের চার পাশে। গ্রহদেরও হয়েছে তাই। সূর্যের সঙ্গে তারা সবাই বাঁধা। বাঁধনের সুতোটা হচ্ছে সূর্যের টান। সূর্য এদের একটা শক্তি দিয়ে টেনে রেখেছে। সেই শক্তির নাম মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ (gravitation).

কেবল সূর্যই গ্রহদের টানে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছোট বড় সবাই যে যখন যাকে নিজের কোটের মধ্যে পাচ্ছে, তাকেই টানছে। বড় জিনিসের টান বেশী, ছোটর টান কম। আর, দূরের জিনিসের উপর টান কম, কাছের জিনিসের উপর টান বেশী। সূর্য গ্রহদের জোরে টানছে। গ্রহরাও তাকে টানছে,
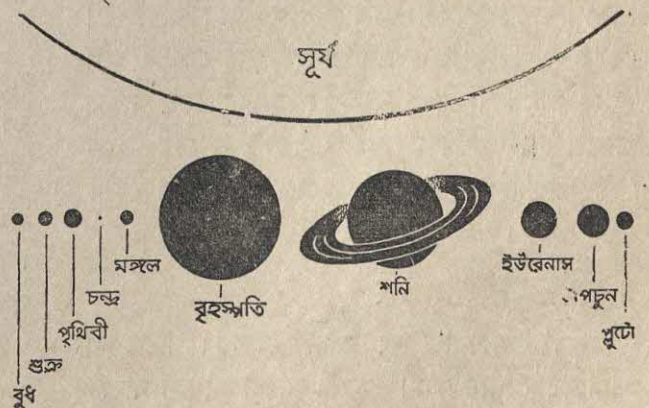
সূর্যের তুলনায় গ্রহ-উপগ্রহের আয়তন
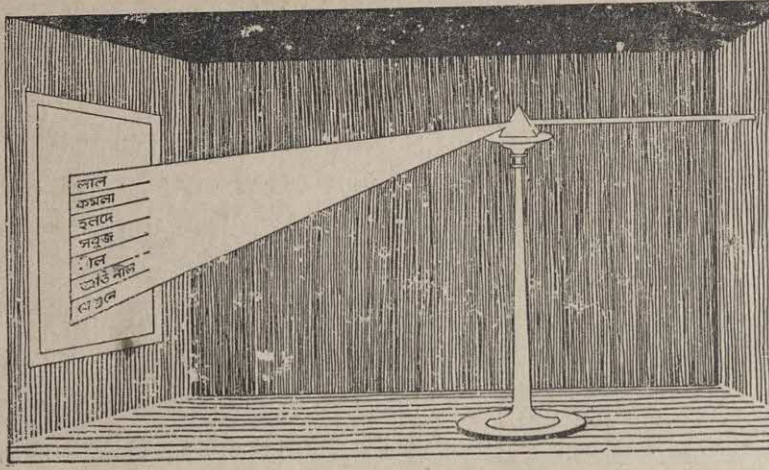
সূর্যের আলোর বিশ্লেষণ

তবে ততটা জোরে নয়। পৃথিবী আবার ছোট্ট চাঁদকে দূর থেকে টানছে, তার উপর আমাদেরও টেনে রেখেছে। গায়ের উপরের জিনিসকে নিজের ভিতর দিকে এভাবে যে টান, এর একটা আলাদা নাম হচ্ছে অভিকর্ষ (gravity). পৃথিবী বড় বলে তার অভিকর্ষ বেশী জোরালো, চাঁদ ছোট বলে তার অভিকর্ষ কম।

পৃথিবী আমাদের টানে বলে আমরা পৃথিবীর গায়ে লেগে আছি। তাহলে সূর্যের টানে পৃথিবীটা গিয়ে তার গায়ে লাগে না কেন? তার কারণ এই যে, পৃথিবী এবং অন্য সব গ্রহই আকাশে ভয়ংকর জোরে ছুটে ছুটে সূর্যের সেই টানটাকে কাটিয়ে চলছে। এরোপ্লেনে চড়ে উপরদিকে খুব জোরে চললে পৃথিবী এরোপ্লেনকে টেনে নামাতে পারে না, কিন্তু এরোপ্লেনের বেগ থামলেই পৃথিবী এরোপ্লেনকে টেনে নামাবেই। সেইরকম, গ্রহরাও জোরে জোরে ছুটে চলেছে বলে সূর্যের গায়ে গিয়ে পড়ে না। সূর্যের বেশী কাছে থাকলে টানটা বেশী লাগে, তাই বেশী কাছের গ্রহকে বেশী জোরে চলে চলে নিজেকে সূর্যের টান থেকে বাঁচাতে হয়।

॥ সূর্যের আলোর রং ॥

সূর্যের আলোর রং সাদা দেখায়। কিন্তু এ আমাদের দেখার ভুল। সূর্যের আলো আসলে সাতটি রঙের মিলন। যদি একটা ত্রিপার্শ্ব কাচ (prism) নিয়ে সূর্যের কিরণের সামনে ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে বিপরীত দিকের দেওয়ালে পর পর সাতটি রং পড়েছে। তিনপেশে কাচের মধ্যে ঢুকে তা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় এক এক রঙের আলো এক এক ভাবে বেঁকে যায় বলে সবগুলো আলাদা আলাদা হয়ে দেখা দেয়।

॥ বুধ ॥

সূর্যের সব চাইতে কাছের গ্রহ বুধ (Mercury); তার গতি এক সেকেণ্ডে ৩০ মাইল। এত জোরে আর কোনও গ্রহ চলে না বলেই রোমান দেবতাদের দূতের নামে তার নাম হয়েছে মার্কারী।

সূর্য থেকে বুধ ৩,৬০,০০,০০০ মাইল দূরে। আর সে খুব ছোটও। পৃথিবীকে ভেঙে একুশটা বুধ তৈরি করা যায়।

সূর্যের সবচাইতে কাছে থেকে তার চারদিকে ঘোরে বলে বুধকে অনেকটা কম রাস্তা ঘুরতে হয়। মানে, তার কক্ষ ছোট। তাই সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে তার লাগে ৮৮ দিন। পৃথিবীর লাগে ৩৬৫ দিন; সেই সময়টাকে আমরা বলি বছর। কাজেই, পৃথিবীর এক বছরে বুধের চার বছর, মানে, সূর্যকে তার চার বারেরও একটু বেশী ঘোরা হয়ে যায়।

বুধে অবশ্য কোনও প্রাণী এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। সেখানে হাওয়া নেই, কোন্‌কালে দূর আকাশে তা চলে গেছে। ছোট বুধের টান কম, সে তার হাওয়াকে ধরে রাখতে পারে নি। তাছাড়া, বুধ সূর্য থেকে এত প্রচণ্ড তাপ পায় যে সেখানে কিছুই বেঁচে থাকতে পারে না। এমন কি, তার পাথুরে গা-টাও ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। সেই ফাটা-চটা ঝলসানো দেহটা লাট্টুর মতো পাকও খাচ্ছে। কিন্তু এত আস্তে যে এক পাক খেতেও তার ৮৮ দিন লাগে। তাহলে, আমাদের ৮৮

দিনে তার একবছর হয়। তার এক দিনে তার একবছর।

এরকম হয় বলে বুধের প্রায় অর্ধেকটা কখনও সূর্যের সামনে আসে না। তাই বুধের একদিকে চিরকালই দিন, সব সময়েই প্রচণ্ড গরম। আবার, অন্য পিঠে সব সময়েই অন্ধকার রাত, আর ভয়ংকর ঠাণ্ডা।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রকেট পাঠিয়ে যা জানা গিয়েছে তা থেকে বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন যে বুধ গ্রহেরও একটি উপগ্রহ আছে, আর বুধ তার চেহারার অনুপাতে বড় বেশী ভারী।

॥ শুক্র ॥

বুধের পরই সূর্যের দ্বিতীয় নিকটতম গ্রহ—শুক্র। সূর্য থেকে তার দূরত্ব কমবেশী ৬,৭২,০০,০০০ মাইল। কক্ষটা ঠিক গোল নয় বলে দূরত্বটা বাড়ে কমে। তার চেহারাখানা পৃথিবীর প্রায় সমানই বলা যায়। কিন্তু তা দেখতে পাবার জো নেই। সে প্রায় ২০ মাইল পুরু একটা ঘন সাদা ধোঁয়ার আবরণে ঢাকা আছে। সূর্যের আলো তাতে পড়ে সেটা এমন ঝকঝক করে যে তাকে আমরা খুব উজ্জ্বল একটি তারার মতো দেখতে পাই। বছরের কোনও কোনও সময়ে সন্ধ্যায় একে দেখা যায়, তখন আমরা একে বলি সন্ধ্যাতারা বা সাঁঝের তারা। আবার, অন্য সময় একে ভোরের আগে দেখা যায়। তখন তাকে বলি শুকতারা বা প্রভাত তারা।

ধোঁয়ায় ঢাকা বলে শুক্রের দেহখানার কথা আমরা বিশেষ জানতে পারি নি। সে লাটুর মতো পাক খাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ক'দিনে এক পাক খায়, তা সঠিক জানা যায় নি। অনেকে বলেন, শুক্রের বছর আর দিন প্রায় সমান। তবে বোঝা গেছে যে ওখানে একটা বায়ুমণ্ডল আছে—বুধে যা নেই। তবে সে বড় বিষাক্ত বায়ু। তাতে অক্সিজেন নেই বলেই মনে হয়, প্রায় সবটাই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। সেই সঙ্গে আছে কিছু জলীয় বাষ্প ; নাইট্রোজেনও কিছু থাকতে পারে। গরমও খুব, তবে বুধের মতো নয়। এ অবস্থায় পৃথিবীর কোনও প্রাণী বা গাছপালা সেখানে থাকতে পারে না, কিন্তু অন্য কোনওরকম প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়।
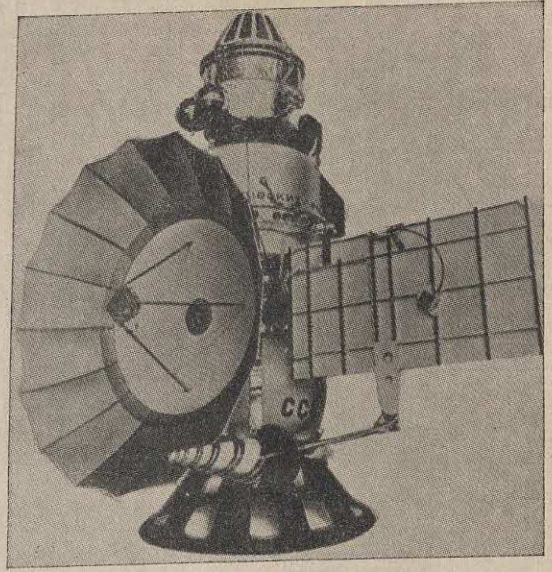
ভেনেরা-৭

২২৫ দিনে শুক্র একবার সূর্যকে ঘুরে আসে। তার গতি বুধের চাইতে কম—এক সেকেণ্ডে প্রায় ২২ মাইল। আর, তার কক্ষও বড়, কেননা সে সূর্য থেকে আরও দূরে।

শুক্রের পরই পৃথিবী। তাই গ্রহদের মধ্যে শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। সে কখনও কখনও পৃথিবীর ২,৬০,০০,০০০ মাইলের মধ্যে এসে পড়ে। ১৯৬২ খ্রীঃ ১৪ই ডিসেম্বর আমেরিকার মহাকাশযান মেরিনার-২ (Mariner-II) শুক্রের ২১,৬০০ মাইলের মধ্যে গিয়ে ঘুরে আসে। তার যেতে লেগেছিল ১০৯ই দিন। তারপর, এই অল্পদিন আগে, রুশ বিজ্ঞানীরা একটি রকেটকে ধীরে ধীরে শুক্রের গায়ে নামিয়ে দিয়েছেন। সেই রকেটটির নাম ভেনেরা-৭ (Venera-7). সেই রকেটে ছিল নানা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। তারা শুক্র সম্বন্ধে অনেক তথ্যও সংগ্রহ করেছে। এগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শুক্র সম্বন্ধে আরও নানা কথা জানা যাবে।

বুধ আর শুক্র কখনও কখনও পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখান দিয়ে চলে যায়। এরা অনেক দূরে বলে এদের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে না, গ্রহণও দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় যে একটি অতি ছোট কালো ফোঁটা সূর্যের একধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত চলে গেল।

একে বলে সংক্রমণ (Transit). সূর্যকেও রাশিদের মধ্য দিয়ে এইভাবে যেতে দেখা যায়।

॥ পৃথিবী ॥

সূর্য থেকে পরপর ধরলে তৃতীয় গ্রহ হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবী। তার বিষয়ে অনেক কথা এই বইয়ের অন্যত্র বলা হয়েছে। পৃথিবীর একপাশে শুক্রগ্রহ, অন্যপাশে মঙ্গলগ্রহ। পৃথিবী এদের চাইতে বড়।

গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর কয়েকটা বিশেষত্ব আছে। সব গ্রহের চাইতে পৃথিবীর 'আপেক্ষিক গুরুত্ব' বেশী। একমাত্র পৃথিবীতেই জল আছে, আর, তারই বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট অক্সিজেন গ্যাস আছে। তাছাড়া তার নিজের তাপ এবং সূর্য থেকে পাওয়া তাপ এমন যে, পৃথিবীর উপরে গরম বা ঠাণ্ডা কোনটাই প্রাণীদের পক্ষে অসহ্য নয়। এই সব আছে বলেই জীবজন্তু ও গাছপালা এখানে টিকে আছে। অন্য কোনও গ্রহে এতরকম সুবিধে নেই। তাই, কোনও জীব অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ!

অন্য সব গ্রহেরই মতো পৃথিবীও ঘুরপাক খেতে খেতে তার কক্ষ ধরে ছুটেছে। লাট্টু বা চরকির মতো ঘুরপাক খাওয়াকে বলে আবর্তন (rotation), আর কাউকে ঘিরে চক্কর দেওয়ার নাম হল প্রদক্ষিণ (revolution). ঘুরপাক খাবার সময়ে তার যে-অংশটায় সূর্য থেকে আলো পড়ে, সেখানে দিন হয়। তার উলটো পিঠেই রাত হয়। যেখানে ভোর হচ্ছে, ঠিক তার উলটো পিঠে সন্ধ্যা হচ্ছে।

সূর্যের মতোই পৃথিবীও তার মাথা (উত্তর মেরুর

পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের আয়তনের তুলনামূলক ছবি

পৃথিবী থেকে কিভাবে চাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল

দিক্‌টা) খাড়া রেখে ছুটছে না, তার মাথাটা সূর্যের উলটো দিকে একভাবে হেলানো থাকে। তাতেই দিন আর রাত কখনও বড়, কখনও ছোট হয় এবং শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি হয়।

পৃথিবীর মাথাটা একেই তো হেলানো, তার উপর মাথাটি একটু কাঁপে, যেন নড়বড় করে। একে বলে অয়নচলন (precession).

মাথা হেলিয়ে, সেটি কাঁপাতে কাঁপাতে, লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে পৃথিবী তার কক্ষ ধরে ছুটতে ছুটতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। তার গতি শুক্রের চাইতে কম তো হবেই—সেকেণ্ডে ১৮½ মাইল। এক বছরে সে সূর্যকে একবার ঘুরে আসে। তার বছর হয় ৩৬৫ দিনের একটু বেশী।

অন্য সব গ্রহের মতো পৃথিবীরও কক্ষ লম্বাটে গোল, যাকে বলে উপবৃত্ত (ellipse). সূর্য তার মধ্যে একটু একপাশে থাকে, একেবারে মাঝখানে নয়।

সূর্য সব গ্রহসুদ্ধ পৃথিবীকেও নিয়ে আকাশগঙ্গার কেন্দ্রকে ঘিরে প্রতি সেকেণ্ডে ১২০ থেকে ১৭০ মাইল বেগে ঘুরছে। সেটাকেও পৃথিবীর আর একটা গতি বলতে হবে।

॥ চাঁদ ॥

তারাদের মধ্যে সূর্য, আর গ্রহদের মধ্যে শুক্র আমাদের সবচেয়ে কাছে। কিন্তু এদের চাইতেও কাছে আছে চাঁদ। সে গ্রহ নয়, তারাও নয়—সে পৃথিবীর উপগ্রহ। গ্রহরা প্রদক্ষিণ করে সূর্যকে, কিন্তু উপগ্রহরা

ঘোরে কোনও-না-কোনও গ্রহের চারপাশে। বুধ আর শুক্রের কোনও উপগ্রহ নেই, বলেই মনে হয়। পৃথিবীর আছে ঐ একটি। অন্য সব গ্রহের সবসুদ্ধ আরও ৩০টি উপগ্রহ আছে।

পৃথিবী থেকে একটা টুকরো ভেঙে বেরিয়ে এসে চাঁদটা হয়েছিল। পৃথিবীর চেয়েও ছোট বলে সে অনেক আগেই ঠাণ্ডা ও শক্ত হয়ে গিয়েছে।

চাঁদের ব্যাস ২১৬০ মাইল। ৮১টি চাঁদের চাইতেও পৃথিবীটি ওজনে একটু ভারী। চাঁদ এত কাছে যে, তাকে পূর্ণিমার দিন সূর্যের সমান দেখায়। চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছে, কমবেশী ২,৩৯,০০০ মাইল তফাতে। পৃথিবীর চারদিকে তার কক্ষপথ লম্বাটে গোল বলে সে কখনও এর চেয়ে দূরে, কখনও বা এর চেয়ে কাছে থাকে।

চাঁদ ছোট বলে পৃথিবীর টানে বাঁধা পড়ে গেছে, অথচ সে এক সেকেণ্ডে এক মাইল বেগে ছুটছে বলে পৃথিবী তাকে একেবারে কাছে টেনে আনতে পারছে না। পৃথিবীর টান এড়াতে ঐটুকু বেগই যথেষ্ট। ঐভাবে চাঁদ পৃথিবীকে প্রায় ২৭½ দিনে একবার ঘুরে আসছে।

চাঁদও ঘুরপাক খেতে খেতে চলেছে। যতক্ষণে সে পৃথিবীকে একবার ঘুরে আসে (২৭½ দিন), ঠিক ততক্ষণেই একবার পাক খায়। তাই, বুধেরই মতো
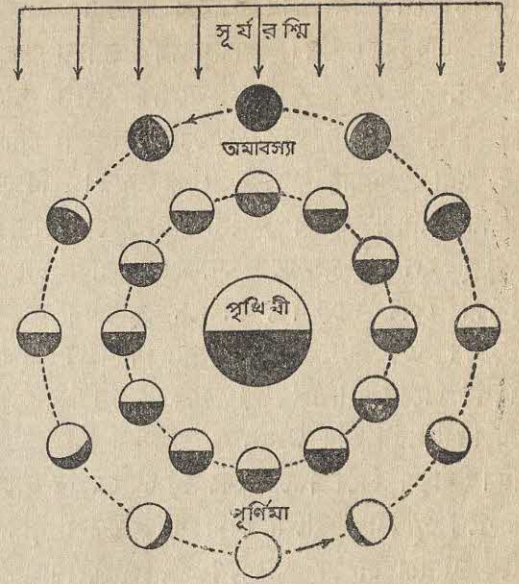
সূর্যের আলোয় চাঁদ আলোকিত হয়

চাঁদেরও একটা পিঠই সবসময় আমাদের দিকে থাকে, অন্য পিঠটা আমরা কখনও দেখতে পাই না।

॥ চাঁদের আলো ॥

চাঁদের যে আলো, তা তার নিজের আলো নয়, সে আলো পায় সূর্য থেকে। সূর্যের আলো চাঁদে পড়ে ঠিকরে পৃথিবীতে আসে। তা দেখে মনে হয় যে চাঁদই আলো দিচ্ছে।

কিন্তু একটা কথা, চাঁদের আলো যদি সূর্যের আলোই হবে, তাহলে তার তেজ অত কম কেন? তার উত্তর এই যে, চাঁদের গা-টা এমন যে তা থেকে আলো কম ঠিকরোয়। সব জিনিস থেকে আলো তো সমান ঠিকরোয় না। সূর্য থেকে চাঁদ যতটা আলো পায়, তার প্রায় ১৫ ভাগের ১ ভাগ মাত্র সে পৃথিবীতে পাঠাতে পারে। সূর্যের যতটা আলো, ততটা আলো দিতে হলে ৪,৬৫,০০০টা পূর্ণিমার চাঁদকে একসঙ্গে আকাশে উঠতে হবে।

চাঁদ এই পৃথিবী থেকেও আলো পায়। সূর্য থেকে আলো পেয়ে চাঁদ যেমন পৃথিবীকে তার খানিকটা দেয়,

সূর্যের আলোতে আলোকিত চাঁদকে পৃথিবীর চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে

পৃথিবীও সেইরকম তার পাওয়া আলো চাঁদের গায়ে একটু ফেলে। অমাবস্যার দু'দিন পরে চাঁদ যখন সরু একটা আলোর ফালি মাত্র হয়ে যায়, তখন তার পাশেই সম্পূর্ণ গোল চাঁদ অল্প আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়। চাঁদের যতটায় আমরা সূর্যের আলো ঠিকরোতে দেখছি, সেইটুকু হল ঐ ঝকঝকে ফালিটা। আর, চাঁদের যেখানে রোদ পড়ে নি, সেখানে পৃথিবীর আলো পড়েছে। এই আলো দেখা যায় দিন তিনেক। তারপর চাঁদের ফালিটা বড় হয়ে গেলে পৃথিবীর দেওয়া আলোটা তার উজ্জ্বলতর আলোয় চাপা পড়ে যায়। মানুষ চাঁদে গিয়ে দেখেছে যে সেখান থেকে আকাশে পৃথিবীর আলো দেখা যায়, যেমন পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদকে আকাশে উঠতে দেখি আর তার আলো দেখি।

চাঁদও চলছে, পৃথিবীও চলছে ; তাই এক এক সময় এক-একটি এক-এক জায়গায় থাকে। কাজেই, সূর্যের আলো চাঁদে সমানভাবে পড়লেও, তার যতটা আমরা দেখতে পাই, সেটা কমে বাড়ে। বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ পুরোপুরি গোল হয়ে ওঠে, সেদিন আমরা চাঁদের আলোকিত অংশের সবটাই পৃথিবী থেকে দেখতে পাই।

দূরবীন দিয়ে দেখা পূর্ণিমার চাঁদ

দূরবীন দিয়ে দেখা নবমীর চাঁদ

॥ চাঁদের কলা ॥

পূর্ণিমার পর পনেরো দিন একটু একটু করে চাঁদের উজ্জ্বল অংশটি কমতে থাকে। এই ১৫ দিনকে বলে কৃষ্ণপক্ষ। রোজ যতটা করে কমে, তাকে বলে এক কলা (phase).

পূর্ণিমার পরের রাতে চাঁদ এক কলা কমে যায় ; সেদিন হল কৃষ্ণা (বা কৃষ্ণপক্ষের) প্রতিপদ। কলার ধারটা গোল। চাঁদের বাইরের দিকটা যেমন গোল আছে, তেমনি থাকে। আর, ভিতর দিকটাও গোল হয়ে কমতে কমতে কাস্তের ফলার মতো হয়। ওদিকে, রোজই আগের দিনের চেয়ে একটু দেরি করে চাঁদ আকাশে ওঠে। শেষে, পূর্ণিমার ১৫ দিন পরে আর এক কলা আলোও থাকে না, রাত্রিতে চাঁদ আর দেখা দেয় না। সেই দিনটাকে বলে অমাবস্যা (New moon)। কৃষ্ণপক্ষের সেটা শেষ দিন। সেদিনও চাঁদে সূর্যের আলো পড়ে, কিন্তু পৃথিবী থেকে তা দেখা যায় না।

তারপর যে ১৫ দিন, তাকে বলে শুক্লপক্ষ। অমাবস্যার পরদিন আবার প্রতিপদ তিথি—এবার শুক্লা প্রতিপদ। সেদিন চাঁদ এক কলা আলো নিয়ে শেষ রাতে দেখা দেয়। তারপর প্রতিদিন তার চেহারা আর আলো এক কলা করে বাড়তে থাকে। আর সে রোজই আগের দিনের চেয়ে একটু আগে আকাশে ওঠে। এইভাবে শেষে ১৫ দিনে তার সব কলা ভরে ওঠে, চাঁদ গোল হয়ে যায়, পূর্ণিমা (Full moon) হয়। পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা, বা অমাবস্যা থেকে অমাবস্যা হতে লাগে ২৯½ দিন। পৃথিবীকে ঘুরতে চাঁদের যত দিন লাগে, অমাবস্যা তার চাইতে দুদিন বেশী।

॥ চাঁদের উলটো পিঠ ॥

চাঁদের কলা, পূর্ণিমা, অমাবস্যা— এ সবই হল চাঁদের এ পিঠের কথা। এ পিঠটা ঠিক অর্ধেক নয়, একটু বেশী। একশোর মধ্যে ৫০ ভাগ হলে হয়
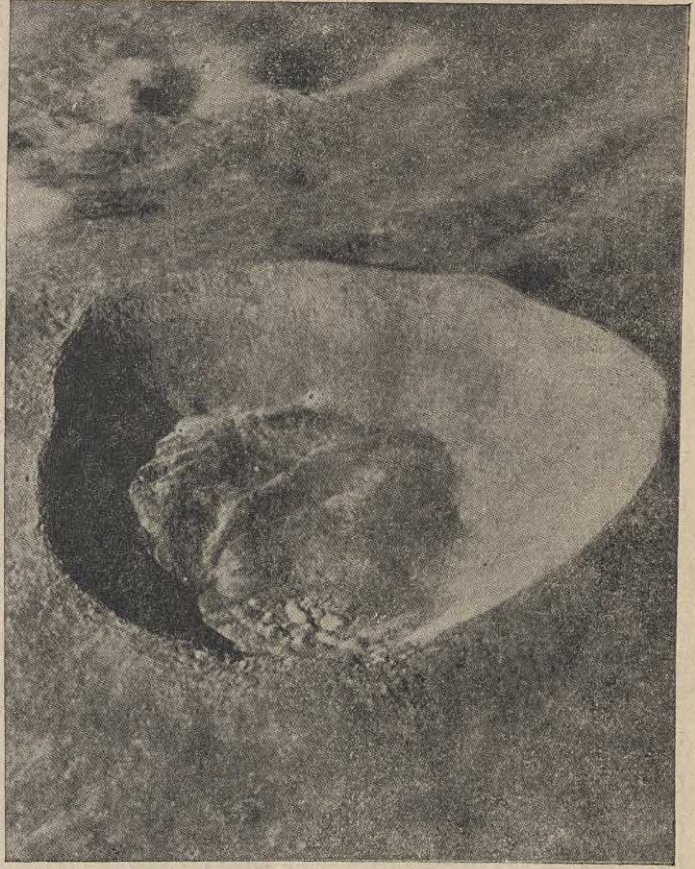
চাঁদের উলটা পিঠের একটি প্রকাণ্ড খাদ

ঠিক অর্ধেক, কিন্তু সূর্যের আলো আরও ৯ ভাগ বেশী জায়গায় পড়ে। চাঁদও মাথা হেলিয়ে আছে, তার উপর আবার একটু দোলও (libration) খায়। তাতেই চাঁদের এই ৯ ভাগ থেকে থেকে আলোর মধ্যে এসে পড়ে।

এই ৫৯ ভাগ বাদে বাকী যে ৪১ ভাগ রইল, সেটাই চাঁদের পিছন দিক্, যার কথা এতদিন পর্যন্ত কিছুই আমরা স্পষ্টভাবে জানতাম না। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া থেকে চাঁদে পাঠানো দুটো রকেটের মধ্যে একটা চাঁদে নেমে ভেঙে যায়, কিন্তু অন্যটা চাঁদের চারপাশে ঘুরে তার ফটো তুলে পৃথিবীতে পাঠায়। সে রকেটটার নাম লুনিক-৩ (Lunik-III). সেই সব ফটোতে চাঁদের উলটো পিঠে মস্ত একটা পর্বতমালা দেখা যায়। সে-পিঠেও এ-পিঠের মতো বড়

চাঁদের উলটো পিঠ—যা আমরা দেখতে পাই না
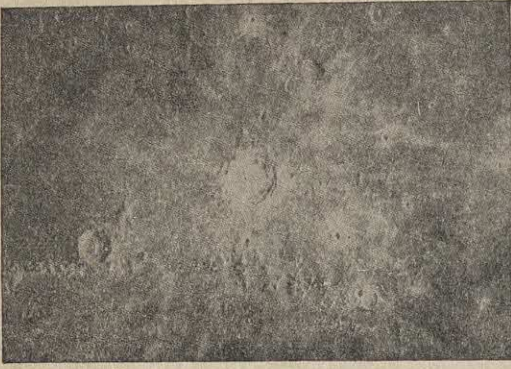
চাঁদের আগ্নেয়গিরির মুখ

বড় খাদ দেখা যায়। এই থেকে বোঝা গেছে যে চাঁদের ও-পিঠটা এ-পিঠটারই মতো।

॥ চাঁদের কলঙ্ক ॥

খালি চোখে চাঁদকে একজনের হাসি-হাসি গোলগাল মুখ বলে মনে হয়। আবার কেউ দেখে যে চাঁদের মধ্যে বসে তার বুড়ী-মা চরকা কাটছে। কেউ বলে বুড়ী নয়, ওটা একটা খরগোশ। ("শশ" মানে খরগোশ, তাই থেকে চাঁদের নাম শশধর, শশাঙ্ক।) কিন্তু যা-ই মনে হোক, ওগুলো চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগ, আর কিছু নয়। সূর্যের মতোই চাঁদেও কলঙ্ক আছে। সূর্যের কলঙ্কের বিষয়ে আমরা বিশেষ জানতে পারি নি, কিন্তু চাঁদের এগুলো যে কি, তা আমরা ভাল করেই জেনেছি।

ওগুলো হচ্ছে চাঁদের শুকনো সমুদ্র—সমতল নীচু জায়গা। কোনও দিন তাতে জল ছিল কিনা কে জানে! কিন্তু আজ ওসব জায়গায় জলের চিহ্নও নেই। গোটা চাঁদেরই কোথাও জলের বাষ্পটুকুও নেই। তবু মানুষ এদের ১৪টার নাম রেখেছে মেঘসমুদ্র, বৃষ্টিসাগর, শান্তিসাগর, ঝঞ্ঝা মহাসাগর ইত্যাদি। এরা চাঁদের দেখা দিক্‌টার তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে আছে। নীচু বলে এখান থেকে আলো ঠিকরে আমাদের কাছে আসে না, তাই এগুলো কালো দাগের মতো দেখায়।

॥ চাঁদের সত্যিকার চেহারা ॥

চাঁদে জল নেই, হাওয়াও নেই। হাওয়ার আড়াল না থাকায় দূরবীন দিয়ে চাঁদকে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। চাঁদের উজ্জ্বল অংশে সবচাইতে বেশী চোখে পড়ে যে চাঁদের সারা গায়ে পাথর ছড়ানো আছে। তাছাড়া চাঁদের সারা গায়ে আগ্নেয়গিরির মুখের মতো ছোটবড় গর্ত আছে। চাঁদের এই গর্তগুলোর কানা খুব উঁচু। এই রকম ছোটবড় গর্ত হাজার তিরিশেক। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টার নাম ক্লেভিউস (Clavius). সেটা ১৪৬ মাইল চওড়া, তার কানাটা হচ্ছে ২০,০০০ ফুট উঁচু একটা গোল পাহাড়, আর সেটা ১৭,০০০ ফুট গভীর। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরির (জাপানের আসো-সান) মুখও ১৭ মাইলের বেশী চওড়া নয়। পরবর্তী অধ্যায়ে মহাকাশ অভিযানের কথা বলা হয়েছে।

মানুষ সত্যিসত্যি চাঁদে গিয়ে সেখানে নেমে এসব দেখে এসেছে। ২১শে জুলাই, ১৯৬৯ তারিখে মানুষ রকেটে চড়ে প্রথম চাঁদে গিয়ে পৌঁছেছে। এই নিয়ে পাঁচবার মার্কিন মহাকাশচারীরা চাঁদে গিয়ে ঘুরে এসেছেন। চাঁদ এখান থেকে খালি চোখে দেখতেই সুন্দর। কিন্তু আসলে সেটা একটা মরুভূমি কিংবা শ্মশানের চাইতেও ঢের বিশ্রী আর ভয়ংকর জায়গা।

চাঁদের গায়ে ছড়ানো পাথর

চাঁদে আছে অজস্র রুক্ষ আগ্নেয়গিরিমুখ

জল নেই, হাওয়া নেই—তাই কোনও প্রাণী, এমন কি পোকামাকড় পর্যন্ত নেই সেখানে। যেখানে রোদ, সেখানে ভীষণ গরম। যেখানে রোদ পড়ে না, সেখানে যা ঠাণ্ডা, তার তুলনায় এভারেস্টের কিংবা উত্তর মেরুর ঠাণ্ডা কিছুই নয়। হাওয়া নেই বলে সূর্যের আলোয় রং খেলে না, আকাশ নীল না হয়ে ঝুলের মতো কালো। তাছাড়া সেখানে শব্দ নেই। হাওয়া তো নেই, শব্দ বয়ে এনে দেবে কে? জল নেই—তাই মেঘ, বিদ্যুৎ, রামধনু, বৃষ্টি কিছুই নেই।

আছে কেবল কয়েকটা জলশূন্য সাগর, আর মুখভরা বসন্তের দাগের মতো সেই বিশ্রী গর্তগুলো। আর আছে খোঁচা খোঁচা রুক্ষ পাহাড়, আর বিরাট লম্বা লম্বা ফাটল। কোনও পাহাড় ২৫,০০০ ফুট উঁচু, কোনও ফাটল ৩০০ মাইল লম্বা। এই তো চাঁদের আসল চেহারা!

চাঁদে ১৫ দিন ধরে এক নাগাড়ে দিন চলে, তার মধ্যে আর রাত হয় না।

চাঁদের একটি গুণ এই যে সে কোন কিছুকে পৃথিবীর মতো জোরে টানে না। সে ছোট বলে তার অভিকর্ষ (টান) কম, পৃথিবীর টানের ছয় ভাগের এক ভাগ। কাজেই, সব জিনিসই, এমন কি আমাদের শরীরটাও, সেখানে হালকা লাগবে। এক লাফে ১৫-১৬ হাত উঁচু ঢিপির মাথায় ওঠা, আর ৪০ হাত চওড়া খানা ডিঙিয়ে যাওয়া সেখানে মানুষের পক্ষে খুব সহজ।

॥ চন্দ্রগ্রহণ ॥

সূর্যের গ্রহণ হয়, চাঁদেরও গ্রহণ হয়। বছরে সূর্যের গ্রহণ পাঁচবার পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু চন্দ্র-গ্রহণ হতে পারে বড় জোর তিনবার। সূর্যগ্রহণ যেমন শুধু অমাবস্যার দিনই হতে পারে, চন্দ্রগ্রহণও তেমনি এক পূর্ণিমার রাত ছাড়া হয় না। কেননা, গ্রহণ হতে হলে পৃথিবী, চাঁদ আর সূর্য ঠিক এক লাইনে আসা চাই। পূর্ণিমায় চাঁদ এসে পৃথিবী আর সূর্যের দিকে সোজা মুখ করে দাঁড়ায়, তখন পৃথিবী থাকে মাঝখানে। ওধার থেকে সূর্য আলো দেয়, তাতে চাঁদে আলো হয়, পৃথিবীরও এক পিঠে আলো পড়ে।

কোনও জিনিসের একদিকে আলো পড়লেই তার উলটোদিকে সেই জিনিসটার একটা লম্বা ছায়া পড়ে। পৃথিবীর ছায়াও সব সময়ে আকাশে পড়ছে। কিন্তু অন্যদিন চাঁদ এদিকে-ওদিকে থাকে, পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে আসে না। শুধু পূর্ণিমার দিনই পৃথিবীর ছায়া যেদিকে পড়ে, চাঁদ ঠিক সেইদিকে এসে যায়। আর, তার ছায়া যতদূর পর্যন্ত যায়, চাঁদ ততদূরের মধ্যেই থাকে সব সময়।

শুধু যদি তা-ই হত, তাহলে তো সব পূর্ণিমাতেই পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়ত। কিন্তু আর একটা
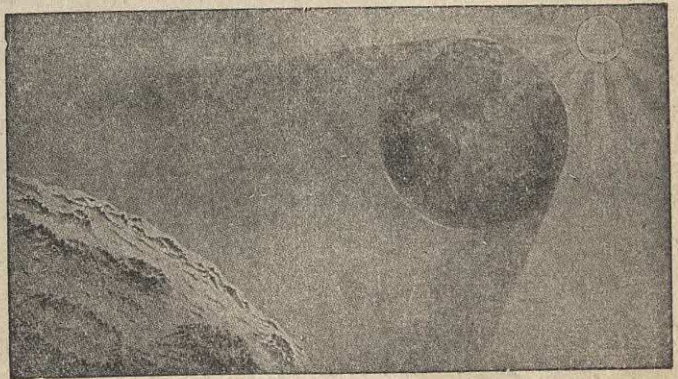
চন্দ্রগ্রহণ
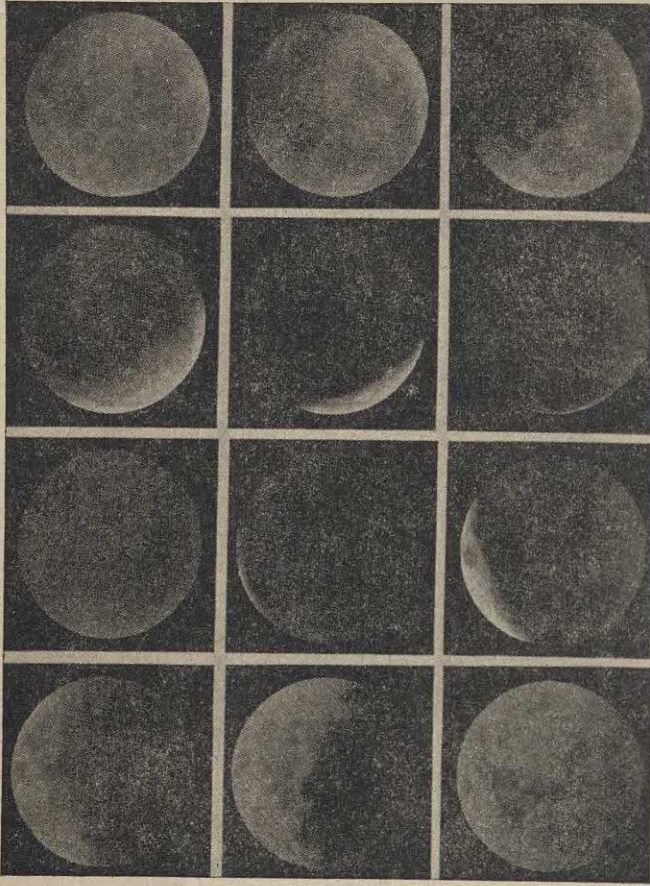
পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময়ের বিভিন্ন পর্যায়ের চাঁদের ছবি

কারণের জন্যে তা হয় না। চাঁদ পৃথিবীর চার-দিকে যে পথ ধরে ঘোরে, সেটা পৃথিবীর কক্ষের সঙ্গে এক সমতলে নয়—সামান্য একটু তেরছা। তাই, চাঁদ সব পূর্ণিমাতে সূর্য আর পৃথিবী, এই দুইয়েরই দিকে মুখ করে দাঁড়ালেও সোজা এক লাইনে আসে না—একটু উঁচু-নীচু হয়ে যেতে পারে। বছরে ১২টা পূর্ণিমার মধ্যে দুই কি তিনবার সে ঠিক এক লাইনে আসতে পারে, তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদে পড়তে দেখা যায়। তখনই চন্দ্রগ্রহণ হয়।

সূর্যগ্রহণ হলে সূর্য চাঁদের আড়ালে থাকে, তার যে কালো অংশটা সেটাই হল চাঁদ। কিন্তু চন্দ্রগ্রহণে চাঁদকে কালো দেখায়, সেই কালোটা হল পৃথিবীর ছায়া। তাই, চন্দ্রগ্রহণ হলে উত্তর গোলার্ধের (কিংবা দক্ষিণ গোলার্ধের) সব জায়গা থেকে তা দেখা যায়। সূর্যগ্রহণ কিন্তু একসঙ্গে সব জায়গা থেকে দেখা যায় না।

চাঁদেরও সূর্যের মতো পূর্ণগ্রাস বা খণ্ডগ্রাস হতে পারে। তবে বলয়-গ্রাস হয় না। পৃথিবীর পুরো ছায়াটা ছোট্ট চাঁদের শুধু মাঝখানটায় আঁটবে কি করে? আর, চাঁদের পূর্ণগ্রাস হলে একটা নতুন ব্যাপার হয়। চাঁদ সূর্যের মতো ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যায় না। কেননা, পৃথিবীর ছায়া তাকে ঢেকে ফেললেও পৃথিবী-ঘেরা বাতাসের মধ্য দিয়ে সূর্যের একটুখানি আলো বেঁকে গিয়ে চাঁদের গায়ে, সেই ছায়ার উপর পড়ে। কাজেই, ছায়া পড়ে যে অন্ধকার হয়েছিল, তা একটু ফিকে হয়ে যায়।

॥ মঙ্গল (Mars) ॥

মঙ্গল গ্রহ যখন খুব কাছে এসে পড়ে, তখন পৃথিবী থেকে সে সাড়ে তিনকোটি মাইল তফাতে থাকে। সূর্য থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে কমবেশী ১৪ কোটি ১৭ লক্ষ মাইল। ৭৮০ দিন অন্তর অন্তর মঙ্গল পৃথিবীর খুব কাছে আসে, তখন তাকে দেখবার সুবিধে হয়।

মঙ্গল পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। মঙ্গল সেকেণ্ডে ১৫ মাইল বেগে ছুটে আমাদের ৬৮৭ দিনে একবার সূর্যকে ঘুরে আসে। সে যে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাতে তার রাত্রিদিনও হচ্ছে আমাদেরই মতো। একবার ঘুরপাক খেতে তার সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগে। ওখানে হাওয়াও আছে, তবে পৃথিবীর মতো অতটা ঘন হাওয়া নয়। তার উপর ওখানে শীত-গ্রীষ্ম আছে, তা খুব কষ্টকর হলেও মারাত্মক নয়।

দূরবীনে দেখা যায় যে মঙ্গলের অর্ধেকেরও বেশী জায়গা লাল রঙের। কেউ কেউ মনে করেন যে মঙ্গলের মাটিতে বেজায় লোহা আছে, যা মরচে ধরে ঐ রকম
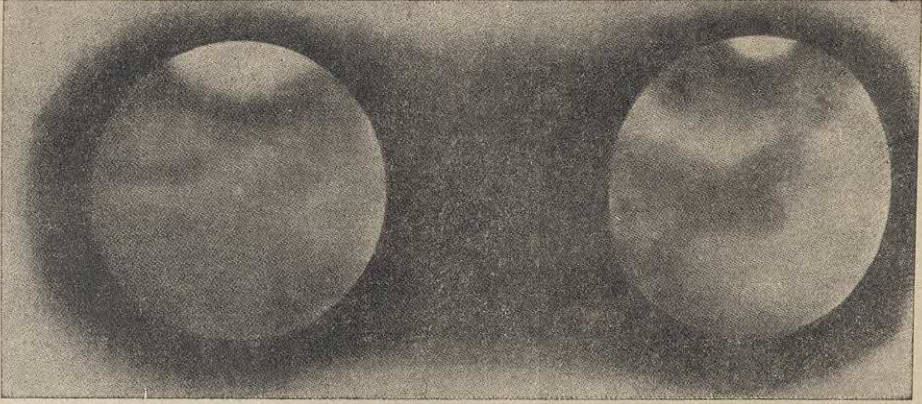
দুইটি বিভিন্ন ঋতুতে তোলা মঙ্গলগ্রহের দুইটি আলোকচিত্র—মাথায় বরফের আবরণ

লাল হয়েছে। মঙ্গল তাহলে আসলে একটা মরচে-ধরা গ্রহ। কেউ কেউ আবার বলেন মরচে-ধরা লোহার জন্য মঙ্গল লাল দেখায় না। মঙ্গলে আছে প্রচুর বালি। ঐ বালির জন্যই গ্রহটিকে অত লাল দেখায়।

মঙ্গলের দুই মাথা বরফের আবরণে ঢাকা। শীত-কালে বরফটা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, আবার গ্রীষ্মকালে সেটা ছোট হয়ে আসে। তখন অনেক জায়গা কালচে রঙের হয়ে ওঠে। হয়তো বা ওখানে সেই সময় শেওলার মতো কিছু জন্মায়।
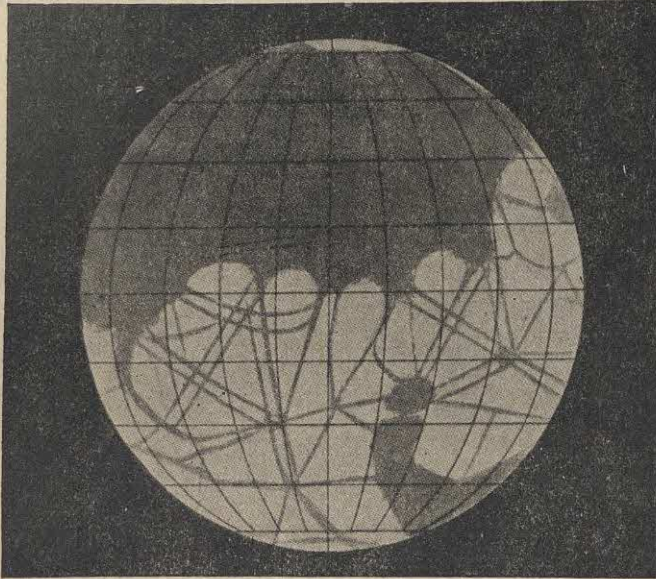
বিজ্ঞানী শিয়াপারেলির আঁকা মঙ্গলগ্রহের নকশা

এই সব দেখে কেউ কেউ মনে করলেন যে মঙ্গলে নিশ্চয় কোনও জীব আছে, গাছপালাও আছে। সেখানে হাওয়ায় অক্‌সিজেন খুবই কম, জলও দেখা যায় না, কিন্তু তার মধ্যে অজানা কোনও রকমের জীব থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। এই নিয়ে কিছুকাল পর্যন্ত ভারী হইচই হয়েছিল। এমন কি ইটালীর বিজ্ঞানী শিয়াপারেলি (Schiaparelli, 1835—1910) মঙ্গলের গায়ে কতকগুলো দাগ দেখতে পেলেন। সেগুলোকে তিনি খাল বলে মনে করলেন।

তারপর মার্কিন বিজ্ঞানী পার্সিভ্যাল লাওয়েল-ও (Percival Lowell, 1855—1916) ঐগুলো দেখে দেখে অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলেন যে ঐগুলো আপনা থেকে হয়নি—গ্রীষ্মকালে তার বরফের আবরণ গলে যে জল হয়, সেখানকার প্রাণীরা সেই জলটাকে মঙ্গলের সব জায়গায় নিয়ে গিয়ে চাষবাস করবার জন্য ঐ হাজার হাজার মাইল খাল কেটে নিয়েছে। সেসব খাল ৫০ থেকে ২০০ মাইল চওড়া, ৩০০০ মাইল পর্যন্ত লম্বা। এমন খাল মানুষে কাটতে পারে না। কাজেই, মঙ্গলে যে শুধু প্রাণী আছে, তাই নয়—তারা মানুষের চাইতে অনেক বেশী পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্ আর
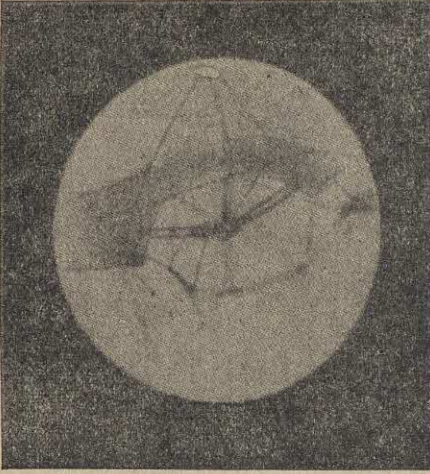
বিজ্ঞানী লাওয়েলের আঁকা মঙ্গলগ্রহের নকশা

বিজ্ঞানে অনেক বেশী উন্নতি করেছে মানতেই হবে।

কিছুকাল পরে একদল বিজ্ঞানী বললেন যে শিয়াপারেলি আর লাওয়েল ভুল দেখেছিলেন, কারণ তাঁদের চাইতে ভাল ভাল দূরবীন দিয়েও মঙ্গলে ওরকম দাগ দেখা যায় নি। এখন বিজ্ঞানীরা আর লাওয়েলের খাল দেখার কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা এই ব্যাপারটার নামই দিয়েছেন 'লাওয়েলের বোকামি' (Lowell's Folly).

মঙ্গলের উপগ্রহ আছে দুটি। একটির নাম ফোবোস (Phobos). সেটি মঙ্গল থেকে মোটে ৫৮০০ মাইল দূরে থেকে প্রতি ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে একবার মঙ্গলের চারদিকে ঘুরে আসছে। তাহলে আমরা একদিনে তাকে তিনবার ঘুরে আসতে দেখব, আর, মনে হবে যে সে পশ্চিম থেকে পূবদিকে যাচ্ছে। তার ব্যাস হচ্ছে ১০ মাইল। অন্যটির ব্যাস এর অর্ধেক, তার নাম ডাইমোস বা ডীমোস (Deimos). সেটি আছে মঙ্গল থেকে ১৪,০০০ মাইল দূরে। ছোট হলেও সেটি ফোবোসের মতো ক্ষিপ্রগতি নয়। মঙ্গলকে চক্কর দিয়ে আসতে তার ৩০ ঘণ্টা লেগে যায়।

বুধ, শুক্র, পৃথিবী আর মঙ্গল—এই চারটি হচ্ছে ছোট গ্রহ। এদের বলে ভিতরকার গ্রহ (Inner Planets), কারণ এরা গ্রহকণিকা (Asteroids)-এর এধারে আছে। গ্রহকণিকার ওধারের পাঁচটি বাইরের গ্রহের (Outer Planets) মধ্যে চারটি—বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন খুব বড়, তাদের রাক্ষুসে গ্রহ (giant planets) বলা হয়। তাদের ওধারকার একে বারে শেষ গ্রহ প্লুটো অবশ্য পৃথিবীর চেয়ে ছোট।

॥ গ্রহকণিকা ॥

এই ছোটদের দল আর বড়দের দলের মাঝখানে—মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাটা, সেটা বড্ড বড়। বোড (Bode) বলে এক জার্মান বিজ্ঞানী ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কারের ১০০ বছর আগে দেখিয়েছিলেন যে, একটা গ্রহ থেকে তার পরেরটা কত দূরে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে, তার একটা বাঁধা নিয়ম (Bode's Law) আছে। সেই নিয়মের হিসেবে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যের ফাঁকটা বড় বেশী। তাই, মনে হয় যে ওখানে নিশ্চয় অজানা কোনও গ্রহ আছে। অমনি খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল। শেষ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীদেশের পিয়াৎসি (Piazzi) অতি ছোট একটা নতুন জিনিসকে আকাশে চলতে দেখলেন। তিনি প্রথমে ওটাকে ধূমকেতু বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু পরে জানা গেল যে ওটা সেই ফাঁকা জায়গার একটি গ্রহ। তার নাম রাখা হল সিরিজ (Ceres). সে লম্বায় মোটে ৪৮০ মাইল।

এটা আবার একটা গ্রহ নাকি ? বিজ্ঞানীরা আরও খুঁজতে লাগলেন। তাইতে ঐ জায়গাটাতেই ছ'বছরের মধ্যে আরও তিনটে গ্রহকে পাওয়া গেল। তাদের নাম হল প্যালাস (Pallas), জুনো (Juno) আর ভেস্টা (Vesta)—এরা আরও ছোট। সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে বলেই এদের গ্রহ বলতে হয়, নইলে এরা আমাদের চাঁদের চেয়েও অনেক ছোট। আবার এদের চাইতেও ঢের ছোট ছোট হাজার ছ'য়েক গ্রহ ওখানে পাওয়া গিয়েছে, যেমন—এরোস (Eros), হিডালগো (Hidalgo), আইকেরাস (Icarus). হার্মিজ (Hermes)-এর আয়তন মোটে এক মাইল। এদের বলা হয় গ্রহকণিকা (Asteroids, Planetoids).

এদের চেহারা গোলগাল নয়, ভাঙাচোরা নানা-

চাঁদ থেকে দৃশ্যমান অর্ধচন্দ্রাকার চাঁদের মতো পৃথিবী।
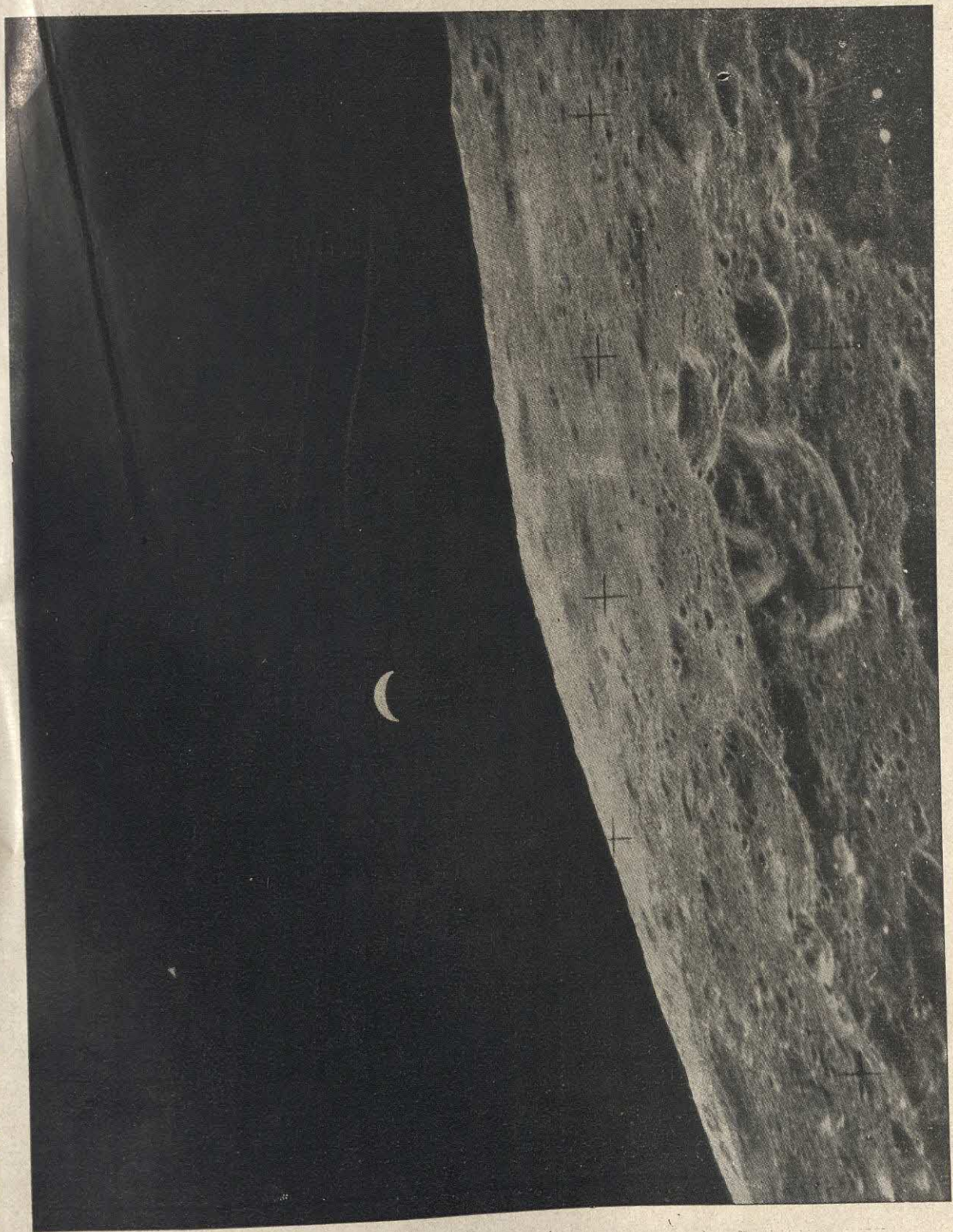
মহাকাশ অভিযানঃ

[চাঁদ থেকে দৃশ্যমান অর্ধচন্দ্রাকার পৃথিবী।]

এখানে একটা বিচিত্র ছবি দেখা যাচ্ছে। ছবির দিকে তাকালে মনে হবে, পৃথিবীর আকাশে অর্ধচন্দ্র বিরাজ করছে। কিন্তু এখানে যে অর্ধচন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে, তা চাঁদ নয়, পৃথিবী।

তাছাড়া পৃথিবীর মতো যে বিরাট আকারের পৃষ্ঠদেশ দেখা যাচ্ছে, তা পৃথিবীর নয়, চাঁদের পৃষ্ঠদেশ।

চাঁদ পৃথিবীর চার দিকে ঘোরবার সময় আমরা সব সময়ে তার একটা পিঠ দেখতে পাই। অপর পিঠ কখনও দেখা যায় না। এখানে চাঁদের যে-পিঠটা আমরা দেখতে পাই না, সেই দিক্‌টা দেখা যাচ্ছে।

চাঁদের অপর দিকে অ্যাপোলো-১২ নামে মহাকাশযানে করে গিয়ে মার্কিন মহাকাশযাত্রী এই বিস্ময়কর আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। মহা-কাশযানে ছিলেন রিচার্ড গর্ডন। চাঁদে নেমেছিলেন চার্লস কনরাড ও অ্যালান বীন।

রকমের। তাই দেখে মনে করা হয় যে এরা বড় কোনও গ্রহের টুকরো—সেটা কোনও এক সময়ে বৃহস্পতির সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে খুঁজলে এরকম লাখখানেক টুকরো পাওয়া যাবে।

॥ বৃহস্পতি (Jupiter) ॥

মঙ্গলের পর রয়েছে গ্রহকণিকারা, তাদের ওধারে আছে বৃহস্পতি। এত বড় গ্রহ আর নেই। অন্য আটটা গ্রহকে একসঙ্গে করলেও বৃহস্পতির তিন ভাগের এক ভাগ হবে না। তেরোশ' পৃথিবীকে বৃহস্পতির মধ্যে পুরে রাখা যায়। তাই একে আমরা বলি গ্রহরাজ। আর, রোমান দেবতাদের রাজার নামে এর ইংরেজী নাম রাখা হয়েছে জুপিটার (Jupiter). এর ব্যাস ৮৮,৭০০ মাইল—পৃথিবীর ব্যাসের ১১ গুণ।

এই বিপুল দেহটি নিয়ে সেটি সূর্য থেকে ৪৮½ কোটি মাইল দূরে থেকে, সেকেণ্ডে ৮ মাইল বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এর কক্ষ খুব লম্বা। তাই একবার ঘুরে আসতে তার লেগে যায় আমাদের ১১ বছর ৩১৪ দিন (প্রায় ১২ বছর)। সূর্য এক এক রাশিতে এক মাস করে থাকে। বৃহস্পতি থাকে প্রায় এক বছর।

একবার আবর্তনে পৃথিবীর লাগে ২৪ ঘণ্টা, কিন্তু বৃহস্পতির লাগে মোটে ৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। ঘুরপাক খাওয়ার ব্যাপারে সেটি পৃথিবীর চেয়ে ২৮ গুণ ক্ষিপ্রগতি।

ঘুরতে ঘুরতে যখন বৃহস্পতি পৃথিবীর ৩৬ কোটি মাইলের মধ্যে এসে পড়ে, তখন তাকে দূরবীন দিয়ে দেখলে দেখা যাবে সেটি খুব ঝকঝক করছে—লুব্ধক তারার চাইতেও সেটি ঢের বেশী উজ্জ্বল। তাকে ঘিরে অনেকটা হাওয়া আছে বটে, কিন্তু তাতে পৃথিবীর মতো নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন নেই। যা আছে, তাতে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না, বিষাক্ত কয়েক রকম গ্যাসও তাতে আছে। বৃহস্পতির গায়ের উপর বোধ হয় খুব পুরু হয়ে বরফ জমে আছে, তাইতে সূর্যের আলো পড়ে তাকে অত চকচকে দেখায়।

বৃহস্পতিকে ঘিরে পরপর বেশ কয়েকটা মোটা মোটা দাগ দেখা যায়—ফিকের পর গাঢ়, তারপর আবার ফিকে, এইরকম আগাগোড়া। তাদের রঙেরও কত বাহার! লাল, হলদে, খয়েরী, হলদে-খয়েরী—নানারকম। সেগুলো একভাবে থাকে না, একবার পরস্পর মিশে যায়, আবার আলাদা হয়ে যায়। এরই মধ্যে এক জায়গায় লাল একটা দাগ (Great red spot) দেখা যায়। সেটা সরে সরেও যায়, আকারেও বাড়ে কমে। সেটা বোধহয় বৃহস্পতির উপরকার একটা ঘূর্ণিঝড়। সেটা ৩০,০০০ মাইল লম্বা আর ৮,০০০ মাইল পর্যন্ত চওড়া হয়।

বৃহস্পতির চাঁদ বারোটি। চাঁদগুলো নেহাত ছোট।
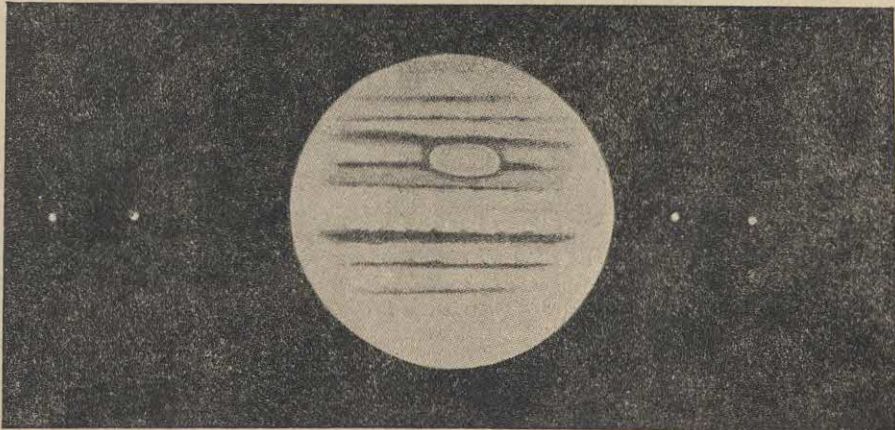
বৃহস্পতি গ্রহ। এই ছবিতে তার চারটি উপগ্রহকে দেখা যাচ্ছে

প্রথমে গ্যালিলিও তাঁর দূরবীন দিয়ে এদের চারটিকে দেখেন। তাদের নাম রাখা হয় গ্যানিমীড, ক্যালিস্টো, ইউরোপা আর আইয়ো। ক্রমে আরও আটটি উপগ্রহকে আবিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া আরও উপগ্রহ আছে কিনা তা এখনও জানা যায় নি।

॥ শনি (Saturn) ॥

বৃহস্পতিরও ওধারে যে গ্রহ, সে হচ্ছে শনি (Saturn). হিন্দু পণ্ডিতেরা দেখেছিলেন যে অন্য গ্রহদের চেয়ে এর গতি মন্দ। এটি খুব আস্তে চলে। তাই এর এক নাম শনৈশ্চর (শনৈঃ মানে আস্তে চরে বা চলে যে)। শনির গতি সেকেণ্ডে ৬ মাইল। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে তার লাগে ২৯ বছর ১৬৮ দিন। সূর্য থেকে তার দূরত্ব কমবেশী ৮৮ কোটি ৭২ লক্ষ মাইল।

গ্যালিলিও তাঁর দূরবীন দিয়ে শনিকে দেখে তার গা ঘেঁষে দুপাশে দুটো জিনিসের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। দিনে দিনে তাদের ক্রমেই ছোট হতে হতে শেষে একেবারে মিলিয়ে যেতে দেখা গেল।

১৬৫৫ খ্রীঃ হয়গেন্স্ (Huygens) নামে এক বিজ্ঞানী অনেক দেখে শুনে শেষটা বললেন যে শনিকে ঘিরে তার একটু তফাতে একটা চেপটা বালার মতো আছে। কোন গ্রহের এরকম নেই। তাই তাঁর কথা শুনে বিজ্ঞানীদের মহলে সাড়া পড়ে গেল। ক্রমে সবাইকে তাঁর কথাটা মানতে হল।

ভাল দূরবীনে শনির চেহারা যেরকম দেখা যায়, তা সত্যিই অদ্ভুত। আকাশে এমন দৃশ্য আর নেই। একটা নয়, তিনটে চাকা (rings of Saturn) একটার ভিতরে আরেকটা থেকে শনির মাঝখানটাকে ঘিরে ঘুরছে। শনির ব্যাস ৭৫,০০০ মাইল, কিন্তু এই চাকা তিনটেকে নিয়ে তার মাঝখানটার ব্যাস হবে ১,৭১,০০০ মাইল—বৃহস্পতিরও প্রায় দ্বিগুণ।

আরও আশ্চর্য কথা এই যে, এই তিনটে চাকা আর কিছু নয়, লক্ষ লক্ষ অতি ছোট ছোট উপগ্রহের তিনটে ঝাঁক। তাদের আলাদা করে চেনা যায় না।
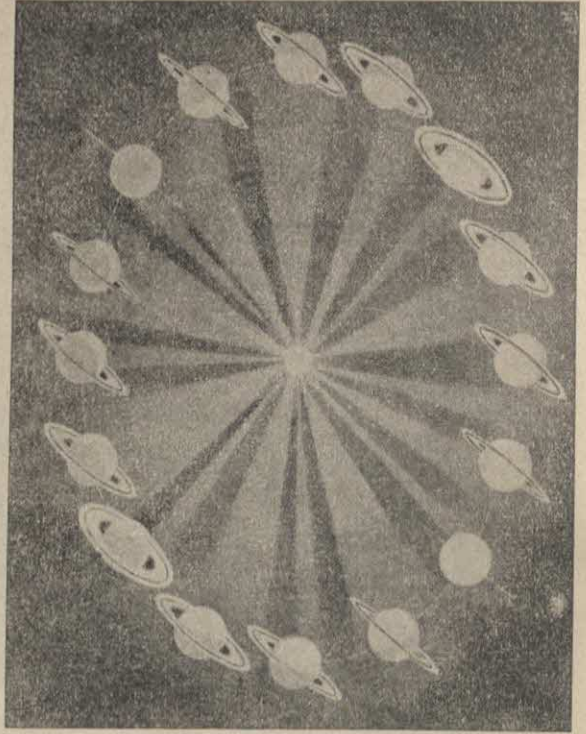
সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণমান শনিগ্রহের ছবি

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা ছুটছে, তাদের গায়ে সূর্যের আলো পড়ে তাদের একটানা চাকার মতো দেখায়।

এ ছাড়া শনির আলাদা ৯টি বড় উপগ্রহও আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম রাখা হয়েছে টাইটান (Titan)—সে আমাদের পৃথিবীর চাঁদের চাইতে একটু বড়। অন্য আটটিই বেশ ছোট।

॥ ইউরেনাস (Uranus) ॥

এই শনিগ্রহের বাইরে যে সূর্যের আর কোনও গ্রহ আছে, সেকথা দু'শো বছর আগেও কেউ জানত না। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিকে নিয়েই ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যত আলোচনা। বোড (Bode) ছ'টি গ্রহকে দেখেই তাঁর নিয়মটা বের করেছিলেন।

তারপর অচেনা এক গ্রহ ধরা পড়ল যাঁর দূরবীনে, তাঁর নাম হার্শেল (Herschel, ১৭৩৮—১৮২২ খ্রীঃ)। গরিবের ছেলে, নিজেও ছিলেন গরিব। একটা গির্জায় বাজনা বাজিয়ে কিছু রোজগার করতেন। তারা

দেখবার শখ ছিল তাঁর খুব, কিন্তু দূরবীন কেনবার পয়সা কোথায়? তাই তিনি অনেকদিন ধরে খেটে-খুটে নিজেই কাচ ঘষে, একটা দূরবীন তৈরি করলেন। তারপর রাত জেগে জেগে আকাশ দেখতেন। তাঁর ছোট বোন ক্যারোলাইনকে তারা দেখা শিখিয়ে নিলেন, তিনিও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। ক্রমে তাঁরা বেশ গ্রহ-নক্ষত্র চিনে ফেললেন।

১৭৮১ খ্রীঃ হার্শেল ঐভাবে আকাশ দেখতে দেখতে সূর্যের আর একটি গ্রহের খোঁজ পেয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি একজন সামান্য বাজনদার, তাঁর কথা কে শোনে? শেষে যখন তিনি তাঁর আবিষ্কারের প্রমাণ দিলেন, তখন জয়-জয়কার পড়ে গেল। ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ তাঁকে আর ক্যারোলাইনকে ডেকে কত সমাদর দেখিয়েছিলেন। তিনি হার্শেলকে নাইট উপাধিও দিয়েছিলেন। পরে ইংল্যাণ্ডের রাজ-জ্যোতিষী হলেন স্যার উইলিয়াম হার্শেল।

স্যার উইলিয়াম হার্শেল

হার্শেল ঐ গ্রহটির নাম ঐ রাজার নামেই রেখেছিলেন জর্জিউস (Georgius). কিন্তু বিজ্ঞানীরা, বিশেষতঃ বোড (Bode), আপত্তি করলেন যে, মানুষের নয়, দেবতার নামেই এসব জিনিসের নাম হওয়া উচিত। নামকরণ করবার জন্য বিজ্ঞানীদের সভা বসে গেল—কারও নামকরণে আর এমন ঘটা হয় নি। নাম ঠিক হল—ইউরেনাস বা য়ুরেনাস (Uranus). গ্রীকদের পুরাণে ঔরানস (Ouranos) বা স্বর্গ ছিলেন দেবতাদের বাবা। আমাদের দেশে এই গ্রহের কথা জানা ছিল না বলে এর কোনও বাংলা নাম নেই।

ইউরেনাস সূর্য থেকে ১৭৮ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল দূরে থেকে ৮৪ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তার ব্যাস পৃথিবীর প্রায় চারগুণ (৩১,০০০ মাইল)। সে চলে খুব আস্তে, সেকেণ্ডে প্রায় ৪½ মাইল বেগে। প্রায় পৌনে ১১ ঘণ্টায় তার একদিন হয়, মানে, একবার আবর্তন হয়। ইউরেনাসকে একটু সবুজ দেখায় বটে, কিন্তু সব বড় গ্রহের মতো সে-ও ভয়ানক ঠাণ্ডা, সেখানে কোন জীব বাঁচতে পারে না। আর তার হাওয়াও বিষাক্ত মিথেন (methane) গ্যাসে ভরতি। তার আকাশে পাঁচটি চাঁদ (উপগ্রহ) আছে—মিরাণ্ডা, এরিয়েল, আমব্রিয়েল, টাইটানিয়া আর ওবেরন।
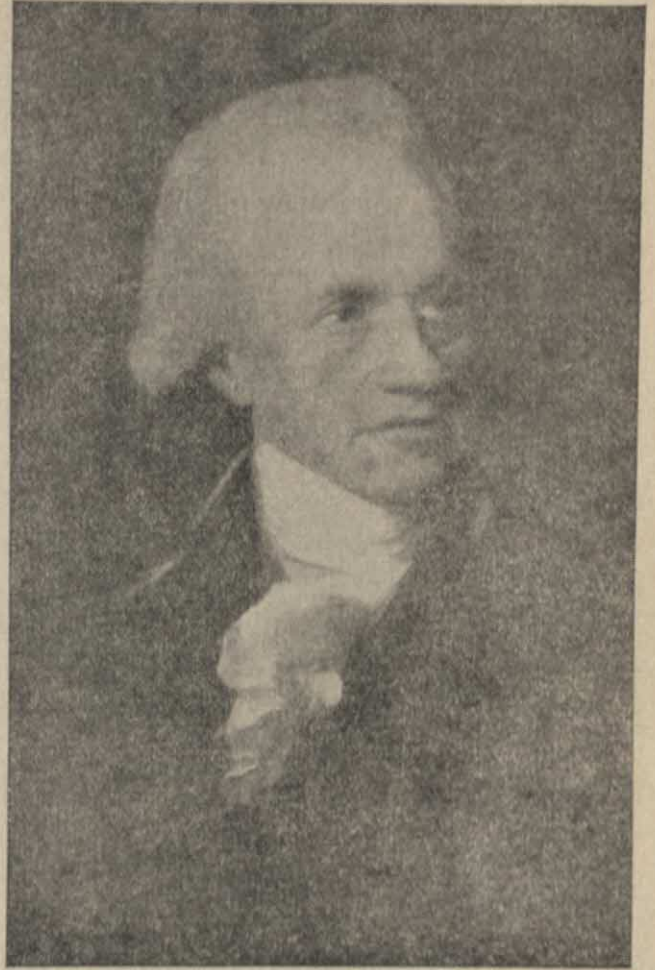
॥ নেপচুন (Neptune) ॥

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে ঠিক করলেন ইউরেনাসের গতিপথ। সেটা কিছুদিন মেলবার পর শেষে

তফাত হয়ে যেতে লাগল। আবার হিসেব করা হল, কিন্তু ইউরেনাস তো তা মানে না, সে বেহিসেবী চালে চলতেই লাগল। তখন বিজ্ঞানীদের ভারী একটা সন্দেহ হল। ১৮৪১ খ্রীঃ অ্যাডামস্ নামে এক ইংরেজ ছাত্র ঠিক করল যে, তার বি. এ. পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই সে এ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবে। পরীক্ষা হয়ে যাবার পর দু'বছর খেটে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সে হিসেব কষে বের করল যে অন্য একটা অজানা গ্রহের টানে ইউরেনাসের গতিপথ বদলে যাচ্ছে। আর আকাশের অমুক জায়গায় খুঁজলে সেই অজানা গ্রহটিকে দেখতে পাওয়া যাবে। এই সব কথা সে রাজজ্যোতিষী স্যার জর্জ এয়ারীকে (Sir George Airy) জানিয়েছিল, কিন্তু তিনি কথাটাকে তেমন আমল দিলেন না।

ওদিকে ফরাসী দেশে লেভেরিয়ার (Leverrier) নামে আর একজনও হিসেব করে ঠিক ঐ কথাই বের করেছিলেন। তিনি ঐ একই মাসে তাঁর হিসেবপত্র ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমী বলে এক পণ্ডিতসভায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আর অ্যাডামস্ কিন্তু কেউ কারও কথা জানতেন না। হিসেব দেখেশুনে অ্যাকাডেমী থেকে সেগুলো পাঠিয়ে দিল বার্লিন শহরের মানমন্দিরে। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট সেটা বার্লিন পৌঁছল, আর সেই রাতেই সেখানকার বিজ্ঞানী গল (Galle) লেভেরিয়ারের হিসেবমতো জায়গায় দূরবীন দিয়ে দেখতেই নতুন একটি গ্রহকে দেখতে পেলেন। এ খবর ইংল্যাণ্ডে পৌঁছতেই এয়ারীর মনে পড়ে গেল অ্যাডামসের কাগজপত্রের কথা। তিনি তাড়াতাড়ি সেগুলো পড়ে নিয়ে আকাশে দূরবীন দিয়ে দেখলেন—অ্যাডামসের কথামতো জায়গাতেই নতুন গ্রহটিকে দেখা গেল। তখন আর হাত কামড়ালে হবে কি? লেভিরিয়ারকেই নতুন গ্রহের আবিষ্কারক বলে মেনে নিতে হল। অথচ ন'মাস আগেই এয়ারি এটাকে দেখতে পারতেন, আবিষ্কারের গৌরবটা একজন ইংরেজ পেত। তা আর হল না।

এই অষ্টম গ্রহের নাম হল রোমান সাগর-দেবতার নামে—নেপচুন (Neptune). চেহারায় সেটি ইউরেনাসের চেয়ে কিছু ছোট—এর ব্যাস ২৭,৭০০ মাইল। তাকেও একটু সবুজ দেখায়। সেখানেও ভয়ানক ঠাণ্ডা, আর হাওয়ায় বিষাক্ত মিথেন গ্যাসই বেশী। সূর্য থেকে তার দূরত্ব প্রায় ২৮০ কোটি মাইল। তার চলন আরও ধীর, সেকেণ্ডে প্রায় ৩২/৩ মাইল। তার বছর হয় আমাদের ১৬৪৪/৫ বছরে আর একবার আবর্তনে লাগে ১৫৪/৫ ঘণ্টা। তার দু'টি উপগ্রহ। তার মধ্যে একটি ট্রাইটন (Triton), আমাদের চাঁদের চেয়ে বড়।

॥ প্লুটো (Pluto) ॥

দূরবীনে নেপচুন তো ধরা পড়ল, কিন্তু ইউরেনাসের গতির সব রহস্য তাতেও বোঝা গেল না। পার্সিভ্যাল লাওয়েল (Percival Lowell) বললেন যে, ইউরেনাসকে ওভাবে চালানো একা নেপচুনের সাধ্যের বাইরে—নিশ্চয় আরও দূর আকাশে আরও একটা অজানা গ্রহ আছে। তাকে খুঁজে বের করবার আগেই তিনি তার নাম দিলেন 'দশম গ্রহ' (Planet X). ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রহটিকে যখন সত্যিই খুঁজে পাওয়া গেল, তার চৌদ্দ বছর আগেই লাওয়েল মারা গিয়েছেন। সূর্য থেকে প্রায় ৩৬৩ কোটি ১০ লক্ষ মাইল দূরে, মোটে ৩৬০০ মাইল ব্যাসের এই ছোট গ্রহটি বুধের চাইতে একটু
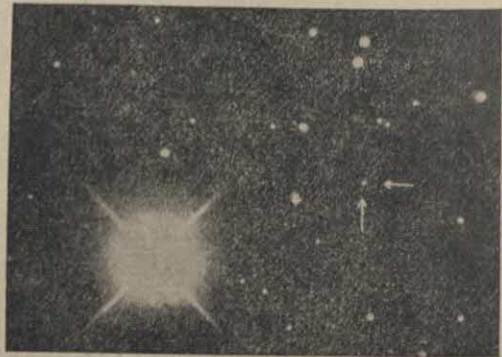
মহাকাশে প্লুটো (দুইটি তীরের মধ্যে দেখানো হয়েছে)

বড়। ঐটুকু দেহ, কিন্তু প্লুটো পৃথিবীর চাইতে ওজনে দশ-গুণ ভারী। সে চলে এক সেকেণ্ডে মোটে ৩ মাইল করে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে তার কেটে যায় আমাদের বছরের ২৪৮ বছর।

নেপচুনের ভাই পাতালের রাজা প্লুটো (Pluto)-র নামে এই গ্রহের নাম রাখা হল। PLUTO নামটার মধ্যে পার্সিভ্যাল লাওয়েল-এর নামের প্রথম অক্ষর দুটো (P. L.) আছে, তাই এ নামটা সকলেরই পছন্দ হল। কেননা, লাওয়েল মানমন্দির থেকেই এই গ্রহটিকে আবিষ্কার করা হয়েছিল।

কোনও কোনও বিজ্ঞানীর মতে প্লুটো আগে নেপচুনের একটি উপগ্রহ ছিল, পরে কোনও কারণে তার বাঁধন এড়িয়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

॥ ধূমকেতু ॥

সূর্যের রাজত্বের (সৌর-জগতের) মধ্যে গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া আরও দু'রকম জিনিস আছে—ধূমকেতু আর উল্কা।

সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে। ধূমকেতু পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে।

সূর্য, তার গ্রহ, গ্রহকণিকা আর উপগ্রহরা সবাই একই জিনিসের ভাঙা টুকরো। কিন্তু ধূমকেতুরা আসলে সৌরজগতের আপন জিনিস নয়। তারা হচ্ছে বাইরের জিনিস। মধ্যে মধ্যে সৌরজগতে এসে চলে যায়।

ধূমকেতু এক মজার জিনিস। প্রথমে তাকে দেখা যাবে যেন এক টুকরো ধোঁয়ার মতো। যতই সে এগিয়ে আসবে, ততই তার আলো বাড়বে, ততই সে তাড়াতাড়ি চলতে থাকবে, আর—ঠিক ঝাঁটার মতো একটি লেজ বেরিয়ে সেটি ক্রমেই বড় হতে থাকবে। ঝাঁটা না বলে অবশ্য লম্বা চুলের মতোও বলা যেতে পারে, আর তা থেকেই ওর নাম Comet, অর্থাৎ 'লম্বা চুলওয়ালা'। চুলই বলা হোক, আর লেজই বলা হোক—সেটি সবসময় সূর্যের ঠিক উলটোদিকে মুখ করে থাকে। তারপর ধূমকেতুটি যখন সূর্যকে ঘুরে চলে যায়, তখন দেখা যায় যে

সে তার লেজটিকে সামনে তুলে ধরে পালাচ্ছে। যত দূরে চলে যায়, তার আলো, গতি আর লেজের বহর তত কমতে কমতে শেষে সেটা এক টুকরো ধোঁয়ার মতো হয়ে মিলিয়ে যায়। তাকে সবসুদ্ধ কতদিন দেখা যাবে, তার কিছু ঠিক নেই—পাঁচ-সাত দিনও হতে পারে। ১৮৬১ খ্রীঃ একটি ধূমকেতুকে এক বছর ধরে দেখা গিয়েছিল। আর, তার লেজটা লম্বাও ছিল ভয়ংকর—১৫-২০ কোটি মাইলও হতে পারে।

এই লেজ আবার কখনও কখনও দুটো কি তিনটেও বেরোয়। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্য-শীজো'র (De-Cheseux) ধূমকেতুর ছ'টা লেজ দেখা গিয়েছিল।

লেজই ধূমকেতুর সর্বস্ব নয়, তার একটা শরীরও আছে। সেটা লোহা, পাথর ইত্যাদি দিয়ে গড়া। প্রায়ই সেটা পৃথিবীর চাইতে বড় হয়, কিন্তু ছোটও হয়। ১৮১১ খ্রীঃ ধূমকেতুটা সূর্যের চেয়েও বড় ছিল, তার লেজটিও অবশ্য ছিল তার ৫০ গুণ।

ধূমকেতু আলোর পুচ্ছ নিয়ে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে

সূর্যের তাপে ধূমকেতুর গা থেকে গ্যাস বেরিয়ে লেজটি হয়। সূর্যের কাছে এলে সেটা বেশী হয়, দূরে থাকলে কম হয়। তারপর সূর্যের একটা তেজ যখন সেই গ্যাসগুলোকে ঠেলে নিয়ে যায়, তখন উলটো দিকে ছড়িয়ে পড়ে গ্যাসগুলো একটা লেজের মতো দেখায়।

একেই তো সেকালে লোকে ধূমকেতুর যখন-তখন আসা, আর অদ্ভুত চেহারা দেখে ভয়ে মরত, তার উপর আবার এই লম্বা লেজের ঝাপটা লেগে কবে যে পৃথিবীটা খানখান হয়ে যায়, এই ভয়ে সবাই তটস্থ হয়ে থাকত। ১৯১০ খ্রীঃ হ্যালী-র ধূমকেতু যখন এল, তখন হিসেব করে দেখা গেল যে তার লেজের ঝাপটা পৃথিবীতে লাগবে। তখন সকলের কি ভয়—পৃথিবীর আর রক্ষে নেই এবার!

শেষে সত্যিসত্যিই একদিন হ্যালীর ধূমকেতুর লেজ পৃথিবীকে ঝাঁট দিয়ে চলে গেল, কিন্তু কেউ কিছু টের পেল না। পৃথিবী দূরে থাক, একটা গাছের পাতারও কিছু হল না। হবে কি করে? ধূমকেতুর লেজ তো খুব ফাঁকা ফাঁকা কতকগুলি পরমাণু মাত্র, অসম্ভব হালকা সে লেজ। তাতে আর ধাক্কা লাগবে কি?

নিউটনের বন্ধু হ্যালী (Halley) ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাজজ্যোতিষী। ধূমকেতুদের আনা-গোনার যে একটা নিয়ম আছে, সে কথাটা আগে কেউ জানত না। নিউটন যখন মহাকর্ষের নিয়ম বের করলেন, হ্যালী তখন সেই নিয়মে হিসেব কষে বের করলেন যে সবগুলি না হলেও কোনও কোনও ধূমকেতু ফিরে ফিরে আসে। তাঁর সময়ে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে একটা ধূমকেতু এল। তিনি প্রমাণ করলেন যে সেটা ৭৫-৭৬ বছর বাদে আর একবার আসবে। যদি সেকথা সত্যি হয়, তাহলে তো আবার ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তার আসবার কথা। তা-ই হল। ১৭৫৯-এর গোড়ার দিকে আবার ধূমকেতু দেখা দিল। এই ধূমকেতুরই নাম রাখা হল হ্যালীর ধূমকেতু (Halley's Comet). সেটাই ১৯১০-এ এসেছিল, আবার ১৯৮৬-তে সেটা আসবে।

বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি বড় গ্রহদের টানে পড়ে অনেক ধূমকেতু সৌরজগৎ ছাড়িয়ে যেতে পারে না, তার মধ্যেই থেকে ঘোরে। বৃহস্পতি এরকম তিরিশটি ধূমকেতুকে ধরে রেখে দিয়েছে। হ্যালীর ধূমকেতু হচ্ছে নেপচুনের টানে বন্দী।

এরকম বন্দী ধূমকেতুরা বেশী দূরে যায় না বলে বারবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসে আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এন্‌কে-র ধূমকেতু (Encke's Comet) মোটে ৩¼ বছর বাদেই দেখা দেয়।

বুধের টানাটানিতে এন্‌কে যেমন বিপদে পড়েছিল, বড় বড় গ্রহের পাল্লায় পড়ে অনেক ধূমকেতুরই তার চাইতে বেশী দুর্দশা হয়েছে। কত ধূমকেতুর লেজ ছিঁড়ে গিয়েছে, কারও বা দেহটিও টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছে। এদের একটি হচ্ছে বায়েলা-র ধূমকেতু (Biela's Comet). সেটি বেশ পৌনে সাত বছর পরপর আসছিল। হঠাৎ হল কি, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সে আসতেই দেখা গেল যে তার লেজ নেই, দেহটার মাঝখানটা সরু হয়ে গিয়েছে। দেখতে দেখতে মাঝখানটা ভেঙে গেল, সে দুটো আলাদা টুকরো হয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখা যায় নি। তবু তার আসার সময় হলেই বিজ্ঞানীরা তাকে খুঁজতেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তার আসবার দিন ছিল। সেদিন দেখা গেল যে আকাশে যেন আগুন বৃষ্টি হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন যে, বায়েলার ধূমকেতু ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে, এখন পৃথিবীর কাছাকাছি এসে তার কয়েক টুকরো পৃথিবীর টানে তার দিকে ছুটে এসেছে। কিন্তু সেগুলোকে আগুনের ফুলকির মতো দেখাল কেন ? টুকরোগুলো ভয়ানক জোরে পৃথিবীর দিকে আসছিল কি না, তাইতে হাওয়ার ঘষা লেগে সেগুলো জ্বলে উঠেছিল।

মোরহাউসের ধূমকেতু
(১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গিয়েছিল)

॥ উল্কা ॥

একটা দৃশ্য আকাশে অনেক সময়ই দেখা যায় যে একটা জ্বলন্ত তারা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে আসতে নিভে গেল। চলতি কথায় একে বলে 'তারা খসা'। কিন্তু তারা নয়, এগুলো বাইরে থেকে আসা ছোটখাট জিনিস, যারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে জ্বলে ওঠে। এদের বলে উল্কা (Meteor). এরা আসলে হয়তো

উল্কাপাত

বায়েলার ধূমকেতুর মতো কোনও ভাঙা ধূমকেতুর টুকরো। নয়তো, সৃষ্টির প্রথম দিকে পৃথিবী যখন টগবগ করে ফুটত, তখন তা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল, এমন কোনও জিনিস, কিংবা কোনও গ্রহকণিকাও হতে পারে।

উল্কা খানিকটা পথ আসবার পর নিভে যায়। সত্যি, প্রায় সব উল্কাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেই ছাই বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিদিন লাখে লাখে উল্কা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে এভাবে ছাই হয়ে যায়—আমরা দেখতে পাই না। সরষের মতো ছোট উল্কাও আছে। তবে, যেগুলোর ওজন অন্ততঃ কিলো-পাঁচেক হয়, তাদের সবটা পুড়ে ছাই হয়ে যায় না। আধপোড়া হয়ে তার খানিকটা পৃথিবীর গায়ে এসে পড়ে। তার আঘাতে মাটিতে গর্ত হয়ে যায়, আর সেটা নিজেও আস্ত থাকে না। তখন সেই টুকরোগুলোকে বলে উল্কাপিণ্ড (meteorite).

এরকম অনেক উল্কাপিণ্ড কলকাতার মিউজিয়ামে দেখা যাবে। তাদের এক একটার ওজন দুমনেরও বেশী। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি উল্কাপিণ্ডের তুলনায় এসব কিছুই নয়—সেটির ওজন ছিল ১৬৫০ মণ।

উল্কার শোভাযাত্রা

উল্কার পতনে সৃষ্ট গহ্বর 'শয়তানের খাদ'
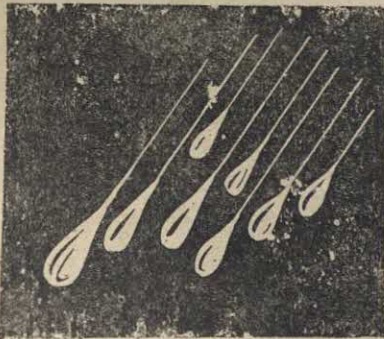
সবসময় উল্কাপিণ্ড পাওয়া না গেলেও, সেটা মাটিতে যে গর্ত করে দেয়, সেটা থেকে যায়। আন্দাজ ৫০ হাজার বছর আগেকার এরকম একটা গর্ত আমেরিকার অ্যারিজোনায় আছে। তার নাম রাখা হয়েছে 'শয়তানের খাদ' (Canyon Diablo)—সেটা প্রায় ৪০০০ ফুট চওড়া, আর ৬০০ ফুট গভীর। আসল উল্কাটা নিশ্চয়ই তাহলে মস্ত বড় ছিল!

উল্কাপিণ্ডে লোহা ইত্যাদি ধাতু আর পাথর থাকে। খুব বড় বড় উল্কাপিণ্ডে লোহাই বেশী পাওয়া যায়। পারস্যের রাজার আর তিব্বতের দলাই লামার তরোয়াল নাকি এইরকম লোহা থেকে তৈরী।

ভাঙা ধূমকেতুর টুকরো ইত্যাদি যেসব জিনিস উল্কা হয়, তারা সবাই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সেই হিসেবে এরাও একরকমের গ্রহকণিকা। ভেঙে যাবার পরও টুকরোগুলো সেই ধূমকেতুর আগেকার পথ ধরেই ঘুরতে থাকে। তারাও চলছে, পৃথিবীও চলছে—এ ওর কাছে এসে পড়লেই পৃথিবীর টানে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই টুকরোগুলো পৃথিবীতে উল্কারূপে এসে পড়ে।

দেখা গেছে যে বছরের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ দিনে কিছু বেশী বেশী উল্কা দেখা যাবেই। ঐ দিনগুলোতে পৃথিবী এক-একটা ভাঙা ধূমকেতুর পথের কাছে এসে পড়ে। ২৭শে নভেম্বর সে আসে বায়েলার ধূমকেতুর পথে। তখন, সেটার ভাঙা টুকরোগুলো ঝুপঝাপ
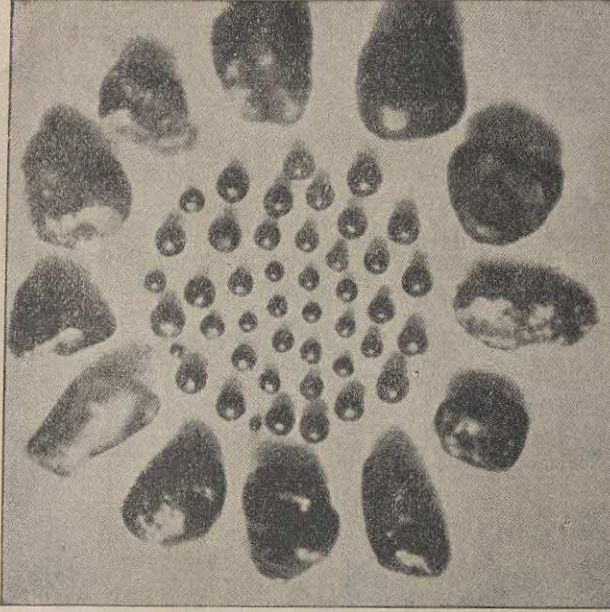
মহাশূন্য থেকে পতিত কয়েকটি উল্কাপিণ্ড

করে পৃথিবীতে পড়তে থাকে। প্রতি বছর ঐ নভেম্বর মাসেরই ১২, ১৩ আর ১৪ তারিখে, আগস্ট মাসের ৯, ১০ আর ১১ তারিখে, আর এপ্রিলের ২১শে তারিখেও রাতের আকাশ লক্ষ্য করলে অনেক উল্কা দেখতে পাওয়া যায়।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই রকম এক ঝাঁক উল্কা জ্বলতে জ্বলতে এসে রুশ দেশের সাইবেরিয়া অঞ্চলে পড়েছিল। তাতে শত শত মাইলব্যাপী একটা প্রকাণ্ড বন পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

॥ মানুষের তৈরী আকাশ ॥

কলকাতায় সিনেমা দেখাবার মতো করে গ্রহতারা-সুদ্ধ নকল আকাশ দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই বাড়িটাকে বলে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম (Planetarium), যন্ত্রটার নামও প্ল্যানেটেরিয়াম।

জার্মানীর মিউনিখ শহরে সবচেয়ে প্রথমে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এরকম প্ল্যানেটেরিয়াম যন্ত্র বসানো হয়। তারপর অনেক দেশেই হয়েছে।

যে ঘরে নকল আকাশ দেখানো হয়, সেখানে ঢুকলেই দেখা যাবে যে তার মাঝখানে ১২-১৪ ফুট উঁচু মস্ত একটা কিম্ভূত-কিমাকার যন্ত্র রয়েছে। তার মাঝখানটা সরু আর লম্বা, আর তার দু'মাথায় মস্ত দুটো গোল বলের মতো—তাতে কয়েকটা করে কাচের চোখ। যন্ত্রটাকে ইচ্ছেমতো উলটে-পালটে ঘোরানো যায়। ঘরের ছাদটা গম্বুজের মতো গোল হয়ে নেমে এসেছে, সেটা ৬৫-৭৫ ফুট চওড়া। সেই ছাদেই ঐ যন্ত্র থেকে আকাশের ছবি পড়বে, সিনেমার পর্দায় যেমন সিনেমার ছবি পড়ে।

আকাশের ছবি দেখানো শুরু হলেই ঘরের আলো কমে যেতে থাকে, ক্রমে শুধু ছাদের নীচের দিক্‌টা জুড়ে একটা আবছা আলো দেখা দেয়। সেটাই হল দিগন্ত, তার উপরেই ছাদটা হল রাতের আকাশ। ক্রমে ক্রমে তাতে গ্রহতারারা একে একে ফুটে উঠতে থাকবে, তারপর নিঃশব্দে তাদের মিছিল চলতে থাকবে পুব আকাশ থেকে পশ্চিমের দিকে। সারারাতের মিছিল এক ঘণ্টায় দেখা হয়ে যাবে।
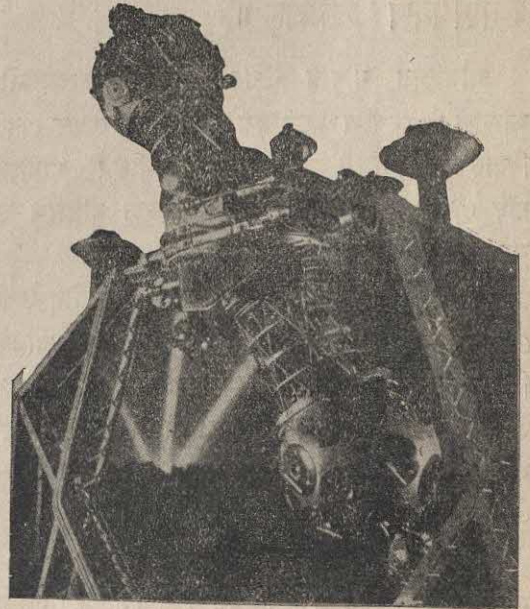
প্ল্যানেটেরিয়ামের কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্র

॥ মহাকাশ কত বড় ॥

আমাদের মাথার উপর ছড়িয়ে আছে নীল আকাশ। দেখলে মনে হয় যেন নীল রঙের একটা বিরাট ছাদের নীচে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের যদি একজোড়া ডানা থাকতো তাহলে বাতাসে ভর করে ঐ ছাদটাকে একটু ছুঁয়ে আসা যেত।

আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। পৃথিবীর উপরে যে বাতাস তার বেশির ভাগই রয়েছে পৃথিবীর পিঠের উপরকার দশ মাইলের মধ্যে। তারপর যত উপরে ওঠা যাবে বাতাস ততই কমতে থাকবে। কমতে কমতে এমন একটা সময় আসবে যখন আর একটুও বাতাস খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আরও উপরে যদি ওঠা যায় তা হলে সে এক নতুন রাজ্য। সেখানে বাতাস তো নেই-ই, বাতাসে ভেসে-থাকা ধুলোও নেই এক কণা। আকাশ যে নীল, তার গায়ে যে মাঝে মাঝে রঙের খেলা দেখা যায়—এর প্রধান কারণ হচ্ছে ঐ ধুলো আর বাতাসের অণু। সূর্যের আলো তারই মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ঐ রঙ সৃষ্টি করে। কাজেই ওখান থেকেই শুরু হবে ঘোর অন্ধকার। বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর পিঠ থেকে ৬০০ মাইল উপরে উঠলেই এই অন্ধকারের রাজ্য শুরু। ওকে আর আমরা আকাশ বলি না—বলি মহাকাশ।

মহাকাশ কত দূর অবধি ছড়িয়ে আছে, এর জবাব আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমরা জানি, আলোর গতিবেগ হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। দূর মহাকাশে এমন জ্যোতিষ্কেরও সন্ধান পাওয়া গেছে যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে লাগে ১৫ কোটি বছর। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। মহাকাশ যে তারও পিছনে ছড়িয়ে আছে বিজ্ঞানীরা সে বিষয়ে একমত।

॥ কি করে মহাকাশে যাওয়া যায় ? ॥

এমন যে দূর মহাকাশ, সেখানে গিয়ে সেখানকার হালচাল নিজের চোখে দেখে আসতে মানুষের আগ্রহ অসীম। যুগ যুগ ধরে মানুষ ঐ মহাকাশ সম্বন্ধে কত কি কল্পনা করে আসছে! ওখানে সশরীরে হাজির হতে পারলে ওখানকার খবর জানতে সুবিধে হয়। কিন্তু কেমন করে ওখানে যাওয়া যাবে ?

মানুষের যদি পাখির মতো এক জোড়া ডানা থাকত তা হলেই কি সে মহাকাশে ঘুরে আসতে পারত ? মোটেই না। পাখিরা বাতাসে ভেসে থাকতে পারে বলেই উড়তে পারে। যার ওপর ভর দিয়ে ওড়া যায়, এমন বাতাস থাকলে তবেই ওড়া সম্ভব। যেখানে বাতাসই নেই সেখানে মানুষ উড়ে যাবে কি করে ? এযাবৎ বেলুন থেকে শুরু করে জেপেলিন ইত্যাদি আকাশে উড়বার যত রকম যন্ত্র মানুষ তৈরি করেছে তার সবগুলোই হাওয়ার উপর ভর করে ওড়ে। হাওয়া না থাকলে সেগুলি অচল তো বটেই, হাওয়া হালকা হলেও সেগুলো তেমন জায়গায় উড়তে পারে না। তাই পৃথিবীর উপর ২০০ মাইল পর্যন্ত নামমাত্র হাওয়া আছে বটে, কিন্তু মধ্যে মাইল দশেকের ওপরেও আর এরোপ্লেন যেতে পারে নি। কেননা সেখানে হাওয়া থাকলেও যথেষ্ট নয়। কাজেই ওরকম কোন উড়োজাহাজ, তা সে যত দ্রুতগামীই হোক না কেন, মহাকাশে যেতে পারে না।
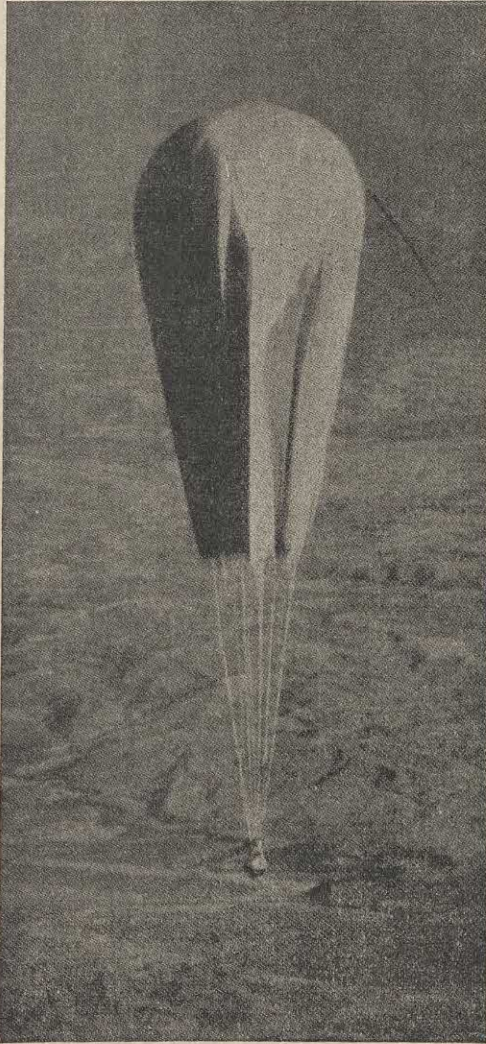
বেলুন

কাজেই এমন কোন দ্রুতগামী যান তৈরি করা চাই যা বাতাসের উপর নির্ভর না করেও মহাকাশের দিকে ছুটে যেতে পারবে।

॥ হাউই বা রকেট ॥

ভাবতে ভাবতে বিজ্ঞানীদের মাথায় এল, আচ্ছা, হাউই-এর সাহায্যে এ কাজটা হাসিল করা যায় না কি ? ইংরেজিতে হাউইকে বলে রকেট। কালী-পুজোর সময় অনেকে আকাশে এই হাউই বাজি ছুড়ে থাকে। হাউই কিভাবে আকাশে ওঠে ? নিউটনের তিনটি সূত্র বা নিয়ম—যাকে বলা হয় নিউটন্‌স্ ‘লজ অব্ মোশন’—তার একটি সূত্র বা নিয়ম হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটি ক্রিয়ারই একটি করে উলটো প্রতিক্রিয়া আছে যা কাজ করে ঠিক ওর উলটো দিকে এবং সে প্রতিক্রিয়া ঐ ক্রিয়ার ঠিক সমান। নিউটন নানা পরীক্ষা করে এই সূত্রটি প্রমাণ করে দিলেন এবং দেখিয়ে দিলেন যে শুধু পৃথিবী নয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই নিয়মটি সমানভাবে কাজ করে। যারা বন্দুক ছোড়ে তারা বন্দুক ছুড়বার সময় বন্দুকের কুঁদোটাকে শক্ত করে কাঁধে চেপে ধরে বন্দুক ছোড়ে। এর কারণ, বন্দুক থেকে যখন গুলি ছুটে বেরিয়ে যায় তখন তার উলটো দিকেও সমান বেগে একটা
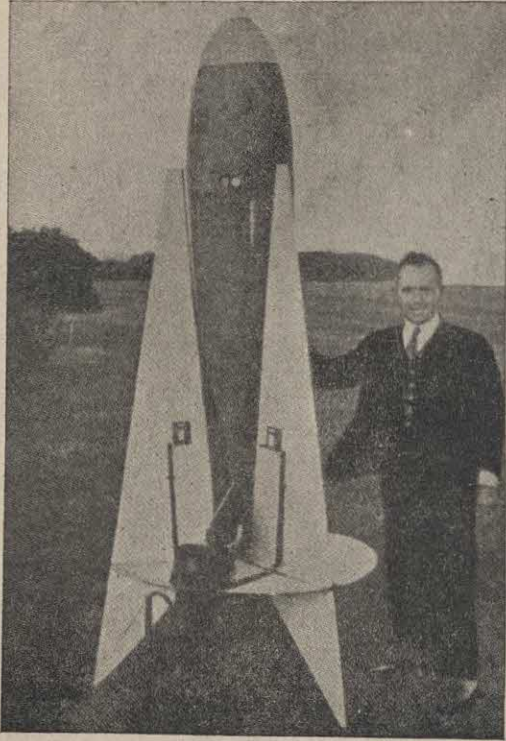
রকেট

প্রতিক্রিয়া হয় অর্থাৎ ঠিক ঐ পরিমাণ একটা চাপ পড়ে। কাঁধে কুঁদো চেপে ধরে সেটা সামলাতে হয়, নইলে ওর ধাক্কায় উলটে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। নিউটনের সূত্র অনুযায়ীই এরকম ঘটে। হাউই ছোটবার বেলায়ও ঠিক তাই হয়। হাউই-এর এদিকে থাকে একটা ছোট্ট ফুটো আর তার ভিতরে পোরা থাকে জ্বালানি, বা আরো ভালো করে বললে কোন বিস্ফোরক পদার্থ—যা জ্বালিয়ে দিলেই ওর ভিতর একটা জ্বলে ফেঁপে-ওঠা গ্যাসের প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। গ্যাসটা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বেরোবার পথ ঐ তো ছোট্ট ফুটোটি। কাজেই তারই ভিতর দিয়ে তাকে বেরিয়ে আসতে হয় প্রবল বেগে। আর, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নিউটনের সূত্র অনুযায়ী কাজ, অর্থাৎ যেদিকে গ্যাস প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক তার উলটো দিকে অনুরূপ প্রচণ্ড আর একটা উলটো চাপ পড়ে। ফলে হাউইটা সেই ফুটোর উলটো দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে আরম্ভ করে।

মানুষ হয়তো প্রথম প্রথম শখ করেই এই হাউই তৈরি করতে শিখেছিল—নিউটনের সূত্র তখন আবিষ্কৃত হয় নি। ভিতরের রহস্যটা সে তখন জানত না। কিন্তু কিছুদিন পরেই তার মাথায় এল এই জিনিসটাকে যুদ্ধের সময় আগুনে-অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা চলতে পারে। তারপর থেকেই এই হাউই বা রকেট (শেষের নামটাই এখন বিশেষ চলে বলে হাউই না বলে রকেটই বলব) যুদ্ধে ব্যবহার করা শুরু হয়ে গেল। যতদূর জানা যায় চীন দেশেই সাত-আটশো বছর আগে প্রথম রকেটকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশেও টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে এটি ব্যবহার করতে ছাড়েন নি। কিন্তু যুদ্ধে মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে এর ব্যবহার দেখা যায় আরও পরে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। জার্মানরা এইরকম রকেট দিয়ে বিপক্ষ দলকে ঘায়েল করতে শুরু করে। তাদের কোন কোন রকেট আকারেও ছিল যেমন বিরাট, ওজনেও তেমনি ভারী। ১২ টন ওজনের আর ৫০ ফুটের কাছাকাছি লম্বা এক-একটা রকেট যখন শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে আকাশ-পথে ছুটে চলত তখন বড় ভয়াবহ কাণ্ড ঘটত। জার্মানদের এই রকম রকেট আকাশ-পথে ২০০ মাইল রাস্তাও অক্লেশে পেরিয়ে যেত। এই ধরনের রকেটের নাম দেওয়া হয়েছিল ভি-টু (V-2) রকেট।

নিউটন

॥ রকেট নিয়ে জল্পনা কল্পনা ॥

কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র বা মারণাস্ত্র হিসেবেই রকেট ব্যবহার করে মানুষ থামল না। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে ভাবতে শুরু করলেন, রকেটের গতি যখন বাতাসের উপর নির্ভরশীল নয় তখন ওকে মহাকাশে পাঠাবার কাজে লাগানো যায় কিনা! জার্মানির বিজ্ঞানী ওবের্থ (Oberth) অঙ্ক কষে কষে এ ব্যাপারে অনেক তথ্য বার করে ফেললেন, আর আমেরিকার বিজ্ঞানী গডার্ড চেষ্টা করতে লাগলেন কি করে রকেটকে মহাকাশে ঠেলে তুলে দেওয়া যায়—এমন কি যাতে সে চাঁদে গিয়ে হাজির হতে পারে।

গডার্ড শুকনো জ্বালানির বদলে তরল জ্বালানি ব্যবহার করে দেখলেন ওতে রকেটের গতিবেগ এবং ছোটবার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। সে হচ্ছে ১৯২৬ সালের কথা। ১৯৩৫ সালেই এই রকম একটি রকেট ঘণ্টায় ৭০০ মাইল বেগে ৭০০০ ফুট পর্যন্ত তুলে দিয়েছিলেন তিনি। এ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের কথা।

ভি-টু (V-2) রকেট আবিষ্কার হবার পর বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে আরও ভাবতে লাগলেন। কিন্তু যতই শক্তিশালী হোক, রকেটেরও ক্ষমতার একটা সীমা আছে। একটা নির্দিষ্ট পথ প্রচণ্ড বেগে পার হয়ে আসার পর স্বভাবতঃই তার গতিবেগ কমে আসবে এবং এক সময়ে তা একেবারেই থেমে যাবে। তা হলে সে রকেট আর কত দূর যেতে পারবে? হাজার—দু'হাজার—দশ হাজার মাইলই যাক! কিন্তু তাতে তো আর মহাকাশ অভিযান চলে না! লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মাইল সে যাবে কি করে?

॥ রকেট যদি রিলে করা যায় ॥

বিজ্ঞানীরা বললেন, হ্যাঁ, অত দূরও চলতে পারে, তবে একটা রকেটের পক্ষে তা সম্ভব নয়। যদি এমন করে কয়েকটা রকেট একসঙ্গে একত্র করে একটা বড়-সড় রকেট পাঠাবার ব্যবস্থা করা যায়, যারা একটা ফুরোলে আরেকটা, এইভাবে চলবে, তাহলে ব্যাপারটা সম্ভব হতে পারে! উপযুক্ত জ্বালানির সাহায্যে প্রথম একটি রকেট ছোড়া হবে আর ওই রকেটের মধ্যেই ভরা থাকবে আর কয়েকটি রকেট। ভীম বেগে মহাকাশের দিকে ছুটতে ছুটতে যখন প্রথম রকেটটির গতিবেগ কমে আসবে সেটি তখন খসে ঝরে পড়বে, যেমন ঝরে পড়ে হাউই বাজি। তখন তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে আর একটি রকেট—দ্বিতীয় রকেট। নতুন জ্বালানির সাহায্যে নতুন করে যাত্রা শুরু হবে এই দ্বিতীয় রকেটের। ঠিক অমনি ভাবে দ্বিতীয় রকেটও চলতে চলতে যখন তার গতিবেগ কমতে শুরু করবে তখন তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে তৃতীয় রকেট, ঠিক আগেরটির মতোই নতুন জ্বালানি নিয়ে। তৃতীয় রকেটের কাজ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন চতুর্থ রকেট ছুটবে। এইভাবে ঠিক স্পোর্ট্‌স্‌-এর রিলে দৌড়ের মতোই খানিকক্ষণ পর পর একটির পর একটি নতুন নতুন রকেট যদি বেরিয়ে এসে ক্রমান্বয়ে ছুটতে শুরু করতে পারে মহাকাশের বুকে, তা হলে হয়তো মানুষের মহাকাশ অভিযানের স্বপ্ন সফল হতে পারে।

॥ মানুষের তৈরী প্রথম উপগ্রহ স্পুৎনিক ॥

এই কাণ্ডই ঘটল ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর। কাণ্ডটা ঘটালেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। ঐদিন সমস্ত বিশ্বসুদ্ধ লোককে চমক লাগিয়ে দিয়ে তাঁদের তৈরী একটি অতিকায় রকেট মহাকাশের দিকে ছুটে চলল এবং ঐভাবে রিলে করে করে তার ভিতর থেকে নতুন নতুন রকেট ক্রমান্বয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে ঠেলে তুলে দিল মহাকাশে আর সেটি চাঁদের মতোই পৃথিবীর টানে পৃথিবীর চারদিকে চক্কর দিতে শুরু করল। মানুষের তৈরী সেইটিই প্রথম উপগ্রহ। আকারে ছোট্টটি হলে কি হবে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে সে এক অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষী। রুশ বিজ্ঞানীরা ওর নাম দিলেন স্পুৎনিক-১ (Sputnik—1), অর্থাৎ এক নম্বর স্পুৎনিক। ঐ নামকরণের কারণ আর কিছুই নয়, পরবর্তী কালে তাঁরা ঐ রকম আরও স্পুৎনিক মহাকাশে পাঠাবেন ঠিক করলেন এবং পাঠিয়েছেনও। নম্বর না দিলে হিসেব থাকবে কি করে?

এই স্পুৎনিক ডাঙা ছেড়ে আড়াইশো মাইল উঁচুতে উঠে ততটা তফাতে থেকেই পৃথিবীকে ঘিরে

রকেট মহাকাশের দিকে ছুটে চলেছে

যন্ত্রপাতি-সমন্বিত প্রথম সোভিয়েট কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিক

ঘুরছে। তাহলে এটা মহাকাশে আছে, আর চাঁদের মত পৃথিবীর একটা যেন উপগ্রহও হল—তবে, আসল উপগ্রহ নয়, কৃত্রিম। তাই একে আর এ জাতের আরও যাদের ঐভাবে মহাকাশে রাখা হয়েছে, তাদের বলা হয় Satellite, কি না, উপগ্রহ।

॥ তারপর মার্কিন এক্সপ্লোরার ॥

ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরাও এ ব্যাপার নিয়ে অনেক দিন ধরে তোড়জোড় করছিলেন। ভিতরে ভিতরে তাঁদেরও গবেষণা চলছিল পুরোদমে। প্রথম কৃতিত্বের দাবি করতে না পারলেও তাঁরাও যে পিছিয়ে নেই তা অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণ করলেন। তাঁদের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহও ঠেলে উঠল মহাকাশে আর চাঁদের মতোই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী ঐ কৃত্রিম উপগ্রহের নাম দেওয়া হল এক্সপ্লোরার। স্পুৎনিক-১-এর মতো প্রথমটির নাম এক্সপ্লোরার-১।

তারপর একের পর এক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উঠতে লাগল। বিজ্ঞানীরা তার মধ্যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বসাতে লাগলেন। সেই সব যন্ত্র আপনা থেকেই মহাকাশের নানা বিচিত্র খবর ধরে নিয়ে আমাদের কাছে পাঠাতে লাগল, পাঠাতে লাগল

রাশিয়ার ভোস্তক যান এই কক্ষপথে উঠেছে

মহাকাশ থেকে তোলা নানারকম ছবি। মহাকাশ থেকে পাঠানো নানা তথ্য জানতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। এর পর তাঁরা ঠিক করলেন, এবার আর শুধু যন্ত্র নয়, জীবন্ত কোন প্রাণীকে মহাকাশে পাঠাতে হবে।

॥ মহাকাশে প্রথম প্রাণী লাইকা, প্রথম মানুষ গ্যাগারিন ॥

এবারেও বাহাদুরি দেখালেন রুশ বিজ্ঞানীরা। তাঁদের তৈরী মহাকাশ-রকেটে চড়ে একটি কুকুর সর্বপ্রথম সশরীরে মহাকাশে উঠে গেল। প্রথম মহাকাশযাত্রী হিসেবে "লাইকা" নামটি ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে রইল চিরকালের জন্য। লাইকা ছিল ঐ কুকুরটির নাম। অবশ্য লাইকা-সমেত মহাকাশযানটি পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে নি, মহাকাশেই লাইকার মৃত্যু হয়েছিল।

কুকুরের পর গেল দু'টি বানর। অবশেষে একদিন এক অসমসাহসিক মানুষও তৈরী হলেন সশরীরে মহাকাশ ঘুরে আসবার জন্য। অক্ষতদেহে তিনি মহাকাশ ঘুরে এলেনও। সেই স্মরণীয় দিনটি হচ্ছে ১২ই এপ্রিল, ১৯৬১। এই প্রথম মহাকাশ-যাত্রী মানুষটির নাম ইউরি গ্যাগারিন (Yuri Gagarin). ইনি জাতিতে রাশিয়ান।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। গ্যাগারিন মহাকাশ ঘুরে এলেন ঠিকই। সাহসেরও তাঁর তুলনা নেই। কিন্তু এই কাজ হাসিল করার ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের কত পরিশ্রম, কত আঁকজোক, হিসেব-পত্র, কত বৈজ্ঞানিক কৌশলের সাহায্য নিতে হয়েছিল তা ভাবলেও অবাক্ লাগে।

॥ মহাকাশে যাওয়ার বাধাবিপত্তি ॥

মহাকাশে যাওয়ার বাধাবিপত্তি কি একটা? প্রথমেই ধরা যাক পৃথিবীর আকর্ষণ। পৃথিবী তার উপরকার সব জিনিসকেই নিজের দিকে টানছে। এই টান কাটিয়ে তবেই না মহাকাশে উঠতে হবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, কোন রকেট যদি ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইলের মতো জোরে ছুটতে না পারে তবে তাকে পৃথিবীর টানে আবার পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে হবে। যদি গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল হয় তবে পৃথিবীর টান খানিকটা কাটানো যায় বটে, কিন্তু পুরোপুরি নয়। সে অবস্থায় রকেটটি পৃথিবীর চারদিকে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকবে, পৃথিবীকে ছেড়ে মহাশূন্যে উঠতে পারবে না। অর্থাৎ একটা দড়ির মাথায় ঢিল বেঁধে দড়িটা আঙ্গুলে জড়িয়ে ঘোরালে যেমন সেটা আঙ্গুলের চারদিকে ঘুরতে থাকে কিন্তু ছিটকে যেতে পারে না, এখানেও সেই রকম ঘটবে। ঘণ্টায় ১৮ হাজার থেকে ২৫ হাজার মাইল গতিবেগ থাকা পর্যন্ত এই রকমই চলবে। কিন্তু গতিবেগ যদি ঘণ্টায়
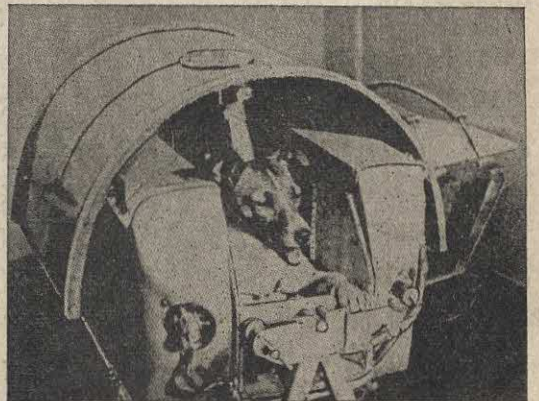
সোভিয়েট মহাকাশযানে 'লাইকা' কুকুরকে দেখা যাচ্ছে

প্রথম মহাকাশচারী গ্যাগারিন

২৫ হাজার মাইল ছাড়িয়ে যায়, কেবলমাত্র তখনই সেটা পৃথিবীর টান সম্পূর্ণ কাটিয়ে মহাকাশে ছিটকে যাবে অর্থাৎ দূর মহাকাশে হাজির হতে হলে গতিবেগ ঐ রকম ভয়ংকর হওয়া চাই।

তারপর ধরা যাক বাতাসের চাপ। আমাদের উপরকার বাতাস সর্বদাই আমাদের মাথার উপর চাপ দিচ্ছে। সে চাপ বড় কম নয়,—প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ডের মতো। কিন্তু সে চাপে আমাদের কোন ক্ষতি হয় না, কেন না তা সামলাবার ব্যবস্থা আমাদের শরীরের মধ্যেই আছে। ঠিক যতটা চাপ আমাদের উপর পড়ছে ততটা চাপ আমরা উলটো দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। তারই ফলে একটা ভারসাম্য হয়ে আমরা বাতাসের চাপে চেপটে যাচ্ছি না। কিন্তু আমরা যতই উপরে উঠব আমাদের উপরকার বাতাসের চাপ ততই কমতে থাকবে। সে অবস্থায় আমরা অভ্যস্ত নই, সে অবস্থা সামলাবার ব্যবস্থা আমাদের শরীরের মধ্যে নেই কাজেই তার ফল হবে মারাত্মক। হিসেব করে দেখা গেছে ডাঙ্গা থেকে ২৫ হাজার ফুট অর্থাৎ মাত্র পৌনে পাঁচ মাইলের মতো উঠলেই বাতাসের চাপ এত কমে যাবে যে আমাদের রক্তের সঙ্গে যে অকসিজেন মিশে রয়েছে তা বুদ্‌বুদের মতো বেরিয়ে আসতে চাইবে। আরও উপরে উঠলে সে অকসিজেন আরও ফেঁপে হালকা গ্যাসে পরিণত হবে, এমন কি মাত্র ৫০ হাজার ফুট অর্থাৎ সাড়ে ন' মাইল উঁচুতে উঠলেই রক্তের ভিতরকার অকসিজেন ফেঁপে আয়তনে ৮৫ গুণ বেড়ে যাবে। আর তার ফলে শরীর ফুলতে ফুলতে এক সময় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

এই তো গেল চাপের কথা, তারপর তাপ। যতই উপরে ওঠা যাবে ঠাণ্ডাও ততই বাড়তে থাকবে। পৃথিবীর উপরকার বাতাস, যাকে আমরা বলি
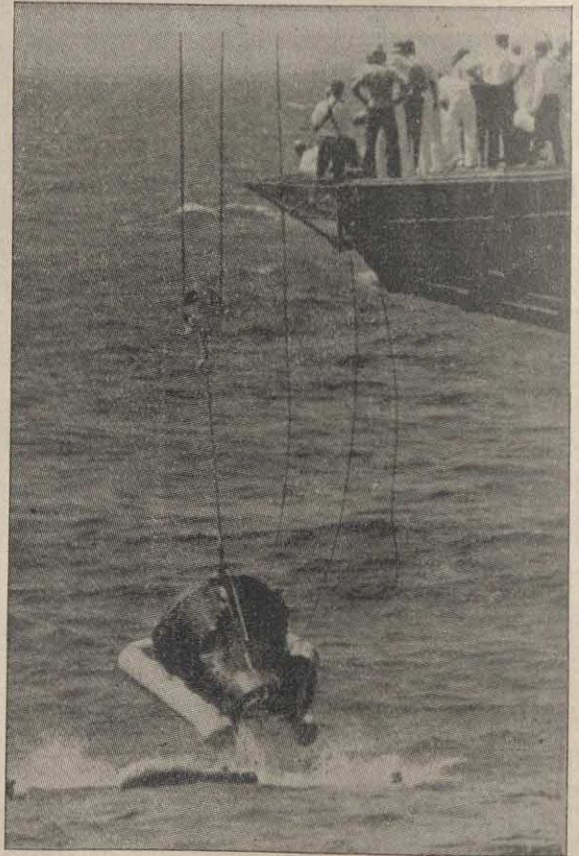
মহাকাশ থেকে ফেরার পর জেমিনি-৪কে সমুদ্র থেকে জাহাজে তোলা হচ্ছে

বায়ুমণ্ডল—তা কম্বলের মতো পৃথিবীকে মুড়ে রেখেছে। পৃথিবীর উপরকার উত্তাপকে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে না, তারই ফলে আমরা আরামে পৃথিবীর বুকে বাস করতে পারছি। কিন্তু বাতাস যতই কমতে থাকবে, তার তাপ আটকে রাখার ক্ষমতাও ততই কমতে থাকবে। মহাকাশে, যেখানে এক ফোঁটাও বাতাস নেই, সেখানে যে কী ভয়ংকর ঠাণ্ডা তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সেই ঠাণ্ডার মধ্যে যদি আমাদের কাউকে ছেড়ে দেওয়া যায় তা হলে আমাদের শরীর সে ঠাণ্ডায় জমে, শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাবে।
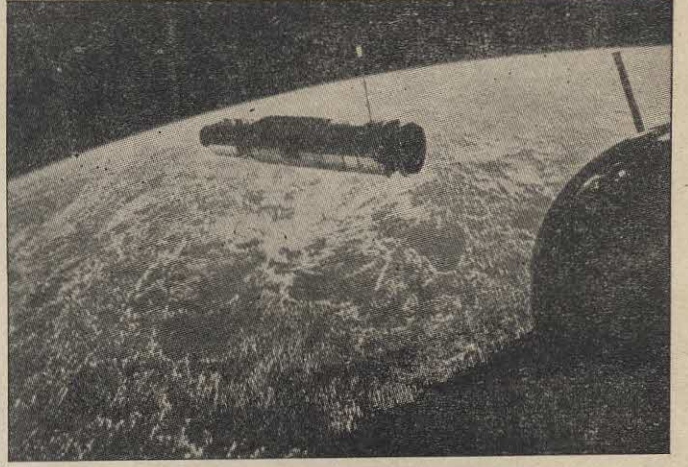
জেমিনি-১০

কিন্তু এ-ই সব নয়, আরও নানারকম বাধা আছে। মহাকাশে ছোটাছুটি করছে নানা ছোটখাট পদার্থ যাদের আমরা বলি উল্কা। পৃথিবীর আকাশে তাদের কোনটা যদি নেমে আসে তবে নেমে আসবার পথে বাতাসের ঘষায় সেগুলির বেশির ভাগই জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মহাকাশে পৃথিবীর টানের বাইরে তো সে রকমটি হয় না। মহাকাশযান যখন মহাশূন্যে থাকবে তখন এই উল্কাদের কোন কোনটা এসে সজোরে তার গায়ে আঘাত করতে পারে, তার ফলে মহাকাশযান ভেঙে, তুবড়ে, ফুটো হয়ে যেতে পারে। তা হলেই তো বিপদ। এ ছাড়া আছে তীব্র কস্‌মিক রে বা ব্যোমরশ্মি, যা রেডিও-অ্যাক্‌টিভ বা তেজস্ক্রিয় রশ্মির মতোই ভীষণ ক্ষতি করতে পারে। তারপর আর এক মস্ত সমস্যা হচ্ছে মহাকাশে মানুষের ওজন বলে কিছু থাকবে না। আমাদের যে ওজন তা আসলে পৃথিবীর টান ছাড়া কিছু নয়। পৃথিবীর আকর্ষণ যদি না থাকে তা হলে শরীরে ওজন বলে কিছু থাকবে না। আর ওজন না থাকলে কোথাও ইচ্ছেমত দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয়। সে অবস্থায় মানুষ পেঁজা তুলোর মতোই শূন্যে ভাসতে থাকবে।

আরও নানা বিপদ আছে। খাদ্য-সমস্যা, শ্বাস-গ্রহণের জন্য অকসিজেনের সমস্যা, নিঃশ্বাসে ছেড়ে-দেওয়া কার্বন ডাই-অকসাইডের সমস্যা, আরও এটা-ওটা-সেটা কত কি! সবশেষে আছে একঘেয়েমি আর মনের উপর তার প্রতিক্রিয়া। দূর পাল্লার পাড়ি দিতে গিয়ে যদি মাসের পর মাস একই অবস্থায় ঘন অন্ধকারের রাজ্যে কাটাতে হয় তবে যে মানুষ যাবে তার মনের উপর তার নানা রকম অশুভ ক্রিয়া ঘটা কিছু বিচিত্র নয়! ডাক্তারেরা বলেন, সে অবস্থায় পড়লে সুস্থ লোকও পাগল হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং মহাকাশে জীবন্ত মানুষ পাঠাবার আগে বিজ্ঞানীদের এ সব সমস্যা খতিয়ে দেখতে হয়েছে এবং সাধ্যমতো তার মীমাংসাও করতে হয়েছে।

॥ সমস্যার সমাধান ॥

মহাকাশযাত্রীদের জন্য বিজ্ঞানীরা একরকম বিশেষ ধরনের পোশাক বার করেছেন যার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্পেস্ স্যুট' বা মহাশূন্যের পোশাক। হালকা কাঠামোর মধ্যে অসম্ভব মজবুত এই পোশাক এমন কৌশলে তৈরী যে বাইরের চাপ, বাইরের ঠাণ্ডা বা উত্তাপ সব থেকে এটি একেবারে মুক্ত অর্থাৎ এই পোশাক পরলে বাইরের চাপ বা তাপ শরীরে ঢুকতে পারে না। যেমন বর্ষাতি কাপড়ের ভিতর দিয়ে জল ঢুকতে পারে না, বায়ুনিরুদ্ধ পাত্রে বাতাস

মহাকাশ-অভিযাত্রীর পিঠে জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জাম

ঢুকতে পারে না—সেই রকম। সুতরাং মহাকাশ-যাত্রার সময় এই পোশাক পরে নিলে মাথার উপরকার বাতাসের চাপ থাকুক আর না থাকুক কিছু এসে যায় না, বাইরে রক্ত-জমাট-করা ঠাণ্ডা থাকলেও তার কিছুই টের পাওয়া যায় না। পোশাকের সঙ্গে নল দিয়ে জোড়া থাকে কয়েকটা ট্যাংক। তার কোনটার কাজ শরীরের চাপকে ঠিক রাখা, কোনটার কাজ নিঃশ্বাসের জন্য শীতাতাপ-নিয়ন্ত্রিত অকসিজেন সরবরাহ করা, আবার কোনটার কাজ অকেজো কার্বন ডাই-অকসাইড, যা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে, তাকে সরিয়ে দেওয়া।

এইভাবে অন্যান্য সমস্যাগুলোও মেটাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারহীন অবস্থায় এসে পড়লে কি ভারে তা সহ্য করা যাবে আগে থেকেই মহড়া দিয়ে দিয়ে তা অভ্যাস করবার নানা উপায় বার করা হয়েছে। রকেট যখন প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেরুবে তখন শরীরটাকে হঠাৎ অসম্ভব ভারী বলে মনে হতে পারে—পাঁচগুণ—দশগুণ—এমন কি চল্লিশগুণ ভারী বোধ হওয়াও বিচিত্র নয়। বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারেই এমনটা হয়। এ অবস্থা সামলাবার জন্যও মহাকাশ-যাত্রীকে আগে থেকেই মহড়া দিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নকল মহাকাশ-কেবিন তৈরি করে মহাকাশ-যাত্রীকে সেখানে রেখে সেন্ট্রিফিউজ-যন্ত্রের সঙ্গে সেই কেবিন জুড়ে দিয়ে প্রথমে ধীরে, তারপর আস্তে আস্তে, ঘোরাবার বেগ বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত বনবন করে ঘুরিয়ে এই মহড়া নেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

মহাকাশে গিয়ে খাবার সমস্যাও একটা বড় সমস্যা! সেই অদ্ভুত রাজ্যে তো আর কোন খাবার পাওয়া যাবে না, তাই মহাকাশযাত্রীকে খাবার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। খুব অল্প জায়গায় আঁটে অথচ খাদ্যগুণে ভরা খাবার চাই। অবশ্য শুধু খাদ্যগুণ থাকলেই হবে না, সেটা আবার মুখরোচক হওয়াও দরকার। খাবারের মধ্যে রাখতে হবে পর্যাপ্ত প্রোটিন, শ্বেতসার এবং চর্বিজাতীয় উপাদান আর সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ সব জাতেরই ভিটামিন। খাবার যাতে সহজে খেয়ে নেওয়া যায় সেভাবেই তা সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে। কোলাপ্‌সিব্‌ল্ টিউবে করে দিতে পারলে আরো ভালো।

মহাকাশচারীদের জন্য যে সব খাবারের ব্যবস্থা এ যাবৎ হয়েছে তা হচ্ছে স্যাণ্ডউইচ, কাটলেট, মাংসের কিমা, মুরগীর কারি, প্যাটিস, সিদ্ধ আলু ও অন্যান্য

মহাকাশ-অভিযানের আগে মহাকাশ-অভিযাত্রীদের সাজসজ্জা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

সবজি, আপেল, কমলালেবু ও অন্যান্য ফলের রস আর দুধ। এর চেয়ে বেশী আর কি চাই ? তবে এ সবই দিতে হবে খুব ঘন করে ; কারণ, জায়গার বড় টানাটানি ওখানে।

মহাকাশ-অভিযাত্রী হোয়াইটের অকসিজেন যোগানকারী নল পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

মহাকাশ-অভিযাত্রী হোয়াইটের মাথায় বিশেষ ধরনের টুপি পরানো হচ্ছে

॥ একমাত্র মহিলা অভিযাত্রী ॥

মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্যাগারিন মহাকাশে উঠেছিলেন। গ্যাগারিনের পরে আরও কয়েক জন রাশিয়ান পর পর মহাকাশে ঘুরে এলেন। টিটভ, পোপোভিচ্, নিকোলয়েভ, বিকোভস্কি, কত নাম করব ? এঁদের মধ্যে একজন মহিলাও এই দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। এঁর নাম ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা--ইনিও রাশিয়ান।

ওদিকে আমেরিকানরাও চুপ করে বসে ছিলেন না। রাশিয়ার দ্বিতীয় মহাকাশযাত্রী টিটভের আগেই দু'জন আমেরিকান পর পর অল্পক্ষণের জন্য মহাকাশে উঠে গিয়েছিলেন, তবে তাঁরা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে পারেন নি। এঁদের একজনের নাম শেপার্ড আর একজনের নাম গ্রিসম। তবে এর অল্পদিন পরেই আমেরিকার মুখ রাখলেন গ্লেন (১৯৬২)। মহাকাশে উঠে তিনবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তিনি পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

এর পর দুই দেশের মহাকাশচারীরা যেন পাল্লা দিয়ে মহাকাশে উঠতে লাগলেন। ক্রমেই তাঁরা বেশী বেশী সময় মহাকাশে কাটাতে সক্ষম

হতে লাগলেন। প্রথম মহাকাশযাত্রী গ্যাগারিন মহাশূন্যে কাটিয়ে এসেছিলেন এক ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট। তারপর টিটভ কাটিয়ে এলেন ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ১৭ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এলেন। আমেরিকার গ্লেন মহাকাশে ছিলেন ৫ ঘণ্টার কাছাকাছি। কিন্তু ঐ দেশেরই গর্ডন কুপার কাটিয়ে এলেন ৩৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট—ঐ সময়ের মধ্যে পৃথিবীকে ২২টা চক্কর দিয়েছিলেন তিনি। রাশিয়ার নিকোলায়েভ তাঁকে ছাড়িয়ে ৯৪ ঘণ্টা ২২ মিনিট মহাকাশে রইলেন,—পৃথিবীকে ৬৯ বার চক্কর দিয়েছিলেন তিনি। বিকোভস্কি তাঁর উপরও টেক্কা দিয়ে ১১৯ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট কাটিয়ে এলেন মহাকাশে। তেরেস্‌কোভা ছিলেন প্রায় ৭১ ঘণ্টা।

॥ মহাকাশযাত্রা নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল ॥

ইতিমধ্যে মহাকাশযাত্রা একটা নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। শুধু তাই নয়, এতদিন এক-একজন মহাকাশচারী একক ভাবে মহাশূন্যে যাত্রা করে এসেছিলেন, এবার শুরু হল একসঙ্গে একাধিক লোকের মহাকাশ-ভ্রমণ। রাশিয়ার কোমারোভ, ইয়েগোরোভ ও ফিওক্‌তিস্তোভ এই তিনজন একসঙ্গে উড়লেন মহাকাশে, কাটিয়েও এলেন ২৪ ঘণ্টার উপর। শেষে আমেরিকার বরম্যান আর লোভেল একাদিক্রমে ৩৩০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট মহাশূন্যে একসঙ্গে কাটিয়ে নেমে এলেন পৃথিবীতে। এই দীর্ঘ সময়ে এঁরা ২০৬ বার পৃথিবীকে চক্কর দিয়েছিলেন।

॥ মহাকাশে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ॥

মহাকাশযাত্রীরা তাঁদের বিচিত্র অভিযানে যেমন অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তেমনি বিপদেও পড়েছেন অনেকবার। আমেরিকার গর্ডন কুপার যখন মহাকাশে উঠে পৃথিবীকে চক্কর দিচ্ছিলেন তখন হঠাৎ তিনি দেখলেন তাঁর কেবিনের ভিতরকার কয়েকটা যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেছে। পৃথিবী থেকে বেতার সংকেতে তাঁকে কখন কি করতে হবে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখলেন সে যোগাযোগও নষ্ট হয়ে গেছে। ভীমবেগে তাঁর যন্ত্রযান পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে, দূরে ছোট্ট একটা আলোকবিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে পৃথিবী, কিন্তু সেখানে ফিরে যাওয়া বুঝি জীবনে আর সম্ভব হবে না! কিন্তু অদ্ভুত মনের জোর কুপারের! সেই অবস্থাতেই কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনি নিজের হাতে সেই বিকল যন্ত্র চালিয়ে মহাকাশ জাহাজটিকে নামিয়ে আনলেন সমুদ্রের জলে।

কোমারোভ, ইয়েগোরোভ ও ফিওক্‌তিস্তোভ

অনেক মজার মজার ব্যাপারও ঘটেছিল। কুপারের একটা অভিজ্ঞতার কথাই বলি। মহাশূন্যে উঠে তাঁর শরীরের সমস্ত ওজন চলে গেল। শুধু

তাই নয়, কামরায় যে জল ছিল, আর তাঁর কপাল থেকে বেরিয়ে-আসা ঘাম, সব ভারহীন হয়ে কামরার ভিতর কুয়াসার মতো ভেসে বেড়াতে লাগল। ফলে খানিকক্ষণের জন্য তাঁর দৃষ্টি হয়ে গেল ঝাপসা। বুদ্ধি করে তিনি তখন রুমাল বের করে সেই জলকণাগুলোকে রুমাল দিয়ে ধরতে লাগলেন—ঠিক যেমন করে লোকে জাল দিয়ে পোকামাকড় ধরে। কুপার বলেন, ভাগ্যিস ঐ রকম করেছিলাম, নইলে যন্ত্র যে বিকল হয়ে গেছে তা তো বুঝতেই পারতাম না। পৃথিবীতে নেমে এসে তিনি হেসে বলেছিলেন, মহাকাশে যেতে হলে সঙ্গে আর যাই নাও আর না নাও, কয়েকখানি রুমাল বেশী করে নিতে যেন ভুল না হয়।

রাশিয়ার মহিলা মহাকাশ-অভিযাত্রী ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা যখন মহাকাশযান চেপে যাচ্ছিলেন তিনি একসময় বুঝতে পারলেন তিনি ভারতের উপর দিয়ে ছুটে চলেছেন। অমনি মহাকাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, “আমি শঙ্খচিল, মহাকাশ থেকে ভারতবাসীকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।” (শঙ্খচিল তাঁর সাংকেতিক নাম)। টেলিভিশনে তাঁর সহাস্য মুখের ছবি আর সেই কথা ভেসে এল পৃথিবীর বুকে। ঠিক অমনি ভাবেই আরও তিনজন মহাকাশচারী—কোমোরোভ, ইয়েগোরোভ আর ফিওক্তিস্তোভ যখন মহাকাশ-যানে করে জাপানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন টোকিও শহরে চলছিল অলিম্পিক খেলা। মহাকাশ থেকে তাঁরা টোকিওর রুশ খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন।

॥ মহাকাশে নানান কাণ্ড ঘটানো হল ॥

এর পর একে একে মহাকাশে আরও নানান কাণ্ড ঘটানো শুরু হল। ১৯৬৫-তে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা মহাকাশে দুটি জাহাজ তুলে একটির সঙ্গে আর একটি গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিলেন। জেমিনি-৮, জেমিনি-৯, জেমিনি-১০ এই তিনটি মহাকাশযান এই কাজ হাসিল করল—ঠিক যেমন করে স্টীমারের গায়ে নৌকো ভিড়োনো হয় তেমনি করে।

এর পরের ধাপ হচ্ছে মহাশূন্যে হেঁটে বেড়ানো। শুনতে যতটা অবাক্ লাগছে আসলে কাজটা সেরকম অবিশ্বাস্য নয়। কারণ, মহাশূন্যে তো ভার বা ওজন বলে কিছু নেই। শূন্যে নেমে পড়লে নীচে পড়ে যাবার কোনও ভয় নেই, পৃথিবী তো টানছে না নীচে থেকে! কাজেই মহাকাশযানের দরজা খুলে যদি মহাশূন্যে স্পেস স্যুট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসা যায়, তা হলে মহাশূন্যে হেঁটে বেড়ানো খুব একটা কঠিন কাজ নয়। এবারে তাই করলেন

ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা এয়ারফোর্স এঞ্জিনীয়ারিং-এর স্নাতক হয়েছেন। এ. নিকোলায়েভ তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন

মহাকাশযাত্রী মহাকাশে হেঁটে বেড়াচ্ছেন

আমেরিকার মহাকাশচারী সারনাম (Cernam). দু'ঘণ্টারও বেশী সময় সীমাহীন মহাশূন্যে হেঁটে বেড়ালেন তিনি। মূল জাহাজের সঙ্গে যোগ রইল একটা সরু নলের সাহায্যে। ঐ নল দিয়ে প্রয়োজনীয় অকসিজেন তাঁকে সরবরাহ করা হল, আর ফেরবার সময় ঐ নল ধরেই তিনি ফিরে এলেন তাঁর নির্ধারিত মহাকাশযানের কামরায়। এভাবে মহাকাশে পায়চারি শুধু আমেরিকানরাই করেন নি, রুশ মহাকাশ-চারীরাও করেছেন। এক মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে শূন্যে হেঁটে গিয়ে আর এক মহাকাশযানে গিয়ে—যাকে বলে 'গাড়িবদল'—তাও করেছেন তাঁরা। মহাশূন্যে হাঁটবার সময় শূন্যে ভাসমান মহাশূন্যের ধুলো, যা নাকি উল্কা গুঁড়ো থেকে তৈরী হয়, তাও তাঁরা সংগ্রহ করতে ছাড়েন নি।

॥ চাঁদে যাবার প্রস্তুতি ॥

কিন্তু শুধু মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ালেই তো হবে না। পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী হচ্ছে চাঁদ। সেই চাঁদে যদি একবার না পৌঁছতে পারা গেল তা হলে মহাকাশ-অভিযানের তো কোন সার্থকতাই থাকে না। এবারে শুরু হল তার জন্য প্রস্তুতি।

পৃথিবীর টান, যাকে বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ, তা যদি কাটিয়ে বেরোতে না পারা যায় তা হলে সত্যি-সত্যি পৃথিবীর বাইরে যাওয়া হয় না। সে টান কাটাতে হলে পৃথিবী থেকে অন্ততঃ ২ লক্ষ ১৬ হাজার মাইল দূরে চলে যেতে হবে। সে দূরত্ব পার হতে পারলে তবেই চাঁদে যাবার কথা উঠতে পারে, নইলে নয়।

এর আগে বলেছি, বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন কোন রকেট যদি ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বা তারও বেশী জোরে ছুটতে পারে তবেই তার পক্ষে পৃথিবীর টান পুরোপুরি কাটিয়ে পৃথিবীর রাজত্বের সীমা পেরিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। অর্থাৎ চাঁদে যেতে হলেও রকেটের ঐ রকম গতিবেগ হওয়া চাই। ভিতরে ভিতরে সেই আয়োজনই চলতে লাগল।

॥ অ্যাপোলো-৮এর অভিযান ॥

১৯৬৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে একটি বিরাট মহাকাশযান ছুটে বেরুল মহাশূন্যের উদ্দেশে। যে রকেটের সাহায্যে এটিকে ছোড়া হল তত বড় রকেট এর আগে আর কখনও ব্যবহার করা হয় নি। এই অতিকায় রকেটটির নাম দেওয়া হল স্যাটার্ন-৫। পর পর তিনটি খোলস দিয়ে তৈরী এটি, আর তারই ডগায় বসানো হল মহাকাশযানটি, যার নাম অ্যাপোলো-৮। সব মিলে হল প্রায় তিরিশ তলার সমান উঁচু আর ওজনে পৌনে তিন হাজার টনেরও বেশী—প্রায় ৭৮ হাজার মন।

জ্বালানি হিসেবে এই রকেটের মধ্যে পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি ছাড়াও ছিল কয়েক শ' টন তরল হাইড্রোজেন আর তা জ্বালাবার উপযোগী তরল অকসিজেন। অকসিজেনকে তরল রাখতে হলে তার উত্তাপকে শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের (সেলসিয়াসের) ১৮৩ ডিগ্রী নীচে রাখতে হয়, আর হাইড্রোজেনকে তরল অবস্থায় রাখতে হলে তাকে আনতে হয় শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের (সেলসিয়াসের) ২৫৩ ডিগ্রী নীচে। সেই

ব্যবস্থাই রাখা হয়েছিল স্যাটার্ন-৫এ। কেপ কেনেডি থেকে প্রথমেই সেটি ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে ছুটে বেরুল, তারপর বার দুই পৃথিবীকে চক্কর দিয়ে নিয়ে তার গতিবেগ হয়ে গেল ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল। তার তিনটি রকেট-খোলস তিনবার ধাক্কা দিয়ে তার মধ্যে এই গতিবেগ সঞ্চারিত করে দিল আর তার ডগায় বসে রইল মূল মহাকাশযান অ্যাপোলো-৮। রকেটের সঙ্গে সঙ্গে সেটিও সমান বেগে ছুটেছে। রকেট-খোলসগুলি ইতিমধ্যে একে একে তাদের কাজ শেষ করে খসে খসে পড়ছে তাতে কিন্তু মহাকাশযান স্থানচ্যুত হয় নি বা তার গতিবেগও কমে নি।

অ্যাপোলো-৮ বিপুল বেগে ছুটতে ছুটতে ২ লক্ষ ১৬ হাজার মাইল পথ পার হয়ে এল, তারপর এক সময়ে পৃথিবীর টান পুরোপুরি কাটিয়ে ভেসে পড়ল মহাশূন্যে। এখন আর তাকে অত জোরে না ছুটলেও চলবে; ঘণ্টায় ৩ হাজার মাইল বেগে ছুটে চললেই সে চাঁদের রাজ্যে গিয়ে হাজির হবে।

ঘণ্টায় ৩ হাজার মাইল ছুটতে ছুটতে অবশেষে অ্যাপোলো-৮ ঢুকে পড়ল চাঁদের রাজ্যে, অর্থাৎ যেখানে পৃথিবী তাকে না টানলেও চাঁদ তাকে টানতে শুরু করেছে—চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের আওতায় চলে এসেছে সে। যতই সে চাঁদের দিকে এগোচ্ছে ততই তার গতিবেগ বেড়ে চলেছে। এবার তার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নইলে এক সময় সে হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়বে চাঁদের বুকে।

অ্যাপোলো-৮ খালি আসছিল না। তার মধ্যে বসেছিলেন তিনজন অসমসাহসিক অভিযাত্রী—বোরম্যান, লোভেল আর অ্যাণ্ডার্স। তিনজনই আমেরিকান। অ্যাপোলো-৮এর মধ্যে বসে তাঁরাই যন্ত্র চালিয়ে তার গতি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন।

চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে প্রথমটা ৭০ থেকে ১৯৬ মাইল ব্যবধান রেখে তাঁরা ঘুরতে লাগলেন চাঁদের চারদিকে—ঘোরবার পথটা হল অনেকটা ডিমের মতো। তারপর তাঁরা মহাকাশযানটিকে নামিয়ে
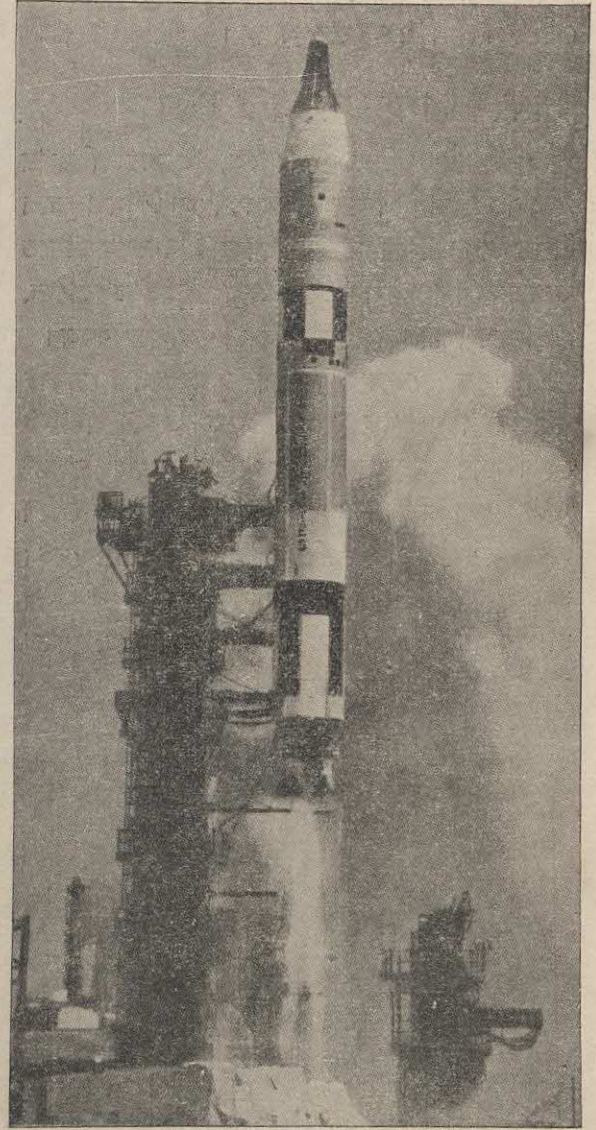
জেমিনি-৪ মহাকাশযান নিয়ে কেপ কেনেডি থেকে বিরাট রকেট যাত্রা শুরু করেছে

আনলেন চাঁদের আরও কাছে। এবার চাঁদ আর তাঁদের মধ্যেকার দূরত্ব মাত্র ৬০ মাইল। প্রতি দু'ঘণ্টায় একবার করে চাঁদকে পাক খেতে লাগলেন তাঁরা। আর, সেই সঙ্গে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন চাঁদকে। শুধু পরীক্ষা করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি তুলে সে ছবি টেলিভিশনে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন পৃথিবীর দিকে। চাঁদের যে

দিক্‌টা পৃথিবী থেকে কখনও দেখা যায় না সেদিক্‌টার ছবিও আসতে লাগল।

॥ ফিরে আসার বাহাদুরি ॥

খুঁটিনাটি পরীক্ষা শেষ হল, এরপর ফিরবার পালা। আবার ফিরলো অ্যাপোলো-৮ মহাশূন্যে। চাঁদের টান কাটিয়ে মহাশূন্যের বিরাট ময়দানে ভাসতে ভাসতে তাঁরা আবার চলে এলেন পৃথিবীর রাজ্যে, যেখানে পৃথিবী আবার তাঁদের টানতে শুরু করল।

মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকাই সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ। ঠিক একটা নির্দিষ্ট কোণ করে সরু একটা পথে, যাকে প্রায় সুড়ঙ্গ-পথই বলা চলে,—ঢুকতে হবে এই বায়ুমণ্ডলে। সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। হয়তো গোটা মহাকাশযানটাই মহাশূন্যে পথ হারিয়ে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিংবা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতেও পারে।
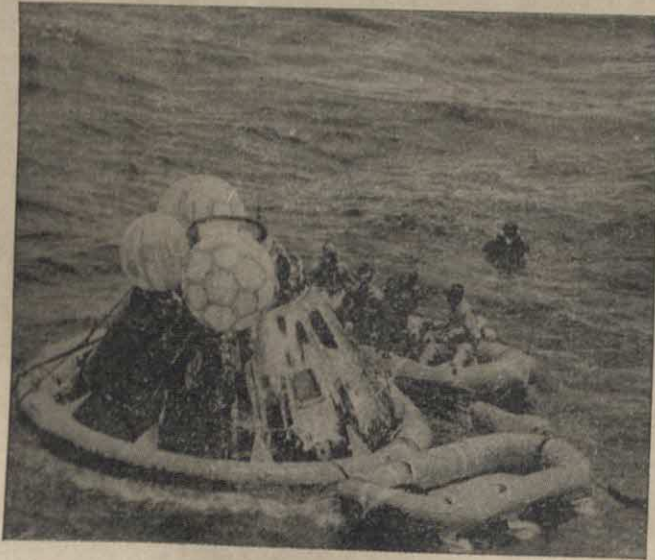
১৯৬৯ সালের ২৪শে নভেম্বর অ্যাপোলো-১২-এর অভিযাত্রী চার্লস কনরাড, রিচার্ড গর্ডন ও অ্যালান বীন চন্দ্র অভিযান শেষে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ফিরে এসেছেন। তাঁদের এখান থেকে হেলিকপটার দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়

সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ওঁরা। উল্কাপিণ্ডের মতো ভীমবেগে ছুটতে ছুটতে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল অ্যাপোলো-৮। বাতাসের ঘর্ষণে তখন তার বাইরেকার উত্তাপ ৩৩০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডও ছাড়িয়ে গেছে। ঐ উত্তাপে যে কোন ধাতু গলে যেতে পারে। কিন্তু মহাকাশযানের খোলটা এমন ভাবে সংকর ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল যে সে উত্তাপে সে টকটকে লাল হয়ে গেলেও গলে যাবে না। তা ছাড়া বাইরে থেকে ভিতরটা এমন ভাবে ইন্‌সুলেট করা ছিল যে জাহাজের ভিতরে বাইরেকার সে উত্তাপ স্পর্শ করতে পারবে না। সুতরাং মহাকাশচারীরা তাঁদের কামরায় বসে বাইরেকার সেই দারুণ উত্তাপের কোন আভাস পেলেন না।

জ্বলন্ত উল্কার মতো ঝলমল করতে করতে অ্যাপোলো-৮ পৃথিবীর আকাশে এসে ঢুকল। তারপর সময় বুঝে তিন মহাকাশচারী প্যারাশুট খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নীচে—মাটিতে নয়, প্রশান্ত মহাসাগরের জলে। সেখানে তাঁদের তুলে নেবার জন্য সব রকম ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। প্রথমে রবারের ভেলায় উঠলেন তাঁরা, তারপর জাহাজে।

॥ লুনার মডিউল বা চাঁদের ভেলা ॥

চাঁদের চারপাশে চক্কর খেয়ে এলেন তিন মহাবীর, কিন্তু চাঁদের বুকে না নামতে পারলে তো কিছুই হল না। এর পর শুরু হল সেই চেষ্টা।

গোটা মহাকাশযানটা নিয়ে চাঁদের বুকে নামা সম্ভব নয়, সেখানে নামতে পারলেও আবার সেটিকে তুলে নিয়ে পৃথিবীর দিকে রওনা হওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা তাই ঠিক করলেন, জাহাজ যেমন সমুদ্রে তীরের কাছাকাছি কোথাও নোঙ্গর করে এবং তারপর যাত্রীরা

চন্দ্রপৃষ্ঠে মার্কিন মহাকাশ অভিযাত্রী অলড্রিন।

মহাকাশ অভিযানঃ

[চন্দ্রপৃষ্ঠে মার্কিন মহাকাশ অভিযাত্রী অলড্রিন।]

চাঁদকে দেখায় আকাশে একটা ছোট থালার মতো। কিন্তু চাঁদ মোটেই ছোট নয়। এর ব্যাস ২১৬০ মাইল। পৃথিবী থেকে প্রায় ২,৩৯,০০০ মাইল দূরে আছে বলে চাঁদকে অত ছোট দেখায়।

এই চাঁদকে বিজ্ঞানীরা দূরবীন দিয়ে দিনের পর দিন দেখেছেন। তাঁদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা তাঁরা মহাকাশযানে করে চাঁদে গিয়ে পৌঁছবেন। বহুদিনের বহু চেষ্টায় তাঁদের সেই চেষ্টা ফলবতী হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ চাঁদের উপরে পদার্পণ করতে পেরেছে।

এ পর্যন্ত শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই চাঁদে মানুষ পাঠাতে ও তাদের সুস্থ শরীরে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে। চাঁদের উপরে পৃথিবীর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অ্যাপোলো—১১ তিনজন মার্কিন মহাকাশযাত্রী—আর্মস্ট্রং, অলড্রিন ও কলিনসকে নিয়ে চাঁদে যাত্রা করে। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চাঁদে নামেন।

ছবিতে অলড্রিনকে অদ্ভুত পোশাকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর স্বচ্ছ মুখাবরণীতে প্রতিফলিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা, টেলিভিশন ক্যামেরা, চান্দ্রযান ও আর্মস্ট্রং-এর ছবি। এই ছবি আর্মস্ট্রং তোলেন।

মার্কিন মহাকাশযাত্রীরা কয়েকবার চাঁদে যেতে ও সেখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পেরেছেন।
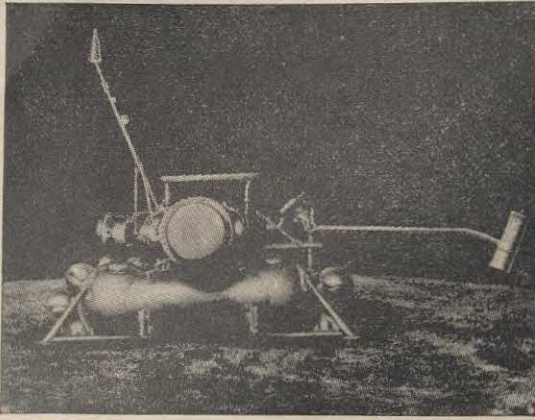
চাঁদে ছেড়ে-আসা লুনা-১৬

যেমন ছোট ছোট নৌকো বা লাইফ-বোটে করে জেটিতে এসে ওঠে, এখানেও সেই রকম কোন ব্যবস্থা করতে হবে অর্থাৎ মহাকাশযান চাঁদের ওপর না নামিয়ে, চাঁদের কাছাকাছি রেখে তা থেকে লাইফ-বোটের মতোই কোন হালকা যন্ত্রে চেপে চাঁদের বুকে নামতে হবে।

সেই রকম একটা যন্ত্র তৈরি করাও হল। বিজ্ঞানীরা ওর নাম দিলেন 'লুনার মডিউল' (Lunar module). বাংলায় নাম দেওয়া হয়েছে 'চাঁদের ভেলা'। আটটা পায়া-বসানো এই যন্ত্রটিকে দেখলে অনেকটা মাকড়সার মতো মনে হয়। ঐ পায়াগুলো এমন ভাবে স্প্রিং দিয়ে তৈরি যে চাঁদের মাটিতে নামবার সময় হঠাৎ কোন আঘাত লাগলে তা সামলে নিতে পারে। ঐ লুনার মডিউলে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কয়েকটা উলটোমুখো রকেট। এই রকেট ইচ্ছেমতো চালিয়ে নামাবার সময় লুনার মডিউলের গতিবেগ খুব খানিকটা কমিয়ে আনা হয়, এমন কি ওর সাহায্যে ভেলাটিকে চাঁদের উপর সমান্তরালভাবে রেখে এদিক্-ওদিক্ চালিয়েও নেওয়া চলে।

॥ চাঁদ থেকে মাত্র দশ মাইল উপরে ॥

লুনার মডিউলকে মহাকাশযান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া এবং আবার তাকে তুলে নিয়ে মহাকাশযানের গায়ে নিয়ে ভেড়ানো—এসব পরীক্ষা পৃথিবীর আকাশেই করে নেওয়া হল। তারপর একদিন ঐ রকম একটি লুনার মডিউল সঙ্গে নিয়ে আবার তিনজন আমেরিকান মহাকাশচারী রওনা হলেন চাঁদের দিকে। এঁদের নাম ইয়ং, সারনান ও স্ট্যাফোর্ড। কথা রইল, এঁদের মধ্যে ইয়ং মহাকাশ-জাহাজেই থেকে যাবেন, অন্য দু'জন ভেলায় চড়ে নেমে যাবেন চাঁদের আকাশে। তবে প্রথমেই চাঁদের মাটিতে নামবেন না। দশ মাইল উপরে থেকে চাঁদকে আরও ভালো করে পরীক্ষা করে উঠে আসবেন আর সেই সঙ্গে দেখে আসবেন কোথায় নামা সবচেয়ে নিরাপদ।

নির্দিষ্ট দিনে মহাকাশযান আবার হাজির হল চাঁদের রাজ্যে। অতি সন্তর্পণে সারনান আর স্ট্যাফোর্ড নেমে এলেন ভেলায়। যান থেকে ভেলা বিচ্ছিন্ন করা হল। তারপর ভেলা নামতে লাগল চাঁদের দিকে। ইয়ং মূল যানটি নিয়ে চাঁদের বেশ খানিকটা উপর দিয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন।

মাত্র দশ মাইল নীচে চাঁদ। এখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরি, তাদের অসংখ্য বিরাট গহ্বর, এদিকে-ওদিকে ছড়ানো খানাখন্দ, ফাটল আর বড় বড় পাথর। সেই সব পাথর চাঁদের এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।

আট ঘণ্টা ধরে দু'জনে মিলে আঁতিপাতি করে পরীক্ষা করলেন চাঁদকে, মোটামুটি একটা জায়গাও ঠিক করে ফেললেন, তারপর উঠে এলেন মূল মহাকাশযানে। যান সোজা ছুটল পৃথিবীর দিকে।

॥ চাঁদে নামার মহড়া ॥

এর পর শুরু হল চাঁদে নামবার আসল মহড়া। সম্পূর্ণ অজানা রাজ্য এই চাঁদ। যদিও বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে চাঁদকে দেখে দেখে এবং নানাভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছেন, তবু এখনও জানবার অনেক

কিছু বাকী যা সশরীরে চাঁদে না নামা পর্যন্ত জানা সম্ভব নয়। হঠাৎ ঐ রকম সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় অজানা অবস্থায় গিয়ে হাজির হলে কত রকম বিপদ ঘটতে পারে কেউ বলতে পারে না। সেই জন্যই দরকার এই মহড়া বা রিহার্সালের। কিন্তু কোথায় রিহার্সাল দেওয়া যাবে? পৃথিবীতে সে রকম জায়গা কোথায়?

উপরে দূরে পৃথিবী দেখা যাচ্ছে। অ্যাপোলো-১১ চন্দ্রপৃষ্ঠে নামছে। এই চন্দ্রযানের মধ্যে নীল আর্মস্ট্রং ও এডুইন অল্‌ড্রিন আছেন। তাঁরা প্রধান যন্ত্রযানে অবস্থিত মাইকেল কলিন্‌সের সঙ্গে যোগ দেবেন।

॥ নকল চাঁদ ॥

মার্কিন বিজ্ঞানীরা বললেন, এই পৃথিবীতেই আমরা একটা নকল চাঁদ তৈরি করে সেইখানেই মহড়া দেব। টেক্সাসের এক বিশাল মাঠ বেছে নিয়ে সেইখানে তৈরী হল ঐ নকল চাঁদ।

এক কথায়, চাঁদে গিয়ে যেভাবে থাকতে হবে, যা কিছু করতে হবে সবেরই মহড়া দেওয়া হতে লাগল ঐ নকল চাঁদের উপর।

আর্মস্ট্রং, অল্‌ড্রিন ও কলিন্‌স্

॥ মানুষের চন্দ্রবিজয় ॥

অবশেষে এল ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের ২১শে তারিখ। সেই দিন প্রথম চন্দ্রযাত্রী মহাকাশযান ও তার ভেলা সমেত রওনা হল পৃথিবী ছেড়ে। এ চন্দ্রযানটির নাম অ্যাপোলো-১১। যথাসময়ে সেটি কেপ কেনেডি থেকে ছুটে বেরুল ৯২ হাজার রেল-এঞ্জিনের শক্তি নিয়ে। এবারেও যাত্রী তিনজন—আর্মস্ট্রং, অল্‌ড্রিন আর কলিন্‌স্। ঠিক হল, কলিন্‌স্ মূল জাহাজে বসে জাহাজ চালাবেন আর ভেলায় চড়ে চাঁদে নেমে যাবেন দলের নেতা আর্মস্ট্রং ও অল্‌ড্রিন।

যথাসময়ে মহাকাশযানটি যখন চাঁদের উপর ৬২ থেকে ৭৫ মাইল উপর দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, তখনই ওঁরা দু'জন ভেলায় গিয়ে ঢুকলেন, ভেলা মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন হল।

প্রথমটা ভেলা নামতে লাগল ভীমবেগে—চাঁদ
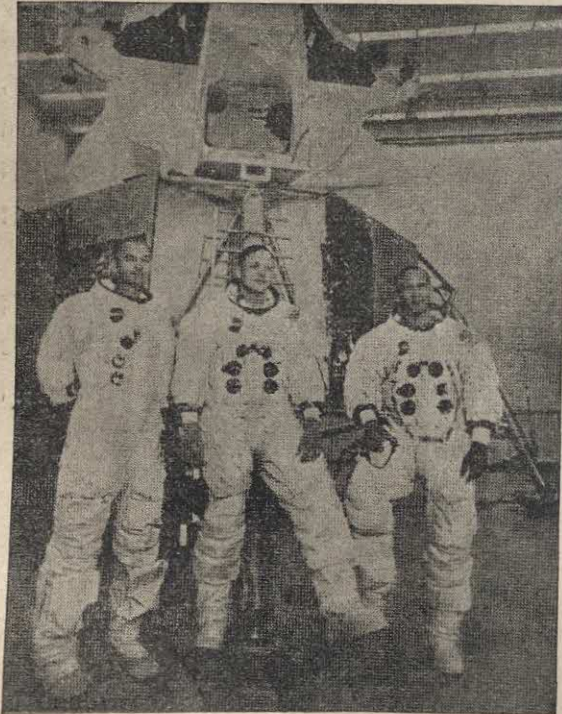
প্রবলবেগে তাকে আকর্ষণ করছে। ওঁরা বিপরীতমুখী রকেট চালিয়ে ভেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করলেন, নইলে তো চাঁদের বুকে সজোরে আছড়ে পড়ে ভেলা ভেঙে চুরমার হতোই, ওঁরাও রেহাই পেতেন না।

বাতাস না থাকলে ধীরে ধীরে, যেমন করে গাছ থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়ে তেমনি ভাবে, ভেলা এসে নামল চাঁদের প্রায় গা ঘেঁষে। ঐ তো সামান্য নীচেই দেখা যাচ্ছে চাঁদের মাটি! কিন্তু ওখানে তো নামা চলবে না। বড় বড় পাথরের চাঁই এমন ভাবে ছড়িয়ে আছে যে তার গায়ে পড়লে ভেলা নিশ্চিত জখম হবে। তখন বুদ্ধি করে চাঁদের উপর দিয়ে সমান্তরাল ভাবে ভেলা চালিয়ে দেওয়া হল। মাইল পাঁচেক ঘুরে একটা সুবিধেমতো জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল—ইতস্ততঃ নুড়ি ছড়ানো একটা জায়গা। সেখানে ওঁরা ভেলা নামিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে সেই ভেলা এসে স্পর্শ করল চাঁদের মাটি।

সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। সমস্ত পৃথিবী হাঁ

তিনটি প্যারাশুট দিয়ে ঝোলানো অ্যাপোলো-১৬কে একটি হেলিকপ্টারে বসানো হচ্ছে

চাঁদে নামা অ্যাপোলো-১৬র কম্যাণ্ডার জন ইয়ং যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাকে স্যালুট করছেন

করে তাকিয়ে আছে টেলিভিশনে সেই দৃশ্য দেখবার জন্য। আগেকার ব্যবস্থামতো খানিকক্ষণ ভেলায় অপেক্ষা করে প্রথম বেরিয়ে এলেন আর্মস্ট্রং। প্রথমেই স্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন ক্যামেরাটি চালিয়ে দিলেন, তারপর তিনি মই বেয়ে নেমে এলেন শেষ ধাপে। সন্তর্পণে এক পা চাঁদের উপর রেখে পরীক্ষা করে দেখলেন মাটি নরম কিনা, পা পিছলে বা বসে যাবে কিনা। তারপর লাফিয়ে পড়লেন চাঁদের মাটিতে। চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম পদচিহ্ন আঁকা হয়ে গেল।

চাঁদে নেমেই চটপট আর্মস্ট্রং বেলচা দিয়ে কিছু পাথর তুলে নিয়ে স্পেস্ স্যুটের পকেটে পুরে নিলেন। কোন কারণে যদি হঠাৎ চলে আসতে হয়, আর সুযোগ না পাওয়া যায়, তাই প্রথমেই পাথর তুলে নিলেন। মিনিট কুড়ি পরে অল্ড্রিনও নেমে এসে তাঁর সঙ্গী হলেন।

চারদিকে ছোট ছোট নুড়ি ছড়ানো, কোথাও বা ছোট ছোট গর্ত—গরুর ক্ষুরের চাপে মাটিতে যেমন হয়। কোন কোন জায়গায় মাটি ময়দার মতো মিহি। পা পিছলে যাচ্ছিল সেখানে, কখনও বা বসে যাচ্ছিল মাটিতে। শরীর অসম্ভব হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে একটু চেষ্টা করলেই বেশ খানিকটা উঁচুতে লাফিয়ে ওঠা যেতে পারে।

প্রথমেই ওঁদের কাজ হল চাঁদের বুকে একটা ধাতুর ফলক আটকে দেওয়া। তাতে সন তারিখ সমেত চাঁদে মানুষের প্রথম পদার্পণের কথা খোদাই করা ছিল। তাঁরা যে শান্তির বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছেন সে কথাও লেখা ছিল সেই ফলকে। তারপর তাঁরা চটপট যুক্তরাষ্ট্রের একটি জাতীয় পতাকা পুঁতে দিলেন চাঁদের গায়ে আর বসিয়ে দিলেন কতকগুলি যন্ত্রপাতি—এর অনেক-গুলিই স্বয়ংক্রিয়।

এই স্বয়ংক্রিয় চন্দ্রযানটি মহাকাশযাত্রীদের নিয়ে চন্দ্রে অবতরণ করে

নানা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে দেখতে, টেলিভিশনে সেই সব দৃশ্যের ছবি পাঠাতে পাঠাতে এবং সেই সঙ্গে তার বর্ণনা দিতে দিতে চাঁদের বুকে দু'ঘণ্টারও কিছু বেশী সময় পায়চারি করলেন দুই মহাকাশচারী। তারপর তাঁরা ফিরে এলেন লুনার মডিউলে। লুনার মডিউল চালিয়ে দেওয়া হল। কলিন্‌স্ তখনও মূল মহাকাশযান নিয়ে চাঁদের চারদিকে ঘুরে চলেছেন। মডিউল গিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হল, আর্মস্ট্রং আর অল্‌ড্রিন মডিউল ছেড়ে ঢুকে পড়লেন মূল মহাকাশযানে। ভেলার কাজ শেষ, এখন আর সেটা বইবার দরকার নেই। সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হল মহাশূন্যে। কোথায় যে সেটা হারিয়ে গেল কেউ জানে না!

অ্যাপোলো-১৬র কম্যাণ্ডার জন ইয়ং চাঁদের গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন

পৃথিবীতে ফিরে এসেও কিন্তু ওঁরা রেহাই পেলেন না। কে জানে ওঁরা চাঁদ থেকে কোনও বিষাক্ত জীবাণু বা ভাইরাস সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কিনা! পৃথিবীর পক্ষে সেটা মারাত্মক হতে পারে। তাই ২১ দিন ধরে সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ওঁদেরকে একটা বিশেষ ভাবে তৈরী আলাদা কামরায় আটকে রাখা হল। সেই সময় ওঁদের নিয়ে তন্নতন্ন করে ডাক্তারী পরীক্ষা করা হল। ডাক্তারেরাও অবশ্য সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হয়েই ওঁদের ঘরে ঢুকতে পেলেন এবং একবার ঢুকবার পর তাঁরাও ২১ দিন সেই ঘরে বন্দী রইলেন। অবশ্য আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেল না। ওরই মধ্যে ওঁদের কুড়িয়ে-আনা নুড়ি-পাথরগুলি নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল।

॥ আবার চাঁদে ॥

চার মাস পরে আবার তিনজন আমেরিকান রওনা হলেন চাঁদের দিকে দ্বিতীয় অভিযানে। এঁরা নতুন লোক। এঁদের মধ্যে রিচার্ড গর্ডনের উপর ভার পড়ল মূল মহাকাশযান (অ্যাপোলো-১২) মধ্যে থাকার। বাকী দুজন—চার্লস কন্‌রাড আর অ্যালান বীন নেমে গেলেন চাঁদে।

এঁদের অভিজ্ঞতা আরও বিচিত্র, কারণ এঁরা নেমেছিলেন অন্য জায়গায় আর চাঁদের বুকে কাটিয়েছিলেনও বেশী সময়—সাড়ে একত্রিশ ঘণ্টা। তার মধ্যে চাঁদের বুকে ঘুরে বেড়ালেন সাড়ে তিন ঘণ্টা। প্রথমবারের অভিযাত্রীরা ১৯ পাউণ্ড নুড়ি-পাথর সংগ্রহ করেছিলেন, এঁরা সংগ্রহ করলেন ১২৮ পাউণ্ড নুড়িপাথর।

চাঁদের দিকে তৃতীয় অভিযান কিন্তু সফল হল না। অ্যাপোলো-১৩ চাঁদের পথে দুই-তৃতীয়াংশ পাড়ি দিয়েও যান্ত্রিক গোলমালের জন্য ফিরে আসতে বাধ্য হল। তবে ঐ বিপদের মধ্যেও অভিযাত্রীদের মনোবল অটুট ছিল।

॥ রুশ বিজ্ঞানীরাও চুপ করে ছিলেন না ॥

এতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদের দিকে যে ক'টি অভিযানের কথা বলা হল তার সবই আমেরিকার কৃতিত্ব। রুশ অভিযাত্রীরা এ পর্যন্ত কেউ সশরীরে চাঁদে যেতে না পারলেও তাঁরাও চুপচাপ বসে ছিলেন না। চাঁদে মানুষ না পাঠিয়েও পৃথিবীতে বসেই তাঁরা বেতারের সাহায্যে চাঁদের বুকে মহাকাশযান নামিয়ে দিয়েছেন ও তাকে ফিরিয়েও এনেছেন। কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে তাকে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো নানা কাজও করিয়ে নিয়েছেন। এদিক দিয়ে তাঁদের বাহাদুরি কম নয়। কেন না, আমেরিকান অভিযানগুলিতে মহাকাশযানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে মহাকাশযাত্রীদেরই। রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর মাটিতে বসেই সে কাজ হাসিল করেছেন বেতারের সাহায্যে। তাঁদের এই সব যানের নাম দেওয়া হয়েছে লুনা—আমেরিকার যেমন অ্যাপোলো।

আরও একটা অদ্ভুত কাজ করেছেন রুশ বিজ্ঞানীরা। মানুষের বদলে তাঁরা চাঁদের বুকে একটা আট চাকার স্বয়ংক্রিয় গাড়ি নামিয়ে দিয়েছেন। আর তার নাম দিয়েছেন 'লুনোখোদ'। এ গাড়িতে কোন মানুষ যায় নি—গিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতীয় পতাকা, লেনিনের ছবি, টেলিভিশন ক্যামেরা আর নানা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। চাঁদের বুক থেকে মাটি পাথর কুড়িয়ে আনা, মাটি পরীক্ষা করা, সামনে পাথর পড়লে তাকে ঠেলে সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে নেওয়া—এসব কাজই লুনোখোদ করেছে নিজে নিজেই। টেলিভিশনে এত নিখুঁত ছবি পাঠিয়েছে যে চাকার দাগগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট বোঝা গেছে। আর তার চেয়েও আশ্চর্য, এ গাড়ি
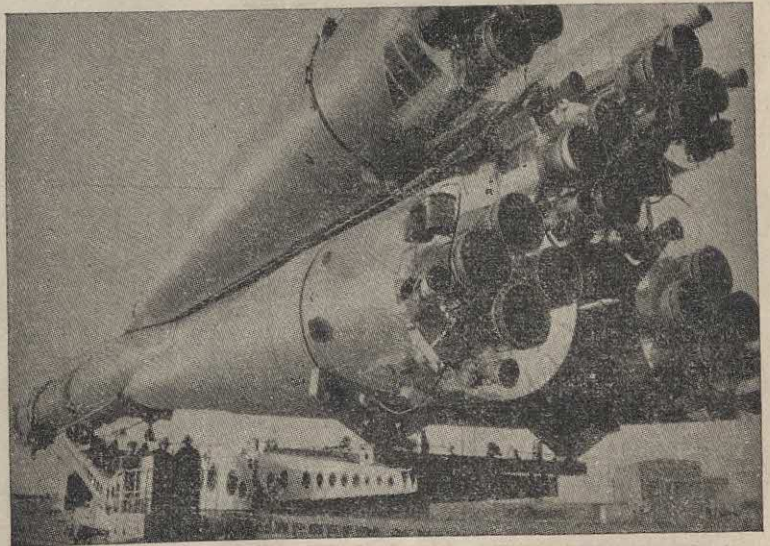
সোয়ুজ-৯কে রকেট বহনকারী যানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে
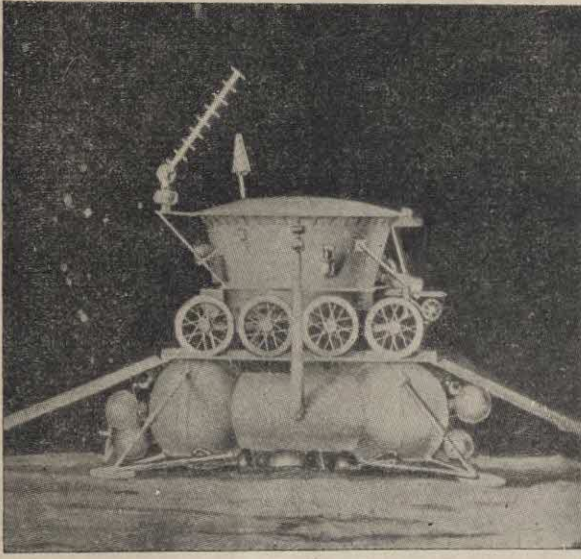
লুনোখোদ-১ চাঁদের উপর নেমেছে

চালাবার শক্তি সংগ্রহ করা হয়েছে সূর্যের আলো থেকে—সৌর ব্যাটারীর সাহায্যে। চাঁদের এক-একটা দিন আমাদের ১৪ দিনের সমান, এক-একটা রাত্রি আমাদের ১৪টা রাত্রি। তাই চাঁদের বুকে যতক্ষণ "দিনের আলো" পাওয়া গেছে ততক্ষণই অর্থাৎ আমাদের হিসেবে ১৪ দিন পর্যন্ত লুনোখোদ চলতে পেরেছে। তারপর ১৪ দিন ধরে, চাঁদের রাত্রির সময়টা, তার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আবার রাত্রি ভোর হলে তার যাত্রা শুরু হয়েছে।

॥ চাঁদে তৃতীয় ও চতুর্থ অবতরণ ॥

লুনোখোদ চাঁদে ঘুরবার সময়েই আমেরিকানরা আরও দুবার চাঁদে অভিযান চালিয়েছেন—তৃতীয় ও চতুর্থ সফল অভিযান। প্রত্যেক বারই তাঁরা ক্রমে ক্রমে অভিযানের জন্য অধিকতর দুর্গম জায়গা বেছে নিয়েছেন। তৃতীয় অভিযানে তাঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন একটা হাতে-টানা রিক্‌শা গাড়ি, মালপত্র বইবার সুবিধে হবে ভেবে। কিন্তু তাতে দেখা গেছে চন্দ্রযাত্রীদের পরিশ্রমটা বড় বেশী হয়ে গেছে। সেজন্য চতুর্থ অভিযানে তাঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন একটা বিদ্যুৎচালিত মোটর গাড়ি—'মুন্ রোভার'। এ গাড়িটি থাকায় তাঁদের অনেক সুবিধে হয়েছিল—পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয় নি বলে পরিশ্রম অনেক কম হয়েছিল এবং অল্প সময়ে অনেক বেশী জায়গায় ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হয়েছিল। এ যাত্রায় তাঁরা চাঁদের উপরে প্রায় ১৬ মাইল ঘুরে বেড়িয়েছিলেন।

তৃতীয় অভিযানে বেছে নেওয়া হয়েছিল চাঁদের পার্বত্য অঞ্চল 'ফ্রা মরো'—যার পাশেই ছিল ৯০০ ফুট উঁচু একটা নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরি। তার গহ্বরটি ১৫০ ফুট গভীর। অবশ্য এবারকার অভিযাত্রীরা তাঁদের কর্মসূচী অনুযায়ী সব কিছু কাজ শেষ করতে পারেন নি, পাহাড়েও বেশী দূর উঠতে পারেন নি। তবে চতুর্থ অভিযানে তাঁরা নেমেছিলেন ওর চেয়েও দুর্গম জায়গা, ১৫ হাজার ফুট উঁচু অ্যাপেনাইন পাহাড়ের নীচে, যার পাশেই ছিল একটা ১২ হাজার ফুট গভীর খাদ। এবারকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল
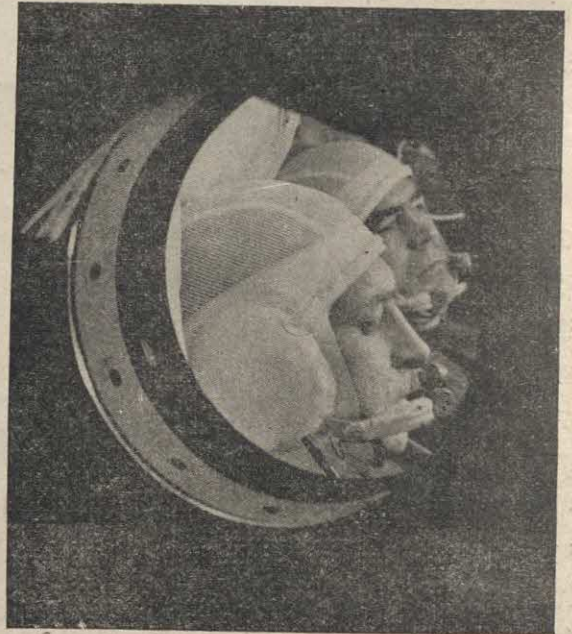
সোয়ুজ-৯ এর মধ্যে রুশ মহাকাশচারী সেবাস্টিয়েনোভ ও নিকোলায়েভ্

রুশ মহাকাশচারী পাভেল পোপোভিচ্

আরও বিচিত্র ; তবে দু-এক বার খুব বিপদ্ও গিয়েছে এবং অল্পের জন্যই ওঁরা রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন। টেলিভিশন যন্ত্রে প্রতিটি খুঁটিনাটি দৃশ্যের খুব স্পষ্ট রঙিন ছবি পাওয়া গিয়েছে এই শেষ অভিযানে; আর সে টেলিভিশন পৃথিবী থেকেই নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ফেরবার পথে অভিযাত্রীরা চাঁদের চারপাশে একটি ছোট কৃত্রিম উপগ্রহ,—আরও সঠিক ভাবে বললে উপ-উপগ্রহ, ছেড়ে দিয়ে এসেছেন।

রাশিয়া যে সব চন্দ্রযান চাঁদের দিকে পাঠান তাদের একটা সিরিজের নাম সোয়ুজ (Soyuz). সোয়ুজ-১১ চাঁদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে এনেছে। এর অভিযাত্রী ছিলেন তিনজন—ভিক্টর প্যাট্সায়েভ, গেয়র্গি ডবরোভল্স্কি ও ভ্লাডিস্লাভ ভল্কভ।

॥ চাঁদে পঞ্চম অভিযান ॥

চাঁদে পঞ্চম অভিযান হয় এপ্রিল, ১৯৭২। সেটি ছিল অ্যাপোলো-১৬র অভিযান। এ অভিযানটিও চালিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবারেও তিনজন মহাকাশযাত্রী এতে অংশ নিয়েছিলেন। এবারকার অধিনায়ক ছিলেন ৩৫ বছর বয়সের জন্ ইয়ং এবং তাঁর সঙ্গী ছিলেন চার্লস্ ডিউক ও টমাস্ ম্যাটিংলি। ম্যাটিংলির ওপর ভার ছিল মূল মহাকাশযানটিকে চাঁদের চারদিকে ঘোরানো, ইয়ং আর ডিউক ভেলায় চড়ে নেমে গিয়েছিলেন চাঁদের মাটিতে।

এবারকার অভিযান হয়েছিল আরও দীর্ঘস্থায়ী। সবসুদ্ধ ৭২ ঘণ্টা তাঁরা চাঁদের বুকে কাটিয়ে এসেছেন। এর মধ্যে চাঁদের খোলা আলোর নীচে এক-নাগাড়ে ৭ ঘণ্টা ১২ মিনিট কাটানো একটা নতুন রেকর্ড। এবারে ওঁরা যে জায়গাটা নামবার জন্য বেছে নিয়েছিলেন তার নাম দেকার্ত (Descartes) অঞ্চল। অবশ্য যান্ত্রিক গোলমালে নামতে প্রায় ৬ ঘণ্টা
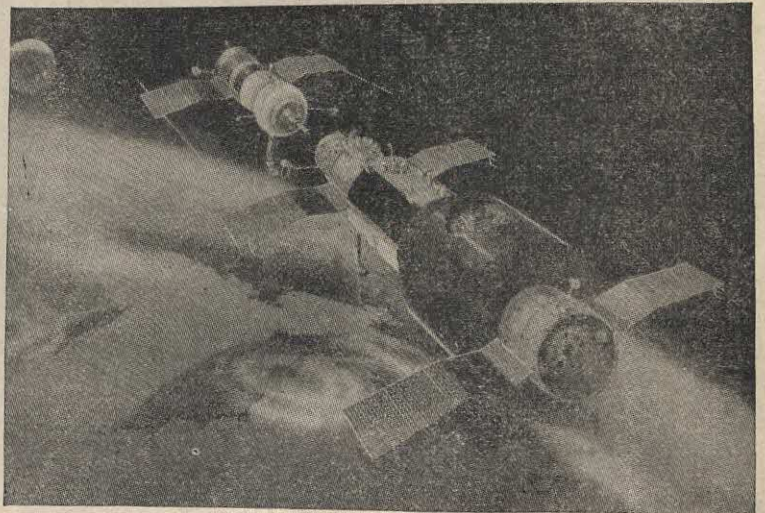
সোয়ুজ-১১

সোয়ুজ-১১র মহাকাশযাত্রী ভিক্টর প্যাটসায়েভ, গেয়র্গি ডবরোভল্‌স্কি ও ভ্লাডিস্লাভ ভল্‌কভ

ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস-সেন্টারে জন ইয়ং, চার্লস ডিউক ও জন ম্যাটিংলি অ্যাপোলো-১৬ চন্দ্রযানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন

দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং ওঁরা নেমেও ছিলেন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আন্দাজ ২০০ মিটার দূরে। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি। সঙ্গে জীপ গাড়ি ছিল, যাতায়াতের জন্য এবার সেটাই ব্যবহার করা হয়েছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে হেঁটেও ওঁদের কতক কতক পথ যেতে হয়েছিল, লাফ দিয়ে খানা, গর্ত পার হতেও হয়েছিল। কিন্তু সে কাজ তাঁরা ভালভাবেই করতে পেরেছিলেন।

দেকার্তের চারদিকে ছোটবড় হাজার হাজার জ্বালামুখ ছড়ানো। ইতস্ততঃ পাথরও কম ছিল না। ওঁরা সে পাথরের নমুনাও কম সংগ্রহ করেন নি—নমুনাগুলির ওজন সবসুদ্ধ প্রায় তিন মন। এও একটা রেকর্ড। এবারকার অভিযানে মহাকাশচারীরা চাঁদের ওপর আরও কয়েকটি যন্ত্রপাতি বসিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আলট্রা-ভায়োলেট বা অতিবেগনী রশ্মিতে ফটো তুলতে পারে এমন একটি ক্যামেরা আর তার সঙ্গে বর্ণালীবীক্ষণ (Spectroscope) যন্ত্র
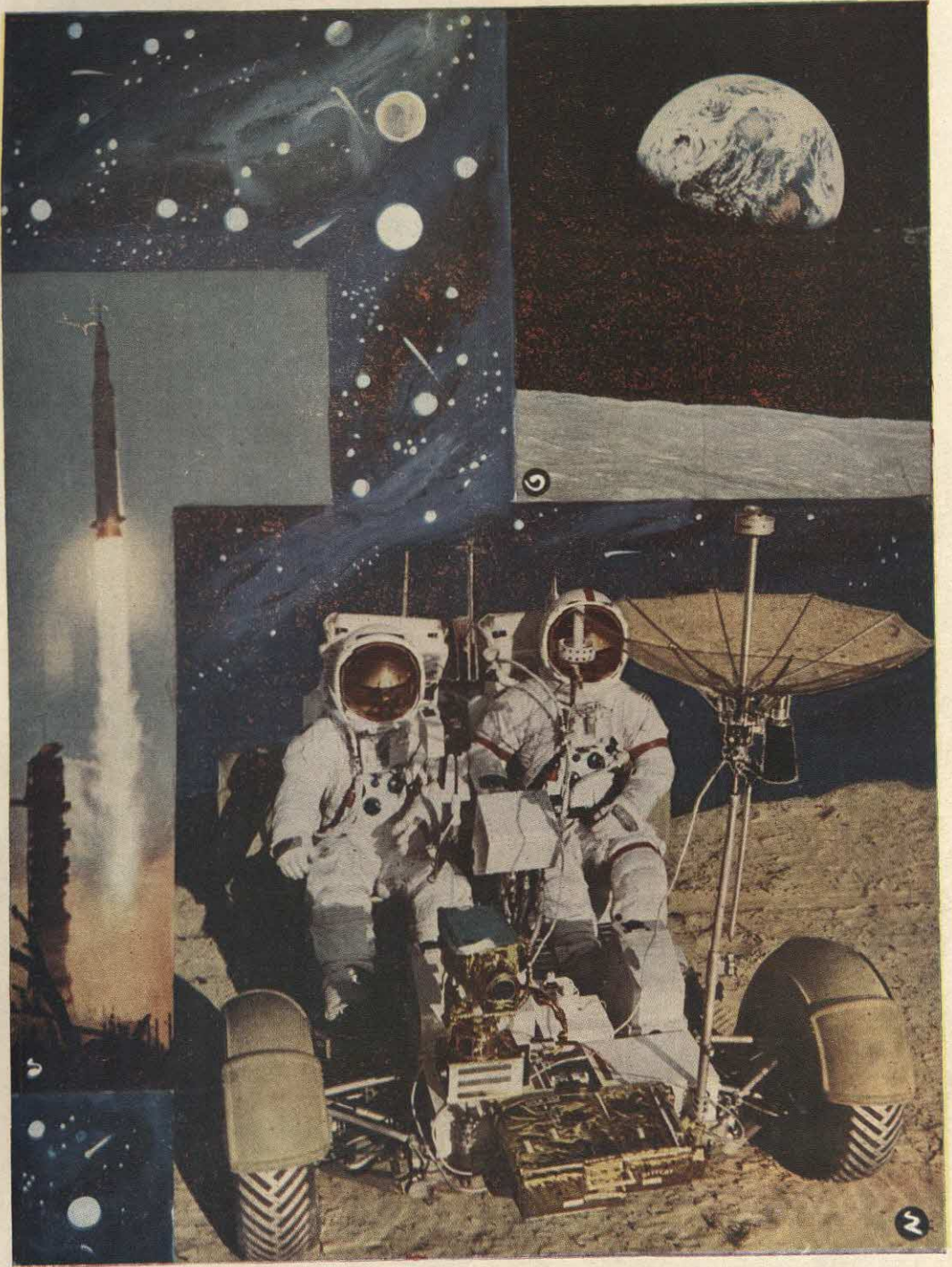
(১) রকেট চাঁদের দিকে
ছুটে চলেছে।

(২) চাঁদের দেশে মানুষ।
(৩) চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে।

মহাকাশ অভিযানঃ

[(১) রকেট চাঁদের দিকে ছুটে চলেছে। (২) চাঁদের দেশে মানুষ। (৩) চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে।]

(১) দু লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার মাইল দূরে থেকে চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। ২১৬০ মাইল চওড়া চাঁদের রাজ্যে মানুষ যাবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা চাঁদের দিকে রকেট ছুঁড়েছেন। এই রকেটে মানুষ আছে। সেই মানুষ চাঁদের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছবে।

(২) ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দু জন মহাকাশ-যাত্রী মহাকাশযানে চাঁদের রাজ্যে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের মহাকাশযানে যে গাড়ি ছিল তাঁরা সেই গাড়ি চড়ে চাঁদের পিঠে বেড়াচ্ছেন।

তাঁরা এই গাড়িতে চড়ে চাঁদের রাজ্যে ঘুরে বেড়ান। পরে মহাকাশযানে করে নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

(৩) আমাদের পৃথিবী চাঁদের মতোই মহাশূন্যে ভাসছে। আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদকে দেখতে পাই। মহাশূন্যে পৃথিবীকে কেমন দেখায় এত দিন তা আমরা দেখি নি। এই ছবিতে চাঁদের পিঠ থেকে পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে—অনেকটা চাঁদের মতোই।

বসিয়ে আসা। বিজ্ঞানীরা এ থেকে মহাকাশের হালচাল সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন বলে আশা করেন। একটি মূল্যবান্ যন্ত্র অবশ্য বসাবার পর শেষ মুহূর্তে পায়ের ঠোক্কর লেগে নষ্ট হয়ে গেছে।

আর একটি মস্ত কাজ করেছেন মহাকাশচারীরা। যাবার সময় তাঁরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আট রকমের জীবাণু। তার মধ্যে ভাইরাস্ জাতীয় অতি ক্ষুদ্র জীবাণুও ছিল। জীবাণুর সংখ্যা ছিল মোট কয়েক কোটি। চাঁদের রাজ্য ঘুরে এসে ফেরবার মুখে ম্যাটিংলি আবার মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এসে ওদের কতকগুলিকে একেবারে খোলা অবস্থায় মিনিট দশেকের জন্য উন্মুক্ত মহাকাশে রেখে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, মহাকাশের ব্যোমরশ্মি বা কস্‌মিক রে ওদের ওপর যাতে বিনা বাধায় ঝরে পড়তে পারে। জীবাণু ছাড়াও কিছু ফলের বীচি, বীজশুঁটি, গাছের ভ্রূণ আর চিংড়ির ডিম মহাকাশ-চারীরা চাঁদে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। চাঁদের আবহাওয়ায় ওদের কোন পরিবর্তন হয় কিনা, তা দেখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। আর যে সব পাথর নিয়ে এসেছেন সে সব নিয়ে পরীক্ষা করে চাঁদের দেহের উপাদান সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যাচ্ছে। এবারেও অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, অনেক নতুন দৃশ্যের ছবি তুলে টেলিভিশনে তা দেখানো হয়েছে।

॥ শেষ অভিযান ঃ অ্যাপোলো-১৭ ॥

তারপর ১৯৭২-এর ডিসেম্বর মাসে চাঁদে গেল অ্যাপোলো-১৭। তাতে গেলেন কারনান, স্মিট আর ইভান্স। স্মিট একজন প্রসিদ্ধ ভূবিজ্ঞানী। তিনিই প্রথম আর একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি চাঁদে নেমেছেন। তাঁর সঙ্গে নেমেছিলেন কারনান। এবারকার অভিযান শেষ হলে আমেরিকা ঘোষণা করেছে যে আপাততঃ আর চাঁদে যাওয়া হবে না। এক্স্‌প্লোরার-১৭-ই তাহলে চাঁদে যাবার শেষ মহাকাশযান।
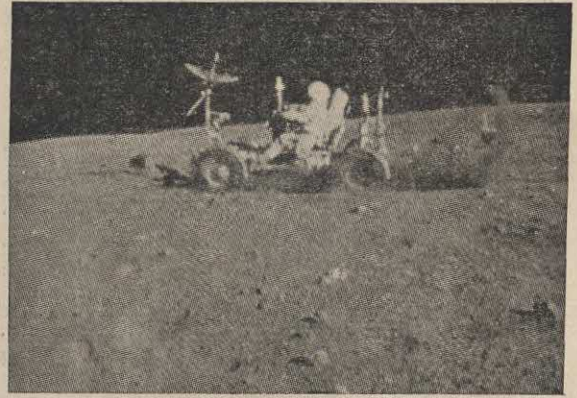
অ্যাপোলো-১৬র কম্যাণ্ডার জন ইয়ং চাঁদের উপর চাঁদের গাড়ি চালাচ্ছেন—পিছনে চাঁদের ধুলো উড়তে দেখা যাচ্ছে

॥ চাঁদ সম্বন্ধে নতুন কথা ॥

চাঁদের এই সব অভিযানে পাওয়া তথ্য এবং সেখান থেকে সংগৃহীত মাটি ও পাথর পরীক্ষা করে এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছেন। আগেকার দিনে ধারণা ছিল যে পৃথিবীরই খানিকটা অংশ ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে চাঁদের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে চাঁদ পৃথিবী থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ায় যে অতিকায় গর্ত তৈরী হয়েছিল সেইটেই এখন প্রশান্ত মহাসাগর। কিন্তু এসব ধারণা এখন উলটে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, চাঁদ তো পৃথিবীর চেয়ে বয়সে ছোট নয়ই, বরং সমবয়সী বা বয়সে কিছু বড়ও হতে পারে। কেউ কেউ বলছেন, চাঁদের বয়স এখন ৪৬৬ কোটি বছর, আর পৃথিবীর বয়স ৪৫০ কোটি বছর। তবে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর বয়স ৫০০ কোটি বছর অর্থাৎ চাঁদ পৃথিবীর চাইতে বয়সে ১৬ কোটি বছরের বড়। কারো কারো মতে চাঁদ আর পৃথিবী একই সময়ে একই উৎস থেকে তৈরী। আবার অন্যদের মত চাঁদ বোধ হয় আগে মহাকাশের অন্য কোথাও ছিল, পৃথিবী চলার পথে তাকে টেনে এনে নিজের উপগ্রহ তৈরি করে নিয়েছে। পৃথিবী আকারে অনেক বড় বলে তার

আকর্ষণী শক্তিও চাঁদের তুলনায় অনেক বেশী, আর তাইতেই এরকম ব্যাপার ঘটা কিছু বিচিত্র নয়।

মহাকাশ অভিযানে সারা বিশ্বের কাছে ১৬ই জুলাই ১৯৭৫ তারিখটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এই দিন শুরু হল আমেরিকা ও সোভিয়েটের এক ঐতিহাসিক এবং যৌথ মহাকাশ অভিযান।

সোভিয়েট থেকে ভারতীয় সময় বেলা ৫টা ৫০ মিনিটে মস্কোর ২২৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বৈকুনোর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল সোভিয়েট মহাকাশযান সোয়ুজ-১৯। এই যানে আছেন কমানডার আলেকসি লিওনোভ এবং ইনজিনিয়ার ভালেরি কুরাশেভ।

অন্যদিকে কেপ কানাভেরাল থেকে ভারতীয় সময় রাত্রি ১টা ২০ মিনিটে তিনজন মার্কিন মহাকাশচারীকে নিয়ে মহাকাশযান অ্যাপোলো যাত্রা করল। তিনজন মহাকাশচারী হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টমাস স্ট্যাফোরড, ভ্যানস ব্রানড ও ডোনালড স্লেটন।

১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৩৯ মিনিটে সোয়ুজ-১৯ এবং অ্যাপোলো মহাকাশযান দুটির মিলন ঘটে। এই মিলন হয় ভূপৃষ্ঠ থেকে ২২৪ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে পর্তুগালের অদূরে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর।

কমানডার আলেকসি লিওনোভ এবং ইনজিনিয়ার ভালেরি কুরাশেভ

॥ গ্রহান্তরে অভিযান ॥

কিন্তু কেবল চাঁদে গিয়েই কি মানুষের মহাকাশ-যাত্রা শেষ হবে? নিশ্চয়ই নয়। বিজ্ঞানীরা অন্যান্য গ্রহে যাবার জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তবে এখন পর্যন্ত সে সম্পর্কে যে সব তথ্যাদি পাওয়া গেছে তাতে এখনই মানুষের সেদিকে সশরীরে রওনা হবার মতো অবস্থা আসে নি। তবে সশরীরে অভিযান চালাতে না পারলেও গ্রহান্তরে রকেট পাঠিয়ে অভিযান ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

১৯৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা শুক্রের দিকে একটি রকেট পাঠিয়েছিলেন। সেটির নাম দেওয়া হয়েছিল মেরিনার-২। নানা রকম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ঐ রকেটের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সে রকেট ফিরে না এলেও, ওখান থেকেই রকমারী বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে তা পৃথিবীতে পাঠাতে পারে।

মেরিনার-২ শুক্রগ্রহের খুব কাছ ঘেঁষে—মাত্র সাড়ে একুশ হাজার মাইল দূর দিয়ে চলে যায়। তার ফলে শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে এমন সব নতুন নতুন খবর পাওয়া গেছে যা পৃথিবীতে বসে দূরবীন কষে বা ফটো তুলে বা অন্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাওয়া সম্ভব ছিল না। যেমন, আমরা জানি, পৃথিবীর চারদিকে একটা চুম্বকের ক্ষেত্র আছে, শুক্রে কিন্তু তা নেই। শুক্রের দিবারাত্রির তাপ, দু'পিঠের উত্তাপ এ সব সম্বন্ধেও নতুন তথ্য জানা গেছে।

কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। ২২শে জুলাই ১৯৭২ তারিখে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এদিক দিয়ে আরও এগিয়ে গিয়েছেন। ঐদিন তাঁরা তাঁদের একটি রকেটকে আলতো ভাবে শুক্রের বুকেই নামিয়ে দিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রেও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে সে রকেট আরও নতুন নতুন তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। শুক্রের বাইরের দিকটা ঠিক পৃথিবীর মতো নয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাইতে অনেক ঘন এবং অনেক পুরু একটা গ্যাসের আবরণ দিয়ে শুক্রের দেহটি ঢাকা। ঐ আবরণের নীচে শুক্রের আসল চেহারাটা কি রকম সে সম্বন্ধে এখনও নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন, শুক্রের জমি শক্ত মরুভূমির মতো, কেউ বলেন, না, শুক্রের গা এখনও তরল রয়েছে, জমাট বাঁধে নি, ইত্যাদি। শুক্রে পাঠানো রকেটগুলো শীগ্‌গিরই হয়তো একদিন এসব বিতর্কের অবসান ঘটাবে এবং তখন বোঝা যাবে মানুষ কোনদিন সশরীরে শুক্রে গিয়ে নামতে পারবে কিনা। শুক্রে রকেট অভিযান এখনও থেকে থেকে চলছে।

পৃথিবীর আর একটি প্রতিবেশী গ্রহ হচ্ছে মঙ্গল। আকাশ-পথে ঘুরতে ঘুরতে মঙ্গল মাঝে মাঝে পৃথিবীর সাড়ে তিন কোটি মাইলের মধ্যে বেশ কিছুটা কাছে এসে পড়ে। আর সেই সময়টাই মঙ্গল সম্বন্ধে পাঁতি পাঁতি করে খোঁজ নেবার উপযুক্ত সময়। রাশিয়া এবং আমেরিকা দু'দেশই এ নিয়ে খুব তোড়জোড় করছে, কারণ চাঁদের পর প্রথম গ্রহান্তরে যেতে হলে মঙ্গলই হবে সেই গন্তব্যস্থান।

সোভিয়েট রাশিয়া একে একে পাঁচটি রকেটকে
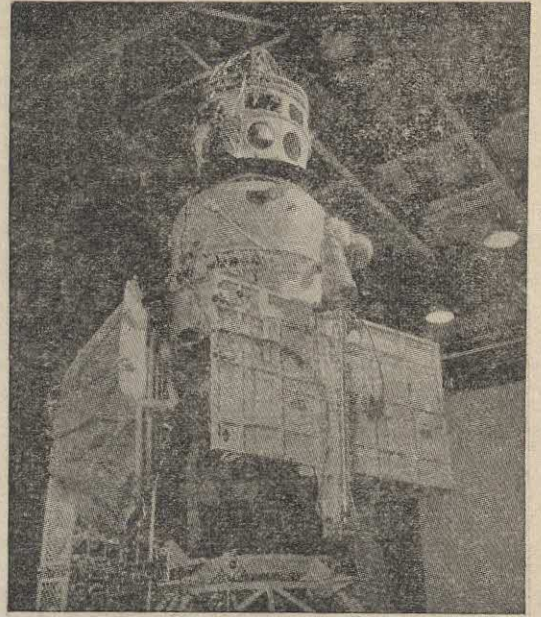
১৯৬৭ সালের ১৮ই অক্টোবর সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহে এই যানটি নামিয়ে অনেক তথ্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করেন

মঙ্গলগ্রহের দিকে পাঠিয়েছে। শেষেরটির নাম ছিল মার্স-৫। সেটি গিয়ে মঙ্গলগ্রহের বুকে নেমেছিল। তাতে অবশ্য কোনও মানুষ ছিল না।

॥ নক্ষত্রলোকের দিকে ॥

১৯৭২ সালের ৩রা মার্চ আমেরিকার বিজ্ঞানীরা গ্রহান্তর অভিযানে আর এক ধাপ এগিয়ে এসেছেন। ঐদিন আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে পাইওনীয়ার-১০ নামে একখানা মহাকাশযান সেকেণ্ডে ১০ মাইল গতিবেগ নিয়ে ছুটে বেরিয়েছিল। প্রথম দিনেই সে চাঁদের রাজ্য পার হয়ে গেল। এই প্রচণ্ড বেগে যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রহরাজ বৃহস্পতি সম্বন্ধে হাতেকলমে নানা তথ্য সংগ্রহ করা। অবশ্য বৃহস্পতিতে গিয়েই সেটা থামবে না—ক্রমাগত ছুটতে ছুটতে সৌরজগতের বাইরেও যাতে সেটা চলে যেতে পারে এই ভাবেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিরাশিদিন বাদে সে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ পার হয়ে গেল। তার পরে যে জায়গা, সেখানে অনেক
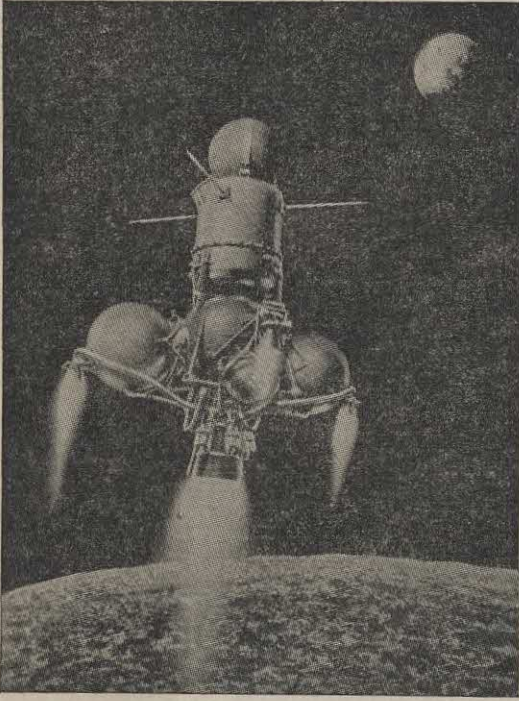
রাশিয়ার স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ-রকেট পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে চলেছে

কোটি কিলোমিটারের মধ্যে কোনও গ্রহ নেই, আছে শুধু গ্রহ-কণিকার ঝাঁক। তাদের মাঝখান দিয়ে ঘণ্টায় ৩৩৮০০ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে চলল পাইওনীয়ার-১০। এই বেগও বাড়তে লাগল। ছ'মাসে সে গ্রহকণিকাদের রাজ্য পেরিয়ে এসে পৌঁছল সৌরজগতের বাহির মহলে। এখানে প্রথমেই আছে বৃহস্পতি।

পাইওনীয়ার-১০ ছুটে চলল তার দিকে—সে আরও ন'মাসের পথ। খানিকটা এগোতেই বৃহস্পতি তাকে প্রবল ভাবে টানতে লাগল। ক্রমে তার বেগ বাড়তে বাড়তে হয়ে দাঁড়াল ঘণ্টায় ১,৩২,০০০ কিলোমিটারে।

এই সাংঘাতিক বেগে সে এসে পড়ল বৃহস্পতির কাছাকাছি কিন্তু তার তো সেখানে নামবার কথা নয়। সে খানিক দূরে থেকে বৃহস্পতির চারদিকে এক পাক ঘুরে তাকে দেখে নিল।

তারপর এগিয়ে গেল আরও দূর মহাকাশের পথে। এখনও পাইওনীয়ার-১০ ছুটেই চলেছে।

পাইওনীয়ার-১০-এও মানুষ নেই। কিন্তু তার সব যন্ত্র থেকে নানা রকম নতুন খবর বেতারে পৃথিবীতে পৌঁছে দিয়ে চলেছে সে। অনেক ফটো তুলেও পাঠিয়েছে সেই যন্ত্রগুলি।

কিন্তু সে যখন বৃহস্পতি আর শনির রাজ্য ছাড়িয়ে ইউরেনাসের কক্ষপথে প্রবেশ করবে, তখন সেই ৩২০ কোটি কিলোমিটার দূর থেকে তার পাঠানো বেতার সংকেত পৃথিবীতে পৌঁছবে।

তবু সে থামবে না। পৃথিবী তার খবর পাবে না বটে কিন্তু ১৫ বছর পরে সে প্লুটোকে ছাড়িয়ে সৌর-জগতের বাইরে গিয়ে পৌঁছবে। তখন তার লক্ষ্য হবে বৃষরাশি (Taurus). হয়তো পাইওনীয়ার-১০ একদিন সেখানে পৌঁছবে—তাতে তার লাগবে ৮৮ লক্ষ বছর। পৃথিবীতে তখন মানুষ জাতি থাকবে কি?

পৃথিবীর নিকটতম দুটি নক্ষত্র আলফা-সেন্টরাই ও প্রক্সিমা-সেন্টরাই। পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব প্রায় ৪·৩৩ আলোক-বর্ষ অর্থাৎ আলোর যা গতিবেগ সেই বেগে (প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,২৮৪ মাইল) ছুটতে পারলে সেখানে পৌঁছতে ঐ সময়টা লাগে। পাইওনীয়ার-১০এর গতিবেগ সে তুলনায় কিছুই নয়। সুতরাং তার পক্ষে যদি নিকটতম নক্ষত্রে পৌঁছানো সম্ভবও হয় তাহলেও তার জন্যে তাকে ছুটতে হবে ক্রমাগত ৮০,৫৩,৮০০ বছর ধরে। কিন্তু তখন পৃথিবীর অবস্থা কেমন থাকবে? মানুষ তো পৃথিবীতে এসেছে বড় জোর পাঁচ লক্ষ বছর আগে। আজ থেকে সাড়ে আশি লক্ষ বছর পরেও কি সে থাকবে? যদি থাকেও তবে সে মানুষ নিশ্চয়ই আমাদের মতো হবে না—হবে আমাদেরই কোন নতুন প্রজাতি; কিংবা, কে জানে, হয়তো সম্পূর্ণ নতুন কোন জীব।

॥ ভারতে ও অন্যান্য দেশে মহাকাশ-গবেষণা ॥

আর বেশী কিছু না করলেও পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশ মহাকাশে স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ পাঠিয়েছে। যেমন—চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া,

ইটালী, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড। এবার এই দলে যোগ দিল আমাদের দেশ—ভারতবর্ষ। শনিবার, ১৯শে মার্চ ১৯৭৫ তারিখে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রথম স্যাটেলাইটকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—রাশিয়াতে গিয়ে, রাশিয়ার বিজ্ঞানী আর রাশিয়ার দেওয়া রকেটের সাহায্যে। এখন আমাদের সেরকম রকেট নেই, কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যেই তা হয়ে যাবে।

এই ভারতীয় উপগ্রহটির নাম 'আর্যভট'। এর ওজন ৩৬০ কিলোগ্রাম—কোনও দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ এত বড় ছিল না। (অবশ্য, আমেরিকার ১৯৭৪ সনে পাঠানো স্কাইল্যাব (Skylab) উপগ্রহটি বিরাট, একটি চারকামরা বাড়ির সমান)।

আর্যভট পৃথিবী থেকে মোটামুটি ৬২৩ কিলোমিটার উঁচুতে উঠে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে ৯৬ মিনিটে একবার। এইভাবে সে হয় তো আড়াই বছর চলবে।

এর নামটি দেওয়া হয়েছে প্রাচীন ভারতের

আর্যভট

একজন অসাধারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদের নামে। দেড়হাজার বছর আগে তিনিই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বলেন যে পৃথিবী পাক খেতে খেতে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। বীজগণিত আর ত্রিকোণমিতিও নাকি তাঁরই আবিষ্কার। অঙ্ক লিখতে শূন্য চিহ্নের ব্যবহার তিনিই প্রবর্তন করেন। কী মাথা, ভাবলে অবাক্ হতে হয়।
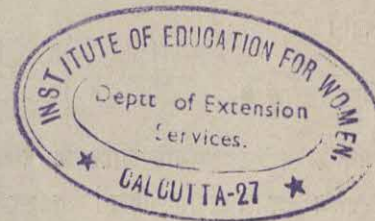
আবহবিজ্ঞান

॥ অন্য এক সাগর ॥

আমাদের মাথার উপরদিকে কত জায়গা, তাকে বলা হয় আকাশ (sky). এর নীচের অংশটাকে বলে বায়ুমণ্ডল (atmosphere), তার উপরে হল মহাকাশ (space). যে আকাশে পাখি ওড়ে, মেঘ করে, সেটা হল বায়ুমণ্ডল। আর যে আকাশে চন্দ্র-সূর্য-তারা দেখতে পাই, সেই আকাশটা মহাকাশ। সেটা পৃথিবীর বাইরে।

পৃথিবীর সব ডাঙা আর সব জলকে ঘিরে হাওয়ার এক মহাসাগর আছে, তার একেবারে নীচে আমরা বাস করি। সেই হাওয়ার মহাসাগর জলের মহাসাগরের গভীরতম জায়গার চাইতেও ত্রিশ-চল্লিশ গুণ বেশী গভীর। তারই নাম হচ্ছে আবহ বা বায়ুমণ্ডল (atmosphere). এটা পৃথিবীরই অংশ, পৃথিবী ছাড়া কিছু নয়। শিলামণ্ডল, বারিমণ্ডল আর বায়ুমণ্ডল নিয়েই এই পৃথিবী।

॥ বাতাসে কি আছে ॥

পৃথিবীটা যখন ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধে তখন তা থেকে অনেক রকম গ্যাস বেরিয়েছিল। সেগুলো হালকা বলে উপরে উঠে গেল, কিন্তু পৃথিবীর টানের ফলে পৃথিবী ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারল না। তাই সেগুলো জল ও ডাঙাকে ঘিরে রইল। এই গ্যাসগুলোকে একসঙ্গে বলা হয় বায়ু বা বাতাস (air).

বাতাস তাহলে একটা জিনিস নয়, কয়েকটা গ্যাসের মিশেল বা মিশ্রণ। তার মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাসই বেশী পরিমাণে আছে, শতকরা ৭৮ ভাগ। তারপর অক্‌সিজেন, এর পরিমাণ ২১ ভাগ। ১০০-র ভিতর ৯৯ ভাগই তো এই দুটো গ্যাসে চলে গেল। বাকী যে ১ ভাগ, তাতে কার্বন ডাই-অক্‌সাইড, হিলিয়াম, আর্গন, নিওন, ক্রিপটন, জেনন প্রভৃতি

অন্য দু'চারটা গ্যাস থাকে। আর থাকে খানিক জলীয় বাষ্প। এ হল পরিষ্কার হাওয়ার কথা। শহরের, কারখানার আর অন্য যে সব জায়গার হাওয়া দূষিত, তাতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন কম, ধুলো-ধোঁয়া আর খারাপ গ্যাসের ভাগ বেশী।

॥ বাতাসের রং ॥

বাতাসের কোনও রং নেই। কিন্তু সূর্যের আলোয় যে নীল রং আছে, সেটা বাতাসের কণায় ঠিকরে আসে। অল্প খানিকটা বাতাস দেখলে বুঝতে পারা যায় না তার কি রং। কিন্তু দূরের পাহাড় কিংবা আরও দূরের আকাশের দিকে চাইলে মাঝখানে অনেকটা বাতাস একসঙ্গে দেখা যায়। তখন পাহাড়টা বা আকাশটাকে নীল দেখায়। আসলে কিন্তু বায়ুমণ্ডলটাকেই নীল দেখা যায়, আমরা তা বুঝতে পারি না।

॥ বাতাসের শেষ কোথায় ॥

সমুদ্রের ধারে আর উপরেই বাতাস সব চাইতে ঘন। সেখান থেকে যতই উপরে উঠবে, বাতাস ততই পাতলা হয়ে যাবে। এমনি ভাবে শেষে পৃথিবী থেকে ৬০ মাইল উঁচুতে দেখা যাবে যে, সমুদ্রের উপর যতটুকু জায়গায় ১০ লক্ষ বাতাসের কণা গাদাগাদি করে থাকে এখানে ততটা জায়গায় রয়েছে মোটে ১টি বাতাসের কণা।

আরও কমতে কমতে শেষটায় ৩০০-৩৫০ মাইল উঁচুতে বাতাস নেই বললেই চলে। তবে, তখনও একেবারে ফুরিয়ে যায় না। হাজার মাইল উপরেও এক-আধটা বাতাসের কণা দেখা যায়, তাই, বায়ুমণ্ডলের শেষ আর মহাকাশের শুরু যে কোথায় হয়েছে, তা ঠিকঠিক বলা যায় না। মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় যে মহাকাশ শুরু হয়েছে আমাদের মাথা থেকে ৩০০-৩৫০ মাইল উপরে।

সব জায়গাতেই বায়ুমণ্ডল যে এতটা পুরু বা গভীর তা নয়। পৃথিবী ঘোরে বলে তার মাঝখানটাতে, মানে, নিরক্ষরেখায়, বায়ুমণ্ডল ছিটকে ফুলে ওঠে, তাই দুই মেরু থেকে বাতাস সেখানটায় সরে আসে।
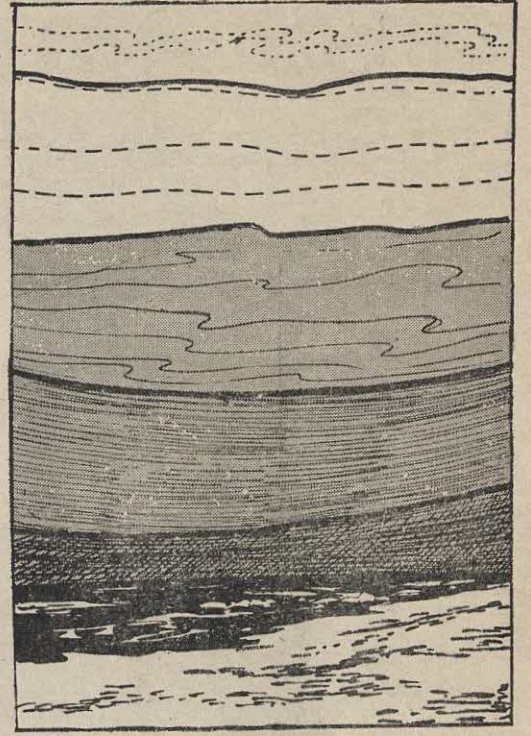
আমাদের মাথার উপর থেকে ৩০০-৩৫০ মাইল পর্যন্ত বাতাস আছে। যত উপরে ওঠা যায় বাতাস তত পাতলা হয়

সেজন্য নিরক্ষরেখার উপর বায়ুমণ্ডল বেশী পুরু, দুই মেরুর উপর বায়ুমণ্ডলের গভীরতা কম।

॥ বাতাসের চাপ ॥

বাতাসের ওজন অবশ্য খুবই কম। তবু কম হলেও তার একটা ওজন আছে, আর সেই জন্যেই তার চাপও আছে। সমুদ্রের কাছে বাতাস যে সব চাইতে ঘন, তারও ওজন হচ্ছে জলের ওজনের ৮০০ ভাগের ১ ভাগ। তবু, ৩০০ মাইল উঁচু বাতাসের সবটা মিলিয়ে ভার কম নয়। ১ বর্গ ইঞ্চি (মানে, ১ ইঞ্চি লম্বা ১ ইঞ্চি চওড়া) জায়গার উপর তার চাপ পড়ে ১৪'৭ পাউণ্ড—প্রায় ৬¾ কিলোগ্রাম। সেই হিসেবে একজন মানুষের শরীরের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ পড়ে প্রায় ৩০,০০০ পাউণ্ড বা ১৩৬২০ কি. গ্রা.—চার-পাঁচটা হাতির ওজনের সমান।
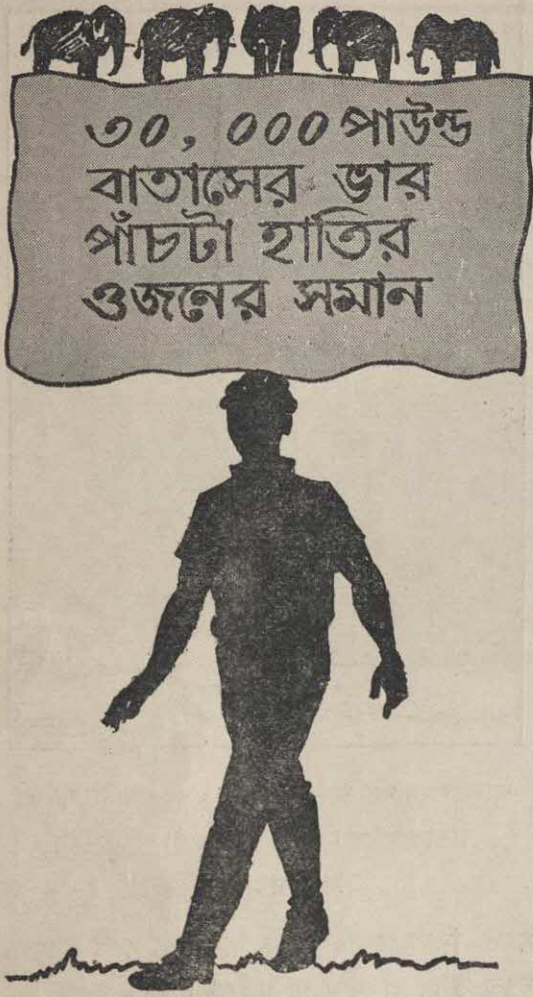
দেহের উপরে এই ভার আমাদের বহন করতে হয়

বাতাসের মধ্যে যত ওপরে যাওয়া যাবে, বাতাসের চাপ ততই কমবে।

নীচু জায়গায় হাওয়ার যে এত চাপ, তাতে তো আমাদের পিষে যাবার কথা, অথচ আমরা সে চাপটা টেরও পাই না।

আমাদের শরীরের ভিতর থেকে একটা চাপ বাইরের দিকে আসে। বাইরের হাওয়ার চাপের সঙ্গে সেটা সমান থাকে বলে আমরা দুটো চাপের কোনওটাই টের পাই না।

যেমন, উপরে উঠে গেলে বাইরের (হাওয়ার) চাপ কমে যায়, শরীরের ভিতরের আর বাইরের চাপের তফাত হয়। দু'মাইলের বেশী উপরে উঠলে সে তফাতটা বেশ বোঝা যায়—মাথাটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগতে থাকে। ৩½ মাইল উপরে উঠলে এই চাপের ফলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাই বেশী উঁচুতে উঠতে হলে বিশেষ এক ধরনের পোশাক পরতে হয়। আবার, যে এরোপ্লেন বেশী উঁচু আকাশ দিয়ে চলে, তাতে যাত্রীদের ঘরে বেশী করে হাওয়া পুরে সেখানকার চাপটা একভারে রাখা হয়। এরকম ঘরকে বলে 'প্রেশারাইজড্' (pressurized) ক্যাবিন।

ইভ্যানজেলিস্টা টরিচেলি (Evangelista Torricelli, ১৬০৮-১৬৪৭ খ্রীঃ) নামে একজন বিজ্ঞানী প্রথম হাওয়ার চাপ মাপেন। তারপর, তাঁর পরীক্ষাকে কাজে লাগিয়ে বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপবার জন্যে যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। তাকে বলে বায়ু-চাপমান যন্ত্র বা ব্যারোমিটার। তার কথা পরে বলব।
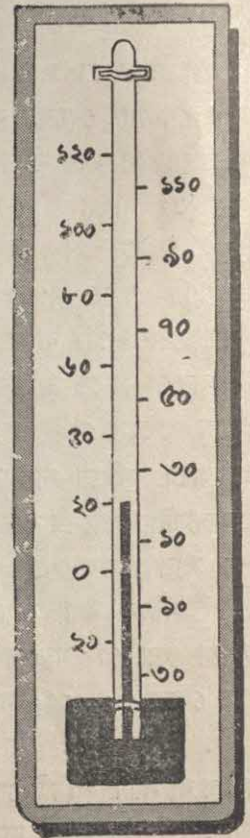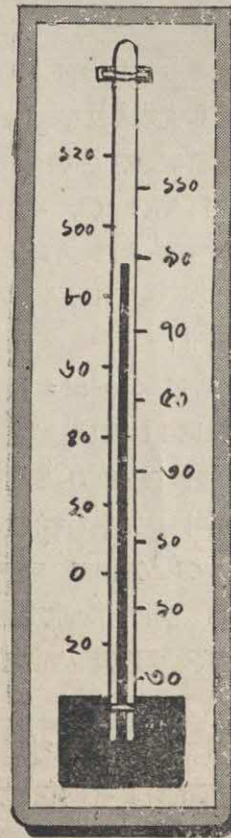
গতি মাপবার ব্যারোমিটার সাধারণ ব্যারোমিটার

॥ বায়ুমণ্ডলের নানা স্তর ॥

বায়ুমণ্ডলকে বিজ্ঞানীরা কয়েকটা স্তরে ভাগ করে প্রত্যেক স্তরের একটা করে নাম দিয়েছেন। সব চাইতে নীচেকার স্তরটার নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রপোস্ফীয়ার' (troposphere) বা ঘনমণ্ডল। নিরক্ষ-রেখার উপর ঘনমণ্ডলটা সমুদ্র থেকে ১০ মাইল উঁচু পর্যন্ত গিয়েছে। কিন্তু দুই মেরুর কাছে বায়ুমণ্ডল একটু চাপা বলে ঘনমণ্ডলও অনেকটা কম পুরু—ছ' মাইল, কি সাড়ে ছ' মাইল। মেঘ, বৃষ্টি, সবই হয় এই ঘনমণ্ডলের মধ্যে। এর উপরদিক্‌কার শেষ মাথাটাকে বলে 'ট্রপোপজ' (tropopause). উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে ট্রপোপজ হচ্ছে মোটে ২৮,০০০ ফুট উপরে, কিন্তু নিরক্ষরেখায় ট্রপোপজ ৫৪,০০০ ফুট উপরে।

এর উপরে ১০ থেকে ১৬ মাইল পর্যন্ত অংশের
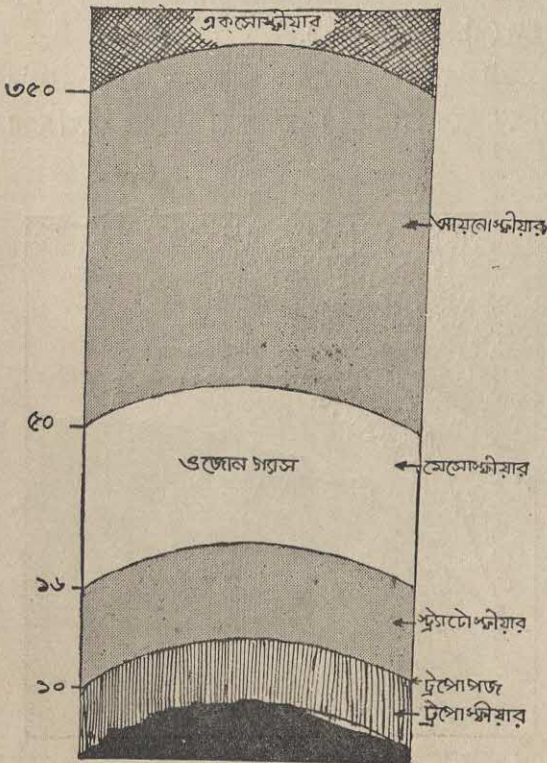
বায়ুমণ্ডলের নানা স্তর
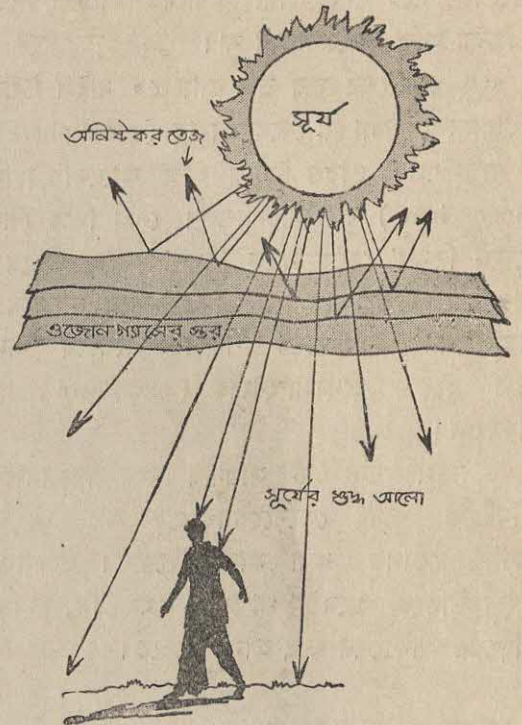
অনিষ্টকর সব তেজ সূর্য থেকে বেরিয়ে ওজোন গ্যাসের স্তর ভেদ করতে না পেরে ফিরে যাচ্ছে

নাম স্ট্র্যাটোস্ফীয়ার (stratosphere) বা সূক্ষ্মমণ্ডল। এত উঁচুতে মেঘ নেই, ঝড়-বৃষ্টিও নেই। তাই এই স্ট্র্যাটোস্ফীয়ার ধরে এরোপ্লেন চালাতে খুব সুবিধে। ভবিষ্যতে হয়তো সব এরোপ্লেনই এমনভাবে তৈরী হবে যাতে তারা এই সূক্ষ্মমণ্ডলে উঠে গিয়ে সেখান দিয়ে চলাচল করতে পারে।

সূক্ষ্মমণ্ডল ছাড়ালেই, মানে ১৬ মাইলের উপরে উঠলেই দেখা যায় যে সেখানে ওজোন (ozone) গ্যাসের একটা স্তর রয়েছে। ওজোন হচ্ছে এক রকমের অক্‌সিজেন—বিজ্ঞানের ভাষায় বলে অ্যালো-ট্রপিক ফর্ম। অক্‌সিজেনে থাকে দুটো পরমাণু, কিন্তু ওজোনে থাকে তিনটি—এই যা তফাত। এর একটা ক্ষমতা আছে, যা অক্‌সিজেনের নেই। সূর্য থেকে নানারকম তেজ বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তার মধ্যে অনেকগুলো আমাদের শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। এই ওজোনের স্তরে এসে তারা বাধা পায়, পৃথিবীতে

পৌঁছতে পারে না। তারা আমাদের কাছে পৌঁছে শরীরের ক্ষতি করতে পারে না।

এই ওজোনের স্তর সুদ্ধ প্রায় ৫০ মাইল উপর পর্যন্ত অংশকে বলা হয় মেসোস্ফীয়ার (mesosphere) বা অন্তর্মণ্ডল। তারও উপরে হচ্ছে আয়নোস্ফীয়ার (ionosphere) বা আয়নমণ্ডল। সেটা গিয়ে শেষ হয়েছে তিনশ' থেকে সাড়ে তিনশ' মাইল উপরে। তার উপরে হাওয়া যা আছে তা একেবারে নামমাত্র। বায়ুমণ্ডলের এই সবচেয়ে উপরকার অংশটার নাম রাখা হয়েছে এক্সোস্ফীয়ার (exosphere) বা বহির্মণ্ডল।

এত সব উঁচু উঁচু জায়গার খবর বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে বসেই জেনেছেন। শুধু অঙ্ক কষেই কোনও কোনও কথা জানা গিয়েছে। তারপর, বেলুন উড়িয়ে, রকেট পাঠিয়ে, এমন কি, ঘুড়ি উড়িয়েও আকাশের খবর জানা গিয়েছে।

॥ বায়ুমণ্ডলের তাপ ॥

পৃথিবী ছেড়ে উপরে উঠলে গরম মোটেই বাড়ে না, বরং কমতেই থাকে। ঘনমণ্ডলের মধ্যে যতদূর উঠবে, ঠাণ্ডা ততই বাড়বে—এর কারণ কি?

সূর্যের তাপ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসে, তাতে হাওয়াটা আগাগোড়াই গরম হয়ে যাবার কথা। কিন্তু সূর্যের তাপে ঘনমণ্ডল, সূক্ষ্মমণ্ডল আর অন্তর্মণ্ডলের হাওয়া গরম হয় না। প্রকৃতির এ এক আশ্চর্য নিয়ম। তবু আমরা যে গরম হাওয়া পাই, সেটা গরম হয় পৃথিবীর জল-মাটির তাপ লেগে। তাই উপরকার হাওয়া ঠাণ্ডা, কেননা পৃথিবীর জলমাটি থেকে সেটা যত দূরে হবে, সেটা ততই পৃথিবী থেকে কম তাপ পাবে। পৃথিবীর ভিতরকার তাপ হিমালয়ের চূড়োয় খুব কমই পৌঁছতে পারে বলে সেখানে বরফ জমে থাকে আর শীত হয় দারুণ।

ঘনমণ্ডলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা ক্রমশঃই বেড়ে চলে। কিন্তু তারও উপরে সূক্ষ্মমণ্ডলের তাপ আর কমে না—প্রায় আগাগোড়াই—৬৭° সেন্টিগ্রেডে (সেলসিয়াস) থাকে। সে বড় অসম্ভব ঠাণ্ডা, বরফের চাইতেও ঢের ঢের বেশী ঠাণ্ডা (০° সেন্টিগ্রেডে জল জমে বরফ হয়)।

কিন্তু এর পর ৫০ মাইল উঁচুতে আয়নমণ্ডলে এলে দেখবে যে ভয়ানক গরমের রাজ্যে এসে পড়েছ। যতই উপরে উঠবে, এবার গরম ততই বাড়বে। বাড়তে বাড়তে শেষে আয়নমণ্ডলের শেষ সীমায়, মাটি থেকে ৩০০-৩৫০ মাইল উঁচুতে, হাওয়া হচ্ছে ২২০০ ডিগ্রী গরম। ১৫০৫ ডিগ্রীতে লোহা গলে যায়—তাহলেই বোঝা যায় আয়নমণ্ডল কত গরম!

॥ আয়নমণ্ডলের কথা ॥

একমাত্র আয়নমণ্ডলের হাওয়াই সূর্যের তাপ নিতে পারে, ঘনমণ্ডল ইত্যাদির হাওয়া তা পারে না। সূর্যের তাপে আয়নমণ্ডলের হাওয়ার অক্‌সিজেন ভেঙে যায়, আর সেই কণাগুলো বিদ্যুতে ভরে গিয়ে তেতে ওঠে। এরকম বিদ্যুৎকণার নাম হচ্ছে আয়ন (ion); তাই এই জায়গার নাম আয়নমণ্ডল। জায়গাটা খুব গরম বলে এর আর এক নাম তাপ-মণ্ডল (thermosphere).

এই আয়নমণ্ডল থাকায় আমাদের ভারী একটা সুবিধে হয়ে গিয়েছে। সুবিধেটা হয়েছে রেডিওর
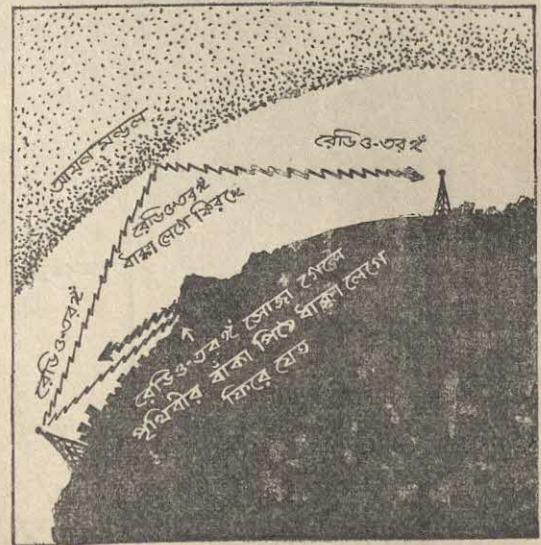
আয়নমণ্ডলে বাধা পেয়ে রেডিও-তরঙ্গ ফিরে আসছে

ব্যাপারে। রেডিও-তরঙ্গ (radio-waves) বায়ু-মণ্ডলের মধ্য দিয়ে সাধারণতঃ সোজা লাইন ধরে চলে। গোল পৃথিবীর পিঠটা তো বাঁকা, তাই রেডিও-তরঙ্গ এক জায়গা থেকে বেরিয়ে বেশী দূরের কোনও জায়গায় সোজাসুজি পৌঁছতে পারে না, কেননা তা করতে হলে তাকে মোড় ঘুরে বেঁকে যেতে হয়। কাজেই, রেডিওর খবর দূরদেশে পাঠানো অসম্ভব হত, যদি না আয়নমণ্ডলে আয়নকণারা থাকত।

রেডিও-তরঙ্গ সোজা উঠে ঘনমণ্ডল, সূক্ষ্মমণ্ডল আর অন্তর্মণ্ডল পার হয়ে যেই আয়নমণ্ডলে পৌঁছয়, অমনি আয়ন-কণারা তাদের বাধা দেয়। তরঙ্গগুলি তখন ঠিকরে পৃথিবীতে ফিরে আসে। সেই ফিরে-আসা তরঙ্গগুলিকে তখন পৃথিবীর এমন এমন জায়গাতেও ধরা যায় যেখানে ওরা সোজাসুজি যেতে পারত না।

॥ একটি আশ্চর্য আলো—অরোরা ॥

আয়নমণ্ডলে হাওয়ার কণা ভেঙে গিয়ে যে-সব বিদ্যুৎকণা হয়, সেগুলো নানা কারণে জ্বলে ওঠে। তখন আশ্চর্য সুন্দর একরকমের আলো আকাশে দেখা যায়। আমরা এদেশে সে আলো দেখতে পাই না। সে আলো দেখা যায় শুধু উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি জায়গা থেকে। তাই একে বলা হয় মেরুজ্যোতিঃ বা অরোরা (aurora). উত্তর দেশের এই আলোর নাম অরোরা বোরিয়ালিস্ (borealis), আর দক্ষিণের এই আলোকে বলা হয় অরোরা অস্ট্রালিস্ (australis).

রাত্রিতেই এই আলো দেখা যায়। কখনও আকাশের নানা জায়গায়, কখনও বা সারা আকাশ জুড়ে এই আলো খেলে বেড়াতে থাকে।

॥ আয়নমণ্ডলের বিদ্যুৎ ॥

সূর্যের তেজ ছাড়াও আরও একটা কারণে আয়নমণ্ডলে প্রচুর বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে। যে-বিদ্যুতে আমাদের আলো জ্বলে, পাখা চলে, তা কি করে তৈরী হয়, জান? একটা চুম্বকের দুই প্রান্তের মাঝখানে 'আর্মেচার' বলে একটা তামার তারের কুণ্ডলী ঘুরলে ঐ তারে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আয়নমণ্ডলটা ঐ রকম একটা আর্মেচারের মতো। তার আয়নকণাগুলো তামার তারের মতোই বিদ্যুৎ-পরিচালক, আর সেই কণাগুলো সজোরে ছুটছে। কেননা, তারাও তো হাওয়া, আর সেই হাওয়াও নীচের হাওয়ার মতো বয়ে যায়। তবে, তারা যে জোরে ছোটে, তা সাংঘাতিক। রকেট থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে সেটা দেখা গেছে। আর পৃথিবী নিজেই একটা চুম্বক। তাহলেই দেখা যায় যে সেই চুম্বকের শক্তির মধ্যে বিদ্যুৎ-পরিচালক জিনিসে গড়া একটা হাওয়া সজোরে ছুটছে। কাজেই, সেই হাওয়ায় প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েই চলেছে। সেই বিদ্যুৎকে ধরে নিয়ে আসতে পারলে আমাদের আর এখানে আলাদা করে বিদ্যুৎ তৈরি করবার কথা ভাবতে হত না। কিন্তু তাকে ধরে আনবার কোনও উপায় আজও কেউ বার করতে পারে নি।

॥ ঘনমণ্ডলের আবহাওয়া ॥

আমরা কিন্তু আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখি, তার সঙ্গে আয়নমণ্ডলের বিদ্যুতের কোনও সম্পর্ক নেই। এই বিদ্যুৎ বা বিজলী হচ্ছে মেঘের বিদ্যুৎ, আর মেঘ থাকে শুধু ঘনমণ্ডলেরই মধ্যে। শুধু মেঘ আর বিজলী নয়, ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াশা, শিশির—এ সবই হচ্ছে এই নীচেকার হাওয়ার ব্যাপার।

এ সবের জন্যে ঘনমণ্ডলের যে নানারকম অবস্থা হয়, তাকে বলে আবহাওয়া। 'আব' মানে জল।

॥ চলন্ত হাওয়া ॥

হাওয়া প্রায় সব সময়ই নদীর জলের মতো বয়ে চলেছে। হাওয়াকে অনবরত চলতে হয় দুটো কারণে। পৃথিবীটা ঘুরছে, তার সঙ্গে তার হাওয়ার খোলসটাও ঘুরছে ঘণ্টায় এক হাজার মাইলের চেয়েও বেশী জোরে। পৃথিবীর সঙ্গে আমরাও অত জোরেই ঘুরছি বলে হাওয়ার এই গতিটা আমরা টের পাই না।

গরম হাওয়া উপরে উঠে যাচ্ছে

ডাঙা আর জল সূর্যের তাপ নিয়ে তেতে ওঠে, কিন্তু ঘনমণ্ডলের হাওয়া সূর্যের তাপ নেয় না—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। জল আর ডাঙা তেতে উঠে যে তাপ ছড়ায়, হাওয়া শুধু সেই তাপটাই নিতে পারে। তাই হাওয়া যতই নীচেকার হবে, ততই বেশী তাপ পাবে, আর ততই গরম হবে; আর যতই উপরকার হবে, ততই কম গরম হবে।

গরম হলে অন্য সব কিছুরই মতো হাওয়াও ফুলে-ফেঁপে ওঠে। নীচেকার বেশী হালকা হাওয়া উপরে উঠে যায়। পাশ থেকে হাওয়া ছুটে এসে সে ফাঁক ভরিয়ে দেয়। হাওয়ার চলা এইভাবে শুরু হয়।

যে-হাওয়াটা উপরে উঠে গেল সেটা জল আর ডাঙা থেকে দূরে এসে পড়ল। কাজেই, সেটা ঠাণ্ডা হতে থাকবে, তাতে উপরকার আশপাশের ঠাণ্ডা হাওয়ার ভিড় বেড়ে যাবে। আর, ভিড় বাড়লেই যা হয়, সেখানে ঠেলাঠেলি, চাপাচাপি আরম্ভ হয়ে যাবে। পাশাপাশি জায়গায় নীচেকার হাওয়া পর্যন্ত তার চাপ পৌঁছে যাবে।

হাওয়া যখন পৃথিবীর উপর একদিক্ থেকে অন্যদিকে বয়ে যায়, শুধু তখনই তাকে বাতাস (wind) বলে। হাওয়া যখন উপরে ওঠে, তখন তাকে বলে 'উৎক্ষেপ' (updraft), আর যখন নীচে নামে তখন তার নাম 'অধঃক্ষেপ' (downdraft). এদের বাতাস বলা হয় না।

জল আর ডাঙা সমান গরম হয় না। দিনে জলের তুলনায় ডাঙা বেশী গরম হয়, রাত্রে ডাঙার তুলনায় জল বেশী গরম হয়। তাই দিনের বেলা নদী আর সমুদ্র থেকে ডাঙার দিকে, আবার রাতে তার উলটো দিকে অর্থাৎ ডাঙা থেকে নদী আর সমুদ্রের দিকে বাতাস বয়। এদের যথাক্রমে বলা হয় সমুদ্রবায়ু (Sea Breeze) আর স্থলবায়ু (Land Breeze).

নিরক্ষরেখার উপর জল আর ডাঙা সবচেয়ে বেশী তাপ পায়। সেখান থেকে যতদূরে সরে যাওয়া হবে; গরম ততই কমবার কথা। কাজেই, সাধারণতঃ উত্তর আর দক্ষিণ থেকে নিরক্ষরেখার দিকে বাতাস বইবে।

আবার, নিরক্ষরেখার উত্তরে যখন শীতকাল, দক্ষিণে তখন গ্রীষ্মকাল, আবার উত্তরে যখন গ্রীষ্ম, দক্ষিণের দেশগুলোতে তখন শীত। তাই, বাতাস একবার উত্তর থেকে দক্ষিণে, আবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে নিরক্ষরেখা পার হয়ে বহে যেতে চাইবে।

এই সব কারণে বাতাস এক এক সময় এক এক দিক্ থেকে আসতে থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই সেটা

দিনে হাওয়া চলছে ডাঙার দিকে। রাতে হাওয়া চলছে জলের দিকে।

বোঝা যায়। যেমন, গরমের সময় দক্ষিণ বাংলায় হাওয়া আসে দক্ষিণ দিক্ থেকে, আর শীতকালে আসে উত্তর থেকে।

এর কারণ পাশাপাশি জায়গায় জল আর ডাঙার মধ্যে তাপের তফাত। গরমের সময় বাংলার মাটি যত গরম হয়, তার দক্ষিণের সমুদ্র তত গরম হতে পারে না। তখন সমুদ্র থেকে দক্ষিণের হাওয়া আসে আমাদের দেশে। একে মলয় হাওয়া বলে।

তারপর শীতকালে পশ্চিমবঙ্গ সমুদ্রের জলের চাইতে বেশী ঠাণ্ডা হয়। তখন একেবারে উত্তরের হিমালয় থেকে ঠাণ্ডা উত্তুরে বাতাস চলে আসে সমুদ্রের দিকে। তা আমাদের উপর দিয়ে বয়ে যায়।

॥ পৃথিবীর আবহাওয়ার নকশা ॥

বাতাস আসে বেশী চাপের জায়গা থেকে কম-চাপের জায়গার দিকে। পৃথিবীর এক-একটা জায়গা জুড়ে এক-এক সময় কম-চাপের সৃষ্টি হয়, তখন অপরাপর কয়েকটা জায়গা জুড়ে বেশী চাপ দেখা দেয়। এ জায়গাগুলোও মাস বা ঋতু বদলের সঙ্গে বদলে যায়। এই কম-চাপ আর বেশী-চাপের জায়গাগুলোর নকশা (map) করা হয়, তাকে বলে আবহাওয়ার নকশা (weather map).

॥ আয়ন বায়ু আর শান্ত বলয় ॥

আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরে বিষুব-রেখার কাছে হাজার হাজার মাইল জুড়ে শুধুই জল, কাজেই অবস্থাটা অনেকটা একরকম। তাই বাতাস সেখানে একটু বেঁকেচুরে ক্রমাগতই পুব থেকে পশ্চিমে একভাবে বয়ে যায়। এদের নাম হয়েছে trade-winds, যাকে বাংলায় বলে 'আয়ন বায়ু'। এই 'আয়ন' আর আয়নমণ্ডলের 'আয়ন' (ion) কিন্তু এক নয়।

বিষুবরেখার কাছে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহা-সাগরে খানিকটা করে জায়গা আছে, যার নাম নিরক্ষীয় শান্ত বলয় (the doldrums). এখানে হাওয়া জোরে বয় না।

॥ মৌসুমী বায়ু ॥

ভারতবর্ষের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে একটা বাতাস বয়, তাকে বলে মৌসুমী বায়ু (monsoon). এখন, মৌসুম মানে হচ্ছে ঋতু। এই বাতাসটা সারা বছর থাকে না, বছরের একটা বিশেষ সময়েই বা ঋতুতেই এটা দেখা যায় বলে এর এই নাম।

এদেশে বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ মাসে ভয়ানক গরম পড়ে। সমস্ত দেশ তেতে ওঠে, সেই সঙ্গে দেশের হাওয়া গরম হয়। আর, তাহলেই সেখানে হাওয়ার চাপ কমে যায়। এমনি কমতে কমতে শেষে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর থেকে বেশী চাপের বাতাস ভারতের দিকে বইতে শুরু করে। এই হাওয়াও গরম, তবে কম গরম। সাগরের জল বাষ্প হয়ে অনবরত এসে তার মধ্যে উঠছে। সেই বাষ্পভরা জলো হাওয়া পৃথিবীর ঘুরপাকের চোটে সোজা উত্তরে উঠতে পারে না, বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ থেকে উত্তর-পুব দিকে বয়ে আসতে থাকে ভারতের বুকের উপর। সেখানে এসে সেই জলো হাওয়া কোনও কারণে ঠাণ্ডা হলে বৃষ্টি হয়।

তবে, ভারতের সব জায়গায় যে সমান বৃষ্টি হয়, তা নয়। বাংলায় আসতে ঐ বাতাসটাকে অনেক বেশী সমুদ্রের উপর দিয়ে অনেক বেশী জলীয় বাষ্প বয়ে নিয়ে আসতে হয়। তাই, মৌসুমী বাতাস থেকে দক্ষিণ বাংলা, আর তার উত্তর-পুবে আসাম, বৃষ্টি পায় খুব বেশী। আসামের চেরাপুঞ্জি, মসিনরাম ইত্যাদি জায়গায় যেরকম বৃষ্টি হয়, পৃথিবীতে এমন আর কোথাও হয় না।

॥ ভিজে হাওয়া ॥

হাওয়ায় সব সময়ই কম বেশী কিছু জলকণা বা বাষ্প থাকে।

হাওয়ার এই জলো ভাবকে বলে আর্দ্রতা (humidity). খবরের কাগজে আবহাওয়ার খবরের মধ্যে দেখবে যে এই আর্দ্রতা রোজ মাপা হয়। কোনও দিন আর্দ্রতা যদি ৫০ হয়, তাহলে বুঝতে

হবে যে সেদিন যত উত্তাপ ছিল, তাতে সবচেয়ে বেশী যতটা জলকণা ধরতে পারত, তার শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র জলকণা ছিল সেই হাওয়াতে।

প্রথমে এই হাওয়ার বাষ্পকে দেখা যায় না। এগুলো বেশী উপরে উঠে গিয়ে ক্রমে তাপ হারিয়ে ফেলে, আর তার উপর ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়াচও পায়। তখন সেগুলো জমে খুব মিহি জলকণা হয়ে চাপ বাঁধতে থাকে, আর হালকা বলে হাওয়ায় ভাসতে থাকে। তখন এই চাপ-বাঁধা জলকণা দেখা যায়। তাকে বলে মেঘ।

আকাশে মেঘ নীচু হয়ে জমে থাকলে কেমন একটা বিশ্রী গরম লাগে। তাকে বলা হয় গুমোট। পৃথিবীর যে গরমটা উপরে উঠে ছড়িয়ে যাবার কথা, সেটা মেঘ পর্যন্ত গিয়ে বাধা পায় ও মেঘ আর আমাদের মাঝখানে জমতে থাকে। তাতেই গরম আর আর্দ্রতা বেড়ে যায়। সেই ভ্যাপসা গরমই হচ্ছে গুমোট।

মেঘের কথা বলতেই মেঘের রঙের কথা মনে আসে। মেঘে কতরকম রং খেলে, কিন্তু আসলে তার কোন রং নেই। আলো পড়লে মেঘকে সাদা দেখায়। সন্ধ্যেবেলা সূর্য যখন ডুবে যায়, তখন তার লাল আলোয় মেঘগুলিকেও লাল বলে মনে হয়। আবার জলভরা মেঘ যখন ভারী হয়ে নেমে আসে, তখন পৃথিবীর ছায়া তাতে পড়ে। তাতেই মেঘের রং কালো দেখায়।

॥ কুয়াশা ॥

শীতকালে যে কুয়াশা দেখা যায়, তাও একরকম মেঘ। রোদ উঠলে মাটি আস্তে আস্তে গরম হতে থাকে, তাতে কুয়াশার জলকণাগুলো আবার বাষ্প হয়ে যায়, তাদের আর দেখা যায় না। কুয়াশা কেটে যায়।

শীতের দেশে যেখানে রোদের তেজ কম, সেখানে কুয়াশা থেকেই যায়। লণ্ডন শহরের কুয়াশা (London fog) তো বিখ্যাত। বেলা হলেও কুয়াশার জন্যে সেখানে পথ চলা দায়।

কুয়াশায় চারিদিক্ ঢেকে গেছে

॥ শিশির ॥

অল্প একটু ঠাণ্ডা পড়লে—আমাদের দেশের কার্তিক মাসের রাত্রিতে যেমন হয়—হাওয়াটা তত ঠাণ্ডা হয় না, কিন্তু গাছের পাতা, ঘাস, মাটি বেশ ঠাণ্ডা হয়। শানবাঁধানো জায়গাও ঠাণ্ডা হয়। তখন হাওয়ার ভিতরকার জলীয় বাষ্প ঐগুলোতে ঠেকে ঠাণ্ডা পেয়ে একেবারে জল হয়ে যায়। এই জলকে বলে শিশির বা হিম। যারা অতশত জানে না, তারা বলে 'হিম পড়ে'—যেমন, বৃষ্টি পড়ে। কিন্তু হিম তো বৃষ্টির মতো উপর থেকে পড়ে না—ঘাসের আর পাতার গায়ে হাওয়ার ভিতরকার বাষ্প জমে সেইখানেই শিশির হয়ে যায়।

॥ নানা রকমের মেঘ ॥

হাওয়ার ভিতরকার বাষ্প থেকেই বৃষ্টিও হয়, কিন্তু সেটা অনেক উপরকার জমাট বাষ্প। তাকে বলে মেঘ। এক-একরকম মেঘের এক-একরকম নাম রাখা হয়েছে।

যে মেঘে বৃষ্টি হয় না, সাধু ভাষায় তার নাম আবর্ত মেঘ। যা থেকে বৃষ্টি হলেও হতে পারে, সে মেঘ হল পুষ্কর মেঘ। যে মেঘ বেশ বৃষ্টি দেয়, যাতে ক্ষেতে ভাল শস্য হয়, তাকে বলা হয় দ্রোণ মেঘ। আর, যাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়, সে মেঘের নাম হল সংবর্ত মেঘ।

বাংলায় আমরা সন্ধ্যেবেলার লাল মেঘকে বলি সিঁদুরে মেঘ। আবার ঝড় ওঠবার আগে যখন মেঘের রং ধুলোর মতো হয়ে যায়, তখন তাকে বলি ধুলো মেঘ। ঘন কালো মেঘকে বলে হেঁড়ে মেঘ, মানে, রান্নার হাঁড়ির মতো কালো মেঘ। একেই বাদল মেঘও বলে, আবার ভাল কথায় বলে নীরদ মেঘ (nimbus). নীরদ কথাটার মানে হল 'যে জল দেয়'।

দু'হাজার ফুটের উপরে দেখা যায় স্তর মেঘ (stratus cloud). স্তরে স্তরে সাজানো থাকে বলে এদের এই নাম। শরৎকালের রাত্রিতে আকাশ জুড়ে এই মেঘকে দেখা যায়। সূর্য উঠলে আস্তে আস্তে এই মেঘ মিলিয়ে যায়। এতে বৃষ্টি হয় না।

গ্রীষ্মকালে আর বর্ষাকালে মাইলখানেক, মানে হাজার পাঁচেক ফুট উপরে উঠে একরকম মেঘ হয়। এর তলাটা বেশ সমান, প্লেন—আঁকাবাঁকা এবড়ো-খেবড়ো নয়। এই মেঘ দেখতে পেঁজা তুলোর স্তূপের মতো, তাই একে বলে স্তূপ-মেঘ কিংবা

স্তূপ-মেঘ

কিউমিউলো-নিম্বাস মেঘ

পুঞ্জ-মেঘ (cumulus). সাধারণতঃ এদের সকালেই দেখা যায়। এই মেঘে বেশী জল জমে গেলে এরা নেমে আসে, তখন একে বলে কিউমিউলো-নিম্বাস (cumulo-nimbus) মেঘ।

সব চাইতে উঁচুতে যে মেঘদের দেখা যায়, তারা হ'ল অলক-মেঘ বা ঘন-মেঘ (cirrus). এরা মাটি থেকে পাঁচ-ছ' মাইল উপরে থাকে। এই মেঘ পালকের মতো দেখতে হয়। ভোরে আর বিকেলে এদের দেখা যায়। অত উঁচুতে থাকে বলে ওখানকার ঠাণ্ডায় এই জলকণাগুলো জমে খুব মিহি বরফের কণা হয়ে যায়। সেগুলো এত ছোট আর হালকা যে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়, মাটিতে নেমে আসে না।

॥ তুষার ॥

আমাদের দেশে আমরা মাটির উপর বরফের কণা পড়তে দেখি না বটে, কিন্তু বেশী শীতের দেশে তাও পড়ে। খুব শীত পড়লে হাওয়ার যত জলকণা সব জমাট বেঁধে একটার গায়ে আর একটা লেগে

গিয়ে ভারী হয়ে নীচে পড়তে থাকে। তুলোর মতো হয়ে সেই বরফকণা মাটির উপর জমতে থাকে। তাকে বলে তুষার (snow). বেশী রোদ পেলে তা গলে জল হয়ে যায়।

পাহাড়ের মাথায় কিংবা ঐ রকম গড়ানে জায়গায় জমলে ঐ তুষার চাপ বেঁধে গড়িয়ে যেতে থাকে। তাকে বলে তুষার-নদী বা হিমবাহ (glacier). আবার চাপের চোটে তুষার জমে শক্ত বরফও হতে পারে—যেমন, পাহাড়ের মাথার বরফ, কিংবা মেরুর দেশ থেকে ভেসে-আসা হিমশৈল (iceberg).

॥ বৃষ্টি ॥

আকাশে রাশি রাশি বাতাস এদিক্-সেদিক্ ছুটে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে কোনটা গরম বা কোনটা ঠাণ্ডা। একরাশি মেঘ-ভরা গরম বাতাস আর একরাশি ঠাণ্ডা বাতাসে হয়তো ঠোকাঠুকি লেগে গেল। যেখানটায় এই দুই বাতাসে ধাক্কা লাগে, সেই সারা জায়গাটা জুড়ে মেঘ ঠাণ্ডা হয়ে গলে

শিলাবৃষ্টি
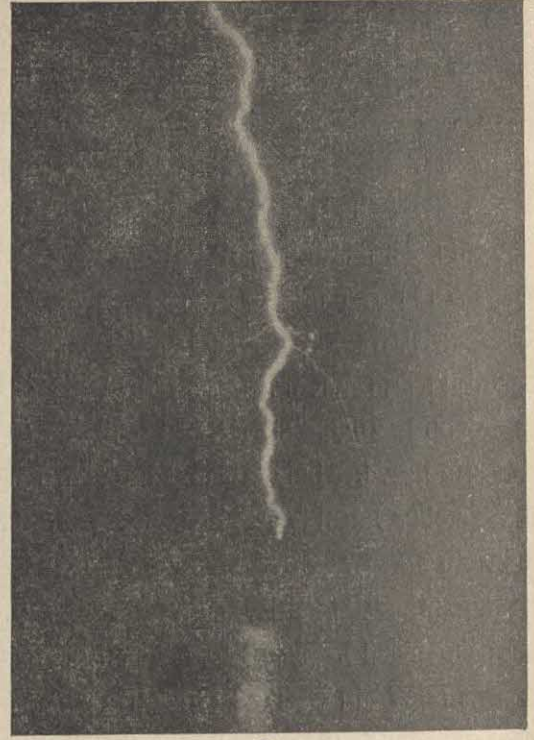
বজ্রপাত

যায়। সেই জল তখন নীচে পড়ে, তাকে বলে বৃষ্টি।

বৃষ্টি নেমে আসবার পথে হঠাৎ কোনও ভয়ানক ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগলে বৃষ্টির ফোঁটা জমাট বেঁধে বরফের ডেলা হয়ে মাটিতে পড়ে। সেগুলোকে বলে শিলা বা করকা। ছেলেরা বলে, 'শিল পড়ছে।'

॥ বিদ্যুৎ আর বজ্র ॥

বাতাস যখন জোরে ছুটে আসে তখন তার মধ্যে উৎক্ষেপ হাওয়া (updraft) থাকে। এই হাওয়া থেকে মেঘের উপরের অংশে পজিটিভ বিদ্যুৎ, আর তার তলার দিকে নেগেটিভ বিদ্যুৎ জমতে থাকে। তারপর, ঐভাবে বিদ্যুতে ভরা দু'খানা মেঘ কাছাকাছি এলেই একটার পজিটিভ আর অন্যটার নেগেটিভ বিদ্যুৎ লাফ দিয়ে এসে মিলে যায়। তখন যে আলোর ঝলক দেখা যায়, সেটাই হচ্ছে বিজলী বা মেঘের বিদ্যুৎ (lightning). তারপর,

হাওয়ার ধাক্কায় শব্দ হয়

পজিটিভ আর নেগেটিভ মিশে গিয়ে এক হয়ে গেলে বিদ্যুৎ আর থাকে না।

বজ্র বা বাজ বলে আলাদা কোনও জিনিসও নেই, আর গাছে বা বাড়িতে কোনও কিছু পড়েও না। মেঘের বিদ্যুৎ মেঘ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসবার সময় বাড়ি, গাছ ইত্যাদি উঁচু জিনিসের মধ্য দিয়ে গেলে সেটা পুড়ে বা ফেটে যায়। তাকেই আমরা বলি 'গাছটাতে (বা বাড়িটাতে) বাজ পড়েছে।'

॥ মেঘের ডাক ॥

বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে যে শব্দ শোনা যায় সেটা হাওয়ার। মেঘে-মেঘেই হোক, আর মেঘে-পৃথিবীতেই হোক, বিদ্যুতের চলাচল হলেই সে-কাজটা হাওয়ার ভিতরেই হয়। হঠাৎ বিদ্যুতের প্রচণ্ড তাপে হাওয়া গরম হয়ে ফেটে যায়, আবার তক্ষুনি ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে আসে। এতে হাওয়ায়-হাওয়ায় এমন ভীষণ ধাক্কা লাগে যে তাইতে দারুণ আওয়াজ হয়। সেই শব্দকেই বলে মেঘের গর্জন বা ডাক।

॥ ঝড় ॥

বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের কথা বলা দরকার। বাতাস বড় বেশী জোরালো হলে তাকে আমরা ঝড় (storm) বলি। সব জোরালো হাওয়ারই জন্যে আমাদের ঐ এক নাম। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বাতাসের গতিবেগ হিসেবে ঝড়ের নানা রকম নাম দিয়েছেন। যেমন, বাতাসের বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৩২-৩৮ মাইল হলে বলে 'জোরালো হাওয়া' (high wind), ৩৯-৬৩ হলে তাকে বলে gale, ৬৪-৭৫ হলে storm, আর ৭৫-এর বেশী হলে hurricane (হারিকেন্)। বাংলায় এদের বাত্যা, ঝটিকা আর ঝঞ্ঝা বলা যেতে পারে। একরকম হাত লণ্ঠনকে 'হারিকেন' (হ্যারিকেন বলা ভুল) বলা হয়। সে কথাটা হল 'হারিকেন ল্যাণ্টার্ণ' কথার সংক্ষেপ। যে লণ্ঠন ঝড়েও নেভে না, তারই নাম 'হারিকেন' লণ্ঠন।

কোনও জায়গায় হাওয়ার চাপ তাড়াতাড়ি কমতে থাকলেই বোঝা যাবে যে ঝড় আসছে। বৈশাখ মাসে গরমের দিনের শেষে তাই ঝড় হয়—তাকে বলে কাল-বৈশাখী।

হাওয়ার চাপ কমছে না বাড়ছে, তা বায়ুচাপমান বা ব্যারোমিটার (barometer) বলে একটা যন্ত্র থেকে দেখা যায়। বিজ্ঞানী টরিচেলি এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন,

১০ লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুতের ঝলক

সে কথা আগে বলা হয়েছে। বেশ সহজ যন্ত্রটা। এটা একটা U-এর আকারে বাঁকানো কাচের নল। তার এক মুখ খোলা থাকে, আর ভিতরে খানিকটা পারা ভরা থাকে। নলটা একটা দাগ-কাটা তক্তার গায়ে আঁটা। হাওয়ার চাপ বাড়লে তা নলের খোলা মুখ দিয়ে পারার উপর চাপ দেয়, তখন পারার এ-মাথাটা নেমে গিয়ে ও-মাথাটা ওঠে। আবার, চাপ কমলে এ-মাথাটা নেমে আসে। নলের গায়ে আঁক কাটা আর সংখ্যা লেখা আছে। তাই দেখে বলা হয় যে এখন বায়ুর চাপ এত।

॥ টাইফুন, সাইক্লোন ও হারিকেন ॥

ঝড় যে শুধু ডাঙার উপরেই হয়, তা নয়। সমুদ্রেও ঝড় হয়। এক-এক জায়গায় তার এক-এক নাম। নিরক্ষরেখার কাছে চীন সমুদ্রে যে ঝড় ওঠে, তাকে বলে টাইফুন (typhoon), ভারত মহাসাগরে

ঝড়

জলস্তম্ভ

যে ঝড় ওঠে তার নাম সাইক্লোন (cyclone) আর আটলান্টিক মহাসাগরে যে ঝড় ওঠে তাকে বলে হারিকেন (hurricane). মরুভূমিতে বালির ঝড়কে কোথাও বলে 'সিরক্কো', কোথাও বলে 'সাইমুম'। আবার, এদেশে ধুলোর ঝড় ওঠে গ্রীষ্মকালে, তাকে কখনও 'লু', কখনও 'আঁধি' বলা হয়।

॥ ঘূর্ণিঝড় ॥

দুটো বাতাস উলটো দিক্ থেকে এসে মুখোমুখি ধাক্কা খেলেই ঘূর্ণিঝড় (whirlwind) হয়। তখন দুটো বাতাসই একসঙ্গে ঘুরতে থাকে। জোরালো হাওয়া না হলে দেখতে বেশ মজা লাগে—হঠাৎ ধুলো আর শুকনো পাতারা চক্কর দিয়ে নাচতে নাচতে খানিকটা এগিয়ে যায়। কিন্তু ঝোড়ো হাওয়া হলে সে আর এক জিনিস। ভয়ানক জোরে পাক খেতে খেতে হাওয়া উপরে উঠতে থাকে। সমুদ্রে এটা হলে

সমুদ্রে ঝড়

সমুদ্রের জল সেই ঘূর্ণির টানে থামের মতো উঁচু হয়ে অনেক দূর উঠে যায়। তাকে বলে জলস্তম্ভ (waterspout). মনে হয় যেন আকাশ একটা শুঁড় বাড়িয়ে দিয়ে সমুদ্র থেকে জল শুষে নিচ্ছে। শেষে জলের সেই বিরাট থামটা যখন ভেঙে পড়ে, তখন সমুদ্রে বিরাট ঢেউ ওঠে। কাছে জাহাজ-টাহাজ থাকলে তার আর রক্ষা থাকে না।

ডাঙার উপরও একরকম সাংঘাতিক ঘূর্ণিঝড় হয়, তাকে বলে টর্নেডো (tornado).

॥ প্রবাদের মধ্যে আবহাওয়ার কথা ॥

আবহাওয়া সম্বন্ধে খনার অনেকগুলি বচন, মানে, ছড়া আছে। খনা নামে এক জন খুব বিদুষী মহিলা ছিলেন, খুব ভালো অঙ্ক আর জ্যোতিষ জানতেন, এই রকম একটা প্রবাদ আছে। যদিও সত্যি খনা বলে কেউ ছিলেন কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন।

যাই হোক, এই ছড়াগুলি খুব সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই। যেমন—"বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়।
সে বৎসর বর্ষা হবে খনা কয়॥"

"ভাদুরে মেঘ বিপরীত বায়।
সেদিন ঝড় বৃষ্টি হয়॥"

"মেঘ ডাকে ঘন ঘন।
সেদিন বৃষ্টি হবে জান॥"

খনার আর একটি বচন বড় মজার—
"বামুন বাদল বান।
দক্ষিণা পেলেই যান॥"

এখানে দক্ষিণা কথাটার দুটো মানে। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা পেলে তবে চলে যাবেন, আর বাদল (বৃষ্টি) আর বান (বন্যা) চলে যায় যদি দক্ষিণা হাওয়া এসে পড়ে।

খনার আরও একটি বচন শোন—
"কোদালে-কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা'।
চাষীকে বল বাঁধতে আল।
আজ না হয় হবে কাল॥"

এর মানে—যখন মেঘ দেখলে মনে হবে যে সেগুলোকে কোদাল-কুড়ুল দিয়ে কোপ মারা হয়েছে, আর সেই সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বাতাস (বা) বইছে, তখনই বর্ষার জল ক্ষেতে ধরে রাখবার জন্যে চাষীর উচিত ক্ষেতে আল বেঁধে ফেলা। কেন না, ওরকম হলে বৃষ্টি হবেই, তা সে আজই হোক কিংবা কালই হোক।

॥ আবহাওয়া আপিস ॥

পৃথিবী জুড়ে শহরে, পাহাড়ে, সমুদ্রে, এমন কি উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলেও আবহাওয়ার আপিস স্থাপন করে খবর সংগ্রহ করা হচ্ছে। তারপর সেই খবর পৃথিবীময় প্রচার করা হচ্ছে।

আজকাল মহাকাশে যেসব মানুষের তৈরী উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট পাঠানো হয়েছে, তাদের একটা বড় কাজই হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে থেকে দেখা যে পৃথিবীর কোথায় ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সে খবর আপনা আপনি বেতারে পৃথিবীতে চলে আসে। এদের মধ্যে আমেরিকার 'টেলস্টার'-ও আছে, আমাদের 'আর্যভট'-ও আছে।

যানবাহনের কথা

আজকাল শহর অঞ্চলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে কাছাকাছি কোন বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াতে হয়। তারপর বাস এলেই তাতে উঠে পড়লেই হল। কিছুক্ষণের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাওয়া যায়। দূরে যেতে হলে ট্রেনে চাপতে হবে। স্টেশনে এসে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে অসুবিধা হয় না। এ ছাড়া জলপথ আছে, স্টীমারে বা জাহাজে চড়ে যেতে হয়। আকাশপথেও যাওয়া চলতে পারে—তার জন্যে আছে এরোপ্লেন।

॥ পুরাকালের কথা ॥

কিন্তু এসব ব্যবস্থা চিরকাল ছিল না।

দুশ' বছর ধরে নানারকম আবিষ্কারের ফলে যাতায়াতের এই সব সুবিধে হয়েছে। প্রাচীন কালের লোক কিভাবে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেত? প্রথমটা পায়ে হাঁটা ছাড়া মানুষের উপায় ছিল না। পায়ে হেঁটেই তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হত।

মার্কো পোলো (Marco Polo—১২৫৬-১৩২৩ খ্রীঃ) যথাসম্ভব পায়ে হেঁটে দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছিলেন কিন্তু অত শখ বা ধৈর্য তো সবার নেই। তাছাড়া সাধারণ মানুষ একটু আরাম চায়। তারা তাই প্রথমে তাদের চেয়ে যে-সব জন্তু দ্রুত চলে তাদের পিঠে চড়ে যাওয়া-আসা সেরে নেবার ব্যবস্থা করে ফেলল। যাদের পিঠে চড়া হয় তাদের বলে বাহন। আর অন্য কোন যন্ত্রে চেপে যাওয়া-আসা করলে তাকে বলে যান। বাহন আগে এসেছে, তারপর যান।

॥ দেবদেবীদের বাহন ॥

মানুষের কল্পনায় দেবদেবীদের আসা-যাওয়া চলে বাহনে চেপে। গ্রীকদের দেবী মিনার্ভার বাহন তাঁর পাখাওয়ালা চটিজুতো। ব্যাকাসের বাহন চিতাবাঘ। আমাদের পুরাণে আছে, নারদ মুনি উড়ন্ত ঢেঁকিতে চড়ে যাওয়া-আসা করেন। মা দুর্গার বাহন সিংহ, শিবের বাহন ষাঁড়, মা শীতলার বাহন গাধা। গণেশ ঠাকুরের বাহন ইঁদুর। লক্ষ্মীদেবীর বাহন পেঁচা। সূর্যদেব সোনার রথে আকাশে ভ্রমণ করেন। সাতটি ঘোড়া সেই রথ টেনে নিয়ে যায়। নারদ মুনির ঢেঁকিকেও যান বলতে হবে বইকি, কারণ সেটা তো কোন জীব নয়।

মানুষ যে জন্তুকে পোষ মানাতে পারল তারই

ষাঁড়ের পিঠে গাঁয়ের লোক

পিঠে চড়ে বসল। আজও পৃথিবীর বহু অঞ্চলে এই রকম পশুর পিঠে চড়ে মানুষ তার যাওয়া-আসার সমস্যার সমাধান করছে।

॥ মানুষের বাহন ॥

বহুদিন থেকেই গরু, ষাঁড়, মহিষ, গাধা, ঘোড়া, খচ্চর, উট, হাতি, উটপাখির পিঠে চড়ে মানুষ হাঁটা-হাঁটির পরিশ্রম বাঁচিয়ে আসছে। মরুভূমি পার হবার

উটের পিঠে লোক

জন্যে আজ উটের ব্যবহার চলে আরব, মঙ্গোলিয়া ও উত্তর আফ্রিকায়।

ঘোড়া খুব জোরে চলে বলে অশ্বারোহণ পৃথিবীর সব জায়গায় চলে আসছে। ঘোড়া মানুষের বাহন হিসাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ওরা খুব প্রভুভক্ত।

ঘোড়ায় চেপে চলেছে

গাধার পিঠে ধোপার মোট

আলেকজাণ্ডারের ঘোড়ার নাম বিউসেফ্যালাস (Bucephalus). হজরত হোসেনের ঘোড়ার নাম ছিল দুলদুল। রাজপুতবীর রানা প্রতাপের ঘোড়ার নাম ছিল চৈতক। সেটার রং ছিল নীলচে। প্রতাপকে বাঁচাবার জন্যে সে পাহাড়ী নদী লাফ দিয়ে পার হতে গিয়ে আহত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছিল।

আমাদের দেশে ধোপাদের মোট বহন করে গাধা। ছোট্টখাট্ট জীবটি, কিন্তু ভারী শান্তশিষ্ট। অনেক সময় গাধার পিঠের বোঝার উপর ধোপাদেরও বসে থাকতে দেখা যায়।

হাতি ছিল রাজা-রাজড়াদের বাহন। হাতির দাম অনেক। সবাই কিনতে পারে না। জমিদার ও রাজারা হাতির পিঠে হাওদা চাপিয়ে তাতে বসে যাতায়াত করতেন॥ আগেকার দিনে ভারতীয় রাজারা আর সেনাপতিরা হাতিতে চড়ে যুদ্ধে যেতেন।
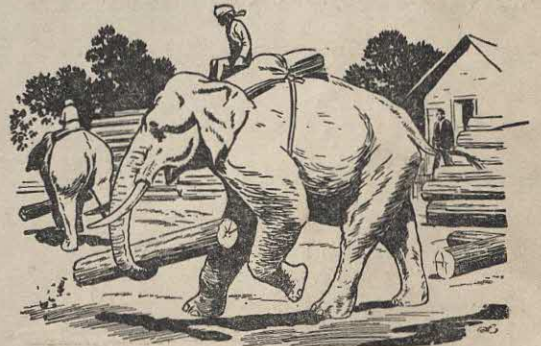
হাতির পিঠে মানুষ

পৃথিবীর উত্তরে ঠাণ্ডা বরফের দেশে বল্‌গা হরিণের পিঠে চড়ে মানুষ যাতায়াত করে।

॥ চাকা-ছাড়া গাড়ি ॥

মেরু অঞ্চলে চাকাহীন স্লেজ (sledge) গাড়ি অনেক সময় সেখানকার বল্‌গা হরিণেই টানে। বরফের পথ পিছল, কাজেই গাড়ি গড়িয়ে চলে অক্লেশে। কুকুরে-টানা স্লেজ গাড়ি উত্তর মেরু অঞ্চলে আজও চলে।

বল্‌গা হরিণে-টানা স্লেজ গাড়ি

উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে চাকা-ছাড়া মালপত্র টেনে নিয়ে যাবার একরকম ব্যবস্থা ছিল। তাকে বলত ট্রাভয় (travois). সেটা দেখতে ঠিক মইয়ের মতো। তার উপর বোঝাটাকে বেঁধে তার এক মাথা ঘোড়া বা কুকুরের পিঠে আটকে দেওয়া হত। অন্য মাথাটা মাটিতে থাকত আর তাকে ঘষটে ঘষটে টেনে নিয়ে চলত' সেই কুকুর বা ঘোড়াটা। মানুষেও এভাবে বোঝা টেনে নিয়ে যেত।

ট্রাভয়

ঝাঁপান

চাকা যতদিন না আবিষ্কার হয়েছে ভারী মালপত্র এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে মানুষকে খুব কষ্ট পেতে হত। ঘোড়াই টানুক, মানুষই টানুক বা অন্য কোন পশুই টানুক, মাটিতে ঘষটে ঘষটে সব টেনে নিয়ে যেতে হত। ইতিমধ্যে একটা জিনিস মানুষ আবিষ্কার করে ফেলল। সেটা বাক্স বা ঐ জাতীয় কিছু একটা পাত্র। ঐ পাত্রে করে মানুষ ও মাল বহা হত। এখনও পাহাড়ে ওঠবার সময় ঝাঁপানে করে মানুষ বহা হয়। তাতে উলটো মুখে মানুষ বসে থাকে আর হাতল দুটো কাঁধে করে বাহক তাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে যায়। এরই আর এক রূপ হচ্ছে ডাণ্ডি।

এর পর এল ডুলি (litter). একটা বাঁশ থেকে ঝোলানো বসবার আসন। দু'জন বাহক এটা বয়ে নিয়ে যেত। এর পর এল পালকি। ছোট দরজাওয়ালা কাঠের ঘর। সামনে পিছনে দুখানা মোটা লম্বা

তাঞ্জাম বা Sedan chair
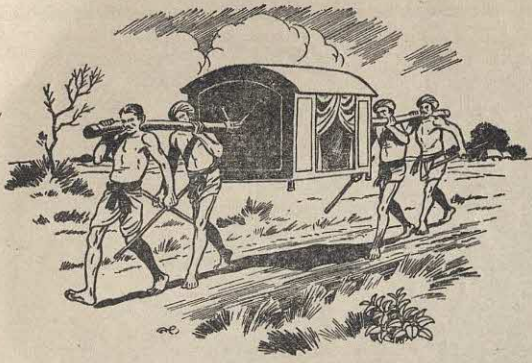
পালকি

ডাণ্ডা লাগানো। দুধারে দুজন করে বেহারা এটা বয়ে নিয়ে যেত। গ্রামাঞ্চলে ডুলি এবং পালকির চলন এখনও আছে। বড়লোকদের পালকির কত বাহার থাকত—হাতল বা ডাণ্ডি: দুটোতে কত কারুকার্য করা থাকত। তার উপর কেউ রুপো, কেউ সোনার পাত বসাত, কেউ বা হাতির দাঁতের কাজ করাত।

তারপরে আরও জাঁকজমকের যান সব তৈরী হল, যেমন চতুর্দোলা, তার চারদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা। চারকোণে তার চারটে খুঁটি, মাথার উপর দামী মখমলের চাঁদোয়া খাটানো থাকত।

'তাঞ্জাম' বলে আরেক রকম যান ছিল। অনেকটা ইওরোপের সীডান (Sedan) চেয়ারের মতো। বসতে
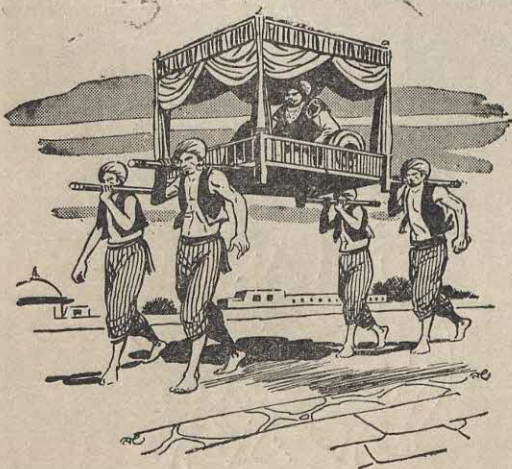
চতুর্দোলা

হত পা ঝুলিয়ে। দেখতে ঠিক চাকাহীন রিক্‌শা গাড়ির মতো। বেহারারা দুপাশে ঝোলানো হাতল কাঁধে করে বইত। এছাড়া ছিল দোলা। সেটা বাঁশ থেকে ঝোলানো একটা আসন। অনেকটা আগেকার ডুলির মতো, কিন্তু তার সাজসজ্জা জমকালো। সেটাও দুজন বেহারা কাঁধে করে দুপাশ থেকে বইত।

কিন্তু এ সব মৃদুমন্দগতি যানে মানুষের যাতায়াতের আশা মিটছিল না। তাই নিরন্তর চেষ্টা চলছিল কি করে একসঙ্গে একের বেশী মানুষকে বহা যায় আর ভারী মাল নিয়ে যাওয়া যায়। ভারী মাল এক স্থান থেকে আর এক স্থানে মানুষকে হামেশাই বইতে হত। এদের মধ্যে পাথর আর কাটা গাছই বেশী বইতে হত তাদের। হয়তো ভারী জিনিসটা মাটিতে গড়িয়ে নিয়ে যেতে হত বা কোন কিছুর উপর চাপিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হত। তাতে বহু লোকের সাহায্য দরকার হত, বহু মেহনত করতে হত।

॥ চাকা আবিষ্কার ॥

জার্মানীতে কোন কোন পাহাড়ে কাঠুরেরা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পাহাড়ের গায়ে গোল গোল কাঠের গুঁড়ি বিছিয়ে একটা রাস্তা তৈরি করে উপর-থেকে-কাটা কাঠের ভারী বোঝা সেই গোল গোল গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে গড়িয়ে দিত। নীচে গোল গোল কাঠ থাকায় বোঝাটা হড়হড় করে সহজেই নীচে নেমে আসত।

এছাড়া ভারী বোঝা মাটি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার সময় মাটিতে আটকে গেলে তার তলায় গোল কাঠের গুঁড়ি আড়াআড়িভাবে বসিয়ে তাকে টানা
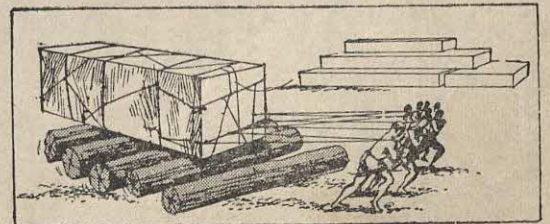
কাঠের গুঁড়ির উপরে রেখে ভারী বোঝা টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

সহজ হত। তবে অনবরত ঐ গোল গোল গুঁড়ি বোঝার সামনে ক্রমান্বয়ে দিতে হত। এই সব দেখতে দেখতে মানুষের মাথায় চাকার ধারণা এসে গেল।

প্রথমে চাকাগুলো হত নিরেট গোল গোল চাকতি। তারপর ক্রমে তাদের হালকা করবার জন্যে আজকালকার মতো পাখি (spoke)-ওয়ালা চাকা বের হল।

এখনকার পাকিস্তানের সিন্ধু-প্রদেশে মোহেন-জো-দরো বলে একটা প্রকাণ্ড ঢিপি ছিল। তা খুঁড়ে আন্দাজ পাঁচ হাজার বছর আগেকার একটা গাড়ির নমুনা পাওয়া গিয়েছে, তাতে নিরেট চাকা দেখা যায়। আবার, প্রায় ৩২০০ বছর আগে ট্রয় শহরে যে যুদ্ধ

চাকার বিবর্তন

হয়েছিল, তাতে সেনাপতিরা পাখিওয়ালা চাকা লাগানো রথে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রায় ২২০০ বছর আগেকার একটা পাখিওয়ালা চাকা পাটনার জাদুঘরে আছে।

গরুর গাড়ির চাকা

চাকার বেড় পরানো

গরুর গাড়ির চাকা ঘিরে একটা লোহার পাত দিয়ে তৈরী বেড় পরানো থাকে। অনেক চাকায় রবারের বেড় থাকে—তাকে বলে টায়ার (tyre). হাওয়া-ভরা (pneumatic) টায়ার থাকে সাইকেল, মোটরগাড়ি ইত্যাদিতে।

॥ চাকাওয়ালা নানারকম গাড়ি ॥

চাকাওয়ালা গাড়ির রকমারির শেষ নেই। মানুষে ঠেলাগাড়ি, রিক্শা, বাচ্চাদের গাড়ি, পেরাম্বিউলেটর ঠেলে নিয়ে যায়, আর সাইকেলে চেপে মানুষ নিজের পায়ের জোরে সেটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। যন্ত্রের জোরে সে ডাঙায় চালায় মোটর সাইকেল, স্কুটার, মোটর কার, বাস, লরী, টেমপো, ট্রামগাড়ি, রেলগাড়ি—আরও কত কি! আবার,
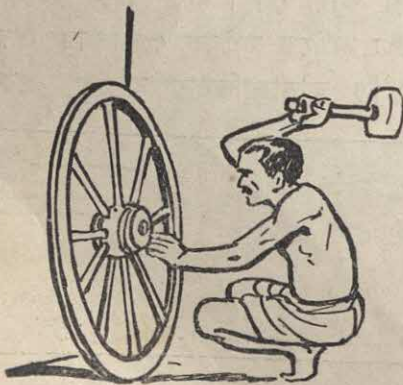
ঠেলা গাড়ি

কুকুর বলদ গাধা খচ্চর উট ঘোড়া ইত্যাদি জীবের সাহায্যে মানুষ নানা ধরনের গাড়ি চালায়। শখ করে কেউ কেউ জেব্রা কুমির উটপাখি ইত্যাদির সাহায্যে গাড়ি টানায়, এমনও শোনা গিয়েছে।

চীনে, জাপানে আর এদেশে রিক্‌শা গাড়ির খুব চলন। এর পুরো নাম হচ্ছে 'জিন্‌রিকিশা'—জাপানীদের দেওয়া নাম। তাদের ভাষায় এর মানে হল মানুষের ('জিন') জোরে ('রিকি') চলে যে গাড়ি ('শা')। সাইকেল দিয়ে একে টেনে নিয়ে গেলে তখন একে বলে সাইকেল-রিক্‌শা। আবার 'সাইকেল' কথাটাও আসলে হচ্ছে 'বাইসাইক্‌ল্‌' কথাটার সংক্ষেপ। তার মানে হচ্ছে 'দুচাকার গাড়ি'। এর চাকা দুটো পাশাপাশি নয়, সামনে আর পিছনে থাকে।

দেড়শ' বছরেরও আগে জার্মানীতে প্রথম সাইকেল তৈরী হয়। তবে, তখন তার নাম হয়েছিল ভিলোসিপীড (Velocipede), আর তার চেহারাও ছিল মজাদার। সামনের চাকাটা মস্ত বড়, পিছনের চাকাটা খুব ছোট। সামনের চাকার উপর হাতলে বসবার ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে তার দুই চাকা সমান হল, পেডাল আর চেন হল।

নানা যুগে নানা রকমের সাইকেল

ঘোড়ায়-টানা গাড়িও হয় কত রকমের ! ঘরের মতো চেহারার ঘোড়ার গাড়ি (পালকি গাড়ি) এখনও কলকাতায় দু'চারটে দেখা যায়। যেগুলো ভাড়াটে গাড়ি তাদের বলে ছ্যাকড়া গাড়ি। ফীটন বলে একরকম শৌখিন ভাড়াটে গাড়িও আছে, তার ছাদটা রিক্‌শার ছাদের মতো গুটিয়ে রাখা যায়। বগি, ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম—এসব হচ্ছে নানা আকারের ঘোড়ারগাড়ির নাম। এ সব শৌখিন গাড়ি। একটা ঘোড়ায় টানলে তাকে বলে এক্কা গাড়ি, দুটো ঘোড়ায় টানলে তাকে বলে জুড়িগাড়ি, চার ঘোড়ায় টানলে তাকে বলে চৌঘুড়ী। রাশিয়ায় পাশাপাশি তিন ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলে, তাকে বলে ট্রইকা (troika). চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে বড়লোকদের বিয়েতে ত্রিশ-চল্লিশটা ঘোড়ায় টানা গাড়িও দেখা যেত। প্রত্যেক ঘোড়ার পিঠে
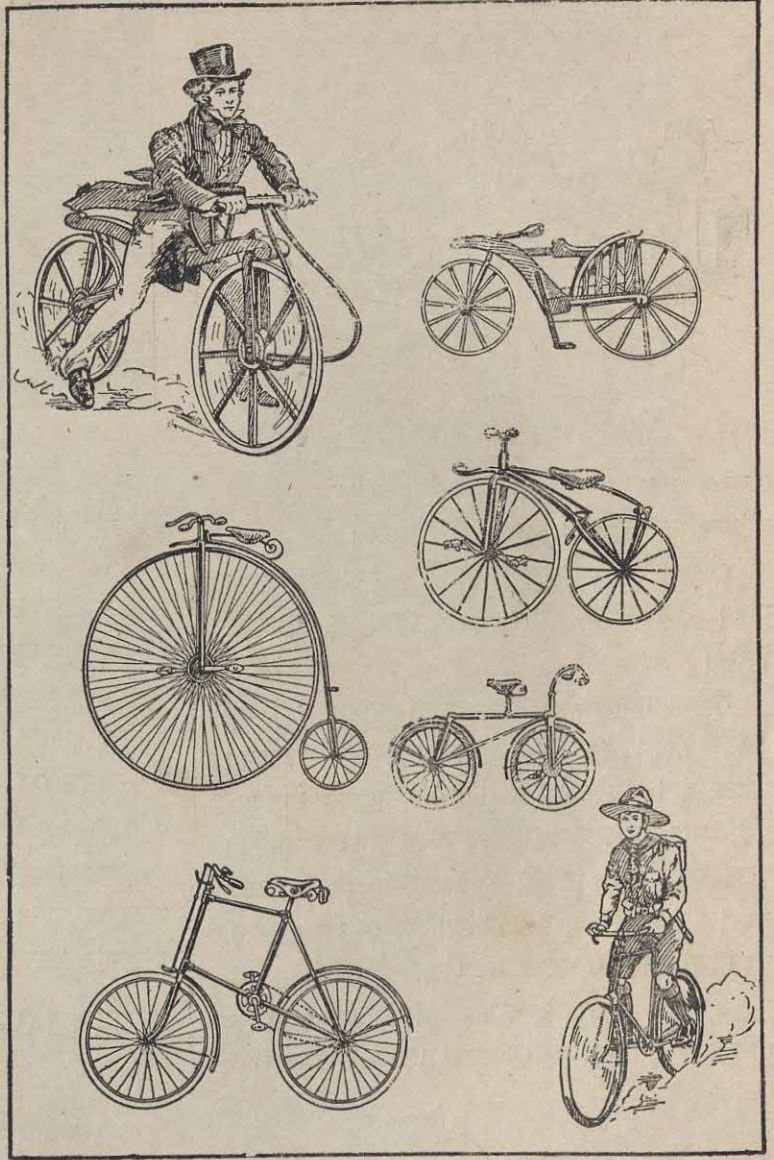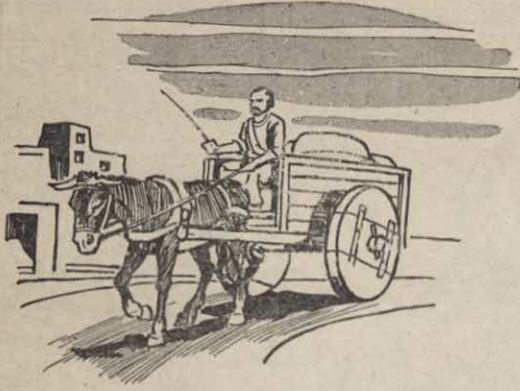
মাল-বহা এক ঘোড়ার গাড়ি

একজন সওয়ার বসত, আর সেই সওয়ারের, ঘোড়ার আর গাড়ির কতই না সাজসজ্জা থাকত!

ঘোড়ায়-টানা মাল-বহা গাড়িও অনেক দেশে দেখা যায়। এসব গাড়ি এক ঘোড়ায়ও টানে, দু ঘোড়ায়ও টানে।

সেকালে যুদ্ধে, এদেশে আর বিদেশেও, বড় বড় বীরেরা খোলা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যুদ্ধ করতেন। তাকে বলা হত রথ (chariot). বীরদের বলা হত রথী, আর যে সেই রথ চালাত তাকে বলা হত সারথি। যুদ্ধে রথের ব্যবহার অনেকদিন হল উঠে গিয়েছে। রথযাত্রা উৎসবের সময় জগন্নাথদেবের যে রথ বেরোয়, তা চাকাওয়ালা মন্দিরের মত।

এই রথ চলে রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনের ও যে-সব বাড়িতে জগন্নাথদেবের
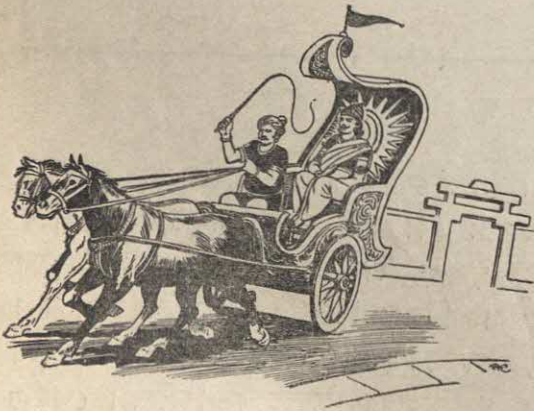
সেকালের রথ

উটে-টানা গাড়ি

পুজো হয় সেই-সব বাড়ির সামনের রাস্তায়। বছরের দুটো দিনে সেই রথে জগন্নাথ ঠাকুরকে বসিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওড়িশায় (উড়িষ্যায়) পুরী, আর পশ্চিমবঙ্গের মাহেশ—এই দুই জায়গার রথ খুব প্রকাণ্ড। তা টানতে অনেক লোকের দরকার হয়। কলকাতায় রানী রাসমণির বাড়ির রথও বড় ও তা রুপোর তৈরী।

অনেক দেশে উটে-টানা গাড়িও চলে। আফ্রিকা, এশিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই এসব গাড়ি চলে।

বলদে-টানা গাড়িকে গরুর গাড়ি বলা হয়। এখনো ভারতের বহু জায়গায় তা চলে। তাতে যাত্রী যাতায়াত করে, মালও বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

॥ বাষ্পের ও পেট্রোলের সাহায্যে গাড়ি চালানো ॥

অনেকদিন পর্যন্ত মানুষ কিংবা অন্য কোনও প্রাণীর শক্তিতেই গাড়ি চালাতে হয়েছে। তারপর মানুষ ক্রমশঃ
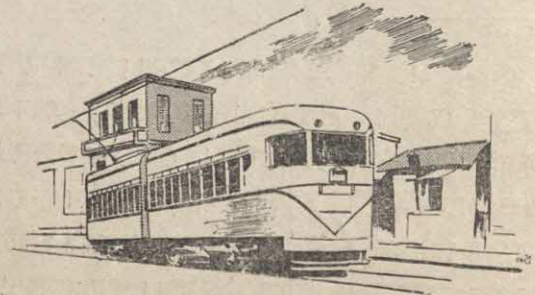
ট্রামগাড়ি

অন্য জিনিসের শক্তিকে এই কাজে লাগাতে শিখল, যেমন—জলীয় বাষ্প, বিদ্যুৎ, পেট্রোল আর ডিজেল তেল। এদের দিয়ে কাজ করবার জন্যে নানারকম যন্ত্রও বেরোতে লাগল। আজকাল সেই সব যন্ত্রের গাড়িই বেশী চলছে। মোটরগাড়ি, মোটরসাইকেল, স্কুটার, বাস, লরী—এ সব চলে পেট্রোলের জোরে। রেলগাড়ির এঞ্জিন চলে বাষ্প কিংবা বিদ্যুতের শক্তিতে। আর ট্রামগাড়ি চলে বিদ্যুতের শক্তিতে। ডিজেল তেলে চলে অনেক বাস, লরী আর রেলগাড়ির এঞ্জিন।

রেলগাড়ির মতো ট্রামগাড়িও চলে মাটিতে পাতা লাইনের উপর দিয়ে। প্রথমে এই লাইন হত কাঠের, আর কাঠের লাইনকে বলা হয় 'ট্র্যাম'। তাই থেকে এই গাড়িরও নাম হয় ট্রামগাড়ি। আবার কেউ কেউ বলেন যে তা নয়, আউটরাম (Outram) বলে একজন ইংরেজ প্রথমে এই ধরনের লাইনে গাড়ি চালিয়েছিলেন বলে তাঁর নাম থেকে এর এই নাম হয়েছে। প্রথমে ঘোড়ায় ট্রামগাড়ি টানত, কলকাতায়ও তাই দেখা গিয়েছে। তারপর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বিদ্যুতের শক্তিতে ট্রামগাড়ি চালানো আরম্ভ হয়। বিদ্যুৎ আসে উপরে টাঙানো তার থেকে, গাড়ির মাথায় লাগানো একটা ডাণ্ডা বেয়ে। সেটাকে বলে টালী বা ট্রলী (trolley).

কোথাও কোথাও—যেমন ইংল্যাণ্ডের নটিংহামে—এরকম গাড়ি চলে, তার উপরে তার আর টালী

গটলিয়েব ডেমলার

থাকলেও সেটার নীচে লাইন পাতা নেই। তার চাকায় মোটরগাড়ির মতো টায়ার পরানো থাকে। তাকে বলে ট্রলী-বাস।

বাস কথাটা হচ্ছে 'ওমনিবাস' (omnibus) কথাটার সংক্ষেপ। এর অর্থ হল 'যা সবাইকে বয়'। প্রথমে বাসও ঘোড়ায় টানত। এখন তো সেগুলো মোটর-বাস হয়েছে, পেট্রোলে তার যন্ত্র চলে। এই যন্ত্রকে বলে এঞ্জিন (engine).
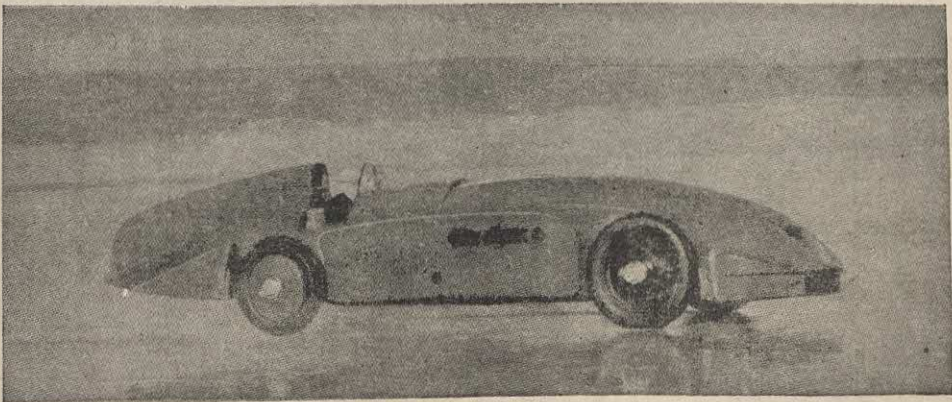
দ্রুতগামী মোটরগাড়ি
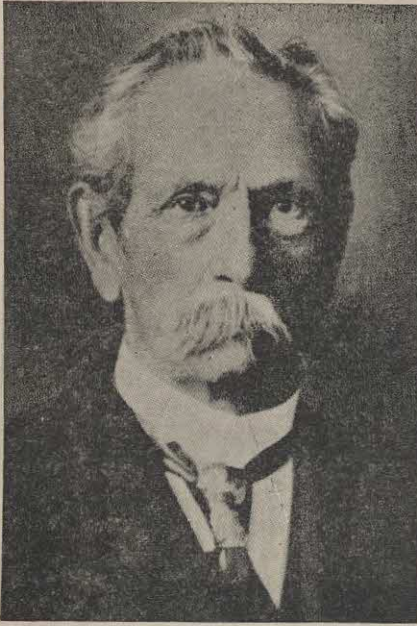
কার্ল বেন্‌ৎস্‌

প্রায় ৯০ বছর আগে দু'জন জার্মান—গটলিয়েব ডেমলার (Gottlieb Daimler—১৮৩৪-১৯০০ খ্রীঃ) আর কার্ল বেন্‌ৎস্‌ (Carl Benz—১৮৪৪-১৯২৭ খ্রীঃ) এই এঞ্জিন বের করেন। এই এঞ্জিন চলে পেট্রোলের ক্রমাগত বিস্ফোরণের ফলে। একে বলে Internal Combustion Engine. তারপর নিত্যি তার কত অদলবদল, কত উন্নতি করা হচ্ছে, তাতে মোটরগাড়ির এঞ্জিন একটা বেশ জটিল জিনিস হয়ে উঠেছে। আজকাল তার কত শত অংশ, তাও আবার এক-এক গাড়িতে এক-এক রকমের।
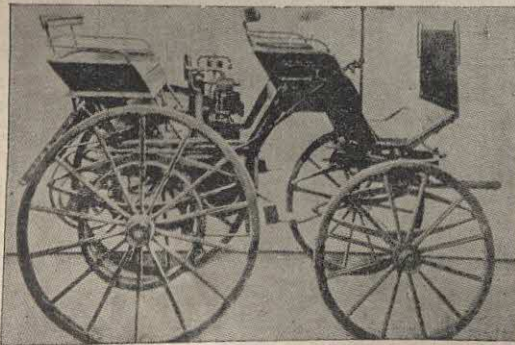
ডেমলার-আবিষ্কৃত প্রথম মোটরগাড়ি
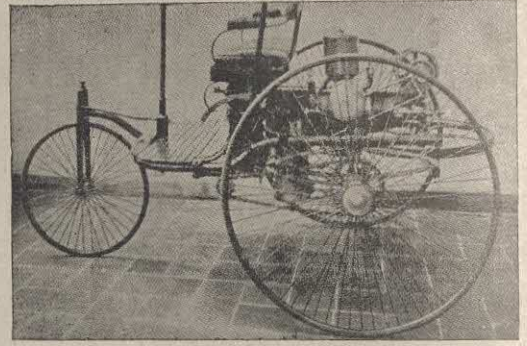
বেন্‌ৎসের আবিষ্কৃত প্রথম মোটরগাড়ি

এই নিয়মে শুধু মোটরগাড়ি নয়, অনেক রকমের গাড়িই চলে। তাদের কতরকম চেহারা, কতরকম নাম। মানুষকে বইবার জন্যে মোটরগাড়ি, মোটর-সাইকেল, স্কুটার, জীপ, মোটর-বাস। মাল বইবার জন্যে মোটর-ভ্যান, লরী বা ট্রাক, তিন চাকার টেমপো। আজকালকার মানুষের সবচাইতে বেশী কাজ করে এই সব যান।

॥ রেলগাড়ি ॥

তা ছাড়া অবশ্য রেলগাড়ি আছে। 'রেল' মানে লোহার পাটি—মাটিতে পেতে তার উপর দিয়ে এ গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া হয় বলে একে বলে রেলগাড়ি। টেনে নেবার কাজটা করা হয় এঞ্জিন দিয়ে, কিন্তু সে এঞ্জিন মোটরগাড়ির মতো এঞ্জিন নয়। এ হলো স্টীম এঞ্জিন, কেননা এটা চলে স্টীম বা বাষ্পের চাপে। তবে তাতেও পিস্টন আর সিলিণ্ডার আছে। আর পিস্টনের ডাঁটি এমনভাবে চাকার সঙ্গে লাগানো আছে, যাতে পিস্টন নামা-ওঠা করলে চাকা ঘোরে।

রেলগাড়ির এঞ্জিনে বয়লার বলে একটা পাত্রে জল
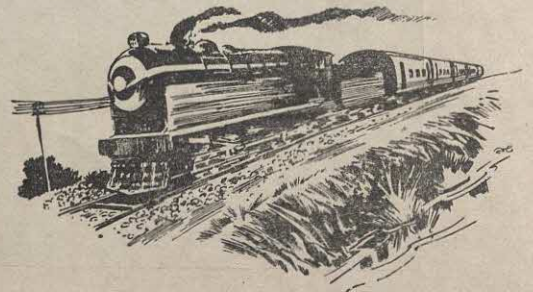
রেলগাড়ি

ফুটিয়ে বাষ্প করা হয়। সেই বাষ্প সিলিণ্ডারে এলে সেটা পিস্টনকে এমন ঠেলা মারে যে পিস্টনের সঙ্গে লাগানো চাকা ঘুরে যেতে বাধ্য হয়।

বাষ্পকে চেপে ধরলে তা যে দারুণ জোরে উলটো ঠেলা লাগাতে পারে, এ কথা প্রথম যিনি জেনেছিলেন তাঁর নাম জেম্‌স্ ওয়াট (১৭৩৬-১৮১৯ খ্রীঃ)। তারপর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াট ও তাঁর বন্ধু বোল্‌টন বাষ্প-চালিত এঞ্জিন, মানে কল, বের করলেন। ক্রমে তা দিয়ে জল তোলা, খনি থেকে কয়লা তোলা ইত্যাদি কাজ হতে লাগল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই এঞ্জিন জেম্‌স ওয়াটকে মেরামত করতে দেওয়া হয়
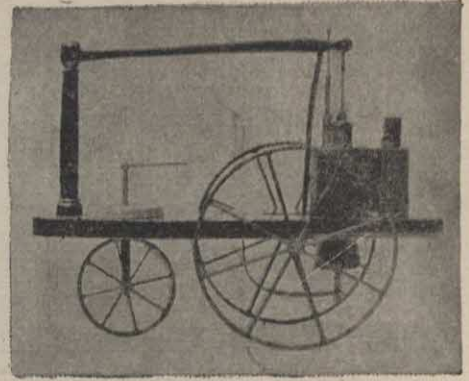
মার্ডকের তৈরী এঞ্জিন
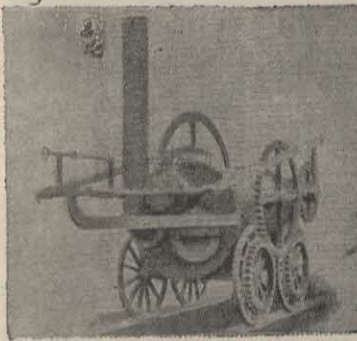
প্রথম বাষ্পীয় যান

জর্জ স্টিফেনসনের তৈরী রকেট এঞ্জিন

মার্ডকও একধরনের এঞ্জিন তৈরি করেন।

শেষে বাষ্পের জোরে গাড়ি চালাবার এঞ্জিন বের করলেন জর্জ স্টিফেনসন (১৭৮১-১৮৪৮ খ্রীঃ)।

পিটার কুপারের তৈরী 'টম থাম' এঞ্জিনও একসময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অনেক চেষ্টার পর শেষে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের স্টক্‌টন থেকে ডারলিংটন পর্যন্ত কয়েক মাইল রেললাইন পেতে প্রথম রেলগাড়ি চালানো হল। প্রথমে কিছুদিন দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে সেই রেলগাড়ির আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক নিশান হাতে ছুটত। তারপর, লোকের ভয় কমবার পর স্টিফেনসনের 'রকেট' এঞ্জিন ঘণ্টায় ৩৫ মাইল পর্যন্ত বেগে চলেছিল।

আজকালকার নতুন ধরনের এমন এঞ্জিনও হয়েছে যা ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগেও ছুটতে পারে।
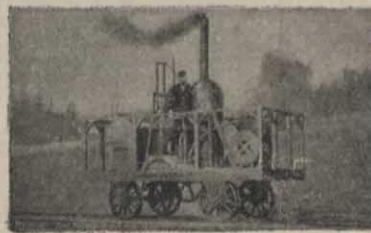
পিটার কুপারের তৈরী টম থাম (Tom Thumb) এঞ্জিন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় চালানো হয়
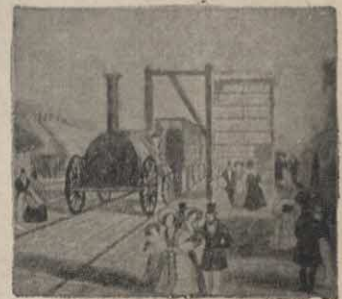
জর্জ স্টিফেনসনের তৈরী দ্বিতীয় এঞ্জিন
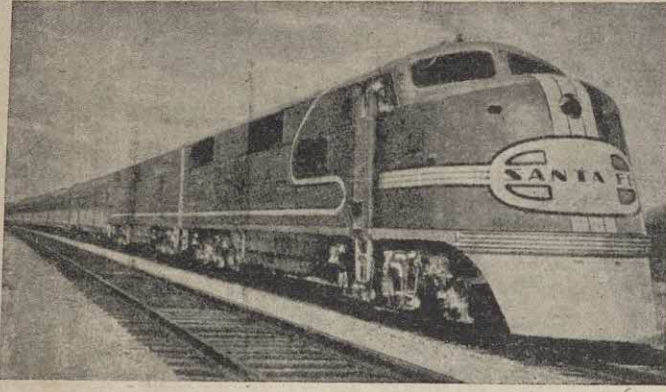
ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিন

তাছাড়া, বাষ্পের বদলে আজকাল ইলেকৃটি সিটি দিয়ে এঞ্জিন চালানোও হচ্ছে। নামে রেলগাড়ি হলেও আসলে এগুলো ট্রামগাড়িই—উপরে বিদ্যুতের তার, ছাদে ট্রলী, আর নীচে পাতা লাইন, সবই ট্রামগাড়ির মতন।

॥ পাতাল-রেল ॥

আমাদের দেশে মাটির তলায় সুড়ঙ্গ দিয়ে যাবার রেলপথ এখনও হয় নি, (যদিও কলকাতায় সেরকম রেলপথ পাতবার কাজ শুরু হয়েছে) কিন্তু ইওরোপ ও আমেরিকার কয়েকটা বড় শহরে তা আছে। শহরে জায়গার অভাব আর বেজায় ভিড়ের জন্যে এই ব্যবস্থা। লণ্ডন শহরে এই মাটির তলায় রেলপথকে বলে টিউব বা আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলওয়ে। প্রায় সারা লণ্ডন শহরের নীচেই এই সুড়ঙ্গ-রেলপথ আছে। এমনকি টেম্‌স্‌ নদীর জলের তলায় যে মাটি, তারও নীচে দিয়ে এই রেলপথ ওপারে গিয়ে উঠেছে। এটা স্যার মার্ক ইসামবার্ড ব্রুনেল নামে এক এঞ্জিনীয়ারের এক আশ্চর্য কীর্তি। এই পাতাল-রেলপথটাই পৃথিবীতে সকলের আগে, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়েছিল।

এখন প্যারিস, মাদ্রিদ, মস্কো, টোকিও, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক প্রভৃতি শহরেও পাতাল-রেল আছে। মস্কো-তে এর নাম 'মেট্রো'।

পাতাল-রেলের স্টেশনে যাবার ব্যবস্থাটা বেশ মজার। মাটির উপর থেকে ভিতরে নামবার জন্যে সিঁড়ি আছে। কিন্তু সে সিঁড়ি বেয়ে কাউকে কষ্ট করে নামতে বা উঠতে হবে না। সিঁড়ির একদিক্‌ ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে, অন্য
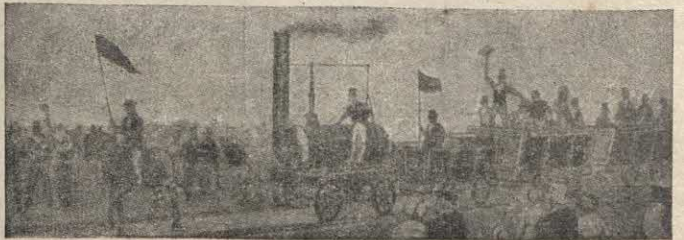
(উপরের ছবি) প্রথম বাস (মধ্যের ছবি) প্রথম সাইকেল (ভিলোসিপীড) (নীচের ছবি) প্রথম ট্রেন
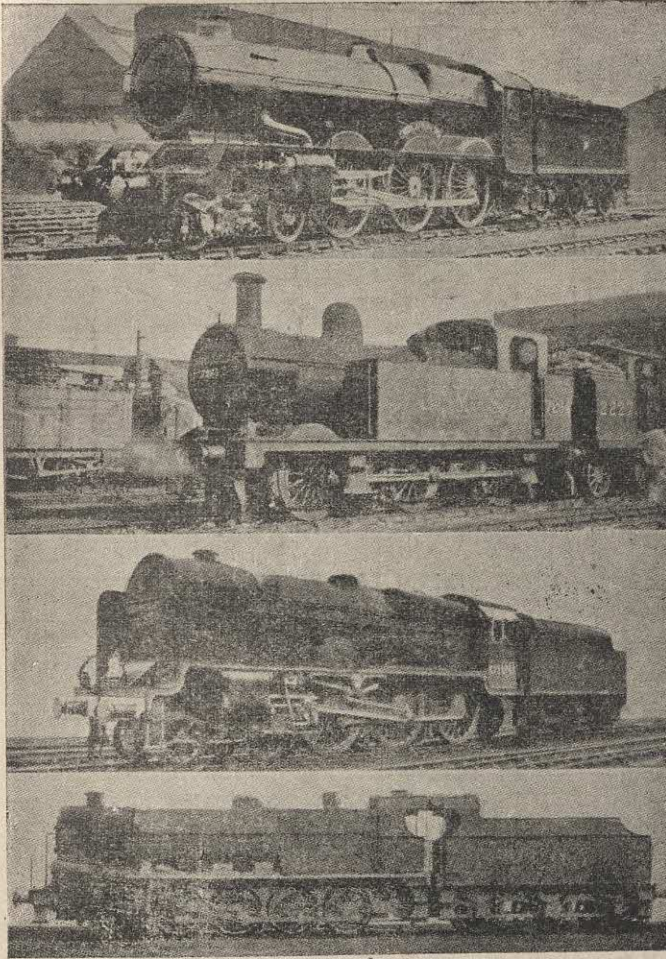
কয়েকটি দ্রুতগামী এঞ্জিন

দিক্‌টা উঠে আসছে। সবটা একটা গোলাকার চাকার মতো ঘুরছে। সামনে যে-ধাপটা পাওয়া যাবে, তার উপর দাঁড়িয়ে পড়লেই হল। সিঁড়িই যাত্রীকে নিয়ে নেমে যাবে, কিংবা উঠে আসবে। এটা বিদ্যুতে চলে। একে বলে এস্‌ক্যালেটর (escalator). কলকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে এস্‌ক্যালেটর আছে।

॥ মনো-রেল ॥

সাধারণতঃ রেলপথে দু'পাটি লোহার রেল পাতা থাকে, রেলগাড়ির তলাকার পাশাপাশি চাকা দুটো ঐ দুই রেললাইনের ওপর দিয়ে চলে। কিন্তু দুটোর বদলে একটি লাইন ধরে চলবার ব্যবস্থা থাকলে তাকে বলে মনো-রেল (mono-rail). সে ক্ষেত্রে অবশ্য ট্রেনের তলায় চাকা থাকে জোড়ায়-জোড়ায় নয়, একটা-একটা করে।

॥ রোপওয়ে (Ropeway) ॥

আবার একরকম গাড়ি আছে, সেটা দড়িতে ঝুলে ঝুলে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে চলে। পাহাড়ের এক মাথা থেকে আর এক মাথায় মাল বা যাত্রী নিয়ে যাবার জন্যেই এরকম দড়ি-পথ বা রোপওয়ের বেশী ব্যবহার। আমাদের কাছে পিঠে রাজগীর, দার্জিলিং ইত্যাদি জায়গায় রোপওয়ে আছে। দড়িটা খুব মোটা লোহার তারের হয়।

॥ গুণটানা নৌকো ॥

ডাঙার প্রাণী কিংবা মানুষ ডাঙায় থেকেও জলের যান টানে। নৌকো, ভেলা ইত্যাদি জলযানে দড়ি বেঁধে, নদী বা খালের ধারে ধারে হেঁটে মানুষ বা ঘোড়া সেটাকে টেনে নিয়ে যায়। এই দড়িকে বলে 'গুণ'; তাই এভাবে চালানোকে বলে গুণটানা।

॥ পালতোলা নৌকো ॥

তাছাড়া মানুষ হাওয়ার সাহায্যে তার জলযান চালিয়ে নেবার এক উপায় করেছিল আট হাজার বছর আগেই। তার জন্যে দরকার মাঝখানে পোঁতা

মানুষ গুণ টানছে, আর নৌকো চলছে

একটা উঁচু খুঁটি—তাকে বলে মাস্তল। তা থেকে ছোট বড় নানারকমের কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়—তাকে বলে পাল বা বাদাম।

একেবারে গোড়ার দিকে চামড়া জুড়ে জুড়েও পাল খাটানো হত। প্রাচীন মিশরে প্যাপাইরাস গাছের ছালের ফালি বুনে, আর প্রাচীন চীনদেশে মাদুর বুনে তাই দিয়েও পাল খাটানো হত। আর আজকাল শৌখিন নৌকোয় নাইলনের পালও থাকে। পালের নীচের দুইকোনা দড়ি দিয়ে পাটাতনের সঙ্গে বাঁধা থাকে। হাওয়া সেই পালে লেগে তাকে ঠেলতে থাকে। তখন ভেলা, নৌকো, এমন কি বেশ বড় জাহাজ পর্যন্ত, সেই হাওয়ার ঠেলায় তরতর করে জলের উপর দিয়ে ছুটে চলে।

॥ ভেলা ॥

জলে চলবার জন্যে সকলের আগে বোধ হয় ভেলা তৈরী হয়েছিল। কয়েকটা হালকা গাছের গুঁড়িকে পাশাপাশি বিছিয়ে একসঙ্গে বেঁধে ভেলা তৈরি করা হয়। পাশাপাশি কলাগাছ সাজিয়েও ভেলা তৈরী করা যায়, তাকে বলে মান্দাস। বেহুলার গল্পে আছে যে তিনি তাঁর মৃত স্বামী লখিন্দরের দেহ নিয়ে কলার মান্দাসে চড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। অগভীর জলে লগি ঠেলে ভেলা চালানো হয়। লগি হচ্ছে লম্বা বাঁশ, ভেলার উপর দাঁড়িয়ে সেটা দিয়ে জলের তলার মাটিতে খোঁচা মারাকে বলে লগি মারা বা লগি ঠেলা। কিন্তু বেশী গভীর জলে লগি মারা যায় না, ভেলা স্রোতে ভেসে চলে—তাইতে সেটা যেদিকে নদী বয়ে যাচ্ছে,

ভেলা

মশক নিয়ে নদী পার

শুধু সেইদিকেই যেতে পারে। ভেলাকে স্রোতের বিপরীতে চালানো যায় না।

ভেলায় চড়ে নরওয়ের লোক থর হেইয়েরডাল আর তাঁর পাঁচজন সঙ্গী কয়েক বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগর প্রায় পার হয়েছিলেন। সে এক ভারী দুঃসাহসিক অভিযান। তাঁদের ভেলার নাম ছিল 'কন্‌-টিকি'।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী কলকাতার গঙ্গার 'আউট্রাম ঘাট' থেকে পিনাকী চট্টোপাধ্যায় ও জর্জ এলবার্ট ডিউক নামে দুই ভারতীয় যুবক ২০।২৫ ফুট একটা দাঁড়টানা নৌকোয় দিগন্তহীন ভারত মহাসমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে ৮০০ মাইল জলপথ ভেঙে আন্দামান দ্বীপমালার পোর্ট ব্লেয়ারে এসে হাজির হন। নৌকোটির নাম 'কনোজী আংরে'। নৌকোয় চড়ে গেলেও এ অভিযানটি ছিল দারুণ দুঃসাহসিক।

জলে ভেসে থাকে এমন অনেক জিনিসকেই জলযান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন চামড়ার মশক। মশক জিনিসটা হচ্ছে একটা পশুর আস্ত চামড়া, গলা কাটা আর চার পা কাটা মতো। সাধারণতঃ তাতে করে জল বওয়া হয়। কিন্তু আগেকার দিনে কোনও কোনও দেশে নদী পার হবার জন্যে লোকে মশক ব্যবহার করত। মশকে হাওয়া ভরে, আর মুখটা বেঁধে, তার উপর উপুড় হয়ে পড়ে, দুই হাতে জল ঠেলে এগিয়ে যাওয়া যায়। ইতিহাসে আছে যে মোগল বাদশা হুমায়ুন একবার যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যাবার জন্যে একটা মশকের সাহায্যে গঙ্গা পার হয়েছিলেন।

॥ কত রকমের নৌকো ॥

জলের যানকে চালাতে হলে জলটাকে ঠেলতে হয়। মশককে চালাতে হলে হাত দিয়ে জল ঠেলতে হয়। তার বদলে চেপটা মাথাওলা কাঠ দিয়ে জল ঠেললে আরও সুবিধে হয়। এরকম কাঠকে বলে 'দাঁড়' বা 'বইঠা'।

জলযানের মধ্যে প্রধান আর সব চাইতে সংখ্যায় বেশী চলে নৌকো। মানুষ খুব প্রাচীনকাল থেকেই নানা রকমের নৌকো ব্যবহার করছে। প্রথমে বোধ হয় নৌকো হত গোলগাল—বেত বুনে তৈরী, আর চামড়া দিয়ে ছাওয়া।

॥ ডোঙা বা শাল্‌তি ॥

গোল নৌকো ঘুরে ঘুরে যায়, চালানোও অসুবিধে, তাই লম্বা লম্বা নৌকো তৈরী হতে লাগল। তার মধ্যে একরকম হল ডোঙা বা শাল্‌তি। কোনও গাছের সোজা লম্বা গুঁড়ির একধারটা লম্বালম্বি খুদে ফেলে মানুষ বসবার আর বোঝা রাখবার জায়গা করা হয়। তালগাছের এরকম ডোঙা আমাদের খালে-বিলে লগি দিয়ে ঠেলে নিয়ে যেতে দেখা যায়। প্রাচীনকালে ধারালো পাথর দিয়ে কেটে, আর ভিতরটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে খোদাইয়ের কাজটা করা হত।

॥ ক্যানু ও উমিয়াক ॥

রেড ইণ্ডিয়ানরা একরকম চামড়ার খোলের হালকা নৌকো তৈরি করে—তার নাম 'ক্যানু' (canoe).

উত্তরমেরু অঞ্চলে উমিয়াক (মেয়েদের নৌকো)

তালগাছের ডোঙা

এস্কিমোদের কায়াক আর উমিয়াক

ভার বহার জন্যে ব্যবহৃত হয়—এ নৌকো খুব বড়—এর উপর কোন আচ্ছাদন থাকে না। এতে মেয়েদের, ছেলেদের ও ঘরকন্নার জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয়। কোথাও যেতে গেলে এস্কিমোরা মালপত্র, ছেলেমেয়ে নিয়ে উমিয়াকে চড়ে।

॥ কায়াক ॥

উত্তরমেরু অঞ্চলের অধিবাসীদের হালকা নৌকোকে বলে কায়াক। তিমির হাড় আর জলে-ভেসে-আসা কাঠ দিয়ে এই নৌকোর কাঠামো তৈরী হয়। তারপর সীল-এর চামড়া দিয়ে এর গা ঢাকা দেওয়া হয়। কায়াকে করে একজন মাত্র যেতে পারে। এর উপর-নীচ সব সীলের চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে। নৌকোচালক এর মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। এ নৌকো খুব হালকা আর দ্রুতগামী। এ নৌকো চালানোর কৌশল এস্কিমোরাই জানে। কায়াক সীল ও সিন্ধুঘোটক শিকারের কাজে লাগে। এর দ্বারা বেশী বোঝা বহা যায় না।

॥ ডিঙি, পানসি, বজরা ইত্যাদি ॥

কাঠের খোলের নৌকোই সব দেশে চিরকাল বেশী চলে আসছে। তা যে কত রকমের হয়, তা বলে শেষ করা যায় না। এক-এক ধরনের নৌকোর এক-এক নাম। পশ্চিমবঙ্গের নদীতে ডিঙি, পানসি, বজরা, ভাউলে, ভড়, বালাম, ছিপ, কোষা ইত্যাদি হরেক রকমের আর ভিন্ন ভিন্ন চেহারার নৌকো দেখা যেত—এখন এদের কোনও কোনওটাকে আর দেখা যায় না।

রেড ইণ্ডিয়ানদের ক্যানু

নৌকো'। নদীর এপার ওপার করে যে ভাড়াটে নৌকো, তাকে বলে খেয়া নৌকো।

॥ ভাইকিংদের জাহাজ ॥

মাল বইবার জন্যে আজকালও খুব বড় বড় নৌকো দেখা যায়। কিন্তু দুশো বছর আগে পর্যন্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকোয় চড়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া হত, কিংবা জলে যুদ্ধ করা হত। এক সময়ে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক থেকে জলদস্যুরা এসে ইংলণ্ডে উৎপাত করত। এই জলদস্যুদের নাম ছিল ভাইকিং। এরা একরকম দুর্ধর্ষ জাত। এদের নৌকো ছিল কাঠের। তাতে অনেক দাঁড় থাকত।

রোমানরা ভূমধ্যসাগরে যে-সব বড় বড় যুদ্ধের নৌকো চালাত, সেগুলোতে নাকি ছতলা পর্যন্ত থাকত। প্রত্যেক তলায় দুপাশে দুসারি লোক বসে দাঁড় টানত। এরকম দোতলা নৌকোকে বলত বাইরীম

সেকালে জলযুদ্ধে ছিপ আর কোষা ব্যবহার করা হত। ভড়, বালাম, ভাউলে হচ্ছে মাল বইবার নৌকো। ডিঙি, পানসি, বজরা—এগুলো হল মানুষের যাওয়া-আসার নৌকো।

পানসি ও বজরার চলন আজকাল বিশেষ আর নেই। তাতে কাঠের তৈরী ঘর থাকে, সাধারণতঃ বড় বড় লোকেরা আমোদ করে বজরায় চড়ে নদীতে বেড়ান। এ ধরনের নৌকো কাশ্মীরে খুব দেখা যায়। তাকে বলে হাউস-বোট, মানে, নৌকো-বাড়ি। তার সঙ্গে একরকমের ছোট ডিঙি থাকে, তাকে বলে শিকারা।

॥ গহনার নৌকো ॥

ডিঙি নৌকোয় সাধারণতঃ কোনও ঘর-টর থাকে না। তবে, ভাড়াটে ডিঙি নৌকোতে মাঝখানটায় একটা ছই (মানে, দরমার তৈরী দুধারে ঢালু ছাদ) থাকে। বাংলাদেশে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে বড় বড় ভাড়াটে নৌকো যাত্রী নিয়ে বাঁধাধরা দুই জায়গার মধ্যে যাতায়াত করে, তাকে বলে 'গহনার ('বা [illegible] :গয়নার[illegible])

ভেনিসের গণ্ডোলা

(bireme), আর তিনতলা নৌকোর নাম ছিল ট্রাইরীম (trireme). তাতে প্রায় দুশো লোকে দাঁড় টানত বলে বিশাল নৌকোগুলোও বেশ তাড়াতাড়ি চলত।

॥ গণ্ডোলা ॥

ভেনিসের 'গণ্ডোলা' দেখতে বড় চমৎকার। ভেনিস হল খালের শহর। গণ্ডোলা এখানকার প্রধান যান।

নৌকোর কাজ হয়ে গেলেই মানুষ তা থেকে ডাঙায় নেমে আসে, কেননা ডাঙাতেই মানুষের ঘরবাড়ি। কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় মানুষ নৌকোতেই বাসা বেঁধে জলের উপরেই জীবন কাটিয়ে দেয়। সত্যি সত্যি এগুলোকেই হাউস-বোট বলা উচিত। চীনদেশে ক্যান্টন শহরে গেলে দেখা যাবে অসংখ্য পরিবার খালের মধ্যে নৌকোয় বাস করছে। ডাঙায় তাদের ঘরদোর নেই, তাদের জন্মমৃত্যু সবই ঐ নৌকোতে।

॥ কলম্বাসের সময়কার জাহাজ ॥

সমুদ্রে চলতে পারে এবং তিন-চার-পাঁচতলা নৌকোকে বলে জাহাজ। দুঃসাহসী মানুষ ছোট নৌকোয় করেও সমুদ্রে যেতে কোনও কালে ভয় পায় নি। কিন্তু বড় বড় জাহাজে চড়ে সমুদ্রে যাওয়াটা বেশী সুবিধের। অবশ্য, জাহাজ বলতে এখন আমরা যা বুঝি, আগেকার জাহাজ সে রকম ছিল না। তখন তো যন্ত্র ছিল না, অথচ জাহাজগুলো এত বড় ছিল যে দাঁড় টেনেও তাকে ঠিকমতো সামলানো যেত না। কাজেই আগেকার দিনের জাহাজ সমুদ্রে চলাফেরা করত স্রোতের টানে, আর হাওয়ার জোরে—মানে, পালের সাহায্যে। সব জাহাজই ছিল পালতোলা জাহাজ। নানান আকারের অনেকগুলি পাল খাটিয়ে, আর নানান কায়দায় সেগুলোকে সাজিয়ে, তাতে হাওয়া ধরা হত। কিন্তু হাওয়া একেবারে না থাকলেই মুশকিল হত, জাহাজ প্রায় অচল হয়ে পড়ত। স্রোতের উলটো দিকে যাওয়াও তার পক্ষে শক্ত ছিল। আজকাল যন্ত্রের জোরে সমুদ্রে জাহাজ চলে, হাওয়া আর স্রোতের তোয়াক্কা সে রাখে
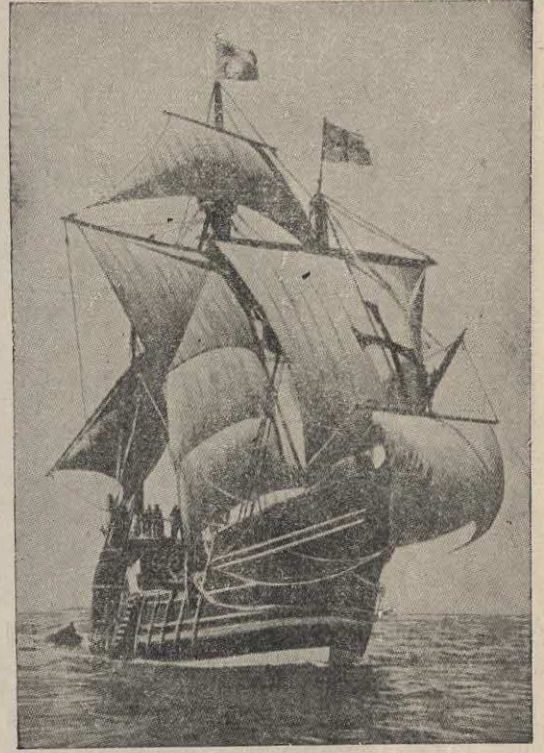
কলম্বাসের জাহাজ

না। কলম্বাস এমনি এক পালতোলা জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর তিনখানা জাহাজের নাম ছিল নিনা, পিণ্টা আর সান্তা মারিয়া।

॥ মে-ফ্লাওয়ার জাহাজ ॥

'মে-ফ্লাওয়ার' (May-flower) সেকেলে পালতোলা একটি জাহাজের নাম। আমেরিকার ইতিহাসে এই নামটি বিখ্যাত হয়ে আছে। এই জাহাজে চড়ে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ১০০ জন নির্যাতিত ইংরেজ পিউরিটান ইংল্যাণ্ডের প্লিমাথ থেকে রওনা হয়ে আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্ রাজ্যে ২১শে ডিসেম্বর এসে পৌঁছান। তাঁরাই ম্যাসাচুসেট্‌স্-এ প্রথম উপনিবেশ গড়েছিলেন।

॥ বাষ্পের জাহাজ ॥

প্রথমে বার হল বাষ্পের জোরে চলে এমন যন্ত্র। বাষ্পের জোরে ডাঙায় রেলগাড়ি চালাতে অনেক

চার মাস্তলওয়ালা জাহাজ

দেরি হয়েছিল বটে, কিন্তু জেমস্ ওয়াট বাষ্পের শক্তি কাজে লাগাবার উপায় বের করবার কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যেই বাষ্প দিয়ে নৌকো চালাবার এঞ্জিন বার হল। ক্রমে তার উন্নতি করে আরও প্রায় কুড়ি বছর বাদে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে ক্লাইড নদীতে মালের নৌকো টানবার এক এঞ্জিন চালিয়েছিলেন উইলিয়ম সাইমিংটন।

॥ পৃথিবীর প্রথম বাষ্পীয় তরী—ক্লারমণ্ট ॥

আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে রবার্ট ফুলটন নামে একজন চিত্রকর ছিলেন। ছবি আঁকা শিখতে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বাষ্পে-চালানো যন্ত্র দেখে এলেন। সেই থেকে তাঁর ছবি আঁকা ঘুচে গেল। বাষ্পে-চালানো জাহাজ তৈরী করা নিয়ে তিনি মেতে উঠলেন। তৈরি করলেন এক জাহাজ। লোকে ঠাট্টা করে সেটার নাম দিল 'ফুলটনের বোকামি' (Fulton's Folly). কিন্তু সেই জাহাজ সত্যিই ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে একদিন হাডসন নদীতে চলল। সে এক দৃশ্য! জাহাজের দুমাথায় দুই পাল খাটানো, মাঝখানটায় একটা চিমনি, আর দুপাশে দুই চাকা। চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আর দুই চাকা ঘুরে ঘুরে জল কাটছে। যারা ঠাট্টা করেছিল, তারা অবাক্ হয়ে দেখল, সেই জাহাজ ৩২ ঘণ্টায় চলে গেল ১৫০ মাইল।

এই হল পৃথিবীর প্রথম বাষ্পীয় তরী 'ক্লারমণ্ট'। এটা সমুদ্রে চলবার মতো ছিল না, তাই একে আমরা জাহাজ না বলে বলব স্টীমার।

ক্রমে সমুদ্রে যাবার জাহাজেও বাষ্পের কল বসানো হল, কিন্তু শুধু কলের ভরসায় না থেকে সে-সব জাহাজে পাল খাটাবারও ব্যবস্থা রাখা হত। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ' কলকাতায় এসেছিল ১১৩ দিনে।

॥ আরও বাষ্পীয় জাহাজ ॥

তারপর, শুধু কলে চালাবার জন্যেই বিশেষ করে তৈরী হল 'গ্রেট ওয়েস্টার্ন' জাহাজ। এটাই প্রথম জাহাজ যা বাষ্পের জোরে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়েছিল (১৮৩৮ খ্রীঃ)। এরপর তৈরী হল 'গ্রেটব্রিটেন' জাহাজ। এতে দুটো নতুনত্ব ছিল। এতকাল জাহাজের খোল কাঠের তৈরি ছিল, আর জল কাটত দুপাশে চাকা ঘুরিয়ে। কিন্তু গ্রেটব্রিটেন জাহাজের খোল হল লোহার, আর এতে পিছন

মে-ফ্লাওয়ার

দিকে লাগানো হল স্ক্রু-প্রোপেলার। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সব জাহাজের খোলই লোহা কিংবা ইস্পাতের হয়ে আসছে, আর স্ক্রু-প্রোপেলার ঘুরিয়ে তারা জল কেটে চলে। স্ক্রু-প্রোপেলার জিনিসটা হচ্ছে খাড়া একটা ডাণ্ডা, আর তার গায়ে স্ক্রুয়ের প্যাঁচের মতো করে সাজানো পাখনা থাকে, সেগুলোই ঘুরে ঘুরে জল কাটে।

একেবারে গোড়ার দিকে কাঠ পুড়িয়ে, তারপর কয়লা পুড়িয়ে তার আঁচে জলকে বাষ্প করা হত। তারপর ক্রমে কয়লার বদলে পেট্রোল এল। তাছাড়া, আজকাল অনেক জাহাজই আর বাষ্পে চালানো যায় না, ডিজেল এঞ্জিনে চালানো হয়। তাদের আর স্টীমশিপ বলে না, বলা হয় মোটরশিপ। সে-সব জাহাজের কল (motor) আজকাল আবার বিদ্যুতেও চলে।

জাহাজের মধ্যে খাবার-ঘর

আজকালকার বড় বড় জাহাজে যাত্রীদের জন্য খাবার-ঘর, খেলার মাঠ, সাঁতারের পুকুর, সিনেমা, দোকানপাট ইত্যাদি অনেক কিছুই থাকে। দশ-বারো-চোদ্দতলা এক একটা জাহাজ, হাজার হাজার যাত্রী নিতে পারে, বলতে গেলে তারা ছোটখাট এক-একটি আধুনিক শহর।

॥ কুঈন মেরী জাহাজ ॥

'কুঈন মেরী' জাহাজখানা চৌদ্দতলা উঁচু, আর ১০১৮ ফুট লম্বা। এতে ২১০০ জন যাত্রী আর ১১০০ জন জাহাজের কর্মচারীর জায়গা ছিল। একটা খাবার-ঘর ছিল যাতে ৯০০ জন লোকের একসঙ্গে খেতে বসবার বন্দোবস্ত ছিল। মস্ত বড় বড় বসবার ঘরই ছিল পঁচিশটা। এই ভাসন্ত শহরটা ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করত। সাড়ে তিন দিন লাগত তার আটলান্টিক পার হতে। এ জাহাজ এখন আর চলে না। সেটাতে এখন আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়ার সমুদ্র-উপকূলে একটি ভাসমান হোটেল হয়েছে।

॥ বৃহত্তম জাহাজ : কুঈন এলিজাবেথ, এণ্টারপ্রাইজ ॥

কুঈন মেরীর চাইতেও বড় জাহাজ কুঈন এলিজাবেথ। সেটা লম্বায় ১০৩১ ফুট। এত বড় যাত্রিজাহাজ আর নেই। তবে, যুদ্ধজাহাজের মধ্যে একটা জাহাজ আছে এর চাইতেও লম্বা, ১১২৩ ফুট। সেটা হচ্ছে এরোপ্লেন বইবার জাহাজ। জাহাজখানা আমেরিকার, তার নাম 'এণ্টারপ্রাইজ'। কুঈন এলিজাবেথ হল চোদ্দ-তলা উঁচু, কিন্তু এণ্টার-প্রাইজ ২৩ তলা উঁচু জাহাজ। তার যে ছাদ, সেটাকে এরোপ্লেন নামবার-ওঠবার একটা বিশাল মাঠ বলা যেতে পারে। তাছাড়া তাতে শ'খানেক প্লেন থাকতে পারে। চার হাজার ছ'শো জন লোক এই জাহাজে কাজ করে।

কুঈন মেরী, কুঈন এলিজাবেথ ঘণ্টায় ৩৫-৩৬ মাইল বেগে চলতে পারত, এণ্টারপ্রাইজের গতিবেগ হল ঘণ্টায় ৪০ মাইলের উপরে।

এই জাহাজ বাষ্প, তেল কিংবা বিদ্যুতে চলে না—এদের চালায় পরমাণুর শক্তি। এই শক্তিতে যে বোমা ফাটানো হয়, তাকে বলে পরমাণু-বোমা বা অ্যাটম-বম। সে বড় সাংঘাতিক জিনিস। এর
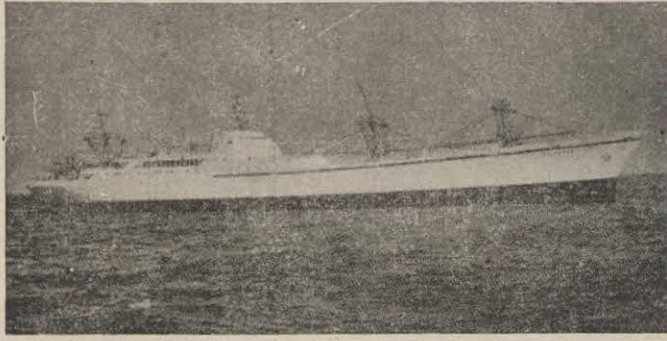
'সাভানা' জাহাজ

একটিমাত্র বোমা ফেলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা বলে একটি বড় শহরকে একেবারে ধ্বংস করা হয়েছিল।

॥ যুদ্ধ-জাহাজ ॥

যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, সৈন্য, এরোপ্লেন ইত্যাদি বহন করবার উপযোগী জাহাজ আজকাল বহু তৈরী হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানরা 'পকেট ব্যাট্‌লশিপ' নামে ছোট আকারের যুদ্ধ-জাহাজ তৈরি করেছিল।

পরমাণুর শক্তিতে যাত্রিজাহাজ চালাবারও ব্যবস্থা হয়েছে—আমেরিকার 'সাভানা' এই রকম একটি জাহাজ। চার-পাঁচ হাজার মাইল গেলেই অন্য সব জাহাজে তেল বা কয়লা নিতে হয়। কিন্তু এতে একদমে তিন লক্ষ মাইল যাওয়া চলে, মানে, একবারের ব্যবস্থায় এ জাহাজ সাড়ে তিন বছর চলাফেরা করতে পারে।

॥ ডুবো-জাহাজ ॥

ডুবো-জাহাজেও পরমাণুশক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। সেটাও আমেরিকার। তার নাম 'নটিলাস'। তাকে দিয়ে একবার এক আশ্চর্য ব্যাপার করা হয়েছিল। উত্তরমেরু হচ্ছে পৃথিবীর একেবারে উত্তরের অংশ, পুরু বরফে-ঢাকা সমুদ্র। জাহাজ তো চলে না, হেঁটে যাওয়াও অসম্ভব কষ্ট। কিন্তু নটিলাসকে এসব কষ্ট বাধা দিতে পারল না। সে ভুশ করে জলে ডুব দিয়ে বরফের তলা দিয়ে উত্তরমেরু পার হয়ে চলে গেল।

ডুবো-জাহাজ বা সাবমেরিন হচ্ছে এমন জাহাজ যা জলে ডুব দিয়েও চলতে পারে। প্রথম স্টীমার চালিয়েছিলেন যে রবার্ট ফুলটন, তিনিই প্রথম ডুবো-জাহাজ তৈরি করবার চেষ্টা করেন। ঠিক জিনিসটি তিনি তৈরি করতে পারেন নি। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকেরই মাথায় থাকে। একজন ফরাসী লেখক জুল ভার্ন (Jules Verne) তো একটি ডুবো-জাহাজ নিয়ে একখানি বই-ই লিখে ফেললেন। তার নাম—ইংরেজী অনুবাদে —'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ্‌স্ আণ্ডার দী সী'।

জুল ভার্ন এইভাবে ডুবো-জাহাজের কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু সত্যিসত্যি ডুবো-জাহাজ তখনও তৈরী হয় নি। তবে, সেটা এর কয়েক বছর বাদেই হল, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর থেকে ডুবো-জাহাজকে শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ ডোবাবার জন্যেই যুদ্ধে লাগানো হয়। টরপেডো বলে একরকম বোমা ছুড়ে যুদ্ধ-জাহাজ ডোবানো হয়। যাকে মারা হয় সে জলের তলায় যে ডুবো-জাহাজ আছে তা দেখতে পায় না। কিন্তু ডুবো-জাহাজ তাকে দেখে নেয় পেরিস্কোপ

পরমাণু-শক্তিতে চালিত 'নটিলাস'

বলে একটা যন্ত্রের সাহায্যে। এর আগাটা জলের উপর ভেসে থাকে। কলকাতায় খেলার মাঠে দর্শকদের হাতে ঐ ধরনের জিনিস দেখা যায়। ভিড়ের উপরে সেটাকে উঁচু করে ধরলে তার উপরকার আয়নায় খেলার মাঠের ছায়া পড়ে, তা থেকে ছায়া পড়ে নীচের একটা আয়নায়। সেখানে চোখ লাগিয়ে দিব্যি খেলা দেখা যায়। ডুবো-জাহাজের পেরিস্কোপ অবশ্য অতটা সোজা যন্ত্র নয়, কিন্তু আসলে তা দিয়ে ঐ রকম কাজই হয়ে থাকে।

॥ আকাশে ওড়া ॥

ডাঙায় চলা, আর জলে চলবার কথা বলা হল, এবার হাওয়ায় চলবার কথা বলি। আমাদের রামায়ণে পুষ্পক রথে চড়ে আকাশ পথে যাবার কথা আছে। গ্রীক পুরাণে আছে ডীডেলাস আর আই-কেরাসের কথা—তারা পালক জুড়ে ডানা তৈরি করে তার সাহায্যে সমুদ্রের ওপর উড়েছিল। শোনা যায় যে, পাঁচ শ' বছর আগে দান্তে (Dante) বলে একজন বিজ্ঞানী নকল পাখায় ভর দিয়ে একটা হ্রদের উপর খানিকক্ষণ সত্যিসত্যিই উড়েছিলেন। কিন্তু শেষটায় তিনি একটা বাড়ির উপর দিয়ে উড়ে যেতে গিয়ে পড়ে যান, আর তাতে তাঁর ঠ্যাং ভেঙে গিয়ে তাঁর ওড়া বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর পরে আরও যে দু'চারজন নকল পাখা বেঁধে ওড়বার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ঐরকম বিপদে পড়েছিলেন।

অটো লিলিয়েন্থাল (Otto Lilienthal) এক-রকমের পাখা তৈরি করে তার সাহায্যে আকাশে উড়বার চেষ্টা করেছিলেন। এই রকম দুঃসাহসিক কাজে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

কিন্তু এত অল্পে মানুষ নিরাশ হল না। তাকে আকাশে উড়তেই হবে—এই হল তার সংকল্প। কোনও কিছু তৈরি করে তাতে চড়ে ওড়া যায় কিনা তা সে ভাবতে শুরু করল। আমাদের রামায়ণে সেরকম একটি যানের কথা আছে, তার নাম পুষ্পক রথ।
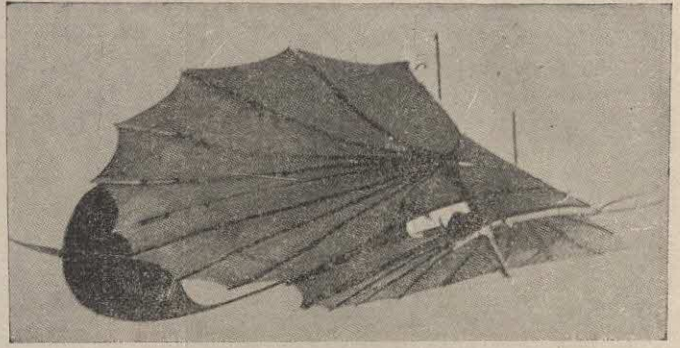
অটো লিলিয়েন্থাল এই বাদুড়ের মতো দেখতে নকল পাখায় ভর করে উড়তে চেষ্টা করেন

এই যে আকাশ, এটা হচ্ছে পৃথিবী-ঘেরা একটা হাওয়ার সমুদ্র ; তাই আকাশে ওঠা মানেই হাওয়ার মধ্যে ওঠা। ডাঙা ছেড়ে হাওয়ার মধ্যে উঠে চলবার পক্ষে বাধা হচ্ছে দুটো। একে তো আমাদের শরীর হাওয়ার চাইতে ভারী—ধোঁয়ার মতো কিংবা সাদা মেঘের মতো সেটা হালকা নয়। সেরকম হলে অবশ্য সুবিধে হত কিনা সন্দেহ, কেননা তা হলে আমাদের চিরকাল হাওয়াতেই ভেসে বেড়াতে হত, মাটিতে আর আমরা নামতে পারতাম না।

দ্বিতীয় বাধা হল—আকাশে ওড়বার কলকবজা মানুষের শরীরে নেই। অথচ তা আছে বলে মশা, মাছি ও পাখিরা হাওয়ার চাইতে ভারী হয়েও হাওয়ায় উড়তে পারে।

॥ বেলুন ॥

প্রথমে বেরোল হাওয়ার চাইতে হালকা আকাশ-যান। হাওয়ার চাইতে হালকা, অথচ মানুষের বোঝা নিয়ে উঠতে পারে, এমন জিনিস প্রথম তৈরি করেছিলেন ফ্রান্স দেশের জ্যাক এতিয়েন মঁগল্‌ফিয়ে (Jacques Etienne Montgolfier—১৭৪৫-১৭৯৯ খ্রীঃ) আর জোসেফ মিশেল মঁগল্‌ফিয়ে (Joseph Michel Montgolfier—১৭৪০-১৮১০ খ্রীঃ) নামে দুই ভাই। তাঁরা খেয়াল করেছিলেন যে অগ্নিকুণ্ডের উপর ছোট কাগজ ফেললে তা উপরে উঠে যায়। তার মানে, হাওয়া গরম হলে হালকা

মঁগল্‌ফিয়ে ভাইদের ওড়ানো বেলুন

হয়ে উপরে উঠে। পরীক্ষা হল ফানুস দিয়ে। কাগজের তৈরি ফানুসকে উপুড় করে ধরে, তার খোলা মুখের তলায় একটু আগুন জেলে দেওয়া হয়। তাতে হাওয়া গরম হয়ে থলির মধ্যে ঢোকে, ফানুসের থলিটা ফুলতে থাকে। একেবারে ভরতি হয়ে উঠলে সেটাকে ছেড়ে দিলেই ভিতরকার গরম হাওয়াটা ফানুসটাকে নিয়েই উপরে উঠে যায়। মঁগলফিয়ে ভাইয়েরা সেই জিনিসই তৈরি করলেন, তবে সেটা হল অনেক বড় আর কাপড়ের তৈরী। এর নাম হল বেলুন। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জুন তাঁদের প্রথম বেলুন আকাশে ওড়ানো হল।

ঐ বছরেই চার্লস বলে একজন বিজ্ঞানী হাইড্রোজেন গ্যাসভরা একটি বেলুন তৈরি করলেন। হাইড্রোজেন হচ্ছে সব গ্যাসের মধ্যে হালকা। হাইড্রোজেন-ভরা বেলুনের উপরে উঠবার ক্ষমতাও বেশী। কিন্তু সেই বেলুনে চড়ে আকাশে উড়তে কেউ সাহস পেল না। কাজেই চার্লসের বেলুনও মানুষ ছাড়াই আকাশে উড়ল। খানিকটা উঠে হাওয়ায় সে যখন খানিকদূর গিয়েছে, তখন তাতে ফুটো হয়ে গ্যাস বেরিয়ে যেতে লাগল, বেলুনটা হেলে-দুলে নামতে নামতে মাটিতে পড়ল।

যে গ্রামে পড়ল সে-গ্রামের লোকেরা কোনও জন্মে বেলুন দেখা তো দূরে থাক, বেলুনের কথাও শোনে নি। আকাশ থেকে একটা কিম্ভূতকিমাকার বিশাল জিনিস পড়তে দেখে তারা তো ভয় পেয়ে চম্পট দিল। কিন্তু খানিকক্ষণ বাদে যখন দেখা গেল যে জিনিসটা নড়ে-চড়ে না, তখন কয়েকজন সাহসী লোক একটু এগিয়ে এল। একজন বীরপুরুষ গিয়ে তাকে এক তরোয়ালের কোপ মারতেই হুহু করে গ্যাস বেরোতে লাগল। তা দেখে আবার সবাই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। খানিক-বাদে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখা গেল যে জিনিসটা একেবারে ছোট হয়ে নেতিয়ে পড়েছে, খোঁচা মারলেও আর নড়ে না। তখন সকলের আনন্দ আর ধরে না! বেলুনের খোলসটাকে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল সকলকে দেখাবার জন্যে।

এরপর মঁগল্‌ফিয়েরা যে-বেলুন ওড়ালেন, তার তলায় একটা খাঁচা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে চড়ে একটি ছাগল, একটি মোরগ আর একটি ভেড়া আকাশে ঘুরে বেশ নির্বিঘ্নে মাটিতে নেমে এল। এই প্রথম মর্ত্যের জীব বেলুনে চড়ল।

॥ বেলুনে প্রথম মানুষ ॥

এবার বেলুনে মানুষকে চড়াবার কথা উঠল। ফ্রান্সের এক রাজা বললেন যে, বেলুনে চড়লে মানুষের বেঁচে ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই, কাজেই যদি মানুষই পাঠাতে হয় তবে জেল থেকে দুজন ফাঁসির আসামীকেই প্রথম বেলুনে পাঠানো হোক। তাই শুনে পিলাৎর্ দ্য রোজীর (Rozier) নামে একজন বিজ্ঞানীর বড় দুঃখ হল—আকাশে সকলের আগে উড়বার যে বাহাদুরি, সেটা পাবে দুটো বাজে বদমাশ লোকে! তিনি অনেক চেষ্টা করে রাজার মত বদল করিয়ে নিজে বেলুনে চড়বার অনুমতি নিলেন। তারপর তিনি আর মার্কুইস দ্য আর্লাঁদ (D' Arlandes)

১

২

৩

৪

৫
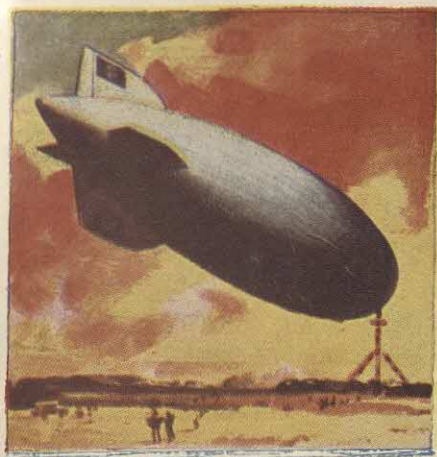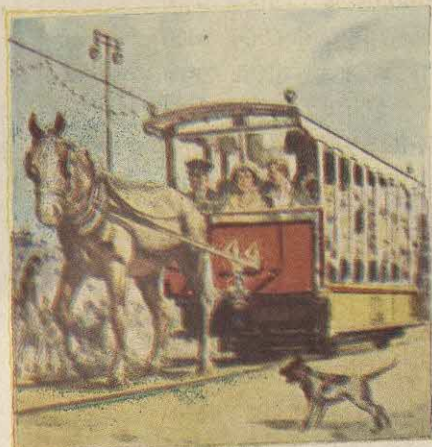
নানারকমের যানবাহন

যানবাহনের কথা

(নানারকমের যানবাহন)

[১] (Zeppelin) **জেপেলীন ঃ** এক রকম উড়ো জাহাজ। Ferdinand Count Zeppelin (১৮৩৮—১৯১৭ খ্রীঃ) নামে একজন জার্মান প্রথম এই ব্যোমযান ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি করেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেক উড়ো জাহাজ গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তৈরী হয়েছিল। এগুলি বৃহদাকৃতির ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এক বৃহদাকার জেপেলীন তৈরী হয়েছিল, তার নাম রাখা হয়েছিল গ্রাফ জেপেলীন।

[২] **মনো রেল** (Mono-rail) ঃ শূন্যে ঝোলানো এই রেলের চাকা উপর দিকে থাকে। লাইনও থাকে উপরে। সমস্ত রেলগাড়ি মাথার উপরের কলকবজার জোরে শূন্য দিয়ে চলে।

[৩] **টেলিফেরিক বোগী** (Telepheric Bogey)ঃ সুইট্-জারল্যাণ্ডের অধিকাংশ অংশ জুড়ে আছে আল্পস পর্বত। এখানকার পথঘাট তুষারে আবৃত। কিন্তু মানুষ এই বাধা পার হওয়ার উপায় বহু চেষ্টায় মাথা খাটিয়ে বার করেছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এক ঝুলন্ত কামরা তারের থেকে ঝুলে ঝুলে চলেছে। যান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে তুষার অঞ্চল পেরিয়ে যায়। এই বোগীর যা কিছু যন্ত্রপাতি, কল-কবজা সব উপরের দিকে।

[৪] **ঘোড়ায়-টানা ট্রাম গাড়ি ঃ** বাঁধা লাইনের উপর দিয়ে প্রথম প্রথম যে ট্রাম গাড়ি চলত তাকে ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যেত। ঊনবিংশ শতকের মধ্য ভাগে ইংল্যাণ্ডে প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রামের প্রচলন হয়েছিল। তারপর বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রাম চালানো হয়। উপর দিয়ে টানা তারের থেকে ট্রলির (Trolley) সাহায্যে বিদ্যুৎ নিয়ে এখন ট্রাম চলে।

[৫] **ঘোড়ায় টানা স্লেজ গাড়ি** (Sledge)ঃ উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে এবং রাশিয়ার তুষারক্ষেত্রে কুকুর ও বলগা হরিণে এক রকম গাড়ি টানে। সে সব গাড়িতে চাকা থাকে না। এদের নাম স্লেজ গাড়ি। সুইট্জারল্যাণ্ডের আলপ্স পাহাড় অঞ্চলের তুষার ঢাকা পথে ঘোড়ায় টানা এক রকম স্লেজ গাড়ি চলে।
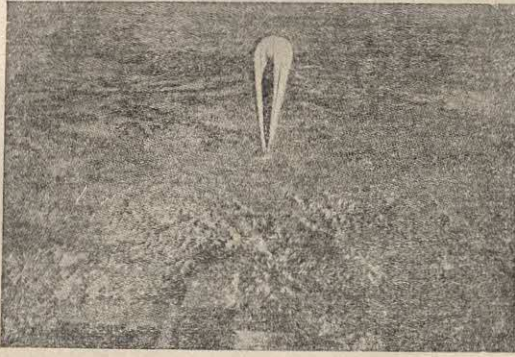
বেলুন শূন্যে উঠে যাচ্ছে

বেলুনে ঝোলানো ঝুড়িতে বসে আকাশে বেশ খানিকটা ঘুরে এলেন। মানুষের এই প্রথম আকাশে ওড়া। সে যাত্রা তাঁদের কোনও বিপদ হয় নি। কিন্তু এর পর আর একবার বেলুনে উড়ে যেতে যেতে সমুদ্রে পড়ে গিয়েই দ্য রোজীর প্রাণটি হারালেন।

এবার বেলুন তৈরি করে তাতে চড়ে ওড়ার খুব চলন হল। একজন তো ইংল্যাণ্ড থেকে রওনা হয়ে, সমুদ্র পার হয়ে, আঠার ঘণ্টায় জার্মানীর এক জায়গায় গিয়েছিলেন।

ক্রমে আমাদের এদেশেও একজন বেলুনবাজ দেখা দিলেন, তাঁর নাম ছিল রামচন্দ্র দত্ত। একশো বছরেরও বেশী হল, তিনি কলকাতার গড়ের মাঠে অনেক লোকের সামনে বেলুনে চড়ে আকাশে বেড়িয়েছিলেন।

॥ বেলুন চালাবার কৌশল ॥

বেলুনকে ইচ্ছেমতো এদিক্-ওদিক্ চালানো যায় না। হাওয়া যেদিকে, বেলুনও সেইদিকে ভেসে যাবে তার সঙ্গে। তবে একটা মজা এই যে, হাওয়া এক এক স্তরে এক এক দিকে বয়। একেবারে নীচে হয়তো উত্তুরে হাওয়া, তা ছাড়িয়ে উঠলেই হয়তো পুবে হাওয়া বইছে দেখা যাবে। কাজেই পুবে হাওয়ায় ভেসে যেতে চাইলে হাওয়ার সেই স্তরে উঠে যেতে হবে। সেইজন্যে বেলুনের যাত্রীর সঙ্গে বালির বস্তা থাকে। তা ফেলে দিয়ে বোঝা কমিয়ে দিলেই বেলুন উপরের স্তরে উঠে যেতে পারে। তারপর উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে যেতে চাইলে নীচের স্তরে নেমে আসতে হবে। তার জন্যে বেলুনে ছিপি আঁটা আছে, সেটা একটু খুলে দিতে হবে। তাতে খানিক গ্যাস বেরিয়ে যাবে এবং বেলুন নামতে থাকবে। যতটা দরকার, ততটা নেমে এসে ছিপি এঁটে দিলে বেলুন আর নামবে না। এই ছিল বেলুন চালাবার কৌশল।

॥ জেপেলিন ॥

কিন্তু এতে সকলে সন্তুষ্ট হলেন না। কেউ কেউ চেষ্টা করতে লাগলেন, কি করে বেলুনকে ইচ্ছেমতো এদিকে-ওদিকে চালানো যায়। অনেককাল ধরে অনেকের নানা চেষ্টার ফলে শেষে জার্মানীর কাউণ্ট ফার্ডিনাণ্ড জেপেলিন বা ৎসেপেলিন (Count Ferdinand Zeppelin—১৮৩৮-১৯১৭ খ্রীঃ) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যন্ত্রচালিত বা ডিরিজিব্‌ল্ (dirigible) বেলুন তৈরি করলেন। তাঁর নামে এই বেলুনের নাম হল জেপেলিন (Zeppelin). এর গা হল অতি হালকা অ্যালুমিনিয়ামে তৈরী, লম্বা সিগারের মতো তার চেহারা, তাতে খোপে খোপে হালকা গ্যাস ভরা। একে হাওয়াই জাহাজও (airship) বলা হত।

নতুন সব কিছুর মতোই এটাকে নিয়ে লোকে খুব মেতে গিয়েছিল। অনেক দেশই জেপেলিন তৈরি করতে শুরু করল। শেষে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ের ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড আমুণ্ড্‌সেন (Captain Roald Amundsen—১৮৭২-১৯২৮ খ্রীঃ) এই রকম বেলুনে করে উত্তর মেরু ঘুরে এলেন।

জেপেলিন

ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড আমুণ্ড্সেন

চেহারায় এগুলো হত প্রকাণ্ড। জার্মানীর 'গ্রাফ' (Graf) জেপেলিন ছিল ৭৭৬ ফুট লম্বা, অথচ তাতে চালাবার লোক ছাড়া যাত্রী যেতে পারত মোটে ২০ জন। তাই নিয়ে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সেটা প্রায় ২২ দিনে আকাশপথে পৃথিবীকে এক চক্কর দিয়ে এল। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

এর চাইতেও বড় হাওয়াই জাহাজ হয়েছিল আমেরিকার 'অ্যাক্রন', ৭৮৪ ফুট লম্বা। আর ইংরেজরা তৈরি করল R-101; সেটা হল ৮০৩ ফুট। কিন্তু আগুন লেগে সেটা ধ্বংস হয়ে গেল। শুধু R-101 নয়, আরও কয়েকটা হাওয়াই জাহাজেরও ঐ দশা হল।

তার উপর দেখা গেল যে এত বড় বিশাল দেহের তুলনায় এদের ক্ষমতা বড় কম। পাঁচশো হাত লম্বা একটা জাহাজ মোটে ২০ জন যাত্রী নিতে পারে, আর উড়তে পারে বড়জোর ঘণ্টায় মাইল পঞ্চাশেক! ক্রমে হাওয়াই জাহাজ তৈরী হওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

॥ এরোপ্লেন ॥

এর অনেক আগেই হাওয়ার চাইতে ভারী আকাশযান 'এরোপ্লেন' তৈরী হতে শুরু হয়েছিল। প্রথম এরোপ্লেন তৈরি করে তাতে চড়ে আকাশে উড়েছিলেন আমেরিকার দুই ভাই—উইলবার রাইট (Wilbur Wright—১৮৬৭-১৯১২ খ্রীঃ) আর অর্ভিল রাইট (Orville Wright—১৮৭১-১৯৪৮ খ্রীঃ)। সাত-আট বছর ধরে তাঁরা চেষ্টা করছিলেন এমন একটা যন্ত্র তৈরি করতে, যা নিজের শক্তিতেই মানুষকে নিয়ে আকাশে উড়তে পারবে। কত খেটে-খুটে, কতবার ভুল করে, কতবার ব্যর্থ হয়ে শেষে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা একটি এরোপ্লেন তৈরি করলেন। কিটি হক (Kitty Hawk) বলে এক জায়গায় তাঁরা তাঁদের কাজ চালাচ্ছিলেন। পাগলের খেয়াল ভেবে প্রথমে কেউ তা গ্রাহ্যও করে নি।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর তাঁদের চেষ্টা সফল হল। তাঁদের তৈরী এরোপ্লেন চার-চারবার মাটি ছেড়ে আকাশে উঠতে পারল। শেষের বারে উইলবার প্লেনে চড়ে ৮৫২ ফুট একনাগাড়ে উড়ে গেলেন। তাতে তিনি একটানা ৫৯ সেকেণ্ড আকাশে ছিলেন।

এতবড় ব্যাপারটা হয়ে গেল, কিন্তু কেউ এর গুরুত্ব বুঝল না। যারা শুনল, তারা ভাবল—'এ আবার একটা ওড়া নাকি? পুরো এক মিনিটও তো নয়!' কিন্তু তাদের টনক নড়ল যখন বছর দেড়েক বাদে অর্ভিল একেবারে ২৪ মাইল উড়ে গেলেন তাঁদের তৈরী প্লেনে চড়ে। তখন ইওরোপ ও আমেরিকায় হুলুস্থুল লেগে গেল দুই ভাইকে নিয়ে।

অন্য অন্য দেশেও এরোপ্লেন তৈরি করবার চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে ফ্রান্সে ব্লেরিঅট, স্যাণ্টোস-ডুমণ্ট, ফারমান প্রভৃতি কয়েকজন এরোপ্লেন তৈরি করে উড়েছিলেন। ব্লেরিঅট উড়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন। বড় বড় সব জাতিই চেষ্টা করতে লাগল যাতে আরও ভাল ভাল এরোপ্লেন তৈরি করা যায়।

॥ মহাযুদ্ধ ও এরোপ্লেন ॥

তারপর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ এল। এই মহাযুদ্ধে প্রথম বাঙালী বিমানবীর ইন্দ্রলাল

রায় যোগ দিয়েছিলেন। মেসোপোটেমিয়ায় এক বিমান-যুদ্ধে তিনি মারা যান। যুদ্ধে এরোপ্লেনের ব্যবহার হওয়ায় ক্রমেই অনেক ভাল প্লেন তৈরী হতে লাগল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এরোপ্লেনে মোট একজন যেতে পারত, আর সেটার বেগ ছিল ঘণ্টায় ৮০-৯০ মাইল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এমন প্লেন তৈরী হল যা ৪ জন লোক, তিনটে কামান আর ৩০০০ পাউণ্ড গুলি-বারুদ নিয়ে ঘণ্টায় দেড়শো মাইল বেগে উড়তে পারত।

নানারকম এরোপ্লেন

॥ এরোপ্লেনে আটলাণ্টিক পাড়ি ॥

যুদ্ধ থেমে যাবার পর এরোপ্লেনে চড়ে একবারও না নেমে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হবার চেষ্টা চলতে লাগল। প্রথম এই চেষ্টায় সফলতা লাভ করলেন অ্যালকক আর ব্রাউন, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। এই ১৯০০ মাইল সমুদ্র পার হতে কুঈন মেরীর মতো জাহাজেরও যেখানে সাড়ে তিন দিন লাগে, সেখানে মোটে ষোল ঘণ্টা লাগল এঁদের।

লিণ্ডবার্গ ও যে এরোপ্লেনে করে তিনি আটলাণ্টিক পার হয়েছিলেন

এঁরা তো তবু দু'জন একসঙ্গে ছিলেন, কিন্তু দুঃসাহসী বিমানবীর আমেরিকার চার্লস এ. লিণ্ডবার্গ (Charles A Lindbergh) ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে একাই তাঁর 'স্পিরিট অফ সেণ্ট লুই' বিমানে আটলাণ্টিক পার হলেন।

॥ এরোপ্লেনে উত্তর মেরু পাড়ি ॥

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার রিয়ার-অ্যাডমিরাল রিচার্ড ইভলিন বার্ড (Rear-Admiral Richard Evelyn Byrd—১৮৮৮-১৯৫৭ খ্রীঃ) এরোপ্লেনে করে উত্তর মেরু ঘুরে

রবার্ট এডুইন পিয়ারী

॥ এরোপ্লেনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ ॥

বাকী ছিল পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা। সেটা হল ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে। আমেরিকার ওয়াইলি পোস্ট (Wiley Post) এবং হ্যারল্ড গ্যাটি (Harold Gatty) সাড়ে আট দিনে ১০৬ ঘণ্টা উড়ে সারা পৃথিবী ঘুরে এলেন।

বেশির ভাগ এরোপ্লেনের চাকা থাকে। মাটি থেকে উঠবার আর মাটিতে নামবার সময় সেটা কাজে লাগে। কিন্তু পোস্ট আর গ্যাটির বিমানে ছিল দুটো বয়া লাগানো। বয়া হচ্ছে ফাঁপা জিনিস, জলে ভাসে। কাজেই তলায় বয়া লাগানো থাকলে সে বিমান জলে নামতে পারে, আর জলে ভেসে থাকে। তাকে বলে হাইড্রোপ্লেন বা হাইড্রো-এয়ার-প্লেন। যিনি ফন্দিটা প্রথম বের করে কাজে লাগিয়েছিলেন, তাঁর নাম ফাব্‌র্‌, তিনি ছিলেন একজন ফরাসী।

॥ হেলিকপ্‌টার ॥

এ ছাড়া আর একরকম এরোপ্লেন আছে, তাকে বলে হেলিকপ্‌টার। তার গুণ হচ্ছে এই যে সেটাতে ওঠানামার জন্যে খুব কম জায়গা লাগে। অন্য সব এরোপ্লেন খানিকটা দৌড়বার পর আকাশে উঠতে পারে, আর নামবার পরও তাদের মাটিতে খানিকটা ছুটতে হয়। কিন্তু হেলিকপ্‌টার খাড়াভাবে ওঠে, খাড়াভাবে নেমেও যেতে পারে। এর জন্যে তার একেবারে মাথায়

এলেন। এই উত্তর মেরুতে জলপথে আর ডাঙায় হেঁটে যেতে কতকাল ধরে কত সাহসী লোক কত কষ্ট পেয়েছেন, কত প্রাণ নষ্ট হয়েছে—শেষে কত দুর্ভোগের পর রিয়ার-অ্যাডমিরাল রবার্ট এডুইন পিয়ারী (Rear-Admiral Robert Edwin Peary—১৮৫৬-১৯২০ খ্রীঃ) ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে উত্তর মেরুতে পৌঁছেছিলেন। আর, বার্ড-এর উত্তর মেরু যেতে-আসতে লাগল মোটে সাড়ে পনেরো ঘণ্টা। আবার ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দেই রিয়ার-অ্যাডমিরাল রিচার্ড বার্ডই দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়েও ঘুরে এলেন।
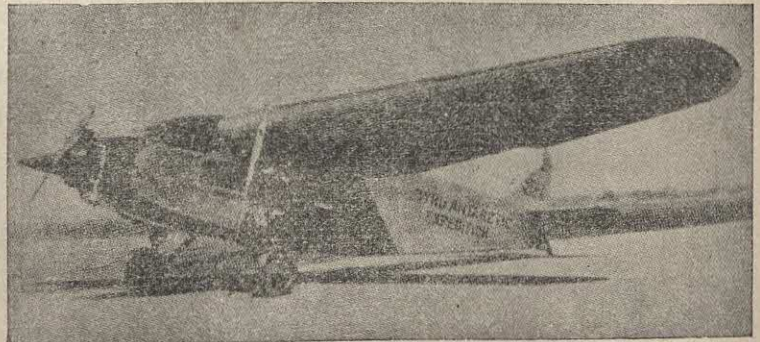
বার্ড যে এরোপ্লেনে মেরু অতিক্রম করেছিলেন

হেলিকপ্‌টার

মস্ত বড় টিং-করা পাখা থাকে, সেটা মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে ঘোরে—তাকে বলে রোটর (rotor), আর এরোপ্লেনের পাখা থাকে তার আগায়, সেটা ঘোরে উপর থেকে নীচে—তাকে বলে প্রপেলার (propeller).

হেলিকপ্‌টার আরও কয়েকটা কাজ করতে পারে। হেলিকপ্‌টার আকাশে উঠে একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, পাশের দিকে যেতে পারে, এমন কি পিছু হটতেও পারে।

॥ অটোজাইরো ॥

অটোজাইরো (autogiro)-তে রোটর আর প্রপেলার দুই-ই থাকে। কাজেই এ ঠিক এরোপ্লেনও নয়, পুরোপুরি হেলিকপ্‌টারও নয়।

মোটর গাড়ি, রেলগাড়ি আর জাহাজের মতো এরোপ্লেনেরও বর্তমানে যা উন্নতি হয়েছে, তা শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। আজকাল যে জেট প্লেন চলছে, সেই জেট প্লেনের আগেকার যুগেও মানুষ মোটে ৭৩ ঘণ্টায় পৃথিবী চক্কর দিয়ে এসেছে। এত বড় বড় প্লেন হয়েছে, যা প্রায় ২০০ জন লোক নিয়ে উড়তে পারে। আমেরিকায় এমন প্লেন তৈরী হচ্ছে যা চালাবার লোকজন ছাড়াও ৪৯০ জন যাত্রী বা সৈন্য নিয়ে উড়তে পারবে (Boeing 747B). আর, গতির তো কোনও সীমা নেই বলে মনে হয়। এরোপ্লেন যখন ঘণ্টায় তিন-চারশো মাইল বেগে উড়তে আরম্ভ করেছে, তখনই মানুষের আশা হল যে সে একদিন শব্দের চাইতেও জোরে যেতে পারবে। শব্দ চলে এক সেকেণ্ডে প্রায় ১১০০ ফুট, মানে, ঘণ্টায় প্রায় ৭৫০ মাইল।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মানুষের সেই আশা পূর্ণ হল। সেই বছরেই ক্যাপটেন ইয়াগারের (Captain Yeager) প্লেন শব্দের চাইতেও জোরে উড়ে যেতে পারল। তারপর ক্রমেই নতুন নতুন কলকবজা বেরোচ্ছে, আর তার সাহায্যে মানুষ ক্রমেই আরও বেগে আকাশপথে পাড়ি দিচ্ছে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মেজর হোয়াইট (Major White) বিশেষ একখানা প্লেনকে অল্পক্ষণের জন্যে ঘণ্টায় ৪১০৫ মাইল বেগে চালিয়েছিলেন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে এত জোরে রীতিমতো চলাচল করতে কোনও প্লেনই এখনও শুরু করেনি। তবু, যাত্রী নিয়ে সর্বদা দেশদেশান্তরে যে সব বিমান আজকাল চলাচল করে, তাদের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০০ মাইলের কম নয়। কলকাতা থেকে সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে কোথায় সেই লণ্ডন শহর—সেখানে মোটে আঠারো ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছনো যাচ্ছে আজকাল। তাও তো পথে তিন চার জায়গায় থামতে হয়। না থামলে আরও কম সময় লাগত।
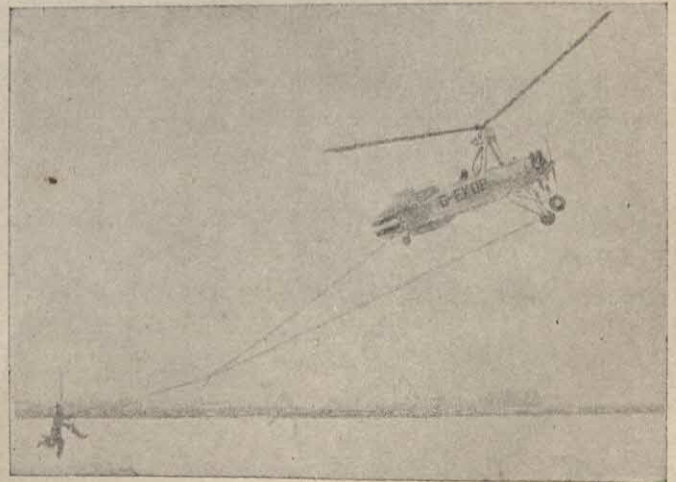
অটোজাইরো

॥ রকেট ॥

রকেটকে বাংলায় বলে হাউই। হাউইয়ের শক্তিতে আকাশে উড়বার প্রথম চেষ্টা বোধ হয় সাড়ে চারশো কি পাঁচশো বছর আগে চীনদেশে করা হয়েছিল। ওয়ান-হু (Wan Hu) বলে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ভাবলেন যে, হাউই যখন আকাশে উঠতে পারে, তখন গোটাকতক হাউই একটা চেয়ারে বেঁধে নিলেই তো তাতে বসে আকাশে ওঠা যায়! যেমন কথা, অমনি সেই কাজ! মস্ত একখানা চেয়ারে একটা-দুটো নয়, সাতচল্লিশটা বারুদ-ভরা খুব বড় হাউই বাঁধা হল। এ তো হল আকাশে উঠবার ব্যবস্থা। সেখানে উঠে হাওয়ায় ভেসে থাকবার জন্যে বেশ খানকতক ঢাউস ঘুঁড়িও তাতে বেঁধে নেওয়া হল। তারপর দুঃসাহসী ভদ্রলোক চেয়ারে বসে হুকুম দিলেন হাউইগুলোতে আগুন লাগাতে। যেই না আগুন লাগানো অমনি প্রচণ্ড এক আওয়াজ হল—আর ওয়ান-হু, আকাশ তো তুচ্ছ কথা, একেবারে স্বর্গে ই চলে গেলেন। তিনি একা নন, যারা আগুন দিয়েছিল আর যারা আশেপাশে ছিল, তারা সবাই স্বর্গে চলে গেল।

সেই রকেট প্লেন শেষে এই সবে সেদিন প্রথম আকাশে উড়ল—১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে। সেটা হয়েছিল ইটালীতে। তারপর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এর বেশ উন্নতি হয়। জার্মানরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে V-2 নাম দিয়ে এক রকম রকেট ব্যবহার করেছিল। কিন্তু তাতে তারা মানুষ পাঠায় নি। সেই রকেটের গতি ছিল শব্দের চেয়ে দ্রুত। জার্মানরা ইংলিশ চ্যানেলের এপার থেকে তা ছুড়ত। সেই রকেট ওপারে ইংলণ্ডে গিয়ে পড়ত।

বর্তমানে রকেটের অনেক উন্নতি হয়েছে। আজ মানুষ একটি রকেটকে এমন করে তৈরি করছে যার মধ্যে থেকে পর্যায়ক্রমে একের পর এক রকেট বেরিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে চাঁদে পৌঁছচ্ছে, শুক্রে যাচ্ছে, মঙ্গলগ্রহে যাচ্ছে। তার মধ্যে মানুষ থাকছে, নানা যন্ত্রপাতি, এমন কি চলতে পারে এমন মোটর গাড়িও থাকছে! 'মহাকাশ-অভিযান' অধ্যায়ে তাদের কথা বলা হয়েছে।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা

॥ এঞ্জিনীয়ারিং বলতে কি বোঝায় ॥

ইংরেজী এঞ্জিন কথাটার মানে হচ্ছে যন্ত্র। কাজেই এঞ্জিনীয়ারিং হলো যন্ত্র-বিদ্যা। প্রকৃতির মধ্যে যে সব শক্তি রয়েছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাদের কাজে লাগিয়ে কি করে মানুষের জীবনকে সুখের করতে পারা যায়, এঞ্জিনীয়ারিং-এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই।

সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনীয়ারিং (প্রযুক্তি-বিদ্যা বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার কৌশল) আমাদের জীবনে একেবারে জড়িয়ে গেছে। সামান্য মাথা গোঁজার আশ্রয় থেকে শুরু করে, চাঁদে গিয়ে পৌঁছোনো পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি-বিদ্যা এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, আমাদের কারোর পক্ষেই আর তাকে বাদ দিয়ে এক পা-ও চলা সম্ভব নয়।

সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে দুর্গম পাহাড়, বন, মরুভূমি ও সাগর। এই সব পেরিয়ে পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্য প্রান্তের মানুষের যোগাযোগ স্থাপন করতে এঞ্জিনীয়ারিং-ই সাহায্য করেছে। এঞ্জিনীয়ারিং দুর্গম পাহাড়ের পথকে সুগম করেছে। বিরাট জলরাশির উপর সেতু তৈরি করে পারাপারের সুবিধা করে দিয়েছে। সাগরের বুকে বড় বড় জাহাজ ভাসিয়ে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাবার ব্যবস্থা করেছে। সেই সব জাহাজের জন্যে তৈরি করেছে নানা ধরনের বন্দর। দ্রুতগামী উড়োজাহাজ ও তার ওঠা-নামার উপযোগী বড় বড় বিমান-বন্দর এঞ্জিনীয়ারিং-ই তৈরি করেছে।
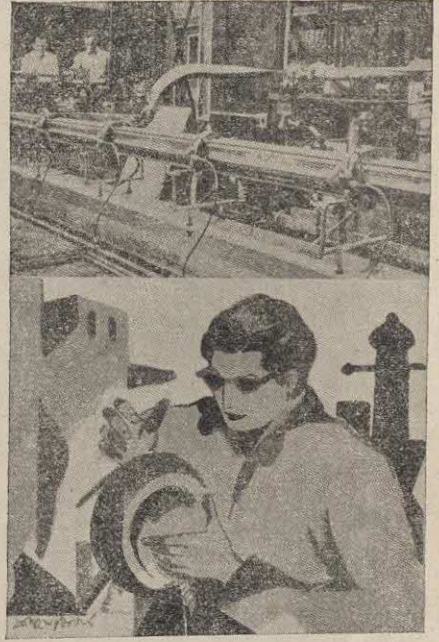
দার্জিলিং-এর রেলপথ, সুয়েজ খাল, পানামা খাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্যেই করা হয়েছে। পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ (টানেল) করা, নদীর মধ্যে কংক্রিট ঢেলে থাম করা এসবই এঞ্জিনীয়ারিং-এর কাজ।

শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নানা দেশের মানুষ নানা ধরনের ঘরবাড়ি তৈরি করেছে। এ ব্যাপারে এঞ্জিনীয়ারিং-ই তাদের সাহায্য করেছে। জলের প্রবল গতির সাহায্যে বিদ্যুৎ তৈরি, খনি থেকে তোলা কয়লা জ্বালিয়ে অসংখ্য কলকারখানার চাকা ঘোরানো—সবই এঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্যে করা সম্ভব হয়েছে। এই সব কারখানাতে মানুষের পরার কাপড়, প্রসাধন দ্রব্য, ছুরি, কাঁচি, ওষুধ, স্কুল-কলেজে লাগে এমন সব যন্ত্রপাতি, চাষের যন্ত্রপাতি—এই ধরনের নানা জিনিস তৈরী হয়েছে।

পৃথিবীর নানা দেশে অসংখ্য খনি আছে। সেইসব খনিতে তামা, রুপা, সোনা, লোহা প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যায়। খনির মধ্যে এই সব ধাতুর সঙ্গে নানা
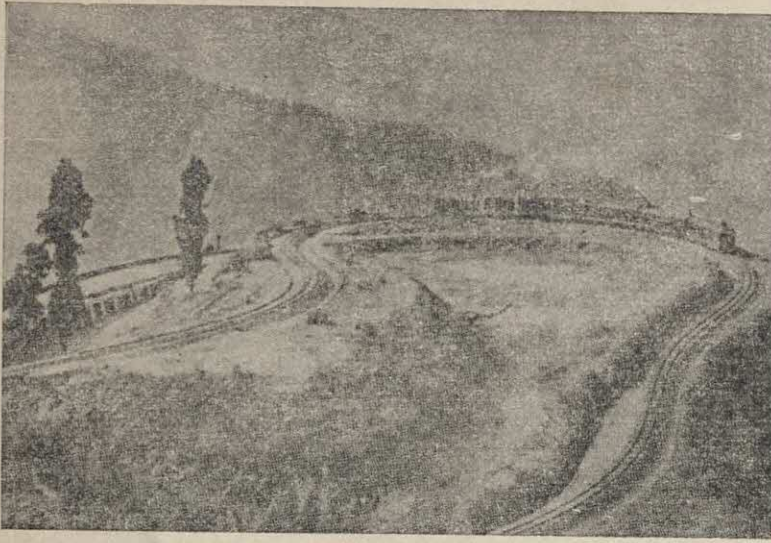
দার্জিলিং রেলপথ

জিনিস মিশে থাকে। খনি থেকে মিশ্র ধাতু তুলে তাকে খাঁটি ধাতুতে পরিণত করতে এঞ্জিনীয়ারিংই সাহায্য করে।

এঞ্জিনীয়ারিং চাষের ক্ষেতে জল সরবরাহ করতেও সাহায্য করে।

॥ নানা শ্রেণীর এঞ্জিনীয়ারিং ॥

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনীয়ারিং-এর জটিলতাও বেড়ে যাচ্ছে। এখন একজনের পক্ষে সমস্ত রকম কাজ জানা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাই, এঞ্জিনীয়ারিং-এর আলাদা আলাদা বিভাগ করে নিয়ে কেউ এটায়, কেউ বা ওটায় নিপুণতা অর্জন করে। সেই শ্রেণীবিভাগ এই রকম :—

সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, মাইনিং ও মেটালারজিক্যাল এবং কেমিক্যাল—এই পাঁচটিই আধুনিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর মোটামুটি কয়েকটি বিভাগ। এছাড়া এদের উপর নির্ভর করে এমন অন্যান্য বহু এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ আজকাল গড়ে উঠেছে। যেমন—জাহাজ শিল্পের সঙ্গে জড়িত মেরিন এঞ্জিনীয়ারিং, মোটর গাড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত অটোমোবাইল এঞ্জিনীয়ারিং, উড়োজাহাজের সঙ্গে জড়িত এরোনটিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং, জলনিকাশ ও জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত পাবলিক হেল্‌থ এঞ্জিনীয়ারিং, কৃষির উন্নতির সঙ্গে জড়িত এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনীয়ারিং, সংবাদ-প্রেরণের সঙ্গে জড়িত টেলিকম্যুনিকেশন এঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রনিক এঞ্জিনীয়ারিং, আণবিক শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত নিউক্লিয়ার এঞ্জিনীয়ারিং,
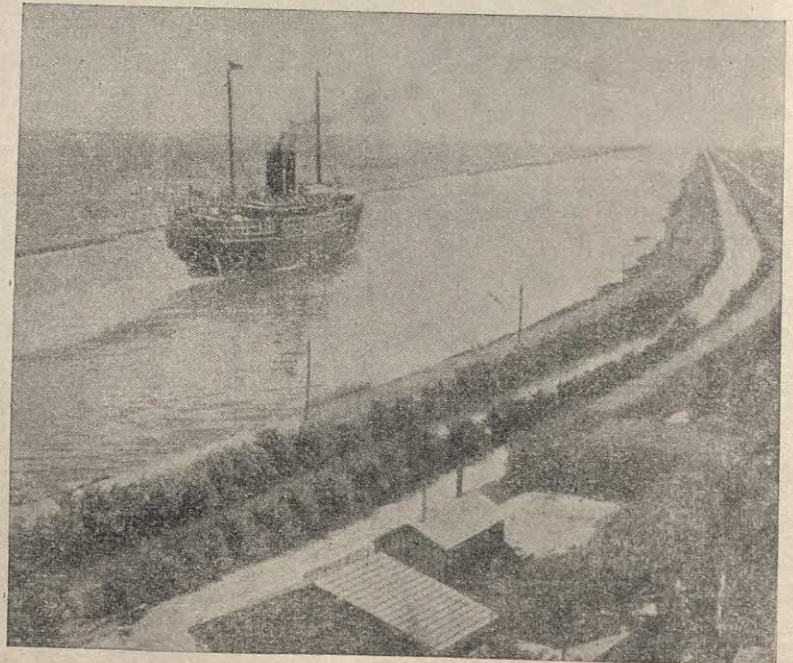
সুয়েজ খাল—এঞ্জিনীয়ারিং-এর এক অদ্ভুত কীর্তি
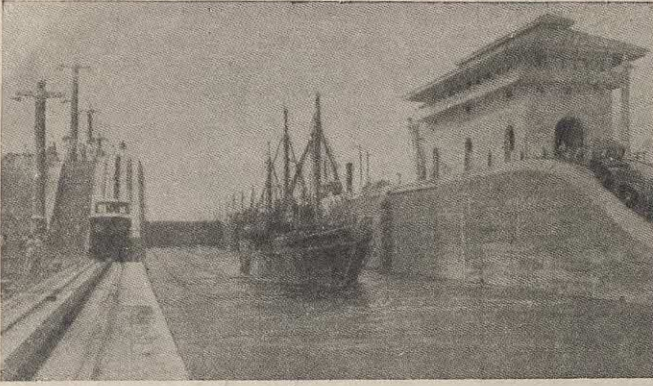
পানামা খাল

রকেট মহাকাশ-যানের সঙ্গে জড়িত রকেট এঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি।

॥ এঞ্জিনীয়ারিং-এর ইতিহাস ॥

সাধারণভাবে এঞ্জিনীয়ারিং-এর ইতিহাসকে প্রধানতঃ দুটি আলাদা যুগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রাচীন যুগ। এই যুগে মানুষ নিজের সুবিধার জন্য নানা যন্ত্রপাতি বের করেছিল বটে, কিন্তু সেগুলি নিজের শক্তিতে কিংবা জীবজন্তুকে দিয়ে চালাত। তারপর যখন মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে দিয়ে তার যন্ত্র চালাবার কৌশল বের করল, তখনই প্রাচীন যুগ শেষ হয়ে এঞ্জিনীয়ারিং-এর আধুনিক যুগের আরম্ভ হল। বাষ্প-শক্তির আবিষ্কার হলো সকলের আগে, তারপর এল বিদ্যুৎ ইত্যাদি আরও কত কি।

প্রথমে মানুষের প্রয়োজন হয়েছিল খাদ্য, আত্মরক্ষা ও নিরাপদ আশ্রয়ের। তখন তারা নানা রকম অস্ত্র ও যন্ত্র তৈরি করেছিল নিজেদের সুবিধের জন্যে। এই সব অস্ত্র-নির্মাণ-পদ্ধতির কলাকৌশল শিক্ষা লাভ করার সময়েই মানুষ পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে যন্ত্রনির্মাণে সমর্থ হয়।

॥ মিশরের পিরামিড ॥

মানুষ যে কেমন সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারে তার প্রথম নমুনা মিশরে পাওয়া যায়। মিশরীয় সভ্যতার প্রথম যুগেও আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে মানুষ নদীতীরের কাদা, গাছ, লতার সাহায্যে প্রথম ঘর-বাড়ি তৈরি শুরু করে। ক্রমশঃ উন্নত হয়ে তারা যখন পাথরের বাড়ি তৈরি করতে সক্ষম হয়, তখনও কিন্তু তাদের গড়বার কৌশল তেমন উন্নত হয় নি।

খিলান বা arch নির্মাণের কৌশল মিশরীয়গণ সেই যুগে আরম্ভ করেছিল। অবশ্য বেশির ভাগ নির্মাণকার্যই তারা সম্পন্ন করত থাম ও কড়িবরগার সাহায্যে। পাথরের কাজে তাদের দক্ষতা ও উন্নতির পরিচয় আরও বেশী করে দেখা যায় চার পাঁচ হাজার বছর আগে তৈরী বিশালকায় পিরামিডগুলিতে।

পিরামিড হচ্ছে মিশরের প্রাচীন রাজা (যাদের বলা হতো 'ফ্যারাও')-দের সমাধি। এদের তলা চতুষ্কোণ, কিন্তু আগাটা ক্রমে সরু হয়ে এসেছে, কাজেই এদের ধারগুলো ত্রিভুজের আকারের। কায়রো শহরের কাছে মরুভূমিতে এরকম তিনটি প্রসিদ্ধ
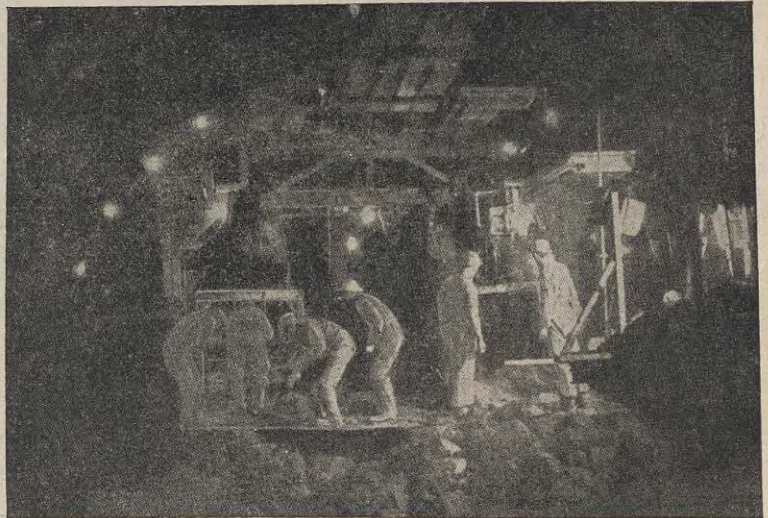
পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ (টানেল) করা হচ্ছে
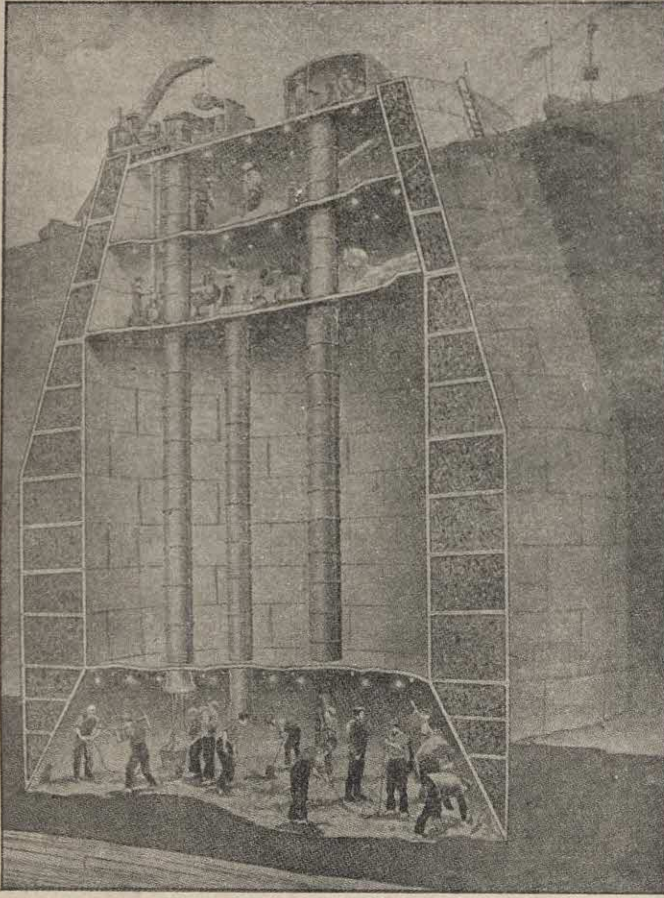
নদীর মধ্যে থাম গেঁথে কংক্রিট করা হচ্ছে—
এই থামের উপর সেতু বসানো হবে

পিরামিড আছে—ফ্যারাও খুফু (Cheops), খাফরা (Caphren) এবং মেনকাউরা (Menkaura) ফ্যারাওয়ের সমাধি। এদের মধ্যে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম মিশরের Great Pyramidটি (খুফু-র পিরামিড) ভিত্তির নিকট প্রায় ৭৫৫ ফুটের ওপর লম্বা ও চওড়া এবং উচ্চতায় ৪৮১ ফুটেরও বেশী। সেই যুগের সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই চল্লিশতলা বাড়ির সমান উঁচু বাড়ি গড়ে তোলা একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা। এক লক্ষ লোক ২০ বছর ধরে পরিশ্রম করে এই পিরামিড তৈরি করেছিল। এই পিরামিডগুলিতে ব্যবহৃত পাথরের স্তূপ বহুদূরের পাহাড় থেকে কেটে এনে নদীর উপর দিয়ে বড় বড় ভেলায় (barge) করে কর্মস্থলে নিয়ে আসা হয়েছিল।

পাথরের এই বড় বড় খণ্ডগুলিকে বহুদূর থেকে নিয়ে এসে ঠিক উপযুক্ত স্থানে সংযোগ করবার জন্যে কি বিরাট পরিকল্পনা এবং সুব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল—আজকের দিনেও সে কথা আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন! এই বিশাল পাথরের স্তূপের ভিতরে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর আছে এবং সেখানে ঢোকবার মতো গলিপথও আছে।

পিরামিড যুগের শেষের দিকে মিশরীয়গণ রাজপুরুষদের সমাধি দেওয়ার জন্যে আর পিরামিড নির্মাণে প্রবৃত্ত না হয়ে পাহাড় কেটে গুহা তৈরি করে সমাধিস্থল তৈরি করতে থাকে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত মিশরের ফ্যারাও (রাজা) টুটানখামেনের (তুত-আন্‌খ্‌-আমেন) ৩৩০০ বছরের পুরানো সমাধিস্থল এই ধরনের একটি গুহাসমাধি। অন্য প্রায় সব সমাধিই ভেঙে দস্যুরা দামী জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু টুটানখামেনের সমাধিতে যে সব অমূল্য জিনিসপত্র ছিল, তা বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। পাহাড় কেটে এই জাতীয় সমস্ত গুহাকক্ষ তৈরি করার সময়ে বহু যন্ত্রের দরকার হয়েছিল। মিশরের বিশাল পিরামিড ও মন্দিরগুলি তৈরির মধ্য দিয়ে সে যুগের এঞ্জিনীয়ারিং-এর দক্ষতার পরিচয় লাভ করা যায়।

॥ মহেন-জো-দারো ও হরপ্পা ॥

এরূপ কুশলতার অন্য প্রমাণ পাওয়া যায় অখণ্ড ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশে (অধুনা পাকিস্তানে) মাটি থেকে খুঁড়ে বার করা মহেন-জো-দারো ও হরপ্পা শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। প্রথমটি সিন্ধু প্রদেশে, দ্বিতীয়টি পাঞ্জাবে। সাড়ে চার হাজার বছরেরও আগে গড়ে ওঠা এই সভ্য শহর ছুটির

মিশরের পিরামিড

ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হয়েছে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের সম্পূর্ণ কৃতিত্বই বিখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের।

এই দুই শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা যায় যে এই দুটি শহরে প্রচুর লোক বাস করত। এখানকার অধিকাংশ ঘরবাড়িই একের বেশী তলাযুক্ত ছিল এবং ইট দিয়েই বেশির ভাগ গড়ার কাজ হয়েছিল।

শহরের ঠিক মাঝখানে ছিল সরকারী দপ্তরখানা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্থান। শত্রুর কোপ থেকে এই নিত্য প্রয়োজনীয় সংস্থাগুলি রক্ষা করবার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় রাখার জন্যেই শহরের মাঝখানে এগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। খাদ্যশস্যকে কেন্দ্রীয়ভাবে জমা রাখার ব্যবস্থাও এখানে ছিল।

এখানকার রাস্তাঘাটের পরিকল্পনা খুবই উন্নত ধরনের ছিল। শহরে জল-নিকাশের জন্যে গভীর পয়ঃপ্রণালীর অভাব ছিল না এবং বাড়ির সঙ্গে আলাদা করে স্নানাগারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ব্যতীত এমন শহর গড়ে ওঠা সম্ভবপর নয়।

॥ সুমেরীয় সভ্যতা ॥

মহেনজোদারোর প্রায় একই সময়কার সুমেরীয় সভ্যতার মধ্যেও এঞ্জিনীয়ারিং-এর অগ্রগতির সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝামাঝি উপত্যকায় অবস্থিত সভ্যতাকে সুমেরীয় (Sumerian) সভ্যতা বলে। এই অঞ্চলে মিশরের সঙ্গে প্রায় এক সময়েই জলসেচ-ব্যবস্থার নতুন উপায় আবিষ্কৃত হয়।

নদীর জলকে দূর-দূরান্তরের ক্ষেতের
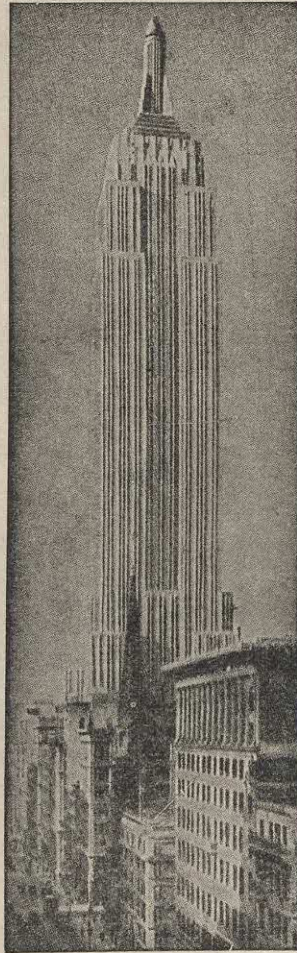
আধুনিককালের এঞ্জিনীয়ারদের অপূর্ব সৃষ্টি—
আকাশ-চোঁয়া এম্পায়ার স্টেট্ বিল্ডিং
দিবালোকে রাত্রিকালে

পিরামিড তৈরী হচ্ছে

মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্যে খাল তৈরি করবার পরিকল্পনা সুমেরীয়রাই প্রথম আবিষ্কার করে। খাল কাটাবার সময়ই প্রথম জমির level সম্বন্ধে এদের চিন্তা করতে হয় এবং একটা সুনির্দিষ্ট ঢালের মধ্য দিয়ে খালকে প্রবাহিত করার অসুবিধে এরাই প্রথম বুঝতে পারে ও তার ব্যবস্থা করে।

খালের গতিপথে হঠাৎ অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গা বা অপর কোন জলপথ এসে গেলে যে প্রচণ্ড অসুবিধের স্বষ্টি হল তা দূর করতে গিয়েই পাকা নালা বা পয়ঃপ্রণালীর প্রথম পরিকল্পনার স্বষ্টি হয়। গৃহনির্মাণ ও স্থাপত্যকলা বিদ্যাতেও সুমেরীয়বাসীদের প্রচুর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইটের তৈরী খিলান করবার কৌশল সুমেরীয়রা ভালভাবে আয়ত্ত করে। রোদে শুকানো ইটের ব্যবহার সুমেরীয়বাসীদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল। সুমেরীয়-বাসীদের তৈরী স্থাপত্য-শিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শনের মধ্যে 'জিগুরাট' (Ziggurats) নামে পরিচিত মন্দির স্তম্ভগুলি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ছয়-সাততলা এই জিগুরাটগুলি উপর দিকে ওঠবার সময় ক্রমশঃ ধাপে ধাপে ছোট হয়ে যেত এবং মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত ওঠার জন্য ঢালু রাস্তাও ছিল। পরে সুমের অঞ্চল আর আশপাশের দেশগুলো নিয়ে ব্যাবিলোনিয়ার সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, তার রাজধানী হয় ব্যাবিলন। ব্যাবিলনের 'ঝুলন্ত বাগান' বা Hanging Gardens সেকালের সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে আর একটি। এটিও ছিল ধাপে ধাপে তৈরী একটি পাহাড়ের মত বাড়ি, তার প্রতি ধাপেই বাগান। এটি তৈরি করেছিলেন রাজা নেবুকডনেজার।

॥ ব্যাবিলন শহর ॥

সুমেরীয় সভ্যতার ভিতরকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বষ্টি হল ব্যাবিলন শহর। ব্যাবিলনের 'ঝুলন্ত উদ্যান' পৃথিবীর একটি আশ্চর্য বস্তু ছিল।

॥ চীনের অগ্রগতি ॥

খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দু হাজার বছর আগে থেকেই চীন দেশে কাঠ দিয়ে সব কিছু দালান, বাড়ি, মন্দির তৈরী হত। কাঠের তৈরী এসব জিনিসের আয়ু খুব বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে না। পর পর
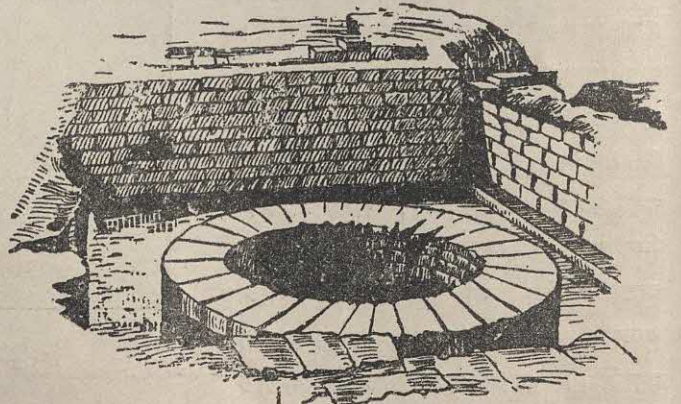
মহেন-জো-দারোর একটি ইটের গাঁথা কূপ
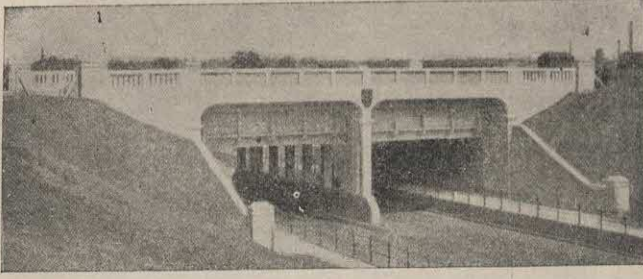
আধুনিক পয়ঃপ্রণালীর উপর পুল

প্রতিটি রাজবংশের রাজারা আগেকার রাজাদের তৈরী-করা সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভ ঈর্ষা করে ভেঙে শেষ করে ফেলেন। তাই পুরোনো যুগের গঠন-শিল্পের নমুনা চীনদেশে বিশেষ পাওয়া যায় না।

॥ চীনের প্রাচীর ॥

চীনদেশে শহরের চারিপাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেওয়াল গেঁথে দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হতো। তারপর উত্তর-দিক থেকে মঙ্গোলদের আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে চীন-দেশের উত্তর সীমানার অনেকটা অংশ জুড়ে খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে শুরু-করা বিশ্ববিখ্যাত চীনের প্রাচীর (Great Wall of China) নির্মিত হয়। প্রায় ২০ ফুট চওড়া এই প্রাচীরটি বিশাল গঠন-কার্যের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। প্রায় ১২৪৮ মাইল লম্বা এই প্রাচীরটি পূর্ব দিকে সমুদ্র থেকে, পশ্চিমে মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইট, পাথর ও মাটি দিয়ে তৈরী। প্রায় ২২ ফুট উঁচু এই প্রাচীরটির মধ্যে মধ্যেই ৪০ ফুট উঁচু থামও স্থাপন করা আছে।

॥ জল থেকে জমি উদ্ধার ॥

চীনদেশে হোয়াং-হো নদীর বন্যার প্রচণ্ড জলের তোড় ঠেকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে হোয়াং-হো নদীর উপর বাঁধ (dike) নির্মাণ শুরু হয়। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে নতুন বাসযোগ্য জমি উদ্ধার করার শিক্ষা মানুষ এইখানেই লাভ করে।

ইওরোপে হল্যাণ্ড দেশে এইরকম সমুদ্রের অগভীর অংশে বাঁধ দিয়ে, ভেতর থেকে জল ছেঁচে বাইরে ফেলে দিয়ে, অনেক জমি উদ্ধার করে চাষবাসের কাজে লাগানো হয়েছে।

॥ গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ॥

এরপর এঞ্জিনীয়ারিং-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নমুনা আছে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার মধ্যে।

শহর ও গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা গ্রীকদের সময় থেকেই অনেক উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত হতে থাকে। গ্রীকদের তৈরী বিশাল মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করলে তাদের নির্মাণ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে মন্দির গঠনের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দেওয়ার ফলে অন্য কোনরকম
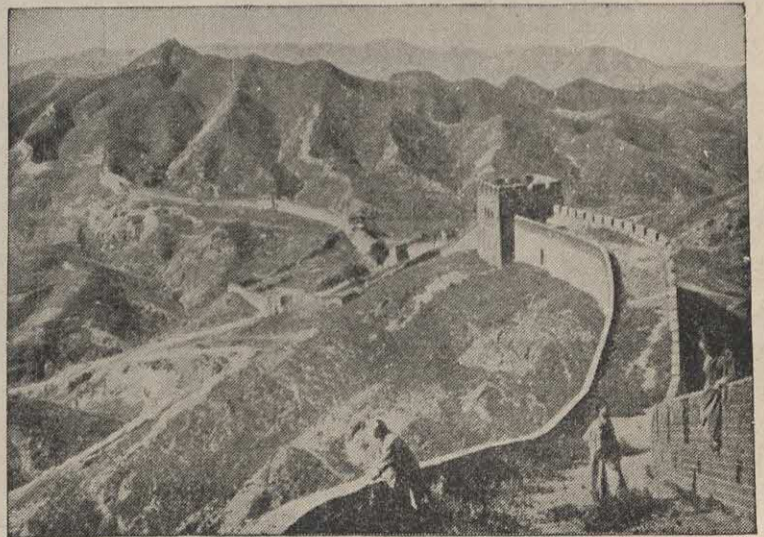
চীনের প্রাচীর
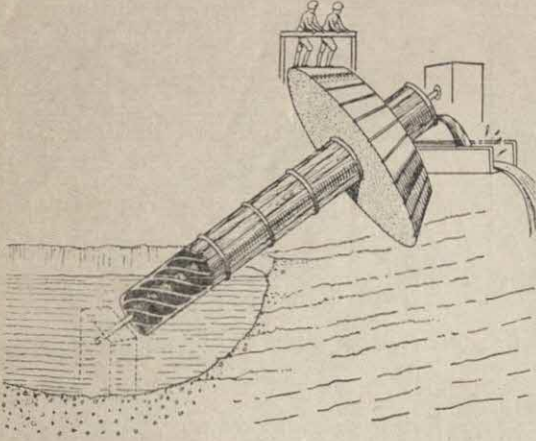
গ্রীক মনীষী আর্কিমিডিস-উদ্ভাবিত 'স্ক্রু'। এর দ্বারা জাহাজ থেকে জল তুলে ফেলা হত

দ্বিতীয় শতাব্দীতে তৈরী রোমের একটি প্রাসাদ

বাড়ি ঘর তৈরিতে মন দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠত না। তবে পাহাড়ের ধারে অবস্থিত মুক্তাঙ্গন নাট্যশালার বিভিন্ন উন্নত ধরনের নিদর্শনও গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখা গেছে।

রোমানদের আমলে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য মন্দির ও সভাকক্ষগুলিতে দেশের জনসাধারণের এক সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল ও সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ সকলকে দেওয়া হত বলে বহু থামবিশিষ্ট হলঘরের পরিবর্তে খিলান- (বা vault) বিশিষ্ট বাড়ির চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে থাকে।

গম্বুজাকৃতি ছাদের ব্যবহারও এই সময় থেকেই শুরু করা হয় এবং রোমানদের আমলেই পাথরের টুকরোগুলিকে জোড়া লাগানোর প্রয়োজনীয়তায় সিমেণ্টের প্রচলন হয়। রোমের স্নানাগারগুলি বহুলোকের ব্যবহারের উপযোগী ছিল। এই সুবিশাল স্নানাগারগুলি আসলে তাদের বিশ্রামের ও আনন্দ করবার স্থান ছিল।

॥ গির্জা ও উপাসনাগার নির্মাণ ॥

ইওরোপে রোমান সাম্রাজ্যের শেষভাগে ও পরবর্তী কালে খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণের গির্জাসমূহের মধ্যেই সেকালের এঞ্জিনীয়ারিং গড়ে উঠতে থাকে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম ধর্ম ও সাম্রাজ্য প্রবর্তিত হওয়ার পরে এই শিল্পের নব নব ধারার প্রচলন হয় বড় বড় মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে। মিনার ও গম্বুজের প্রচুর নিদর্শনও এই সময়কার শিল্প-রীতিতে দেখা যায়। এই মিনার ও গম্বুজ-শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় ভারতে অবস্থিত আগ্রার মোতি-মসজিদ ও পৃথিবীর অন্যতম বিশিষ্ট স্থাপত্য তাজমহলের মধ্যে।

মোতি মসজিদ

তাজমহল

কাঠের কাজের ধরন দিয়ে অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে নির্মিত সাঁচীস্তূপের কারুকার্যখচিত রেলিং ও পুণার নিকটবর্তী 'কারলা' গুহার অর্ধ-বৃত্তাকৃতি (vault) ছাদের নির্মাণকার্য এই রীতির নিদর্শন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে নির্মিত অজন্তা ও ইলোরা গুহার মধ্যে গুহা-স্থাপত্যের আরও অনেক উন্নত পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ইলোরায় বৌদ্ধগণ-স্থাপিত তিন শত ছাত্রের বাস করার উপযোগী তিনতলা ছাত্রাবাসটি উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ের ভিতর থেকে পাথর কেটে তৈরী এই গুহার মধ্যে পাথরের চৌকা থামগুলিকে সমান্তরাল ভাবে নিখুঁত বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সেকালের গঠন শিল্পীদের দক্ষতার পরিচয় দেখা যায়।

পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারক, মহাবলীপুরম, মহীশূরের বেলুড় প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত মন্দিরগুলি সে আমলের শিল্পীদের প্রতিভার প্রমাণ। রামেশ্বরমের মন্দির, মাদুরার মন্দির, বুদ্ধগয়ার মন্দির, জয়পুরের

॥ ভারতের দান ॥

এই সময়ে ভারতবর্ষেও অনেক উল্লেখযোগ্য নির্মাণকার্য সাধিত হয়। পাহাড়ের গায়ে বিরাট বিরাট গুহা নির্মাণ করে তার ভিতর ধর্মীয় উপাসনার ও শিক্ষাপ্রদানের কেন্দ্র নির্মাণের বহু নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। প্রথম দিকে এখানকার গঠনরীতি

অজন্তা গুহা
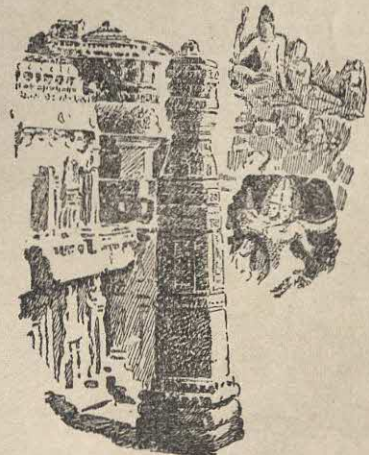
ইলোরা গুহা

কোনারকের সূর্যমন্দির

হাওয়ামহল, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি ভারতীয় স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মোঘলযুগে নির্মিত দিল্লী ও আগ্রার বিশাল পাথরের স্মৃতি-সৌধগুলি পুরাতন ভারতীয় নির্মাণ-শিল্পের শেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

হিন্দু শিল্পীদের নিদর্শন ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়ানো মন্দিরগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সেকালে ক্রেন ছিল না। তবুও কি কৌশলে এত উঁচু সব প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। এ সব মন্দিরের গায়ে পাথর কেটে যে সব মূর্তি তৈরী হয়েছিল সেগুলি শিল্পপ্রতিভারও নমুনা। পরে, 'ভারতের মঠ ও মন্দির' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আরও বিবরণ লেখা হয়েছে।

ভুবনেশ্বরের (লিঙ্গরাজ) মন্দির
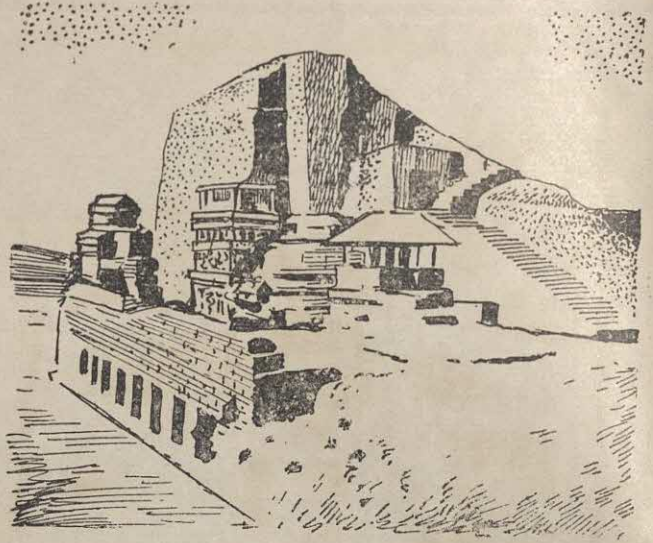
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ

॥ সেতু-নির্মাণের কথা ॥

প্রাচীনযুগের এঞ্জিনীয়ারিং-এর অন্যতম বিশিষ্ট-ক্ষেত্র ছিল সেতু-নির্মাণ-প্রণালীতে। গৃহনির্মাণের মতো এ ব্যাপারেও মানুষের প্রথম শিক্ষালাভ হয়েছিল প্রকৃতির নিকট।
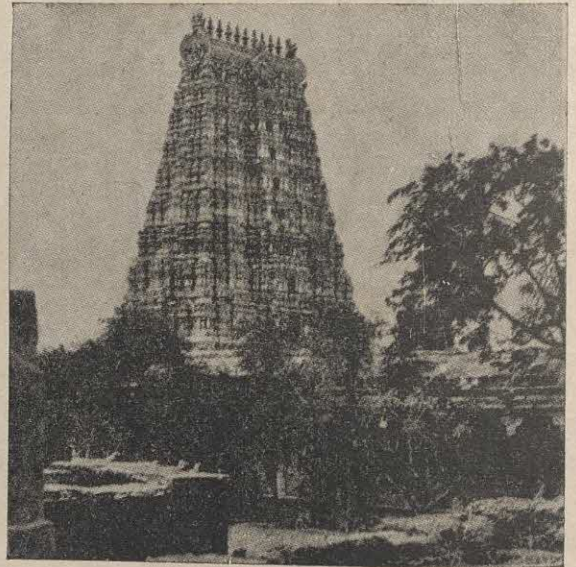
রামেশ্বরমের মন্দির

জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত এঞ্জিন।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথাঃ

[জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত এঞ্জিন।]

জেমস ওয়াট (James Watt—১৭৩৬-১৮১৯ খ্রীঃ) বাষ্পচালিত এঞ্জিনের আবিষ্কারক। তিনি প্রথম জীবনে গণিতবিষয়ক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজ করতেন। তিনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম বাষ্পচালিত এঞ্জিনের পেটেন্ট গ্রহণ করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বাষ্পচালিত এঞ্জিন খনির কাজে ব্যবহৃত হত।

বহু বৎসর ধরে তিনি নানাভাবে এই এঞ্জিনের উন্নতির চেষ্টা করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে বাষ্পচালিত এঞ্জিন নির্মাণ করান তা কাপড়কলে ব্যবহৃত হয়।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর তৈয়ারী বাষ্পচালিত এঞ্জিন একটা ঘরে বসানো হয়েছে। উৎসুক লোকেরা তা দেখবার জন্যে ভিড় জমিয়ে তুলেছে।

অবশ্য বর্তমানে বাষ্পচালিত এঞ্জিনের অনেক উন্নতি হয়েছে। তার চেহারার সঙ্গে জেমস ওয়াটের তৈয়ারী বাষ্পচালিত এঞ্জিনের অনেক পার্থক্য।

মাদুরার মন্দিরদ্বার

বুদ্ধগয়ার মন্দির

মনে হয়, কোন জলস্রোতের উপর হঠাৎ-পড়ে-থাকা এক পার থেকে অন্য পার পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ গাছের গুঁড়ি দেখে মানুষ প্রথম Girder Bridge-এর সৃষ্টি করেছিল। দীর্ঘকাল ধরে পাথর ক্ষয় করে কোন নদীস্রোত পাহাড় ভেদ করে বার হয়ে এসেছে দেখে বোধহয় প্রথম Arch Bridge বা খিলান সেতু কি করে তৈরি করতে হয় তা মানুষ শিখেছিল। Suspension Bridge বা ঝুলন্ত সেতুর উৎপত্তি হয়েছিল সম্ভবতঃ কোন নালা বা খাঁড়ির উপর দিয়ে ঝুলে থাকা লতাগুচ্ছ বা বৃক্ষের ঝুরি দেখে। আদিম যুগের মানুষ এই সমস্ত প্রকৃতির তৈরী সেতুর সাহায্যে যাওয়া-আসা করার সময়ই নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে প্রথম সেতু-নির্মাণ করতে উৎসাহী হয়।

এইরকম ভাবেই খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছরেরও আগে মানুষ সেতু নির্মাণের মূলনীতিগুলো শিখে নিতে পেরেছিল।

পরের যুগে মানুষ যখন ক্রমশঃ এক জায়গায় বসতি বাঁধল এবং সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হতে লাগল তখন দীর্ঘস্থায়ী সেতু গঠনের প্রয়োজনীয়তা

জয়পুরের হাওয়ামহল

বাড়তে থাকল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ যতই বেড়ে যেতে লাগল, সেতুগুলিকে এক সঙ্গে অনেক লোক পার করতে পারার মতো মজবুত এবং চওড়া করে তোলার প্রয়োজনীয়তাও অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠল। এর ফলেই শুধু গাছের গুঁড়ির সাহায্যে সেতু তৈরি না করে জলের উপর পাথর ফেলে তাকে শক্ত এবং সেতুর সমান চওড়া থাম তৈরি করে তার উপর গাছের গুঁড়িকে সমানভাবে কেটে বসিয়ে কাঠের কড়ির সেতু তৈরী হতে লাগল।

॥ কাঠের পাইল ও ট্রাস ॥

এই যুগেই ইওরোপের সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের দ্বারা এঞ্জিনীয়ারিং-এ দুটি নতুন জিনিসের আবিষ্কার হয়। একটি কাঠের পাইল (খুঁটি) এবং অপরটি কাঠের ট্রাস (কড়ি)। এই সুইজারল্যাণ্ডবাসিগণ হ্রদের উপর কাঠের বাড়ি তৈরি করার সময়েই প্রথম কাঠের খুঁটির (timber pile) ব্যবহার শুরু করে। এঞ্জিনীয়ারিং-এর দুটি খুব উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার 'পাইল' ও 'ট্রাস' এই সুইজারল্যাণ্ডবাসীদেরই আবিষ্কার।

নানারকম সেতু

॥ ঝুলন্ত সেতু ॥

শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিগণ যখন পাথর ও কাঠের কড়ি দ্বারা তৈরি সেতুর কি করে আরও উন্নতি করা যায় সেই চিন্তায় মগ্ন ছিল তখন আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঝুলন্ত সেতুর ব্যবহার এবং গঠনরীতির নৈপুণ্য বাড়তে থাকে। একেবারে প্রথম দিকে ঝুলন্ত সেতুতে একটি মাত্র দড়ি বা cable থাকত এবং পারাপার করার প্রয়োজনে যাত্রীকে একটা ঝুড়ির আকারের ঝোলায় বসে থাকতে হত।
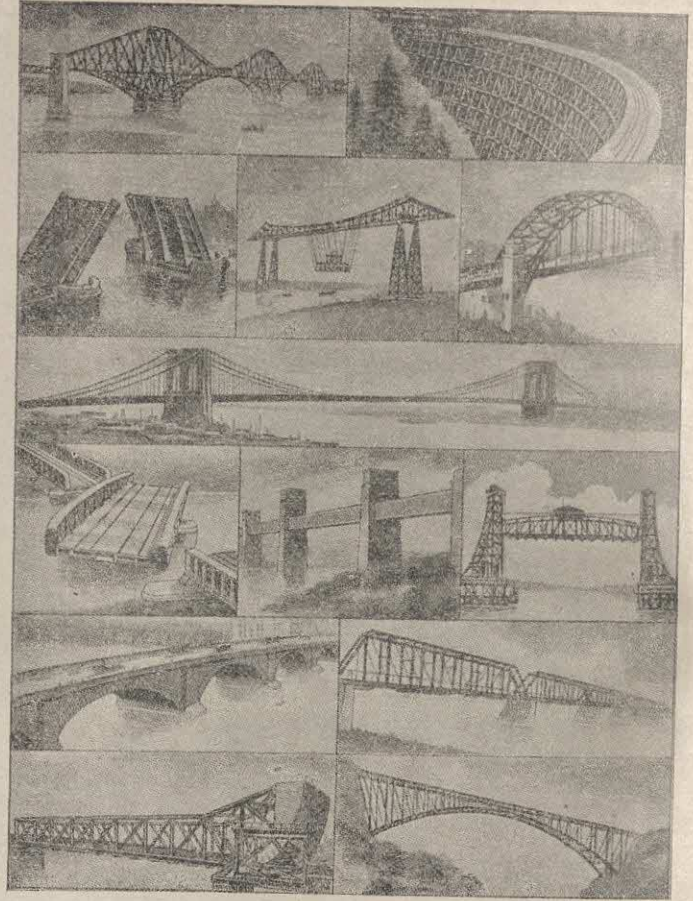
চীনদেশে এই ধরনের সেতুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু এই প্রকারের ঝুলন্ত সেতুর অনেক উন্নতি হয় ভারতবর্ষের উত্তর অঞ্চলে। এখানেই প্রথমে কিছু তফাতে দুটি আলাদা মোটা দড়ি (cable) ঝুলিয়ে রেখে তার প্রত্যেকটি থেকে কিছু দূর অন্তর অন্তর সরু দড়ি (suspender) ঝুলিয়ে নেওয়া হত এবং এই দ্বিতীয় দড়িগুলি থেকে মানুষের চলবার জন্যে একটি পাটাতন ঝুলিয়ে দেওয়া হত। লছমন ঝোলার পুরোনো সেতুটি ছিল এই ধরনের সেতু। একটি দড়ি হাতে ধরে পাটাতনের উপর দিয়ে লোক পারাপার হত।

সেতু তৈরির আর এক উল্লেখযোগ্য রীতি canti-

lever construction—ভারতবর্ষেই শুরু হয়েছিল। কলকাতার হাওড়া ব্রীজ এই দ্বিতীয় ধরনের cantilever-এর নিদর্শন।

মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয়দের আমলে প্রথম খিলান-সেতু তৈরির রীতির উন্নতি হতে থাকে। তাদের সময় থেকেই সেতু-নির্মাণে খিলানের ব্যবহার শুরু হয়। এই খিলানের ব্যবহারে সেতু-গঠন-বিদ্যা অনেক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

সামরিক প্রয়োজনে প্রথম সেতু ব্যবহৃত হয়েছিল ব্যাবিলন-জয়ের জন্যে। ৫৩৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে পারস্য-সম্রাট্ সাইরাসের আমলে পর পর নৌকো বা ভাসমান pontoon সাজিয়ে তার উপর কড়ি ফেলে এই সেতুটি নির্মিত হয়েছিল। বসফরাস প্রণালীর বক্ষে ৩০০০ ফুট দীর্ঘ সেতুটি স্যামসের (Samos) মান্দ্রোক্লিস (Mandrocles)-নামক এঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়। সেতুগঠনের ভারপ্রাপ্ত প্রথম এঞ্জিনীয়ার হিসেবে এঁর নামই ইতিহাসে পাওয়া যায়।

সেতু-নির্মাণের বিভিন্ন রীতিগুলি গ্রীসে ও চীনে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। তবে গ্রীসবাসী যেস্থলে Girder Bridge-এর ব্যবহারই বেশী পছন্দ করত, চীনবাসী সেস্থলে খিলান সেতুর অধিক ভক্ত ছিল। ক্যান্টিলিভার (Cantilever) ও ঝুলন্ত সেতুর ব্যবহারে চীনারা খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তাদের তৈরী সেতুতে কাঠের ব্যবহারই বেশী ছিল।

বোল্ডার ড্যাম তৈরির সময়কার ছবি। ঢালাই করার আগে লোহার ফ্রেম বাঁধা হচ্ছে

॥ রোমানদের কৃতিত্ব ॥

কাঠকে রাসায়নিক পদার্থে ভিজিয়ে তার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে ব্যবহার করার প্রথম প্রচেষ্টা রোমানদের মাথায় এসেছিল। সিমেন্ট ব্যবহার করে ও অসমান পাথরকে নিখুঁত উপায়ে কেটে, লোহার আংটার সাহায্যে আটকে পাথরের জোড়গুলিকে দৃঢ়সংবদ্ধ করার চেষ্টা তাদেরই মধ্যে প্রথম দেখা যায়। নদীর পাড়ের রাস্তা তৈরির সুবিধের জন্যে তেরচাভাবে সেতু-নির্মাণ তারাই শুরু করে এবং খিলান সেতুর ভার বহনের ক্ষমতার উপযোগী নদীগর্ভে নির্মিত থামগুলিকে তারা এমন সুকৌশলে মজবুত ও জোরদার করে তোলে যাতে একটা খিলান কোনক্রমে ভেঙে গেলেও সমস্ত সেতুটা নষ্ট হয়ে যেতে না পারে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক ব্যক্তি টেমস নদীর উপর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরোনো লণ্ডন ব্রিজ (Old London Bridge) তৈরি করতে শুরু করেন।

সমসাময়িককালে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে বহু সেতু তৈরী হয়। এগুলির অধিকাংশই পাথরের খিলানের উপর তৈরী চুন-সুরকির সাহায্যে গাঁথা ছিল।

এরপর ক্রীতদাসদের দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তার বদলে কারিগরদের কাজে লাগাবার প্রথা শুরু হল। তখন থেকে সেতু নির্মাণের আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে

॥ যন্ত্রের ব্যবহার ॥

সেতু-নির্মাণকারী এঞ্জিনীয়ারগণ তখন থেকে খরচ কমাবার কথা চিন্তা করতে বাধ্য হলেন। ফলে যন্ত্রের ব্যবহার না করে উপায় রইল না। একটা যন্ত্র শত শত কুলির কাজ করে অনেক পয়সা বাঁচাতে লাগল। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাণ্ড্রিয়া পালাদিও (Andrea Palladio) নামে এক এঞ্জিনীয়ার কম খরচায় অনেক লম্বা আকারের সেতু নির্মাণের পথ দেখান। এর প্রায় দেড়শ' বছর পরে ইংরেজ দার্শনিক রবার্ট হুক (Robert Hooke) কোন জিনিসের উপর ভার পতনের ফল সম্বন্ধে নিয়ম আবিষ্কার করেন যা Hooke's Law নামেই খ্যাত। তা এঞ্জিনীয়ারদের অনেক নতুন নতুন বস্তু তৈরি করতে সাহায্য করল।

॥ যুদ্ধের যন্ত্র ॥

প্রাচীনকালে প্রযুক্তিবিদ্যার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণ। শুধুমাত্র অনেক সৈন্য ও হাতিয়ারের উপর নির্ভর না করে যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধজয়ের চেষ্টা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়। শত্রুকে বধ করার যন্ত্র ও মালমসলা প্রস্তুত করার ব্যাপারে অপরকে টেক্কা দেবার চেষ্টায় মানুষ আজও সমান উৎসাহী। যুদ্ধের প্রয়োজনে তৈরী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি অবশ্য অন্যান্য অনেক অসামরিক কার্যে ব্যবহৃত হয়ে মানব-সভ্যতাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে।

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য যুদ্ধাস্ত্র—
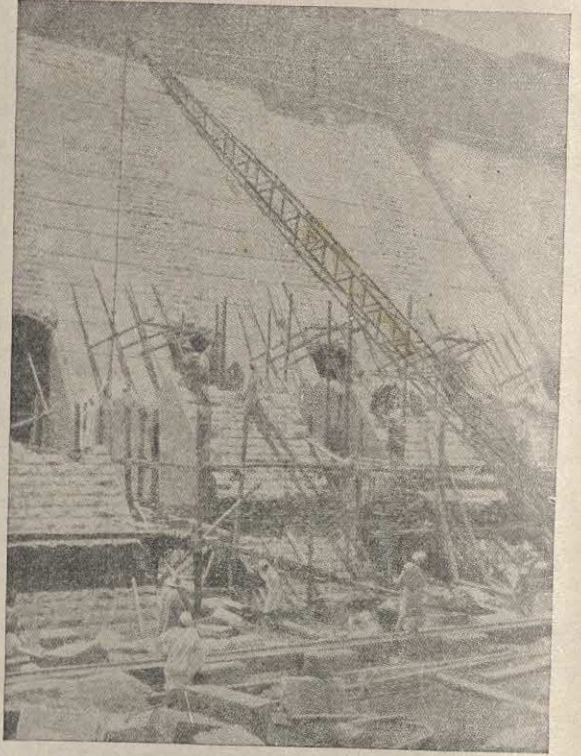
বাঁধের ধার কংক্রিট করা হচ্ছে

যুদ্ধের রথ (war chariot) নির্মিত হয়েছিল আজ থেকে ৫।৬ হাজার বছর আগে। পদাতিকদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে এই সব চাকাযুক্ত ঘোড়ায় টানা রথে প্রায়ই নানা ধরনের ধারালো ফলা লাগিয়ে দেওয়া হত। প্রচীন যুগে ভারতবর্ষেও রথের ব্যবহার খুবই জনপ্রিয় ছিল। সাধারণ গুলতি (catapult) ও তীর, ধনুক, বিভিন্ন ধারালো অস্ত্র ও ছোট থেকে বড় আকারের পাথর ছোড়বার উপযোগী নানান যন্ত্র গ্রীকদের আমলে প্রচুর তৈরী হয়েছে।

শত্রুপক্ষের দুর্গের ভিতরে আগুন নিক্ষেপ করার যন্ত্রও বারুদ আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত খুবই প্রচলিত ছিল। এই সকল যন্ত্রের দ্বারা শত্রুপক্ষের পরিখার মধ্যে মৃত ও বিষাক্ত জন্তুর দেহ নিক্ষেপ করে শত্রুবাহিনীর মধ্যে রোগের বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার নজিরও অনেক পাওয়া যায়।

আধুনিক ট্যাঙ্ক

দুর্গ বা শহরের দরজা ও দেওয়াল ভেঙে ফেলার জন্যে বিশাল আকারের লোহা বা কাঠের দণ্ড রোমানরা ব্যবহার করত। এই সব দণ্ড ১২০ থেকে ১৫০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ এবং বিপুল ওজনের হত।

ভারতবর্ষে দুর্গ ও দরজা ভাঙার কাজে হাতিকে ব্যবহার করা হত। লোহার ঢাল এবং মোটা লোহার চাদরের আচ্ছাদন দিয়ে তৈরী চলন্ত যানের আড়ালে সৈন্যবাহিনী লুকিয়ে থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হত। এই থেকেই আধুনিক যুদ্ধের ট্যাঙ্ক (tank) নির্মাণের প্রেরণা এসেছে।

জলযুদ্ধে নৌকোর বা জাহাজের অনেক উন্নত এবং নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে গ্রীক গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শত্রুপক্ষের নৌকো দূর থেকে ধরে উলটে দেওয়ার জন্যে তিনি এক ধরনের ক্রেন (crane) আবিষ্কার করেছিলেন। তারপর বারুদ ও বন্দুক আবিষ্কারের পর থেকেই যন্ত্রবিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়।

॥ জলযান ॥

জলপথে যাতায়াত করার কায়দা শিখতে আগেকার দিনের মানুষের বোধহয় বেশীদিন দেরি লাগে নি। প্রথমে লোকে গাছের গুঁড়ির সাহায্যে জলে ভেসে থাকার কৌশল শেখে। পরে ভেসে থাকবার উন্নত ধরনের সরঞ্জাম প্রস্তুতের কৌশল আবিষ্কার করে। গাছের গুঁড়ির মাঝখানকার কিছুটা কাঠ কেটে বার করে নিয়ে জলের উপর তাকে ভাসিয়ে রাখা শিখতে গিয়েই মানুষ নৌকো তৈরি করতে শেখে।

মিশরে খ্রীষ্টের জন্মের তিন-চার হাজার বছর আগে থেকেই নৌকো ব্যবহারের নজির পাওয়া যায়। প্রথম যুগের নৌকো কেবল স্রোতের অনুকূলেই চলতে পারত। পরে পাল খাটিয়ে বাতাসের সাহায্যে খুশিমত নৌকো চালানো শুরু হয়। ফিনিসীয়গণ (Phoenecians) খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে। প্রথম নৌকোকে নিজের প্রয়োজনমতো যেদিকে খুশি চালাতে শেখে।

বাইবেলে বিখ্যাত নোয়ার আর্ক (Noah's ark)-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। নৌকোর আকারের উন্নতি থেকেই ক্রমশঃ জাহাজ তৈরি শুরু হয়। জাহাজ-তৈরি প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় গ্রীকদের আমলে। রোমানদের সময়ে অসংখ্য জাহাজ তৈরী হয়। রাজ্য-জয়ের জন্যে সে-সব জাহাজ ব্যবহৃত হত। মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার সময়ে রোমান যুদ্ধজাহাজের অনেক উন্নতি হয়।

রোমানদের এক-একটি জাহাজে ৩৫০ জন পর্যন্ত লোক একসঙ্গে দাঁড় টানত এবং এই সব জাহাজে ১২০ জন পর্যন্ত সৈন্য থাকতে পারত। উত্তর ইওরোপের দুর্ধর্ষ নাবিক দস্যু 'ভাইকিং'রা (Vikings) উত্তাল সমুদ্রে দক্ষতার সঙ্গে জাহাজ চালিয়ে খুব নাম করেছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে সমুদ্রগামী জাহাজের চলাচল নিয়মিতভাবে শুরু হয়। এর বেশ কিছু আগে থেকেই ভূমধ্যসাগরে ইতালীয়গণ যাত্রী ও মালপত্র বহন করার জন্যে তিনতলা ৬০০।৭০০ টনের জাহাজ ব্যবহার করা শুরু করে।

প্রথমে দিকে স্পেনীয়, পোর্তুগীজ, ডাচ, ইতালীয়
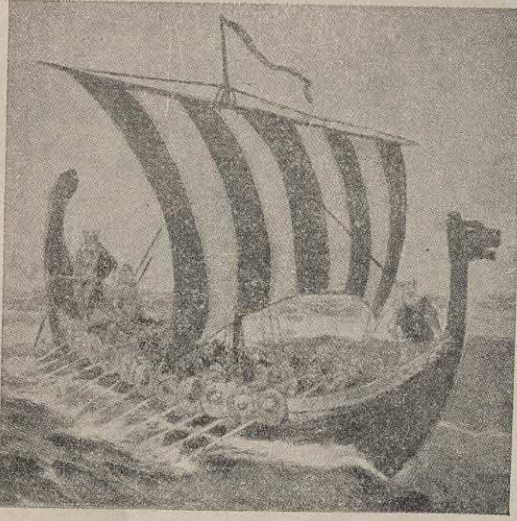
ভাইকিংদের জাহাজ

ও ফরাসীগণ জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পে অগ্রণী থাকলেও রানী এলিজাবেথের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নৌশিল্পে ইংলণ্ড শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে।

॥ অন্ধকার যুগ ॥

এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রথম যুগ ছিল হাতে-কলমে শিক্ষার যুগ। এই যুগ কেটে যাবার পরেই প্রায় হাজার বছর ধরে সভ্যতার ক্ষেত্রে অন্ধকারময় যুগ (Dark Age) এসে যায়। এই সময়ে মানুষ তেমন কোন সৃষ্টির কাজে হাত দেয় নি। প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন সমস্ত মহান্ সভ্যতাই এই সময় নষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন কোন অগ্রগতি সে সময়ে হয় নি।

ইওরোপে রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যুগের অবসান ঘটে। রেনেসাঁস মানে পুনর্জন্ম। মানুষ আবার নতুন উদ্যমে কাজে লাগে। নতুন সব বিদ্যা শিখে তারা সব বিষয়ে অনেক উন্নতি করে। এই সময় মানব-সভ্যতার তিনটি ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রথম পরিবর্তন ঘটে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। জনসাধারণের ক্ষমতা বাড়তে থাকে আর রাজাদের ক্ষমতা কমতে থাকে। আগে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করে রাজারা যেমন খুশি তেমন কাজ করতেন। এখন থেকে সে জায়গায় দেশের ও জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিল।

দ্বিতীয়তঃ, অসংখ্য নাম-করা দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের আবির্ভাবের ফলে মানুষ অনেক কিছু নতুন জ্ঞান লাভ করে ও অনেক পুরোনো ধারণা লোপ পায়। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, দেকার্ত, নিউটন, ডারউইন, পাস্তুর, কুরী প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁদের জ্ঞানের আলোয় মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে এগিয়ে আসেন।

তৃতীয়তঃ, যান্ত্রিক ও অন্যান্য অগণিত নতুন আবিষ্কারের ফলে মানুষ নানারকম শিল্পের কাজে লেগে যায়।

ইওরোপে রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত বিভাগের মতো এঞ্জিনীয়ারিং-এর ক্ষেত্রেও একটি বড় রকমের পরিবর্তন দেখা গেল। আগে প্রতিটি কাজই মানুষের দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করত, আর আজ নিত্যনতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার মানুষের বুদ্ধিকে নানা দিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

বিজ্ঞানকে নানা উপায়ে মানুষের উপকারে লাগাবার জন্যে এবং বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির জন্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে রয়্যাল সোসাইটি ও সায়েন্স আকাদেমী (Academie des Science)-র মতো প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সে এই সময় রাস্তা ও খালের নানা রকম উন্নতি করার জন্যে বহু কাজকর্ম শুরু করা হয় ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে এইসব এঞ্জিনীয়ারিং-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। রাস্তা বাঁধিয়ে দেওয়া ও রাস্তার ধারে আলোর বন্দোবস্ত করা এই সময় থেকেই শুরু হয়।

॥ যান্ত্রিক যুগ ॥

বিজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার সঙ্গে সঙ্গেই এঞ্জিনীয়ারিং-এর আধুনিক যুগের পত্তন হয় এবং এই সময় থেকেই সমাজের ও মানবগোষ্ঠীর উপর এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব বৃদ্ধি পায়।
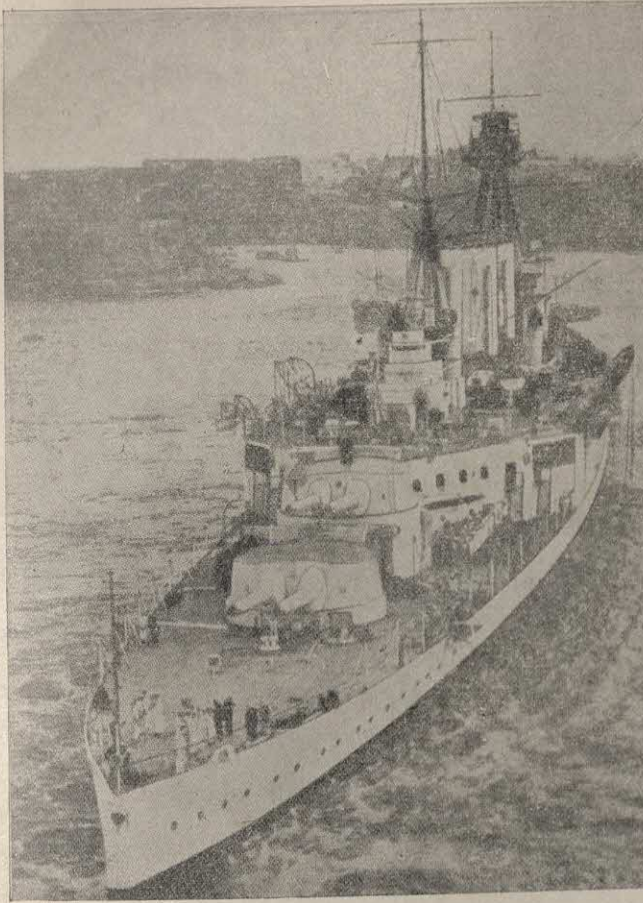
যুদ্ধ-জাহাজ এইচ. এম. এস হুড। ৮৫০ ফুট লম্বা। তৈরি করতে ৬০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়েছিল

যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে কত কি জিনিসের চাহিদা বাড়তে লাগল। আর সেই সব চাহিদা মেটাতে এঞ্জিনীয়ারিং-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হতে লাগল। এঞ্জিনীয়ারিং-এর ক্ষেত্রও বিস্তার লাভ করতে থাকল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংলণ্ডে পর পর অনেকগুলি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে শিল্প-জগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। ঐতিহাসিকগণ এরই নাম দিয়েছেন শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution).

সাধারণতঃ ব্যবসায়িক প্রয়োজনের জন্যেই এই বিপ্লব শুরু হয়। বিপ্লব মানে কর্মধারা একেবারে পালটে যাওয়া। পৃথিবীর চারদিকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা উপনিবেশগুলিতে ইংলণ্ডের প্রচুর কাঁচামাল ছিল। এইসব কাঁচামাল থেকে ইংলণ্ড নানা জিনিস তৈরি করতে লাগল। নানা যন্ত্রপাতি, কলকারখানা তৈরী হল। যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে গেল।

॥ বস্ত্রশিল্প ॥

যান্ত্রিক উন্নতির প্রথম সূত্রপাত হয় বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে। 'কটন জিন' (cotton-gin) জাতীয় নতুন যন্ত্র বস্ত্রশিল্পে যুগান্তর ঘটাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহারই শিল্প-জগতের কাজকর্মে নতুন ধারা এনে দেয়। জেমস্ ওয়াট্ কয়লা-খনির জল নিষ্কাশনের কাজে পাম্প চালাবার জন্যে বাষ্পীয় শক্তিকে ব্যবহার করে মানুষের কাছে নতুন শক্তির ভাণ্ডার খুলে দেন। তারই নানা রকম ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তন আনে।

আধুনিক বস্ত্রকলে ১৫০টি মাকু একসঙ্গে চলছে

বাষ্পীয় এঞ্জিন ব্যবহারের ফল হিসেবে লৌহশিল্পে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। নতুন নতুন চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে কাঠকয়লা পুড়িয়ে লোহা গলানোর পুরোনো কলকারখানাগুলি একেবারেই উঠে গেল। জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়, কিন্তু বস্ত্রশিল্পের নতুন চাহিদা পূরণ করার জন্যে লোহাকে ইস্পাতে রূপান্তরিত করা ও ইস্পাতকে পিটিয়ে বিভিন্ন আকারের তৈরি করা শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে।
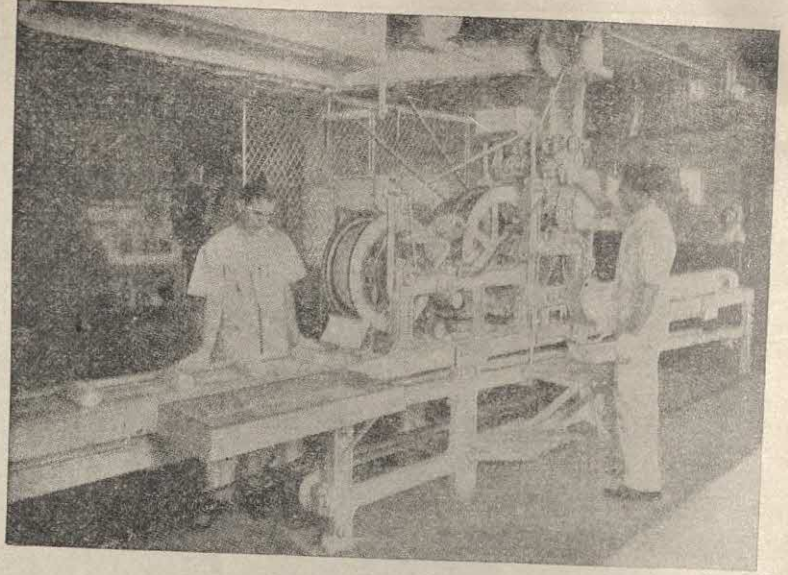
পাঁউরুটির কলে পাঁউরুটি তৈরী হচ্ছে

এইভাবে ইংলণ্ডের যন্ত্র-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মেকানিক্যাল (যান্ত্রিক) এঞ্জিনীয়ারিং ও মেটালারজিক্যাল (ধাতুবিদ্যাসম্বন্ধীয়) এঞ্জিনীয়ারিং-এর জন্ম হল।

॥ বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার ॥

এঞ্জিনীয়ারিং-এর আর একটি বিশিষ্ট বিভাগ ইলেকট্রিক্যাল (বৈদ্যুতিক) এঞ্জিনীয়ারিং-এর পত্তন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। ইলেকট্রিসিটির আবিষ্কার হয় খুবই অল্পকাল আগে। গ্যালভানি, ভোল্টা, ফ্যারাডে প্রমুখ পদার্থবিদ্‌গণ এই শাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে ইলেকট্রিসিটির প্রথম ব্যবহার হয় টেলিগ্রাফের কাজে স্যামুয়েল মর্স-এর প্রচেষ্টায়।

রাশিয়ার ভলগা নদীর উপর নির্মিত জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র

সিমেন্স, বেল, এডিসন, ওয়েস্টিংহাউস প্রমুখ বিজ্ঞানীরা মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে ইলেকট্রিসিটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে দেন। বাষ্পীয় শক্তির পরেই মানুষের উন্নতির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠল বৈদ্যুতিক শক্তি। বাষ্পীয় শক্তির সাহায্য ছাড়াও মানুষের অসংখ্য নিত্যপ্রয়োজনীয় নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতা খুব উন্নতি লাভ করল। অল্প সময়ের মধ্যেই
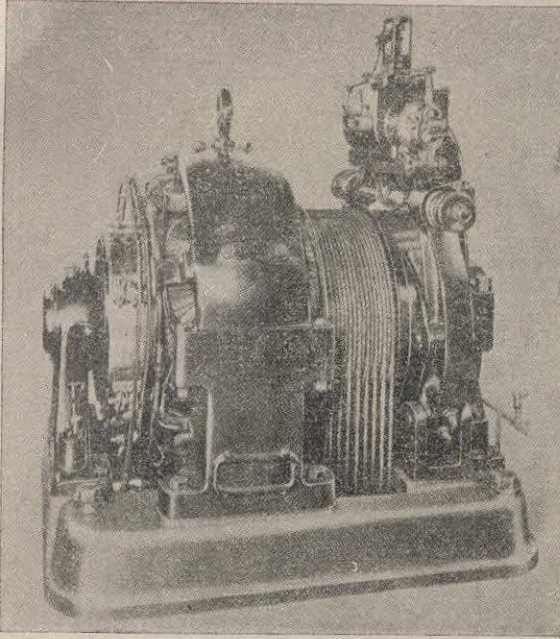
আধুনিক এলিভেটর যন্ত্র

ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রচুর উন্নতি হল।

॥ সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং ॥

রেলপথ, রাস্তা, সেতু, খাল, গৃহনির্মাণ, কল-কারখানার কাঠামো, জাহাজঘাটা, বন্দর, বিমানঘাঁটি নদীর বাঁধ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ-পরিকল্পনা, জমির ক্ষয়-নিবারণ, সেচ-ব্যবস্থা, জল-সরবরাহ, ময়লা-নিষ্কাশন, ভারী যন্ত্রপাতির ভিত্তি-নির্মাণ, মহাকাশগামী রকেটের ক্ষেপণভূমি প্রভৃতি সম্পর্কের সমস্ত সমস্যাই আজকের সিভিল এঞ্জিনীয়ারের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষ আধুনিক এঞ্জিনীয়ারিং জগতে নবাগত হলেও গত বিশ বছরে ভারতবর্ষে অনেক উল্লেখযোগ্য নির্মাণকার্য হয়েছে। মোকামার কাছে অতি প্রশস্ত গঙ্গার উপর ও গৌহাটীর কাছে ব্রহ্মপুত্রের উপর যুগ্ম রেল ও সড়ক সেতুগুলি এঞ্জিনীয়ারিং কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এই দুটি সেতুর পরপর দুটি থামের মধ্যেকার প্রসার প্রায় ৪০০ ফুট। আরও আগের আমলে (১৯৪০ খ্রীঃ) তৈরী হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে ১৫০০ ফুট প্রসারের রবীন্দ্র সেতু পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ক্যান্টিলিভার সেতু।
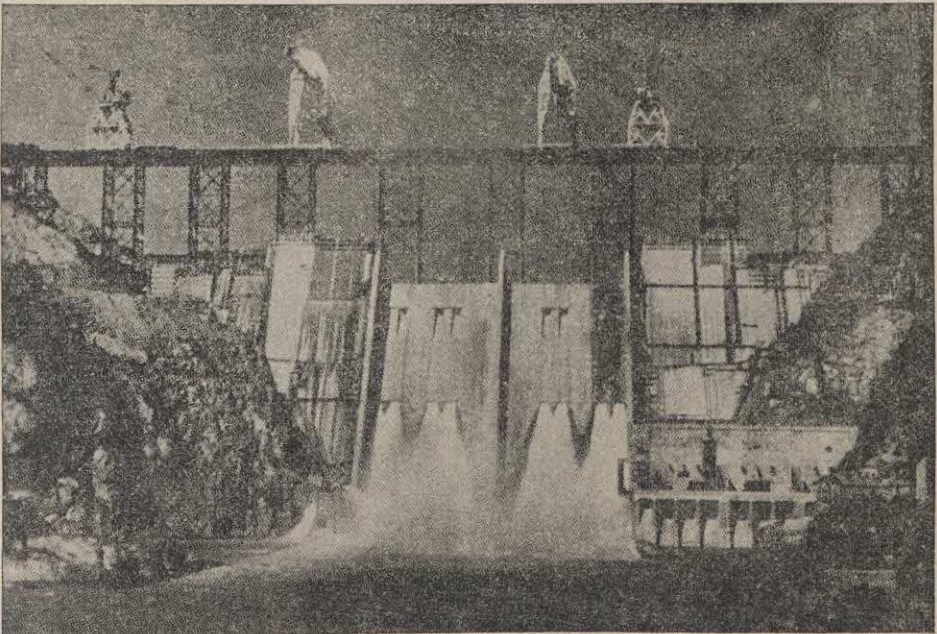
ভাখরা ড্যাম। শতদ্রু নদীর উপর এই বাঁধ ৫৪,২৫,০০০ ঘন গজ আয়তনের। ৭২০ ফুট উঁচু
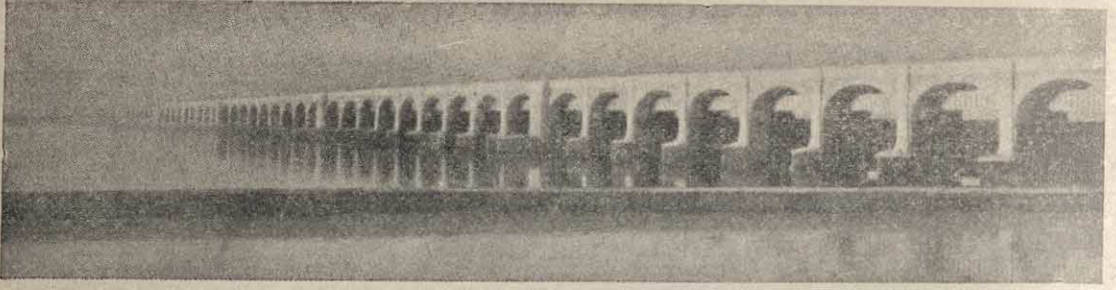
পাকিস্তানের স্থক্কুর বাঁধ বা লয়েডস ব্যারেজ

খিদিরপুরে জাহাজ যাতায়াতের খালের উপর তৈরী এবং জাহাজ চলাচলের সময় ফাঁক হয়ে-যাওয়া দুই পাল্লার bascule সেতুটি এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনা ও ভাখরানঙ্গল পরিকল্পনাতে নদীর জল-স্রোতের শক্তিকে বশ করে মানবকল্যাণে লাগানো হয়েছে।

পশ্চিম জার্মানীর একটি জাহাজ তৈরির কারখানা

বন্যার জল নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি এবং বিজলী-শক্তি-উৎপাদনের উপায় পাওয়া গেছে। কান্দলা, বিশাখাপত্তনম্, পরাদীপ ও হলদিয়ার বন্দর নির্মাণের কাজও আমাদের সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং-এর উন্নতির পরিচয়। লোহা ও কংক্রিটের কাঠামোর উপর তৈরী বিশাল বিশাল অট্টালিকা কলকাতা ও বোম্বাইয়ের চেহারা একেবারে বদলে দিয়েছে।

বোম্বাইয়ের কাছে তারাপোর ও রাজস্থানের কোটায় আণবিক শক্তিকে মানুষের দরকারে ব্যবহারের জন্যে বিশাল কারখানা তৈরী হয়েছে। দুর্গাপুর, ভিলাই, বোকারো প্রভৃতি কেন্দ্রে স্থাপিত ইস্পাত কারখানা ও রাঁচীর হেভি এঞ্জিনীয়ারিং কারখানার নির্মাণ-কার্যও এদেশের সিভিল এঞ্জিনীয়ারদের গর্বের বস্তু। ফরাক্কার গঙ্গানদীর উপর ১১০টি দরজাবিশিষ্ট বাঁধ বা ব্যারাজ (barrage) তৈরি করে নদীর গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে এবং কৃত্রিম খাল দিয়ে জল এনে পলি-মাটিতে মজে যাওয়া ভাগীরথীর ও সঙ্গে

নদীর জল অদম্য গতিতে বাঁধের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে

সঙ্গে কলকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং-এরই মতো আরকিটেক-চারাল এঞ্জিনীয়ারিং ও টাউন প্ল্যানিং এঞ্জিনীয়ারিং গৃহনির্মাণে ও শহর-পরিকল্পনায় সৌন্দর্য এনে দিয়েছে।

॥ মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ॥

মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বলতে প্রধানতঃ যন্ত্র ও সবরকম যান্ত্রিক খুঁটিনাটি উৎপাদন ও চালনা-শক্তিকে বোঝায়। আজকের মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারদের কাজ হাওয়া, গ্যাস, বাষ্প ও জলের শক্তিতে এঞ্জিন, পাম্প ও অন্যান্য হাইড্রলিক যন্ত্র ও বাষ্পীয় বয়লার চালানো বোঝায়। গরম করার যন্ত্র ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র, জল স্থল আকাশে চলার উপযুক্ত যানবাহনের এঞ্জিন নির্মাণের উপযোগী যন্ত্রপাতি ও মাল বহনের জন্যে কনভেয়ার, ক্রেন ইত্যাদি নানান যন্ত্র তৈরিও তাঁদের কাজ। এই যন্ত্রযুগে অন্য সমস্ত বিভাগের এঞ্জিনীয়ারকেই তাঁদের নিজেদের কাজের উপযোগী যন্ত্রের যোগান দেওয়ার জন্যে মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারদের উপর নির্ভর করতে হয়।

মেরিন এঞ্জিনীয়ারিং, এরোনটিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং, অটোমোবাইল এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি মেকানিক্যাল এনজিনীয়ারিং থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

॥ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ॥

ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর কাজ প্রধানতঃ বিদ্যুৎ নিয়ে।

শিল্পে বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার বর্তমানে খুব জনপ্রিয়। এত জনপ্রিয়তার কারণ আছে। মানুষের ব্যবহার্য উৎসগুলির মধ্যে একমাত্র বিদ্যুৎ-শক্তিই খুব অল্প খরচে ইচ্ছা-অনুসারে দূর দূর স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ঘরে আলো যোগানো এবং পাখা ও পাম্প চালানো ছাড়াও রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিসন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, অসিলোগ্রাফ্, চিকিৎসার ও রোগনিরূপণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এক্সরে, ট্রাম, ট্রেন, উড়োজাহাজ, মোটরগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি আধুনিক যানবাহন, যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত রেডার জাতীয় অসংখ্য সরঞ্জাম, জল গরম করা থেকে মসলাপেষার উপযোগী অসংখ্য গৃহস্থালির টুকিটাকি সবকিছু যোগানোর জন্যেই আজকের ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জি-নীয়ারদের কাছে মানব-সভ্যতা প্রচুর পরিমাণে ঋণী।

॥ মাইনিং ও মেটালারজিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ॥

এঞ্জিনীয়ারিং-এর এই দুইটি বিভাগের উন্নতি ও প্রসার পরস্পরের উপর নির্ভর করে। মাইনিং বলতে খনি থেকে খনিজ বস্তু সংগ্রহকে বোঝায় আর মেটালারজি হচ্ছে এই খনিজ থেকে ধাতু বার করার কলাকৌশল। ধাতুর ব্যবহার সভ্যতার আদিযুগে শুরু হয়েছিল প্রধানতঃ অস্ত্রনির্মাণের তাগিদে। প্রথমে তামা, ব্রোঞ্জ, পরে লোহা, তারও পরে ইস্পাতের বহুল ব্যবহার মানব-সভ্যতার এক একটি আলাদা যুগকে চিহ্নিত করে রেখেছে। আধুনিক যুগের জটিল প্রয়োজনের দাবি মেটাবার জন্যে ইস্পাতের সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরী সংমিশ্রিত ইস্পাতের বহুল প্রচলন হয়েছে এবং এই জন্যে আধুনিক যুগকে অনেকে সংমিশ্রিত ইস্পাতের যুগ (Alloy Steel Age) বলে অভিহিত করেন।

শহরে জল-সরবরাহের পাইপ বসানো হচ্ছে
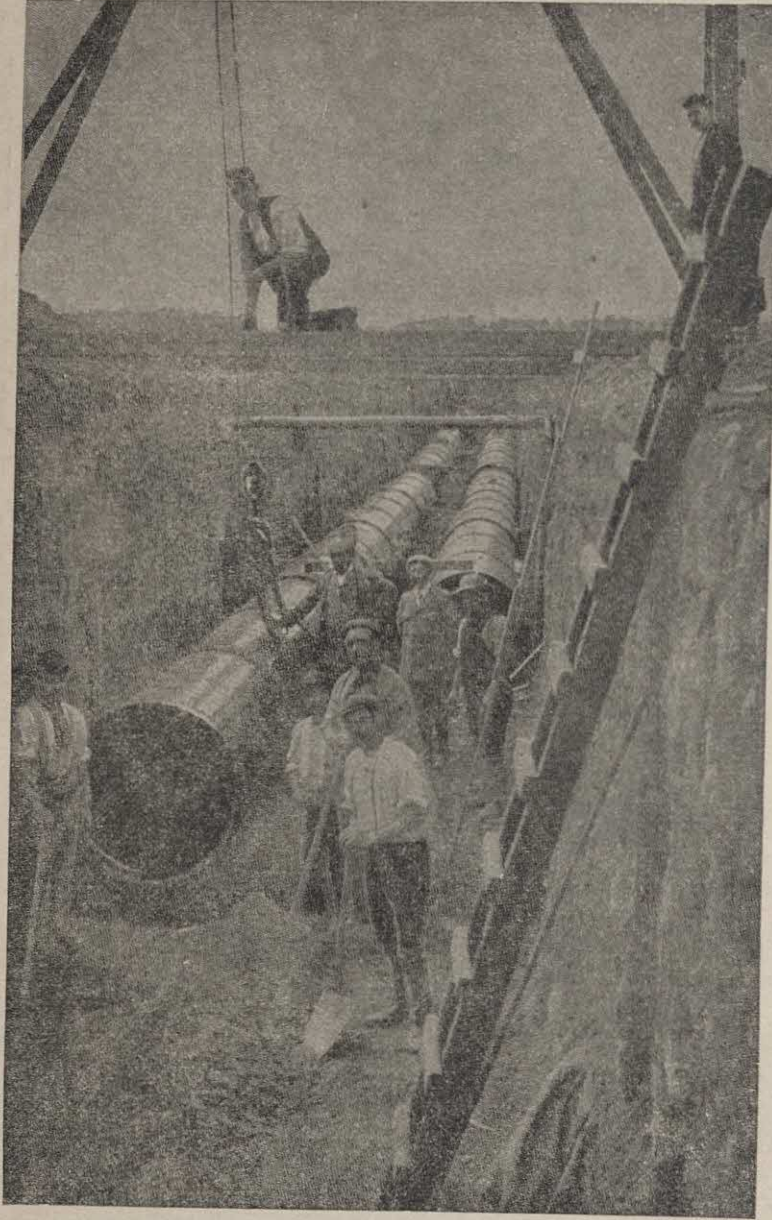
খনির ভিতরে যাতে কোন বিপদ ঘটতে না পারে সে ব্যবস্থা করা মাইনিং এঞ্জিনীয়ারের একটি প্রধান কর্তব্য। খনির ভিতরে ঠিকমতো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা, ভূগর্ভের গরম ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াকে সহনীয় করে তোলা, খনির ভিতরে ধসনামা এড়াবার জন্যে খনিজ সংগ্রহ করে সেই শূন্যস্থান নিপুণ হাতে বালি বা মাটি দিয়ে আবার ভরাট করে দেওয়া, পাথর ফাটাবার জন্যে হিসেবমতো বিস্ফোরণ ঘটানো, ভূ গ র্ভে নামবার-ওঠবার সুবন্দোবস্ত করা ও সেই ব্যবস্থাকে সব রকম জরুরী অবস্থার জন্যে তৈরী রাখা, ভূগর্ভ থেকে যে জল বেরোয় সেই জলধারাকে পাম্প করে বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা—এই ধরনের নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার মাইনিং এঞ্জিনীয়ারদেরই বহন করতে হয়।

মেটালারজিক্যাল এঞ্জি-নীয়ারদের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধাতু সংগ্রহের জন্যে আকরকে বিশেষ ধরনের চুল্লীর (furnace) মধ্যে প্রচণ্ড তাপে গলিয়ে ফেলে মিশ্রিত অদরকারী বস্তুকে (অর্থাৎ, খাদ-কে) ফেলে দিয়ে গলিত ধাতুকে প্রয়োজনমতো বার করে নেওয়া। সদ্য গলা ধাতুকে নানান কৌশলে খাঁটী করে ঢালাই কারখানায় (Foundry) বা রোলিং-মিলে দরকারমতো ছাঁচে তৈরি করে নেওয়াও মেটালারজিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

মেটালারজিক্যাল এঞ্জিনীয়ারদের সচরাচর জ্বালানির (fuel) ব্যবস্থা ঠিক করতে হয়। অতি উচ্চ তাপের চুল্লীর দেয়াল তৈরির জন্যে রিফ্র্যাক্টরির (refractory) ব্যবস্থা করতে হয়, ধাতুর আকরকে ঠিকমতো গলাবার জন্যে তার সঙ্গে ফ্লাক্স (flux) মেশানোর ব্যবস্থা

অত্যন্ত উচ্চ তাপ ও চাপ সহ্য করবার মতো মেশানো ধাতুর উদ্ভাবনের ফলে বিমান ও মহাকাশ-গামী রকেটের বিস্ময়কর উন্নতি সম্ভব হয়েছে। নানা ধাতুর মিশ্রণে তাপ ও চাপ সহ্য করতে পারে এমন ধাতু আবিষ্কার করে, সেই ধাতু দিয়ে রকেট তৈরি করা হচ্ছে।

॥ কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ॥

কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বলতে যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক ক্রিয়া থেকে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের বিদ্যা বোঝায়। ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং যেরকম

ইলেকট্রিক ক্রেন

করতে হয়। জ্বালানির উপযুক্ত চুল্লী ও আর সব আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি মাথা খাটিয়ে বার করার দায়িত্বও তাঁদের নিতে হয়। বিভিন্ন ধাতুর উৎপাদনের জন্যে বিভিন্ন ধরনের ও মাপের চুল্লী তৈরি করতে হয়। লোহা তৈরির জন্য ব্যবহৃত Blast furnace, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই Blast furnace একটি গোল বোতলের মতো আকারের চুল্লী—এর তলায় গলা ধাতু জমা করবার মতো পাত্র থাকে এবং এর ধার দিয়ে ময়লা মেশানো উপচে-পড়া slag-এর সর এবং তার তলায় জমা খাঁটী লোহা বার করে নেওয়ার আলাদা আলাদা নালী থাকে। এক নালী দিয়ে ময়লা মেশানো slag ও অন্য নালী দিয়ে খাঁটী লোহা বার হয়।

মেটালারজিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর দ্রুত উন্নতিই আজকের সভ্যতার অনেক কীর্তিকে সম্ভব করে তুলেছে।

মাটির তলা থেকে তেল তোলা হচ্ছে

পদার্থবিদ্যা থেকে উৎপন্ন, কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিংও সেরকম রসায়নশাস্ত্র থকে সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের চাহিদা পূরণের জন্যে কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং আজকে নিত্যনতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অসংখ্য নতুন শিল্পসংস্থা সৃষ্টির ফলেই এঞ্জিনীয়ারিং-এর এই বিভাগটি একটি প্রধান শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় অ্যাসিড, এলকালি, লবণ, দাহ্য গ্যাস, সিরামিক, সিমেণ্ট, কাচ, সার, চিনি, স্টার্চ, কাগজ, কৃত্রিম সুতা, বিস্ফোরক, রং, কৃত্রিম চামড়া, তেল, সাবান, প্রসাধন দ্রব্য, রবার, আঠা, প্লাস্টিক, পলিথিন, পেট্রোল ও পেট্রোলিয়ামজাত অসংখ্য পদার্থের উৎপাদনের উপযোগী শিল্পসংস্থার পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর কাজ।

কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারদের প্রধান দায়িত্ব উৎপাদনের খরচকে কম রাখা, যাতে উৎপন্ন

কয়লার খনি
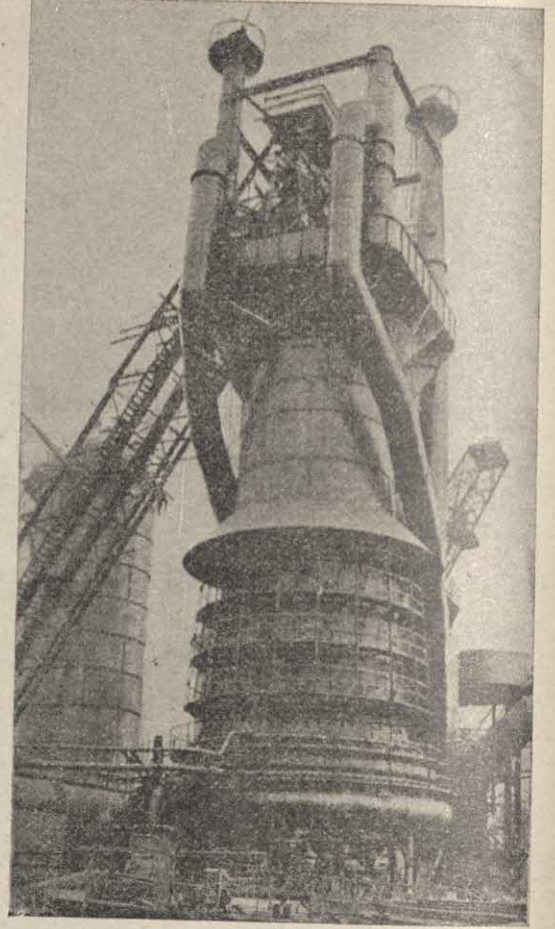
ব্লাস্ট ফার্নেসের বাইরের দৃশ্য

দ্রব্য সবচেয়ে বেশী লোকে ব্যবহার করতে পারে। রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলিকে দ্রুত ও সম্পূর্ণ করে তোলার দিকেও এইজন্যে সব সময় দৃষ্টি রাখতে হয়। কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রসারের প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এঞ্জিনীয়ারিং-এর এই বিভাগের তেমন উন্নতি এখনও হয় নি।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর মূল বিভাগগুলির পরিচয় থেকেই বোঝা যাবে যে আজকের কোনও কীর্তিই আর এঞ্জিনীয়ারিং-এর একটিমাত্র বিভাগকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে পারে না। বড় বা ছোট যে কোন কাজেই একাধিক বিভাগের মিলিত কাজের ফলেই এঞ্জিনীয়ারিং সফল হয়ে উঠতে পারে।

খেলাধুলার কথা

মানুষ যখন সভ্য হয় নি তখন খেলাধুলা করবার বড় একটা সময় পেত না। তারপর যখন তারা চাষবাস শিখল, তখন ফসল বোনা থেকে ফসল ওঠা পর্যন্ত সময়টা নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও, ফসল ওঠার পর তারা প্রচুর সময় পেত। সেই সময়টা তারা নানারকমের আমোদ-প্রমোদ আর খেলায় কাটাত। সে সময়ের ইতিহাস কেউ লিখে রাখে নি। তাই আমরা সে সব দিনের বিবরণ পাই না। অনুমান করে নিতে হয় এসব কথা।

খেলাধুলার প্রথম বিশদ বিবরণ জানা যায় গ্রীসের ইতিহাস পড়ে।

॥ ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা ॥

গ্রীসের ওলিম্পিয়া বলে একটা জায়গায় গ্রীক দেবতাদের রাজা জীউস-এর (Zeus) মন্দির ছিল। জীউস ছিলেন গ্রীক দেবদেবীদের সকলের উপরে। সেখানে আরও অনেক দেবদেবীর মন্দির ছিল। ৭৭৬ গ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে (মানে, আজ থেকে প্রায় ২৭৫০ বছর আগে) সেখানে নানারকম খেলার একটা উৎসব শুরু হয়েছিল। ওলিম্পিয়ায় হত বলে তার নাম হয়েছিল ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা।

সমস্ত গ্রীসদেশ তখন অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সব রাজ্য থেকে দলে দলে খেলোয়াড় সেই ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় আসত তাদের নানারকম খেলাধুলা দেখাতে। যারা জয়লাভ করত তারা পেত—টাকা নয়, সোনা-রুপোর মেডেলও নয়—বুনো জলপাই গাছের পাতার মুকুট! সেটাই ছিল এইসব খেলার শ্রেষ্ঠ সম্মান।

চার বছর পর পর এই ওলিম্পিক খেলা হত।

দেবরাজ জীউস

এই চার বছর ধরে গ্রীসের যে-রাজ্যে যত খেলোয়াড়, সবাই তৈরী হত এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পাতার মুকুট পাবার জন্যে। শেষে এই ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা এত আদরের জিনিস হল যে, যে-মাসে ওলিম্পিক হত, সে মাসে গ্রীসের রাজ্যগুলির মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখা হত—যাতে সবাই ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় আসতে পারে, যাতে প্রতিযোগিতাটা বন্ধ না হয়।

প্রথম ওলিম্পিকে শুধু একটি খেলাই হয়েছিল—দৌড়। এত বেশী লোক দৌড়তে এসেছিল যে ঐ এক দৌড়ের খেলাই অনেকদিন ধরে চলেছিল। শেষে যে জিতল, সে একজন রাঁধুনী; তার নাম কোরোয়েবাস (Coroebus).

প্রথম-প্রথম মেয়েদের এসব খেলায় যোগ দেওয়া নিষেধ ছিল। ওলিম্পিক খেলা দেখতে গেলে পর্যন্ত মেয়েদের শাস্তি হত। শেষে মেয়েরাও ওলিম্পিকে আসতে পেলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁরা দৌড়ঝাঁপে যোগ দিতেও লাগলেন। বেলিসিকা (Belisicha) নামে একজন মহিলা একবার রথ চালাবার প্রতিযোগিতায় (chariot race) প্রথম হয়েছিলেন।

এরপর ওলিম্পিকে নতুন নতুন অনেক খেলা যোগ হয়েছিল। যেমন—কুস্তি, লাফ, লোহার চাকতি ছোড়া ইত্যাদি আর 'প্যানক্রেসিয়ান'—কিলিয়ে মানুষ মারার খেলা। 'পেন্টাথ্‌লন' ছিল পাঁচরকম খেলার সমষ্টি—লাফ, বর্শা ছোড়া, দৌড়, চাকতি ছোড়া আর কুস্তি। এই পাঁচটায় জিততে পারাটা ছিল ওলিম্পিকে সব চাইতে বড় সম্মান।

প্রায় ১২০০ বছর চলবার পর ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়।

তার ১৫০০ বছর পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তাঁ (Baron Pierre de Coubertin) ইওরোপে ঐ ধরনের একটা খেলার উৎসব চালু করেন, সেটার নাম দেন ওলিম্পিক গেম্‌স্‌। এটাও আগেকার মতো চার

ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তাঁ

বছর পর পর হতে থাকে, কিন্তু নিয়ম হল যে সেটা এক-এক বার পৃথিবীর এক-এক জায়গায় হবে। আর তাতে যোগ দিতে পারবে পৃথিবীর যে কোনও দেশের যে কোনও অ্যামেচার (অপেশাদার) খেলোয়াড়। পুরস্কার আর পাতার মুকুট রইল না, তার বদলে দেওয়া হতে লাগল মেডেল। যে প্রথম হবে, সে পাবে সোনার মেডেল, দ্বিতীয় হলে রুপোর, আর তৃতীয় হলে ব্রোঞ্জের মেডেল।

॥ ম্যারাথন রেস ॥

ওলিম্পিক খেলাধুলার একটা প্রধান প্রতিযোগিতা ম্যারাথন দৌড়। ম্যারাথন হচ্ছে গ্রীস দেশের একটা জায়গার নাম। ৪৯০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে সেখানে এক যুদ্ধে এথেন্সের সৈন্যদল পারস্যদেশের সৈন্যদলকে আশ্চর্য-ভাবে হারিয়ে দেয়। ফাইডিপাইডিস (Pheidippides) নামে একজন লোক এক দৌড়ে সেখান থেকে এথেন্সে এসে সুখবরটা পৌঁছে দেন। সেই কথা মনে করে ওলিম্পিকে ম্যারাথন রেস বলে একটা দৌড়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। ম্যারাথন থেকে এথেন্সের দূরত্ব যা ছিল (অর্থাৎ ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ), এই রেসেও ততটাই দৌড়নো হয়।

হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ

॥ ওলিম্পিক হকি ॥

ওলিম্পিকে ভারতবর্ষের খেলোয়াড়রা একমাত্র হকি ছাড়া অন্য কোন খেলায় কখনও সুবিধে করতে পারে নি। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ওলিম্পিকে ভারতের হকিদল ফাইনালে জেতে। সেই থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত প্রত্যেক ওলিম্পিকে হকি খেলায় সোনার মেডেল ভারতই পায়। তারপর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে রোমে অনুষ্ঠিত ওলিম্পিক হকিতে ভারতকে হারিয়ে দিল পাকিস্তান। তারপর ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে টোকিওতে ভারত আবার বিজয়ী হয়। তারপর দু'বার ওলিম্পিক খেলায় ভারত সুবিধে করতে পারে নি। ১৯৭৪ সালে ভারত আবার বিজয়ী হয়েছে।

রোমে ওলিম্পিকের স্টেডিয়াম

হকি খেলায় ভারতের ধ্যানচাঁদের নাম সকলের উপরে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার লস-এঞ্জেল্স শহরে যে ওলিম্পিক খেলা হয়, তাতে তিনি ভারতের
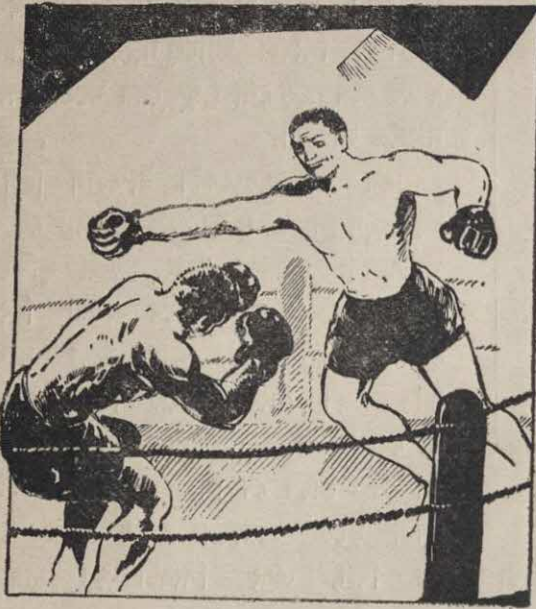
বক্‌সিং

বলে শ্যাডো বক্‌সিং (shadow boxing). খালি হাতের বদলে দু হাতে চামড়ার দস্তানা পরে বক্‌সিং করতে হয়। দস্তানার ওজন ৬ আউন্স হয়।

মার খেয়ে পড়ে গিয়ে ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে না পারলে, যোদ্ধার হার হয়, তাকে বলে 'নক-আউট' (Knock-out, সংক্ষেপে K-O). তা যদি না হয়, তাহলে কে কাকে কত ঘা মেরেছে, তার হিসেব করে হার বা জিত ঠিক হয়—তাকে বলে 'অন্ পয়েণ্টস্' হার বা জিত। আর, যদি রেফারী দেখেন যে, একজন মার খেয়ে খেয়ে আর লড়তে পারছে না, তাহলে তাকে পরাজিত বলে ঘোষণা করে তিনি খেলা বন্ধ করে দিতে পারেন। এরকম হারকে বলে 'টেক্‌নিক্যাল নক আউট'।

॥ মুষ্টিযোদ্ধাদের শ্রেণী বিভাগ ॥

শরীরের ওজন-অনুসারে মুষ্টি-যোদ্ধাদের অনেক-গুলো শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। 'ফ্লাইওয়েট', 'ব্যান্টাম-ওয়েট', 'ফেদার-ওয়েট', 'লাইটওয়েট', 'ওয়েল্টার-ওয়েট', 'লাইট হেভীওয়েট' ও 'হেভীওয়েট'।

নতুন নিয়মে প্রথম চ্যাম্পিয়ান হলেন আমেরিকার কর্বেট। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ২১ রাউণ্ডের খেলায় সালিভানকে হারিয়ে দেন। জ্যাক জনসন প্রথম নিগ্রো বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। তাতে সাহেবরা ক্ষেপে গিয়ে এমন অত্যাচার শুরু করল যে তিনি বাধ্য হয়ে চ্যাম্পিয়ান উপাধি ছেড়ে দিলেন।

নিগ্রোদের কিন্তু চিরকাল চেপে রাখা যায় নি। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আবার একজন নিগ্রো জো লুই চ্যাম্পিয়ান হলেন। ১২ বছরের মধ্যে তাঁকে কেউ হারাতে পারল না। শেষে তিনি নিজেই ঐ খেতাব ছেড়ে দিলেন। তারপর বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান সনি লিস্টন—আর এক নিগ্রো। সনি লিস্টনও ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হারলেন আর এক নিগ্রোর কাছে, তাঁর নাম ক্যাসিয়াস ক্লে। তিনি মুসলমান হয়ে নাম নিয়েছেন মহম্মদ আলি। তাঁকে হারিয়েছেন জো ফ্রেজিয়ার—তিনিও নিগ্রো। ১৯৭৫-এ তিনি আবার লড়াই করে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

॥ লাঠি খেলা ॥

ঘুষো-ঘুষি খেলার মত আর একটি খেলা আছে তার নাম লাঠি খেলা। লাঠি খেলায় একসময়ে বাঙালীর খুব নাম ছিল। তার কথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখে গিয়েছেন। ইংলণ্ডেও এটার চল ছিল। রবিনহুডের গল্পে আছে যে তাঁর দলের লিট্‌ল জন ছিলেন লাঠি খেলায় ওস্তাদ।
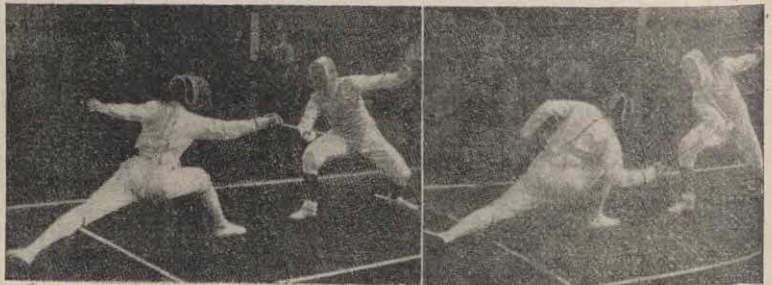
ফেন্সিং
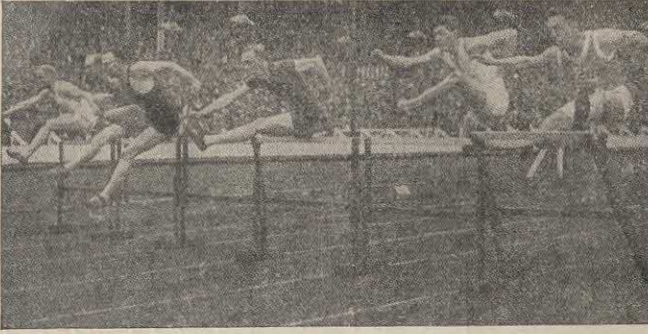
হার্ডল রেস

আমাদের দেশেও সেকালে লাঠি খেলা খুব চলত। লাঠি খেলায় ওস্তাদও ছিল অনেক। শোনা যায় যে তাদের হাতে লম্বা পাঁচহাতী লাঠি এমন বাঁইবাঁই করে ঘুরত যে, বন্দুকের গুলি তাতে লেগে ফিরে যেত। লাঠি নিয়ে মারামারি হলে অবশ্য মাথা ফাটত কিংবা হাড় ভাঙত।

কিন্তু এমনিতে যে লাঠি খেলা, তাতে নানারকম মারের হাত থেকে কি করে নিজেকে বাঁচাতে হয়, সেই কৌশলগুলোই আসল। আমাদের দেশে আধুনিক কালে লাঠি খেলায় পুলিন দাসের খুব নাম ছিল।

॥ তরোয়াল খেলা (ফেন্সিং) ॥

লাঠি খেলার মতো আর এক খেলা হচ্ছে তরোয়ালের খেলা। এ খেলাও ভারতে এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ছিল। তরোয়াল চালাবারও অনেক কৌশল ছিল। তরোয়াল খেলা আজকাল আমেরিকায় আর ইওরোপে কিছু কিছু আছে। তাকে বলে ফেন্সিং (fencing). তাতে যে তরোয়াল ব্যবহার করা হয়, তার ফলাটা দেখতে তরোয়ালের মতো, কিন্তু তাতে ধার নেই, তার আগাটাও ভোঁতা। তাকে বলে 'ফয়েল'—একটু ভারী হলে বলে 'এপে' (epee). খেলবার সময় ওর ভোঁতা আগাটা কে কতবার অপরের গায়ে ঠেকাতে পারে, তাই থেকে হার বা জিত ঠিক হয়।

॥ গদা যুদ্ধ ॥

গদাযুদ্ধের কথা মহাভারতে আছে। ভীম ছিলেন গদাযুদ্ধে ওস্তাদ। গদার ঘায়ে তিনি দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করেছিলেন।

॥ খালি হাতের খেলা ॥

লাঠি, গদা, তরোয়াল ইত্যাদি হাতে নিয়ে খেলতে হয়। কিন্তু হাতে কিছু নিতে হয় না, এমন অনেক খেলা আছে। যেমন—হাঁটা, দৌড়নো, লাফ দেওয়া। তাছাড়া আছে কপাটি, গাদি, গোল্লাছুট ইত্যাদি খেলা। আর সব চাইতে বড় খালি হাতের খেলা হল কুস্তি।

॥ দৌড় ॥

ফাঁকা জায়গায় দৌড়নোকে বলে 'ফ্ল্যাট রেস', কিন্তু মধ্যে মধ্যে বেড়া ডিঙোতে হলে সেই দৌড়কে বলে 'হার্ডল রেস' (Hurdle race)। তারপর, দূরত্ব হিসেবে দৌড়ের নাম হয়, যেমন ১০০ মিটার ফ্ল্যাট রেস, ৪০০ মিটার হার্ডল রেস—এই রকম। সব চাইতে বেশী দূর পাল্লার রেস হচ্ছে ম্যারাথন রেস।

॥ লাফ-ঝাঁপ ॥

লাফানো তিন রকমের। খালি জায়গায় লাফ দিয়ে যতদূর সম্ভব দূরে গিয়ে পড়াকে বলে লং জাম্প কিংবা
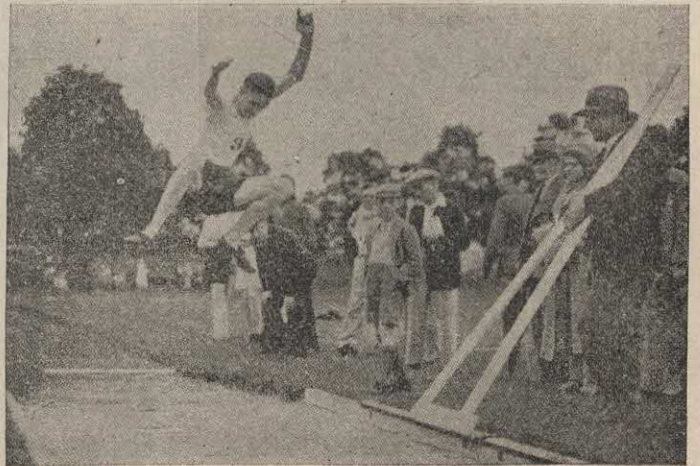
লং জাম্প

হাই জাম্প

ব্রড জাম্প, লাফিয়ে উঁচু বাধা ডিঙানোর নাম হাই জাম্প, আর লম্বা লাঠিতে ভর দিয়ে উঁচু দিকে লাফ দেওয়াকে বলে পোল-ভল্ট (pole-vault), মানে 'লগি ধরে ডিগবাজি'। পোল-ভল্ট অবশ্য খালিহাতের খেলা হল না।

পোল-ভল্ট

॥ রনপা ॥

সেকালের ডাকাতরা দৌড়বার একটা জিনিস ব্যবহার করত—তার নাম রনপা (stilt). দুহাতে দুটি বাঁশ ধরে, দুটি বাঁশের গায়ে অনেক উপরে লাগানো দুটো খাঁজে পা রেখে, অসম্ভব লম্বা লম্বা পা ফেলে, ঘোড়ার মতো বেগে দৌড়তে পারত তারা। এইভাবে রাতারাতি অনেক দূরে চলে যেতে পারত। সেকালে ডাকাতরা এইভাবে বহুদূরে গিয়ে ডাকাতি করত।

॥ জ্যাভেলিন ছোড়া ॥

আর এক ধরনের খেলা হল নিক্ষেপের খেলা অর্থাৎ কোন কিছু ছোড়া। কাজেই সেগুলো আর খালি হাতে হয় না। বর্শা (javelin), হাতুড়ি (hammer), গোলা (shot) আর চাকতি (discus)—এই চাররকম জিনিস ছুড়ে ফেলা হয়। যে সব চাইতে বেশী দূরে জিনিসটা ফেলতে পারে, তারই জিত। এ সবেরই আবার ওজন কত হবে, তা ঠিক করা আছে। বর্শা হবে ১ পাউণ্ড ১২$\frac{1}{2}$ আউন্স, হাতুড়ি হবে ১৬ পাউণ্ড ওজনের, আর চাকতি হওয়া চাই ৪ পাউণ্ড ৬$\frac{1}{2}$ আউন্স ওজনের।
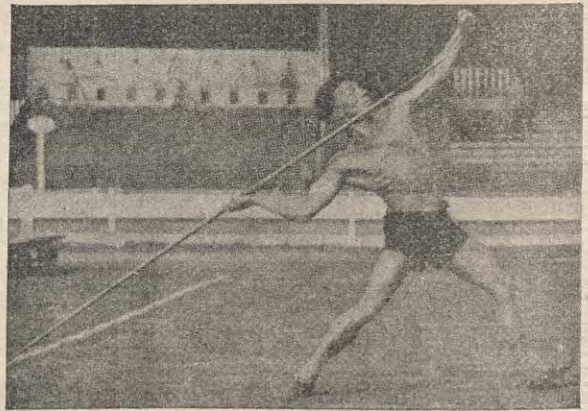
বর্শা ছোড়া

লোহার চাকতি ছোড়া

॥ গোলা ছোড়া ॥

গোলা ছোড়াকে বলে 'পাটিং দি শট' (putting the shot). 'পুটিং' যেন বলা না হয়! B-u-t হয় 'বাট্', কিন্তু P-u-t হয় 'পুট্'। কিন্তু এই এক জায়গায় P-u-t হবে 'পাট্'। গোলাটার ওজন হবে ১৬ পাউণ্ড, মানে, সওয়া সাত কিলোগ্রাম।

॥ সাইকেল ও মোটর সাইকেল রেস ॥

সাইকেলে চড়ে বা মোটর সাইকেলে চড়ে প্রতিযোগিতার খেলা হয়। সে খেলা দেখতে খুব ভাল লাগে। খেলাধুলায় এ দুটি খুব উত্তেজনা জাগায়।

॥ কপাটি : গাদি : গোল্লাছুট ॥

এবার খালি হাতে খেলার কথায় ফিরে আসা যাক। আমাদের দেশী খেলার মধ্যে হচ্ছে কপাটি, গাদি, গোল্লাছুট ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে একটা দলের সঙ্গে আর একটা দলের খেলা। কেউ একা হারে বা জেতে না, দলেরই হার বা জিত হয়। চোর-চোর, কুমীর-কুমীর ও কানামাছি খেলা—এদেশের ছেলেদের খুব প্রিয় খেলা।

॥ কুস্তি ॥

এইবার কুস্তির কথা। ভাল কথায় একে বলে মল্লযুদ্ধ। কেন না প্রাচীনকালে এটা একটা খেলা ছিল না, ছিল মারামারির ব্যাপার। রামায়ণে

লোহার গোলা ছোড়া

সাইকেল রেস

কুস্তির প্যাঁচ

বালী আর সুগ্রীবের যুদ্ধ, মহাভারতে ভীম আর জরাসন্ধের যুদ্ধের কথা আছে। সে-সব কুস্তিই, কিন্তু মেরে ফেলবার জন্যে কুস্তি।

খেলা হিসেবে কুস্তি আমাদের দেশে এবং আরও অনেক দেশেই আছে।

ভারতবর্ষে যত বড় বড় কুস্তিগীর জন্মেছেন, এমন আর ইওরোপে বা আমেরিকায় জন্মান নি। তাঁদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন গামা পালোয়ান। তাঁর মেজ ভাই হচ্ছেন ইমাম। তাঁদের আগে ছিলেন গুলাম, যাঁকে ভারতের কুস্তিগীররা দেবতা বলে মানতেন।

কলকাতার শরৎ মিত্র আর শ্রেষ্ঠ বাঙালী পালোয়ান গোবরবাবু (যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ) মিলে গামা আর ইমামকে নিয়ে কুস্তি খেলা দেখাতে বিলেত গিয়েছিলেন। তখন ইওরোপের 'চ্যাম্পিয়ান' জন লেম। ইমাম তাঁকে অতি সহজেই হারিয়ে দিলেন। আগেকার দিনের আর এক 'বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান' ছিলেন ডক্টর রোলার। গামা তাঁকে দুমিনিটের মধ্যে দুবার চিত করে দিলেন। কুস্তি খেলায় অপর পক্ষকে চিত করতে পারা মানেই হারিয়ে দেওয়া। ইওরোপীয় কুস্তিগীর বিস্কো গামার চাইতে অনেক বেশী লম্বা-চওড়া। কিন্তু তিনি পাঁচ মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন নি, তাড়াতাড়ি মাটি নিলেন।

ইমাম জীবনে একবারমাত্র হেরেছিলেন গুঙ্গা বলে এক পাঞ্জাবী পালোয়ানের কাছে।

বিদেশের পালোয়ানদের মধ্যে বোধ হয় জার্মান ব্যায়ামবীর ইউজীন স্যাণ্ডো-র (১৮৬৭-১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ) সব চাইতে বেশী নাম। কুস্তিতে আর ভার তোলায় তিনি একসময়ে চ্যাম্পিয়ান হন।

॥ রামমূর্তি ॥

কুস্তি ছাড়া দেহের বল দেখাবার জন্যে, একরকম

মহামল্ল গামা

খেলা—বুকের উপর হাতি তোলা, এক সময়ে দেখানো হত। রামমূর্তি (জন্ম ১৮৭৯ খ্রীঃ) এই খেলা দেখাতেন। তাঁর বুক ৪৮ ইঞ্চি ছিল, ফোলালে ৫৮ ইঞ্চি হত। তিনি গায়ের জোরের অদ্ভুত অদ্ভুত সব খেলা দেখাতেন। শুয়ে পড়ে, বুকে একটা হাতিকে উঠতে দেওয়ার খেলা তিনিই প্রথম দেখান। তাঁর পর আরও অনেকে সেই খেলা দেখিয়েছেন।

॥ ভীমভবানী ॥

বাঙালীবীর ভীমভবানীই একমাত্র পালোয়ান, যিনি একসঙ্গে দুটো হাতি বুকে তুলতে পারতেন। তাঁর মতো পালোয়ান পৃথিবীতে বেশী জন্মগ্রহণ করেন নি। তাঁর আসল নাম ছিল ভবেন্দ্রনাথ সাহা (১২৯৮-১৩২৯ বাংলা সন)।

॥ গোবরবাবু ॥

বাঙালীদের মধ্যে শেষ জগদ্বিখ্যাত কুস্তিগীর ছিলেন গোবরবাবু, যাঁর আসল নাম ছিল যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ (লিখতেন Goho). ইওরোপ ও আমেরিকার কোনও মল্লই তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯৭২ সনে ৭৮ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় মারা গিয়েছেন।

গোবরবাবু

॥ শ্যামাকান্ত ॥

অন্যান্য নাম-করা বাঙালী পালোয়ানদের মধ্যে ময়মনসিংহের শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯২৫) অনেক দিক দিয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেন। শ্যামাকান্ত প্রথম নাম করেছিলেন একটা বাঘের সঙ্গে খালি হাতে যুদ্ধ করে। পরে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। তখন তাঁর নাম হয় 'সোহহং স্বামী'।

॥ জুজুৎসু, জুডো, কারাতে ॥

জাপানে কুস্তির মতো এক রকমের খেলা আছে, তাকে বলে জুজুৎসু (Jiu-Jitsu)। সেটা হচ্ছে খালি হাতে আত্মরক্ষার কৌশল দেখানো। কেউ আক্রমণ করলে বিদ্যুৎ-গতিতে তাকে

রামমূর্তির বুকের উপর হাতি

এমন কায়দায় ধরে ফেলে যে আক্রমণকারী নিজের গতিবেগেই হাত পা ঘাড় পিঠ মুচড়ে পড়ে যায়। এই জুজুৎসুরই আর এক রকম কুস্তি হচ্ছে জুডো (judo). তবে তাতে জুজুৎসুর মতো ভয়ানক জখম করবার চেষ্টা থাকে না। কারাতে (Karate) বলে আরও একরকম বিদ্যা আছে, যা অভ্যেস করলে খালি হাতে অস্ত্রের আক্রমণ ঠেকানো যায়, শত্রুকে মেরে ফেলাও যায়। এর উদ্ভাবক নাকি চীন দেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। ব্যায়াম বা খেলা হিসেবেও অনেকে জুডো, জুজুৎসু আর কারাতে-র চর্চা করেন।

॥ ভার তোলা ॥

কুস্তি ছাড়া গায়ের জোরের আর এক রকম প্রতিযোগিতা আছে, যার্কে বলে ভারোত্তোলন, মানে, ভার তোলা (weight-lifting).

বাঙালীদের মধ্যে ভার তোলায় সবচেয়ে নাম করেছিলেন জ্ঞানদাস দত্ত।

॥ ঘুড়ি ॥

ছেলেরা ঘুড়ির প্যাঁচ খেলে, লাট্টু খেলে, গুলি খেলে আর খেলে ডাংগুলি। এর কোনওটাতেই তেমন পরিশ্রম নেই। কিন্তু কায়দা-কৌশল আছে। এর মধ্যে ঘুড়ি অবশ্য বড়রাও ওড়ায়। নিজের উড়ন্ত ঘুড়ির সুতো দিয়ে অপরের উড়ন্ত ঘুড়ির সুতো কেটে দেওয়াই এই খেলার মজা। ভাদ্রমাসের শেষ দিনে বিশ্বকর্মা পুজো, সেইদিনই ঘুড়ি ওড়ানোর বড় উৎসব। জাপানেও খুব ঘুড়ি ওড়ানো হয়। সেদেশে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত আকারের ঘুড়ি, যেমন—সাপ, মাছ, ড্রাগন ইত্যাদি উড়তে দেখা যায়। আমাদের দেশে ঘুড়ির ডিজাইন হিসেবে কত রকমের নাম হয়, যেমন—বুলুম, পেটকাট্টি, ময়ূরপঙ্খী, শতরঞ্চ, চাপরাশ, চাঁদিয়াল ইত্যাদি।

॥ গুলি ও লাট্টু ॥

গুলি খেলা শুধু আঙুলের টিপের খেলা। ছোট ছোট গোল পাথরের বা কাচের গুলি নিয়ে এই খেলা হয়।

ভীমভবানী

শ্যামাকান্ত

জুজুৎসু

লাট্টু খেলায় অনেক কৌশল আছে। 'গচ্চা', 'চৌকোণ', 'উড়নচৌকোন' ইত্যাদি নানারকমের মারও আছে। লাট্টুর সুতোকে বলে লেত্তি। লাট্টুকে সুতো জড়িয়ে ছুড়ে দিয়ে লেত্তি টানলে লাট্টু ঘোরে।

॥ তাস খেলা ॥

ঘরে বসে যত খেলা, তার মধ্যে তাস খেলা চলে সবচেয়ে বেশী। বহুদিন আগে আমাদের দেশে গোল গোল তাস নিয়ে খেলা হত, তাতে দেবদেবীর ছবি থাকত। এই খেলাটা আগে এশিয়ার নানা দেশে চলত, সেখান থেকে ইওরোপে যায়। সেখানে তারা প্রথমে ঘণ্টা, পাতা, ওক গাছের ফল আঁকা তাস ব্যবহার করত। ক্রমে তাসে জন্তু-জানোয়ারদের, তারপর কয়েকটাতে মানুষের ছবি ও বাকীগুলোতে ইস্কাপন, চিড়িতন, হরতন আর রুইতনের চিহ্ন আঁকা হতে থাকে। এই নতুন ধরনের তাস আমরা পোর্তুগিজদের ও ওলন্দাজদের থেকে পাই। তাই বাংলায় তাসের প্রায় সব শব্দই তাদের ভাষা থেকে নেওয়া, যেমন—ইস্কাপন, চিড়িতন, হরতন, রুইতন, তুরুপ, বিন্তি ইত্যাদি। (এবিষয়ে পরে আবার বলা হয়েছে।)
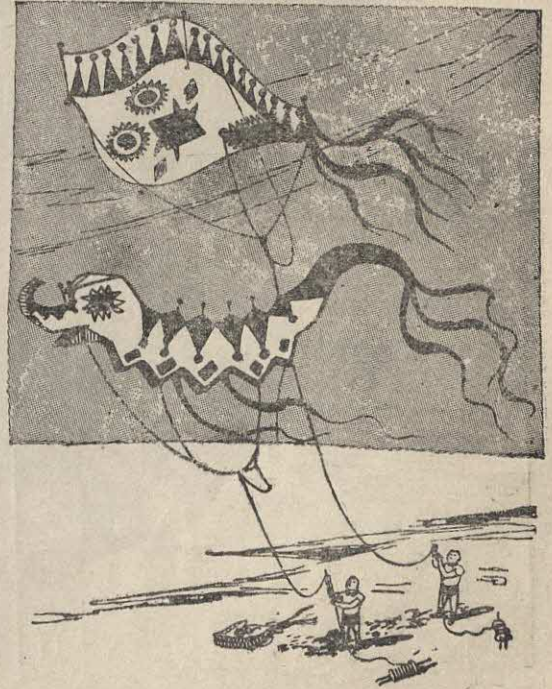
জাপানী ঘুড়ি

॥ দাবা খেলা ॥

দাবা খেলা একমনে খেলতে হয়। এই দাবা খেলা (Chess) হচ্ছে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। সেকালে হাতিতে, ঘোড়ায়, আর রথে-চড়া ও পদাতিক এই চার রকম যোদ্ধা দিয়ে যুদ্ধ হত। তাই এই খেলার নাম হল চতুরঙ্গ। অনেক পরে পারস্যের (ইরানের) লোকেরা এ খেলা শিখল। তারা চতুরঙ্গ না বলে বলত 'শতরঞ্জ'। সেখান থেকে ইওরোপে গিয়ে এ খেলার নাম নিয়ম সব বদলে গেল।

দাবা হচ্ছে. দু'জনের খেলা। প্রত্যেকের ঘুঁটি ১৬টা, একজনের সাদা, অপরজনের কালো। ১৬টা ঘুঁটির মধ্যে রাজা (King), মন্ত্রী বা দাবা (Queen), দুটো গজ বা পিল (Bishop), দুটো ঘোড়া (Knight), দুটো নৌকো (Castle বা Rook), আর আটটা বোড়ে (Pawn) থাকে। যুদ্ধক্ষেত্র হলো ৬৪ খোপ-ওয়ালা একটা চৌকো ছক। তার দুই মাথায় দুপক্ষের ঘুঁটি সাজিয়ে খেলা আরম্ভ হয়। উদ্দেশ্য হল, নিজের ঘুঁটি চেলে চেলে অপরের রাজাকে বন্দী করা। একে বলে কিস্তিমাত, এই হলেই খেলা শেষ।

ফতেপুর-সিক্রির প্রাসাদে বাদশা আকবর একটা মজার ছকে দাবা খেলতেন। সেই ছক মেঝের উপর আঁকা এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। কেননা, ঘুঁটি হত নানা রং-এর পোশাক-পরা মেয়েরা। ছকটা এখনও আছে।
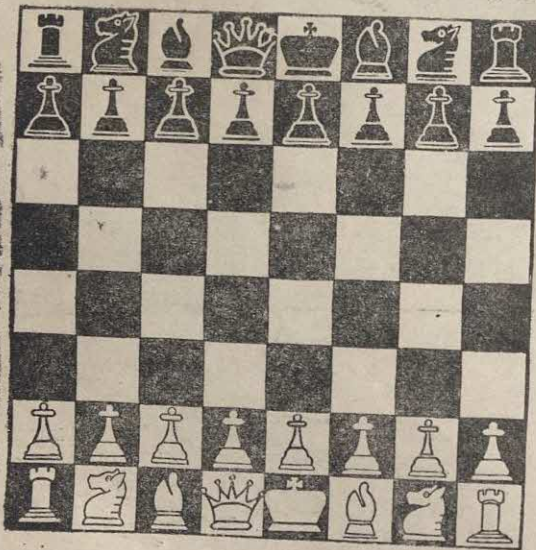
দাবা খেলার ছক

আমাদের এদেশী ঘুঁটি আর সাহেবী দাবার ঘুঁটিতে যেমন নামেও তফাত, তেমনি চেহারাতেও তফাত আছে। ছবিতে বিদেশী ঘুঁটির চেহারা দেখতে পাবে।

প্রত্যেক ঘুঁটির চাল আলাদা। বোড়ে চলবে সামনে এক ঘর, কিন্তু অপর পক্ষের ঘুঁটিকে শুধু কোণাকুণি ঘরে গিয়ে মারতে পারবে। দাবা সোজা বা কোণাকুণি যতদূর ফাঁকা পাবে, ততদূর যাবে, মারতেও পারবে। গজ শুধু কেণোকুণি, আর নৌকো শুধু সোজা—যেদিকে ইচ্ছে। ঘোড়ার চাল সবদিকে আড়াই ঘর, মানে, দু'ঘর সোজা গিয়ে তার পর ডান কিংবা বাঁ পাশের ঘরে চলবে। রাজা একেবারে প্রথমে আড়াই ঘর, তারপর একঘর করে—যে কোনও দিকে।

এদেশে আর ইওরোপে এক নিয়মে খেলা হয় না। রাশিয়াতে দাবা খেলার খুব চলন আছে। প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়দের মধ্যে কাপাব্লাঙ্কা, সুলতান খাঁ, আলেখিন, বট্‌ভিনিক, বরিস স্প্যাস্‌কি এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি আমেরিকার ববি ফিশার বিশ্বজয়ী দাবা খেলোয়াড় হিসেবে খুব নাম করেছেন।

॥ পাশা খেলা ॥

পাশা খেলাও এদেশের খুব পুরোনো খেলা। কতকাল আগেকার বই মহাভারত—তাতে পর্যন্ত পাশা খেলার কথা আছে। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শকুনির বাজি ধরে পাশা খেলা হয়েছিল। খেলায় হেরে যুধিষ্ঠির আর তাঁর ভাইদের রাজত্ব ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তাই একে বলত দ্যূতক্রীড়া, মানে, জুয়াখেলা।

এর আর এক নাম অক্ষক্রীড়া। অক্ষ বা পাশা হচ্ছে কাঠ, হাড় কিংবা হাতির দাঁতের তৈরী তিনটে লম্বা লম্বা চৌকো কাঠি। ছক থাকে, যোগচিহ্নের (+) মতো তার চেহারা। প্রত্যেকটা হাতে তিন সারি খোপ আঁকা, প্রতি সারিতে ৮টা করে খোপ। ৪ জন খেলোয়াড়ের প্রত্যেকের ৪টা করে ঘুঁটি থাকে, আর এক-এক জনের এক-এক রং। তিনটে পাশা একসঙ্গে গড়িয়ে দিলে তারা যখন থামে, তখন

টেবল-টেনিস বা পিংপং খেলা

তিনটের উপর পিঠের ফোঁটাগুলো মিলিয়ে যত ফোঁটা হয়, ছকের উপর ঘুঁটি তত ঘর এগিয়ে যেতে পারে।

পাশার ফোঁটার বেশ মজার মজার নাম। যেমন, তিনটে পাশায়ই ১, ১, ১, পড়লে তাকে বলে তিনপোয়া ; ১, ১, ২ পড়লে চোক ; ১, ২, ২ পড়লে পঞ্জুরী ; ৬, ৫, ১ হল কচে বারো, ৬, ৬, ১ হচ্ছে পোয়াবারো—এইরকম।

॥ বিলিয়ার্ড্‌স্‌ ও পিংপং ॥

ঘরেই খেলা হয় এমন আর দুটো খেলা হচ্ছে বিলিয়ার্ড্‌স্‌ আর পিংপং। পিংপং-এর আর এক নাম টেবল-টেনিস। দুটো খেলাই হয় টেবিলের উপর।

বিলিয়ার্ড্‌স্‌ খেলবার টেবিল প্রকাণ্ড বড়, তাতে ক্যারমবোর্ডের মত পকেট আছে। কিউ (cue) বলে একটা লাঠির খোঁচা মেরে টেবিলের উপরকার বলগুলির একটার সঙ্গে আরেকটার ঠোকাঠুকি করে পকেটে ফেলতে হয়। আর, টেবল-টেনিসের খেলা হয় একটা টেবিলের ওপর টেনিসের মত নেট লাগিয়ে। এর বল আর ব্যাট দুইই খুব ছোট।

॥ ক্যারম ॥

ক্যারম একটি বিদেশী খেলা, এদেশে খুব চলে। ক্যারমবোর্ড বলে একটা চার কোণে ফুটো-(পকেট) ওয়ালা, উঁচু বেড় দেওয়া, চৌকো কাঠের বোর্ডের মাঝখানে সাদা আর কালো ঘুঁটি রেখে (মধ্যিখানে একটা লাল ঘুঁটিও থাকে), টোকা মেরে স্টাইকার দিয়ে আঘাত করে পকেটে ঘুঁটি ফেলতে হয়। যে নিজের সব ঘুঁটি আগে ফেলতে পারবে, তারই জিত।

॥ টেনিস বা লন-টেনিস ॥

টেবল-টেনিসের (পিংপং) পর এবার আসল টেনিসের কথা।

টেনিস আজকাল খোলা মাঠের খেলা, কিন্তু একেবারে গোড়ায় এ খেলা হত দেয়াল-ঘেরা জায়গায়। একজন ব্যাট দিয়ে দেয়ালে বল মারত, মারবার সময় বলত 'Tenetz !' (মানে, 'এই নিন' !)—তাই থেকে এর নাম হল টেনিস।

ঘাসজমিতে (lawn) খেলা হয় বলে এর নাম এখনও লন-টেনিস। অবশ্য, শানবাঁধানো জমিতে (hard court) আর নুড়ি-বিছানো কোর্টেও (gravel court) টেনিস খেলা হয়, কিন্তু টেনিস বললে লন-টেনিসই বোঝায়।

টেনিস খেলায় এক এক পক্ষে একজন করে খেললে তাকে বলে সিঙ্গ্‌ল্‌স্‌ খেলা, আর দু'জন করে
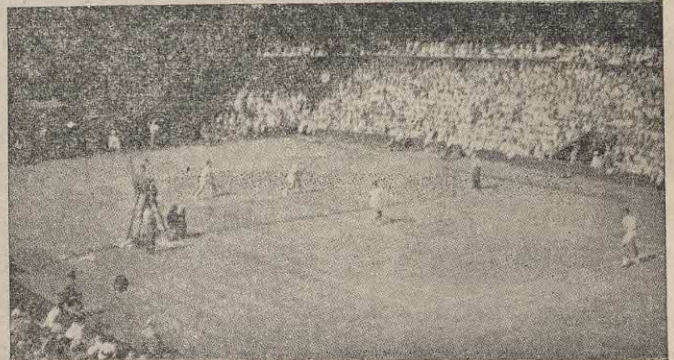
উইম্‌ব্‌ল্‌ডনে টেনিস খেলা হচ্ছে

খেললে হয় ডাব্‌ল্‌স্ খেলা। ডাব্‌ল্‌সে একজন মেয়ে আর একজন ছেলে জুটি হলে তাকে বলে মিক্‌স্‌ড্ ডাব্‌ল্‌স্।

সিঙ্গ্‌ল্‌স্ খেলায় ২৭ ফুট চওড়া কোর্ট ব্যবহৃত হয়, আর ডাব্‌ল্‌স্ খেলায় ৩৬ ফুট চওড়া কোর্টে খেলা হয়। কোর্টের লম্বাটা সব খেলায়ই এক—৭৮ ফুট। দু'পক্ষের খেলোয়াড়রা র‍্যাকেট হাতে নিয়ে দু'পাশে দাঁড়ায়—টেনিসের ব্যাটকে র‍্যাকেট (racket, racquet) বলে। তাই দিয়ে বল পেটাপিটি হয়। ফসকে গেলেই এক পয়েন্ট হার হয়।

টেনিস খেলা

কিন্তু মজা এই যে, প্রথম পয়েন্টকে ১ বলা হয় না, বলা হয় ১৫। তারপর ৩০, তারপর ৪০, তারপর ৫০। দু'পয়েন্ট এগিয়ে থেকে যে আগে ৫০ করতে পারবে, সে সেই গেম বা দান জিতবে। আবার, ২ গেম এগিয়ে থেকে ৬ গেম জিতলে, তার এক সেট (set) জিত হল। সাধারণতঃ তিন কিংবা পাঁচ সেট খেলা হয়, বেশী সেট যে জেতে তারই জিত।

ইংলণ্ডের লণ্ডন শহর থেকে ৮ মাইল দূরে উইম্‌ব্‌ল্‌ডনে (Wimbledon) ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে লন টেনিস খেলা হয়ে আসছে। সেখানকার খেলায় জিতে পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ান হবার জন্যে পৃথিবীর যত খেলোয়াড় প্রতি বছর সেখানে আসেন। এখানে খেলা হয় যার যার নিজের নামের জন্যে। আর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডোয়াইট এফ. ডেভিস (Dwight F. Davis)-এর নামে ডেভিস কাপ বলে একটা কাপ আছে—সেই কাপের খেলা হয় এক দেশের দলের সঙ্গে আর এক দেশের দলের, তাতে আজকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর অস্ট্রেলিয়ারই প্রাধান্য।

॥ ব্যাডমিণ্টন ॥

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যরা ভারতবর্ষ থেকে একরকম খেলা শিখে বিলেতে গিয়ে সেই খেলা চালু করে—তার নাম ছিল 'পুনা'। মহারাষ্ট্রের পুনা শহরে তারা এই খেলা শিখেছিল বলে এই নাম। পুনা খেলার চলন ক্রমে বাড়তে থাকে। তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন ডিউক অফ বোফোর্ট। শেষে, তাঁর বাড়ি যেখানে ছিল, সেই গ্রামের নামে এই খেলার নাম বদলে রাখা হল—ব্যাডমিণ্টন।
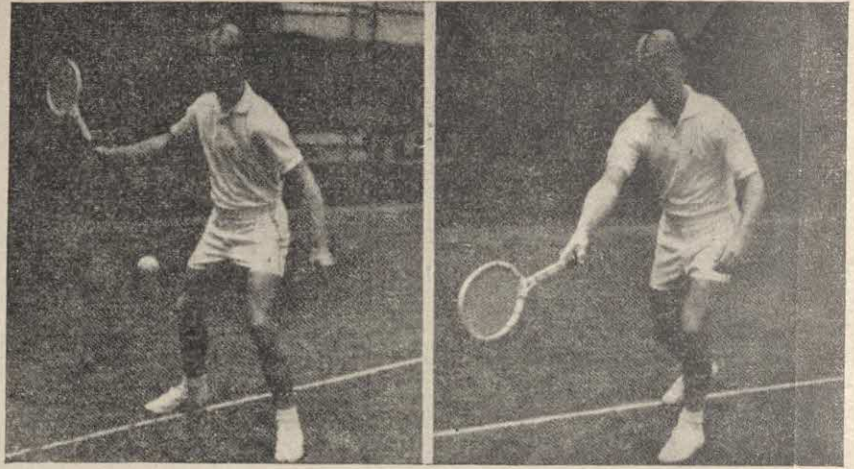
এ খেলায় র‍্যাকেট আছে, দাগ-কাটা কোর্টও আছে, কিন্তু সে সবই টেনিসের চাইতে ছোট। কোর্ট হবে ৪৪ ফুট লম্বা। সিঙ্গল্‌স্ খেলা হলে ১৭ ফুট চওড়া, ডাব্‌ল্‌স্ খেলা হলে কোর্ট হবে ২০ ফুট চওড়া। আর এর বলও অতি হালকা, এক ইঞ্চি মোটা একটা সোলার গুলি, তার একদিকে ১৪ কিংবা ১৬টি পালক বসানো। তাকে বলে শাট্‌ল্‌কক (shuttlecock). মাঝখানে যে নেট থাকে, তার মাথা মাটি থেকে ৫ ফুট উঁচু। র‍্যাকেটের মারে ঐ নেট ডিঙিয়ে ককটাকে ওধারে কোর্টের মধ্যে মাটিতে ফেলতে পারলেই এক পয়েন্ট। ১৫ কিংবা ২১ পয়েন্ট পেলে এক গেম হয়। তিন গেমের মধ্যে দু'গেম জিতলেই জিত হয়।

॥ ভলিবল ॥

ব্যাডমিণ্টনের চাইতেও উঁচুতে নেট টাঙিয়ে এক খেলা আছে, তার নাম ভলিবল (volleyball).
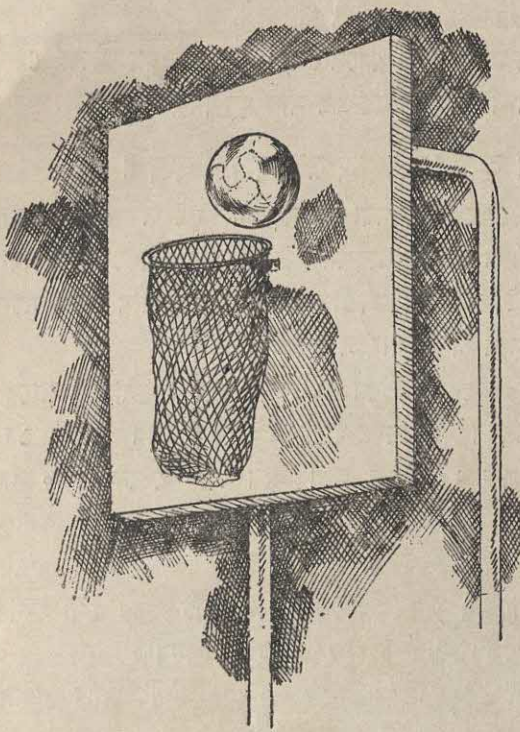
বাস্কেট বলের গোল ও নেট

বলটা ফাঁপা, ফুটবলের মতো। নেটের দু'পাশে কোর্টের মধ্যে দু'দল দাঁড়ায়, প্রতি দলে ৬ জন। হাত দিয়ে বলে চাপড় মেরে খেলতে হয়। নেট ডিঙিয়ে অপর পক্ষের কোর্টের মাটিতে বল ফেলে দেওয়াই এই খেলার মজা।

॥ বাস্কেটবল ॥

ভলিবলের মতো বাস্কেটবলও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খেলা। এদেশে এ খেলা খুব চালু হয়েছে। এটাও হাত দিয়ে আর একরকমের বল খেলা। তবে এতে নেট থাকে না। খেলার মাঠের দুই মাথায় দুটো খুটির উপর একটা চারকোণা কাঠের পাটা থাকে, আর মাটি থেকে দশ ফুট উঁচুতে তার মাঝখানে খাড়া করে বসানো থাকে প্রায় হাত খানেক ফাঁদওয়ালা একটা গেল রিং। এ থেকে ঝুলানো থাকে একটা ছোট গোল মুখখোলা জাল। এই রিং আর জাল হল বাস্কেট। এই বাস্কেটে বল ফেললে গোল হয়।

॥ রাগবী ॥

আর এক রকম হাত দিয়ে বল খেলা আছে, তাকে বলে 'রাগ্‌বী' বা 'রাগার' (Rugby or Rugger). সে-খেলায় পা দুখানাও চালানো যায়। কাজেই একে রাগবী ফুটবলও বলে। আমরা ফুটবল বলতে যা বুঝি, তা শুধু পা দিয়েই খেলতে হয়, তার নাম 'অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল'। রাগবীর বল কতকটা ডিমের মতো, লম্বাটে।

॥ ফুটবল ॥

তারপর ফুটবল খেলার কথা। উত্তর আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় আর সব দেশেই এ খেলার এত যে আদর, তা বোধহয় ইংলণ্ড থেকেই ছড়িয়েছে।

১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে নিয়মকানুন বেঁধে ফুটবল খেলার চেহারা বদলে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু আজও সেই সেকেলে ইংলণ্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (F. A.) শুধু পা দিয়ে ফুটবল খেলবার নানা নিয়ম তৈরি করে। তাই সেই খেলার নাম হয় 'অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল'—তা থেকে সংক্ষেপে 'সকার' (Soccer). এই 'সকার'কেই আমরা সাধারণতঃ ফুটবল বলে থাকি।

এই ফুটবল খেলার মাঠ হয় ১০০ থেকে ১৩০ গজ লম্বা, আর ৫০ থেকে ১০০ গজ পর্যন্ত চওড়া —এক-এক দেশে বা এক-এক খেলায় এর এক-এক মাপ। দু' মাথায় গোল, ২৪ ফুট চওড়া আর ৮ ফুট উঁচু। বলের বেড় ২৭-২৮ ইঞ্চি, আর ওজন ১৪-১৬ আউন্স। সেই বল এক গোল-কীপার (সংক্ষেপে গোলি, goalie) ছাড়া কেউ হাতে ছুঁতে

ফুটবল খেলা

পারবে না। গোল-কীপারও বল হাতে ছুঁতে পারবে শুধু তার গোলের সামনে পেনালটি এরিয়ার ভিতরে।

দুই পক্ষেই ১১ জন করে খেলে। আগেকার দিনে ১ জন গোল-কীপার, দুজন ব্যাক, তিনজন হাফ-ব্যাক, পাঁচজন ফরোয়ার্ড—এইভাবে খেলোয়াড়দের চার লাইনে সাজানো হত। আজকাল ফরোয়ার্ড আর হাফ-ব্যাকের সংখ্যা কমিয়ে চারজন ব্যাক নিয়ে খেলার চলন হয়েছে। আমাদের দেশে খেলা হয় সাধারণতঃ ৬০ মিনিট ও বিদেশে ৯০ মিনিট। মাঝখানে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম।

কলকাতায় আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে।

২৯শে জুলাই, ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ বাঙালীর ফুটবল খেলার সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। একদিকে বুট পায়ে দুর্ধর্ষ গোরা সৈন্যদল ইস্ট ইয়র্কস, আর অন্যদিকে খালিপায়ে বাঙালী ছেলেদের দল মোহনবাগান। সেদিন গড়ের মাঠে এদেশী টিম মোহনবাগান প্রথম শীল্ড জিতল। বাঙালী জাতির জীবনে সে এক পরম আনন্দের ঘটনা।

ফুটবলের আদি জায়গা ইংলণ্ডে সবচাইতে বড় হচ্ছে F. A. Cup-এর খেলা। সেটা হয় লণ্ডনের কাছে ওয়েম্‌বলী বলে একটি জায়গায়। বিলেতের আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় হচ্ছেন (স্যার) স্ট্যানলী ম্যাথুজ। ব্রাজিল দেশের পেলে (Pele), হাঙ্গেরীর পুসকাস, পর্তুগালের ইউসেবিও—জগদ্বিখ্যাত খেলোয়াড়। বাঙালীদের মধ্যে গোষ্ঠ পাল আর সামাদ-এর নাম খুব বিখ্যাত।

অস্ট্রেলিয়ান রুলস ফুটবল

॥ অস্ট্রেলিয়ান রুলস ফুটবল ॥

অস্ট্রেলিয়ানরা একরকম ফুটবল খেলে, যার নিয়ম অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলের নিয়ম থেকে আলাদা। এটাই ওদের জাতীয় খেলা। তার নাম অস্ট্রেলিয়ান রুলস বা ন্যাশানাল ফুটবল।

প্রত্যেক টিমে ১৮ জন করে খেলোয়াড় থাকে। ডিমের আকারের মাঠে এই খেলা হয়। মাঠটি ১৫০ থেকে ২০০ গজ লম্বা আর ১২০ থেকে ১৭০ গজ চওড়া। দুটি গোলপোস্ট থাকে, তাদের মাঝখানে ৭ গজ তফাত; এ দুটি কুড়ি ফুট উঁচু। এদের পাশে ৭ গজ তফাতে আরো দুটি করে গোলপোস্ট থাকে। ৪টি খুঁটিই একই লাইনে।

এদের নিয়ম-কানুন সব আলাদা। বলটি রাগবীর বলের মতো ডিমের আকারের আর ওজনে রাগবীর বলের চেয়ে ২ আউন্স বেশী ভারী।

খেলাটি ২৫ মিনিট অন্তর অন্তর চারটি ভাগে ভাগ করা।

॥ ক্রিকেট ॥

ক্রিকেট খেলাও ফুটবল খেলার মতোই আরম্ভ হয়েছিল ইংলণ্ডে। অনেক আগেকার দিনে সেদেশে স্টুলবল বলে একরকম খেলা ছিল, তা থেকেই ক্রমে ক্রিকেট খেলাটা এসেছে।

বিলেতে প্রথম ক্রিকেট ক্লাব ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল বটে, কিন্তু ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে আজও যে ক্লাব সারা ইংল্যাণ্ডে কর্তৃত্ব করে, সেই M. C. C. (Marylebone Cricket Club) বা ম্যারিবঁ ক্রিকেট ক্লাব স্থাপিত হল ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনের সেন্ট জন্‌স্ উড পাড়ায়
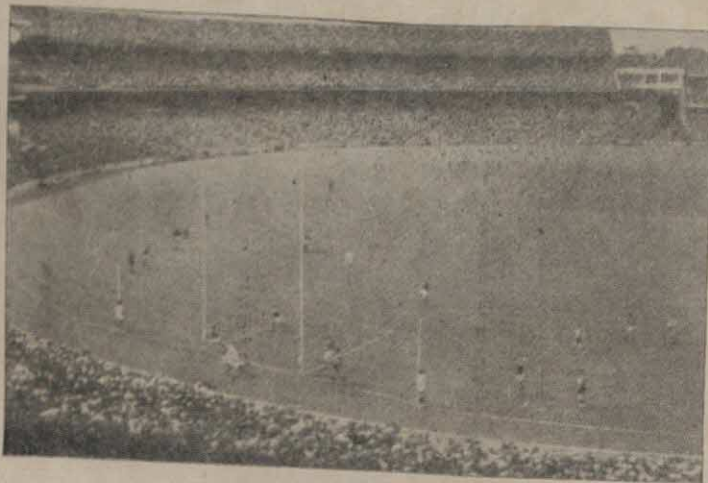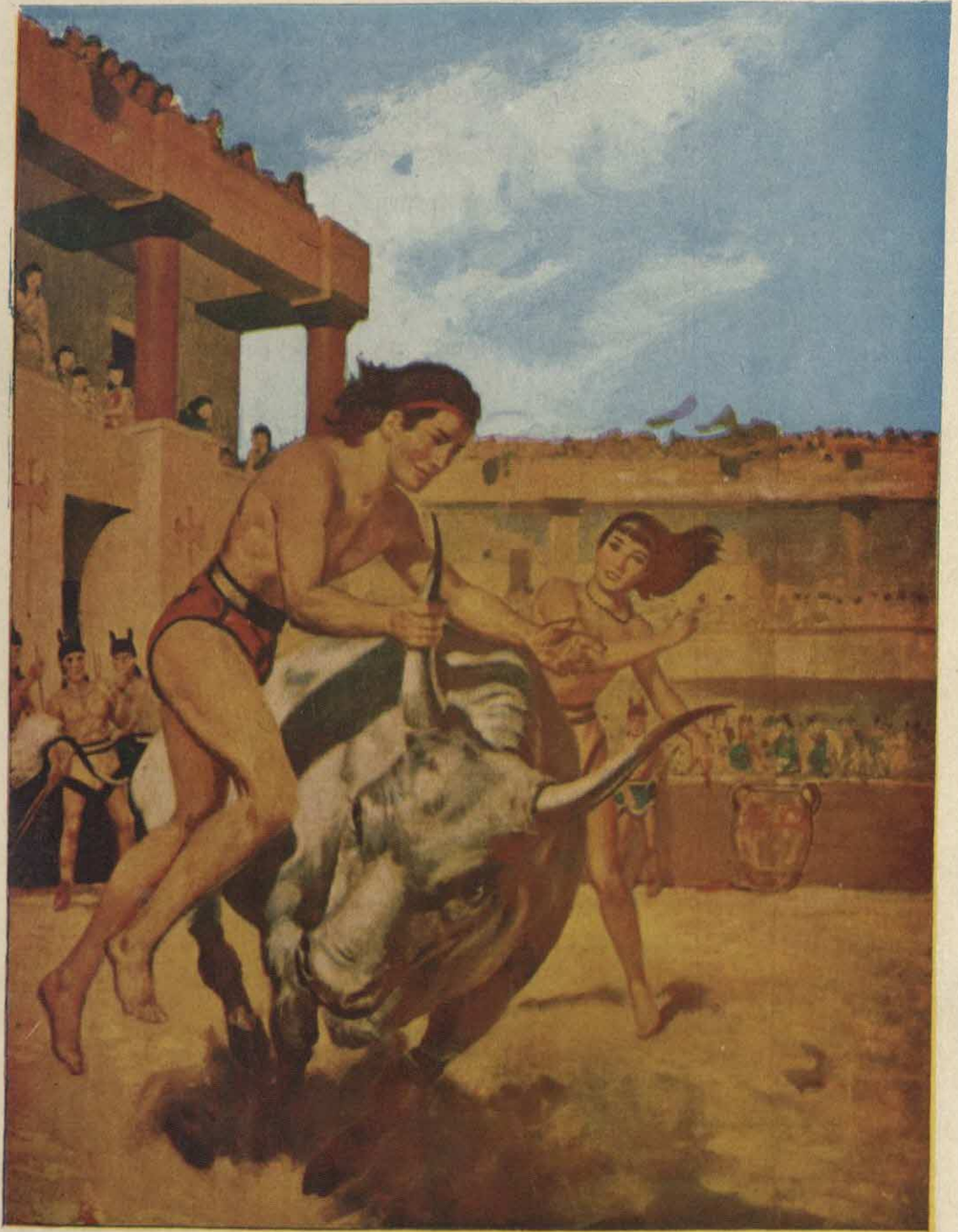
প্রাচীনকালের অলিম্পিক ক্রীড়ায় ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই।

খেলাধুলার কথাঃ

[প্রাচীনকালের অলিম্পিক ক্রীড়ায়
ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই।]

প্রাচীনকালে গ্রীসদেশের লোকেরা দেবতা জিউসের সম্মান উপলক্ষে প্রতি পঞ্চম বৎসরে অলিম্পিয়া (Olympia)-নামক প্রান্তরে একটা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করত। খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫৪৩ অব্দ থেকে ৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়েছিল।

সেই প্রাচীন ক্রীড়ার অনুকরণে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এথেন্সে এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা আবার শুরু হয়। এখন প্রতি চার বছর অন্তর বিভিন্ন দেশে অলিম্পিক-ক্রীড়ার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এথেন্স, প্যারিস, লণ্ডন, আমস্টার্ডাম, বার্লিন, মেলবোর্ন, হেলসিঙ্কি, রোম, টোকিয়ো, মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে এই খেলার অনুষ্ঠান হয়েছে।

এখানে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে তাতে প্রাচীনকালের অলিম্পিক ক্রীড়ায় ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই দেখানো হচ্ছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একজন যুবক ষাঁড়ের শিং ধরে তার সঙ্গে লড়াই করছে। উৎসুক জনতা বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কে. এস. দলীপ সিংজী   সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান   লালা অমরনাথ

ওদিকে খাস বিলেতে একজন ভারতীয় রাজকুমার ক্রিকেটের এক দিক্‌পাল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সৌরাষ্ট্রের পূর্বতন জামনগর রাজ্যের রাজকুমার রণজিৎ সিংজী—সংক্ষেপে 'রণজি'। তাঁর পর আরও তিনজন ভারতীয় রাজকুমার বিলেতে ক্রিকেট খেলে খুব নাম করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন দলীপ সিংজী এবং পাতাউদির নবাব পিতা ও পুত্র (ইফ্‌তিখার আলি খান এবং মনসুর আলি খান)।

টমাস লর্ড বলে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে জমি কিনে এম. সি. সি. তাতে তাদের খেলার জায়গা করে—পুরোনো মালিকের নামে সেটার নাম হয় লর্ড্‌স্ (Lord's). তাছাড়া এম. সি. সি. ক্রিকেট খেলার নিয়মকানুন করে ক্রিকেটের কর্তা হয়ে বসে। তারপর ইংরেজ যেখানে-যেখানে গিয়েছে, সেখানেই ক্রিকেট খেলা চালু হয়েছ—বিশেষতঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা আর ভারত।

ফাঁক ফাঁক করে পোঁতা তিনখানি লাঠি ('স্টাম্প') দিয়ে গড়া হয় উইকেট। সেগুলো ২৭-২৮ ইঞ্চি উঁচু হবে, আর তিনটে মিলিয়ে উইকেট হবে ৮ ইঞ্চি চওড়া। তার উপর ৪ ইঞ্চি লম্বা দু'টুকরো কাঠ আলগা করে চাপানো থাকবে—তাদের নাম 'বেল' (bail). ঠিক মুখোমুখি ২২ গজ দূরে আর একটি ঐরকম উইকেট থাকবে। দু'উইকেটের মাঝখানে

বিজয় হাজারে   লালা অমরনাথ   পাতাউদির নবাব   ভিজি   সি. কে. নাইডু

বাঙালী খেলোয়াড় পঙ্কজ রায়

এই ২২ গজ জায়গার নাম 'পিচ' (pitch). তা ঘাসে-ঢাকাও হতে পারে, কিংবা মাদুর (matting) দিয়েও ছাওয়া হতে পারে। দু'দিকেই উইকেটের দু'পাশে, উইকেটের সঙ্গে এক লাইনে, ৪ ফুট করে একটা সোজা দাগ আঁকা থাকে—তাকে বলে 'বোলিং ক্রীজ' (bowling crease). আর, উইকেট থেকে ৪ ফুট এগিয়ে আর একটা সমান্তরাল দাগ থাকে—সেটা হল 'পপিং ক্রীজ' (popping crease).

খেলবার সময় একপক্ষের দু'জন দুই ব্যাট হাতে করে এসে দুই পপিং ক্রীজে দাঁড়াবে। ব্যাটের হাতল হয় বেতের, ১৪ ইঞ্চি লম্বা। আর, ফলাটা হয় উইলো (willow) কাঠের। সেটা ২৪ ইঞ্চি লম্বা আর ৪½ ইঞ্চি চওড়া। অন্য পক্ষের কিন্তু ১১ জন সবাই মাঠে নামবে। তার মধ্যে একজন-না-একজন বোলিং ক্রীজে পা দিয়ে বল ছুড়বে, যাতে সেটা ওদিকের উইকেটে লাগে। যে বল ছোড়ে তাকে বলে 'বোলার' (bowler) আর একজন ওদিককার উইকেটের পিছনে দাঁড়াবে বল ধরবার জন্যে—তাকে বলে 'উইকেট-কীপার'। বাকী আর ন'জন মাঠের নানা জায়গায় এমনভাবে দাঁড়াবে যাতে তারা বলটাকে ধরতে বা আটকাতে পারে। এদের নাম ফীল্ডার বা ফীল্ড্স্‌মেন। মাঠে তাদের দাঁড়াবার এক একটা জায়গার এক একটা নাম আছে। এছাড়া আর দুজন লোক মাঠে থাকে—তারা হল আম্পায়ার (umpire), খেলার পরিচালক। সবসুদ্ধ ১৫ জন মাঠে থাকে।

'রান' মানে দৌড়। বোলার বল দিলে ব্যাটসম্যান সেটাকে ব্যাট দিয়ে মারবে। সেটা ফীল্ডাররা বোলারকে ফিরিয়ে দেবার আগে ব্যাটসম্যান এক পপিং ক্রীজ থেকে আর এক পপিং ক্রীজের মধ্যে যতবার ছুটোছুটি করতে পারবে, তার তত 'রান' হবে। তবে, বল যদি মাঠের বাইরে চলে যায়, তাহলে না ছুটেই রান পাওয়া যায়—মাঠ দিয়ে গড়িয়ে গেলে হয় চার রান; একে বলে বাউণ্ডারি। আর মাঠের মধ্যে

ভারতীয় খেলোয়াড় বিনু মাঁকড়

মাটিতে না পড়ে ব্যাট থেকে একেবারে উড়ে গিয়ে মাঠের বাইরে পড়লে হয় ছয় রান; একে বলে ওভার বাউণ্ডারি। ১০০ রান হলে সেঞ্চুরী, ২০০ রান হলে ডবল সেঞ্চুরী।

ভারতবর্ষে বিনু মাঁকড়, লালা অমরনাথ, বিজয় হাজারে, পঙ্কজ রায়, সি কে নাইডু, ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ-কুমার (সংক্ষেপে Vizzy বা ভিজি), বিজয় মার্চেন্ট, মুস্তাক আলি—এঁরা অতীতের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়।

ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাড্‌ম্যানের (Sir Donald Bradman) নাম সব চাইতে বেশী। তিনি জীবনে বড় বড় খেলায় ১১৭টা সেঞ্চুরী করেছেন। রণজি করেছিলেন ৭২টা সেঞ্চুরী। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টর ট্রামপার, ইংলণ্ডের ডক্টর গ্রেস, হব্‌স্, হ্যামণ্ড, লেন হাটন, কাউড্রে, রোডস্, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গারফীল্ড্ সোবার্স, কন্‌স্ট্যানটাইন, ওরেল—এঁরাও জগদ্বিখ্যাত।

॥ হকি ॥

হকি খেলা যে এদেশের খেলা নয়, তা তার নাম থেকেই মনে হয়। হকি খেলায় একটা মাথা-বাঁকা লাঠি দিয়ে বল পিটিয়ে ফুটবলের মত গোলে ঢোকাবার চেষ্টা করতে হয়। সেই বাঁকা মাথা বা hook কথাটা থেকেই বোধহয় হকি নামটা এসেছে।

হকির মাঠ হয় ৮০-১০০ গজ লম্বা, আর ৪০ গজ চওড়া। দুদিকে ফুটবলের মতো গোল, তবে দূরত্ব তার চাইতেও ছোট—১২ ফুট চওড়া আর ৭ ফুট উঁচু। গোলের সামনে ঘিরে ১৫ গজ দূরে একটা আধখানা গোল দাগ থাকে, তাকে বলে 'স্ট্রাইকিং সার্কল'—তবে ভিতরে এসে না মারলে গোল দেওয়া হয় না। ফুটবলের মতো এতেও এক এক পক্ষে ১১ জন করে খেলে। কিন্তু খেলা আরম্ভ করবার বা ফ্রী-কিক করবার সময় হকিতে ফুটবলের মতো বিনা বাধায় বল মারবার নিয়ম নেই—সব সময়ই 'বুলী' (bully) করতে হয়। বলটাকে মাটিতে রেখে তার দুপাশে দুপক্ষের দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের স্টিক একবার মাটিতে, একবার অপরের স্টিকে ঠেকাবে। তাড়াতাড়ি এইরকম তিনবার করেই যে পারে সে বলটাকে সরিয়ে নিয়ে দখল করবে। একেই বলে বুলি করা। তারপর খেলা চলবে।

ভারতের নিজের খেলা না হলেও হকিতে ভারতের স্থানই সবচেয়ে উঁচুতে, আর ভারতের ধ্যানচাঁদের মতো আশ্চর্য হকি-খেলোয়াড় পৃথিবীতে জন্মাননি। তাঁর ভাই রূপসিং এবং জয়পাল সিং, বাবু, শওকত আলী, তিফহোল্টস্ অতীতের নামী খেলোয়াড়।

কলকাতায় বাইটন কাপের (Beighton Cup) খেলাই ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত হকি প্রতিযোগিতা। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এটা চলে আসছে।

॥ গল্‌ফ্ ॥

আর একরকমের খেলা আছে, তাতেও একরকমের লাঠি দিয়ে বল মেরে খেলতে হয়। তাকে বলে গল্‌ফ্ (Golf). এটা হকির মতো দল বেঁধে খেলা নয়, প্রত্যেকে আর সবাইকে হারাবার চেষ্টা করবে। বলগুলো নিরেট রবারের তৈরী ও ভয়ানক শক্ত আর ছোট হয়। আর লাঠিগুলোকে বলে ক্লাব। তাদের মাথার চেহারা অনুসারে নানারকমের নাম—ড্রাইভার, ম্যাশি, পাটার, নিবলিক ইত্যাদি। গল্‌ফ্ খেলবার জন্যে অনেক জায়গা লাগে, তাকে বলে লিংক্। বড় বড় লিংকে নানা জায়গায় ১৮টা পর্যন্ত ছোট্ট ছোট্ট গর্ত থাকে, তার নাম হোল। ক্লাব দিয়ে মেরে মেরে নিজের বলটাকে একটার পর একটা গর্তে ফেলতে হবে, তাতে যে সব চাইতে কমবার আঘাত করে শেষ গর্তে বল এনে ফেলতে পারবে, তারই জিত হয়।

॥ পোলো ॥

লাঠি দিয়ে বল মেরে ঘোড়ায় চড়ে আর একরকম খেলা হয়। তার নাম পোলো (Polo). সেটা প্রথমে ভারতবর্ষে ও পারস্যে (ইরানে) খেলা হত। তখন তার নাম ছিল চৌগাম বা চৌগান। পরে তিব্বতীয়রাও সেই খেলাটা খেলতে থাকে। তারা এর নাম দেয় 'পুলু'। যে গাছের শিকড় থেকে এই খেলার বল তৈরী হত, সেই শিকড়কে তারা পুলু বলত। ইংরেজরা
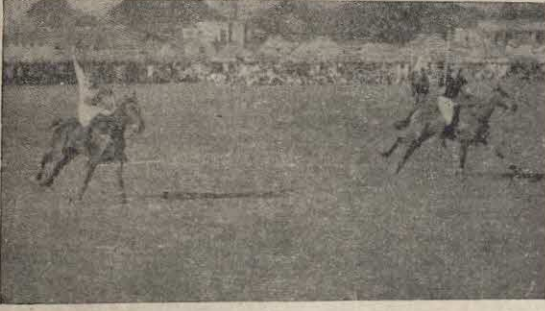
পোলো খেলা

ভারত থেকে এই খেলা বিলেতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে এটা শিখে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ঘোড়ায় বসে মাটিতে বল মারতে হয় বলে লাঠিগুলি হয় সেই অনুসারে লম্বা, সেগুলোর মাথা হয় হাতুড়ির মতো। আমাদের দেশে বাঁশের নিরেট গোড়া গোল করে কেটে পোলোর বল তৈরী হয়। বলের ব্যাস হয় সাড়ে তিন ইঞ্চি। হকি খেলার মতো এতেও দুই দলে খেলা হয়, গোল দেওয়াই হল তাদের লক্ষ্য। এক এক প্রস্থ খেলাকে বলে চক্কর। ঘোড়ায় চড়ে ছুটোছুটি করতে হয় বলে পোলো খেলতে খুব বড় মাঠের দরকার হয়।

॥ ঘোড়দৌড় ॥

ভাড়া-করা ওস্তাদ ঘোড়সওয়াররাই ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া চালায়। তাদের বলে জকী (Jockey). ঘোড়ার মালিকরা ঘোড়াকে শেখাবার জন্যে ওস্তাদ রাখে, তাদের বলে ট্রেনার (Trainer).

পৃথিবীর অনেক দেশেই ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে, তাতে বিজয়ী ঘোড়ার মালিকের জন্য মোটা মোটা পুরস্কারও আছে। সবচাইতে বিখ্যাত হচ্ছে বিলেতের এপ্‌সম বলে জায়গার ডার্বী রেস (Derby Race). আমাদের এখানে কলকাতায় গড়ের মাঠে আর টালিগঞ্জে ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতার প্রেসিডেন্টস্ কাপ-এর (আগে নাম ছিল ভাইসরয়জ কাপ) রেসই বেশী প্রসিদ্ধ।

॥ বাইচ খেলা ॥

নৌকো বাইবার প্রতিযোগিতাকে বলে বাচ বা বাইচ খেলা (boat race). কলকাতার ঢাকুরিয়া লেকের মতো যেখানে যেখানে দাঁড় টানবার ক্লাব আছে, সে-সব জায়গায় এই খেলা হয়। বিলেতের অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিবছর বাইচ খেলার প্রতিযোগিতা হয় টেম্‌স্ নদীতে—পাট্‌নী থেকে মর্টলেক পর্যন্ত।

॥ স্কেটিং ॥

বরফের উপর শীতের দেশে স্কেটিং (skating)

ঘোড়দৌড়
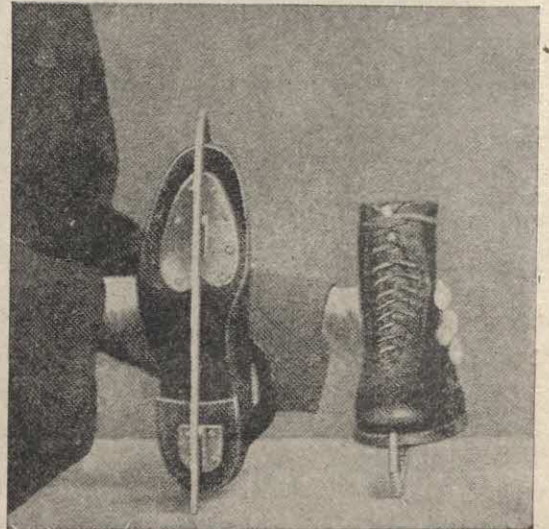
স্কেটিং-এর জুতো

খেলা হয়। কাঠে লাগানো আর দুমাথা-উঁচু লোহার পাতকে স্কেট বলে, জুতোর তলায় তা আটকে নিয়ে বরফের উপর চলা যায়। স্কেটের তলায় চাকাও থাকতে পারে, তাকে বলে রোলার স্কেট।

॥ সাঁতার ॥

সাঁতারের নানারকম কায়দা আছে। হাত চালানোর নানারকম কায়দার নানারকম নাম, যেমন—পেট সাঁতার (breast stroke), চিত সাঁতার (back stroke), কাত সাঁতার (side stroke), ট্রাজেন (trudgen), হামা-টানা সাঁতার (crawl) আর প্রজাপতি সাঁতার (butterfly stroke). পা চালাবারও নানা কায়দা—flutter kick, fishtail kick, frog kick, scissors kick. হাতের কায়দা আর পায়ের কায়দা এটার সঙ্গে ওটা মিলিয়ে নানা ধরনে সাঁতার কাটা যেতে পারে।

সাঁতারের রেসের মধ্যে বহরমপুরে গঙ্গায় ৭২ কিলোমিটার রেস আর কলকাতার কাছে গঙ্গায় ৫০ কিলোমিটার রেসই এদেশে প্রধান। কিছু দিন আগে ভারত আর সিংহলের মধ্যে একটা রেস হয়ে গেল—পক্ প্রণালী (Palk Strait) পার হওয়া। এই প্রণালীটা ভারত আর সিংহলের মধ্যে। এই তিন রেসেই প্রথম হয়ে বাঙালী সাঁতারু বৈদ্যনাথ নাথ নাম করেছেন।

আর একজন বাঙালী মিহির সেন শুধু পক্ প্রণালী নয়, ইওরোপে ইংলিশ চ্যানেল, জিব্রালটার প্রণালী, দারদানেলেস প্রণালী, কনস্ট্যান্টিনোপল প্রণালী (বসফরাস) ও আমেরিকার পানামা খাল সাঁতারে পার হয়েছেন।

সব দেশের সাঁতারুরাই ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার কেটে পার হতে চান। ক্যাপটেন ম্যাথু ওয়েব ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২১ ঘণ্টা ৯৫ মিনিটে ইংলণ্ডের ডোভার থেকে উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের কেপ গ্রিস নেজ (Cape Gris Nez) পৌঁছান। ইংলিশ চ্যানেল সেখানে ১৯ মাইল চওড়া। তিনিই প্রথম চ্যানেল সাঁতারু।

মেয়েদের মধ্যে প্রথম এটা পার হন গারট্রুড এডার্লি (Gertrude Ederle). ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ১৪ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে চ্যানেল পার হন।

প্রথম বাঙালী যিনি চ্যানেল পার হন তিনি বাংলার ব্রজেন দাস। তাঁর পর মিহির সেন, বিমল চন্দ্র ও নীতীন্দ্রনাথ রায়। বাঙালী মেয়ে আরতি সাহাও চ্যানেল পার হয়েছেন।

আর এক বিখ্যাত বাঙালী সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রেঙ্গুনে গিয়ে সেখানকার রয়্যাল লেকে (Royal Lake) একটানা ৭৮ ঘণ্টা সাঁতার কেটে দীর্ঘকাল সন্তরণে পৃথিবীর রেকর্ড করেন।

॥ স্কি-ইং ॥

স্কি-ইং (ski-ing) বা শীইং হচ্ছে আর এক রকম বরফের দেশের খেলা। স্কি বা শী হচ্ছে ছ'ফুট লম্বা, পায়ের মাপে চওড়া, কাঠের পাত, তার আগাটা নাগরা জুতোর মতো পেছনে ওলটানো। সেটাকে

স্কি-ইং

পায়ে জুতোর সঙ্গে বেঁধে নিতে হয়, আর দু'হাতে দু'খানা লাঠি নিতে হয় টাল সামলাবার ও কায়দা দেখাবার জন্যে। এই সব নিয়ে বরফের উপর দৌড়-ঝাঁপ ও ঘোরাফেরার কত সুন্দর সুন্দর কৌশল দেখানো হয়!

শরীর-বিজ্ঞানের কথা

॥ মানুষের দেহ ॥

আজ মানুষ কত না নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করেছে! এত চেষ্টা করে, উন্নতির সবচেয়ে উঁচু ধাপে উঠেও আজ মানুষ এমন একটা যন্ত্র তৈরি করতে পারে নি, মানুষের দেহের সঙ্গে যার তুলনা হতে পারে। যন্ত্রের মানুষও তৈরী হয়েছে কিন্তু আসল মানুষের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। আশ্চর্য যন্ত্র মানুষের এই শরীর।

॥ আমাদের শরীরের আবরণ ॥

মানুষের দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে আমাদের শরীরের আবরণ—ত্বক্। কেউ বা দিব্যি গৌরবর্ণ অর্থাৎ ফরসা, কেউ বা দিব্যি কালো। কিন্তু ত্বক্ বা চামড়া তো আর কেবল আমাদের শরীরের আবরণই নয়, বলতে গেলে এ আমাদের শরীরের একটা যন্ত্র। শরীরের ক্ষতিকারক ক্লেদ এ বার করে দেয়, শরীরের তাপ রক্ষা করে, আরও কত কি কাজ করে!
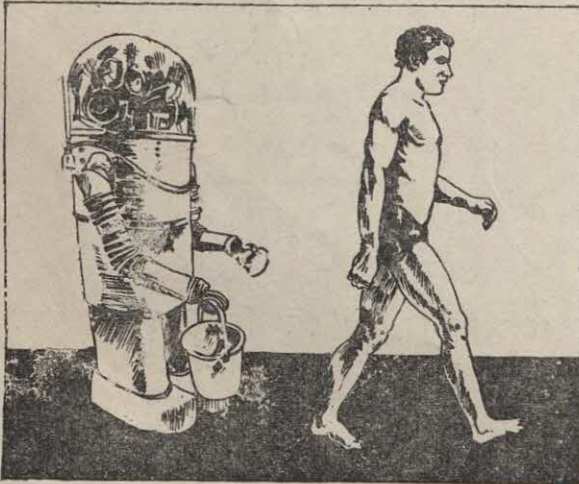
যন্ত্রের মানুষ ও আসল মানুষ

আমাদের শরীরের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ ওজনই হয় চামড়ার। আমাদের শরীরের নানারকম বাড়তি জিনিস জমা হয় চামড়ায়—মেদ ও জলের আকারে। যখনই আমরা বেশী খেয়ে মোটা হতে থাকি তখনই আমাদের চামড়ায় মেদ জমে, আবার যখনই আমাদের খাওয়া কম হয়, তখনই শরীরের এই বাড়তি জিনিস চামড়া থেকে রক্তে চলে যায়। এ ছাড়াও চামড়ায় আছে আমাদের অনেকগুলো কৈশিক রক্তনালী। তারা ধরে রাখে শরীরের অনেক রক্ত; দরকারমতো সে রক্তও চলে যায় শরীরের ভিতরে।

রক্ত-চলাচল ছাড়া চামড়ার আরও একটা বেশ বড় কাজ আছে, যা আমাদের শরীরের তাপ বাড়ায় ও কমায়। আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হলে রক্ত ভিতরে চলে যায়, যাতে শরীরের তাপ না বাইরে চলে যেতে পারে; আবার শরীর গরম হয়ে উঠলে এই রক্তনালীগুলির মুখ খুলে যায়, রক্ত এসে চামড়ায় জমা হয়, তাপ ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারদিকে। তা ছাড়া

চামড়ার স্বেদগ্রন্থিগুলি ঘাম তৈরি করতে থাকে। ঘাম ঝরার ফলে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

এই ঘামের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীর থেকে কিছু ময়লা ও দূষিত জিনিস বেরিয়ে যায়।

আমাদের চামড়ায় লুকিয়ে আছে অনেকগুলি নার্ভের প্রান্ত (papillae)—এগুলি দিয়ে তৈরী হয়েছে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়। এই নার্ভগুলির জন্যেই আমরা বুঝতে পারি কেউ আমাদের ছুঁয়েছে কিনা, বুঝতে পারি ঠাণ্ডা লাগলে, এদের জন্যেই চিমটি কাটলে আমরা বেদনা বোধ করি। এরাই আমাদের দেহের গোয়েন্দার কাজ করে। এরাই আমাদের মস্তিষ্কে বাইরের খবর পেঁাছে দেয়।

আমাদের চামড়াকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখলে দেখা যাবে এই চামড়ারই বা কত বাহার—এর আছে সাতটি স্তর। বাইরে থেকে দেখতে গেলে প্রথম পাঁচটি স্তর হচ্ছে বহিস্ত্বক্ (epidermis). তার নীচের দুটি স্তর হচ্ছে আসল ত্বক্ আর তারও নীচে হচ্ছে অধস্ত্বক্—এটা থাকে ঠিক মাংসের গায়েই।
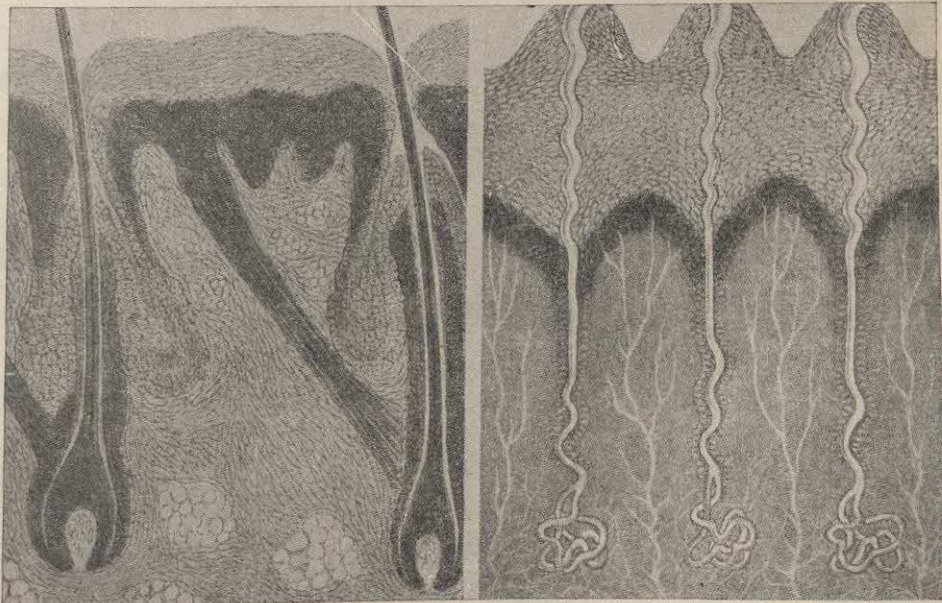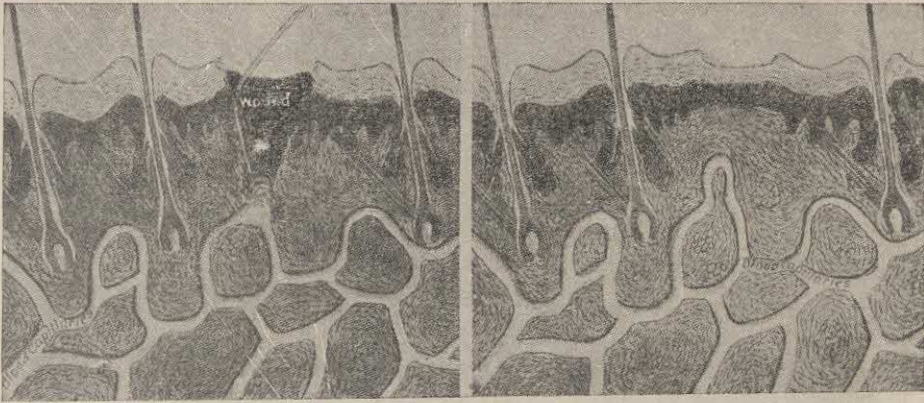
অণুবীক্ষণে দেখা ত্বকের নীচের ছবি

বহিস্ত্বকের বাইরের স্তরটিকে বলা চলে মরা-কোষের স্তর। আমাদের অজ্ঞাতে এরা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শরীর থেকে ঝরে পড়ে যায়। আবার যে সব জায়গায় চামড়ার কাজ খুব বেশী হয় যেমন হাতের চেটো, পায়ের তলা, সেখানে এরা বেশ শক্ত হয়ে ওঠে।

আমাদের আসল ত্বক্ হল আমাদের বহিস্ত্বকের নীচে। এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নার্ভ-তন্তু আর রক্ত-নালী। আর তারই মধ্যে মধ্যে রয়েছে নানা-রকম গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি। স্বেদগ্রন্থি ঘাম তৈরি করে। সেটা দেখতে খুব সাধারণ—গোটানো একটা নলের মতো।

চামড়া দিয়ে অনবরত আমাদের শরীর থেকে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে, বাইরে থেকে কোন কিছুরই কিন্তু সেইভাবে শরীরের ভিতরে যাবার উপায় নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ত্বক্ অটুট থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রোগের জীবাণু চামড়া ভেদ করে আমাদের শরীরের মধ্যে ঢুকতে পারে না।

ত্বক্ যে কেবল আমাদের গায়ের আবরণই তা নয়, এটা বর্মের মতো আমাদের শরীরকে বাইরের নানা উৎপাত থেকে রক্ষা করছে।

মাংসপেশী ও হাড় ॥

চামড়া ছাড়িয়ে ফেললে আমাদের শরীরে যা দেখতে পাওয়া যায় তা হল মাংসপেশী। কিন্তু মাংসপেশীদের তো শক্ত একটা কিছুর ওপর থাকতে হবে—আমাদের শরীরের হাড়-গুলোই দেহের সেই শক্ত জিনিস। আমাদের দেহে হাড় না থাকলে আমাদের চেহারা হত জেলির মতো থপ্‌থপে।

হাড় আছে বলেই আমাদের চেহারার একটা বাঁধাধরা গড়ন আছে। এদের গায়ে গায়ে লেগে থাকে মাংসপেশী। আর হাড়-গুলোই তৈরি করে আমাদের শরীরের যত খোপ। সেগুলো আমাদের শরীরের নানা প্রয়োজনীয় জিনিসের ভাণ্ডার। প্রথমে মাথার কথাই ধরা যাক—আমাদের মাথার খুলি হাড় দিয়ে তৈরী খোপের মতো বলেই না আমাদের মাথার ঘিলু বা মস্তিষ্ক তার মধ্যে থাকে। খুলির সামনের দুটি হাড়ের গর্ত হচ্ছে আমাদের চোখ দুটির খোপ। আমাদের পিছনের শিরদাঁড়ার ভিতরের খোপ দিয়ে চলে গিয়েছে আমাদের পিঠের সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord). বুকের দুপাশ থেকে হাড়ের পাঁজর গোল হয়ে এসে যে খোপ করেছে, তার ভিতরে থাকে আমাদের হৃৎপিণ্ড ও হাপরের মতো ফুসফুস দুটি।

তাহলে হাড়গুলো আসলে একটা খাঁচা। এই খাঁচার মধ্যে আমাদের শরীরের যত কলকবজা থাকে।

এই হাড়ের খাঁচাটার নাম কঙ্কাল (skeleton).
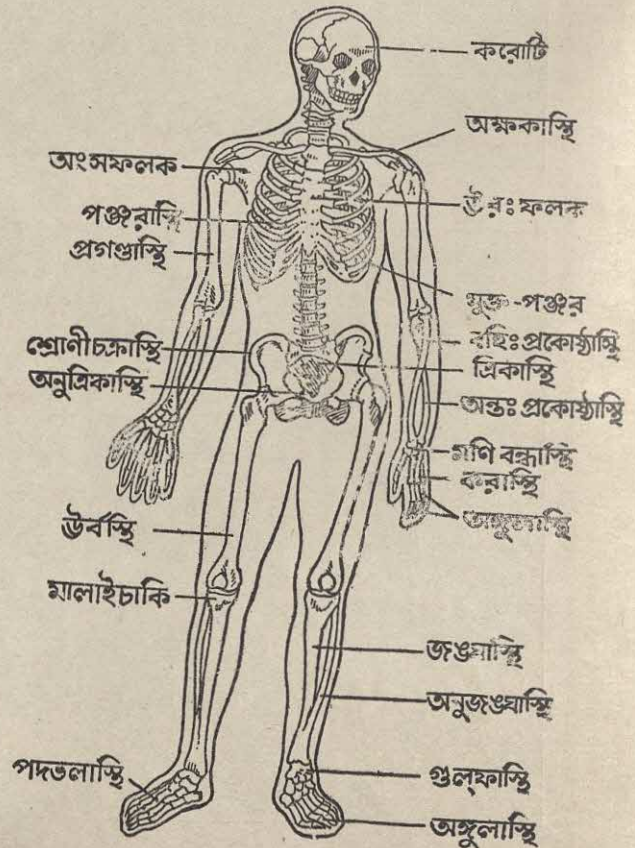
কঙ্কাল

তা ছাড়া হাড় না থাকলে মাংসপেশীগুলোই বা থাকত কোথায় আর কী করেই বা এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়ে মানুষকে কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়াত ?

হাড়ের গুণের শেষ নেই। এদের ভিতরে তৈরী হয় রক্তকণিকা আর শরীরের ক্যালসিয়ম তো হাড়গুলোতেই জমানো থাকে।

॥ শরীরে কত হাড় আছে ॥

আমাদের শরীরে সবসুদ্ধ হাড় আছে ২০৬টি। আমাদের মাথার খুলি ২৯টি হাড় দিয়ে তৈরী। মাথার উপরের ভাগ তৈরী ৮টি হাড় দিয়ে, মুখ তৈরী ১৪টি হাড়ে, কানে আছে ৬টি হাড় আর গলায় ১টি হাড়।

মাথা থেকে নেমে এল মেরুদণ্ড (spine)— ২৬টি কশেরুকা (vertebra) দিয়ে তৈরী। এই মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়ার নীচের দিকটা লেজের মত বলে কেউ কেউ বলেন যে এটা মানুষের লুপ্ত লেজের চিহ্ন। এটাকে বলে অনুত্রিক (coccyx). মেরুদণ্ডের নলের মধ্য দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) নেমেছে, তা থেকেই অসংখ্য নার্ভ বেরিয়ে দেহের সর্বত্র গিয়েছে। মেরুদণ্ডের ওপরের অংশ থেকে দুপাশে গোল হয়ে বেরিয়েছে পাঁজরের হাড়গুলি। আমাদের বুকের খাঁচা তৈরী ১২ জোড়া পাঁজরের হাড়ে। তার মধ্যে একেবারে নীচের দু'জোড়া ছোট বলে তারা দু'পাশ থেকে এসে মেশে নি। বাকী ১০ জোড়া মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে গোল হয়ে বেঁকে এসে মিলেছে বুকের মাঝখানকার লম্বালম্বি একটি হাড়ে—তাকে বলে উরঃফলক (sternum).
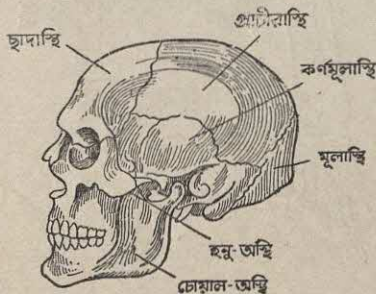
মাথার হাড়

আমাদের দেহে দুই কাঁধের নীচেই সামনের দিকে থাকে দুটি কণ্ঠা বা অক্ষক (calvicle বা collar bone) আর পিছনে পিঠের দিকে কাঁধের নীচেই কতকটা তিনকোনা চেহারার অংসফলক (scapula বা shoulder-blade). উপরের হাতে একটি করে লম্বা হাড় (humerus), আর নীচের হাতে পাশাপাশি ২টি লম্বা হাড় (ulna এবং radius) আছে। এদের সঙ্গে মণিবন্ধে অর্থাৎ হাতের কবজিতে এসে লাগছে ছোট ছোট ৮টি হাড় (carpal bones). আমাদের হাতের চেটোয় আছে পাঁচ পাঁচটি করে হাড় (meta-carpal bones), আর আঙ্গুলে আছে ১৪টি হাড় (বুড়ো আঙ্গুলে ২টি, আর চারটি আঙ্গুলে ৩টি করে)।

মেরুদণ্ডের হাড়

কোমরে আছে দুদিকের দুটি শ্রোণীচক্র (pelvis). প্রত্যেক পায়ে আছে একটা করে ঊর্বস্থি (femur), হাঁটুর নীচ থেকে নেমে গিয়েছে পায়ের দুটি হাড় (tibia ও fibula). হাঁটুর উপরে আছে একটি ছোট হাড়—মালাইচাকি (knee-cap).

গুল্ফ-সন্ধিতে (ankle) আছে সাতটি হাড়, তারা গিয়ে পায়ের পাতার পাঁচটি হাড়ের সঙ্গে লাগছে। আর তাদের সঙ্গে এসে লাগছে পায়ের আঙ্গুলের হাড়গুলি।

॥ অস্থি-সন্ধি ॥

হাড় একটার উপর আরেকটা সাজালে তাদের কাজ চলে না; তাদের একটার সাথে আরেকটা আটকানো থাকা চাই। এর জন্য তৈরী হয়েছে অস্থি-সন্ধি (joint). অস্থি-সন্ধি দু-রকমের হয়—যারা নড়তে পারে, আর যারা নড়তে পারে না। শেষের

পায়ের হাড়

দলে হল আমাদের মাথার খুলির অস্থি-সন্ধি। এদের নড়বার কোন ব্যবস্থা নেই, দরকারও নেই।

অন্য অস্থিসন্ধিগুলো এমন যে তাতে হাড়ের নড়তে-চড়তে অসুবিধে হয় না। এই সব অস্থি-সন্ধিতে একটা হাড় যাতে অন্য হাড়ের উপর দিয়ে ঘষে না চলে, তার জন্য দুই হাড়ের মধ্যে থাকে কোমলাস্থি (cartilage) আর তেলের মতো একটা জলীয় পদার্থ। তাই হাড়গুলি ক্ষয়ে যায় না।

অস্থি-সন্ধিগুলিকে দড়ির মতো কতকগুলি সন্ধি-বন্ধনী (ligaments) ধরে রাখে।

হাড়ের একটা কাজ হল আমাদের শরীরের মাংসের একটা থাকবার জায়গা করা। মাংসপেশী না হলে হাড়েদের নড়াচড়ারও কোন উপায় থাকে না। প্রায় ছশো মাংসপেশী দুশো হাড়কে নাড়িয়ে নিয়ে চলে, তাতেই হয় আমাদের চলাফেরা।

॥ মাংসপেশী ॥

একগোছা লম্বা লম্বা সরু সরু রবারের টুকরো একত্র করলে যা হয়, সাধারণভাবে বলতে গেলে এক-একটি মাংসপেশী হল সেইরকম দেখতে। মাংসপেশীর মাঝখানটা বেশ মোটা আর দুদিক্‌টা বেশ সরু। এই সরু দিক্‌গুলিই হাড়ের সঙ্গে জুড়ে থাকে। এদের একটা দিক্‌কে বলা হয় শুরু, আর একটা দিক্‌কে শেষ ; কারণ প্রত্যেকটা মাংসপেশী কেবল একই দিকে কাজ করতে পারে, যেমন আমাদের বাহুর মাংসপেশী,—বাইসেপ,
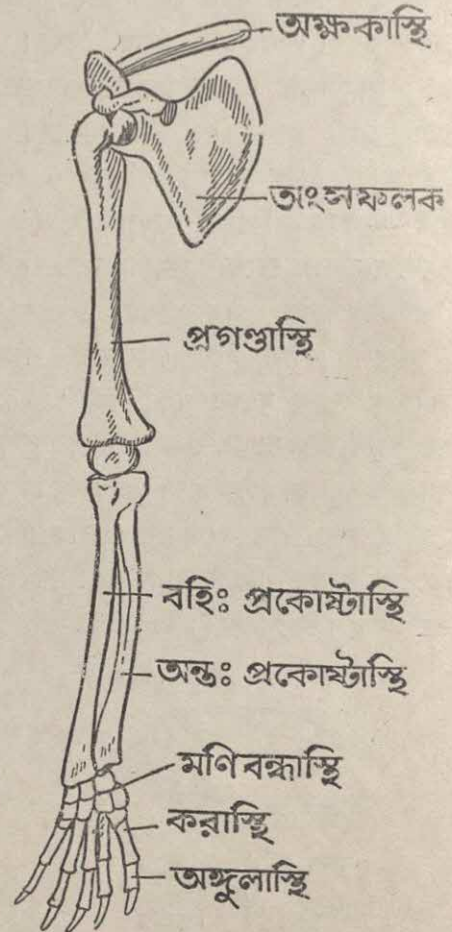
বাহুর হাড়
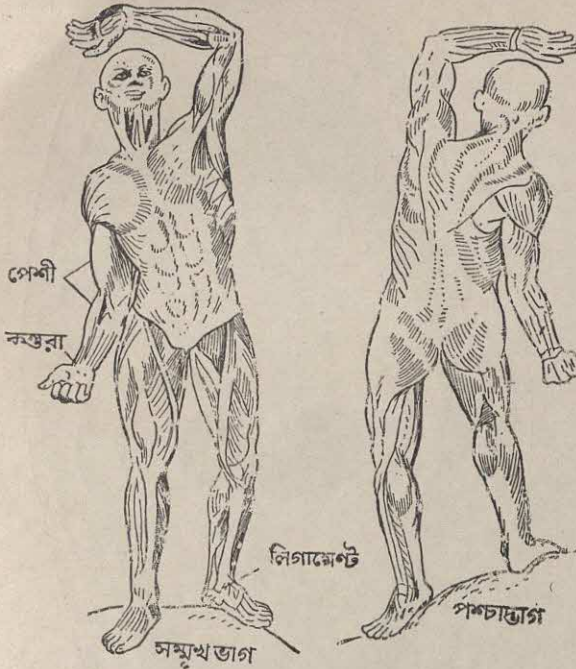
পেশীতন্ত্র

কেবল হাতকে নীচে থেকে উপরেই তুলতে পারে, বাহুকে উপর থেকে নীচে নামাতে পারে না।

॥ ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক মাংসপেশী ॥

মাংসপেশী আবার দুরকমের আছে—ঐচ্ছিক (voluntary) আর অনৈচ্ছিক (involuntary). ঐচ্ছিক মাংসপেশীদের ইচ্ছেমতো আমরা নাড়াতে পারি, যেমন আমাদের হাতের ও পায়ের মাংসপেশী। আর অনৈচ্ছিক মাংসপেশী হল, যারা আমাদের ইচ্ছের অধীন নয়, আপনা থেকেই সবসময় কাজ করে চলেছে। যেমন আমাদের হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের মাংসপেশী।

আমাদের মাংসপেশীর ভিতরে আছে ছোট ছোট রক্তনালী।

॥ পাচন-তন্ত্র ঃ হজমের কাজ ॥

আমরা ডাল ভাত মাছ তরকারি যাই খাই না কেন, সেগুলিকে গালিয়ে জলের মতো না করতে পারলে, আর নানাভাবে বদলে তৈরি করে না দিলে, আমাদের শরীরের কোষগুলি তা গ্রহণ করতে পারে না। এ কাজটি যে সব যন্ত্রে করে, তাদের একসঙ্গে বলা হয় পাচন-তন্ত্র বা হজমের যন্ত্রপাতি।

মুখ, খাদ্যনালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র—এসবই একটা নলেরই নানান ভাগ। খাবার হজম করার জন্যে এটা তৈরী ; প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা এই নলটির নাম পৌষ্টিক নালী (alimentary canal). এরই ভিতর দিয়ে খাবার চলে যায় হজমের জন্যে। এদের আশেপাশে আছে আরো দুটো গ্রন্থি—যকৃৎ (liver) ও অগ্ন্যাশয় (pancreas). এদের থেকেও রস আসে খাদ্য হজমের জন্যে। এরা সবাই মিলে হল পাচন-তন্ত্র (Digestive System).

হজমের কাজটি শুরু হয় মুখের মধ্যে। আমাদের খাদ্যে সাধারণভাবে থাকে তিন প্রকারের জিনিস—শর্করা, প্রোটিন এবং স্নেহ (carbohydrates, proteins and fats). এদের মধ্যে শর্করার হজমই শুরু হয় মুখে। শর্করাজাতীয় খাবার আমাদের মুখে পড়লে, আমাদের মুখে লালা বের হয়। লালা (saliva) তৈরী হয় আমাদের মুখের দুপাশে দুটো গ্রন্থি আর আমাদের নীচের চোয়ালের নীচেকার দুটো গ্রন্থি থেকে।
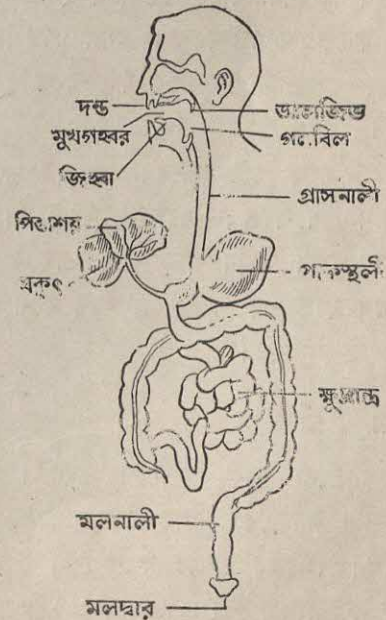
লালাগ্রন্থি থেকে খাদ্যের হজম-ক্রিয়া দেখানো হয়েছে

ক্রমাগত এই লালা আমাদের মুখে এসে আমাদের মুখের ভিতরটা আর্দ্র করে রাখে ; কিন্তু যেই না শর্করাজাতীয় জিনিস এল মুখে, অমনি এই গ্রন্থিগুলি থেকে বেশী করে রস এসে জমতে থাকল আমাদের মুখে, আর শুরু হল শর্করাজাতীয় খাবার হজম হওয়ার কাজ। যাতে পাচক রস খাবারের সব জায়গায় মিশে যেতে পারে, সেই কাজটি করে জিভ আর দাঁত। আমাদের দাঁত খাদ্য কেটে-কুটে পিষে মণ্ড তৈরি করে ফেলে, আর এ কাজে তাদের সাহায্য করে আমাদের জিভ —কাটতে হলে নিয়ে যায় সামনে, পিষতে হলে নিয়ে যায় পিছনে।

॥ দাঁতের কাজ ॥

দাঁত নানা আকারের। আলাদা আলাদা চেহারার দাঁতের আলাদা আলাদা কাজ। সামনের দুটি দাঁত শুধু খাবার কাটে, গালের দিকের দাঁতেরা খাবারকে পেষে, অন্যগুলো অন্য কাজ করে। কোনটা বা লম্বা সরু, কোনটার আগা ছুঁচলো, কোনটা বা আবার বেঁটে। কিন্তু সকলেরই আছে মাড়ির ভিতরে শিকড়। দাঁতের বাইরে আছে এনামেল, পরিষ্কার রাখলে তাই ঝকঝক করে। তার ভিতরে থাকে ডেনটিন (dentine). এটাই হল দাঁতের আসল শরীর। আর তার ভিতরে আছে মজ্জা—এরই মধ্যে থাকে দাঁতের স্নায়ু আর রক্ত-জালি।

দাঁত আমাদের ওঠে দুবার। একবার ওঠে ছ' থেকে ন' মাস বয়স পর্যন্ত ;—এরা হল দুধে দাঁত। এই কুড়িটা দাঁত শেষ অবধি পড়ে যায়, তার জায়গায় গজায় আসল দাঁত—বত্রিশটি। ছ' বছর বয়স থেকে তারা উঠতে শুরু করে।

॥ জিভের কথা ॥

জিভ আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি। জিভ দিয়েই আমরা খাবারের স্বাদ—টক, ঝাল, মিষ্টি বুঝতে পারি। জিভের উপরে কতকগুলি উঁচু উঁচু খুব ছোট ছোট মাংসগ্রন্থি (taste buds) দেখা যায়, এদের সাহায্যেই আমরা আস্বাদ গ্রহণ করি।

দাঁত আর জিভের কাজ যেই শেষ হল, তখনই
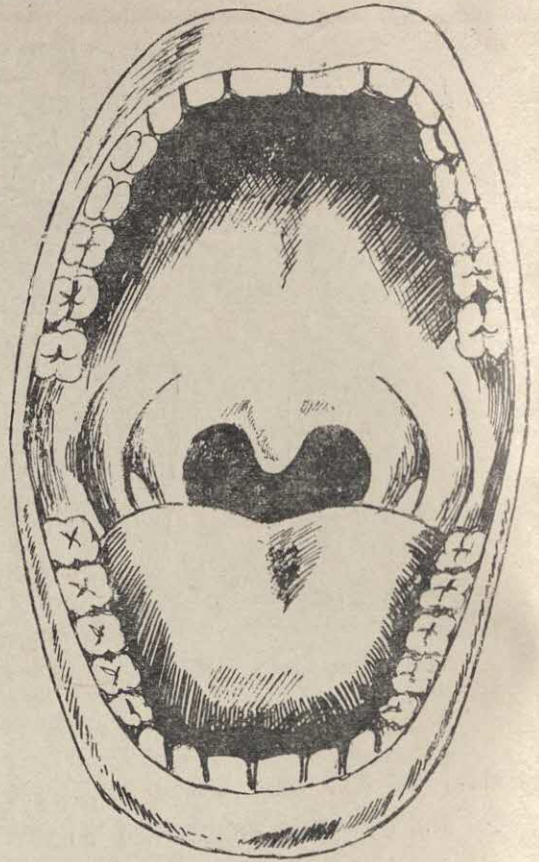
জিভ

তৈরী হল খাবারের মণ্ড। সেই মণ্ড জিভ ঠেলে দিল খাদ্যনালীতে (gullet বা oesophagus). এই ন' দশ ইঞ্চি মাংসের নলটি মুখ থেকে খাবার নিয়ে পাকস্থলী বা আমাশয়ে পৌঁছে দেয়।

॥ আমাশয় ॥

আমাশয় বা পাকস্থলী (stomach) আমাদের শরীরের মধ্যে একটা মাংসের থলির মতো। এর গায়ে গায়ে আছে ছোট ছোট গ্রন্থি, তাতে খাবার হজম করবার জন্য নানা রকম রাসায়নিক জিনিস তৈরী হয়—যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর পেপসিন নামে একটি জারক রস যা খাদ্য হজম করায়। আমাশয়ের হজম করার কাজটি আবার ভারী মজার। যতক্ষণ না প্রোটিনজাতীয় জিনিস ভাল করে হজম হচ্ছে ততক্ষণ খাদ্যবস্তুর আমাশয় থেকে বেরোবার উপায়

থাকে না কিন্তু যেই আমাশয়ের কাজ শেষ হয়ে গেল তখনি খাবারগুলিকে আমাশয়ের নীচের দরজা (pyloric valve) দিয়ে ঠেলে দেয় গ্রহণীতে।

॥ পাচনতন্ত্রের শেষটা ॥

গ্রহণী (duodenum) হল ক্ষুদ্রান্ত্রের (small intestine) প্রথম ভাগ। এখানে যকৃৎ থেকে পিত্তরস আসে, আর অগ্ন্যাশয় থেকে আসে নানারকম রস। এইসব রসের কাজ হল খাবারের ভিতরের শর্করা ও স্নেহ জাতীয় জিনিসকে হজম করানো। খাবারের এইভাবে হজম যখন শেষ হয়, তখন তা ক্ষুদ্র-অন্ত্রে ঢুকে তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে, আর তাদের শুষে নিতে থাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ের ছোট ছোট গ্রন্থিগুলি —খাবার তখন জলীয় অবস্থায় রক্তে চলে যায়।

দরকারী জিনিস সব শুষে নেওয়া হয়ে গেলে খাবারের যেটুকু পড়ে থাকে, সেটা ক্ষুদ্রান্ত্র পার হয়ে এসে পড়ে বৃহদন্ত্রে। সেখানে আবার জল শুষে নেওয়া হয়—এই জল চলে যায় আবার রক্তে। আর বাকী জিনিসগুলি আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যায় মলের আকারে।

॥ যকৃৎ আর প্লীহা ॥

পেটের মধ্যে ডানদিকে আছে যকৃৎ (liver), যা হচ্ছে দেহের বৃহত্তম গ্ল্যাণ্ড। এ থেকে পিত্তরস (bile) বেরিয়ে গ্রহণীতে পড়ে, তা আগেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া, এর আর একটি কাজ হচ্ছে ময়লা ছেঁকে নিয়ে রক্তকে পরিষ্কার করা। পশুদেহের যকৃৎকে বলে 'মেটে'।

আর একটি গ্ল্যাণ্ড হচ্ছে পেটের বাঁদিকে প্লীহা বা 'পিলে' (spleen). পিলের কাজও রক্তকে নিয়ে। সে রক্তকণিকাও বানায়। ম্যালেরিয়া ইত্যাদি অসুখে পিলেটি অসম্ভব বড় হয়ে ওঠে।

॥ রক্ত-চলাচলের কথা ॥

আমাদের পাচন-তন্ত্র শরীরের কোষেদের জন্যে খাবার তৈরি করে দেয় কিন্তু রক্ত সেগুলি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। রক্তই আমাদের শরীরের সমস্ত জায়গায় খাবার নিয়ে ছোটাছুটি করে। একথাটা আগে জানা ছিল না। যিনি একথাটা প্রথম আবিষ্কার করেন, তাঁর নাম উইলিয়াম হার্ভে (Harvey)।

এইভাবে ধমনী দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়

॥ হৃৎপিণ্ড ॥

আমাদের হৃৎপিণ্ড একটা পাম্প যন্ত্রের মতো। এই যন্ত্র সারা শরীরে রক্ত পাঠায়। আর তা ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আমাদের বুকের মধ্যে এই পাম্প যন্ত্র আছে।

হৃৎপিণ্ড দেখতে অনেকটা মাথা-কাটা মোচার মতো। আমাদের বুকের প্রায় মাঝখানে, একটু বাঁদিক ঘেঁষে এটা বসে আছে। আর তার দুপাশে আছে দুটো ফুসফুস। হৃৎপিণ্ড একটা পর্দা বা ঝিল্লী দিয়ে ঢাকা।

হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দেখা যাবে মোটামুটি দুটো ভাগ —ডান আর বাঁ ভাগ। আর দুটো ভাগের মাঝখানে একটা পর্দা। ডানদিক্ থেকে বাঁ দিকে রক্ত যাওয়ার কোন ব্যবস্থাই নেই। প্রত্যেক ভাগটা আবার দু ভাগে ভাগ করা—উপরে আর নীচে, আবার তাদের মাঝখানে রয়েছে কপাটক (valve), যারা উপর থেকে রক্তকে নীচের দিকে নামতে দেয় কিন্তু নীচের থেকে কিছুতেই রক্তকে উপরে যেতে দেয় না। উপরের ভাগগুলিকে বলা হয় অলিন্দ (auricle) আর নীচের ভাগগুলিকে নিলয় (venrticle).

রক্ত জমা হয় অলিন্দে। সেখান থেকে রক্ত মহাধমনী (aorta) দিয়ে শরীরের ভিতরের সব জায়গায় চলে যায়।

হাতের চামড়ার তলার ধমনীর ছবি

॥ রক্তের কথা ॥

রক্তই আমাদের শরীরের পুষ্টির কাজ চালাবার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। সেজন্যেই তো রক্তের নাম দেওয়া হয়েছে "জীবনের নদী"। রক্ত যে কেবল আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি কোষে খাবার নিয়ে যায় তা-ই নয়, নিয়ে যায় অক্সিজেন আর পুষ্টি ও বৃদ্ধির সব উপাদান আর ফিরিয়ে নিয়ে আসে কোষেতে-জমা যত আবর্জনা আর কার্বন ডাই-অক্সাইড।

রক্তের আরো অনেক গুণ আছে। রক্তে আছে আমাদের শরীরের সৈন্যসামন্ত। এরা হল শরীর-রক্ষী জীবাণু। আমাদের শরীরে কোন ব্যাধি ঢুকলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে যে সব কোষ নষ্ট হয় তাদের যত্ন করে সারানোও রক্তের কাজ।

॥ লাল ও শ্বেত কণিকা ॥

রক্ত হচ্ছে একরকম তরল পদার্থ, তার নাম রক্তরস (plasma)। তার কোনও রং নেই। তাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে লাল ও শ্বেত কণিকা (corpuscle) এবং প্লেটলেট (platelet) বলে আর এক ধরনের কণিকা।

রক্তের দশ ভাগের ন ভাগই লাল কণিকায় বোঝাই থাকে—এক ফোঁটা রক্তে থাকে প্রায় ২৫০ কোটি লাল কণিকা, এরা খুবই ছোট। এদের লাল রংটা হল হীমোগ্লোবিন নামে একটা জিনিস। অক্সিজেন নিতে পারলে রক্ত লাল হয়ে যায়, আর অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিলে দেখতে হয় নীল। অক্সিজেন ছাড়া আমাদের শরীরের কোন কোষেরই কাজ করার শক্তি থাকে না, কাজেই রক্তকণিকার কাজ হল কোষে কোষে অক্সিজেন বিতরণ করা আর তাদের ভিতরে জমা হওয়া দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে এসে ফুসফুসের ভিতর দিয়ে বাইরে বের করে দেওয়া। আমাদের হাড়ের ভিতরে ভিতরে এই লাল কণিকারা তৈরী হয়। যদি কোন লোকের রক্তে লাল কণিকা কমে যায় তা হলে বলা হয় যে সে রক্তাল্পতায় ভুগছে।

শ্বেত কণিকারা হচ্ছে আমাদের শরীরের সৈন্য-সামন্ত। রক্তে সাধারণভাবে চার রকমের শ্বেত কণিকা
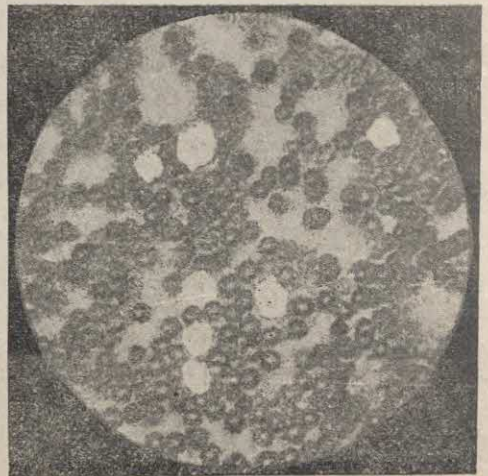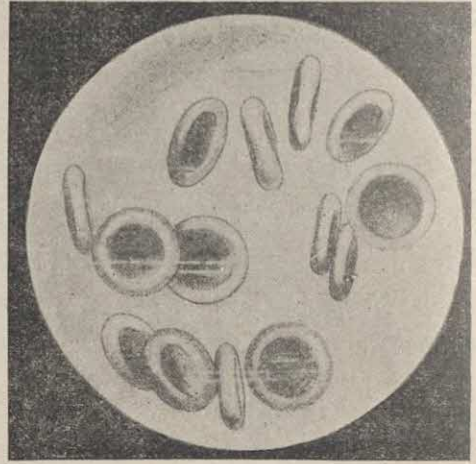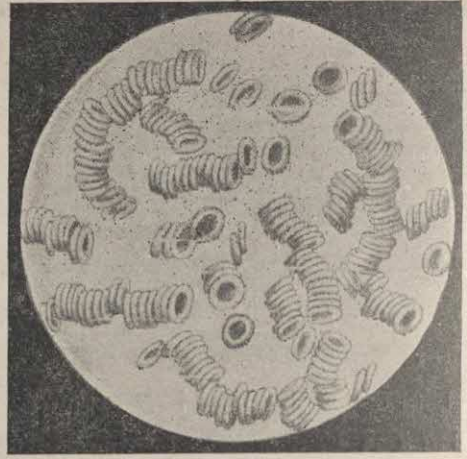
উপরে : লোহিত কণিকাগুলি মরে যাবার আগে দলবদ্ধ হচ্ছে।
মাঝে : লোহিত কণিকারা হীমোগ্লোবিন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
নীচে : অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা এক ফোঁটা রক্ত।
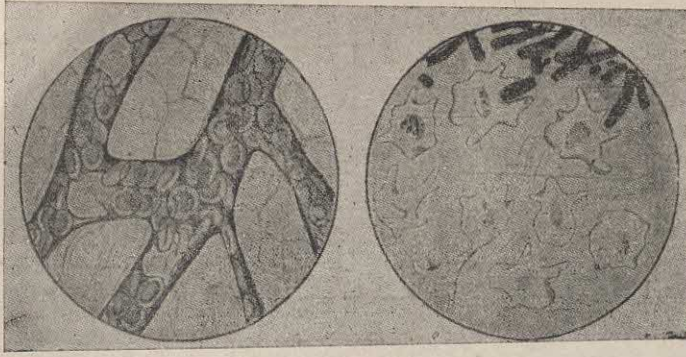
অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা রক্তকণিকা

দেখা যায়। আমাদের শরীরে কোন জীবাণু ঢুকলেই এরা টের পায় এবং প্রবল যুদ্ধ শুরু করে দেয়। ডাক্তারদের ওষুধপত্র এদের কাজে সাহায্য করে বটে, কিন্তু আসল নেতা এরাই। মৃত শ্বেতকণিকারা পুঁজ হয়ে বেরিয়ে যায়।

আমাদের শরীরের কোন জায়গা কেটে গেলে প্রথমে রক্ত বেরোয় বটে, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে রক্ত জমে গিয়ে রক্ত-পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কাটা জায়গায় জাল বুনে-বুনে, তার ওপর আরও নানা কাণ্ড করে আমাদের রক্তের প্লেটলেটরা (platelet) ক্যালসিয়ম এবং আরও জিনিসের সাহায্যে এই কাজটি করে। এর যে কোনো একটা কিছু কম থাকলেই আমরা একটানা রক্তপাতের ফলে মারা যেতে পারি।

॥ ফুসফুসের কাজ ॥

সারাক্ষণই আমাদের অজান্তেই আমরা মিনিটে ১৬-১৮ বার শ্বাস গ্রহণ আর ত্যাগ করি। আমাদের রক্তকণিকারা প্রতি মুহূর্তেই আমাদের দেহের প্রতিটি কোষকে অক্সিজেন যোগান দেয়, কিন্তু সে অক্সিজেন সে পাবে কোথা থেকে? এই অক্সিজেন সরবরাহের জন্যেই আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের দরকার। আমাদের নাক দিয়ে আমরা যে হাওয়া ফুসফুসে টেনে নিচ্ছি, সেই হাওয়ার মধ্যেই অক্সিজেন থাকে। রক্তকণিকারা এই অক্সিজেন টেনে নিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়।

রক্তে টাইফয়েডের জীবাণু প্রবেশ করছে
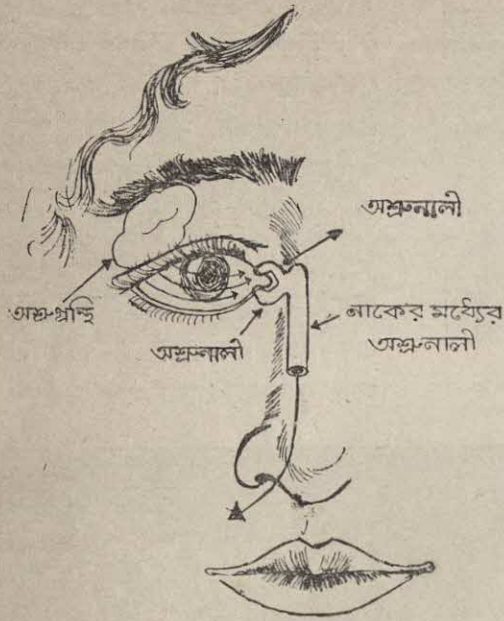
ফুসফুসটা আসলে লক্ষ লক্ষ হাওয়া-ভরতি থলে দিয়ে তৈরী ; আর এই প্রত্যেকটা থলের সঙ্গে আছে একটি করে কৈশিক ঝিল্লী। এই কৈশিক ঝিল্লী দিয়েই অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের আনাগোনা চলে।

॥ নাক ॥

নাক দিয়ে আমরা শ্বাস নিয়ে থাকি। নাকের ছেঁদার মুখ লোমে ভরতি, হাওয়ার সঙ্গে যে বড় বড় ধুলো বালি থাকে তারা এতে আটকে যায়। এর হাড়ের গায়ে গায়ে আছে শ্লেষ্মার ঝিল্লী। এই শ্লেষ্মায় ধুলো বালি আটকে যায়। আর তার ভিতরে ভিতরে আছে কৈশিক ঝিল্লী। এতে অনবরত রক্ত এসে জমা হয়।

আমাদের শরীরের রক্ত বেশ গরম, তাই যখন এই গরম রক্তের গায়ে এসে হাওয়া লাগে তখন হাওয়াও হয়ে যায় গরম। আমাদের ফুসফুসে যে হাওয়া ঢোকে, তা যে শুধু গরমই হয় তা নয়, জলীয় বাষ্পও তাতে প্রচুর থাকে। যার ফলে ফুসফুস শুকিয়ে যায় না।

এছাড়া আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি তাতে যে-সব জীবাণু থাকে তাদের আটকানোর জন্যে আছে টনসিল, শ্লেষ্মা আর ছোট ছোট শুঁয়োর মতো লোম, যারা ঠেলে ঠেলে জীবাণুদের বাইরের দিকে পাঠিয়ে দেয়।

॥ বৃক্কের (কিডনি) কথা ॥

আমাদের শরীরের কোষেরা তাদের নানারকম কাজ চালাবার জন্যে রক্তে-আনা খাবারগুলি নিয়ে নেয়, আর সেগুলি তাদের নিজেদের কাজে লাগাবার জন্যে নেয় অক্সিজেন, ছেড়ে দেয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কিন্তু এছাড়াও নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে আমাদের কোষে—রক্ত তৈরি করে হজম করবার রস, শরীর বৃদ্ধির উপাদান, ভাগ ভাগ হয়ে গিয়ে তৈরি করে চাপ চাপ কোষ। কিন্তু এসব কাজের ফলে কতকগুলি দূষিত পদার্থও তৈরী হয়। রক্ত সেগুলি নিয়ে আসে যকৃতে—সেখানে সেগুলি পরিষ্কার হয়ে চলে আসে।

আমাদের পেটের দুদিকে দুটো বৃক্ক আছে, দেখতে অনেকটা সিমের বিচির মতো। বৃক্ক প্রায় ২০০ লিটার রক্ত দিনে পরিষ্কার করে, আর দূষিত জিনিসও (প্রায় ১½ লিটার) মূত্রের আকারে বাইরে বের করে দেয়।

বৃক্ক বা কিডনি যে কেবল আমাদের রক্ত পরিষ্কার করে তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে সে নজর রাখে আমাদের শরীরে কি কি জিনিস দরকার তার উপর ; অর্থাৎ শরীরে যে-সব জিনিস দরকার তার কোনটাই এরা বাইরে বেরোতে দেয় না, অথচ যে-সব জিনিস আমাদের শরীরের অপকার করতে পারে তাদের প্রস্রাবের সঙ্গে বের করে দেয়।

॥ স্নায়ু-তন্ত্র ॥

এই যে আমাদের শরীরের ভিতর এত সব কাজ হয়, এ সব চালায় কে ? এ সব চালাবার মালিক হচ্ছে আমাদের দেহের স্নায়ু-তন্ত্র (nervous system).

স্নায়ু-তন্ত্রের রাজা হল আমাদের মস্তিষ্ক। মগজ বা ঘিলু (brain) আমাদের মাথার করোটির বা খুলি ভিতর অতি যত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে। তা থেকে

নেমেছে সুষুম্নাশীর্ষক। এখান থেকে সুষুম্না-কাণ্ড নেমে গেছে আমাদের শিরদাঁড়ার ভিতরের গর্ত দিয়ে আমাদের পিঠের প্রায় শেষ ভাগ পর্যন্ত। সুতোর মত অসংখ্য নার্ভ বা স্নায়ু চলে গেছে শরীরের চতুর্দিকে। এদের কাজ হল খবর সরবরাহ করা। মস্তিষ্ককে এরা জানিয়ে দেয় শরীরের কোথায় কি ঘটছে, আর মস্তিষ্ক থেকে নিয়ে আসে নানারকম নির্দেশ।

॥ মস্তিষ্ক ॥

মস্তিষ্কের ওজন প্রায় দেড় কিলোগ্রাম। উপর থেকে মস্তিষ্ককে দেখলে ধূসর দেখায়—এটা আখরোটের শাঁসের মতো কোঁচকানো। তার ভিতরে আছে সাদা অংশ—এগুলি নার্ভের স্তর। তিনটি পর্দা দিয়ে এগুলি ঢাকা—একটি একেবারে লেপটে জড়িয়ে থাকে আর তার বাইরে থাকে খানিকটা জল—যাতে হঠাৎ মাথায় চোট লাগলে মস্তিষ্কের কোন ক্ষতি না হতে পারে।

মস্তিষ্কের তিনটি ভাগ—গুরু মস্তিষ্ক, লঘু মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না-শীর্ষক। গুরু মস্তিষ্ক (cerebrum) হচ্ছে আমাদের বুদ্ধির ভাণ্ডার, লঘু মস্তিষ্কের (cerebellum) আসল কাজ হচ্ছে আমাদের ভারসাম্য ঠিক রাখা ; আর

মস্তিষ্ক

সুষুম্না-শীর্ষকে (medulla oblongata) আছে আমাদের শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের চালক—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি চালাবার কেন্দ্র হচ্ছে এখানে।

স্নায়ু-তন্ত্রের প্রাথমিক যন্ত্র হচ্ছে একটি স্নায়ু-কোষ এবং তার নার্ভ। কোষ থেকে উঠে স্নায়ু দেহের সকল প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মাথা থেকে মাথার চারদিকে বেরিয়ে গেছে বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু—তারা নাক, কান, চোখ, জিভ, মুখ, গলা প্রভৃতি থেকে খবর নিয়ে আসে এবং মস্তিষ্ক থেকে সেখানে খবর পৌঁছে দেয়, আর সুষুম্না-শীর্ষক থেকে আমাদের শরীরের চারদিকে রয়েছে ৩১ জোড়া মেরুস্নায়ু (spinal nerves). এরা দু রকমের কাজ করে। এদের একদল বাইরে থেকে খবর নিয়ে আসে মস্তিষ্কে আর একদল মস্তিষ্ক থেকে হুকুম নিয়ে যায় মাংসপেশীদের কাছে।

অনেক সময় মেরুস্নায়ু থেকে কোন খবর মস্তিষ্কে যাওয়ার দরকার করে না। আমাদের শরীরে কতগুলি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ আপনি-আপনি এ কাজগুলি হয়। যেমন—হঠাৎ কারো হাত একটা গরম জিনিসে লেগে গেল অমনি সে হাত গুটিয়ে নিল। এর জন্যে মস্তিষ্ক অবধি খবর পাঠাতে হয় না। এদের নাম দেওয়া হয়েছে প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex action). হঠাৎ বিপদের হাত থেকে এরা আমাদের সদাসর্বদাই বাঁচিয়ে চলেছে। এরকম স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা না থাকলে আমাদের অনেক অসুবিধেয় পড়তে হত।

॥ অনৈচ্ছিক স্নায়ু ॥

এতক্ষণ যে-সব স্নায়ুর কথা বলা হল, এরা সবাই আমাদের ইচ্ছের অধীন। আমরা ইচ্ছে করলেই এদের দিয়ে কাজ করাতে পারি। কিন্তু আমাদের শরীরে এমন সব যন্ত্র আছে, যাদের অহরহ কাজ করা দরকার। যারা থেমে গেলেই আমরা মারা যাই। যেমন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাচনতন্ত্র। আমরা চাই বা না চাই এদের কাজ দিনরাত চলা চাই। কাজেই এদের চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে আলাদা স্নায়ু-তন্ত্রের উপর—যাদের নাম দেওয়া হয়েছে
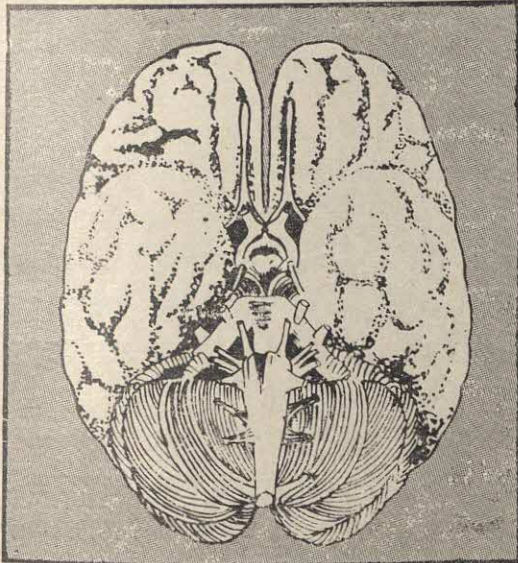
অনৈচ্ছিক স্নায়ু (involuntary nerves). এদের কাজ আমাদের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না।

॥ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ॥

আমাদের মস্তিষ্ক তো বসে আছে অন্ধকার বন্ধ খোপের মধ্যে। তার কাছে খবরাখবর গেলে তবে তো সে বুঝতে পারবে আর হুকুম দেবে। তাকে খবর যোগাবার জন্য তৈরী হয়েছে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।

॥ চোখ ॥

আমাদের চোখ দুটি দেখতে ছোট ছোট বলের মতো। এর চারদিক্ ঘিরে আছে একটা শক্ত আবরণ। তারই মধ্যে সামনের দিকে খানিকটা জায়গা আছে বেশ স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছ অংশ দিয়েই বাইরের আলো আমাদের চোখের ভিতরে ঢুকতে পারে। অস্বচ্ছ অংশের নাম দেওয়া হয়েছে শ্বেত-মণ্ডল (sclerotic), আর স্বচ্ছ অংশের নাম দেওয়া হয়েছে অচ্ছোদপটল (cornea). অচ্ছোদপটলের ঠিক পিছনে একটা কালো পর্দা আছে তার মাঝখানে আছে একটা ফুটো, যার ভিতর দিয়ে আমাদের চোখের ভিতর আলো ঢোকে। এই কালো পর্দাটার নাম কনীনিকা (iris). আমরা তাকে বলি চোখের তারা। কালো না হয়ে এটা বাদামী বা নীলও হতে পারে। আর ভিতরের ফুটোটার নাম হচ্ছে তারারন্ধ্র (pupil). তারারন্ধ্রের ভিতরে আছে একটা পেটমোটা লেন্স।

চোখ

এই লেন্সের সামনে একরকম জলের মতো জিনিস আছে, যার নাম হচ্ছে জলীয় রস (aqueous humour), আর পিছনে আছে আর একটু ঘন রস (vitreous jelly). এদের কাজ হল অক্ষিগোলকের গঠন ঠিক রাখা। কিন্তু যাতে এদের ভিতর দিয়ে আলো যেতে কোন অসুবিধে না হয় সেজন্যে এরা ঠিক কাচের মতো স্বচ্ছ।

আমাদের চোখের একেবারে পিছনে আছে অক্ষিপট (retina)—এটা সিনেমার পর্দার মতো। আমাদের চোখের সামনে যা যা এসে দাঁড়াচ্ছে লেন্স তার ছবি নিয়ে ফেলছে অক্ষিপটের উপর। অক্ষিপটে যা কিছু ছবি পড়ে, সমস্তই তার পিছনকার একটি স্নায়ু (optical nerve) দিয়ে চলে যায় আমাদের মস্তিষ্কের পিছন দিকে। আসলে তখনি আমরা দেখতে পাই।

যাদের চোখের এই লেন্সটা ঠিকমতো কাজ করতে পারে না তাদেরই চশমা নিতে হয়। এই লেন্সটি ঘোলা হয়ে গেলে তাকে বলে 'ছানি পড়া'।

॥ কান ॥

কানের মোটামুটি তিনটি অংশ : বহিষ্কর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ।

কানের কাজ হল শব্দ-সংগ্রহ করা। শব্দ তরঙ্গ গিয়ে ঘা দেয় আমাদের কর্ণপটহে (tympanum). বহিষ্কর্ণ ও মধ্যকর্ণের মাঝখানে রয়েছে কর্ণপটহ আর এর গায়ে লাগানো রয়েছে হাতুড়ির মতো দেখতে মধ্যকর্ণের তিনটি ছোট ছোট হাড়।

কর্ণপটহের শব্দ-স্পন্দন কাঁপিয়ে তোলে অন্তঃকর্ণের দরজার পর্দাকে। তখনই আমরা শুনতে পাই।

অন্তঃকর্ণ অনেকটা শামুকের মতো দেখতে। এর ভিতরটা ফাঁপা। এর ভিতরে আছে খানিকটা জল আর অনেকগুলি স্নায়ু। স্নায়ুগুলি এসে এর ভিতরে
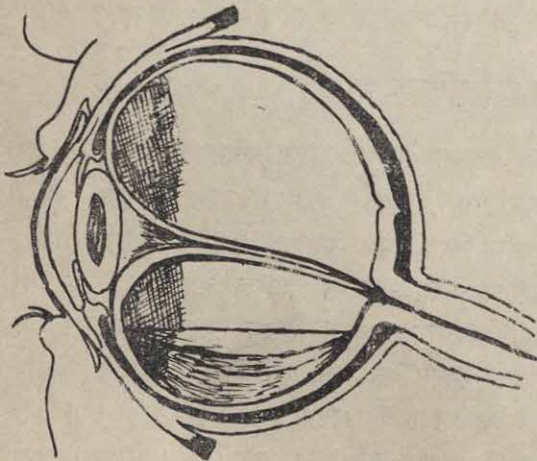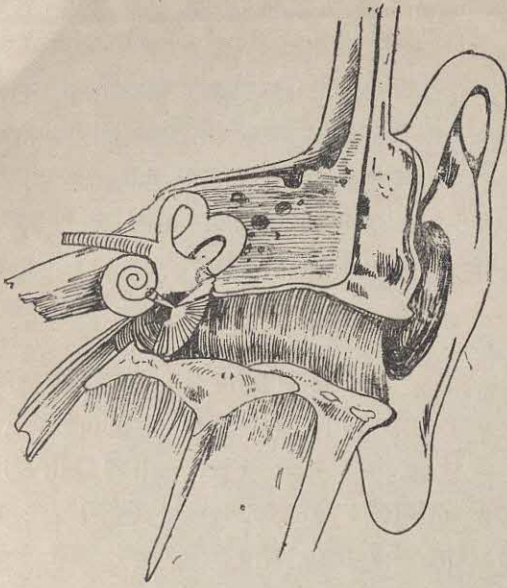
কান—বাহিরের ও ভিতরের অংশ

ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে যেই স্পন্দন উঠল, অমনি যে যে পর্দার স্নায়ুতে এসে সে আঘাত করল, বেজে উঠল সেই সেই পর্দা। আর স্নায়ুরা তাদের সংগ্রহ করে নিয়ে গেল আমাদের মস্তিষ্কে। তখন আমরা শুনতে পেলাম।

॥ অন্তঃক্ষরণ-তন্ত্র ॥

খাবার হজম করবার জন্যে আমাদের মুখ থেকে লালা বেরোয়, পেটে বেরোয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ইত্যাদি ; কিন্তু আমাদের দেহে এমন কতকগুলি গ্রন্থি আছে যারা তাদের তৈরী সব রস সোজাসুজি রক্তেই ঢেলে দেয়।

আমাদের অগ্ন্যাশয়ের কোষগুলির রস বাইরে বেরোবার কোন নল নেই। এদের চারদিকে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ কৈশিক ঝিল্লী অর্থাৎ সরু কেশের মতো ঝিল্লী। এদের তৈরী "ইনসুলিন" এরা ঢেলে দেয় রক্তে। সমস্ত শরীরে এই ইনসুলিন ছড়িয়ে পড়ে। ইনসুলিন না থাকলে আমরা শর্করা-জাতীয় খাদ্যকে ভালভাবে হজম করতে পারি না, আমাদের হয়ে যায় ডায়াবিটিস (বহুমূত্র) রোগ। ইনসুলিন ইন্‌জেকসন করলে এ রোগের উপশম হয়।

আমাদের মাথার খুলির মধ্যে একটি ছোট বাক্সের মতো খোপে ছোট একটি গ্রন্থি আছে। তার নাম পিটুইটারী গ্রন্থি। অনেক অনেক বছর তো জানাই যায় নি এই ছোট্ট গ্রন্থিটির কী কাজ। এখন দেখা গেছে যে অন্ততঃ আট রকম রস এটি তৈরি করে। সামনের ভাগে ছয় রকম আর পিছনের ভাগে দুই রকম। সামনের ভাগের রসের কাজ হল ঃ—ছোটকে বড় করে তোলা, থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ নিয়মিত করা, অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির কাজ নিয়মিত করা, মার বুকে দুধ যোগানো ইত্যাদি।

॥ থাইরয়েড গ্রন্থি ॥

থাইরয়েড গ্রন্থি আমাদের গলার সামনে থাকে। এ তৈরি করে একটি রস যার নাম থাইরক্সিন। এই থাইরক্সিন না থাকলে লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিকমতো হয় না।

॥ প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি ॥

থাইরয়েড গ্রন্থির পিছনে দুটি ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। এদের প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি বলে। এদের কাজ হল আমাদের শরীরের ক্যালসিয়াম আর ফসফরাস তৈরি করা। এরা না থাকলে ক্যালসিয়ামের অভাবে তড়কা রোগ হয়।

কানের ভিতরকার অংশ

গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি

॥ অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি ॥
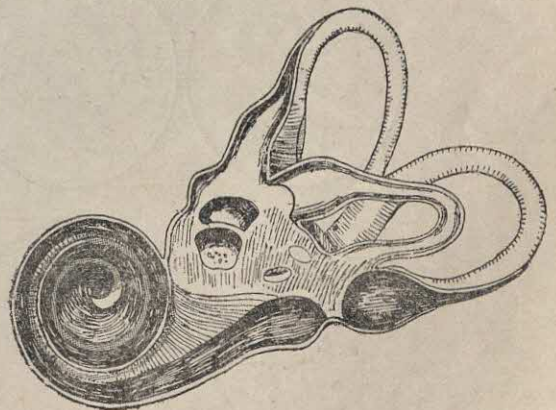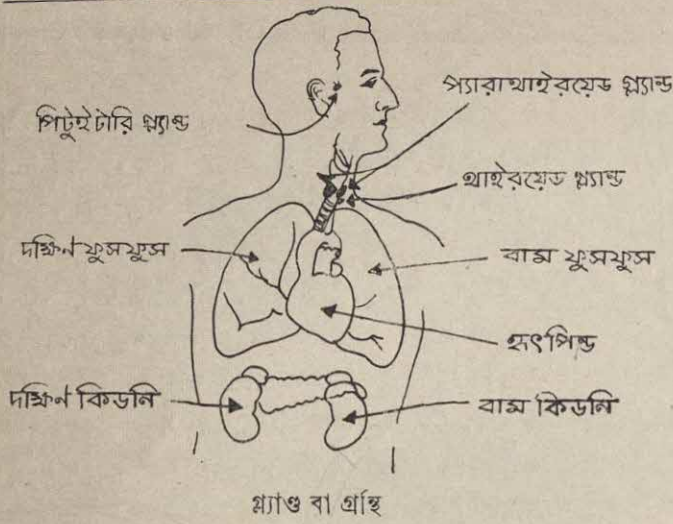
বৃক্কের মাথার উপর টুপির মতো দুটি গ্রন্থি দেখতে পাওয়া যায়। তাদেরই নাম অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি। এদের দুটো ভাগ দেখা যায়—কর্টেক্স ও মেডালা। কর্টেক্সে তৈরী হয় অ্যাড্রিন্যালিন। এর কাজ হল আমাদের সমস্ত শরীরের উপর—হৃৎপিণ্ডের কাজ বাড়িয়ে দেওয়া, নিশ্বাসের গতি বাড়িয়ে দেওয়া, আর রক্তে শর্করা এনে জমা করা। কর্টেক্সের রসের কিন্তু কাজ অনেক—জীবকে বাঁচিয়ে রাখা, মাংস-পেশীর কাজে সাহায্য করা, শর্করা ও প্রোটিনজাতীয় খাবার হজম করা ও বৃক্কের লবণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করা।

॥ অসুখ-বিসুখের কথা ॥

শরীর থাকলেই ব্যাধি হবার সম্ভাবনাও থাকবে। আর ব্যাধি কি দু'এক রকম! রোজই নতুন নতুন ব্যাধির আবিষ্কার হচ্ছে। সেকালের লোকেদের মধ্যে কেবল সুস্থ ও সবল লোকেরাই বেঁচে থাকত। অসুখ হলে মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

বছরের পর বছর তারা দেখেছে কি কি তারা খেতে পারে, কি ভাবে চললে তাদের অসুখ-বিসুখ কম হয়, আর সেভাবে গড়ে তুলেছে তাদের জীবন-যাত্রা। যেমন, এস্কিমোরা জানে যে, তাদের দেশের
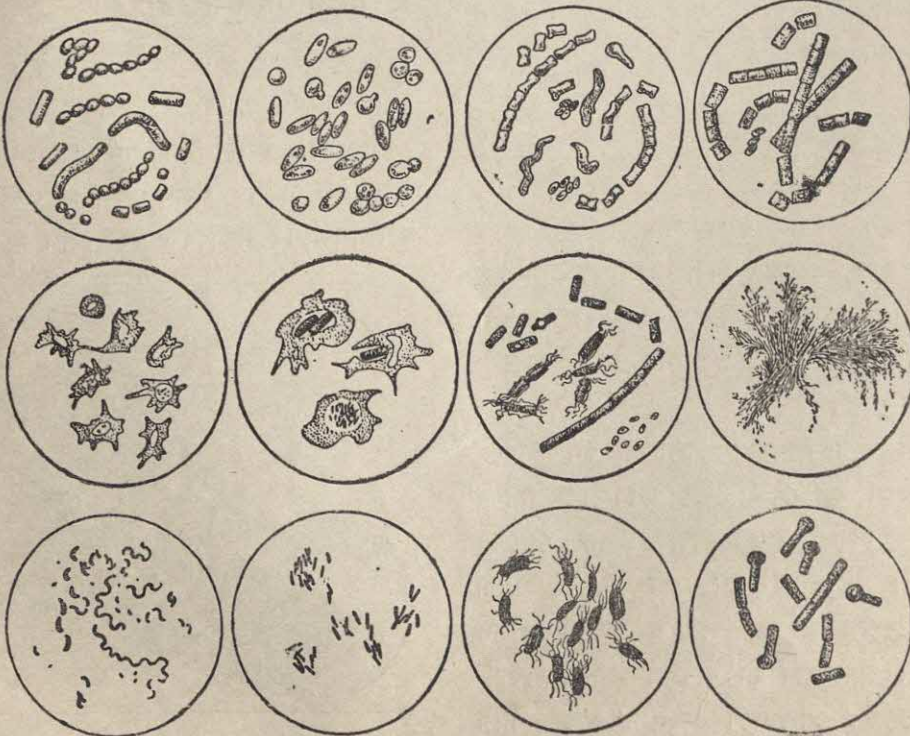
অণুবীক্ষণ যন্ত্রে-দেখা নানারকম জীবাণু

ভাল্লুকের যকৃতে বিষ আছে, খেলেই লোক অবশ হয়ে যায়। তারা জানত না সে বিষ আর কিছুই নয়—ভিটামিন-এ। ভাল্লুকের শরীরে এত বেশী ভিটামিন-এ আছে, যা মানুষের পক্ষে হজম করা দুঃসাধ্য। এস্কিমোদের মধ্যে যারা তাদের নিত্য-প্রচলিত খাবার খায় তাদের অসুখ-বিসুখ কম হয়। তাদের চোখ থাকে অত্যন্ত ভাল, দাঁত চমৎকার আর শক্ত সুঠাম হয় তাদের শরীর।

যা হোক, মানুষের অসুখ-বিসুখের জন্যে চিন্তার অবধি থাকত না, কারণ বেশির ভাগ অসুখেরই কারণ ছিল অজানা, তাই তা সারানোও যেত না।

সেজন্যে প্রত্যেক জাতের মধ্যেই কয়েকজন চিন্তাশীল লোক রোগ কি করে আরাম হয় তাই নিয়ে কাজ করে যেতেন—তাঁরাই ছিলেন সেকালের ওঝা—দেবদেবীকে খুশী করা, ভূত তাড়ানো প্রভৃতিই ছিল তাঁদের চিকিৎসা। কবচ তাবিজ ছিল তাঁদের ওষুধপত্তর এবং ঝাড়ফুঁক ছিল তাঁদের রোগ সারাবার কৌশল। এসব চিকিৎসায় অনেকে সেরেও যেত।

কেউ কেউ দেখতে লাগলেন যে, পশুরা অসুখ হলে বনে চলে যায়, গাছপালা খায়;—সুস্থ হয়ে যায়। তখন থেকে নানারকম পরীক্ষা চলল গাছপালা নিয়ে।

এই গাছপালার ব্যবহার থেকেই আমাদের দেশে শুরু হয় আয়ুর্বেদ আর পাশ্চাত্ত্য দেশে ডাক্তারি।

॥ আয়ুর্বেদ ॥

আমাদের দেশে চিকিৎসাশাস্ত্র অন্ততঃ আড়াই কি তিন হাজার বছরের পুরানো। তাকে বলে আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন ধন্বন্তরি। ২৫০০ বছর আগেকার চরক ঋষি আয়ুর্বেদের একখানা বই লিখে গেছেন, তার নাম চরকসংহিতা। এতে আছে নানা রোগের আর তাদের ওষুধের কথা। তারপর অস্ত্র চালিয়ে রোগের চিকিৎসার কথা লিখে রেখে গেছেন সুশ্রুত বলে আর একজন তাঁর সুশ্রুত-সংহিতা বইয়ে। বুদ্ধদেবের সময়ে বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন জীবক। তখন তক্ষশিলা নগরে আয়ুর্বেদ শেখাবার খুব বড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন ভারতের বাইরেও আয়ুর্বেদের আদর হয়ে থাকে। বাগদাদে খলিফা হারুণ-অর-রশীদের চিকিৎসার জন্যে ভারত থেকে মামরা নামে একজন কবিরাজ বাগদাদ গিয়েছিলেন।

আয়ুর্বেদমতে মানুষের শরীরে ত্রি-দোষ আছে—বায়ু, পিত্ত ও কফ। এরা একভাবে থাকলে দেহ ভাল থাকে, কোনওটির বাড়াবাড়ি হলেই অসুখ হয়। তিনটেই বাড়লে তখন গুরুতর অবস্থা হয়, তাকে বলে সান্নিপাত।

॥ পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা ॥

পাশ্চাত্ত্য দেশে, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশো বছর আগে, গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস চিকিৎসা শাস্ত্রকে মন্ত্র-তন্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার করেন। অজানা কারণে ব্যাধি হয়, এ কথায় তাঁর মন সাড়া দেয় নি। তিনি এবং তাঁর শিষ্যরা রোগের কারণ জানবার জন্য অনুসন্ধান শুরু করেন। তাঁদের দেখানো পথেই পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিদ্যা চলে প্রায় ২০০০ বছর ধরে।

আর একজন বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক ছিলেন গ্যালেন (Galen, ১৩০-২০০ খ্রীঃ)। রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসকে তিনি চিকিৎসা করেন। তাঁর চেষ্টার ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছিল।

মধ্যযুগের ইওরোপের আর এক বিখ্যাত ডাক্তার ও রসায়নবিদ্ ছিলেন জার্মানীর প্যারাসেলসাস (১৪৯৩-১৫৪১ খ্রীঃ), যাঁর আসল নাম ছিল ফন হোহেনহাইম।

॥ শল্য-চিকিৎসা ॥

শল্য-চিকিৎসা অনেক দূরে এগিয়ে গেলেও অসুখ কেন হয় তা কিন্তু অজানাই রয়ে গেল অনেকদিন।

এই সময়েই আবির্ভাব হল জানসেন (Janssen)

এর। জাতে ইনি ওলন্দাজ—হল্যাণ্ডে ছিল এঁর বাড়ি। ইনি চশমার কাচ নিয়ে এমন এক যন্ত্র তৈরি করলেন, যাতে যে কোন জিনিসকে ১৫০ গুণ বড় করে দেখা যায়—যন্ত্রটার নাম দিলেন মাইক্রসকোপ। এইভাবে অজানা জীবাণুরা ধরা পড়ে গেল বিজ্ঞানীদের কাছে।

॥ লুই পাস্তুর ॥

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মালেন লুই পাস্তুর (Louis Pasteur—১৮২২-১৮৯৫ খ্রীঃ) ফরাসী দেশে। এই লুই পাস্তুরই প্রমাণ করলেন যে সাধারণ হাওয়ায় নানারকম জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারাই বংশবৃদ্ধি করে নানা খাবার জিনিস বিষাক্ত করছে আর তাইতে লোকে অসুখে পড়ছে।

॥ লর্ড লিস্টার ॥

ঠিক এই সময়ে তিনি ইংলণ্ডের মস্ত বড় শল্য-চিকিৎসক লিস্টারের কাছ থেকে এক পত্র পেলেন। লর্ড লিস্টার (Lord Lister—১৮২৭-১৯১২ খ্রীঃ) তাঁকে লিখেছেন যে হাসপাতালের অর্ধেক রোগীই অদ্ভুত এক অসুখে মারা যাচ্ছে। পাস্তুরের কাজ দেখে তাঁর মনে হয়েছে, হাসপাতালেও ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট জীবাণু যারা এ অসুখের সৃষ্টি করে রোগীদের মৃত্যু ঘটাচ্ছে। কীভাবে এদের হাত থেকে বাঁচা যাবে? তিনি রোগীর ঘায়ে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দিয়ে জীবাণু ধ্বংস করে কিছু কিছু রোগীর প্রাণ রক্ষা করতে পারছেন বটে তবে তাদের একেবারে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে না।

পাস্তুর জানালেন জীবাণুমুক্ত করে নিলেই রোগ সারবে। কিন্তু তিনি সেখানেই থামলেন না—বার করলেন মুরগীর কলেরার জীবাণু, জলাতঙ্ক আর অ্যানথ্রাক্স (anthrax)-এর জন্যে প্রতিষেধক ভ্যাকসিন।

॥ রবার্ট কক ॥

জার্মান দেশে একই সময়ে রবার্ট কক (Robert Koch—১৮৪৯-১৯১৯ খ্রীঃ) বার করলেন অ্যানথ্রাক্স (anthrax)-এর জীবাণু, যক্ষ্মা জীবাণু ও কলেরার
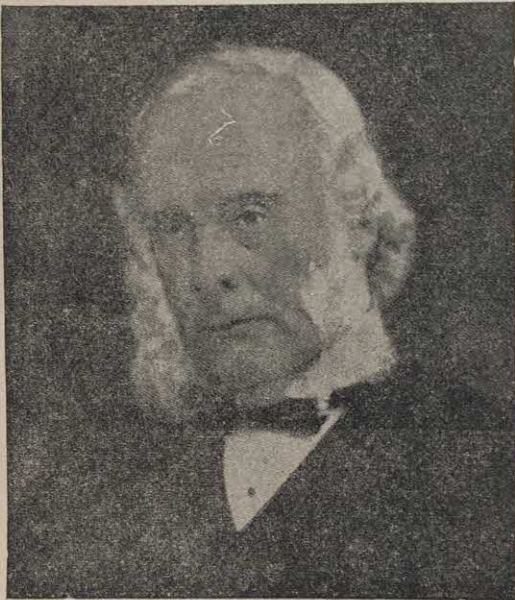
লর্ড লিস্টার
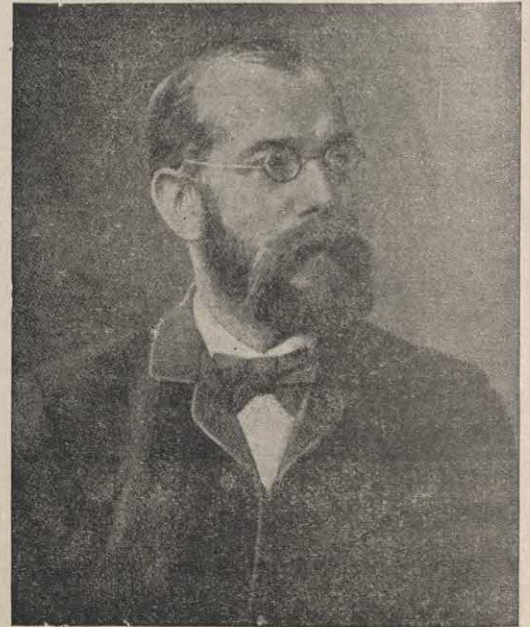
রবার্ট কক—কলেরার জীবাণুর আবিষ্কারক

জীবাণু। কলেরার জীবাণু তিনি বের করলেন কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ল্যাবরেটরীতে।

এই দুজনে মিলে নতুন জীববিদ্যার প্রতিষ্ঠা করলেন। আজ সমস্ত যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করে শল্য-চিকিৎসকেরা জীবাণুমুক্ত পোশাক পরে কাজ করেন। তার ফলে অপারেশনের পরে জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে না।

॥ জীবাণুর কথা ॥

আজ ডাক্তাররা জীবাণুর সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পেরেছেন। আজ তাঁরা সমস্ত জীবাণু নানা শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলতে পেরেছেন।

এদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর জীবাণু আছে যাদের সাধারণ মাইক্রসকোপে দেখা যায় না ; তাদের বলে ভাইরাস (virus).

নানা জাতের ভাইরাস থেকেই হয় জল বসন্ত, আসল বসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিওমায়েলাইটিস (poliomyelitis).

অনেক পরীক্ষার ফলেও আজ পর্যন্ত এদের সম্পূর্ণ মেরে ফেলার মতো কোন ওষুধ বার হয় নি। কিন্তু অন্যান্য বেশির ভাগ রোগেরই বেরিয়েছে প্রতিষেধক টিকা।

বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন ইংলণ্ডের এক ডাক্তার—এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner—১৭৪৯-১৮২২ খ্রীঃ)। জেনার চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখেছিলেন যে বসন্ত রোগ সকলেরই হতে পারে। কিন্তু একটা ব্যাপার তাঁর কাছে খুব আশ্চর্য লাগত যে, বসন্ত রোগ যত বেশী শহরে হয়, গ্রামে কিন্তু তত হয় না, আর সবচেয়ে কম হয় গয়লাদের ভিতর। খবর নিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে যাদের আগে গো-বসন্ত হয় তাদের আর পরে আসল বসন্ত হয় না। তিনি ভাবতে লাগলেন যে ব্যাপারটা যদি সত্যিই হয় তাহলে সুস্থ লোকের শরীরে গো-বসন্তের জীবাণু দিয়ে দিলে তার তো আর আসল বসন্ত হবে না। এ পরীক্ষাই তিনি করলেন জেমস্ ফিপ্‌স্ নামে একটি ছেলের উপর—১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই মে তারিখে।
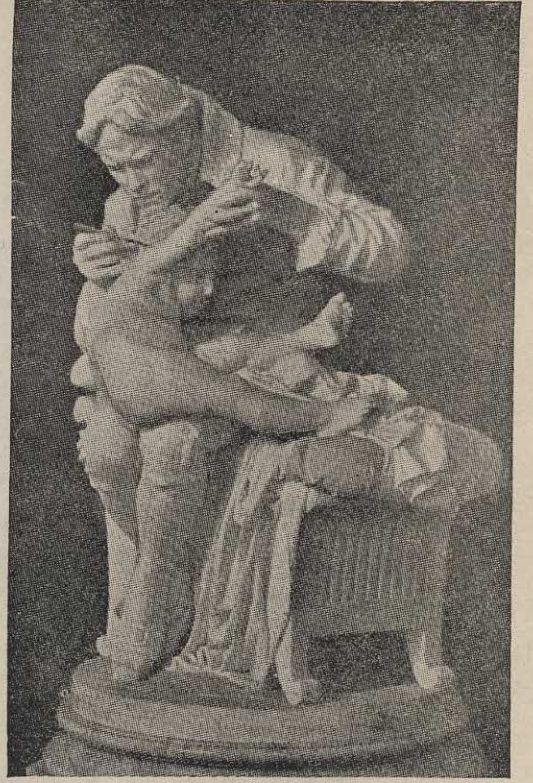
জেনার জেমস্ ফিপ্‌স্‌কে গো-বসন্তের টিকা দিচ্ছেন

এ পরীক্ষা থেকেই প্রমাণ হল যে গো-বসন্তের জীবাণু শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষকে আসল বসন্তের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

খুব অল্প পরিমাণে কোনও রোগবীজাণুকে রক্তে ঢুকিয়ে দেওয়ার এই নিয়মকে বলে টিকা দেওয়া (vaccination). অল্প বিষ বলে শরীরের ক্ষতি কিছু হয় না, কিন্তু ঐ বিষ পেয়েই শরীরের রক্ত নিজের মধ্যে নানারকম ব্যবস্থা করে, যাতে পরে বেশী বিষ এলেও শরীর তাকে হারিয়ে দিতে পারে। শরীরের এই অবস্থাকে বলে immunity.

জলবসন্তের কিন্তু কোন প্রতিষেধক আজও বের করতে পারা যায় নি।

তোমরা নিশ্চয়ই পোলিওমায়েলাইটিসের নাম শুনেছ। একে সংক্ষেপে বলে পোলিও। এতে ছোট ছেলেদের প্যারালিসিস হয় বলে এর আর

বসন্তের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হচ্ছে

একটা নাম হয়েছে ইনফ্যান্টাইল প্যারালিসিস (Infantile Paralysis). এরও কোন ওষুধ তৈরী হয় নি, কিন্তু এরও প্রতিষেধক টিকা বের করেছেন Dr. Salk আর Dr. Sabin. ছুঁচ ফুটিয়ে Salk ভ্যাকসিন দিতে হয় আর খাইয়ে দিতে হয় Sabin ভ্যাকসিন।

যে-সব বীজাণুদের মাইক্রসকোপে দেখা যায় তাদের দেখতে নানারকম হতে পারে। কেউ বা গোল-গোল, কেউ বা লম্বা-লম্বা কেউ বা স্ক্রুর মতো দেখতে, কারও বা আছে চলবার জন্যে পাখনা, কারও বা আছে লেজ। কত না তাদের চেহারার বাহার। এদের অনেকেই আমাদের শরীরে রোগ সৃষ্টি করে। এদের থেকেই আমাদের হয় মেনিনজাইটিস, ডিপথিরিয়া, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, যক্ষ্মা, প্লেগ, আমাশয়, আরও কত কি!
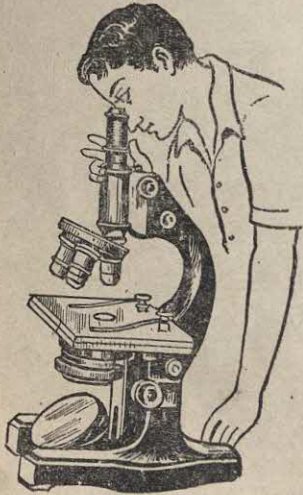
সাধারণ মাইক্রসকোপ

স্যর রোনাল্ড রস

কাজেই জীবাণু আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তাদের জয় করার অভিযান। এ অভিযানের পুরোভাগে ছিলেন পল এর্লিখ (Erlich). পল এর্লিখ পরীক্ষা শুরু করেছিলেন যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কারক রবার্ট ককের ল্যাবরেটরীতে নানারকম রং নিয়ে। কাচের স্লাইডে জীবাণুদের আজ আমরা রং দিয়ে চিনতে পারি। কিন্তু এর্লিখই প্রথম এ জিনিস যে সম্ভব তা প্রমাণ করেন।

স্যর রোনাল্ড রস (Sir Ronald Ross—১৮৫৭-১৯৩২ খ্রীঃ) ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। ম্যালেরিয়া রোগ যে এনোফিলিস জাতীয় স্ত্রী-মশা বহন করে এবং এই মশা মারলেই যে

এনোফিলিস মশা পিছনটা উঁচু করে বসে

ম্যালেরিয়া রোগ কমে, এই তথ্য ইনি আবিষ্কার করেন। কলকাতায় বসে তিনি এই আবিষ্কার করেন। এখনকার সুখলাল কারনানি হাসপাতালের উত্তরের একটি ছোট গেটে তা লেখা আছে।

আমাদের দেশে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী উঠে পড়ে লাগলেন আমাদের দেশের কালাজ্বরকে জয় করতে। শেষকালে মিলল তাঁর পরিশ্রমের ফল—ইউরিয়া স্টিবামাইন। আজ ইউরিয়া স্টিবামাইনের জন্যে কালাজ্বর প্রায় নেই বললেই হয়।

একজন ডাক্তার পরীক্ষা করে বের করলেন প্রণ্টসিল। তার পরে পরপর ওষুধ বেরুল নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস ও আমাশয়ের জন্যে।

যখন নানা ওষুধের সন্ধানে ডাক্তারেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, সে সময়ে ইংলণ্ডে একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটল। স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Sir Alexander Fleming—১৮৮১-১৯৫৫ খ্রীঃ) ছুটিতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখেন তাঁর জীবাণু তৈরির বাটিগুলিতে একরকম ছাতা (ছত্রাক) এসে বাসা বেঁধেছে এবং জীবাণুগুলিকে খেতে শুরু করেছে। আসলে ছাতাগুলি নিজেদের বাঁচবার জন্যে নিজেদের চারদিকে একটা জিনিস তৈরি করত যাতে সাধারণ জীবাণু মরে যেত। ডাক্তার ফ্লেমিং এ জিনিসটার নাম দিলেন পেনিসিলিন। পেনিসিলিন যে কেবল একটা নতুন ওষুধ, তা নয়, এটা খুলে দিল ডাক্তারদের সামনে এক নতুন পথ। জীবাণু দিয়ে জীবাণুকে ধ্বংস করা—এর থেকেই জন্ম হল "অ্যান্টিবায়োটিক" জাতীয় ওষুধের।

অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ আজ চিকিৎসা জগতে যুগান্তর এনেছে। আজ যক্ষ্মা চিকিৎসা করা হচ্ছে স্ট্রেপটোমাইসিন দিয়ে, টাইফয়েড চিকিৎসা করা হচ্ছে ক্লোরামফেনিকল্ দিয়ে, টনসিলের রোগ পেনিসিলিন দিয়ে।

চিকিৎসার এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে রোগকে সারানোর থেকে আটকানোই হচ্ছে ভাল বুদ্ধি। কাজেই আজকাল আমরা ডিপথিরিয়া, টিটেনাস, হুপিং কাশির জন্যে দিচ্ছি ট্রিপল অ্যান্টিজেন ইনজেকসন; কলেরা ও টাইফয়েডের জন্যে তার প্রতিষেধক ইনজেকসন, যক্ষ্মার জন্যে বি. সি. জি. টিকা।

॥ আধুনিক শল্য-চিকিৎসা ॥

আজ শল্য-চিকিৎসার (Surgery) যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। লোকের বৃক্ক (কিডনি) বদলে দেওয়া হচ্ছে। হৃৎপিণ্ড বদলে দেওয়া হচ্ছে। যত দিন যাবে আরও নতুন নতুন নানারকম শল্য-চিকিৎসার উন্নতি দেখা যাবে। শল্য-চিকিৎসা নতুন নয়, শল্য-চিকিৎসা আয়ুর্বেদেও ছিল এবং সমস্ত দেশেই কিছু-না-কিছু চলত; বেশির ভাগ সময়ে নাপিতরাই ছিল এ ব্যবসায়ে পটু। এই সেদিন পর্যন্তও ইংলণ্ডে শল্য-ব্যবসায়ীদের নাম ছিল 'বার্বার-সার্জন'। আজকাল শল্য-চিকিৎসার এই উন্নতির মূলে কিন্তু দুটি জিনিস বর্তমান—অজ্ঞান করার কৌশল ও জীবাণুমুক্ত করার কৌশল।

ভাবতে অবাক্ লাগে যে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগে রোগীকে অজ্ঞান করে শল্য-চিকিৎসার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। আমেরিকার জেফারসন শহরে ক্রফোর্ড উইলিয়মস্ লঙ বলে একজন ডাক্তার দেখেছিলেন যে, 'ঈথার' শুঁকলে লোকেরা খানিকক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞান থাকে এবং সে সময়ে তাদের উপর অস্ত্রোপচার করলে তাদের বেদনাবোধ হয় না। তিনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ঈথার শুঁকিয়ে এক রোগীর ঘাড় থেকে দুটো ছোট ছোট টিউমার কেটে বাদ দেন। রোগী একটুও টের পায় নি।

ডাক্তার লঙ যখন রোগীদের জন্যে 'ঈথার' ব্যবহার করছিলেন তখন ডাক্তার ওয়েল্স্ নামে একজন দাঁতের ডাক্তার 'লাফিং গ্যাস' বা "নাইট্রাস অক্সাইড" ব্যবহার করে দাঁত তোলবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ডাঃ মর্টন নামে আর একজন দাঁতের ডাক্তার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁদের প্রথম রোগী বলে বসল যে তার দাঁত তুলতে বেশ ব্যথা লেগেছে। কাজেই ওয়েল্স্ মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে গেলেন।

আগেকার দিনের চক্ষু অপারেশন

ডাঃ মর্টন কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। তিনি ঈথার নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবর মাসে ঈথার দিয়ে বোস্টনের সেরা সার্জন জন সি. ওয়ারেন প্রথম অপারেশন করলেন এবং ডাঃ মর্টন যে তাঁর চেষ্টায় কৃতকার্য হয়েছেন, তা বলতে বাধ্য হলেন।

এদিকে ঈথারের খবর ইংলণ্ডে চলে গেল। লণ্ডনের সেরা সার্জন রবার্ট লিস্টন ঈথার ব্যবহার করতে লাগলেন।

এর পরে ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ ডাঃ সিমসন (Sir James Young Simpson—১৮১১-১৮৭০ খ্রীঃ) শুরু করলেন "ক্লোরোফর্মের" ব্যবহার। এর পরে এলেন ডাঃ জোসেফ। তিনি ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে পরে রোগীদের ঈথার দিয়ে অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আরো কিছুক্ষণ অজ্ঞান করে রাখতেন। কোন কোন সময় তিনি "লাফিং গ্যাসও" ব্যবহার করেছেন।

এরকম ভাবে শুরু হলেও আস্তে আস্তে অজ্ঞান করার প্রক্রিয়া নানাভাবে এগিয়ে গিয়েছে। নানারকম রাসায়নিকের সাহায্যে আজকাল অনেকক্ষণ ধরে রোগীদের অজ্ঞান করে রাখতে পারা যায়।

কাজেই আজকাল অজ্ঞান করার এবং জীবাণু-মুক্তির কৌশল জানার ফলে শল্য-চিকিৎসকরা সব রকম অপারেশনই করছেন—পেট কেটে "অ্যাপেন-ডিক্স" বা "গল ব্লাডার" বাদ দেওয়া তো সাধারণ ব্যাপার; টিউমার, আমাশয় খানিকটা বাদ দেওয়া, অন্ত্র কেটে বাদ দেওয়া, বৃক্ক বাদ দেওয়া, বদলে দেওয়া প্রভৃতি আশ্চর্য আশ্চর্য শল্য-চিকিৎসার কৌশল তাঁরা দেখাচ্ছেন। দরকার হলে হৃৎপিণ্ড বদলে দেওয়াও হচ্ছে।

॥ এক্স্‌রে ॥

রণ্টজেন (Wilhelm Konard Rontgen—১৮৪৫-১৯২৩ খ্রীঃ) কর্তৃক আবিষ্কৃত এক্স্‌রে চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগান্তর এনেছে। শরীরের অভ্যন্তরের ফটো তোলা

রোগীকে অজ্ঞান করে অপারেশন করা হচ্ছে
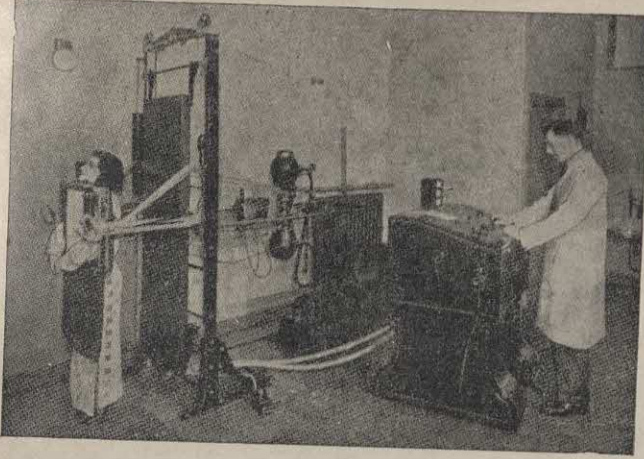
এক্স্-রের সাহায্যে ফটো নেওয়া হচ্ছে

হয় এক্স্-রে যন্ত্রে। ফলে শরীরের ভিতরের রোগগুলিও চোখে দেখা যায় ও চিকিৎসক সে সব জেনে চিকিৎসা করেন। এক্স্-রে একরকম অদৃশ্য আলো যার কথা ভাল করে জানা ছিল না বলে এর নাম রাখা হয় X-Ray অর্থাৎ অজ্ঞাত রশ্মি। বাংলায় একে রণ্টজেন-এর নামে রঞ্জন রশ্মিও বলা হয়।

॥ খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ॥

অনেক রোগের কারণই জীবাণুরা। আবার এমন অনেক রোগ আছে যেগুলো আমাদের খাদ্যের মধ্যে দেহের প্রয়োজনীয় কতকগুলি পদার্থ—যেমন ক্যালসিয়াম কিংবা ভিটামিন অভাবে হয়ে থাকে। স্বাভাবিক খাদ্যের মধ্যে এই ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ নানারকমের থাকে। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ভিটামিন-এ, কিংবা বি, কিংবা সি ইত্যাদি। এরা অতি দরকারী জিনিস। যত বেশীই খাও আর যত ভাল খাবারই খাও, ভিটামিনহীন খাবার খেলে শরীর ভাল থাকবে না।

১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, ফরাসীদেশবাসী আবিষ্কারক কার্টিয়ের (Jacques Cartier—১৪৯৪-১৫৫৭ খ্রীঃ) যখন Newfoundland-এর দিকে গেলেন তখন তাঁর জাহাজের অনেক লোকই আক্রান্ত হল 'স্কার্ভি' রোগে। সেকালে কেউ জানত না স্কার্ভি (scurvy) কেন হয়। কাজেই রক্তপাত হয়ে বেশির ভাগ রোগীই মারা যেত। কিন্তু রেড ইণ্ডিয়ানরা গাছপালা থেকে এক রকম রস খাইয়ে এদের ভালো করে তুলল। এর প্রায় দুশো বছর পরে ক্যাপ্টেন জেমস কুক (Captain James Cook —১৭২৮-১৭৭৯ খ্রীঃ) তাঁর জাহাজের খালাসীদের বাঁচিয়েছিলেন ফলের রস খাইয়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম বাচ্চাদের জন্যে টিনের দুধ তৈরী হতে লাগল। তখন প্রোটিন, স্নেহ ও শর্করা মিশিয়ে তৈরি করা হল দুধ কিন্তু অনেক বাচ্চাদেরই হয়ে গেল 'স্কার্ভি'। কারণ তখন কেউ জানত না যে ভিটামিন-'সি'র অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়।

ইংলণ্ডের ডাক্তার হপকিন্‌স, পোল্যাণ্ডের ডাক্তার ফুঙ্ক (Funk) এবং হল্যাণ্ডের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার খাদ্য ও খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে গবেষণা করে অনেক তথ্যই বের করেন। হল্যাণ্ডের ডাক্তার জাভার জেলেতে এক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন যে আসলে রোগটা কোন জীবাণুর জন্য হয় না, হয়

খাবারে খাদ্যপ্রাণ-'বি' না থাকলে—রোগটার নাম হল বেরিবেরি।

হপকিন্‌স্ দেখালেন যে আমাদের খাদ্যে প্রোটিন, স্নেহ ও শর্করা থাকলেই হবে না, তাদের সঙ্গে থাকা চাই খাদ্যপ্রাণ।

ফুঙ্কই এই খাদ্যপ্রাণগুলির নাম দেন 'ভিটামিন'।

ভিটামিন-এ না খেলে চোখের রোগ হয়; রাত্রিতে দেখতে অসুবিধে হয় এবং পরে চোখে ঘা হয়ে যায়।

ভিটামিন-বি'র আবার অনেকগুলি রকম আছে—ভিটামিন বি-১, বি-২ ইত্যাদি। এদের মধ্যে কোনোটা দরকার হয় আমাদের শরীরে রক্ত তৈরির কাজে,

কোনোটা বা দরকার হয় আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের পুষ্টির জন্যে।

ভিটামিন-সি না খেলে স্কার্ভি হয়—রক্ত-ক্ষরণ এর প্রধান লক্ষণ।

ভিটামিন-ডি'র অভাবে হাড়ের অপুষ্টি রোগ হয়।

॥ ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ ॥

আমাদের শরীরের অন্তঃক্ষরণ-গ্রন্থিগুলি অত্যন্ত বিস্ময়জনক। এর কোনওটা বিকল হলে নানা ব্যাধি হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দেখা যায় ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র বা মধুমেহ। বহুমূত্রের আসল মুশকিল হল, শরীর খাবারের শর্করা জাতীয় উপাদান কিছুতেই নিজের কাজে লাগাতে পারে না, প্রস্রাবের সঙ্গে তা বেরিয়ে যায়। এর ফলে, লোক রোগা হতে থাকে এবং আস্তে আস্তে মারা যায়। কাজেই এর জন্যে ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা চিরকাল চলছে। অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন (insulin) রস না বেরোনোই এর কারণ। শরীর যদি ইনসুলিন না বানায়, তবে বাইরে তা বানিয়ে শরীরে ফুঁড়ে দেবার উপায় যিনি বের করলেন তিনি হলেন ক্যানাডার ডাক্তার ব্যান্টিং (Sir Frederick Grant Banting). ব্যান্টিং ও তাঁর সহকারী বেস্ট প্রায় এক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরি করলেন "ইনসুলিন"—বহুমূত্রের ওষুধ।
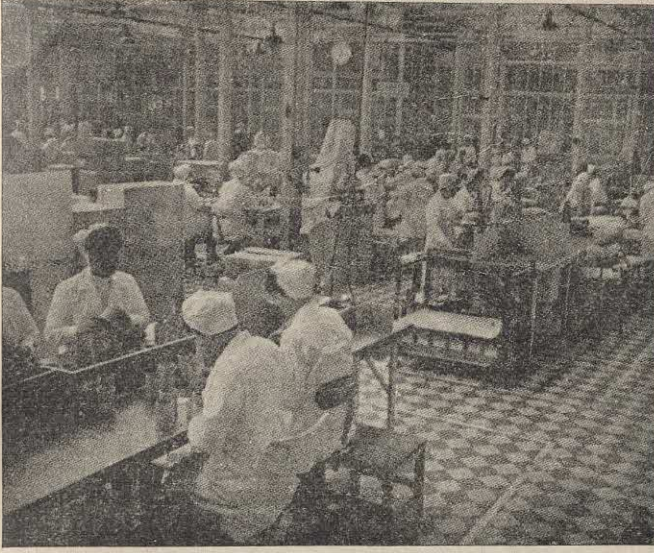
একটি আধুনিক ওষুধ তৈরির কারখানা

আজকাল অবশ্য ইনসুলিন ছাড়াও ডায়াবেটিসের অন্য ওষুধ বেরিয়েছে, কিন্তু সবার জন্যে আজও ইনসুলিনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

॥ ক্যান্সার এবং রেডিয়াম ॥

আমাদের শরীর নানা জাতীয় কোষ দিয়ে তৈরী। তারা এক-একদল এক-এক কাজ করে, কিন্তু সবাই মিলে-মিশে কাজ করে বলেই আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম চলে। রুডলফ ভিসো নামে একজন বিখ্যাত জার্মান ডাক্তার শরীরের এই কোষ নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে দেখলেন যে বিশেষ বিশেষ রোগে কতকগুলি কোষ শরীরের কোন নিয়ম-কানুন মেনে চলে না, তারা চলে নিজের তালে এবং শরীরে তৈরি করে কর্কট রোগ—ক্যান্সার।

বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী মাদাম মেরী ক্যুরি (Madame Marie Curie—১৮৬৭-১৯৩৪ খ্রীঃ) ছিলেন পোল্যাণ্ডের অধিবাসী। প্যারিসে চলে এসে তিনি বিয়ে করেন পিয়ের কুরি (Pierre Curie—১৮৫৯-১৯০৬ খ্রীঃ) নামে একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপককে এবং এঁরা দুজনে মিলে পিচব্লেণ্ড থেকে রেডিয়াম বের করেন। দেখা গেল, রেডিয়াম ক্যান্সারের কোষগুলিকে মেরে ফেলতে পারে।

এর পরে অবশ্য ক্যান্সারের, আরও নতুন নতুন ওষুধ বেরিয়েছে কিন্তু সবারই গোড়াতে হল ঐ রেডিয়াম।

॥ হাসপাতালের কথা ॥

হাসপাতাল রোগ-সারানোর কেন্দ্র। এখানে ডাক্তার থাকেন, নার্স থাকেন আর থাকে ওষুধপত্র ও ডাক্তারী যন্ত্রপাতি। খ্রীষ্টীয় যুগ শুরু হবার আগেও ভারতে এরূপ হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল। ৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বোগদাদে এরূপ হাসপাতাল ছিল। ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে একটি কুষ্ঠরোগীর হাসপাতাল ছিল।

এখন বিশেষ বিশেষ রোগ-চিকিৎসার জন্য, যথা, ক্ষয়রোগের চিকিৎসা, শিশু-রোগের চিকিৎসা, প্রসূতি চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য বহু হাসপাতাল সব দেশেই হয়েছে।

প্রথমে হাসপাতালগুলি দরিদ্রের জন্যেই স্থাপিত হয়েছিল। সাধারণ লোক চাঁদা দিয়ে হাসপাতাল চালাত। এখন সরকার এসব ব্যবস্থা করে থাকেন। এখন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে সকলেই যান। তাঁরা চিকিৎসার খরচের কিছু অংশ দেন।

ক্ষয় রোগের চিকিৎসার জন্যে টি. বি. শীল বিক্রি হয়। এই টাকায় ক্ষয় রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। 'রেড ক্রস' প্রতিষ্ঠানও চাঁদা তুলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। 'রেড ক্রস' একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্যে ১৮৬৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠা করেন আঁরি দুনাঁ (Henri Dunant)।

হাসপাতালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হল—পরিচ্ছন্নতা, প্রচুর আলো-বাতাস, পুষ্টিকর খাদ্য আর নিয়ম করে খাওয়া, চিকিৎসা আর দরকারমতো শুশ্রূষা। হাসপাতালের চিকিৎসা হয় অভিজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা। শিক্ষার্থীরা ডাক্তারের নির্দেশমতো রোগীর চিকিৎসা করে হাতে-কলমে ডাক্তারি শেখেন।

॥ রোগীর পরিচর্যা ও শুশ্রূষা ॥

রোগীর পরিচর্যা ও শুশ্রূষা করার জন্যে বিশেষ ভাবে শিক্ষিতা সেবাব্রতী শুশ্রূষাকারিণী নিযুক্ত হন। এঁরা রোগীকে যত্ন করেন ও যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্যে যা কিছু করা দরকার সে সবই করেন।

তাঁরা প্রত্যেক রোগীর মাথার কাছে তার রোগের বিবরণ, কবে কি ওষুধ দেওয়া হল তার তালিকা, জ্বরের তাপমাত্রা ও অন্যান্য বিশেষ রোগলক্ষণ লিখে রাখেন।

এই সব নার্সদের নিয়ত দেখা-শোনার ফলে রোগী অনেক সময় নিজের বাড়ির চেয়েও আরামে হাসপাতালে থাকেন।

॥ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ॥

সেবাব্রতী মহিলাদের আদর্শ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল (Florence Nightingale—১৮২০-১৯১০ খ্রীঃ)। ইটালীর ফ্লোরেন্সে তাঁর জন্ম হয়। তিনি তাঁর বাপ-মায়ের সঙ্গে লণ্ডনে বাস করতেন।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রদের উপর তাঁর সহানুভূতি জন্মাতে থাকে। প্রায়ই তিনি দরিদ্রদের কুটিরে গিয়ে তাদের দেখাশোনা করতেন।

কিছুকাল পরে জার্মানির কাইজরওয়ের্থ-এ একটি নার্সিং শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি নার্সিং শিক্ষা করেন। তারপর লণ্ডনে ফিরে তিনি একটা ছোট হাসপাতাল স্থাপন করেন।

স্কুটারির হাসপাতালে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল

এদিকে রাশিয়ার দক্ষিণাংশে ক্রিমিয়াতে যুদ্ধ (Crimean War) শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধে আহত সৈন্যদের জন্যে হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু কে নেবে এই বিরাট কাজের ভার? কর্তৃপক্ষ কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। অনেকেই দরখাস্ত করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলকেই কর্তৃপক্ষ মনোনীত করলেন।

এক সপ্তাহের মধ্যেই নাইটিংগেল ৩৮ জন শিক্ষিতা নার্সকে নিয়ে ক্রিমিয়ার অন্তর্গত স্কুটারির হাসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। স্কুটারির হাসপাতালে হাজির হয়ে তিনি দেখলেন শত শত রোগী চরম অব্যবস্থার জন্যে কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁদের পোশাক নোংরা, খাদ্য জঘন্য, ওষুধপত্রের অভাব। দশ দিনের মধ্যে নাইটিংগেল সেখানে ধোবিখানা খুললেন, ভাল রাঁধুনী যোগাড় করে রোগীদের পথ্য তৈরির ভার দিলেন। তিনি হাসপাতালটিকে আনন্দ নিকেতন করে তুললেন।

অতি যত্ন করে মায়ের মতো স্নেহে তিনি রোগীদের সেবা-যত্ন করতেন। রাত আটটায় যখন অন্য সব নার্স কাজের শেষে বিশ্রাম করতে যেতেন তখন তিনি রোগীদের বিছানার ধারে ধীরে দীপ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। রোগীদের কাছে তিনি ছিলেন স্বর্গের দেবীর মতো। তারা তাঁর নাম দিয়েছিল 'দীপহস্তে মহিলা' (The Lady with the Lamp).

অবশেষে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হল।

ইংলণ্ডে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই নাইটিংগেল অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হাস-পাতালের কাজে তাঁকে দারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আরোগ্য লাভের পর তিনি অনেককাল নার্সের কাজ করে অনেক হাসপাতালের নিয়মকানুন বেঁধে দেন। তাঁরই উপদেশে নতুন নতুন হাসপাতাল গড়ে উঠতে থাকে এবং তাঁর আদর্শে আজ বহু ভদ্রমহিলা এই মহান্ সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করে জগতের কল্যাণে রত আছেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এই কীর্তিমতী মহিলার মৃত্যু হয়।

ছবিতে সাধারন জ্ঞান

॥ মৌমাছি গুনগুন করে কেন ॥

মৌমাছির গুনগুন শব্দ আসলে তার দ্রুত ডানা নাড়ার শব্দ। মিনিটে ২৪,০০০ অর্থাৎ সেকেণ্ডে

৪০০'-রও বেশী বার মৌমাছি ডানা নাড়ে। কখনো কখনো মিনিটে ২৬,০০০ বারেরও বেশী ডানা নাড়ে।

॥ বিঘত, গজ, বাঁও ॥

আঙুলগুলো যতদূর সম্ভব মেলে ধরে, বুড়ো আঙুলের ডগা থেকে কড়ে আঙুলের ডগার মাপ এক বিঘত
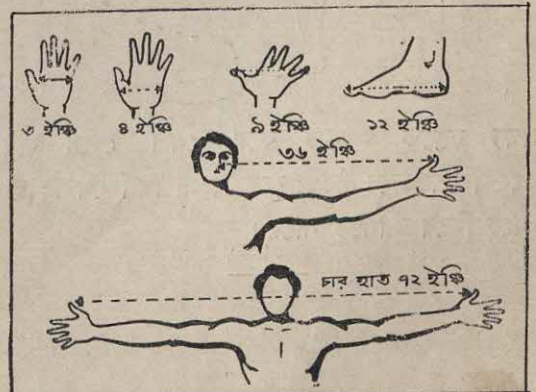
(span). ইংলণ্ডের রাজা প্রথম হেনরি এক গজ মাপের প্রবর্তন করেন। তাঁর নাকের ডগা থেকে প্রসারিত বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ডগা পর্যন্ত মাপকে এক গজ (yard) বলা হয়। বাঁও (fathom) হচ্ছে সমুদ্রের বা নদীর গভীরতা মাপের একক। দুই হাত প্রসারিত করলে বাঁ হাতের মধ্যমার ডগা থেকে ডান হাতের মধ্যমার ডগা পর্যন্ত মাপকে বলে বাঁও অর্থাৎ মোটামুটি ৪ হাত পরিমাণ।

———

॥ বূমেরাং কি ? ॥

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা অস্ত্র হিসেবে একরকম বাঁকানো কাঠ ব্যবহার করে, তার নাম বূমেরাং (Boomerang). সেটা ছুড়ে মারতে হয়।
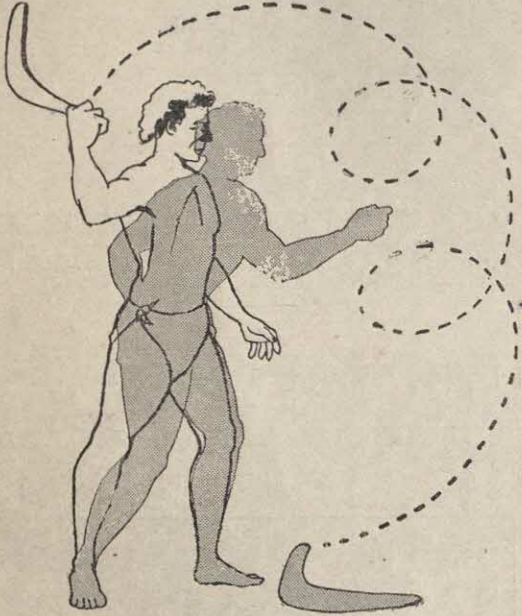
লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত করে সেটা থেমে যায়। তবে বিশেষভাবে তৈরী বূমেরাং আবার নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসতে পারে।

———

॥ তারাদের রং রকম রকম হয় কেন ? ॥

কতক তারা সূর্যের মতো হলদে, কতক তারা নীল, আর কতক তারা সাদা রঙের। সবুজ, লাল, গোলাপী ইত্যাদি রঙের তারাও আছে। তাপের উপর তারার রং নির্ভর করে। লাল তারার তাপ

হলদে তারাদের চেয়ে কম। আবার হলদে তারার তাপ সাদা তারাদের চেয়ে কম। Canis Major-এর Sirius (কুকুর তারা) সাদা—এর তাপ ২০,০০০° ফারেনহাইট। যুগ্ম তারাদের অর্থাৎ যেখানে দুটি তারা একসঙ্গে জোড়া থাকে তাদের দুটি দু'রঙের হতে পারে।

———

॥ সূর্যের তাপ আমাদের কাছে কিভাবে পৌঁছয় ?

সূর্য আমাদের থেকে সওয়া ন' কোটি মাইল দূরে
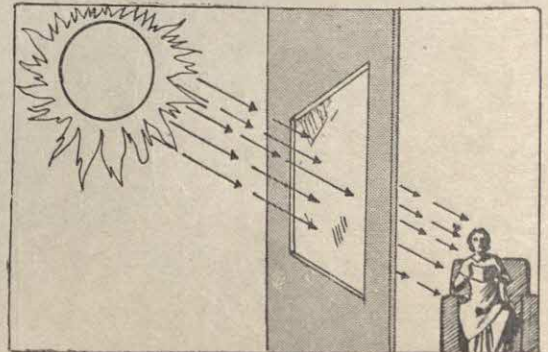
আছে। পৃথিবীর উপরকার বায়ু-স্তরকে গরম না করে সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসতে পারে। সূর্যের তাপের তরঙ্গগুলি খুব ছোট বলেই তারা বায়ুমণ্ডলের বায়ু, এমনকি জানালার কাচকেও, গরম না করে তা ভেদ করে চলে আসে। কিন্তু পৃথিবীর জলমাটিকে তা ভেদ করতে পারে না বলে সূর্যের তাপে সেগুলো গরম হয়। গরম হয়ে তারা তাদের গরম দিয়ে ওপরের হাওয়াকে গরম করে।

॥ ধোঁয়া কি ? ॥

উনুনে প্রথম আঁচ ধরালে তখন ভাল করে আঁচ না ওঠা পর্যন্ত গলগল করে ধোঁয়া বেরোয়। ক্রমে আঁচ ভাল করে ধরলে আর ধোঁয়া থাকে না। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন জিনিস পুরোপুরি পুড়লে

গ্যাস হত, কিন্তু পুরোপুরি না পুড়লে যে আ-পোড়া কার্বন-কণা গ্যাসে মিশে থাকে, তাই ধোঁয়া হয়। আর সেই কণাগুলোই সব কিছুকে ময়লা করে, গাছ-পালার ক্ষতি করে আর আমাদের ফুসফুসে ঢুকে ফুসফুসের ক্ষতি করে।

॥ দুধ টকে যায় কেন ?

দুধে জীবাণু জন্মাবার ফলেই দুধ টকে যায়। এই জীবাণু আসে হাওয়া থেকে। দুধ ফুটিয়ে আগে সেগুলোকে মেরে নিতে হয়। তারপর তাকে হয় কোনও বায়ুশূন্য পাত্রে রাখতে হয়, নয়তো খানিকক্ষণ পরপর তাকে ফোটাতে হয়। তাহলেই আর দুধ টকে যেতে পারে না।

টকে-যাওয়া দুধে যা বিস্বাদ লাগে তা হল এক রকম অ্যাসিড। একে বলে ল্যাকটিক অ্যাসিড। দুধের মধ্যে যে শর্করাজাতীয় বস্তু আছে তা থেকে জীবাণুরা এরকম অ্যাসিড তৈরি করে।

॥ তাসখেলা কোন্ দেশে শুরু হয়েছিল ? ॥

যতদূর জানা গেছে খ্রীষ্ট জন্মাবার ৮০০ বছর পরে ভারতবর্ষে প্রথম তাসখেলা শুরু হয়। এখান থেকে এই খেলা পুবে ও পশ্চিমে ছড়িয়ে

পড়ে। মুসলমানদের কাছ থেকে শিখে ক্রুসেডাররা (ধর্মযোদ্ধারা) এ খেলা ইওরোপে নিয়ে যায়। ভারতবর্ষে দশ রকমের তাস ছিল—দশ অবতারের ছবি দেওয়া। ইওরোপে চার রকমের তাস চলে—চিড়েতন, রুইতন, হরতন ও খড়্গ বা তরবারি। Spade (ইস্কাবন) কথাটা ইতালীয়, এর অর্থ তরবারি। রাজদরবারের তাসে আগে ছিল পুরুষমানুষদের মাথা। প্রথমে এ ছিল একরকম

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা—কাজেই যুদ্ধের ব্যাপারে মেয়েদের স্থান ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে দুদিকে মুণ্ড দেওয়া তাসের চলন হল। তাতে উলটো-সোজা সাজাবার ঝঞ্ঝাট আর রইল না।

এখন ১৩টি করে চার প্রস্থ তাসে এক প্যাক বা বাণ্ডিল হয়। বাণ্ডিলে সবসুদ্ধ ৫২ খানা তাস থাকে। এক সময়ে চারজন রাজা মানে শার্লেমেন, ডেভিড, আলেকজাণ্ডার ও জুলিয়াস সীজারকে বোঝাত।

ভারতবর্ষের প্রাচীন আমলের তাস ছিল গোল, চীনদেশে লম্বা লম্বা, পোর্তুগালের তাস ছিল আজকালকার তাসের মতো চওড়ায় কম, লম্বায় বেশী।

———

॥ উড়ন্ত চাকি (flying saucer) কি ? ॥

উড়ন্ত চাকি এক ধরনের অচেনা উড়ন্ত বস্তু—unidentified flying object (সংক্ষেপে UFO—উফো). রোমান ইতিহাসবেত্তা লিবি (Livy) বলেন, ২১৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উড়ন্ত চাকি আকাশপথে ঝাঁকে ঝাঁকে ইওরোপে এসে নেমেছিল। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানাদেশের আকাশে চেপ্টা, গোলাকার বা লম্বাটে ধরনের উফোর আবির্ভাব ঘটেছে বলে শোনা যায়। অনেকে বলেন, উফো দৃষ্টিভ্রমের ফল ; আসলে উড়ন্ত চাকি বলে কিছু নেই। কিন্তু মার্কিন বিমানবাহিনীর তদন্ত কমিটি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর এগারো হাজারেরও বেশী উফোর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন যে সব না হলেও কিছু পরিমাণ উড়ন্ত চাকি সত্যি এবং রহস্যময় বস্তু। একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, বহু দূরের গ্রহান্তর থেকে উড়ন্ত চাকি পৃথিবীতে আসছে। এ কথাটাকে অসম্ভব বলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না

———

॥ ধাতুর মুদ্রার ধারে খাঁজ কাটা থাকে কেন ? ॥

সোনা ও রুপোর মুদ্রার ধারেই খাঁজ কাটা থাকে। এগুলো দামী ধাতু। পাশ থেকে ঘষে ধাতু যাতে বার করতে না পারে সেজন্য খাঁজ কাটা থাকে। ধাতু ঘষে বার করলে খাঁজ সমান হয়ে
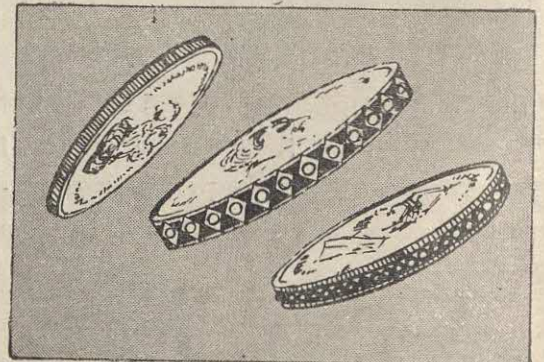
যায় ও মুদ্রা আকারে ছোট হয়ে যায়। তখন সহজেই ধরা পড়ে। তামা বা নিকেলে এরকম করা হয় না। তার কারণ, তামা বা নিকেলের মুদ্রা ঘষে ধাতু বার করে নিলে বিশেষ লাভ হয় না।

———

॥ কুকুর শোবার আগে গোল হয়ে ঘোরে কেন ? ॥

বহু কাল আগের এই অভ্যাস কুকুরদের মধ্যে রয়ে গেছে। কুকুর যখন মানুষের সঙ্গে এসে

বাস করে নি, তখন তারা বন্য ছিল, তারা জঙ্গলে ঘাসের উপর শুত। বিছানাটা নরম ও আরামের করবার জন্যে তারা কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে ঘাস মাড়িয়ে নরম করে নিত।

এর পর বহু জাতের কুকুরকে মানুষ পোষ মানিয়েছে। এখন তারা মাদুরে, কুশনে বা কাঠের বাক্সে শোয়। তবু তারা তাদের পূর্বপুরুষদের মতো শোবার আগে কয়েকবার ঘুরে তারপর শুয়ে পড়ে।

॥ সবচেয়ে দ্রুতগামী জীব কোন্‌টি ? ॥

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর ঘণ্টায় ২২ মাইল ছুটতে পারে—তাও সামান্য খানিকটা পথ। শূয়োর ঘণ্টায় ১১ মাইল ছুটতে পারে। শিকারী কুকুর ঘণ্টায় ৩৬ মাইল ছুটতে পারে, আর ঘোড়া ঘণ্টায় ৪০ মাইল ছুটতে পারে। হরিণ ঘণ্টায় ৫০ মাইল ছুটতে পারে। চিতা (চিতাবাঘ নয়) বা হান্টিং লেপার্ড শিকার ধরবার সময়ে ঘণ্টায় ৭০ মাইল ছুটতে পারত, তবে অল্প সময়ের জন্য। কৃষ্ণসার হরিণ
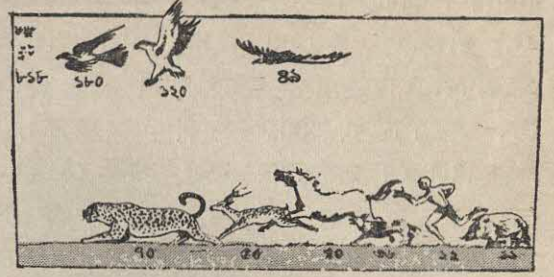
তার চাইতে কিছু কম বেগে অনেকক্ষণ দৌড়াতে পারে। কাজেই পশুদের মধ্যে সে-ই চ্যাম্পিয়ন।

জন্তুরা এর বেশী ছুটতে পারে না। কিন্তু পাখিদের ক্ষমতা এর চেয়ে অনেক বেশী। শকুন ঘণ্টায় ৪৯ মাইল উড়তে পারে। সোনালী ঈগল ঘণ্টায় ১২০ মাইল উড়তে পারে। এক রকম বাজজাতীয় পাখি ঘণ্টায় ১৬০ থেকে ১৮০ মাইল উড়ে শিকার ধরে।

কেউ কেউ হিসেব করে দেখিয়েছেন যে কয়েক জাতীয় পতঙ্গ ঘণ্টায় ৮১৮ মাইল পর্যন্ত উড়তে পারে।

॥ আকাশে কি কোন তারাশূন্য ফাঁক আছে ? ॥

আকাশের দিকে তাকালে কোন কোন জায়গায় কোন তারা দেখা যায় না। মনে হয়, এসব জায়গা বুঝি ফাঁকা। জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হার্শেল দূরবীনে এমনি সব জায়গা দেখে বলেছিলেন, "এই সব জায়গা নিশ্চয়ই ফাঁকা!" কিন্তু আজ আর সে কথা বলা যাবে না। এখানে কালো কালো

নীহারিকা তারাদের আড়াল করে বিরাজ করছে বলে এসব জায়গায় তারা দেখা যায় না। নীহারিকাগুলো গ্রহকণিকা আর গ্যাসের জমাট পুঞ্জ। এরা ধুলোর মেঘ—এরা পিছনের তারাদের আড়াল করে থাকে।

আমরা যে ছায়াপথের মধ্যে আছি সেখানেও কোন জায়গা ফাঁকা নেই। সব জায়গায় এই সব নীহারিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছায়াপথের পর ছায়াপথ —মহাকাশভরা নীহারিকা, গ্রহ, তারা সব রয়েছে, কেউ দূরে, কেউ কাছে। কোথাও ফাঁকা নেই।

॥ মানুষের চোখের উপর ভুরু থাকার কি সুবিধে ? ॥

আমাদের চোখের ঠিক উপরে যে ভুরু আছে তা চোখের শোভার জন্যে নয়। এদের খুব একটা উপকারিতা রয়েছে। গরমের সময়ে আমাদের শরীরে যখন খুব ঘাম হয় তখন কপাল গড়িয়ে ঘাম এসে চোখে পড়বার সম্ভাবনা। কিন্তু ভুরু সেই ঘাম আটকে দেয়। তাই ঘামের জল চোখের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিতে পারে না। ঘামের মধ্যে অনেক ময়লা থাকে, এসব চোখের মধ্যে এসে পড়লে চোখ খারাপ হবার সম্ভাবনা। ভুরু এই ভাবে আমাদের চোখকে বাঁচায়।

॥ জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গরা কি কথা বলতে পারে ? ॥

আমরা যেমন কথা বলি তেমনি অন্য কোনো জীবজন্তু বা কীটপতঙ্গ কথা বলতে পারে না, তবে অনেকে নিজেদের পদ্ধতিতে মনের কথা জানায়। কুকুর রাগলে ডাকে, অন্য কুকুরকে বিপদ থেকে সাবধান
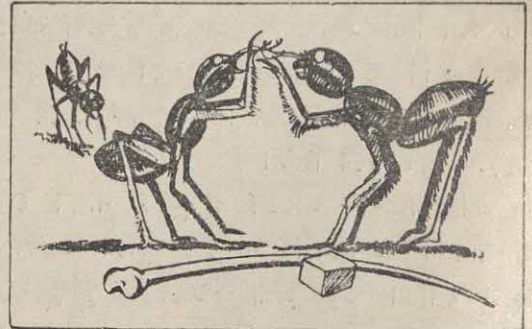
করে দেবার সময় চেঁচায়, আনন্দ প্রকাশ করতে চিৎকার করে। মা-পাখি বাচ্চাদের উড়তে শেখাবার সময় কত কি বলে তাদের উৎসাহ দেয়। বাছুর ক্ষিদে পেলে তার মাকে ডাকে। বানরদের নানা ভাষা আছে।

শূয়োরের চিৎকার, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, ভেড়ার ডাক, হাতির ডাক, গরুর হাম্বারব, গাধার চিৎকার শুনে মনে হয় ওরা যেন মনের কোন ভাব প্রকাশ করে।

ভয় পেলে চিৎকার করে সে ভাব জন্তুরা পরস্পরের মধ্যে জানিয়ে দেয়।

মৌমাছি, পিঁপড়ে, উই ইত্যাদি অনেক পতঙ্গও নিজেদের ভাব প্রকাশ করে। তা না হলে এরা এক সঙ্গে কাজ করে কি করে ? পিঁপড়েরা তাদের শুঁড়ে

শুঁড়ে জড়াজড়ি করে অন্য পিঁপড়েকে মনের কথা জানায়।

॥ বানরের কয়টা পা ? ॥

বানরের একটাও পা নেই, চারটিই হাত। এদের পিছনের হাত দুটির গড়ন পায়ের মতো

নয়, হাতের মতো। তাই ভালো বাংলায় বানরকে বলে চতুর্ভুজ।

॥ গাছ মাটি ফুঁড়ে উপর দিকে ওঠে কেন ? ॥

প্রত্যেক গাছের দুটি অংশ থাকে। একটা চায় আলো-বাতাস আর একটা চায় মাটির অন্ধকার ও মাধ্যাকর্ষণের টান। যে অংশ আলোর দিকে যাবে তাকে মাটি ফুঁড়ে মাথা তুলতেই হবে।

বীজটাকে উলটো করে পুঁতে দেখা গেছে যে তার যে অংশ আলো ও বাতাস চায় তা বেঁকে ঘুরে
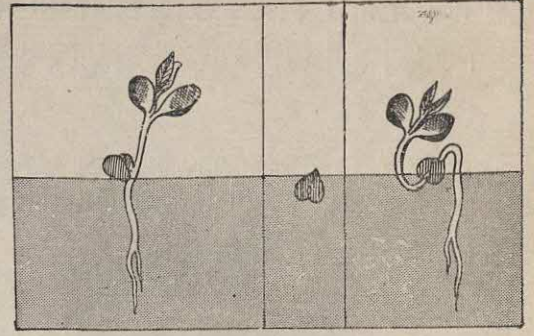
ওঠে আর শিকড়ের অংশটা মাটির দিকে আপনা থেকেই নেমে যায়।

॥ সকালে আমাদের ঘুম ভেঙে যায় কেন ? ॥

সারারাত আমরা একই ভাবে ঘুমাই না—সারারাতের ঘুমটা একই রকম গভীর হয় না।
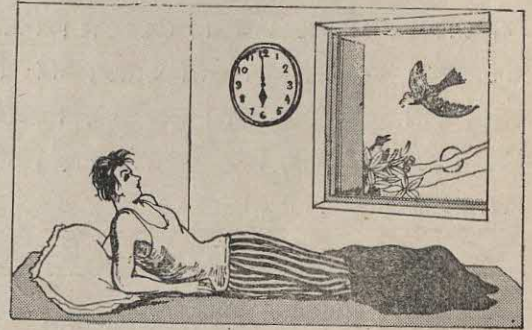
প্রথমে আমরা খুব গভীরভাবে ঘুমাই—সে ঘুম আমাদের শরীরকে সুস্থ করে। ইংরেজীতে এই প্রথম রাতের গভীর ঘুমকে বলে beauty sleep.

কিন্তু এই গাঢ় ঘুমের পর ক্রমশঃ আমাদের ঘুম পাতলা হয়ে যায়। গাঢ় ঘুমের সময়ে জোরে শব্দ হলেও আমাদের ঘুম ভাঙে না, কিন্তু পাতলা ঘুমের সময়ে সামান্য আলো, সামান্য শব্দ ইত্যাদিতে আমাদের স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আমরা জেগে উঠি। এছাড়া সকালে ওঠার অভ্যাসও আমাদের ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেয়।

॥ একটা প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ি জলে ভাসে, কিন্তু একটা ছোট্ট নুড়ি জলে ডুবে যায় কেন ? ॥

এর সোজাসুজি উত্তর--কাঠ যে জলের তুলনায় হালকা! কিন্তু কাঠের গুঁড়িটা তো হালকা নয়, নুড়িটার চাইতে ঢের বেশী ভারী। তবে ?
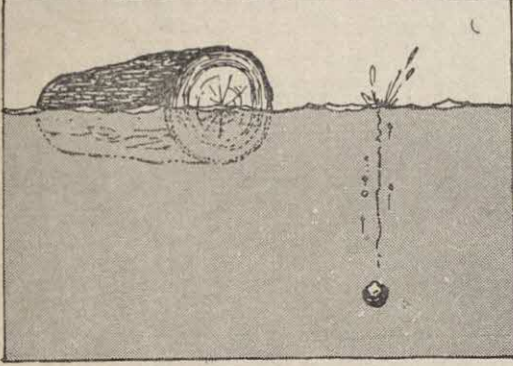
এর ঠিক উত্তর তাই হচ্ছে এই যে, কোন জিনিসের সমান আকারের জলের চেয়ে সেই জিনিসটা যদি ওজনে কম হয়, তবে সেটা ভাসবে, আর যদি ওজনে বেশী হয়, তবে সেটা ডুবে যাবে। তাই, ছুঁচটিও জলে ডুবে যায়, কিন্তু ইস্পাতে-মোড়া বিরাট জাহাজও জলে ভাসে।

॥ খাদ্য ছাড়া কি কোন জীব দীর্ঘকাল বাঁচতে পারে ? ॥

একজাতীয় মাকড়সা আছে, তারা দীর্ঘকাল খাদ্য না খেয়ে বাঁচতে পারে। এ মাকড়সা জলে থাকে। এর নাম জলভালুক।

এরা ভিজে আবহাওয়ায় থাকে, কিন্তু বাতাস শুকনো হলে এরা শুকিয়ে যায়। এরা তখন নড়াচড়া করতে পারে না। এদের শরীর তখন গুটিয়ে একটা শুকনো বীজের মতো হয়ে যায়। এই অবস্থায় এরা মড়ার মতো অনেক বছর পড়ে থাকে। জলে এনে রাখলে এরা জল শুষে ক্রমশঃ পাগুলো ছড়িয়ে দেয়, তারপর নড়াচড়া করে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে
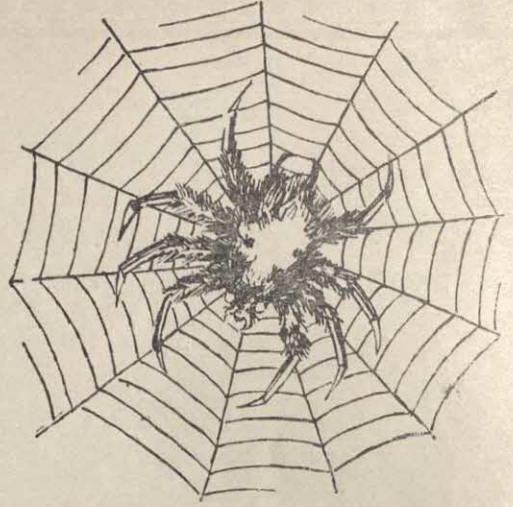
এরা চটপটে হয়ে ওঠে আর পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে যায়।

কয়েক রকম শামুকও অনেক বছর খাদ্য ছাড়াই মড়ার মতো পড়ে থাকতে পারে।

॥ ক্লিপার শিপ (clipper ship) কাকে বলে ? ॥

ক্লিপার শিপ (clipper ship) ছিল একরকম অতি দ্রুতগামী পালের জাহাজ। এদের সম্মুখভাগটা ছিল লম্বা ও সরু—আর জলের কাছাকাছি নীচু হয়ে সামনে ঝুঁকে এরা চলত। এদের মাস্তুলগুলো খুব লম্বা ও উঁচু হত ; তাতে এমন কি ১৩,০০০ বর্গফুট পর্যন্ত পাল খাটানো থাকতো। এতে করে প্রধানতঃ চীনদেশের চা ইংলণ্ডে ও যুক্তরাষ্ট্রে চালান হত।

বছর কুড়ি এই ক্লিপার জাহাজ ছিল জলপথের রাজা। নিউইয়র্কে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্লিপার জাহাজ জলে ভাসানো হয়েছিল—তার নাম ছিল হেলেনা। এটা লম্বায় ১৩৫ ফুট আর তার পাটাতনের সব চেয়ে চওড়া অংশটা (beam) ছিল ৩০ ফুট ৬ ইঞ্চি। প্রথমে এ জাহাজের নিউইয়র্ক থেকে ক্যাণ্টন পৌঁছুতে প্রায় ছ মাস লাগত।

শেষ পর্যন্ত ক্লিপার জাহাজ ৩১৪ ফুট লম্বা করে তৈরী হল আর তার মাঝখানটার চওড়া বাড়িয়ে

করা হল ৪৯ ফুট। জাহাজের গতিও নানা উপায়ে বাড়ানো হতে লাগল।

বাষ্পশক্তি আর ইস্পাত আবিষ্কারের ফলে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দেই কাঠের জাহাজে বাষ্পীয় এঞ্জিন বসানো হল। তারপর কাঠের জাহাজের বদলে তৈরী হল ইস্পাতের জাহাজ। কাঠের তৈরী পালতোলা জাহাজের দিন ফুরিয়ে গেল।

॥ গরুর শিং ও হরিণের শিঙের তফাত কি ? ॥

গরুর খুর যে বস্তুতে তৈরী, গরুর শিং তাই দিয়ে তৈরী। এগুলি চামড়ার বাইরের ত্বকের শক্ত অংশ। গরুর মাথার খুলি থেকে একরকম হাড় সৃষ্টি হয়ে শিং গজায়। গরু যতদিন বাঁচে ততদিন পর্যন্ত এ শিং থাকে। গরু মারা গেলে এই শিংগুলো খুলে নেওয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় গরুরই শিং থাকে।

হরিণের শিং কিন্তু সত্যিকারের হাড়। এ শিং

খসে যায় আবার গজায়। স্ত্রী-হরিণের শিং গজায় না। কেবল ক্যারিবো ও বল্‌গা হরিণের স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতেরই শিং গজায়। শীত শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য হরিণের শিং খসে পড়ে। শিঙের গোড়ায় যে অংশ মাথা থেকে বেরোয় সেখানে দুটো নীচু গর্ত হয়। পরে তা ভরে ওঠে ও নরম শিং বেরুতে শুরু করে। পরে তা ক্রমশঃ শক্ত হয়ে যায়।

॥ উটের একটা কুঁজ থাকে, না দুটো ? ॥

উট বিরাট আকৃতির। এদের পাগুলো খুব লম্বা। এদের পায়ের তলায়, বুকে ও পায়ের গাঁটে পুঁটুলির মতো থাকে। বালির কণা লেগে যাতে কেটে না যায় সেজন্যে প্রকৃতি এরকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বালির উপর হাঁটু গেড়ে বসলেও বুকের তলার আর হাঁটুর উপরের মাংসের পুঁটুলি এদের আঘাত থেকে বাঁচায়। এদের চোখের পাতার লোম লম্বা—এর

ফলে সূর্যকিরণ থেকে, আর ঝড়ের সময় বালি এসে পড়া থেকে এদের চোখ রক্ষা পায়। এদের উপরের ঠোঁট কাটা আর নাকের ফুটো কাত-করা। যখন বালির ঝড় বয় তখন এরা নাকের ফুটো বন্ধ করে রাখতে পারে। উটের অনুভব-শক্তি খুব তীক্ষ্ণ। কোথায় জল পাওয়া যাবে তা এরা অনেক দূর থেকেই টের পায়।

উট দু'জাতের আছে। এক জাতের উটের একটা কুঁজ থাকে। এদের আরবীয় উট বলে। উত্তর ও পুব আফ্রিকা, আরব, এশিয়া মাইনরের মরুভূমিতে ও উত্তর ভারত, মঙ্গোলিয়া আর মধ্য এশিয়ায় এদের দেখতে পাওয়া যায়।

আর, ব্যাকট্রিয়ান (Bactrian) উটের দুটো কুঁজ থাকে। আরবীয় উটের চেয়েও এদের শরীর বড়। ব্যাকট্রিয়ান উটের পা শক্ত। এরা মরুভূমিতে বাস করে না। উত্তর ও পুব এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চল, চীনদেশ, সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও ভারতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। উট খুব দ্রুত হাঁটতে পারে। বাহন হিসেবে এদের ব্যবহার করা হয়। দিনে একশ মাইল পর্যন্ত এরা ভ্রমণ করতে পারে।

॥ কোন্ অর্গ্যানবাদক পরবর্তী জীবনে জ্যোতির্বিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন? ॥

স্যার উইলিয়াম হার্শেলি (১৭৯২—১৮৭১ খ্রীঃ) অর্গ্যানবাদকের চাকরি নিয়ে ইংলণ্ডে আসেন। অবসর সময়ে আকাশের তারা দেখা ছিল তাঁর স্বভাব। একটা দূরবীন নিজেই তৈরি করে তিনি সারারাত তারা দেখতেন। ক্রমে তিনি নামকরা জ্যোতির্বিদ হয়ে ওঠেন। তিনি ৫,০০০ গ্রহ, উপগ্রহ, তারা

ইত্যাদির বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন। এর নাম দেন তিনি জর্জিয়ান সিডাস্ (Georgian Sidus). তখনকার রাজা তৃতীয় জর্জের নামে গ্রহটির নাম দেওয়া হয়। কিন্তু সে নামটি চলল না। এ ছাড়া শনি গ্রহের চারধারের দুটি বলয়ের আবিষ্কারও তিনি করেছিলেন।

॥ সবচেয়ে বড় হীরক কোন্‌টি? ॥

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী ট্রান্সভালের
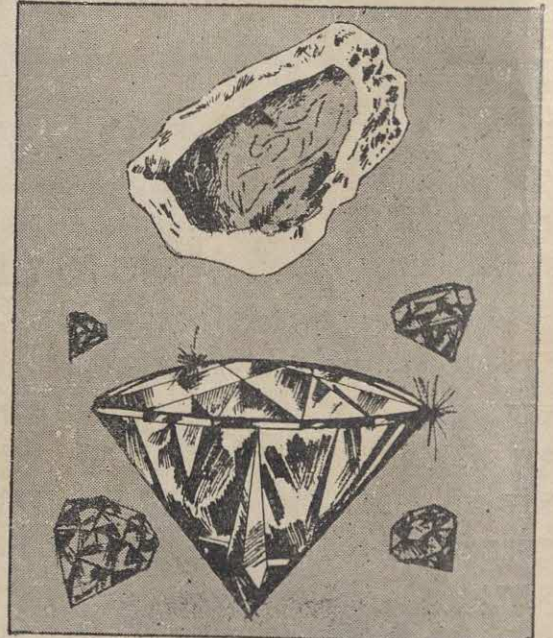
উগান্ডা দেশের গরু

ছবিতে সাধারণ জ্ঞানঃ

[উগান্ডা দেশের গরু।]

উগান্ডা (Uganda) পূর্ব-মধ্য আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে নীল নদ বয়ে গেছে। নীল নদের দুধারের জমি উর্বর। মাইলের পর মাইলব্যাপী ফসলের ক্ষেত।

এই রাষ্ট্রে এক বিচিত্র ধরনের গরু দেখা যায়। গরুর প্রকাণ্ড দুটো শিং আছে। এত লম্বা শিংওয়ালা গরু উগান্ডা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। ছবিতে তিনটে এই ধরনের গরুকে দেখা যাচ্ছে। লম্বা ঘাসের মাঠে তারা দাঁড়িয়ে আছে।

এই গরুর শিংগুলো ফাঁপা। শিং-এর জন্যে এদের ভয়ংকর দেখালেও এরা মোটেই হিংস্র নয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটা লোক বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। শিংওয়ালা গরুর ভয়ে সে বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। আশপাশের জঙ্গলে সিংহের বাস। সিংহ এসে গরুদের আক্রমণ করতে পারে। সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে লোকটি বর্শা নিয়ে গরুদের পাহারা দিচ্ছে।

এই সব গরুর মালিকেরা সাধারণ লোক-দের কাছ থেকে খুব সম্মান পায়। সমাজে এদের খুব প্রতিপত্তি।

প্রিমিয়ার খনিতে এক মহামূল্যবান্ বিরাট হীরা পাওয়া যায়। জমির মালিক টি. কুলিনান (Cullinan)-এর নামে এর নাম হয় কুলিনান হীরক। এই হীরকের ওজন ছিল ১৳ পাউণ্ড (অর্থাৎ ৩,১০৬ ক্যারাট)। ট্রান্সভাল সরকার সেটা ১,৫০,০০০ পাউণ্ড দিয়ে কিনে নিলেন; আর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সেটা ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডকে উপহার দিলেন। আমস্টারডামের হীরক-কাটা মিস্ত্রী সেটাকে চারটি বড় এবং কয়েকটি ছোট ছোট টুকরোয় কেটে ফেললেন। এর থেকে ডিমের আকারের একটা সবচেয়ে বড় টুকরোর ওজন দাঁড়াল ৫৩০·২ ক্যারাট। ইংরেজ রাজার রাজদণ্ডের মাথায় সেটিকে বসানো হয়েছে। বাকী তিনটির ওজন হল ৩১৭·৪, ৯৪·৪৫ ও ৬৩·৬৫ ক্যারাট। আসল কুলিনান হীরকের চেয়ে বড় হীরক আর কখনও পাওয়া যায় নি।

॥ ট্রয়ের ঘোড়া কি? ॥

মহাকবি হোমারের গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াডে আছে ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী। দশ বছর যুদ্ধ করেও গ্রীক সৈন্যরা যখন ট্রয় শহরে ঢুকতে পারল না, তখন ইথাকার রাজা গ্রীকবীর ইউলিসিস বা অডিসিউস এক ফন্দি করলেন। একটি বিরাট কাঠের ঘোড়া তৈরি করান হল এবং তার

পেটের মধ্যে ১০০ জন বাছাই গ্রীক সৈন্য লুকিয়ে রইল। বাকী গ্রীকেরা জাহাজে উঠে চলে গেল, যেন তারা চলেই যাচ্ছে। তখন ট্রয়ের লোকেরা গেট খুলে সেই ঘোড়াটাকে ট্রয় শহরের ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। গভীর রাতে ঘোড়াটার পেটের ভিতর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে গ্রীক সৈন্যরা ট্রয় শহরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর, তারা ট্রয় শহরের দরজা খুলে দিয়ে, তা দিয়ে বাইরে লুকিয়ে থাকা গ্রীক সৈন্যদের শহরে ঢুকতে দেয়।

॥ 'লুপিং দি লুপ' মানে কি? ॥

'লুপ' (loop) মানে ফাঁস, বাংলা ৪-এর আকারের।
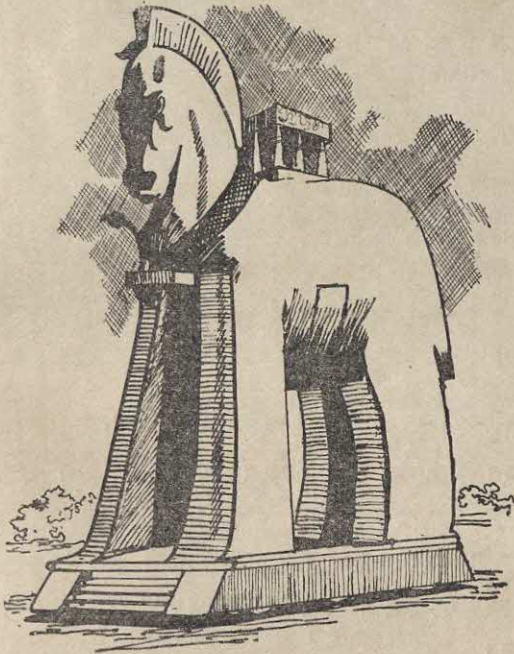
দার্জিলিং রেলপথে এমনি লুপ আছে। লুপ-লাইনে চলবার সময়ে যাত্রীদের চক্রাকারে ঘুরতে হয়। সাইকেল-চালক যখন উপর থেকে নীচে গড়ানো এই রকম ৪-এর পথে আসা-যাওয়া করে তখন তাকে বলে 'লুপিং দি লুপ'। এরোপ্লেনেও এমনি কৌশল দেখানো হয়। আবার প্যারাসুট নিয়ে কোন বৈমানিক শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে এমনি ৪-এর আকারে ঘুরপাক খেয়ে খেলা দেখালে তাকেও বলে 'লুপিং দি লুপ'।

॥ বয়স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তক কে ? ॥

বয়স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তক রবার্ট স্টিফেনসন স্মাইথ Robert Stephenson Smyth (Baden-Powell) ব্যাডেন-পাওয়েল (১৮৫৭—১৯৪১ খ্রীঃ)।

তিনি ভারতে ও আফগানিস্তানে সামরিক বিভাগে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি গুপ্তচরের কাজ করেন। তিনি এমন ছদ্মবেশে কাজ করতেন যে তাঁকে ধরা অসম্ভব ছিল। একবার রাশিয়ায় একটুর জন্যে তিনি ধরা পড়তে পড়তে রক্ষা পান।

অবসর গ্রহণ করে ইংলণ্ডে ফিরে এসে ব্যাডেন-পাওয়েল ক্রমশঃ বয়স্কাউট আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দল গড়ে তুললেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে 'লর্ড' উপাধি এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে 'অর্ডার অব মেরিট' উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাডেন-পাওয়েল মারা যান। তখন বয়স্কাউট আন্দোলন জগদ্‌ব্যাপী হয়ে উঠেছে।

॥ সামোভার কাকে বলে ? ॥

সামোভার (Samovar) চা তৈরি করবার একরকম কেটলি। এর তলায় কয়লা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে চা তৈরি করা যায়। তলা দিয়ে ছাই ঝেড়ে ফেলবার একটা গর্ত থাকে এতে। গোল, লম্বা, চৌকোনো, পিপের আকারের নানারকম
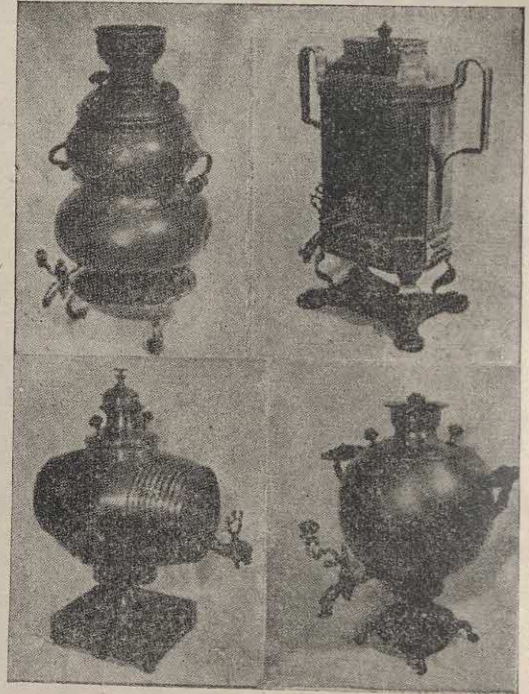
কারুকার্য-করা সামোভার সারা রাশিয়ায় ব্যবহার হয়। উপরের ঢাকনা খুলে চা, চিনি ও জল ভিতরে দিলে নীচের আগুনের আঁচে চা তৈরী হয়ে থাকে। একটা কলের মুখ তাতে লাগানো থাকে। সেটা খুলে ইচ্ছেমতো চায়ের কাপে চা ঢেলে নেওয়া হয়।

আজকাল বিদ্যুতের সাহায্যে সামোভারে চা তৈরি করা যায়।

রাশিয়াতেই সামোভারের প্রচলন খুব বেশী।

॥ যীশুখ্রীষ্ট কবে জন্মগ্রহণ করেন? কত বৎসর বয়সে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়? খ্রীষ্টমাস উৎসব কবে শুরু হয়েছিল? ॥

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম থেকে খ্রীষ্টাব্দের হিসেব গণনা করা শুরু হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর তিনশো বছর পরে।

সেই হিসেব ধরলে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম সাল ১ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু পরে পণ্ডিতরা হিসেব করে দেখেছেন যে যীশু ১ খ্রীষ্টাব্দের চার বছর আগে জন্মেছিলেন। কাজেই যীশুখ্রীষ্টের জন্ম সাল ৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। মজা করে বলা হয় যে তিনি জন্মেছিলেন তাঁর জন্মের চার বছর আগে।

যীশু ২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩৩ বছর বয়সে ক্রুশবিদ্ধ হন।

খ্রীষ্টমাসের উৎসব এখন ২৫শে ডিসেম্বর পালিত হয়। কিন্তু এই উৎসব প্রথম শুরু হয়েছিল মে মাসে। খ্রীষ্টের জন্মের ২০০ বছর পরে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ২০শে মে এই উৎসবের প্রথম প্রবর্তন হয়। পরে দিন বদল করে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এপ্রিল মাসে। তারপরে জানুয়ারী মাসের ৬ই। শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টের মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে এই উৎসবের দিন ধার্য হয় ২৫শে ডিসেম্বর। সেই থেকে ঐ তারিখেই খ্রীষ্টমাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

॥ শিলাবৃষ্টির শিলা কি? ॥

শিলাবৃষ্টির সময়ে যে শিলা পড়ে, তা আসলে

জমাট-বাঁধা বৃষ্টির ফোঁটা। প্রাকৃতিক কারণে কোন কোন সময়ে বৃষ্টির জলের ফোঁটা আকাশের অনেক উঁচুতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যায়। সেই জমাট-বাঁধা বরফই শিলা।

॥ ভাষা ও চিন্তা ॥

মনের ভাব অন্যকে বুঝিয়ে বলার জন্যে আমরা যে-সব শব্দ পর পর উচ্চারণ করে থাকি, তার নাম ভাষা। ভাষার দ্বারা মনের ভাব অন্যকে জানিয়ে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর হতে সমর্থ হয়েছে। ভাষার ব্যবহার মানুষকে চিন্তা করার ক্ষমতা এনে দিয়েছে।

কিন্তু শুধু ভাষা থাকলেই তো হল না। শুধুমাত্র ভাষার সাহায্যে বড়জোর কাকেও মনের ভাব বোঝানো যেতে পারে, কিন্তু যে সমস্ত জরুরী কথা বা ঘটনা, অনেকদিন ধরে মনে রাখার প্রয়োজন অথবা যে সমস্ত কথা বা বিবরণ কাছে না গিয়েও কাউকে জানাবার মতো দরকারী সে সবের জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। লিপি বা অক্ষরমালা এরকম একটা কাজ করার জন্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লিপি বা অক্ষর মনের ভাব প্রকাশের সংকেত।

॥ লিপি বা অক্ষরমালার সৃষ্টি ॥

একেবারে গোড়ার দিকে বন্য ও বর্বর মানুষ ছবি বা চিহ্নের ব্যবহার করে নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে ধরে রাখার চেষ্টায় আস্তে আস্তে সফল হয়েছে। প্রাচীন প্রস্তরযুগের শেষ দিকে মানুষ পাহাড়ের গুহায় ছবি আঁকতে আরম্ভ করে। প্রথম দিকে এতে কেবলমাত্র আঁকিবুঁকি বা রঙ মাখানো হাতের দাগের ব্যবহার হত। ক্রমশঃ মানুষ চারপাশের প্রাণীদের ভালোভাবে দেখতে শিখল। যুদ্ধ করে তারা এই সব প্রাণীর হিংস্র আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করত অথবা তাদের শিকার করে তারা খাবার সংগ্রহ করত। অনুমান করা যেতে পারে যে, ছবি বা প্রতিকৃতি এঁকে, তারা হয়তো ভাবত, এর ফলে তাদের ঐ সব জন্তু ধরতে বা শিকার করতে সুবিধে হবে।

বেশ কয়েক হাজার বছর চলে যাবার পর, মানুষ আরও একটু সভ্য হল এবং পাহাড় বা পাথরের গায়ে আর এক ধরনের ছবি দেখা গেল। এইসব ছবির মধ্য দিয়ে কোন কিছু বুঝিয়ে বা গুছিয়ে বোঝানোর ক্ষমতাটি ক্রমশঃ ফুটে উঠতে লাগল। এর আগের ছবি ছিল একটা প্রাণী বা জানোয়ার নিয়ে কিন্তু পরবর্তী কালের ছবিতে দেখা গেল একাধিক মানুষকে নিয়ে গড়ে তোলা সুন্দর সুন্দর ছবি। কোনটাতে দেখানো হচ্ছে মধু সংগ্রহ করার কাজ, কোথাও দেখানো হচ্ছে যুদ্ধের দৃশ্য অথবা একজোটে নাচের দৃশ্য ইত্যাদি।

পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার পূর্ব কোণে অর্থাৎ বর্তমানকালের ইরাক দেশ ও মিশর দেশেই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো লিপিমালার জন্ম হয়।
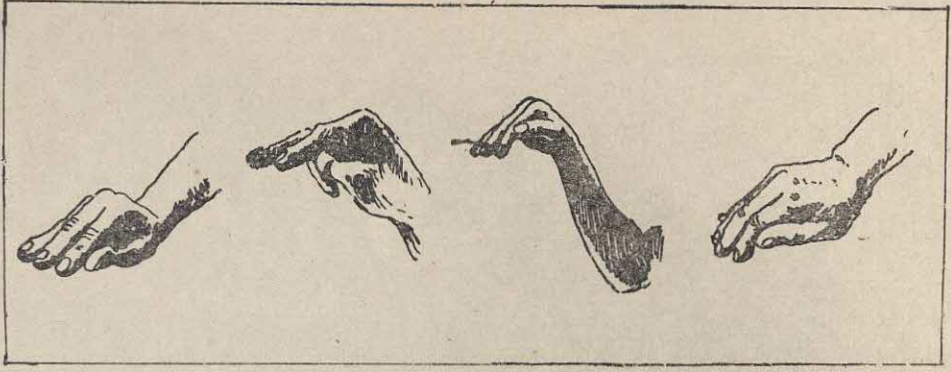
হাতের নানারকম ভঙ্গীর দ্বারা মনের কথা বোঝানো

॥ চিত্রলিপি ॥

মিশরীয় ও সুমেরীয় লিপির ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, একেবারে প্রথম স্তরে ব্যবহৃত হয়েছিল সত্যিকারের জিনিস বা প্রাণীর সঙ্গে মিল-থাকা ছবির সারি। এইজন্যে এ সমস্তকে আমরা চিত্রলিপি (hieroglyphics) নাম দিতে পারি। অনেকদিন ধরে এই চিত্রলিপি ব্যবহার করার পর ক্রমাগত সংক্ষিপ্ত আকার নিতে নিতে সেগুলি কতকগুলি চিহ্নের রূপ ধরে।

মিশরীয় লিপি মিশরের সমাধি-সৌধ পিরামিড এবং পাহাড়ের মধ্যে সমাধি-গৃহ প্রভৃতির দেওয়ালে, প্যাপাইরাসের গুটানো বইয়ে এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের গায়ে দেখা গেছে।

॥ কিউনিফর্ম ॥

ইরাক দেশের সুমের (Sumer) অঞ্চলের লিপিও প্রধানতঃ মিশরীয় লিপিমালার মতো ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বদলে কয়েকটি চিহ্নের রূপ গ্রহণ করে। এ অঞ্চলের লিপির নাম 'কিউনিফর্ম' বা কীলক লিপি। কীলক মানে 'গোঁজ'। এই অক্ষরগুলোর চেহারার সঙ্গে কাঠের গোঁজের মিল আছে। কাদামাটির টালিতে নরম অবস্থায় কোন তীক্ষ্ণ শলাকা দিয়ে এই লিপি লেখা হত। পুরোনো মন্দির, রাজ-প্রাসাদ ও শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এ ধরনের হাজার হাজার দলিল, পুঁথি বা সীলমোহরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অনেক কাল চলে যাবার পর এই 'কীলক লিপি'কে বর্তমানের তুর্কী-দেশ, সিরিয়া, আরব, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলের নানা জাতির বিভিন্ন ভাষাতে কাজে লাগানো হয়। প্রাচীন পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেই পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার লিপিমালার উৎপত্তি হয়েছিল।

॥ ফিনিশীয় লিপি ॥

অতি প্রাচীনকালে ফিনিশীয় জাতি নামে এক বণিক

পাহাড়ের গুহায় আঁকা ছবি

জাতি ভূমধ্যসাগরের তীরের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। এরা প্রতিটি উচ্চারিত শব্দের জন্যে পৃথক্ পৃথক্ চিহ্নের প্রবর্তন করে। পণ্ডিতেরা অনেকে মনে করেন যে, ফিনিশীয় লিপি থেকেই ইওরোপের বেশির ভাগ ভাষার লিপির সৃষ্টি হয়েছে। গ্রীক লিপিমালা ফিনিশীয় লিপিমালার ধারাকে ঠিক রেখে পরের যুগে অধিকাংশ পূর্ব ইওরোপীয় অর্থাৎ রুশ, য়ুক্রেনীয়, বুলগেরীয় প্রভৃতি ভাষার লিপিকে একটু একটু করে বদলে দিয়েছে। আবার এই লিপিমালা অন্যদিকে ইট্রুস্কান (Etruscan), রোমান ও পশ্চিম ইওরোপীয় নানা বর্ণমালার সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম এশিয়ায় প্রচলিত আরবীয় লিপিমালা থেকেই বর্তমানের আরব, হিব্রু প্রভৃতি বর্ণমালার সৃষ্টি হয়েছে।

কাদামাটির উপর শলাকা দিয়ে লেখা

॥ সিন্ধুসভ্যতার লিপি ॥

আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে আজ থেকে সাড়ে চার কি পাঁচ হাজার বছর আগে এক ধরনের চিত্রলিপি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম পাঞ্জাবের হরপ্পায়, সিন্ধুদেশের মহেনজোদারো ও চানহুদারো এবং বালুচিস্তানের কোন কোন অংশে, রাজস্থানের কালিবহান, গুজরাটের লোথাল প্রভৃতি স্থানে এই সময়ের বহু সীলমোহর বা মুদ্রা পাওয়া গেছে। সেগুলিতে সারি সারি এমন কতকগুলি চিহ্ন দেখা যায়, যেগুলি তখনকার লিপি বলে মনে হয়। আজও এ লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি।

দেওয়ালে মিশরীয় লিপি বাটালির ঘায়ে খোদাই করা হচ্ছে

॥ খরোষ্ঠী আর ব্রাহ্মী ॥

খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দ থেকে বেশ কয়েক শ বছর পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলে 'খরোষ্ঠী' লিপিমালা ও অবশিষ্টাংশে 'ব্রাহ্মী' লিপির প্রচলন ছিল। প্রথমটি লেখা হত দক্ষিণ থেকে বামে ও দ্বিতীয়টি বাম হতে দক্ষিণে। সম্রাট্ অশোকের বিখ্যাত শিলালেখ ও স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা লেখাগুলির মধ্যে দুটি মাত্র খরোষ্ঠী আর

মহেনজোদারোর শিলালিপি ও চিত্র

বাকী সব ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। কালক্রমে খরোষ্ঠীর প্রচলন মধ্য এশিয়ায় কিছুকাল থাকলেও ভারত থেকে তার ব্যবহার উঠে যায়। বর্ণমালার গঠনাকৃতি প্রভৃতি দেখে-শুনে মনে হয় যে, বর্তমান ভারতের বিভিন্ন দেশীয় ভাষার বর্ণমালা একাধিক ধারায় ব্রাহ্মীলিপি থেকেই এসেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বর্মী, সিংহলী, ইন্দোনেশীয়, থাইদেশীয় ও ভিয়েতনাম উপদ্বীপের ভাষার লিপি বা বর্ণমালা এবং তিব্বতীয় প্রভৃতি বর্ণমালা বিভিন্ন যুগের ভারতীয় লিপিমালা থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল।

॥ চীনালিপি ॥

পূর্ব এশিয়াতেও লিপি বা বর্ণমালার জন্মস্থান চীনদেশে। জীবজন্তুর হাড়ের উপর ধাতুর শলাকা
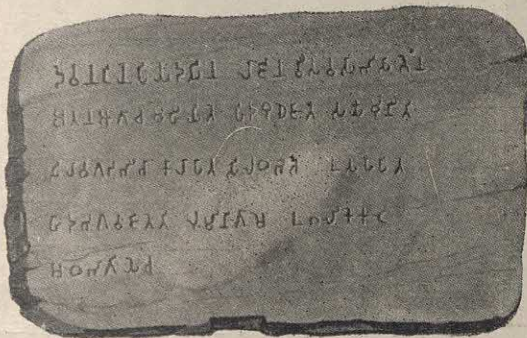
অশোকের শিলালিপি (ব্রাহ্মী অক্ষর)

চীনলিপি

গরম করে তা দিয়ে দৈববাণী লেখা হত। এই দৈববাণী লেখা হাড়ের টুকরোর নাম 'চিয়া-কু-ওয়েন'। এই সূত্র থেকেই ক্রমশঃ ধাপে ধাপে বদল হয়ে চীনা বর্ণমালার সৃষ্টি হয়।

অতি প্রাচীনকালে কচ্ছপের খোলা বা বলদের কাঁধের হাড়ের উপর লেখা এই রকম চীনালিপি শাং বংশের রাজত্বকালে ধাতুর লেখনীর সাহায্যে লেখা হত। এর কিছু পরেই চীনদেশে মিশ্রধাতুর উপরে খোদাই-করা বা ঢালাই-করা ও পাথরে খোদাই-করা লিপি দেখা যায়।

চীনদেশের বর্ণমালা প্রধানতঃ চিত্রধর্মী। ছবি দেখে লেখার এই পদ্ধতি এখনও চীনদেশে প্রচলিত। লিপি বা বর্ণমালার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে মূল চীনদেশ থেকে কোরিয়ায় ও জাপানে প্রচলিত হয় এবং কোরীয় ও জাপানী ভাষা ঐ লিপিতেই লেখা হতে থাকে।

ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধারে জেমস প্রিন্সেপ (Prinsep) বিখ্যাত হন। এছাড়া চার্লস উইলকিনস, কোলব্রুক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁদের অনুগামীরা ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন লিপি পড়বার কৌশল বার করেছেন।

॥ কাগজ তৈরি ॥

লিপি বা বর্ণমালা তো তৈরী হল। কিন্তু কিসের উপর লেখা হবে এ ভাবনাটিও কম নয়। নীল নদের

তীরে, মিশরে, অতি প্রাচীন কাল থেকে নদীর তীরে জন্মানো প্যাপাইরাস নামে এক রকম নলখাগড়ার গাছ থেকে কাগজ তৈরী হত। এ থেকে ফালি বার করে সেগুলিকে সমানভাবে কেটে একটা স্তরের পর আর একটা স্তর এইভাবে সাজিয়ে জল দিয়ে ভিজানো হত। প্যাপাইরাসের স্বাভাবিক আঠায় এগুলি পরস্পর জুড়ে গেলে সেই চাদরটিকে মসৃণ করা হত। অনেকগুলি চৌকো প্যাপাইরাসের পাত জুড়ে জুড়ে তৈরী হত একটা লম্বা একটানা পাত। এর উপরে লেখা হত আর পাতটাকে সযত্নে গুটিয়ে রাখা হত।

প্যাপাইরাসের পাতে লেখা বই মিশরের রাজাদের কবরে রেখে দেওয়া হত। এদের বলা হয় 'বুক অফ দী ডেড'। এগুলো অন্ততঃপক্ষে আড়াই-তিন হাজার বছরের পুরোনো।

প্যাপাইরাস থেকে কাগজ তৈরী হচ্ছে

কাঠের পাটায় লেখা রোমকদের লিপি

এছাড়া রোমকেরা কাঠের পাটায় মোমের প্রলেপ লাগিয়ে তার উপর ছুঁচালো লেখনী দিয়ে লিখতেন। এইসব 'কলম' বা 'কালামাস', 'স্টাইলাস' প্রভৃতি লেখনীর নাম গ্রীক-রোমকদের কাল থেকেই প্রচলিত হয়েছে।

এখন থেকে প্রায় আঠারো শ বছর আগে চীনদেশে কাগজের আবিষ্কার হয়। প্রাচীনকালে চীনে সিল্কের কাপড় প্রচুর তৈরী হত। লেখবার জন্যে সিল্কের চাদরের ব্যবহার চীনদেশের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সিল্কের এই চাদরে 'পো' লেখা হত বলে এই ধরনের পুঁথিকে 'পো-শূ' বা 'চিয়েন-শূ' বলা হত।

আমাদের দেশে এইভাবে তলায় তলায় জুড়ে কাগজ লম্বা করে তার উপরে এখনও ঠিকুজী কোষ্ঠি লেখা হয়।

॥ ভেলাম ও পার্চমেণ্ট ॥

মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়া ও ইওরোপে লেখার কাজে চামড়ার ব্যবহার বাড়তে থাকে। এই চামড়ার পাতকে 'ভেলাম' ও 'পার্চমেণ্ট' বলা হত। এর মধ্যে ভেলাম তৈরী হত বাছুরের, আর পার্চমেণ্ট তৈরী হত ভেড়া ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ও পাতলা মসৃণ চামড়া থেকে।

উইলিয়াম ক্যাক্সটনের ছাপাখানায় লোকের ভিড়।

লিপি ও মুদ্রণের কথাঃ

[উইলিয়াম ক্যাক্সটনের ছাপাখানায় লোকের ভিড়।]

জারমানির জোহান গুটেনবার্গ (Johan Gutenberg) ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন করেন।

উইলিয়াম ক্যাক্সটনের (William Caxton—১৪২২—১৪৯১ খ্রীঃ) জন্ম হয় ইংল্যাণ্ডের কেণ্টে। তাঁর নাম ইংল্যাণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের প্রসঙ্গে বিখ্যাত হয়ে আছে।

ক্যাক্সটন একবার ফ্ল্যাণ্ডার্সে বেড়াতে যান। সেখানে এক জায়গায় তিনি একটা মুদ্রাযন্ত্র দেখেন। সেই থেকে তাঁর মাথায় ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের অভিলাষ জাগে।

তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে ওয়েস্টমিনিস্টারে তাঁর নিজের ছাপাখানা নির্মাণ করেন। ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর মুদ্রাযন্ত্র থেকে প্রথম বই ছেপে বার করেন।

আজকাল সব দেশেই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। সাধারণ মুদ্রাযন্ত্র দেখলে লোকের মনে বিস্ময় জাগে না। কিন্তু ইংলণ্ডের লোক যখন শুনল, ক্যাক্সটন এমন একটা যন্ত্র বসিয়েছেন, যা থেকে কাগজ ছেপে বের হচ্ছে, তখন তা দেখবার জন্যে নানা জায়গা থেকে তাঁর ছাপাখানায় লোক আসতে লাগল।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর ছাপাখানায় দেশের বহু লোক এসে ভিড় জমিয়েছে।

তখন দামী ও শৌখিন বই এবং চিরস্থায়ী দলিলপত্র চামড়ায় লেখা হত।

চামড়ায় লেখা পুঁথির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে 'ডেড-সী স্ক্রল্‌স্‌' (Scrolls). প্যালেস্টাইনে ডেড-সী হ্রদের ধারে এক পাহাড়ের গুহায় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই পাকিয়ে-গুটানো চামড়ার রাশি পাওয়া গিয়েছিল। এগুলো আলকাতরা দিয়ে লেখা, এক-একটি ২৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা।

॥ তালপাতা, ভূর্জপত্র, তুলোট ॥

ভারতবর্ষেও নানা যুগে নানা প্রকারের লেখার সরঞ্জাম ব্যবহার করা হত। প্রাচীন কাল থেকেই দেশের বেশির ভাগ অংশেই লেখার জন্যে উত্তম তালপাতার ব্যবহার হত। তালপাতাকে সমান মাপে কেটে নিয়ে পুঁথির আকারে সাজিয়ে তবে লেখা হত। অনেক সময়ে কাঠের পাটা দিয়ে পুঁথির মলাট করা থাকত। অবশ্য পুঁথি রাখবার জন্যে নানারকমের সুন্দর কারুকার্য-করা ধাতুর আধারেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ধাতুর শলাকা দিয়ে সূক্ষ্ম রেখাঙ্কনের সাহায্যে তালপাতাতে লেখা হত। প্রাচীনকালে ভূর্জপত্র বলে আর একরকম জিনিসের ওপরেও লেখা হত। নাম শুনে পাতা বলে মনে হলেও আসলে ভূর্জপত্র ছিল একরকম বড় গাছের ছালের খোলা। এগুলি মোলায়েম আর দারুচিনির মত রঙের হত। এর ওপর কালি দিয়ে লেখা হত।

তালপাতার উপর পুঁথি লেখা হচ্ছে

তালপাতার পুঁথি

ভারতে মুসলমান আমলে, বিশেষ করে মুঘল যুগে, ভারতীয় পুঁথি পৃথিবীর শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। লেখার মধ্যে এবং বাইরে প্রতি পাতায় এত সুন্দর সুন্দর ফুলপাতা ও নকশা নানা রং-এ আঁকা হতো, যা দেখলে এখনও অবাক লাগে।

কাগজের কল যখন হয় নি, তখন হাতে-তৈরী একরকমের মোটা খসখসে নরম কাগজ হত, তার নাম তুলোট কাগজ। সেকেলে তুলোট কাগজে লেখা পুঁথি এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

॥ মলাট ও বাঁধাই ॥

আগেকার দিনের মলাট ও বাঁধাই নানা রকমের ছিল। চীনদেশে ও জাপানে বই বাঁধাইয়ের শিল্প আজও সমান উদ্যমে চলছে।

মধ্যযুগের ইওরোপে ও পশ্চিম এশিয়ার কোন কোন অংশে চামড়ার বাঁধাইয়ের খুব উন্নতি হয়। চামড়ার উপর খোদাই করে নকশা তৈরি করা, চামড়া কেটে নানা রকমের কারুকার্য করা বা চামড়ার উপর রঙীন লেখা বা অলংকার করা এবং সোনার জলের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশ ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই কাঠের মলাটে চিত্রণের কাজ চলেছিল। চামড়ায় সুন্দর চিত্রাবলী আঁকা বইয়ের মলাট মুসলমান আমলে দেখা দেয়। এছাড়া প্রাচীন তিব্বতীয় পুঁথিতে বৌদ্ধ কাহিনীর চিত্র কাঠের উপর খোদাই করা অবস্থায় দেখা যায়।

॥ বিভিন্ন রকমের ও সাইজের কাগজ ॥

আজকাল কাগজ তৈরী হয় আঁশওয়ালা জিনিসকে কুটে নিয়ে, ভিজিয়ে, পচিয়ে, তাতে দরকার মত নানা জিনিস মিশিয়ে, তার মণ্ড (pulp) তৈরি করে, তাকে পাত করে শুকিয়ে নিয়ে। আর, সেসব করা
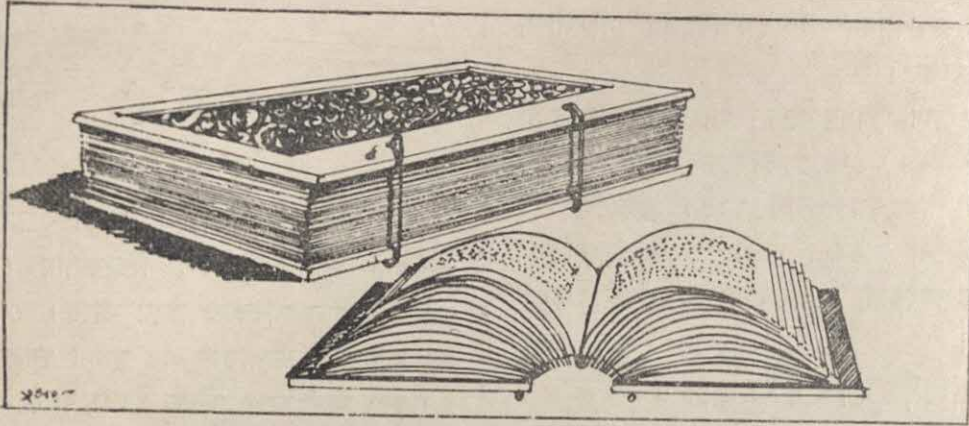
সেকালের বাঁধানো পুঁথি

হয় যন্ত্রে বা কলে। আধুনিক কালে তৈরী কাগজ নানারকমের হয়। বিভিন্ন আকারের কাগজ 'ফুলস্ক্যাপ', 'ডিমাই', 'ক্রাউন', 'রয়্যাল' প্রভৃতি ইংরেজী নামে পরিচিত। এইগুলির মাপ হচ্ছে যথাক্রমে ১৭ ইঞ্চি × ১৩½ ইঞ্চি, ২২½ ইঞ্চি × ১৭½ ইঞ্চি, ২০ ইঞ্চি × ১৫ ইঞ্চি, আর ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি। এই নামগুলিই আমাদের দেশে চলে। কাগজের প্রকৃতিও নানারকমের। কোনটার জমি অমসৃণ, কোনটা মোটা ও শক্ত, কোনটা পাতলা কিন্তু টেঁকসই, কোনটাতে শোষণক্ষমতা কম বা বেশী, আবার কোন কাগজ অতি মোলায়েম ও মসৃণ। মোলায়েম ও মসৃণ কাগজে ছবি ছাপবার সুবিধে হয়। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত তালপাতা, কাঠের ফলক, সিল্ক বা বাঁশের পাত, চামড়ার 'ভেলাম' বা 'পার্চমেন্ট' এ সমস্তকেই হার মানিয়ে দিয়েছে আজকের কলে তৈরী কাগজ।

॥ কি ভাবে বই ছাপা হয় ॥

বই কখনই আলাদা আলাদা ছোট ছোট পাতার আকারে ছাপা হয় না। ছাপার টাইপ এমনভাবে সাজানো হয় যে একটা বড় ছাপার কাগজ পাট করলে বা ভাঁজ করলে তার দুই দিকের ছাপা ঠিক পর পর থাকা বই বা পত্রিকার পাতার মতো হবে। এরকমের একটা বড় কাগজ থেকে আমরা সাধারণতঃ ষোল, আট, চার বা দু পাতায় ছাপার কাগজ পেতে পারি। এটিকে ইংরেজী ভাষায় বলা হয় 'ফর্মা' (form). বাংলায় একে আমরা এক 'ফর্মা' বলে থাকি।

ফর্মা ভাঁজা বা পাট করা হয়ে গেলে শুরু হয় বাঁধাইয়ের কাজ। পাশ থেকে গর্ত করে বই বাঁধলে তাকে বলে ফোঁড়
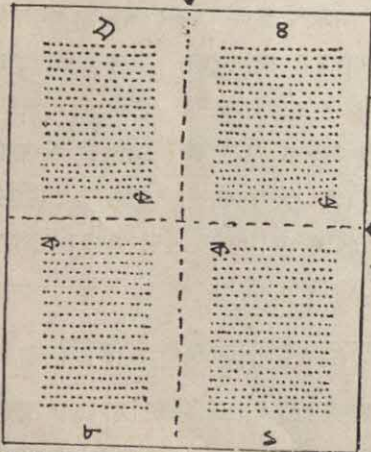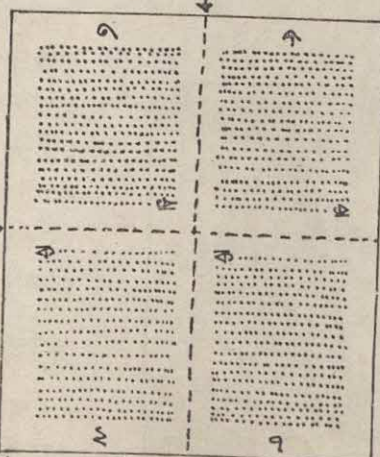
এইভাবে ছাপা কাগজ ভাঁজ করা হয়
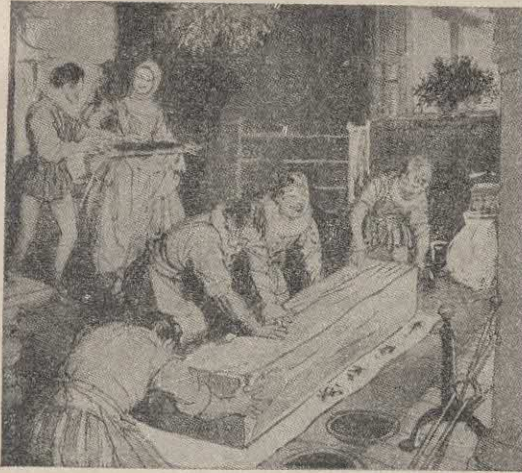
চীনেরা কাগজের উপর ছাপ তুলছে

সেলাই। ভাল বইয়ে প্রত্যেক ভাঁজ-করা ফর্মার মাঝের পাতা থেকে কয়েকটি ফোঁড় দিয়ে সুতো নিয়ে এসে যে সেলাই করা হয় তাকে বলে জুজ সেলাই।

॥ মুদ্রণের জন্মকথা ॥

চীনদেশে মুদ্রণ-পদ্ধতির সূচনা হয় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে। আন্দাজ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে চীনে পোড়ামাটির অক্ষর বা টাইপ ব্যবহার করা হত। 'রেজিন', মোম ও কাগজের ছাইয়ের মিশ্রণের একটি পাত গরম করে তাতে পোড়া-মাটির টাইপ বসিয়ে দেওয়া হত। সেটা হত ছাঁচ। তারপর এর উপর রং লাগিয়ে কাগজ চেপে ধরে তা থেকে প্রতিলিপি তুলে নিয়ে বই ছাপা হত।

অক্ষর ঢালাই

যোহান গুটেনবার্গ
(Johann Gutenberg—১৪০০-১৪৬৮)

এর পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় আলাদা আলাদা অক্ষরের টাইপ তৈরী হয়। আলাদা টাইপ প্রভৃতির ব্যবহার হলেও চীনে মুদ্রণের তেমন উন্নতি হয় নি।

ইওরোপে মুদ্রণের প্রচলনের ফলে ক্রমশঃ সারা জগতে দ্রুত মুদ্রণের সূচনা হয়।

প্রথমে, গোটা পাতা খোদাই করে সেই ছাঁচ থেকে ছাপানো হত বা এক-একটা লাইন খোদাই করে সেগুলি সাজিয়ে বই ছাপানো হত। এতে একবার ছাপানোর পর সেই সব অক্ষরে সেই বই ছাড়া অন্য বই ছাপানো সম্ভব হত না। তারপর পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুটেনবার্গই প্রথম আলাদা আলাদা অক্ষর (moveable
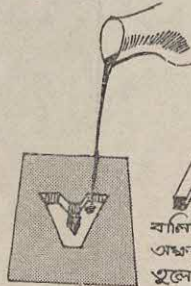
প্রথম ছাপার কল

type) সাজিয়ে ছাপার কাজ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

এইভাবে অর্ধ শতাব্দী পার হবার পর ফরাসীদেশে এঁতিয়েন দুপেঁর ও ইংলণ্ডে লর্ড স্টানহোপ ছাপার জন্য ধাতুর তৈরী লৌহ-যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে জার্মানীর স্যাক্সনীতে ফ্রিড্‌রিখ কোয়েনিগ 'ফ্ল্যাট্‌বেড্‌' মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দেই জার্মান আবিষ্কারক ওট্‌মার মারগেনথেলার-এর 'লাইনোটাইপ' যন্ত্র এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে টোলবার্ট ল্যান্সটনের 'মনোটাইপ'-যন্ত্রের ব্যবহার হলে হাতে লেখা বা আসল পাণ্ডুলিপি থেকে সরাসরি টাইপ ঢালাই করা ও ঠিকমতো সাজানোর পদ্ধতি সহজ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাষ্প-চালিত যন্ত্রের পরিবর্তে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

॥ টাইপের কথা ॥

আজকালকার ছাপার অক্ষরের টাইপ সীসা থেকে তৈরী হয়। ছাপার টাইপ এমন হওয়া দরকার যে সেটি সহজে ভাঙবে না, তাতে মরচে পড়বে না বা তা বেড়ে-কমে বিকৃত হয়ে যাবে না। কখনও কখনও সীসার সঙ্গে তামা মেশানো হয়। আগেকার দিনে হাতে তৈরী ছাঁচ কেটে ও চাপ দিয়ে টাইপ কাটা হত। এখন এ কাজটি মেসিনেই করা যায়, ঢালাইয়ের কাজও মেসিনে হয়।

॥ লাইনোটাইপ ॥

'লাইনোটাইপ' আধুনিক কালের একটি খুব উল্লেখযোগ্য টাইপ সাজানোর যন্ত্র। তাতে যান্ত্রিক উপায়ে একটা সম্পূর্ণ লাইনের টাইপ ঢালা হয়ে যায়। এর চালক টাইপরাইটারের মতো চাবিওলা একটা যন্ত্রাংশের সামনে বসে কাজ করেন। চাবি টিপলেই দরকারী টাইপগুলি একটির পর একটি ঠিক বেরিয়ে

প্রাচীনকালের ছাপাখানা
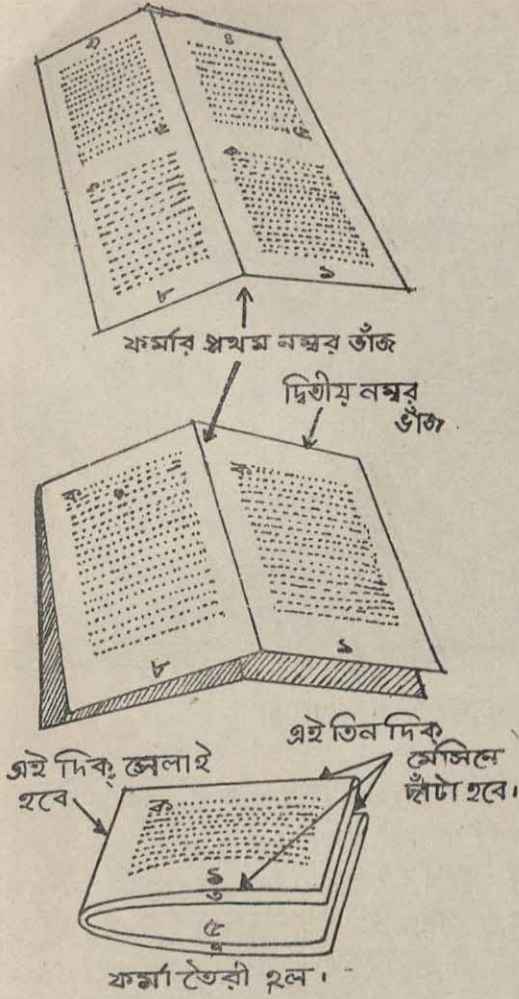
ছাপার পাতা এইভাবে ভাঁজ করা হয়

এসে এক জায়গায় পরপর জমা হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে একটা পুরো লাইনের সব টাইপ গাঁথা হয়ে গেলে সম্পূর্ণটিই আর একটি জায়গায় চলে আসে। তারপর সেখানে গলা ধাতু এসে সমস্তটিকে ঢালাই করে দেয়। এরপর টাইপকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। চালক আবার চাবি টিপে টিপে কাজ করে যেতে থাকেন।

॥ ছবি ছাপার কথা ॥

মুদ্রণের কাজ শুধুমাত্র অক্ষর ছেপেই শেষ হয়
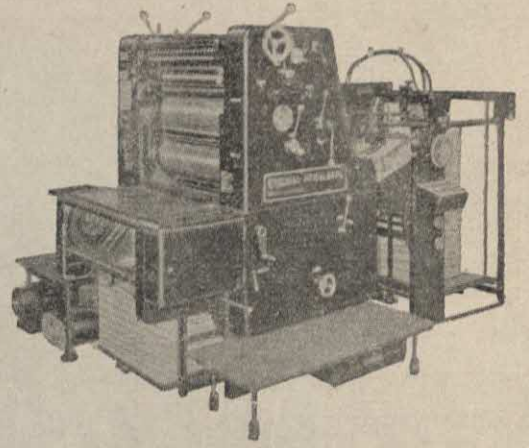
একটি আধুনিক মুদ্রণ-যন্ত্র

না। খবরের কাগজে, পুস্তিকায়, বাঁধানো ভাল বইয়ে নানাকারণে ছবি ছাপবার দরকার হয়।

ছবি ছাপবার জন্যে আধুনিক ছাপাখানায় নানা-রকম ব্যবস্থা রাখতে হয়। ছবি প্রধানতঃ দুরকম হয়—যেগুলি রেখাচিত্র বা লাইন ব্লক আর বিন্দুসমষ্টির দ্বারা তৈরী হাফটোন ব্লক।
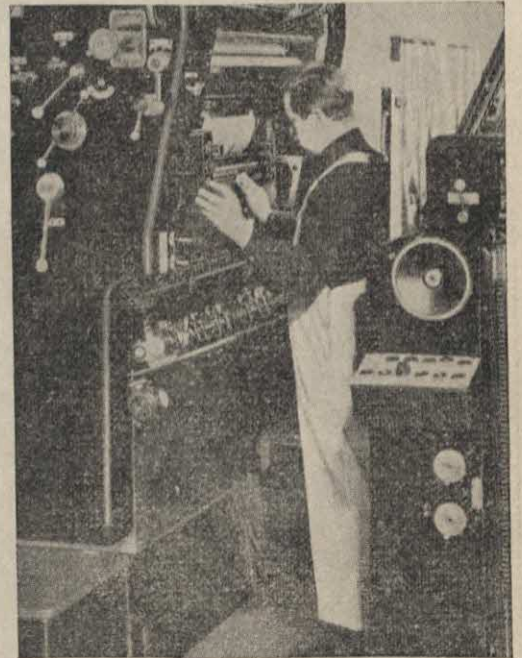
বর্তমানকালের উন্নত ধরনের মুদ্রণ-যন্ত্র

॥ ভারতে মুদ্রণের গোড়ার কথা ॥

১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি তারিখে সুরাট থেকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে লেখা একখানি চিঠি থেকে জানা যায় যে ভীমজী পারেখ নামে এক ব্যক্তি প্রাচীন হিন্দু ধর্মপুস্তক মুদ্রণের জন্যে বোম্বাইয়ে একটি ভালো ছাপার কাজ-জানা লোক পাঠিয়ে দিতে কোম্পানিকে অনুরোধ করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে মুদ্রণের সুবিধে হবে মনে করে ভীমজীর অনুরোধ রক্ষা করেন।

কেরী সাহেবের ছাপাখানা।

পোর্তুগীজ পাদরীরাই সকলের আগে তিনখানা বই বাংলা অক্ষরে ছাপিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলো এদেশে নয়—পোর্তুগালের লিসবন শহরে ছাপা হয়েছিল। এদেশে সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে ছাপা বই হচ্ছে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড (১৭৫১ খ্রীঃ—১৮৩০ খ্রীঃ) কর্তৃক ছাপা বাংলা অক্ষর, শব্দ ও বাক্য সমেত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। এটিই বাংলা ভাষায় আলাদা আলাদা অক্ষরে ছাপার প্রথম নমুনা। চার্লস উইলকিন্স এই টাইপ কাটেন ও তাঁর কাছে পঞ্চানন কর্মকার শিক্ষা নেন। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদরী উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রীঃ) সাহেবের প্রেস উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে বর্তমান ভারতে মুদ্রণ চর্চার প্রধানতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

হরফ বসাবার যন্ত্র

এর পরে ভারতের মুদ্রণের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অনেক উন্নতি হয়েছে। মুদ্রণ কার্যালয় ও মুদ্রণ পদ্ধতির ব্যবহারেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। কাগজ ও কালির অধিকাংশই আজ ভারতে তৈরী হয়। কিন্তু মুদ্রণ-যন্ত্রের ক্ষেত্রে যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ও চিত্রণের উপকরণের জন্যে আজও আমরা অন্য দেশের উপর নির্ভর করে আছি।
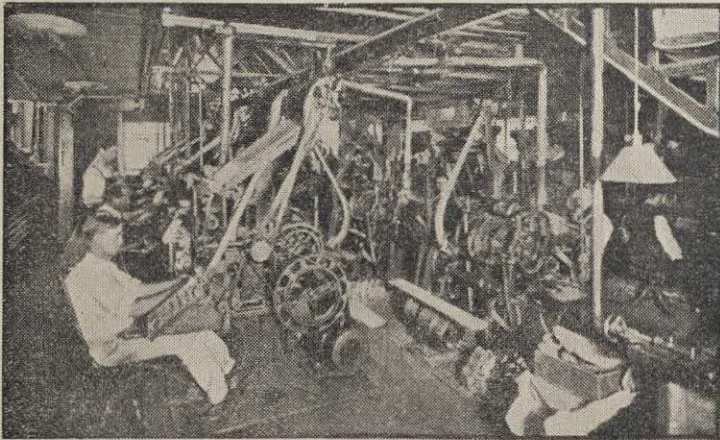
ভূগোলের কথা

॥ পৃথিবী সম্বন্ধে প্রাচীনকালের লোকের ধারণা ॥

প্রাচীনকালে সবদেশের লোকেই মনে করত যে পৃথিবী বলতে শুধু এই ডাঙাটাকে বোঝায়, আর সেই পৃথিবী সমুদ্রের জলে ভেসে রয়েছে। যেন, পৃথিবী আর সমুদ্র আলাদা জিনিস।

হিন্দুদের শাস্ত্রে আছে যে, পৃথিবী সমুদ্রের জলে তলিয়ে গিয়েছিল, ভগবান তাকে তুলে আবার জলের উপর বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমনি বসিয়ে দিলে তো আবার তলিয়ে যাবে! তাই, আর এক শাস্ত্র বলেছে যে, জলের তলায় একটি বিরাট কচ্ছপ এই পৃথিবীকে পিঠে নিয়ে ভাসিয়ে রেখেছে।
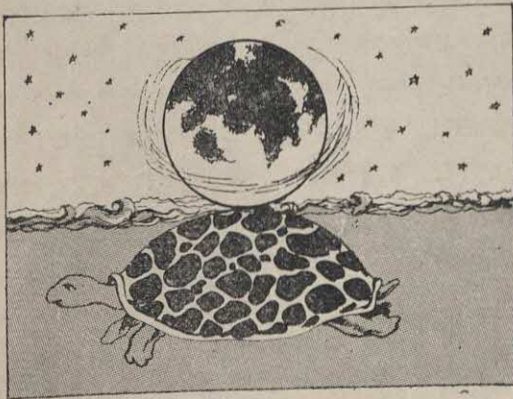
একটি বিরাট কচ্ছপের পিঠে পৃথিবীর কল্পিত ছবি

আবার, আর এক শাস্ত্রের মতে সাপেদের রাজা বাসুকি তাঁর সহস্র ফণার উপর এই পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন। তিনি মধ্যে মধ্যে মাথা বদল করেন, তখন ভূমিকম্প হয়।

কিন্তু এখন আমরা জেনেছি যে, ডাঙা, সমুদ্র আর তাদের উপরের হাওয়া—এই তিন নিয়ে পৃথিবী। আর, সেই পৃথিবী ভেসে আছে মহাকাশে, জলের মধ্যেও নয়, হাওয়ার মধ্যেও নয়, একেবারে ফাঁকার মধ্যে। আর, কোনও সাপও নয়, কচ্ছপও নয়—সূর্যের প্রচণ্ড টানই তাকে শূন্যে ধরে রেখেছে।

তাহলে পৃথিবী মহাকাশে একটা অতি বড় রকেটের মতো, আর, মানুষ জীবজন্তু সবাই মহাকাশের যাত্রী হয়ে তাতে চেপে বসে আছে। মানুষের তৈরী রকেটে চড়বার কত ঝামেলা! কিন্তু এই স্বাভাবিক রকেট-খানায় এত রকম ভাল ভাল ব্যবস্থা রয়েছে যে, আমরা মহাকাশে বেড়াবার অসুবিধে কিছুই টের পাই না।

প্রাচীনকালে লোকদের আর একটা ভুল ধারণা ছিল যে, পৃথিবী থালার মতো চেপটা আর গোলাকার—কাজেই, পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গেলেই পৃথিবীর বাইরে নীচে পড়ে যাবার ভয় আছে। অবশ্য, দু'চার জন পণ্ডিত বলতেন যে, পৃথিবী চেপটা নয়, একটা কমলালেবুর মতো গোল। গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস (Pythagoras, জন্ম ৫৮২ খ্রীঃ পূঃ) আড়াই হাজার বছর

আগে সর্বপ্রথম এ কথা বলেন। আমাদের দেশে পণ্ডিত আর্যভট, বরাহমিহির আর ভাস্করাচার্যও হিসেব করে তাই বলে গিয়েছেন। পাঁচ শ' বছর আগে ইওরোপের বিজ্ঞানী কোপার্নিকাসও বলেছিলেন যে পৃথিবী হলো বলের মতো। কিন্তু সে সব কথা তখন কেউ শুনল না, কেউ মানল না।

॥ ম্যাগেলানের সমুদ্র-যাত্রা ॥

শেষে ১৫২০ খ্রীস্টাব্দে ম্যাগেলান (Ferdinand Magellan, ১৪৭০-১৫৩১ খ্রীঃ) নামে একজন সাহসী লোক পর্তুগাল দেশ থেকে রওনা হয়ে জাহাজে চড়ে বরাবর পশ্চিমমুখে যেতে লাগলেন। পৃথিবী চেপটা হলে তাঁর জাহাজ পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে যেত। কিন্তু সেটা বরাবর চলেও শেষে ফিরে এল পর্তুগালেই। পৃথিবী যে কমলালেবুর মতো গোল, এরপর আর সেকথা না মানবার উপায় রইল না। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানীর অঙ্ক বোঝে নি, কিন্তু এটা বুঝল।

॥ পৃথিবীর চেহারা ॥

তারপর এই সেদিন পৃথিবীর বাইরে গিয়ে রকেট থেকে পৃথিবীর ফটো তুলে নিয়ে এসে দেখা গিয়েছে যে, সত্যিই তার চেহারাখানা গোল। আগে থেকেই জানা ছিল যে তার দুই প্রান্ত একটু চাপা—কতকটা কমলালেবুর মতো। এবার দেখা গেল যে, পৃথিবীর তলার দিকটা সামান্য একটু বেশী মোটা—তবে, তফাতটা খুবই সামান্য।

ঠিক মাঝখানটায় এর বেড় হচ্ছে চল্লিশ হাজার কিলোমিটারের একটু বেশী। জল আর স্থল মিলিয়ে পৃথিবীর বুকে মোট জায়গা আছে ৫১ কোটি বর্গ-কিলোমিটারেরও বেশী।

॥ পৃথিবীর নানারকম গতি ॥

এই প্রকাণ্ড গোলাকার পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় পনেরো কোটি কিলোমিটার দূরে থেকে সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে। পুরো একবার ঘুরে আসতে এর লাগে ঠিক একটি বছর। তাই পৃথিবীর এই ঘুরে আসাটাকে বলে এর বার্ষিক গতি। এর বেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার। সে যে কী সাংঘাতিক, তা ধারণা করাও শক্ত! সবচেয়ে দ্রুতগামী রেলগাড়িও দশ মিনিটে ৩০ কিলোমিটার যেতে পারে না।

তাছাড়া, পৃথিবী ক্রমাগত লাটুর মতো পাকও খাচ্ছে। পশ্চিম থেকে পুব দিকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় আধ কিলোমিটার বেগে পুরো এক পাক খেতে তার ঠিক একদিন সময় লাগে। তাইতে আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই যে সূর্য পুব থেকে পশ্চিমে চলে যাচ্ছে। পৃথিবীর এই গতিকে বলে দৈনিক গতি—ভাল কথায়, আহ্নিক গতি।

এর উপর আবার পৃথিবীর মাথাটা সব সময় একটু কাঁপছে। একে বলে অয়নচলন—ইংরেজীতে বলে 'প্রিসেশন'। এও পৃথিবীর আর একটা গতি। এই সব গতির ফলে পৃথিবীতে দিনরাত্রি এবং শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ঋতু হয়; কোনও দেশে শীত, কোনও দেশে গরম বেশী হয়।

॥ শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল ॥

আর একটা কথা এই যে, পৃথিবী একেবারে খাড়া হয়ে নেই, তার উপরটা সামনের দিকে বেশ একটু ঝুঁকে রয়েছে। আমরা সামান্য একটু জোরে দৌড়তে গেলেই আমাদের শরীরটা একটু সামনে ঝুঁকিয়ে নি, পৃথিবীও ছুটবার সময় ঠিক তাই করছে। তাতে হয়েছে এই যে, তার উপরদিকের আধখানা আর নীচের দিকের আধখানা সূর্য থেকে সমান তাপ পায় না। একদিকের দেশগুলোতে যখন গরমকাল, অন্যদিকের দেশগুলোতে তখন শীতকাল। তাই, বৈশাখ মাসে যখন আমাদের গ্রীষ্মকাল, অস্ট্রেলিয়ায় তখন শীত। আবার, মাঘ মাসে সেখানে যখন গরম পড়ে, আমাদের দেশে তখন শীত পড়ে।

॥ চিরশীতের জায়গা ॥

অবশ্য, পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে চিরকালই শীত। সেরকম বরফ-ঢাকা জায়গা

মেরু অঞ্চলের তুষার রাজ্য

অনেক আছে। পৃথিবীর সব উঁচু পাহাড়েরই চুড়োর কাছাকাছি অনেকদূর পর্যন্ত সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। তা ছাড়া, পৃথিবীর উপর (মানে, উত্তর) আর নীচের (মানে, দক্ষিণ) দিকটাও অনেকদূর পর্যন্ত চিরতুষারে ঢাকা, সেখানে গ্রীষ্মকাল বলে কিছু বোঝবার জো নেই। এক সময়ে পৃথিবীর অনেকটা অংশই বরফে ঢেকে ছিল। তারপর সেই বরফ অনেকটাই গলে গিয়েছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর দুই প্রান্তের অনেকটা জায়গা থেকে বরফ এখনও সরে যায় নি। এ দুটো জায়গাকে মেরু-অঞ্চল বলা হয়। কেন না, পৃথিবীর দুই প্রান্তকেই বলা হয় মেরু। ওপরকার প্রান্তের একেবারে মাঝখানের বিন্দুকে বলে সুমেরু (বা উত্তর মেরু), আর নীচের প্রান্তকে বলে কুমেরু (বা দক্ষিণ মেরু)। ইংরেজীতে 'নর্থ পোল' আর 'সাউথ পোল'।

এই দুই মেরু, আর তাদের আশপাশের অঞ্চল, বড় আশ্চর্য জায়গা। পৃথিবীর আর সব জায়গারই উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম দিক আছে, কিন্তু দুই মেরুতে মোটে একটি করে দিকই আছে—চারটি দিক নেই। সুমেরুতে দাঁড়িয়ে কেউ চারদিকে তাকাতে পারবে না। যেদিকে চাইবে, সেদিকটাই দক্ষিণ, যেদিকে পা বাড়াবে সেদিকটাই দক্ষিণ। সুমেরুতে পুব পশ্চিম উত্তর নেই। তেমনি, কুমেরুতে পুব পশ্চিম তো নেই-ই, দক্ষিণও নেই, কেননা কুমেরুই পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষিণের স্থান। সেখানে শুধু উত্তর দিকই আছে। বিখ্যাত বই 'হাসিখুসি'র লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের (১৮৬৭-১৯৩৭ খ্রীঃ) লেখা ছড়ার বই হাসিরাশিতে এক মজার দেশের কথা আছে, যেখানে 'রাত্তিরেতে বেজায় রোদ, আর দিনে চাঁদের আলো!' সেই মজার দেশ কিন্তু সত্যিই আছে। মেরু অঞ্চলই সেই দেশ। সেখানে ছ'মাস ধরে সূর্যের মুখ দেখা যায় না। সেই ছ'মাসই রাত্তির। তখন শীতকাল। তারপর ছ'মাস ধরে একটানা দিনের আলো দেখা যায়। এর মধ্যে কোনও মাসে সূর্যকে আকাশে একটু উপরদিকে দেখা যায়, আবার কখনও বা দিনের পর দিন সেটা দিগন্তের ঠিক উপরেই থাকে—তার উপরেও ওঠে না, নীচে নেমে গিয়ে চোখের আড়ালও হয় না।

মেরু অঞ্চলের যে কোনও জায়গায় গেলে রাত্তিরে সূর্য ওঠার এই দৃশ্য দেখা যেতে পারে।

তুন্দ্রা অঞ্চল

ইওরোপের নরওয়ে দেশের উত্তর দিকটা সুমেরু অঞ্চলের মধ্যে পড়ে বলে সেখানে জুন মাসে রাত্তিরেও সূর্য দেখা যায়। তাই নরওয়ের আর এক নাম হয়েছে 'নিশীথ সূর্যের দেশ' (Land of the Midnight Sun). উত্তর-নরওয়ের হ্যামারফেস্ট শহরে অনেকে এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে যায়।

দুই মেরু অঞ্চলই চিরতুষারের দেশ। তবে, যে প্রান্ত থেকে মেরু অঞ্চল আরম্ভ, সেখানে খানিকটা জায়গাতে শীত যখন কম থাকে তখন বরফ গলে যায়, তাই সে-সব জায়গায় কিছু কিছু ঘাস ইত্যাদি জন্মায়, সেখানে মানুষও বাস করতে পারে। সুমেরু অঞ্চলে এরকম জায়গাকে বলা হয় 'তুন্দ্রা'।

তাহলে তুন্দ্রা অঞ্চলে বরফের তলায় মাটি আছে, বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু একেবারে উত্তর মেরু বা সুমেরুকে ঘিরে যে বরফের দেশ, সেখানে বরফের নীচে শুধুই সমুদ্রের জল। কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে বরফ-চাপা একটা ছোটখাটো মহাদেশই আছে।

॥ মহাদেশ কাকে বলে ॥

পৃথিবীজোড়া যে জলরাশি, তার নাম সমুদ্র। তার মধ্য থেকে স্থলভাগ মাথা তুলে আছে। একসঙ্গে লাগোয়া বিশাল বিশাল স্থলভাগকেই বলে মহাদেশ। যেমন,—এশিয়া, ইওরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা, অ্যাণ্টার্কটিকা আর ওশিয়ানিয়া।

॥ পৃথিবীর স্থলভাগ ॥

সমুদ্রের মাঝখানে চারিদিক জল দিয়ে ঘেরা যে সব স্থলভাগ আছে, সেগুলোকে বলে দ্বীপ। যেমন,—সিংহল, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।

এখন, সমুদ্রের জল সব জায়গায় যেমন সমান উঁচু, মানে, এক সমতলে আছে, পৃথিবীর স্থলভাগ তেমন নয়। তাতে উঁচু নীচু নানারকম জায়গাই আছে। খুব উঁচু জায়গাকে বলে পাহাড়, আর সামান্য উঁচু জায়গাকে বলে মালভূমি। এ ছাড়া আছে সমতলভূমি।

এ সবই সমুদ্রজলের চাইতে উঁচু। কিন্তু ডাঙার মধ্যেই এমন কয়েকটা জায়গা আছে যেগুলো সমুদ্রের চেয়ে অনেক নীচু। আফ্রিকায় বিশাল সাহারা আর লিবিয়া মরুভূমি, আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথ ভ্যালী এরকম নীচু জায়গা।

তবে, পৃথিবীর সবচেয়ে নীচু জায়গা হল ডেড সী নামে প্যালেস্টাইনের একটি হ্রদ—সমুদ্র থেকে সেটা প্রায় ৩৯০ মিটার নীচুতে। তার জল এত ঘন যে মানুষ তাতে ডোবে না, তার জলে মাছ বাঁচে না। তাই এর নাম ডেড সী।

ডাঙার আর সব জায়গাই সমুদ্রের চাইতে উঁচু। তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় হল আমাদের হিমালয়। তার বিশাল বুকে এমন অন্ততঃ ২৪।২৫টি শিখর আছে, যাদের উচ্চতা ২৫,০০০ ফুটের বেশী। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু হচ্ছে এভারেস্ট, তিব্বতীরা যাকে বলে চোমোলুংমা। তার উচ্চতা হল ২৯,০০২ ফুট (৮৮৬৫ মিটার)।

॥ রাধানাথ শিকদার ॥

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই তথ্য আবিষ্কার করেন একজন বাঙালী—তাঁর নাম রাধানাথ শিকদার।

রাধানাথ শিকদার

হিমালয়ের চূড়া

তিনি ভারতীয় জরিপ বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন। অফিসে বসে অঙ্ক কষে তিনি একদিন হিমালয়ের নানা চূড়ার মধ্যে একটি অজানা শিখরের উচ্চতা বের করলেন—২৯,০০২ ফুট। তিনি তখনি আনন্দে ছুটে গিয়ে তাঁর উপরওলা সাহেবকে বললেন, "স্যার, আমি আজ পৃথিবীর সব চাইতে উঁচু শিখরের কথা জানতে পেরেছি।" যখন তিনি সে-কথাটা অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দিলেন, তখন সারা পৃথিবী মেনে নিল যে এত উঁচু চূড়া আর কোথাও নেই। অথচ, নাম রাখবার বেলায় চূড়াটির নাম দেওয়া হল জরিপ বিভাগের আগেকার দিনের বড় সাহেব স্যার জর্জ এভারেস্টের নামে। আসল আবিষ্কারক রাধানাথের নাম কেউ জানল না।

এভারেস্ট কিন্তু গৌরীশঙ্কর নয়। গৌরীশঙ্কর হল হিমালয়ের অন্য একটি উঁচু চূড়া। কাঞ্চনজঙ্ঘাও আর একটি প্রসিদ্ধ উঁচু শিখর, ২৮,১৪৬ ফুট উঁচু। কিন্তু অমন সুন্দর নামটি তার আসল নাম নয়—আসল নাম হচ্ছে কাং-ছেন্‌-দ্‌জোং-গা! এটা তিব্বতী কথা, যার মানে হচ্ছে 'বরফ-চূড়া-রত্নভাণ্ডার-পাঁও'—তাই বা মন্দ কি!

॥ পৃথিবীর উঁচু পাহাড়গুলির কথা ॥

হিমালয় ছাড়া ২৫,০০০ ফুট উঁচু শিখর পৃথিবীর আর কোনও পাহাড়ে নেই। রুশ-চীন সীমান্তে প্রায় অতটা উঁচু চূড়া আছে আলটাই পাহাড়ে। ইওরোপে বিখ্যাত আল্পস পাহাড়ের সর্বোচ্চ মঁ-ব্লাঁ (Mont Blanc) শিখর মোটে ১৫,৭৮২ ফুট। আফ্রিকায় কিলিমানজারো পাহাড়ের কিবো শিখর ১৯,৭৮২ ফুট উঁচু, আর উত্তর আমেরিকার রকিজ্‌ পর্বতের চূড়া ম্যাক-কিনলী হল ২০,৪৬৪ ফুট। এশিয়ার বাইরে সবচেয়ে উঁচু চূড়া হল দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের অ্যাকোন্‌কাগুয়া শিখর—২৩,০৮৭ ফুট।

॥ নানারকমের পর্বত ॥

ডাঙার উঁচু অংশকে বলে পর্বত তার মধ্যে যেগুলোর মাথা বিস্তীর্ণ আর কতকটা সমতল, সেগুলোর নাম মালভূমি। পর্বতের আকৃতি নানা রকমের হতে পারে। কতকগুলো পর্বত খুব উঁচু আর তাদের চূড়ো এবড়ো-খেবড়ো। আবার অনেক পর্বতের গা মসৃণ আর চূড়ো দেখতে সুন্দর, সুগোল।

মঁ-ব্লাঁ

যে-সব পর্বত থেকে আগুন বেরোয় তাদের মাথা মোচার মাথার মতো আকারের। কতকগুলো পর্বত সরু ও দীর্ঘ—অনেক দূর পর্যন্ত দেয়ালের মতো উঠে গেছে আবার অনেক পর্বতে দুটো কি তিনটে উঁচু চুড়ো থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে কতকগুলো পর্বত আছে, তাদের নাম (Mesa). এগুলোর গা খাড়া উঠে গেছে আর এদের মাথাগুলো ভোঁতা ও চওড়া।

পর্বতের গোড়া থেকে অনেকটা উচ্চতা পর্যন্ত প্রায়ই বড় বড় গাছ জন্মায় ও যে পর্যন্ত গাছপালা জন্মায় তাকে ইংরেজীতে বলে timber line. এর পরে ছোট ছোট গুল্ম ও ঝোপ-ঝাড় জন্মায়। তার উপরে কোন গাছপালা জন্মায় না। কোন কোন পর্বতের উপরের অংশে শুধু লাইকেন (lichen) ছাড়া আর কোনও জাতের গাছ জন্মায় না।

যে-সব পর্বতের চুড়ো খুব উঁচু—তাদের চুড়োয় বাতাস খুব ঠাণ্ডা—সেজন্যে তাদের চুড়ো বরফে ঢাকা থাকে। আবার কোন কোন পর্বতের চুড়োয় এত তুষার জমে যে সেই তুষার মাঝে মাঝে তুষার-নদীর (glacier) আকারে নীচে গড়িয়ে নেমে আসে। সাধারণতঃ নীচু জমিতে পৌঁছবার আগেই তুষার-নদী গলে জল হয়ে যায়। কিন্তু মেরু অঞ্চলে এই চলন্ত তুষার-স্তূপ সমুদ্রে নেমে আসে বিরাট ভাসমান হিমশিলা বা বরফ-শৈলের (iceberg) আকারে। তাদের ধাক্কায় বড় বড় জাহাজ পর্যন্ত ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এগুলো সময়ে সময়ে এত বিরাট আকৃতির হয় যে মনে হয় যেন এক-একটা বিরাট পর্বত।

॥ পর্বত কি করে হয় ॥

পর্বত চার রকমের হতে পারে। খুব প্রাচীনকালে যখন ভূত্বক্ নরম ছিল, আর পৃথিবীর ভেতরকার ধাক্কায় যখন তখন ভেঙে চুরে ওলটপালট খেয়ে যেত, তখন সে ধাক্কায় হয়তো একটা জায়গা অনেক উঁচু হয়ে উঠল—এরকম পাহাড়কে বলে স্তূপ পর্বত বা চ্যুতি-পর্বত (Block Mountain). তাছাড়া, সেই ধাক্কায় পৃথিবীর ত্বক্ কুঁচকে বা ভাঁজ হয়ে পর্বত তৈরী হতে পারে—তাকে বলে ভঙ্গিল পর্বত (Fold mountain). আগ্নেয়গিরির লাভা জমেও পর্বত তৈরী হতে পারে (Mountain of Accumulation). তাছাড়া পৃথিবীর উপর পিঠটা ক্ষয়ে-ক্ষয়েও পর্বত তৈরী হয় (Mountain of Denudation).

॥ পর্বতের উচ্চতা কি করে মাপা হয় ॥

কোনও জায়গা যত উঁচুতে হয়, সেখানে বাতাসের চাপ তত কম হয়। কাজেই কোনও পাহাড়ের চুড়োয় বাতাসের চাপ কত, তা মাপলে তা থেকে হিসেব করে সে জায়গাটা সমুদ্রের উপর থেকে কত উঁচু তা বলে দেওয়া যায়। যে যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজটা করা হয় তার নাম অলটিমিটার (altimeter). আরও দেখ, হাওয়ার চাপ কম হলে সেখানে জল কম তাপেই ফুটবে। তা থেকেও সে জায়গার উচ্চতা মোটামুটি ঠিক করা যায়। তার জন্যে যে যন্ত্র দরকার, তার নাম হিপসোমিটার (hypsometer).

হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু চুড়ো ২৯,০২৮ ফুট। একজন বাঙালী সার্ভেয়ার, রাধানাথ শিকদার, হিসাব করে এটি বার করেন। তিনি উচ্চতা নিরূপণ করেন ২৯,০০২ ফুট। তখন পর্যন্ত কেউ এভারেস্টে উঠতে পারে নি। এ হিসেব তবে কি করে বার হল ?

সার্ভেয়াররা অঙ্ক কষে এ ব্যাপার বার করতে পারেন। তাঁদের একটি যন্ত্র আছে, তার নাম ট্র্যানজিট (transit). এর দ্বারা কোণের মাপ বার করা হয়। transit-এর মধ্য দিয়ে পর্বতের চুড়ো দেখে সার্ভেয়ার একটি কাল্পনিক রেখার সঙ্গে পর্বতের চুড়োর রেখা কতখানি কোণ সৃষ্টি করল তা জেনে নেন। তারপর ত্রিকোণমিতির (Trigonometry) সাহায্যে চুড়োর উচ্চতা কষে বার করেন। এ হিসেব কিন্তু সব সময়ে সঠিক হয় না।

॥ কয়েকটি উঁচু পর্বতের চুড়ো ॥

ছোট হোক আর বড় হোক, সব মহাদেশেই কিছু পর্বত আছে। উত্তর-আমেরিকার প্রধান পর্বত,
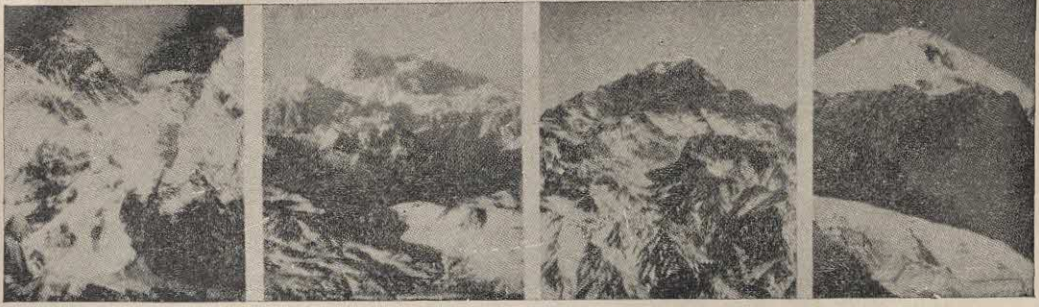
মাউণ্ট এভারেস্ট	মাউণ্ট ম্যাক্‌কিনলি	মাউণ্ট অ্যাকনক্যাগুয়া	মাউণ্ট এলব্রুস
পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ	উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ	দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ	ইওরোপের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ
২৯,০২৮ ফুট	২০,৩২০ ফুট	২২,৮৩৫ ফুট	১৮,৫০৬ ফুট
নেপাল	আলাস্কা	আর্জেন্টিনা	সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র
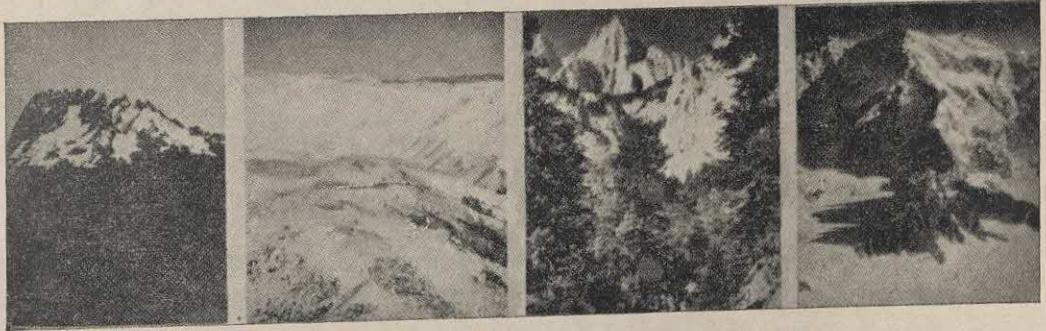
মাউণ্ট কিলিম্যাঞ্জারো	মাউণ্ট কসকিউস্কো	মাউণ্ট হুইটনি	মাউণ্ট লোগান
আফ্রিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ	নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ	যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ	কানাডার সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ
১৯,৩২১ ফুট	৭,৩২৮ ফুট	১৪,৮৯৮ ফুট	১৯,৮৫০ ফুট
তানজানিয়া	নিউসাউথ ওয়েল্‌স্‌, অস্ট্রেলিয়া	ক্যালিফোর্নিয়া	দক্ষিণ-পুর্ব রাজ্য

পশ্চিমে রকি পর্বতমালা (The Rockies) আর পুবে অ্যাপ্যালেচিয়েন (Appalachians) পর্বতমালা। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলব্যাপী আন্দিজ (Andes) পর্বতমালা। এশিয়া মহাদেশে অনেক পর্বত আছে। তাদের মধ্যে হিমালয় ও কারাকোরাম সবচেয়ে বড়—এদের কয়েকটি চুড়ো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। এদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু এভারেস্ট শৃঙ্গ। আফ্রিকার পর্বতগুলির মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এটলাস পর্বতমালা ও দক্ষিণে অবস্থিত ড্র্যাকেনসবার্গ (Drakensberg) আর মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত কিলিম্যানজারো (Kilimanjaro) এবং রুয়েনজোরি (Ruwenzori) পর্বতমালা বিখ্যাত। এই পর্বতমালাকে চাঁদের পাহাড় বা Mountains of the Moon বলে। দক্ষিণ-মধ্য ইওরোপে আল্‌প্‌স্‌

রকি পাহাড়ের লেফ্রয় চুড়ো। ১১,১০০ ফুট উঁচু

(Alps). এছাড়া ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যবর্তী পিরেনীজ (Pyrenees) আর দক্ষিণ রাশিয়ায় ককেশাস (Caucasus) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এশিয়া ও ইওরোপকে বিভক্ত করেছে ইউরাল পর্বতশ্রেণী (Ural Mountains). অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলব্যাপী The Great Dividing Range উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া দক্ষিণ মেরু অঞ্চলেও কয়েকটি উঁচু পর্বত আছে। সবচেয়ে উঁচু মাউন্ট এরেবাস্।

পৃথিবীতে যে-সব বড় বড় দ্বীপ আছে। তাতেও অনেক এবড়োখেবড়ো পর্বত আছে। জাপান, নিউগিনি, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, নিউজীল্যাণ্ড আর প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপ পর্বতে ভরা। কয়েকটি দ্বীপ শুধু পর্বত দিয়ে তৈরী—সমুদ্রের বুকে জেগে উঠেছে এই সব পর্বত। এরা জল ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যে-সব পর্বতের মাথা সমুদ্রের জল ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি, তারা ডুবো পর্বত হয়ে জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে এবং বহু জাহাজ এই সব ডুবো পর্বতে ধাক্কা খেয়ে জখম হয়ে ডুবে যায়।

॥ আগ্নেয়গিরি কাকে বলে ॥

অনেক পাহাড়ের চুড়োতে গহ্বর (crater) থাকে। সেই গহ্বর দিয়ে জ্বলন্ত পাথর ও ধাতু গলা অবস্থায় বেরিয়ে আসে। কারখানার চিম্‌নি দিয়ে যেমন ধোঁয়া বেরোয় এই সব পাহাড়ের উপরের গহ্বর দিয়ে তেমনি ছাই, ধোঁয়া, গলা পাথর, ধাতু ইত্যাদি ফোয়ারার মতো বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদের বলে আগ্নেয়গিরি।

বিসুবিয়াস এট্‌না, স্ট্রম্বোলি, হেকলা, কোটোপ্যাক্সি ফুজিয়ামা, মৌনালোয়া ইত্যাদি পৃথিবীর বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি।

॥ কি করে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয় ॥

পৃথিবীর ওপরকার শক্ত খোসাকে বলে ভূত্বক্। তার নীচে সাংঘাতিক গরম আর তরল পদার্থ আছে, তাকে বলে ম্যাগ্‌মা। ভূত্বকের উপর কোনও ফাটল পেলে, কিংবা কোনও কাঁচা জায়গা পেলে তা ফাটিয়ে, ম্যাগমার স্রোত ওপরে বেরিয়ে আসে।

গলিত অগ্নির মত এই ম্যাগমা পৃথিবীর কোন ফাটল বা দুর্বল ভূমিকে ভেদ করে উঠে ছড়িয়ে পড়ে পড়ে স্তূপ বা পাহাড়ের আকারে জমে যায়। এইরকম স্তূপ বা পাহাড়গুলোকেই আমরা বলি আগ্নেয়গিরি, কারণ এর গহ্বরে বা তলায় রয়েছে শুধু আগুনের স্রোত আর জ্বলন্ত, গলন্ত ধাতু।

আগ্নেয়গিরির গলিত পদার্থ বেরিয়ে আসার আর একটি কারণ হল এই পৃথিবীর নীচে আছে রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এই সব পদার্থের ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় তাপ ও অগ্নি। ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের মধ্যভাগের তাপ বৃদ্ধি পায়। এতে অন্যান্য উপাদানগুলো তরল আকার ধারণ করে।

এই তরল আগুনের প্রবাহ বেরিয়ে আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে।

এ ছাড়া, পৃথিবীর উপরের জল নানারকম ফাটল দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মাটির নীচের গরমে এই জল বাষ্পের সৃষ্টি করে। মাটির নীচে যে-সব জলীয় পদার্থ আছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্য দিয়েও আর এক রকম গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া পৃথিবীর অভ্যন্তরের নানা উপাদান শীতল হওয়ার সঙ্গে এক ধরনের গ্যাস সৃষ্টি হয়। নানাভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে জমে ওঠা এই সব গ্যাস বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন এই শক্তি ভীষণ-ভাবে চাপ দিয়ে উপরের ভূ-ত্বককে ফাটিয়ে, কিংবা তা কোনও ফাটলের মধ্য দিয়ে উপরে বেরিয়ে আসে। তারপর তা শুকিয়ে গিয়ে জমে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়।

॥ লাভা ॥

আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে গলানো আগুনের মত ম্যাগমা যখন বেরিয়ে আসে তাকে বলে লাভা। বাইরে আসবার আগে একে বলে ম্যাগমা। সেটা মাটির নীচে কোন গহ্বরে থাকে। এই গহ্বরটি থাকে আগ্নেয়গিরির ঠিক নীচে। একে বলে আগ্নেয় গহ্বর (Magma Chamber). লাভা আর অন্যান্য পদার্থ-গুলির উপরের দিকে ছিটকে বেরোনোকে বলে অগ্ন্যুৎপাত (eruption).
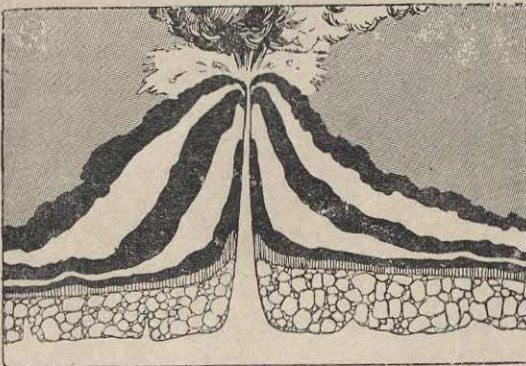
ফাটল ভেদ করে গলিত অগ্নি বাইরে বেরিয়ে আসছে

ম্যাগমার উদ্ভব

॥ জ্বালামুখ ॥

আগ্নেয়গহ্বর থেকে গলিত উত্তপ্ত পদার্থগুলো একটি বন্দুকের নলের মতো মুখের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে বিস্ফোরণ ঘটায়। এই মুখকে বলা হয় জ্বালামুখ (crater)। এই জ্বালামুখের পাশে থাকে আবার ছোট ছোট নলের মতো অনেকগুলো মুখ। তাদের বলে গৌণ জ্বালামুখ। এই সব জ্বালামুখের মধ্য দিয়ে সবেগে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে।

॥ জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ॥

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এক হাজারেরও বেশী আগ্নেয়গিরি আছে। এদের মধ্যে অনেকগুলো থেকে এখনও অগ্ন্যুৎপাত হয়। এই সব আগ্নেয়গিরিকে বলে জীবন্ত (active) আগ্নেয়গিরি। এই রকম জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সংখ্যা চারশ'য়েরও বেশী।

॥ মৃত আগ্নেয়গিরি ॥

আর যে-সব আগ্নেয়গিরি বহুকাল ধরে নিষ্ক্রিয় রয়েছে ও যাদের জীবন্ত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, তাদের বলে মৃত (extinct) আগ্নেয়গিরি। দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিজ পর্বতের চিম্বোরাজো (৬,২৫০ মিটার উঁচু) একটি মৃত আগ্নেয়গিরি। ব্রহ্মদেশে কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে যেগুলো নামে মাত্র আগ্নেয়গিরি, কিন্তু সেগুলো

থেকে কখনও অগ্ন্যুৎপাত হয় না। সেগুলো থেকে শুধু ফুটন্ত কাদা বার হয় (Mud-volcanoes of Minbu).

॥ অবিরাম ও সবিরাম আগ্নেয়গিরি ॥

যে সব আগ্নেয়গিরি থেকে অবিরাম অগ্ন্যুৎপাত হয় সেগুলোকে বলে অবিরাম আগ্নেয়গিরি। এই অবিরাম আগ্নেয়গিরিগুলোই হল সব থেকে ভয়ংকর। ইটালীর দক্ষিণ দিকে লিপারী দ্বীপের স্ট্রম্‌বলী এই রকম একটি অবিরাম আগ্নেয়গিরি। যে সকল আগ্নেয়গিরি থেকে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত হয়, সব সময়ে হয় না, সেগুলোকে বলে সবিরাম আগ্নেয়গিরি। ইটালীর ভিসুভিয়াস একটি সবিরাম আগ্নেয়গিরি।

॥ সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ॥

এছাড়া আরও একরকম আগ্নেয়গিরি আছে যাদের মধ্য থেকে বর্তমানে অগ্ন্যুৎপাত হয় না, কিন্তু যে কোন সময়ে তারা জীবন্ত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। এদের বলে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। জাপানের ফুজিয়ামা এমনি একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।

ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের যে-সব জায়গা দুর্বল ও ক্ষীণ সেই সব জায়গাতেই আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের উপকূলভাগের ভূ-ত্বক্ সমতল ভূমির চেয়ে দুর্বল। সমুদ্রগর্ভ ও দ্বীপগুলির ভূ-ত্বক্ উপকূল থেকে আরও দুর্বল। সেজন্য এই সমুদ্র-উপকূল বা দ্বীপগুলিতেই রয়েছে সব আগ্নেয়গিরি। পৃথিবীতে যত জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে, তাদের দুই-তৃতীয়াংশ রয়েছে একমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগে ও দ্বীপপুঞ্জে। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগে ও দ্বীপপুঞ্জে যে-সব আগ্নেয়গিরি আছে তাদের বলা হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলভাগে ও দ্বীপপুঞ্জে রয়েছে বহু আগ্নেয়গিরি। আইসল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ করে স্কটল্যাণ্ড, আজোরস দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে গিনি উপসাগর পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরীয় এই আগ্নেয়গিরিশ্রেণী। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রয়েছে কয়েকটি আগ্নেয়গিরি; ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, ঈজিয়ান সাগর, ককেশাস, ইরান, বেলুচিস্থানেও রয়েছে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি।

॥ আগ্নেয়গিরির ধ্বংসলীলা ॥

এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পৃথিবীর বুকে যে কী ভয়ংকর ধ্বংসলীলা হয় তা ভাবতে গেলেও ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। প্রায় উনিশশো বছর আগে ইটালীর ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি থেকে যে প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল তার ফলে অতি সমৃদ্ধ ও সুন্দর দুটি নগর পম্পেই ও হারকিউলেনিয়াম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ভিসুভিয়াস পাহাড়ের গা বেয়ে রয়েছে অনেক উঁচু পর্যন্ত রাস্তা। পাহাড়ে-রাস্তা সাধারণতঃ যেমন সুন্দর হয়, এ ঠিক তার উলটো— সর্বত্র গাছ, আগাছা, ঘাস—একটুখানি সবুজের চিহ্ন

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

(১) প্রাগৈতিহাসিক যুগের আগ্নেয়গিরি।
(২) আগ্নেয়গিরি থেকে লাভাস্রোত বেরিয়ে আসছে।

আগ্নেয়গিরির কথাঃ

[(১) প্রাগৈতিহাসিক যুগের আগ্নেয়গিরি।
(২) আগ্নেয়গিরি থেকে লাভাস্রোত বেরিয়ে আসছে।]

কোটি কোটি বছর আগে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি। পৃথিবীতে বহু আগ্নেয়গিরি আছে। সেই সব আগ্নেয়গিরির সবগুলো সক্রিয় নয়। কোন কোনটা থেকে অগ্ন্যুদ্গম হয়। তবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতো প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গম হয় না।

১নং ছবিতে একটা প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি দেখা যাচ্ছে। তা থেকে অগ্ন্যুদ্গম হচ্ছে। গলিত লাভাস্রোত পর্বতের মুখ থেকে বেরিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ছে।

নীচে হ্রদের ধারে দেখা যাচ্ছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানারকম গাছ ও প্রাণী।

২নং ছবিতে আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত প্রচণ্ড উত্তপ্ত গলিত লাভাস্রোতকে দেখা যাচ্ছে। এই লাভাস্রোত বহু সুপ্রাচীন জনপদকে ঢেকে দিয়েছে।

কোথাও নেই। চারিদিকে লাভার স্তূপ যেন কুমীরের পিঠের মতো হয়ে আছে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পেলি-নামক আগ্নেয়গিরি থেকে যে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল তার ফলে সেন্ট-পিয়েরে-নামক একটি জনপদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছিল।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পৃথিবীর বহু নগর জনপদ এমনিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কখনও কখনও আগ্নেয়গিরির আলোড়নের ফলে সমুদ্র-বক্ষে তাণ্ডবের সৃষ্টি হয়, প্রবলবেগে ঝড় ওঠে। ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের পাশে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমুদ্রে ৩০ মিটার উঁচু তরঙ্গ উঠেছিল আর ১৬০ কিলোমিটার স্থান জুড়ে প্রলয়ংকর ঝড় উঠেছিল।

॥ মালভূমির সৃষ্টি ॥

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ভয়ংকর আগ্নেয়-গিরি তার ধ্বংসলীলার মধ্যে আমাদের কিছু উপকারও করে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে লাভা স্রোত বয়ে যায়, তা সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে পৃথিবীতে মালভূমির সৃষ্টি হয়। এই ভাবেই আমাদের ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে তৈরী হয়েছে প্রায় দু'লক্ষ বর্গমাইল 'কৃষ্ণ-

মাউন্ট অ্যাসিনিবইন। ১১,৮৬০ ফুট উঁচু। এটিকে 'রকি পর্বতের ম্যাটার হর্ন' বলা হয়
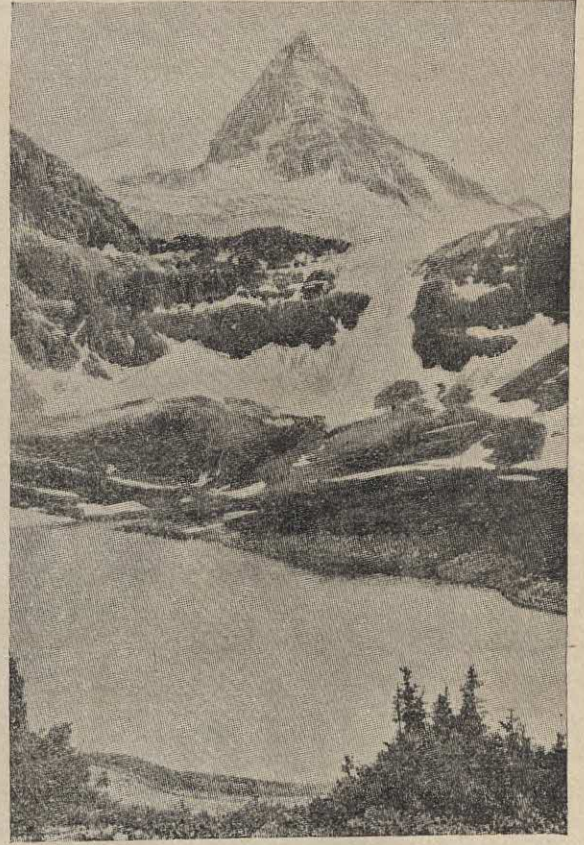
প্রলয়ংকর ঝড়ের সৃষ্টি

মৃত্তিকা' অঞ্চল। মাটির সঙ্গে এই লাভার শক্তিশালী ধাতু-পদার্থ মিলে বেশ উর্বর জমি তৈরি করে।

॥ দ্বীপের সৃষ্টি ॥

আগ্নেয়গিরির লাভা পুঞ্জীভূত হয়ে অনেক সময় মহাসাগরের বুকে দ্বীপের সৃষ্টি করে। হাওয়াই দ্বীপ মহাসাগরের বুকে আগ্নেয়গিরির দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আগ্নেয়গিরির গহ্বর বা অগ্ন্যুৎপাত থেকে বহু মূল্যবান্ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ গন্ধকই আমরা পাই আগ্নেয়গিরি অঞ্চল থেকে।

॥ গিরিবর্ত্ম (Pass) কাকে বলে ॥

পাহাড়ের এপার থেকে ওপারে যাবার অনেক সময় স্বাভাবিক পথ থাকে। সে সব পথ কখন কখন উঠে নেমে বহু দুর্গম স্থান দিয়ে চলে গেছে। মাঝে
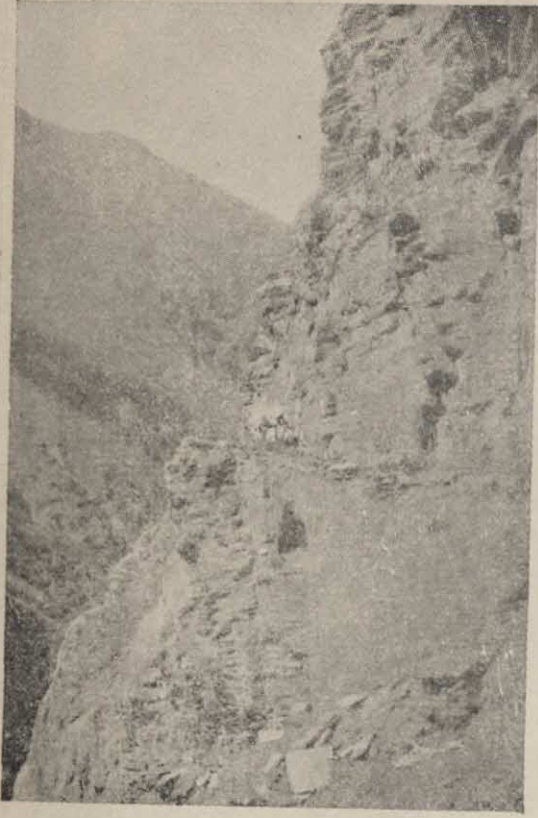
সাউথ আইল্যাণ্ডে অবস্থিত ওয়ারটিপু হ্রদের নিকটবর্তী ডান ও কোনেল পর্বতচূড়া

নদী পড়ে, খাদ থাকে—কত কি প্রাকৃতিক বাধা থাকে! কিন্তু মানুষ ঘুরপথে গিয়ে বেশী সময় নষ্ট না করে কষ্ট করে এই সব বাধাপূর্ণ পথ দিয়েই পাহাড় পার হয়। এই সব পাহাড়ে পথকে বলে গিরিবর্ত্ম বা গিরিপথ (Pass).

বেলুচিস্তানের কোয়েটা ও আফগানিস্তানের কান্দাহারকে এমনি একটি গিরিবর্ত্ম যুক্ত করেছে। এর নাম বোলান গিরিবর্ত্ম। এই পথের দুধারে উঁচু পাহাড়, মধ্যে খাদের মতো সরু পথ। এপথ ক্রমশঃ নীচু দিকে নেমে গেছে।

খাইবার পাসও (Khyber Pass) একটি সরু পার্বত্য পথ। এই পথ বর্তমান পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে যুক্ত করেছে। এই পথ ৩৩ মাইল লম্বা, একস্থানে পথটি মাত্র ১০ ফুট চওড়া।

স্কটল্যাণ্ডের কিলিক্র্যাঙ্কি (Killiecrankie) পাসও বিখ্যাত। এই পথ দিয়ে একটি রেল লাইন পাতা হয়েছে। তা ছাড়া হাঁটা পথও আছে।

॥ পবিত্র পাহাড় ॥

অনেক পাহাড়কে পবিত্র বলে মনে করা হয় ও দেবতাদের বাসস্থান বলে ভাবা হয়। হিমালয়ে কত তীর্থ, তাই হিমালয়কে দেবতা মনে করা হয়। হিমালয়ের ওধারে কৈলাস পাহাড় শিবের বাসস্থান। গ্রীসে ওলিম্পাস্ পাহাড় ছিল গ্রীক দেবতাদের বাসস্থান। জাপানের ফুজিয়ামা পাহাড় এত পবিত্র যে, জাপানীরা তাকে বলে ফুজি-সান, মানে, 'ফুজি মহাশয়'। ফুজিয়ামা একটি আগ্নেয়গিরি ছিল, এককালে তার মুখ দিয়ে আগুন, ধোঁয়া আর লাভা বেরোত।

॥ উচ্চতম মালভূমি ॥

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়গুলি যেখানে, তারই কাছাকাছি জায়গায় পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমিগুলিও আছে। পামির মালভূমিকে বলা হয় 'পৃথিবীর ছাদ'। তার পাশেই তিব্বতের বিস্তীর্ণ মালভূমি। দক্ষিণ ভারতের বেশির ভাগ জুড়ে রয়েছে দাক্ষিণাত্য মালভূমি।

॥ আভালাঁশ (Avalanche) ॥

পাহাড় আর মালভূমিগুলিতে বৃষ্টির যে জল পড়ে, আর পাহাড়ের উপরের বরফ গলে যে জল নামে, সেই সব মিলে বড় বড় নদ-নদীর উৎপত্তি হয়েছে। পাহাড়ের ঢালু গায়ে বরফ জমে বেশী ভারী হলে তা হঠাৎ খসে পড়ে। তাকে বলে বরফের ধস বা

হেকলা—আইসল্যাণ্ডের জীবন্ত আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরি থেকে ধূম বেরুচ্ছে

আভালাঁশ। যে বরফের রাশি গলে পাহাড়ের কোনও পথ ধরে নামতে থাকে তাকে বলা হয় তুষার নদী, হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার। খানিকটা নামবার পর ঐ তুষার গলে জল হয়। সেই জলধারা অন্যান্য জলধারার সঙ্গে মিশে ক্রমেই বড় হতে থাকে, পাহাড়ী ঝরনাগুলো এইভাবে এক হয়ে নদী হয়ে যায়। জল তো সব সময়ই নীচের দিকে যাবে, আর সমুদ্র হচ্ছে ডাঙার চেয়ে নীচু। তাই সব নদীই ছোটে সমুদ্রের দিকে। সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলে অজস্র পলিমাটি।

॥ পলিমাটির দেশ ॥

পলিমাটি দিয়ে অনেক দেশ গড়ে উঠেছে। আমাদের বঙ্গভূমি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের জলে ধুয়ে আনা পলিমাটি দিয়ে গড়া। আর মিশর দেশ? সেখানে দু'পাশে বিশাল মরুভূমির মাঝখান দিয়ে নীলনদ চলে গিয়েছে সোজা ৫৭৫০ কিলোমিটার। বর্ষায় বন্যা হয়ে জল দুকূল ছাপিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়, সেখানে উর্বর পলিমাটি জমে। নীলনদের জল আর পলিমাটি যতদূর পর্যন্ত যায়, মরুভূমির মধ্যে নীলনদের দু' পাশ বরাবর সেই সব জমি শস্যে ভরে ওঠে। তাই আমরা যেমন গঙ্গাকে মা বলি, পূজা করি, মিশরীরা সেইরকম নীলনদকে বাবা বলে।

॥ নদীর কথা ॥

নদীর জন্ম যেখানে, সেখান থেকে সমুদ্র অনেক দূরে হতে পারে। নীলনদ পৌনে ছ' হাজার কিলোমিটার গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে, আর উত্তর-আমেরিকার মিসিসিপি-মিসৌরি নদীকে যেতে হয়েছে ৬৬৪০ কিলোমিটার। পৃথিবীতে সবচেয়ে লম্বা নদী এইটে। আর দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনও প্রায় ৬৪০০ কিলোমিটার লম্বা।

আমাজন এক আশ্চর্য নদী। খুব লম্বা, তার উপর খুব চওড়া। এত বড় নদী আর কোথাও নেই। কোনও কোনও জায়গায় নদীটা পঞ্চাশ মাইল চওড়া। সে এত জল নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ঢালছে যে তার মোহনা থেকে আশি-নব্বুই কিলোমিটার পর্যন্ত সমুদ্রের যত জল, তা আর নোনা নেই। তার তীরে হাজার-হাজার কিলোমিটার গভীর দুর্ভেদ্য বন। অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ে তার জন্ম, তার ওধারে সমুদ্র মোটে একশো কিলোমিটার দূরে। পাহাড়টার ওধারকার ঢালুতে জন্মালে সে এত বড় হতে পারত না। কিন্তু এধার থেকে বেরিয়েছে বলে সমুদ্রে পৌঁছবার জন্যে তাকে ছুটে যেতে হয়েছে প্রায় সাড়ে ছ'হাজার কিলোমিটার পথ।

বড় নদী হিসেবে আরও নাম করা যেতে পারে চীনের ইয়াংসিকিয়াং-এর। কিয়াং মানেই 'নদী', অর্থাৎ
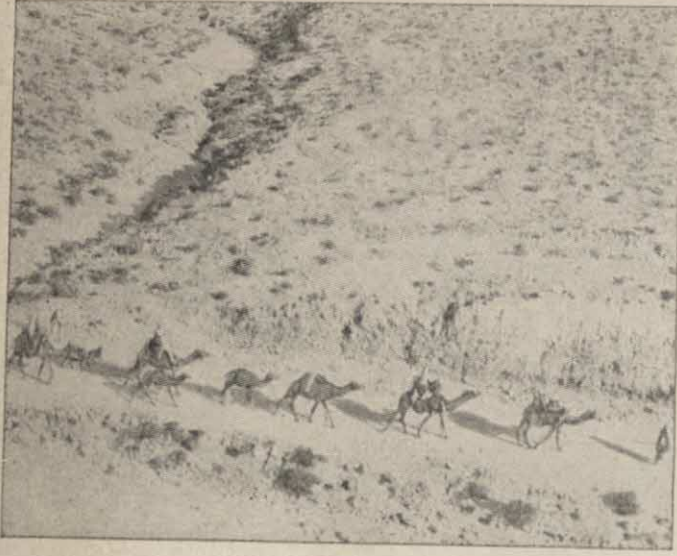
বোলান গিরিপথ ধরে উটের সারি আফগানিস্তান থেকে বেলুচিস্তান চলেছে

'ইয়াংসি নদী'; তার দৈর্ঘ্য ৫৫০০ কিলোমিটার। রুশদেশের ইয়েনিসি প্রায় ৫২০০ কিলোমিটার লম্বা। ওদেশেরই আর এক নদী লেনা, আর আফ্রিকার নাইজার আর কঙ্গো নদী প্রায় ৪৮০০ কিলোমিটার লম্বা।

॥ অন্য কয়েকটি নদ-নদী ॥

ভারতে অতবড় নদী নেই। সবচেয়ে বড় সিন্ধু আর ব্রহ্মপুত্র, ২৬০০ কিলোমিটার লম্বা। গঙ্গা আর একটু ছোট, ২৪০০ কিলোমিটার। তার মধ্যে আবার এই তিন নদীরই খানিক খানিক পাকিস্তানে আর বাংলাদেশে মানে পূর্ব-বাংলায় পড়েছে। দক্ষিণ-ভারতের গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা তো আরও ছোট।

এদের কথা আরও বলা হয়েছে 'ভারতের নদ-নদী' অধ্যায়ে।

ইওরোপে ভলগা, ড্যানিউব, রাইন, সীন, টেমস বিখ্যাত কিন্তু ছোট নদী। আর ইরাকে আছে টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস। ওদেশে যাদের নাম দজলা আর ফোরাত। এই দজলা আর ফোরাত এক জায়গায় এসে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। তারপর নতুন নাম হয়েছে শাত-এল-আরব। ব্রহ্মদেশে ইরাবতী, থাইল্যাণ্ডে মেকং, অস্ট্রেলিয়ায় মারে ও ডার্লিং নদীও উল্লেখযোগ্য।

॥ কলোরাডো নদীর কথা ॥

আশ্চর্য এক নদী উত্তর আমেরিকার কলোরাডো নদী। অ্যারিজোনা অঞ্চলের রুক্ষ মালভূমির বুকে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার লম্বা একটা বিরাট ফাটল আছে, দেখলে মনে হবে যে পৃথিবী ওখানে দু'ফাঁক হয়ে ফেটে যেতে যেতে থেমে গিয়েছে। সেই ফাটলটা কিন্তু কলোরাডো নদীর কীর্তি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তার জলপ্রবাহ মালভূমির নরম পাথরকে কেটে কেটে ঐ গিরিখাত তৈরি করেছে। এর সবচেয়ে অদ্ভুত অংশ যেটা, তাকে বলে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন (canyon). খাতটা সেখানে দেড়-দুই থেকে সাতাশ-আটাশ কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া, আর প্রায় দু'কিলোমিটার গভীর। পাথর কেটে কেটে সেই দুর্দান্ত নদী সেইখানটাতে অতো নীচে নেমে গিয়ে বয়ে যাচ্ছে। দু'পাশে পাহাড়ের গা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে কাটা, তার স্তরে স্তরে রং-বেরঙের পাথরের বাহার। সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

॥ অদ্ভুত গুহার কথা ॥

অনবরত জল বয়ে যাওয়ার ফলে পাথর ক্ষয়ে গিয়ে, কিংবা চুনা-পাথরের মতো নরম পাথর গলে

তুষার-রাজ্য
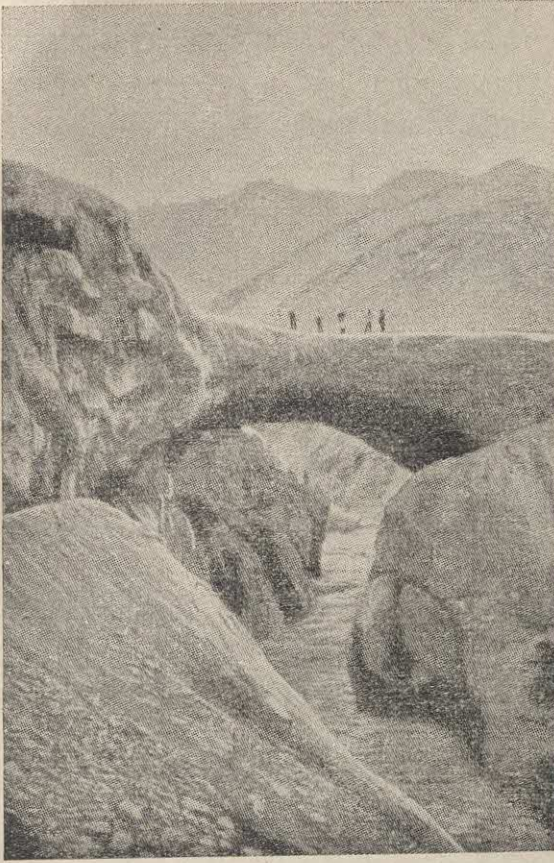
আর্জেন্টিনার মেণ্ডোজা নদীর উপর প্রাকৃতিক সেতু

গিয়ে পৃথিবীর নানা জায়গায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব গুহা তৈরী হয়েছে। ভারতে এরকম বেশী নেই, মধ্যপ্রদেশে কোটামসারে এরূপ একটা গুহার খবর পাওয়া গিয়েছে। ব্রহ্মদেশে গোটেইক (Gokteik) নামে একটা জায়গায় নদীটি দুই পাহাড়ের মাঝখানে যেতে যেতে হঠাৎ নরম পাথর পেয়ে তা ক্ষইয়ে মাটির তলায় ঢুকে গিয়েছে—সে গুহাও এক দেখবার জিনিস। গুহার ছাদ থেকে বড় বড় চুনাপাথরের বিচিত্র সব ঝাড় নেমে এসেছে, কোথাও বা মেঝে থেকে নানা গড়নের চুনাপাথরের সব থাম উঠে গিয়েছে।

এরকম সব বড় বড় গুহা আছে আমেরিকায়। কেণ্টাকী রাজ্যের ম্যামথ গুহাই সবচেয়ে বড়। মাটির তলায় দশ মাইল লম্বা এই চুনাপাথরের গুহার প্রথম ঘরটাই পাঁচ বিঘে জমি জুড়ে রয়েছে। এমনি কত ঘর, কত থাম, কত ঝাড়, কত বিচিত্র সব গড়ন!

সবচেয়ে সুন্দর গুহা হল ইতালীর নেপ্‌ল্‌স্‌ শহরের কাছে ব্লু গ্রটো (Blue Grotto). এই গুহার মুখ সমুদ্রের দিকে। ভিতরে খিলানের পর খিলানের তলায় রয়েছে কাকচক্ষুর মতো পরিষ্কার জল। গুহার মুখ দিয়ে রোদ এসে সেই জলে পড়ে, আর একরকম অদ্ভুত নরম নীল আলোয় গুহার ভিতরটা ঝলমল করতে থাকে।

॥ আবর্তের (maelstrom) কথা ॥

সমুদ্রে জলের আবর্ত বা ঘূর্ণী থাকে। নরওয়ের উপকূল থেকে কিছু দূরে একটি বিখ্যাত ঘূর্ণী আছে। এখানকার এই ঘূর্ণী চিরস্থায়ী। লফোটেন (Lofoten) দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী প্রণালী দিয়ে

কলোরাডো নদীর গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ান

মহাসমুদ্রের জলস্রোত ঢোকবার সময়ে এই প্রচণ্ড ঘূর্ণা সৃষ্টি করে। ভূগোলে মেলস্ট্রম (maelstrom) বা ঘূর্ণা বলতে এটি বিখ্যাত।

॥ জলপ্রপাত কাকে বলে ॥

উঁচু জায়গা দিয়ে চলতে চলতে নদী তার খাড়া কিনারায় এসে পড়লে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জলের সেই উপর থেকে নীচে ঝরে পড়াকে বলা হয় জলপ্রপাত। পাহাড়ী জায়গায় জলপ্রপাতের অভাব নেই। শিলং-এ মসমাই, বীডন ইত্যাদি, দার্জিলিঙে ভিক্টোরিয়া, আর রাঁচীতে হুণ্ড্রু বা হুড্রু ও জোহ্না জলপ্রপাত আছে। এসব তো নিতান্তই ছোট। ভারতে সবচেয়ে বড় প্রপাত হচ্ছে মহীশূরে যোগ অথবা গারসোপ্পা প্রপাত। এখানে শরবতী নদী পাহাড়ের উপর থেকে একেবারে ২৬০ মিটার নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হুড্রু তো মোটে ৯৭ মিটার। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রপাত, দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি ধাপে গঠিত টুগেলা, সেটা হচ্ছে প্রায় ৭০০ মিটার বা ২৮১০ ফুট উঁচু।

পৃথিবীতে আরও কত বিশাল বিশাল জলপ্রপাত আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ নায়েগারা নামে ছোট প্রপাতটি। এটি কানাডা আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে। উচ্চতায় মোটে ৫০ মিটার হলে কি হয়! এত চওড়া জলপ্রপাত আর নেই। প্রায় ১২০০ মিটার চওড়া এক বিপুল নদীর জল প্রচণ্ডবেগে ছুটে এসে বজ্রপাতের মতো শব্দ করে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নায়েগারা কথাটার মানে হচ্ছে 'জলের বজ্রনাদ'। জায়গাটা যেমন সুন্দর, তেমনি ভয়ংকর।

মহীশূরের গারসোপ্পা জলপ্রপাত

আমেরিকার যোসেমাইট জলপ্রপাত আর এক ধরনের। সেটা পাহাড়ের উপর থেকে এক লাফে তার গোড়ায় এসে পড়ে নি, তিন ধাপে নামতে হয়েছে তাকে। সবসুদ্ধ সে নেমেছে প্রায় ৭৫০ মিটার, কিন্তু এটা হল জলপ্রপাতের মোট উচ্চতা। তবে প্রথম লাফেই সেটা গিয়ে পড়েছে প্রায় চারশো মিটার নীচে। নিউজীল্যাণ্ডের সাদারল্যাণ্ড জলপ্রপাত এক লাফে প্রায় ৬০০ মিটার নীচে পড়ছে।

॥ হ্রদের কথা ॥

পাহাড় কিংবা মালভূমি থেকে নেমে আসছে যে জল, তা যদি পথে বাধা পেয়ে আটকে গিয়ে জমতে থাকে, কিংবা

পৃথিবীর বুকে বড় বড় যে সব খানাখন্দ আছে, তার মধ্যে এসে পড়ে, তবে তা আর সমুদ্রে পৌঁছতে পারে না। জলটা ঐখানে জমে হ্রদ হয়। তারপর, কানায়-কানায় ভরতি হয়ে জল যদি একদিক দিয়ে উপচে পড়ে বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে সেই জল একটা নদীর সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বড় নদীগুলির মধ্যে নীলনদের একটা ধারা এইভাবে ভিক্টোরিয়া হ্রদ (নায়াঞ্জা) থেকে বেরিয়েছে। ক্রমাগত জল এসে জল বেরিয়ে যেতে পারলে হ্রদের জল টাটকা থাকে। আর যেটুকু জল আসছে, তা যদি রোদের তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, বেশী জল বেরিয়ে যেতে না পারে —তাহলে হ্রদের জল কটু আর নোনা হয়।

নোনা জলের হ্রদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্যাস্পিয়ান সী। এতবড় যে, বাংলাদেশ আর পশ্চিম বঙ্গের মিলিত আয়তনের দ্বিগুণ তার আয়তন। এর জল আবার সমুদ্রের জলের চাইতে ২০ মিটার নীচে। এর কাছেই ব্ল্যাক সী, তার আকারও প্রায় অতখানিই। এত বড় বলেই তাদের সম্মান করে 'সী' অর্থাৎ সাগর বলা হয়, কিন্তু তারা হ্রদই। টাটকা জলের কোনও হ্রদ এত বড় নেই। সেরকম সবচেয়ে বড় হ্রদ হচ্ছে আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদ, আর তারই কাছাকাছি হল আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া নায়াঞ্জা।

আগে যে ডেড সী'র কথা বলা হয়েছে, সেটাও সাংঘাতিক নোনা জলের একটা ছোট্ট হ্রদ। প্রায় তার মতো সাংঘাতিক নোনা জল আছে উত্তর আমেরিকার গ্রেট সল্ট লেক নামে এক হ্রদে। এই সব হ্রদের জল থেকে মানুষ তার দরকারী লবণ, পটাশ ইত্যাদি নানা জিনিস বের করে নেয়। ভারতেও এভাবে লবণ পাওয়া যায় রাজস্থানের
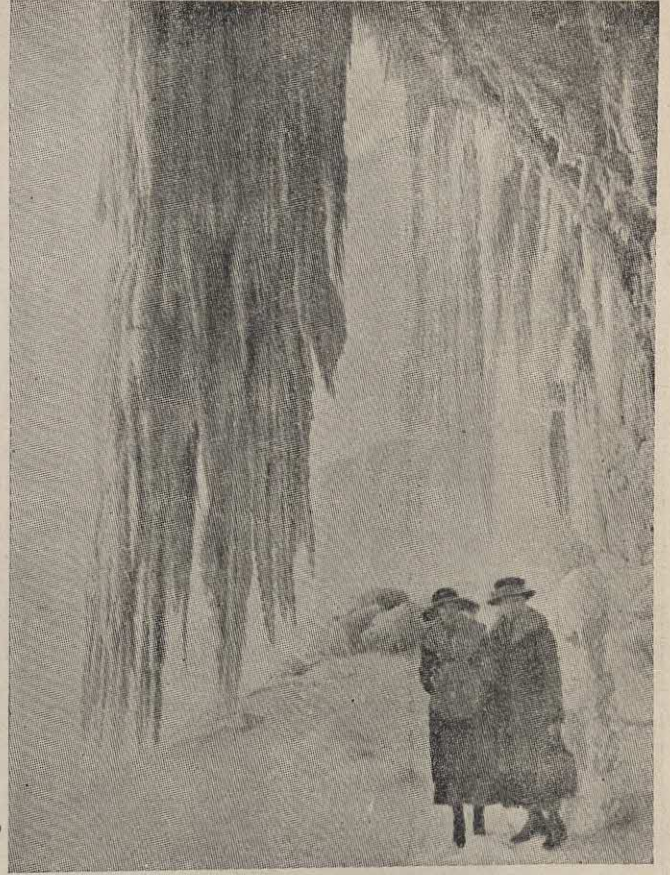
নায়েগারা জলপ্রপাতের শীতকালের দৃশ্য। প্রপাতের জল জমে ঝাড়-লণ্ঠনের কাচের মত ঝুলে রয়েছে

সম্বর হ্রদ থেকে। এ হ্রদ এত অগভীর যে বর্ষায় এর জল প্রায় ২৩০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে থাকলেও এটা গ্রীষ্মকালে একেবারে শুকিয়ে যায়।

আর একটি হ্রদের কথা বলতে হয়—তা হচ্ছে তিব্বতের মানসসরোবর, সাগরপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৬০০ মিটার উঁচু জায়গায় এটি রয়েছে। এত উঁচুতে আর কোন হ্রদ নেই। দক্ষিণ আমেরিকার টিটিকাকা হ্রদও খুব উঁচুতে, প্রায় ৪০০০ মিটার উঁচু পাহাড়ে।

হ্রদ বলতে অবশ্য জলের হ্রদই বোঝায়, কিন্তু অন্য জিনিসে ভরতি বড় বড় কুণ্ডকেও হ্রদই বলা হয়। পিচ বলে একরকম কালো আলকাতরার

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের সবচেয়ে বড় অংশ রেনবো ফল্‌স্‌।
চারটি ধাপে গড়া এই জলপ্রপাত

মতো থক্‌থকে জিনিস আছে। উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে ত্রিনিদাদ দ্বীপে প্রায় ৩০০ বিঘা জমি জুড়ে একটা বিশাল কুণ্ড আছে, তা পিচে ভরতি। জায়গায় জায়গায় তাতে ভুড়ভুড়ি উঠছে, অর্থাৎ নীচে থেকে গলানো পিচ উঠছে। ঐ কুণ্ড থেকে কত পিচ তুলে নেওয়া হয়, তবু পিচ ফুরোবার কোনও লক্ষণ নেই।

আবার, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে কিলাউইয়াতে লাভা-ভরতি এক প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। লাভা পৃথিবীর ভিতরকার গরমে গলে-যাওয়া পাথর। আবার, কোথাও বা থক্‌থকে ফুটন্ত কাদার হ্রদ আছে—যেমন, আমেরিকার ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে। এ সবই পৃথিবীর ভিতরের আগুনের খেলা।

॥ প্রস্রবণ বা ঝরনার কথা ॥

হ্রদ আর নদীর অনেকটা জলই চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির ভিতরে চলে যায়। সেই জল নেমে যেতে যেতে হয়তো পাথরের স্তরে ঠেকল, আর নামতে পারল না। তখন সে জল পাশের দিকে চলল। চলতে চলতে, পাহাড়ের ঢালু গায়ে এসে হয়ত সেখান দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একে বলে প্রস্রবণ বা ঝরনা। পাহাড়ে পাহাড়ে একরকম ঝরনা অনেক দেখা যায়।

॥ উষ্ণপ্রস্রবণ কাকে বলে ॥

তার মধ্যে আবার কতকগুলি হয় গরম জলের ঝরনা, বা উষ্ণপ্রস্রবণ। পৃথিবীর ভিতরে যত নীচে যাওয়া যায়, ততই গরম। জলটা নীচে নেমে যদি সেই তাপে গরম হয়ে উপরে ওঠে, তারপর বেরিয়ে আসবার পথ পায়, তাহলে গরম জল উঠে এসে সেই পথে ঝরে পড়তে থাকে। এরকম উষ্ণপ্রস্রবণ বিহারের রাজগিরে আর বীরভূমের বক্রেশ্বরেও আছে। আবার কখনো কখনো গরম জলটা একটা ফাটলের মধ্য দিয়ে উঠে একটা গর্ত বা কুণ্ড ভরে থাকে। যেমন, মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রামের বাড়বাকুণ্ড। আইসল্যাণ্ডে এত উষ্ণপ্রস্রবণ আছে যে, অনেক জায়গায় ঐ জল পাইপে করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। ঐ জলের সাহায্যে ঘরও গরম রাখা হয়।

দক্ষিণ রোডেশিয়ার ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্

খানেক। কাচের একটা পাহাড় আছে, ৫০।৬০ মিটার উঁচু। পেণ্ট্ পট্‌স ('রঙের ভাঁড়') বলে কতকগুলো কুণ্ড আছে, তা থেকে সাদা, হলদে, লাল ইত্যাদি নানা রঙের কাদা ছিটকে ছিটকে উঠছে। ওখানেও কাদার ফুটন্ত কুণ্ড রয়েছে, আগ্নেয়গিরি থেকে লাভার বদলে কাদা বেরোচ্ছে। আবার অনেক পাহাড়ের মাথায় ফাটল রয়েছে, সেগুলো থেকে ক্রমাগত শত শত রেলগাড়ির হুইস্‌লের মতো শব্দ করে জলের বাষ্প বেরিয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলছে।

॥ গেজার (Geyser) ॥

আইসল্যাণ্ড, নিউজীল্যাণ্ড আর সবচেয়ে বেশী আমেরিকার ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক অঞ্চলে এমন সব ফোয়ারা আছে যা থেকে গরম জল থেকে থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে। তাদের বলে গেজার। এ জল সব-সময় বেরোয় না। গেজারের মুখটা সরু; অনেক নীচে জল এসে খানিকক্ষণ ধরে জমতে জমতে গরম হয়ে উঠলে তবেই বাষ্পের ধাক্কায় সেটা ঐ সরু মুখ দিয়ে ঠেলে ওঠে। ইয়েলোস্টোনের 'ওল্‌ড্ ফেথ্‌ফুল' নামে গেজার ৬৫।৭০ মিনিট বাদে বাদে গরম জল বের করে দেয়। প্রায় ৫৩½ মিটার উঁচু হয়ে সেই ফোয়ারা খানিকক্ষণ জল ছাড়তে থাকে। 'জায়াণ্ট' নামে গেজারের ফোয়ারা আরো উঁচু, প্রায় ৮০ মিটার—কিন্তু ওল্ড ফেথফুলের মতো নিয়মিত সময়ে তার জল বেরোয় না।

ইয়েলোস্টোন পার্ক একটা আশ্চর্য জায়গা। সেখানে গেজার আছে শ'

পৃথিবী-প্রসিদ্ধ 'ওল্‌ড্ ফেথ্‌ফুল' গেজার

ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের একটা রন।

তাও আবার সমান নয়, উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো। উঁচু লম্বা লম্বা বালির ঢিবিগুলোকে বলে বালিয়াড়ি। ঝোড়ো হাওয়া সেই ঢিবিগুলোকে এখানে ভাঙছে, ওখানে গড়ছে। এমন কি সেই বালি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মরুভূমির বাইরে কোনও বন বা কোনও শহরের উপর এনে ফেলে তাকে একেবারে চাপা দিচ্ছে।

এই রকম মরুভূমির বালিই একদিন চাপা দিয়ে ফেলেছিল প্রাচীন কালের বিখ্যাত শহর ব্যাবিলনকে। এ হল ইরাকদেশের মরুভূমির কাজ। আবার, চীনদেশের উত্তরে বিশাল গোবি মরুভূমি এভাবে কত শহর ধ্বংস করেছে, সেরকম অনেক জায়গাও এখন বালি সরিয়ে বের করা হয়েছে। ভারতে এক রাজস্থানে থর মরুভূমি ছাড়া আর মরুভূমি নেই।

মরুভূমির মধ্যে সব চাইতে বড় হচ্ছে উত্তর আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি। দক্ষিণ আফ্রিকার ভয়ংকর মরুভূমি কালাহারি। আরব দেশের, আর অস্ট্রেলিয়ার মাঝখানটা মরুভূমি। উত্তর আমেরিকায়ও মরুভূমি আছে।

॥ মরুভূমির কথা ॥

আরও কত অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গা আছে। কত সুন্দর, আবার কত ভয়ংকর ভয়ংকর জায়গা আছে এই পৃথিবীতে। এই ধরনের একরকম জায়গাকে বলে মরুভূমি। ক্রোশের পর ক্রোশ, এমন কি শত শত ক্রোশের মধ্যেও এক ফোঁটা জল নেই, গাছপালা ঘাস নেই, জনপ্রাণী নেই। খালি ধুধু করছে বালি।

এরই মধ্যে কোথাও হয়তো কোনও সুযোগ পেয়ে মাটির তলাকার জল উঠে জমিকে একটু ভিজিয়ে রাখতে পেরেছে। হয়তো জল একেবারে উপরে উঠে একটু নালার মতো বয়ে যাচ্ছে। অমনি সেখানে গাছপালা জন্মে দিব্যি একটি স্বাভাবিক জায়গার সৃষ্টি হয়েছে। এমন জায়গাকে বলে ওয়েসিস (oasis) বা মরূদ্যান।

সাহারা মরুভূমি

মরুভূমির খানিকটা ভিতর পর্যন্ত মানুষ থাকে। যেমন, আরবদেশের বেদুইনরা। কত কষ্ট করে থাকতে হয়, কিন্তু কেউ তার নিজের দেশের অসুবিধের জন্য তা ছেড়ে দিয়ে অন্য দেশে যায় না। আফ্রিকার কিংবা অ্যামাজনের গহন অরণ্যে—হিমালয়, অ্যাণ্ডিজ ও আল্পসের দুর্গম উঁচু জায়গায়—আগ্নেয়গিরির পাদদেশে—কিংবা তুন্দ্রা কি মেরু অঞ্চলের তুষাররাজ্যে—সব জায়গাতেই বিশেষ বিশেষ ধরনের বা জাতের মানুষের দেখা পাওয়া যায়।

॥ মানুষের কীর্তি ঃ শহর ॥

মানুষের প্রধান কাজ হয়েছে গ্রাম, শহর ইত্যাদি পত্তন করা। বনজঙ্গল ও পাহাড় কেটে, সুবিধে মতো জায়গায় তারা সুখে বাস করবার জন্য শহর বসিয়েছে। হল্যাণ্ডের মতো দেশে সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে জল ছেঁচে বার করে মানুষ থাকবার জায়গা করেছে।

খুব আগেকার দিনের শহর তো এখন নেই। তবে যা আছে, তার মধ্যে সব চাইতে পুরনো শহর বোধহয় দামাস্কাস। আমাদের বারাণসী বা কাশীও পৃথিবীর মধ্যে খুব পুরনো। সবচেয়ে উত্তরের শহর নরওয়ের হ্যামারফেস্ট—নিশীথ সূর্যের রাজ্যে। আর, সবচেয়ে দক্ষিণের শহর পুণ্টা-এরেনাস, দক্ষিণ আমেরিকার পাটাগোনিয়া দেশে। সবচেয়ে বড় শহর টোকিও। আর সব চাইতে বড় নাম হচ্ছে ওয়েল্‌সের একটা ছোট্ট শহরের—LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWILLLANTYSILIOGOGOGOCH. কিন্তু এত বড় নামটা শুধু স্টেশনেই লেখা আছে—লোকে বলে LLanfair P. G.

॥ সুড়ঙ্গ বা টানেল ॥

পাহাড় ডিঙিয়ে এপার থেকে ওপারে যাওয়া বড় কষ্ট, তাই মানুষ দেশে দেশে পাহাড় কেটে সোজা পথ করে নিয়েছে। এই পথকে বলে টানেল বা সুড়ঙ্গ। আল্‌প্‌স্ পাহাড়ের দু'জায়গায় ফুটো করে তৈরী হয়েছে সিম্পলন টানেল, লম্বায় ১২½ মাইল, প্রায় ২০ কিলোমিটার; আর, সেণ্ট্ গট্‌হার্ড টানেল, প্রায় ১৫ কিলোমিটার। এর চেয়েও বড় টানেল আমেরিকার শ্যাণ্ডাকেন টানেল। ২৯ কিলোমিটার লম্বা সেটা। এদেশে কাশ্মীরে জওয়াহর টানেল উল্লেখযোগ্য।

সাহারা মরুভূমির ওয়েসিস

॥ খাল ॥

পৃথিবীকে বাসের যোগ্য করে নেবার জন্যে মানুষ আরও কত শক্ত শক্ত কাজ করেছে। তার মধ্যে বড় বড় খাল কাটার কথা বলা যেতে পারে। চার হাজার বছর আগে, যখন মানুষ উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শেখে নি, তখনই মিশর দেশের রাজারা নীলনদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত এক বিশাল খাল কেটেছিলেন। চীন দেশে ২৫০০ বছর আগে হ্যাংচাও থেকে পিকিং পর্যন্ত প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার লম্বা গ্র্যাণ্ড ক্যানাল কাটা হয়। এটি এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে লম্বা খাল।

তারপর নাম করা যেতে পারে রাশিয়ার বালটিক-হোয়াইট সী খাল, ২১০ কিলোমিটার লম্বা।

তবে, জাহাজ চলাচলের জন্যে খাল কেটে দুই সাগরকে যোগ করা হয়েছে দু'জায়গায়। একটা, ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগরের মধ্যে ১৬৫ কিলোমিটার সুয়েজ খাল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপ্স এই খাল কাটা শেষ করেন।

দ্বিতীয় খালটি হচ্ছে মধ্য-আমেরিকাতে পানামা খাল। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ যেতে হলে পুরো দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে যেতে হত, অথচ মধ্য-আমেরিকার আটলান্টিকের ধারে পানামা শহর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে কোলন শহর সোজা ৬৫ কিলোমিটারও নয়। এই পথটুকু কেটে পানামা খাল করে নেওয়া হয়েছে। এ কাজের এঞ্জিনীয়ার ছিলেন গয়ট্হাল্স্ (Goethals). ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট এই খালে প্রথম জাহাজ চলেছিল।

সুয়েজ খাল কাটা হচ্ছে

খোকনের নামে একটা চিঠি এসেছে কানাডা থেকে। লম্বা খাম। ডানদিকের কোণে একটা সুন্দর ডাকটিকিট। চিঠি লিখেছে খোকনের কাকা। তিনি সেখানে ডাক্তার হয়ে গেছেন। চিঠি পড়তে পড়তে খোকন তন্ময়।

হঠাৎ কে যেন তাকে ডাকলে, "খোকন, খোকন?"

কিন্তু কেউ তো কোথাও নেই। টেবিলে নানা রকম বই ছড়ানো—দেয়ালে ঘড়িটা টক্‌টক্ করে বাজছে।

খোকন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে অবাক্ হয়ে।

এমন সময়ে আবার খুব মৃদুস্বরে কে ডাকল, "খোকনমণি!"

তখন ঘুমে খোকনের চোখ জড়িয়ে আসছে। সে ঘুম-জড়ানো স্বরে বললে, "কে?"

"আমি চিঠি। এই যে টেবিলের উপর শুয়ে আছি। দেখতে পাচ্ছ না?"

খোকন তো অবাক্! "চিঠি আবার কথা বলে নাকি?" সে আপন মনে বলে ওঠে।

চিঠি তখন বলে, "বলে বৈকি! চিঠিই তো কথা। তোমার কাকার কথা তো আমি তোমাকে পৌঁছে দিলাম। ভাবো তো কত হাজার মাইল পথ এসেছি আমি। এই পথে কত দেশ দেখেছি—কত নদী পেরিয়েছি—কত সাগর পার হয়েছি।"

খোকনের বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু চিঠিটা চুপ করে যেতে সে তাগিদ দিল, "বলো না কি করে এলে এখানে—আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।"

চিঠিটা বলতে লাগল, "ডাকঘর কি জানো?"

"জানি, যেখানে সব চিঠি পৌঁছয় আর সেখান থেকে চিঠিগুলো ঠিক ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। এখানে খাম, পোস্টকার্ড, টিকিট বিক্রি হয়।"

"ডাকঘর কে চালায় বলো তো?"

"দেশের সরকার চালায়।"

"ঠিক কথা। সব দেশেই সরকার প্রথমে নিজেদের খবর আনা-নেওয়ার জন্যে ডাকের ব্যবস্থা শুরু করে। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখা যায় যে জনসাধারণের চিঠিও যদি সরকার থেকে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়, তাতে সরকারেরও লাভ, দেশের লোকেরও উপকার। তাই ইংল্যাণ্ডে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাকবিভাগের কর্তা উইদারিংস সাহেব সে ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশে সেটা হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে।"

বাধা দিয়ে খোকন বললে, "কিন্তু যখন ডাকঘর হয় নি, তখন কি করে লোকে খবর পাঠাত?
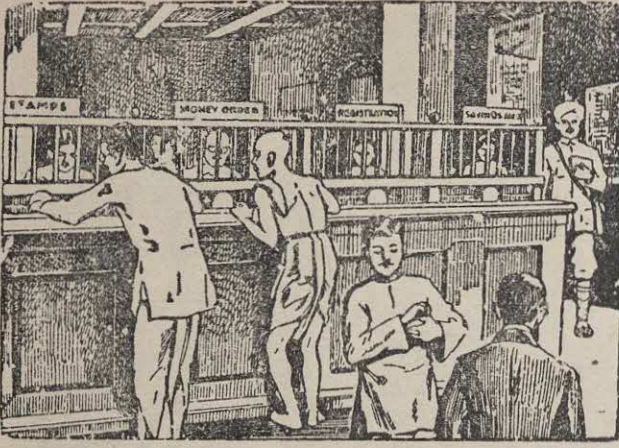
ডাকঘর

প্রাচীনকালে যখন ডাক-ব্যবস্থা ছিল না তখন কি করে লোক নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখত ?”

চিঠি বললে, “শুনেছি যে কখনও কখনও শিক্ষিত পোষা পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে তাকে ছেড়ে দিলে সে উড়ে গিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছুতো, সেখানে তার আনা চিঠিটা খুলে নেওয়া হত। কিন্তু তার ওপরে আর কতটুকু নির্ভর করা যায় ? চিঠি পাঠাতে হলে লোক দিয়েই পাঠাতে হত। কিন্তু তাতে খুব বেশী খরচ পড়ত। একজন যখন বিদেশে যেত—যাদের সেখানে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন আছে তারা তার কাছে খবর পাঠাতো। খরচও কিছু দিতে হত। কতক লোক পয়সা পেলে দূর দেশে চিঠি নিয়ে যেত—সেটা ছিল তাদের পেশা। আবার ব্যবসায়ীরাও বহু লোকের খবর বয়ে নিয়ে যেত। আচ্ছা, তুমি তো সম্রাট শের শাহের কথা ইতিহাসে পড়েছ ?”

খোকন বললে, “তা পড়েছি। তাঁর আমলে ঘোড়ার পিঠে ডাক যেত।”

“এখনও বহু দেশে ডাকবাহীরা ঘোড়ায় চড়ে, উটে চড়ে ডাক বয়ে আনে। সাইকেল, গরুর গাড়ি, মোটর, রেল, জাহাজ, উড়ো-জাহাজ ইত্যাদি নিত্য ডাক বইছে। মেল রানার (runner) বা ডাক-হরকরার কথা জানো ত ?”

খোকন বলে উঠল, “জানি। ওদের গায়ে সাদা ফতুয়া, মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে দীর্ঘ বর্শা, তাতে ঘণ্টা বাঁধা। ওরা যখন ডাকগাড়িতে ডাক দিতে যায়, তখন ওদের পিঠে থাকে ডাকের বোঝা ! আর ওরা ছুটে চলে আর ঠুং ঠুং করে ঘণ্টা বাজে।”

চিঠি বললে, “গ্রেট ব্রিটেনে অনেক রানার পায়ে হেঁটে ডাক বয়ে আনে। যাদের দূরে যেতে হয় তারা গাড়ি ব্যবহার করে। উত্তরে বরফের দেশে বল্‌গা হরিণের গাড়িতে ডাক যায়, নদীবহুল দেশে নৌকো করে ডাক যায়, আবার মরু অঞ্চলে যায়

ঘোড়ার পিঠে ডাক নিয়ে যাচ্ছে

ডাক-হরকরা

বল্‌গা হরিণে-টানা স্লেজ গাড়ি করে ডাক বইছে

উটের পিঠে। রাশিয়ার বরফ-ঢাকা অঞ্চলে স্লেজ গাড়িতে ডাক যায়—সে স্লেজ গাড়ি কুকুরে টানে।"

"আচ্ছা, কবে থেকে এদেশে ডাক-ব্যবস্থা রীতিমতো চালু হল?" খোকন জিজ্ঞাসা করলে।

চিঠি বললে, "লর্ড ক্লাইবের নাম শুনেছ কি? তিনিই ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ডাক-ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু সে ব্যবস্থা শুধু সরকারের কাজের সুবিধের জন্যে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জনসাধারণের জন্যে ডাক-ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ডাকটিকিট চালু হয় শুধু সিন্ধুদেশে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশের সব জায়গায় এক রকম মাসুলের হার চালু হয়। তিন রকম ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিলঃ (১) সাদা কাগজে একটা শুধু ডিজাইন ছাপা হয়, (২) সাদা কাগজে নীল কালিতে ডিজাইন ছাপা হয়, আর (৩) লাল কাগজে ডিজাইন ছাপা হয়।

"ইংল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্যের মধ্যে সর্বত্র মোটে এক পেনি মাসুলে চিঠি যাবে, এ ব্যবস্থা হয়েছিল রোল্যাণ্ড হিল-এর আন্দোলনের ফলে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

মরুভূমিতে উট ডাক বইছে

স্যার রোল্যাণ্ড হিল

পরে তিনি ইংল্যাণ্ডের ডাকবিভাগের কর্তা হন, এবং স্যার উপাধি পান। তার আগে দূরত্ব অনুসারে পত্র-প্রাপকের কাছ থেকে কম বা বেশী ডাকমাসুল আদায় করা হত। অনেক সময় সে পয়সা দিতে রাজী হত না, তাতে সরকারের ক্ষতি হত। তাই নিয়ম হল যে, চিঠি যে পাঠাবে, সে-ই আগে থেকে মাসুল দিয়ে দেবে, আর, যত মাসুল তত দামের টিকিট লাগিয়ে দিলেই সে-কাজটা হল।"

খোকন বললে, "সরকার না হয় টিকিট ছাপালো কিন্তু অন্য লোকও তো তেমনি টিকিট ছাপিয়ে সরকারকে ফাঁকি দিতে পারে?"

"ঠিক বলেছ!" চিঠি খোকনকে তারিফ করে বলে উঠল, "কিন্তু সে ব্যাপারে

জলছাপ

সরকারেরও হুঁশ ছিল। জলছাপ (water-mark) দেওয়া বিশেষ একরকম কাগজ তৈরী হল ডাকটিকিটের জন্যে। তার পিছনে আঠা লাগানো হলো যার সাহায্যে সেটা খামের উপর আঁটা সহজ হলো; আর টিকিটের চারধারে এমন ভাবে ফুটো ফুটো করে দেওয়া হল যে তাদের সেই ফুটো বরাবর ছিঁড়ে আলাদা আলাদা করা যায়।"

"আচ্ছা, শুধু গ্রেট ব্রিটেন আর ভারতের কথাই বলছ তুমি। অন্য দেশে কি ডাক-ব্যবস্থা ছিল না?" খোকন জিজ্ঞাসা করলে।

"ছিল বইকি! সবদেশেই এই চিঠি পাঠানোর প্রয়োজনটা দেখা দিয়েছিল, আর সব দেশই একটা উপায় বার করেছিল। রোমে ঘোড়সওয়ার বড় রাস্তা দিয়ে চিঠি বিলি করে বেড়াত। মাঝে মাঝে ডাকঘর ছিল। এখানে সওয়ার বদল হত। প্রাচীন পারস্যে যীশু জন্মাবার ছ'শ বছর আগেও চিঠি বিলির ব্যবস্থা ছিল। আরব-ভ্রমণকারী ইবন বতুতা সুলতান মহম্মদ তুঘলকের সময়ে (১৩২৫-১৩৫১ খ্রীঃ) ভারতে আসেন। তখন ভারতে ঘোড়ার সাহায্যে ও পায়ে হেঁটে ডাকবিলির সুন্দর ব্যবস্থা তিনি দেখে গেছেন। মার্কো পোলো ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান।
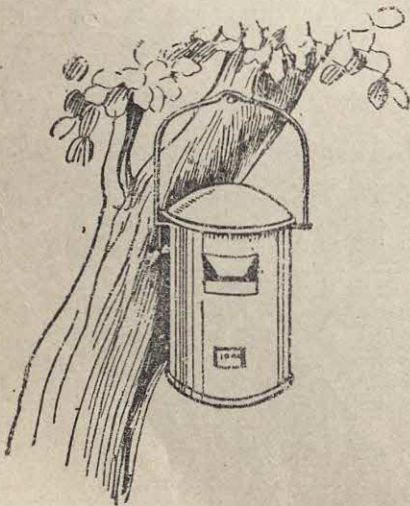
ডাক-বাক্স

ট্রেনে তোলবার আগে মেল-ব্যাগ পরীক্ষা হচ্ছে

তিনি লিখে গেছেন যে চীনদেশে দশ হাজার পোস্ট অফিস তখনই ছিল।"

খোকন বললে, "আচ্ছা, চিঠি তো অনেক অনেক আসে—তাদের ঠিক ঠিক ঠিকানায় পাঠানো হয় কি ভাবে, তাই ভাবছি!"

চিঠি বললে, "চিঠি লেখা হলে তাকে একটা ডাকবাক্সে ফেলতে হয়। তাই, লোকের সুবিধে মত নানা জায়গায় ডাকবাক্স রেখে দেওয়া হয়। এই চিঠির বাক্স কোথাও বসানো হলে সেটা কোন নির্দিষ্ট ডাকঘরের অধীনে থাকে। চিঠি খালাস করার একটা সময় থাকে। সেই সময়ে ডাকঘর থেকে লোক এসে বাক্স থেকে চিঠিগুলো বার করে থলিতে ভরে সেগুলো নিয়ে ডাকঘরে যায়। সেই ডাকঘরের অধীনে সব চিঠির বাক্সের চিঠি সে সময়ে ডাকঘরে এসে উপস্থিত হয়। তখন কয়েকজন পোস্ট ম্যান (ডাক বিভাগের লোক) সেই চিঠি ঠিকানা ও ডাকঘর হিসেবে আলাদা আলাদা করে তাড়া বাঁধে। একে বলে সর্ট (sort) করা। এক এক অঞ্চলের চিঠি এক এক তাড়ায় বাঁধা হয়। তারপর সেগুলো থলিতে ভরে উপরে লেবেল দিয়ে 'মেল ভ্যান'-এ তুলে দেওয়া হয়। মেল ভ্যান ডাকঘর থেকে এমনি সব চিঠি নিয়ে বড় ডাকঘরে (কলকাতায় জি. পি. ও.) হাজির হয়। সেখান থেকে সেগুলোকে একত্র করে এক এক মেল ট্রেনে (ডাকবাহী ট্রেনে) তুলে দেওয়া হয়। মেল গাড়িতে কয়েকটি ডাককামরা (mail van) থাকে।

পোস্টম্যান

সেখানে সেগুলো ঠিকানা হিসেবে আলাদা করা হয়। তা থেকে চিঠিগুলো নিয়ে আবার এক-এক স্টেশনের জন্যে আলাদা করা হয় ও সেই সেই স্টেশনে সেই সেই থলিগুলো নামানো হয়। মনে রেখো চিঠির থলি নামানো ও নতুন থলি ওঠানো দুটোই এক সঙ্গে চলে ও অল্প সময়ের মধ্যে মেল ট্রেনের ডাক-বিভাগের লোকেরা তাদের ব্যবস্থা করে ফেলে। তারপর ডাকঘরে এলে পোস্টম্যান সেগুলি যথাস্থানে পৌঁছে দেয়।"

খোকন বলে, "ওরে বাবা! সে যে বিরাট কাণ্ড!"

"মেল ট্রেন ছাড়া এরোপ্লেনেও ডাক যায়। তার মাস্তুল বেশী। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি প্রথম উড়োজাহাজে করে ছ' হাজার চিঠি পাঠানো হয়েছিল। ডাকঘরে যেমনি সাধারণ ডাকের চিঠি বিলি হয় তেমনি এই এয়ার-মেলের চিঠিগুলিও বিলি হয়।

"খবর পাঠাবার আর একটা উপায় আছে, তা হচ্ছে তারের খবর বা টেলিগ্রাফ। তাতে চিঠিটা যায় না, শুধু খবরটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় টেলিগ্রাফ করে।

"তারের খবরের একটা আলাদা বিভাগ আছে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে ডায়মণ্ড হারবারে প্রথম টেলিগ্রাফে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। এই টেলিগ্রাফ লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র একুশ মাইল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে আগ্রা পর্যন্ত টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। এইভাবে পরে একদিকে বোম্বাই ও অন্যদিকে পেশোয়ার পর্যন্ত এই লাইন বাড়ানো হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের

এরোপ্লেনেও ডাক যায়

২৭শে জানুয়ারি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন চালু হয়।

"১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পোস্ট অফিসে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক (অর্থাৎ, জনসাধারণের থেকে টাকা জমা নেবার) বিভাগ খোলা হয়েছে। ডাকঘরের মারফত মনি অর্ডার-যোগে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্যাকেট ও পার্শেল ইত্যাদি পাঠাবার কাজও ডাকঘর করে থাকে। সেগুলো যাতে না হারায় সেজন্যে রেজিস্ট্রী বিভাগ আছে। চিঠি, পার্শেল ইত্যাদি ইনসিওর (insure) করাও যেতে পারে, তাতে চিঠি ইত্যাদি হারালে সরকার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। অবশ্য, ইনসিওর করে পাঠালে, বেশী মাস্তুল দিতে হয়। এসব চিঠির জন্যে ডাকঘর বিশেষ যত্ন নেয়। সত্বর চিঠি যাবার জন্যে 'এক্সপ্রেস্ ডেলিভারী'র জন্যে অতিরিক্ত মাস্তুল দিতে হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার
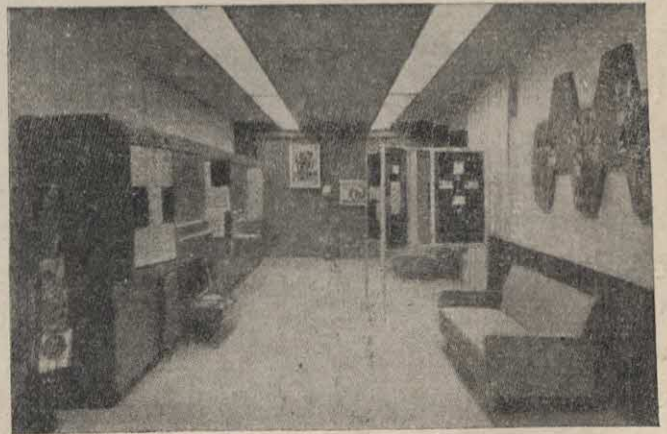
নয়া দিল্লীতে অবস্থিত ভারতীয় ডাক-টিকিটের জাদুঘর

সিন্ধুপ্রদেশের প্রথম ডাকটিকিট

বড় ডাকঘর (জি. পি. ও.) খোলা হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভি. পি. বা প্রাপ্তিমাত্র মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় মাল পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

"নয়া দিল্লীতে ডাকটিকিটের জাদুঘর করা হয়েছে একটা। এখানে দুর্লভ টিকিটের সংগ্রহ রাখা হয়েছে।"

খোকন বলে উঠল, "আমিও তো ডাকটিকিট জমাই। আমার এক হাজার সাত শ তিপ্পান্নটা ডাকটিকিট আছে।"

চিঠি বললে, "সিন্ধুপ্রদেশে প্রথম যে টিকিট বের করা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই তোমার নেই?"

খোকন বললে, "সে কোথায় পাবো? তাছাড়া তার বর্তমান দাম কয়েক হাজার টাকা যে!"

চিঠি বললে, "বর্তমান কালে ডাকঘরের কাজ খুব বেড়ে গেছে। বিশেষ করে এর সঙ্গে তারবার্তার ব্যবস্থা যুক্ত হয়েছে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে প্রথম টেলিগ্রাম ব্যবস্থার চলন হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চলনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। ভারতে সর্বমোট ১৫ হাজারের মতো তার অফিস আছে। এসব তারের খবর ইংরেজীতে দেওয়া হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবনাগরী ভাষায় লেখা টেলিগ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে প্রায় তিন হাজার তার অফিসে।

"কম খরচে প্রীতি ও শুভেচ্ছা (Greetings) জানিয়ে তারবার্তা দেবনাগরী ও ইংরেজী ভাষায় লেখা সুন্দর ছবিওলা কার্ডে ও সুন্দর খামে ভরে পাঠাবার ব্যবস্থা তারবিভাগ করেছে। এর জন্যে নম্বর-দেওয়া কয়েকটা বাঁধা গৎ আছে, তোমার ইচ্ছামত ভাষায় Greetings টেলিগ্রাম চলবে না। তুমি তার মধ্যে পছন্দমত একটা বেছে নিয়ে শুধু তার নম্বরটা টেলিগ্রাম করবে, টেলিগ্রাফ অফিস সেই নম্বরের বাঁধা গৎটা পাঠিয়ে দেবে। ১৯৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এরকম তেতাল্লিশ হাজার বার্তা পাঠানো হয়েছিল।"

খোকন বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে টুকুমাসী আমাকে এরকম একটি বিজয়া-বার্তা পাঠিয়েছিলেন বোম্বাই থেকে।"

"কত শুনবে? দেশ এগিয়ে চলেছে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ থেকে 'প্রিন্টোগ্রাম সার্ভিসের' প্রচলন হয়েছে।"

চোখ বড়ো বড়ো করে খোকন বললে, "সে আবার কি? ভালো করে বুঝিয়ে বলো। অত বড়ো বড়ো ইংরেজী কথা বললে আমি বুঝব কি করে?"

"ঠিক, ঠিক। বুঝিয়ে বলছি। খবরের কাগজের জন্যে বহু খবর থাকে। সেগুলো প্রায় একই রকমের। সে সব খবর ছাপা হয়ে টেলিগ্রাফ অফিস থেকে খবরের কাগজওলাদের পাঠানো হয়। যে সব কাগজ এই খবরের জন্যে একটি নির্দিষ্ট টাকা জমা দিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করে, টেলিগ্রাফ অফিস থেকে তাদের সেই ছাপা খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সব টেলিগ্রাম সকলের আগে পাঠানো হয়। এই খবর পরের দিন কাগজে তোমরা দেখতে পাও।"

খোকন অবাক্ হয়ে বলে ওঠে, "ওরে বাবা! ডাকঘরের কাজ ত বিস্তর! শুধু চিঠি আর পার্শেল বা মনি অর্ডার ছাড়া এত রকম কাজ করতে হয় ডাক-তার অফিসদের!"

চিঠি বললে, "আরো আছে। 'টেলেক্স' (Tellex) নাম শুনেছ?"

"না তো। ওর মানে কি?"

"ওটা 'টেলিপ্রিণ্টার এক্সচেঞ্জে'র সংক্ষিপ্ত নাম। টেলিপ্রিণ্টার একরকম যন্ত্র। এ যন্ত্রের সাহায্যে টেলিগ্রামের খবর ছাপিয়ে পাঠানো হয়। এসব সংবাদের গ্রাহক খবরের কাগজ, ব্যবসাদার আর সরকারী অফিস।"

খোকন অবাক্ হয়ে শুনতে শুনতে বলে ওঠে, "অতশত তো আমার জানা ছিল না। তুমি আমাকে আজ কত কথাই শোনালে। তুমি খুব ভাল।"

"একটা কথা বলা হয়নি কিন্তু।" চিঠি বললে।

খোকন বললে, "তাহলে বলে ফেলো।"

চিঠি বললে, "তোমরা তো চিঠি লেখো, কিন্তু সব লিখেও মাঝে মাঝে একটা দারুণ ভুল করে বসো। ঠিকানা লিখতে কেউ একেবারে ভুলে যাও, আর কেউ বা এমন সাংঘাতিক ভুল কর যে, ডাকঘর সে সব চিঠি বিলোতে হিমশিম খেয়ে যায়। অনেক সময় তা পাঠানো সম্ভবই হয় না।"

"সে চিঠিগুলোর কি অবস্থা হয়?"

"সেই কথাই বলছি। তা চলে যায় ডি. এল. ও.-তে অর্থাৎ Dead Letter Office-এ। সে অফিস এই রকম বেওয়ারিস, বেঠিকানা চিঠির জাদুঘর। ডি. এল. ও.-তে সব চিঠি খোলা হয়। ভিতরে লেখকের নাম ঠিকানা থাকলে তা তাকে ফেরত পাঠানো হয়।"

খোকন বললে, "তা হলে প্রত্যেক চিঠিতেই লেখকের নাম ঠিকানা ও পুরো ঠিকানা লেখা দরকার।"

চিঠি বললে, "চিঠি লেখার এইসব নিয়ম প্রত্যেক স্কুলে শেখানো দরকার। চিঠির কাগজের ডানদিকে উপরের কোণে নিজের নাম, পুরো ঠিকানা ও চিঠি লেখার তারিখ দিতে হয়। যাকে চিঠি লিখবে সে যাতে তোমাকে উত্তর দিতে পারে সেজন্যে এটা লেখা দরকার। তাছাড়া চিঠি তুমি কবে লিখলে সেটাও তার জানা দরকার। খামের উপরে প্রাপকের পুরো নাম, ঠিকানা, ডাকঘর, জেলা, রাজ্যের নাম স্পষ্ট ও নির্ভুল করে লেখা দরকার। এখনকার নতুন নিয়মে PIN Code নম্বরটা লেখাও দরকার।"

খোকন বললে, "কথাটা পোস্টকার্ডে আর ইনল্যাণ্ড লেটারে ছাপা থাকে দেখেছি। কিন্তু কী ওটা!"

চিঠি বললে, "PIN হচ্ছে Postal Index Number-এর সংক্ষেপ। সারা ভারতকে ১, ২, ৩ করে ৮টা ডাক এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। যেমন বাংলা উড়িষ্যা আসাম পড়েছে ৭ নম্বরে। এখানকার সব ডাকঘরের নম্বর আরম্ভ হবে ৭ দিয়ে। তারপর দুটো সংখ্যা বসবে জেলার নম্বর, যেমন ৭নং এলাকায় কলকাতা জেলার নম্বর হল ০০। তারপরের তিনটে সংখ্যায় বোঝাবে ডাকঘর বিশেষের নম্বর—যেমন, কলকাতার বড় ডাকঘরের সংখ্যা ০০১। সবটা একসঙ্গে নিয়ে ছ'টা সংখ্যায় হবে PIN Code, যেমন কলকাতার বড় ডাকঘর বোঝাবে ৭০০০০১ দিয়ে, নয়াদিল্লীর বড় ডাকঘর হয়েছে ১১০০০১ ইত্যাদি।

পোস্ট অফিসে চিঠি সর্ট (sort) করা হচ্ছে

"তারপর, ঠিকানা লিখে খামে ঠিক ঠিক ডাকটিকিট ডানদিকে উপরের কোণে এঁটে দেবে। চিঠির ওজন হিসেবে মাসুল ধার্য আছে। কম মাসুল হলে যত কম মাসুল হবে তার দ্বিগুণ প্রাপকের কাছে ডাকঘর আদায় করে নেবে, এরকম চিঠিকে 'বেয়ারিং' চিঠি বলে।"

খোকন অনেকক্ষণ চুপ করে আছে কিন্তু চিঠির আর সাড়াশব্দ নেই।

খোকন জিজ্ঞেস করলে, "চিঠি, কথা কইছ না কেন? চিঠি, চিঠি?"

খোকনের বোন টুসকি ইতিমধ্যে পড়ার ঘরে এসে দেখলে দাদা টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছে।

সে দাদাকে এক ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলে। টুসকি হেসে বললে, "চিঠি, চিঠি বলে কাকে ডাকছিলে?"

"ডাকছিলুম?" চোখ কচলাতে কচলাতে খোকন বললে, "তাই নাকি? আরে ভারী মজার একটা স্বপ্ন দেখছিলাম!"

ডাকটিকিটের কথা

॥ খেয়ালের রাজা ॥

'ডাকটিকিটের রাশি—আমি ভালবাসি,
যদি তা পুরোনো হয়—ব্যবহার করা,
ছেঁড়া, কাটা, ছাপমারা, স্বদেশী, বিদেশী ;
তা সবে পরশি যেন হাতে পাই ধরা !"

এটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা। তিনি ডাকটিকিট জমাতে ভালবাসতেন। ডাকটিকিট বা স্ট্যাম্প জমানোর শখ (Stamp collecting) সারা পৃথিবীজোড়া একটা মজার খেয়াল। এই শখকে বলে 'খেয়ালের রাজা আর রাজা-রাজড়াদের খেয়াল' (the king of hobbies and the hobby of kings). ডাকটিকিট সংগ্রহ করাকে বলে Philately.

ভেবো না যে এটা একটা ছেলেখেলা ; অনেক বয়স্ক লোক এই খেয়ালে মেতে আছেন। দেশ-বিদেশের টিকিট তো এমনি পাওয়া যায় না ! তাদের কিনতে হয়। কোন কোন টিকিট অনেক কষ্টে পাওয়া যায় বলে তাদের দাম বেড়ে যায়। কাজেই সবরকম টিকিট যোগাড় করতে অনেক টাকা লাগে।

কোন দেশের একটা নতুন টিকিট বেরুলে সে দেশের লোকেরা তাদের চিঠিপত্রে সেটা ব্যবহার করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর যত টিকিট-সংগ্রহকারী সেটা সংগ্রহ করতে উৎসাহী হয়। অনেকে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সেটা সংগ্রহ করে ফেলে। যারা সংগ্রহ করতে পারে না তারা যায় টিকিটের দোকানে। সেখানে চাহিদা অনুযায়ী তার দাম বাড়ে বা কমে।

॥ ডাকটিকিট জমানোর সরঞ্জাম ॥

ডাকটিকিট জমাতে হলে কতকগুলি সরঞ্জামের দরকার হয়। প্রথমে চাই একখানি খাতা—যাকে বলে স্ট্যাম্প অ্যালবাম (album)। এই অ্যালবামের পাতায় টিকিট লাগিয়ে রাখতে হয়। প্রথম সংগ্রহ-কারীর পক্ষে বাঁধানো একটা মাঝারি সাইজের অ্যালবামই যথেষ্ট। এই অ্যালবামে টিকিট আটকাবার জন্যে দেশ-হিসেবে পাতা আছে। তাতে দেশের নাম ও নমুনা হিসেবে দু-একটি টিকিটের ফটো ছাপা থাকে।
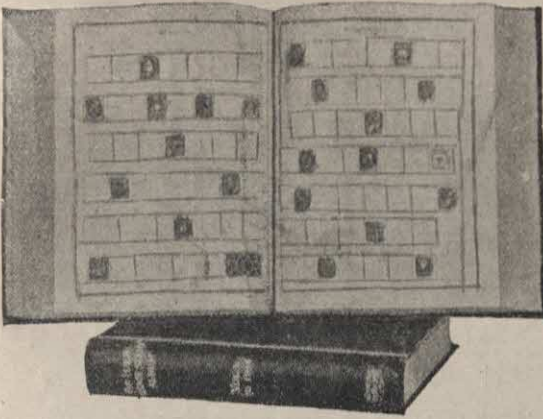
স্ট্যাম্প অ্যালবাম

পাতাগুলোয় টিকিট আটকাবার জন্যে ঘর কাটা থাকে। কিছুদিন টিকিট জমাবার পর দেখা যায় কয়েকটি পাতা ভরে উঠেছে। আর সে দেশের নতুন টিকিট আটকাবার জায়গা নেই। তখন সেখানে নতুন ঘরকাটা পাতা যোগ করে নিতে হয়। এ রকম ঘরকাটা কাগজ পুরনো ডাকটিকিটের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। এ ব্যবস্থা যাদের পছন্দ হয় না, তারা আলাদা আলাদা পাতাওলা (loose-leaf)
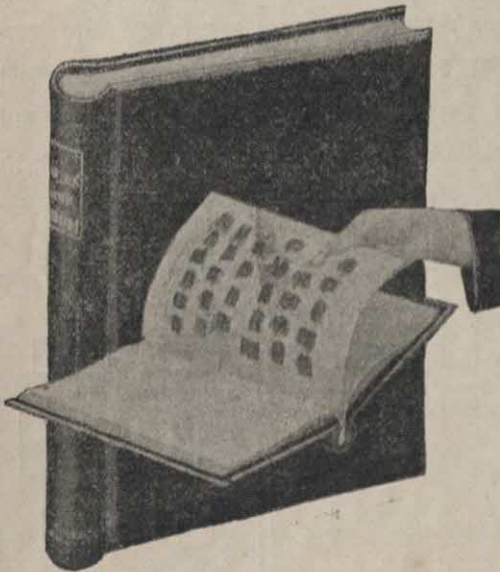
লুস-লিফ (loose-leaf) অ্যালবাম।
এই অ্যালবামের পাতা আলাদা করা যায়
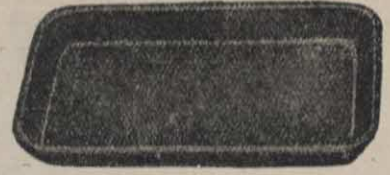
এই ট্রেতে জল দিয়ে খামের কাগজ থেকে
ডাকটিকিট ভিজিয়ে তোলা হয়

অ্যালবাম ব্যবহার করে। তার বাঁ দিকে ফুটো করা থাকে এবং পাতাগুলো খুলে তার পাশে নতুন পাতা যোগ করা যায়।

আবার এমন বড় সাইজের অ্যালবামও পাওয়া যায় যাতে প্রত্যেক দেশে আজ পর্যন্ত যত টিকিট বেরিয়েছে তার প্রত্যেকের জন্য পাতা ও স্থান চিহ্নিত আছে। তবে এ সব বড় বড় সংগ্রাহকদের জন্যে।

অ্যালবাম ছাড়া একটি ট্রের (Tray) দরকার। এই ট্রেতে জল দিয়ে ভিজিয়ে খামে-আঁটা ডাকটিকিট খাম থেকে তুলে নিতে হয়। তোলা হয়ে গেলে ডাকটিকিটের পিছনের আঠা ধুয়ে তাকে একটা ব্লটিং কাগজের উপর চেপে শুকিয়ে নিতে হয়। হাত দিয়ে টিকিট নাড়াচাড়া করলে টিকিট ময়লা হয়ে যায়। তাই টিকিট ধরবার জন্যে একরকম চিমটে পাওয়া যায়। তাকে বলে টুইজার্স (tweezers).

এছাড়া টিকিটের কাগজে যে জলছাপ থাকে তা দেখবার জন্যে এক রকম কালো ট্রে পাওয়া যায়। তার উপর টিকিট উল্টে রাখলে জলছাপটা স্পষ্ট দেখা যায়। একে বলে ওয়াটার-মার্ক ডিটেকটার (water-mark detector).

এ ছাড়া একটা বিশেষ ধরনের গজকাঠি দরকার। তা দিয়ে ডাকটিকিটের পাশের ফুটো (perforation) মাপা যায়। এই ফুটো নানা রকমের হয়। এক-

এইরকম চিমটে দিয়ে টিকিট ধরতে হয়
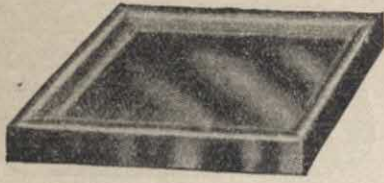
ওয়াটার-মার্ক ডিটেকটার
এতে টিকিট উলটো করে রাখলে জলছাপ দেখা যায়

এক দেশে এক-এক রকম আর কোন কোন দেশে বহু রকমের perforation ব্যবহার হয়।

এগুলি ছাড়া অ্যালবামে টিকিট আটকাবার জন্যে একরকম পাতলা কাগজের ব্যবহার হয়। তাকে বলে হিঞ্জ (hinges). সেই কাগজ দুমড়ে তার এক ধার অ্যালবামের সঙ্গে জোড়া হয় আর অন্য ধার জোড়া হয় টিকিটের সঙ্গে। এতে টিকিটটা যে-কোন সময়ে অ্যালবাম থেকে তুলে নেওয়া যায়। এসব যারা জানে না তারা আঠা দিয়ে টিকিটগুলি অ্যালবামে জুড়ে অ্যালবাম ও টিকিট দুই-ই নষ্ট করে।

॥ পার্ফোরেশন ॥

ডাকটিকিটের চারপাশে যে ফুটো থাকে তাকে বলে পার্ফোরেশন (perforation). এর সাহায্যে টিকিটগুলো আলাদা করা সহজ হয়। বড়ো বড়ো কাগজে এক সঙ্গে অনেক ডাকটিকিট ছাপা হয়। পার্ফোরেশন করা না থাকলে আলাদা করার সময়ে অনেক টিকিট ছিঁড়ে যেত। আগে অবশ্য কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে টিকিট আলাদা করা হত। যখন ডাক-টিকিটের কাগজ ছাপা হয় তখন তাদের মধ্যে সমান ফাঁক রাখা হয়। তাতে অনেক ডাকটিকিট এক সঙ্গে সহজে গোনা যায়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ডাকটিকিটের ব্যবহার চালু হলেও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের আগে সরকারী ভাবে পার্ফোরেশন করা হয় নি। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে হাউস অব কমনসে আর্চার সাহেব পার্ফোরেশন-করা ডাকটিকিট চালু করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট আর্চার সাহেবকে এটি পেটেণ্ট করার মূল্য বাবদ চার হাজার পাউণ্ড দেন। অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ডাকটিকিট চুরি বন্ধ করার জন্যে ডাকটিকিটের উপর তাঁদের নাম বা সীল পার্ফোরেশন করে দেন। এই পার্ফোরেশন না থাকলে, বা তাতে কোনও ভুল থাকলে সেই বিশেষ রকমের স্ট্যাম্পের পাতা বেশী দাম দিয়ে নেন সংগ্রাহকরা।
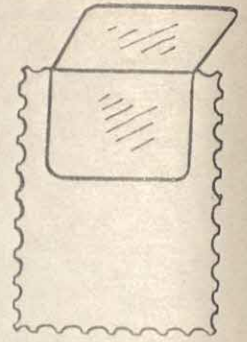
এই গজকাঠি দিয়ে ডাকটিকিটের পাশের ফুটো মাপা হয়

হিঞ্জ বা পাতলা আঠা মাখানো কাগজ

॥ ইংল্যাণ্ডের প্রথম ডাকটিকিট ॥

ইংল্যাণ্ডে চিঠিতে আঁটবার আলাদা (adhesive stamp) ডাকটিকিট প্রথম ব্যবহার হল এক স্কুল-মাস্টারের প্রচেষ্টায় (পরে তাঁকে ডাকবিভাগের কর্তা করা হয় ও স্যার উপাধি দেওয়া হয়)। তাঁর নাম রোল্যাণ্ড হিল। তাঁর আন্দোলনের ফলে ১৮৩৯
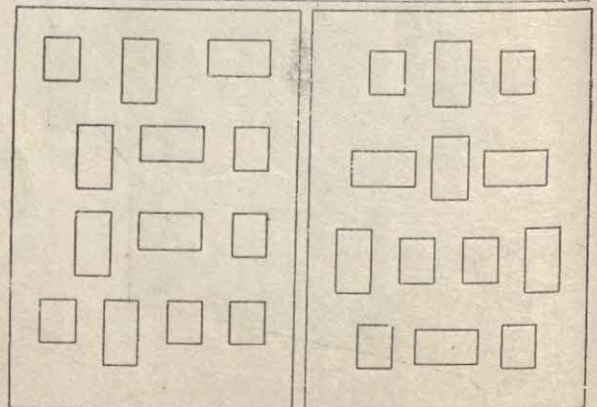
বাঁ দিকে যা তা করে মারা টিকিট ঃ
ডানদিকে সুন্দর করে সাজানো টিকিট

গ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে আইন পাস হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে কোন স্থানে চিঠি পাঠাবার জন্যে এক পেনির ডাকটিকিট ছাপার ব্যবস্থা হয়। প্রথম প্রথম এক পেনি আর দু পেনি—দু রকম টিকিট ছাপা হয়ঃ "পেনি ব্ল্যাক", "টুপেনি ব্লু"। তখন রানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি খোদাই করা ছাঁচ থেকে টিকিট ছাপা হত। খোদাইকার ছিলেন হেনরি করবুল্ড। জেকব পার্কিনস টিকিটের পিছনে আঠা দেওয়ার মেসিন আবিষ্কার করেন। চিঠির ওজন হিসেবে এক পেনি বা দু পেনি ডাক-টিকিট লাগাতে হত।

॥ ভারতের প্রথম ডাকটিকিট ॥

১৯৫৪ গ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ডাকটিকিট প্রচলনের শতবর্ষ পূরণ হওয়া উপলক্ষে দিল্লীতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। তাতে ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্দ থেকে সে সময় পর্যন্ত ছাপা টিকিটের একটি রঙিন অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছিল।

আসলে কিন্তু ১৮৫২ গ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই ভারতে প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিল—কিন্তু সে শুধু তখনকার সিন্ধু প্রদেশে চলতো। তারপর সারা ভারতের জন্য ডাকটিকিটের প্রথম প্রচলনের বছর ১৮৫৪ বলে ভারতে ডাকটিকিটের শত-বার্ষিকী প্রতিপালিত হয় ১৯৫৪ গ্রীষ্টাব্দে।

১৮৫২ গ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই সিন্ধু প্রদেশে যে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় তারও আগে ভারতে দু রকম ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিল ১৮৫০ গ্রীষ্টাব্দে। তাতে সিংহ ও একটা গাছের নকশা ছিল। ঐ টিকিট-গুলি কলকাতার টাঁকশালে ছাপা হয়েছিল। এ টিকিটগুলি শেষ পর্যন্ত চালানো হয় নি। ১৮৫২ গ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই যে টিকিট চালু হয় তাতে লাল, সাদা ও নীল এবং একটি গোল বেল্টের মাঝখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তীর আঁকা একটি নকশা 'এম্বস্' করে দেওয়া হত, আর ইংরেজীতে লেখা থাকতো Sinde District Dawk. প্রত্যেকখানি টিকিটের মূল্য ছিল দু পয়সা। এ সব পুরানো টিকিটের বর্তমান দর কয়েক শো টাকা। পুরোনো লাল রঙের টিকিটের দাম কয়েক হাজার টাকা।

১৮৫০ খ্রীঃ ভারতের ডাকটিকিট সিংহ ও গাছ

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দু' পয়সার (আধ আনার) ডাক-টিকিট। এই ডাকটিকিট খুব কম সংখ্যায় বাজারে ছাড়া হয়েছিল

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিলা রু অ্যাণ্ড কোম্পানির

উপরের বাঁদিকে ভারতের প্রথম ডাকটিকিট। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল। ডানদিকে কোম্পানির আমলের প্রথম ডাকটিকিট। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল। নীচে বাঁদিকে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম ডাকটিকিট। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল। ডানদিকে সপ্তম এডওয়ার্ডের করোনেশন উপলক্ষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ডাকটিকিট।

বিলাতের ছাপাখানায় চার আনা দামের একরকম টিকিট ছাপা হয়। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে নাসিক শহরে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ভারতীয় ডাক-টিকিট ছাপাবার ব্যবস্থা হয়। গান্ধী-স্মারক ডাক-টিকিটগুলি ফটোগ্রেভিওর (Photcgravure) পদ্ধতিতে সুইজার্ল্যাণ্ডের কুরভয়জিয়ার প্রতিষ্ঠান থেকে ছাপিয়ে আনা হয়। পরে ভারতেই ফটোগ্রেভিওর পদ্ধতিতে টিকিট ছাপা হচ্ছে।

ভারত স্বাধীন হবার পর নানা রকম স্মারক টিকিট বেরিয়েছে। এগুলি সংগ্রহ করা এক মহা সমস্যা। এখন শুধু ভারতীয় টিকিট সংগ্রহ করাও কারো কারো শখ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ভারত সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দেশীয় ও করদ রাজ্যগুলি নিজস্ব ডাকটিকিট ছাপা শুরু করে। চাম্বা, গোয়ালিয়র, ঝিন্দ, পাতিয়ালা, ভূপাল, নাভা, কোচিন ইত্যাদি নিজ নিজ ডাকটিকিট ছাপাতে থাকে। এখন এ সব দেশীয় রাজ্যের টিকিট দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। কারণ এসব ছাপানো বন্ধ হয়ে গিয়াছে বহুকাল হলো। এসব দেশীয় রাজ্য এখন আর নেই—এরা সব ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে গিয়েছে।

ভারতের নানা রকম ডাকটিকিট

ভারতের আরো কয়েক রকম ডাকটিকিট

॥ মিণ্ট ও ব্যবহৃত টিকিট ॥

ডাকটিকিটের দরকার চিঠি পাঠাবার জন্যে। কিন্তু দিন দিন দেশে দেশে এত সংগ্রহকারী বেড়ে উঠছে যে তাদের চাহিদা মেটাবার জন্যে বহু টিকিট বাড়তি ছাপাবার দরকার হয়ে পড়েছে। এজন্যে ব্যবসায়ীরা টিকিট প্রকাশিত হওয়া মাত্র অব্যবহৃত নতুন টিকিট কিনে সংগ্রহ করে রাখেন। অব্যবহৃত নতুন টিকিটের নাম 'Mint'. Mint টিকিট সুন্দর ও ঝক-ঝকে ; তাতে ডাকঘরের ছাপ নেই। সেজন্যে অ্যালবামে আটকালে সুন্দর দেখায়। মিণ্ট টিকিটের চেয়ে ব্যবহার-করা টিকিটের দাম ও চাহিদা বেশী।

জীবজন্তু ও পশু-পাখির ছবি-দেওয়া ডাকটিকিট

তারা চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে তাদের কাজ করে এসেছে এবং অক্ষত অবস্থায় আছে। এরকম টিকিট সংগ্রহ করা সহজ নয়। সেজন্যে সব সময়ে ব্যবহার-করা টিকিটের বাজার দর মিণ্টের চেয়ে বেশী।

এই ছাপমারা টিকিট পাবার আর একটা উপায় আছে। ডাকবিভাগ যেদিনই কোনও নতুন টিকিট বের করে, সেদিনই সেই টিকিট-লাগানো কিছু খামে সেইদিনকার ডাকঘরের ছাপ মেরে তা বিক্রি করে। তাকে বলে First Day Cover. ডাকটিকিট সংগ্রাহকরা তা কেনে। এতে সুবিধে এই যে ছাপও থাকে, আর তা থেকে টিকিটটার বেরোবার তারিখও জানা যায়।

॥ নিত্য নতুন ডাকটিকিট ॥

আজকাল ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের মুখ চেয়ে প্রত্যেক দেশ নিত্য নতুন ডাকটিকিট বার করছেন। সুন্দরভাবে ছাপা ছবি হলে তাদের আলাদা আদর। তাছাড়া স্মারকটিকিটগুলির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাধারণ সংগ্রাহক, যাঁরা টিকিট পেলেই জমান, তাঁদের সংগ্রহ ক্রমশঃই এলোমেলো হয়ে পড়ছে। তাই অনেকে সারা পৃথিবীর (whole world) টিকিট জমানো ছেড়ে বিশেষ বিশেষ দেশের টিকিট জমানো ধরেছেন। কেউ বা শুধু ব্রিটিশ উপনিবেশ ও গ্রেট ব্রিটেনের টিকিট জমান, কেউ শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের, কেউ শুধু রাশিয়ার, কেউ শুধু ভারতবর্ষের। পশুপাখির ছবি-দেওয়া টিকিট, ম্যাপের ছবি-দেওয়া টিকিট, মহৎ লোকদের ছবি-দেওয়া টিকিট—এই রকম সংগ্রহও কৌতূহল জাগায়।

বাংলাদেশের নতুন ডাকটিকিট

ভিয়েৎনামের ডাকটিকিট

॥ কয়েকজন নামকরা ডাকটিকিট-সংগ্রাহক ॥

জার্মানীর কাউন্ট ফিলিপ ফন ফেরারিকে 'স্ট্যাম্প কালেক্টার নাম্বার ওয়ান' উপাধি দেওয়া হয়েছে। ফেরারিকে ডাকটিকিট জমাতে উৎসাহ দেন তাঁর মা। দশ বছর বয়স থেকে তিনি টিকিট জমাতে শুরু করেন। তিনি মস্ত ধনী ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে আড়াই কোটি টাকার সম্পত্তি দিয়ে যান। কিন্তু হালচাল, বেশভূষা কোন দিকেই তাঁর নজর ছিল না। প্রতি সোমবার ছিল তাঁর টিকিট কেনার দিন। সেদিনের জন্যে তাঁর বরাদ্দ ছিল পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ। প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অংশ হিসেবে জার্মান গভর্নমেণ্ট কাউন্ট ফেরারির এই অমূল্য সংগ্রহ দিয়ে দেয় ফরাসী সরকারকে। এইভাবে ফেরারির সংগ্রহ ফরাসী সরকারের হাতে এসে পড়ে। সে সংগ্রহ সেকালের হিসেবে ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যে নিলামে বিক্রি হয়ে যায় প্যারিস শহরে।

ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ, রুমানিয়ার রাজা ক্যারল, স্পেনের রাজা আলফান্সো ও মিশরের রাজা কুয়াদ ও তাঁর ছেলে ফারুক, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও জার্মানীর হিটলার ডাকটিকিট-সংগ্রাহক ছিলেন। পঞ্চম জর্জের মৃত্যুর পর ষষ্ঠ জর্জ ও রানী এলিজাবেথ এই সংগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাজা ক্যারলের সংগ্রহ-করা টিকিটের সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁর মায়ের ডাকটিকিট সংগ্রহের খাতা পেয়ে টিকিট জমাতে শুরু করেন। তাঁর সংগ্রহ ছিল চল্লিশখানি অ্যালবামে—টিকিটের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। এ সংগ্রহ দু লক্ষ একুশ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছিল।

আমেরিকার কর্নেল এড্ওয়ার্ড হাউল্যাণ্ড রবিনসন গ্রীনের শখ ছিল রেডিও, মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন আর ডাকটিকিটের। একদিন তিনি সাতাত্তর হাজার ডলার পর্যন্ত খরচ করে টিকিট কেনেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জমানো টিকিট ৩০ লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়।

এরপর নাম করা যায় আর্থার হিণ্ডের। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে অবশেষে ডাকটিকিট সংগ্রহের শখ ধরলেন। তিনি তিন হাজার ডলার ব্যয় করে ১২০০ টিকিট কিনে সংগ্রহ শুরু করেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের সঙ্গে রেষারেষি করে তিনি প্যারিসে ফেরারির ডাকটিকিটের নিলামে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এক সেণ্ট দামের ব্রিটিশ গায়েনার একটি টিকিট ৭৩৪৩ পাউণ্ড দিয়ে কিনে নেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সংগ্রহ (ব্রিটিশ গায়েনার টিকিটটি বাদে) দশ লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়। এই সংগ্রহ কেনেন এইচ. আর. হার্মার। এখন ব্রিটিশ গায়েনার সেই এক সেণ্ট টিকিটের দাম দশ লক্ষ ডলার।

॥ সবচেয়ে দামী ডাকটিকিট ॥

এই স্ট্যাম্পটির এত দাম কেন ? এটি পৃথিবীর বিরলতম টিকিট। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গায়েনাতে

নেপালের ডাকটিকিট

উপরের সারির টিকিটগুলি প্রজাতন্ত্রী ভারতের স্মারক ডাকটিকিট
নীচের সারির প্রথম ডাকটিকিটটি ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষার শতবার্ষিকী স্মারক ডাকটিকিট

হঠাৎ দরকার হওয়ায় তাড়াতাড়ি করে এক সেণ্ট দামের কয়েকখানা স্ট্যাম্প নীল রঙের আর ম্যাজেণ্টা রঙের কাগজে ছাপানো হয়। ম্যাজেণ্টা রঙের একখানা কি করে যেন ফেরারির হাতে এসেছিল, তা ছাড়া আর একটিও গত প্রায় একশো বছর ধরে খুঁজেও কেউ পায় নি। এটি আটকোণা চেহারার, ম্যাজেণ্টা রঙের। একটি তিন মাস্তুলওলা জাহাজের ছবি এতে আছে। ফেরারির সংগ্রহ থেকে নীলামে আর্থার হিণ্ড এটা কেনেন। আশ্চর্য, হিণ্ডই আর একখানা এই স্ট্যাম্প কেনেন এক জাহাজের খালাসীর নিকট থেকে। কিনেই তিনি সেটা পুড়িয়ে ফেললেন। কাজেই আগে কেনা স্ট্যাম্পখানা অদ্বিতীয় হয়ে রইল।

॥ ডাকটিকিট থেকে আমরা কি শিখতে পারি ॥

আমরা ডাকটিকিট থেকে আনন্দের সঙ্গে ভূগোল শিখতে পারি। অনেক বিদেশী শব্দ, বিদেশে প্রচলিত মুদ্রা, ঐতিহাসিক ঘটনা, রাজা বা প্রেসিডেণ্টের ছবি, সে সব দেশের গাছপালা, পশুপাখি, নদীপর্বত, প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্থাপত্য, বিখ্যাত ব্যক্তি—এসব ডাকটিকিট থেকে জানা যায়। বিভিন্ন দেশের ডাকটিকিটে আজকাল সেই সব দেশের সংস্কৃতির কথা প্রচার করা হয়।

ডাকটিকিট সংগ্রহকারীর যথেষ্ট সৌন্দর্যবোধ জন্মায়। ডাকটিকিট থেকে পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা হয়।

ডাকটিকিট সংগ্রহ করাকে বলে ফিলাটেলি (Philately). যে টিকিট সংগ্রহ করে তাকে বলে ফিলাটেলিস্ট (Philatelist).

কয়েকটি দামী ডাকটিকিট। বাঁদিকে প্রথম দুটি মরিশাসের ডাকটিকিট। মাঝেরটি হাওয়াই দ্বীপের। তার পরেরটি মোলডাভিয়ার ডাকটিকিট এবং শেষেরটি ব্রিটিশ গায়েনার ডাকটিকিট

অস্ট্রেলিয়া ও নিউ জীল্যাণ্ডের ডাকটিকিট

॥ ডাকটিকিটের সবচেয়ে বড় দোকান ॥

লণ্ডনের স্ট্যানলি গিবন্‌স্ লিমিটেড পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডাকটিকিটের দোকান। এটি স্ট্র্যাণ্ড নামে রাস্তার উপর। প্রতি বছর এঁদের ডাকটিকিটের বিরাট মূল্য-তালিকা বার হয়। কোন্ টিকিটের কত মূল্য তা এই তালিকা থেকে বোঝা যায়। ভারতেও ফিলাটেলি ওরিয়েণ্ট, বোম্বে ফিলাটেলিক কোং ইত্যাদি অনেক দোকান হয়েছে।

॥ নয়া দিল্লীর জাতীয় ডাকটিকিট জাদুঘর ॥

নয়া দিল্লী ডাক-তার ভবনে জাতীয় ডাকটিকিটের জাদুঘর (National Philatelic Museum) স্থাপিত হয়েছে। এখানে আজ পর্যন্ত যত ভারতীয় ডাকটিকিট বেরিয়েছে সেগুলি ও অনেক বিদেশী ডাকটিকিটও রাখা হয়েছে।

সর্বপ্রথম যে সব ডাক-টিকিটের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা ছাপা হয়েছিল কিন্তু ব্যবহারের জন্যে বিক্রি হয় নি সেগুলোও এখানে দেখানো হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পাশে-ফুটো-না-করা ডাকটিকিটও এখানে আছে। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফির ফর্মে ব্যবহার করার জন্যে যে পাশে ফুটো-না-করা ডাকটিকিট বেরিয়েছিল তাও এখানে রাখা হয়েছে।

এ ছাড়া দশ টাকা মূল্যের গান্ধী-স্মারক শুধু সরকারী কাজে ব্যবহৃত ডাকটিকিটও কয়েকটি দেখানো হয়।

বিদেশী ডাকটিকিটগুলির মধ্যে Penny Black of 1840 (১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে যে কালো রঙের এক পেনি মূল্যের) ইংলণ্ডের ডাকটিকিট তাও এখানে আছে।

॥ জাল কুপার ॥

ডাকটিকিট সম্বন্ধে ভারতবর্ষে জাল কুপারের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বর্তমানে কেউ নেই। তিনি "India's Stamp Journal"-এর সম্পাদক। তিনি জাতিতে পার্শী। সাত বছর বয়স থেকে তিনি ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে শুরু করেন।

জাল কুপার
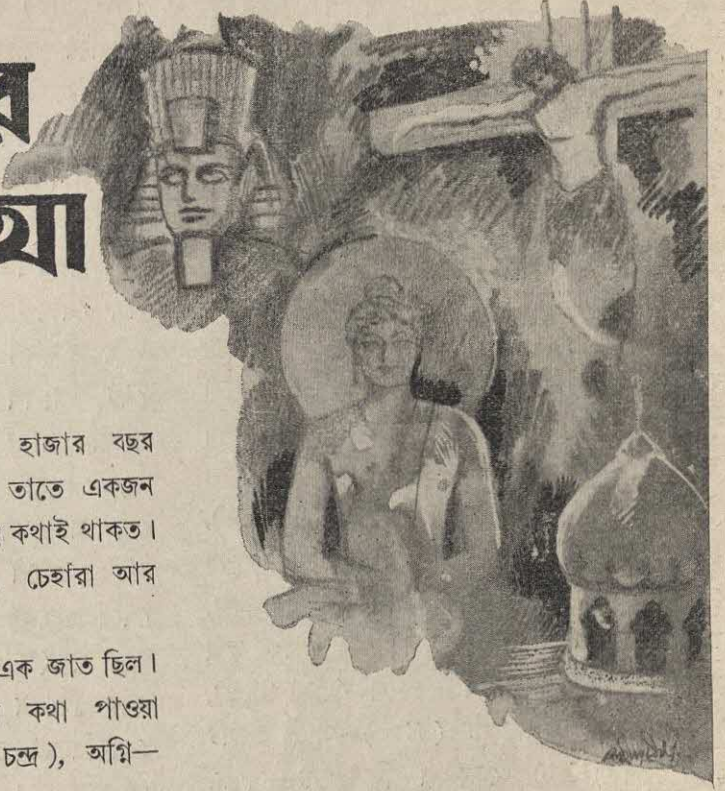
ধর্মের কথা

॥ ধর্ম কি ? ॥

ধর্মের মূল ভগবান্। তিন-চার হাজার বছর আগেকার যেসব ধর্মের কথা জানা যায়, তাতে একজন ভগবানের কথা নয়, অনেক দেবদেবীর কথাই থাকত। তবে এক এক ধর্মে দেবদেবীর নাম, চেহারা আর কাজে তফাত ছিল খুবই।

ভারতবর্ষে ঐ সময়ে আর্য বলে এক জাত ছিল। তাদের ধর্মে তেত্রিশ জন দেবদেবীর কথা পাওয়া যায়। মিত্র (সূর্য), বরুণ, সোম (চন্দ্র), অগ্নি— এঁরা ছিলেন বড় বড় দেবতা।

তবে সবচেয়ে বড় দেবতা ছিলেন ইন্দ্র। তিনি খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। দেবতা আর মানুষের শত্রু ছিল অসুরেরা। তাদের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ হত।

॥ হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র ॥

বেদ পড়ে এসব কথা জানা যায়। বেদ হচ্ছে হিন্দুদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র। কি করা উচিত, সে কথা যেসব বইয়ে থাকে, তাদের বলে শাস্ত্র। বেদ ছাড়া হিন্দুদের আরও অনেক শাস্ত্র আছে, তবে বেদই প্রধান আর সবচেয়ে পুরনো।

বেদের চারভাগ—ঋক্‌বেদ বা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ আর অথর্ববেদ।

বেদের পরই নাম করতে হয় উপনিষদের। উপনিষদ্ অনেকগুলি। তার মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয় ও কৌষীতকি প্রধান। উপনিষদ্‌গুলিতে একটা নতুন কথা বলা হল যে, আসলে ভগবান একজনই, তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়। এ প্রায় আড়াই-তিন হাজার বছর আগেকার কথা।

তা ছাড়া কতকগুলি শাস্ত্র আছে, সেগুলিকে বলে স্মৃতি। তার মধ্যে মনুর লেখা মনুসংহিতা, আর যাজ্ঞবল্ক্য মুনির লেখা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতারই নাম বেশী। তারপর আছে পুরাণ, তাদের সংখ্যা ১৮। যেমন—বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি। হিন্দুদের সব শাস্ত্রই সংস্কৃত ভাষায় লেখা।

॥ মিশর দেশের ধর্ম ॥

মিশর দেশের প্রাচীনকালের ধর্মে অনেক দেবদেবীর পূজো করবার নিয়ম ছিল। তাদের মধ্যে

শিষ্যরা ঋষির কাছে বেদ পাঠ করছেন

প্রধান ছিলেন সূর্যদেবতা 'রি' বা 'রা'। তাঁর চেহারা মানুষের মতো, কেবল মাথাটাই ছিল বাজপাখির মতো। তাঁর মাথায় থাকত একটি সাপ-জড়ানো গোল মুকুট। পরে 'রা' (Ra) নাম বদলে আমন (Ammon), আটন (Aton) ইত্যাদি নামকরণ হয়েছিল। সেদেশের শাস্ত্রে বলে যে, একেবারে গোড়ায় ছিল এক মহাসমুদ্র, আর তাতে ভাসছিল একটি ফুল। তা থেকে জন্ম নিলেন সূর্যদেবতা। তাঁর তিন ছেলে—'শু' (Shu), 'টেফনুট' (Tefnut), 'নুট' (Nut)—আর একটি মেয়ে—'কেব' (Keb). কেব হল পৃথিবী, নুট আকাশ, আর শু আর টেফনুট হল বায়ুমণ্ডল। কেবের দুটি ছেলে—ওসাইরিস (Osiris) আর সেট (Set) আর দুই মেয়ে। তার মধ্যে আইসিস (Isis) হলেন ওসাইরিসের বউ।

এখন, সেট ছিল ভারী খারাপ দেবতা, হাতির মতো তার মুখ। সে ওসাইরিসকে মেরে ফেললে। তখন আইসিস গেলেন শেয়ালমুখো দেবতা আনুবিসের (Anubis) কাছে। দু'জনে মিলে অনেক মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাবে ওসাইরিসকে বাঁচিয়ে তুললেন। কিন্তু ওসাইরিস আর মৃতের দেশ পাতাল থেকে ফিরে এলেন না, তিনি সেদেশেই রাজা হয়ে রইলেন।
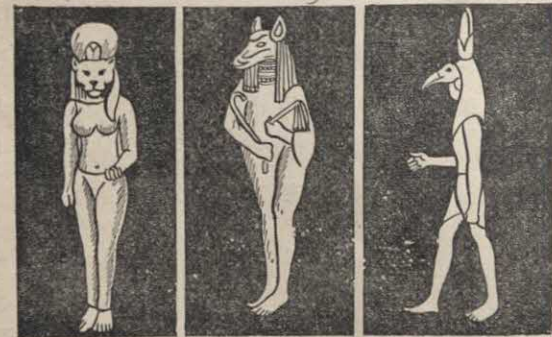
মিশরের দেবদেবী

আইসিসের এক ছেলে হল—হোরাস (Horus). তিনিও সূর্যদেবতা। তাঁর মাথাটিও বাজপাখির মতো।

এরপর তিনি তাঁর বাবার শত্রু সেটকে দূর করে দিয়ে পৃথিবীর রাজা হয়ে বসলেন। সেট নালিশ করলে যে হোরাস রাজা হতে পারে না, কেননা সে রাজার ছেলে নয়—মরা ওসাইরিসের কখনও ছেলে হতে পারে? শেষে জ্ঞানের দেবতা সারস-মুখো থথ (Thoth) প্রমাণ করে দিলেন যে হোরাস ওসাইরিসেরই ছেলে, কাজেই সে রাজপুত্র।

এই সব দেবতা ছাড়া আরও অনেক দেবতার পূজো করা হত প্রাচীন মিশর দেশে। আর, তাদের ধর্মে বলত যে, মানুষ মরে গেলেই তার শেষ হয়ে যায় না—তার শরীরটা তখন পড়ে থাকে, তার আত্মাটা বেরিয়ে যায়। সেটারও সুখ-দুঃখ থাকে, আবার আত্মাটা একদিন শরীরটার মধ্যে ফিরে আসতে পারে। এই বিশ্বাসে প্রাচীন মিশরীরা মৃতদেহকে রেখে দেবার ব্যবস্থা করত, আর তার সঙ্গে

ওসাইরিস

রেখে দিত তার সুখসুবিধের জন্যে নানারকম জিনিস। যাতে মৃতদেহ পচে নষ্ট না হয়ে যায়, তার জন্যে দেহের ভিতরকার সব যন্ত্র বের করে ফেলে তাতে নানারকম মসলা পুরে আরক মাখিয়ে রাখা হত। এরকম দেহকে বলে 'মমি' (Mummy)। হাজার হাজার বছর আগেকার এরকম একটি মমি কলকাতার জাদুঘরে আছে। অবশ্য, শুধু রাজা কিংবা খুব বড় লোকের মৃতদেহেরই 'মমি' করা হত।

এই পুরোনো ধর্ম বহুকাল হল মিশর (ইজিপ্ট) থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

॥ নরওয়ের দেবতাদের গল্প ॥

ইওরোপের উত্তরে যে নরওয়ে দেশ, সেখানকার প্রাচীন ধর্মে বলে যে দেবতারা থাকেন আস্‌গার্ড নামে এক সুন্দর জায়গায়। তাঁদের রাজা ওডিন (Odin) আর রানীর নাম ফ্রিয়া (Freya).

তাঁদের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হয়েছিল। এক-জনের নাম থর, তাঁর মতো বলবান্ কেউ ছিল না। আমাদের ভীমের যেমন গদা, তেমনি থরের ছিল এক সাংঘাতিক হাতুড়ি। ফ্রিগা বা ফ্রিয়া নিজে ছিলেন পরমা সুন্দরী। কোনও বীরপুরুষ যুদ্ধে মারা পড়লে তিনি তাঁর সখী ভালকিরিদের (Valkyrie) দিয়ে সেই বীরের আত্মাকে ভালহাল্লার (Valhalla) প্রাসাদে আনিয়ে পরম সুখে রেখে দিতেন।

ওডিনের এক ছেলে ছিলেন আলোর দেবতা বল্‌ডার (Balder). এরই যমজ ভাই হোডার ছিলেন অন্ধ। লোকি নামে একটি ভারী দুষ্টু দেবতা ছিল। বল্‌ডারকে সবাই ভালবাসে বলে তার উপর তার ভারী হিংসে হল। সে বল্‌ডারকে মারবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

কিন্তু কাঠ পাথর লোহা দিয়ে তৈরী অস্ত্র বল্‌ডারের দেহে বিঁধবে না। অনেক খোঁজ করে লোকি জানতে পারল যে শুধু মিস্‌ল্‌টো বলে ছোট্ট একরকম পরগাছাই বল্‌ডারের গায়ে ফুটতে পারে। সে একটা মিস্‌ল্‌টোর ডাঁটা নিয়ে গেল অন্ধ হোডারের কাছে। তারপর অনেক ভুলিয়ে তাকে

নরওয়ের বলবান্ দেবতা থর

ঐ ডাঁটাটা ছুড়তে বলল। বেচারা অন্ধ হোডার জানে না, কিন্তু সেটা গিয়ে লাগল বল্‌ডারের গায়ে, আর তখনই বল্‌ডারের মৃত্যু হল। স্বর্গে মর্ত্যে কান্নাকাটি পড়ে গেল। দেবতারা কত চেষ্টা করলেন, কিছুতেই কিছু হল না। সব শুনে হোডারেরও কষ্টের শেষ রইল না। শেষে একখানা জাহাজে বল্‌ডারের দেহ রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে জাহাজখানাকে ভাসিয়ে দেওয়া হল। দেবতারা কাঁদতে কাঁদতে আসগার্ডে ফিরে গেলেন।

॥ গ্রীস ও রোমের ধর্ম ॥

গ্রীসের সেকালের দেবদেবীরা গ্রীসের অলিম্পাস পাহাড়েই নাকি থাকতেন। সকলের চাইতে উঁচুতে থাকতেন দেবতাদের রাজা জীউস (Zeus). তাঁর রানী ছিলেন হেরা (Hera). ওসাইরিস আর আইসিসের মতো এঁরাও ছিলেন ভাইবোন। তাঁদের বাবা ক্রোনাস (যার মানে 'সময়') ছিলেন উরানস ('স্বর্গ') আর গেয়া ('পৃথিবী')-র

এক ছেলে। ক্রোনাস তাঁর বাবাকে তাড়িয়ে রাজা হয়েছিলেন বলে তাঁর ভয় ছিল যে ছেলের হাতে তাঁর নিজেরও ঐ দশা হবে। তাই তিনি ছেলেমেয়ে হওয়ামাত্র তাদের খেয়ে ফেলতেন। তবু তাঁর এক মেয়ে হেরা আর তিন ছেলেকে তাদের মা লুকিয়ে রেখে বাঁচিয়েছিলেন। ছেলেদের মধ্যে জীউস বড় হয়ে তাঁকে অলিম্পাস থেকে দূর করে নিজে স্বর্গের আর মর্ত্যের রাজা হয়ে বসলেন। আর্যদের দেবতা ইন্দ্রের মতো তাঁরও অস্ত্র ছিল বজ্র। তাঁর এক ভাই পসাইডন (Poseidon) হলেন সমুদ্রের রাজা, অন্য ভাই হেডিস (Hades) হলেন ওসাইরিসের মতো মৃতের দেশ পাতালপুরীর রাজা।

এখন হেডিসের মুশকিল হল এই যে, কেউ তাঁর বউ হতে চায় না। মাটির নীচে সেই অন্ধকার দেশে

সমুদ্রের রাজা পসাইডন

ভূতপেত্নীদের সঙ্গে থাকতে যাবে কে? তাই হেডিস একদিন শস্যের দেবী ডিমিটারের (Demeter) মেয়ে প্রসারপাইনকে (Proserpine) চুরি করে নিয়ে গেলেন। ডিমিটার তখন মেয়ের শোকে পাগলের মতো ছুটে বেড়াতে লাগলেন। পৃথিবীতে আর শস্য ফলে না, মহা বিপদ হল। শেষে দেবতারা হেডিসকে অনেক বুঝিয়ে এই ঠিক করলেন যে, বছরে কয়েক মাসের জন্যে মেয়ে মায়ের কাছে আসতে পাবেন। তাই হয় এখনও। প্রসারপাইন যখন মার কাছে থাকেন, তখন মা আনন্দে থাকেন, পৃথিবীতে শস্য হয়। অন্য সময়ে তা হয় না।

আরও অনেক গ্রীক দেবদেবী ছিলেন। যেমন, প্যালাস এথেনী (Athene) বা এথেনা। ইনি ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞান আর শিল্পের দেবী। অ্যাপোলো (Apollo) বা ফীবাস ছিলেন সূর্যদেব হেলিওসের (Helios) সারথি, তাঁর রূপ ছিল অসাধারণ। সেকালের গ্রীসের ডেল্‌ফি শহরে তাঁর এক বিখ্যাত মন্দির ছিল। আর ওলিম্পিয়া গ্রামে ছিল জীউসের মন্দির। অ্যাপোলোর যমজ বোন আর্টেমিস (Artemis) ছিলেন চাঁদের দেবী। তিনি শিকার করতে ভালবাসতেন। পসাইডনের ছেলে ওরাইয়নকে (Orion) তিনি রাগের বশে মেরে ফেলেছিলেন।

রোমেও গ্রীসের এই সব দেবদেবীর পূজো হত—শুধু তাদের নামগুলো ছিল আলাদা। যেমন, রোমে জীউসকে বলত জুপিটার, হেরার নাম ছিল জুনো। ক্রোনাস্‌কে স্যাটার্ন, পসাইডনকে নেপচুন আর হেডিসকে প্লুটো বলা হত। রোমে প্যালাস-এথেনীর নাম ছিল মিনার্ভা, ডিমিটারের নাম সীরীজ (Ceres), আর আর্টেমিসের নাম ডায়ানা।

॥ সুমের দেশের ধর্ম ॥

এখন যাকে ইরাক দেশ বলে, ৫০০০ বছর আগে তার দক্ষিণ অংশকে সুমের বলত। প্রাচীন মিশরের মতো প্রাচীন সুমের দেশের লোকেরাও বিশ্বাস করত, প্রথমে দেবতা ছিলেন চারটি—বাবা 'আন' (আকাশ), মা 'কি' (পৃথিবী), হাওয়ার দেবতা
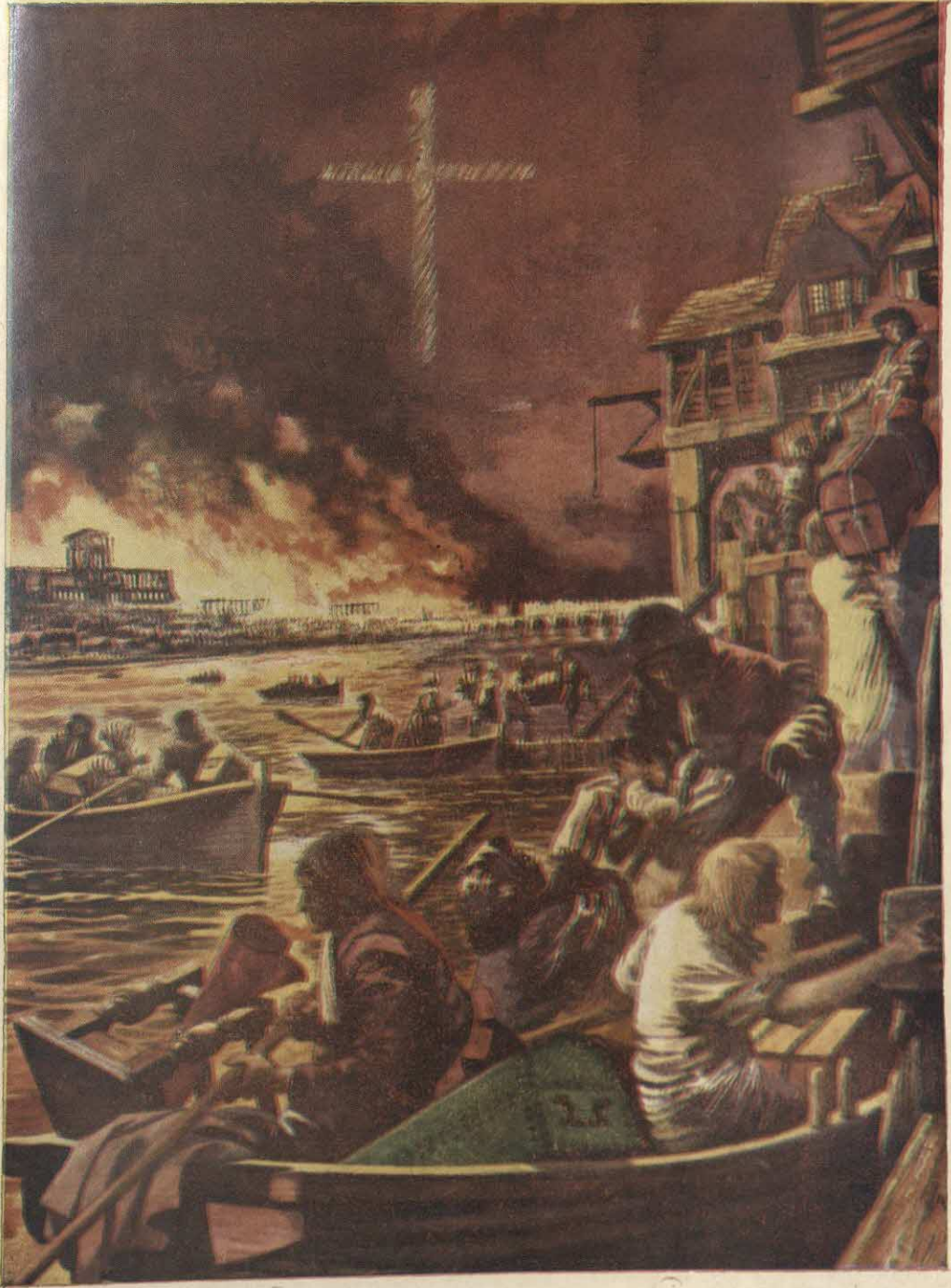
নীরোর আদেশে রোম নগর আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

ধর্মের কথাঃ

[নীরোর আদেশে রোম নগর আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।]

ক্লডিয়াস সীজার নীরো (Claudius Caesar Nero—৩৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন রোমের সম্রাট্। তিনি চৌদ্দ বৎসর সিংহাসনে বসেছিলেন।

নীরো ছিলেন অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির ধর্মান্ধ লোক। কথিত আছে, তিনি নিজের মা, দুই পত্নী ও অন্যান্য বহু লোককে হত্যা করেন।

নীরো ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মের বিরোধী। তাঁর অত্যাচারে সে যুগে খ্রীষ্টানেরা বিশেষ বিব্রত ছিল। বহু খ্রীষ্টান দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল, অনেকে নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিল।

তিনি তাঁর নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে রোমে আগুন ধরিয়ে দেন। সেই সময়ে তিনি মনের আনন্দে বাঁশী বাজাতে থাকেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি রোম নগর আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করছেন। রোমের বহু অধিবাসী আগুনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে টাইবার নদী দিয়ে নৌকো করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। আগুনে বহু খ্রীষ্টান নিহত হয়।

[নীরোই যে রোমনগর পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিলেন, এটা এখন সর্বজনস্বীকৃত তথ্য নয়। আজকালকার বহু ঐতিহাসিক বলেন, রোমে যখন আগুন লাগে, নীরো তখন রোমেই ছিলেন না। তাছাড়া সে যুগে বাঁশী আবিষ্কৃতই হয় নি।]

'এন্‌লিল' আর জলদেবতা 'এন্‌কি'। এঁরাই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সব তৈরি করলেন। প্রত্যেকের কর্তা হলেন এক-একজন দেব বা দেবী, তাঁরা সবাই আন এবং কি'র ছেলে কিংবা মেয়ে। তাঁরা মানুষকে সৃষ্টি করলেন, যাতে তারা দেবতাদের মন্দির তৈরি করে দেবতাদের পুজোর ব্যবস্থা করে। সুমেরের লোকেরা জানত যে এই করলেই ধর্ম হয়।

পরে সুমের দেশ নিয়ে ব্যাবিলনিয়া বলে এক রাজ্য স্থাপিত হয়। ততদিনে সেখানে নতুন নতুন দেবতার পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছিলেন সূর্যদেবতা 'বেল'। পরে আবার তাঁর নাম হয় 'মার্ডুক'। ব্যাবিলনিয়ার যুদ্ধের দেবী ছিলেন 'ইশ্‌তার'।

॥ ইহুদী ধর্ম আর খ্রীষ্টধর্ম ॥

অনেকের মতে, ভগবান্ যে এক, একথা প্রথম দেখা দিয়েছিল ইহুদী ধর্মে। তাদের ধর্মের কথা বলবার আগে ইহুদী জাতের কথা একটু বলা দরকার। এর আগে যাদের কথা বলা হয়েছে, সে সব জাতের নিজেদের একটা একটা দেশ ছিল। কিন্তু প্রথমে ইহুদীরা এক জায়গায় ছিল না, নানা দেশে তারা ছড়িয়ে থাকত। তাই তারা কখনও ব্যাবিলনে, কখনও মিশরে বাস করত। যখন যেখানে থাকত, তখন হয়তো সেখানকার যা ধর্ম, তাই মেনে চলত, দেবদেবীর পুজো করত।

বাইবেল নামে একখানা বই আছে। তার গোড়ার দিকের অংশটাকে বলে 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'। তাতেই ইহুদীদের ইতিহাস লেখা আছে। চারহাজার বছর আগে সুমের দেশের উর শহরে আব্রাম নামে একজন ইহুদী ছিলেন। তিনি ভগবানের আদেশ পেলেন যে, একমাত্র ভগবান্‌কে মেনে চললে তিনি আব্রামকে চমৎকার একটি দেশে নিয়ে যাবেন, সেখানে ইহুদীরা সুখে থাকতে পারবে—সেটাই হবে তাদের নিজেদের দেশ।

ভগবান্‌কে আব্রাম বলতেন 'যিহোবা'। তিনিই প্রথম ইহুদী যিনি এই একমাত্র ভগবানের কথা বলেন। যারা তাঁর কথা মেনে নিল, তাদের নিয়ে তিনি ভগবানের দয়ায় সেই সুন্দর দেশটিতে চলে গেলেন। সে দেশের নাম হল কানান। আজকাল তাকে বলে প্যালেস্টাইন। আর, আব্রাম নিজের নাম বদলে 'আব্রাহাম' নাম নিলেন।

ভগবান্ এক, তাঁর কোন মূর্তি বা চেহারা নেই। তাই ব্রহ্মই বল, যিহোবাই বল, ভগবানের কোনও মূর্তি নেই, তাঁর ছবি বা প্রতিমা করে তাঁর পুজো হতে পারে না। ইহুদীরা তাই মন্দির করে, কিন্তু তাতে কোনও মূর্তির পুজো হয় না, যিহোবার উপাসনা হয়। কিন্তু থেকে থেকে তারা যিহোবার কথা ভুলে গিয়ে বেল, মার্ডুক ইত্যাদির মূর্তি পুজো করত। যিহোবা তাইতে রেগে গিয়ে তাদের শাস্তি দিতেন, ইহুদীরা কত কষ্ট পেত। তারপর এক এক সময়ে একজন করে মহাপুরুষ এসে আবার তাদের যিহোবার উপর বিশ্বাস রাখতে বলতেন। তা-ই করলে তারা আবার সুখশান্তি ফিরে পেত।

এই রকম মহাপুরুষদের একজন ছিলেন মোজেস্ বা মুশা। যিহোবার শাপে ইহুদীরা এক সময় মিশরে থেকে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। শেষে যিহোবার দয়া হল। তিনি মুশাকে আদেশ পাঠালেন—ইহুদীদের নিয়ে কানানে ফিরে যাও, আমার দূত পথ দেখিয়ে নির্বিঘ্নে তোমাদের নিয়ে যাবে।

মিশরের রাজা তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, লোহিত সাগর দু'ভাগ হয়ে গিয়ে তাদের পথ করে দিল। যিহোবা তখন তাঁর দশটি আদেশ (Ten Commandments) একখানা পাথরে বিদ্যুতের অক্ষরে লিখে মুশাকে দিলেন। সেইগুলিই ইহুদী-ধর্মের আসল কথা। ইহুদী-ধর্মের আর সব কথা যে শাস্ত্রে আছে, তার নাম 'তালমুদ'।

আরও কতবার ইহুদীরা যিহোবাকে অমান্য করল, কত বিপদে পড়ল, কত মহাপুরুষ এলেন—সে অনেক কথা। শেষে আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে ইহুদীদের শেষ মহাপুরুষ এলেন ইশা। তাঁকে যীশু বা খ্রীষ্টও বলা হয়। মায়ের নাম ছিল মেরী। মেরীর স্বামী যোসেফ ছিলেন ছুতোরমিস্ত্রী।

যীশু জন্মেছিলেন কানান দেশের বেথলেহেম
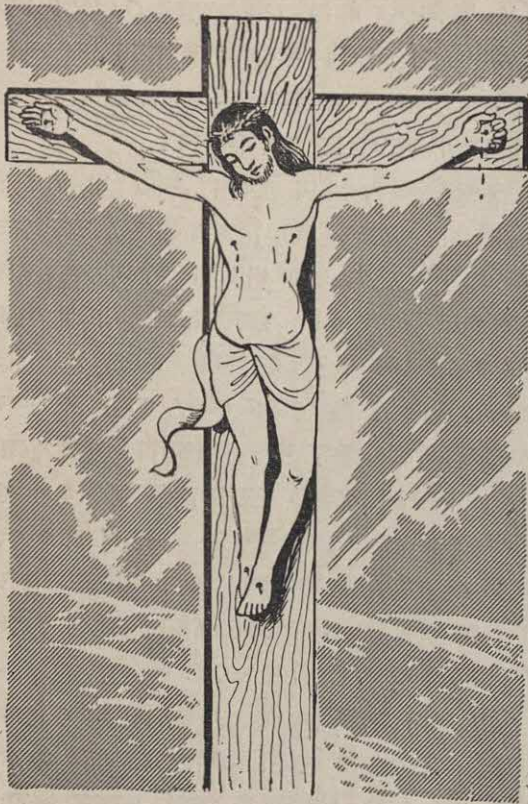
ক্রুশবিদ্ধ যীশু

শহরে। কিন্তু সেখানকার বিদেশী শাসনকর্তা সব ছোট ছেলেকে মেরে ফেলছিলেন বলে তাঁকে মিশরে নিয়ে যাওয়া হল। বড় হয়ে তিনি ইহুদীদের কাছে ভগবানের কথা বলতে লাগলেন। ধর্মের নামে তারা যে সব অন্যায় কাজ করত, তিনি সেগুলোর নিন্দে করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর বারোজন শিষ্য হল। আর, তিনি অনেকের উপকার করায় লোকে তাঁকে খুব ভালবাসত। তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে ভয় পেয়ে একদল হিংসুটে লোক রাজার কাছে তাঁর বিচার চাইল। বিচারে হুকুম হল যে তাঁকে ক্রুশে বিঁধে মেরে ফেলা হবে। কত অপমান করে নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করা হল। তবু তিনি শত্রুদের ক্ষমা করেছিলেন। তাঁর বয়স তখন মোটে ৩৩ বছর।

যীশু বলেছিলেন যে, ঈশ্বর একজনই, তাঁকে ভালোবাসো, সকলকে ভালোবাসো। আরও যা যা বলেছিলেন, ইহুদীরা তা মানলো না। তাই তাঁর বার জন শিষ্য আলাদা হয়ে গিয়ে যীশুর কথাগুলো প্রচার করতে লাগল, তাতে 'খ্রীস্টধর্ম' বলে আলাদা একটা ধর্মই গড়ে উঠল। সেন্ট্ (সাধু) পল ছিলেন যীশুর প্রধান শিষ্য। ক্রমে ক্রমে তাঁদের চেষ্টায় এবং খ্রীস্টানদের প্রচারে এখন পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকই খ্রীস্টধর্ম মেনে চলছে।

খ্রীস্টধর্মের শাস্ত্র হচ্ছে বাইবেল। তার শেষ অংশ 'নিউ টেস্টামেণ্টে' যীশুর জীবনী আর তাঁর উপদেশ সব আছে। কিন্তু তা নিয়েও দলাদলি হয়ে ক্রমে খ্রীস্টানদের তিনটে সম্প্রদায় হল—রোম্যান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট আর ঈস্টার্ন চার্চ। পৃথিবীর যত রোম্যান ক্যাথলিক, সকলের গুরু হচ্ছেন পোপ। রোম শহরে ভ্যাটিকান প্রাসাদে তিনি থাকেন। তাঁকে মানবেন না বলে, প্রায় ৪৫০ বছর আগে মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রীঃ) প্রোটেস্টাণ্ট দলটি প্রথম গড়েছিলেন। তারপর দু'দলে যে কত খুনোখুনি হয়েছে তা বলবার নয়! অথচ, দু'দলই বলে যে তারা যীশুকে মানে। দু'য়েরই তীর্থ হচ্ছে প্যালেস্টাইন দেশের জেরুসালেম শহর।

॥ আরব দেশের ইসলাম ধর্ম ॥

প্যালেস্টাইনের দক্ষিণেই আরব দেশ। যীশুর জন্মের প্রায় ছ'শো বছর পরে এই আরব দেশের মক্কা

মার্টিন লুথার

শহরে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। তখন আরবের লোকেরা নানা দেবদেবীর পুজো করত। তাদের প্রধান ভজনালয় ছিল 'কাবা'। এই ভজনালয়টি মক্কাতেই ছিল। মহম্মদ বলতে লাগলেন, এ সব তুলে দাও। ভগবান্ একজনই, তাঁর নাম 'আল্লাহ্'। তাঁকে মেনে চলো। তিনি এই কথা তোমাদের বলবার জন্যে আমাকে তাঁর দূত (রসুল বা পয়গম্বর) করে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাঁকে যেসব কথা বলতে বলেছিলেন, সেগুলোকে একত্র করে একখানা বই আছে, তার নাম 'কোরান'। এই কোরানে আছে যে, মুশা (Moses) আর ইশাকে (Jesus) আল্লাহ্ আগে পাঠিয়েছিলেন, আর এখন মহম্মদকে পাঠালেন মানুষকে ঠিক ধর্মটি বুঝিয়ে দেবার জন্যে। এর পর আর কাউকে তিনি পাঠাবেন না। যারা কোরানের উপদেশমতো না চলবে, দেবদেবীর পুজো করবে, তাদের ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে।

অনেক মারামারি কাটাকাটির পর আরব দেশের লোকেরা হজরত মহম্মদের কথা মেনে নিল। একটি নতুন ধর্ম হল, তার নাম হল ইসলাম। আর, যারা সে ধর্ম মানে, তাদের বলে মুসলমান।

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর কিছু পরেই ঝগড়া বেধে গেল যে, কে মুসলমানদের গুরু বা খলিফা হবে। দামাস্কাসের রাজা এজিদ চেষ্টা করতে লাগলো খলিফা হবার জন্যে। সে প্রথমে হজরত মহম্মদের মেয়ের বড় ছেলে হাসানকে লুকিয়ে বিষ দিয়ে মেরে ফেলল। তারপর এজিদের পাঠানো সৈন্যরা হাসানের ছোট ভাই হোসেনকে দলবল সুদ্ধ ভুলিয়ে কারবালা বলে একটা মরুভূমিতে এনে তাঁদের জল খেতে না দিয়ে খুব কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলল। এইভাবে দুই বাধা সরিয়ে সে খলিফা হল। মুসলমানরা সেই কারবালার দুঃখের ঘটনার কথা মনে করে আজও শোকের উৎসব করেন—তাকে বলে মহররম।

আর, এই ঝগড়া নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় হল—শিয়া আর সুন্নী। তা ছাড়াও মুসলমান-ধর্মে আরও অনেক দল আছে।

॥ পার্শী ধর্ম ও জরথুস্ট্র ॥

জরথুস্ট্র

আরব দেশের কাছেই পারস্য, যার নাম এখন ইরান। ইরানে এখন প্রায় সবাই মুসলমান। কিন্তু আগে সেখানে অন্য একটা ধর্ম চলত। জ র থু স্ট্র (ইংরেজীতে 'জোরোয়াস্টার') বলে একজন মহাপুরুষ বোধ হয় ২৬০০-২৭০০ বছর আগে সেই ধর্ম সেদেশে চালিয়েছিলেন।

সেই ধর্মেও এক ভগবান্, তাঁর নাম অহুর-মজ্দা। তিনি হচ্ছেন আলোর দেবতা, ভালর দেবতা। সূর্য আর আগুনের রূপ ধরে তিনি আমাদের দেখা দেন। ইন্দ্রের শত্রু যেমন বৃত্র, তাঁরও তেমনি শত্রু আছে, তার নাম আহ্রিমান। সে অন্ধকার, সে মন্দ। ভালর পথে থাকলে, আর সূর্য আর আগুনকে পুজো করলে, অহুর-মজ্দা আমাদের সেই দুষ্ট আহ্রিমানের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই ধর্মে পৃথিবীকে আর আগুনকে পবিত্র মনে করা হয়, এদের মন্দিরে সর্বদা আগুন জ্বলে। এরা মড়া নিয়ে একটা উঁচু টাওয়ারে রেখে শকুনিদের খেতে দেন। পার্শীদের পুরোহিতরা কোমরে পৈতে পরেন, তার নাম কস্তি। আর পুরুতদের বলা হয় দস্তুর।

পারস্যে যখন সবাই মুসলমান হতে লাগল, তখন এই ধর্মের কিছু লোক ভারতবর্ষে পালিয়ে এলেন। প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে এঁরা থাকেন। তাঁদেরই নাম হচ্ছে পার্শী। তাঁরা এখনও সেই জরথুস্ট্রের ধর্ম মেনেই চলেন।

॥ চীনদেশের ধর্ম ঃ কনফুসিয়াস্ ॥

চীনে তিনটি ধর্মের এখন প্রচলন আছে। তিনটিই প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে চলে আসছে—কন্‌ফুসি ধর্ম, তাও ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম। কুংফুৎজি (Kung-fu-tze) বা কন্‌ফুসি (ইওরোপীয়েরা বলেন 'কনফুসিয়াস') ছিলেন

কনফুসিয়াস

চীনের সবচেয়ে জ্ঞানী লোক। দেবতা অনেক, না, একজন—তিনি সে কথা বলেন নি। তাঁর ধর্মে তাই ভগবান্ কিংবা দেব-দেবীর কথা নেই। তিনি বলেন ভাল হবার কয়েকটা নিয়ম মেনে চললেই মানুষের ধর্ম করা হবে, তার ভাল হবে। একটা নিয়ম এই যে, অন্য লোকে তোমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করবে বলে তুমি আশা কর, সকলের সঙ্গে তুমিও সেই রকম ব্যবহার করো।

॥ লাওৎজু ॥

তাও ধর্মের কথা যিনি প্রথম বলেছিলেন, তাঁর নাম ছিল লাওৎসে বা লাওৎজু। এর মানে হচ্ছে 'চুলপাকা খোকা'। তিনি নাকি জন্মাবার আগে ৭০-৮০ বছর মায়ের পেটে ছিলেন। তাই যখন জন্ম নিলেন, তখনই তিনি চুল-পাকা বুড়ো। এইজন্যে তাঁর এই নাম।

তাঁর ধর্মের উপদেশ লেখা আছে 'তাও-তে-কিং' নামে একখানা বইয়ে। তাতে অনেক ভাল কথা লেখা আছে, কিন্তু সে সব ছেড়ে দিয়ে তাও-ধর্ম এখন দাঁড়িয়েছে দেবতা-উপদেবতার পুজোয়। জাদুবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, ভেলকি আর কি করে মানুষ অমর হতে পারে, তার চেষ্টাই হয়েছে এখন তাও-ধর্মের কাজ আর লক্ষ্য।

॥ বৌদ্ধধর্ম ঃ গৌতম বুদ্ধ ॥

চীনের আর একটি প্রধান ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু এ ধর্ম বাইরে থেকে চীনদেশে এসেছিল। এ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৮-৪৮৮)। তাঁর আসল নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি জন্মেছিলেন ভারতবর্ষে হিমালয়ের কাছে কপিলাবস্তু নগরের রাজা শুদ্ধোদনের ঘরে। রাজার ছেলে সুখের মধ্যে থেকেও তাঁর মনে শান্তি ছিল না। মানুষের দুঃখ-কষ্ট-মৃত্যু দেখে তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠল। শেষে তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরোলেন। কি করলে সব দুঃখ দূর হয়, তা তিনি খুঁজতে লাগলেন। পণ্ডিতেরা যা বললেন, সেইভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়ে তপস্যা করে দেখলেন যে তাতে কাজ হবে না—লাভের মধ্যে তাঁর শরীর তাতে খারাপ হয়ে গেল।

এই সময় তিনি একটি বনে ছিলেন। বনের ধারে এক গ্রামে এক গৃহস্থের বউ সুজাতা স্বপ্নে তাঁকে দেখে তাঁর জন্যে পায়েস রেঁধে নিয়ে এল। সেই পায়েস খেয়ে গৌতম একটু সুস্থ হয়ে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় গিয়ে ধ্যানে বসলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন যে মানুষের দুঃখ দূর করবার উপায় না জেনে তিনি সেখান থেকে উঠবেন না।

একদিন তিনি সে-উপায় জানতে পারলেন। সেই জ্ঞানকে বলে 'বোধি'। তাই যে-গাছের তলায় তিনি বসেছিলেন তাকে বলে 'বোধিদ্রুম', মানে জ্ঞানের গাছ। গয়ার কাছে বুদ্ধগয়াতে গেলে সেই

বুদ্ধদেব

জায়গাটি দেখা যায়। আসল গাছটি নেই। এখন যেটি আছে, সেটি তারই চারার একটি চারা মাত্র।

গৌতম এবার 'বুদ্ধ' (জ্ঞানী) হলেন। তিনি কাশীর কাছে, এখন যাকে সারনাথ বলে, সেইখানে গিয়ে এক নতুন ধর্মের কথা বললেন। সেই ধর্মকে বলে 'সদ্ধর্ম' বা বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধের মতে, জন্মালে কষ্ট পেতেই হবে, তাই যাতে বার বার জন্ম না হয়, তাই করতে হবে। কামনা বাসনা যদি ত্যাগ করতে পারা যায়, তবেই এটা হতে পারে। এই অবস্থাকে বলে 'নির্বাণ'। নির্বাণ লাভের উপায়ও বুদ্ধ বলে দিয়েছিলেন।

তিনি মারা যাবার পর ক্রমে ক্রমে দলাদলি করে বৌদ্ধরা দুটো সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেল। সে দুটোর নাম হীনযান আর মহাযান। পরে আরও একটা দল হয়েছিল ; তার নাম বজ্রযান।

॥ মহাবীর ॥

বুদ্ধের সময়ের আর একজন মহাপুরুষ মহাবীর। তাঁকে বর্ধমান এবং নির্গ্রন্থনাথপুত্রও বলা হয়। তিনি বৈশালীর (এখনকার মজঃফরপুর জেলার) লোক ছিলেন। তিনিও মানুষের কষ্টে ব্যথা পেয়ে অনেক তপস্যা করে জানতে পারলেন যে কিসে মানুষ ভাল থাকে। তখন তিনি হলেন একজন জিন
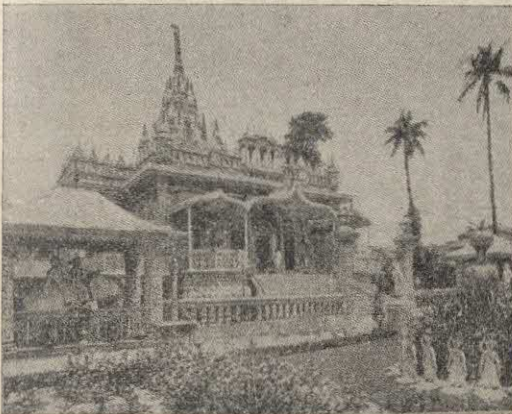
কলিকাতার জৈন মন্দির

(মানে, দুঃখজয়ী)। তাই তিনি যে ধর্মমত প্রচার করলেন, তাকে বলে জৈনধর্ম।

এঁর কথাগুলো কিছু নতুন নয়, মহাবীরও যে প্রথম 'জিন' ছিলেন, এমন নয়। তাঁর আগে আরও ২৩ জন জিন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম ছিলেন ঋষভদেব। আর, ২৩শ ছিলেন পার্শ্বনাথ। বলতে গেলে পার্শ্বনাথই জৈনধর্ম প্রথম চালু করেন। মহাবীর এসে সেই ধর্ম প্রচার করেন। পার্শ্বনাথকে আমরা পরেশনাথ বলি। জৈনধর্মেও দুটো সম্প্রদায়—শ্বেতাম্বর আর দিগম্বর। কলকাতার দু'জায়গায়, আর হাজারিবাগ জেলায় পরেশনাথ পাহাড়ে পরেশনাথের মন্দির বিখ্যাত।

জৈনধর্মের প্রধান কথা হচ্ছে অহিংসা। কোনও কিছুকে হত্যা করা তো দূরের কথা, কষ্ট দেওয়াও এ ধর্মে নিষেধ আছে।

॥ শিখধর্ম ঃ গুরুনানক ॥

ভারতবর্ষে আর একটি ধর্ম হচ্ছে শিখধর্ম। তার প্রথম গুরু হলেন নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রীঃ)। তিনি প্রায় পাঁচশ' বছর আগে পঞ্জাবে জন্মেছিলেন। হিন্দুধর্ম আর মুসলমানধর্ম থেকে ভাল ভাল কথা তিনি প্রচার করতে লাগলেন। তাতে তাঁর হিন্দু-মুসলমানি অনেক শিষ্য হল।

নানকের ধর্মে বলে, ঈশ্বর এক। আর বলে, যে মানুষকে ভালবাসবে, সে শান্তিতে থাকবে। তাঁর সব উপদেশ নিয়ে পরে একখানা বই লেখা হয়, তাকে বলে আদিগ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেব।

শিখদের দশম আর শেষ গুরু গোবিন্দ দেখলেন মুসলমানদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে হলে শিখদের যুদ্ধ করতে হবে। তিনি তাই তাদের সৈন্যের মতো শিক্ষা দিতে লাগলেন। নিরীহ শিখেরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়ে উঠল। তাদের নতুন নাম হল 'খালসা' (ঈশ্বরের সম্পত্তি), আর তাদের চিহ্ন হল বড় চুলদাড়ি, খাটো জাঙ্গিয়া, লোহার বালা, চুলে চিরুনী, আর কোমরে ছোরা। এখনও শিখদের এ সব চিহ্ন ধারণ করতে হয়।

গুরু নানক

॥ হিন্দুধর্ম ॥

ভারতবর্ষে আরও অনেকরকম ধর্ম চলে। তবে বেশির ভাগ লোকই যে ধর্ম মানে, তার নাম হিন্দুধর্ম।

ভারতের আর্যরা সিন্ধুনদের এপারে থাকত বলে ওপারের লোকেরা তাদেরও নাম দিয়েছিল সিন্ধু। তারা 'স' বলতে পারত না, সিন্ধুকে বলত হিন্দু। সেই থেকে আর্যদের নাম হল হিন্দু।

হিন্দুদের শাস্ত্রের কথা আগে বলা হয়েছে। সেখান থেকে জানা যাবে যে, আর্যদের প্রথম বই বেদ। তাতে দেখা যায় যে তাঁরা প্রথমে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য ইত্যাদি ৩৩টি দেবতাকে মানতেন। ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের আর্য ঋষিরাই প্রথম বুঝেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ভগবান্ এক, অনেক নন। বেদের কোনও কোনও অংশকে (উপনিষদ্) উপনিষৎ বলে। সেই উপনিষদে তাঁরা এ কথা বলে গিয়েছেন। সেই ভগবান্‌কে তাঁরা বলেছেন 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্মই সব, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। কাজেই তুমিও তিনি, আমিও তিনি। এই কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করাই আসল কথা। এ কথা আজ পর্যন্ত অনেক হিন্দুই মেনে আসছেন।

॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ॥

তবে, হিন্দুদের মধ্যে সাধারণতঃ অনেক দেব-দেবীর পূজাই প্রচলিত। হিন্দুদের প্রধান দেবতা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর মহেশ্বর (অর্থাৎ, মহাদেব বা শিব)। আর, দেবীদের মধ্যে কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু তাকে পালন করেন, আর মহেশ্বর সব কিছুকে ধ্বংস করেন। হিন্দুধর্মে বলে যে জগৎটা বারবার তৈরী হচ্ছে আর ধ্বংস হচ্ছে।

চতুর্মুখ ব্রহ্মা

বুদ্ধ, যীশু বা মহম্মদের মতো কোনও একজন মহাপুরুষের কথার উপর হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়। অনেক মুনিঋষি, অনেক মহাপুরুষ নানা সময়ে যা যা বলে গিয়েছিলেন, তা সব নিয়েই হিন্দুধর্ম। তাই, এমন শাস্ত্রও হিন্দুধর্মে আছে যাতে ভগবানের কথা নেই—যেমন, কপিলমুনির লেখা 'সাংখ্যসূত্র'। আবার 'বেদান্তসূত্রে' বলেছে ভগবান্ একজনই। 'গীতায়'ও তাই। গীতার নাম সকলেই শুনেছে। এর পুরো নাম হচ্ছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা। এটা আসলে মহাভারতের একটা অংশ।

এদিকে, 'পুরাণ' নামে যে সব শাস্ত্র আছে, তাতে অনেক দেবদেবীর কথাও আছে। তবে, কোনও কোনও পুরাণে এক এক জন দেবতাকে বড় করা হয়েছে। যেমন, ভাগবত পুরাণে (যার পুরো নাম হচ্ছে 'শ্রীমদ্‌ভাগবত') বিষ্ণুকে আর বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলা হয়েছে।

মহেশ্বর

আবার শিবপুরাণে শিবকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলা হয়েছে। আসল পুরাণ (মহাপুরাণ) ১৮ খানা, তা ছাড়াও অনেক পুরাণ আছে।

মুনিঋষিদের মধ্যে কপিল, মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের নাম বলেছি, তবে, সকলের চেয়ে নাম বেশী ব্যাসদেব বা বেদব্যাসের। তিনি বেদগুলিকে চারটি ভাগে সাজিয়েছিলেন ও মহাভারত, ভাগবত আর ব্রহ্মসূত্র লিখেছিলেন। এঁরা যে কোন্ সময়ের লোক, তা ঠিক করে জানবার উপায় নেই। এমনও হতে পারে যে একাধিক ব্যাসদেব ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছিলেন।

॥ শঙ্করাচার্য ॥

হিন্দু মহাপুরুষদের মধ্যে শঙ্করাচার্য ছিলেন দক্ষিণ ভারতের লোক। এগারো-বারো শ' বছর আগে তিনি জন্মেছিলেন। আর, বেঁচেছিলেন মোটে ৩২ বছর। হিন্দুধর্ম তখন বৌদ্ধধর্মের দাপটে পিছু

বিষ্ণু
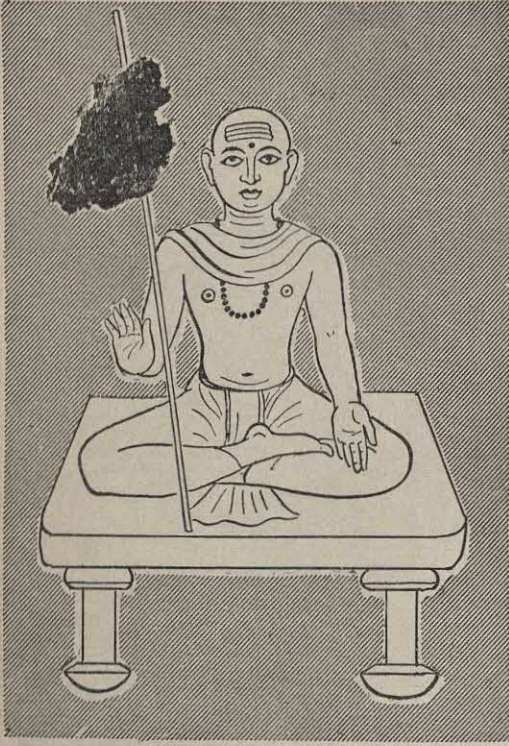
সন্ন্যাসগ্রহণের প্রথম অবস্থায় শঙ্করাচার্য

হটে যাচ্ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্যে আর চেষ্টায় হিন্দুধর্ম রক্ষা পেয়েছিল। তাঁর জীবনকথা বড়ই আশ্চর্য।

॥ রামানুজ ॥

তারপর দক্ষিণ ভারতেই তিন শ' বছর পরে জন্মালেন রামানুজ। শঙ্করাচার্য বলেছিলেন যে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই—এই মতকে বলে অদ্বৈতবাদ। রামানুজ বললেন, বিষ্ণুই ভগবান্—আর, ভক্ত না থাকলে তাঁর পুজো কে করবে? তাই, ভক্তও থাকা চাই। এই মতকে বলে ভক্তিবাদ বা দ্বৈতবাদ।

॥ কবীর ॥

এই ভক্তিবাদ অনেকে প্রচার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন কবীর (খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ অব্দ)। তিনি বলতেন যে, অন্তরের ভালবাসা দিয়েই ভগবানকে পেতে হয়, বাইরের ভড়ং—যেমন, পূজা ইত্যাদি—কিছু নয়। হিন্দুরা তাঁকে যেমন ভক্তি করতো, তেমনি মুসলমানরাও। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল যে তাঁর দেহের বদলে পড়ে আছে শুধু একরাশি ফুল। তার কতক হিন্দুমতে পোড়ানো হলো, কতক মুসলমান মতে কবর দেওয়া হলো। তাঁর উপদেশ দু'লাইনের ছোট ছোট কবিতায় আছে, তাকে বলে 'দোঁহা'।

॥ শ্রীচৈতন্য ॥

বঙ্গদেশে এই ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন—নবদ্বীপের 'নিমাই' বা শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন তাকে বলে বৈষ্ণবমত। ভালবাসার

শঙ্করাচার্যের পাথরের মূর্তি

নীলাচলে শ্রীচৈতন্য

বন্যা এনেছিলেন তিনি। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, আর মাতার নাম শচীদেবী।

ইনি একুশ বছর বয়সে নিজে চতুষ্পাঠী করে অধ্যাপনা করতেন। পরে ঈশ্বরপুরী নামে এক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নিয়ে নবদ্বীপে হরিনামে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। পরে সংসার ত্যাগ করে কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হন।

ইনি নীলাচলে (পুরী) গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে বাস করেন। ইনি কাশী, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থে ভ্রমণ করে প্রেমভক্তি প্রচার করেন।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

আর একজন মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৫-১৮৮৬ খ্রীঃ) কলিকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে থেকে ধর্মোপদেশ দিতেন। তাঁর ধর্মের মোট কথা এই যে সব ধর্মই এক, সব ধর্মেরই আসল কথাগুলি এক। যা তফাত, তা শুধু নামে, আর ধর্মের ছোটখাট ব্যাপারে। তাঁর সেই সুন্দর কথাগুলি শুনে অনেকে তাঁর ভক্ত হয়েছিল। অনেকে এখন তাঁকে ভগবান বলে মনে করে। পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, ভারতেও ঘরে ঘরে তাঁর নাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ

॥ বিবেকানন্দ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ) নাম নিয়েছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আমেরিকায়, বিলেতে এবং এদেশে প্রচার করেন। মানুষের সেবার জন্যে তিনি 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে একটি সন্ন্যাসিদল গড়ে তোলেন। যে বেদান্তশাস্ত্রের কথা আগে বলা হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ সেই বেদান্তই মানতেন।

॥ ব্রাহ্মধর্ম ॥

আর এক সম্প্রদায় এর অনেক আগেই হয়েছিল, তাকে বলা হয় ব্রাহ্মসমাজ। তাঁরা উপনিষদকে মানেন, তাতে যে ব্রহ্মের কথা আছে, তাঁকেই মানেন। অন্য হিন্দুরা প্রায় সবাই মূর্তি বা ছবির পুজো

বিবেকানন্দ

রাজা রামমোহন রায়

করেন—এঁরা তা করেন না। হিন্দুরা ব্রাহ্মণ ইত্যাদি জাত মেনে চলেন—এঁরা তা মানেন না। এই সব নানা তফাতের জন্যে ব্রাহ্মধর্মকে একটা আলাদা ধর্ম বলেই মনে করা হয়।

॥ রামমোহন রায় ॥

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম এই ধর্মের কথা তোলেন—সে প্রায় পৌনে দু'শ' বছর আগেকার কথা। শেষ বয়সে তিনি দিল্লীর তখনকার বাদশাহের কাছ থেকে রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর মতের লোকদের নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই সমাজের কর্তা হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা। তাঁকে লোকে বলত 'মহর্ষি'। তিনিই ব্রাহ্মধর্মের আর ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম ঠিক করে দিয়ে এর যথার্থ প্রতিষ্ঠা করেন।

এরপর দলাদলি আরম্ভ হল। কেশবচন্দ্র সেনকে (১৮৩৮-১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) লোকে 'ব্রহ্মানন্দ' বলত। তিনি দল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ
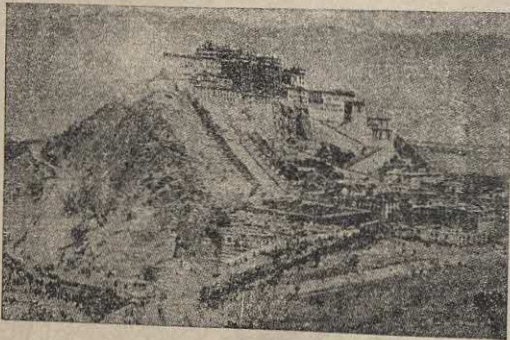
তিব্বতের রাজধানী লাসায় দালাই লামার ভজনালয় ও বাসভবন 'পোটালা'
[দালাই লামা বর্তমানে ভারতে আছেন]
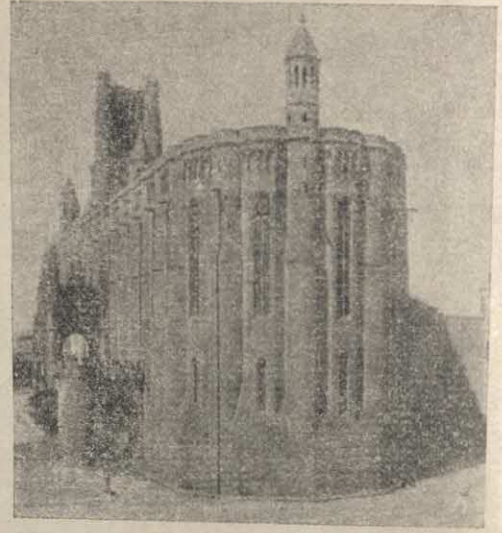
রোমান ক্যাথলিক চার্চ

স্থাপন করলেন; তাকে 'নব-বিধান' সমাজও বলে। আবার তাঁর দল ভেঙে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ

সেণ্ট পলস গির্জা, লণ্ডন

রোমের সেণ্ট পিটারের গির্জা

শাস্ত্রী ইত্যাদি কয়েকজনে 'সাধারণ' ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন। মহর্ষির দলের নাম হল 'আদি' ব্রাহ্মসমাজ।

॥ আর্য সমাজ ॥

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৭-১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) একজন বৈদিক ধর্ম-সংস্কারক সন্ন্যাসী ছিলেন। কাথিয়াবাড় প্রদেশে এঁর জন্ম হয়।

বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রচারের জন্যে ইনি আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন।

ইনি 'ঋগ্বেদ-ভাষ্য' ও 'সত্যার্থ-প্রকাশ' নামে দুইখানি গ্রন্থ লিখে প্রচার করেন।

॥ বিভিন্ন ধর্মের লোকের প্রার্থনা-স্থান ॥

হিন্দুদের পূজাবাড়িকে মন্দির বলা হয়।

মুসলমানরা মসজিদে নামাজ (প্রার্থনা) করে।

ইহুদীরা সিনাগোগে (Synagogue) প্রার্থনা করে।

খ্রীষ্টানরা গির্জায় (চার্চে) প্রার্থনা করে। নানা সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানদের জন্যে নানা রকম গির্জা আছে ঃ—রোমান-ক্যাথলিক চার্চ, প্রোটেস্টাণ্ট চার্চ ইত্যাদি।

তিব্বতে লাসায় দালাই লামার প্রাসাদের নাম পোটালা। তিব্বতীদের সবচেয়ে প্রধান মন্দিরও তারই মধ্যে। মন্দিরকে তারা বলে 'গোম্পা'।

হিন্দুরা যে যার বাড়ির ঠাকুরঘরে প্রার্থনা করে। কেউ কেউ মন্দিরেও যায়।

ব্রাহ্মদের প্রার্থনার স্থল হচ্ছে তাদের সমাজের মিলনস্থান।

শিখদের প্রার্থনা-স্থানকে বলে গুরুদ্বার।

চীন ও জাপানে 'প্যাগোডা' আছে। বর্মীরা তাকে বলে 'ফয়া'। এগুলি প্রায়ই কাঠের তৈরী এবং বহু কারুকার্য করা। বৌদ্ধদের প্রার্থনার মন্দির এগুলি।
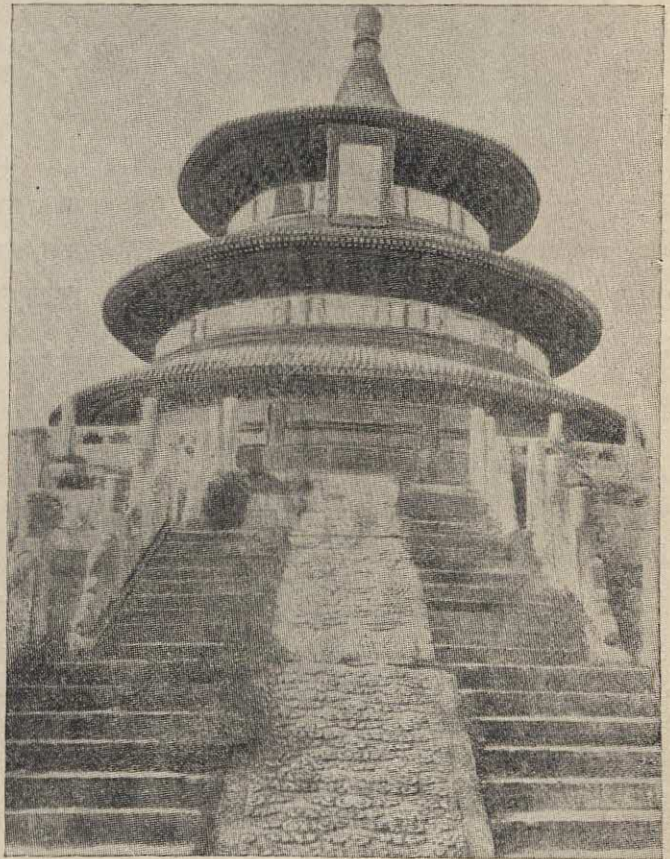
স্বর্গের মন্দির (Temple of Heaven)
পিকিং শহরের বাইরে এটি তৈরী। ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে এটি তৈরী হয়।
মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি হলে এখানে বিশেষ প্রার্থনা জানানোর ব্যবস্থা হয়

॥ দর্শনশাস্ত্র কাকে বলে ॥

যাতেই জ্ঞানের কথা আছে, কি করে জানা যায় তা আছে, তাকেই ইংরেজীতে বলে ফিলজফি (Philosophy), মানে জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা। বাংলায় আমরা একেই দর্শনশাস্ত্র বলি বটে, কিন্তু সংস্কৃতে যে দর্শনের বই আছে, তা ঠিক ইওরোপের ফিলজফির বইয়ের মতো নয়।

র‍্যাফেলের আঁকা দর্শনের ভাবমূর্তি

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ফিলজফির লক্ষ্য হচ্ছে জানবার বিষয় সব কিছু জানা। পৃথিবীটা কি করে হল, ভগবান্ কী, আগুন কি করে জ্বলে, মানুষ রাগ করে কেন—এই রকম শত সহস্র প্রশ্নের উত্তর জানবার চেষ্টাই করে ফিলজফিতে। আর, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতে দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র কাজ হল মুক্তি বা মোক্ষের উপায় স্থির করা। এই দুটোকেই আমরা দর্শনশাস্ত্র বলব—অবশ্য তফাতটা মনে রেখে।

প্রথমে ফিলজফি (দর্শন) বললে বিজ্ঞান ইত্যাদিকেও বোঝাত, কেননা, বিজ্ঞানেও তো কয়েক বিষয়ে জ্ঞানের কথাই থাকে। যেমন, পৃথিবী কি করে সৃষ্টি হয়েছিল, এ কথাটা তো আজকাল বিজ্ঞানের কথা। কিন্তু প্রথম যুগের দার্শনিকদের এটাই ছিল মস্ত একটা চিন্তা। তারপর ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের প্রচলন বেশী হওয়াতে বিজ্ঞানগুলিকে দর্শন থেকে আলাদা করে এক একটা নাম দেওয়া হল। যেমন—ভূগোল, অঙ্ক, রসায়ন ইত্যাদি। তাই আজকাল দর্শনের মধ্যে আছে এমন সব বিদ্যা যাতে ঈশ্বর, মানুষের আত্মা, তার

মন ইত্যাদির আলোচনা থাকে। কয়েকজন বিখ্যাত ইওরোপীয় দার্শনিকের কথা এখানে বলব।

॥ ডায়োজিনিস ॥

অনেকদিন আগে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সময়ে গ্রীস-দেশের এথেন্স্ শহরে থাকতেন ডায়োজিনিস (Diogenes—৪১২-৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নামে একজন লোক। বাড়িতে নয়, কুঁড়েঘরে নয়, পাহাড়ের গুহায় নয়, নৌকোতেও নয়—তিনি থাকতেন রাস্তার ধারে একটা স্নানের টবের মধ্যে। জুতো জামা পরতেন না, খুব খারাপ খাবার ছাড়া খেতেন না। তিনি বলতেন যে, দেহের সুখের দিকে মন দিলে জ্ঞান-লাভের দিকে মন দেওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে তিনি দিনদুপুরে একহাতে একটি লাঠি, আর একহাতে একটি জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, ভাল লোক একজনও খুঁজে পাই কিনা, তাই দেখছি।

আলেকজাণ্ডার ও ডায়োজিনিস

এই তো ক্ষ্যাপাটে মানুষ, কিন্তু মস্ত বড় জ্ঞানী বলে খুব নামডাক ছিল তাঁর। দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার তাঁর জ্ঞানের কথা শুনে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। অতবড় একজন রাজা এসেছেন, কিন্তু ডায়োজিনিসের গ্রাহ্যই নেই। নিজের টবটিতে আপন মনে বসেই আছেন। শীতকাল, একটু রোদ পোয়াচ্ছেন আর কি!

আলেকজাণ্ডার নিজেই শেষে বললেন, আমি দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার। আপনাকে কিছু দিতে পারি কি?

উত্তর পেলেন, হ্যাঁ রোদটা ছেড়ে দিতে পারেন। আর কিছু চাই না।

আলেকজাণ্ডার সরে গেলেন। তারপর নিজের মনে বললেন, দিগ্বিজয়ী না হয়ে যদি এঁর মত হতে পারতাম!

ডায়োজিনিস টবের মধ্যে বসে আছেন

॥ বুনো রামনাথ ॥

কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র একদিন এক মহাপণ্ডিতের নাম শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। তিনি বনেই থাকেন। কখনও শহরে আসেন না বলে সেই পণ্ডিতকে লোকে বলত 'বুনো' রামনাথ। তাঁর আসল নাম ছিল রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। খুব গরিব, বনের মধ্যে এক ভাঙা কুঁড়েঘরে পুঁথিপত্র নিয়ে আনন্দে থাকেন।

মহারাজ ভাবলেন, এঁকে কিছু সাহায্য করা উচিত। পণ্ডিতের সঙ্গে সাধু ভাষায় কথা বলা উচিত, তাই মুখে বললেন, আপনার কোনও বিষয়ে অনুপপত্তি আছে কি? বুঝতে পারছ তো ব্যাপার কি? পণ্ডিত লোকের সঙ্গে কথা বলছেন কি না, তাই 'অভাব' না বলে শক্ত কথা 'অনুপপত্তি' বলেছেন। কিন্তু ও কথাটার আর একটা অর্থ হল 'বুঝবার অসুবিধা'। রামনাথ অমনি বললেন, না মহারাজ! ক'দিন আগে একটা বইয়ে একটি কথা নিয়ে যেটুকু অনুপপত্তি ছিল, তা আর এখন নেই।

মহারাজ এবার সোজা করে বললেন, সংসারে কোনও টানাটানি থাকে তো দয়া করে আমাকে বলুন।

সংসার? রামনাথ সংসারের কথা কিছুই জানেন না। তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনিও তো রামনাথেরই স্ত্রী! তিনি মহারাজকে বললেন, না বাবা, আমাদের কোনও টানাটানি নেই। গাছে কত তেঁতুলপাতা রয়েছে, তার ঝোল খেয়ে বেশ চলে যায় আমাদের।

এই যে রামনাথ, এই যে ডায়োজিনিস—এঁরা এক শ্রেণীর মানুষ। যুগে যুগে দেশে দেশে এই শ্রেণীর মানুষ অনেক দেখা গেছে। এঁরা শুধু জানতে চান—জ্ঞানলাভের জন্যে আর সব ত্যাগ করেন।

বুনো রামনাথ ও রাজা শিবচন্দ্র

এঁদের বলে দার্শনিক, কেননা এঁরা সব কিছুতেই ভিতরকার কথাটা দেখতে বা দর্শন করতে চান।

সে-হিসেবে রামনাথ আর ডায়োজিনিস যেমন, তেমনি যাঁরা অঙ্ক, কিংবা গাছপালা, কিংবা সূর্যচন্দ্র নিয়ে চিন্তা করেন আর জানতে চান, তাঁরাও দার্শনিক।

॥ ইওরোপের প্রথম যুগের দার্শনিক ॥

ইওরোপের দক্ষিণে গ্রীসদেশে আর তার কাছাকাছি দ্বীপগুলিতেই ইওরোপের প্রথম দার্শনিকদের দেখা পাওয়া যায়। সবচেয়ে আগেকার যাঁর কথা জানা গিয়েছে, তাঁর নাম ছিল থালিস (Thales of Miletus—৬২৪-৫৬৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। তিনি ছিলেন আমাদের বুদ্ধদেবেরও আগেকার লোক। পৃথিবীটা কিসের থেকে হল, তা নিয়ে তিনিই ইওরোপে প্রথম মাথা ঘামিয়েছিলেন। অনেক যুক্তি দিয়ে তিনি ঠিক করেছিলেন যে জলই হল সব কিছু উৎপত্তির মূলে। কথাটা ঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু তিনি যে এই বিষয় নিয়ে ভেবেছিলেন, সেটাই বড় কথা।

॥ পিথাগোরাস ॥

বয়স হিসেবে থালিস-এর পর নাম করা যায় পিথাগোরাস (Pythagoras—৫৮২-৫০৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)-এর। তিনি সেকালের একজন বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন। জ্যামিতিতে ইউক্লিডের যে ১৭নং থিওরেম, সেটা নাকি তাঁরই আবিষ্কার ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, সংখ্যাই হচ্ছে জগৎসৃষ্টির আসল কথা। তিনি আরও বলতেন মানুষের দেহটা তার আসল জিনিস নয়, তার আসল জিনিস হল আত্মা। দেহ মরলেও আত্মা মরে না, কাজেই আসলে মানুষ অমর।

॥ হিরাক্লিটাস ॥

তাঁর পরে হিরাক্লিটাস (Heraclitus—৫৩৫-৪৭৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) বললেন, দুনিয়ার কিছু একভাবে এক-মুহূর্তও থাকে না। কেবলই বদলে যায়। আগুনই হচ্ছে মূল জিনিস, তা থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি। পৃথিবীও বদলাচ্ছে—পৃথিবী হচ্ছে আগুনেরই এক চেহারা। মানুষের মনও তাই।

॥ সক্রেটিস ॥

তারপর এলেন মহাজ্ঞানী সক্রেটিস বা সোক্রাতেস (Socrates—৪৬৯-৩৯৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। গ্রীসদেশেরই এক গরিব চাষীর এই বুদ্ধিমান্ ছেলেটি অতি কদাকার দেখতে ছিলেন। একটু বড় হয়ে তিনি নিজেই ছাত্রদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। তিনি তাদের

পিথাগোরাস ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিচ্ছেন

বিষপানে সক্রেটিসের মৃত্যু

বলতেন যে, জগৎটা কি করে হয়েছে, তা জানবার চাইতে বেশী দরকার মানুষের নিজেকে জানা। তা জানলেই সে সৎপথে থাকতে পারবে, কেননা কিছু জানে না বলেই লোকে অন্যায় করে। ধনদৌলত, ক্ষমতা, নাম —এ সবের চাইতে অনেক বড় কথা হচ্ছে জ্ঞান। আর, সেই জ্ঞানলাভের উপায় হচ্ছে যাচাই না করে কোনও কিছু মেনে না নেওয়া।

এমন লোকেরও শত্রু ছিল। তাঁর শিষ্যরা যাচাই না করে কোনও কথা মেনে নিত না বলে অন্য পণ্ডিতদের অসুবিধে হত। তাই তাঁরা ষড়যন্ত্র করে তাঁর বিচার করলেন। বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হল। বিষ পান করে মরতে হবে তাঁকে।

কারাগারে যখন তাঁর হাতে হেমলক বিষের বাটি দেওয়া হল, তখন তিনি শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিষটুকু পান করলেন—যেন ব্যাপারটা কিছু না। সবাই কাঁদতে লাগল। একজন বললে, বিনা দোষে ওরা আপনাকে মেরে ফেলছে! তিনি হেসে বললেন, মরতে তো হবেই, দোষ না করে মরাই তো ভাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

॥ প্লেটো ॥

সক্রেটিসের দুই শিষ্য ছিলেন খুব বিখ্যাত।

দার্শনিক প্লেটো শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছেন

একজন হলেন বিখ্যাত লেখক জেনোফন (Xenophon), জন্ম বোধ হয় ৪৩০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ; অন্যজন হলেন আরও বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো (Plato—৪২৮-৩৪৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) রাজবংশের ছেলে ছিলেন ইনি। আসল নাম ছিল তাঁর অ্যারিস্টক্লিস। তাঁর চওড়া কাঁধের জন্যে তাঁকে সবাই ডাকত 'প্লেটো' বলে।

সক্রেটিস কিছু লিখে যান নি, প্লেটো কয়েকখানা বই লিখে-ছিলেন। তাতে যেন শিষ্যরা প্রশ্ন করছে, সক্রেটিস উত্তর দিচ্ছেন। এইভাবে প্লেটো সক্রেটিসের চিন্তাধারা জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তাঁর সব-চেয়ে বিখ্যাত বই 'রিপাবলিক'।

আবু-ইব্‌ন্‌-রশিদ

॥ অ্যারিস্টট্‌ল্‌ ॥

প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টট্‌ল্‌ (Aristotle—৩৮৪-৩২২ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ।)। তাঁকে বলা হয় 'সব জ্ঞানীদের গুরু' (The Master of all who know). প্লেটোর সঙ্গে কুড়ি বছর কাটিয়ে তিনি এক রাজপুত্রের গৃহশিক্ষক হন। সেই ছেলেটিই পরে হল দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার। তাঁর একখানা বইয়ের নাম 'পলিটিক্‌স্‌' (রাজনীতি)।
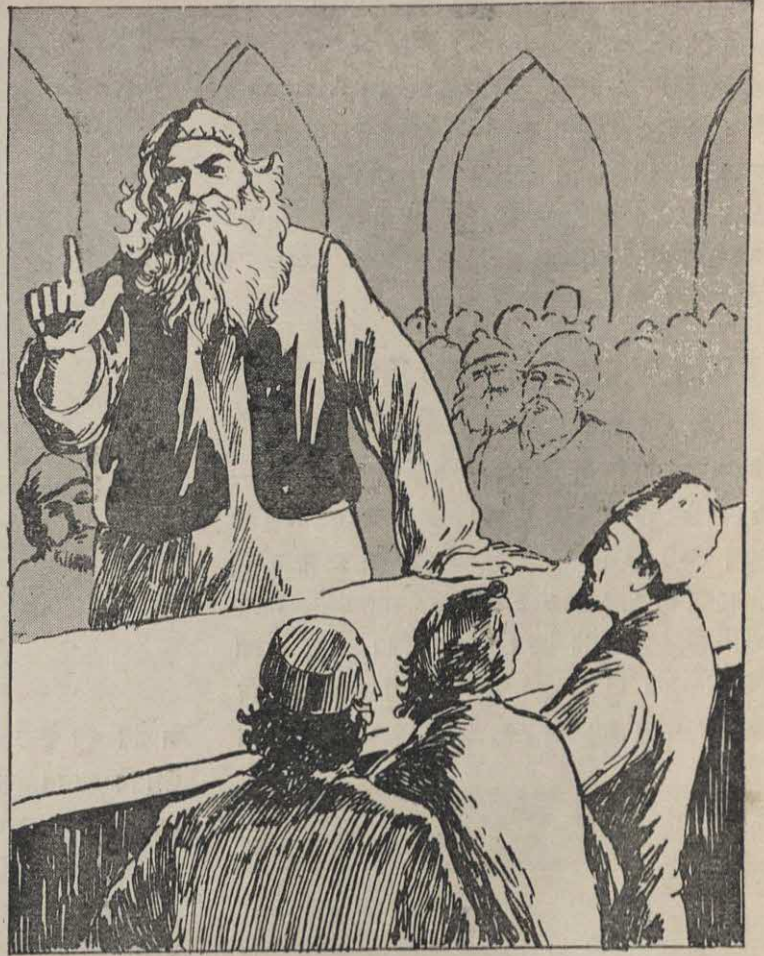
এথেন্সে সশিষ্য অ্যারিস্টট্‌ল্‌

॥ আবু-ইব্‌ন্‌-রশিদ ॥

তারপর প্রায় দেড় হাজার বছরে আর তত বড় পণ্ডিতও কেউ জন্মালেন না,

অ্যারিস্টট্‌লের শিক্ষাও লোকে ভুলে যেতে বসল। তারপর এলেন বিখ্যাত আরব দার্শনিক আবু-ইব্‌ন্‌-রশিদ, যাঁকে খ্রীষ্টানরা বলত আবেরোস (Averroes). ইনি ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের কর্ডোভা শহরে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন অ্যারিস্টট্‌লের ভক্ত। তাঁর চেষ্টায় আর লেখার মধ্য দিয়ে অ্যারিস্টট্‌লের মতগুলি আবার প্রচারিত হল। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

॥ আর কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিক ॥

এর পর নাম করা যেতে পারে ইটালীর সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস (St. Thomas Aquinas—১২২৫-১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)-এর। তাঁর মতো বিদ্বান্‌ সে যুগে কেউ ছিল না। তবে, ইংরেজ পণ্ডিত ফ্রানসিস্‌ বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) মত মহাজ্ঞানী নাকি অ্যারিস্টট্‌লের পরে আর জন্মায় নি। তাঁর লেখা বই Novum Organum, New Atlantis ইত্যাদি জ্ঞানের নতুন নতুন দিক খুলে দিয়েছিল। তিনি আবার খুব উচ্চ সরকারী কর্মচারীও ছিলেন, লড উপাধি পান। অনেকের মতে তিনিই নাকি আসল শেক্‌স্‌পীয়ার—শেক্‌স্‌পীয়ারের নামে যে সব বই চলে, সে সব নাকি তাঁরই লেখা। কী অদ্ভুত প্রতিভা, নয় কি ?

হেগেল

ইমানুয়েল কাণ্ট

দার্শনিকেরা সাধারণতঃ আজকাল আর বিজ্ঞানচর্চা করেন না—বিজ্ঞানের বাইরেকার মন, বুদ্ধি, আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি কথা নিয়েই আলোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম নাম হচ্ছে ফরাসীদেশের দেকার্ত (Rene Descartes—১৫৯৬-১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ)-এর। তারপর হল্যাণ্ডের ইহুদী দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza—১৬৩২-১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)। আর এক দিক্‌পাল পণ্ডিত ছিলেন জার্মানীর ইমানুয়েল কাণ্ট্‌ (Immanuel Kant —১৭২৪-১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, তাঁর বিখ্যাত বই হচ্ছে Critique of Pure Reason. দুজন জার্মান পণ্ডিত হেগেল (Hegel—১৭৭০-১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) আর শোপেনহাউয়ার (Arthur Schopenhauer—১৭৮৮-১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ), আর ফরাসীদেশের কোঁত (Auguste Comte—১৭৯৮-১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)—এঁরাও বিশ্ব-বিখ্যাত দার্শনিক।

শোপেনহাউয়ার

ইওরোপের অন্যান্য বিখ্যাত দার্শনিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন হব্‌স্‌ (Hobbes, ১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রীঃ), লক্‌ (Locke, ১৬৩২-১৭০৪ খ্রীঃ), লাইবনিট্‌স্‌ (Leibnitz, ১৬৪৬-১৭১৬ খ্রীঃ), ভলতেয়ার (Voltaire, ১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রীঃ), হিউম (David Hume, ১৭১১-১৭৭৬ খ্রীঃ), রুসো (Jean Jacques Rousseau, ১৭১২-৭৮ খ্রীঃ), ফিখ্‌টে (Fichte, ১৭৬২-১৮১৪ খ্রীঃ), বেন্থাম (Jeremy Bentham, ১৭৪৮-১৮৩২ খ্রীঃ), এমার্সন (Ralph Waldo Emerson, ১৮০৩-১৮৮২ খ্রীঃ), হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer, ১৮২০-১৯০৩ খ্রীঃ), উইলিয়াম জেম্‌স্‌ (William James, ১৮৪২-১৯১০ খ্রীঃ), নীট্‌শে (Nietzsche, ১৮৪৪-১৯০০ খ্রীঃ), অঁরিবের্গ্‌সঁ (Henri Bergsón, ১৮৫৯-১৯৪১ খ্রীঃ), ইত্যাদি। আর, এত সব দার্শনিকেরা ভারী সুন্দর সুন্দর কথা বলে গেছেন। কিন্তু হলে কি হয়? কথাগুলি বড্ড শক্ত।
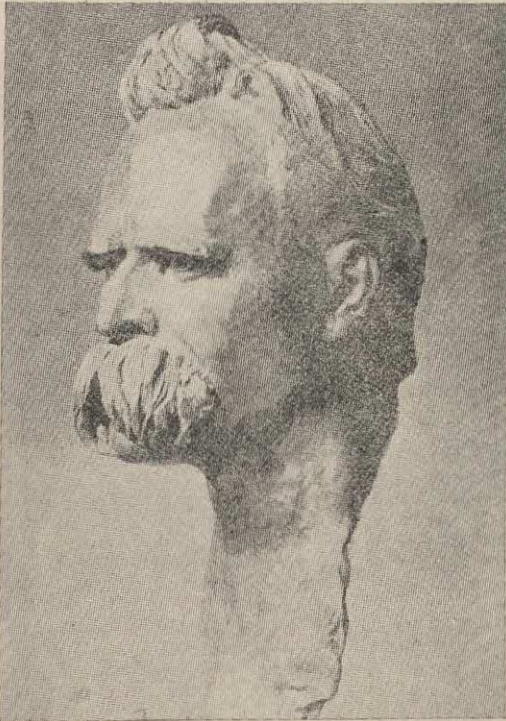
জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill—১৮০৬-১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) একজন বড় দার্শনিক। তাঁর বাবা জেম্‌স্‌ মিল (James Mill) এক বড় পণ্ডিত ছিলেন। পনেরো বছর বয়সে জন স্টুয়ার্ট মিল ধুরন্ধর পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। প্রায় সমস্ত বিষয়ে এবং অনেকগুলি ভাষায় তিনি অগাধ পণ্ডিত হয়েছিলেন, বইও লিখেছিলেন অনেক।

নীট্‌শে

মিল

ভারতের দর্শনশাস্ত্র ॥

ইওরোপের দার্শনিকদের কথা হল, এবার আমাদের দেশের দর্শন আর দার্শনিকদের কথা। ভগবান্, আত্মা, মন ইত্যাদি নিয়ে আমাদের দেশেও সংস্কৃতে লেখা খুব পুরনো বই আছে। তার মধ্যে কোনও কোনওটা প্রায় ৩৫০০ বছরেরও আগেকার। সংস্কৃতে তাদের 'দর্শন' না বললেও সাধারণভাবে আমরা তাদেরও দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে ধরতে পারি। তাদের মধ্যে আছে কয়েকখানা উপনিষদ্।

॥ উপনিষদ্ ॥

উপনিষদ্গুলিকে নানা বেদের নানা অংশের শেষ অংশ বলে মনে করা হয়। বেদ হচ্ছে পৃথিবীর সব চাইতে পুরনো কতকগুলি বই—সংস্কৃতে লেখা। বেদের অন্য অংশে জ্ঞানের আলোচনা বড় একটা নেই, তাই শুধু উপনিষদ্কেই 'দর্শন' বললেও বলা যেতে পারে।

সব চাইতে পুরনো উপনিষদ্ হচ্ছে ছান্দোগ্য আর বৃহদারণ্যক। তাছাড়া আরও কয়েকখানার নাম বলছি—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকি আর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। এগুলোও খুবই পুরনো।

এদের এক একখানাতে এক এক ভাবে ব্রহ্মের (ভগবানের) কথা আছে। এক জায়গায় আছে যে, কথা দিয়ে তাঁকে বোঝানো যায় না, মন দিয়ে তাঁর ধারণা করা যায় না। তাঁর চাইতে ছোটও কিছু হতে পারে না, সব বড়'র চাইতেও বড় তিনি। তিনি ছাড়া কিছু নেই, তিনিই সব। তাই, তুমিও তিনি ('তত্ত্বমসি')। তিনিই প্রাণ, তিনিই আনন্দ। তাঁকে জানলেই সব জানা হল।

॥ গীতা ॥

তারপর, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যাকে সংক্ষেপে বলা হয় গীতা। কেননা ভগবান্ যখন শ্রীকৃষ্ণ হয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন, তখন তিনি অর্জুনকে জীবন, মৃত্যু, আত্মা, ভগবান্ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ দিয়েছিলেন, তা এতে আছে। গীতা হচ্ছে মহাভারতের একটা অংশ—এর সমস্তটাই মহাভারতের মধ্যে আছে।

উপনিষদ্ আর গীতার মতো বই পৃথিবীতে খুব কমই আছে। ভগবান্, আত্মা, আর মানুষের নিজের সম্বন্ধে মানুষের অনেক প্রশ্নের আলোচনা এতে আছে বলে এদের দর্শনের বইয়ের মধ্যে ধরা হয়। কিন্তু হিন্দুদের মতে দর্শন একে বলে না। আমাদের দেশে দর্শন কথাটার আসল অর্থ হল মোক্ষ-শাস্ত্র, অর্থাৎ যাতে মোক্ষ পাওয়া যায় এমন উপদেশ থাকে।
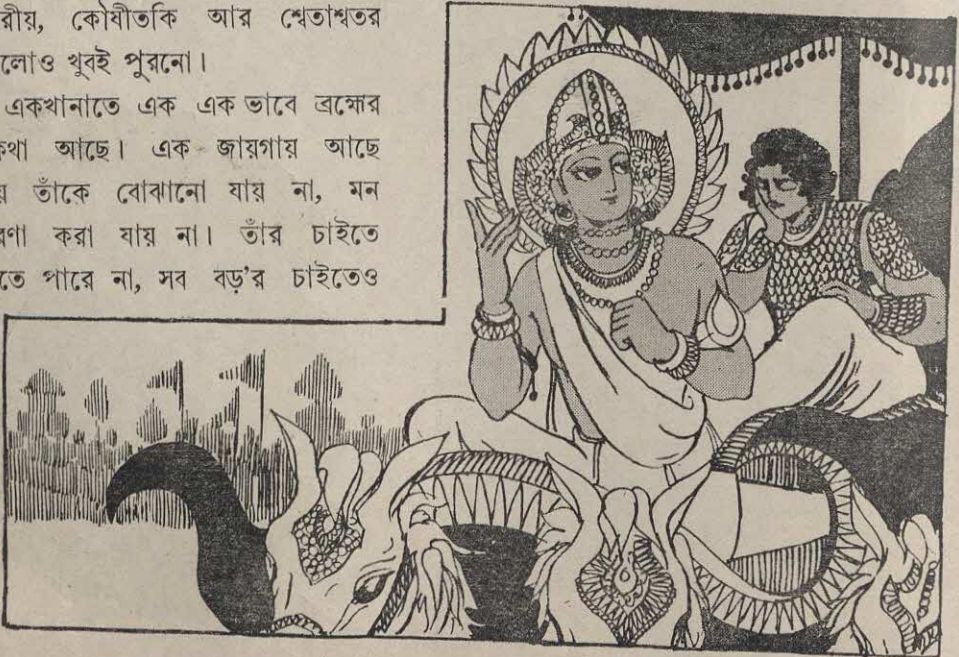
রথের উপরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন

॥ মোক্ষ কাকে বলে ॥

মোক্ষ কাকে বলে? মোক্ষ মানে মুক্তি। দুঃখের হাত থেকে মুক্তি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ কত যে শোক-দুঃখ পায়, তার শেষ নেই। এ দুঃখ আসে অজ্ঞান থেকে। ঠিক কথাটা জানি না, তাই দুঃখ পাই। জ্ঞান পেতে হবে, সত্য কথাটা জানতে হবে—তবেই আর দুঃখ থাকবে না।

॥ নচিকেতা ॥

নচিকেতা নামে একটি ছেলেও এই কথা বলেছিল। তার কথা কঠ-উপনিষদে আছে। যমরাজার কাছে সে মৃত্যুর কথা জানতে চেয়েছিল। যমরাজা তাকে কত ভোলালেন, রাজা করে দেব বলে লোভ দেখালেন, কিন্তু নচিকেতা ছাড়ল না। সে বললে, জ্ঞানের মতো আর কিছু নেই, আমাকে তা-ই দিন। ওসব সাধারণ জিনিস আমি চাই না।

॥ ষড়্‌দর্শন ও নব্যন্যায় ॥

জ্ঞানলাভ করে মোক্ষ পেলে তবেই দুঃখ এড়ানো যাবে, বোঝা গেল। ছ'জন মুনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে ছ'খানা বই লিখলেন—এগুলোই হল সংস্কৃত ষড়্‌দর্শন—ছ'খানা দর্শনের বই।

প্রথম হল ন্যায়দর্শন। বইখানা যিনি লিখেছিলেন তাঁর নাম মেধাতিথি গোতম, গৌতম বা অক্ষপাদ। দ্বিতীয়, কণাদ মুনির বৈশেষিক দর্শন। তৃতীয়, কপিল মুনির লেখা সাংখ্যদর্শন। চতুর্থ, পতঞ্জলির যোগ-দর্শন বা পাতঞ্জল দর্শন। পঞ্চম, জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসা। ষষ্ঠ হল বাদরায়ণ বা ব্যাসের উত্তর-মীমাংসা—একে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রও বলে।

ন্যায়দর্শনের একটা শাখা হল গৌতমের—নব্যন্যায়। মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় এর প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশে নবদ্বীপে নব্যন্যায়ই পড়ানো হত। বাঙালী ন্যায়ের পণ্ডিতদের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণির নাম খুব বিখ্যাত। তাঁর গুরু ছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম।

বাসুদেব বাংলা দেশ থেকে মিথিলায় ন্যায় পড়তে যান। সকলকেই যেতে হত, কেননা ন্যায়ের

কপিল মুনি সাংখ্যদর্শন বোঝাচ্ছেন

পুঁথি মিথিলাতেই থাকত—বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হত না। শিক্ষা শেষ হলে তিনি যখন ফিরে আসবেন, তখন তাঁর পরীক্ষা হল। তাতে তিনি সেখানকার প্রধান পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকেও হারিয়ে দিলেন। তারপর চলে আসবার সময় বলে এলেন—আমি সমস্ত পুঁথি মুখস্থ করে নিয়ে যাচ্ছি, দেশে গিয়ে লিখে ফেলব। বাঙালী ছেলেরা তা-ই পড়বে, তাদের আর এখানে আসবার দরকার হবে না।

বাসুদেব তাঁর কথা রেখেছিলেন। নবদ্বীপেই তিনি ন্যায় পড়াবার টোল খোলেন। তার ফলে ক্রমে ক্রমে মিথিলার পণ্ডিতদের প্রতিপত্তি কমে গিয়ে নবদ্বীপই ন্যায় পড়বার প্রধান জায়গা হয়ে উঠেছিল।

অনেকের মতে বাসুদেব নন, রঘুনাথ শিরোমণিই পক্ষধর মিশ্রকে হারিয়ে মিথিলার সমস্ত পুঁথি মুখস্থ করে নবদ্বীপে নিয়ে এসেছিলেন।

গৌতমের ন্যায় আর গঙ্গেশের নব্যন্যায়ে তফাতটা কি, সে কথাটা শক্ত হলেও একটুখানি বলছি। গৌতম বলেছেন যে প্রমাণ, প্রমেয় ইত্যাদি ষোলটা

বাসুদেব

বিষয়ে জ্ঞান হলে তবে মোক্ষ লাভ হয় (যাকে বলে নিঃশ্রেয়স)। আর, নব্যন্যায়ের মতে শুধু প্রমাণের আলোচনাতেই তা হতে পারে।

কণাদ তাঁর বৈশেষিক দর্শনে ন্যায়ের ১৬টি বিষয় মানেন নি, অন্য ৬টি বিষয়ে জ্ঞানের কথা বলেছেন। তার মধ্যে 'বিশেষ' বলে একটি পদার্থ আছে বলে তাঁর মতের এই দর্শনের নাম বৈশেষিক। তিনি যে পরমাণুর কথা বলছেন, সে-পরমাণু অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের পরমাণু নয়, আলাদা জিনিস।

কপিলের লেখা আসল সাংখ্য বই পাওয়া যায় না। তার কথা প্রধানতঃ জানা যায় ঈশ্বরকৃষ্ণের লেখা সাংখ্যকারিকা থেকে। তাতে জানা যায় যে মোক্ষ পেতে হলে প্রকৃতি, পুরুষ ইত্যাদি ২৫টি তত্ত্ব জানতে হবে।

পতঞ্জলির যোগদর্শনে আছে যে ভগবানকে পেতে হলে কতকগুলি উপায়ে আর কতকগুলি শক্ত কাজ অভ্যাস করে তৈরী হতে হবে।

জৈমিনি তাঁর পূর্ব-মীমাংসায় বলেছেন যে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি করলেই মোক্ষ হবে, তাতে ভগবানের কিছু করা না করার কথা ওঠে না। এটা বেদের পূর্বভাগের কথা। তাই এই দর্শনের নাম পূর্বমীমাংসা।

আর, বেদের উত্তর ভাগে, মানে, শেষের দিকে উপনিষদ্‌গুলিতে যে ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, সেই ব্রহ্মের আলোচনাই আছে ব্যাস বা বাদরায়ণ মুনির লেখা উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র বইয়ে। এই ব্রহ্মসূত্রকে মেনে নিয়ে অথচ তার একেবারে আলাদা-রকমের মানে করে পরে বই লিখেছিলেন দুই মহাপুরুষ—আচার্য শঙ্কর আর আচার্য রামানুজ।

———

পর্বত আরোহনের কথা

॥ পর্বত আরোহণ করে কেন ? ॥

আঠার শতাব্দী থেকে মানুষের মাথায় পর্বত-আরোহণের শখ চাপল। নানা কারণে সাহসী লোকেরা পর্বতের উপর চড়বার চেষ্টা করতে লাগল। এতে ব্যায়াম হয় আর চুড়োয় উঠতে পারলে একটা বিজয়গর্বও মানুষ অনুভব করে। চুড়োয় থেকে সে যে সৌন্দর্য দেখে তাতে তার নয়ন ও মন তৃপ্ত হয়। কিন্তু যেখানে নানা ভয় রয়েছে, পা পিছলে পড়লে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা সেখানেও কেন মানুষ এগিয়ে আসে? তুষার-ঢাকা পর্বতের চুড়োয় পা রাখা যায় না, নিঃশ্বাস নেবার কষ্ট হয়, অক্সিজেনের সিলিণ্ডার নিয়ে যেতে হয়, তার উপর তুষার-ধসের তলায় চাপা পড়ার সম্ভাবনা—পদে পদে মৃত্যুর ভয়—তবুও এরা এগিয়ে আসে কেন? তারা আসে অভিযান করার লোভে, প্রকৃতিকে পরাজিত করতে—মানুষের অসীম শক্তির মহিমা দেখাতে।

জর্জ লে ম্যালরী (George Leigh Mallory) এভারেস্ট শৃঙ্গে উঠতে গিয়ে প্রাণ হারান। তিনি একজন ব্রিটিশ পর্বতারোহণকারী। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেন তিনি এরকম বিপদ্সংকুল অভিযানে যাচ্ছেন। তিনি বলেছিলেন যে বিপদ্ আছে বলেই তিনি যাচ্ছেন, এভারেস্টের গর্ব খর্ব করতে হবে—তাকে পদানত করতে হবে। তাঁর আশা সফল হয় নি। কিন্তু তাঁর আশা সকল মানুষের আশা হয়ে উঠেছিল। অন্য মানুষ তাঁর পর বারবার এভারেস্টকে পরাজিত করতে চেষ্টা করেছে। হেরে গেছে তারা, মৃত্যু বরণ করেছে, কিন্তু আবার নতুন অভিযানকারী এগিয়ে এসেছে।

॥ পর্বতে চড়ার বাধা-বিপত্তি ॥

এক এক পর্বতে ওঠার এক এক রকম বাধা—আবহাওয়ার বাধা আছে, আর আছে আরোহণকারীর শারীরিক বাধা। আরোহণকারীর স্নায়ু ইস্পাতের মতো কঠিন হওয়া চাই, ভয় পেলে বা ভড়কে গেলে চলবে না। বুদ্ধি ও কৌশল দুটিকেই সজাগ রাখতে হবে—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। মুহূর্তে ইতিকর্তব্য ঠিক করে কাজ করতে হবে তাকে। খাড়া পর্বতে পা রাখবার জায়গা থাকে না, পর্বতের গায়ে পিটন (piton) অর্থাৎ লোহার গজাল (বড় লম্বা পেরেক) পুঁতে তা থেকে কাছি দড়ি ঝুলিয়ে আরোহণকারীকে ঝুলে ঝুলে উঠতে হয়। সেকি নিদারুণ ঝুঁকি! উপর থেকে পাথর আলগা হয়ে খসে পড়তে পারে—সে পাথর বড় হলে তার আঘাতে মৃত্যু অনিবার্য। উঁচু পর্বতের চুড়োয় তুষার বা বরফ জমে থাকতে পারে—এ সব তুষার গলে বিরাট বিরাট তুষার-ধস (avalanche) আকারে নীচে নেমে আসতে পারে। এছাড়া আছে তুষার নদী বা হিমবাহ (glacier) তার মধ্যে পড়লে মানুষ তলিয়ে যেতে পারে।

ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্ভাবনাও আছে। তাকে বলে blizzard, অর্থাৎ তুষার ঝড়। এসব এড়িয়ে পর্বতে উঠতে হয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় আরোহণকারীদের হাত ও পায়ের আঙল অসাড় হয়ে যেতে পারে।

পিটন বা ইস্পাতের গোঁজ মেরে পর্বতে পা রাখবার চেষ্টা করছে

এক চুড়ো থেকে অন্য চুড়ো যাবার দুঃসাহসিক চেষ্টা

একে ইংরেজীতে বলে frost-bite. এসব হিসেব না করে পর্বতে ওঠা মানেই মৃত্যু।

হিমালয় পর্বতে ওঠার মরসুম হল বসন্তকাল। শীত ও বর্ষার বারিপাতের মধ্যের সময় হল পর্বতে ওঠার পক্ষে উপযোগী।

উঁচু পর্বতের চুড়োয় বাতাস অত্যন্ত পাতলা। সেখানে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তাই মুখে মুখোশ পরে অক্সিজেনের সিলিণ্ডার সঙ্গে করে নিয়ে না গেলেই মৃত্যু। এত সব ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখলেও সেখানে দারুণ ঘুম পায়, ঘুমিয়ে পড়লেই সর্বনাশ। সে ঘুম আর ভাঙে না! রাতদিন সাদা তুষার দেখে অনেক অভিযানকারীর দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। তুষারের উপর যখন সূর্যকিরণ পড়ে উজ্জ্বল আলো ঠিকরে বেরোয় তখন সেদিকে চাইলে চোখ একেবারে অন্ধ হয়ে যায়।

এছাড়া পর্বতে ওঠবার জন্যে অনেক কৌশল শিখতে হয় আর অনেক সাজসরঞ্জামও সঙ্গে নিতে হয়।

॥ পর্বতে ওঠবার কৌশল ও সাজসরঞ্জাম ॥

নীচু পর্বতে উঠতে হলে কেবল শরীরের বল ও ধৈর্য চাই, আর চাই শক্ত একজোড়া বুট জুতো আর খাবারের সংস্থান। কিন্তু খুব উঁচু আর খাড়া পর্বতে উঠতে হলে কিছু কিছু

পর্বতের উপর থেকে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হচ্ছে।

পর্বত ও পর্বত আরোহণের কথাঃ

[পর্বতের উপর থেকে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হচ্ছে।]

পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র, মরুভূমি, তুষার-প্রান্তর নিয়ে আমাদের পৃথিবী। এ সবের বহু স্থান দুর্গম। মানুষ অভিযাত্রীরা সেই সব দুর্গম স্থানে গিয়েছেন, সেখানকার আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন। সমুদ্রের নীচে, গহন অরণ্যে, দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমিতে, তুষারাবৃত পর্বতে গিয়ে তাঁরা নানা আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন, আজও করেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে, এক সুউচ্চ বরফে ঢাকা পর্বতগাত্রে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি চলচ্চিত্রের উপযোগ্য আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন, তাঁর দুজন সহকর্মী তাঁকে সাহায্য করছেন। উপরে এক ব্যক্তি দড়ি ধরে পর্বতের আরো উচ্চ স্থানে উঠে যাচ্ছেন।

মেরু অঞ্চলে এ রকম বরফে ঢাকা পর্বত দেখা যায়। হিমালয়, আল্পস প্রভৃতি পর্বতের নানা স্থান পুরু বরফে ঢাকা থাকে। অভিযাত্রীরা সেই সব দুর্গম স্থানে গিয়ে আলোকচিত্র গ্রহণ করেন।

পর্বতের গায়ের বিরাট ফাঁক কি করে পার হওয়া যাবে তা শেখানো হচ্ছে

হয়, এমনি প্রথমে এক পা দিয়ে জায়গাটা শক্ত কিনা দেখে নিয়ে, পরে দু'পা রাখতে হয়।

পাহাড়ের চুড়ো থেকে নীচে নামবার সময়ে পিঠের উপর ভর দিয়ে পা দুটোর মধ্যে দড়িটা আটকে ধরে ঝুলে সড়সড় করে নেমে আসতে হয়।

তুষারে ঢাকা পর্বতে ওঠবার সময়ে বুটের তলায় ক্র্যাম্পন (crampon) নামে একরকম কাঁটাওলা ফ্রেম লাগিয়ে নিতে হয়। এর ফলে তুষারে পা হড়কাবার সম্ভাবনা থাকে না।

অভিজ্ঞতার দরকার। কিছু কৌশলও জানা চাই, আর কয়েকটি সাজসরঞ্জামেরও দরকার। এছাড়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব (অর্থাৎ ঠিক সময়ে তাড়াতাড়ি ঠিক কাজটি করে ফেলার বুদ্ধি) আর আত্মবিশ্বাস চাই।

সাধারণ অভিযানকারীর দল তিন চারজনের মধ্যে কাছি দিয়ে পরস্পরকে বেঁধে রাখে। এইরূপ ব্যবস্থা থাকে বলে একজন পা পিছলে পড়ে গেলে অপরেরা তাকে উঠিয়ে নিতে পারে—সে একেবারে গড়িয়ে পড়ে যায় না।

কোন দুর্গম বিপদ্‌সংকুল জায়গা পার হবার সময়ে যে এগিয়ে যায় সে, হয় কাছিটা কোন পর্বতের উঁচু শিঙে বেঁধে দেয়, নয়তো নিজের শরীরে সেটা জড়িয়ে নিয়ে তবে অন্যদের একে একে পার হবার জন্যে দড়ি টেনে সংকেত জানায়। খুব উঁচু পর্বতে ওঠবার সময়ে সেটির গায়ে পিটন (piton) অর্থাৎ গজাল পুঁতে সেই গজালে কাছি আটকে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে হয়। পর্বতে উঠতে গেলে হাত-পা সাবধানে পর্বতের উপর রাখতে হয়। পুরো শরীরের ভর দেবার আগে জায়গাটা নির্ভরযোগ্য কিনা পরীক্ষা করে নিতে হয়। নতুন জায়গায় হাত বা পা রাখবার আগে প্রথমে এক হাত রেখে পরে দু'হাত রাখতে

পিটনের সাহায্যে পর্বতে ওঠার চেষ্টা হচ্ছে

পিটনের সাহায্যে পর্বতে অনেকদূর ওঠা হয়েছে

এছাড়া হাতে একটা বরফ-কাটা কুঠার নিতে হয়। হঠাৎ পা হড়কে গেলে, পাশের বরফে কুঠার দিয়ে আটকে, পড়া বন্ধ করা যায়।

অনেক সময় তুষার-নদী পার হবার জন্যে এক রকম হালকা মই ব্যবহার করা হয়। দড়ি দিয়ে অভিযানকারীদের এক সঙ্গে বাঁধা থাকার ফলে অনেক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচা যায়।

দীর্ঘদিন ধরে অভিযান চালাতে হলে, শোবার জন্যে তাঁবু ইত্যাদি আর রান্নার সরঞ্জাম দরকার। কাপড়-চোপড় ও অক্সিজেনের প্রচুর ব্যবস্থাও থাকা দরকার। বাতাস-ভরা বালিশ আর গদি নিলে গরমে আরামে থাকা যায়। 'প্রেশার কুকার' সঙ্গে থাকলে রাঁধারও সুবিধে হয়।

এভারেস্টের মতো উঁচু দুর্গম চুড়োয় উঠতে গেলে আগে সাবধানে সকল ব্যাপার ভেবে একটা পরিকল্পনা করা দরকার। এভারেস্টে পৌঁছবার একাধিক পথ। কোন্ পথ ধরে যেতে হবে তা ঠিক করা দরকার। তাছাড়া ভারী মালপত্র বইবার জন্যে কুলী (শেরপা) ঠিক করতে হয়। সারা পথে কয়েকটি তাঁবু রাখা দরকার। সুবিধেমতো নীচের তাঁবু থেকে মালপত্র উপরের তাঁবুতে নিয়ে যেতে হয়।

॥ পৃথিবীর কয়েকটি পর্বতচুড়ো ॥

দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাকনক্যাগুয়া	২২,৮৩৫ ফুট
দক্ষিণ আমেরিকার ইলামপু (Illampu)	২১,৪৯০ ,,
উত্তর আমেরিকার ম্যাককিনলি (Mackinley)	২০,৩২০ ,,
(ককেসাসের) মাউণ্ট এলব্রুস ...	১৮,৫২৬ ,,
মঁ ব্লাঁ (আল্প্স্) ...	১৫,৭৮১ ,,
বেন নেভিস (স্কটল্যাণ্ড) ..	৪,৪০৬ ,,
স্নোডন (ওয়েল্স্) ...	৩,৫৭১ ,,
সীকেল (ইংল্যাণ্ড) ...	৩,২১০ ,,
ক্যারানটুও হিল (আয়ার্ল্যাণ্ড) ...	৩,৪১৪ ,,

॥ হিমালয়ের কয়েকটি উঁচু চুড়ো ॥

এভারেস্ট ...	২৯,০২৮ ফুট
কে২ (গডউইন অস্টেন) [কারাকোরাম পর্বতে] ...	২৮,২৫০ ,,
কাঞ্চনজঙ্ঘা ...	২৮,১৪৬ ,,
মহাকাল (মাকালু) ...	২৭,৭৯০ ,,
চো ওয়ু ...	২৬,৮৬৭ ,,
ধবলগিরি ...	২৭,৭৯৫ ,,
নাঙ্গা পর্বত ...	২৬,৬৬০ ,,
অন্নপূর্ণা ...	২৬,৪৯২ ,,
গোঁসাই থান ...	২৬,২৯১ ,,
কামেত ...	২৫,৪৪৭ ,,
মান্ধাতা ...	২৫,৩৫৫ ,,
তিরিচমীর ...	২৫,২৬৩ ,,
গৌরীশংকর ...	২৩,৪৪০ ,,
ত্রিশূল ...	২৩,৪০৬ ,,

॥ পর্বত আরোহণের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ॥

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আল্প্স পর্বতের মঁ ব্লাঁ (Mont Blanc) চুড়োয় ওঠেন জ্যাক্স বালমা (Jacques Balmat) ও ডাক্তার প্যাকার্ড (Paccard).

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের ম্যাটারহর্নের চুড়োয় ওঠেন এডওয়ার্ড হুইম্পার নামে একজন ইংরেজ।

আফ্রিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত কিলিম্যাঞ্জারো (তানজানিয়া) ১৯,৩২১ ফুট উঁচু। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই চুড়োয় ওঠেন হ্যান্স্ মেয়ার আর এল্. পার্টসেলার (Purt Scheller).

অ্যাকনক্যাগুয়া ২২,৮৩৫ ফুট উঁচু। এটি দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় অবস্থিত। এই পাহাড়ে ওঠেন জারব্রিগেন (Zurbriggen) ও ভাইন্স্ (Vines).

কানাডার মাউন্ট লোগান ১৯,৮৫০ ফুট উঁচু। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাম্বার্ট ও ম্যাকার্থি প্রথম এর চুড়োয় ওঠেন।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যরিস হারজগ (Maurice Herzog) হিমালয়ের অন্নপূর্ণা নামে এক চুড়োয় ওঠেন। এই চুড়োর উচ্চতা ২৬,৪৯২ ফুট।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু চুড়ো এভারেস্টে আরোহণ করেন একটি দল। এই চুড়োর উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট। দলটির নেতা ছিলেন কর্নেল এইচ. সি. জে. হান্ট (H. C. J. Hunt). ঐ বছরের ২৯শে মে ঐ দলের এডমণ্ড হিলারী (Edmund Hillary) নামে একজন নিউজীল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং তেনজিং নোরগে নামে একজন পাহাড়ী একসঙ্গে এভারেস্ট চুড়োয় উঠেছিলেন।

এই বছর নাঙ্গা পর্বতে আরোহণ করেন একজন জার্মান অভিযানকারী। তাঁর নাম পীটার অ্যাসেন-ব্রেনার (Peter Aschenbrenner). এই চুড়োর উচ্চতা ২৬,৬৬০ ফুট।

K_2 (গডউইন অস্টেন) ২৮,২৫০ ফুট উঁচু। আর্ডিটো ডেসিও নামে এক ইটালীয়ান দলনেতা এই অভিযানে সফল হন। K_2 কাশ্মীরের কারাকোরাম পর্বতে অবস্থিত।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ইভান্স্ (Charles Evans) নামে এক ব্রিটিশ অভিযাত্রী কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োয় ওঠেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা ২৮,১৪৬ ফুট উঁচু।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এক সুইস অভিযাত্রী দল হিমালয়ের আরেকটি চুড়ো, ধবলগিরি, অভিযান করেন। এই দলের নেতা ছিলেন ম্যাক্স আইসেলিন। ধবলগিরি ২৬,৭৯৫ ফুট উঁচু।

॥ হিমালয় বিজয় অভিযান ॥

১৮০৫ খ্রীঃ সর্বপ্রথম হিমালয় অভিযানের চেষ্টা হয়।
১৮২৮ „ ক্যাপ্টেন জিরার্ড ১৯,০০০ ফুট ওঠেন।
১৮৮৩ „ উইলিয়াম গ্রেহাম ২৪,০০০ ফুট ওঠেন।
১৮৯২ „ কনওয়ে ও একেনস্টিন (দু'জনই অস্ট্রিয়ান আরোহী) ২৬,০০০ ফুট পর্যন্ত ওঠেন।
১৯০৩ „ মিসেস বুলক ও তাঁর স্বামী ২২,০০০ ফুট পর্যন্ত ওঠেন।
১৯০৫ „ জ্যাকো গুইলার্মোর নেতৃত্বে একদল কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োয় ওঠবার চেষ্টা করেন।
১৯০৯ „ ইতালীয় অভিযানকারী ডিউক অব আব্রুৎসীর নেতৃত্বে একটি দল $কে_২$র চুড়োয় ২০,০০০ ফুট পর্যন্ত ওঠেন।
তাঁরা আবার ব্রাইডস পীকের ২৪,৬০০ ফুট পর্যন্ত ওঠেন।
১৯২৯ „ ডাঃ পল বাউয়ারের দল কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োয় ২৩,০৩৫ ফুট পর্যন্ত ওঠেন।
১৯৩০ „ ফ্রাঙ্ক স্মাইথের দল কামেটের চুড়োয় ওঠেন।
১৯৩১ „ ডাঃ পল বাউয়ার দ্বিতীয় অভিযানে কাঞ্চনজঙ্ঘার ২৫,৬২০ ফুট পর্যন্ত ওঠেন।
১৯৩৩ „ লেফটেনাণ্ট পি. আর. অলিভার ও ডেভিড ক্যাম্বেল ত্রিশূলের চুড়োয় ওঠেন।
১৯৩৪ „ প্রোফেসর গ্রেহাম ব্রাউনের দলের টিলম্যান ও ওডেল নন্দাদেবীর চুড়োয় ওঠেন।

হিমালয় বিজয় অভিযানের দল চলেছেন তুষারপথে

১৯৩৭ খ্রীঃ ডাঃ কার্ল হ্বিনের (Wien) নেতৃত্বে এক জার্মান দল কাঞ্চনজঙ্ঘার ২৪,০০০ ফুট পর্যন্ত ওঠেন এবং সকলে তুষারে চাপা পড়ে প্রাণ হারান।

॥ এভারেস্ট বিজয়ঃ প্রথম অভিযান ॥

এভারেস্টের মাথায় উঠবার চেষ্টা আরম্ভ হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর। নেপাল সরকারের অনুমতি ও দালাইলামার অনুমতি ছাড়া তখনকার দিনে হিমালয়ের এভারেস্ট চুড়োয় আরোহণ করা সম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের মধ্যস্থতায় নেপাল ও তিব্বতের ধর্মগুরু দালাইলামার অনুমতি শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শুরু হয়। কোন্ দিক্ দিয়ে কোন্ পথে হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু চুড়োয় আরোহণ করা সহজ হবে, সেই কথা ভাবতে থাকেন কর্নেল হাওয়ার্ড বেরি। তাঁর দলটি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং-এ এসে সমবেত হন।

এই অভিযানে ম্যালরী ছিলেন। এভারেস্ট অভিযানের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। হিমালয়ের ওই অঞ্চলে পথ পাউডারের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো তুষারে ঢাকা। একটু অসাবধান হলেই কোথায় যে চলে যেতে হবে তার ঠিক নেই। কোথাও বা সামনে বিরাট তুষার-নদী (glacier). কোথাও বা তুষার-ঝঞ্ঝা (blizzard). ম্যালরী একা এগিয়ে চললেন। সামনে দেখলেন রংবাক নামে একটি তিব্বতী মঠ।

চারদিকে কেবল বাধা। কোন্ দিক দিয়ে কি করে উঠবেন! ম্যালরী ভেবে কূল পান না। চারদিকে অজস্র মৃত্যুফাঁদ পাতা! ভাবতে ভাবতে, যাওয়ার পথ ঠিক করতে করতে সময় কেটে গেল। শীত এসে পড়েছে। শীতকালে একেবারেই অভিযান চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু ম্যালরীর মনের বল ছিল দুর্জয়। তিনি একটা সরু পথ আবিষ্কার করলেন। তার নাম দিলেন 'নর্থ কোল' (উত্তরের পথ)। এই পথ ২৩,০০০ ফুট উঁচুতে। এই পথ আবিষ্কার করেই প্রথম বারের মতো ম্যালরীকে ফিরতে হল।

॥ দ্বিতীয় অভিযান ॥

এর পরের বছরেই নতুন একদল এগিয়ে এল জেনারেল ব্রুসের নেতৃত্বে। এ দলে ছিলেন তেরজন ইংরেজ ও ষাটজন শেরপা জাতীয় পাহাড়ী সাহায্যকারী। এই দলে ছিলেন পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ পর্বত-আরোহণকারী—ম্যালরী, নর্টন, সমারভেল ও ফিঞ্চ।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মার্চের শেষে অভিযান শুরু হল। দ্বিতীয় অভিযাত্রী দল রংবাক মঠে পৌঁছে একটা তাঁবু (base camp) গাড়লেন। সেই তাঁবু

থেকেই আসল অভিযান চালানো হবে। এখান থেকে কয়েকজন উপরে উঠে দ্বিতীয় তাঁবু খাটাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁবু খাটানোর জায়গা পাওয়া খুব সহজ ছিল না। হিমালয়ের গায়ে মাত্র দু'ফুট চওড়া একটা শক্ত স্তর (layer) আবিষ্কার করতে তাঁদের অনেক বেগ পেতে হল।

এইভাবে ম্যালরী ২৫,০০০ ফুট পর্যন্ত উঠলেন। এখানে ৪নং তাঁবু খাটানো হল।

এরপর ব্রুস ও ফিঞ্চ পরদিন প্রাণপণ চেষ্টা করে ২৭,৩০০ ফুট পর্যন্ত উঠলেন।

এরপর ম্যালরী ও সমারভেল উঠতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন তাঁদের সাহায্যকারী একদল শেরপা তুষারের মধ্যে হারিয়ে গেল। ম্যালরী ও সমারভেল তাদের উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে গেলেন। সাতজনের মধ্যে তিনজনকে তাঁরা উদ্ধার করতে পারলেন। এরপর আর ওঠা সম্ভব হল না। সকলে তাঁবুতে ফিরে এলেন। সেবার এই অভিযান আর চালানো সম্ভব হল না।

মৃত্যুভয়সংকুল এভারেস্টের পথে দড়ি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় আরোহণ

॥ তৃতীয় অভিযান ॥

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় অভিযানের জন্যে তৈরী হয়ে এলেন আর এক দল। এবারেও দলে ছিলেন ম্যালরী। এবারের অভিযানের নায়ক ছিলেন জেনারেল ব্রুস। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনা হয়। তাঁর স্থান অধিকার করলেন নর্টন। এই দলে হ্যাজার্ড নামে একজন অভিযাত্রী ছিলেন। তিনি কয়েকজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে ২৫,০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত তাঁবু থেকে এগোতে লাগলেন। পথ ভয়ানক

এভারেস্ট অভিযানের একজন নায়ক কর্নেল স্যার জন হাণ্ট

দুর্গম। পাশ দিয়ে তুষার-নদী নেমে আসছে—উপরে ঝঞ্ঝা বইছে। হ্যাজার্ড দেখলেন এগোলেই মৃত্যু। তাই একটা ছোট জায়গায় কোন রকমে একটা তাঁবু খাটালেন। কিন্তু কয়েকজন শেরপা সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মারা পড়ল। বাকী কয়জনকে নিয়ে হ্যাজার্ড আগেকার তাঁবুতে ফিরে এলেন।

আবার আরোহণ শুরু হল। তাঁরা ২৬,৮০০ ফুট পর্যন্ত উঠলেন। আর ২২২৮ ফুট বাকী। প্রথমে বেরুলেন ম্যালরী ও ব্রুস। কিন্তু ফিরে এলেন তাঁরা—দারুণ দুর্যোগে অগ্রসর হতে পারলেন না। ২৮,২০০ ফুট উঠে তাঁরা দু'জনেই ফিরে এলেন। তখন নর্টন অন্ধ, আর সমারভেল বোবা হয়ে গেছেন।

আর বেশী দিন হিমালয়ের উপর থাকা চলবে না —দুর্যোগ আসছে। এই সুযোগ না নিলে এবারের মতো অভিযান ত্যাগ করতে হবে। ম্যালরী তাতে রাজী নন। তিনি আর্ভিনকে নিয়ে অগ্রসর হলেন।

ঐ দলে ওডেল নামে একজন ভূতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। ৬নং তাঁবুতে ওডেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ম্যালরী ও আর্ভিন উঠতে লাগলেন। ওডেল টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে লাগলেন চুড়োর দিকে এগোচ্ছে ছোট্ট পুতুলের মতো দু'জন আরোহী—আর ৮০০ ফুট বাকী। হঠাৎ একটা তুষার ধস তাঁদের আড়াল করে ফেলল। মেঘ কেটে গেলে দেখা গেল কেউ কোথাও নেই। ম্যালরী ও আর্ভিন তুষারের মধ্যে চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন। এ অভিযানও ব্যর্থ হল। এভারেস্ট রইল অপরাজিত। এই অভিযানে প্রাণ দিয়েছিলেন ১৩ জন। রংবাকে তাঁদের স্মৃতিস্তম্ভ আছে।

॥ আরো অভিযান ॥

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাটলেজের নেতৃত্বে আর একটি অভিযান চালানো হল। এবার অভিযানকারীরা

প্রথম এভারেস্ট-শৃঙ্গ-বিজয়ী তেনজিং নোরগে ও স্যার এডমণ্ড্ হিলারী

বেতারযন্ত্র সঙ্গে নিলেন। এই অভিযানে এরিক শিপটন ও ফ্রাঙ্ক স্মাইথ যোগ দেন। স্মাইথ বিনা অক্সিজেনে ২৮,১০০ ফুট পর্যন্ত ওঠেন। কিন্তু অভিযান ব্যর্থ হয়। এরপর ১৯৩৬-এর অভিযানটিও ব্যর্থ হয়।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিমানপোত এভারেস্ট-শৃঙ্গের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। এতে ছিলেন কেলোজ্ আর লর্ড ক্লাইড্স্‌ডেল।

॥ এভারেস্ট বিজয়ের পথে ॥

রাটলেজের দলে এরিক শিপটন একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। তেনজিং নোরগে তাঁরই হাতে গড়া শেরপা।

ম্যালরীর আবিষ্কৃত নর্থ কোল ধরেই এভারেস্টে উঠতে হবে কিন্তু তার আগে সামনের চুড়োর অবস্থাটা জানা দরকার। শিপটন ঠিক করলেন যে, ২৭,০০০ ফুট উঁচুতে গিয়ে সেখানকার অবস্থা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কিন্তু এত তুষারপাত হতে লাগল যে তাঁরা সেখানে থাকতে না পেরে সেবারের মতো ফিরে এলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার রাটলেজের অধিনায়কত্বে চেষ্টা হয়। শিপটন ও স্মাইথ এ দলে ছিলেন। কিন্তু এবার এত দুর্যোগ দেখা দিল যে মাঝরাস্তা থেকে তাঁদের ফিরতে হল।

এরপর দু'বছর কেটে গেল। আবার অভিযানের আয়োজন হল। এবার দলের নায়ক টিলম্যান। এ দলেও শিপটন, স্মাইথ ও তেনজিং ছিলেন। এবারের অভিযানে এঁরা বুঝলেন যে নর্থ কোল ধরে কোনদিনই এভারেস্টে চড়া যাবে না। এপথ অত্যন্ত দুর্গম। তাঁদের দক্ষিণ দিক্ ঘুরে যেতে হবে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে শিপটন একটি ছোট দল নিয়ে নতুন পথের সন্ধানে আবার চললেন। এবারও তিনি ব্যর্থ হলেন কিন্তু একটি নতুন পথ আবিষ্কার করলেন।

॥ বিজয় অভিযান ॥

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নতুন পথেই এগিয়ে চলল এক অভিযাত্রী দল। এই দলে ছিলেন কর্নেল হাণ্ট (John Hunt—ইংরেজ), এডমণ্ড হিলারী (Edmund P. Hillary—নিউ জীল্যাণ্ডের অধিবাসী), তেনজিং (Tenzing—নেপাল-ভারতীয়), টমাস স্টোবার্ট (Thomas Stobart), জর্জ সি. ব্যাণ্ড (George C. Band), চার্ল্‌স্ জিওফ্রে উইলি (Charles Geoffrey

তুষার পথে হিলারী

Wylie), টমাস বুর্দিলোঁ (Thomas Bourdillon), আর. সি. ইভান্স (R. C. Evans), জর্জ লাওয়ি (George Lowe), উইলফ্রিড নইস (Wilfrid Noyce), এল. জি. পিউ (L. G. Pugh), আলফ্রেড গ্রেগরি (Alfred Gregory) এবং মাইকেল ওয়েস্টম্যাকট (Michael Westmacott).

এবার অনেক উঁচুতে তাঁরা তাঁবু ফেলার মতলব করলেন। ২৮শে মে তাঁরা ৮নং তাঁবু ফেললেন ২৭,৮০০ ফুট উঁচুতে। সেখানে এত ঠাণ্ডা যে, সারারাত কেউ ঘুমতে পারলেন না! ২৯শে মে ছ'টা না বাজতেই তাঁবু থেকে তাঁরা বার হলেন। সারাপথ গুঁড়ো গুঁড়ো বরফে ভরতি। বুটসুদ্ধ পা বরফে ডুবে যাচ্ছিল। এগিয়ে যাওয়া দারুণ কষ্টকর। পা পিছলে পড়ে গেলে শত শত ফুট নীচে কোথায় যে পড়বেন তার স্থিরতা নেই। একজনের সঙ্গে আর একজনের কোমরে দড়ি বাঁধা। এই অবস্থায় ৯নং তাঁবুতে এসে ওরা পৌঁছলেন। এটা শেষ তাঁবু। আর ৮৮০ গজ বাকী। সঙ্গে যে অক্সিজেন এনেছিলেন তা ফুরিয়ে যাবার আগেই চুড়োয় না পৌঁছতে পারলে এবারেও ফিরতে হবে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরে এই শেষ ধাপে অগ্রসর হলেন হিলারী আর তেনজিং। অবর্ণনীয় কষ্টে তিল তিল করে এগিয়ে শেষে সাড়ে এগারটার সময় তাঁরা এভারেস্টের চুড়োয় পৌঁছলেন। সেদিন ২৯শে মে, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ।

তেনজিং প্রথমে উঠলেন। তারপর সেখানে নত হয়ে ভগবান্ বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে নেপাল ও ভারতের পতাকা পুঁতে দিলেন। তারপর নিয়ে এলেন হিলারীকে।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় মানুষ চেষ্টা করেছে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু চুড়োয় উঠতে। কষ্ট করেছে কত, প্রাণ দিয়েছে কত! তবু চেষ্টা ছাড়ে নি। তাই শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছে হার মানল এভারেস্ট। মানুষ উঠল তার চুড়োয়, পুঁতল তার জয়ের চিহ্ন। সে মানুষ আমাদেরই একজন। তাঁর নাম তেনজিং নোরগে।

॥ তেনজিং নোরগে ॥

নেপালের থামি গ্রামে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তেনজিং-এর জন্ম হয়। তাঁর উপাধি ছিল 'নোরকে'। সেটা তিনি বদল করে 'নোরগে' পদবী নিয়েছেন।

গ্রামের শান্ত একঘেয়ে জীবন তাঁর ভাল লাগত না। তাই একদিন তিনি বেরিয়ে পড়লেন পৃথিবীর ডাকে ঘর ছেড়ে দার্জিলিঙের উদ্দেশ্যে।

এখানে তিনি পছন্দ করে নিলেন শেরপার কাজ। বিদেশী পর্বত-আরোহণকারীদের সাহায্যকারী হিসেবে যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে। তখন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। তখন থেকেই তেনজিং-এর পাহাড়ে ওঠার শিক্ষা আরম্ভ হল। সে বছর থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত যত দল হিমালয় পর্বতারোহণের চেষ্টা করেছে সব দলেই তিনি ছিলেন।

তেনজিং নোরগে

তুষার-ঝঞ্ঝা থেকে কত অসহায় অভিযাত্রীকে তিনি বাঁচিয়েছেন! হাসিমুখে এগিয়েছেন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষতে। শেষ পর্যন্ত বিজয়মালা তাঁরই গলায় দুলল।

দার্জিলিং-এর পর্বতে আরোহণ শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানে একটি ক্লাস

॥ পরবর্তী অভিযান ॥

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ও ২৪শে মে একটি সুইস অভিযাত্রী দল দু'বার এভারেস্ট চুড়োয় পেঁাছলেন।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নর্মান ডিরেনফার্থ (Norman G. Dyhrenfurth)-এর অধিনায়কত্বে একদল ১লা মে চুড়োয় পেঁাছেন। সাউথ কলের রাস্তা ধরে ২৩শে মে জেমস হুইটাকার ও নাওয়াং গোম্বু চুড়োয় পেঁাছান।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি ভারতীয় অভিযাত্রী দল চুড়োয় উঠতে চেষ্টা করেন। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার এম. এস. কোহলি। এই দলের এ. এস. চীমা ও নাওয়াং গোম্বু

নাওয়াং গোম্বু। ৩৪ বছর বয়সের যুবক। ইনি দু'বার এভারেস্টের চুড়োয় উঠেছেন

২০শে মে চুড়োয় পেঁাছান। এই দলের আরও অনেকে পরে পরে চুড়োয় পেঁাছান।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটি জাপানী অভিযাত্রী দল অগ্রসর হন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ১৩ই এবং কয়েকজন ১৪ই মে চুড়োয় ওঠেন। তারপর আর একদল জাপানী দ্বিতীয়বার এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছিলেন ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

॥ এভারেস্ট চূড়ায় প্রথম মহিলা ॥

ইতিমধ্যে এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠবার আরও উন্নত কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, এমনকি দক্ষিণদিক থেকে ওঠবার আর একটি পথও (South col) জানা গিয়েছে। ১৯৭৫-এর এপ্রিল মাসে একদল জাপানী মহিলা সেই পথে উঠবার চেষ্টা করেন। অনেক বিপদ বাধা পার হয়ে তাঁদের একজন, মিসেস জুনকো তাবেই (Mrs Junko Tabei) আর তাঁর সঙ্গী শেরপা আং সেরিং (Ang Tsering) ১৬ই মে ১৯৭৫ তারিখে বেলা ১২॥ টার সময় এভারেস্ট শিখরে ওঠেন। মিসেস তাবেইয়ের আগে আর কোনও মহিলা সেখানে উঠতে পারেন নি।

ঐ একই সময়ে জাপানীরা আর একটি দুর্ধর্ষ শিখরে (ধবলগিরি-৪) আরোহণ করেছেন।

॥ হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট্ ॥

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্বতে আরোহণ শিক্ষা দেবার জন্যে দার্জিলিং-এ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এখানে পর্বত আরোহণের কৌশল শেখানো হয়।

হিমালয়ের পর্বতে আরোহণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মইয়ের সাহায্যে পর্বতে আরোহণের শিক্ষা দিচ্ছেন একজন শেরপা শিক্ষক

পর্বতে আরোহণ, পর্বত থেকে নামা, তাঁবু খাটিয়ে পর্বতে রাত কাটানো—এই রকম খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা হয়।

॥ মহিলা অভিযাত্রীদের হনুমান টিব্বা আরোহণ ॥

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পাঁচজন অল্পবয়সী মহিলা ১৯,৪৫০ ফুট উপরে অবস্থিত হিমালয়ের হনুমান টিব্যায় ওঠার আয়োজন করেন। তাঁরা তাঁদের সাজসরঞ্জাম মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউসন কুলু (মানালি) থেকে সংগ্রহ করেন।

এঁদের দলনেত্রী হলেন এম. সি. উষা। এঁদের দলে একজন মহিলা ডাক্তার ছিলেন। পাঁচ জন অভিযাত্রী ও একজন ডাক্তার, তাছাড়া কয়েকজন সাহায্যকারী শেরপা ছিল। মহিলা ডাক্তারের নাম তৃপ্তা দত্ত। তিনি দিল্লীর সাফদারজং হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অপর চারজনের নাম শোভা, রানী, সুধা ও ভারতী।

বেয়াকুণ্ড (১২,০৫০ ফুট) পর্যন্ত তাঁরা বিনা বাধায় উঠলেন। বেয়াকুণ্ডে কয়েকদিন থেকে আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে তাঁরা ১লা অক্টোবর ১নং তাঁবুতে (১৫,৩০০ ফুট) বহু কষ্টে উঠলেন। পথ পিছল, নুড়ি পাথরে পা হড়কে যাচ্ছে—ফাঁকে ফাঁকে জমাট বরফ। তাঁদের কাছে এসব সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। ২রা অক্টোবর ২নং তাঁবু, ৩রা অক্টোবর ৩নং তাঁবু আর ৪ঠা অক্টোবর পৌঁছলেন ৪নং তাঁবুতে (১৭,০০০ ফুট)। আর ৪৫০ ফুট উঠলেই তাঁরা হনুমান টিব্যার উপর পৌঁছবেন।

হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাওয়া তুষার-পথ অতিক্রম করে ৫ই অক্টোবর পুরো দলটি বিকেল ৩-৩০ মিনিটে হনুমান টিব্যার উপরে উঠলেন।

ছ'জন মহিলা ও তাঁদের শেরপা পথপ্রদর্শক। বাঁ দিক্ থেকে দ্বিতীয় হচ্ছেন ডাক্তার তৃপ্তা দত্ত।
এঁরা হনুমান টিব্যায় আরোহণ করেন (১৯,৪৫০ ফুট)

মহিলা অভিযাত্রী দলের নেত্রী শ্রীমতী শোভা একটু বিশ্রাম করছেন

॥ সময়ের শুরু নেই শেষও নেই ॥

আগে বলা হয়েছিল যে, সব কিছুরই একটা আরম্ভ বা আদি আছে। কিন্তু সময়ের কোনও আরম্ভ নেই। সময় আগেও ছিল, এখনও আছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে।

তাই, আমরা সময়ের আরম্ভটা খুঁজি না। শুধু কোন্ ঘটনা কত আগে, আর কোন্ ঘটনা কত পরে, তা ঠিক করবার জন্যে সময়কে ভাগ করে নিই। সেই ভাগগুলোর মোটামুটি নাম হচ্ছে বছর, মাস আর দিন। প্রায় সব দেশেরই সময়ের হিসেবের মধ্যে বছর, মাস আর দিন আছে। এই 'দিন' মানে 'দিন ও রাত'।

দিনের চাইতে ছোট ভাগ ধরবার বেলায় কিন্তু হিন্দুদের সঙ্গে অন্য দেশের হিসেবে তফাত আছে। হিন্দুদের হিসেবে—

৬০ অনুপলে — ১ বিপল।
৬০ বিপলে — ১ পল।
৬০ পলে — ১ দণ্ড।
৬০ দণ্ডে — ১ দিন।

কিন্তু বিলিতি হিসেবে—

৬০ সেকেণ্ডে — ১ মিনিট।
৬০ মিনিটে — ১ ঘণ্টা।
২৪ ঘণ্টায় — ১ দিন।

দিনের মাপটা কিন্তু সব দেশের হিসেবেই এক। কেননা, সকলেই ধরে নেয় যে পৃথিবীর একবার নিজেকে পাক খেতে যত সময় লাগে, সেই সময়টাই হচ্ছে এক দিন। এটার একটা বাঁধাধরা মাপ আছে।

লাট্টুর পাকের মতো এক পাক ঘুরতে পৃথিবীর লাগে ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪১ সেকেণ্ড। একে বলে 'সৌর' দিন, অর্থাৎ সূর্যের দিন। মোটামুটি ভাবে আমরা বলি ২৪ ঘণ্টায় এক দিন হয়, কিন্তু তাতে প্রায় সাড়ে তিন মিনিট হিসেবের বাইরে থাকে।

॥ কখন দিন আরম্ভ হয় ॥

দিন কখন আরম্ভ হয়? আমরা ভাবি ভোর হলেই নতুন দিন আরম্ভ হয়। তিন চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনিয়ার পণ্ডিতরাও তাই মানতেন। কিন্তু ইহুদী আর গ্রীকরা দিনের আরম্ভ ধরত

সূর্যাস্ত থেকে, অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে। আবার রোমানরা গেল এরও একটু উপরে। তারা ধরে নিল যে মাঝরাত্রি থেকে দিন শুরু হয়। সেটাই এখন সমস্ত সভ্য দেশ মেনে নিয়েছে, কেননা ইংরেজরা রোমান পঞ্জিকা মেনে চলে, আর ইংরেজী পঞ্জিকাই চলে বেশির ভাগ দেশে। সেই নিয়মে আমাদের দেশেও রেলের টাইম-টেবলে রাত বারোটাকে লেখে শূন্য দিয়ে— ০·১৫ মানে রাত বারোটা বেজে পনের মিনিট। তারপর ১৩ ঘণ্টা কাটলে আমাদের হিসেবে হবে দুপুর ১·১৫, কিন্তু টাইম-টেবলে লিখবে ১৩·১৫। এইভাবে ২০, ২১, ২২, ২৩ হয়ে রাত বারোটা হল ২৪ অথবা ০ (শূন্য)।

॥ দিনের দুটো ভাগ ॥

দিনের দুটো ভাগ। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হল 'দিবা' (দিন); আর সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত হল 'রাত্রি' বা 'রাত'। দিন আর রাত কিন্তু সারা বছর সমান থাকে না। শুধু ২১-২২শে মার্চ আর ২১-২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে দিন আর রাত সমান সমান হয়।

২৩শে ডিসেম্বরের পর, দিন আবার বড় হতে থাকে, তাই তখন 'বড়দিন' আসে। ঐ সময়ে খ্রীষ্টানদের ক্রিস্‌মাস উৎসব হয়, তাকে আমরা বলি 'বড়দিনের উৎসব'।

॥ তিথি ঃ কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ ॥

হিন্দুরা আরও একরকম দিন মানেন, তাকে বলে তিথি। আগে 'সৌর' (সূর্যের) দিনের কথা বলেছি, আর এ হল 'চান্দ্র' (চাঁদের) দিন। চাঁদের কলা থেকে এর হিসেব। চাঁদ যখন একেবারে দেখা যায় না, তখন হয় অমাবস্যা তিথি। আর চাঁদের সবটা আলোয় ভরে উঠলে তখন হয় পূর্ণিমা তিথি। পনেরোটা তিথি ধরে চাঁদের আলো আস্তে আস্তে বেড়ে অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা হয়, তাকে বলে শুক্লপক্ষ। তারপর আবার পনেরো তিথি ধরে আলো কমে শেষ দিন অমাবস্যা হয়ে যায়, তার নাম কৃষ্ণপক্ষ। এই দুই পক্ষ মিলে হয় এক চান্দ্রমাস।

॥ সাত বার ॥

তিথিরও যেমন, দিনেরও তেমনি নাম আছে। পনেরোটা ভিন্ন ভিন্ন নামের তিথি নিয়ে হয় এক পক্ষ। আর, সাতটা ভিন্ন ভিন্ন নামের দিন বা 'বার' নিয়ে হয় এক সপ্তাহ। সাত বারের নামের মধ্যে দুটি (রবি, সোম) হল সূর্য আর চাঁদের নামে, বাকী পাঁচটির নাম রাখা হয়েছে পাঁচটি গ্রহের নামে।

॥ চান্দ্র ও সৌর মাস ॥

দুই পক্ষে এক চান্দ্র মাস হয়। আমরা সব সময় যে মাসের কথা বলি, এ কিন্তু সে মাস নয়। এ সব মাসের আলাদা নাম আমাদের মধ্যে চলতি নেই— এদের বলে চান্দ্র মাস। চান্দ্র মাস প্রত্যেকটা আরম্ভ

সূর্যের নামে Sunday

চাঁদের নামে Monday

আকাশের দেবতা Tiw-এর নামে Tuesday

যুদ্ধের দেবতা Woden-এর নামে Wednesday

আলো ও হাওয়ার দেবতা Thor-এর নামে Thursday

রোমানদের সৌন্দর্যের দেবী Frig-এর নামে Friday

জলের শক্তির দেবতা Sæter-এর নামে Saturday

আর শেষ হয় অমাবস্যা তিথিতে। তাতে শুক্ল আর কৃষ্ণপক্ষ নিয়ে মোট ত্রিশটা তিথি থাকে। দিন হিসেবে চান্দ্র মাস হয় ২৭ দিনের একটু বেশী।

মুসলমানদের সময়ের হিসেব এই চান্দ্র মাস ধরে হয়। তাদের বারো মাসের নাম হচ্ছেঃ মহরম, শফর, রবীঅল্‌আউঅল, রবীঅস্‌সানি, জমাদিঅল্‌-আউঅল, জমাদিঅস্‌সানি, রজব, শাবান, রমজান, শওআল, জেল্‌কদ্‌ ও জেল্‌হজ্জ্‌।

হিন্দুদের কাজকর্ম সৌর দিন দিয়ে। সেই মাস আবার বাঁধাধরা কয়েকটা দিন নিয়ে নয়, তার হিসেব আলাদা।

পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয় যেন সূর্য বছরের এক একটা সময়ে আকাশে এক এক ঝাঁক তারার মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে। গোল করে সাজানো এই রকম বারোটা ঝাঁকের মধ্য দিয়ে গিয়ে সূর্য ঠিক একবছর বাদে আবার প্রথম ঝাঁকটার মাথায় চলে আসে। এগুলোকে বলা হয় 'রাশি' (Sign), তার বারোটাকে নিয়ে নাম হল 'রাশিচক্র' (Zodiac). এই রাশিদের এক একটাকে পার হতে সূর্যের যত সময় লাগে বলে মনে হয়, সেই সময়কে আমরা এক এক মাস ধরি। সব রাশি পার হতে সময় সমান লাগে না। তাই আমাদের বাংলা মাসগুলো সব এক মাপের নয়—কেউ ৩০, কেউ ৩১, আবার কেউ বা ৩২ দিনেও হয়। এক রাশি ছেড়ে আর এক রাশিতে সূর্যের চলে আসাকে বলে 'সংক্রান্তি', এর মানে পার হওয়া। বাংলা মাসের শেষ দিনেই সংক্রান্তি হয়।

॥ মাসের নাম ॥

বাংলা মাসগুলোর নাম হয়েছে এক একটা নক্ষত্রের নামে। যেমন—বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, পূর্বাষাঢ়া, শ্রবণা, পূর্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, পূর্বফল্গুনী আর চিত্রা নক্ষত্রের নামে বাংলা বারো মাসের নাম হয়েছে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন আর চৈত্র।

মার্গশীর্ষ মাসকে অগ্রহায়ণ বলে এই জন্যে যে, এক সময় ঐ মাসটা থেকে বছরের আরম্ভ ধরা হতো। তাই তখন ওর নাম বদলে করা হয় 'অগ্রহায়ণ' (অগ্র মানে আগা, আর হায়ন মানে বছর)।

এই নক্ষত্র বা তারাগুলির সঙ্গে মাসগুলির একটা সম্পর্ক আছে। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায়, চাঁদ অস্ত যাবার সময় বিশাখা নক্ষত্রকে তার কাছে দেখা যায়, চৈত্র পূর্ণিমায় চিত্রা নক্ষত্রকে—এইরকম। তাই দিয়ে সে মাসের নাম।

॥ রাজরাজড়াদের খেয়াল ॥

জুলাই আর আগস্ট মাস আগে ছিল ৩০ দিনে। তখন এদের নাম ছিল কুইন্টিলিস্‌ আর সেক্‌স্‌টিলিস্‌ (মানে পঞ্চম আর ষষ্ঠ—কেননা তখন ওদের মার্চ মাস ছিল বছরের প্রথম মাস)। তারপর যখন জুলিয়াস সীজার রোম সাম্রাজ্যের কর্তা হলেন, তখন তিনি তাঁর জন্মমাস কুইন্টিলিসের নাম নিজের নামে বদলে দিলেন—কুইন্টিলিসের জুলিয়াস নাম হল।

অগাস্টাস সীজার

শুধু তাতেই হল না, তার গৌরব বাড়াবার জন্যে তাকে ৩১ দিনের মাস করা হল। কিন্তু বারো মাসে তো ৩৬৫ দিনের বেশী হলে চলবে না, তাই বছরের শেষ মাস ফেব্রুয়ারী মাসের ৩০ দিন থেকে সেই একটি দিন কমিয়ে তাকে করা হল ২৯ দিনের মাস। তারপর যখন অগাস্টাস সীজার রোমের সম্রাট্ হলেন, তিনি তাঁর জন্মমাস সেক্সটিলিসের নাম দিলেন অগাস্টাস, তারও দিন বাড়িয়ে করলেন ৩১। তাই আবার ফেব্রুয়ারীর আরও একটি দিন কাটা গেল। সেই থেকে সে হয়ে গেল ২৮ দিনের মাস। জুলিয়াস আর অগাস্টাস নাম দুটোই ক্রমে জুলাই আর আগস্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরে জানুয়ারী মাসকে প্রথম মাস বলে ধরা হতে থাকে।

॥ ইংরেজী মাসের নাম ॥

জুলাই আর অগাস্ট মাসের নামের ইতিহাস তো জানা গেল, এবার আর সকলের কথা। দুদিকে মুখ-ওয়ালা এক রোমান দেবতা জানুয়ারিআস্, তাঁর নামে জানুয়ারীর নাম। ফেব্রুয়ারী মানে পবিত্র, এ মাসটা রোমানরা পবিত্র বলে মনে করত। মার্চ, এপ্রিল, মে আর জুন মাসের নাম এসেছে রোমান দেবদেবী মার্স, এপ্রিলিস, মায়া আর জুনো-র নাম থেকে। সেপ্টেম্বর, অকটোবর, নভেম্বর আর ডিসেম্বর খুব সোজা নাম, এদের মানে হচ্ছে সপ্তম, অষ্টম, নবম আর দশম। প্রথমে যখন মার্চ মাসে বছর শুরু হত, তখন এরা তো তাই ছিল। এখনও সেই পুরানো নামগুলিই থেকে গিয়েছে।

॥ বছরও দু'রকমের ॥

দিন আর মাসের মতো বছরও দু'রকমের হয়—সৌর আর চান্দ্র। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে যতটা সময় লাগে, তাকে বলে সৌর (মানে, সূর্যের) বছর। ঠিক ঠিক বলতে গেলে এক সৌর বছর হয় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড। আমরা মোটামুটি ধরি ৩৬৫ দিনে বছর। কিন্তু তাতে প্রত্যেক বছর প্রায় ছ'ঘণ্টা করে কম ধরা হয়ে যায়। চার বছরে তাহলে কম পড়ে যায় প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা বা এক দিন। সেই একটি দিনকে প্রতি চার বছরে একবার বছরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। সেই বছরে ফেব্রুয়ারী মাসকে করা হয় ২৯ দিনের মাস, আর বছরটা হয়ে যায় ৩৬৬ দিনের। এ বছরটাকে বলে লীপ-ইয়ার (Leap Year).

এইভাবে চার বছরে একবার ভুল শোধরানো হয়। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। চার বছরে ভুল হয়েছে এক দিনের একটু কম, কিন্তু যোগ করা হচ্ছে পুরো একটি দিন। তাতে আবার একটু বেশী ধরা হয়ে গেল তো! তাই, প্রতি চারশো বছরে তিনবার লীপ-ইয়ারে ১ দিন আর বাড়ানো হয় না, তাতে এই ভুলটার অনেকটা সংশোধন হয়ে যায়।

চান্দ্র বছর হয় বারোটা চান্দ্র মাসে। চান্দ্র মাস তো প্রায় ২৭ দিনে হয়, তাই চান্দ্র বছরে থাকে ৩৫৩ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিমিট ৩৪ সেকেণ্ড। সৌর বছরের চাইতে এটা প্রায় ১১ দিন ছোট। মুসলমানদের বছর হচ্ছে চান্দ্র বছর। হিন্দুদের আর ইওরোপীয়দের বছর হচ্ছে সৌর বছর।

॥ অব্দ ॥

কোন্ ঘটনা কবে হয়েছে, তা বোঝাবার জন্যে বলা হয় এটা অমুক বিশেষ ঘটনার এত বছর আগে কিংবা এত বছর বাদে ঘটেছিল। এক এক দল এক একটা বিশেষ ঘটনা থেকে হিসেব করে। এই হিসেবকে বলে অব্দ। অব্দ মানে বৎসরও হয়।

যেমন, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম থেকে গোনা অব্দ হচ্ছে চৈতন্যাব্দ, রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে গোনা অব্দের নাম রবীন্দ্রাব্দ। কিন্তু সবচেয়ে বেশী চলে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম থেকে গোনা অব্দ—খ্রীষ্টের অব্দ বা খ্রীষ্টাব্দ। যীশু খ্রীষ্টের ৫৬৩ বছর আগে বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন। তাই বলা হয় যে, তিনি জন্মেছিলেন ৫৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সংক্ষেপে ৫৬৩ খ্রীঃ পূঃ।

একটা মজার ভুল ধরা পড়েছে। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম-বছর বলে যে বছরকে ১ খ্রীষ্টাব্দ ধরা হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে যে তিনি আসলে তার ৪ বছর

আগে (৪ খ্রীঃ পূঃ) জন্মেছিলেন। কিন্তু এ ভুল শোধরাবার এখন আর উপায় নেই।

মুসলমানেরা মানেন হিজরী অব্দ। হিজরী মানে পলায়ন। মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। ঐ বছর থেকে হিজরী অব্দ ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু হিজরী অব্দের বছরগুলো ৩৫৪ দিনের চান্দ্র বছর, আর খ্রীষ্টাব্দের বছরগুলো ৩৬৫ দিনের সৌর বছর বলে, হিজরী আর খ্রীষ্টাব্দের তফাত ক্রমেই ৬২২ বছরের চেয়ে কমে আসছে। প্রতি বছরে ১১ দিন করে তফাত হচ্ছে, ৩৩ বছরে একটি পুরো বছর তফাত হয়ে যায়।

ভারতবর্ষে শকাব্দ ধরা হয় ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, আর সংবৎ অব্দ ৫৬ খ্রীঃ পূঃ থেকে। যে বছর যে খ্রীষ্টাব্দ, সে বছর কত শকাব্দ বার করতে হলে তার থেকে ৭৮ বছর বাদ দিতে হয়। আর সংবৎ-এর বেলায় তাতে ৫৫ বছর যোগ করতে হয়। এর আর কোন হেরফের নেই। ভারত গভর্নমেণ্ট এখন শকাব্দ চালাবার চেষ্টা করছেন। সংবৎ অব্দটা চলে প্রায় সারা উত্তর ভারতে।

আরও একটা বছরের হিসেব আছে বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ। সেটার সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দের তফাত মাস বুঝে ৫৯৩ বা ৫৯৪ হয়। ১লা বৈশাখ থেকে ১৬ই পৌষ পর্যন্ত সনটার সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে সেই বছর কত খ্রীষ্টাব্দ তা পাওয়া যাবে। আর ১৭ই পৌষ থেকে ৩১শে চৈত্র পর্যন্ত যোগ করতে হবে ৫৯৪।

॥ আগেকার দিনে সময় মাপা ॥

মানুষ যখন ঘড়ি তৈরি করতে শেখে নি, তখন ছিল সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি, বালি-ঘড়ি ইত্যাদি। দিনের বেলা সূর্য সরে সরে যায়, তার সঙ্গে জিনিসের ছায়াও সরে সরে যায়। সেই ছায়াটা কোথায় পড়েছে, তা দেখে বোঝা যায় যে বেলা কতটা হল। একে বলে সূর্যঘড়ি। তবে এতে তো রাত্রিতে কিংবা মেঘলা দিনে কাজ চলে না! তাই হলো বালি-ঘড়ি আর জলঘড়ি। একটা ফুটো পাত্রে জল বা বালি রাখলে তা যতক্ষণে পড়ে যায়, তা দেখে সময় ঠিক করা হত। রাজা আলফ্রেড কতকগুলো বাতি এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যেগুলো পুড়তে কত সময় লাগে তা তাঁর জানা ছিল। সেগুলো জ্বালিয়ে তাদের পোড়া দেখে তিনি সময়ের হিসেব করতেন।

বালি-ঘড়ি

॥ ঘড়ি আবিষ্কার ॥

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্‌জ্‌ (Christian Hygens) সব প্রথম নিয়ন্ত্রিত ঘড়ি তৈরি করেন। এ ঘড়ি দম দিলে আপনা-আপনিই চলতে পারত।

এই ঘড়ির ভিতরে একটা স্প্রিং-এর প্যাঁচ থাকে; তারই সাহায্যে ঘড়ি চলে। প্যাঁচ সবটা খুলে গেলে আবার প্যাঁচ কষে দিতে হয়—তাকে বলে দম দেওয়া।

বড় বড় ঘড়িতে একটা জিনিস দোলে, তাকে বলে দোলক (পেণ্ডুলাম—pendulum). পেণ্ডুলামের মজা এই যে সেটা অনেকটাই দুলুক আর একটুখানিই দুলুক, একবার দুলতে তার একই সময় লাগবে। শুধু লম্বায় কমালে বা বাড়ালেই তার দোলনের সময়টা বেড়ে বা কমে যায়। এটা লক্ষ করেছিলেন ইটালীর বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও।

কি করে ভার ও স্প্রিংয়ের সাহায্যে ঘড়ি চালানো যায় এবং কাঁটার দ্বারা কি করে সময় নির্দেশ করা যায়, আর্কিমিডিস তা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু দোলক (পেণ্ডুলাম)-এর সাহায্যে কি করে সময় বিভাগ করা যায় তা নাকি আবিষ্কার করেন স্পেনদেশের করডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র (১০০০ খ্রীষ্টাব্দে।

॥ সময়ের হেরফের ॥

ভাল ঘড়িতে যে সময় দেখা যায়, তা কি সব জায়গায় এক হয়? কলকাতায় যখন দুপুর ১২টা,

তখন কি লণ্ডনের ঘড়িতেও বেলা ১২টাই দেখা যাবে? না, তা নয়। কারণ, পৃথিবীর প্রত্যেক জায়গাতেই সূর্য ঠিক মাথার উপর এলে ঠিক সেই সময়টাকে সেখানকার দুপুর বারোটা ধরে হিসেব করা হয়। শুধু সেই জায়গাটাই নয়,—সেই জায়গাটার মত এক দ্রাঘিমায় (longitude) অবস্থিত সব জায়গাতেই তা হবে। সূর্য একই সময়ে সব জায়গার মাথার উপর থাকে না, পুব থেকে পশ্চিমে, সেখান থেকে আরও পশ্চিমে যেতে যেতে ক্রমে ক্রমে এক এক জায়গার মাথায় আসে, তখন সে সব জায়গায় একের পর এক বারোটা বাজবার সময় হয়। কাজেই, কলকাতায় যখন ১২টা, তখন তার পশ্চিমের জায়গায় ১২টা বাজতে দেরি আছে, অথচ তার পুবের দেশগুলোতে তখন বেলা ১২টা পার হয়ে গিয়েছে। তখন পুবে টোকিওতে বেলা সাড়ে তিনটে, রেঙ্গুনে বেলা ১টা। অথচ, পশ্চিমে মস্কোতে তখন সকাল সাড়ে ন'টা, আর আরও পশ্চিমে লণ্ডনে তখন ভোরও হয় নি, সাড়ে ছ'টা বেজেছে।

কয়েকটি প্রাচীন ও আধুনিক ঘড়ি

ম্যাপে দেখা যায় যে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত অনেকগুলো লম্বা লম্বা লাইন পৃথিবীর ম্যাপের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এগুলোকে বলে দ্রাঘিমা (longitude), এদের সংখ্যা মোট ৩৬০টা। ইংলণ্ডের গ্রীনিচ শহর (Greenwich) যে দ্রাঘিমার ওপরে, তাকেই পৃথিবীর মাঝের ০° দ্রাঘিমা ধরে তা থেকে পুব আর পশ্চিম দ্রাঘিমার গণনা করা হয়। তাতে একটা মজা হয়েছে এই যে, ম্যাপে যেটা ১৮০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা, সেটাই অন্য দিক্ থেকে ১৮০ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমা। তাহলেই এই হয় যে ওখানকার সময় এক হিসেবে গ্রীনিচের ১২ ঘণ্টা আগে অন্য হিসেবে ১২ ঘণ্টা পরে। সেই দ্রাঘিমাকে বলে International Date Line.
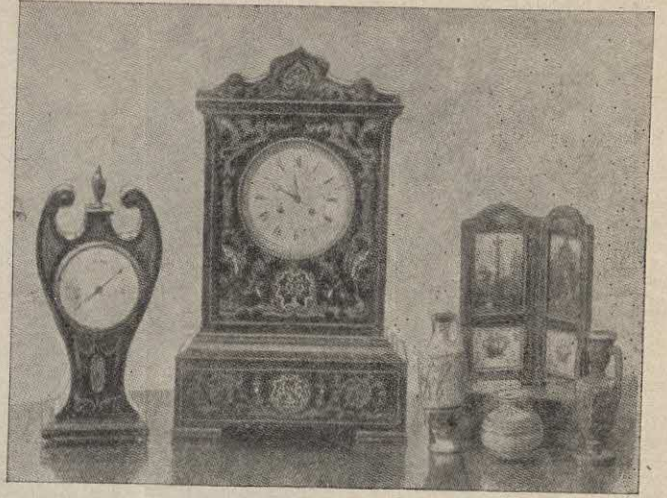
প্রাচীনকালের নানারকম ঘড়ি

॥ একালের ঘড়ি ॥

আজকাল বিদ্যুতের তরঙ্গের সাহায্যে ঘরে বসানো আলাদা আলাদা ঘড়িকে এক সঙ্গে চালানো হয়। একটা দোলক (pendulum) দুলে সবকটা ঘড়িকে একই সময়ে চালাতে পারে।
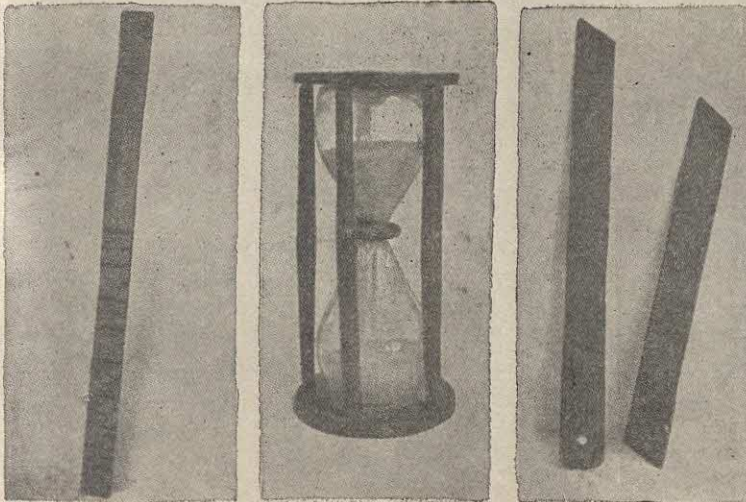
সূর্য-ঘড়ি বাতি-ঘড়ি দড়ি-ঘড়ি

প্রাচীনকালে সময় মাপবার কয়েকটি কৌশল

বর্তমানে যে সব ঘড়ি চলছে তারা নানা রকমের। কতকগুলো ঘড়িতে একবার দম দিলে বছরের পর বছর চলে। এমন ঘড়িও আছে যাতে একবার দম দিলে এক নাগাড়ে আট দিন চলে। সাধারণ ঘড়িতে প্রত্যেক দিন দম দিতে হয়। সব ঘড়িই এক নিয়মে চলে। ঘড়ির মধ্যে ছোট বড় অনেক চাকা আছে। এদের একটার সঙ্গে অন্যগুলো এমন ভাবে বসানো যে একটা অপরটাকে চালায়। ওদের দাঁতে দাঁতে সেট্ করা থাকে। একটা চাকা ষাট সেকেণ্ডে একবার ঘোরে, আরেকটা চাকা ষাট মিনিটে একবার ঘোরে। তার ফলে সেই চাকার সঙ্গে লাগানো কাঁটা ঘড়ির উপরকার ডালার উপরে আঁকা সেকেণ্ড ও মিনিটের ঘর পার হয়। স্প্রিং, দোলক (পেণ্ডুলাম) ও নিয়ন্ত্রক যন্ত্র থাকায় ঘড়ির কাজে ভুল হলে তা শুধরে দেওয়া যায়।
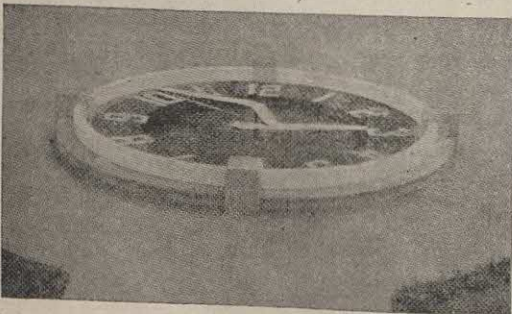
কতকগুলো ঘড়ির এমন ব্যবস্থা থাকে যে ঘণ্টার কাঁটা নির্দিষ্ট ঘরে পৌছলে ঘড়ি বেজে ওঠে। অন্ধকারে ঘড়ির ডালা চোখে দেখা যায় না বলে কোন কোন ঘড়ির কাঁটায় আর অক্ষরগুলিতে এমন জিনিস লাগানো থাকে যা অন্ধকারে দেখা যায়। কোন কোন ঘড়িতে

সবচেয়ে বড় ঘড়ি
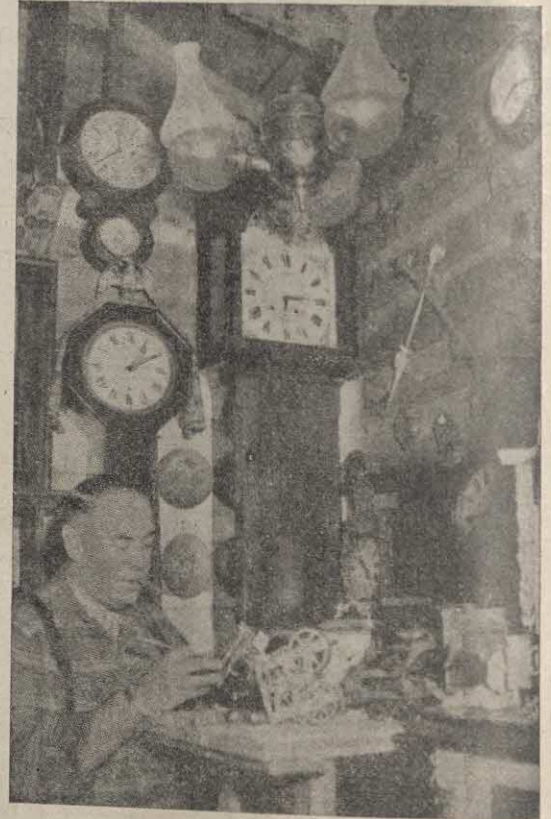
জ্যাক উইলির ঘরে কত ঘড়ি! তিনি একমনে তাঁর ঘরে বসে ঘড়ি পরীক্ষা করছেন

এমন ব্যবস্থা করা থাকে যে বোতাম টিপলে ঘড়ি শব্দ করে জানিয়ে দেয় ক'টা বেজে ক' মিনিট হয়েছে। আবার এলার্ম ঘড়িতে ঘড়ির কাঁটা যেই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আসে, অমনি ঘড়ি বেজে উঠে জানিয়ে দেয় যে নির্দিষ্ট সময় এসে গেছে।

॥ বিগ্ বেন ॥

লণ্ডনে ওয়েস্টমিন্স্টারের বিগ বেন (Big Ben) ঘড়িটার ঘণ্টাটা প্রথম থেকেই ফাটা। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই ঘণ্টা বেজে চলেছে। এই ঘণ্টা তৈরি করতে ও বসাতে ২২ হাজার পাউণ্ড খরচ পড়েছিল।

ওয়েস্টমিন্স্টারের ঘড়ির উঁচু ঘরটায় ঘড়ির কাছে যেতে হলে ৩৬০ ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হয়। উঁচু ঘরটার চারদিকে চারটে ডালা আছে। এই

২০০ বছরের পুরনো কারুকার্য-করা ঘড়ি

মিনার্ভার ব্রোঞ্জের মূর্তি। ঢালটা ঘড়ির ডালা। ঘড়ি সমানে চলছে
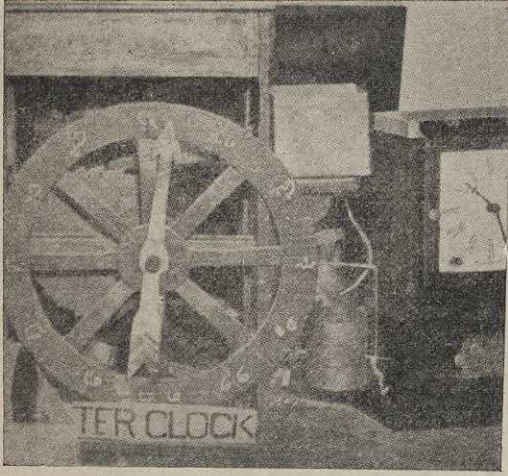
সেকেলে জলঘড়ি

ডালাগুলো ২৩ ফুট চওড়া—মিনিটের কাঁটাটা ১৪ ফুট লম্বা। দোলকটির ওজন ৪৫০ পাউণ্ড। ঘণ্টার অঙ্কগুলো ২ ফুট লম্বা—এক মিনিটের স্থান ১ ঘন ফুট। মিনিটের কাঁটা এক সঙ্গে ১২ ইঞ্চি স্থান অতিক্রম করে।

ইংলণ্ডেরই লিভারপুলে একটা ঘড়ি আছে। তার ডালা ২৫ ফুট। নিউইয়র্কে কলগেট কোম্পানির ঘড়ি ৩৯ ফুট চওড়া।

দক্ষিণ আফ্রিকার র‍্যাণ্ড এয়ার পোর্টে একটি ভূমির সহিত সমান্তরাল ঘড়ি আছে। এর ডালাটা ত্রিশ ফুট।

॥ জ্যাক উইলির ঘড়ি সংগ্রহ ॥

ক্যালিফোর্নিয়ার জ্যাক উইলির সবসুদ্ধ ৪০০ ঘড়ি ছিল।

তাঁর সংগ্রহ-করা সবচেয়ে বড় ঘড়িটার দোলক তিন তলার সমান। এ ছাড়া একটা ক্যালেণ্ডার ঘড়ি ছিল, সেটা মাস তারিখ ও সময় নির্দেশ করত। এই ঘড়িতে লিপ ইয়ারের হিসেবও বাদ যেত না।

ছবিতে দেখ, একটি ঘড়ি সুন্দর কারুকার্য-করা বাক্সের মধ্যে বসানো! বাক্সটা কচ্ছপের খোল দিয়ে তৈরী। এটার বয়স প্রায় ২০০ বছর।
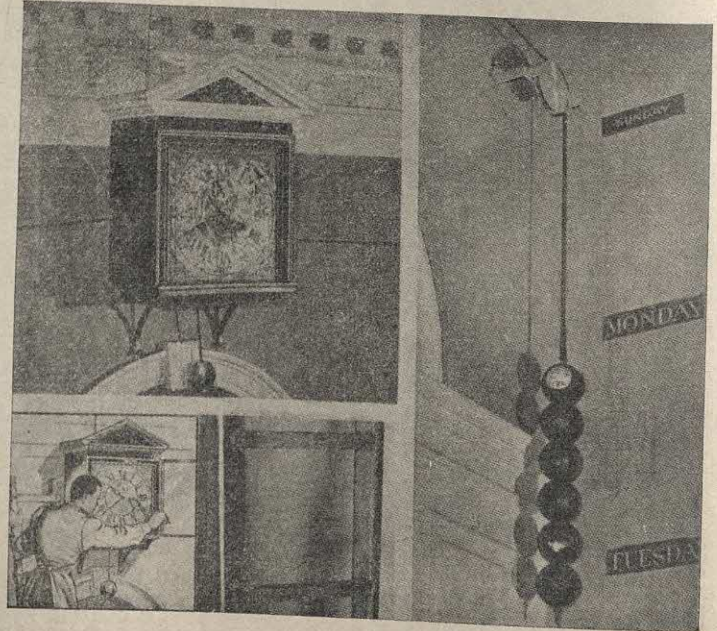
পূর্ব পৃষ্ঠায় ব্রোঞ্জের স্ট্যাচুটা রোমান দেবী মিনার্ভার। তাঁর হাতে যে ঢাল সেটা আসলে একটা ঘড়ি। এ ঘড়ি ঠিকমতো সময় জানায়।

জ্যাক উইলির বাড়িতে ৫৪৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের একটা রোমান জলঘড়ি (clepsydra) আছে। এর থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়ে ১২ মিনিটে একটা পাত্র ভরিয়ে দেয়। আর ঘড়িতে ১২ মিনিট পার হওয়ার সংকেত দেখা যায়।

॥ প্রেসিডেণ্ট জেফারসনের ঘড়ি ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট টমাস জেফারসন (১৭৪৩—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ) নূতনত্বের খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সুইজারল্যাণ্ডের একজন মিস্ত্রী দিয়ে একটা বিরাট অদ্ভুত ঘড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। ভুপ্রস্থ কামানের গোলার সাহায্যে এই ঘড়ি চলতো। সেই গোলাগুলো ধীরে ধীরে নেমে এসে দিনের সংকেত জানাতো। বারের নাম লেখা দেয়ালের ঠিক জায়গায় কামানের ঝোলানো গোলাগুলো পৌঁছলে বোঝা যেত সেদিন কি বার। সপ্তাহে একদিন একটা হাতলের সাহায্যে কাঠিম ঘুরিয়ে দম দেওয়া হত।

জেফারসনের অদ্ভুত ঘড়ি

॥ ছায়াকে চিরস্থায়ী করা ॥

"আজগুবী নয়, আজগুবী নয়, সত্যিকারের কথা,
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হ'ল ব্যথা।"

হাসির রাজা সুকুমার রায়ের এই লেখাটাকে যতটা আজগুবী বলে মনে হয় ব্যাপারটা আসলে কিন্তু ততটা আজগুবী নয়।

মানুষ বহুকাল ছায়ার সঙ্গে লড়াই করছে। প্রথমে তো সে ছায়াকে নিয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছে। নদী বা পুকুরের জলে মানুষ নিজের ছায়া দেখে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকত। আবার দেখতে হলে তাকে ছুটে আসতে হত সেই জলের ধারে। তারপরে ধাতুর চকচকে পাতে সে মুখের ছায়া দেখতে শিখল। তারও বহু পরে কাচ আবিষ্কার হতে যখন কাচের পিঠে পারা দিয়ে আয়না তৈরী হল তখন তার যখন-তখন মুখ দেখার সুব্যবস্থা হল। তখন সে ভাবতে লাগল কি করে ছায়া ধরে রাখা যায়।

মানুষ শুধু শুধুই ভাবে না, ভাবতে ভাবতে একটা পথ বার করে। নানা দেশের মানুষ ভাবতে লাগল মুখের ছায়া যেমন আয়নায় ধরা পড়ে তেমনি করে ছায়াকে চিরস্থায়ী করা যায় কিনা।

॥ ওয়েজউডের পরীক্ষা ॥

অনেক বছর কেটে গেল। শেষে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ওয়েজউড (Wedgwood) দেখলেন যে কাগজে কিংবা চামড়ায় মাখানো সিলভার নাইট্রেট্ বলে একটা জিনিস আলো লাগলে অন্য রকম হয়ে যায়।

॥ নীপ্‌সে ও দাগের ॥

তারপর ফ্রান্সে নীপ্‌সে (Nicephore Niepce), তাঁর ছেলে আর ভাই এবং দাগের (Louis Daguerre—১৭৮৯-১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ) নামে একজন চিত্রকরও আলাদা আলাদা ভাবে ওই বিষয়ে গবেষণা চালাতে লাগলেন। দাগের এসে যোগ দিলেন নীপ্‌সের সঙ্গে। সোনায় সোহাগা হল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দাগের আলোর সাহায্যে চমৎকার ছবি তোলবার এক উপায় বের করলেন। তা নিয়ে হইচই পড়ে গেল। ফরাসী সরকার দাগেরকে মাসিক ৫০০ ফ্রাঁ করে পেনশন মঞ্জুর করলেন। নীপ্‌সে তাঁর প্রথার নাম দিয়েছিলেন হেলিওগ্রাফি অর্থাৎ সূর্যের লেখা। দাগের-এর প্রথার নাম হল দাগেরোটাইপ (Daguerrotype).

দাগের আর নীপ্‌সের চেষ্টায় আলোর সাহায্যে ছবি তোলার উপায় বের হল

॥ দাগেরের আবিষ্কার ॥

নীপ্‌সে আবিষ্কার করেছিলেন যে বিটুমেন নামে একটা কালো চটচটে পদার্থ আলো পেলে আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যায়। তিনি বিটুমেনের উপর ছবি তুলতে পেরেছিলেন। তারপর দাগের বের করলেন যে রুপোর পাতে আয়োডিনের বাষ্প লাগিয়ে নিলে তার উপর ভালভাবেই আলোর দাগ পড়ে।

কিন্তু মুশকিল এই যে, সে দাগ বা ছবি প্রথমে অদৃশ্য থাকে। তাকে অন্য মসলা দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয়। ইংরেজীতে একে বলে 'ডেভেলপ' (develop) করা। দাগের ঐ অদৃশ্য ছবিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে তাতে পারদের বাষ্প লাগাতেন। অন্ধকারে এ কাজটা করতে হত। এলোমেলো আলো লাগলে যেখানে আগে আলোর দাগ পড়ে নি, সেখানেও দাগ পড়ে সব হিজিবিজি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। ছবি বাইরের আলোয় আনাই চলত না।

॥ ডেভেলপ ও 'ফিক্‌স্‌' করা ॥

ছবিতে কাঁচা মসলা যা লেগে থাকে, তাতে আলো লাগলে তো তাতেও দাগ পড়ে যাবে। তাই, অন্ধকারেই তাকে ধুয়ে ফেলে দিতে হয়। দাগের একটা মসলা বের করে ফেললেন। ডেভেলপ করবার পরই সেই মসলা-গোলা জল দিয়ে অন্ধকারেই প্লেটের কাঁচা সিলভার আয়োডাইড ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া হতে লাগল। যে ছবি রইল তা পাকা হয়ে গেল। তাই এরকম ধুয়ে নেওয়াকে বলা যেতে পারে 'পাকা করা'। ইংরেজীতে বলা হয় 'ফিক্‌স্‌' করা। দাগের এই কাজের জন্যে নুন-জল, পটাসিয়াম সায়ানাইড ইত্যাদি ব্যবহার করেছিলেন।

॥ ফক্‌স্‌ ট্যালবট ॥

তারপর এলেন ইংল্যাণ্ডের ফক্‌স্‌ ট্যালবট (Fox Talbot—১৮০০-১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)। দাগেরের মতো রুপোর পাতে আয়োডিন না দিয়ে তিনি রুপো দিয়ে তৈরী মসলাই ব্যবহার করতে থাকেন। কেননা, আগে থেকেই জানা ছিল যে আলো শুধু কয়েক রকম রুপোর মসলার উপরেই দাগ কাটতে পারে। তাই তিনি কাগজের উপর সিলভার ক্লোরাইড মাখিয়ে নিয়ে তার উপর ছবি তুলতেন। আগেই বলা হয়েছে যে এ ছবি হত আসল জিনিসের বিপরীত। অর্থাৎ, সাদা জায়গা কালো আর কালো জায়গা সাদা। এর থেকে ছেপে নিয়ে তিনি ঠিক-ঠিক ছবি তৈরি করতে পেরেছিলেন। উলটো জিনিসকে উপুড় করে চেপে ধরলে তার যে ছাপটা পড়ে সেটা সোজা হয়। ছাপাখানার অক্ষরগুলো সবই উলটো থাকে, তাদের উপর কালি মাখিয়ে কাগজ চেপে বই ছাপা হয়। বইয়ের অক্ষর সোজা হয়ে ছাপা হয়।

নিজের পদ্ধতিতে তোলা ছবিকে ফক্‌স্‌ ট্যালবট নাম দিয়েছিলেন ক্যালোটাইপ (Calotype). ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী হার্শেল এভাবে প্রথমে যে

উলটো ছবি ওঠে, তার নাম দিয়েছিলেন 'নেগেটিভ', আর এভাবে তোলা ছবির নাম দিলেন 'ফটোগ্রাফ'। সেই দুই নামই আজও চলছে।

॥ ফটোগ্রাফি মানে কি ॥

'ফটোস্' মানে আলো, আর 'গ্রাফি' মানে লেখা। কাজেই, কথাটার মানে হল 'আলো দিয়ে লেখা'। শুধু সূর্যের আলো দিয়ে নয়, অন্য আলো দিয়েও এ কাজ হতে পারে বলে হেলিওগ্রাফির চাইতে এই নামটাই বেশী ঠিক। তবে, শুধু তো লেখা নয়—এ তো ছবি লেখা কিনা, তাই বাংলায় একে বলা হয় আলোকচিত্র। আমরা সাধারণতঃ বাংলা শব্দটা ব্যবহার করি না, আলো দিয়ে আঁকা ছবিকে ফটোগ্রাফই বলি। সংক্ষেপে 'ফটো'ও বলি।

॥ স্কট আর্চার ॥

ফক্স্ ট্যালবটের পরেই একজন ইংরেজ ভাস্কর স্কট আর্চার ফটোগ্রাফির অনেকটা উন্নতি সাধন করলেন (১৮৫৬ খ্রীঃ)। কিন্তু তাঁর পদ্ধতিতে ফটো তোলাটা একটা জবড়জঙ্গ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ফটোগ্রাফাররা একটা আঁধার তাঁবু খাটিয়ে তার মধ্যে বসে কলোডিয়নের সঙ্গে সিলভার ব্রোমাইড মিশিয়ে, কাচের পাতে তা মাখিয়ে নিতেন। তারপর তাকে ক্যামেরায় পুরে বাইরে এসে ছবি তুলেই তাড়াতাড়ি আবার তাঁবুতে ঢুকতেন এবং প্লেটটি বের করে তাকে ডেভেলপ আর ফিক্স্ করবার কাজ শেষ করতেন। কলোডিয়ন ভিজে থাকতে থাকতেই একাজ করতে হত বলে এর নাম 'ভিজে প্লেট' (Wet Plate) পদ্ধতি।

॥ জিলেটিনের ব্যবহার ॥

এই অসুবিধে ঠিক ২০ বছর বাদে দূর করলেন জার্মানীর ম্যাডক্স্। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলোডিয়নের বদলে জিলেটিন ব্রোমাইড ব্যবহার করে দেখলেন যে কলোডিয়নের ঐ দোষটা জিলেটিনের নেই। শুধু তাই নয়, জিলেটিন মেশানো মসলা শুকিয়ে

স্কট আর্চারের পদ্ধতিতে ফটো তোলা

গেলে তাতে বরং আরও ভাল কাজ দেয়। এর নাম হল 'শুকনো প্লেট পদ্ধতি' (Dry Plate Process).

॥ ক্যামেরা ॥

এবার একটা যন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে যে যন্ত্রের সাহায্যে এলোমেলো আলোর রেখাকে বাদ দিয়ে শুধু ফটোগ্রাফারের পছন্দমতো আলোর রেখাগুলিকেই আলোকগ্রাহী প্লেটের উপর এনে ফেলা যায়। এই যন্ত্রটার নাম ক্যামেরা।

ক্যামেরার গড়ন আর চেহারাও অসংখ্য রকমের। তার মধ্যে সবচেয়ে সাদাসিধে হল বক্স্ ক্যামেরা। সত্যিই সেটা একটা চৌকো বাক্সের মতো দেখতে। তার একপিঠে মাঝখানে একটি কাচের চোখের মতো বসানো। ভিতরে আরও নানারকম ব্যাপার আছে।

॥ ক্যামেরা অব্স্কিউরা ॥

একেবারে গোড়ায় এরকম ছায়াছবি দেখবার জন্যে কাপড়ের অন্ধকার ঘর তৈরী হত, তার নাম ক্যামেরা অব্স্কিউরা (camera obscura). ঘরের মাথায় একটু

ফুটো দিয়ে উলটো ছায়া দেয়ালে এসে পড়েছে

ফুটো, তাতে একখানা কাত-করা আয়না, আর ঘরের মাঝখানে একটি ছোট সাদা টেবিল রেখে দেখা গেল যে টেবিলের উপর বাইরের জিনিসের ছবি পড়ছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত! সে ছবিকে ধরে রাখবার ব্যবস্থা তখন আর হল না।

তারপর, চারশো বছরেরও কিছু আগে ইটালীর ব্যাপটিস্টা পোর্টা চৌকো বাক্সের আকারের ক্যামেরা অব্‌স্কিউরা তৈরি করলেন। কালো চৌকো একটা বাক্স, তার সামনের দিকে আলপিনের মুখের মতো সূক্ষ্ম একটা ফুটো, আর পিছনের পিঠের ভিতরদিকে একটা সাদা পর্দা, তাতে কালো পাড় লাগানো। দেখা গেল যে ঐ ফুটো দিয়ে আলো ভিতরে গিয়ে পর্দার উপর দিব্যি বাইরের জিনিসের ছবি ফেলে। কিন্তু, সে ছবিকে ধরে রাখা গেল না, কারণ আলোক-গ্রাহী পদার্থের ব্যবহার তখনও কেউ জানত না।

॥ আলোকগ্রাহী প্লেট ॥

যখন আলোকগ্রাহী প্লেট হল, তখন তা দিয়ে ছবি তোলবার জন্যে যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দিল। সে-যন্ত্র এমন হওয়া চাই যে তা দিয়ে শুধু এক-দিকের আলো ঢুকে প্লেটে পড়বে। ক্যামেরা অব্‌স্কিউরাই তো সেরকমের যন্ত্র। তার ভিতরকার সাদা পর্দা কিংবা কাত-করা কাচের বদলে আলোক-গ্রাহী প্লেট বসিয়ে নিলেই তো হয়! তাই করা হতে লাগল। ক্যামেরা অব্‌স্কিউরা বদলে গিয়ে হয়ে দাঁড়াল ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা। তারপর তার নানাভাবে উন্নতি করা হতে লাগল।

॥ এক্সপোজার ॥

এই সামনে-ফুটোওলা ক্যামেরার কয়েকটা অসুবিধে ছিল। ফুটোটা যত সূক্ষ্ম হয়, ছবির দাগ-গুলো প্লেটে তত স্পষ্ট হয় বটে, কিন্তু ছোট ফুটো দিয়ে আলো কম ঢোকে বলে তাড়াতাড়ি ছবি হয় না —অনেকক্ষণ ধরে ফুটো খুলে রেখে আলো ঢুকতে দিলে তবে ছবি হয়। এই আলোকে যতক্ষণ ঢুকতে দেওয়া হয়, তাকে বলে 'এক্সপোজার' (exposure). নীপ্‌সে যে হেলিওগ্রাফ করতেন, তাতে এক্সপোজার লাগত ছ'ঘণ্টা। সে কি কম অসুবিধে? বুঝতেই পারা যায় যে এতক্ষণ এক্সপোজার দিতে হলে চলন্ত বা নড়ছে এমন কিছুর ফটো তোলা যাবে না। এমন কি, একজন মানুষের ফটো তুলতে হলে তাকে ঠায় একভাবে ছ'ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। তা কি সম্ভব? কিন্তু এই ফটো ক্যামেরার মস্ত গুণ এই যে এতে সামনেরই হোক আর দূরেরই হোক, সব জিনিসের ছবিই সমান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

॥ লেন্‌স্ ॥

ছোট ফুটো দিয়েই বেশী আলো যাতে ঢোকানো যায় তার উপায় বের করা হল। ক্যামেরাতে একটা
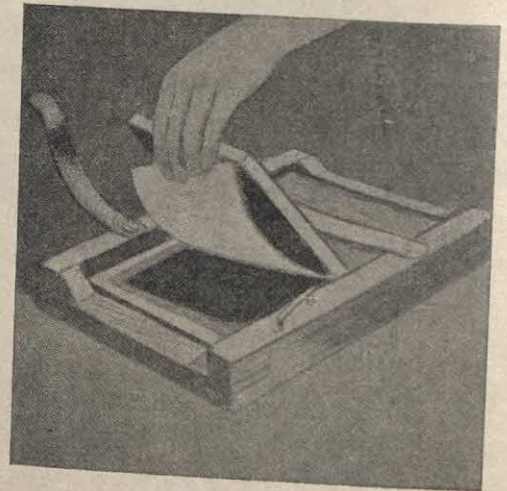
দিনের বেলার আলোয় ডেভেলপ করার জন্যে কাগজটা মধ্যে ভরে দেওয়া হচ্ছে

লেন্স্ আবিষ্কারক কার্ল জাইস

পরকলা কাচ বা লেন্স্ (lens) বসিয়ে দিলেই সেটা বেশী আলো ঢোকাতে পারে।

লেন্স্ হচ্ছে এমন কাচ যার দু'পিঠ প্লেন নয়। দু'পিঠই ধনুকের পিঠের মতো হতে পারে, তাকে পেট-মোটা (convex) লেন্স্ বলা হয়। কিংবা দু'পিঠই ভিতর দিকে বাঁকা হতে পারে, তখন লেন্স্টা হবে পেট-সরু (concave). এ ছাড়াও আরও নানারকমের লেন্স্ হতে পারে। আতসী কাচ এইরকম পেট-মোটা লেন্স্। তা দিয়ে সব জিনিস বড় দেখায়। চোখে ভাল দেখা যাচ্ছে না এমন জিনিসকেও স্পষ্ট দেখা যায়।

প্রথমে ক্যামেরার ফুটোতে এইরকম লেন্স্ লাগানো হল। তাইতে বেশ ছোট ফুটোয় অনেকখানি আলো যেতে লাগল, তাই এক্সপোজারও কম দিতে হল। ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এমন সব লেন্স্ বেরুলো যাতে নিখুঁত ছবি দেখা যেতে লাগল।

জার্মানীর কার্ল জাইস (Carl Zeiss—১৮১৬-১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) একজন চশমা-বিক্রেতা ছিলেন। তিনি জেনা (Jena)-তে একটা কারখানা খুললেন। এখানে ফটোগ্রাফের লেন্স্ তৈরী হতে থাকল। লেন্স্-সৃষ্টিতে জাইসের দান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

॥ ফোকাসিং ॥

কিন্তু আগেই লেন্সের জন্যে নতুন করে আর এক ধরনের মুশকিল দেখা দিয়েছিল। আগে যখন লেন্স্ ছিল না, শুধু একটি সূক্ষ্ম ফুটো দিয়েই আলো ঢুকত, তখন সব ছবিই স্পষ্ট হত —জিনিসটা দূরে, না কাছে, তার জন্যে মাথা ঘামাতে হত না। আলোর যে রেখাগুলো লেন্সের মধ্য দিয়ে ঢোকে তারা লেন্সের ঠিক কতটা পিছনে আলোকগ্রাহী প্লেট থাকলে তার উপর স্পষ্ট দাগ কাটতে পারবে, তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এই দূরত্বটাকে ফোকাস্ (focus) বলা যেতে পারে। কাজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, লেন্স্টা যদি স্থিরভাবে লাগানো থাকে, তবে সেই ক্যামেরা দিয়ে সব রকম দূরত্বের জিনিসের ফটো তোলা যাবে না।

তাহলে ক্যামেরার মধ্যে এমন ব্যবস্থা করতে হয় যাতে জিনিসের দূরত্ব বুঝে ফোকাস কম বেশী করা যায়। লেন্স্খানাকে দরকারমতো সামনে বা দূরে সরাতে পারলে এটা করা যাবে।

॥ ফোল্ডিং ক্যামেরা ॥

এজন্যে এমন ক্যামেরা তৈরি করা হল যাতে লেন্স্টাকে দরকারমতো এগিয়ে বা পেছিয়ে নেওয়া যায়। সেরকম লেন্স্ওলা ক্যামেরাকে বলে ফোল্ডিং ক্যামেরা। তাতে লেন্স্টা থাকে ক্যামেরার গায়ে একটা হাপরের মাথায় বসানো। হাপরটা ধরে টানলে সেটার ভাঁজ খুলে সেটা লম্বা হয়ে যায়, লেন্স্খানাও এগিয়ে যায়। আবার হাপরটাকে চেপে দিলে সেটা ভাঁজ হয়ে গুটিয়ে যায়, কাজেই লেন্স্খানা সেই সঙ্গে পিছিয়ে গিয়ে একেবারে ক্যামেরার গায়ে গিয়ে বসে। এর গায়ে বা ধারে একটা স্কেলের মতো লেখা থাকে। লেন্স্টাকে টেনে নিয়ে এলে কতটা দূরের জিনিসের ঠিক ফোকাস হবে সেটা
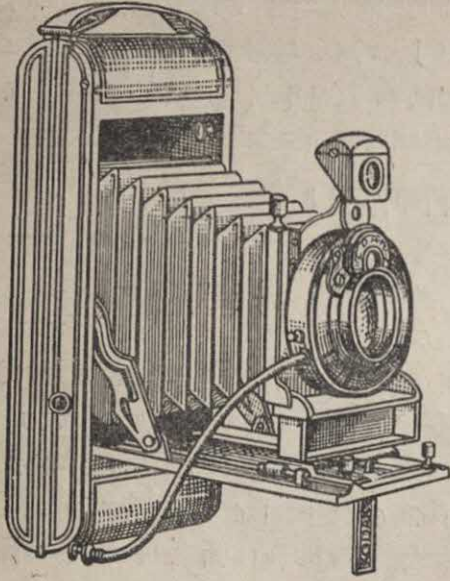
ফটো তোলার ফোল্‌ডিং ক্যামেরা

বোঝা যায়। কাজেই সেইটে দেখে ফোকাস সহজেই ঠিক করা যায়।

॥ অ্যাপার্চার ॥

অ্যাপার্চার (aperture) কথাটার মনে হচ্ছে ফুটো। ফুটো বড় হলে তা দিয়ে বেশী আলো ঢোকে, ছোট হলে কম আলো ঢুকবে। ক্যামেরা অবস্কিউরাতে আর বক্‌স্ ক্যামেরাতে যে ফুটো আছে তা সবসময় একভাবেই থাকে—তাকে ছোট বড় করা যায় না। ফোল্‌ডিং ক্যামেরাতে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে ইচ্ছেমতো অ্যাপার্চার ছোট বড় করা যায়। প্রথমটাই হচ্ছে সব চাইতে বড় ফুটো। এটা দিয়ে যতটা আলো ঢুকতে পারে, তার পরেরটা দিয়ে তার অর্ধেক, আবার তার পরেরটা দিয়ে তারও অর্ধেক—এইভাবে অ্যাপার্চারগুলো সাজানো আছে। যে ফটো তুলছে, সে বিবেচনা করে দরকার মতো অ্যাপার্চার ঠিক করে নেবে।

॥ শাটার ॥

ছিদ্রগুলো যা দিয়ে ঢাকা থাকে, সেটা একটা পাতের মতো জিনিস; তাকে বলে ডায়াফ্রাম (diaphragm). এটা সাধারণতঃ থাকে shutter বলে একটা অংশের মধ্যে। 'শাটার' মানে 'যে বন্ধ করে'। ক্যামেরার শাটার ক্যামেরার মধ্যে আলো ঢোকবার পথ বন্ধ করে রাখে—শুধু ফটো তোলবার সময় এক নিমেষের জন্যে সেটাকে খুলে আলো ঢোকবার পথ করে দিতে হয়। দরকারের সময় ছাড়া ক্যামেরার ভিতরে যদি আলো ঢুকে আলোকগ্রাহী প্লেটের উপর পড়ে তবে ছবি নষ্ট হয়ে যায়। তাই শাটারের ব্যবস্থা। তাতে আবার এমন ব্যবস্থা থাকে যে, ঠিক যতটুকু সময় এক্‌স্‌পোজার চাই, ততটুকু সময়ই সেটা খোলা থাকে। পরে শাটারটা আবার ফিরে এসে আলোর পথ বন্ধ করে দেয়। এক এক রকম ক্যামেরায় শাটার এক এক জায়গায় থাকে।

॥ ফিল্ম ॥

অনেককাল পর্যন্ত শুধু প্লেটগ্লাসেই, অর্থাৎ কাচের পাতেই, আলোকগ্রাহী মসলা মাখিয়ে তাতে ফটো তোলা হয়ে আসছিল। তারপর বের হল ফিল্ম, মানে, সেলুলয়েডের স্বচ্ছ পাতের উপর মসলা মাখিয়ে তাই ব্যবহার করা।

॥ জর্জ ঈস্টম্যান ॥

সাধারণতঃ যে ফটো তোলা হয়, তা প্রায় সবই তোলা হয় গোটানো লম্বা ফিল্মে। আমেরিকার জর্জ ঈস্টম্যান (George Eastman—১৮৫৪-১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ফিল্ম প্রথম তৈরি করেন। প্লেটে যেমন একখানা করে ফটো তোলা যায়, তারপরেই নতুন ফটো তোলবার জন্যে আবার একখানা প্লেটকে ক্যামেরায় ভরে নিতে
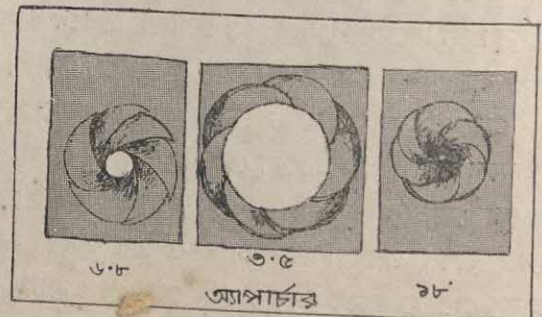
ক্যামেরার অ্যাপার্চার বা ফুটো

হয়—গোটানো বা রোল ফিল্মে সে অসুবিধে নেই। একবারে অনেকখানি লম্বা একটি ফিল্মকে গোটানো অবস্থায় ক্যামেরায় পুরে নিয়ে সেটাকে একটু একটু করে খুলে সেইটুকুর উপর আলাদা আলাদা ছবি নেওয়া যায়। এই সুবিধের জন্যে ঈস্টম্যানের গোটানো (রোল) ফিল্মের খুব চাহিদা হল।

॥ নানা রকমের ফিল্ম ॥

আজকাল বিশেষ বিশেষ ধরনের অনেক ফিল্ম বেরিয়েছে। যেমন, প্যানক্রোম্যাটিক (panchromatic) ফিল্ম। সাধারণ ফিল্মে লাল আলো লাগলে ক্ষতি হয় না অর্থাৎ দাগ পড়ে না। কিন্তু প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্ম অবিকৃত থাকে শুধু সবুজ আলোতে—আর অন্ধকারে তো বটেই।

আবার একরকম ফিল্ম আছে যাতে শুধু ইনফ্রা-রেড (infra-red) আলোয় ছবি তোলা যায়।

আরও একরকম অদৃশ্য রশ্মি আছে যা দিয়ে ছবি তোলা হয়। তার নাম হচ্ছে এক্স্-রে। চোখে দেখা না গেলেও, ফটোগ্রাফিক প্লেটে তার দাগ পড়ে। সেরকম এক্স্-রে ফটো অনেকেই দেখেছে।

তাছাড়া আর একরকম হল রঙিন ছবি তোলবার ফিল্ম। যার ফটো তোলা হবে তাতে যত রং-বেরংই থাকুক না কেন, সাধারণ ফিল্মে শুধু সাদা আর কালো ছবিই উঠবে। কিন্তু রঙিন ফিল্মে তার যেখানে যে রং আছে তা সব হুবহু তুলে নেওয়া যায়।

তারপর, এমন সব ফিল্ম বেরিয়েছে যাতে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে ফটো তোলা যায়। আজকাল এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়ে ছবি তুলে নিতে পারে, এমন ফিল্মও হয়েছে। অবশ্য, তার সঙ্গে আবার সেইরকম ক্যামেরাও তৈরী হয়েছে।

এত কম সময় এক্স্পোজার দিলেও চলে বলে চলন্ত কিংবা ছুটন্ত জিনিসের ছবিও নেওয়া যাচ্ছে।

এত তাড়াতাড়ি ছবি তোলা সম্ভব হওয়াতেই চলন্ত ছবি বা চলচ্চিত্র তৈরি করাও সম্ভব হল। চলচ্চিত্র তোলবার যে রোল ফিল্ম, তা এক সেকেণ্ডে এক ফুট করে খুলে যায়, আর তার উপর ঐ এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ১৬ বারে ১৬ খানা ছবি পরপর উঠে যায়।
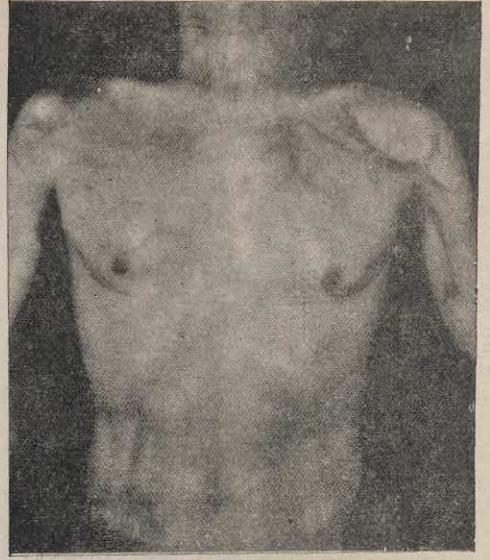
ইনফ্রা-রেড-রশ্মির সাহায্যে তোলা মানুষের শরীরের ছবি

॥ নানারকমের ক্যামেরা ॥

ক্যামেরাও নানা ধরনের আছে। বক্স ক্যামেরা, ফোল্ডিং ক্যামেরা, রিফ্লেক্স্ ক্যামেরা তো আছেই। তাদের নানারকম সাজসরঞ্জাম আছে। তাছাড়া, সিনেমার ছবি তোলবার জন্যে যেমন মস্ত বড় বড় ক্যামেরা হয়, তেমনি আবার নিতান্ত ক্ষুদে ক্যামেরাও আছে। তাকে বলে মিনিয়েচার (miniature) ক্যামেরা। তাতে ক্ষুদে চেহারার ফিল্ম পুরে ডাক-টিকিটের মতো ছোট্ট চেহারার ছবি তোলা হয়। আবার, চোখে দেখা যায় না এমন দূরের জিনিসকে ক্যামেরায় দূরবীন লাগিয়ে ক্যামেরার প্লেটে ধরা হচ্ছে। পাঁচ কোটি মাইল দূরের মঙ্গলগ্রহের ছবিও তোলা হয়েছে ; লক্ষ কোটি মাইল তফাতের নীহারিকার ফটোও তোলা হয়েছে। তেমনি আবার যারা ছোট বলে তাদের দেখতে পাই না, এমন সূক্ষ্ম রোগবীজাণু ব্যাসিলাস, ভাইরাস ইত্যাদির ফটো তো তোলা হয়েছেই, অণু-পরমাণুরও ফটো তুলতেও বাকী নেই।

॥ ভাল ফটো কি করে তুলতে হয় ॥

ভাল ফটো তুলতে হলে শুধু ক্যামেরা আর ফিল্ম ভাল হলেই হয় না। নানারকম কৌশলে বিবেচনা
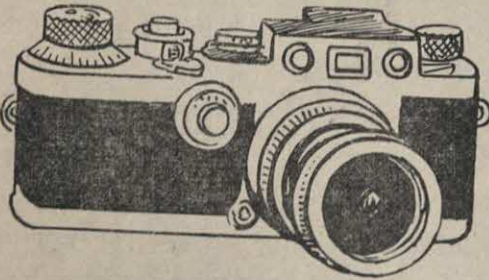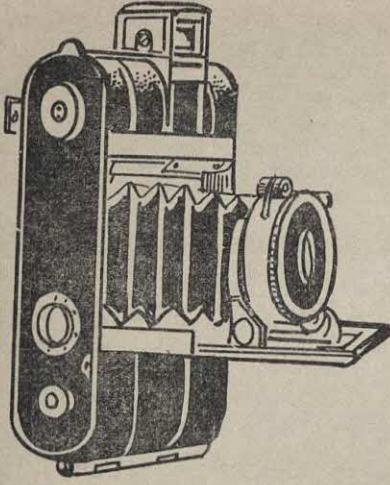
নানারকমের ক্যামেরা

করে ফটো তুলতে হয়, আর সবচাইতে বেশী দরকার হয় অভিজ্ঞতা। তবে, বাঁধাধরা কতকগুলো নিয়মও আছে। প্রথমেই তো যার ফটো তোলা হবে তার দূরত্ব বুঝে ফোকাস ঠিক করে নিতে হবে। তারপর অ্যাপার্চার কি হবে, তা ঠিক করা দরকার। তারপর এক্স্‌পোজার কতক্ষণ হবে, সেটা ঠিক করে নিতে হয়।

মোটামুটি নিয়ম এই যে, স্থির পদার্থের বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি নিতে হলে চাই ছোট অ্যাপার্চার—তাতে অনেক কিছু জিনিস ফোকাসে এসে যাবে। এক্স্‌পোজার নির্ভর করবে আলোর উজ্জ্বলতার উপর। ঝকঝকে আলো থাকলে কম এক্স্‌পোজারেই কাজ হবে, কিন্তু অস্পষ্ট আলোতে এক্স্‌পোজার বেশীক্ষণ চাই। চলন্ত জিনিসের বেলা সাধারণতঃ এক্স্‌পোজার খুব কম হবে, আর অ্যাপার্চার হবে বড়। মানুষ বা জীবজন্তুর ফটো তুলতে সাধারণতঃ সবদিক্ থেকে তার উপর সমান আলো পড়লে ভাল হয়। আলোর অসুবিধে থাকলে এ সব নিয়মও ভাঙতে হয়। তাছাড়া হাত কাঁপলে ফটো খারাপ হয়।

যে ফটো ক্যামেরার ভিতরে ফিল্মে উঠল, সে তো অদৃশ্য ছবি। প্রথমে তাকে ডেভেলপ করতে অর্থাৎ ফুটিয়ে তুলতে হবে। বাইরে আলোয় ফিল্মটাকে বের করা চলবে না, তাকে একটা ডার্করুমে (অন্ধকার ঘরে) নিয়ে গিয়ে ক্যামেরার বাইরে আনতে হবে। কিন্তু ডার্করুমে তো কাজ করা চলে না। তাই সাধারণ ডার্করুমে বাইরের আলো আসে না বটে, কিন্তু ঘরের মধ্যে একটা লাল আলো জ্বলতে পারে। তাতে কাঁচা ফিল্মের ক্ষতি হয় না। শুধু প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্মের বেলায় সবুজ আলো লাগে।

ফিল্মের বা প্লেটের ছবিকে ফুটিয়ে তোলবার নানা-রকম ওষুধ পাওয়া যায়। ডার্করুমে একটা গামলায় ফিল্মটাকে সেই ওষুধের মধ্যে ভিজিয়ে রাখবার পর

হাইপোয় নেগেটিভ ধোয়া হচ্ছে

কলের জলে নেগেটিভ ধোয়া হচ্ছে

ছবিটা ফিল্মে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন তাকে তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে নিলেই ডেভলেপ করার কাজ শেষ হল।

এইবার ফিক্স্ করবার জন্যে ওকে আর একটা গামলায় আর এক রকম ওষুধে ভিজিয়ে দিতে হবে; সেটাকে সংক্ষেপে 'হাইপো' বলা হয়। তাতে ফিল্মের গায়ে আলোকগ্রাহী মসলার যে যে জায়গায় আলো পড়ে নি, সেই অংশগুলো গলে বেরিয়ে যাবে। এবার ফিল্মটিকে তুলে কলের তলায় ধরে ভাল করে ধুয়ে নিলেই পাকা নেগেটিভ হয়ে যাবে। এখন একে শুকিয়ে নিতে হবে।

কিন্তু আমরা যে ফটো চাই, নেগেটিভ তো আর তা নয়, সেটাকে বলে পজেটিভ, কিংবা প্রিণ্ট (অর্থাৎ ছাপ)। সব উলটো নেগেটিভ পাওয়া যায়। এবার ডেভেলপ আর ফিক্স্ করা হয়েছে এমন নেগেটিভকে আলোকগ্রাহী মসলা মাখানো কাগজের উপর রেখে তাতে আলো ফেলতে হবে। নেগেটিভ ফিল্ম বা প্লেট তো স্বচ্ছ জিনিস—তা আলোকে বাধা দেবে না। কিন্তু নেগেটিভের ছবির যে দাগগুলো রয়েছে, তাতে আলোর রেখা কম-বেশী বাধা পাবে। তাই নীচের কাগজে আলো পড়ে ঠিক নেগেটিভের ছবির দাগে দাগে দাগ কাটবে, কিন্তু সাদার জায়গায় হবে কালো আর কালোর জায়গায় সাদা। নেগেটিভের উলটো বলে এ ছবিটা হবে সোজা।

এভাবে কাগজের উপর ফিল্ম বা প্লেটের নেগেটিভ ফটো ছাপাকে বলে কন্‌ট্যাক্ট (contact) প্রিন্টিং। এতে যত বড় নেগেটিভ তত বড়ই পজিটিভ ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু যদি এনলার্জার (enlarger) বলে একরকম যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়, তাহলে নেগেটিভের চাইতে পজিটিভটা বড় হয়। কতটা বড় হবে, সেটা ইচ্ছেমতো ঠিক করা যায়। তাতে সুবিধে

ডার্করুমের আলোয় ফিল্ম ডেভলপ করা হচ্ছে

ডেভেলপ-করা নেগেটিভ। সাদা অংশ কালো আর কালো অংশ সাদা দেখাচ্ছে

নেগেটিভের উপর আলো ফেলে প্রিণ্ট করা হচ্ছে

এই ছোট ক্যামেরায় ছোট ফিল্মে তোলা ছোট নেগেটিভ কম খরচে তুলে তা থেকে খুব বড় ফটো ছেপে নেওয়া চলে।

॥ ফটোগ্রাফির নানা ব্যবহার ॥

ফটোগ্রাফি যে কত কাজে লাগছে, তার আর শেষ নেই। ফটোগ্রাফি সব চাইতে বেশী কাজ দেয় স্মৃতি-চিহ্ন ধরে রাখার ব্যাপারে। মানুষের নানা অবস্থার নানা ছবি, ভ্রমণকারীদের তোলা দেশবিদেশের নানা দৃশ্যের ছবি, এসবই এই শ্রেণীতে পড়ে, তারপর, আমোদ-প্রমোদ, বিজ্ঞান, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষাক্ষেত্র, আরও কত ব্যাপারে ফটোগ্রাফি কত সাহায্য করছে। অতি দুর্গম জায়গার মানচিত্র (map) তৈরির জন্যে প্লেনে উঠে তা থেকে সে সব জায়গার ফটো তুলে নিয়ে তা থেকে সহজেই মানচিত্র তৈরি করা যাচ্ছে। তারপর, হয়তো সরকারী আপিসে বছরের পর বছর কাগজের পাহাড় জমছে। সবই দরকারী, অথচ রাখতে জায়গা কুলোয় না। তখন ফটোগ্রাফিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। প্রতিটি কাগজের ছোট্ট ডাকটিকিটের মতো ফটো তুলে তুলে (photostat) তা রেখে দিলেই হল, তাতে হয়তো এক বস্তা কাগজের ছবি একটা পকেটে রাখবার মতো হল। জায়গাও কম লাগে, ওজনেও অনেক কম। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে বিশ্বযুদ্ধ হয়, তাতে ডাকবাহী প্লেনে জায়গা আর ওজন কমাবার জন্যে বিদেশে যাবার চিঠিগুলোর ফটো তুলে শুধু নেগেটিভগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হত। বিলি করবার আগে সেই নেগেটিভ থেকে একটু বড় করে প্রিণ্ট করে দেওয়া হত।

এক্স-রে ছবি তুলে রোগবীজাণু আবিষ্কার করে ও আরও কতভাবে ডাক্তারি-শাস্ত্রের উন্নতি করে ফটোগ্রাফি কত মানুষের প্রাণ বাঁচাচ্ছে! এক্স্-রে ফটো তুলে রোগীর শরীরের ভিতরে কি রোগ হয়েছে তা দেখা এখন সম্ভব হয়েছে।
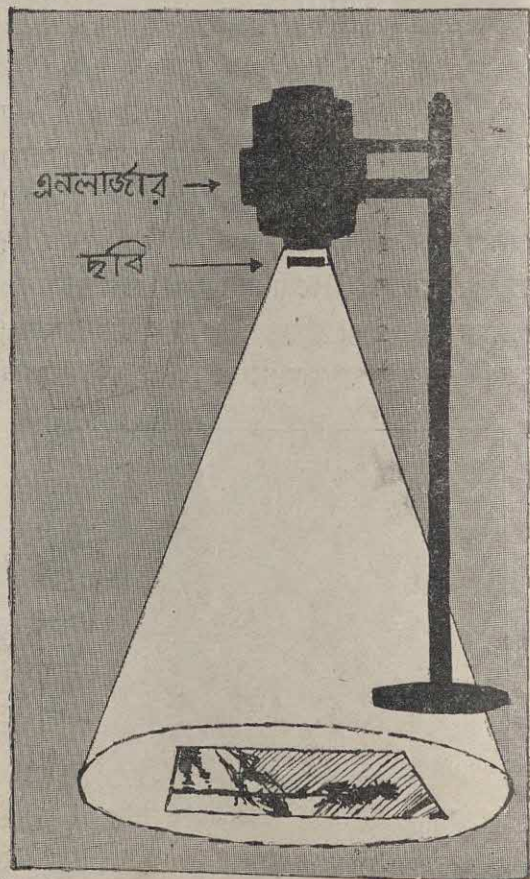
এনলার্জারের সাহায্যে ফটোগ্রাফ বড় করা হচ্ছে

চারুকলা

"চারুকলা বলতে প্রধানতঃ ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়া বোঝায়। সুন্দর জিনিস দেখে ও তৈরি করে মানুষ আনন্দ পায়। সেই আদিম কাল থেকে তাই মানুষ আনন্দের সন্ধানে নানারকম কলা বা শিল্পের চর্চা করে আসছে।"

মাস্টারমশাই ছবি আঁকা শেখাতে এসে তাঁর ছাত্রী পুষ্পকে কথাগুলো বললেন। "শিল্পী যে ছবি আঁকেন তার অস্তিত্ব তাঁর মনের মধ্যে। বাইরের জিনিস দেখে শিল্পীর মনে যে আনন্দ হয়—তাই হল তাঁর সৃষ্টির উৎস। অর্থাৎ মন থেকেই আসছে সব ছবি। বহুকাল আগে এমনি সব ছবি এঁকেছিল পৃথিবীর আদিম শিল্পীরা তাদের বাসগুহার গায়ে।"

পুষ্প বাধা দিয়ে বললে, "ও, বুঝেছি। অজন্তা, ইলোরার ছবির কথা বলছেন তো?"

মাস্টারমশাই বললেন, "না, যে যুগের কথা বলছি, সে আরও আগেকার দিনের—প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার বছর আগেকার কথা। পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে তিন রকম রং দিয়ে আঁকা অতদিন আগেকার ছবি পৃথিবীর নানা জায়গাতেই পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে উত্তর স্পেনের আলটামিরা গুহার ছবিগুলিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সেগুলো প্রধানতঃ নানারকম জীবজন্তুর ছবি আর শিকারের ছবি। এর বহু পরে কোনও কোনও দেশের মানুষ লেখা বা ছবির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করত। আদিম যুগের এরকম ছবি দিয়ে লেখবার নমুনা পাওয়া গেছে মিশর দেশের প্রাচীন 'হাইরোগ্লিফিক্স' (বা সাংকেতিক চিহ্ন) লিপিতে।"

পুষ্প বলল, "তা হলে ছবি-আঁকা থেকে লেখার সৃষ্টি হয়েছে?"

মাস্টারমশাই বললেন, "অনেকটা ধরেছ। এখন বহু গল্প শুধু ছবির সাহায্যে বলা হয়। মনে রেখো, ছবিও একরকম ভাষা—এর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।"

একটু থেমে মাস্টারমশাই বললেন, "এখন শোন, ছবি আঁকা কি করে দেশে দেশে উন্নতি লাভ করতে লাগল। সবদেশেই চারুকলা বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিমতো শুরু হয়েছিল—তাদের কোন লক্ষ্য ছিল না। বাড়ির দেয়ালে, নিত্য ব্যবহারের জিনিসে মানুষ তাদের শিল্পবোধের পরিচয় দিতে লাগল। ক্রমশঃ তাদের শিল্পের কদর বাড়তে লাগল। তখন তারা বাড়ির দেয়ালে, মন্দিরে, গির্জায় নানারকম কারুকার্যে হাত লাগাল। মাটির মূর্তি, তৈজসপত্র, পোড়া মাটির

অজন্তা গুহার মধ্যের দেয়ালের চিত্র

কাজ, পাথর কুঁদে মূর্তি তৈরি, কাঠ খোদাই শুরু হল। তারপর এল রঙ ও তুলির কাজ, দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকা ফ্রেস্কো ইত্যাদির কাজ।

"প্রথমে ইওরোপের কথা বলি। প্রাচীন গ্রীসে পাথর খোদাই করে মূর্তি গড়ার এক মহান্ যুগ এল। এই কাজকে বলে ভাস্কর্য। সে যুগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য হল ওলিম্পিক খেলায় ডিসকাস বা গোল চাকতি ছোড়ার একটি মূর্তি (Discobolus), একটি হাতভাঙা অপূর্ব সুন্দর মূর্তি (Venus di Milo, অর্থাৎ Milos দ্বীপে প্রাপ্ত ভেনাস-দেবী), আর একটি মূর্তির সেটা—সাপের সঙ্গে লাওকুনের লড়াই করার মূর্তি।

"যীশুখ্রীস্টের মৃত্যুর পর তাঁর ভক্তেরা সব এসে জুটলেন রোমে। তাঁদের ধরতে পারলে পুড়িয়ে মারা হত। সেজন্যে তারা মাটির তলায় সুড়ঙ্গে লুকিয়ে থাকতেন। এইসব সুড়ঙ্গকে বলা হত ক্যাটাকোম (catacomb). সেখানে তাঁরা সাধন-ভজন করতেন। দেয়ালে তাঁদের আরাধ্য যীশুকে মেষপালক মূর্তিতে আঁকা দেখা যায়। এছাড়া বাইবেলের বহু ছবিও এই ক্যাটাকোমের দেয়ালে দেখা গিয়েছিল।

"এর পরে ইটালীর ফ্লোরেন্সে এক মহান্ শিল্পী জন্মালেন। নাম তাঁর চিমাবুয়ে (Cimabue—১২৪০-১৩০২ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁর আঁকা সেন্ট ফ্রান্সিসের ছবি খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল। এঁর এক শিষ্য জত্তো (Giotto). ইনি গির্জার ভিজে দেয়ালে রঙের আস্তর বুলিয়ে সেন্ট ফ্রান্সিসের জীবন নিয়ে এক সার ছবি আঁকলেন। এইরকম দেওয়ালে আঁকা ছবিকে বলে ফ্রেস্কো। ফ্রা এঞ্জেলিকো (Fra Angelico—১৩৮৭-১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দ) কাঠের পাটায় যীশুর অনেক ছবি এঁকে-ছিলেন। এইসব ছবির মধ্যে যীশুকে কোলে নিয়ে মাদোনা বা মাতা মেরীর ছবি তাঁর এক অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি।"

পুষ্প অবাক্ হয়ে শুনছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, "মাস্টারমশাই, সব ছবিই তো দেখছি ধর্ম বিষয়ের। অন্য বিষয় নিয়ে কি ছবি আঁকা হত না?"

মাস্টারমশাই বললেন, "হ্যাঁ, সেই কথায় আসছি। বতিচেলি (Boticelli—১৪৪৭-১৫১০ খ্রীস্টাব্দ) নামে একজন শিল্পী ধর্ম বিষয়ের ছবি ছাড়াও অন্য গ্রীক দেব-দেবীর ছবি ও নিজের কল্পনা থেকে অনেক ছবি এঁকেছিলেন। পরে সে সব ছবি তিনি পুড়িয়ে ফেলেন। তাঁর আঁকা একখানি সুন্দর 'মাদোনা'র

ছবি আজও আছে। এর পর ইতালিতে এমন একজন শিল্পীর জন্ম হল যিনি চারুকলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। নাম তাঁর রাফায়েল বা র‍্যাফেল (Raphael Sanzio—১৪৮৩-১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ)। ইনি মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মারা যান, কিন্তু ঐ বয়সের মধ্যে হাজারের উপর ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ছবি 'লা মাদোনা দেল গ্রান্ ডুকা'। কারো কারো মতে ভ্যাটিকান প্রাসাদে সিস্তিন গির্জায় (Sistine Chapel) আঁকা 'সিস্তিন মাদোনা' তাঁর সবচেয়ে সুন্দর ছবি।

"এর পর নাম করা যায় মূর্তি-শিল্পী মাইকেল্যাঞ্জেলো বা মিকেলাঞ্জেলো (Michelangelo —১৪৭৫-১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ ভাস্কর। তাঁর গড়া শ্রেষ্ঠ মূর্তি 'ডেভিড', 'মোজেস', 'Pieta' ইত্যাদি। এর পর রোমের পোপের ডাকে তিনি সিস্তিনের ছাদে ছবি আঁকার ভার নিলেন। তারপর মাচা বাঁধিয়ে শুরু হল তাঁর আঁকার কাজ।

সাপের সঙ্গে লাওকুনের লড়াই করার মূর্তি

ওলিম্পিক খেলায় ডিসকাস ছোড়ার মূর্তি

ধনুকের মতো বাঁকানো ছাদের ভিতর দিকে ছবি আঁকতে তাঁর সাড়ে চার বছর সময় লেগেছিল। এর পর নাম করা যায় লিওনার্দো দা ভিনচির (Leonardo da Vinci—১৪৫২-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর আঁকা মোনা লিসা (Mona Lisa)-র ছবি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছবি। আসল ছবিটি আছে প্যারিসে ল্যুভ্‌র জাদুঘরে। এতে আশ্চর্য আলোছায়ার খেলা দেখানো হয়েছে। ওঁর মুখের রহস্যময় হাসিটার কতই না ব্যাখ্যা হয়েছে! অনেকে বলেন যে, তাঁর ডান হাতখানা এমন নিখুঁত করে আঁকা যে মনে হয় যেন সত্যিকারের রক্তমাংসের মতো সেটি নিটোল।"

পুষ্প বললে, "এবার জেঠুর বাড়ি গেলে ছবিটাকে ভাল করে দেখে আসব।"

মাস্টারমশাই আবার শুরু করলেন, "ইওরোপের ফ্ল্যাণ্ডার্স অঞ্চলে কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী জন্মেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছেন হিউবার্ট ভ্যান এইক (Van Eyck—১৩৬৬-১৪২৬ খ্রীঃ) আরতাঁর ভাই জ্যান। এঁরাই নাকি সর্বপ্রথম তেলরঙে ছবি আঁকেন। আর এক শিল্পীর নাম পিটার পল রুবেন্স্ (Peter Paul Rubens—১৫৭৭-১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ)।

"তিনি জমকালো রং দিয়ে ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি হল "যীশুর ক্রুশ থেকে অবরোহণ"। তাঁর শিষ্য ভ্যানডাইকও (Vandyke —১৫৯৯-১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ) খ্যাতি অর্জন করেন। এ ছাড়া নাম করা যেতে পারে আর দুজনের—আলব্রেখট ড্যুরার এবং হান্স্ হলবীন। এঁদের বলা হয় ফ্লেমিশ-গোষ্ঠীর চিত্রকর (Flemish School).

"নেদারল্যাণ্ডসের শিল্পীদের মধ্যে রেমব্রাণ্ট (Rembrandt—১৬০৬-১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) এবং ভেরমীয়ার (Vermeer—১৬৩২-১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। স্প্যানিশ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে এল্ গ্রেকো (Greco—১৫৪৮ (?) —১৬১৪ বা ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ), ভেলাসকেস

ক্রুশ থেকে যীশুকে নামানো হচ্ছে (চিত্রকর—র‍্যাফেল)

(Velasquez—১৫৯৯-১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ) ও মুরিল্লোর (Murillo—১৬১৭-১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ) নাম উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সেও চারুকলার সাধনা চলছিল। তাঁদের মধ্যে ওয়াত্তো (Watteau, ১৬৮৪-১৭২১), দাভিদ্ (David —১৭৪৮-১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও দেলাক্রোয় (Delacroix —১৭৯৮-১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তারপর ১৯শ শতকের গোড়ায় নতুন ধারায় আঁকা প্রবর্তন করলেন ফরাসী একদল শিল্পী। মিলে (Millet) আর কোরো (Corot) তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তারপর এলেন ইম্প্রেশনিস্ট-রা (Impressionist), যথা, মানে (Manet, ১৮৩২-১৮৮৩), মোনে (Monet), দেগাস (Degas), রেনোয়া (Renoir)।"

মোনা লিসা (চিত্রকর—লিওনার্দো দা ভিনচি)

পুষ্প বললে, "কিন্তু মাস্টারমশাই, আপনি ইংলণ্ডের নাম করতে বোধহয় ভুলে গেছেন !"

মাস্টারমশাই বললেন, "না, ভুলে যাই নি। ক্রমে ক্রমে বলছি। ইংলণ্ডের প্রথম খ্যাতিমান্ শিল্প হলেন হোগার্থ (Hogarth—১৬৯৭-১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি প্রধানতঃ রুপোর উপর এনগ্রেভিং-এর কাজ নিয়ে শুরু করেন। চিত্রশিল্পে তাঁর প্রধান অবদান কমিক

বা কার্টুন ছবি আঁকা। তারপর এলেন স্যার জস্যুয়া রেনল্ডস্ (Sir Joshua Reynolds—১৭২৩-১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ) ও টমাস গেইনজবরো (Thomas Gainsborough—১৭২৭-১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এর পর যিনি এলেন তিনি এনগ্রেভার ও কবি। তাঁর নাম উইলিয়াম ব্লেক (William Blake—১৭৫৭-১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ইংলণ্ডের চিত্রকলায় জন কন্‌স্ট্যাবল (John Constable—১৭৭৬-১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) ও টার্নার (Turner—১৭৭৫-১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ) দুটি মহান্ নাম। কন্‌স্ট্যাবলের প্রাকৃতিক দৃশ্য আর টার্নারের রঙের জাদু প্রশংসার যোগ্য। অনেকের মতে টার্নার ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর।

"উত্তর আমেরিকা আবিষ্কারের পর এর পাহাড়ের গুহায় বহু আদিম চিত্রকরের শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল। এই সময়কার বাসন-কোসন, নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য, কাঠের উপর খোদাই ও গুহা-গাত্রে আঁকা বহু শিল্প-নিদর্শন মেলে। ইওরোপের নানা দেশ থেকে লোক এসেছিলেন এখানে বসতি স্থাপন করতে। তাঁদের জেঁকে বসতে কিছু সময় লেগেছিল। তারপর তাঁরা তাঁদের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগলেন। ওয়াশিংটন্ অ্যাল্‌সটন (Washington Alston—১৭৭৯-১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ), এফ. বি. মর্স (F. B. Morse

জেমস্ অ্যাবট হুইসলারের আঁকা ছবি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পী জেমস অডুবনের আঁকা ছবি

—১৭৯১-১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ), মেরী ক্যাসাট (Mary Cassatt—১৮৪৫-১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ), জেমস অ্যাবট হুইসলার (James Abbott Whistler—১৮৩৪-১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি আমেরিকার খ্যাতিমান্ শিল্পীদের অন্যতম।

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত শিল্পী জেমস অডুবন (James Audubon—১৭৮৫-১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ) পাখিদের নিয়ে চমৎকার ছবি আঁকতে পারতেন। এ বিষয়ে তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলা যায়।

"আর একটা কথা। শিল্পীদেরও মতভেদ আছে, তা নিয়ে দলও আছে। ইম্‌প্রেশনিস্ট দলের কথা আগে বলেছি। তারপর এলেন পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিস্ট দল, যাঁদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন ফ্রান্সের সেজান (Cezanne—১৮৩৯-১৯০৬), গগাঁ (Gauguin—১৮৪৮-১৯০৩), আর ওলন্দাজ ভ্যান গঘ (Van Gogh,

১৮৫৩-১৮৯০)। সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন স্পেন দেশীয় পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭২)। এঁদের মতে সব কিছু আকৃতিই কয়েকটা জ্যামিতিক আকারের মধ্যে নিয়ে আসা যায়। চিত্রশিল্পে এ ছাড়া আরও অনেক মতবাদই আছে, যথা, ফিউচারিজম, কিউবিজম, সুর-রিয়ালিজম ইত্যাদি। পিকাসোর কলা বোঝা শক্ত, বোঝানোও সমান শক্ত। তিনি ছবি আঁকার জগতে এক বিরাট কীর্তি গড়ে তুলেছেন। শুধু ছবি আঁকায় নয়, মূর্তি গড়তেও তিনি ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাধর। প্রাচীন মিশরীয় শিল্প তাঁকে প্রভাবিত করে। আদিম শিল্পের অনুপ্রেরণা থেকে তাঁর শিল্পের জন্ম হলেও তার নাম দেওয়া যায় "পিকাসিয়ান প্রিমিটিভ্‌নেস্"।"

পুষ্প বললে, "মিশরের হাইরোগ্লিফিকস্ সম্বন্ধে বলেছেন। ও দেশের চারুকলার কথা কিছু বলুন।"

মাস্টারমশাই বললেন, "প্রাচীন মিশরের শিল্প-কলা ছিল সব মরা মানুষের জন্যে। প্রথমতঃ ওদের আরক-মাখানো মরা মানুষ, যাকে 'মামি' বলে,

ধ্যানী বুদ্ধ

নটরাজ

সে-সব বিশেষ কারুকার্য-করা খুব সুন্দর কাঠের শবাধারে রাখা হত। রাজারাজড়া ও বড় লোকদের ভূগর্ভের সমাধি-মন্দিরের ঘরের মেঝে, ছাদ, দেয়াল ভরে আঁকা হত হাজার হাজার ছবি—সে-সব জমকালো রঙে আঁকা হত। ওদের বিশ্বাস, মরা মানুষ একদিন বেঁচে উঠবে। তাই তাদের খুশী করার জন্যে এত রকমের শিল্পসৃষ্টি। এ ছাড়া ভাস্কর্যেও শিল্পীদের প্রতিভার নিদর্শন নানা দেবদেবীর পাথরের মূর্তি থেকে পাওয়া যায়।

"প্রাচীনত্ব হিসেবে তার পরেই নাম করতে হয় ব্যাবিলনিয়া, অ্যাসীরিয়া ইত্যাদি দেশের শিল্পের, বিশেষতঃ ভাস্কর্যের। মিশরীয় শিল্পের মত কোমল সৌন্দর্য তাতে ছিল না, তাদের কাজের মধ্যে শক্তির পরিচয় খুব পাওয়া যেত। তারও পরে, আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর আগে গ্রীসের কাছাকাছি ভূমধ্যসাগরে ক্রীট দ্বীপে এক আশ্চর্য শিল্পোন্নতি দেখা দিয়েছিল, তখনকার দিনের দেওয়াল চিত্র, পালিশ-করা মাটির

বাসন, পাথরের মূর্তি আর ধাতুর কাজের নমুনা পেয়ে তা জানা গিয়েছে।”

পুষ্প বললে, “এবার ভারতীয় চারুকলা সম্বন্ধে কিছু বলুন।”

মাস্টারমশাই বললেন, “প্রসিদ্ধ শিল্পী নন্দলাল বসু বলেছেন, ‘সর্বদেশে সবযুগে বড়ো বড়ো আর্টের পিছনে বড়ো বড়ো আদর্শ বা আইডিয়া থাকে। যেমন ইওরোপে ছিল খ্রীস্টের আদর্শ, ভারতে ছিল শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের, চীনে তাও-এর।’ ভারতে পুরাণের শিব, শ্রীকৃষ্ণ, মহাভারত ও রামায়ণের ছবি, কালীমূর্তি—এইসব নিয়ে শিল্পসাধনা দানা বাঁধতে লাগল। তারপর এলেন বুদ্ধ। সমস্ত ভারত এই বুদ্ধের মহান্ জীবনের আদর্শে মেতে উঠল শিল্পকর্মে। ধ্যানী বুদ্ধ, নটরাজ শিব, শ্রীকৃষ্ণ—ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদান।

মহেনজোদারোয় প্রাপ্ত সীলমোহর

“খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে সিন্ধুনদের উপত্যকায় এক সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছিল। এই সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার অতিপ্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার বহু সাদৃশ্য ধরা পড়েছে। একালের মাটির পাত্রের রং-করা টুকরো কিছু পাওয়া গেছে। মহেনজোদারো ও হরপ্পা ইত্যাদি স্থানে মাটি খুঁড়ে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পের যে-সব নমুনা পাওয়া গেছে সেগুলো সেই ‘সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা’র নিদর্শন।

“ব্রোঞ্জের একটি নৃত্যরতা নারীমূর্তি, শিঙ-বাঁকানো মহিষ, ছাগল, তৈজসপত্র শিল্প হিসেবে অতি উন্নত শ্রেণীর। এ ছাড়া নরম পাথরে ক্ষোদাই-করা প্রচুর সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে মহেনজোদারোতে। এগুলি সব খ্রীষ্টপূর্ব ৩২০০ থেকে ২৭০০ অব্দের জিনিস।

“খ্রীষ্টপূর্ব ৩২০ অব্দে মৌর্যযুগে বহু নিপুণ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। অশোকের স্তম্ভ, বুদ্ধের ধর্ম-প্রচারের স্থানগুলিতে শিল্পপ্রতিভার নমুনা পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ১০০ অব্দের মধ্যে নির্মিত এখনকার মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত, সাঁচীস্তূপ ভাস্কর্যের এক অত্যাশ্চর্য বস্তু। কারুকার্যে লতাপাতা, জীবজন্তু, মানুষের মূর্তি ক্ষোদিত আছে। সাঁচীর তোরণটি অপূর্ব।
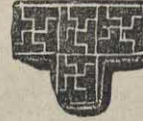
“এর পর গান্ধার ভাস্কর্য। এর আনুমানিক কাল হল খ্রীষ্টপূর্ব ১ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। গান্ধার শিল্পের সঙ্গে গ্রীক ও রোমান শিল্পের সাদৃশ্য আছে। কেননা, গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পধারা এখানে এসে মিশেছে।

“ভারতে চিত্রকলার সবচেয়ে পুরনো নমুনা হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত অজন্তা গুহার দেওয়ালে আঁকা বৌদ্ধযুগের ছবি, আর গোয়ালিয়রের কাছে বাঘগুহার দেওয়ালের ছবি—দুইই প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার। তুমি একটু আগেই এলোরার চিত্রের কথা বলেছিলে,

মূর্তি (গান্ধার শিল্প)

কিন্তু এলোরায় ছবি নেই। সেটা হল পাহাড় কেটে তৈরী অপূর্ব কারুকার্য করা মন্দির। সেও ঐরকম পুরনো।

"এ হল প্রাচীন যুগের কথা। ভারতের মধ্যযুগে মোগল সম্রাট্দের সময়ে পারস্য দেশের শিল্পীদের প্রভাবে এদেশে যে মোগল চিত্রশিল্প ও রাজপুত চিত্র-শিল্প গড়ে ওঠে, তা উল্লেখযোগ্য। হাতির দাঁতের ওপর আঁকা ছবি, আর খুব ছোট আকারের ছবি ছিল মোগল চিত্রের বৈশিষ্ট্য। রাজপুত চিত্রকলায় হিন্দুভাব ও সংস্কৃতির প্রাধান্য এবং আধ্যাত্মিকতার ভাব প্রধান। রাজপুত পাহাড়ী চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য তাদের কোমল ভাব। হিমালয় অঞ্চলের কাঙড়া চিত্রকলার স্থান অতি উচ্চে। রাজরাজড়াদের জন্যে এইসব ছবি আঁকা হয়েছিল। রাজা গোবর্ধন সিং (১৭৪৪-১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) এই শিল্পধারার প্রবর্তন করেন বলা যায়। কাঙড়া শিল্পে মোগল ও হিন্দুরীতির মিলন ঘটেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা এইসব ছবির বিষয়বস্তু এবং বহু চিত্রে বৈষ্ণব ভাবধারা বর্তমান রয়েছে।

"অষ্টাদশ শতকে ইওরোপীয় রীতিতে জল রং-এ ও তেল রং-এর ছবি আঁকার রেওয়াজ শুরু হল। এসময়ের শিল্পীদের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার আত্মীয় রবিবর্মা উল্লেখযোগ্য। ইনি মহাভারত ও রামায়ণের বিষয় নিয়ে বহু ছবি এঁকেছেন। আর একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন শশী হেস।"

পুষ্প বলল, "কোনারকের মন্দিরের গায়ে অনেক ছবি দেখেছি।" মাস্টারমশাই বলেন, "ও সব ছবি নয়, ভাস্কর্য। তবে ছবির মতোই অপূর্ব।"

পুষ্প বলল, "আপনি বাংলা দেশের চিত্রকলার কথা বলছিলেন।"

মাস্টারমশাই বললেন, "বঙ্গদেশে অন্যান্য জায়গার

রাজপুত চিত্র
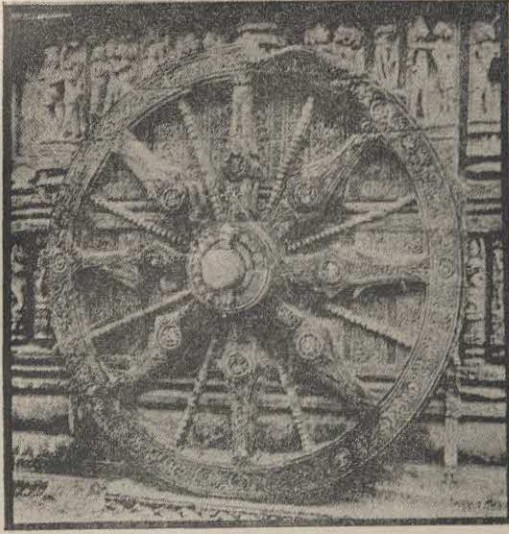
কোনারকের মন্দিরে সূর্যের রথের চাকা—অপূর্ব ভাস্কর্য শিল্প, যেন পাথরে আঁকা একখানি ছবি

মধ্যে কলকাতার আশেপাশে এক ধরনের শিল্পচর্চা হত। কালীঘাটের পটুয়াদের ছবি সাধারণের চিত্রের চাহিদা মেটাতে লাগল। আর রং তুলি নিয়ে তখন নতুন একদল শিল্পী তাঁদের সাধনায় লেগে গেলেন।

শিশুকোলে পাবলো পিকাসো

পিকাসোর আঁকা ছবি

"এর পরেই চিত্রকলার ইতিহাসে যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসু ও যামিনী রায়। এঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

"গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর প্রথম প্রথম কিউবিজমের ও সুর-রিয়ালিজমের প্রভাব পড়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র নন্দলাল বসু ও অসিত হালদার ভারতীয় চিত্রকলার অআ-কখ শিখতে অজন্তায় গিয়াছিলেন। তাঁরা ভারতীয় শিল্পে দেশীয় ভাবধারা আমদানি করলেন। যামিনী রায় কালীঘাটের পট-শিল্পের ধারা অনুসরণ করে নতুন পথ বার করতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন ছবি আঁকা ধরলেন, তাতে অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় এক নতুন রীতির সৃষ্টি হল। কিন্তু এযুগের ভারতীয় চিত্রকলার গুরু (ফাদার অব ইণ্ডিয়ান আর্ট) বলতে হবে অবনীন্দ্রনাথকে।"

পুষ্প বলে উঠল, "মাস্টারমশাই, আমি অবনীন্দ্রনাথের 'বিরহী যক্ষ' ও 'আলমগীর' ছবি দেখেছি।"

মাস্টারমশাই বললেন, "ওঁর দুটো বিখ্যাত ছবিই তা হলে তুমি দেখেছ। ওঁর সম্বন্ধে বলা

হয় যে ভারতীয় শিল্পের উনি পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। প্রথমে তিনি ইওরোপীয় গুরুদের কাছে ইওরোপীয় চিত্রবিদ্যা শেখেন বটে, কিন্তু নিজের কাজে তিনি শেষ পর্যন্ত ভারতীয় রীতিকেই বেছে নিলেন। তার উপর পারসীক শিল্পপদ্ধতি ও রবিবর্মার আঁকা ছবি দেখে তিনি নতুন পথের আবিষ্কার করেন। তাঁর আঁকা কয়েকটি বিখ্যাত ছবির নাম জেনে রাখ। সুযোগ হলে এগুলো দেখবে। শাজাহানের মৃত্যু-প্রতীক্ষা, শাজাহানের স্বপ্ন, আলমগীর, বিরহী যক্ষ, বুদ্ধ ও সুজাতা, ভারতমাতা ইত্যাদি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নন্দলাল বসু

নন্দলাল বসুর আঁকা শকুন্তলা

"বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু একসময় কিছুদিন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করেন। পরে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এঁর বেশির ভাগ সময় কাটে। ইনি অজন্তার গুহাচিত্রের প্রতিলিপি করতে এক সময়ে লেডি হেরিংহ্যামের সঙ্গে অজন্তায় যান। ভারতীয় চিত্রে তাঁর দান অসামান্য।

"বর্তমান সময়ের অন্যান্য প্রতিভাধর শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করছি। সুযোগ পেলে এঁদের আঁকা ছবি দেখবে। এঁরা হলেন চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মুকুল দে, আবদুর রহমান চাঘতাই, হীরাচাঁদ দুগড়, ইন্দ্র দুগড়, সুনয়নী দেবী, ক্ষিতীন মজুমদার, গোপাল ঘোষ ইত্যাদি।"

॥ পৃথিবী বিরাট্ ॥

পৃথিবী বিরাট্। মহাদেশগুলির মাঝে মহাসমুদ্র তাদের আলাদা করে রেখেছে। আবার বহু অঞ্চল দুর্গম। ঐসব অঞ্চলের কথা মানুষ অনেক পরে জানতে পেরেছে।

এগুলো একদিনে মানুষ জানে নি। এজন্যে বহু বছর ধরে অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে। তারও আগে এই সব দুর্গম দেশ, অঞ্চল ও অরণ্য, মরুভূমি, মহাসাগর, হ্রদ, নদী মানুষকে পায়ে হেঁটে বা জাহাজে করে ভ্রমণ করে আসতে হয়েছে। সে সব ভ্রমণের কাহিনী বড় চমৎকার। কত মৃত্যু, কত বাধা-বিপদ কাটিয়ে দুঃসাহসী মানুষ এসব জায়গার খবর আমাদের এনে দিয়েছে। তবেই এখন পৃথিবী আমাদের নখদর্পণে এসে গেছে।

এমন একদিন ছিল যখন মানুষ তার এলাকা ছেড়ে বেশীদূর যেত না। প্রত্যেক গোষ্ঠী মনে করত যে তারা যেখানে থাকে সে জায়গা ছাড়া আর কোথাও মানুষ থাকতে পারে না। অন্য জায়গা-গুলোয় ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানবেরা থাকে।

কেউ কেউ সাহস করে নিজেদের এলাকা ছেড়ে একটু একটু করে পৃথিবীর অন্য অন্য জায়গার সঙ্গে পরিচিত হল। ভাল ভাল জায়গা বেছে সেখানে চাষবাস করে বসতি করল। এইভাবে তারা ক্রমশঃ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল।

ইংল্যাণ্ডে বীড (Bede—৬৭৩-৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) নামে এক ঐতিহাসিক এই সব অসমসাহসিক মানুষের কথা লিখে গেছেন।

ইংল্যাণ্ডে সর্ব প্রথম এসেছিল পিক্‌ট্‌স্ (Picts) নামে একজাতের লোক। এদের আদি বাসস্থান ছিল সাইথিয়া (Scythia). তারা তাদের লম্বা লম্বা কাঠের জাহাজে করে এসে নেমেছিল আয়ারল্যাণ্ডের পুব-উপকূলে। সেখানে তখন স্কট্‌স্ নামে একজাতের লোক বাস করছিল। পিক্‌ট্‌স্‌রা তাদের জন্যে একটু
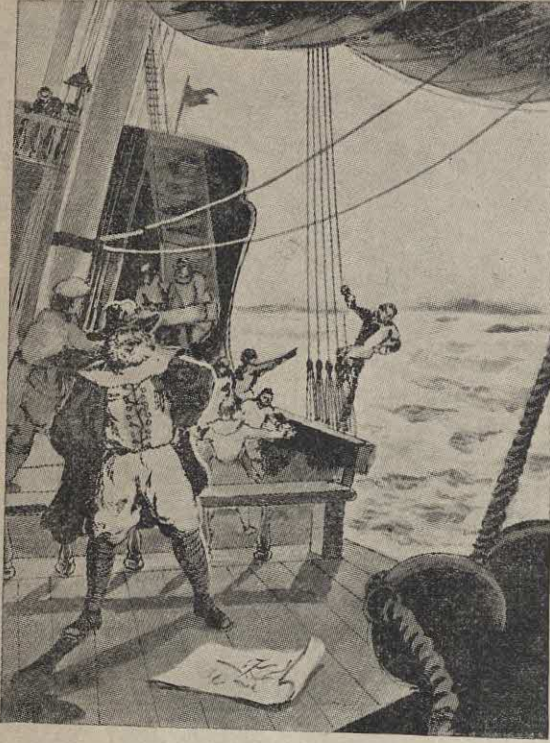
জাহাজে করে ভ্রমণ করে আসতে হয়েছে

জায়গা চাইল। সেখানে তারা বসবাস করবে। স্কটস্‌রা বললে, "উঁহুঁ, দু'জাতের লোক এখানে ধরবে না। তবে পুব দিকে আর একটা দ্বীপ আছে। তোমরা সেখানে যেতে পারো। তারা যদি তোমাদের থাকতে না দেয় ত আমাদের ডেকো, আমরা একটা ব্যবস্থা করে দেব।"

পিক্‌ট্‌স্‌রা যা ভুল করেছিল, অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড ভেবে আয়ার্ল্যাণ্ডে পৌঁছেছিল এমনি ভুল পরেও অনেক হয়েছে। কলম্বাস (Columbus—১৪৫১-১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দ) জাহাজে করে পশ্চিমে যেতে যেতে পুবের দেশে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। সাগরপারে তিনি যে দেশে পৌঁছলেন, তার নাম পরে আমেরিকা হয়েছে। কিন্তু তাঁর ধারণা হয়েছিল যে তিনি ভারতে এসেছিলেন।

এর পরেও মানুষ নানা রকম ভুল করেছে। লা সাল (La Salle—১৬৪৩-১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) নামে একজন ফরাসী অভিযাত্রী কানাডার সেণ্ট লরেন্স নদী দিয়ে যেতে যেতে একটা জলপ্রপাত দেখে ভেবেছিলেন এর ওপারেই চীনদেশ অবস্থিত। তিনি এই জলপ্রপাতের নাম দিয়েছিলেন ল্যাশিন র‍্যাপিড্‌স্ (Lachine Rapids) অর্থাৎ চীন জলপ্রপাত।

ম্যাপ, চার্ট নিয়েও যদি এরা এরকম ভুল করে, তবে তারও আগেকার লোকেদের অবস্থা কি রকম ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। ম্যাপ ছিল না, চার্ট ছিল না, ভূগোলের জ্ঞানই তখন মানুষের ছিল না।

যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার ৫০০ বছর আগে হিরোডোটাস (Herodotus) তাঁর ভ্রমণের বিবরণ তাঁর ইতিহাসে লিখে গেছেন। গ্রীকরা নাকি দিনের বেলায় যতদূর থেকে ডাঙা দেখা যায় তার বাইরে জাহাজে চড়ে যেত না—রাতে তারা তীরেই কাটাত।

গ্রীকদের থেকেও হাজার হাজার বছর আগে ভ্রমণকারীরা গভীর প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে দ্বীপগুলিতে গিয়ে বসবাস শুরু করে দিয়েছিল। তাদের জাহাজ বা নৌকো এখনকার মতো এত মজবুত ছিল না। ঝড়-ঝাপটায় কত নৌকো ডুবেছে, তবু তারা হাল ছেড়ে দেয় নি।

নরওয়ের ভাইকিং একরকম অদ্ভুত জাত। এরা

ভিনদেশের লোক ইংল্যাণ্ডে এল

কলম্বাস

সমুদ্রকে ভয় করত না। জাহাজে চড়ে এরা দেশে দেশে অভিযান করে বেড়াত। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ৫০০ বছর আগে ভাইকিং সর্দার লীফ এরিকসন (Leif Ericsson) আমেরিকায় পৌঁছেছিল। কিন্তু তাদেরও হাজার হাজার বছর আগে অপরিচিত মানুষ আমেরিকায় ছিল। মানুষের সামনে কত ভূখণ্ড—কিন্তু মানুষ যেখানেই গেছে সেখানেই দেখেছে যে তাদের আগেই লোকজন এসে সেখানে বসতি করে আছে। পলিনেশিয়া থেকে ৬০০ বছর আগে মাওরিরা নিউজিল্যাণ্ডে এসেছিল কিন্তু তারও আগে সেখানে আদিম অধিবাসীরা ছিল।

এস্কিমো ও ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীদের প্রকৃত ইতিহাস আমরা জানি না, কিন্তু এরা সবচেয়ে কষ্টসহিষ্ণু ভ্রমণকারী। এরা সবুজ গাছপালা ইত্যাদিতে পূর্ণ দেশ ছেড়ে স্বাধীনভাবে থাকবার জন্যে উত্তর-মেরু অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল। জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar—১০০-৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করার অন্ততঃ এক হাজার বছর আগেও তারা মেরু অঞ্চলে ছিল।

মিশরীয়গণ ভূমধ্যসাগরের ওপারে তাদের রীতি-নীতি ও সভ্যতার চিহ্ন বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। ক্রীট দ্বীপেও বাণিজ্যের মাধ্যমে এক সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সে সভ্যতা পরে বর্বর জাতিদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে যায়।

ফিনিশিয়ানদের মতো সাহসী নাবিক পৃথিবীতে ছিল না। তারা তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে ভারতবর্ষ, চীন ও পারস্যে গিয়েছিল। গ্রীস এবং স্পেনেও তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এরা ইংল্যাণ্ডেও এসেছিল।

৮৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজ নামে ফিনিশিয়ানদের একটি উপনিবেশ খুব উন্নতি করেছিল। এদেশের নাবিকরা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ও ইওরোপের বহুস্থানে এমন কি ইংল্যাণ্ডে পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ৬০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের কাছাকাছি নেকো (Necho) নামে এক মিশরীয় রাজা তাদের বলেছিল যে সমুদ্রপথে আফ্রিকা ঘুরে আসা যায়। তারা সে চেষ্টাও করেছিল। তারা রেড সী হয়ে আফ্রিকার পুব উপকূল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এরা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত গিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিন বছর বাদে তারা ভূমধ্যসাগরের তীরে নিজেদের দেশে ফিরে এসেছিল।

গ্রীক ও রোমানরা বহু দেশের খবর এনে দিলেও রোমানরা কোনদিন চীন দেশের নামও শোনে নি।

গ্রীক ও রোমানগণ অন্যান্য জাতিদের বর্বর বলত। এই বর্বর জাতিরা শেষ পর্যন্ত গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ধ্বংস করে, পুস্তক ও পুঁথি পুড়িয়ে ইওরোপে যা কিছু পুরাতন সব ধ্বংস করে দিয়েছিল।

মিশরীয় রাজা বলল, সমুদ্রপথে আফ্রিকা ঘুরে আসা যায়

॥ মার্কো পোলো ॥

ইওরোপের প্রাচীন ভ্রমণকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন মার্কো পোলো (Marco Polo—১২৫৪ ?-১৩২৪ ? খ্রীষ্টাব্দ)। ইটালীর ভেনিস শহরে তাঁর জন্ম। ১৭ বছর বয়সে তিনি তাঁর বাবা আর কাকার সঙ্গে রওনা হন চীনদেশে যাবেন বলে।

পথে তাঁদের পাহাড় ডিঙোতে হল, মরুভূমির উপর দিয়ে বালির সমুদ্র পার হতে হল—এমন এমন জায়গায় এলেন যে গরমে টেঁকা দায়, আবার এমন শীতের দেশ দিয়ে যেতে হল যে ঠাণ্ডায় শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়।

অবশেষে তাঁরা চীনদেশে পৌঁছলেন। সে দেশে তখন কুবলাই খাঁ (১২১৬-১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) রাজা। মার্কো রাজার দরবারে থেকে ক্রমশঃ রাজার খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন। মার্কো অনেক ভাষা শিখেছিলেন। তিনি খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। রাজা তাঁকে ভারত, কোচিন-চায়না ও অন্যান্য দেশে দূত করে পাঠালেন।

বালির সমুদ্র পার হতে হল

মার্কো পোলো

অবশেষে তেইশ বছর বাদে পোলোরা দেশে ফিরে গেলেন।

দেশে ফিরে আসার কিছুদিন বাদে মার্কো একটা যুদ্ধে বন্দী হন। কারাগারে বসে তিনি তাঁর অদ্ভুত কাহিনী একজনকে দিয়ে লেখান। তাতে তিনি তাঁর দেখা এশিয়ার নানা দেশের কথা লেখেন।

॥ ইবন বাটুটা ॥

আরবদেশের ইবন বাটুটা একজন বড় পর্যটক ছিলেন। ত্রিশ বছর ধরে তিনি মেসোপটেমিয়া, আরব, আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর, বোখারা, ভারত, চীন ও সুমাত্রা ভ্রমণ করেন। তিনি ভারতে এসেছিলেন ১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে।

॥ পুবদেশে আসবার পথ ॥

পুবদেশ বলতে ইওরোপের লোকেরা বোঝে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে—তার মধ্যে ভারতই প্রধান। পুবদেশের সঙ্গে বাণিজ্যটা হত ভেনিস আর আরব দেশের সওদাগরদের হাত দিয়ে। পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলি তাদের এড়িয়ে পুবদেশের

লাভের বাণিজ্যে ভাগ বসাতে পারত না। তাই পশ্চিম ইওরোপের সব দেশই, যেমন, ফ্রান্স, পোর্তুগাল, স্পেন, ইংল্যাণ্ড—সবাই ভাবছিল কি করে জলপথে অন্যদিক দিয়ে প্রাচ্যে (পুবদেশে) যাওয়া যায়!

১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাডেইরা আবিষ্কার হলে পর পোর্তুগিজদের জাহাজ পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে ৫৩৫ মাইল এগিয়ে যেতে পারলো।

তখন চেষ্টা হতে লাগলো আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে ভারতে আসা যায় কিনা।

॥ বারথোলোমিউ ডিয়াস ॥

প্রথমে পোর্তুগালের প্রিন্স হেনরী (Prince Henry the Navigator) আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণে অনেকদূর পর্যন্ত এসে ফিরে যান। তারপর বারথোলোমিউ ডিয়াস (Bartholomeu Dias—১৪৫০ ?-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) নামে একজন পোর্তুগিজ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রা শুরু করেন। ডিয়াস তাঁর জাহাজে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ধরে ভেসে চললেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আফ্রিকার দক্ষিণতম প্রান্তে পৌঁছলেন। কিন্তু কোথায় এসেছেন তা বোঝবার আগেই তাঁর জাহাজের মাঝিমাল্লারা তাঁকে ফিরে আসতে বাধ্য করল। সে জায়গায় ঝড় দেখে তিনি তার নাম দিতে চেয়েছিলেন 'ঝড় অন্তরীপ' (Cape of Storms)। এইসব শুনে পোর্তুগালের রাজার আশা হল যে ভারতের পথ এবার পাওয়া যাবে। তাই তিনি তার নাম দিলেন উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope).

॥ ভাস্কো ডা গামা ॥

পোর্তুগিজ-রাজ ঠিকই ধরেছিলেন। ১৪৯৮ খ্রীঃ ঐ পথে গেলেন ভাস্কো ডা গামা (Vasco da Gama—১৪৬৯ ?-১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দ)। এই জাহাজে ডিয়াস ছিলেন কিন্তু এবার দলপতি ছিলেন ভাস্কো ডা গামা নিজেই।

ডিয়াসের এবং ভাস্কো ডা গামার অভিযানের মধ্যে

ভাস্কো ডা গামা

কলম্বাস তিনবার আটলান্টিক পার হন। আর জন ক্যাবট (John Cabot—১৪৫০-১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

অন্য দেশের অভিযান সফল হতে দেখে পোর্তুগিজরা উৎসাহ পেল। ভাস্কো ডা গামা জাহাজে চড়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে পৌঁছবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ভাস্কো ডা গামা উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছে আফ্রিকার পুব উপকূল ধরে চলতে লাগলেন। পথে ঝড় উঠল—জাহাজ ডুবে যাবার উপক্রম হল, খালাসীরা সবাই বাড়ি ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল, কেউ কেউ গামাকে হত্যা করবার ফন্দি আঁটল। কিন্তু গামা কোন কিছুতেই ভয় পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ভারত মহাসাগরে এসে পড়লেন এবং কালিকটে পৌঁছলেন। কালিকটের জামোরিন বা

নাবিকরা বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল

রাজাকে দামী দামী উপহার দিয়ে তাঁরা নিরাপদে পোর্তুগালে ফিরে এলেন। ইওরোপ থেকে ভারতে আসার পথ এইভাবে আবিষ্কৃত হল। কালিকটের নাম এখন কোঝিখোড (Kozhikode) হয়েছে।

॥ ম্যাগেলান ॥

ম্যাগেলান (Magellan—১৪৮০ ?-১৫২১ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন পোর্তুগালের অধিবাসী, কিন্তু তিনি স্বদেশ ছেড়ে স্পেনে বসবাস করছিলেন। নতুন আবিষ্কার করা দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে স্পেন ও পোর্তুগালে বিরোধ বাধল। স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের সাহায্যে ম্যাগেলান বেরুলেন নতুন দেশ আবিষ্কার করতে। ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেভিল থেকে সমুদ্রযাত্রা করেন। ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তাঁর জাহাজ পৃথিবী চক্কর দিয়ে ফিরে এল। তিন বছর বারোদিনের সমুদ্র-যাত্রায় পাঁচটি জাহাজ ও ২৭০ জন খালাসীর মধ্যে একটি জাহাজ ও ১৮ জন খালাসী বেঁচে দেশে ফিরে এল।

ম্যাগেলানও দেশে ফেরেননি। তিনি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছে এখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে মারা পড়েন।

তাঁর পরে পোর্তুগাল এবং ফ্রান্সের অধিবাসী ও ব্রিটিশরা কয়েকটি অভিযান চালিয়ে কয়েকটি দ্বীপ আবিষ্কার করেন।

॥ ড্রেক ॥

ফ্রান্সিস ড্রেক (Francis Drake—১৫৪০ ?-১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন একজন ইংরেজ নাবিক ও অভিযাত্রী। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিন বছর সমুদ্রে ঘুরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসেন। এখন পর্যন্ত ইংরেজরা পৃথিবীর অন্য কোন ভূভাগে এক তিলও জমি দখল করতে পারে নি। স্পেন আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল, পোর্তুগাল ভারত পর্যন্ত জাহাজে পৌঁছেছিল। ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড ওদের দেখাদেখি সমুদ্রযাত্রা, দেশ আবিষ্কার ও অধিকার করতে শুরু করেছিল।

স্যার হামফ্রে গিলবার্ট (Sir Humphrey Gilbert —১৫৩৯ ?-১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) ও স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে (Sir Walter Raleigh—১৫৫২ ?-১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ) ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানাডার উপকূলে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দখল করেন। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যে জায়গার নাম এখন ভার্জিনিয়া, সেখানটা দখল করেন। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ছিল মাছ ধরার জায়গা। স্পেন, পোর্তুগাল ও ফ্রান্সের মাছধরা জাহাজ এখানকার সমুদ্রে মাছ ধরত। ইংল্যাণ্ড এ দেশ আবিষ্কার করলেও এখানে তারা বিশেষ পাত্তা পাচ্ছিল না।

ওদিকে ভারতবর্ষ নিয়ে ফ্রান্স ও পোর্তুগালের সঙ্গে ইংরেজদের মন কষাকষি চলছিল। ইংরেজরা বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় বাণিজ্য করতে শুরু করে দিলেন।

নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি অধিবাসীরা ইংল্যাণ্ডের বশীভূত হয়ে তাঁদের আধিপত্য মেনে নিল।

অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশদের আধিপত্য ধীরে ধীরে স্থাপিত হতে লাগল।

॥ আমেরিকা আবিষ্কার ॥

কলম্বাস পৃথিবীবাসীকে একটি চতুর্থ মহাদেশের সন্ধান এনে দিলেও তিনি জানতেন না যে তিনি চতুর্থ মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি ভারত (Indies) আবিষ্কার করেছেন। তাই আমেরিকার যে অংশে তিনি পৌঁছেছিলেন সে দেশের অধিবাসীদের নাম দেন ইণ্ডিয়ান। পরে ভুলটা জানা গেলে সেখানকার নাম হয় West Indies.

॥ কারা আমেরিকা প্রথম আবিষ্কার করেছিল ॥

চীনের পুরাতন ইতিহাসে পাওয়া যায় যে গ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে সমুদ্র পার হয়ে চীনের পালতোলা জাহাজগুলো পুবে এক বিরাট্ দেশে পৌঁছয়। একথা সত্য কিনা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। পেরুর অধিবাসীদের জীবনযাত্রা-প্রণালীতে চীনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একথা সত্য যে ইওরোপের লোকেরা আমেরিকার খবর জানবার আগেই আমেরিকায় লোক পৌঁছেছিল। কলম্বাসের ৫০০ বছর আগে থেকেই ইওরোপ থেকে লোক আমেরিকায় যেতে আরম্ভ করেছিল।

॥ ভাইকিংদের কথা ॥

জানা গেছে যে আইসল্যাণ্ড থেকে বিয়ার্ন হারজুল্ফ্সন (Bjarne Herjulfsson) নামে এক ভাইকিং জলদস্যু প্রথম আমেরিকায় পৌঁছয়। ৯৮৬ গ্রীষ্টাব্দে জাহাজে করে যেতে যেতে ঝড়ের মুখে পড়ে সে হুহু করে উত্তর-পশ্চিমে ভেসে চলল। সে ভাবল যে, সে বোধহয় গ্রীনল্যাণ্ডে পৌঁছেছে। এর আগে কয়েকবার সে গ্রীনল্যাণ্ডে এসেছিল। তাই গ্রীনল্যাণ্ড তার জানা ছিল। কিন্তু আসলে গ্রীনল্যাণ্ডে নয়, সে পৌঁছেছিল এক নতুন জায়গায়। পরে ঝড় থামলে সে নিজের দেশে ফিরে তার এই আশ্চর্য দেশে পৌঁছনোর খবর সবাইকে জানায়।

এরপর লীফ (Leif Ericsson) নামে আর একজন ভাইকিং নরওয়ে থেকে তার কাঠের জাহাজে উত্তর আমেরিকার লাব্রাডরের উপকূলে পৌঁছল ১০০০ গ্রীষ্টাব্দে। দক্ষিণে সে ম্যাসাচুসেট্স (এ নাম অবশ্য অনেক পরে হয়েছে) পর্যন্ত গেল। এ দেশে অনেক আঙুর গাছ দেখে সে এর নাম রেখেছিল Vinland (আঙুর রাজ্য)।

এই ঘটনার ছ বছর বাদে থরফিন্ কার্লসেফনে (Thorfinn Karlsefne) ১৬০ জন স্ত্রীপুরুষ ও কিছু গোরু ও ছাগল নিয়ে এখনকার মেক্সিকোতে এসে নামল।

তিন বছর এখানে থাকবার পর এখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে ভাইকিংরা আইসল্যাণ্ডে ফিরে চলে গেল। আইসল্যাণ্ডের পুরোনো বইয়ে ভাইকিংদের এইসব ভ্রমণ-কাহিনীর কথা লেখা আছে।

॥ কলম্বাস ॥

কলম্বাসের বাড়ি ছিল ইটালীর জেনোয়ায়। ১৪৪৬ গ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি বহু জায়গায় সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। তিনি আফ্রিকার উপকূলে ভ্রমণ করলেন, ভূমধ্যসাগরের বহু জায়গায় গেলেন,

ভাইকিংরা জাহাজে করে আসছে

আইসল্যাণ্ডে গেলেন। সেখান থেকে ভাইকিংদের কাহিনী শুনে তাঁর মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে পশ্চিমে কোন দেশ আছে।

ইতিমধ্যে তিনি অনেক কিছু পড়ে ফেললেন। ম্যাপ ও নকশা পেলেই মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। ভারতবর্ষে পৌঁছবার জলপথ আবিষ্কারের আশায় তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু কে তাঁকে জাহাজ দেবে? কে লোকজনের মজুরি দেবে?

তখন স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ (Ferdinand—১৪৫২-১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ) ও রানী ইজাবেলা (Isabella—১৪৫১-১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দ)। সাত বছর ঘোরাঘুরি পর শেষ পর্যন্ত স্পেনের রাজা ও রানী কলম্বাসকে তিনটি জাহাজ দিয়ে সাহায্য করলেন। আর অভিযানের সব খরচ, প্রায় ১০০০ পাউণ্ড, তাঁরা দিলেন।

যাঁরা কলম্বাসের সঙ্গে সমুদ্রে ভাসলেন তাঁদের কেউই স্বেচ্ছায় একাজ করেন নি। ১২০ জনের অধিকাংশই বেশ মোটা টাকা মজুরিতে এই জাহাজগুলি চালাতে রাজী হয়েছিলেন। তাও রাজার আদেশে বাধ্য হয়ে তাঁদের এরকম বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল।

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট তারিখে কলম্বাস তাঁর তিনখানা জাহাজ 'নিনা', 'পিণ্টা' আর 'সাণ্টা মারিয়া' নিয়ে অজানা সমুদ্র-পথে অজানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন।
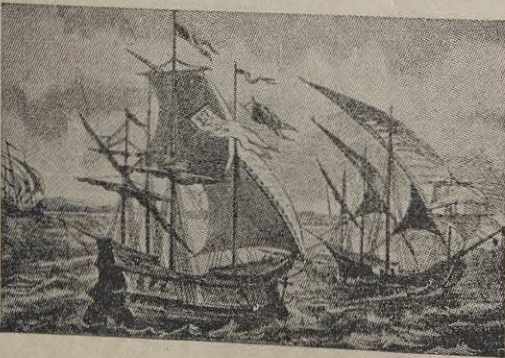
১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই তিনটি জাহাজে চড়ে কলম্বাস অজানার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে ভাসেন

কলম্বাস হিসেব করেছিলেন যে পৃথিবী অনেক ছোট—তার আসল আকৃতির তিন ভাগের এক ভাগ। তাই ঠিক জায়গায় পৌঁছতে যত সময় লাগবে বলে তিনি হিসেব করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগল তাঁর।

দিন চলে সপ্তাহ হল—সপ্তাহ চলে গিয়ে মাস পূর্ণ হল। মাসও কেটে গেল। তবুও কলম্বাসের জাহাজ চলেছে ভেসে পশ্চিমে—আরও পশ্চিমে। কোথাও ডাঙা নেই। তাঁরা সারগোসা সমুদ্রে এসে পড়েছেন। জাহাজ আর চলছে না। জলজগাছ অক্টোপাশের মতো জাহাজগুলোকে আঁকড়ে ধরল। ক্রমশঃ তাঁরা সেগুলো কাটিয়ে এলেন। কিন্তু ডাঙা কই? মেঘ দেখলে সবাই নেচে ওঠে, এই বুঝি ডাঙা! কিন্তু কোথাও ডাঙার চিহ্নমাত্র নজরে পড়ে না।

সকলের সব আশা মিলিয়ে গেল। সবাই একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কলম্বাসকে আর তারা মানবে না। লোকটা নিষ্ঠুর আর পাগল। সবাইকে মারবার জন্যে এ কোথায় তাদের এনে ফেললেন! সকলের মনের অবস্থা এইরকম। এই অবস্থায় একদিন কয়েকটা পাখি দেখা গেল, ভেসে গেল কয়েকটা তাজা সবজি, তীরের ধারে জন্মানো কয়েকটা নলখাগড়া, একগুচ্ছ ফুল, একটা পালিশ-করা কাঠ, একটা খোদাই-করা লাঠি—এগুলো সবই ডাঙা আর মানুষের চিহ্ন। কাছেই ডাঙা আছে নিশ্চয়। এবার নাবিকরা শান্ত হল। কলম্বাসের প্রাণ রক্ষা হল। লোকের মনে বিশ্বাস ফিরে এল।

সারারাত আকুল আগ্রহে সবাই প্রতীক্ষা করতে লাগল কখন ভোরের আলো ফুটবে! ভোরে জাহাজ থেকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হল। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর শুক্রবারের সকালে সত্যিই ডাঙা পাওয়া গেল। কলম্বাস জমকালো পোশাক পরে পতাকা উড়িয়ে নতুন দেশের তীরে জাহাজ থেকে এক লাফে নেমে পড়লেন ও হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানকে প্রার্থনা করে কৃতজ্ঞতা জানালেন। স্পেনের রানীর নামে তিনি এদেশ অধিকার করলেন।

কলম্বাসের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে তিনি ভারতে পৌঁছেছেন। তাই তিনি এই দেশের নাম দিলেন ইণ্ডিজ।

আদিম অধিবাসীরা এসে তাঁদের পুজো করতে লাগল। তাদের ধারণা এঁরা সবাই দেবতা, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। জাহাজগুলোর পাল দেখে তাদের ধারণা হল যে এগুলো সাদা ডানাওলা একরকম বিরাট পাখি।

আমেরিকার মাটিতে কলম্বাসের প্রথম পদক্ষেপ

ওয়াটলিং দ্বীপেই সম্ভবতঃ কলম্বাস প্রথম নেমেছিলেন। এখান থেকে তিনি কিউবা, হাইতি ও আরও কয়েকটি দ্বীপে গিয়েছিলেন। হাইতিতে একটা দুর্গ তৈরি করে কিছু লোক সেখানে রেখে তিনি স্পেনে ফিরে এলেন। স্পেনে তিনি তখন কত খাতির-যত্ন পেলেন।

তারপর তিনি আরও তিনবার আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক লোক হিংসা করে কলম্বাসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনেছিল। ফলে কলম্বাসকে কিছুকাল কারাগারে কাটাতে হয়েছিল কিন্তু পরে মুক্তি পেলেও তাঁর শেষ জীবন দারিদ্র্যে কাটে। স্পেন একটি ছোট্ট দেশ। তার কাছে আমেরিকার মতো এত বড় দেশ একটা সম্পদ্। কিন্তু জনমত কলম্বাসের এ মহান্ কীর্তির কোন সম্মানই দিল না। ১৫০৬ গ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে ভালাডোলিডে (Valladolid) তিনি মারা যান।

॥ আমেরিগো ভেসপুচি ॥

ফ্লোরেন্সের একজন ঠিকাদার কলম্বাসের জাহাজে মালপত্র যোগান দিতেন। তাঁর নাম ছিল আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespuchi ১৪৫১-১৫১২ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনিও কলম্বাসের মতো জাহাজে করে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দেন। তিনি ভেনিজুয়েলা পৌঁছে তটভূমি ধরে ভ্রমণ করেন। নানা অলীক কাহিনীর বিবরণে পূর্ণ বই প্রকাশ করায় সবাই তাঁকে খুব সম্মান করতে থাকেন। তিনিই প্রথমে ঘোষণা করেন যে এ একটা নতুন দেশ ও এটা ভারত নয়। তাঁর ভাগ্য কলম্বাসের চেয়ে ভাল ছিল। তাই কলম্বাসের আবিষ্কৃত দেশ তাঁর নাম বহন করে হয়ে উঠল আমেরিকা। আসলে কিন্তু আমেরিকার নাম হওয়া উচিত ছিল 'কলম্বিয়া'।

দেশ তো আবিষ্কৃত হল। কিন্তু এর কোথায় কি আছে, এবার তা জানতে হবে। ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তমী হেনরী (Henry VII--১৪৫৭-১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ) এক জেনোয়াবাসীর উপর সে ভার দিলেন। লোকটির নাম ক্যাবট। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে বাস করছিলেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম হেনরীর সাহায্যে তিনি ভাইকিংদের অধিকার-করা আমেরিকার এলাকায় এলেন। তাঁর ছেলে সেবাস্টিয়েন এদেশে বণিকদের সঙ্গে মিশে তাদের দলপতি হয়ে উত্তর-পূর্ব পথে রাশিয়া যাবার পথ খুঁজতে লাগলেন। ক্যাবট উত্তর আমেরিকার প্রায় সবটাই আবার আবিষ্কার করলেন।

কলম্বাসের সহকারী একটি লোক ব্রাজিল আবিষ্কার করলেন। লোকটির নাম পিঁজোঁ (Pinzon —১৪৬০-১৫২২ খ্রীষ্টাব্দ)।

॥ স্পেনের উদ্যম ॥

অনেক দেশ ও দ্বীপ আবিষ্কার হচ্ছে এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দলে দলে দুঃসাহসী অভিযানকারীরা জাহাজে পাল তুলে ভেসে চললো।

আমেরিগো ভেসপুচি

জুয়ান পনস্ দ্য লিওঁ (Juan Ponce de Leon) ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরিডা আবিষ্কার করে ফেললেন। এঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভাস্কো নুনেজ দ্য বালবোয়া (Vasco Nunez de Balboa—১৪৭৫-১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ) ড্যারিয়েন যোজক আবিষ্কার করলেন। তিনি আদিম অধিবাসীদের মুখে শুনলেন যে পশ্চিমে এক বিস্তীর্ণ জলরাশি আছে। তিনি এক ঘন জঙ্গলে ঢুকে একটা উঁচু গাছের মগডালে চড়ে দেখলেন প্রশান্ত মহাসাগর ধুধু করছে। তিনি এই মহাসাগর আর তার মাঝখানকার দ্বীপ ও দেশ সব কিছু স্পেনের নামে দাবি করলেন।

মেক্সিকোর আজটেক জাতির সম্পদ্ ও সভ্যতার কথা শুনে হারন্যাণ্ডো কর্টেজ (Hernando Cortez —১৪৮৫-১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) এসে ঐ দেশ জয় করেন।

এদিকে ফ্রান্সিসকো পিজারো (Francisco Pizarro —১৪৭০ ?-১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দ) গেলেন সোনার দেশ পেরুতে। বিশ্বাসঘাতকতা আর নৃশংসতার সাহায্যে পেরুর শেষ স্বাধীন ইন্‌কা (Inca) সম্রাট আতাহু আল্‌পাকে বন্দী ও বধ করে তিনি পেরু অধিকার করলেন। ফ্রান্সিসকো দ্য ওরেলানা (Orellana) আমাজন নদীর তীর ধরে এগিয়ে চললেন। হারন্যাণ্ডো দ্য সোটো (Soto) মেক্সিকো উপসাগর ও ওহিওর মধ্যের দেশ জয় করে আরকানসাসে পৌঁছে সেখানে মারা গেলেন।

॥ অন্যান্য অভিযান ॥

১৫৩৩ থেকে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সও এ-বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিল। জাক্ কার্তিয়ে (Jacques Cartier—১৪৯১-১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) উত্তর-পশ্চিমে তিনবার সমুদ্রযাত্রা চালান।

ব্রিটিশ অভিযানকারী স্যার হামফ্রে গিলবার্ট ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড দখল করেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। এটি ব্রিটিশদের আমেরিকার প্রথম উপনিবেশ। বাড়ি ফেরবার পথে তাঁর জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেল। জাহাজটির নাম ছিল 'স্কুইর‌্ল্' (কাঠবিড়াল)।

॥ হাডসন ও স্মিথ ॥

হেনরী হাডসন (Henry Hudson—মৃত্যু ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে) বহু দ্বীপদেশ আবিষ্কার করে অসম সাহসে ভর করে নোভায়া জেমলিয়ায় এসে পৌঁছলেন। তারপর চললেন হাডসন নদী ধরে,

পিজারো

পিজারোর অভিযান

॥ অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের কথা ॥

ব্যবসায়ীরা মসলাপাতির সন্ধানে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের খোঁজ পেয়ে যায়।

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন, ম্যাগেলান সেই মহাদেশ ঘুরে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পথ খুঁজে বার করেন। তারপর বড় বড় পালতোলা জাহাজ সেই পথ ধরে ভাসতে ভাসতে কত দ্বীপে উপস্থিত হয়ে সেখানকার মসলাপাতি দেশবিদেশে বিক্রি করে ধনী হয়ে ওঠে।

এই রকম বণিকদের কোনও জাহাজ সম্ভবতঃ ভুল পথে এসে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ভিড়েছিল। কোন্ দেশের নাবিক বা বণিকেরা এদেশ প্রথম আবিষ্কার করেছিল তা জানা যায় না। স্পেন, পোর্তুগাল, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স—সবাই এই দাবি করে থাকে। কিন্তু পোর্তুগিজ নাবিকদের দাবিই সংগত।

পোর্তুগিজ নাবিকরাই প্রথম এই বিরাট দ্বীপ দেখতে পায়। সে বোধ হয় ১৫২৪ থেকে ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

আবার এর আগেও একজন ফরাসী নাবিকের কথা শোনা যায়। এঁর নাম বিনো দ্য গোনেভিল

কিন্তু একটি উপসাগরে পৌঁছে তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর নামে সেটার নাম হয়েছে হাডসন উপসাগর।

জন স্মিথ (John Smith—১৫৭৯-১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ) আমেরিকায় আসেন ও ভার্জিনিয়া প্রদেশে প্রথম বসবাস করেন।

ড্রেক ও ম্যাগেলানও সমুদ্রযাত্রা করে প্রমাণ করলেন যে পৃথিবীটা সত্যিই গোল এবং আমেরিকা দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত নয়।

এই ভাবে বহু দুঃসাহসী নাবিক ও দেশ-আবিষ্কারকের চেষ্টায় বিরাট এক ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হল।

কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশ পৃথিবীর এক মহান্ শক্তি হয়ে উঠল।

স্কুইরল্ জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেল

(Binot del Gouneville). ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে এই নাবিক উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসবার সময়ে ঝড়ের মুখে পড়ে এক বিরাট দ্বীপে পৌছেন। তিনি সঙ্গে করে সেই দেশের একজন অধিবাসীকে নিয়ে এসেছিলেন।

গোনেভিল বলেন যে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় পৌছেছিলেন। আসলে কিন্তু তিনি মাদাগাস্কার ছাড়িয়ে যান নি।

এর পর পেরু থেকে পাঠানো হয় অ্যালভারো মেণ্ডানা ছ নেয়রাকে (Alvaro Mendana de Neyra). এঁর বাড়ি সারগোসায়। তাঁকে আদেশ দেওয়া হয় প্রশান্ত মহাসাগরে জলের উপর যে ডাঙা দেখবেন তাই অধিকার করবেন। এখন যা সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, সেখানে পৌছে তিনি একটা মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন ভেবে খুশী হলেন। মেক্সিকোতে কর্টেজ সোনার সন্ধান পেয়েছে শুনে এঁর মনে হল ইনিও এখানে সোনা পেয়ে যাবেন। মসলার সন্ধানে এসে সোনা! বড় সহজ কথা নয়!

পেরুতে ফিরে এলেন মেণ্ডানা। সেখানে এসে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গল্প ফাঁদলেন। তাঁর ধারণা এখানেই রাজা সলোমনের রত্নখনি আছে। এখান থেকে সোনা নিয়ে সলোমন জেরুজালেমের মন্দির তৈরি করেছিলেন।

এবার স্পেনবাসীরা গেল ঐদিকে সোনার সন্ধানে। তারা মার্কুয়েসাস দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করল।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথমদিকের যে মানচিত্র করা হয়েছিল তাতে কেবল পোর্তুগিজদের নামই ছিল। তা থেকে ফরাসী ও ওলন্দাজরা নকল করে নেয়। কিন্তু পোর্তুগিজ নাবিকটির কথা কেউ মনে করে রাখল না। এরপর একজন স্পেনবাসী এগিয়ে এলেন। নাম তাঁর পেড্রো ফার্নাণ্ডেজ কুইরোস (Pedro Fernandez Quiros). তিনি নিউ হেব্রাইডিস আবিষ্কার করেন—এর নামই তিনি অস্ট্রেলিয়া দেন।

১৫ বছর পরে ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে রবার্ট বার্টন (Robert Burton—১৫৭৭-১৬৪০ খ্রীস্টাব্দ) নামে এক সাহিত্যিক তাঁর বইয়ে ফার্নাণ্ডেজ কুইরোর আবিষ্কারের নাম দিলেন "টেরা অস্ট্রালিস ইনকগনিটা" (Terra Australis Incognita).

কিন্তু কুইরো অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন নি। এ কাজ করেছিলেন তাঁর একজন সহকারী। তাঁর নাম ছিল লুই ভেইজ ছ টরেস্ (Louis Vaez de Torres). নিউগিনির উপকূল ধরে তিনি ধীরে ধীরে ভয়ংকর বিপদে পূর্ণ পথ ধরে একটি প্রণালীতে পৌছান। এটা ছিল ৮০ মাইল চওড়া। এই প্রণালীর একদিকে নিউগিনি, অপর দিকে অস্ট্রেলিয়া। টরেসের জাহাজের খালাসীরা আর যেতে চাইল না। তিনি এই প্রণালীর অপরদিকে যেতেই পারলেন না। তাঁর ধারণা হল, ওপারে বড় বড় কতকগুলি দ্বীপ আছে। বর্তমানে যাকে কুইনসল্যাণ্ড বলে এগুলি তারই পাহাড়-পর্বত।

যখন টরেস জাহাজে করে এই প্রণালী দিয়ে যাচ্ছেন তখন ডয়ফেন নামে আর একটা ওলন্দাজ জাহাজও ঐদিকে যাচ্ছিল। ঐ জাহাজ ডাঙায় নঙ্গর করামাত্র আদিম অধিবাসীরা তাদের কয়েকজনকে তখনি মেরে ফেলল।

এর দশ বছর বাদে এক ওলন্দাজ জলদস্যু অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে পৌছলেন। তিনি একটা খুঁটিতে তাঁর ঝোল খাবার টিনের ডিশ পেরেক দিয়ে আটকে তাতে লিখে দিলেন তাঁর দলের নাবিকদের নাম। আর লিখলেন যে তাঁরা ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর এখানে পৌছেছেন।

১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন ভ্লীমিং নামে আর একজন ওলন্দাজ সেখানে হাজির হয়ে ডার্কের খুঁটি উপড়ে নিজের নাম-লেখা একটা সাইনবোর্ড সেখানে টাঙ্গিয়ে দিলেন।

এর পর বহু ওলন্দাজ নাবিক এলেন ও আদিম অধিবাসীদের হাতে অনেকে মারা পড়লেন আবার অনেকে কৌশলে পালিয়ে বাঁচলেন। অস্ট্রেলিয়ার অনেক অংশ তাঁরা আবিষ্কার করলেন। প্রায় একশ বছর ধরে এমনি চলল।

এর পর ইংরেজদের আগমন হয়। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ের (Captain William Dampier—১৬৫২-১৭১৫ খ্রীস্টাব্দ) একটা দল নিয়ে

আদিম অধিবাসীরা তাদের কয়েকজনকে মেরে ফেলল

জাহাজে চেপে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে এলেন। এ যাত্রায় তাঁরা লেভেক্ (লেভেক্ অন্তরীপ) পর্যন্ত পৌঁছলেন। এগার বছর বাদে তিনি আবার এলেন 'রোবাক্' জাহাজে চেপে তার ক্যাপ্টেন হয়ে। এবার উত্তর-পশ্চিম উপকূল ধরে তিনি অভিযান চালালেন। ড্যাম্পিয়ের একটা বইয়ে তাঁর সেই অভিযানের কথা লিখে গেছেন।

১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে ড্যাম্পিয়েরের অভিযানে এক নাবিক ছিলেন আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক (Alexander Selkirk—১৬৭৬-১৭২১ খ্রীষ্টাব্দ)। অবাধ্যতার জন্য ড্যাম্পিয়ের তাঁকে জুয়ান-ফার্নাণ্ডেজ নামে একটা নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে যান। সেখানে তাকে একেবারে একা থাকতে হয় চার বছর। তার কথা শুনে ইংরেজ (লেখক) ডিফো (Daniel Defoe) তাঁর বিখ্যাত বই 'রবিনসন ক্রুসো' লেখেন।

ড্যাম্পিয়ের অস্ট্রেলিয়ার যা বিবরণ দিয়েছেন তাতে মনে হয় দ্বীপটি মরুভূমি বিশেষ, এর মাটিতে কিছুই ফলে না, উপকূলগুলি ভয়ংকর বিপদসংকুল আর এখানে ভূতপ্রেত, দৈত্যদানাদের আস্তানা।

এর পর এলেন ইয়র্কশায়ারের এক যুবক। নাম ক্যাপ্টেন জেমস কুক (Captain James Cook—১৭২৮-১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি খুব সাহসী ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বহু অংশ তিনি আবিষ্কার করেন। নিউজিল্যাণ্ডের চারদিক্ তিনি প্রথম জাহাজে করে ঘুরে আসেন। এবার অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পুব উপকূল ধরে যেতে যেতে তিনি আবিষ্কার করলেন যে এ অঞ্চল পশ্চিমের মতো বন্ধ্যা নয়, এ অঞ্চল ফলেফুলে ভরা। তিনি এ অঞ্চলের নাম দিলেন 'নিউ সাউথ ওয়েলস'।

কুক আরও খবর আনলেন যে অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত নয়।

তখন পর্যন্ত অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চল অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল। পরে স্কট, আমুণ্ডসেন ও শ্যাকলটন এই ভূভাগে অভিযান চালিয়ে এর খবর পৃথিবীর লোকদের এনে দেন।

প্রশান্ত মহাসাগর ও অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে বহু খবর কুক পৃথিবীর লোকদের এনে দিয়েছেন। সমুদ্র-যাত্রায় যে সব রোগ হয় কুক তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্কার্ভি রোগে বহু নাবিক মারা পড়ত।
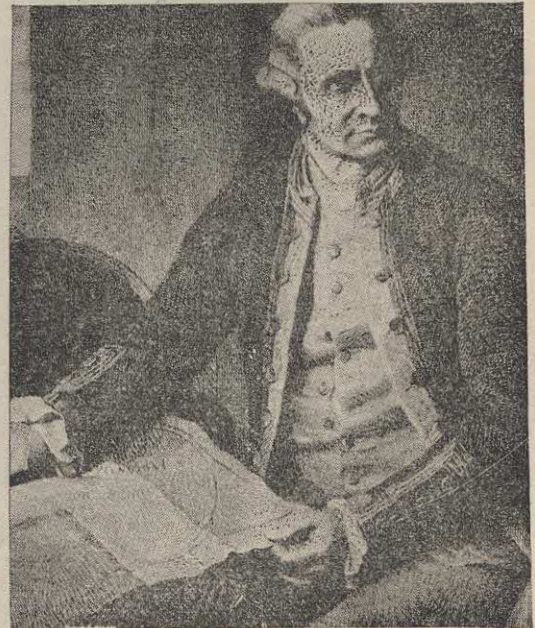
ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ কুক

তিনি লেবুর জল ও প্রচুর টাটকা শাক-সবজি খাইয়ে বহু নাবিককে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা করেন। ম্যাগেলানের মতো তিনিও হাওয়াই দ্বীপে জংলীদের বর্শায় বিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান।

তারপর কয়েকজন ফরাসী নাবিকও অস্ট্রেলিয়ার অভিযানে এসেছিলেন।

॥ আফ্রিকায় নানাদেশ আবিষ্কার ॥

আফ্রিকা মহাদেশের ভিতরে কোথায় কি আছে তা ইওরোপে কেউ বড় একটা জানত না। এর উত্তর উপকূল ছাড়া ভিতরে যাবার বড় একটা চেষ্টাও কেউ করে নি। একে বলা হতো Dark Continent (অজানা মহাদেশ)।

কার্থেজের হ্যানিবল, মিশরের ক্লিওপেট্রা, গ্রীকরা কিংবা রোমানরাও কোনদিন এর অভ্যন্তরে অভিযান চালায় নি।

যীশু জন্মাবার প্রায় ৬০০ বছর আগে মিশরের রাজা নেকো (Necho) ফিনিশিয়ার নাবিকদের একবার এর উপকূল বরাবর ঘুরে আসতে পাঠান।

ক্রীতদাস ধরে এনে বিক্রি করত

তারাই হয়তো রাজা সলোমনের রত্নখনির সন্ধান পেয়েছিল।

আফ্রিকার গরিলা, বেঁটে বুশম্যান এসবদের কথা আফ্রিকার প্রাচীন লোকেরা জানত। কার্থেজের এক নাবিক আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে জাহাজে যেতে যেতে গরিলা দেখেছিল আর তাদের ঐরকম নাম করেছিল। কিন্তু বাইরের লোকে অনেককাল গরিলার খবর পায় নি।

রাজা সলোমনের স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়েছিল

আফ্রিকার নরখাদক মানুষদের কথা ইওরোপে পৌঁছলে সবাই আফ্রিকার নামে ভয়ে কাঁপত।

আফ্রিকায় যাঁরা অভিযান চালিয়েছিলেন তাঁদের দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একদল হলেন খ্রীস্টান ধর্মযাজক আর একদল হলেন স্পেন ও পোর্তুগালের ক্রীতদাস ব্যবসায়ী। এরা আফ্রিকার উপকূল থেকে দলে দলে মানুষ ধরে এনে জাহাজ ভরতি করে নিয়ে গিয়ে আমেরিকায় বড় বড় চাষীদের কাছে বিক্রি করতো। তারা তাদের ক্রীতদাস হয়ে সারা-জীবন গোরু-ছাগলের মতো প্রভুর হয়ে খাটত। তাদের ছেলেমেয়েরাও তাদের প্রভুর ক্রীতদাস হয়ে জীবন কাটাত। আফ্রিকার পূর্ব

হীরে, জহরত, সোনাদানা নিয়ে আসত

উপকূলে আরবরা ঠিক এইভাবেই আফ্রিকার লোকদের ধরে নিয়ে দাসব্যবসা চালাত। আফ্রিকার মানুষদের বলা হয় কাফ্রী বা নিগ্রো।

এই ঘৃণ্য ব্যবসায়ে ইওরোপের সব দেশ, বিশেষ করে ফ্রান্স, পোর্তুগাল, ইংল্যাণ্ড ও স্পেন লিপ্ত হয়ে পড়ে। আফ্রিকা ছিল তাদের লুটের ভাণ্ডার। তারা আদিম অধিবাসীদের ঠকিয়ে চিনি, নুন, পুঁথির মালা, আয়না—এই সবের বদলে হীরে, জহরত, সোনাদানা নিয়ে আসত।

॥ জেম্‌স ব্রুস ॥

জেম্‌স ব্রুস (James Bruce—১৭৩০-১৭৯৪) নামে একজন পণ্ডিত ও ব্যবসায়ী ছিলেন প্রকৃতিতে ভাইকিংদের মতোই দুঃসাহসী। তিনি গেলেন আবিসিনিয়ায়। আবিসিনিয়ার লোকেরা তাঁকে রাজা বলে সম্মান করতে লাগল। তাঁর কথায় এরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শিখল। কিন্তু ব্রুস যখন নীল নদের উৎপত্তি-স্থলের সন্ধানে গেলেন তখন আবিসিনিয়ার লোকেরা তাঁর শত্রুতা করতে লাগল। তিনি এক দেশীয় রাজকুমারীর রোগ আরোগ্য করে রাজার সাহায্য লাভ করলেন।

ব্রুসের একটা বন্দুক ছিল। এদেশের লোক বন্দুক দেখে নি। ব্রুস বহু পাখি মেরে নামালেন। তারা তাঁকে জাদুকর মনে করে খাতির করতে লাগল। ব্রুস নীল নদের একটি শাখা—The Blue Nile-এর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করলেন।

চার বছর ধরে অভিযান চালিয়ে ব্রুস ফিরে এলেন। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। কত বিপদে তিনি পড়েছিলেন—সে-সব তিনি একখানা বইয়ে লিখে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বইয়ের কাহিনীকে গল্পকথা বলে সবাই অবিশ্বাস করল।

॥ মাঙ্গো পার্ক ॥

লোকে অবিশ্বাস করলেও এসব কাহিনী অনেক লোককে অনুপ্রাণিত করল। যাঁদের মধ্যে কৌতূহল জাগাল, তাঁদের মধ্য থেকে এগিয়ে এলেন মাঙ্গো পার্ক (Mungo Park—১৭৭১-১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁর বাড়িও ব্রুসের মতো স্কটল্যাণ্ডে। ইনি আদিম অধিবাসীদের ভাষা শিখে নাইজার নদীর উৎপত্তিস্থল আবিষ্কারের জন্যে একদিন বেরিয়ে পড়লেন।

আদিম অধিবাসীদের এক সর্দার সাদা চামড়ার লোকটিকে সন্দেহ করে তাঁকে বন্দী করে রাখে। কিন্তু তিনি ফন্দী করে পালালেন ও শেষ পর্যন্ত নাইজার নদীর উৎসে পৌঁছলেন। তিনি দেখলেন যে এই নদী পশ্চিমে না গিয়ে পুবে ঘুরেছে।

নদী দেখতে এসেছে শুনে আদিম অধিবাসীরা তো অবাক্। একজন বলে বসল, "তোমার দেশে কি নদী নেই? নদী দেখতে এদেশে এত কষ্ট করে এসেছ কেন?"

হায়! এই নদীর উৎসে পৌঁছতে মাঙ্গো পার্ক কী কষ্টই না করেছিলেন! হাঁটতে হাঁটতে তাঁর পায়ে ঘা হয়ে গিয়েছিল। তিনি একলা এসেছিলেন, তাঁর পোশাক ছিঁড়ে খুঁড়ে গিয়েছিল। তাঁকে পাগলের মতো দেখাচ্ছিল; পথে কতবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু

পদে পদে বিপদ তাঁকে তাড়া করেছে

সব সময়ে তিনি তাঁর ডায়েরি লিখে সে কাগজগুলো যত্নে রেখেছিলেন।

জ্বরে বেঁহুশ অবস্থায় তাঁকে একজন ইওরোপীয় দাস-ব্যবসায়ী কোন রকমে বয়ে জাহাজে নিয়ে আসেন। এইভাবে তিনি স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যান।

দেশে ফিরে বিয়ে করে তিনি সংসারী হন, কিন্তু আফ্রিকাকে তিনি ভোলেন নি। আবার তিনি আফ্রিকায় যান এবং টিমবাকটুর ২০০ মাইলের কাছাকাছি পৌঁছান।

পদে পদে বিপদ তাঁকে তাড়া করেছে। তিনি ৪৫ জন সঙ্গী নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে মোটে ৭ জন প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিল।

স্থানস্থাণ্ডিক থেকে তাঁর কাগজপত্র তিনি ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু তিনি আর দেশে ফেরেন নি। অজানা নাইজার নদীর উৎস সন্ধানে এসে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁকে জংলীরাই মারল কি তিনি অপঘাতে মারা গেলেন তা কেউ জানতে পারে নি।

॥ রবার্ট মোফাট্ ॥

অভিযানের পর অভিযান চলতে থাকল। একটু একটু করে আফ্রিকার কথা লোকে জানতে লাগল।

এবার এলেন রবার্ট মোফাট্ (Robert Moffat—১৭৯৫-১৮৮৩). তিনি দেশ-আবিষ্কারক নন, তিনি একজন ধর্মপ্রচারক। কেপ টাউন থেকে তিনি ভ্রমণ শুরু করলেন। এক রাতে তিনি এক বুয়রের (Boer, অর্থাৎ ওলন্দাজ জাতীয় উপনিবেশকারী) গোলাবাড়িতে আশ্রয় নিলেন। এই বুয়রের অনেকগুলি ক্রীতদাস ছিল। এই বুয়রের ঘরে তিনি প্রার্থনার ব্যবস্থা করেন। এইভাবে শুরু হল তাঁর খ্রীস্টধর্ম প্রচার।

গ্রেট নামাকোয়াল্যাণ্ডের উষর বনভূমি পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেন। বেচুয়ানাল্যাণ্ডের কুরুমানে তিনি জেঁকে বসে খ্রীস্টধর্মের মহিমা বুঝিয়ে সেই রক্তলোলুপ হিংস্র মানুষদের সভ্যতার আলো দেখান।

॥ ডেভিড লিভিংস্টোন ॥

রবার্ট মোফাট্ আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার অসভ্য জংলীদের কি ভাবে সভ্য করছেন ক্রমে সে কাহিনী ইংল্যাণ্ডে এসে পৌঁছল। তখন স্কটল্যাণ্ডের এক কাপড়ের কলে ডেভিড লিভিংস্টোন (David Livingstone—১৮১৩-১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ) কাজ করছেন। কাপড়ের কলে সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করার পরেও তিনি পড়াশুনা করতেন। মানুষকে ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত করা তিনি তাঁর পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন।

রবার্ট মোফাট্ খ্রীষ্টধর্মের মহিমা বুঝিয়ে অসভ্য মানুষদের সভ্যতার আলো দেখান
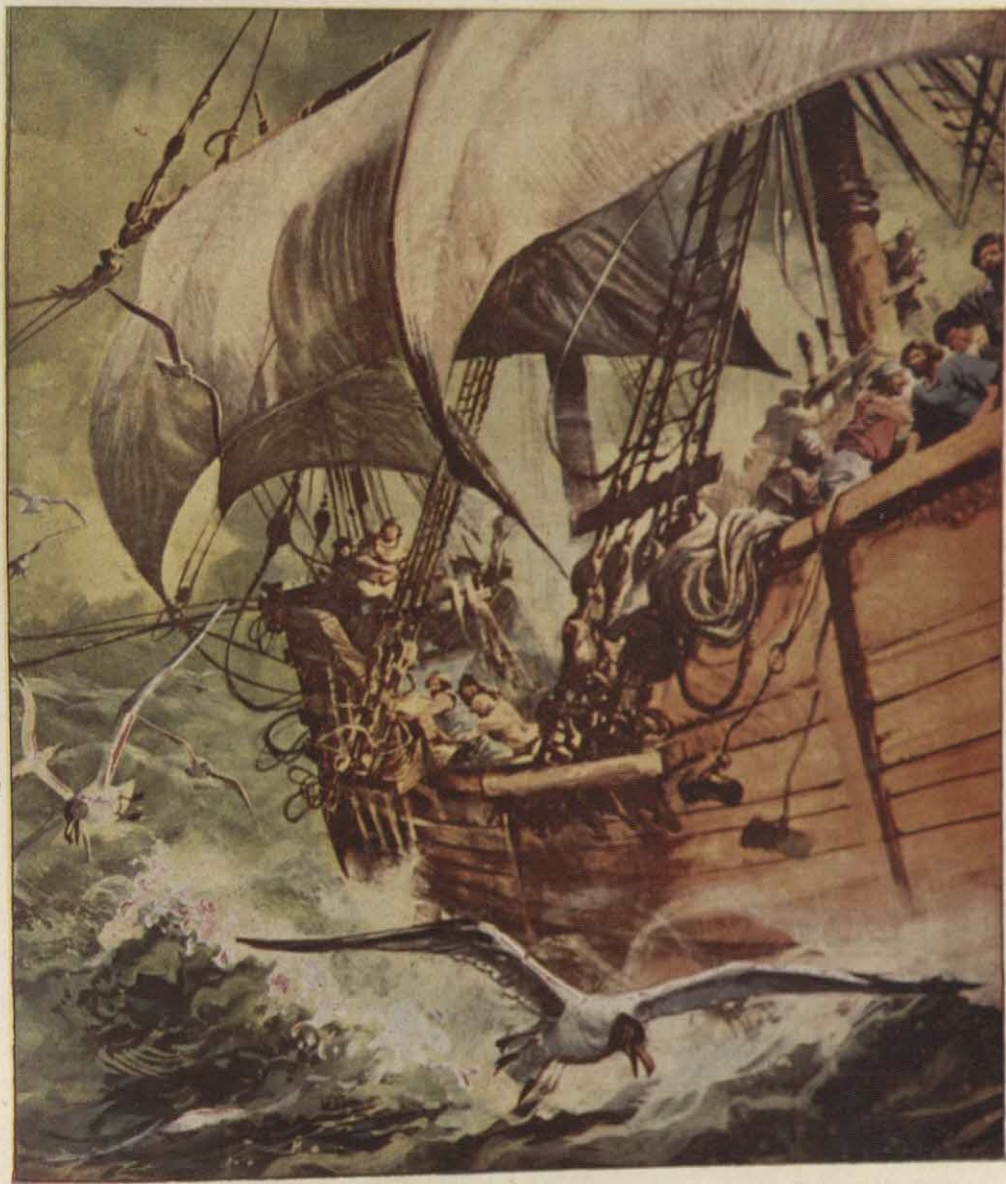
কলম্বাস পাখির ঝাঁক দেখে বুঝলেন কাছেই কোথাও ডাঙা আছে।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কথাঃ

[কলম্বাস পাখির ঝাঁক দেখে বুঝলেন কাছেই কোথাও ডাঙা আছে।]

ক্রিস্টোফার কলম্বাস (Christopher Columbus) একজন প্রসিদ্ধ ইতালীয় নাবিক। ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনোয়ায় তাঁর জন্ম হয়, মৃত্যু হয় ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে। স্পেনের রাজদম্পতি ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলার সহায়তায় তিনি ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সমুদ্রযাত্রা করেন। প্রথমে তিনি কিউবা, বাহামা প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার করেন এবং ক্রমশঃ জ্যামেইকা (১৪৯৮ খ্রীঃ), উত্তর আমেরিকা ও ত্রিনিদাদ প্রভৃতি আবিষ্কার করেছিলেন।

তখনকার দিনে লোকেদের মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ। এ দেশ নানা সম্পদে ভরা। সেই চিন্তা করে তারা ভারতবর্ষে আসতে চাইত।

কলম্বাস ভারতবর্ষে আসবার জন্যেই বেরিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর জাহাজ আমেরিকার দিকে যায়। বহু দিন কূলহীন জলরাশির উপর দিয়ে যেতে যেতে তাঁর সঙ্গের লোকজন হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁরা কলম্বাসকে আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে যেতে বলেন। কলম্বাস চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু হতাশ হন নি। শেষে একদিন পাখির ঝাঁক দেখে কলম্বাস ও তাঁর লোকেরা বুঝতে পারেন, কাছেই ডাঙ্গা আছে। তাঁদের মনে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কলম্বাসের জাহাজে চিন্তিত লোকজন বাইরে সমুদ্রের জলের উপরে উড়ন্ত পাখির ঝাঁক।

তাঁর ইচ্ছে ছিল রবার্ট মোফাট যেমন আফ্রিকায় ধর্মপ্রচার করছেন, তিনিও তেমনি চীনে গিয়ে ধর্মপ্রচার করবেন। কিন্তু চীনে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসক, ধর্মপ্রচারক ও দেশ-আবিষ্কারকরূপে আফ্রিকায় উপস্থিত হলেন।

ট্রান্সভালে তিনি বুয়রদের কাছে বাধা পেলেন। সেখান থেকে উত্তরে মোফাটের বাড়ির দিকে গেলেন। পথে এঁগামি (Ngami) হ্রদ আবিষ্কার করে পুব থেকে পশ্চিম দিকে আফ্রিকার মাঝখান দিয়ে ভ্রমণ করবার উদ্যোগ করলেন।

এই ভয়ংকর দেশে, এরকম ভীষণ একটা অভিযানের কথা ভাবা বড় কম সাহসের কথা নয়! চারদিকে নিবিড় বন, অসভ্য নরখাদক ভীষণ হিংস্র জাতের বাসস্থান চারদিকে, ভয়ংকর সব জন্তু বনে বনে হানা দিয়ে ফিরছে—নানারকম রোগ, মড়ক, খাদ্যাভাব—কিন্তু লিভিংস্টোনের অসীম মনোবল ছিল। চার বছর ধরে এইসবের মধ্য দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন।

তাঁর ব্যবহার ছিল অমায়িক। আদিম অধিবাসীদের তিনি বশীভূত করে ফেললেন। রোগে চিকিৎসা করে, ভগবানের শান্তিময়ী বাণী শুনিয়ে তিনি নিরাপদে তাদের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলেন। এই ভ্রমণের সময় তিনি জাম্বেসী নদীর গতিপথে পৃথিবীর এক অতি আশ্চর্য জলপ্রপাত আবিষ্কার করলেন ও তার নাম দিলেন ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। পরে সেখানে তাঁর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন কিন্তু আবার কয়েকবছর পরে আফ্রিকায় চলে যান। তাঁর চেষ্টা কতকাংশে সফল হয়েছিল। দাস-ব্যবসা ছাড়া বাণিজ্য করার যে কত সুযোগ এদেশে আছে তার খবর তিনিই প্রথম সভ্যজগৎকে জানিয়েছিলেন।

কিন্তু সে দেশের আবহাওয়া তাঁকে রুগ্‌ণ করে তুলল। রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে তিনি সে দেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। পাঁচ বছর চেষ্টা করে তিনি সিওয়া ও নায়াসা হ্রদ আবিষ্কার করেন ও জাম্বেসী নদীর তীর ধরে ভ্রমণ করেন। তারপর একটি স্টিমারে
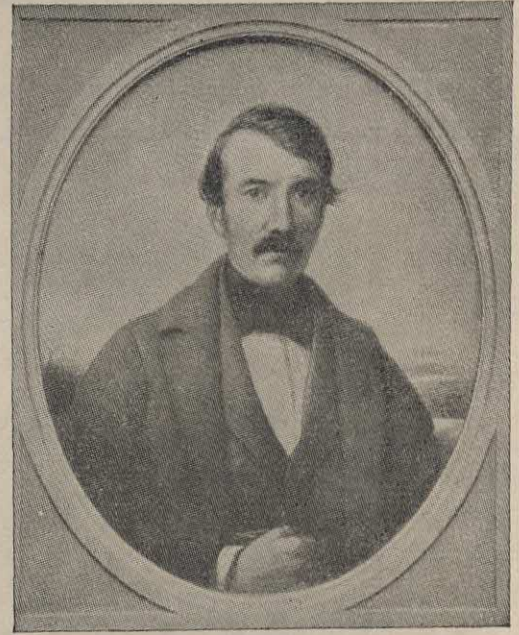
ডেভিড লিভিংস্টোন

করে বোম্বাই পৌঁছান। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্রামের জন্যে তিনি আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি আফ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি জাঞ্জিবার পৌঁছান। এপ্রিল মাসে তিনি আবার আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এই ভ্রমণ যেমন দীর্ঘ, তেমনি কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। রোগে লিভিংস্টোন শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আরব দাস-ব্যবসায়ীরা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা শুরু করে দেয়। তারা তাঁর কাজে বাধা দিতে থাকে ও তাঁকে মারবারও ষড়যন্ত্র করে। দু'বছর ভীষণ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তিনি মেউরু ও ব্যাঙ্গেউরু নামে দু'টি হ্রদ আবিষ্কার করেন। তখন পর্যন্ত আফ্রিকার এ অঞ্চল ম্যাপে খালি ছিল। তিনিই কঙ্গো নদীর অববাহিকা আবিষ্কার করেন। তিনি অবশ্য জানতেন না যে এটা নীল নদ নয়।

ক্রমে রোগে আর খাদ্যাভাবে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। সঙ্গে যে সব ওষুধপত্তর এনেছিলেন তা ফুরিয়ে গেল।

তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন

এ অবস্থায় পথ চলা সত্যি দুষ্কর। শরীর দুর্বল, হাত-পা নাড়তে পারেন না, তার উপর রোগের যাতনা! উজিজি পৌঁছে তিনি জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্যে স্ট্যানলী বলে একজন সাহসী ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল। জংলীদের কাছে খবর নিয়ে স্ট্যানলী শেষ পর্যন্ত যখন লিভিংস্টোনের কাছে পৌঁছলেন তখন তাঁর অবস্থা জ্বরে কাহিল। স্ট্যানলীর কথা পরে বলছি।

কিছুদিন বিশ্রাম লওয়ার পর লিভিংস্টোন সুস্থ হয়ে উঠলেন। আবার দুর্গম পথ ধরে, নদী পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মাইলের পর মাইল চলতে লাগলেন। এবার ইলালা (Ilala)-য় এসে পৌঁছলেন।

এখানে তাঁর আবার জ্বর হল। কাজেই তাঁকে আবার বিশ্রাম নিতে হল।

॥ লিভিংস্টোনের মৃত্যু ॥

তাঁর সঙ্গে ছিল একটি জংলী দল। এরা তাঁর সব কাজে তাঁকে সাহায্য করত। তিনি এদের বললেন, "এখানে একটা কুঁড়ে বেঁধে দাও, আমি সেই কুঁড়েতে মরব। আমার দারুণ শীত করছে। কুঁড়েতে বেশী করে শুকনো ঘাস দিও।" ক্লান্ত হয়ে তিনি ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে তাঁকে ডাকতে এসে জংলীরা দেখল, সাহেব মারা গেছেন। বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সেখান থেকে জাঞ্জিবার কয়েক শ' মাইল। তবুও তাঁর ভৃত্যরা তাঁর মৃতদেহ খাটিয়ায় করে সেখানে বয়ে নিয়ে চলল।

জংলীদের দেশ দিয়ে সাহেবের মৃতদেহ নিয়ে গেলে তাদের অমঙ্গল হবে, এই জন্যে জংলীরা বাহকদের বাধা দিল। বাহকরা ফন্দি করে একটা বোঁচকা দেখিয়ে বললে যে মৃতদেহ এই বোঁচকায় আছে। আর সেই বোঁচকাটা মাটিতে পুঁতে দিল।

এইভাবে জংলীদের ফাঁকি দিয়ে তারা লিভিংস্টোনের মৃতদেহ জাঞ্জিবারে সাহেবদের কাছে পৌঁছে দিল। জাঞ্জিবার থেকে সেই মৃতদেহ ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ওয়েস্টমিন্‌স্টার অ্যাবিতে সমাধিস্থ করা হল। ওদেশে সেটা খুব বড় সম্মানের কথা।

জংলীরা দেখল, সাহেব মারা গেছেন

॥ হেনরী মর্টন স্ট্যানলি ॥

লিভিংস্টোনের খবর না পেয়ে তাঁর বন্ধুরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা আমেরিকার এক সংবাদপত্রের মালিক হেনরী মর্টন স্ট্যানলি (Henry Morton Stanley—১৮৪১-১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ) নামে এক সাহসী যুবককে তাঁর খোঁজে পাঠালেন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে স্ট্যানলি এসে হাজির হলেন জাঞ্জিবারে। অনেক খুঁজে খুঁজে আর অনেক কষ্ট করে স্ট্যানলি উজিজি পৌঁছলেন। সেখানে লিভিংস্টোনের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। আনন্দে স্ট্যানলি কেঁদে ফেললেন। তিনি সসম্ভ্রমে মাথার টুপি খুলে বললেন, "Dr. Livingstone, I presume." মনে হচ্ছে আপনিই ডাক্তার লিভিংস্টোন? এই কথাটি স্মরণীয় হয়ে আছে।

লিভিংস্টোন একটু সেরে উঠে স্ট্যানলির সঙ্গে অভিযানে বেরুলেন। তাঁরা ট্যাঙ্গ্যানিকা হ্রদের উত্তর সীমানায় পৌঁছলেন। তাঁরা দেখলেন যে নীলনদের সঙ্গে এই হ্রদের কোন সম্পর্ক নেই।

এরপর লিভিংস্টোন অন্য পথ ধরলেন। স্ট্যানলি দেশে ফিরে গেলেন।

স্ট্যানলি আবার দ্বিতীয় অভিযানে আফ্রিকায় এলেন। তিনি ট্যাঙ্গ্যানিকার চারপাশে ঘুরলেন এবং অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে কঙ্গো নদী যেখানে তার জলধারা বয়ে আটলান্টিকে নিয়ে ফেলছে সেইখানটা আবিষ্কার করলেন। এর জন্যে তাঁকে অনেক বাধা অনেক বিপদের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এছাড়া এমিন পাশাকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে তিনি ভ্রমণ করেন। এমিনকে উদ্ধার করবার জন্যে তাঁর দলের বহু লোক মারা যান।

॥ এমিন পাশা ॥

এমিন পাশার আসল নাম এডওয়ার্ড শ্লিৎসার (Edward Schnitzer). তিনি জাতিতে ইহুদী ও সাইলিসিয়ার অধিবাসী। তাঁর পেশা ছিল ডাক্তারি। তিনি তুর্কীদের ধর্ম গ্রহণ করেন আর তুর্কী বেশভূষা পরে তুর্কীদের সব কিছু রীতিনীতি মেনে চলেন। তিনি মিশরে গিয়ে একটি উঁচুদরের চাকরি পান। জেনারেল গর্ডন তাঁকে আফ্রিকার ইকোয়েটোরিয়াল প্রভিন্সের শাসনকর্তা করে দেন। এগার বছর তিনি কালো মানুষদের সঙ্গে জীবন কাটান। তিনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন।

দাস-ব্যবসায়ীরা এমিন পাশার চিরশত্রু ছিল। স্ট্যানলি গিয়ে শত্রুদের হাত থেকে অনেক কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করে আনলেন, কিন্তু তিন বছর বাদে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তঘাতকরা তাঁকে হত্যা করল।

॥ স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন ও জন হ্যানিং স্পেক ॥

স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন (Sir Richard Francis Burton—১৮২১-১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ) ও জন হ্যানিং স্পেক (Speke, ১৮২৭-১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) বহু হ্রদ ও স্থান আবিষ্কার করে তাদের বিবরণ সভ্য জগৎকে জানিয়েছেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁদের নীলনদের উৎসের সন্ধানে পাঠালেন। দু' বছর দারুণ কষ্ট সহ্য করে অভিযান চালিয়ে তাঁরা ট্যাঙ্গ্যানিকা হ্রদ আবিষ্কার করেন।

বাড়ি ফেরবার পথে দু'জনে দু'পথে যান। স্পেক্

এমিন পাশা কালো মানুষদের সঙ্গে জীবন কাটান

ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা হ্রদ আবিষ্কার করেন। এবার দুই বন্ধুতে মন কষাকষি ঝগড়া ও ছাড়াছাড়ি হয়। স্পেক অন্য একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী জেমস অগাস্টাস গ্র্যাণ্টের সঙ্গে অভিযানে বেরিয়ে ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জাই যে নীলনদের উৎস তা অভ্রান্তভাবে আবিষ্কার করেন।

এইভাবে এঁরা একের পর এক দুঃসাহসী অভিযান চালিয়ে মৃত্যুবরণ করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত অজানা আফ্রিকার বিবরণ সভ্য মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

ঠাণ্ডায় জমে তিনটি জাহাজের যাত্রীরা মারা গেল

॥ নর্থ-ওয়েস্ট প্যাসেজ ॥

পুবের দেশ সোনারুপোর দেশ, হীরে-জহরতের দেশ, দামী মসলাপাতির দেশ। পশ্চিমী বণিকেরা অস্থির হয়ে উঠল এদেশে যাবার সোজা পথ বার করতে।

কলম্বাস পুবদেশের পথ খুঁজতে আমেরিকায় এসে পৌঁছলেন। ক্যাবটের চেষ্টা বিফল হল।

ড্রেক (Sir Francis Drake, ১৫৪৫-৯০) ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জাহাজ 'গোল্ডেন হাইণ্ড'-এ চড়ে যাত্রা করলেন। ক্রমে তিনি ম্যাগেলান প্রণালী দিয়ে কেপ হর্ন পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়লেন। আমেরিকা মহাদেশ যে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত নয় এ কথা তিনিই প্রমাণ করলেন।

ড্রেক জাহাজে চড়ে যাত্রা করলেন

পথে তিনি স্পেনের একটি জাহাজ লুট করেন। তিনি একেবারে দক্ষিণে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু নাবিকরা কিছুতেই সেদিকে যেতে চাইল না। তাদের বিশ্বাস এ অঞ্চলে দৈত্যদানবদের বাস। কাজেই ড্রেক প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে চলতে চলতে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন।

তারপর কেউ কেউ মনে করলেন যে উত্তর আমেরিকার উত্তরে যে সমুদ্র, তা ধরে পশ্চিমে গেলে প্রাচ্য দেশে গিয়ে পৌঁছনো যেতে পারে। এই পথের নাম দেওয়া হল নর্থ ওয়েস্ট প্যাসেজ। তারপর শুরু হয়ে গেল এই পথ খোঁজা। ইংল্যাণ্ড থেকে জন ক্যাবট (Cabot) আর তাঁর ছেলে সিবাস্টিয়ান ক্যাবট ঐ দিকে গিয়ে আমেরিকার উত্তর প্রান্তের অনেকগুলো অজানা জায়গার খোঁজ পেলেন।

সার হিউ উইলোবি (Sir Hugh Willoughby—১৫০০-১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) ইংল্যাণ্ড থেকে গেলেন উত্তর-পুবে গিয়ে পুবদেশে পৌঁছবার কোনও পথ পাওয়া যায় কিনা, তা দেখতে। ল্যাপল্যাণ্ডের উপকূলে পৌঁছে তাঁরা ঠাণ্ডায় জমে মারা গেলেন। তিন বছর বাদে তাঁদের সন্ধান পাওয়া গেল। জাহাজে যিনি যেখানে ছিলেন সেই অবস্থায় বরফে জমে গেছেন।

উইলোবি টেবিলের সামনে কাগজপত্র নিয়ে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর ডায়েরিতে শেষ লেখা দেখা গেল, "অচেনা, অদ্ভুত যত জন্তু আমাদের জাহাজের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে।"

এরপর মার্টিন ফ্রবিশার (Martin Frobisher—১৫৩৫ ?—১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) আবার উত্তর-পশ্চিমের পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় ড্রেকের অভিযানের পঞ্চাশ বছর পরে বেরুলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত লাব্রাডর পৌঁছলেন।

ফ্রবিশার তিনটি জাহাজ নিয়ে জমাট বরফ ও ভাসন্ত বরফস্তূপের রাজ্যে পৌঁছলেন। সবসুদ্ধ ৩৫ জন নাবিক সেই তিনটি জাহাজে ছিলেন। ফ্রবিশারের ইচ্ছা ছিল চীনদেশে গিয়ে প্রচুর সোনা-দানা আনবেন। একটি দ্বীপে কিছু ধাতুর তাল পেলেন। তাই সোনা মনে করে জাহাজ বোঝাই করলেন। একটা নার্হোয়াল (narwhal—একধরনের তিমি)-এর খড়্গ পেয়ে তিনি মনে করলেন যে এটা ইউনিকর্নের শিং। দেশে সব নিয়ে এলেন। সবই বাজে জিনিস। ধাতুর তালগুলো সোনা নয়।

কোথায় তিনি চীনে পৌঁছবেন, তা না হয়ে তিনি এসে পড়লেন এস্কিমোদের দেশে। তাঁকে এস্কিমোরা সীল মাছের টোপ গাঁথা বঁড়শি দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেছিল—তাঁকে ভেবেছিল যে একটা অদ্ভুত মাছ।

মার্টিন ফ্রবিশার

॥ জন ডেভিস ॥

১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ৩৫ বছরের এক ব্যক্তিকে গ্রীনল্যাণ্ডে পাঠান হয়েছিল। তাঁর নাম জন ডেভিস (John Davis—১৫৫৫-১৬০৪ খ্রীঃ). গ্রীনল্যাণ্ডে তখন এস্কিমো ও ভাইকিংরা এক সঙ্গে বসবাস করছে। তিনি কেপ ফেয়ারওয়েল ঘুরে সারা দক্ষিণ দেশ বেড়িয়ে ক্রমশঃ উত্তর দিকে এলেন। তিনি কত দ্বীপ ও শান্ত সমুদ্র দেখলেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার তিনি এ অঞ্চলে গেলেন এবং গ্রীনল্যাণ্ডের পাশে একটি প্রণালী আবিষ্কার করলেন। তাঁর নামেই প্রণালীটির নাম হল ডেভিস প্রণালী।

তিনি ৭৩° অক্ষাংশ উত্তরে যান, কিন্তু আদিম অধিবাসীদের হাতে মারা পড়েন।

ডেভিস উত্তর মেরু সম্বন্ধে কিছু ভুল সংবাদ এনে দেন। তিনি বলেন যে উত্তর মেরুর সমুদ্রে বরফ নেই, এখানকার আবহাওয়া সুন্দর আর এদেশ চিরস্থায়ী আলোর দেশ।

তিনি মেরু অঞ্চলে ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন।

॥ উইলিয়াম ব্যারেণ্টস ॥

তাঁর পরেই ওলন্দাজ উইলিয়াম ব্যারেণ্টস (William Barents—১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু) কোমর বেঁধে লেগে গেলেন পুবদেশের সহজ পথ আবিষ্কার করতে। পুবে ওলন্দাজদের বহু উপনিবেশ ছিল। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারেণ্টস সমুদ্রে ভাসলেন ও ১৭০০ মাইল সমুদ্রে ভ্রমণ করলেন। ৮১ বার উত্তর মেরু অঞ্চল ঘুরে কোথায় কি আছে ভাল করে লক্ষ্য করলেন। দ্বিতীয় বার অভিযানে তিনি স্পিটসবার্গেন (Spitsbergen) আবিষ্কার করলেন। কিন্তু ভুল করে এটিকে গ্রীনল্যাণ্ডের অংশ মনে করলেন। এরপর তিনি নোভায়া জেমলায়া (Novaya Zemlya)-র দিকে

উইলিয়াম ব্যারেণ্টস-এর সমুদ্রযাত্রা

গেলেন। সেখানে বরফ জমতে শুরু করায় তাঁকে শীতকালে সেখানে আটক থাকতে হল।

তাঁর সে অভিজ্ঞতার কথা যেমনি ভয়াবহ তেমনি আশ্চর্যের। তাঁরা কয়েকটি ভেসে-আসা কাঠ যোগাড় করে কুঁড়ে ঘর তৈরি করে তাতে বাস করতে লাগলেন। কাঠের তক্তার খাট তৈরি করে ১৮ জনের শোবার ব্যবস্থা করলেন। বরফে কুঁড়ে ঘরটি একেবারে ঢেকে দিল। শ্বেত ভালুক দলে দলে এসে ছাদ খুলে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ধোঁয়া বেরুবার জন্যে ছাদের উপর খালি পিঁপে দিয়ে যে চিমনি (chimney) করা হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে কয়েকজন উঠে ভালুকদের মেরে তাড়িয়ে দিলেন।

খাদ্যের অভাবে তাঁরা সে অঞ্চলের নীল শিয়াল মেরে তাদের মাংস খেতে লাগলেন আর তাদের চামড়ায় পোশাক তৈরি করে ব্যবহার করতে লাগলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যেই দু' আঙুল মোটা বরফ জমে গেল।

এমনি করে শীত কেটে বসন্তকাল এসে গেল। ব্যারেণ্টস দু'টি জাহাজে দেশের দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই তিনি মারা গেলেন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আর একজন অভিযানকারী নোভায়া জেমলায়া পর্যন্ত এসে এই কুঁড়ে ঘর দেখতে পান। কাঠের দেয়ালে তখনো ব্যারেণ্টসের ঘড়িটি টাঙানো ছিল। ২৭৪ বছর আগে ঘরে যেমন অনেক কিছু সাজানো ছিল তখনো তেমন সব ঠিকঠাক রয়েছে। এই অভিযানকারী ব্যারেণ্টসের ডায়েরির কতক অংশ উদ্ধার করে নিয়ে যান।

এর পর এলেন উইলিয়াম ব্যাফিন (William Baffin—১৫৮৪-১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ)। ইনি ব্যাফিনল্যাণ্ড আবিষ্কার করেছিলেন। ব্যাফিন terrestrial magnetism সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছিলেন। এঁর উদ্দেশ্যে ছিল কানাডার উত্তর ঘুরে চীনদেশে পৌঁছানোর একটা রাস্তা খুঁজে বার করা। কিন্তু তিনি পারস্য উপসাগরেই মারা যান।

॥ হেনরি হাডসন ॥

হেনরি হাডসন (Henry Hudson—১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু) তুষারময় সমুদ্রপথে চীনে পৌঁছবার বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর নামেই 'হাডসন বে'র নাম হয়েছে। যে জাহাজে চড়ে হাডসন সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন সে জাহাজের নাম 'হাফমুন'।

তাঁর বিদ্রোহী নাবিকরা তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে নৌকোয় চড়িয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

সমুদ্র বিপদসংকুল দেখে জলপথে উত্তরমেরু আবিষ্কারের চেষ্টা অনেকেই ছেড়েছিল। তখন

শীতকালে আটকে থাকতে হল
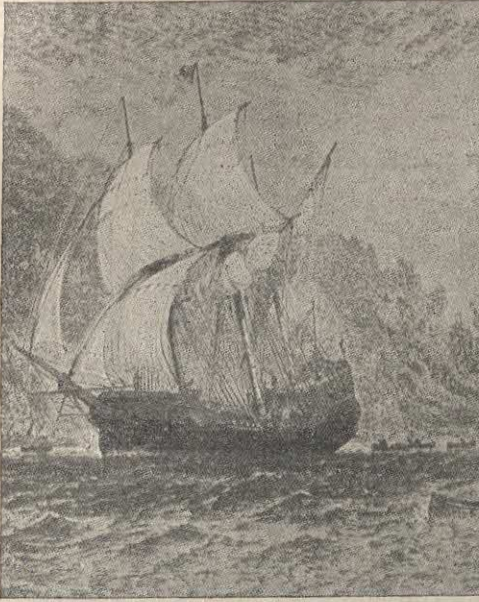
হেনরী হাডসনের 'হাফমুন' জাহাজ

কানাডার উত্তর ধরে পদব্রজে অভিযান চালানো হয়। ম্যাকেঞ্জি নামে একজন অভিযাত্রী একটি বড় নদী আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। তাঁর নামেই সে নদীর নাম হয় ম্যাকেঞ্জি নদী।

॥ ভাইটাস বেরিং ॥

ভাইটাস বেরিং (Vitus Bering—১৬৮০-১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ) ডেনমার্কের অধিবাসী। রুশ সরকার তাঁকে পাঠাল এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে কোন প্রণালী আছে কিনা তার সন্ধানে। এর আগে সাইমন ডেশিনেফ (Simon Deshinef) ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করেন যে এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে এক বিরাট সাগর রয়েছে। কিন্তু তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করে নি।

ভাইটাস বেরিং ১৬ বছর ধরে এই কাজে লেগে রইলেন। ৪০০০ মাইল পথ তাঁকে চারবার হাঁটতে হয়। পেট্রোগ্রাড থেকে ওখোট্স্ক্ (Okhotsk) পর্যন্ত মালপত্র সব তাঁকে নিজে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। ইওরোপ থেকে এশিয়ার এই তুষারজমা অঞ্চলে যেতে তাঁকে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। এই অভিযানে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হয়েছিল ও শত শত লোক মারা গিয়েছিল।

প্রথম অভিযানে ৫০০ লোক ছিল—তার মধ্যে বহু বিজ্ঞানী, নাবিক, ছুতোর ও কামার ছিল। ৮০০ ঘোড়া প্রচুর মাল নিয়ে গিয়েছিল; তবুও রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় খিদের জ্বালায় তারা শেষ পর্যন্ত নিজেদের জুতোর চামড়া ও ঘোড়ার চামড়ার সাজ পর্যন্ত সিদ্ধ করে খেতে বাধ্য হয়েছিল।

তিন বছর ধরে তোড়জোড় করে শেষে জাহাজ তৈরী হল। তারপর সাত সপ্তাহ ধরে অভিযান চলে। কিন্তু বেরিং এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে স্থলভাগের যোগ দেখতে পেলেন না। তিনি দেখলেন অবাধ সমুদ্র। আমেরিকার কূল খুঁজে বার করবার আগেই শীত এসে গেল। তাঁকে শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী আস্তানায় ঢুকতে হল।

বসন্তকালে বেরিং আর একবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রকৃতি তখনও প্রতিকূল। কাজেই পাঁচ বছর বাদে তাঁকে রাশিয়ায় ফিরে আসতে হল। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি অভিযানে বেরলেন। তিনি জাপানের উদ্দেশে জাহাজ পাঠালেন এবং সে জাহাজ জাপানে পৌঁছল। কিন্তু বেরিং-এর রসদ ফুরিয়ে গেল। আমেরিকার তীরের দিকে জাহাজ ভাসাতে তাঁর প্রায় আট বছর লেগে গেল।

বেরিং অবশ্য আমেরিকার তীরে পৌঁছেছিলেন

হেনরী হাডসনের সমুদ্রযাত্রা

শিয়ালেরা খুব উৎপাত করেছিল

কিন্তু কামচাটকা (Kamchatka) ফিরবার পথে তিনি সমুদ্রে দারুণ ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। জাহাজের খালাসীদের স্কার্ভি রোগ দেখা দিল, তার উপর খাদ্যাভাব। কোনক্রমে কম্যাণ্ডার দ্বীপপুঞ্জে এক খাঁড়ির মুখে তাঁর জাহাজ আশ্রয় নিল।

নৌকো উলটে তার তলায় তাঁরা শীতকাল কাটালেন। সমুদ্রের অটার আর সীলের মাংস খেয়ে তাঁরা বেঁচে রইলেন। সে অঞ্চলে শিয়ালেরা খুব উৎপাত করত। তারা খাবার চুরি করে নিয়ে যেত, ওঁদের পোশাক চিবিয়ে ছিঁড়ে দিয়ে যেত, মরা লোকদের খেয়ে যেত আর অসুস্থদের আঁচড়ে কামড়ে জ্বালাতন করত।

এইখানে তাঁবুর তলায় অসুস্থ হয়ে বেরিং ধীরে ধীরে মারা যান। যে দ্বীপে তিনি মারা যান তার নাম বেরিং দ্বীপ।

॥ ২৫,000 পাউণ্ড পুরস্কার ॥

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ৫০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করলেন। উত্তর মেরুর পথে ৮৯ ডিগ্রী অক্ষাংশ যে অতিক্রম করতে পারবে তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল।

উইলিয়ম এডওয়ার্ড প্যারি (Sir William Edward Parry—১৭৯০-১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) যখন এই অভিযানে নামলেন তখন পুরস্কারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫,০০০ পর্যন্ত। স্যার জন রস (Sir John Ross—১৭৭৭-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর ভাইপো স্যার জেমস ক্লার্ক রস (Sir James Clark Ross—১৮০০-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ) আর উইলিয়ম এডওয়ার্ড প্যারি এই দুর্গম পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

তাঁরা দেখলেন যে ব্যাফিন আসলে উপসাগর নয়, সমুদ্র। এ সমুদ্র ৮০০ মাইল লম্বা, ২৮০ মাইল চওড়া। এ সমুদ্র অধিকাংশ সময়ে জমে বরফ হয়ে থাকে। উত্তর দিকে অগ্রসর হতে না পেরে তাঁরা পশ্চিমে ফিরলেন। এইখানে এক বিষম ভুলের ফলে তাঁদের সব কৃতিত্ব নষ্ট হয়ে গেল।

তাঁদের সামনে এক নতুন জগৎ কিন্তু মেঘে সব অন্ধকার করে আছে। তাঁরা মেঘগুলোকে পর্বত মনে করলেন। তাদের নাম দিলেন 'ক্রুকার রেঞ্জ'। তারপর সটান দেশে ফিরে এসে বললেন যে পাহাড়গুলো পশ্চিমে অচল বাধার স্মৃষ্টি করে আছে। আর এগোবার উপায় নেই।

প্যারি প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু বরফের বাধা অতিক্রম করে তিনি মূল উত্তর-মেরুতে যেতে পারলেন না।

স্লেজ গাড়ি আর জাহাজে চড়ে প্যারির উত্তর-মেরু অভিযানের কাহিনী রোমাঞ্চকর। তাঁর জাহাজ বরফের চাপে ভেঙে গেল। তিনি ভাসমান বরফের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে ভেসে গেলেন। তাঁর লোকেরা উত্তরে এগিয়ে গেল।

এরপর রস চার বছর অভিযান চালিয়ে ম্যাগ্‌নেটিক পোলের নকশা এঁকে ফেললেন।

॥ স্যার জন ফ্র্যাঙ্কলিন ॥

তারপর স্যার জন ফ্র্যাঙ্কলিন (Sir John Franklin—১৭৮৬-১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ)-এর চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি স্পিটসবার্গেনের সমুদ্রের গভীরতা মাপলেন ও আমেরিকার উত্তরাংশের তটরেখা জরিপ করলেন।

উইলিয়াম এডওয়ার্ড প্যারি

এজন্যে তাঁকে ৫৫০০ মাইল ভ্রমণ করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় অভিযানে তিনি ম্যাকেঞ্জি নদী সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯ বছর বয়সে ফ্রাঙ্কলিন আবার দু'টি জাহাজ সাজিয়ে অভিযানে বেরোলেন। জাহাজ দু'টির নাম এরেবাস (Erebus) ও টেরর (Terror). তাতে মোট ১৩৪ জন দক্ষ লোক নেওয়া হল। কিন্তু ফিস রিভার থেকে বেরিং প্রণালীর দিকে যেতে পথেই তিনি ও তাঁর দল মারা পড়লেন। কি যে হল তাঁদের সবই রহস্য হয়ে রইল। কেউ কিছু জানল না। তিমি শিকারে গিয়ে একদল লোক ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্যাফিন উপসাগরে জাহাজ দু'টি দেখেছিল।

তিন বছর সবাই তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করে রইল। তারপর তাঁদের খোঁজ খবর করা হতে লাগল। এই অভিযানের সঠিক খবর আনার জন্যে সরকার ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করলেন। দশ বছর ধরে প্রায় ৩৯টি দল পাঠানো হল এঁদের খোঁজ আনবার জন্যে। কোটি পাউণ্ড খরচ হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত এস্কিমোদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল আর যে-সব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল সেই সব থেকে জানা গেল যে ওঁদের জাহাজ দুটো ম্যাকক্লিনটক প্রণালীতে বরফের মধ্যে আটকে যায়। আর দু'বছরে প্রায় ৩০ মাইল ভেসে যায়। পয়েন্ট ভিক্টরিতে একটা ছোট জাহাজে এক চিলতে কাগজ পাওয়া যায়। তারিখ লেখা ছিল ২৫শে এপ্রিল ১৮৪৮। কাগজটিতে লেখা হয়েছিল, "১৮৪৮-এর ২২শে এপ্রিল এরেবাস ও টেরর জাহাজ দুটিকে পরিত্যাগ করা হল। উত্তরে যাবার পথ আটক। বরফের বাধার জন্যে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ থেকে এগোবার পথ নেই। ১০৫ জন অভিযাত্রী ও নাবিক ক্যাপ্টেন ক্রোজিয়ের নেতৃত্বে এখানে নেমেছিলেন। স্যার জে. ফ্রাঙ্কলিন ১২ই জুন ১৮৪৭-এ মারা গেছেন।"

এস্কিমোরা দেখেছিল যে বরফের মধ্যে বন্দী জাহাজ থেকে খর্বাকৃতি লোকেরা নৌকো টেনে বার করছে—একদল ভূতের মতো তারা জাহাজটাকে টেনে নিয়ে চলেছে বরফের উপর দিয়ে। খিদেয় ক্লান্ত ক্ষীণ তাদের দেহ। এস্কিমোদের কাছ থেকে দু'এক

ভাসমান বরফের সঙ্গে ভেসে গেলেন

স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন

টুকরো সীলমাছের মাংস চেয়ে খেয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে। এক এস্কিমো বরফের উপর আঙুল দিয়ে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিল যে তাদের অনেকেই পথ চলতে চলতে বরফের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে।

পরে পথের ধারে মৃতদেহ পাওয়া গেছে, কতক উলটানো নৌকোর নীচে, তাদের হাতে তখনো বন্দুক ধরা আছে। বন্দুক, ছররা, বারুদ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি—বরফের উপর মানুষের চলার পথের রেখা, হাতের দস্তানা ছড়ানো।

॥ এডলফ এরিক নর্ডেনশিল্ড ॥

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এডলফ এরিক নর্ডেনশিল্ড (Adolf Erik Nordenskjold—১৮৩২-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ) ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিংফোর্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজনৈতিক অত্যাচারে বাধ্য হয়ে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক হন ও বড় হয়ে উত্তর মেরু অভিযানে উৎসাহী হন। অপরে যে পথে মৃত্যু বরণ করেন সেই পথে তিনি বিজয়ী হন।

তিনি উত্তর এশিয়ার তটরেখা ধরে ইএনিসি (Yenisei) পৌঁছান। তিনি প্রমাণ করলেন যে শীত পড়বার আগে কারা সমুদ্র (Kara Sea) জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত থাকে। ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়ে জাহাজ চালিয়ে মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে জাপানে ইয়োকোহামাতে (Yokohama) পৌঁছান। এইভাবে নর্ডেনশিল্ড উত্তর-পুবের পথ আবিষ্কার করে খ্যাতি অর্জন করেন।

॥ রোয়াল্ড আমুণ্ডসেন ॥

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমুণ্ডসেন (Roald Amundsen, ১৮৭২-১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ) নামে একজন নরওয়েবাসী উত্তর-পশ্চিমের পথ আবিষ্কার করলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টিয়ানিয়া থেকে একটি ৭০ ফুট ছোট্ট জাহাজে তিনি সমুদ্রে ভাসেন। তখন বসন্তকাল। তিনি পশ্চিমে ভেসে চলে ব্যাফিন উপসাগর পার হলেন ও ল্যাঙ্কাস্টার সাউণ্ড ছেড়ে ব্যারো প্রণালী পার হলেন। পিল সাউণ্ডে তিনি এসে বরাবর ডিলা রোকেট দ্বীপপুঞ্জ ধরে চলে উত্তর মেরু পার হলেন ও তারপর পুবে কিংউইলিয়াম ল্যাণ্ডে এলেন।

পথে তিনি জাহাজ নঙ্গর করে শীতকাল কাটালেন। দু' বছর তাঁকে এখানে কাটাতে হল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে তিনি ম্যাকেঞ্জি উপসাগরে কিংপয়েণ্টে পৌঁছলেন। আবার শীতকাল এল। বরফ জমতে শুরু করল। কাজেই বাধ্য হয়ে এখানে তাঁকে সারা শীতকাল আটক থাকতে হল।

ফ্রাঙ্কলিনের অভিযানের শেষ পর্যায়

এক এস্কিমো ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছে

জাহাজ আটক রইল কিন্তু আমুণ্ডসেন ভ্রমণের নেশায় একটা স্লেজগাড়ি নিয়ে বরফের উপর দিয়ে চলে ১৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করে আলাস্কায় পৌঁছলেন।

আবার গ্রীষ্মকাল এসে গেল। ১১০০ মাইল জলপথ পার হয়ে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেরিং প্রণালী পার হয়ে নোমে (Nome) পৌঁছলেন.।

এইভাবে উত্তর মেরুর দুটি পথই আবিষ্কার করা হল। নর্ডেনশিল্ডকে পশ্চিম থেকে উত্তর ঘুরে পুব দিকে যেতে শীতকাল কাটাতে হয়েছিল, আর আমুণ্ডসেনের তিন বছর লেগেছিল পুব থেকে উত্তর হয়ে পশ্চিমে যেতে। দুটি পথই ভয়ংকর বিপদে পূর্ণ, পদে পদে মৃত্যুর ভয়, কিন্তু মানুষ শেষ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছে পৃথিবীর এই রহস্যময় উত্তর অঞ্চলের সঠিক খবর নিয়ে এল। ভূগোল তৈরী হল আর তাতে লেখা রইল সব কিছুর নিখুঁত বর্ণনা, মাপজোখ, হিসাব-নিকাশ।

॥ অস্ট্রেলিয়ার আবিষ্কারকগণ ॥

প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত অস্ট্রেলিয়া—এখানে ৬০ লক্ষ ব্রিটিশ বাস করে। দেশটা পুরাতন, কিন্তু যারা বাস করে তারা একটা নতুন জাত।

অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর যাদের এদেশ দখল করে বাস করতে পাঠানো হল তারা সবাই সিডনী (Sydney)-তেই বাস করতে লাগল। এই অঞ্চলের পরিমাণ কুড়ি বর্গ মাইল। এ অঞ্চলের নতুন নামকরণ হল নিউ সাউথ ওয়েলস। দেশটি সম্পূর্ণ অজানা—২৫ বছরের মধ্যে তার পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী জানা গেল না। বাকী অস্ট্রেলিয়া তাদের কাছে অজানা এলাকা হয়েই রইল। তটভূমির পিছনে ব্লু মাউণ্টেন্‌স্, কেউ সাহস করে ঐ নীল পাহাড়ের ওপারে গেল না।

॥ গ্রেগরী ব্ল্যাক্সল্যাণ্ড ॥

কিন্তু ওদের মধ্যে একজন ২৫ বছর পরে সাহস করে এগিয়ে দেখতে চাইলেন ওপারে কি আছে। লোকটির নাম গ্রেগরী ব্ল্যাক্সল্যাণ্ড (Gregory Blaxland). ষোল দিন ধরে তিনি ক্রমাগত হাঁটতে লাগলেন। ছোট ছোট গাছের জঙ্গল ভেদ করে, কাঁটা গাছ মাড়িয়ে তিনি চললেন। তিনি দেখলেন সুন্দর মাঠের মতো এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। এখানে

জঙ্গল ভেদ করে গ্রেগরী চললেন

পশু চরানো যাবে, বাসও করা যাবে। তিনি ঠিক করলেন নিউ সাউথ ওয়েলসের তীরে বাস করে ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করার চেয়ে নীল পাহাড়ের ওপারে বাস করা বেশী আরামের হবে।

অস্ট্রেলিয়ার নরখাদক জংলীরা

॥ অপরাধীদের শাস্তি ॥

১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি ৫৬৫ জন পুরুষ, ১৪৪ জন স্ত্রীলোক, দুটি বালিকা আর পাঁচটি বালক নিউ সাউথ ওয়েলস ছেড়ে এই নতুন অঞ্চলে এসে উপস্থিত হল। এ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের শাস্তি দেবার জন্যে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হত। জেলখানা থেকে এমনি শত শত কয়েদীকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হতে লাগল। এই সব অপরাধীই গড়ে তুলল অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস।

এইভাবে ব্যাথার্স্‌ট শহরের গোড়াপত্তন হল। একশ বছর বাদে এখানকার অধিবাসীরা এখানে সোনা, রুপো, তামা ও স্লেটের সন্ধান পেল। তারা দেখল এখানকার অধিকাংশ গাছই ইউক্যালিপটাস জাতের। এখানকার জলজন্তু ও পাখি সবই নতুন ধরনের। কুকাবুরা, কিউই, বীণা পাখি (Lyre-bird), ক্যাঙ্গারু, প্ল্যাটিপাস, কালো রাজহাঁস সবই অদ্ভুত পশুপাখি—এরকম দুনিয়ার আর কোথাও নেই।

এখানকার আদিম অধিবাসীরা নরখাদক। তাদের অস্ত্র ব্যূমেরাং। এই বাঁকানো নানা আকারের কাঠের অস্ত্রগুলির মধ্যে ভারী লোহা এমন কৌশলে বসানো যে ছুড়লে বাতাস কেটে এঁকে বেঁকে ছুটে গিয়ে এগুলি শত্রুকে আঘাত করে, কখনও বা ফিরেও আসে।

॥ জন অক্সলি ॥

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে জন অক্সলি (John Oxley) সব প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে লাচ্‌লান নদী (River Lachlan)-র গতিপথ নির্ধারণ করতে উদ্যোগী হন। তিনি দেখলেন যে এই নদী একটা জলাভূমিতে এসে হারিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় অভিযানে তিনি ম্যাকওয়েরি নদী (Macquarie) ও অন্য কয়েকটি নদী আবিষ্কার করেন। অস্ট্রেলিয়ার নদীগুলোর উৎস সন্ধান করা শক্ত। তিনি ব্রিসবেন নদী আবিষ্কার করেন। এই নদীর তীরে ব্রিসবেন শহর গড়ে ওঠে।

॥ অ্যালান কানিংহাম ॥

অ্যালান কানিংহাম নামে একজন উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিশারদ (botanist) গাছপালা সম্বন্ধে গবেষণা করতে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। তিনি ঘুরতে ঘুরতে 'ডারলিং ডাউনস' নামে শত শত মাইল বিস্তৃত এক তৃণভূমি আবিষ্কার করলেন। সেটা ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দ।

॥ ক্যাপ্টেন চার্লস্‌ স্টার্ট ॥

ক্যাপ্টেন চার্লস্‌ স্টার্ট একজন সেনাবিভাগের যোদ্ধা। তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে অক্সলির আবিষ্কৃত জলাভূমি সম্বন্ধে নিজে গিয়ে দেখে আসতে উৎসাহী হলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন হ্যামিলটন হিউম। তাঁরা একটা চাকাওলা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

অক্সলি বর্ষাকালে অভিযানে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা বেরলেন দারুণ গ্রীষ্মকালে। বড় বড় এমু পাখিরা

গরমের জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবি খাচ্ছে। কুকুরগুলোর জিভ বেরিয়ে পড়েছে, ঘোড়াদের আর ছোটবার শক্তি নেই—তাদের খুর চিরে দু'খানা হবার উপক্রম।

স্টার্ট দেখলেন বিস্তীর্ণ নলখাগড়ায় ভরা এক জলাভূমি। একটি নদী এখানে আশি গজ চওড়া হয়ে গেছে—আর অসংখ্য বুনো জলচর পাখিতে নদীর তীর ভরে উঠেছে। তাঁরা নদীতে জল খেতে গেলেন, কিন্তু জল লোনা, আস্বাদ কটু। এই নদীর নাম ডারলিং নদী।

পরবর্তী অভিযানে স্টার্ট ১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে মারাম-বিজি (Murum-bidgee) নদীর গতিপথ ধরে চললেন। সিডনী থেকে ২০০ মাইল পর্যন্ত এই নদীর গতি ধরে এসে জায়গাটা খুব দুর্গম হয়ে পড়ল। সবাইকে নিয়ে আর এগোনো সম্ভব নয় দেখে ওঁরা একটা ভেলা তৈরি করলেন। তারপর খুব দরকারী জিনিসপত্র সেই ভেলায় উঠিয়ে বাদবাকী সব তাদের নৌকোয় তুলে দিলেন। তারপর ভেলায় করে চললেন নদীর উৎসের সন্ধানে।

দ্রুতবেগে খরস্রোতা নদী দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন—ক্রমশঃ নদী চওড়া হয়ে এল। তাঁরা মহানন্দে সেই নদীর নাম করলেন মারে নদী (Murray River). অস্ট্রেলিয়ায় এইটিই বৃহত্তম নদী।

স্টার্ট বন্দুক ওঠালেন

ওঁরা প্রায় একমাস ধরে নদীর উপর দিয়ে ভেসে বেড়ালেন। নদীর তীর থেকে বর্শা হাতে শত শত জংলীকে তাঁদের দিকে ধেয়ে আসতে দেখে স্টার্ট বন্দুক ওঠালেন ওদের গুলি করবার জন্যে। কিন্তু মুহূর্তে ওদের একজন সর্দার সবাইকে নিরস্ত করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্টার্টের বন্দুকের সামনে বুক পেতে তাঁকে ইঙ্গিতে গুলি ছুড়তে নিষেধ করল। এর ফলে শান্তি স্থাপিত হল।

ওঁরা আরও এগোতে লাগলেন ও শেষ পর্যন্ত একটি হ্রদে এসে পৌঁছলেন। এই হ্রদের নাম দেওয়া হল আলেকজান্দ্রিনা (Alexandrina).

আর তাঁদের এগোবার সাহস হল না। খাদ্য নেই, জাহাজ নেই—কাজেই ফেরা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কিন্তু ফিরলে আবার সেই জংলীদের মুল্লুক দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এ ছাড়া অন্য পথও নেই। প্রচণ্ড গরম, দারুণ খাদ্যাভাব, সবাই ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। ভয়ংকর বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা ফিরে চললেন। অনেকে পাগল হয়ে গেলেন। তবু যাঁরা সুস্থ, প্রকৃতিস্থ ছিলেন তাঁরা অসীম সাহসে ভর করে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরে এলেন।

এখানে এসে দেখেন যে তাঁদের উদ্ধার করার জন্যে রসদ নিয়ে একটি দল এসেছে। ওঁরা তারপর সিডনীতে ফিরে গেলেন। এই যাত্রায় ওঁরা ২০০০ মাইলেরও বেশী ভ্রমণ করেছিলেন।

স্টার্টই দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সত্যিকারের আবিষ্কর্তা। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশের যথারীতি প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাঁকে সার্ভেয়ার জেনারেলের পদ দেওয়া হয়। কিন্তু স্টার্টের মনে তখন সারা অস্ট্রেলিয়াকে জানবার আকাঙ্ক্ষা পুরোদস্তুর রয়েছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গী হলেন জন ম্যাকডুয়াল স্টুয়ার্ট। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরে তাঁরা অভিযানে বের হলেন।

লেক লরেনস বাঁ দিকে রেখে ওঁরা মারে ও ডার্লিং নদী পার হয়ে ক্রমশঃ উত্তরে অগ্রসর হলেন। তখন শীতকাল। ওঁরা মরুভূমি অঞ্চলে এসে পৌঁছলেন। এখানে ব্যারিয়ার পর্বতমালা আর গ্রে পর্বতমালা। মাটি শুকনো, ফেটে চৌচির। ঘোড়া ইত্যাদি মালবাহী পশুদের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতে লাগল। আর পথ চলা যায় না। ওঁরা শেষ পর্যন্ত একটা পাহাড়ী ঝরনার কাছে এসে গেলেন। স্টার্ট জায়গাটার নাম দিলেন রকি গ্লেন (Rocky Glen).

দারুণ গরমে এইখানে তাঁদের দীর্ঘ ছ'মাস আটকে থাকতে হল। এখান থেকে চতুর্দিকে ভ্রমণ করে তাঁরা হতাশ হলেন—রুক্ষ, বন্ধুর অঞ্চল, গাছ-পালা জন্মায় না, ঘাস পর্যন্ত নেই। লেখবার আগেই কলমের ডগার কালি শুকিয়ে যায়। ধাতুর জিনিস এত গরম যে হাতে ঠেকানো যায় না।

খাদ্যের অভাবে তাঁদের স্কার্ভি রোগ দেখা দিল। বাড়ি ফেরা ছাড়া আর উপায় রইল না। তাঁরা 'কুপারস ক্রীক' নামে একটি জলধারা আবিষ্কার করলেন।

এর পর কলেট বার্কার নামে একজন সেণ্ট ভিন্সেণ্ট উপসাগর ও লেক আলেক্‌জান্দ্রিনার যোগসূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে লফ্‌টি পর্বতের চুড়োয় উঠে দেখলেন অ্যাডেলেডের সুন্দর সমতল ভূমি। আর যে সরু খাত দিয়ে মারে নদী সমুদ্রে ঢুকেছে তা আবিষ্কার করে কাপড়জামা খুলে সেই জলে ঝাঁপ দিলেন—ইচ্ছেটা ওপারে উঠে নদী কতখানি চওড়া তা তিনি জানবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

নদীর অপর পারে বিস্তর আদিম অধিবাসী ছিল। তাদের বাসস্থান থেকে ঊর্ধ্বাকাশে আগুন উঠছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে জংলীরা কলেটকে পুড়িয়ে তাঁর মাংস সবাই মিলে খেয়েছে।

॥ এডওয়ার্ড জন আয়ার ॥

এডওয়ার্ড জন আয়ার (Edward John Eyre—১৮১৫-১৯০১) ছিলেন একজন ধর্মযাজকের ছেলে। তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্থলপথে মরুভূমি ডিঙিয়ে অস্ট্রেলিয়ান বাইট নামে উত্তরের একটি জায়গায় পৌঁছান। এখন এখান থেকে সাউথ অস্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেলিগ্রাফ যোগাযোগের লাইন টাঙানো হয়েছে।

তিনি ঠিক করলেন যে ফাউলার বে (Fowler Bay) থেকে আলবানি (Albany), ৮০০ মাইল পথে অভিযান চালাবেন। এখানে কোনদিন কোন অভিযান চালানো হয় নি। এখন এ জায়গার নাম পোর্ট আয়ার।

ব্যাক্সটার নামে একজন শ্বেতাঙ্গ সহকারী ও তিনজন দেশী কুলি নিয়ে আয়ার যাত্রা শুরু করলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল ন'টা ঘোড়া, একটা টাট্টু ঘোড়া, একটা ঘোড়ার বাচ্চা, ছ'টা ভেড়া আর ন'সপ্তাহ চলবে এমন ময়দা, চা, চিনি ও খাবার জল। তখন ভরা গ্রীষ্মকাল। ১৩৫ মাইলের মধ্যে কোথাও এক ফোঁটা জল পাওয়া গেল না।

পাঁচ দিন ঘোড়া ও ভেড়াদের এক ফোঁটাও জল দেওয়া গেল না। পাঁচ দিনের দিন ৫ ফুট মাটি খুঁড়ে অনেকটা জল পাওয়া গেল।

শ্বেতাঙ্গ আর জংলীদের মধ্যে যারা খুব বলবান্ তারা হেঁটেই চলল আর অল্পবয়সের দুজন জংলী পালা করে সব চেয়ে বলবান্ ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলল। এর পর আবার ১৬০ মাইল জলহীন অঞ্চল। এই ১৬০ মাইল মরুভূমির শেষে ওঁরা যখন পিপাসায় গলা শুকিয়ে মরে যাবার মতো অবস্থায় এসেছেন তখন এক জায়গায় ভিজে বালি খুঁড়ে ছ' ফুট নীচে জল পাওয়া গেল। সঙ্গে যা জিনিসপত্র এসেছিল তার অবশিষ্ট ছিল দুটি বন্দুক, সামান্য কিছু চা, কিছু ময়দা। টাট্টু ঘোড়াটা আর দুটো ঘোড়া মরে গেছে—ভেড়াদের মধ্যে মোটে দুটি বেঁচে ছিল। জল সবই ফুরিয়ে গেছে। রাতে খুব শিশির পড়ত—সেগুলি সংগ্রহ করেই তাঁরা কোন রকমে প্রাণে বেঁচে গেলেন।

এখন পর্যন্ত তাঁরা এসেছেন অর্ধেক পথ মাত্র। সামনে ১৫০ মাইলের মধ্যে আর জল পাবার কোন আশাই নেই। একজন জংলীকে সঙ্গে নিয়ে আয়ার পথে ফেলে-আসা মাল উদ্ধার করতে ফিরে গেলেন।

মাটি খুঁড়ে অনেকটা জল পাওয়া গেল

এখন যেখানে 'আয়ার' শহর সেখানে তাঁরা ২৮ দিন থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। জংলী লোকটি পচা রুটি আর ঘোড়ার মাংস খেয়ে বাঁচল আর আয়ার খেলেন ভেড়ার মাংস।

এরপর এক রাতে এই সাহসী অভিযাত্রীরা এক দারুণ বিপদে পড়লেন। একদিন তাঁবু ছেড়ে বাকী ঘোড়াগুলো তদারক করতে গেছেন আয়ার, এমন সময়ে গুলি ছোড়ার শব্দ শুনে তিনি চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরে দেখেন ব্যাক্সটার মুমূর্ষু। দুজন জংলী তাঁকে গুলি করে বন্দুক আর গোলাবারুদ ও খাদ্য প্রায় সবটাই নিয়ে পালিয়েছে। বাকী আছে শুধু গ্যালন চারেক খাবার জল।

তাঁদের সঙ্গে ওয়াইলি নামে একটা ছোকরা জংলী চাকর ছিল। সে শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত রইল। এক সপ্তাহ মরুভূমির পথে দূর থেকে এই বিশ্বাসঘাতকরা তাঁকে হত্যা করবার জন্যে ঘোরাঘুরি করল। শেষ পর্যন্ত আবার তাঁরা ছ'ফুট মাটির তলায় জল পেলেন।

আয়ার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এতদিনে তিনি পয়েণ্ট মালকম (Point Malcolm)-এ এসেছেন। এটা তীরভূমির কাছে। এখানে সপ্তাহখানেক তাঁরা অপেক্ষা করলেন। খাদ্য শেষ। এবার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু একটা ফরাসী জাহাজ সমুদ্রপথে তিমি শিকারে যাচ্ছিল। সেই জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন ইংরেজ। তিনি উপসাগরে জাহাজ ভেড়ালেন।

দীর্ঘ দশদিন আয়ার এই সদাশয় কাপ্তেনের অতিথি হয়ে কাটিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কাপ্তেনের কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করে নতুন উৎসাহে তিনি অভিযান চালিয়ে আর এক মাসের মধ্যে আলবানি (Albany) পৌঁছলেন।

এর পর আয়ার হলেন নিউজিল্যাণ্ডের ছোট লাট, সেণ্ট ভিন্সেণ্টের লাট আর শেষ পর্যন্ত জামাইকার লাট। শেষে একদল নিগ্রোর বিদ্রোহ দমন করতে তিনি যে কড়া নীতি অবলম্বন করেছিলেন সেজন্যে তাঁকে নিয়ে ঝঞ্ঝাট বাধল। ৩৫ বছর অবসর ভোগ করার পর ৮৬ বছর বয়সে আয়ারের মৃত্যু হয়।

॥ লাডউইগ লিকহার্ড ॥

লাডউইগ লিকহার্ড (Ludwig Leichhardt) ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সিডনী থেকে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন পাঁচজন ইংরেজ আর দু'জন দেশী লোক। অভিযান আটমাসে শেষ হবার কথা। কিন্তু ১৭ মাস লেগে গেল।

একদল নিগ্রোর বিদ্রোহ দমন

লাডউইগের সে দারুণ অভিজ্ঞতার কথা ভুলবার নয়। জংলীদের আক্রমণে তাঁর একজন সঙ্গী নৃশংস ভাবে মারা পড়লেন আর দু'জন দারুণ আহত হলেন। সব রসদ ফুরিয়ে গেল, সাজ-সরঞ্জামও সব নষ্ট হল। সে যা হোক, দলের বাকী ক'জন কোনক্রমে গন্তব্য স্থানে পৌঁছলেন।

একটা জাহাজ তাঁদের তুলে নিয়ে সিডনী পৌঁছে দিল। পুব থেকে পশ্চিমে এই মহাদেশ পার হবার উদ্দেশ্যে লিকহার্ড বহু চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত শেষ অভিযানে তাঁর সঙ্গে ছিল সাতজন সঙ্গী, ৫০টি ষাঁড়, ২০টি খচ্চর আর ৬টি ঘোড়া। তারপর তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁকে খুঁজতে পাঁচটি অভিযান চালানো হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে একটা পরিত্যক্ত তাঁবু আর একটা 'এল' খোদাই করা গাছ মাত্র পাওয়া গিয়েছিল।

॥ জ্যাকি জ্যাকি ॥

এবার আর একজন অভিযানকারীর কথা বলা হচ্ছে। এঁর নাম জ্যাকি জ্যাকি। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এঁর নাম অমর হয়ে আছে।

একটা পরিত্যক্ত তাঁবু আর তার পাশে একটা 'এল' খোদাই করা গাছ

সঙ্গী দারুণভাবে আহত হলেন

তিনি ছিলেন এডমাণ্ড কেনেডির ক্রীতদাস। ইনি 'কুপারস্ ক্রীক' পর্যন্ত একটি নদীর গতিপথ আবিষ্কার করেছিলেন।

তারপর কেনেডি কুইনসল্যাণ্ডের উত্তরে 'দি গ্রেট কেপ' উপদ্বীপ অভিযানে জ্যাকিও ন'জন লোক সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়েন। ঘন জঙ্গল ও কাঁটা ঝোপের মধ্য দিয়ে বহুকষ্টে চলতে গিয়ে তাঁদের জামাকাপড় ছিঁড়ে হাত-পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কেনেডি দলটি দু' ভাগ করে ফেলেন। জ্যাকি ও তিনজন শ্বেতাঙ্গ সঙ্গী নিয়ে তিনি উপদ্বীপের সীমানায় পৌঁছবার চেষ্টা করেন। একজন সঙ্গী দারুণভাবে আহত হওয়ায় বাকী দু'জনকে তার পরিচর্যায় রেখে কেনেডি জ্যাকিকে নিয়ে এগিয়ে চললেন।

কিন্তু জংলীরা তাঁকে আক্রমণ করে মেরে ফেলল। জ্যাকি মাথা ঠাণ্ডা রেখে বন্দুক নিয়ে জংলীদের ভয় দেখান ও তাদের তাড়িয়ে দিয়ে একটা কবর খুঁড়ে প্রভুর দেহ কবরে পুঁতে দেন। কেনেডির ডায়েরিটি নিয়ে জ্যাকি ফিরে আসেন। শত্রুদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে জ্যাকি নদীতে ঝাঁপ দেন ও সাঁতরে নদীর ধার দিয়ে জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে সমুদ্রের কাছাকাছি এসে পড়েন। পরে একটা জাহাজ

উপনীবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একদল ইওরোপীয় উত্তর আমেরিকার একস্থানে সমবেত হচ্ছে।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কথাঃ

[উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একদল ইওরোপীয় উত্তর আমেরিকার একস্থানে সমবেত হচ্ছে।]

আগে ইওরোপ মহাদেশের ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, পোর্তুগাল, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকেরা আমেরিকা বলে যে একটা মহাদেশ আছে, তা জানত না। কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করলে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের লোকেরা আমেরিকায় যেতে আগ্রহী হয়।

উত্তর আমেরিকা এখন এক জনবহুল মহাদেশ। আগে এই মহাদেশে যে-সব আদিম অধিবাসী বাস করত, তারা এখন সংখ্যায় কম। ইওরোপের নানা দেশ থেকে বিভিন্ন জাতির লোক গিয়ে উত্তর আমেরিকার বর্তমানে যে দেশের নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি সেই সব দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। এখন সেই সব জাতির লোক উত্তর আমেরিকার দেশসমূহের স্থায়ী অধিবাসী।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একদল ইওরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে উত্তর আমেরিকার এক স্থানে সমবেত হয়েছে।

প্রথম দিকে ইওরোপীয়েরা নানা বাধার সম্মুখীন হয়। আদিম অধিবাসীরা প্রচণ্ড-ভাবে বাধা দেয়। বহু যুদ্ধ, ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে ইওরোপীয়রা শেষ পর্যন্ত আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছে।

তাঁকে তুলে নিয়ে সিডনী বন্দরে নামিয়ে দিয়ে যায়। দলের অন্য লোকদের মধ্যে দু'জন বেঁচে ফিরে আসে আর ছ'জন অনাহারে মারা যায়।

জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ল

॥ জন ম্যাকডুয়াল স্টুয়ার্ট ॥

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে যিনি এর ম্যাপ এঁকে দেন তিনি হচ্ছেন জন ম্যাকডুয়াল স্টুয়ার্ট। তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কাজে নামেন। ইতিমধ্যে বার্ক ও উইলস্ এই কাজে নেমেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এমন দুর্ভাগ্য যে ম্যাকডুয়াল যখন অ্যাডেলেডে পৌঁছলেন তখন বার্ক ও উইলসের মৃতদেহ অ্যাডেলেড দিয়ে মেলবোর্নে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শীতকালে স্টুয়ার্ট অভিযানে নামেন। তারপর বৃষ্টি শুরু হয়। তাঁর সব মালপত্র ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর একটা ঘোড়া একটা জলায় ডুবে মরে। তারপর কাঁটা ঝোপের জঙ্গল—মাইলের পর মাইল এই সব ঝোপের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাঁর পোশাক ছিঁড়ে যায়। তার উপর আর এক বিপদ। তাঁর ডান চোখ অন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু কিছুতেই দমলেন না স্টুয়ার্ট—এগিয়ে চললেন তিনি। তারপর যে জায়গাটা এই মহাদেশের কেন্দ্র বলে তাঁর মনে হল সেখানে পুঁতে দিলেন ব্রিটিশ পতাকা।

এদিকে পথ ক্রমশঃ দুর্গম হতে লাগল। এক এক সময় তিন চার দিন এক ফোঁটাও জল না খেয়ে ঘোড়াদের চলতে হল। দুটো ঘোড়া ক্ষেপে গেল, তৃতীয় ঘোড়াটা তাঁকে পিঠে নিয়ে দুদ্দাড় করে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। তার ফলে তাঁর ডান হাত জখম হয়ে গেল। তাঁর মাড়িতে এমন ঘা হল যে তরল খাদ্য ছাড়া আর কিছু খাবার ক্ষমতা তাঁর রইল না। হাতের ঘা বিষাক্ত হয়ে হাড় দেখা যেতে লাগল। এতেও তিনি পশ্চাৎপদ হলেন না। শেষ পর্যন্ত জংলীদের আক্রমণে তাঁকে ফিরতে হল। তখন তাঁর আর ৪০০ মাইল পথ যেতে বাকী। চার মাস বাদে তিনি আবার অ্যাডেলেড থেকে যাত্রা করলেন। তিনি জানতেন না যে বার্ক আর উইলস পুবের রাস্তা ধরে ঐ দিকে চলেছেন।

তিনি তাঁর আগের পথ ধরেই চললেন। এবার তিনি এক আশ্চর্য ও করুণ দৃশ্য দেখলেন। একটা গাছের ডালের উপর একটা কারুকার্য করা ছোট্ট নৌকো। তিরিশ ইঞ্চি লম্বা। তার মধ্যে একটা জংলীদের মরা ছেলের দেহ।

এবার যে পথ সে একেবারে দুর্ভেদ্য। পঞ্চাশ ফুট উঁচু সব কাঁটা গাছ ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে। তার মধ্য দিয়ে পথ হাঁটা দারুণ কষ্টকর। কাঁটা শরীরে বিঁধলে রক্ত ঝরে আর বিষাক্ত ঘা হয়ে যায়। সারা গা ফুলে ওঠে। পাঁচ গজ দূরের ঘোড়া দেখা যায় না—এমন ঘন সে জঙ্গল। জল ফুরিয়ে যেতে এবারেও স্টুয়ার্টকে ফিরতে হল। তখনও ১৫০ মাইল পথ হাঁটতে বাকী।

অ্যাডেলেডে পৌঁছে স্টুয়ার্ট শুনলেন যে বার্ক ও উইলস্ মারা গেছেন। তবুও তিনি হতাশ হলেন না। তৃতীয় অভিযানে তিনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছলেন। কাঁটা গাছের জঙ্গল, জলের অভাব, জংলীদের আক্রমণ কিছুতেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারল না। যখন

তিনি প্রায় সমুদ্রের ধারে এসে গেছেন তখন একজন চেঁচিয়ে উঠল, "সমুদ্র! সমুদ্র!" স্টুয়ার্ট কোন কথা না বলে সমুদ্রে হেঁট হয়ে পা ডুবিয়ে দু'হাত জলে ধুয়ে নিলেন।

এই উপসাগরের নাম 'ভ্যান ডিমেনস্ গালফ'। তিনি এখানে একটি পতাকা পুঁতে তাতে তাঁদের নাম ও তারিখ লিখে দিলেন।

॥ রবার্ট ও'হারা বার্ক ॥

বার্ক (Robert O' Hara Burke, ১৮২০-১৮৬০) অ্যায়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসী। তিনি সেনাবিভাগের ক্যাপ্টেন ছিলেন কিন্তু সে পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি মেলবোর্নের পুলিস-ম্যানের চাকরি নেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন উইলিয়াম জন উইলস্। বার্ক অভিযানের জন্যে অস্ট্রেলিয়ায় সর্বপ্রথম উট আমদানি করেন।

তিনি তাঁর সঙ্গে নিলেন আরও দু'জনকে। একজনের নাম গ্রে আর একজনের নাম কিং। ছ'টা উট, দুটো ঘোড়া ও ছ'মাসের খাদ্যসম্ভার নিয়ে তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন। তিনি ব্রাহি নামে একটি লোককে তাঁদের জন্যে তিন মাস অপেক্ষা করতে বলে যাত্রা শুরু করে দিলেন।

উত্তর দিকে চললেন তাঁরা চারজন—ও'হারা, উইলস্, গ্রে ও কিং। সামনে মরুভূমি ও পাথুরে জমি আর মধ্যে মধ্যে পাঁকে ভরা জলাভূমি। তার মধ্যে নেমে গেলে তল পাওয়া যায় না—সহজে ওঠারও

গাছের গায়ে খোদাই করা রয়েছে 'Dig'

উপায় নেই। তাঁরা কার্পেণ্টারিয়া উপসাগরের দিকে অগ্রসর হলেন। সমুদ্রে তাঁরা পৌঁছতে পারেন নি, তবে ফ্লিণ্ডার্স নদীর মুখে জলপ্লাবনের মধ্যে পড়ে আর এগুতে পারলেন না।

খাদ্য কমে যাওয়ায় তাঁরা ফিরে আসেন। খাদ্যাভাবে একটা উট মেরে তার মাংস এক মাস ধরে খেলেন। তারপর আবার একটা ঘোড়া মারলেন খাবার জন্যে। গ্রে মারা গেলেন। বাকী তিনজন কুপারস্ ক্রীকে কোনক্রমে ফিরে এলেন।

ওঁরা একটা গাছের কাছে এসে দেখলেন যে গাছের গায়ে খোদাই করা রয়েছে 'Dig' (অর্থাৎ এখানে খোঁড়)। ওঁরা খুঁড়ে কিছু খাদ্য পেলেন। তারপর খাদ্যাভাবে তাঁরা তাঁদের শেষ উটটিও খেয়ে ফেললেন।

সমুদ্রে হেঁট হয়ে পা ডুবিয়ে স্টুয়ার্ট দু'হাত জলে ধুয়ে নিলেন

উইলস্ পীড়িত হয়ে পড়লে বার্ক ও কিং তাঁকে দিন আষ্টেকের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে চলে যান। বার্ক খোলা জায়গায় কঙ্কালসার হয়ে মারা যান। আদিম অধিবাসীরা কিংকে তাদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রূষা করে। পরে উদ্ধারকারী দল তাঁকে উদ্ধার করে। উইলস্ মারা যান। পরে উইলস্-এর লেখা ডায়েরি পাওয়া যায়। উদ্ধারকারী দল এঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করে অ্যাডেলেডে নিয়ে আসে।

এই সব বীরদের চেষ্টায় অজানা অস্ট্রেলিয়ার কথা লোকে জেনেছে। ইতিহাস এঁদের ভুলে যাবে না।

মেরু-অভিযানের কথা

॥ উত্তর মেরু-অভিযান ॥

উত্তর মেরু (North Pole) হল পৃথিবীর উত্তরতম বিন্দু, ভূগোলের হিসেবে ৯০ ডিগ্রী অক্ষরেখা। তাকে ঘিরে বিস্তৃত এক ভূখণ্ডকে বলে উত্তর মেরু অঞ্চল।

ইওরোপের লোকে প্রথমে এই মেরু অঞ্চলে যেতে শুরু করল পুব দেশে যাবার পথের খোঁজে।

তাদের সকলের লক্ষ্য ছিল ধনসম্পদ্, নতুন নতুন দেশের সোনা, রুপো, দামী মসলা আর মহামূল্য হীরে-জহরত।

এই অঞ্চলের অভিযাত্রীদের কথা আগেকার পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছে—ভাইকিংরা, ফ্রবিশার, রস্, প্যারী, ফ্রাঙ্কলিন, নর্ডেনশিল্ড আর আমুণ্ডসেন।

কিন্তু যাঁরা উত্তর মেরু অভিযানে গেছেন, তাঁরা জেনে শুনে গেছেন যে তাঁদের অনন্ত কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত মরতেও হতে পারে, কিন্তু কোনও লাভের আশা নেই। তবু এই অজানাকে জানতে, অদেখাকে দেখতে একের পর এক বীর উত্তর মেরুর দিকে ক্রমাগত অভিযান করছিলেন। দলের পর দল আসছিল ইওরোপের নানা দেশ ও আমেরিকা থেকে। জন ফ্রাঙ্কলিন (John Franklin—১৭৮৬-১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দ) ও তাঁর সঙ্গে যে নাবিকদল এসেছিল তাদের সন্ধানও চলছিল—এমনি করে একদিন খুলে গেল অজানা পথের দ্বার। ফ্রাঙ্কলিনকে খুঁজতে এসে ১৮৫২ সালে স্যার অগাস্টাস ইংগলফিল্ড (Inglefield) কেপ স্যাবিন ও এলেজমিয়ার (Ellesmere) দ্বীপ আবিষ্কার করলেন। এত উত্তরে এর আগে আর কেউ পৌঁছতে পারে নি।

এর পরের বছর এলিশা কেণ্ট কেন (Elisha Kent Kane—১৮২০-১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ) নামে একজন ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার হেনরি গ্রিনেল নামে নিউইয়র্কের এক মেরু-অভিযাত্রীর দলে ভিড়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। পরে ইনি নিজেই দলপতি হয়ে আবার অভিযান চালান। পথের কষ্ট ও দারুণ বিপর্যয় সহ্য করে পরে তিনি অনেক দরকারী খবর সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন।

গ্রীনল্যাণ্ডের অধিবাসী এস্কিমোদের কেন-ই প্রথম কাজে লাগালেন। এস্কিমোদের মধ্যে একটি উনিশ

এলিশা কেন্ট কেন ও তাঁর সঙ্গীরা

বছরের যুবক ছিল। তার নাম হ্যানস হেনড্রিক। সে গ্রীনল্যাণ্ডের অধিবাসী। সে কেনের লোকদের ভালুক শিকার করতে শিখিয়েছিল আর কিভাবে পাখি মেরে খাদ্য-সমস্যা সমাধান করতে হয় তাও শিখিয়েছিল। একটা ফুটদশেক লাঠির মাথায় সিলের চামড়ার জাল বেঁধে সেটা নিয়ে পাহাড়ের মাঝ বরাবর উঠে সে বসে থাকত। তারপর সমুদ্র থেকে পাখি উড়লেই হঠাৎ জাল বাড়িয়ে তাদের ধরে ফেলত। কাজেই খাবারের অভাব তাদের কোনদিন হয় নি।

এলিশা কেন এই সব এস্কিমোর সাহায্য পেয়ে অনেক অঞ্চল আবিষ্কার করেন। তিনি কেন বেসিনের আবিষ্কর্তা। তিনি কেনেডি প্রণালী পর্যন্ত গিয়ে ইংগলফিল্ডের 'রেকর্ড' ভঙ্গ করেন। তিনি পরবর্তী অভিযাত্রীদের পথ খুঁজে পাওয়ার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কেন স্লেজে করে বহু মাইল বহু কষ্টে ভ্রমণ করলেও শেষ পর্যন্ত বরফের মধ্যে জমে মারা যান।

এতে কিন্তু উত্তর মেরু যাবার প্রচেষ্টা একটুও কমল না। কেনের দলের ডাক্তার হেয়েস (Hayes—১৮৩২-১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ) এবার সাহস করে এগোলেন। কিন্তু তাঁর কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় একটার পর একটা ভুল করে শেষ পর্যন্ত তাঁর দলের বিজ্ঞানী 'সণ্ট্যাগ' (Sontag)-কে হারাতে হল। সণ্ট্যাগ স্লেজে চড়ে যেতে যেতে ঠাণ্ডায় জমে পথের মাঝে মারা গেলেন।

এরপর এগিয়ে এলেন সিনসিনাটি (Cincinnati)-র একজন কামার। তাঁর নাম চার্লস ফ্রান্সিস হল (Charles Francis Hall—১৮২১-১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি পরে সাংবাদিক হন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিনের অনুসন্ধানে যে দল উত্তর মেরুর পথে যায় তিনি সেই দলে ছিলেন। দু'বছর বাদে তিনি এই দলের লোকদের হাড়গোড় খুঁজে বার করেন। পাঁচ বছর তিনি এস্কিমোদের দেশে কাটিয়েছিলেন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান সরকার তাঁকে 'পোলারিস' জাহাজের ক্যাপ্টেন করে মেরু অভিযানে পাঠান। এই অভিযানে তিনি স্মিথ প্রণালী থেকে ২৫০ মাইল উত্তর পর্যন্ত পৌঁছান। কিন্তু অসুস্থ হয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করার পর তিনি থ্যাংক গড বন্দরে (গ্রীনল্যাণ্ডে) এসে মারা যান।

পোলারিস জাহাজের ১৯ জন অভিযাত্রী ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর থেকে পরের বছর এপ্রিল পর্যন্ত জাহাজে করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এক তিমি-শিকারী শেষ পর্যন্ত তাঁদের উদ্ধার করেন। পোলারিস জাহাজটিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। নৌকো করে

একজন তিমিশিকারী শ্বেতাঙ্গদের পথ দেখিয়ে সাহায্য করেছিল

যাবার সময়ে তার যাত্রীদের কেপ ইয়র্ক থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি এই অভিযানে নামল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জারমানিয়া ও হান্‌সা নামে দু'টি জার্মান জাহাজ মেরু অভিযানে পাঠানো হল। দু'টি জাহাজ দু'দিকে আলাদা পথে চলে গেল। হান্‌সা জাহাজটা স্যাবিন দ্বীপ থেকে ৪০ মাইল দূরে দুটো বরফের বিরাট পাহাড়ের মধ্যে জমে গেল। জাহাজের নাবিকরা ভাবল যে শীঘ্র বরফ গলে গেলে তারা মুক্তি পাবে কিন্তু সমস্ত বরফের চাঁইটা যেই ঘুরতে লাগল তখন পাশের চাপে জাহাজ ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেল। তারা বরফের মধ্যে বন্দী হয়ে রইল।

অনেক দিন পরে বিরাট বরফের চাঁই ক্রমশঃ গলে ছোট হয়ে যেতে লাগল। পরের বছর বসন্ত-কালে যাত্রীরা ছোট ছোট নৌকো করে ফিরে আসতে সক্ষম হল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া থেকে একটা অভিযান চালানো হয়েছিল। এই দলের অধিনায়ক ছিলেন লেফটেনাণ্ট কার্ল উইপ্রেক্‌ট (Carl Weyprecht) ও জুলিয়াস পেয়ার (Julius Payer). ১৪ই জুলাই তাঁরা জাহাজ ছাড়লেন আর ৩৪ দিন বাদে তাঁরা ভাসমান বরফের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়লেন। প্রায় দু'বছর ধরে তাঁরা সমুদ্রস্রোতের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ঘুরে বেড়ালেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অগস্ট পর্যন্ত কোন ডাঙা তাঁরা দেখতে পেলেন না। তারপর ফ্রাঞ্জ জোজেফল্যাণ্ড তাঁদের চোখে পড়ল। কুয়াশা তখন একেবারে কেটে গেছে। কিন্তু চার-দিকের ভাসমান বরফস্তূপ ঠেলে ডাঙায় পৌঁছতে তাঁদের পুরো দু'টি মাস অপেক্ষা করতে হল।

পেয়ার দু'জন লোক, কুকুর আর স্লেজ গাড়ি নিয়ে বরফের উপর দিয়ে চলতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ পায়ের নীচে একটা বরফের সেতু মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। তাতে স্লেজ, কুকুরগুলো ও
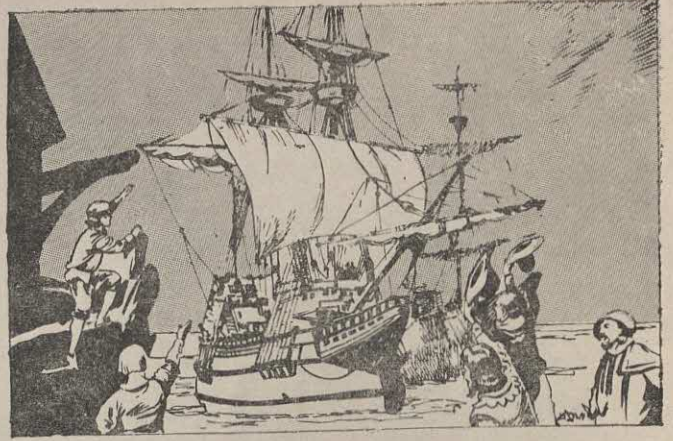
মেরু-অভিযানে জারমানিয়া ও হান্‌সা জাহাজ

লোকজন নীচে পড়ে ঝুলতে লাগল, কারণ পেয়ার স্লেজের দড়ি ধরে আটকে রইলেন। কিন্তু দড়ির টানে তিনি দু'খানা হয়ে যাবেন বলে তাঁর মনে হল। তিনি নীচের লোকটিকে বললেন, "আমি দড়ি কেটে দিচ্ছি, না হলে মারা যাব।"

নীচের লোকটি বলল, "তা হলে আমি ও কুকুরগুলো মারা পড়ব! দোহাই, আপনার দড়ি কাটবেন না।"

পেয়ার দেখলেন যে দড়ি কাটলে লোকটি স্লেজ-সুদ্ধ দশ ফুট নীচে আর একটা বরফের উপর পড়বে। তিনি দড়ি কেটে দিলেন। স্লেজ গাড়ি ও কুকুরের সঙ্গে লোকটি দশ ফুট নীচে আর একটা বরফের চাঁই-এর উপর আশ্রয় পেল।

পেয়ার উপর থেকে বললেন, "ঘণ্টা চারেক অপেক্ষা কর, আমি ব্যবস্থা করছি।" এই বলে ছ' মাইল পথ দৌড়ে তিনি তাঁবুতে গেলেন। পোশাক কমিয়ে, জুতো খুলে হালকা হয়ে, শুধু মোজা পায়ে তিনি প্রাণপণে ছুটে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে এলেন। ফিরে এসে যারা পড়ে গিয়েছিল তাদের সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে উপরে তুলে ফেললেন।

তারপর পেয়ারকে খাদ্যের জন্যে জাহাজে ফিরতে হল। পথে দুটো কুকুর ছাড়া আর সবগুলোকে মেরে খেতে হল। বরফের পিছল পথ, কত ফাঁক

ডিঙিয়ে, কত বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত আধ-মরা অবস্থায় পেয়ার সেখানে পৌঁছে দেখেন

"দোহাই, আপনার দড়ি কাটবেন না"
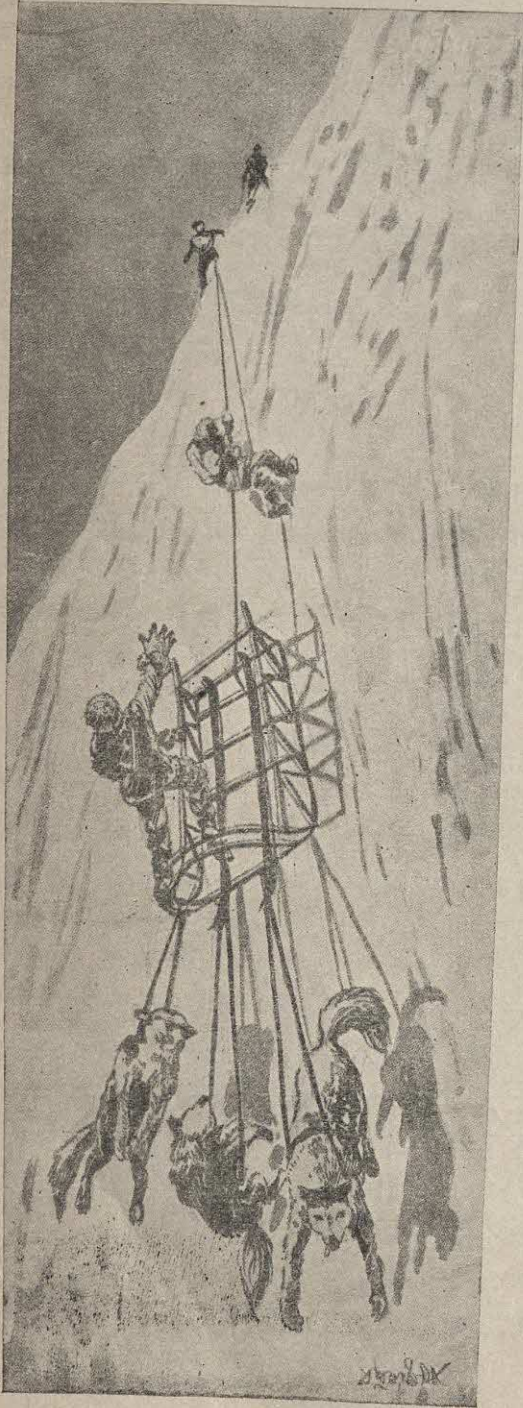
জাহাজ কোথাও নেই। হয়তো ভাসমান বরফের ধাক্কায় জাহাজ বহুদূরে ভেসে গেছে। পেয়ার হাল ছাড়লেন না। একটা উঁচু বরফের চুড়োয় উঠে পেয়ার জাহাজটি দেখতে পেলেন। কুকুর দুটোর মাথা ধরে তুলে তাদের জাহাজটি দেখালেন। তাদের চোখে আলোর ঝিলিক দেখা গেল। তারা কান খাড়া করে তাকাল। তাদের কিছু বলবার মতো স্বর তখন পেয়ারের গলায় ছিল না। কুকুর দুটো তাঁকে শেষ পর্যন্ত জাহাজে নিয়ে এল।

কিন্তু বরফের পথে কষ্ট করে এই জাহাজ নিয়ে তাঁরা বেশীদিন এগুতে পারলেন না। দু'বছর বাদে তাঁদের জাহাজ ছেড়ে দিতে হল। তাঁদের কি হল তা পঞ্চাশ বছর বাদে জানা গেল। ডেনরা নোভায়া জেমলায়া যাবার যে অভিযান চালিয়েছিলেন তার অধিনায়ক ছিলেন এক অধ্যাপক। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পেয়ারের পরিত্যক্ত জাহাজ থেকে তাঁর লেখা বিবরণী তিনি উদ্ধার করলেন। জাহাজ ছেড়ে তাঁরা পায়ে হেঁটে যাত্রা করে কোথাও মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

এরপর দু'জন ইংরেজ অভিযানে বার হলেন। এঁদের নাম জেমস ল্যামণ্ট (James Lamont) ও বেঞ্জামিন লে স্মিথ (Benjamin Leigh Smith). এঁরা ছোট ডিঙি নৌকো করে দুঃসাহসিক কাজের সন্ধানে উত্তর সমুদ্রে ভেসে পড়লেন। ল্যামণ্ট স্পিটসবার্গেনে একটা কয়লা খনি আবিষ্কার করলেন। তিন দিনে তাঁর লোকেরা দশ টন কয়লা তুলে ফেলল।

লে স্মিথ একজন পণ্ডিত লোক ও পাস-করা ব্যারিস্টার ছিলেন। উত্তরে তিনি পাঁচবার অভিযান চালান। তিনি স্পিটসবার্গেনে গিয়ে দেখেন সেখানে বেশ কতকগুলি লোক খুব বিপদে পড়ে আটক হয়ে রয়েছে। নর্ডেনশিল্ড ২৪ জনকে নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে ১০১ জন লোক অনাহারে এখানে আটক রয়েছে। খাদ্য ও পানীয় যা আছে তা ২৫।৩০ জনের উপযোগী। অথচ শীতকালটা এখানে কাটাতে হবে। এ বিপদের সময়ে লে স্মিথ যদি এসে উপস্থিত না হতেন তাঁরা অনাহারে মারা

ডিঙি নৌকো করে সমুদ্রে ভেসে পড়লেন

পড়তেন। লে স্মিথই এই গোটা দলকে উদ্ধার করেছিলেন।

স্মিথের ডিঙির নাম এইরা (Eira). তিনি দ্বিতীয়বার ফ্র্যাঞ্জ জোজেফল্যাণ্ড আবিষ্কার করলেন। পেয়ার (Payer) ছ'বছর আগে এ জায়গা আবিষ্কার করেছিলেন।

'এইরা' বরফের মধ্যে আটকে গেল। এর আরোহীরা তাঁবু ফেলবার আগেই ডিঙি বরফের চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পাথর ও কাদা দিয়ে একটা ঘর করে এরা তাতে আশ্রয় নিল। ভালুক, সিন্ধুঘোটক আর পাখির মাংস খেয়ে এরা টিঁকে রইল। এক সময়ে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। পেটের জ্বালায় ঘুরতে ঘুরতে তারা দৈবাৎ ছ'টা ভালুক দেখতে পেয়ে তাদের মেরে সেই মাংস খেয়ে সে-যাত্রা প্রাণ বাঁচায়।

গ্রীষ্মকাল এল। স্মিথ তাঁর ডিঙি উদ্ধার করলেন ও তাঁর টেবলক্লথ আর শার্ট দিয়ে পাল তৈরি করে তাতে সেই পাল খাটিয়ে দেশে ফিরে এলেন। এই দুঃসাহসী বীর উত্তর মেরুর অনেক মূল্যবান্ খবর পৃথিবীকে এনে দিলেন এবং এসব স্থানের মানচিত্র তৈরির কাজে যথেষ্ট সাহায্য করলেন।

এইভাবে বহু অভিযাত্রী বহু পথে উত্তর মেরু অভিযান চালাতে লাগলেন। সে সব ইতিহাস দীর্ঘ ও বিচিত্র। এইসব অভিযাত্রীদের মধ্যে একজনের কথা জানা দরকার। তাঁর নাম স্যার জর্জ নেয়ারস (Sir George Nares—১৮৩১-১৯১৫ খ্রীঃ)। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে গভর্নমেণ্ট তাঁকে তিনটি ছোট জাহাজ দিয়ে উত্তর মেরু অভিযানে পাঠান। ইতিমধ্যেই মেরু অভিযানের দুঃখকষ্ট, মৃত্যু ইত্যাদির খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবুও যখন স্যার জন নেয়ারস স্বেচ্ছাসেবী ডাকলেন, ৮০০ দুঃসাহসী লোক এই অভিযানে যোগ দেবার জন্যে এগিয়ে এল।

এই অভিযান লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলেও উত্তর মেরুর ৩৯৯ মাইলের মধ্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন অভিযাত্রীরা। এঁরা ভূগোল, ভূতত্ত্ব ও প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন। উত্তরে বহুদূরে ওয়াশিংটন আর্ভিংল্যাণ্ডে এঁরা একটা পাথরের স্তূপ আবিষ্কার করেছিলেন—সেটি খুব প্রাচীন। তার উপর লাইকেন জন্মেছে। দেখে মনে হয়েছিল পাথরের স্তূপ শ্বেতাঙ্গদের সৃষ্টি। কিন্তু কে তৈরি করেছিল সেটি? কবেই বা সেটি তৈরী হয়েছিল? এখানে তাঁরা স্যাণ্ডারলিং পাখির বাসা পেয়েছিলেন। সেটি এখনো প্রাণিবিজ্ঞানের চিহ্ন হিসেবে জাদুঘরে আছে। এখানে এস্কিমোদের পুরনো বাসস্থানের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। তাছাড়া কয়লাও পাওয়া গিয়েছিল।

তারপর যখন শীত এল তখন তাঁরা বহু কষ্টে একটা আশ্রয়স্থল পেলেন। কিন্তু সেখানেও বিপদ! দেখতে দেখতে সামনে বরফের পাহাড় জমে পথ বন্ধ হয়ে গেল। ৩০০ ফুট চওড়া, ৫০ ফুট উঁচু বরফের চাঁই তাঁদের ঘিরে ফেলল। যেরকম ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয়, তা থেকে ঢের নীচে নেমে এল ঠাণ্ডা। এর মধ্যেই নেয়ারস স্লেজ চালালেন—দু'ঘণ্টা লেগে গেল এক মাইল যেতে।

॥ লেফটেনান্ট জর্জ ওয়াশিংটন ডি লঙ ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎসাহে একটি জাহাজ নিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন ডি লঙ (George Washington De Long—১৮৪৪-১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ) ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে সান ফ্রান্সিসকো ত্যাগ করলেন। দু'মাস বাদে হেরাল্ড দ্বীপ ছাড়িয়ে বরফের মধ্যে তিনি আটক হয়ে গেলেন। এত ঠাণ্ডা যে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে না। দু'ঘণ্টা একজন নাবিকের শরীরের মধ্যে চেপে রেখে শেষ পর্যন্ত দেশলাই কাঠি জ্বালানো হল। তারপর তেল দিয়ে কিছু জিনিসপত্র পোড়ানো হল। এঞ্জিনকে চালাবার জন্যে ডি লঙ তাঁর শূকরকে পোড়ালেন। কিন্তু শেষে ডি লঙ বরফের মধ্যে বন্দী হয়ে গেলেন। জাহাজ বরফের চাপে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত নৌকোয় করে তাঁরা ভেসে আসতে লাগলেন।

দলের কিছু লোক ফিরল

দলের কিছু লোক ফিরল কিন্তু ডি লঙ অনাহারে ও শীতে মারা গেলেন। পরে একটি উদ্ধারকারী দল তাঁর হাড়গোড় আবিষ্কার করল।

ডি লঙের ডায়েরি নিয়ে যারা ফিরে এসেছিল তারা এই অভিযাত্রীদের মর্মন্তুদ মৃত্যুর যে বিবরণ দিল তাতে পৃথিবী ভয়ে শিউরে উঠল। এই অভিযানে একটি অল্পবয়সের চীনা রাঁধুনীর বিশ্বস্ততার যে কাহিনী প্রকাশ পেয়েছিল—তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। ছেলেটির নাম আহ্‌সান।

অনাহার, দুঃখকষ্ট, পরিশ্রম, ভয় আর তুষারে হাত-পা অবশ আর তার গা ফেটে ফেটে গেলেও তার মনোবল একটুও কমে নি। সে সব সময়ে তার প্রভু, তাদের দলপতির কাছে কাছে থাকত। তার শরীরের উত্তাপ দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করত। বরফ কেটে যখন তাদের মৃতদেহ বার করা হল তখন দেখা গেল ডি লঙের দেহের নীচে দোভাঁজ হয়ে পড়ে আছে আহ্‌সানের মৃতদেহ।

নৌকায় করে ভেসে আসতে লাগলেন

সাইবিরিয়ার কূলে ডি লঙের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। তিন বছর বাদে গ্রীনল্যাণ্ডের কূলে ভেসে আসতে লাগল জাহাজের ভগ্নাংশ, জামাকাপড়, লেখা কাগজ। এসব এশিয়ার বেরিং প্রণালী হয়ে ইওরোপে পৌঁছতে লাগল। তবে কি মেরুর পথে ভয়ংকর সমুদ্রের মধ্য দিয়ে কোন সংক্ষিপ্ত রাস্তা আছে? এ সমস্যা এসে বাসা বাঁধল নরওয়ের পণ্ডিত এবং দেশ-আবিষ্কারক ফ্রিচফ ন্যানসেনের মাথায়।

॥ ডাক্তার ন্যানসেনের অভিযান ॥

ডাক্তার ফ্রিচফ ন্যানসেন (Fridtjof Nansen—১৮৬১-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) নরওয়ের রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেরু অভিযানের জন্যে 'ফ্র্যাম' জাহাজ তৈরি করালেন। 'ফ্র্যাম' কথাটির মানে 'অগ্রবর্তী'। জাহাজটি ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত শক্ত করে তৈরী, যাতে বরফের চাপে ভেঙে না যায়।

ন্যানসেন দীর্ঘকাল ধরে মেরু অঞ্চলের পথ, সমুদ্র ও সেখানকার বিপদ-আপদ সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছিলেন। তিনি জাহাজ নিয়ে চলে গেলেন উত্তর এশিয়ার তীরে। চেলিউস্কিন (Chelyuskin) অন্তরীপ ঘুরে চলে এলেন নিউ সাইবিরিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। আর পথে একটি ভাসমান বরফের উপর নঙ্গর করলেন। পরের ৩৫ মাস এই ভাসমান বরফের চাঁই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল। ভাসমান বরফের সঙ্গে সঙ্গে 'ফ্র্যাম্' জাহাজও ভেসে চলল। ঘুরপথে এঁকেবেঁকে অজানা স্রোতে এইভাবে চলতে লাগল জাহাজটি। ৮৫° অক্ষাংশ ও ৬৬° দ্রাঘিমায় খুব তাড়াতাড়ি জাহাজ এসে পৌঁছে গেল। এর আগে কোন জাহাজ এত উত্তরে পৌঁছতে পারে নি।

অবশেষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে 'ফ্র্যাম' এই ভাসমান বরফস্তূপ থেকে মুক্ত হল।
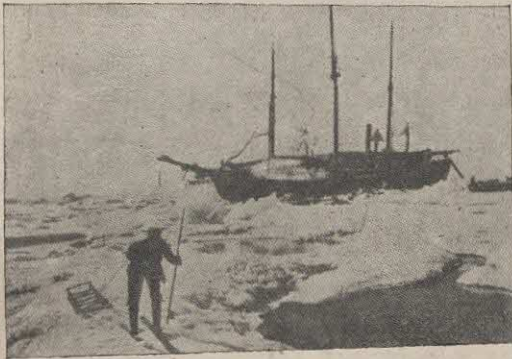
ন্যানসেনের জাহাজ ফ্র্যাম
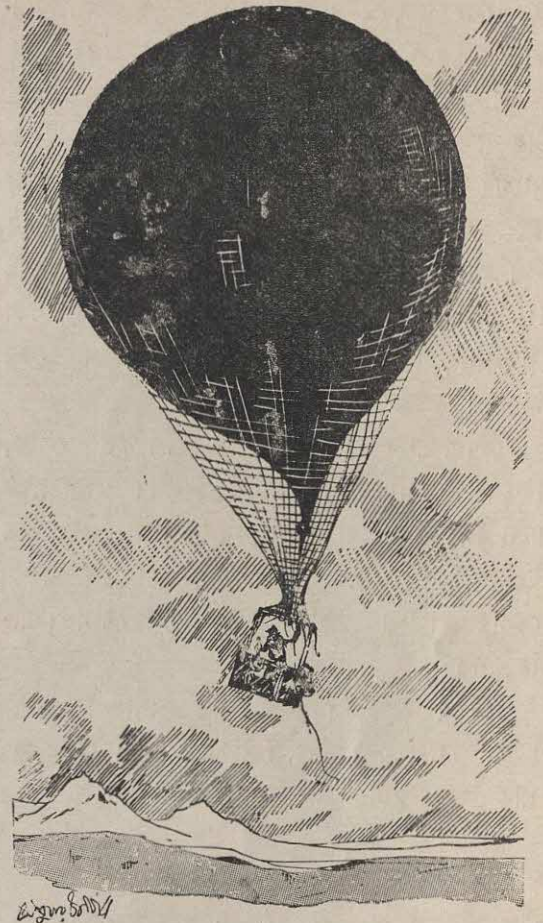
আন্দ্রে বেলুনে চড়ে আকাশে উড়লেন

বাষ্প তৈরি করে এবার তিনি ডেনস্ দ্বীপের (Danes Island) দিকে জাহাজ চালালেন। স্পিটস-বার্গেনে এই দ্বীপ। এখানে সবে তিনি জাহাজ নঙ্গর করেছেন এমন সময়ে তাঁর দেখা হল সলোমন অগাস্ট আন্দ্রের সঙ্গে। ইনি জাতে সুইস। এঁর সঙ্গে এসেছিলেন ডাক্তার একহোম (Ekhholm) আর স্ট্রিনডবার্গ (Strindberg). এই সুইস ভদ্রলোক তখন বেলুনে করে উত্তর মেরু উড়ে যাবার উপক্রম করছিলেন। এটি নিছক পাগলামি! ফলে সেই যে তিনি বেলুনে চড়ে আকাশে উড়লেন সেই শেষ। পরে কেউ আর তাঁকে দেখে নি।

কিন্তু ন্যানসেনের কি হল? তিনি তাঁর জাহাজটিকে একটা ভাসমান বরফের চাঁইয়ে নঙ্গর

করে সেই বরফের সঙ্গে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এমনি করে দীর্ঘ কুড়িটি মাস কেটে গেল। তিনি হিসেব করে দেখলেন যে এইভাবে ভাসতে ভাসতে তাঁর পক্ষে উত্তর মেরু পৌঁছনো সম্ভব হবে না। তার আগেই তাঁর খাদ্য ফুরোবে—কাজেই তিনি তাঁর সঙ্গে নিলেন তাঁরই মতো একজন সাহসী লোককে। তাঁর নাম ফ্রেডারিক হ্যালমার জোহানসেন (Frederick Hjalmar Johansen). কয়েকটি কুকুর আর একটা স্লেজ গাড়ি নিয়ে তাঁরা দু'জনে নেমে পড়লেন বরফের রাজ্যে।

জোহানসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত লোক, কিছুকাল সেনাবিভাগে কাজ করেছিলেন। ন্যানসেনের দলে ভিড়ে উত্তর মেরু অভিযানে যেতে তাঁর এত ইচ্ছে হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত জাহাজে কয়লা ঠেলার কাজ নিয়ে তিনি এই দলে যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দু'জন দুঃসাহসী এগিয়ে চললেন সাদা বরফের মধ্য দিয়ে। সাদা বরফ আর শীত—জনমানুষের দেখা নেই। শুধু মানুষ বলতে তাঁরা দুজন। এইভাবে কেটে গেল দেড় বছর। স্লেজ গাড়ির সঙ্গে তাঁরা এস্কিমোদের নৌকো বা কায়াক জুড়ে নিলেন আর অসীম সাহসে ভর করে চললেন। একবার ক্রুদ্ধ একদল ভালুকের সামনে পড়েন তাঁরা। একবার জলের মধ্য থেকে সিন্ধুঘোটকরা তাঁদের দু'টি কায়ারের একটি দাঁত দিয়ে ফাঁসিয়ে দিল। একবার পড়ে গেলেন বরফের এক খাদের মধ্যে। বরফের মধ্যে জমে গিয়ে ন্যানসেনের হল দারুণ গেঁটে বাত। একবার এমন খাদ্যাভাব হল যে কুকুরের রক্ত খেয়ে সে যাত্রা তাঁদের প্রাণ রক্ষা করতে হল।

ক্রুদ্ধ একদল ভালুকের সামনে

সে যাই হোক, এইভাবে তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁরা দেড়'শ মাইল অগ্রসর হলেন। দারুণ শীতে আর অগ্রসর হওয়া যাবে না ভেবে তাঁরা উত্তরে ৮৬ ডিগ্রী ১৪ মিনিটে অবস্থিত এক জায়গায় তাঁবু খাটালেন। কিন্তু সেখানে থাকবার সাহস হল না। চারদিকে দুর্ভেদ্য পাঁচিলের মতো বড় বড় বরফের পাহাড়। ফেরবার পথ শীঘ্র বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাজেই ন্যানসেন দক্ষিণে ফিরে চললেন—স্পিটসবার্গেন বা ফ্রাঞ্জ যোজেফল্যাণ্ডের দিকে। এই যাত্রার বিবরণ ন্যানসেন তাঁর ডায়েরিতে লিখে গেছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা কোথায় এসে পৌঁছলেন তা ঠিক করতে পারলেন না। তাঁদের সব যন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, এখানে তাঁরা প্রচুর ভালুক শিকার করে খেয়ে দেয়ে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনলেন।

বসন্তকাল এল। তাঁরা দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। এবার তাঁরা অনেক বিপদের মধ্যে পড়লেন। একবার তাঁদের কায়াক নৌকো দুটো তো তাঁদের ছেড়ে জলে ভেসে প্রায় নাগালের বাইরেই চলে যাচ্ছিল। হিমের মতো ঠাণ্ডা জলে নেমে বহুকষ্টে ন্যানসেন সেদুটো উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। ফলে তাঁর হাত-পা এমন অবশ হয়ে গেল এবং তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়লেন যে কায়াকে চড়বার ক্ষমতাও তাঁর রইল না। এইভাবে মৃত্যুর সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করতে করতে দুই বন্ধু এগুতে লাগলেন।

এই সময়ে হঠাৎ তাঁরা কুকুরের ডাক শুনতে পেলেন। এ কুকুর বুনো কুকুর নয়। তারা ডাকে না। পোষা কুকুরই ডাকে। জোহানসেনকে তাঁবুর জিম্মায় রেখে ন্যানসেন কুকুরের ডাক লক্ষ্য করে এগুলেন।

তিনি দূরে এক মানুষের মূর্তি দেখতে পেলেন। তাঁর মুখে ইংরেজি ভাষা শুনলেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল উস্কখুস্ক, দেহ কঙ্কালসার, চোখ কোটরে ঢুকেছে। লোকটি বললেন যে, তিনি ন্যানসেনকে খুঁজছেন। সামনেই দাঁড়িয়ে ন্যানসেন, কিন্তু তাঁকে তিনি চিনতেই পারলেন না।

ন্যানসেন কিন্তু লোকটিকে চিনেছিলেন। ইনি তাঁর দলেরই লোক। এঁর নাম জ্যাকসন। এঁকে ন্যানসেন অন্য কয়েকজনের সঙ্গে কিছুকাল আগে ফ্রাঞ্জ যোজেফল্যাণ্ডে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ কথা বলবার পর জ্যাকসন ন্যানসেনকে চিনতে পারলেন। পরে তিনি ন্যানসেন ও জোহানসেনকে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে গেলেন।

রবার্ট এডউইন পিয়েরি

ডাঃ এফ ন্যানসেন

এই বছরে খাদ্যসম্ভার নিয়ে একটা জাহাজ এল। অভিযান চালাবার জন্যে জ্যাকসন রয়ে গেলেন। ন্যানসেন ও জোহানসেন সভ্যজগতে ফিরে গেলেন।

এবার এলেন বরফের দেশে একজন লোহার মানুষ। তাঁর দেহ যেমন শক্ত-সমর্থ, মনটাও তেমনি ইস্পাতের মতো কঠিন। ইনি এলেন পেনসিলভানিয়া (Pennsylvania) থেকে। এঁর নাম অ্যাডমিরাল রবার্ট এডউইন পিয়েরি (Admiral Robert Edwin Peary—১৮৫৬-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরে অভিযান চালিয়ে একটি জায়গা আবিষ্কার করে তার নাম দেন ইনডিপেণ্ডেন্স উপসাগর (Independence Bay). তিনি বহুকাল এস্কিমোদের মধ্যে বাস করে তাদের রাজনীতি, আদবকায়দা, জীবনযাপন-প্রণালী শিখে ফেললেন।

পিয়েরি আটবার উত্তর মেরু অভিযানে যান। তিনি বলতেন যে উত্তর মেরু পৌঁছতে হলে এস্কিমোদের মতো থাকতে হবে।

তিনি বারে বারে অভিযান চালিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে "রুজভেল্ট" (Roosevelt) জাহাজে চেপে তিনি মেরুবিজয়ে বেরুলেন। এই জাহাজে ক্যাপ্টেন ছিলেন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের রবার্ট বার্টলেট (Robert Bartlett).

এই দলে ছিল সাতজন শ্বেতাঙ্গ, সতের জন এস্কিমো, একজন নিগ্রো, উনিশটি স্লেজ গাড়ি আর একশ তেত্রিশটি কুকুর।

জাহাজ থেকে নেমে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তাঁরা হাঁটতে শুরু করলেন। মার্চ মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত সূর্যের দেখা মেলেনি—অন্ধকার পথে তাঁরা চলতে লাগলেন। তারপর একদিন দিগন্তের একটু উপরে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে থালার মতো সূর্য দেখা গেল।

ক্রমশঃ লোকসংখ্যা ও কুকুরের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হতে লাগল। প্রধান দলটির ফেরবার পথে রসদ জমা করে দিয়ে এস্কিমোরা ও কুকুররা ক্রমশঃ ফিরে যেতে লাগল।

তারপর পিয়েরি শুধু একজন নিগ্রোকে সঙ্গে নিলেন, তার নাম ম্যাথু হেনসন (Matthew Henson).

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল পিয়েরি ও হেনসন উত্তর মেরুতে এসে পৌঁছলেন। আরও দশ মাইল এগিয়ে যেতে আকাশে আলো ফুটল। পিয়েরি দেখলেন যে তিনি মেরুবিন্দু পেরিয়ে গেছেন।

চারদিকে শুধু সাদা বরফের স্তর, তুষার আর বরফ। এখানে কোন শব্দ নেই—বরফ ছাড়া আর কিছু নেই। সমুদ্রের জল মোটা সাদা চাদরের মতো জমে আছে।

সেখানকার উত্তাপ হিমাঙ্ক থেকে ৩৩ ডিগ্রী নীচে।

এই স্থানে পৌঁছবার জন্যে মানুষ ৩০০ বছর ধরে চেষ্টা করেছে। দলে দলে মানুষ বরফের দেশে হারিয়ে গেছে, প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও নতুন দল এসেছে।

এক ঘণ্টা তাঁরা দু'জন সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একজন শ্বেতাঙ্গের সাথে একজন কালা আদমি—একজন নিগ্রো!

তারপর পিয়েরি উত্তর মেরু থেকে ক্রমশঃ ফিরে আসতে লাগলেন সভ্য-জগতের মধ্যে। লাব্রাডরের ইণ্ডিয়ান হারবার থেকে বেতারে খবর দেওয়া হল। পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসে জগতের লোক পিয়েরির এই বিস্ময়কর অভিযানের সাফল্যের কথা জানতে পারল।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পিয়েরি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন। তাঁকে যাঁরা অভিনন্দন জানালেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন স্কট। দু'বছর পরে এই স্কটই দক্ষিণ মেরু পৌঁছে সেখানেই মারা যান।

॥ দক্ষিণ মেরু অভিযানের কথা ॥

অ্যাণ্টার্কটিকা (Antarctica) বা কুমেরু অঞ্চল অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু অঞ্চলটি সম্পূর্ণই এক হাজার থেকে দু'হাজার ফুট বরফের স্তরের তলায় ঢাকা। উত্তর মেরুর বরফের নীচে ডাঙা নেই, শুধুই জল। কিন্তু সমস্ত দক্ষিণ মেরু অঞ্চল হচ্ছে ডাঙা জায়গা, পুরু বরফের তলায় চাপা। এ অঞ্চলের তটরেখা ১৪,০০০ মাইল দীর্ঘ, তার মধ্যে মাত্র ৪,০০০ মাইল বরফ-

দক্ষিণ মেরুতে বরফস্তূপের বিভীষিকা

মুক্ত। এসব জায়গা অবিচ্ছিন্ন পাহাড়ের চুড়োর মতো, শত শত ফুট উঁচু। এই চিরশীতের রাজ্যে বিরাট বিরাট পর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে আবার কয়েকটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরিও আছে। এরেবাস (Erebus, ১৩০০০ ফুট উঁচু) ও টেরর (Terror) রীতিমতো আগ্নেয়গিরি। এদের ভিতরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, কিন্তু উপরটা তুষার ও বরফে ঢাকা।

দেড় শতাব্দী ধরে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে অভিযান চালিয়ে এ সম্বন্ধে অভিযাত্রীদের জ্ঞান আহরণ করতে হয়েছে। ইওরোপ ও অস্ট্রেলিয়া যোগ করলে তবে এর সমান হতে পারে, এত বড় এই কুমেরু অঞ্চল—একে তাই মহাদেশও বলা চলে। এর তিন ভাগের এক ভাগ জায়গায় মাত্র মানুষ যেতে পেরেছে। এককালে এখানে যে প্রচুর রোদ উঠত সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নেই। তার কারণ এখান থেকে প্রচুর কয়লা পাওয়া যাচ্ছে। অরণ্য দীর্ঘকাল মাটি চাপা পড়ে থাকলে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। কাজেই বুঝতে পারা যায় এখানে এককালে অরণ্য ছিল। সূর্যের পর্যাপ্ত আলো না পেলে গাছপালা জন্মাতে পারে না। এই থেকে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে এককালে এখানে প্রচুর রোদ উঠত আর সেজন্যেই প্রচুর গাছপালা জন্মাত।

তখন গ্যাস আবিষ্কার হয় নি। কয়লার সন্ধানে দলে দলে লোক এদিকে ছুটে আসত। আর তেলের জন্যে সীল ও তিমিমাছ ধরতে আসত।

মানুষ তাদের প্রয়োজন মেটাতেই এদিকে দলে দলে আসতে শুরু করে দেয়। কষ্ট, মৃত্যু, বিপদ এসব অগ্রাহ্য করেই তারা ছুটত। তাদের মুখের কথা ছিল, দক্ষিণে চলো (Southward ho)! এই দক্ষিণের খবর নিয়ে যেত তিমি ও সীল-শিকারীরা। তারাই দক্ষিণ জর্জিয়া, দক্ষিণ শেট্‌ল্যাণ্ড ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিল।

তেল পাবার আশায় সমুদ্রের এই সব জলজন্তুদের শিকার করতে যে সব শিকারী আসত, তারা শুধু শিকারই করত না, অভিযানের শখও তাদের কিছু

সীল ও তিমিমাছ ধরতে আসত

কিছু ছিল। তাই অনেক খবর যোগাড় করে তারা আমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সব লোকের মধ্যে জন বিসকো (John Biscoe) ও জেমস ওয়েডেল (James Weddell)-এর নাম করা যায়। তাঁরা তাঁদের কাঠের তৈরী জাহাজে চেপে এই কুমেরু অঞ্চলে দুঃসাহসী অভিযান চালাতে পেরেছিলেন।

ভাইকিংরা দেড়শ বছর ধরে এই সব দক্ষিণের দেশে অভিযানে আসছিল। তাদের ছিল দাঁড় ও পালের জাহাজ—সেসব জাহাজ কাঠের তৈরী। কত দক্ষ নাবিক ছিল তারা তা এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

॥ ক্যাপ্টেন ভন বেলিংহাউসেন ॥

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ভন বেলিংহাউসেন (Captain Von Bellinghausen) পৃথিবী ঘুরে একটি রুশ দল নিয়ে ১৮১৯ থেকে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অ্যাণ্টার্কটিকাতে অভিযান চালিয়ে দক্ষিণে

৭০ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পীটার দি ফার্স্ট দ্বীপ এবং আলেকজাণ্ডার দি ফার্স্ট দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তিনি বলেছিলেন যে জমাট বরফ পেরিয়ে ৬০ ডিগ্রীতে খোলা সমুদ্র আছে।

ওয়েডেল দক্ষিণে ৭৪ ডিগ্রীর ওপারে গিয়েছিলেন। তিনি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়েডেল সাগর' আবিষ্কার করেন। বিস্কো 'গ্রাহাম দ্বীপ' আবিষ্কার করেন। তাছাড়া অ্যাডেলেড দ্বীপ, বিস্কো দ্বীপপুঞ্জ তাঁরই আবিষ্কার। এখন যাকে ব্যালিনী দ্বীপপুঞ্জ বলা হয় তা জন ব্যালিনী (John Balleny) আবিষ্কার করেন। তারপর এলেন একজন ফরাসী নৌবিভাগের লোক। নাম তাঁর ড্য উরভিল (D' Urville). আমেরিকার অভিযাত্রী উইলকি ও রসের পিছু পিছু তিন বছর ঘুরে ড্য উরভিল উরভিল সমুদ্র আবিষ্কার করেন। ইনিই মেলোস দ্বীপে 'ভেনাস ডি মিলো'র সুবিখ্যাত অপূর্ব সুন্দর পাথরের মূর্তিটি আবিষ্কার করেছিলেন।

এরপর এক সঙ্গে তিন দেশ থেকে তিনটি অভিযান একযোগে শুরু হল। একটি ফরাসী, একটি আমেরিকান ও একটি ব্রিটিশ।

দুঃসাহসী স্যার জেমস ক্লার্ক রস (Sir James Clark Ross—১৮০০-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ)-এর নাম আগে বলা হয়েছে। নৌবিভাগ থেকে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে দক্ষিণ মেরু-বিন্দু আবিষ্কারে পাঠান হল। তিনি দু'টি জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ভাসলেন। একটির নাম এরেবাস (Erebus), অপরটির নাম

দক্ষিণ মেরুতে পেঙ্গুইনদের দল

টেরর (Terror). তাঁর দলের দ্বিতীয় অফিসারের নাম ক্রোজিয়ার (Crozier). তাঁর নামেই একটি অন্তরীপের নাম করা হল। রস এইখানে এক দেশ আবিষ্কার করলেন। তার পরই দুর্গের মতো বরফের উঁচু উঁচু পাহাড়। এর নাম 'দি গ্রেট আইস ব্যারিয়ার'। তিনি দক্ষিণ ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড অধিকার করে তার নামকরণ করলেন। তারপর বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ৭৫ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশে পৌঁছে তিনি ফিরে এলেন।

তুষার-ঝড়, ভাসমান বরফের পাহাড় এসবের সঙ্গে জাহাজ দু'টি যুদ্ধ করে অজানা সমুদ্রস্রোতে পড়ে, ঝড়ের ধাক্কায় একস্থানে গিয়ে পৌঁছয়। এখানে রস দশ হাজার ফুট উঁচু এক পাহাড় দেখে তার নাম দেন মাউন্ট স্যাবিন।

তিনি দু'টি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করেন। তাঁর জাহাজ দুটির নাম অনুযায়ী একটির নাম দেন মাউন্ট এরেবাস ও অপরটির নাম দেন মাউন্ট টেরর।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি বাষ্পের জাহাজ 'দি চ্যালেঞ্জার' অ্যান্টার্কটিকায় গিয়েছিল। এর অধিনায়ক ছিলেন নেয়ারস (Nares), যাঁর কথা আগে উত্তর মেরু অভিযানের কথায় বলেছি। এর পর ত্রিশ বছর আর কেউ এই সাদা বরফের নিস্তব্ধ রাজ্যে অভিযান করতে আসেন নি।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম থেকে অ্যাড্রিয়েন ড্য গারল্যাচি 'বেলজিকা' জাহাজে দক্ষিণ মেরু অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু শীতের প্রকোপ সহ্য করতে পারলেন না। দশ সপ্তাহ অন্ধকার রাতের মধ্যে কাটিয়ে সূর্য উঠলে দেখলেন যে জাহাজ বরফের মধ্যে জমে গেছে। তাঁরা অন্য একটি স্টীমারে করে কোনরকমে ফিরে এলেন।

এই অভিযানে ছিলেন রোয়াল্ড আমুণ্ডসেন। পরবর্তী সময়ে ইনিই 'উত্তর-পশ্চিম পথ' আবিষ্কার করেন ও সকলের আগে দক্ষিণ মেরু পৌঁছান।

উত্তর মেরুর চেয়েও ঠাণ্ডা আর নিস্তব্ধতার রাজ্য দক্ষিণ মেরু। সমুদ্রের ধারে ছাড়া এখানে কোন প্রাণীর চিহ্ন দেখা যায় না।

গ্রীষ্মকালে তীরের কাছে পেঙ্গুইনরা বাসা বাঁধে—জলে সীল আর সিন্ধুঘোটক দেখা যায়। শীতকালে ভালুক, খেঁকশেয়াল বা কস্তুরী ষাঁড় কিছুই দেখা যায় না; বল্‌গা হরিণ বা কোন পাখির দেখা মেলে না—কোন এস্কিমোকেও এ অঞ্চলে আসতে দেখা যায় না।

একজন নরওয়ের অধিবাসী সারা শীতকাল অ্যাণ্টার্কটিকায় কাটাতে সক্ষম হন। এই দলের নিকোলাই হ্যানসন (Nikolai Hanson) গ্রীষ্ম আসবার আগেই মারা পড়লেন। তাঁকে এই বরফের রাজ্যে বরফের মধ্যে কবর দেওয়া হয়।

কবর দেওয়াও খুব সহজে হয় নি। বরফ এত শক্ত যে সারাদিনে তিন জন মিলে খেটে মাত্র চার ইঞ্চি খুঁড়লেন। পরদিন ডিনামাইট দিয়ে বরফের চাঁই উড়িয়ে দেখলেন তলায় একটা তুষারনদী জমাট বেঁধে রয়েছে। কতকাল আগে যে এ নদী এমনি জমাট বেঁধেছিল তা বলা যায় না।

ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেখলেন তলায় তুষারনদী

এই দল দেখতে পেয়েছিল এক আশ্চর্য দৃশ্য—হাজার হাজার পেঙ্গুইন হেঁটে চলেছে সৈনিকের মতো বরফের উপর দিয়ে সমুদ্র থেকে বারো মাইল অভ্যন্তরে। এমনি পাখির মিছিল চলে চোদ্দ দিন ধরে। রাত নেই দিন নেই, বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। কে এদের ডাকল, কেমন করে কোথা থেকে এরা এল, কি করে সব একই সময়ে এল—তা প্রকৃতির এক রহস্য!

রসের দল স্লেজ করে এগিয়ে চললেন। ৭৮ ডিগ্রী ৫০ মিনিট দক্ষিণে পৌঁছলেন এঁরা। এইটি হল উনবিংশ শতাব্দীর রেকর্ড।

॥ রবার্ট ফকন স্কট ও আর্নেস্ট হেনরি শ্যাকলটন ॥

রবার্ট ফকন স্কট (Robert Falcon Scott—১৮৬৮-১৯১২ গ্রীষ্টাব্দ) ডিভনপোর্টে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মেছিলেন রুগ্‌ণ হয়ে।

তবুও ১৩ বছর বয়সে তিনি নৌবিভাগে যোগ দেন। ১৯০১ গ্রীষ্টাব্দে তিনি, আর্নেস্ট হেনরি শ্যাকলটন (Sir Ernest Henry Shackleton—১৮৭৪-১৯২২ গ্রীষ্টাব্দ), ডাক্তার ই. এ. উইলসন ও আর কয়েক জনের সঙ্গে দক্ষিণ মেরু অভিযানে যান। তাঁর জাহাজের নাম ছিল ডিস্‌কভারী।

রস দ্বীপের টেরর পাহাড়ের পাদদেশে এসে নামলেন স্কট। তারপর তাঁর জাহাজ গ্রেট ব্যারিয়ার ধরে পুবদিকে চলল। এখানে তিনি এক ভূভাগ আবিষ্কার করলেন। এর নাম দিলেন তিনি কিং এডওয়ার্ড দি সেভেনথ্‌ ল্যাণ্ড।

স্কট শীতকাল কাটালেন ম্যাকমার্ডো সাউণ্ডে (McMurdo Sound). আর বসন্তকাল এলে উইলসন শ্যাকলটনকে নিয়ে স্লেজে করে চললেন দক্ষিণ অভিমুখে। উঁচু-নীচু বরফের পাহাড়ের

মধ্য দিয়ে দুর্গম পথে ৩৭০ মাইল পথ অতিক্রম করে দক্ষিণে চললেন। কিন্তু তবুও ডাঙ্গা পেলেন না।

সাউথ ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত পর্বতমালা সর্বদা তাঁর চোখের সামনে। পথে ক্লান্ত হয়ে ও খিদের জ্বালায় প্রায় সব কুকুরই মারা পড়ল। শ্যাকলটন ভেঙে পড়লেন। তাঁর স্কার্ভি রোগ দেখা দিল। এই রোগে মাঢ়ি ফুলে ওঠে আর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই ৮২°১৭′ দক্ষিণ অক্ষাংশে পৌঁছে তাঁদের ফিরে আসতে হল। তাঁদের ফিরে আসতে ৫৯ দিন লেগেছিল। লাভ হল এই যে দক্ষিণ মেরু যাবার পথটি স্কট আবিষ্কার করে ফেললেন। পরের বছর তিনি ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড থেকে পশ্চিমে ৩০০ মাইল এগোলেন আর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন।

এরপর ১৯০৮ খ্রীঃ শ্যাকলটন নেতা হয়ে নিমরড (Nimrod) জাহাজে করে অভিযানে বেরোলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মের শেষে জাহাজ কেপ রয়েড পৌঁছল। আসন্ন শীতের ভয়ে তাঁকে বাধ্য হয়ে তাড়াহুড়ো করে এখানে নামতে হল। ইতিমধ্যেই কিং এডওয়ার্ড দি সেভেন্থ্ ল্যাণ্ডে যাবার পথ বরফ রুদ্ধ করে ফেলেছে। তাছাড়া কয়লাও ফুরোবার সম্ভাবনা দেখা দিল। কয়লা ফুরোলে শীতকাল কি করে কাটাবেন তাঁরা?

তার উপর হঠাৎ এক বিপদ ঘটে গেল। কঠিন বরফের উপর মালপত্র, রসদ, ঘোড়া সব জড়ো করা ছিল। কয়েকটা মঙ্গোলিয়ান টাট্টু এনেছিলেন শ্যাকলটন। এদের দিয়ে স্লেজ টানাবেন বলেই এনেছিলেন। সহসা বরফের চাঁই ফেটে ফাঁক হয়ে অনেক মালপত্র আর আটটা টাট্টু ঘোড়া সেই খাদের মধ্যে পড়ে অতল তলে তলিয়ে গেল। তার উপর ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে এক ঝড় উঠে জাহাজকে একেবারে অকেজো করে দিল। তীরে প্রচুর জলকণার ঝাপটা এসে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো শক্ত হয়ে বরফের মতো জমে গেল।

খাদের মধ্যে অতল তলে তলিয়ে গেল

জাহাজের উপর যে সব ঢেউ এসে পড়তে লাগল তারা তখুনি জমাট বেঁধে এক ফুট পুরু হয়ে জমে যেতে লাগল। ঝড়ের বেগে একটা সাত পাউণ্ড ওজনের রাশিয়ান বুট জুতো সিকি মাইল দূরে উড়ে চলে গেল।

কুমেরু অভিযানে এসব তো দৈনিক ঘটনা। গ্রীষ্মকালেও উত্তাপ হিমাঙ্ক ছাড়িয়ে উঠে না। দীর্ঘ শীতের রাতে অন্ধকারে বার হলে আর রক্ষা নেই—কোথায় যে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে তার আর খোঁজ থাকবে না।

শ্যাকলটন স্কটের পথ ধরলেন। কিন্তু তিনি এক মারাত্মক ভুল করে বসলেন। কুকুরের উপর নির্ভর না করে তিনি টাট্টু ঘোড়াদের কাজে লাগালেন। ঘোড়াগুলো নুন খেতে অভ্যস্ত। নোনা বালি খেয়ে চারটে ঘোড়া মারা পড়ল। কাজেই টেনে নিয়ে যাবার মতো বাহনের অভাবে ওঁরা ধীর গতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন।

যাই হোক, বেয়ার্ডমোর গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে সাহসে ভর করে শ্যাকলটন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি কিং এডওয়ার্ড দি সেভেনথ্ মালভূমিতে পৌঁছে গেলেন। এর আগে অভিযাত্রীরা যতদূর পৌঁছেছিলেন এঁরা পৌঁছলেন তারও ৪২০ মাইল দক্ষিণে। সেটা হল ৮৮°২৩′ অক্ষাংশ। এখান থেকে মেরুকেন্দ্র আর ৯৭ মাইল মাত্র। কিন্তু যাট ঘণ্টা ধরে তুষার-ঝঞ্ঝা চলল। দলের সবাই
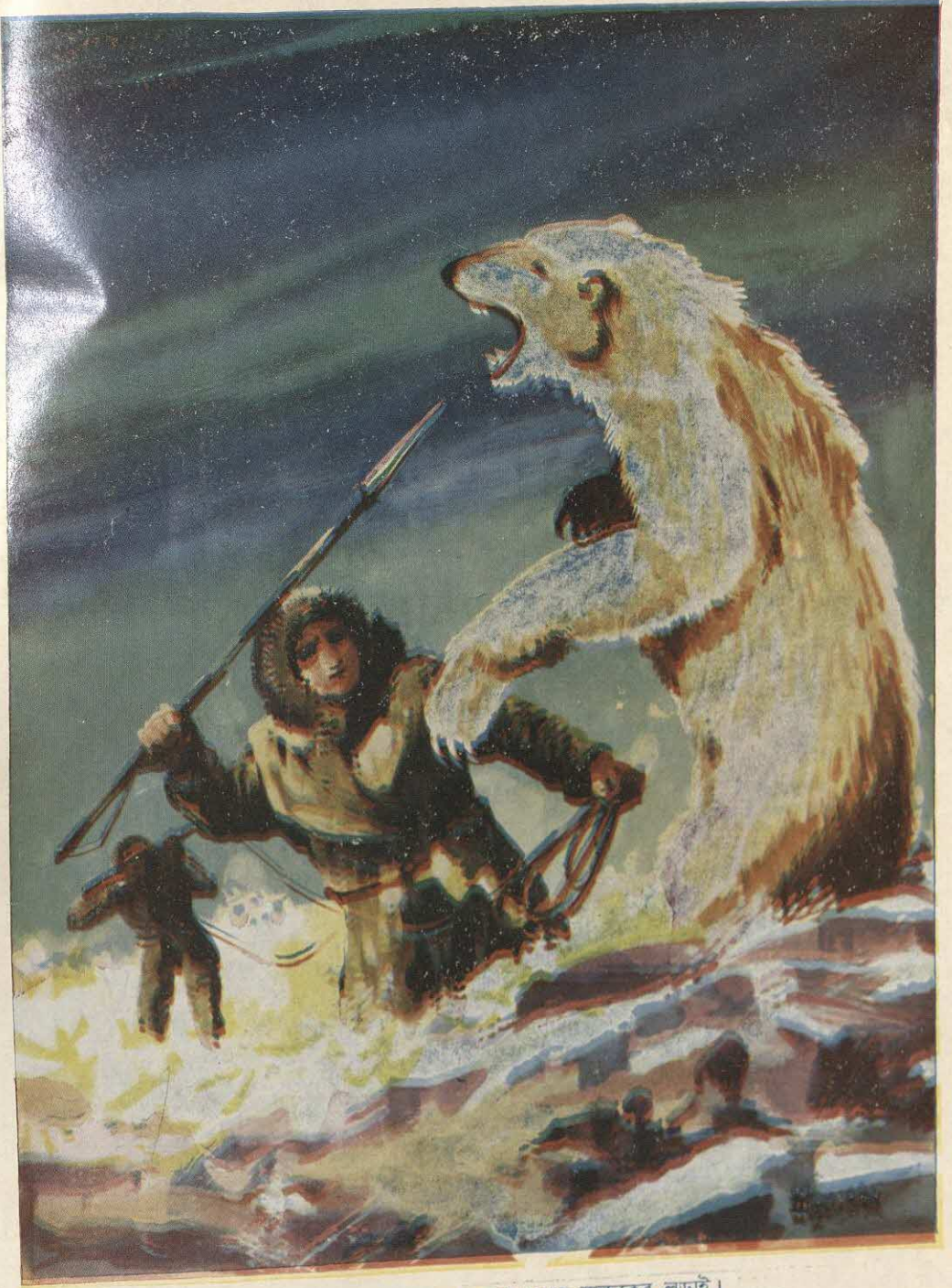
মেরু অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে শ্বেত ভল্লুকের লড়াই।

মেরু অভিযানের কথা:

[মেরু অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে **শ্বেত** ভল্লুকের লড়াই]

উত্তর মেরুপ্রদেশে প্রচণ্ড শীত। সেখানে সারা বছর ধরেই বরফ জমে থাকে। এস্কিমো, ল্যাপ, ফিন, স্যামোয়েড প্রভৃতি জাতির লোকেরা উত্তর মেরু অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বাস করে। তারা সীল, শ্বেত ভালুক প্রভৃতির মাংস খায়।

শ্বেত ভালুক শিকারে বেরিয়ে মেরু অঞ্চলের লোকেদের অনেক সময়ে শ্বেত ভালুকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। তারা সঙ্গে নেয় বর্শা ও চামড়ার দড়ি।

এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুজন শিকারী। তাদের সামনে একটা প্রকাণ্ড শ্বেত ভালুক। ভালুকটি আক্রান্ত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। সামনের লোকটি বর্শা হাতে তার সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

প্রায় আধমরা হয়ে পড়লেন। খাবার কমে গেছে, সকলের শরীর দুর্বল হয়ে গেছে, প্রাণ-শক্তি কমে আসছে, শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ আর বজায় রাখা সম্ভব নয়। শেষ টাট্টু ঘোড়াটাও মরেছে। এখন নিজেদেরই স্লেজ টানতে হচ্ছে।

কাজেই দলটিকে সেবার ফিরতে হল। কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে তাঁরা দেশে ফিরে এলে শ্যাকলটন তাঁর দুঃসাহসী কাজের জন্য 'নাইট' উপাধি পেলেন।

॥ ম্যাসনের দুঃসাহসিক অভিযান ॥

ইতিমধ্যে একটি দ্বিতীয় দল বেরিয়ে পড়ল। এই দলে ছিলেন অধ্যাপক এজওয়ার্থ ডেভিড (Edgeworth David), ডাক্তার ম্যাকে (Mackay) এবং ডাক্তার ডগলাস ম্যসন (Douglas Mawson—১৮৮২-১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁরা দুর্জয় সাহসে ভর করে হিমবাহের মধ্য দিয়ে হেঁটে দক্ষিণ ম্যাগনেটিক পোলে উপস্থিত হলেন। সেদিন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি। তাঁরা যেখানে উপস্থিত হলেন সেটা দক্ষিণে ৭২ ডিগ্রী ২৫ মিনিট অক্ষাংশ আর পুবে ১৫৫ ডিগ্রী ১৬ মিনিট দ্রাঘিমা। পথে উঁচু উঁচু বরফের পাহাড়, খাদ আর নরম তুষারের নদী। উপরটা শক্ত বরফে ঢাকা, কিন্তু পায়ের ভর দিলেই সেটা ভেঙে কোথায় যে তলিয়ে নিয়ে যাবে তার স্থিরতা নেই।

ম্যসন এমনি একটা খাদের মধ্যে হঠাৎ পড়ে গিয়ে স্লেজের দড়ি ধরে দশ ফুট নীচে ঝুলতে লাগলেন। এরকম বিপদে পড়েও তিনি পাহাড়ের গা থেকে অদ্ভুত আকৃতির বরফের জমাট-বাঁধা ছোট ছোট টুকরো সংগ্রহ করছিলেন আর সেগুলো পরীক্ষা করবার জন্যে উপরের সঙ্গীদের দিকে ছুড়ে দিচ্ছিলেন। এত বিপদেও এমনি স্বাভাবিক থাকা বড় কম সংযমের কথা নয়!

ম্যসন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দু'দল কুকুর আর জেভিয়ার মার্জ (Xavier Mertz) ও লেফটেনাণ্ট নিনিস (Ninnis)-কে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তখন গ্রীষ্মকাল। বরফ জমাট বেঁধে গেছে সারা

ম্যসন ঝুলতে ঝুলতেও পাথর কুড়োচ্ছেন

পথে, তুষার জমে আছে জায়গায় জায়গায়—ঝড়-ঝঞ্ঝায় তুষার ঝাঁট দিয়ে মাঝে মাঝে পাহাড়ের মতো করে রেখেছে—ঢিপির মতো উঁচু উঁচু তুষারস্তূপ। দেখে মনে হয় যেন সবটা একটা জমাট-বাঁধা সমুদ্র। তার মধ্যে মধ্যে খাদ—সেই খাদের ভিতর পড়ে গেলে আর বাঁচবার কোন সম্ভাবনা নেই—একটা একটা তুষার খাদ শত শত ফুট, কোথাও বা হাজার ফুট গভীর।

এমনি মরণ-ফাঁদ পাতা পথ দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন। ৩৫ দিনে তাঁরা ৩১৫ মাইল পথ অতিক্রম করলেন। সহসা এক ভয়ংকর গভীর খাদের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন নিনিস—তিনি স্লেজে করে যাচ্ছিলেন, তাঁর স্লেজে ছিল অধিকাংশ খাবার-দাবার আর সবচেয়ে ভাল কুকুরগুলো টানছিল সেই স্লেজটি। দড়ি ঝুলিয়ে নিনিসকে যে রক্ষা করবেন তারও

উপায় নেই। দড়িটা ছোট—নিনিস যেখানে পড়ে গেছেন অত দূর পর্যন্ত দড়িটা পৌঁছয় না।

ওঁদের কাছে রইল ছ'টা রোগা কুকুর, তাঁবুর ক্যানভাস, কিন্তু তাঁবু খাটাবার খুটিগুলো চলে গেল নিনিসের সঙ্গে। রান্নার স্টোভ আর তেল তাঁদের কাছে, কিন্তু অন্য সব রান্নার জিনিস নিনিসের সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল। রইল শুধু কিছু বাদাম আর কিশমিশ।

সারাদিন ধরে ম্যসন আর মার্জ তাঁদের সঙ্গীকে উদ্ধার করবার জন্যে নানারকম চেষ্টা করে বিফল হলেন। একটা কুকুরকে দেখা গেল দেড়শ ফুট নীচে আর শোনা গেল অস্ফুট একটা গোঁঙানি মাত্র। বরফের মধ্যে অন্ধকার খাদে কোথায় হারিয়ে গেলেন নিনিস, তাঁর আর কোন সন্ধান মিলল না।

ফেরবার পথে একে একে বাকী কুকুরগুলো মারা পড়ল, তারপর স্লেজটাকে ফেলে দিতে হল। স্লেজ টানবে কে? মার্জ দারুণ অসুস্থ হয়ে পথেই মারা গেলেন।

ম্যসন তখন একাকী চলতে লাগলেন। সম্বল কয়েক মুঠো কিশমিশ আর একটা কুকুরের মৃতদেহ —দরকার হলে কুকুরের মাংস খেতে হবে। চলতে চলতে কতবার খাদে পড়লেন, বহু কষ্টে উঠলেন খাদ থেকে। তারপর ফিরে চললেন পিছনে ফেলে আসা তাঁবুতে। এখানে কিছু রসদ পেলেন। ঘণ্টা ছয়েক আগে তাঁর লোকজন তাঁবু ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তিনি সেখানে বিশ্রাম করে আবার ফিরে যেখানে জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এসে হাজির হলেন। কিন্তু জাহাজ তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করে চলে গেছে। তাঁর জন্যে তারা রেখে গেছে পাঁচজন লোক ও কিছু খাদ্য। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে আবার জাহাজ তাঁকে নিতে ফিরে এল। ইতিমধ্যে তিনি কোনক্রমে শীতকালটা তাঁবুতে কাটিয়েছিলেন। তিনি জাহাজে চড়ে ফিরে এলেন। হারিয়ে এলেন বরফের দেশে তাঁর দু'জন প্রিয়বন্ধুকে। কিন্তু সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন বহু খবর। এই সব খবর পরের অভিযাত্রীদের কাজে লেগেছিল।

॥ আমুণ্ডসেন ॥

ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড আমুণ্ডসেন (Captain Roald Amundsen—১৮৭৮-১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কার করেন, সেকথা যথাস্থানে বলা হয়েছে। তারপর তিনি উত্তর মেরু অভিযানে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে পিয়েরি সার্থক হয়েছেন খবর পেয়ে তিনি গোপনে ফিরে এলেন। তারপর স্কট ও শ্যাকলটনের অভিযান-কাহিনী ভাল করে পড়ে দক্ষিণ মেরুর দুর্গম পথের সমস্ত বাধা-বিপত্তির কথা জানলেন। তিনি নিজে কোন্ পথে কিভাবে যাবেন সব ঠিক করে এসে উপস্থিত হলেন 'বে অব হোয়েলস' (Bay of Whales) উপসাগরে। তাঁর সামনে বরফের সুউচ্চ পাহাড়—দি গ্রেট ব্যারিয়ার (The Great Barrier). এখানে শীতকাল কাটিয়ে কুকুরদল আর সঙ্গীদের নিয়ে তিনি দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা করলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ২০ তারিখে তিনি যাত্রা শুরু করেন। পথের মধ্যে নেমে এল তুষার-ঝঞ্ঝা। সমস্ত দিক্ অন্ধকার করে পেঁজা তুলোর মতো তুষার সব ঢেকে দিল। কিন্তু

আমুণ্ডসেন

তাঁর ধমনীতে ভাইকিং রক্ত বইছিল—এসব গ্রাহ্য না করে তিনি এগিয়ে চললেন। তুষারে পা ডুবে যাচ্ছে —পাশে ভয়ংকর মরণ ফাঁদের মতো খাদ। তাঁর দলের হেলমার হ্যানসেন (Helmer Hanssen) স্লেজ গাড়িসুদ্ধ ছ ফুট চওড়া এক তুষার খাদের মধ্যে পড়ে গেলেন। স্লেজটা ঝুঁকে পড়েছে খাদের দিকে আর কুকুরগুলো লাফিয়ে চলে গেছে খাদের ওদিকে। ওঁদের দলের উইস্টিং (Wisting) খাদ ডিঙিয়ে ওপারে গিয়ে দড়ি ঝুলিয়ে হ্যানসেনকে টেনে তুললেন।

আমুণ্ডসেন ৫২টি কুকুর নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। এদের মধ্যে ২৪টি কুকুর তাঁদের মেরে খেতে হয়। ১৮টি কুকুর স্লেজ গাড়ি টেনে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ মেরু পৌঁছল। ফেরবার পথে মহানন্দে স্লেজ টেনে বারোটি কুকুর ফিরে এল ঘাঁটিতে।

অর্ধেক পথ এগোবার পর—১০,০০০ ফুট একটা পাহাড়ে তাঁদের চড়তে হয়েছিল। ওঁদের সঙ্গে ভারী মাল টেনে স্লেজসুদ্ধ কুকুররাও উঠেছিল। তারপর তাঁদের আবার ৩,০০০ ফুট নামতে হল। শেষ পর্যন্ত একটা হিমবাহ বা তুষারনদী তাঁদের পার হতে হয়েছিল। তারপর একটা ১২০ মাইল লম্বা মালভূমি পার হয়ে গড়ানে পথে তাঁদের মেরু অভিমুখে যেতে হয়েছিল। এইভাবে রোয়াল্ড আমুণ্ডসেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দক্ষিণ মেরু পৌঁছলেন।

॥ স্কটের শেষ অভিযান ॥

আগে একবার স্কটের কথা খানিকটা বলেছি। দক্ষিণ মেরু বিজয়ের উদ্দেশ্যে তিনিও আবার ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে টেরা নোভা (Terra Nova) জাহাজে চড়ে লণ্ডন থেকে এসে রস আইল্যাণ্ডে শীত কাটালেন। বসন্তকাল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দল এক-এক জায়গায় ঘাঁটি করে মালপত্র জমা রাখতে শুরু করল। কিন্তু প্রথম থেকে স্কটকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হল। আমুণ্ডসেনের অভিযানে তেমন উল্লেখযোগ্য বাধা-বিপদ হয় নি বললেই হয়।

হ্যানসেন গাড়িসুদ্ধ তুষার খাদের মধ্যে পড়ে গেলেন

কিন্তু স্কটের এই অভিযানে তাঁর দলটিকে অনেকরকম বিপদে পড়তে হয়েছিল।

সব বাধা অতিক্রম করে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি স্কট তাঁর শেষ ঘাঁটি থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে রওনা হলেন। বিপদ্, রোগ, অনাহার তখনও তাঁর সাথী।

তাই নিয়ে কখনো তুষারনদী পার হন, কখনো বরফের উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটেন তুষারে পা ডুবে যায়, তবুও সাবধানে এগুতে থাকেন। এই দলে যাঁরা ছিলেন সকলেই ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন—দলপতি স্কট, সার্জন ও শিল্পী ডাক্তার উইলসন, দৈত্যের মতো বিরাটাকৃতি বাওয়ার্স (Bowers), ওট্‌স্ (Oates) ও এডগার ইভান্স (Edgar Evans).

শেষে, এক স্মরণীয় দিনে, ১৮ই জানুয়ারি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁরা তাঁদের এতদিনের আকাঙ্ক্ষিত দক্ষিণ মেরুতে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু সেখানেও চরম দুর্ভাগ্য তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল। দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেই দেখলেন, তাঁদের ১ মাস ৬ দিন আগেই আমুণ্ডসেন সেখানে পৌঁছেছিলেন। এ কথা জানা গেল আমুণ্ডসেনের রেখে যাওয়া চিঠি থেকে।

দক্ষিণ মেরু অভিযানের সময় বিরাট ভাসমান বরফস্তূপের পাশে 'টেরা নোভা' (Terra Nova) জাহাজ

এই চিঠির সঙ্গে নরওয়ের রাজাকে লেখা আমুণ্ডসেনের একটি চিঠি ছিল এবং এই চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার অনুরোধ তাতে লেখা ছিল।

স্কট সেই চিঠি সঙ্গে করে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ভগ্নহৃদয়ে দেশে ফিরে আসতে লাগলেন স্কট। গ্রীষ্মকাল এল, কিন্তু আবহাওয়া তখনো দুর্যোগপূর্ণ। বরফ অত্যন্ত ধারালো; তার উপর দিয়ে চলা বিপজ্জনক। তা ছাড়া কেউই ভরপেট খেতে পাচ্ছিলেন না। ইভান্সের মতো দৈত্যও পথশ্রমে মৃতপ্রায় হয়ে পড়লেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বেয়ার্ডমোর (Beardmore) তুষারনদী পার হতে গিয়ে ইভান্স মারা গেলেন। এবার স্লেজ টানার লোকের অভাব হল। ইভান্স এতদিন গায়ের জোরে ভারী স্লেজটি টেনে আনছিলেন।

এবার আবহাওয়া ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল। যত রকম দুর্যোগ সব একে একে দেখা দিতে লাগল। তুষারঝড় এল, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ল, কুয়াশা সব অন্ধকার করে ফেলল। ওট্‌স্-এর হাতের ও পায়ের আঙুল তুষারে অসাড় হয়ে গেল। হাঁটাই তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল তো স্লেজ টেনে চলবেন কি করে? তিনি ঠিক করলেন যে তিনি আর সঙ্গীদের ভারস্বরূপ হয়ে থাকবেন না।

ভাসমান বরফস্তূপের মধ্যে গুহায় বন্দী জাহাজ ও অভিযাত্রীরা

একদিন ভয়ানক তুষার ঝড় বইছিল, তিনি ইচ্ছে করেই তার মধ্যে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন।

বাওয়ার্স, উইলসন ও স্কট আরও খানিকটা এগিয়ে তাঁবুতে আশ্রয় নিলেন। এখানেই তিনজন মারা পড়লেন। স্কট সব শেষে মারা যান। তাঁর ডায়েরি, আমুণ্ডসেনের চিঠিপত্র, সব তাঁর তাঁবু থেকে আট মাস পরে উদ্ধার করা হয়েছিল। ওট্‌সের দেহ বহু খোঁজাখুঁজির পরেও পাওয়া যায় নি।

বাওয়ার্স, উইলসন ও স্কটের মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই বরফের তলায় তাঁদের কবর দেওয়া হয়েছিল।

স্কটের তাঁবুতে তাঁদের এই অভিযানে সংগ্রহ-করা কয়লা, জীবাশ্ম বা পাথর হয়ে যাওয়া জীবজন্তুর হাড়, কাঠ, মহামূল্য ধাতুর টুকরো আর প্রবালের টুকরো সংগ্রহ করা ছিল।

ক্যাপ্টেন স্কটের পরিত্যক্ত জাহাজ

॥ মেরু পার হওয়া ॥

দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনো তো হয়েই গেল, এবার দক্ষিণ মেরু অঞ্চল এপার-ওপার হবেন বলে শ্যাকলটন বেরোলেন Endurance জাহাজে চড়ে, ১৯১৪ সনে। তিনি অনেক নতুন খবর পেলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হল তাঁকে।

তারপর বহুদিন কেটে গিয়েছে, বিজ্ঞানের কত উন্নতি হয়েছে, এখন আর মেরু পার হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। এই তো কয়েক বছর আগে International Geophysical Year-এ আন্তর্জাতিক উদ্যোগে ক'বার দক্ষিণমেরু পারাপার করা হয়েছে।

উপরের ছবি—ক্যাপ্টেন স্কটের তোলা দক্ষিণ মেরুর ছবি
নীচের ছবি—দক্ষিণ মেরুতে ক্যাপ্টেন স্কটের তাঁবু

গানবাজনার কথা

নারদ মুনির খুব অহংকার যে তিনি একজন বড় গাইয়ে।

একদিন পথে যেতে যেতে তিনি দেখলেন এক জায়গায় কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক কাতরাচ্ছে। তাদের কারও চোখ নেই, কারও বা নাক নেই, কেউ খোঁড়া, কেউ কুঁজো, কেউ নুলো।

নারদ জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কে গা? তারা বলল—ঠাকুরমশাই, আমরা গানের রাগরাগিণী। নারদ নামে এক মুনি আমাদের এই দুর্দশা করেছে।

নারদ তখন বুঝলেন যে তিনিই সব রাগরাগিণী বিকৃত করেছেন। তাই তিনি ছুটে গেলেন মহাদেবের কাছে শুদ্ধ রাগরাগিণী শুনতে।

মহাদেব বললেন, আমি গান গাইতে পারি, কিন্তু তাল রক্ষা করবে কে? নারায়ণ ছাড়া এমন ক্ষমতা আর কারো নেই।

গানের সভা বসে গেল। দেবতারা সব হলেন শ্রোতা। মহাদেবের গানে আবার সব রাগরাগিণী সুন্দর চেহারা নিয়ে মূর্তি ধরে দাঁড়াল। নারায়ণ তাল রাখতে গিয়ে ঘেমে যেতে লাগলেন। তাঁর পা বেয়ে ঘাম বের হতে লাগল। আর তাঁর পায়ের কাছ থেকে সেই জল ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলুতে ধরে রাখলেন—যা থেকে গঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল। মহাদেব তখন ব্রহ্মাকে গানের কলাকৌশল শিখিয়ে সামবেদ থেকে সংগীত-বিদ্যা সংগ্রহ করতে বললেন।

ব্রহ্মা সামবেদ থেকে গান শিখে ভরত, নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি ক'জনকে শিখিয়েছিলেন। বৈদিক যজ্ঞের চারজন পুরুষের মধ্যে একজনকে বলা হত উদ্‌গাতা। যজ্ঞের সময় তাঁরা সামবেদের মন্ত্রগুলি সুর করে গাইতেন।

॥ গান কি ॥

গান জিনিসটা মানুষের গলার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে, সব আওয়াজ গান নয়—আওয়াজটা শুনতে ভাল লাগা চাই। গানের সুর নিয়ম মেনে চলে বলেই তা মধুর হয়ে ওঠে।

মানুষের গলার যে আওয়াজগুলোকে মৃদু ও চড়া হিসেবে সাজিয়ে উচ্চারণ করলে ভাল শোনায়, তাদের সংখ্যা সাতটি। এগুলোকে বলে 'স্বর'। আমাদের দেশে সাতটি স্বরের নাম হচ্ছে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার,

মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত আর নিষাদ (চলতি ভাষায় ষ-কে অনেকে খ-এর মত উচ্চারণ করেন বলে খরজ, রেখাব, নিখাদ নাম শোনা যায়)। এই সাতটিকে নিয়ে স্বর-সপ্তক। স্বরগুলোর নামের প্রথম অক্ষর ধরে তাদের সংক্ষেপে বলা হয় সা রে গা মা পা ধা নি। কোথাও বা স র গ ম প ধ ন বলে--যার যেমন সুবিধে।

শব্দ হতে হলেই একটা কোনও কিছু কাঁপা চাই। তার ধাক্কায় হাওয়া হোক, জল হোক, মাটি হোক—কাঁপলে তবে আমরা শব্দ শুনতে পাই। মানুষের গলা কাঁপলে কিংবা সেতারের তার কাঁপলে তার ধাক্কায় হাওয়ায় কাঁপন ওঠে। সেই কাঁপনের ঢেউ আমাদের কানে এসে পৌঁছলে আমরা শুনতে পাই।

একটা গান গাইবার সময় ঠিকভাবে সা রে গা মা পা ধা নি উচ্চারণ করলে, গলার কাঁপন হয়তো প্রতি সেকেণ্ডে ২৪০ বার থেকে ৪৫২ বার পর্যন্ত উঠে গেল। তারও পরে যদি গলা চড়ানো যায় তা হলে আরও বেশী উঠবে।

গলার আওয়াজ নি-এর পরে চড়ানো যায়, আবার সা-এর নীচেও নামানো যায়। নি-এর উপরে উঠে সেই কাঁপনের সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮০ তে পৌঁছলে অমনি আবার সা স্বরটি ফিরে আসবে—তবে এবার সেটার আওয়াজ চড়া। তার পর আবার সেই সা রে গা মা পা ধা নি স্বর ক'টাই ফিরে আসবে, সেটা আর একটা স্বর-সপ্তক। তফাত এই যে, এটা চড়া স্বর, অর্থাৎ

সেই জল ব্রহ্মা কমণ্ডলুতে ধরে রাখলেন

সামবেদের মন্ত্রগুলি সুর করে গাইতেন

এর কাঁপন হবে আগেকার সপ্তকের ঠিক দ্বিগুণ। অর্থাৎ আগেকার সপ্তকের সা যদি হয়ে থাকে এক সেকেণ্ডে ২৪০ বার কাঁপনে, তা হলে এই চড়া সা-এর কাঁপন হবে ৪৮০। এই চড়া সপ্তককে ভাল কথায় বলে 'তার' সপ্তক। আর তার আগেকার সপ্তক, যাতে সা হল ২৪০, সেটার নাম 'মধ্য' সপ্তক। আর এরনীচের দিকে বা খাদের দিকে যে আর একটা সপ্তক, তাকে বলে 'মন্দ্র' সপ্তক। এই সপ্তকের সা-এর কাঁপন হবে মধ্য সা-এর অর্ধেক, অর্থাৎ ১২০ বার। চলতি কথায় এই তিন সপ্তককে বলা হয় উদারা, মুদারা আর তারা।

॥ হারমোনিয়ামের কথা ॥

হারমোনিয়মে যেগুলো টিপে টিপে বাজাতে হয়, সেগুলোকে বলে পর্দা। তাতে প্রথমে নীচু বা খাদ (মন্দ্র) এক সপ্তক, তারপর মাঝারি (মধ্য) এক সপ্তক, তারপর চড়া (তার) এক সপ্তক শব্দ বাজে। তারপরও হয়তো আরও দু'তিনটে পর্দা থাকে, সেগুলো অত্যন্ত চড়া—প্রায় কখনও কাজে লাগে না।

হারমোনিয়ামের পর্দা কতক সাদা, কতক কালো। সাদাগুলো পর পর হল সা রে গা মা

হারমোনিয়ামের পর্দা
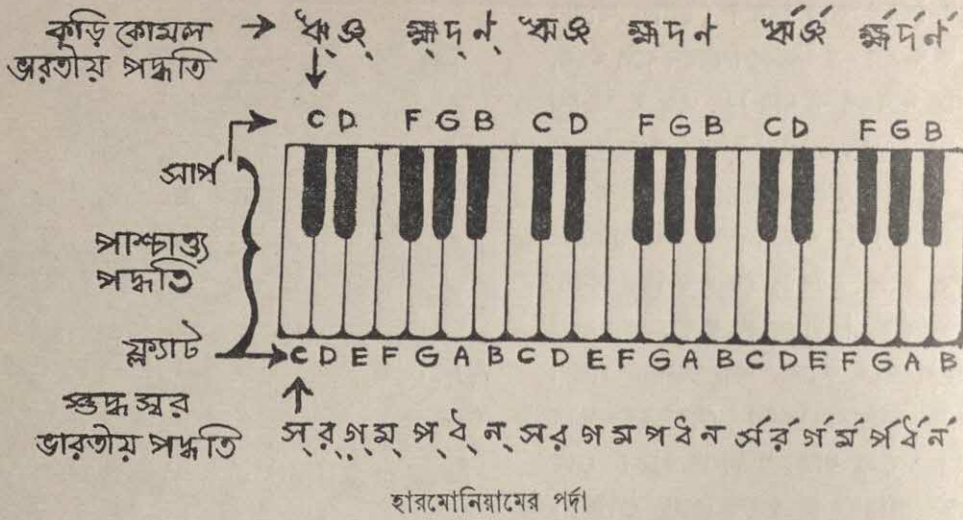
পা ধা এবং নি। আর, মাঝে মাঝে কালো রঙের কয়েকটা পর্দাও আছে। এক এক অক্টেভে বা অষ্টকের মধ্যে ওরকম আছে পাঁচটা করে। সেগুলোকেও অষ্টকের মধ্যেই ধরতে হবে। তাই এক এক অষ্টকে মোটের উপর ১২টা স্বর হয়ে দাঁড়াল।

সা রে গা মা পা ধা নি—এই সাতটিকে বলে শুদ্ধ স্বর। অন্য পাঁচটিকে বলে বিকৃত স্বর। তারা আলাদা স্বর নয়, ঐ সাতটি বিশুদ্ধ স্বরের মধ্যে পাঁচটির হেরফের করে ওগুলোকে পাওয়া গিয়েছে। যেমন, সা আর রে স্বরের মাঝখানকারটা হচ্ছে একটু নীচু রে, তাই তার নাম 'কোমল রে'। তার পরেরটা ঐভাবে 'কোমল গা'। গা আর মা'র মধ্যে কিছু নেই, আছে মা'র পরে। সেটাকে এই হিসেবে হয়তো 'কোমল পা' বলা যেত, কিন্তু তা হয় নি। সেটাকে মা'রই একটু চড়া স্বর বলে ধরে তার নাম রাখা হয়েছে তীব্র বা কড়ি মা—কড়ি মধ্যম। পাঁচটার মধ্যে এই একটারই নামে 'কড়ি' আছে। এর পরের দুটো হল 'কোমল ধা', আর 'কোমল নি'। তারপর, নি-সা'র মাঝখানে কোনও বিকৃত স্বর নেই।

হারমোনিয়াম চেনা জিনিস বলেই তা দিয়েই ঐ স্বরের কথা বোঝানো হল। কিন্তু এটা তো বিলিতী বাজনা, ওতে ঠিক আমাদের দেশী নিয়মে সা রে গা মা স্বরগুলি থাকে না। আমাদের সঙ্গে ওদের বেশ তফাত।

ওদের মতেও স্বর সাতটাই, বিকৃত স্বর পাঁচটা। গিদো অ্যারেটিনো (Guido Aretino—৯৯৫ ?-১০৫০ ? খ্রীষ্টাব্দ) নামে এক ইতালিয়ান পণ্ডিত ইওরোপের সংগীতের সাতটা শুদ্ধ স্বরের নাম দেন ডো, রে, মি, ফা, সল্, লা, টি (do, re, mi, fa, sol, la, ti). তারপর আবার 'ডো' সুদ্ধ ধরে এই আটটাকে বলে অক্টেভ। আমাদের সপ্তক, ওদের অক্টেভ—অর্থাৎ অষ্টক। কিন্তু সেটা হয় একটা স্বরকেই দুবার হিসেবে ধরে। সংক্ষেপে এই অষ্টকের স্বরগুলোর নাম হচ্ছে এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এ। কিন্তু তাই বলে সব সময়েই যে A মানেই ডো, তা নাও হতে পারে। বরং বলা যায় যে, বেশির ভাগ জায়গাতেই ডো হয় সি (C). তাই সাধারণতঃ এদের অক্টেভ হয় সি, ডি, ই, এফ, জি, এ, বি, সি।

সি দিয়ে শুরু হলে আমাদের সঙ্গে গোড়াটা মিলে যায়। সি আর সা এক হয়ে যায়, কেন না সি'র কাঁপন আর সা'র কাঁপন কখনও কখনও একেবারে এক—২৪০ বার (সি কখনও বা ২২০-তেও ধরা হয়)। সেক্ষেত্রে এদের ডি আর আমাদের রে-ও এক—২৭০ কাঁপনের স্বর। কিন্তু তারপর আমাদের মা পা ওদের এফ জি-র সঙ্গে এক হলেও, আমাদের গা ধা নি ওদের ই এর সঙ্গে মেলে না। কারণ, গা ধা নি হল যথাক্রমে ২৮৮, ৪০৫ আর ৪৫২ বার কাঁপবার শব্দ, আর ই এ বি হল যথাক্রমে ৩০০, ৪০০ আর ৪৫০।

অথচ, হারমোনিয়াম বাজাবার সময় ওগুলোকে গা ধা নি-র জায়গায় বাজাতে হয়। সাধারণ গানে হয়তো সেটা চলে যায়, কিন্তু উঁচুদরের গানে ঠিক ঠিক গা ধা নি চাই, কাজেই তাতে কখনও হারমোনিয়াম বাজানো হয় না।

শুধু আমাদের ওস্তাদরাই নন, ইওরোপ আমেরিকার ওস্তাদরাও হারমোনিয়াম পছন্দ করেন না, কারণ তাঁরা যাকে খাঁটী সি ডি ইত্যাদি বলেন, হারমোনিয়ামে তা বাজে না। আমাদের মতো তাঁদেরও সাতটা শুদ্ধ স্বর (regular note) আর পাঁচটা বিকৃত স্বর—মোট এই বারোটা। আমাদের বিকৃত স্বরের নামের মধ্যে তীব্র বা কড়ি একটা, আর কোমল চারটে। কিন্তু ওঁদের নিয়মে ফ্ল্যাট (কোমল) একটা, আর শার্প (কড়ি) চারটে। এই বারোটার নাম পরপর হচ্ছে (সি-কে প্রথম বা ফার্স্ট নোট ধরে)—সি, সি-শার্প, ডি, ডি-শার্প, ই, এফ, এফ-শার্প, জি, জি-শার্প, এ, বি-ফ্ল্যাট, বি।

॥ রাগ রাগিণী ॥

গানের তো কত রকম সুর শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু যে-সুরই হোক, তাতে ঐ বারোটি স্বরই ঘুরে ফিরে আসবে—তার বাইরে আর কোনও স্বর নেই। আমরা যাকে সুর বলি, তাকেই একটু কেটেছেঁটে ভাল কথায় বলে রাগ আর রাগিণী।

রাগ প্রথমে ছিল ছ'টি। মহাদেবের পাঁচটি মুখ। তা থেকে বেরিয়েছিল পাঁচটি রাগ—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম আর মেঘ। পার্বতীর মুখ থেকেও আর একটি রাগ বেরিয়েছিল—তার নাম নট-নারায়ণ। এই ছয় রাগের প্রতিটি থেকে আরও ছ'টি করে সুরের সৃষ্টি হল। সেই ছত্রিশটিকে বলে রাগিণী। তা থেকে ক্রমে ক্রমে গাইয়েরা অসংখ্য রকমের সুর তৈরি করেছেন আর করছেন—এখন সেই সবেরই নাম রাগ। রাগিণী কথাটা আর চলে না।

॥ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র ॥

এ দেশের প্রবাদ অনুসারে গানের সৃষ্টি হয়েছিল মহাদেবের কণ্ঠ থেকে। তাঁর কাছ থেকে শেখেন ব্রহ্মা। তিনি আবার শিক্ষা দেন পাঁচজনকে, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ভরতমুনি। এঁর লেখা নাট্য-শাস্ত্র বলে একখানা বই আছে। গান নাচ অভিনয় সম্বন্ধে এখানাই সবচেয়ে পুরনো বই—আন্দাজ সতেরোশো বছর আগে এটা লেখা হয়েছিল। গান অবশ্য এদেশে তার অনেক আগে থেকেই ছিল, বেদের সময়ও সামগান বলে এক রকম গান হত যজ্ঞের সঙ্গে। তখন এত সা রে গা মা ইত্যাদি স্বরের ব্যাপার ছিল না। স্বর ছিল মোটে তিনটি—অনুদাত্ত, স্বরিত, আর উদাত্ত।

শুধু গান বিষয়ে আর একটি প্রাচীন বই শার্ঙ্গ-দেবের সংগীতরত্নাকর, প্রায় হাজার বছর আগে লেখা।

॥ আমীর খসরু ॥

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হবার পর আমাদের দেশের গানে ফারসী গানের নানা জিনিস মিশিয়ে অনেক নতুন নতুন রকমের গান আর বাজনার সৃষ্টি হতে লাগল। এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী ছিলেন ছ'শো বছর আগেকার আমীর খসরু (খুসরৌ)। তিনি ছিলেন সম্রাট্ আলাউদ্দীন খিলজীর প্রধান মন্ত্রী আর গুরু। তিনি যেমন বড় পণ্ডিত, তেমনি বিখ্যাত কবিও ছিলেন। তিনি ইমন, পুরিয়া, আশাবরী ইত্যাদি অনেক নতুন নতুন রাগ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রথমে সেতার যন্ত্র তৈরি করেন। কাওয়ালী বলে এক ধরনের গান তিনি এদেশে প্রথম চালিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে খেয়াল গানও তাঁরই সৃষ্টি।

॥ গোপাল নায়ক ॥

সেই সময় দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরের রাজা দেবরায়ের সভানায়ক গোপাল নায়ক একজন খুব বড় গাইয়ে ছিলেন। অন্যমতে তিনি দেবগিরি নিবাসী ছিলেন। আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি জয় করেন, আর আমীর খসরুর কথায় সেখান থেকে গোপালকে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। গোপাল যখন গান গাইতেন তখন লুকিয়ে থেকে

সে সব গান আমীর খসরু শিখে নিতেন। তারপর দু'জনে যখন গানের প্রতিযোগিতা হল, তখন অন্যায়-ভাবে খসরুই জিতলেন। অথচ গোপাল এমন আশ্চর্য গায়ক ছিলেন যে তাঁর গানে নাকি পাথর পর্যন্ত গলে যেত।

॥ অন্য অন্য গায়ক ॥

খেয়াল গান আমীর খসরুর সৃষ্টি, কিন্তু জৌন-পুরের সুলতান হোসেন শর্কী তার ভালভাবে প্রচার করেন। এর কিছু পরে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর এক ধরনের গান বের করলেন, তার নাম হল ধ্রুপদ। ধ্রুপদ আর খেয়াল হল আজকালকার প্রধান দু'রকম ওস্তাদী গান।

সেকালের সব চাইতে নামকরা ধ্রুপদ গায়ক হলেন বৈজনাথ। গুজরাটের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি গানে মগ্ন থেকে পাগলের মতো হয়েছিলেন তাই তাঁকে বৈজু বাওরা (বাওরা মানে পাগল) বলা হত।

॥ মীরাবাঈ ॥

ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দ ?) যোধপুর রাজ্যে, রাঠোর বংশে মীরাবাঈয়ের জন্ম হয়। ছোট-বেলায় মায়ের সঙ্গে এক বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মা, আমার বর কে?" মা

বৈজু বাওরা

হরিদাস স্বামী

শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, "ঐ যে তোর বর।" সেই থেকে মীরা গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজকে সঁপে দিলেন। বিশ বছর বয়সে মেবারের রাজা ভোজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিষয়ভোগ ছেড়ে তিনি গিরিধারীলালের সেবা আর একতারা বাজিয়ে ভজন গান করতেন। এতে রাজপরিবারের অপমান হয় বলে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে কিছুদিন থাকার পর দ্বারকায় গিয়ে রণছোড়জীর মন্দিরে উপস্থিত হন। লোকে বলে সেখানে তিনি ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবমূর্তির সাথে মিশে যান। তাঁর রচিত শত শত ভজন গান লোকেরা গেয়ে থাকে।

॥ হরিদাস স্বামী ॥

সম্রাট্ আকবরের সময়ে (১৫৪২-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ) বৃন্দাবনে ছিলেন প্রসিদ্ধ গায়ক ও সাধু হরিদাস স্বামী। আদিবাস মুলতান জেলা থেকে তাঁর বাবা আলিগড় জেলায় এসে বাড়ি করেন। পনের বছর বয়সে হরিদাস বৃন্দাবনে গিয়ে গানের চর্চা করতে থাকেন। কৃষ্ণদত্ত বা কৃষ্ণানন্দ তাঁর গুরু ছিলেন বলে শোনা যায়। ভক্তিরসের অনেক গান তিনি লিখেছেন। তাঁর গানের সবচেয়ে বড় শিষ্য হলেন সম্রাট আকবরের সভাগায়ক তানসেন।

॥ তানসেন ॥

তানসেন ভারতের সবচেয়ে নামকরা গায়ক। তিনি অনেক নতুন রাগরাগিণী তৈরি করেছিলেন। গোয়ালিয়রের মাইল সাতেক দূরে এক গ্রামে মকরন্দ বা মুকুন্দ পাণ্ডে নামে এক পণ্ডিত ও গায়ক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁরই ছেলে রামতনু বা তন্নার জন্ম হয় ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে (?)। তাঁরা যখন কাশীতে ছিলেন তখন হরিদাস স্বামী তন্নাকে গান শেখান। তন্না এক মুসলমান রমণীকে বিয়ে করে নিজে মুসলমান হন ও তাঁর নাম হয় আতা-আলী খাঁ। প্রথমে তিনি রেওয়া বা বাঘেলার রাজা রামচাঁদের সভা-গায়ক ছিলেন, সেখান থেকে সম্রাট্ আকবরের সভায় যান। সম্রাট্ তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তানসেন উপাধি দেন।

গোয়ালিয়রে তানসেনের সমাধি ভারতের গায়কদের কাছে একটি তীর্থ।

তানসেন

॥ সুরদাস ॥

১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী-মথুরা রোডের কাছাকাছি কোন গ্রামে জন্মান্ধ সুরদাসের জন্ম হয়। বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে তিনি গান শিখেছিলেন। এক হাজারের বেশী ভজন গান তিনি লিখেছিলেন।

॥ দাদূ ॥

সম্রাট্ আকবরের সময়ে আর একজন ভজন গাইয়ে ছিলেন দাদূ (১৫৪৪-১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি ছিলেন জাতিতে মুচি।

॥ সদারঙ্গ্ ॥

তানসেনের প্রায় দেড়শো বছর পরে গাইয়ে হিসেবে যাঁর নাম খুব বিখ্যাত হয়, তিনি হলেন শাহ সদারঙ্গ্। তাঁর আসল নাম হল নিয়ামত খাঁ। তিনি ছিলেন খেয়াল গানের রাজা। তাই বাদশাহ তাঁকে শাহ (রাজা) উপাধি দেন। তিনিও বাদশাহের নাম দিয়েই তাঁর গানগুলো লিখতেন, তাতে লেখা থাকত 'সদারঙ্গিলে মহম্মদ শাহ'। তাই থেকে তাঁর নাম হয় সদারঙ্গ্। তাঁর দুই ছেলেও বড় গায়ক হয়েছিলেন, তাঁদের নাম হয় অদারঙ্গ্ আর মহারঙ্গ্ (ফিরোজ খাঁ আর ভূপৎ খাঁ)।

॥ ভাতখণ্ডে ॥

বর্তমানকালের গানের একজন মহাগুণীর নাম হল পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে। বোম্বাইয়ের কাছে বালকেশ্বর গ্রামে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ইংরেজী লেখাপড়ার সঙ্গে গানেরও চর্চা করে তিনি দেশজোড়া নাম করেন। তিনি ওকালতি করতেন। কাশীর বল্লভদাসের কাছে সেতার, জাকির উদ্দীনের কাছে ধ্রুপদ এবং আসেখ আলী ও মহম্মদ আলীর কাছে খেয়াল শিখে তিনি মারাঠী ভাষায় "হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি" নামে চারখণ্ডে বই প্রকাশ করেন। সংস্কৃতে তিনি "লক্ষণ সংগীত ও অভিনব রাগমঞ্জরী" লেখেন আর 'চতুর পণ্ডিত' ছদ্মনামে গীত রচনা করেন।

ভাতখণ্ডে

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সারা ভারত ঘুরে ধ্রুপদ খেয়াল গান সংগ্রহ করে ছ'খণ্ডে 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা' নামে স্বরলিপির বই প্রকাশ করেন। তাঁর স্বরলিপি-পদ্ধতির নাম 'হিন্দুস্থানী (বা ভাতখণ্ডে) পদ্ধতি'। বরোদার মহারাজা ও রামপুরের নবাব ছিলেন তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। লখ্‌নউ-এর মরিস কলেজ (বর্তমানে ভাতখণ্ডে বিদ্যাপীঠ) তাঁরই বিশেষ কীর্তি। বরোদা আর গোয়ালিয়রও তাঁরই চেষ্টায় গানের বড় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাতখণ্ডে মারা যান। তাঁর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরও একজন ভারত-বিখ্যাত গায়ক হয়েছিলেন।

॥ বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর ॥

বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্করও সংগীতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। মারাঠা দেশের কুরুন্দবাড়ে (বেলগাঁও জেলা) ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। বার বছর বয়সে আতশবাজির আগুনে তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে গেলে তাঁর বাবা দিগম্বর গোপাল তাঁকে বালকৃষ্ণ বুওয়ার কাছে গান শিখতে পাঠান। ভক্তিরস ছিল বিষ্ণুদিগম্বরের গানের প্রধান অবলম্বন। লাহোরের গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় তাঁর চেষ্টায় গড়ে ওঠে। বোম্বাই-এ তার শাখা খোলা হয়। তিনি রামায়ণও গাইতেন। "রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম"—এই গান তাঁরই রচনা। তিনি স্বরলিপির এক নতুন পদ্ধতির প্রচলন করেন।

॥ অন্যান্য গায়ক ॥

বর্তমান কালের গুণী গায়কদের ভিতর উজীর খাঁ (১৮৬০-১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ), আবদুল করিম খাঁ (১৮৭২-১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) আর ফৈয়াজ খাঁর (১৮৮৬?-১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) নাম করতে হয়। রামপুর রাজদরবারে বীণা-বাজিয়ে আমীর খাঁর ছেলে উজীর খাঁ, পিতার নিকট ও হায়দার আলী খাঁর নিকট বীণা শেখেন, আর কাশীর নিজার আলী খাঁর কাছে শেখেন রবাব। তিনি ধ্রুপদ গানও গাইতেন। তাঁর অনেক বড় বড় ছাত্রের ভিতর আলাউদ্দীন খাঁ সবচেয়ে বিখ্যাত।

আবদুল করিম খাঁ বরোদা রাজদরবারের গায়ক ছিলেন। তিনি পুণায় আর্যসংগীত বিদ্যালয় ও বোম্বাইয়ে তার শাখা খুলেছিলেন। তাঁর বাবা কালে খাঁ আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সবাই গান ও বাজনায় ওস্তাদ ছিলেন। সাহারানপুর জেলার 'কিরানায়' তাঁর জন্ম বলে তাঁর গানের ঢংকে 'কিরানা ঘরানা' বলে। শোনা যায়, শ্রীঅরবিন্দকে গান শোনাবার জন্যে পণ্ডিচেরী যাবার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

হীরাবাঈ বরোদেকর, রোশনারা বেগম প্রভৃতি অনেকে তাঁর কাছে গান শিখে সুখ্যাতি লাভ করেছেন। আগ্রায় মামাবাড়িতে ফৈয়াজ খাঁর জন্ম হয়। ঠাকুরদা গোলাম আব্বাসের কাছে এবং আরও দু' একজনের কাছে তিনি গান শেখেন। শ্বশুর মেহবুব খাঁর কাছেও

বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর

তিনি খেয়ালের তালিম নেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি বরোদা রাজদরবারের গায়ক ছিলেন।

বড়ে গোলাম আলি, আলাবন্দ খাঁ, নাসির উদ্দীন খাঁ, এনায়েৎ খাঁ (সেতার), কেরামত উল্লা খাঁ (স্বরোদ), বাদল খাঁ, কণ্ঠে মহারাজ (তবলা), খলিফা আবেদ হোসেন খাঁ (তবলা), আহমদ জান খেরাকুয়া (তবলা), মসিদ খাঁ (তবলা) এঁদের নামও যথেষ্ট।

হিন্দুস্থানী সংগীতে আগে ধ্রুপদ, ধামার (হোরি), খেয়াল, কাওয়ালী ইত্যাদি বিশেষ কয়েক ধরনের গানই চলত। ক্রমে আরও নানা জাতের গান যেমন—ঠুংরী, টপ্পা, গজল তৈরী হয়ে প্রচলিত হতে থাকে। টপ্পা গানের প্রথম প্রচলন করেন শোরী মিঞা।

বাংলা দেশে টপ্পা গান শেখেন আর প্রচলন করেন নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত—১৭৪১-১৮২৮ খ্রীঃ)। তা ছাড়া বাংলা দেশের নিজস্ব বিশেষ গান হল কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, ঢপ, সারি, জারী, ঝুমুর ইত্যাদি।

এরপর নানারকম সুর নানাভাবে মিশিয়ে কবি ও গায়করা নানারকম নতুন নতুন সুর সৃষ্টি করতে লাগলেন। যে-সব সুরের আর নাম দেওয়া যায় নি, সে-সব সুরে গাওয়া বেশির ভাগ গানকেই আজকাল বলা হয় আধুনিক সংগীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৃষ্টি করলেন তাঁর নিজস্ব গানের পদ্ধতি, যাকে বলে রবীন্দ্র সংগীত।

॥ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীত ॥

আমাদের গানের মূল হল মেলডি অর্থাৎ গান ও বাজনায় সব কিছুর একই সুরে মিল। কিন্তু ইওরোপীয় গানের মূল হল হার্মনি (harmony) অর্থাৎ মূল গানের সুরের সঙ্গে সব যন্ত্রের সুর ঠিক এক না হলেও একটা সংগতি থাকা।

ওরা একই সঙ্গে এমন দুটো, তিনটে বা আরও বেশী স্বর (tone) বাজাবে যাতে সে স্বরগুলো এটার সঙ্গে ওটা বেশ খাপ খেয়ে যায়, শুনতেও ভাল লাগে। তাই, আমাদের যদি অনেক যন্ত্র একসঙ্গে বাজানো হয়, সবগুলোই এক সময়ে একই স্বর বাজাবে, কিন্তু ওরা বাজাবে আলাদা আলাদা স্বর, যারা বেশ মিল খায়।

একে অন্য কথায় বলে হোমোফনি (homophony). গাইয়ে হয়তো গলায় সা-সুর বের করছেন আর একটা যন্ত্রে ঠুং করে গা-সুর বেরোল, আর একটায় হয়তো পা-সুর বাজছে। ওদেশের গানের একটা ব্যাপার হল পলিফনি (polyphony) অর্থাৎ একই সময়ে নানা যন্ত্রে আলাদা আলাদা সুর বাজান। অথচ সব সুর বেশ মিলে যায়। এই সুরগুলির সংগতি বের করা কঠিন ব্যাপার। এই সংগতি রেখে যারা সুর রচনা করেন তাঁদের বলে কম্পোজার (composer) অর্থাৎ সুরকার। তাঁদের কয়েকজনের কথা বলছি।

॥ মোৎসার্ট ॥

অস্ট্রিয়া দেশের মোৎসার্ট (Mozart—১৭৫৬-১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ) সলৎসবুর্গ শহরে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতাও সুরকার ছিলেন। ছ'বছর বয়সে দিদি সারার সঙ্গে সারা ইওরোপ ঘুরে নিজের তৈরী সুরগুলি বাজান। তাঁর নাম শুনে হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়ার রানী মারিয়া টেরেসা (Maria Theresa

মোৎসার্ট

—১৭১৭-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁকে ডেকে তাঁর গানবাজনা শোনেন।

ভাগনার ও তাঁর স্ত্রী

॥ বেটোফেন ॥

লুডভিগ বেটোফেন (Ludwig Beethoven—১৭৭০-১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ) জার্মানীর বন শহরে জন্মেছিলেন। তাঁকে মোৎসার্টের ছাত্র বলা যায়। মাত্র দশ বছর বয়স থেকেই তিনি ভাল ভাল সুর রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। সুর রচনায় তিনি ইওরোপীয় গানে এক নূতন যুগ আনেন। তাঁর Ninth Symphony একটি খুব নাম-করা সুর-সৃষ্টি। ৩০ বছর বয়সে তিনি একেবারে কালা হয়ে যান, তবু সুর-সৃষ্টি তাঁর থামে নি। একবার এক মজলিসে শ্রোতাদের দিকে পিছন ফিরে থাকায় তাদের আনন্দ উল্লাস কিছুই তিনি বুঝতে পারেন নি, পরে ঘুরিয়ে বসালে বুঝতে পেরেছিলেন।

জর্জ ফ্রেডারিক হ্যাণ্ডেল (George Frederick Handel—১৬৮৫-১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ), যোহান সেবাস্টিয়ান বাখ (Johaun Sebastian Bach—১৬৮৫-১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ), মেণ্ডেলসন-বারথলডি (Mendelssohn-Bartholdy—১৮০৯-১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ), রিচার্ড ভাগনার (Richard Wagner—১৮১৩-১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ), যোহানেস ব্রাম্‌জ্ (Johannes Brahms—১৮৩৩-১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ), জোসেফ হেড্‌ন্ (Joseph Haydn—১৭৩২-১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ), আলেসান্দ্রো স্কার্লাটি (Alessandro Scarlatti—১৬৫৯-১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ), ফ্রেডারিক শোপাঁ (Frederic Chopin—১৮১০-১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ), সাইবেলিয়াস্ (Sibelius—১৮৬৫-১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ), প্যাডেরেভ্‌স্কি (Paderewski—১৮৬০-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ), ফ্রান্‌ৎস্ লিস্ট (Franz Liszt—১৮১১-১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ), চাইকভ্‌স্কি (Tchaikovsky—১৮৪০-১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ), স্মেটানা (Smetana—১৮২৪-১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ), কোগান—এই সব সুরকার ও শিল্পীদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

লুডভিগ বেটোফেন

অতি আশ্চর্যের কথা যে, এঁদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত ছোট বয়সে বাজাতে আর সুর দিতে আরম্ভ করেছিলেন। মোৎসার্ট বেঁচেছিলেন মাত্র ৩৫ বছর। তিন বছর বয়সে তিনি গানে সুর দিতে আরম্ভ করেন। ছ' বছর বয়সে তিনি এত ভাল বাজাতে

রিচার্ড ভাগনার

হ্যাণ্ডেল

রুশ সুরশিল্পী কোগান বেহালা বাজাচ্ছেন
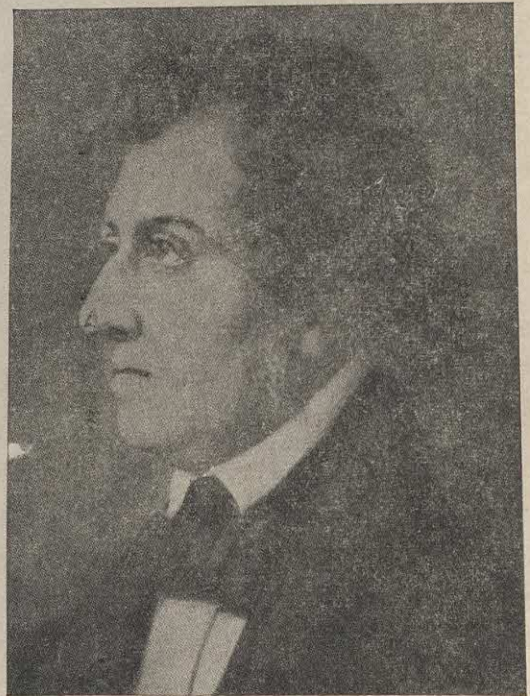
ফ্রেডারিক শোপাঁ

পারতেন যে তিনি যেখানেই বাজনা বাজাতেন সেখানেই হুলুস্থূল পড়ে যেত।

বেটোফেন, শোপাঁ, মেণ্ডেলসন আর লিস্ট—এঁরা চারজনই ৮ থেকে ৯ বছর বয়সে বড় বড় জায়গায় গিয়ে বাজাতে শুরু করেছিলেন। বেটোফেন ১০, মেণ্ডেলসন ১২ আর লিস্ট ১৪ বছর বয়সে যে সব সুর সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তা আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। শুম্যান (Schuman) তাঁর প্রথম সুর লিখে যখন প্রকাশ করেন, তখন তাঁর বয়স মোটে ১১ বছর।

হ্যাণ্ডেলদের বাড়িতে একতলার ঘরে একটা হার্পসিকর্ড (Harpsichord, কতকটা পিয়ানোর মত একরকম বাজনা) যন্ত্র ছিল, সেটা বাড়ির লোক বাজাত, হ্যাণ্ডেল তা দেখেছিলেন। একদিন গভীর রাতে তাঁর বাবার ঘুম ভেঙে গেলে তিনি শুনলেন যে সেই বাজনাটা কে যেন সুন্দরভাবে বাজাচ্ছে। তাড়াতাড়ি নেমে এসে দেখেন যে সে আর কেউ নয়—তাঁরই ছেলে। তখন তার বয়স মোটে চার। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রোজ সে চুপে চুপে এসে বাজনা বাজাতে শেখে। দেখে শুনে হ্যাণ্ডেলের বাবার মনে চেতনা জাগল। তিনি ছেলের বাজনা শেখবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

বাখ ছিলেন হ্যাণ্ডেলের সমবয়সী। দুজনেরই জন্ম হয় ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। গরিবের ছেলে, কিন্তু সারাজীবন তিনি রাজার সম্মান পেয়ে গিয়েছেন। তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তবু সুর রচনা করে অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে রেখে গিয়েছেন। তাঁর একুশটি ছেলেমেয়েদের মধ্যে চারজন প্রায় বাপের মতই প্রসিদ্ধ সংগীতবিৎ হয়েছিলেন।

ইতালীর এনরিকো কারুসোর (Enrico Caruso—১৮৭৩-১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ) জীবন অতি বিচিত্র। তাঁর মা গাইয়ে ছিলেন বলে কারুসোকে গানের স্কুলে ভরতি করেন। কিন্তু অপদার্থ বিবেচনা করে সেখান থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তবু তাঁর মা ছাড়লেন না, নিজেই ছেলেকে শেখাতে লাগলেন। সেই ছেলেই শেষে হয়ে দাঁড়ালেন ইওরোপের শ্রেষ্ঠ গায়ক। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা গেলে সারা পৃথিবী থেকে চাঁদা তুলে একটি গির্জায় তাঁর নামে একটি এত বড় মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সেটা একটানা ১০০ বছর ধরে জ্বলবে।

॥ যদুভট্ট ॥

এবার কয়েকজন এদেশী গায়ক ও গীতিকারের কথা বলা যাক। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়ক যদুনাথ ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্য খুব ভাল বীণা বাজাতে পারতেন। যদুভট্ট তাঁর কাছ থেকে বীণা ও পাখোয়াজ শেখেন। বাহাদুর সেনের (বাহাদুর খাঁ) ছাত্র রামশংকর ভট্টাচার্য পরে যদুভট্টকে গান শেখান। এর পর গঙ্গানারায়ণ চাটুয্যে তাঁকে ধ্রুপদ শেখান। যদুভট্ট হিন্দী গান ও ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুরু ছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁকে রাজসভায় নিয়ে গিয়ে তাঁর গান শুনে তাঁকে 'তানরাজ' উপাধি দেন।

॥ রামনিধি গুপ্ত ॥

নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ) ত্রিবেণীর কাছে এক গ্রামে জন্মলাভ করেন। পরে তাঁরা কলকাতায় কুমারটুলিতে উঠে আসেন। ছাপরা কালেক্টরিতে চাকরি করবার সময় এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে তিনি শোরী মিঞার টপ্পা শিখতে থাকেন। কিন্তু ওস্তাদ সহজে তাঁকে গান দিতে না চাওয়ায় তিনি নিজে বাংলায় গান লিখে তাতে শোরী মিঞার টপ্পার সুর দিয়ে গাইতে আরম্ভ করেন। সারা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

॥ রামপ্রসাদ সেন ॥

রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) হালি-শহরের কাছে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার দুর্গাচরণ মুখার্জীর জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতে করতে তিনি খাতায় লিখে রাখেন—'আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শংকরী'। জমিদার তখন

যমপুরীতে অর্ফিউস ও ইউরিডিসী।

[যমপুরীতে অর্ফিউস ও ইউরিডিসী]

গ্রীক পুরাণে আছে, অর্ফিউস (Orpheus) ছিলেন একজন কবি ও সংগীতজ্ঞ। তাঁর স্ত্রীর নাম ইউরিডিসী (Eurydice). ইউরিডিসী মারা গেলে অর্ফিউস তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যমপুরীতে গিয়ে হাজির হন। তিনি বাঁশী বাজিয়ে যমরাজ প্লুটোকে (Pluto) মুগ্ধ করেন ও তাঁর কাছে বর চান। যমরাজ বর দিতে রাজী হলে তিনি মৃত ইউরিডিসীকে পুনর্জীবিত করে দিতে বলেন। যমরাজ ইউরিডিসীকে বাঁচিয়ে তোলেন। অর্ফিউস ইউরিডিসীকে নিয়ে যেতে চান। যমরাজ রাজী হন। তবে একটা শর্ত থাকে, যমপুরীর দরজার বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত অর্ফিউস ইউরিডিসীর দিকে তাকাতে পারবেন না।

প্লুটো যমপুরীর দরজা নিজ হাতে খুলে দিলেন। ইউরিডিসী যমপুরী থেকে বেরিয়ে স্বামীর কাছে চলে যাবেন, এমন সময়ে অর্ফিউস শর্তের কথা ভুলে গিয়ে বিহ্বল ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে ফেললেন। তার ফলে যমপুরীর দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। ইউরিডিসী যমপুরীতেই রয়ে গেলেন। ইউরিডিসীকে না নিয়েই অর্ফিউসকে বাড়ি ফিরতে হল।

তাঁর ভক্তি ও সাধনার পরিচয় পেয়ে তাঁর জন্যে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তিনি বহু শ্যামাসংগীত লিখেছেন। তাঁর গানের একটি বিশেষ সুরকে বলে রামপ্রসাদী সুর। কিংবদন্তী আছে যে, তাঁর গানে ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে মা কালী তাঁর মেয়ের মূর্তি ধরে একদিন তাঁকে বেড়া বাঁধতে সাহায্য করেছিলেন।

॥ কান্তকবি রজনীকান্ত সেন ॥

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ) পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজসাহীতে ওকালতি করতেন। 'বাণী' ও 'কল্যাণী' নামে দু'খানা গানের বই লিখে তিনি প্রসিদ্ধ হন। তাঁর স্বদেশী গান 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' এক সময় সব বাঙ্গালীর মুখে মুখে ছিল। গানের ভণিতায় তিনি নিজেকে 'কান্ত' বলে লিখতেন, তাই তাঁকে লোকে 'কান্তকবি' বলে।

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥

ডি. এল. রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ) নামে বিখ্যাত দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইংল্যাণ্ড থেকে খেতাব নিয়ে এসে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। 'শাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবারপতন', প্রভৃতি নাটক লিখে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর ঐ সকল নাটকের গান এবং হাসির গান সংগীত-জগতে বিশেষ সম্পদ্। তাঁর স্বদেশী গানগুলিরও তুলনা হয় না। তাঁর ছেলে দিলীপকুমার রায়ও প্রসিদ্ধ গায়ক।

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ) কবিগুরু এবং সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী (১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি ছেলেবেলায় ভারত-বিখ্যাত বাঙ্গালী গায়ক বিষ্ণু ও যদুভট্টের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন। তারপর পেলেন তাঁর সেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। সেজদা ছিলেন বিলিতী গানবাজনায় ওস্তাদ। তাই রবীন্দ্রনাথের গানে ইংরেজী সুর মিশল, তার উপর ধ্রুপদ, খেয়াল, বাউল প্রভৃতি নানারকম এদেশী সুর মিলে নতুন সুরের সৃষ্টি হল। তাঁর লেখা গানের সংখ্যা তিন হাজারের বেশী।

॥ অতুলপ্রসাদ সেন ॥

অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) লক্ষ্ণৌতে ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁর রচিত সংগীত ভাবে ও সুরের মাধ্যমে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর গানকে অতুলপ্রসাদী গান বলা হয়।

॥ নজরুল ইসলাম ॥

আর একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী গীতিকার হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম, বাংলা ১৩০৬ সন)। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে সেনাদলে ছিলেন। তখনই লিখতে শুরু করেন। তিনি অনেক জনপ্রিয় গানের রচয়িতা।

॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ॥

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর এক কারণে গানের জগতে বিখ্যাত। বাংলা গানের স্বরলিপি শেখবার যে-নিয়ম তিনি ঠিক করে গিয়েছেন, তা-ই আজকাল চলে। আর ভাতখণ্ডের স্বরলিপি চলে বাংলার বাইরে সব হিন্দুস্থানী সংগীতে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপিকে বলে আকারমাত্রিক স্বরলিপি।

॥ আলাউদ্দিন খাঁ ॥

আলাউদ্দিন খাঁ (?-১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ) একজন বিখ্যাত স্বরোদ-বাদক। ত্রিপুরা জেলায় তাঁর জন্ম। প্রথমে নানা দেশী বাজনা শেখেন ও পরে আহম্মদ আলী খাঁর স্বরোদ বাজনা শুনে তাঁর কাছে শিখতে যান।

তিনি ওস্তাদদের মন যোগাবার জন্যে তাঁদের চাকরদের কাজ করতেন আর গোপনে শুনে শুনে তাঁদের সব বাজনা শিখে নিতেন। ১৮ বছরের চেষ্টায় তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ স্বরোদ বাজিয়ে হন। অন্যান্য অনেক বাজনাতেও তিনি ওস্তাদ হন। তাঁর এক শিষ্য তিমিরবরণ ভট্টাচার্য (স্বরোদ)। আর এক শিষ্য রবিশঙ্কর (সেতার) হলেন তাঁর জামাই। তাঁর ছেলে আলি আকবর খাঁও (স্বরোদ) তাঁর শিষ্য। সেতার ও স্বরোদ বাজনায় শুধু ভারতে কেন, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁরা বিখ্যাত।

আলাউদ্দিন খাঁ

॥ স্বরলিপি ॥

স্বরলিপি জিনিসটা কি? কোনও গানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বরগুলো যেটার পর যেটা যে ভাবে গাইতে বা বাজাতে হবে, তা লিখে রাখাকে বলে স্বরলিপি। তাই স্বরলিপি পড়ে সেই অনুসারে কোনও বাজনা বাজিয়ে অজানা গানও শেখা যায়।

স্বরলিপির তিন পদ্ধতি—ভাতখণ্ডের পদ্ধতি, দণ্ড-মাত্রিক পদ্ধতি আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আকারমাত্রিক পদ্ধতি।

শুধু স্বরলিপি দেখে গান গাওয়া অবশ্য শক্ত কাজ, কিন্তু তা দেখে বাজনা বাজানো তত শক্ত নয়।

॥ তাল কাকে বলে ॥

কোনও গান বা বাজনা শুনলে, অর্থাৎ কোনও সুর কানে এলে আমরা মাথা নেড়ে, হাত চাপড়ে, কখনও বা পা ঠুকে যাই। তখন আমরা সেই গানটার সঙ্গে তাল দিচ্ছি, অর্থাৎ মেপে দেখছি যে গানের যেখানটা ঠিক যে সময়ে গাওয়া উচিত, তা হচ্ছে কিনা। তাল হচ্ছে গানের সময়ের মাপ। তাকে আবার খুব ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা যায়, তাদের বলে মাত্রা। এই মাত্রার সংখ্যা হিসেবে তালও নানারকম হয়; যেমন, ৭ মাত্রার তাল, ১২ মাত্রার তাল, ১৬ মাত্রার তাল ইত্যাদি। প্রত্যেক তালের কয়েকটা ভাগ বা পদ থাকে। তার মধ্যে একটা পদকে বলে 'খালি' বা 'ফাঁক', বাকী ক'টাকে বলে 'তালি'। ফাঁক যেখানে, সেখানে গানের জোর বা ঝোঁক নেই। আবার, তালিগুলোর মধ্যে একটাতে বেশী ঝোঁক দেবার নিয়ম—সেই ঝোঁকটাকে বলে 'সম'।

॥ একতালা ॥

একতালা হচ্ছে ১২ মাত্রার একটি তাল। আর চারটি সমান পদ, কাজেই প্রত্যেক পদে মাত্রা থাকে

ভারতীয় রামশিঙ্গা

বাঁয়া তবলা

তিনটি করে। পদ চারটি হলে একটি ফাঁক আর বাকী তিনটি তালি তো হবেই। তবে, একতালা তালের প্রথম তালিতেই সম, অর্থাৎ ঝোঁক পড়ে। একতালা তালে গান হলে, পর পর ঠিক সমান বাদে-বাদে সম, তালি, তালি ফাঁক নিয়ে তালের চারটি পদ শেষ পর্যন্ত বার বার ঘুরে ঘুরে আসবে।

॥ ঢিমে তেতালা ॥

ঢিমে তেতালা হল ১৬ মাত্রার তাল, চার মাত্রাওয়ালা চার পদ তাতে থাকে। দ্বিতীয়টিতে সম, চতুর্থটি ফাঁক।

এ তো সহজ তাল—সব পদে মাত্রা সমান নয়, এমন তালও কত আছে। সব গানই একটা-না-একটা তাল ধরে চলবে, নইলে সুর নষ্ট হয়ে যাবে। তবে, সব জায়গায় একই তাল নেই, এমন গানও হয়।

॥ বাজনার যন্ত্রপাতি ॥

বাজনা নানারকমের আছে—তার মধ্যে কোনও কোনওটাতে শুধু সুরই বাজানো যায়, সেগুলোকে সুরযন্ত্র বলা হয়। অন্যগুলোতে শুধু তালই দেওয়া যায়, তাদের বলা হয় তাল-যন্ত্র। সুরযন্ত্র মোটামুটি দু'রকম। এক হল তারের বাজনা (String instruments), ভাল কথায় ততযন্ত্র—যেমন, সেতার। অন্য হল হাওয়ার বাজনা, যার নাম শুষির যন্ত্র (Wind instruments) —যেমন বাঁশি। তারপর, তালযন্ত্রও দু'রকম। এক হচ্ছে অবনদ্ধ বা আনদ্ধ যন্ত্র, চামড়া দিয়ে ছাওয়া বাজনা—যেমন, ঢোল। আর আছে ঘন যন্ত্র, দুটো ধাতুর জিনিস ঠুকে বাজাবার বাজনা—যেমন, করতাল। ইংরেজীতে এই দুটোকেই এক শ্রেণীতে ফেলা হয়—Percussion instruments.
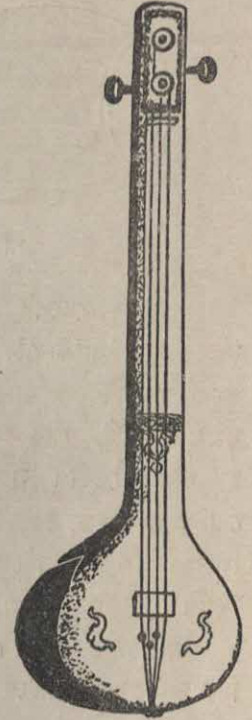
তানপুরা

করতাল হল দুটো গোল কাঁসার পাত, মাঝখানে ফুটো করে দড়ি পরানো। দু'হাতে সেই দুটো নিয়ে ঠুকে ঠুকে তাল দেওয়া হয়। একে করতাল বা খর্তালও বলে। এই জিনিসই বড় চেহারার হলে তাকে বলে ঝাঁজর, আবার ছোট ছোট বাটির মতো হলে তার নাম হয় মন্দিরা।

এদের মতোই আনদ্ধ যন্ত্রগুলিতেও সুর বাজানো যায় না, তালই বাজে। যেমন বাঁয়া তবলা। গানের সময় বেশির ভাগ জায়গাতেই এই বাজনা বাজানো হয়। তবলাটা একটু উঁচু, সেটাকে ডান হাত দিয়ে বাজানো হয়। আর, বাঁয়াটাকে বাঁ হাত দিয়ে বাজাতে হয়। দুটোরই মুখে চামড়া ঢাকা। চামড়ার উপর একটা গোল কালো জিনিস লাগানো থাকে—তাকে বলে গাব বা খিরণ। আমীর খসরুই নাকি প্রথম বাঁয়া-তবলা তৈরি করেছিলেন।

খোল বা মৃদঙ্গ
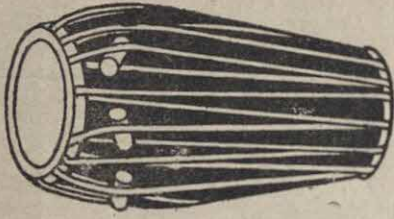
পাখোয়াজ

আমাদের দেশের পুরনো আনদ্ধ যন্ত্র হচ্ছে মৃদঙ্গ—ব্রহ্মা নাকি ওটা প্রথম তৈরি করেছিলেন। একে খোলও বলা হয়। বৈষ্ণবরা বলেন শ্রীখোল। মৃৎ মানে মাটি, আর অঙ্গ মানে গা, কাজেই মৃদঙ্গ হয় মাটির তৈরী। লম্বা, গোল আকার, পেটটা মোটা, সেখান থেকে দুই মুখ পর্যন্ত ক্রমে সরু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বাঁ দিকের মুখটা ডান দিকের মুখের দ্বিগুণ বড়। দু'মুখেই গাব দেওয়া।

দুর্গাপূজোয় যে ঢাক মাটিতে রেখে দুটো কাঠি দিয়ে একমুখ পিটিয়ে বাজানো হয় তার ভাল নাম ঢক্কা আর ডঙ্কা। আর ঢোল গলায় ঝুলিয়ে, কাঠি দিয়ে ডান দিক আর খালি হাতে বাঁ দিকটা পিটিয়ে বাজায়। তার দুটো মুখই প্রায় সমান। ছোট ঢোলের নাম ঢোলক, সাঁওতালরা বলে মাদল। দু'মুখওলা এক রকম বড় ঢাককে নাকাড়া বা নাগরা বলে। আর একটা বাজনা আছে পাখোয়াজ—তার চেহারা মৃদঙ্গেরই মতো। তবে সেটা কাঠের হয়, তার বাঁ মুখে খিরণ থাকে না, আর বাঁ মুখটা ডান মুখের দেড়গুণ বড় হয়।

মহাদেব ডমরু বাজাতেন, সেটাও আনদ্ধ যন্ত্র। আজকাল তা বাজায় শুধু যারা বাঁদর বা ভালুক নাচায়। তাকে বলে ডুগডুগি। তার পেটটা সরু, সেখানে ধরে নাড়লে দু'-পাশের দুটো দড়ির গাঁট দুমুখ-ছাওয়া চামড়ায় লেগে ডুগডুগ শব্দ হয়।
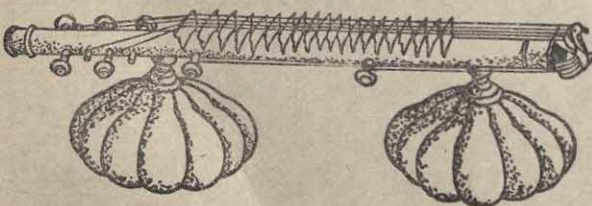
বীণা

খঞ্জনি একটা কাঠের রিং-এর একপিঠে চামড়া দিয়ে ছাওয়া, বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে চাপড়ে বাজানো হয়। ঐ রিংটার সঙ্গে আলগা টিনের কতকগুলো চাকতি পরানো থাকে, তাতে ঝনঝন শব্দ হয়।

যেসব যন্ত্রে গান বাজানো যায়, তার ভিতর শুষির বাজনার মধ্যে আছে বাঁশি আর সানাই। এতে সা রে গা মা দিয়ে সুর বাজানো যায়, কিন্তু ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় বলে যে বাজায় সে আর গাইতে পারে না। যে-বাঁশির এক মাথায় ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় তাকে বলে সোজা বা সরল বাঁশি (flageolet)। আর যে-বাঁশির ফুঁ দেবার ফুটো পাশের দিকে থাকে, তার নাম আড় বাঁশি বা মুরলী (flute)। শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাতেন। তাঁর বাঁশির শব্দ শুনে যমুনা নদীর জল উজানে, অর্থাৎ যেদিকে চলে তার উলটো দিকে বইতে থাকত।

বিয়েবাড়িতে বাজনদাররা সানাই বাজায়—একটা শুধু পোঁ ধরেই থাকে, আর একটাতে গান বাজে—তাকেই বলে সানাই। বড় বড় ওস্তাদ আছেন, যাঁরা সানাই বাজান।
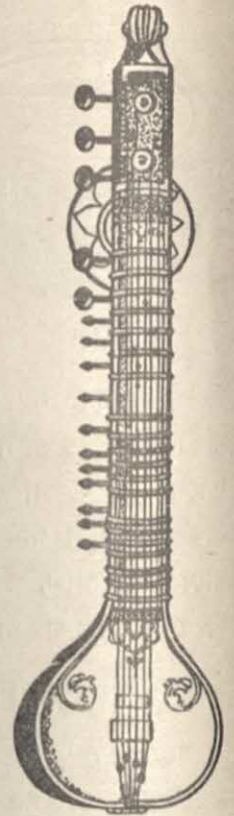
সেতার
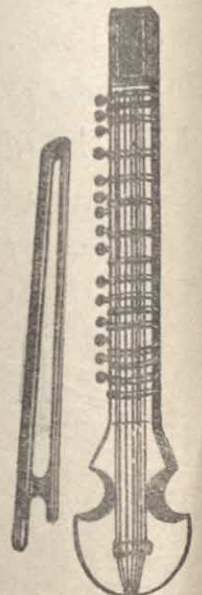
এসরাজ
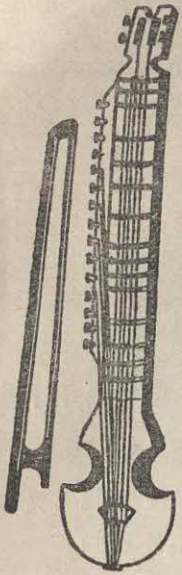
দিলরুবা

॥ যন্ত্রের শ্রেণীভেদ ॥

তবলা, পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, সেতার, বীণা —এগুলি সভা বা মজলিসের যোগ্য বলে এদের নাম সভ্য। রণশিঙা, তূরী, ভেরী, বিউগল, ঢাক—এগুলি যুদ্ধে ব্যবহার হয় বলে এদের নাম সাংগ্রামিক। একতারা, দোতারা, ঢোলক, খঞ্জনি, ডুগডুগি পল্লীগীতিতে বাজে বলে এগুলির নাম গ্রাম্য। টিকারা, সানাই এসব বিয়ে ইত্যাদি উপলক্ষে ফটকের কাছে বাজানো হয় বলে এদের নাম বহির্দ্বারিক। আর খোল, ঢোল ধর্মসংগীত, বিয়ে ইত্যাদিতে বাজে বলে সেগুলির নাম মাঙ্গলিক।

॥ বীণা, তানপুরা ॥

হাতে বাজান যায়, আর তার সঙ্গে মুখেও গান গাওয়া চলে, এমন তারের যন্ত্রের মধ্যে সব চাইতে পুরনো হচ্ছে বীণা বা বীণ। মা সরস্বতী বীণা বাজান, তাই তাঁর এক নাম বীণাপাণি। পুরাণে আছে, নারদমুনি বীণা বাজিয়ে হরিনাম গান করে ত্রিভুবনে ঘুরতেন।

বীণা অনেক রকমের হয়, তবে আজকাল যা চলে তাতে সাতটি তার থাকে, তার মধ্যে তিনটি থাকে পাশের দিকে। দেখতে খানিকটা সেতারের মতো। বড় বড় ওস্তাদরাই
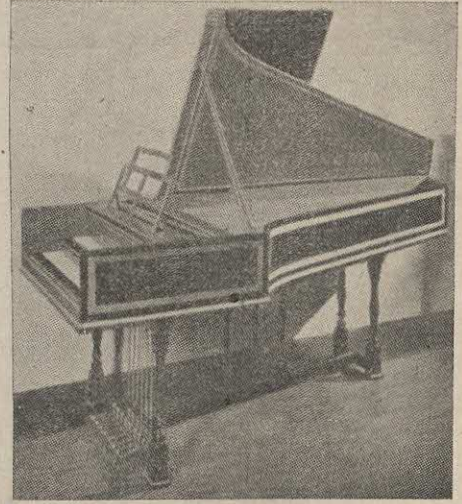
সুরবাহার

হার্পসিকর্ড

বীণা বাজান। তাঁরা আর একটা যন্ত্র বাজান, তাকে বলে তানপুরা কিংবা তম্বুরা। তাতে থাকে চারটি তার, চারটি ভিন্ন স্বরে বাঁধা। কাজেই তাতে সাতটি স্বর বাজাবার উপায় নেই।
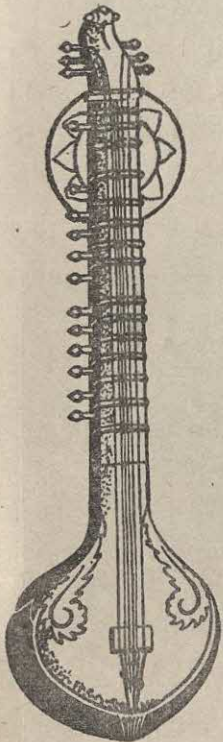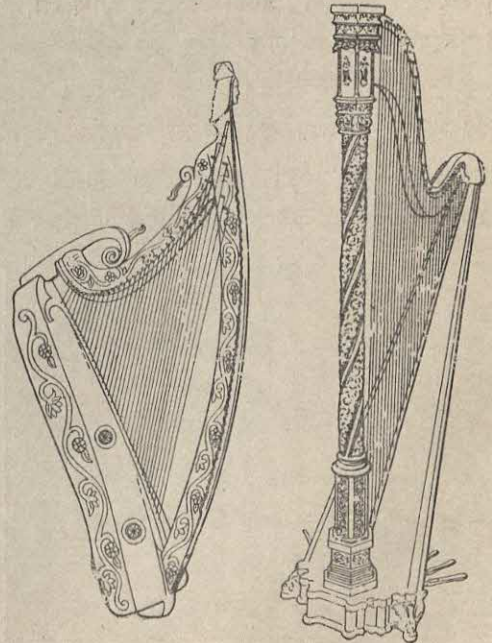
আইরিশ হার্প

লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরী বাজনা বাজাচ্ছে আফ্রিকার অধিবাসীরা

॥ সেতার ॥

সবচেয়ে বেশী যে তারের বাজনা দেখা যায়, তার নাম সেতার। ফারসীতে 'সেহ্' মানে 'তিন'। আমীর খসরু প্রথমে এটাকে তিন তার দিয়ে তৈরি করে এর নাম দেন সেহ্তার। শাহ্ সদারঙ্গ্ তাতে আরও তিনটি তার যোগ করেন, কিন্তু নাম একই থেকে যায়। আজকাল এতে সাতটি তার থাকে। ডান হাতের আঙুলে একটা তারের টুপি লাগিয়ে তাই দিয়ে তারে আঘাত করে আওয়াজ তুলতে হয়—তাকে বলে মিজরাব। আর বাঁ হাতের আঙুল তারের উপর চালিয়ে সুর তুলতে হয়। কোনও কোনও সেতারে ৭টা তার ছাড়া আরও ৯টা বা ১১টা বা ১৫টা তার পাশের দিকে লাগানো হয় —সেরকম সেতারকে বলে তরফদার (অর্থাৎ পাশে তার লাগানো) সেতার।

॥ সুরবাহার ॥

সুরবাহার এক ধরনের বড় সেতার। এতে গৎ না বাজিয়ে রাগের আলাপ বেশী বাজানো হয় বলে যন্ত্রটি তারই উপযোগী করে তৈরী।

॥ স্বরোদ ও রবাব বা রুদ্রবীণা ॥

স্বরোদ যন্ত্রের তার ৬টি। রবাব বা রুদ্রবীণায়ও তাই। চেহারা আর গড়নের তফাত দিয়ে চিনতে পারা যায়।

॥ ছড় দিয়ে বাজানো ॥

আঙুল দিয়ে না বাজিয়ে, ছড় দিয়ে তার ঘষে বাজাতে হয় যে সব বাজনা, তাদের মধ্যে এসরাজ, সারেঙ্গী আর সারিন্দার নাম করা যেতে পারে। ছড় বা ছড়ি হচ্ছে কতকটা ধনুকের মতো একটা জিনিস, যার ছিলেটা হয় ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে তৈরী। সেই দিক্ তারের উপর ঠেকিয়ে টানলে তার বাজতে থাকে।

বর্মীদের জাইলোফোন (Xylophone) বাদ্যযন্ত্র

বর্মীদের হার্প বা বীণা

জাপানী মহিলারা গান-বাজনার খুব ভক্ত। বামদিকের মহিলাটি গেকিন (Gekkin) বাজাচ্ছেন আর ডানদিকের মহিলাটি বাজাচ্ছেন স্যামিসেন (Samisen)

॥ এসরাজ, সারেঙ্গী, সারিন্দা ॥

এসরাজও অনেকটা সেতারের মতো, কিন্তু ছড় চালাবার সব বাজনার মতো এরও তলাকার খোলটার ধারটা কাটা—সমান গোল নয়। সারেঙ্গী, সারিন্দারও তাই, তবে তারা অনেক ছোট। আর, এসরাজের সব তারই ধাতুর, কিন্তু ওস্তুটোর তার তাঁতের, অর্থাৎ শুকনো নাড়ীভুঁড়ি পাকিয়ে তৈরী। এসরাজে আর সারেঙ্গীতে চারটে করে আসল তার, আর ১৫টা করে পাশের (তরফের) তার। কিন্তু সারিন্দার শুধু আসল তিনটি তার।

॥ একতারের বাজনা ॥

একতারের যন্ত্রও আছে—একতারা আর গোপীযন্ত্র, যাকে .আনন্দলহরী কিংবা গাবগুবাগুব-ও বলা হয়।

॥ বিলিতী বাজনা ॥

এখন বিলিতী কয়েকটা বাজনার কথা বলা হচ্ছে।

প্রথম হল—পর্দা টিপে বাজাবার যন্ত্র (key-board instruments); যেমন—অর্গ্যান, পিয়ানো, হারমোনিয়ম। আর আগেকার দিনে ছিল হার্পসিকর্ড। অর্গ্যানের প্রধান অংশ হচ্ছে কতকগুলো পাইপ। হাপর (bellow) দিয়ে তাতে হাওয়া চালিয়ে পর্দা টিপলে পাইপে সেই পর্দার স্বর বাজে। আমরা যাকে সাধারণতঃ অর্গ্যান বলি, সেটা সত্যিকার অর্গ্যান নয়—আসলে পায়ে হাপর-চালানো হারমোনিয়ম মাত্র। তাকে 'টেবল হারমোনিয়ম' বলাই ভাল। আসল অর্গ্যান সাহেবদের দেশে গির্জায় দেখা যায়।

পিয়ানো কথাটা আসলে হচ্ছে পিয়ানোফোর্ট (Pianoforte). এর ভিতরে সুর-বাঁধা তার থাকে। পর্দা টিপলে সেই সুরের তারে হাতুড়ি পড়ে সেটা বেজে ওঠে। এ যন্ত্রও পা দিয়ে চালাতে হয়, কিন্তু হাওয়া দেবার জন্যে নয়। পা চালালে আর একটা হাতুড়ি (damper) উঠে তারটাকে ছুঁয়ে তার কাঁপন থামিয়ে দেয়।

হারমোনিয়মে হাপর (bellow) দিয়ে হাওয়া করে এদিকে পর্দা টিপে ধরলে হাওয়াটা সেই পর্দার

বেলজিয়ান কঙ্গোর লোকেরা ঢাক ও রামশিঙা বাজাচ্ছে। রামশিঙাগুলো হাতির দাঁত থেকে তৈরী

আবিসিনিয়ার অধিবাসীদের তারের বাগুযন্ত্র

পথ দিয়ে বেরোয়। তখন সেখানে একটা রীড (পাতলা ধাতুর পাত) কাঁপে, তাইতে সুর হয়, কেননা রীডগুলো কোনও না কোনও সুরে বাঁধা থাকে।

ইওরোপের তারের যন্ত্রের মধ্যে হার্প, কিথারা বা সিথারা আর লায়র (lyre) খুব আগেকার দিনেও ছিল।

আজকাল তারের বাজনা বেশী চলে; যেমন—গিটার (guitar), ভায়োলিন (violin) ইত্যাদি। ভায়োলিনকে আমরা বলি বেহালা। বেহালা বাজাতে হয় ছড় দিয়ে, গিটার বাজাতে হয় তিন আঙুলে খুঁটনি (pick) পরে। খুব বড় বেহালাকে সংক্ষেপে বলে চেলো (Violoncello). সাধারণ গান বাজাবার জন্যে ওদেশে তারের বাজনা আছে—ম্যাণ্ডোলিন, ব্যান্জো, জিথার (Zither), ইউকুলেলে (Ukulele) বা হাওয়াইয়ান গিটার ইত্যাদি।

বিদেশে নানারকমের বাঁশি আছে। তাদের কোনটাই আমাদের মতো সাদাসিধে গড়নের নয়। সোজা বাঁশির নাম ফ্ল্যাজিওলেট, আড় বাঁশি হচ্ছে ফ্লুট। তা ছাড়া পিকলু (Piccolo) বাঁশি, ওবো (Oboe), কর্নেট (Cornet), ক্ল্যারিনেট বা ক্ল্যারিওনেট (Clarionet), ব্যাসূন (Bassoon) ইত্যাদিও মুখ দিয়ে বাজানো হয়।

এ সবই কাঠের। তাছাড়া ফুঁ দিয়ে বাজাবার পিতলের যন্ত্র আছে। ট্রম্বোন, ট্রাম্পেট, হর্ন, টিউবা ইত্যাদি যন্ত্র সাধারণতঃ ব্যাণ্ড বাজনায় বাজানো হয়। আর বাজানো হয় স্যাক্সোফোন।

বিদেশের পিটিয়ে বাজাবার যন্ত্রও আছে নানারকম। যেমন—টমটম, বঙ্গো (bongo), কেট্‌লড্রাম। ওদের দেশে বড় করতালকে বলে সিম্বাল (cymbal).
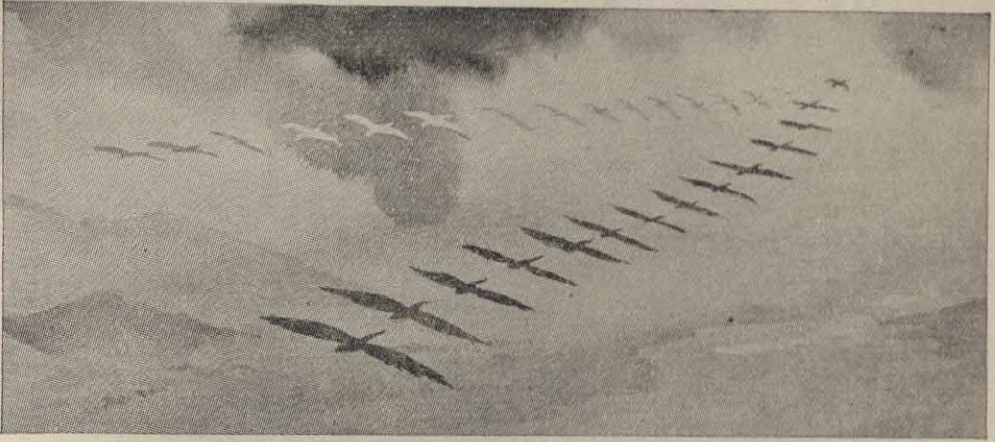
যাযাবর পাখির কথা

মিতালী ও রবীন তাদের বড়মামার সঙ্গে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এসেছে।

চিড়িয়াখানার দীঘির ধারে আসতে রবীন চেঁচিয়ে উঠল—"বড়মামা, দেখুন, দেখুন, সারা দীঘিটা পাখিতে ভরে গেছে। কই, আগের বার যখন এসেছিলাম, তখন তো এখানে এত পাখি ছিল না!"

বড়মামা—"এখন শীতকাল। শীত পড়তে শুরু করলে এই সব পাখি সাইবীরিয়া থেকে উড়ে এখানে আসে। সারা শীতকাল এখানে কাটিয়ে আবার তারা যে-যার জায়গায় ফিরে যায়।"

রবীন—"কেনই বা তারা আসে, কেনই বা চলে যায়?"

বড়মামা—"সাইবীরিয়ার নাম ভূগোলে পড়েছ। এশিয়া মহাদেশের উত্তর সীমায় এটা একটা বড় জায়গা। এখানে শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে। সারা দেশ বরফে ঢেকে যায়। তখন সেখানকার পাখিরা খাবার জিনিস ও থাকবার জায়গা পায় না। তাই যে-সব দেশে শীতকালে অসহ্য ঠাণ্ডা পড়ে না, খাবার জিনিসের অভাব হয় না, সেই সব দেশে শীতকালটা কাটাতে ওই সব পাখির দল উড়ে আসে।"

মিতালী বলল—"সাইবীরিয়া তো অনেক দূর। অত দূর থেকে তারা আসে?"

মিতালীর বড়মামা বললেন—"ভাবতে গেলে অবাক্ হতে হয়। ছোট ছোট পাখি। নরম পালকে ঢাকা শরীর। তাদের গায়ে কতটুকুই বা জোর! অথচ তারা প্রতি বছর হাজার হাজার মাইল দূরের সাইবীরিয়া থেকে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আসে।"

রবীন—"ওরা কোন্ পথে আসে?"

বড়মামা—"আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যে-সব পাখি আসে তারা তিব্বতের উপর দিয়ে হিমালয় পেরিয়ে চলে আসে। হিমালয়ের মাথা ডিঙিয়ে নয়, হিমালয়ের কতকগুলি গিরিসংকট দিয়ে তারা এদেশে আসে। একথা মহাকবি কালিদাসের কালেও জানা ছিল। মহাকবি সেগুলোকে বলেছেন 'ক্রৌঞ্চপথ'। গরমকালে আবার সেই পথে ঠিক যে-জায়গা থেকে তারা এসেছিল সেই জায়গাতেই ফিরে যায়। তাদের

শীতপ্রধান দেশ থেকে উড়ে এসে যাযাবর পাখিরা নির্জন দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে

রবীন—"এদের কেন যাযাবর পাখি বলে?"

বড়মামা—"ওই সব পাখি বছরের সব সময়ে এক জায়গায় থাকে না বলে ওদের বলা হয় যাযাবর পাখি বা ভবঘুরে পাখি। ইংরেজীতে বলা হয় migratory bird."

রবীন—"কি কি পাখি আসে?"

বড়মামা—"গাং চিল, জল-পিপি, পানকৌড়ি, বাচকা, বুনো-হাঁস, পানমোরগ, চকাচকী, স্টর্ক, খৈরি, কানঠুঁটি, মরাল, সুরখিয়া, মানিকজোড় প্রভৃতি নানা-জাতের পাখি নানা শীতপ্রধান জায়গা থেকে শীতকালটা কাটাতে ভারতের নানা জায়গায় আসে।

"আবার, সব পাখিই যে ভারতের বাইরে থেকে আসে, তা নয়। অনেক পাখি এক এক সময়ে ভারতেরই এক জায়গা ছেড়ে অন্য এক জায়গায় চলে আসে, যেমন কোকিল। তা ছাড়া, শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীতেই যাযাবর পাখিদের আনাগোনা চলে।

দিক্ ভুল হয় না, জায়গা চিনতেও অসুবিধে হয় না।"

মিতালী—"সাইবীরিয়া থেকে পাখির দল কি শুধু আলিপুরের চিড়িয়াখানাতেই আসে?"

বড়মামা—"না, ওরা ভারতের নানা জায়গায় এসে শীতকালটা কাটিয়ে যায়। শুধু ভারতে নয়, অন্যান্য দেশেও তারা এসে থাকে। সুদূর মধ্যপ্রদেশের নানা জায়গায় পর্যন্ত এরা চলে যায়। এদের মধ্যে নানা জাতের পাখিই থাকে, তবে, বুনো হাঁসই বেশী।

"শুধু যে সাইবীরিয়া থেকে আসে তা নয়। মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলীয় ভূমি, বৈকাল হ্রদের ধারের জায়গা, তিব্বতের উপত্যকা, দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের মালভূমি, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি নানা স্থান থেকে বেরিয়ে যাযাবর পাখির দল শীত কাটাতে মধ্যভারতে, রাজস্থানে, সুন্দরবন এলাকার বনবাদাড়ে, কালিন্দী নদীর পাশে, মুর্শিদাবাদে পদ্মার চরে, গোসাবা থানার নদীর ধারে, সাহেবখালির চরে, আলি-পুরের চিড়িয়াখানায়, আরও নানা জায়গায় আসে।"

শীতের শেষে যাযাবর পাখিরা ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে

"গোল্ডেন প্লোভার পশ্চিম আলাস্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব সাইবীরিয়ার পাখি। এরা শীত কাটায় প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে।

"শরাল বা হুইসলিং টিলস (Whistling Teals) উত্তর হিমালয়ের দুর্গম পাদদেশ থেকে উড়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আসে। এরা যখন কলরব করতে করতে উড়ে যায় তখন যেন মনে হয় শিস দিচ্ছে। তাই এদের বলা হয় হুইসলিং টিলস।

দক্ষিণ আটলান্টিক সাগরের অ্যাসেনসন দ্বীপে যাযাবর পাখিদের মেলা

"গিরিয়া (Gargeney) আসে সাইবীরিয়া থেকে। সাইবীরিয়ার পাতিহাঁস, গিনচেল, নকতা পাতিহাঁস (Comb duck) শীতের শুরুতে এসে পৌঁছয়। এপ্রিল-মে মাসে উড়ে চলে যায়।

"মালয়ী বক, সাহেব বুলবুল, কালিজ ফেজাণ্ট, পাহাড়ী তিতির, মরাল নীলশিরা, রঙিন পানকৌড়ি, বনঘুঘু, হরিয়াল প্রভৃতি পাখি বৈকাল হ্রদ, মানস সরোবর, সাইবীরিয়া থেকে আসে।

"সারা পৃথিবী জুড়ে যাযাবর পাখিদের আনাগোনা চলছে। পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে যখন প্রচণ্ড শীত পড়ে সেই সব জায়গা থেকে পাখিরা দক্ষিণাঞ্চলে প্রতি বছর উড়ে আসে। গরম পড়লে আবার তারা তাদের নিজেদের জায়গায় ফিরে যায়।

"হুইটোর পাখি গ্রীনল্যাণ্ড থেকে দু'হাজার মাইল দূরে স্পেনের উপকূলে উড়ে আসে। ইওরোপীয়ান সোয়ালো জিব্রাল্টার পেরিয়ে সাহারার ধার দিয়ে উড়ে আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে চলে যায়। এরা অবশ্য যখন ফিরে যায় তখন সাহারা মরুভূমির উপর দিয়ে যায়।

"আর্কটিক টার্ন পাখি আটলান্টিক পেরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যায়। এরা যাতায়াতে বাইশ হাজার মাইল আকাশপথ অতিক্রম করে।"

মিতালী—"পাখিরা কত উঁচু দিয়ে যায়?"

বড়মামা—"সাধারণতঃ পাখিরা তিন-চার হাজার ফুট উপর দিয়ে যায়। তবে কোন কোন পাখির ঝাঁক পাঁচ, দশ, পনর, কুড়ি হাজার ফুট উপর দিয়েও যায়।"

মিতালী—"ওরা ঘণ্টায় ক' মাইল বেগে যায়?"

বড়মামা—"সাধারণতঃ ঘণ্টায় কুড়ি থেকে তিরিশ মাইল।"

রবীন—"কোকিল কি যাযাবর পাখি?"

বড়মামা—"হ্যাঁ। কোকিল শীতপ্রধান দেশের পাখি। গরম দেশে শীত কাটিয়ে ওরা বসন্তের শেষে নিজেদের জায়গায় চলে যায়। সেই সময়ে তাদের মধুর ডাকে আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে।"

রবীন—"বসন্তের পরেও তো এদেশে কোকিলের ডাক শোনা যায়। তা কি করে হয়?"

বড়মামা—"কিছু কিছু কোকিল এদেশে থেকে যায়। কেউ কেউ দেরিতে নিজের জায়গায় ফিরে যায়। তাদের ডাকই শুনতে পাও।"

মিতালী—"কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে কেন?"

বড়মামা—"কোকিল দু'এক মাস বাদেই চলে যায়,

পাতিহাঁস

বুনোহাঁস

স্টর্ক

করমোর‍্যাণ্ট (পানকৌড়ি)

খৈরি
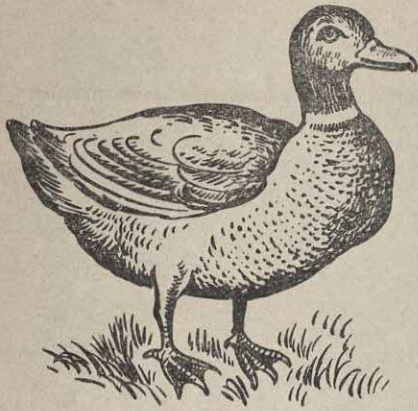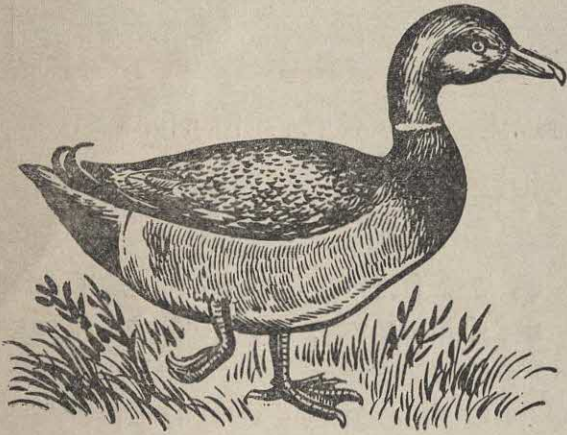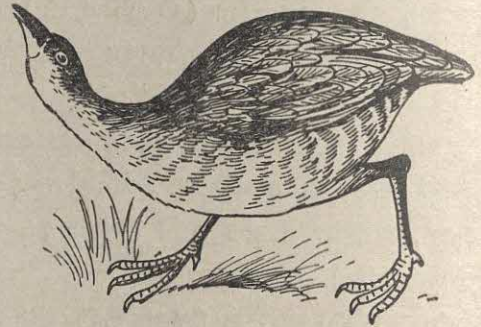
পানমোরগ

তিতির

হরিয়াল

বাচকা (বক্কা)

গাংচিল

মানিকজোড়

কোকিল
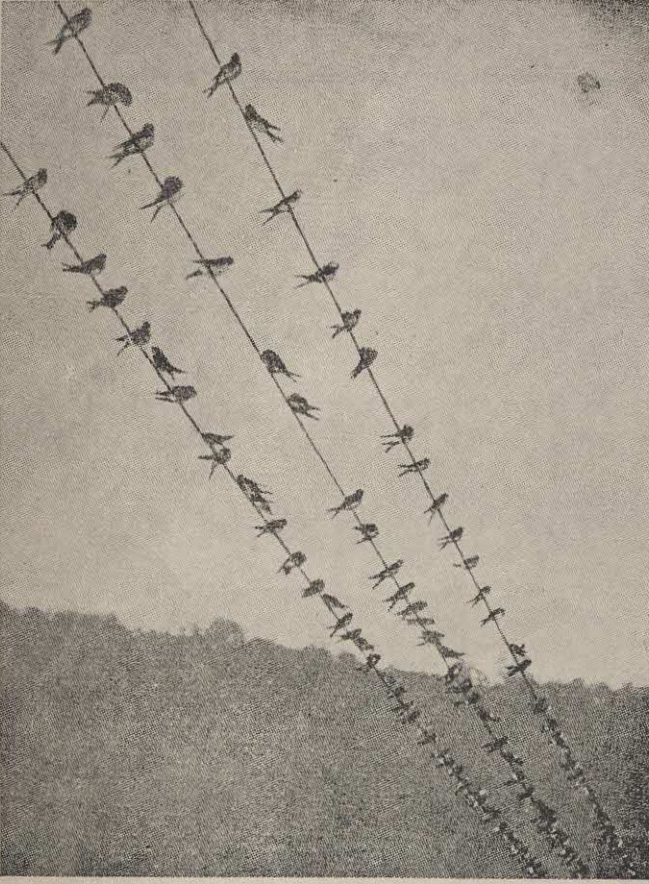
অন্য দেশ থেকে যাযাবর সোয়ালো পাখিরা যাবার পথে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের টেলিগ্রাফের তারে এসে বসেছে

তাই তারা বাসা বাঁধে না। কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা হলে সেই বাচ্চাদের পালন করবার সময় তাদের থাকে না। সেই সব বাচ্চা বড় হয়ে ডাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরই মধুর ডাক অন্য ঋতুতে শোনা যায়।"

রবীন—"কত রকমের যাযাবর পাখি আছে ?"

বড়মামা—"স্নাইলার, স্নেকবার্ড, চখা বা চক্রবাক, শীয়ারওয়াটার, স্টার্লিং, লিট্‌ল্ অক, গ্যানেট, স্যাণ্ডউইচ, টার্ন, ওয়ার্বলার, ল্যাপউইং, ওয়াক্সউইং প্রভৃতি প্রায় আট হাজার রকমের যাযাবর পাখি আছে।

"শৌখিন মানুষেরা যেমন সুন্দর করে ঘর সাজায় তেমনি সেই পাখিরাও তাদের বাসা খুব সুন্দরভাবে সাজায়। তাদের রুচি দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য! এমন সাজানো বাসা ফেলে আবার কোথায় তারা উধাও হয়ে যায়!

"সারা পৃথিবী জুড়ে যাযাবর পাখিদের যাতায়াত অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। এই সব পাখি সাধারণতঃ যেখান থেকে আসে সেখান থেকে উড়ে হাজার হাজার মাইল দূরের ঠিক সেই জায়গায় ফিরে যায়।"

রবীন—"কি করে তারা দিক্ ঠিক করে ?"

বড়মামা—"ইংল্যাণ্ডের সোয়ালো পাখিরা ফ্রান্স ও স্পেনের সোয়ালো পাখিদের দলে ভিড়ে পশ্চিম আফ্রিকায় পাড়ি জমায়। অকূল সাগরের উপর দিয়ে কি ভাবে তারা পথ চিনে উড়ে যায়, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ভ্রমণ করে তা আজও বিজ্ঞানীদের বিস্ময় হয়ে আছে। কেউ তাদের শেখায় না। হাজার হাজার বছর

পাখির পায়ে আংটি পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে

জলপিপি

ধরে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ ধরে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় উড়ে যায়। ওদের প্রাণে আপনা থেকেই একটা ইচ্ছে জাগে আর ওরা ডানা মেলে আকাশে উড়ে চলে।

"খাদ্যের অভাব দেখা দেবার সময় পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করে না। শরীরে একটু বল, একটু ক্ষমতা হলেই তাদের মনের মধ্যে অস্বস্তি জাগে, তাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

"বাচ্চা বেলা থেকে খাঁচায় ভরে রাখলেও তারা ঠিক সময়ে আকুল হয়ে ওঠে। খাঁচার শলাকায় ডানা ঝাপটাতে থাকে। কি যেন তাদের চাই—তা না পেলে—তারা অস্থির হয়ে ওঠে। একে বিজ্ঞানীরা বলে সহজাত প্রবৃত্তি (instinct).

"কি করে যে তারা দিক্ ঠিক করে তা প্রকৃতির এক বিরাট বিস্ময়। অনেক গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন, যাযাবর পাখিরা আকাশের তারা দেখে দিক্ ঠিক করে।"

মিতালী—"তাহলে ওরা রাত্রে ওড়ে?"

বড়মামা—"বেশির ভাগ পাখিই রাত্রে ওড়ে। দিনে পাতার আড়ালে, পাহাড়ের উপরে বসে বিশ্রাম করে। কিন্তু ইওরোপীয়ান সোয়ালো দিনে ওড়ে। বিজ্ঞানীরা বলেন, তারা সূর্য দেখে দিক নির্ণয় করে।

"কিন্তু তারা সূর্য দেখে দিক্ নির্ণয় করলেও প্রকৃতি তাদের এক বিস্ময়কর শক্তি দিয়েছে—যার ফলে তারা এই প্রায় অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তোলে।"

মিতালী—"ওরা যে ঠিক ঠিক জায়গায় ফিরে যায়, তার প্রমাণ কি?"

বড়মামা—"নানা দেশের লোকে এ নিয়ে নানা পরীক্ষা করে দেখেছে। উদয়পুরের লেকে যে-সব পাখি নামে, আগেকার দিনে রাজকুমারেরা সেই সব পাখিকে ধরে তাদের পায়ে ছোট আংটি পরিয়ে দিতেন। সেই আংটির মধ্যে রাজকুমারদের নাম-ঠিকানা-লেখা কাগজ থাকত। তাতে আরও লেখা থাকত, যে সেই পাখি ফিরিয়ে দিতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। এরকম অনেক পাখিকে ইংল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্ত থেকে ধরা গেছে।"

মিতালী—"শুধু কি পাখিরা এইভাবে পৃথিবীর এক ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত যাওয়া আসা করে?"

সাহেব বুলবুল

যাযাবর হরিণ

গয়ার (স্নেকবার্ড)

বড়মামা—"না, তা নয়। অনেক রকমের মাছ এক সাগর থেকে আর এক সাগরে যাতায়াত করে। এমন মাছ আছে যারা প্রতি বছর আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে ইংল্যাণ্ডের বিশেষ বিশেষ নদীতে ডিম পাড়তে আসে, ডিম ফুটে বাচ্চারা বেরিয়ে আটলান্টিক পার হয়ে বাপমা'র দেশে ফিরে যায়। পঙ্গপাল প্রধানতঃ খাদ্যের খোঁজে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায়। পেঙ্গুইন উড়তে পারে না। জলে সাঁতার কেটেই তারা এক দেশ থেকে শত শত মাইল দূরের অন্য দেশে চলে যায়।

"এমন কি প্রজাপতিরাও শীত কাটাতে অন্য দেশে যায়। তারা অবশ্য আর ফিরতে পারে না।

"নানা জন্তুও শীত এড়াতে বা খাদ্যের খোঁজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। হরিণ, বাইসন, সীল প্রভৃতি এই ধরনের জানোয়ার। অবশ্য পাখিদের মতো তারা অত দূর জায়গায় যায় না।"

রবীন—"বড়মামা, দেখুন দেখুন, পাখিরা জল ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে!"

বড়মামা—"সন্ধ্যে হয়ে এল। এবার ওরা খাদ্যের খোঁজে নানা জায়গার খালে বিলে যাবে। সেখান থেকে আবার ফিরে আসবে।"

বেরিং সাগরের প্রিবিলফ দ্বীপে যাযাবর সীলের দল'। এরা শীতকালে তিন হাজার মাইল দূরে চলে যায়
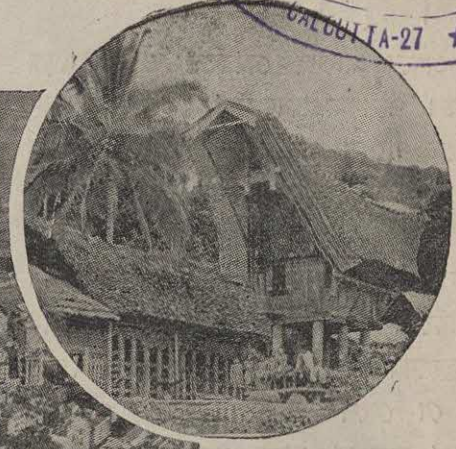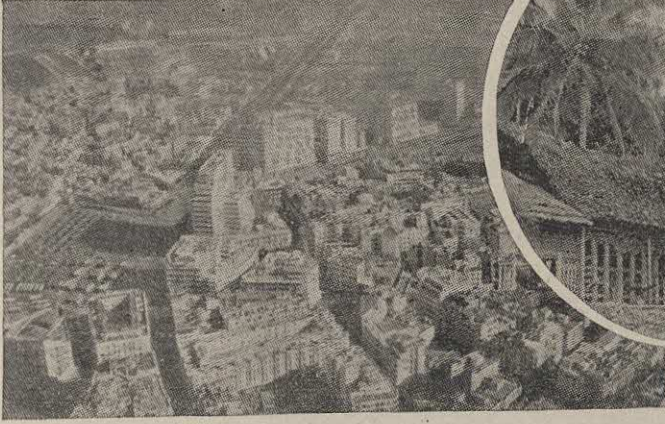
দেশবিদেশের ঘরবাড়ি

॥ জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের ঘরবাড়ি ॥

সব প্রাণীই কোন-না-কোন আশ্রয় তৈরি করে সেখানে বাস করে। কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সকলেই এ বিষয়ে উৎসাহী। কেউ মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে থাকে, কেউ থাকবার জন্যে আশ্চর্য রকমের বাসা তৈরি করে। মৌমাছি মৌচাক তৈরি করে, বোলতা-ভিমরুলও চাক তৈরি করে, পিঁপড়েরা কেউ কাঠে গর্ত করে থাকে, কেউ গাছের পাতা জুড়ে বাসা করে, কেউ আবার মাটির তলায় কেল্লার মতো ঘর করে থাকে।

টুনটুনি পাখি গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে বাসা বোনে। অন্যান্য পাখিরা কাঠিকুটি নিয়ে গাছের ডালের উপর বাসা বাঁধে। সবচেয়ে সুন্দর বাসা বোনে বাবুই পাখি। সেগুলো তাল-গাছের পাতা থেকে ঝুলতে দেখা যায়। ঠিক যেন উলটানো কুঁজো। নীচের দিক দিয়ে পাখিরা ঢোকে কিন্তু ডিম পাড়ে একটা পকেটের মতো খাঁজে। হাওয়ায় বাসা দুললেও ডিম বা বাচ্চা পড়ে যায় না। শালিক পাখি কোঠাবাড়ির দেয়ালের ফোকরে বাসা বাঁধে। চড়াই পাখি ঘরের মধ্যেই কার্নিসের ধারে বাসা বাঁধে। অনেক গৃহস্থ গাছে কলসী বেঁধে দেয়। সেই কলসীর মধ্যে শালিক পাখিরা বাসা বাঁধে।

সাপ গর্তে থাকে। কিন্তু সাপ গর্ত তৈরি করতে পারে না। ইঁদুরের গর্তে বা ফাটলে সাপ থাকে।

ইঁদুরের গর্ত নানারকম সুড়ঙ্গ দিয়ে তৈরী। সে সব গর্ত একটানা নয়। মাঝে মাঝে গর্তের পাশে উপরের দিকে একটু করে জায়গা থাকে। গর্তে জল ঢেলে দিলে ইঁদুর এই সব উপরের দিকটায় এসে থাকে।

খরগোশের বাসা থেকে বেরোবার এমনি অসংখ্য সুড়ঙ্গ থাকে।

মাটির তলায় পিঁপড়েরা যে সব গর্ত করে সেগুলো নানা কামরাওলা ঘরের মতো। তা

থেকে জল বেরিয়ে যাবার নরদমা থাকে। সমগ্র ঘরটার চারদিক খুব সুন্দর করে মাজা থাকে।

॥ গুহাবাসী মানুষ ॥

মানুষ প্রথমে গাছের ফোকরে ও পাহাড়ের গুহায় থাকত। পরে আরামের সন্ধানে তারা নানারকম ব্যবস্থা করতে থাকে। মাটির ঢিপির তলায় গর্ত করেও কত মানুষ থাকে। কিন্তু এসব জায়গা সেঁতসেঁতে হয়—সাপ ইত্যাদির ভয় থাকে, বর্ষাকালে জল ঢোকে। তাই পরে, মানুষ পাখিদের দেখাদেখি গাছেই থাকতে শুরু করে। পাহাড়ের গুহাই আদিম মানুষদের কাছে খুব আরামের বাসস্থান হয়ে উঠেছিল। যে দেশে কাছাকাছি পাহাড় নেই বা গুহা পাওয়া যেত না—মানুষ সেখানে নকল গুহা তৈরি করতে শুরু করল।

এমন একটা সময় ছিল যে সময়ের কথা ইতিহাসে লেখা নেই। তখন গুহাই ছিল মানুষদের বাসস্থান। তাই তখনকার মানুষদের বলা হয় গুহা-মানব (Cave-Man).

পশ্চিম মিনডানাওয়ে গাছের উপর বাড়ি

এসব গুহায় বন্য জন্তুদের আড্ডা ছিল। মানুষ তাদের তাড়িয়ে দিয়ে সেই সব গুহা অধিকার করল।

অনেক পরে যখন মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করতে শিখল তখনও বহু দেশে আদিম অধিবাসীরা গুহাতেই থাকত। ইংলণ্ডের উরস্টারশায়ারে, পাকিস্তানের সীমান্তে সফেদ-কোহ্ পাহাড়ে এবং আরও নানা জায়গায় আজও মানুষ পাহাড় কেটে তার মধ্যে ঘর তৈরি করে তাতে বাস করে।

॥ হ্রদের ওপর গ্রাম ॥

মধ্য ইওরোপের সুইজারল্যাণ্ড অঞ্চলে প্রাচীনকালে মানুষেরা একরকম বাসস্থান তৈরি করতো। তারা ছিল নবপ্রস্তর কিংবা তাম্র যুগের মানুষ। তারা হ্রদের তীরের কাছে জল যেখানে অগভীর, সেখানটায় অসংখ্য খুঁটি পুঁতে তার ওপর কাঠ বিছিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাচা করতো। তারপর সেই মাচার ওপর হতো তাদের কাঠের ঘর। এক একটা মাচার ওপর ২০০ পর্যন্ত ঘরও থাকতো—পুরো একটা গ্রামই আর কি! হ্রদের তীর থেকে একটি সাঁকো দিয়ে এই গ্রামে আসতে হতো। এদের নাম দেওয়া হয়েছে Lake-dwellers বা হ্রদবাসী।

॥ গাছের উপর বাড়ি ॥

প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপে লোক গাছের উপর কাঠের বাড়ি করে তাতে বাস করে। একটা মই দিয়ে এই সব বাড়িতে উঠতে হয়। বন্য পশু বা দুষ্টু লোক এরকম বাড়িতে সহসা আসতে পারে না। পশ্চিম মিনডানাওয়ে গাছের উপর বাড়ি করে ম্যানেবো জাতের লোকেরা বাস করে, সে সব বাড়ি দেখতে সত্যি অদ্ভুত।

॥ পাপুয়ায় কাঠের দোতলা বাড়ি ॥

পাপুয়াতে আর এক রকমের বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো একটু ভাল। এদের ব্যাস ৮ ফুট আর এগুলি ৫ ফুট উঁচু। এতে একটা গোটা পরিবারও থাকতে পারে। মাটিতে চারটে শক্ত খুঁটি পুঁতে

পাপুয়ার কাঠের দো-তলা বাড়ি

দোতলা ঘরও করা হয়। গাছের ছাল দিয়ে চারপাশ ঢাকা হয়। ছাদে আড়াআড়ি করে কাঠ পেতে তার উপর পাতা ও গাছের ছাল চাপা দেওয়া হয়। জল তাড়াতাড়ি ঝরে যাবে বলে চালগুলো ঢালু করা হয়।

॥ অস্ট্রেলিয়ানদের 'হামপি' (humpies) ॥

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা গাছের ছাল, পাতা দিয়ে ঢাকা, গাছের ডালের ছাদ-করা একদিক্ খোলা ঘরে বাস করে। এদের নাম কোথাও বা হামপি, কোথাও বা উরলি আর কোথাও বা গানিয়া (humpies, wurleys or gunyahs).

এসব কুড়ে ঘর শক্ত কাঠ দিয়ে মজবুত করে তৈরী। যাতে ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে না পারে সেজন্যে কোন কোন ঘরের পাশে আলাদা বেড়া দেওয়া থাকে।

॥ পাতায় কিংবা ঘাসে ছাওয়া বাড়ি ॥

হাওয়াই দ্বীপে ঘরের চালে শুকনো লম্বা ঘাস দেওয়া হয়। আমাদের দেশে খড়ের চাল আছে। অনেক গরিব লোক খড়ের বদলে গোলপাতা বা তালপাতা দিয়ে চাল ঢাকা দেয়। খড়ের চেয়ে উলুঘাস শক্ত, তাড়াতাড়ি পচে যায় না। সেজন্যে অনেকে ঘরের চালে উলুঘাস দেয়। কোন কোন জায়গায় কাঠের ফ্রেমের বাড়ি তৈরি করে তার উপর ঘাস দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়। দেখতে খারাপ হলেও এরকম বাড়ি শীতকালে বেশ গরম থাকে আর গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা থাকে। বাড়ির বাইরে উনুন থাকে। তাতে ঘরে আগুন ধরে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। ঘরের মধ্যে ধোঁয়াও হয় না।

॥ ফিজি দ্বীপের বাড়ি ॥

ফিজি দ্বীপের ঘরবাড়ি আরও বড়। এসব বাড়ি খুব উঁচু হয় আর কাঠের ফ্রেম দিয়ে প্রায় আজকালকার বাড়ির মতোই করা হয়। তাদের দেওয়াল ঘাস দিয়ে ছাওয়া বা মাদুর ঝুলিয়ে পাশে আড়াল করা, তলায় কাঠের প্লাটফর্ম করা থাকে। ঠিক যেন তক্তাপোশের উপর তৈরী বাড়ি। ঘরের মধ্যে কাঠের তৈরী টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, টুল ইত্যাদি থাকে।

॥ মৌচাকের মত বাড়ি ॥

অনেক দেশে মৌচাকের মতো বাড়ি তৈরি করে। পেরুর রেড ইণ্ডিয়ানরা গোলাকার ঘর তৈরি করে তাতে বাস করে। এগুলো খুব উঁচু হয়। এর উপর ঘাস দিয়ে ভাল করে ঢাকা দেওয়া থাকে। এগুলি ঠিক মৌচাকের মতো দেখতে। দক্ষিণ আফ্রিকার হটেনটটরা এই রকম গোলাকার বাড়ি পছন্দ করে। বাঁশ বাঁকিয়ে এর চাল তৈরী হয়। তার উপর নল-খাগড়ার গুছি সাজিয়ে ছাদ তৈরী হয়। দেখতে ঠিক ছাতার মতো। কয়েকটি বাড়ি এক সঙ্গে থাকলে তাকে বলে ক্রাল (kraal). এর নীচু তলায় গরু-বাছুর থাকে, উপর তলায় মানুষ থাকে।
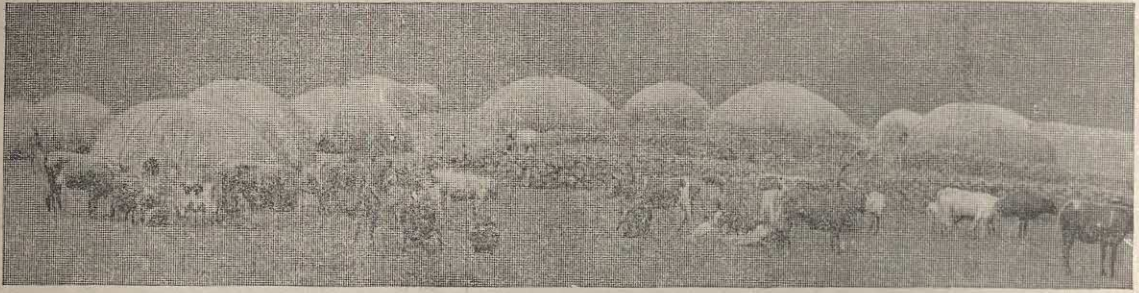
পেরুর রেড ইণ্ডিয়ানদের মৌচাকের মতো বাড়ি

॥ আফ্রিকায় গোল্ড কোস্টের বাড়ি ॥

আফ্রিকায় গোল্ড কোস্টের কাছে কয়েকটা বাড়িতে ঘরে ঢোকবার দরজা এত ছোট যে হেঁট হয়ে তাতে ঢুকতে হয়। একটা চওড়া বড় কাঠ দিয়ে এই ফাঁক বন্ধ করা যায়। ঘরগুলো চোদ্দ থেকে পনেরো বর্গফুট। ঘরে কোন জানলা নেই। মেঝেতে বালি ছড়ানো। ঘরের মধ্যে উনুন। উনুনের ধোঁয়া চালের আলগা ঘাসের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই সব ঘরে একটা করে কাঠের লম্বা বেঞ্চি পাতা থাকে। তার উপরে কাঠের বালিশ আর কম্বল বিছানো। এই তাদের বিছানা।

॥ কাঠের থামের উপর বাড়ি ॥

প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপে বিস্তীর্ণ জলার উপর কাঠের থামের উপরে বাড়ি তৈরি করা হয়। শক্ত কতকগুলি থামের উপর একটা কাঠের মাচা (platform) করে তার উপর ঘর তৈরি করা হয়। উপরে উঁচু করে একটা থাম পুঁতে সেই খুঁটি থেকে চাল নামানো হয়।

বোর্নিও দ্বীপে সবাই মিলে এক সঙ্গে বাস করার উপযোগী লম্বা লাগোয়া সব ঘর তৈরি করে। এসব বাড়ি চারশো গজ পর্যন্ত লম্বা

আফ্রিকার জুলুদের বাড়ি

খুঁটির উপর তৈরী বাড়ি। মইটা তুলে নিলে বন্যজন্তুর আক্রমণের ভয় থাকে না। এ ঘরে জানলা থাকে না

হয়। বহু পরিবার এই সব ঘরে পাশাপাশি বাস করে। পাপুয়ার গ্রামে আবার কাঠের লম্বা লম্বা 'ক্লাব ঘর' তৈরী হয়। উপরে ঘাস দিয়ে ছাওয়া এই সব ঘরে পাপুয়ার অধিবাসীরা গানবাজনা ইত্যাদি করে এবং সবাই মিলে আনন্দ-উৎসব করে।

নিউজিল্যাণ্ডের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে মাওরিরা অতিথিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে এক রকম মজলিস ঘর তৈরি করে। এইসব ঘরের নাম 'হয়ার হোয়া কাইরো' (whare wha kairo). এই সব ঘরের মাটির দেওয়ালে নানা রকম কারুকার্য করা হয়। মাওরিরা গায়ে নানারকম উলকি কেটে তাতে রং করায়। এই সব বাড়ি আবার কাঠেরও তৈরী হয়। সে সব বাড়ির চওড়া কাঠে বা থামে নানারকম খোদাই করা হয়। খুঁটির মাথায় নানা রকম বীভৎস মুণ্ড খোদাই করা হয় আর সারা গায়ে নানারকম ফুল, পাখি, জীবজন্তুদের মুখ খোদাই করা থাকে। কাঠ খোদাই শিল্পটা মাওরিদের একটা বিশেষত্ব।

ফরমোজার পুবদিকের বাসিন্দা আটায়ালদের এমনি উঁচু ঘরে নব দম্পতিকে থাকতে দেওয়া হয়। এগুলি মাটি থেকে ২০ ফুট উঁচু হয়।

রেড ইণ্ডিয়ানদের বাড়ির নাম উইগওয়াম (wigwam) আর টেপী (tepee). কাঠের ফ্রেমের উপর গাছের ছাল বিছিয়ে যে সব ঘর হয় তাদের নাম উইগওয়াম। কোন কোন বাড়ির উপর ঘাসের মাদুর বুনে বিছিয়ে দেওয়া হয়। 'টেপী' ওদের একরকম অস্থায়ী তাঁবু। কয়েকটা বাঁশের খুঁটির উপরটা একসঙ্গে বেঁধে তাদের তলাগুলো গোলাকারে সাজিয়ে চামড়া দিয়ে উপরটা ঘিরে দেওয়া হয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার সময়ে বাঁশগুলো তাড়া বেঁধে চামড়াগুলো গুটিয়ে গোল করে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে তারা চলে যায়।

॥ আটায়ালদের ঘর ॥

ফরমোজার পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা আটায়ালরাও বিচিত্র ধরনের বাড়ি তৈরি করে। পাহাড় বা সমতল ভূমি যেখানেই তারা বসবাস করে, তাদের ঘর হয়

পাহাড়ের উপর তৈরী কাঠের বাড়ি

মাটি থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তাদের ঘর তৈরী হয়, উপরটা ঘাস দিয়ে ঢাকা থাকে। নব দম্পতির থাকবার জন্যে তারা যে ঘর তৈরি করে তা সাধারণতঃ বিশ ফুট উঁচু হয়।

॥ বাইসনের চামড়ার তাঁবু ॥

আগে যখন উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার প্রান্তরে অনেক বাইসন পাওয়া যেত তখন রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের মেরে মাংস খেত আর চামড়া দিয়ে তাঁবু তৈরি করে তার মধ্যে বাস করত। বাইসন যখন কমে গেল তখন তারা এক রকম ক্যানভাসের মতো সুতীর চাদর দিয়ে তাঁবু ঢাকত। কিন্তু পুরনো রীতিতে তাঁবুর খুঁটি লাগানো তখনও চলত। দশ বারোটা খুঁটি পুঁতে তারা তাঁবুর কাপড়টা সমান করে খাটাতো —তাঁবুর মাথার উপর দিয়ে যাতে ধোঁয়া বেরিয়ে যায় তার জন্যে একটু ফাঁক রেখে দিত। ওদের টেপী (তাঁবু) খাটাবার একটা নিয়ম ছিল। তাঁবুর কাপড়ে নানা রকম রং থাকত। তাতে তাঁবুগুলো দেখতে খুব সুন্দর হত। লাল, হলদে, সবুজ এগুলিই ওদের পছন্দসই রং। কোন কোন তাঁবুর উপর ওদের দলের চিহ্ন থাকত—ভালুক, নেকড়ে, ঈগল ইত্যাদি। এক একটা তাঁবুতে গোল করে আঁকা শিকারের দৃশ্যও আঁকা দেখা গেছে।

॥ এস্কিমোদের ইগলু ॥

সবচেয়ে অদ্ভুত বাড়ি হল এস্কিমোদের ইগলু। এসব ঘর একেবারে আগাগোড়া ঢাকা। ঘরে ঢোকবার পথটা খুব নীচু। নীচু একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তবে ঘরের দেয়ালের মধ্যে কাটা ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। উত্তর মেরুর প্রচণ্ড শীতে এই সব বাড়ি খুব আরামের। ভিতরে একটুও ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকতে পারে না বলে, ভিতরটা বেশ গরম। ওদের আর এক রকম বাড়ির ফ্রেম হয় তিমির হাড় বা কাঠ দিয়ে বা পাথর দিয়ে। তার উপর শেওলা ও চামড়া ঢাকা দেওয়া থাকে। এগুলো ঘণ্টার মত দেখতে আর গ্রীষ্মকালে বাস করবার জন্যে।

আটায়ালদের বাড়ি। উঁচু পাহাড়ের উপর তৈরী। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরী এসব বাড়ি ঘাস দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়
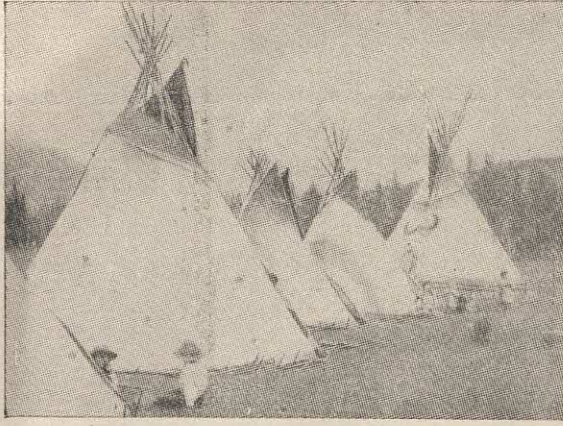
ভবঘুরে রেড-ইণ্ডিয়ানদের বাসস্থান বাইসনের চামড়ার তাঁবু

এসব বাড়ির আসল অসুবিধে হচ্ছে আলো আর হাওয়া-বাতাসের অভাব। ধোঁয়া বেরুবার জন্যে কোন চিমনি থাকে না। সীলের চর্বির আলো জ্বলে, তাতে ঘরটা খুব গরম হয়ে ওঠে। বাইরে এত ঠাণ্ডা যে বরফের বাড়ির দেওয়াল গলে যায় না।

॥ নৌকোয় বাড়ি ॥

কতক লোক সারা জীবন নৌকোয় থাকে। সেখানেই তাদের ঘরকন্না। ডাঙায় তাদের এতটুকুও জায়গা নেই। যা কিছু সব এদের নৌকোয়।

চীনে কিছু লোক নৌকোয় জীবন কাটায়। ডাঙার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই

চীনদেশে এমনই অনেক পরিবার আজন্ম নৌকোয় বসবাস করে। কাশ্মীরেও অনেক পরিবার এমনি নৌকোয় বসবাস করে।

॥ গ্রীসের ও রোমের বাড়ি ॥

প্রাচীন গ্রীসে পাথর দিয়ে সব বাড়ি তৈরী হতো—সে সব বিরাট বাড়ি। যেমন আকারে বড়ো তেমনি তাদের তৈরির কারুকার্য। এখনও তাদের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন রোমানদের আমলে ক্যাটাকোমস (catacombs) অর্থাৎ মাটির নীচে সুড়ঙ্গের মতো ঘর তৈরি করা হত। এগুলো ছিল রোমানদের কবর। পরে খ্রীষ্টানরা এখানে লুকিয়ে থেকে ভগবানের আরাধনা করত। এই সব আরাধনার ঘরে খুব সুন্দর কারুকার্য করা থাকত। রোমের আশপাশে ওরকম অনেক পাহাড়ের গুহা বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে, তা মোটের ওপর কয়েকশ' মাইল লম্বা। মিশরদেশের আলেকজ্যাণ্ড্রিয়াতেও ক্যাটাকোম আছে।

॥ ইংল্যাণ্ডের বাড়ি ॥

ইংল্যাণ্ডে আগে সব কাঠের বাড়ি ছিল। পরে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পাথরের বাড়ি তৈরী হতে থাকে। নিউটনের জন্মস্থান লিঙ্কনশায়ারের

লিঙ্কনশায়ারের অন্তর্গত উলসথোর্পে নিউটনের জন্মস্থান—কাঠের বাড়ি
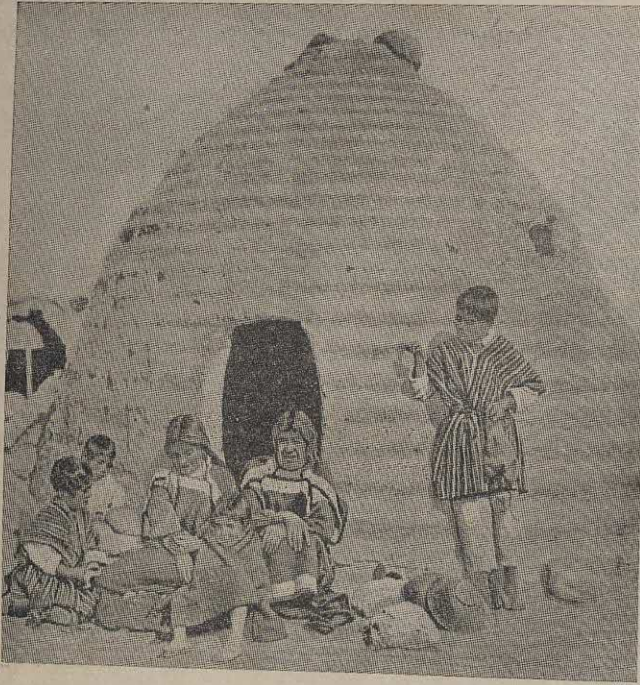
বলিভিয়ায় ইণ্ডিয়ানদের বাড়ি

অন্তর্গত উলসথোর্প। যে বাড়িতে নিউটনের জন্ম হয়েছিল সেটা একটা কাঠের বাড়ি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বহু কাঠ ও পাথরের বাড়ি তৈরী হয়েছিল। এগুলোর দেওয়াল ছিল পাথরের কিন্তু মেঝে ছিল কাঠের। পরে ইংল্যাণ্ডের বাড়িঘর তৈরির মধ্যে বহু বৈচিত্র্য আসে। ইট, কাঠ, পাথর দিয়ে বাড়ি তৈরী হয়। ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে কাঠের ফ্রেমের বহু বাড়ি আজও আছে। তাছাড়া ইটের দেওয়াল ও কাঠের ফ্রেমের ছাদওলা বাড়িও প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়।

॥ বলিভিয়ায় ইণ্ডিয়ানদের বাড়ি ॥

বলিভিয়ায় ইণ্ডিয়ানদের বাড়ি পাথরের তৈরি। দেখতে ঠিক এস্কিমোদের ইগলুর মতো। একটি মাত্র দরজা। তাই দিয়ে তারা ভিতরে ঢোকে। অধিকাংশ সময়ে তারা বাড়ির বাইরে বসে কাজকর্ম করে।

বলিভিয়ার ইনকাদের বাড়িতে আবার একেবারে জানলা থাকে না। মাটিতে মৃতদের কবর দেয়। উপরের ঘরে এরা ঘেষাঘেঁষি করে থাকে।

॥ কিরঘিজদের তাঁবু ॥

কিরঘিজরা মঙ্গোল জাতের লোক। এরা কিরঘিজ প্রান্তরে বাস করে। এখানে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় গাছপালা নেই। এখানকার লোকেরা তাঁবুতে বাস করে। এই তাঁবুগুলো এমন করে তৈরী যে এদের মাঝখানে দাঁড়ালে চালটা মাথায় ঠেকে আর সবসুদ্ধ তাঁবুটা উঠে আসে। তখন এরা
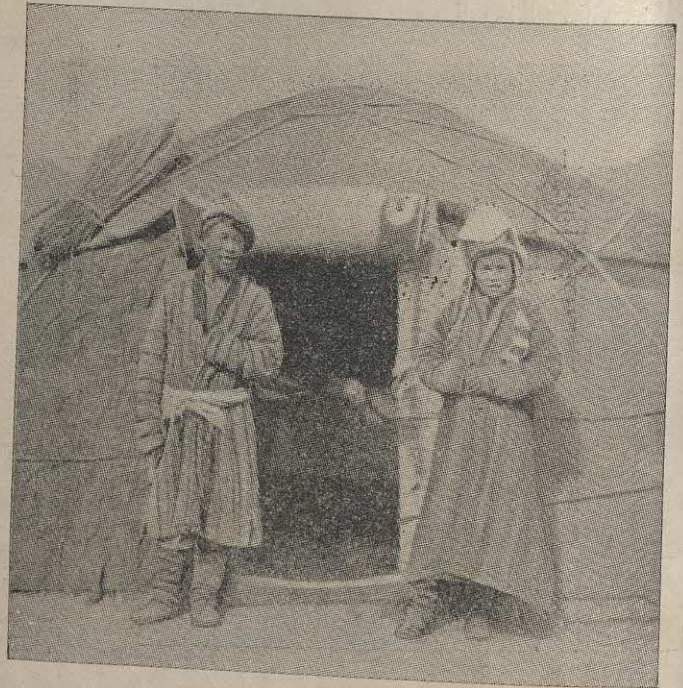
কিরঘিজদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরাবার উপযোগী নীচু তাঁবু
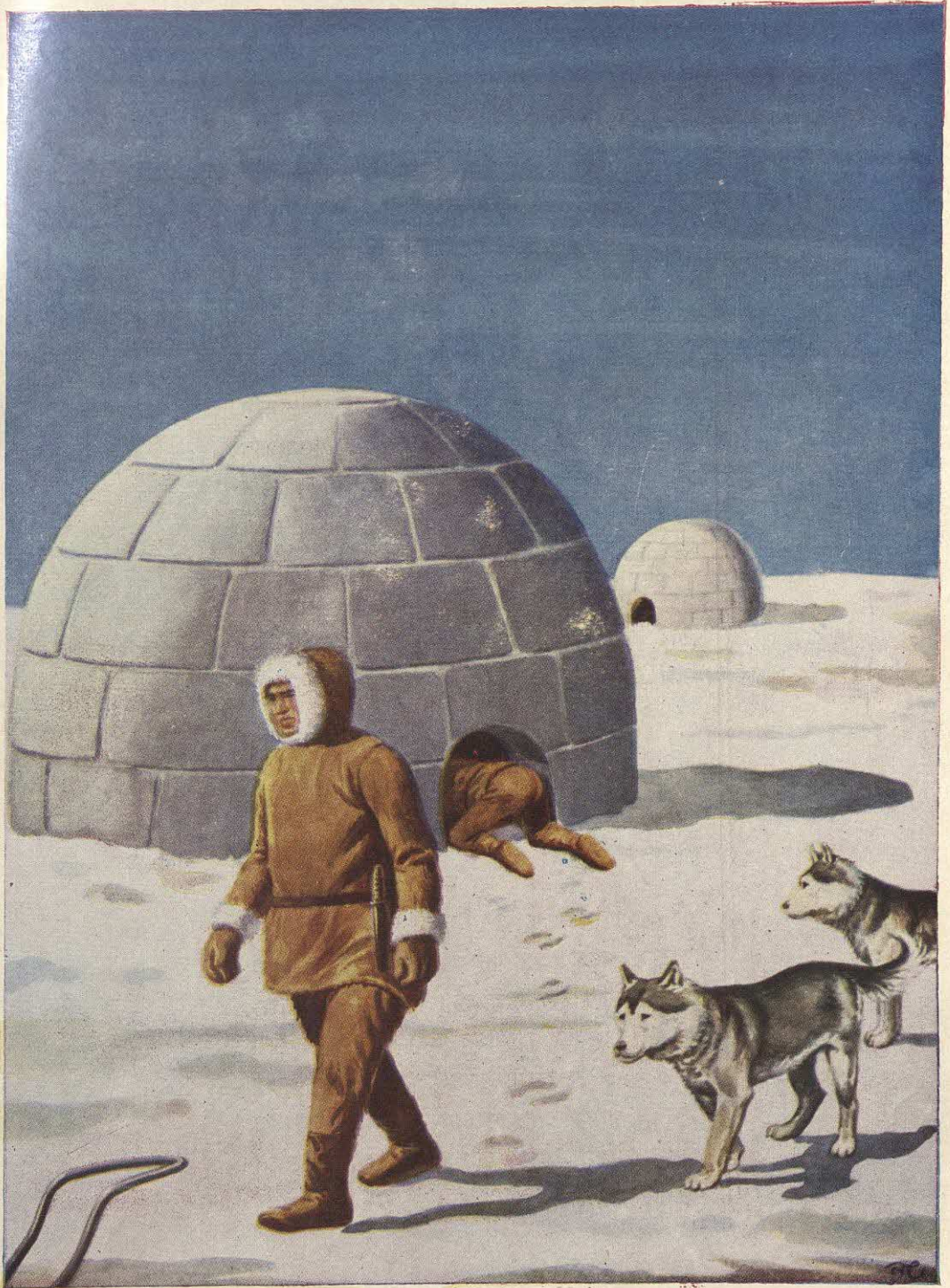
এস্কিমোদের বাসভবন—ইগলু।

দেশবিদেশের ঘরবাড়িঃ

[এস্কিমোদের বাসভবন—ইগলু]

এস্কিমো উত্তরমেরু অঞ্চলের একশ্রেণীর মানবজাতি। তারা সাধারণতঃ উত্তরমেরুর সন্নিহিত অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রীনল্যাণ্ডে বাস করে। এই সব অঞ্চলে প্রচন্ড শীত। বৎসরের সব সময়েই বরফ জমে থাকে। এস্কিমোরা থাকবার জন্যে বাড়ি তৈরি করে। এ বাড়ি আমাদের দেশের ইট বা মাটির নয়। তারা বরফের চাঁই কেটে বড় বড় ইটের মতো করে তাই দিয়ে বাসের ঘর তৈরি করে। এই ঘরের নাম ইগলু।

ইগলুতে কোন জানালা নেই। ভিতরে যাবার জন্যে একটা ছোট প্রবেশপথ থাকে। এস্কিমোরা হামাগুড়ি দিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ করে।

ছবিতে দুটো ইগলু দেখা যাচ্ছে। একজন এস্কিমো হামাগুড়ি দিয়ে একটা ইগলুর ভিতরে যাচ্ছে, আর একজন দুটো কুকুর নিয়ে স্লেজগাড়ির দিকে যাচ্ছে। ছবিতে স্লেজ-গাড়ির হাতলটা দেখা যাচ্ছে। এস্কিমোদের দেশে এই স্লেজগাড়িতে করে যাওয়াআসা চলে। গাড়িতে কোন চাকা নেই। কুকুর বা বলগা হরিণ গাড়িটা বরফের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়।

চলতে থাকে আর তাঁবুটাও ওদের মাথায় মাথায় চলতে থাকে। তারপর একটা পছন্দমতো জায়গায় তারা সেটা বসিয়ে দেয়।

বলিভিয়ার একরকম জানলাহীন পাথরের বাড়ি। মাটিতে মৃতের কবর। উপরের ঘরে এরা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে

॥ পশ্চিম আফ্রিকার রোদে শুকানো মাটির বাড়ি ॥

পশ্চিম আফ্রিকার অসভ্যরা একরকম শুকনো মাটির চুড়োওলা বাড়ি তৈরি করে। খানিকটা করে মাটির অংশ তৈরি করে রোদে শুকিয়ে পরে সেগুলো জুড়ে জুড়ে এই বাড়ি তৈরি করে। এর সামনে দরজা থাকে। ছাদে যাতে জল না জমে সেজন্যে ছাদের উপর থেকে জল বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে।

॥ সুমাত্রা দ্বীপের নরখাদকদের বাড়ি ॥

সুমাত্রা দ্বীপে এক জাতের নরখাদক আছে। তাদের কাঠের ঘরবাড়ি ও বেশভূষা দেখলে তারা যে অসভ্য নরখাদক তা মনেই করা যায় না।
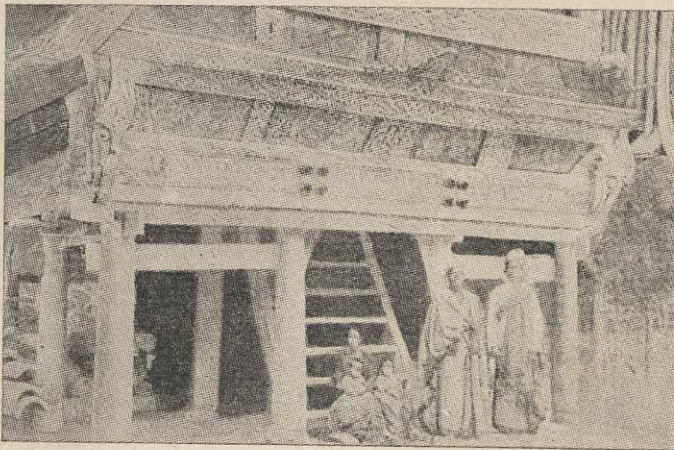
মধ্য সুমাত্রার এক জাতের নরখাদকদের মধ্যে সংস্কৃতির ঢেউ এসেছে তাদের ঘরবাড়িতে

॥ কয়েকটি অদ্ভুত বাড়ির কথা ॥

পিকিং শহরের ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জলের উপর নৌকোর আকৃতির একটি পাথরের বাড়ি আছে। জলের উপর থেকে এর ভিত্তি তৈরী।

স্পেনের উত্তর-পুবে বার্সিলোনার একটি আধুনিক ফ্ল্যাট-বাড়ির ছবি দেখানো হল। এর বারান্দাগুলো ঢেউ-খেলানো। এই রকম বিরাট আকৃতির ফ্ল্যাট-বাড়ি আজকাল সব শহরে তৈরী হচ্ছে।
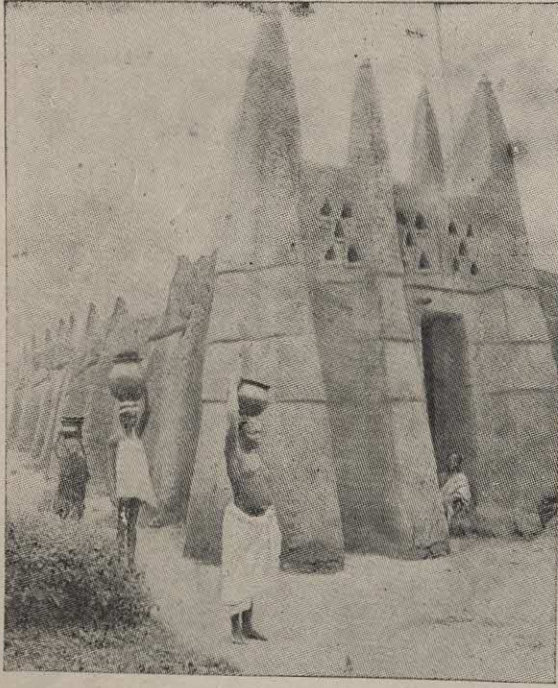
রোদে শুকানো মাটির তৈরী চুড়োওলা বাড়ি
(পশ্চিম আফ্রিকা)

এইসব ফ্ল্যাট-বাড়িতে শত শত পরিবার বাস করে। সকলের ঘরদোর কিন্তু আলাদা করা।

॥ বাঁশিওলার স্মারক বাড়ি ॥

রবার্ট ব্রাউনিং-এর "পায়েড্ পাইপার অফ হ্যামলিন" কবিতার বাঁশিওলা একদিন বাঁশি বাজিয়ে হ্যামলিন শহরের সব বাড়ি থেকে ইঁদুরদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শহরটিকে ইঁদুরদের হাত থেকে মুক্ত করেছিল। কিন্তু এ কাজের জন্যে তাকে যে পুরস্কার দেবার কথা ছিল তা তাকে দেওয়া হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত সে বাঁশি বাজিয়ে শহরের সব ছেলে-মেয়েকে তার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। এটি ঐ অঞ্চলের একটি প্রচলিত কিংবদন্তী।

১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামলিন শহরে বাঁশিওলার স্মারক একটা বাড়ি তৈরী হয়েছিল।

॥ সবচেয়ে বড় বাড়ি ॥

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাড়ি হচ্ছে রোমের ভ্যাটিকান (Vatican) প্রাসাদ। খ্রীষ্টান রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপ (Pope) এখানে থাকেন। বাড়িটি ১১৫১ ফুট লম্বা, আর ৭৬৭ ফুট চওড়া এতে ৪০০ ঘর আছে। তার মধ্যে একখানা ঘরই ১০০ ফুট লম্বা।

॥ কয়েকটি বিখ্যাত বাড়ি ॥

স্পেনদেশে গ্রানাডাতে মুসলমানরা ৬০০ বছর আগে আলহামব্রা নামে একটি অপূর্ব কারুকার্যখচিত প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। সেটি এখনও পৃথিবীর একটি দ্রষ্টব্য জিনিস।

রাশিয়ার মস্কো শহরে রুশ-সম্রাটদের বিশাল প্রাসাদ ক্রেমলিনও (Kremlin) একটি বিখ্যাত প্রাসাদ। এটা ৩০০ বিঘা জমির ওপর তৈরী।

তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামা-র লাসা
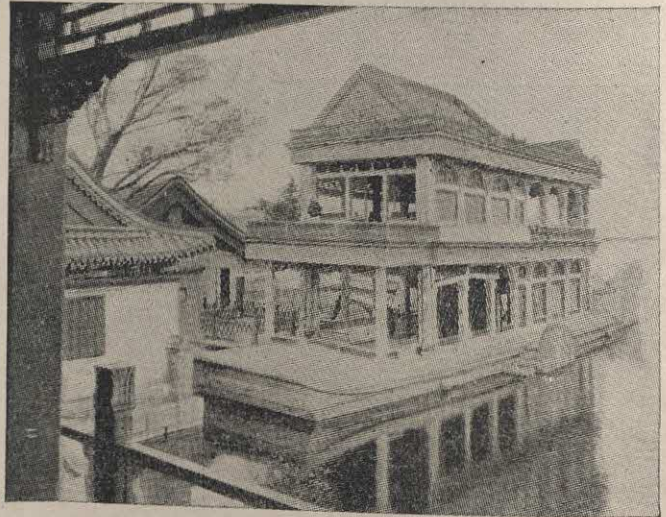
জলের উপর সাদা পাথরের তৈরী নৌকোর আকৃতির বাড়ি।
পিকিং-এর এগার মাইল উত্তর-পশ্চিমে এটি অবস্থিত

শহরের প্রাসাদ-দুর্গ পোটালা (Potala) একটি উঁচু পাহাড়ের সমস্ত গা জুড়ে তৈরী।

ফরাসীদেশের বিখ্যাত প্রাচীন কারাগার-দুর্গ ছিল বাস্তিল (Bastille). ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কারাগার দখল করেই বিপ্লবীরা ফরাসীবিপ্লব শুরু করেন।

প্যারিসের বিখ্যাত প্রাচীন রাজপ্রাসাদ লুভ্‌র্ (Louvre) এখন একটি সংগ্রহশালা।

॥ এদেশের ঘরবাড়ি ॥

অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও খুব প্রাচীন-কালে মানুষ প্রথমে গুহায়, তারপর তাঁবুতে, তারপর ঘর তৈরি করে নিয়ে তাতে থাকতো। তারপর ৫০০০

স্পেনের উত্তর-পূবে বার্সিলোনার একটি আধুনিক ফ্ল্যাট-বাড়ি
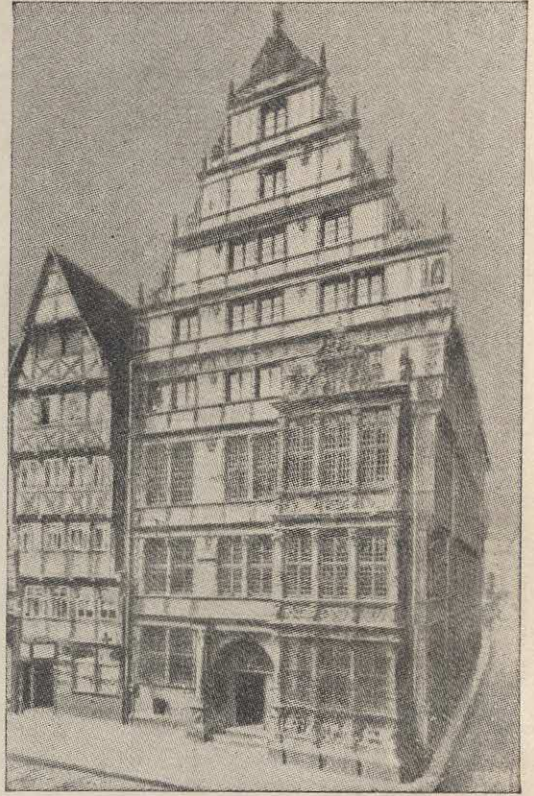
১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হ্যামলিনের বাঁশিওলার স্মারক বাড়ি (Pied Piper of Hamelin)

বছরেরও আগে ভারতে যখন শহর তৈরী হল, তখন তাতে দিব্যি ইট পাথরের দোতলা বাড়ি করে মানুষ তাতে থাকতো। এর প্রমাণ যে মহেনজোদারো আর হরপ্পাতে পাওয়া গিয়েছে, সে কথা আগে বলা হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতে কত ভাল ভাল বাড়ির কথা আছে, কিন্তু সে সবই শহরের আর বড়লোকদের ব্যাপার।

গরীবরা আর গ্রাম্য লোকেরা অবশ্য পাকাবাড়িতে থাকতো না, প্রায়ই পাতা দিয়ে ছাওয়া, মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরে থাকতো। তাকে বলে পর্ণকুটির। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরাও চালাঘরেই থাকতেন, তবে তার চাল আর দেওয়াল ভাল মজবুত জিনিসের হতো। সোনা দিয়ে কারুকার্যকরা চালাঘরের কথাও জানা যায়।
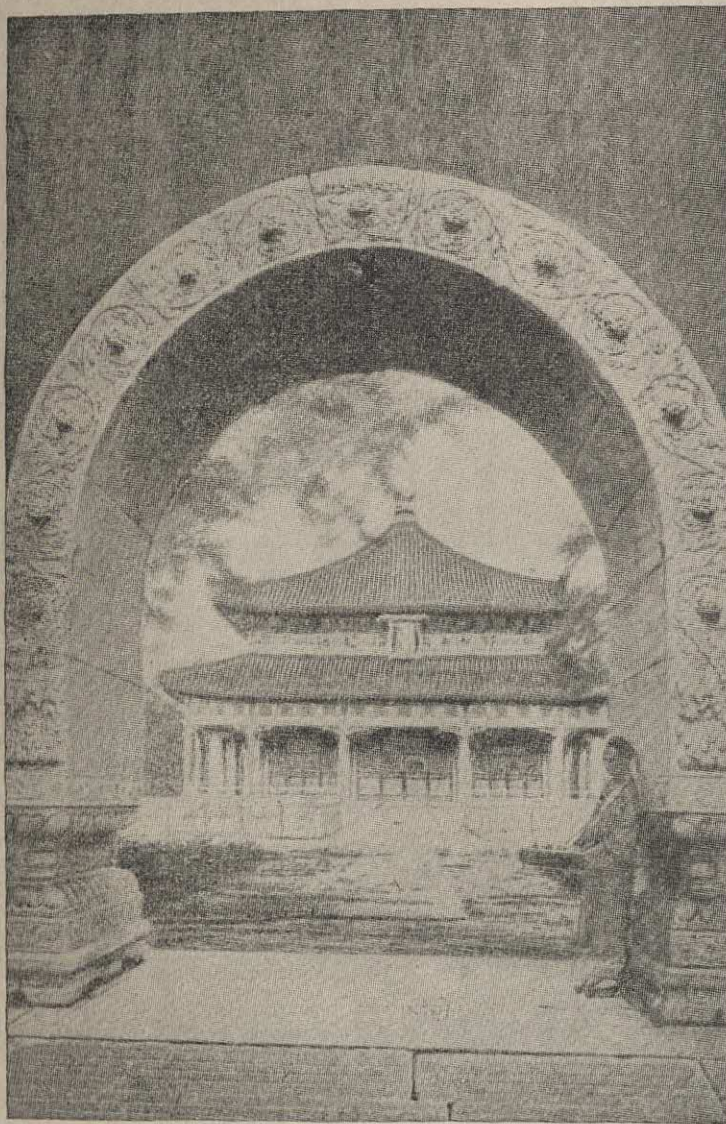
অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীন-সম্রাট্ চি. এন্. নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়

ছাদ যদি পাকা জিনিসের না হয়, তবে তাকে বলে চাল। যদি একদিকে ঢালু একটি মাত্র চাল থাকে, তাহলে তাকে বলে একচালা (Lean-to), ঘরের ওপরে মাঝখান থেকে দুদিকে ঢালু হয়ে দুটো চাল নামলে তাকে বলে দোচালা। চারদিকে চারটে চাল নামলে বলে চারচালা বা চৌচালা। তার একটু ওপরে একটু ফাঁক রেখে, আবার চারটি ছোট চাল থাকলে তার নাম হয় আটচালা।

॥ বর্তমান যুগের ঘরবাড়ি ॥

বর্তমানে রি-ইনফোর্স'ড কংক্রিট আবিষ্কার হওয়ায় বাড়িঘর তৈরির পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আমেরিকার আকাশে মাথা উঁচু করা বিরাট বাড়ি বর্তমান যুগের স্থপতিতে বিস্ময়কর সৃষ্টি। ছোটখাট বাড়ির প্ল্যানও আজকাল অতি সুন্দর করে করা হচ্ছে।

লোহার ফ্রেমের বাড়ি খুব মজবুত। এরকম বাড়ি তৈরির আগে লোহার ফ্রেম সাজানো হয়। সমগ্র বাড়ির কাঠামো আগে তৈরী হয়। তারপর বাড়ি গাঁথা হয়। বাড়ি তৈরী হয়ে গেলে বালি, চুন ইত্যাদির তলায় ফ্রেম ঢাকা পড়ে যায়।

———

নানারকম শখ ও খেয়াল

॥ রকমারী শখ ॥

মানুষের শখের অন্ত পাওয়া ভার। চলতি শখ তো আছেই, মাঝে মাঝে দু একটা উদ্ভট শখের কথা শুনলে অবাক লাগে। আমেরিকার ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে একবার শখ করে গাছে চড়ে বসে থাকতো। গাছে চড়ল তো নামবার নাম নেই। বসে আছে তো বসেই আছে—একদিন, দুদিন, তিনদিন।

সেসব বেয়াড়া শখের কথা থাক। চলতি যেসব শখ আছে, সেগুলোকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়।

প্রথম হচ্ছে কোনও কিছু সংগ্রহের শখ। ডাকটিকিট সংগ্রহের শখের কথা 'ডাকটিকিটের কথা' অধ্যায়ে বলা হয়েছে। তাছাড়া পুরোনো মুদ্রা, বই, পুতুল, রেকর্ড, দেশলাই বাক্স, ঝিনুক, বোতাম, প্রজাপতি—এ সব জমাবার শখ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। প্রসিদ্ধ লোকের হাতের লেখা বা সই (autograph) যোগাড় করতেও অনেককে দেখা যায়। আর, দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন জিনিস (antiques) কিনে জমাবার লোকও অনেক দেশে দেখা যায়, তবে, খুব ধনী না হলে এ কাজে কেউ নামতে পারে না। কলকাতায় এরকম ছোট-খাট সংগ্রহ আছে চোরবাগানে মল্লিক বাড়িতে। ভারতের মধ্যে এরকম সবচেয়ে বড় সংগ্রহ আছে হায়দরাবাদে, সালার জঙ্গ বাহাদুরের সংগ্রহ। আর, আমেরিকার অনেক কোটিপতির বাড়িতে কোটি কোটি টাকা দামের এরকম সংগ্রহ আছে। সময় ও ঘড়ির কথায় ক্যালিফোর্নিয়ার জ্যাক উইলির ঘড়ি সংগ্রহের শখের কথা তোমরা পড়েছ।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলা যায় শিল্পকর্মকে। ফটো তোলা, ছবি আঁকা, মাটি ইত্যাদি দিয়ে জিনিস গড়া, কাঠ খোদাই করা ইত্যাদি হাতের কাজে অনেকের শখ থাকে।

তৃতীয়তঃ, কিছু পুষবার বাতিক। কেউ বা পোষে কুকুর বাঁদর বেড়াল গিনিপিগ খরগোশ। আবার কেউ বা পোষে পাখি। আবার কেউ পোষে মাছ।

তবে একটা কথা, এই সব কাজকেই পয়সা রোজগারের উপায় হিসাবে করা যেতে পারে। তখন আর তাকে শখ বলা চলবে না। শখের কাজ করা হয় শুধু আনন্দ পাবার জন্যে, শুধু সেটা ভাল লাগে বলে।

॥ মাছ পোষা ॥

আমরা সমুদ্রের তলায় নামতে পারি না। ডুবুরীরা জলের তলায় নেমে স্বাভাবিক পরিবেশে মাছ ও অন্যান্য জলজন্তুদের হালচাল দেখতে পারে। কিন্তু সে সব সম্বন্ধে আমাদেরও প্রচুর কৌতূহল

আছে। আমরা আমাদের কৌতূহল মেটাতে জলজন্তুদের চিড়িয়াখানা বা মাছ রাখবার বড় বড় কাচের চৌবাচ্চা দেখে আসতে পারি। মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে এমন একটি করে জলজন্তুর চিড়িয়াখানা বা অ্যাকোয়েরিয়াম আছে।

সেখানে বড় বড় কাচের চৌবাচ্চায় নানা রকম সুন্দর সুন্দর মাছ আছে। রাতে যখন সেগুলোতে আলো জ্বেলে দেওয়া হয় তখন দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। মাছেদের লেজ নাড়া, মুখ হাঁ করা, নিঃশ্বাস ফেলা, গা নাড়া দেওয়া, পাখনা নাড়া আর ভেসে ভেসে বেড়ানো দেখতে ভারী সুন্দর। যখন তারা গা নাড়া দেয় তখন রঙিন মাছদের গা থেকে যেন রামধনুর রং ঝলসে ওঠে। অ্যাকোয়েরিয়ামে আলোর ব্যবস্থা থাকে বলে রাত্রে মনে হয় যেন স্বপ্নের দেশে এসে স্বপ্ন দেখছি। সরকার বহু টাকা খরচ করে এসব অ্যাকোয়েরিয়াম তৈরি করেছেন।

কিন্তু অত টাকা তো সাধারণ লোকের নেই। তাই সাধারণ লোক ছোট ছোট কাচের বোতল বা বয়ামে বা মাটি কিংবা চীনা-মাটির পাত্রে বা গামলায় মাছ পোষে। কেউ কেউ বাজারে তৈরী ছোট ছোট কাচের চৌবাচ্চা কিনে তাতে মাছ পোষে। ঐ কাচের চৌবাচ্চাকে অ্যাকোয়েরিয়াম (Aquarium) বলা হয়।

মাছেদের খুব ছোট জায়গায় রাখলে তাদের পক্ষে নড়াচড়ার কষ্ট হয়। খাঁচার পাখির মতো তারা আধমরা হয়ে থাকে —বেশীদিন বাঁচে না।

পুকুরে বা নদীতে মাছ প্রচুর সূর্যের আলো পায়। তাছাড়া জলের উপর দিয়ে বাতাস বয় বলে বাতাস জলের সঙ্গে মিশে জলের তলা পর্যন্ত পেঁছিয়। মাছেরা সেই বাতাস জল থেকে নিয়ে বাঁচে। মাছ নদীতে বা পুকুরে মাঝে মাঝে জলের উপরে ভেসে ওঠে। সে শুধু উপরের তাজা বাতাসের জন্যেই আসে। এজন্যে অ্যাকোয়েরিয়ামের উপরটা বেশ ফাঁকা এবং প্রশস্ত হওয়া দরকার। তাহলে জলের উপর দিয়ে বাতাস বইবার সময়ে জলের মধ্যে অক্সিজেন পৌঁছতে কোন অসুবিধে হয় না।

জীবজন্তু কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বার করে দেয়। মাছও তাই করে। এই গ্যাস বিষ। যদি জলের মধ্যে এই গ্যাস বেশী জমে তা হলে মাছ মরে যায়। এজন্যে অ্যাকোয়েরিয়ামে গাছপালা রাখা হয়। গাছপালা কার্বনিক গ্যাস শুষে নেয়। কিন্তু প্রচুর রোদ না পেলে জলের গাছপালারা কার্বনিক গ্যাস নিতে পারে না। রোদ ও আলো পেলে গাছপালারা কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস শুষে নিয়ে অক্সিজেন ছাড়ে। এই অক্সিজেন মাছেদের পক্ষে নিতান্ত দরকার।

॥ অ্যাকোয়েরিয়ামের মাপ ॥

সাধারণতঃ মাছের চৌবাচ্চা তিন ফুট লম্বা, আঠারো ইঞ্চি চওড়া আর আঠারো ইঞ্চি গভীর হয়। ফ্রেমটি ধাতুর তৈরী হওয়া দরকার। সামনের দিকে সাদা ও স্বচ্ছ একটি কাচ লাগাতে হয়। এই কাচ দিয়ে মাছের চলাফেরা দেখা যায়। পাশগুলি সবুজ রং-করা কাচের করাই ভাল। তাতে পাশ থেকে খুব বেশী আলো অ্যাকোয়েরিয়ামে আসতে পারে না। মাছেদের পক্ষে বেশী আলো ভাল

অ্যাকোয়েরিয়াম

নয়। অ্যাকোয়েরিয়ামের তলাটা স্লেট পাথরের বা মোটা কাচের করাই উচিত। উপরের ডালাটি পরিষ্কার সাদা কাচের করাই ভাল। উপরে ডালা ও অ্যাকোয়েরিয়ামের মাঝে হাওয়া ঢোকার জন্যে খানিকটা ফাঁক রাখতে হয়।

রঙিন নুড়ি দিয়ে তলাটা তিন ইঞ্চি ভরতি করে তার উপর ছ ইঞ্চি পুরু বালি ছড়িয়ে দিতে হয়। বাজারে যে বালি পাওয়া যায় তাতে কাদা ও ময়লা থাকে। সে বালি ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে তবে আকোয়েরিয়ামে দিতে হয়। বালি পরিষ্কার থাকলে তার উপরে বাতিল খাদ্যকণাগুলো দেখা যায়। সেগুলো পরিষ্কার করে না দিলে জল দূষিত হয়ে মাছ মরে যেতে পারে।

॥ পরিষ্কার করার প্রণালী ॥

অ্যাকোয়েরিয়াম পরিষ্কার করার জন্যে বাজারে একরকম ফাঁপা কাচের নল পাওয়া যায়। নলের আগা বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে থেকে বাড়তি, তলায়-পড়ে-থাকা খাবারের ঠিক উপরে নলের উলটো মুখটা নিয়ে গিয়ে টিপে-থাকা বুড়ো আঙুল তুলে নিলে বাড়তি খাদ্যকণা নলের মধ্যে এসে ঢোকে। তখন আবার বুড়ো আঙুল দিয়ে নলের মুখ বন্ধ করলে বাড়তি খাদ্য নলের মধ্যে থেকে যায়। তখন তাকে তুলে বাইরে ফেলে দিতে হয়।

॥ নানা জাতের মাছ ॥

বিভিন্ন জাতের মাছের বিভিন্ন রকমের অভ্যেস। এক জাতের মাছ বেগবতী নদীতে বাস করে। তারা স্রোতের জলে থাকতে ভালবাসে। অ্যাকোয়েরিয়ামের জল বেরোবার ব্যবস্থা থাকলে তাতে নতুন জল যোগানো ও পুরাতন জল বার করার কাজ একসঙ্গে করলে জলে স্রোতের সৃষ্টি হয়। তাতে এই জাতের মাছ ভাল থাকে। কতক মাছ লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। তাদের জন্যে পাত্রে বড় বড় পাথর দিতে হয়। পাথরের আড়ালে এই সব মাছ বেশ আরামে থাকে। পাথর ও নুড়ির উপর ছোট ছোট শেওলা জন্মায়। মাছরা এই সব শেওলা খায়।

॥ অ্যাকোয়েরিয়ামের জল ॥

অ্যাকোয়েরিয়ামের জন্যে পুকুরের জল বা বৃষ্টির জলই ভাল। তার অভাবে কলের পরিষ্কার জলও দেওয়া চলতে পারে। যে জলে কাপড়ে সাবান দিলে ফেনা হয় না বা ডাল সিদ্ধ হয় না সেরকম জল না দেওয়াই ভাল। অন্য পাত্র থেকে সাইফনের (siphon) সাহায্যে ধীরে ধীরে জল অ্যাকোয়েরিয়ামে ঢালাই ভাল। মাছ রাখবার আগে জলটার উত্তাপ পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ঘরের উত্তাপের চেয়ে ঠাণ্ডা জল দিলে মাছ মরে যেতে পারে। তাই জলে মাছ ছাড়বার আগে জলটার তাপ পরীক্ষা করে দেখা দরকার। অ্যাকোয়েরিয়ামের তলায় জল বার করবার ফুটো রাখলে ইচ্ছেমতো জল বার করে দেওয়া যায়। জল বার করবার ফুটোর মুখে মিহি ঝাঁজরি রাখলে অ্যাকোয়েরিয়াম থেকে মাছ বেরিয়ে যেতে পারে না।

জল বদলাবার জন্যে অ্যাকোয়েরিয়ামে ফুটো না থাকলে মগে করে জল তুলে অ্যাকোয়েরিয়াম পরিষ্কার করতে হয়। জল বদলাবার আগে মসলিনের জালতি করে একে একে মাছ তুলে অন্য পাত্রে রাখতে হয়। অন্য পাত্রে বেশীক্ষণ মাছ না রাখাই ভাল। ছোট ছোট কাচের পাত্রে জল ভরতি করে তাতে জালতি করে মাছ তুলে রাখতে হয়। পাত্রের মুখ চওড়া না হলে অক্সিজেনের অভাবে মাছ মারা যেতে পারে।

॥ মাছেদের শত্রুতা ॥

সব জাতের মাছ এক সঙ্গে থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে শত্রুতা থাকে। এসব জেনে তবে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হয়। 'ফাইটার' মাছ এক পাত্রে দুটি রাখলে তারা সব সময় শত্রুতা করে এবং একে অন্যকে মেরে ফেলে। 'স্টিক্‌ল্ ব্যাক' এই ধরনের মাছ।

॥ অ্যাকোয়েরিয়ামের গাছপালা ॥

অ্যাকোয়েরিয়ামের জলে কিছু গাছপালা রাখতে হয়। এগুলো সাজাবার জন্যে দেওয়া হয় না।

ওয়াটার-ক্রোফুট
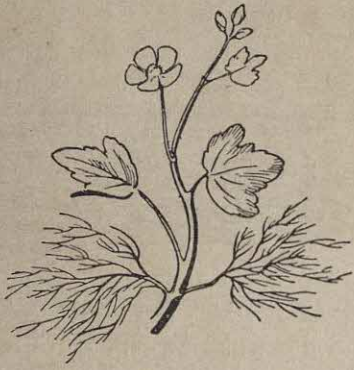
এদের উপকারিতা আছে। এরা জলের দূষিত গ্যাস শোষণ করে অক্সিজেন যোগায়। মাছেরা এই অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকে। খুব কড়া রোদে দেখা যায় জলের গাছপালা থেকে বুদ্‌বুদের মতো অক্সিজেন বেরুচ্ছে। অ্যাকোয়েরিয়ামে যে সব গাছপালা দেওয়া হয় তাদের সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখা দরকার।

ক্যানাডিয়ান ওয়াটার-উইড (Canadian water-weed) জলে ফেলে রাখলে এরা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন অক্সিজেন যোগায়।

ডাকউইড (duckweed)—এরা জলে ভেসে থাকে ও প্রচুর বাড়ে। বেশী হয়ে গেলে এদের কাঁচি দিয়ে কেটে ছোট করে দেওয়া চলে।

ওয়াটার-মিলফয়েল (water-milfoil)—সুতোর মতো পাতা-ওলা এ গাছ দেখতে খুব সুন্দর।

পণ্ড্‌-উইডস (pond-weeds)—পুকুরে এই সব শেওলা বা ঝাঁজি গাছ জন্মায়। এই গাছ প্রত্যেক অ্যাকোয়েরিয়ামে কিছু কিছু রাখা উচিত।
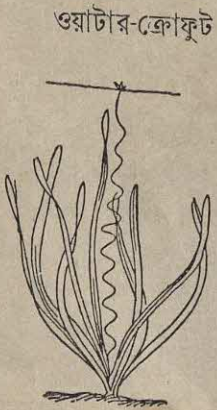
ওয়াটার-ক্রোফুট (water-crowfoot)—এদের পাতা কতক ভেসে থাকে, কতক জলে ডুবে থাকে। বসন্তকালে এতে ছোট ছোট সাদা ফুল ফোটে।

ভ্যালিসনিরিয়া

ভ্যালিসনিরিয়া (Vallis-neria)—এ গাছ ফিতের মত পাতাওয়ালা। ব্যবসায়ী-দের কাছ থেকে প্রচুর পাওয়া যায়। এরা খুব বেশী অক্সিজেন যোগায়।

॥ অ্যাকোয়েরিয়ামে রাখার উপযোগী মাছ ও কীট ॥

গোল্ড-ফিশ (gold-fish)—নানারকমের লাল মাছ। এরা বেশ কৃত্রিম পরিবেশে মানিয়ে থাকতে পারে ও অনেক দিন বাঁচে।

বুলহেড বা মিলারের বুড়ো আঙুল (bulhead or miller's-thumb)—এদের মাথাটা ভোঁতা আর বড়। এরা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। এরা খুব নিরীহ।

ঈল (eel) বা কুঁচে মাছ—এগুলো ছোট জাতের কুঁচে মাছ। অ্যাকোয়েরিয়ামে এদের পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়ানো দেখতে বেশ ভাল লাগে।

তিন শিরদাঁড়াওলা স্টিক্‌ল্‌ব্যাক (three-spined
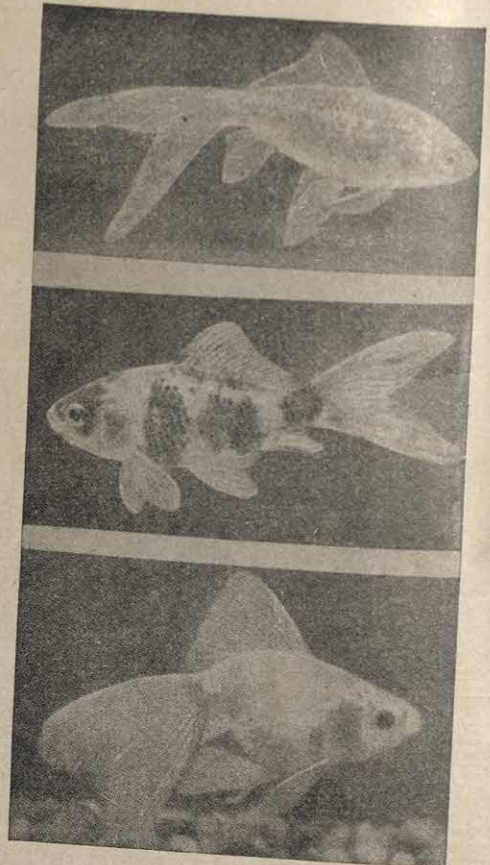
নানারকমের গোল্ড-ফিস

বেলুনে চড়ে আকাশে ওঠা।

নানারকম শখ ও খেয়ালঃ

[বেলুনে চড়ে আকাশে ওঠা]

পাখিরা আকাশে ওড়ে। তাই দেখে মানুষ চিরকাল আকাশে উঠে বিচরণ করবার কল্পনা করে এসেছে। নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে আকাশে ওঠার চেষ্টা হয়েছে।

এখানে যে ছবি দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, একজন মানুষ প্রকাণ্ড একটা বেলুনের নীচে সংযুক্ত আধারে চড়ে আকাশে উঠে যাচ্ছেন। নীচের লোকেরা বিস্মিত নেত্রে বেলুনের যাত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে। বেলুনের যাত্রীর নাম লুনার্ডি। তিনি ইংল্যাণ্ডের লোক।

লুনার্ডি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে একটা বেলুনে করে আকাশে ওঠেন। অবশ্য, তাঁর বেলুন বেশী দূর উঠতে পারে নি। বেলুনটি গাছে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

অবশ্য, লুনার্ডির আগে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর প্রথম বেলুন আকাশে ওঠে। সেই বেলুনে করে মানুষ শূন্যে ওঠে। তার পরে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর বেলুনকে মানুষসমেত আকাশে ওড়ানো হয়।

stickleback)—পিঠের উপর এদের তিনটে শিরদাঁড়া দেখে চেনা যায়।

এছাড়া চাঁদা মাছের মত এঞ্জেল (angel) ও বড় বড় পাখনাওলা ফাইটার ইত্যাদি অনেক রঙের ও আকৃতির মাছ পাওয়া যায়। টেট্রা, উইডো টেট্রা, জেব্রা, ব্ল্যাকমলি, গোরামিন, রেনবো, সোর্ডটেল, গাপ্পি ইত্যাদি নানা রকম মাছ আছে।

র‍্যাম্স্‌হর্ন স্নেল (ramshorn snail)—এক রকম ছোট শামুক। অ্যাকোয়েরিয়ামে এদের রাখলে দেখতে ভারী সুন্দর দেখায়।

ওয়াটার-বীট্‌ল্‌ (water-beetle)—এক রকম গুবরে পোকা। এরা জলে থাকে। এদের শূক-কীট ভয়ানক হিংস্র। অ্যাকোয়েরিয়ামে ছোট ছোট মাছ থাকলে এরা তাদের খেয়ে ফেলে।

ওয়াটার-বোটম্যান (water-boatman)—এরা এক রকম পোকা। পা দুটো দাঁড়ের মতো নেড়ে নেড়ে এরা নৌকোর মতো ভেসে ভেসে চলে।

হুইর্লিগিগ্‌ বীট্‌ল (whirligig beetle)—এরাও এক রকম জলের পোকা। জলের মধ্যে এরা গোল হয়ে বোঁবোঁ করে ঘোরে।

॥ মাছেদের আহার ॥

বিস্কুটের গুঁড়ো, জলজ মাছি, ছোট ছোট করে কাটা বা কেটে কুচিকুচি-করা পোকা, পিঁপড়ের ডিম, ছোট ছোট কেঁচোর বাচ্চা ইত্যাদি মাছেদের আহার।

প্রতিদিন একই সময়ে খাবার দেওয়া উচিত। বাড়তি খাবার জল দূষিত করে।

বুলহেড মাছ
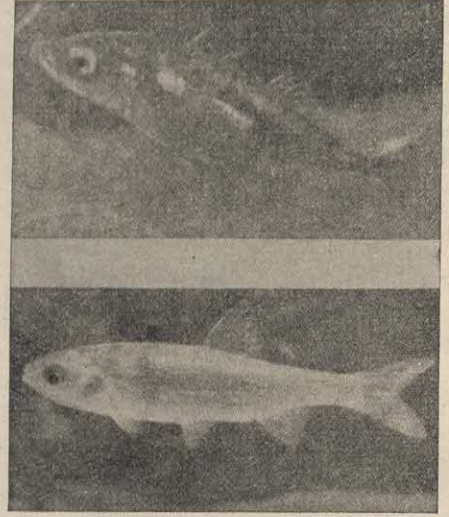
উপরে : স্টিক্‌ল্‌ ব্যাক : নীচে : গোল্ডেন ওরি

কেঁচোর বাচ্চা কাচের নিপ্‌লে ভরে জলের উপর ভাসিয়ে দিতে হয়। এর তলায় ফুটো থাকে। মাছেরা ফুটো থেকে মুখ দিয়ে কেঁচোর বাচ্চা টেনে বার করে খায়। খাবার দিলে সব মাছ নিপলের তলায় এসে জমে। এদের খাওয়া দেখতে ভারী সুন্দর।

বিস্কুটের গুঁড়ো চিমটি করে তুলে জলের উপর ভাসিয়ে দিতে হয়। মাছরা ভেসে ভেসে সেগুলো খায়।

॥ অ্যাকোয়েরিয়ামের যত্ন ॥

মরা গাছপালা, মরা মাছ বা কীট সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলে দিতে হয়। অ্যাকোয়েরিয়াম কড়া রোদে রাখলে জলের মধ্যে নানারকম পোকা জন্মায়। তাই অ্যাকোয়েরিয়াম ছায়ায় রাখতে হয়। যাতে ঘরে রোদ আসে অথচ অ্যাকোয়েরিয়ামে সোজাসুজি রোদ এসে না পড়ে সে রকম জায়গায় অ্যাকোয়েরিয়াম রাখতে হয়। বেশী আলোও মাছেদের পক্ষে ক্ষতিকর। অ্যাকোয়েরিয়ামের যে ধারটা খোলা জানলার দিকে পড়ে সে ধারটা কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত।

॥ মাছেদের অসুখ ॥

অনেক সময়ে দেখা যায় যে মাছেদের পাখনার উপর একটা সাদা ছাতা-পড়ার মতো দাগ হয়েছে। একে বলে ফাংগাস (fungus). এই দাগ ক্রমশঃ

বেড়ে কানকো পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে প্রায়ই মাছ মরে যায়। রোগের অন্য লক্ষণ হচ্ছে রং ফিকে বা ফেকাশে হয়ে যাওয়া। পিঠের পাখনা জলের উপরে তুলে মাছ ভাসছে দেখলে বুঝতে হবে যে তার fungus রোগ হয়েছে।

এ রোগ সারাতে গেলে সব প্রথম অসুস্থ মাছকে আলাদা করে ফেলতে হবে। অন্য মাছেদের সঙ্গে অসুস্থ মাছ রাখলে সব মাছের এই অসুখ হতে পারে।

অসুস্থ মাছকে আলাদা পাত্রে রেখে এক গ্যালন জলে চায়ের চামচের দু চামচ নুন মিশিয়ে সেই জলে মাছটিকে ছেড়ে দিতে হবে। রোজ এ ব্যবস্থা করতে হবে অর্থাৎ নতুন করে জল নিয়ে, নতুন করে নুন মিশিয়ে তাতে মাছটিকে রাখতে হবে। এ রোগ সংক্রামক, ক্রমে সব মাছের এ রোগ হতে পারে। তাই এ সম্বন্ধে খুব নজর রাখতে হবে।

জীবজন্তু পোষা

॥ পোষবার নানারকম জীব ॥

গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া অনেকেই পুষে থাকেন। কিন্তু এদের পোষাকে শখ বলা যায় না। তাই সে সবের কথা এখানে বলা হবে না।

শখ হিসেবে জীবজন্তু পোষার মধ্যে কুকুর, বিড়াল, খরগোশ, গিনিপিগ, সাদা ইঁদুর পোষার রেওয়াজই বেশী। গ্রামাঞ্চলে কেউ কেউ বেঁজি পোষে। বেঁজি পুষলে সাপের ভয় থাকে না।

॥ কুকুর পোষা ॥

কুকুর পুষতে গেলে কি জাতের কুকুর পুষতে হবে তা আগে থেকে ঠিক করতে হবে। বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাবে এমন কুকুরই পুষতে হবে। সময় যদি কম হয় তাহলে গ্রেহাউণ্ড বা বরজোই (borzoi) কুকুর পোষা চলবে না। ওদের নিয়মিত পার্কে বা মাঠে নিয়ে দৌড় করাতে হয়, না হলে ওদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। আবার বেশী লোমওলা কুকুর পুষলে বুরুশ আর চিরুনি
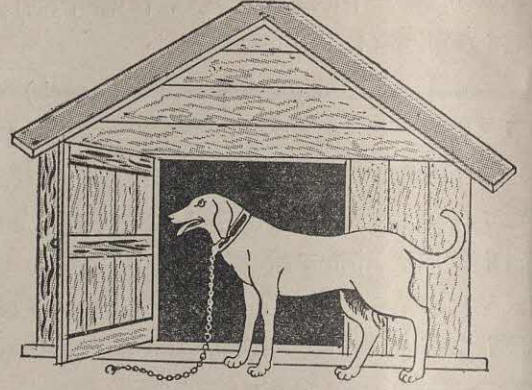
কুকুর পোষা

দিয়ে ওদের অনেকক্ষণ ধরে গায়ের লোম আঁচড়ে দিতে হয়। যদি বেশী সময় না থাকে তো এরকম কুকুর পোষা চলবে না। দৈনিক এদের গায়ের লোমে চিরুনি ও বুরুশ না লাগালে এদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে।

টেরিয়ার কুকুর নানা জাতের হয়। এরা গ্রাম ও শহর সব জায়গায় নিজেদের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। পাহারার কাজে টেরিয়ার কুকুরের জুড়ি নেই। আগন্তুক দেখলেই এরা ডাকতে থাকে। 'বুলডগ' দেখতে বদমেজাজী হলেও তারা শান্ত-প্রকৃতির। ছোট জায়গায় এদের রাখা চলে। এদের খাওয়ানোর খরচও কম। যাঁরা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন তাঁদের পক্ষে 'বুলডগ' পোষাই সুবিধে।

অ্যালসেসিয়ান কুকুর সাধারণতঃ একজনেরই প্রিয় হয়। যথেষ্ট সময় হাতে না থাকলে ঐ কুকুর বাড়িতে রাখা ঠিক নয়।

কুকুর যে জাতেরই পুষতে হোক না কেন চার মাসের বাচ্চা পুষতে হয়।

॥ কোথা থেকে কুকুর সংগ্রহ করতে হবে ॥

অল্প দামে দো-আঁশলা কুকুর কিনতে পাওয়া যায়। একটু বেশী দাম দিয়ে ভাল জাতের কুকুর কিনতে চাইলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কিনতে পারা যায়। তা ছাড়া বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন যাদের বাড়ি মাদী কুকুর আছে তাদের

সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে বাচ্চা হবার পর একটি সংগ্রহ করা যায়।

কুকুরছানা বাড়িতে আনার পর বেশী অপরিচিতদের কাছে তাদের যেতে দিতে নেই।

॥ খাওয়া-দাওয়া ॥

প্রথম প্রথম কুকুরকে তিনবার খেতে দিতে হবে। সকালে বাসী রুটি আর দুধ। দুপুরে শাকসবজি সিদ্ধ, কাঁচা বা আধসিদ্ধ মাংস, আর রাত্রে কুকুর ঘুমোতে যাবার আগে শুকনো বিস্কুট। বড় বড় হাড়ের টুকরো কামড়ে খেতে দিলে কুকুরের হজম করার শক্তি বাড়ে। কুচো হাড় খেতে দিলে কুকুরের পেটে ঘা হয়। সে জন্যে মুরগীর বা অন্য কোন ছোট হাড়ওলা মাংস দেওয়া উচিত নয়।

কুকুরের বয়স আট মাস হলে দুপুরের খাওয়া বন্ধ করে শুধু সকালে ও সন্ধ্যায় খেতে দিতে হবে। তাতে কুকুর আরামে ঘুমুবে—রাত্রে অযথা চিৎকার করবে না।

॥ শোবার ব্যবস্থা ॥

কুকুর যতদিন ছোট থাকবে ততদিন তাকে ঘরের মধ্যেই শুতে দিতে হয়। একটা দেবদারু কাঠের বাক্সের মধ্যে খড় বা কাঠের কুচো বিছিয়ে তার উপর কাগজ পেতে শোবার ব্যবস্থা করতে হয়। নরম গদি বা কম্বল ছেঁড়া-বিছানো ঝুড়িতেও কুকুরছানাকে রাখলে সে বেশ আরামে থাকে।

ঘরের বাইরে কুকুর রাখার ঘর (kennel) থাকলে দেখতে হবে তার ভিতরটা সেঁতসেঁতে না হয়। ঘরের গরম থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডায় কুকুরের ঘরে কুকুরকে শুতে পাঠালে তার নানা রকম অসুখ হতে পারে।

॥ ব্যায়াম ॥

বাচ্চা অবস্থা থেকেই কুকুরকে একটু একটু বেড়াতে নিয়ে যেতে হয়। একেবারে অনেক পথ হাঁটলে

অ্যালসেসিয়ান

তার ক্লান্তি আসতে পারে, তাই ক্রমশঃ বেড়ানোর পরিমাণ বাড়াতে হয়। বয়স বাড়লে দু ঘণ্টা হাঁটলেও কুকুরের কষ্ট হয় না। মোটা কুকুর বা যে সব কুকুরের পা ছোট তাদের বেশী হাঁটলে কষ্ট হয়। নিয়মিত বেড়ানোর অভ্যেস করানো দরকার। একদিন দু মাইল হাঁটিয়ে পাঁচদিন বসিয়ে রাখলে কুকুরের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।

॥ পরিচর্যা ॥

কুকুরের লোম ও চামড়া যাতে ঠিক থাকে তার জন্য নিয়মিত পরিচর্যা করা দরকার। চিরুনি দিয়ে লোম সাবধানে আঁচড়ে, জট বেঁধে থাকলে তা সাবধানে ছাড়িয়ে দিতে হয়। লোম ছোট হলে রবারের বুরুশ দিয়ে ঘষে দিতে হয়, লোম বড় হলে শক্ত বুরুশ দিয়ে আঁচড়ে সমান করে দিতে হয়। মাঝে মাঝে কুকুরের গায়ে পাউডার দিতে হয়। কুকুরকে বেশী স্নান না করানোই উচিত। তাতে ওদের চামড়ার ক্ষতি হয়। স্নান করবার সময়ে ঈষদুষ্ণ জলে (না খুব গরম, না, খুব ঠাণ্ডা) কুকুরকে স্নান করাতে হয়। স্নানের সময় কুকুরের জন্যে তৈরী সাবান (dog soap) মাখিয়ে তাকে স্নান করাতে হয়। চোখে যাতে সাবান না লাগে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। সাবানের ফেনা জল দিয়ে ধুয়ে গরম তোয়ালে দিয়ে মুছে শুকনো করে দিতে হয়। শীতকালে স্নানের পর কুকুরকে খানিক উনুনের ধারে নিয়ে গিয়ে তার

কুকুরের স্নান

গা শুকনো করে দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে ওকে খানিক রোদে রাখলে ওর গা আপনি শুকনো হয়ে যায়।

যে-সব কুকুর রাস্তায় ছোটাছুটি করে তাদের পায়ের নখ আপনি ক্ষয়ে ছোট হয়ে যায়। কিন্তু বাড়ির পোষা কুকুররা রাস্তায় তত ছোটাছুটি করার সুযোগ পায় না বলে ওদের নখ বড় হয়ে বেঁকে এসে পায়ের তলার নরম মাংসের পুঁটুলিতে বসে যায়। এতে ওদের কষ্ট হয়। সাবধানে এইসব নখের আগা কেটে দিতে হয়।

কুকুরের দাঁতের উপরও নজর রাখা দরকার। যদি দাঁতে বাদামী ছোপ পড়ে তাহলে ছোট টুথব্রাশ দিয়ে ভাল পেস্ট লাগিয়ে সেগুলো পরিষ্কার করে দিতে হয়। এরকম ছোপ অগ্রাহ্য করলে শেষ পর্যন্ত দাঁত ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যায়। এরূপ ছোপ দেখা গেলে দিনে দুবার দাঁত পরিষ্কার করে দিতে হয়।

॥ কুকুরের শিক্ষা ॥

প্রথম প্রথম কুকুর ঘরদোর ময়লা করে ফেলে। তখন তাকে যে জায়গা নোংরা করেছে সেখানে নিয়ে গিয়ে ধমকে কিছুক্ষণ বাইরে বার করে দিতে হয়। সকালে তাকে কিছু খেতে দেবার পরই কিছুক্ষণ বাইরে বার করে দিতে হয়। কুকুর যদি বাইরে যাবার জন্যে ডাকাডাকি করে তখনি তাকে বাইরে যেতে দিতে হয়।

শোবার ঘরে বা ঈজিচেয়ারে বা সোফায় কুকুরকে উঠতে দিতে নেই। ঘরের দরকারী জিনিস নিয়ে খেলা করতে দেখলে তাকে ধমক দিতে হয়। কুকুর সহজেই বুঝতে শেখে যে কি করা তার নিষেধ। তার জন্যে আরামের একটা আস্তানা থাকলে সে সেখানে গিয়ে সুখে থাকে। কাউকে বিরক্ত করে না।

॥ বেড়ানো ॥

পিছনে পিছনে বেড়ানো কুকুরের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। যে ফুটপাথে ভিড় কম সেই ফুটপাথ ধরে লম্বা চেন বেঁধে তার সামনে সামনে দ্রুত হাঁটতে বা ছুটতে হয়। এমনি করে কুকুরকে শিক্ষা দিতে হয়। কিছুদিন বাদে চেন দিয়ে না বাঁধলেও কুকুর ঠিক পায়ে পায়ে হেঁটে আসবে। এই ভাবে কুকুরকে বসতে শেখাতে হয়। প্রথম প্রথম থেবড়ে বসিয়ে দিতে হয়, পরে 'বোস' বললেই সে বসবে।

কুকুরকে কোথাও বসিয়ে রাখতে হলে টুপি বা লাঠি বা রুমাল রেখে গেলে কুকুর সেটা আগলে বসে থাকে।

॥ কায়দা ও খেলা শেখানো ॥

কেউ কেউ কুকুরকে দিয়ে পাইপ টানিয়ে বা নাচিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু এসব শেখালে কুকুর হাস্যাস্পদ হয়ে উঠবে। তার চেয়ে কুকুরকে দিয়ে চটি জুতো আনানো, দরজা ভেজিয়ে দেওয়া ইত্যাদি শেখালে কাজ হয়। মুখে করে খবরের কাগজ বয়ে আনার কাজও কুকুর করতে পারে। এগুলো তাকে সহজেই শেখানো যায়।

॥ কুকুরের অসুখ ॥

কুকুরের নানা রকম অসুখ হয়। অসুখ হলেই একজন পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

শিকারী কুকুর বোরজোই (borzoi)

স্প্যানিয়েল (spaniel)
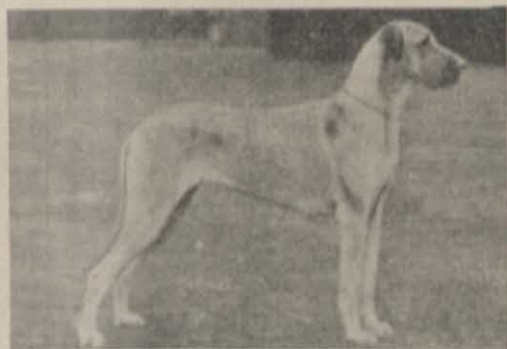
গ্রেট ডেন (Great Dane)

গ্রে-হাউণ্ড (grey-hound)

স্পোর্টিং ডগ (sporting dog)

ব্লাড-হাউণ্ড (blood-hound)

সেন্ট্ বার্নার্ড কুকুর

ব্রঙ্কাইটিস, সর্দি, কোষ্ঠকাঠিন্য, কালা হয়ে যাওয়া, উদরাময় আর জ্বর—এই সব কুকুরের সাধারণ অসুখ। এছাড়া কুকুর মাঝে মাঝে ঝিমুনি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া এদের একরকম কানের রোগ হয়, কান থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। গায়ে একজিমা বা চর্মরোগ কুকুরের পক্ষে সাংঘাতিক। পায়ে ঘা, অম্বল ইত্যাদি বহু রোগ কুকুরের হয়। গায়ে পোকা ও পেটে কৃমি হলে তখুনি চিকিৎসা করতে হয়।

এসব ব্যাপারে নিজে কিছু না করে পশু-চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়।

॥ পৃথিবীতে কত জাতের কুকুর আছে ॥

পৃথিবীতে প্রায় ১৮৫ জাতের কুকুর আছে। তাদের নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১। নেকড়ে জাতীয় কুকুর—এস্কিমোদের কুকুর, মেষরক্ষক কুকুর আর রাস্তার কুকুর।

২। গ্রে-হাউণ্ড, হরিণ শিকারী ডালকুত্তা ও নেকড়ে শিকারী ডালকুত্তা।

৩। স্প্যানিয়েল—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর, সেন্ট্ বার্নার্ড কুকুর।

৪। ম্যাস্টিফ, বুলডগ।

৫। রক্ত-পিপাসু ডালকুত্তা।

৬। টেরিয়ার কুকুর।

॥ বিড়াল পোষা ॥

প্রায় সব দেশেই বাড়িতে বিড়াল পোষার রেওয়াজ আছে। বিড়াল নানা রঙের হয়। কুকুরের মতো বিড়াল প্রভুভক্ত হয় না—এই রকম একটা ধারণা সকলের মনে স্থান পেয়েছে। এ কথা সত্যি নয়। বিড়াল প্রভুর জন্যে প্রাণও দিতে পারে। মৃত প্রভুর কবরে দিনের পর দিন বসে থেকে অনাহারে বিড়ালকে মারা যেতে দেখা গেছে। বিড়ালকে থলিতে বন্ধ করে দূরে ফেলে দিয়ে এলেও বিড়াল ঠিক পথ চিনে একদিন আবার ফিরে আসে। বিড়াল পোষার কোন বিশেষ ঝঞ্ঝাট নেই। কিছু খেতে আর আরামে থাকতে পেলে বিড়াল আর সে বাড়ি ছেড়ে নড়ে না।

ইঁদুর, আরসোলা, বিছে ইত্যাদি মেরে বিড়াল গৃহস্থের উপকার করে। কিন্তু চুরি করে খাবার অভ্যেস বিড়ালের একটা বড় দোষ। ঢাকা সরিয়ে দুধ, মাছ ইত্যাদি খেয়ে ফেলতে বিড়াল ওস্তাদ। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি গিয়ে খাবার চুরি করে আনতে এরা খুব পটু।

আনন্দ হলে বিড়াল ঘড়ঘড় শব্দ করে, খিদে পেলে বা কষ্ট হলে মিউমিউ করে করুণ সুরে ডাকে, রাগ করলে পিঠ বাঁকিয়ে ফোঁসফোঁস, ম্যাও-ম্যাও শব্দ করে, রাগ করলে গায়ে আঁচড়ে

চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে পরিষ্কার করা

কামড়েও দেয়। আদর পছন্দ না হলে লেজ উঁচু করে সটান চলে যায়। বিড়াল মাছ, ভাত, দুধ, রুটি, ছানা, ক্ষীর খেতে ভালবাসে।

বেশী মাছ খেতে দিলে বিড়ালের একরকম রোগ হয়। চর্বি দিয়ে মেখে আলু, সিদ্ধকরা শাক-সবজি এক সঙ্গে চটকে বিড়ালকে খেতে দিতে হয়।

অসুখ করলে বিড়াল ঘাস খায়। সেজন্যে বিড়ালের কাছাকাছি টবে ঘাস রাখা দরকার।

বিড়ালের অসুখ করলে বিশেষতঃ জ্বর বা নিউ-মোনিয়া হলে তাকে জামা পরিয়ে রাখতে হয়।

বেশী বড় বড় লোম থাকলে চিরুনি দিয়ে রোজ আঁচড়ে পরিষ্কার করে দিতে হয়।

॥ নানা জাতের বিড়াল ॥

তুরস্কদেশের অ্যাঙ্গোরা (Angora) বিড়াল আকারে একটু বড় হয়। এদের গায়ের লোম রেশমের মতো চকচকে ও নরম। এদের গা ধবধবে সাদা, লোমগুলি লম্বা আর গলা, পেট ও বুক এবং লেজের লোম খুব বড় বড় হয়।

শ্যামদেশে একরকম বিড়াল (Siamese cat) আছে তাদের গায়ের রং হরিণের মতো গাঢ় বাদামী, চোখ দুটি নীল আর কপালের উপর দু তিনটি ছোট ছোট টাক হয়। এ বিড়াল খুব ধনীলোক ছাড়া কেউ পুষতে পারে না।

শ্যামদেশে 'মালয় বিড়াল' নামে একরকম ছোট লেজওয়ালা বিড়াল দেখতে পাওয়া যায়।

আইল অব ম্যানে লেজহীন একরকম বিড়াল আছে (Manx cat).

চীনদেশের বিড়ালের গায়ের লোম লম্বা হয়। চীনারা বিড়ালকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে পরে তাকে মেরে তার মাংস খায়।

কাবুলী বিড়াল (Persian cat) আকারে বড় হয়। দেখতেও সুন্দর হয়।

॥ খরগোশ পোষা ॥

অনেকে খরগোশ পোষে। খরগোশের জন্য আলাদা কাঠের খোপ করে দেওয়া হয়। আবার মাটির ভিতর সুড়ঙ্গ করে বহুদিক্ দিয়ে বার হবার রাস্তা করে দিলে খরগোশ তার মধ্য দিয়ে ছোটাছুটি করে খেলা করে।

ধান, শস্য, তাজা গাছের পাতা এই সব খরগোশের খাদ্য। তাজা ঘাসও এরা মহানন্দে খায়।

খরগোশের সামনের পা ছোট। এরা তাই পিছনের পায়ে ভর দিয়ে জোরে জোরে লাফিয়ে চলে। সব সময় খরগোশ চঞ্চল ও ব্যস্ত। এদের হালচাল দেখ্‌তে ভারী মজা লাগে।

খরগোশের খোপে কাঠের গুঁড়ো বা কুচানো খড় দিলে এরা আরামে থাকে।

॥ গিনিপিগ পোষা ॥

গিনিপিগ বা কেভি (cavy) দক্ষিণ আমেরিকার একরকম তীক্ষ্ণদন্ত ইঁদুর জাতের জীব। গৃহপালিত
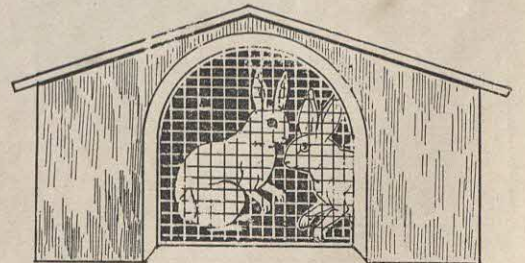
খরগোশ পোষা

গিনিপিগ ক্ষুদ্র আকারের হয়—ছ' ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা। সামনের দু'পায়ে চারটে করে আঙুল থাকে আর পিছনের দু' পায়ে তিনটি করে আঙুল থাকে। এদের লেজ থাকে না। সাদা গায়ে নানা রকম ছাপছোপ থাকে।

এরা ঘাসপাতা, শাকসবজি খায়। এদের এক সঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চা হয়।

তারের খাঁচায় বা কাঠের খোপে এদের রাখতে হয়।

গিনিপিগ তিন জাতের হয়—বিলাতী, আবিসিনীয় ও পেরুদেশীয়।

এদের খাঁচা পরিষ্কার করা বড় নোংরা কাজ। এদের ঘরে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। তবু পরিষ্কার করে না দিলে এদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।

শাকসবজি, দুধ বা জল মেশানো দুধ এদের খেতে দিতে হয়। মাঝে মাঝে জলে মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া দিলে এদের অসুখ করে না।

॥ সাদা ইঁদুর ॥

কেউ কেউ সাদা ইঁদুর পোষে। এদের থাকবার জন্যে দোতলা, তিনতলা খাঁচা করে দিতে হয়। এরা একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত ছোটাছুটি করে খেলা করে। নিয়মমতো এদের পাঁউরুটি, বাদাম, ছোলা ইত্যাদি খেতে দিতে হয়। সাদা শরীরে এদের সবুজ চোখ দুটো বড় সুন্দর দেখায়।

খাঁচা রোজ পরিষ্কার করে না দিলে বড় দুর্গন্ধ হয়।

কিছুক্ষণ রোদের কাছে ছায়ায় রাখলে এদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

ইঁদুর পোষা

পাখি পোষা

॥ পায়রা ॥

পাখির মধ্যে পায়রা পোষার খুব বেশী রেওয়াজ। অনেকের বাড়িতে পায়রার ঝাঁক বসবার জন্যে উঁচু বাঁশের তৈরী মাচা (ব্যোম) করা থাকে। আকাশে উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে ওরা শেষে এই ব্যোমে এসে বসে। দেয়ালে উঁচুতে সারি সারি কাঠের খোপ করে দিলে পায়রারা সেই সব খোপে মনের আনন্দে বসবাস করে।

॥ নানা জাতের পায়রা ॥

পায়রা নানা জাতের দেখা যায়। গেরোবাজ (বা গৃহবাজ) খুব জোরে ও উপরে উড়তে পারে। তা ছাড়া মুক্ষি, লোটন, পরপণ, লক্কা, সেরাজু প্রভৃতি নানা রকম সুন্দর সুন্দর পায়রা আছে। তারা যখন গলা ফুলিয়ে বকবকম করে ডাকে তখন ভারী চমৎকার শোনায়।

লোটন বা নোটন পায়রা ডিগবাজি খেতে ওস্তাদ। মুক্ষিরা অসম্ভব গলা ফুলোতে পারে। লক্কা তার লেজ তুলে বিছিয়ে দেয়—ময়ূরের মত। পরপণের পায়ে পর (মানে, পালক) থাকে।

গোলা পায়রা কেউ পোষে না, কিন্তু দেখতে সুন্দর। এরা গৃহস্থবাড়ির কার্নিসে আপনা থেকে বাসা করে থাকে।

যারা পায়রা পোষে তারা নিয়মিত এদের খেতে দেয়। এদের খোপ পরিষ্কার করে দেয়। রোজ নিয়মিত সময়ে এদের ওড়ায়। শিস দিলে এরা ইঙ্গিত বোঝে ও খুব জোরে গোল হয়ে ঘোরে। ঘোরবার সময় অনেক পায়রা ডিগবাজি খায়।

উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে ব্যোমে এসে বসে এরা জিরোয়। উড়ন্ত ঝাঁকে নতুন পায়রা এসে ভিড়ে যায়। সে পায়রা আর ফিরে যায় না। এক একটা গেরোবাজ এমনি অন্য পায়রাদের ভুলিয়ে আনে।

নতুন পায়রা খোপে ঢুকলে তাকে ধরে তার ডানায় সুতো বেঁধে দিলে কিছুদিন উড়তে না পারলে

সেণ্ট বার্নাড় কুকুর

[সেণ্ট বার্নাড কুকুর।]

চার পেয়ে স্কাউট বলা যায় এই কুকুর দুটিকে। এরা কিন্তু সাধারণ কুকুর নয়। এদের বলে সেণ্ট বার্নার্ড ডগ। এদের কাজ তুষারে চাপা পড়া অসহায় মানুষদের উদ্ধার করা। সুইট্জারল্যাণ্ডের আল্পস পাহাড়ের গিরিপথ ধরে যে সব পথিক চলে তারা অনেক সময় অত্যন্ত ঠাণ্ডায় অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে অসহায় ভাবে পড়ে থাকে। শিক্ষিত সেণ্ট বার্নার্ড কুকুররা এ অঞ্চলে এমনি অসহায় পথিকেরই খোঁজে ঘোরে। এ রকম অসহায় পথিককে তারা তখুনি পিঠে করে নিয়ে যায়। এই ভাবে এরা বিপথু মুমূর্ষু পথিকের প্রাণ রক্ষা করে।

এ কুকুরের গায়ে বড় বড় ঝাঁকড়া লোম হয়। বিপন্নদের কি করে উদ্ধার করতে হয় তা এদের শেখানো হয়।

শত সহস্র বিপন্ন মুমূর্ষু পথিক এদের কল্যাণ কর্মের ফলে রক্ষা পেয়ে গেছে।
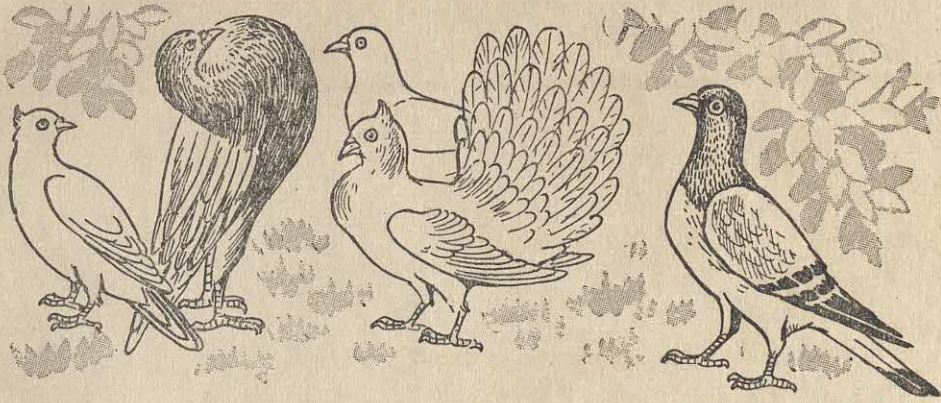
মুক্ষি লক্কা গোলা

নানা জাতের পায়রা

তারা ক্রমশঃ এই দলেই ভিড়ে যায়। পরে আর কোনদিন সে পায়রা দল ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না।

আগেকার দিনে চিঠি নিয়ে যাবার জন্যে শিক্ষিত পায়রা পোষা হতো।

॥ খাদ্য ॥

ধান, যব, চাল, ভুষি, পায়রামটর এইসব পায়রার খাদ্য। গামলায় করে পায়রার বাসার ধারে জল রাখলে তারা আপনিই দরকারমতো জল খায়। ছাদে বা খোলা উঠোনে পায়রামটর ইত্যাদি ছড়িয়ে দিলে পায়রারা ঝাঁক বেঁধে এসে খায়। এদের দল বেঁধে নেমে এসে খাওয়া দেখতে ভাল লাগে।

পায়রা পোষা আমাদের দেশের খুব প্রাচীন প্রথা। বণিকরা পায়রা পুষত আর মনে করত পায়রা লক্ষ্মীর বাহন। পায়রা ও অন্যান্য পাখিদের সকালে দানা খেতে দেওয়া অনেক লোকে ধর্মের কাজ মনে করে।

॥ স্নান ॥

পায়রারা স্নান করতে ভালবাসে। জলখাবার গামলায় নেমে তারা স্নান করে। তারপর গা থেকে জল ঝেড়ে এরা রোদে বসে খুঁটে খুঁটে পালক পরিষ্কার করে নেয়। খাবার জলে স্নান করতে দিলে জল দূষিত হয়ে পায়রার রোগ হতে পারে। তাই স্নান করার জন্যে একটা বড় রকমের জলের চৌবাচ্চা বা পাত্র রাখা উচিত। এতে যাতে সব সময়ে জল থাকে সেদিকে নজর রাখা উচিত। এতে অন্ততঃ ৩ ইঞ্চি জল থাকলেই পায়রাদের পক্ষে যথেষ্ট।

পায়রার খোপ থেকে যাতে ডিম গড়িয়ে পড়ে ভেঙে না যায় সেজন্যে খোপের সামনেটা একটু উঁচু করে তারের জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হয়।

পায়রার খাবার জলের মধ্যে একটা মরচে ধরা পেরেক রেখে দিতে হয়। তার ফলে ওদের জলে প্রয়োজনীয় লোহার যোগান হয়। এতে ওদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

॥ মুনিয়া পাখি ॥

ছোট ছোট মুনিয়া পাখি খাঁচায় করে পুষতে হয়। লাল, হলদে, সবুজ ইত্যাদি নানা রঙের মুনিয়া পাখি দেখা যায়। কাঁকনি দানা নামে একরকম মিহি ঘাসের বীজ এদের খেতে দিতে হয়। কেউ কেউ বড় খাঁচার মধ্যে টবসমেত একটা গাছ বসিয়ে তার ডাল থেকে নারকেলের মালা ঝুলিয়ে দেয়। মুনিয়া পাখিরা এই সব নারকেলের মালায় বাসা বেঁধে মনের আনন্দে বাস করে আর ডিম পাড়ে আর সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। মেঝেতে খাঁচার নীচে গামলায় করে জল দেওয়া হয় এবং ছোট ছোট পাত্রে কাঁকনি দানা রাখা থাকে। মাঝে মাঝে দু'দিকে তার বেঁধে

লাঠি ঝুলিয়ে দিলে মুনিয়া পাখিরা সেই লাঠির দোলনায় বসে দোল খায়।

॥ বদরিকা ॥

আবার অনেকে পোষেন বদরিকা (আসলে Budgerigar) পাখি—এদের Love Bird-ও বলা হয়। নীল, সবুজ, ধূসর, নানা রং-এর আর ছোটখাট চেহারার এই পাখিগুলি দেখতে মজার।

॥ ময়ূর ॥

যাদের বাড়িতে বড় বাগান আছে তারাই ময়ূর পুষতে পারে। বেশ অনেকখানি জায়গা তারের জাল দিয়ে ঘিরে তাতে ময়ূর রাখলে ময়ূর চলে-ফিরে বেড়ায়। পুরুষ ময়ূররা মেঘ দেখলেই পেখম তুলে নাচে। তখন তাদের দেখতে ভারী সুন্দর লাগে।

॥ টিয়া, কাকাতুয়া, হীরামন, শালিক, ময়না ॥

টিয়া, চন্দনা, ময়না, শালিককে শেখালে তারা মানুষের মতো কথা বলে। এজন্যে অনেকে এসব পাখি পোষে।

টিয়ার রং সবুজ, ঠোঁট লাল। যে টিয়ার গলায়
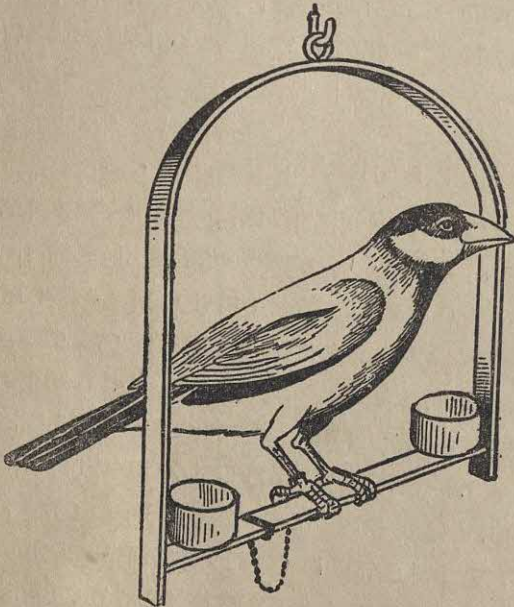
ময়না পাখি

কাকাতুয়া

লাল রং-এর ঘেরা দাগ থাকে, তাকে বলে চন্দনা। পোষা টিয়া দাঁড়ে থাকে। দাঁড়ের সঙ্গে এদের এক পা লোহার চেন দিয়ে বাঁধা থাকে। কেউ কেউ লোহার পাতের খাঁচায় টিয়া পাখি পোষে। তারের খাঁচায় বা কাঠের খাঁচায়ও টিয়া পাখি পোষা যায়। তবে এরা ধারালো ঠোঁট দিয়ে তারের খাঁচা বা কাঠের খাঁচা কেটে পালাতে চেষ্টা করে। পেয়ারা এদের প্রিয় খাদ্য।

ময়না কাঠির খাঁচায় থাকে। দুধ ভাত, ছাতু কলা ইত্যাদি ময়নাদের প্রিয় খাবার। গৃহস্থ বাড়ির যত কথাবার্তা সব এরা নকল করে আর ঠিক মানুষের ঢঙে কথা বলে।

শালিক বাংলা দেশের পাখি। সহজেই এরা পোষ মানে। পোষ-মানা শালিক খাঁচার দরজা খোলা পেলেও উড়ে পালায় না। প্রায়ই খাঁচার উপর বসে থাকে। এরা ফড়িং, পোকা, ছাতু, কলা, পাকা ফল ইত্যাদি খায়। পাকা তেলাকুচা ফল এদের ভারী প্রিয়।

কাকাতুয়া, হীরামন ইত্যাদি দামী পাখি। এদের জন্যে বড় বড় লম্বা দাঁড় দরকার। সেই দাঁড়ের দু'দিকে খাবারের বাটি থাকে। দাঁড়ের সঙ্গে শিকল দিয়ে এদের পা বাঁধা থাকে। এরা খুব সুন্দর বুলি বলে। মনে হয় ঠিক যেন মানুষ কথা বলছে। মাথায় ঝোঁটন থাকার জন্যে এদের ভারী সুন্দর দেখায়।

দেশবিদেশের বেশভূষা

আদিম যুগে মানুষ যখন উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত তখন তাদের লজ্জাবোধ ছিল না, শুধু শীত করলে তাদের একটা আচ্ছাদন দরকার হত। তখন তারা গাছের বাকল, শুকনো পাতা, পশুর ছাল, পাখির পালক, পশুর লোম এই সব সংগ্রহ করে তার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে শীত কাটাত।

ক্রমশঃ মানুষের যত বুদ্ধি বাড়তে লাগল ততই নানা রকম কৌশল তারা শিখতে লাগল। পাতা দিয়ে পোশাক বুনে তারা পরত, মাথায় পরত গাছের পাতার বা পালকের টুপি। পশুর শুকনো ছাল বা গাছের বাকল গায়ে জড়াত। এমনি সব অভ্যেস আজও বহু অসভ্য জাতের মধ্যেই রয়েছে।

তার উপর নিজের দেহকে সুন্দর দেখাবার জন্যে অসভ্য অবস্থা থেকেই তারা নানারকম রঙিন জিনিস কোমরে ঝোলাত, গলায় পরত বা কেউ রং দিয়ে গায়ে চিত্রবিচিত্র করত। এগুলো ছিল তাদের ভূষণ বা গহনা। তখন মানুষ কি যে সুন্দর তাই ঠিক জানত না, তাই খুব চড়া রং, জবড়জং সাজসজ্জা, শরীরের উপর নানা রকম অত্যাচার করে দেহ বিকৃত করে মনে করত তাদের সুন্দর দেখাচ্ছে।

আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, গ্রীনল্যাণ্ড, প্রশান্ত মহাসাগরের সব দ্বীপের লোকেরা এমনি সব কত অদ্ভুতভাবে নিজেদের সজ্জিত করত। আজও বহুদেশে ঐ ধরনের নানা প্রথা চলছে। বরফের দেশের অধিবাসী এস্কিমোদের পোশাক দেখলে মনে হয় সারা শরীরটাই তাদের পোশাকে তৈরী।

কিন্তু এদের মধ্যে কোন কোন অঞ্চলের লোক সভ্য হয়ে উঠতে লাগল। সেই সব অঞ্চলের লোকের হালচাল, বেশভূষা ইত্যাদি একটা বিশেষ ধারায় একটা বিশেষ রীতিতে বদলাতে লাগল এবং এক এক অঞ্চলে প্রায় একই রকম পোশাক গ্রহণ করতে লাগল।

মিশরীয়, গ্রীক ও ইতালীয়দের বেশভূষার বিশেষ বদল হয় নি, কিন্তু গত পাঁচশ বছরে পশ্চিম ইওরোপের বেশভূষা আমূল বদলে গেছে।

শীতের পোশাক-পরা এস্কিমো দম্পতি

॥ প্রাচীন মিশর ও আসিরিয়া ॥

প্রাচীন মিশর ও আসিরিয়ার ধনী লোকেরা লিনেন (বা শনের) কাপড় ব্যবহার করত। তখন পশুলোমের পোশাক তৈরী হত কিন্তু ধনীরা তা বড় একটা পছন্দ করত না। অনেকটা আজকালকার ফ্রকের মত দেখতে 'টিউনিক' পোশাকের বাঁধাধরা স্টাইল ছিল। এই সব পোশাক পরবার সময়ে বিশেষভাবে ভাঁজ করে পরা হত। তাতে নানা পছন্দমতো রং ও সূচী-শিল্পের কাজ করা থাকত।

প্রাচীন পারসিকরা চামড়ার তৈরী একরকম কোট ও পাৎলুন পরত। ক্রীট দ্বীপে মেয়েরা গায়ে আঁটসাট বডিস্ আর কোমরে আঁট বেল্ট পরত, তলায় থাকত ঘণ্টার মুখের মতো নীচের দিকে ঘেরওয়ালা (আজকাল যাকে বলে bell-bottom) ঘাগরা। ছুঁচলো মুখ বুটজুতা পরা ছিল তখনকার ফ্যাশান।

॥ গ্রীস ॥

প্রাচীনকালে গ্রীসের লোকেরা এক রকম লম্বায় বড়, চওড়ায় ছোট পশু-লোমের পোশাক পরত। তার নাম ছিল হিমেশন (himation). এ পোশাক পরবার নানারকম স্টাইল ছিল। বয়স্ক লোকেরা ভিতরে কাঁধ পর্যন্ত আঁটা কিটন (chiton) নামে অন্তর্বাস পরত—তার উপরে পরত হিমেশন। মেয়েরাও হিমেশন পরত, তাদের পরার ভঙ্গী অন্য রকম ছিল। তারা কোমরে একটা আঁট করে বেল্ট পরত। মেয়েদের পোশাকে কুঁচি দেওয়া থাকত। মেয়েরাও সেমিজের মতো হিমেশনের তলায় অন্তর্বাস হিসেবে 'কিটন' পরত।

গ্রীকরা জুতো না পরে সাধারণতঃ খালি পায়ে থাকত। কোন কোন মেয়ে বা পুরুষ স্যাণ্ডাল বা খুব নরম জুতো পরত। পর্যটক ও শিকারীরা হিল উঁচু বুট পায়ে দিত।

॥ নিউগিনি ॥

নিউগিনির আদিম অধিবাসীদের যুদ্ধের সাজ এবং পাপুয়ার নর্তকদের মাথায় বাহারে টুপি

নিউগিনির আদিম অধিবাসীদের যুদ্ধের সাজ

দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তারা যেন জবড়জং হয়ে থাকতেই ভালবাসে। নাচের তালে তালে টুপির পালক হেলে দুলে ভারী চমৎকার দেখায়। তাই তাদের নাচ দেখতে লোক জমে দেদার। আদিম লোকেরা নাচের তালমান বোঝে না। জমকালো ব্যাপার দেখে হাঁ করে থাকে।

॥ রোম ॥

রোমের সাধারণ পোশাক ছিল টোগা (toga). টোগার আকৃতি ছিল বৃত্তের একটি কাটা অংশের মতো। গ্রীকদের হিমেশন যেমন এক কাঁধের উপর ফেলা থাকত, রোমের টোগাও তেমনি ভাবে

পাপুয়ার নর্তকের মাথার বাহারে টুপি (নিউগিনি)
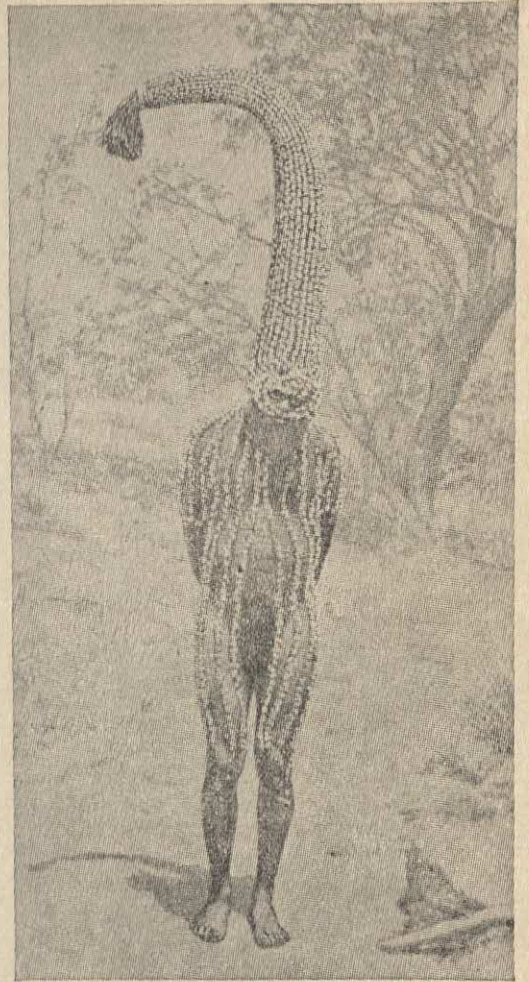
গাছের ডাল ও পাখির পালক দিয়ে তৈরী টুপি পরে অস্ট্রেলিয়ার জাদুকর এমু পাখি ধরতে যায়

পরা হত ভাঁজ করা অবস্থায়। টোগার তলায় রোমানরা টিউনিক পরত। দরিদ্ররা শুধু টিউনিক পরত। কালক্রমে প্যালিয়াম (pallium) পরার ফ্যাশান দেখা দিল; এর অপর নাম ক্লোক, এটা একরকম আলখাল্লার মতো ঢিলা পোশাক। গ্রীকরা যেমন তলায় কিটন ও উপরে হিমেশন পরত রোমক মেয়েরা তেমনি স্টোলা (stola) ও পালা (palla) পরত। বাইরে বেরবার সময় স্ত্রীপুরুষ সবাই বুট পরত আর বাড়িতে স্যাণ্ডাল পরে থাকত।

॥ ফরমোসা ॥

ফরমোসা (এখন নাম তাইওয়ান) দ্বীপের মেয়েরা ঘাসের তৈরী এক রকম পোশাক পরে। এগুলো রঙিন কাঠি সাজিয়ে মাছুরের মত বোনা। রঙিন পশম দিয়ে পোশাকগুলো আবার শরীরের সঙ্গে বাঁধে। উত্তর ফরমোসার মানুষ ও পশু-শিকারীদের পোশাক দেখলে মনে হয় তারা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় আছে। গায়ে জালের মতো পোশাক। পরনে নেংটি বা জাঙ্গিয়া।

শরীরের আকৃতি অনুযায়ী পোশাকের ছাঁটকাট শুরু হল

ফরমোসা দ্বীপের মেয়েদের ঘাসের তৈরী পোশাক
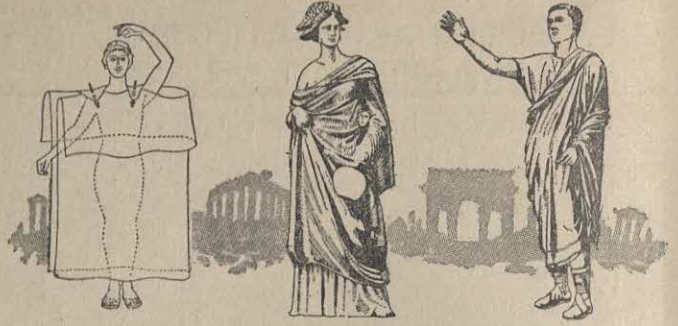
॥ ইওরোপীয় পোশাক ॥

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইওরোপের পোশাক সম্বন্ধে তেমন কিছু খবর সংগ্রহ করা যায় নি। স্থাপত্য, চিত্র এবং স্মৃতিস্তম্ভ থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করা গিয়েছে। ডেন, ভাইকিং ও নরম্যানদের পোশাক সারা ইওরোপের লোক প্রচুর নকল করত। তাছাড়া পুবের দেশে ধর্মযুদ্ধ (crusade) করতে গিয়ে ধর্মযোদ্ধারা ওসব দেশের পোশাক নকল করেছিল। প্রাচ্য দেশ থেকে পশমী, রেশমী, কিংখাব (brocade) প্রভৃতি বস্ত্র আমদানি করে ব্যবসায়ীরা ঐ সময়কার পোশাক অনেক পালটে দিয়েছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে লোকে প্রায়ই শার্ট বা খাটো জ্যাকেট পরত। তা-ছাড়া সবাই হাত-ওলা আলখাল্লা পরত, যার ঝুলের কোন ঠিক ছিল না। যত ঢিলে-ঢালা হত ততই আভিজাত্য বাড়ত। তার উপরে কাঁধে ফিতে বাঁধা আলখাল্লা পরত বা বুকে ফিতে বাঁধা মেরজাই পরত। শার্টের তলায় পাৎলুন পরত। মোটা মোজা দিয়ে ওদের পা ঢাকা থাকত কিংবা পায়ে কাপড়ের ফালি (পট্টি) জড়িয়ে তার উপর জুতো পরত।

মেয়েদের পোশাক থেকে পুরুষদের পোশাক তফাত করা যেত না। মেয়েদের

পোশাক আরও ঢিলেঢালা আর চিত্র-বিচিত্র হত। মেয়েদের পোশাকের হাতা ছিল বড়ো, এছাড়া তারা অ্যাপ্রন ইত্যাদি পরত। হাতা থেকে ঝোলানো নানা রকম পোশাক পরত যা দেখতে ছিল সত্যি বিচিত্র।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে রেনেসাঁসের প্রারম্ভ পর্যন্ত সময়কে 'গথিক যুগ' বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সেটা ছিল অসভ্যযুগ। এই সময় থেকে দরজীর কেরামতি প্রথম শুরু হল। শরীরের আকৃতি অনুযায়ী পোশাকের ছাঁটকাট আরম্ভ হল। হাতা সেলাই করা এবং মাথা গলিয়ে পোশাক পরার রেওয়াজ দেখা দিল। মেয়েদের পোশাকেও এল নতুনত্ব। এই সময় থেকে স্কার্টের চলন হল।

অদ্ভুত পোশাকে সজ্জিত পোর্তুগিজ পশ্চিম আফ্রিকার যুবকগণ

কাপড়ের উপর ফুল, লতাপাতা, নকশা করা, ঝালর দেওয়া, ধাতুর ব্রুচ এবং পিন পরার রেওয়াজ উঠল। সামাজিক মর্যাদা ও পেশা অনুযায়ী পোশাকের বৈচিত্র্য এল।

উত্তর ফরমোসা দ্বীপের পশু শিকারীদের সাজসজ্জা

চতুর্দশ শতাব্দীতে পুরুষের পোশাক আর নারীর পোশাক একেবারে অন্য ধরনের হয়ে গেল। মেয়েরা খাটো ঘেরের সিল্কের গাউন পরতে লাগল। এদের হাতা হয় ভাঁজে ভাঁজে ফোলানো থাকত, না হয় লম্বা হয়ে ঝুলে থাকত; কোমরে ফিতের মতো বেল্ট জড়ানো থাকত। পাগুলো মোজা পরা থাকলেও দেখা যেত। কাঁধটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খোলা থাকত। টুপির নিম্নাংশ দিয়ে কাঁধ ঢাকা দিয়েও কেউ কেউ বেড়াত।

১৩৭৫ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পোশাকে এত রকমের বৈচিত্র্য এল যে তাকে আর কোন বাঁধাধরা নিয়মে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

রানী এলিজাবেথের সময়ে কোমর থেকে ফোলানো এক রকম বিচিত্র গাউনের চলন হল। ইওরোপে বহু দেশে এই রকম মেয়েদের গাউনে লম্বা

রেড-ইণ্ডিয়ান মেয়ে সুদৃশ্য পোশাকে সজ্জিত হয়ে রঙিন বেতের ঝুড়ি বুনছে

লেজুড় (trail) ব্যবহার করা হত। রানীদের লেজুড় খুব লম্বা হত। দু'জন করে বালক ভৃত্য দু'পাশ থেকে ধরে এই লেজুড় বয়ে নিয়ে চলত। রানী কোথাও গেলে, তিনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলেও তাঁর পোশাকের লেজুড় অনেকক্ষণ ধরে বালক ভৃত্যেরা (page) ধরে থাকত। রানী হয়তো কোন বাড়ির দোতলায় পৌঁছে গেছেন কিন্তু তাঁর গাড়ি থেকে তখনও তাঁর পোশাকের লেজুড় বার করা হচ্ছে।

ক্রমশঃ এসব ব্যবস্থা উঠে গেল। পোশাকে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিল। যাতে ঘোরাফেরা যায়, কাজকর্ম করা যায়, পোশাক তেমনই হালকা হয়ে উঠতে লাগল।

তাই এখন বলতে গেলে সারা ইওরোপের এবং আমেরিকার সাধারণ সভ্য পোশাক হয়ে দাঁড়িয়েছে মাথায় টুপি, পায়ে জুতো-মোজা, কোমর থেকে পা পর্যন্ত পাৎলুন ('ট্রাউজার্স'), আর গায়ে পুরো হাতাওলা কোট। সেই কোটের সামনেটা ওপরের অংশ ভাঁজ করে খোলা ('ওপেনব্রেস্ট')। ফাঁক দিয়ে ভেতরকার শার্ট, আর তার কলার ঘিরে জড়িয়ে সামনে ঝোলানো 'টাই' দেখা যায়। শার্টের ওপরে কোটের তলায় 'ওয়েস্ট কোট' পরার রেওয়াজ আগে ছিল। একসময় টাইয়ের বদলে গলায় 'ক্র্যাভাট' বাঁধা হতো, সেটা হতো ফুলো মতন একটা বড় কাপড়।

॥ এশিয়ার পোশাক ॥

তুরস্কে ও ইজরেলে জাতীয় পোশাক ছেড়ে অনেকে এখন ইওরোপীয় পোশাক পরছে। কিন্তু বহু আরবীয় এখনও আব্বা (abba) বা হাতাহীন আলখাল্লা পরে ও মাথায় অনেক রঙের সুতোর বা সিল্কের টুপি

তিব্বতের কয়েকজন জ্ঞানী লামা

পরে। এইসব টুপি থেকে একটা ট্যাসেল ঝোলানো থাকে। বেদুঈন মহিলারা তাঁদের পুরাতন পোশাক আজও ছাড়েন নি।

॥ তিব্বত ॥

তিব্বত শীতের দেশ। তাদের পোশাক ঢিলে-ঢালা ও তা দিয়ে তাদের সমস্ত শরীর ঢাকা থাকে। তাকে বলে ছুপা। এরা মাথায় টুপি পরে।

॥ চীন ॥

চীনেরা আলগা কোট পরে আর সিল্ক বা সুতোর পাজামা পরে। মেয়েদের কোটে সুন্দর রঙিন সুতোর কাজ করা থাকে। তারা চুলে কাঁটা ও ফুল পরে আর চিরুনি বা বন্ধনী দিয়ে চুল বাঁধে। মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে পোশাক পরার ধরন একই রকমের তবে পোশাকের কাপড় নানা রকম বিচিত্র হয়।

॥ জাপান ॥

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে জাপান ইওরোপীয় পোশাক গ্রহণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু তারা তাদের ঢলঢলে বহির্বাস 'কিমোনো' এখনও ত্যাগ করে নি। চীনে তাং রাজবংশের আমল থেকে 'কিমোনো' পরার প্রথা ছিল। জাপানীরা তাই গ্রহণ করেছে। মেয়ে-পুরুষ বিচিত্র রঙের, সুন্দর ফুলতোলা কিমোনো ব্যবহার করে। তারা কোমরে একটা চাদরের মতো চওড়া কাপড়ের বন্ধনী পরে। তার নাম ওবি (obi).

কয়েকটি দেশের বিভিন্ন ধরনের পোশাক

দীর্ঘ বর্শা হাতে আগেকার ফ্রেঞ্চ কঙ্গোর যোদ্ধা

॥ ভারতবর্ষ ॥

হিন্দু মহিলারা নানা রঙের শাড়ি পরে। শাড়িগুলি কোমর থেকে জড়িয়ে সারা গায়ে বেড় দিয়ে খানিকটা অংশ দিয়ে মাথা ঢাকা দেয়। এই মাথার কাপড়টুকুকে বলে ঘোমটা। মুসলমান মেয়েরা পাজামা পরে। উপরের শরীরে থাকে লম্বা কামিজ।

নিউ মেক্সিকোর সর্দার বিচিত্র সাজে বসে আছে

ভারতীয় মহিলারা গহনা পরতে ভালবাসে। কাচের নানারকম চুড়ি, রুপোর ভারী গহনা, সোনার গহনা, হীরামুক্তোর গহনা—কত রকমের গহনাই তারা পরে! পার্শীরা সাদা পোশাক পরে আর মাথায় কালো টুপি পরে। হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসীদের পোশাক ওজনে ভারী। পঞ্জাবীদের লম্বা পাগড়ি। তারা লম্বা পাঞ্জাবি ও পাজামা পরে।

॥ বাঙালীদের পোশাক ॥

বাঙালীদের পোশাক ধুতি ও চাদর। চোগা-চাপকানের ব্যবহার এক সময়ে ধনী লোকদের মধ্যে খুব চল হয়েছিল। কোঁচানো ধুতি, কোঁচানো চাদর, গিলে করা পাঞ্জাবি এক সময়ে ধনী লোকদের পোশাক ছিল। সভা-সমিতিতে যাবার সময়ে অনেকে পাগড়ি পরতেন। এখন যে যার রুচি অনুযায়ী পোশাক পরছেন। বাঙালী মেয়েদের শাড়ির আঁচল তাদের বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে, কিন্তু অনেক রাজ্যের মেয়েদের শাড়ির আঁচল তাদের ডান কাঁধের ওপর দিয়ে যায়।

বর্তমান কালে বাঙালী মেয়ে ও পুরুষের পোশাক নানা রকম ধরনের হয়েছে। সবাই যেন নতুন কিছু করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। চুলের বাহার, খোঁপার বাহার, দাড়ি-গোঁফের বাহার, জুলফির বাহার—তা ছাড়া শাড়ি ধুতির ব্যবহার কমছে। বিচিত্র আকারের বেল বটম প্যান্ট, বাহারী জামা, বর্মিদের লুঙ্গি, মিনি, ম্যাকসি—বাঙালী জাতের যেন নিজস্ব কোন পোশাক নেই। সবই বিদেশ থেকে আমদানি করা নতুন কিছু।

॥ বর্মা ॥

বর্মার মেয়ে ও পুরুষ লুঙ্গি ('লৌঙ্গি') পরে। গায়ে খাটো-হাতা কোট, তাকে বলে 'এঙ্গি'। তার উপর মাথায় নানা কারুকার্য করা এক টুকরো কাপড়ের ফেট্টি। পায়ে থাকে স্ট্র্যাপ-ওলা চটি, যাকে বলে 'ফানা'।

সব দেশেই পোশাকের সংস্কার হচ্ছে। ধীরে ধীরে সব দেশে ইওরোপীয় ধরনের পোশাকের প্রসার হচ্ছে।

॥ বিভিন্ন দেশের বিচিত্র বেশভূষা ॥

কয়েকটি ছবির পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন দেশের বিচিত্র বেশভূষার কথা বলা হচ্ছে। নিউ মেক্সিকোর

নলখাগড়ার পোশাক ও টুপি পরা আফ্রিকার যুবকদল

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী গুণিনের সাজঃ এরা ছোট ছোট কাঁকরে মন্ত্র পড়ে রোগীর গায়ে ছড়িয়ে দেয়

দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়ার আদিবাসী রমণীর বিনুনী

আয়নার সামনে ফিজিদ্বীপের মহিলা লম্বা দাড়ার চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে

আয়নার সামনে বসে ফিজিদ্বীপের যে মেয়েটি চুল আঁচড়াচ্ছে তার মাথার চুল এবং লম্বা দাড়াওয়ালা চিরুনি দুই-ই দেখবার মতো জিনিস। দূর থেকে মনে হয়, মাথার উপর মৌমাছি মৌচাক তৈরি করেছে। ঐ চুলে ঐ ধরনের চিরুনিই বোধহয় মানানসই। চিত্রবিচিত্র নক্সাওলা শাড়ি পরতে যে তারা ভালবাসে তা ঐ মেয়েটির পরনের শাড়িটি দেখলেই বোঝা যায়। বেশভূষাই মেয়েদের প্রাণ। ভাল করে সেজেগুজে থাকতে সব দেশের মেয়েরাই চায়। প্রসাধন বা চুল আঁচড়ানো সাজ-গোজের একটা অঙ্গ। আয়না নিয়ে বসে নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে হয়, কোথায় কোন সাজটি মানায়, যাতে নিজেকে সুন্দর দেখায়।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা এখনও যে ধরনের সাজসজ্জা করে তা দেখলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। পাখির পালকের মুকুটপরা আফ্রিকার যোদ্ধাদের দেখলে মনে হয়, যুদ্ধ করার চাইতে তাদের ভড়ংই বেশী।

রেডইণ্ডিয়ান রমণীরা সুদৃশ্য পোশাক পরতেই ভালবাসে। পুরো হাতাওয়ালা জামা, সেই জামার ঘের ভয়ানক লম্বা, পা অবধি লুটিয়ে পড়ে। গায়ে যে ওড়নাটি দেয় তা বেশ জমকালো। যখন গৃহকর্ম করে তখনো তাদের সাজ জবরর। বাইরে বা আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলতে গেলে তখন ত অনেক কিছুই চাই। কিন্তু নিত্য দিনও তারা না সেজে যেমন-তেমন অবস্থায় থাকে না। মেয়েটি ঝুড়ি বুনছে কিন্তু সাজের কী ঘটা! তার উপর কেমন পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো!

পুয়েবলো জাতির সর্দার আব্রাহাম লিঙ্কনের দেওয়া একটি লাঠি পরীক্ষা করছেন। তাঁর মাথার পাগড়িতে পালক গোঁজা। সারা গায়ে ঢাকা আলখাল্লার মতো পোশাকটিও চিত্রবিচিত্র। গলায় একটা মাত্র টাই বেঁধে তিনি সন্তুষ্ট হন নি, তিন-চারটা টাই তাঁর গলায় শোভা পাচ্ছে। তিনি একজন সর্দার। অন্য সকলের দলপতি। কাজেই মর্যাদা তাঁর একটু বেশি। এই মর্যাদা তাঁর পোশাক থেকেই দেখা যাচ্ছে। সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র পোশাক না পরলে লোকেই বা তাঁকে মানবে কেন?

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপের ডাক-ডাক জাতির

লোকদের মাথার টুপি দেখবার মতো জিনিস। শুকনো পাতা, পালক ইত্যাদিতে তৈরী ঝালরওয়ালা টুপি মাথায় পরলে তাদের মুখ দেখা যায় না। সেই টুপির মাথায় লম্বা ত্রিশূলের মতো একটা জিনিস আছে। সেটা বাঁশ বা গাছের ডাল দিয়ে তৈরী।

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এক শ্রেণীর জাদুকর আছে, তাদের আচার-ব্যবহার অতি অদ্ভুত। গাছের পাতা ও পাখির পালক দিয়ে তৈরী টুপি পরে তারা এমু পাখি ধরতে যায়। মাথায় টুপিটি দেখলে মনে হয় যে জেব্রার গলা অথবা রামশিঙ্গা।

এ বেশ কিন্তু শুধু বাহারের জন্যে নয়। এ বেশ এমু পাখিদের ভোলাবার জন্যে। তাদের ঝাঁকে যখন জাদুকর গুঁড়ি মেরে বসে তখন তাকে ঠিক পাখির মত দেখায়—কে বুঝবে যে সে মানুষ! এইভাবে এমু পাখিদের মধ্যে থেকে সে কৌশল করে এমু পাখি ধরে। অবশ্য মন্ত্র-তন্ত্রও কিছু সে জানে। সে সব সে আওড়ায় গান গাইবার মত সুরে। তাতে এমু পাখিরা চলে যায় না—স্তব্ধ হয়ে শোনে। আর সেই ফাঁকে সে তার কাজ উদ্ধার করে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপবাসী ডাক-ডাক জাতির মাথার টুপি

সেই দেশেরই আদিম অধিবাসীদের ডাক্তারদের পোশাক বলতে কিছু নেই। কিন্তু সাজসজ্জা অতি বিচিত্র। গায়ে রং দিয়ে চিত্র-বিচিত্র দাগ কাটতে তারা ভালবাসে। দূর থেকে মনে হয় ওটা পোশাক। কপালেও তিলকের মতো বিরাট দাগ কাটে। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হল, নাক ফুটো করে একটা লম্বা কাঠি সেখানে গুঁজে রাখে। নাক ফুটো করার কষ্ট স্বীকার করতে তারা মোটেই কুণ্ঠিত হয় না। ব্যবসা বা কাজের জন্যেই এই বেশভূষা। আদিম অধিবাসীরা বেশভূষা দেখেই বেশি ভোলে। রোগীর পাশে এই রকম বিচিত্র চেহারার ডাক্তার যখন এসে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ে তখন রোগী ভাবে এবার নিশ্চয়ই সেরে উঠবো। রোগীর মনে আশা ভরসা জন্মানোর জন্যে এই রকম বেশভূষা দরকার হয়। সেইজন্যে ও দেশের ডাক্তারদের ঐ রকম বেশভূষা করতে হয়।

সামোয়ার যোদ্ধাদের পোশাকও কম বিচিত্র নয়। গায়ে কোন জামা নেই, কিন্তু পাগড়ির বাহার অপূর্ব।

সামোয়ার যোদ্ধার পোশাক

তা ছাড়া কোমরে যে আবরণ তারা জড়ায় তা থেকে অসংখ্য রকমের লতাপাতা ঝোলানো থাকে। তাদের গলায় হাঁসুলির মতো গয়নাও দেখবার মতো জিনিস। হাতে অস্ত্র নিয়ে এই রকম যোদ্ধারা যখন সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের হুংকার ছাড়ে তখন মনে হয় যেন একদল যমদূত এসে দাঁড়িয়েছে। বিচিত্র পোশাকে তাদের ঠিক ঘাতকের মত ভয়ংকর দেখায়।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের লোকদের সাজ-পোশাক দেখলে মনে হয় তারা সভ্যতার আলোক থেকে অনেক দূরে রয়েছে। হাঁটুর উপরে ছোট এক ফালি কাপড়, গায়ে জামার বালাই নেই। মাথায় তারা পরে সাগু গাছের পাতার তৈরী বিচিত্র টুপি। এই টুপি পরে এরা মনে করে এদের না জানি কত সুন্দর দেখাচ্ছে! মনে মনে এদের খুব গর্ব ও আহ্লাদ হয়। গায়ে যে ঢাকা নেই, পোশাক যে খাটো তার জন্যে একটুও ক্ষোভ এদের নেই।

কঙ্গো সভ্যতার আলোক পাচ্ছে। তবু আদিবাসীদের সাজ-পোশাক দেখলে মনে হয় সভ্যতার তালে তালে পা ফেলতে তারা এখনও পারে নি। লম্বা বর্শা হাতে ফ্রেঞ্চ কঙ্গোর যে যোদ্ধাটি দাঁড়িয়ে আছে, তার পরনে রয়েছে বুক থেকে পা অবধি একটি মাত্র কাপড়। মাথার মুকুটে বিশেষ বৈচিত্র্য না থাকলেও গলার আভরণটি অতি বিচিত্র। কয়েকটি পাকওয়ালা হাঁসুলি সারা গলাটি ছেয়ে আছে। লোকটি খুব ঢ্যাঙা। দাঁড়িয়ে আছে যেন কত শান্তশিষ্ট! হাতে বর্শার বদলে কমণ্ডলু দিলে অনায়াসে তাকে সন্ন্যাসী বলে চালানো যায়। কিন্তু যুদ্ধের সময় এলে এদের মূর্তি হয়ে ওঠে ভয়ংকর—দুর্ধর্ষ ঠিক যেন যমদূত।

কঙ্গোর যুদ্ধের সাজ আরও বিচিত্র। কোমরে লতাপাতা জড়ানো। মুখ ও সারা গায়ে চিত্রবিচিত্র নানা রঙের ছোপ দেখলে মনে হয় সঙ্ সেজে আছে।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ করার রেওয়াজ খুব বেশী। এরা যখন যুদ্ধে নামে তখন নানাভাবে সাজে ও দু'-হাতে অস্ত্র নেয়। অনেক জাতির যুদ্ধসজ্জা খুবই অদ্ভুত। কোন কোন জাতির লোকেরা মাথায় পাখির পালকের মুকুট পরে।

কঙ্গোর রমণীর কবরী বা খোঁপা

সিংহলের নর্তকের বিচিত্র পোশাক

হাতলওলা ঝুড়ির আকারের টুপি-পরা থাইল্যাণ্ডের মহিলা

সম্ভ্রান্ত মোঙ্গল মেয়েদের সুদৃশ্য বেণী

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের লোকের মাথায় সাগু
গাছের পাতার টুপি

এই মুকুট তারা এমন আট করে মাথায় বসায় যে যুদ্ধ করার সময়ও তা খুলে পড়ে যায় না।

আফ্রিকার বেলজিয়ান কঙ্গো নামে যে অংশ একসময়ে বেলজিয়ামের অধিকৃত ছিল এখন অবশ্য সেই কঙ্গো এক স্বাধীন রাষ্ট্র। এই দেশের অভ্যন্তরে গভীর জঙ্গলে যে-সব আদিম অধিবাসী বাস করে তারা যুদ্ধে যাবার আগে গায়ে বিচিত্র উল্কি পরে, তাদের পরনে থাকে অদ্ভুত সাজ, হাতে ঢাল ও নানা ধরনের বর্শা ও অস্ত্র।

এস্কিমোদের পোশাক তাদের দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী। সবই পশুর চামড়ার পোশাক। সবই ঢাকাঢুকির ব্যাপার। মাথা ঢাকবার চামড়ার টুপি —কেবল ওরা পরেনি। যেমন শীতের দেশ পোশাকও তেমনি।

কয়েকটি ছবিতে মেয়েদের চুল, বিনুনি ইত্যাদির বাহার লক্ষ্য কর। ফিজিদ্বীপের মহিলার মাথায় এক বোঝা চুল। তার যত্নও তিনি নেন। বলিভিয়ার মহিলার মাথা থেকে বটের ঝুরির মত নেমেছে অসংখ্য বিনুনি। বোধহয় সারাদিন গেছে এই বিনুনি বুনতে। কাজেই কয়েকদিন ধরে এমনি ভাবে তাদের থাকতে হয়। রোজ ত এত পরিশ্রম করে বিনুনি বাঁধতে পারে না!

থাইল্যাণ্ডের মহিলার মাথায় যে সাজির মত সজ্জা এটা টুপি। তার মধ্যে থাকে তাঁর নুটি করা চুল।

হ্যাঁ, খোঁপা করতে জানে মোঙ্গল মেয়েরা। এরা বড়লোক সম্প্রদায়ের। বিনুনি আর পোশাক দেখলে বোঝা যায় এদের আভিজাত্য। প্রায় সব দেশের মেয়েরাই লম্বা চুল রাখে। এই চুলের মধ্যেই যেন তাদের প্রাণ। কত রকম করে এরা বিনুনি বাঁধে! তার উপর করে খোঁপার বাহার। খোঁপা বাঁধবার কতরকম রীতিই সব দেশে দেশে প্রচলিত! সারা পৃথিবীর মধ্যে বাহারী খোঁপা বাঁধতে জানে উড়িষ্যার মেয়েরা। আমাদের বাঙালী মেয়েদেরও এক কালে ছিল কত রকম খোঁপার বাহার। তার পিছনে থাকতো একটা সোনা-বাঁধানো চিরুনি আর খোঁপা শক্ত করবার জন্যে নানা রকম সোনা-রুপোর কাঁটা। খোঁপাটাকে ঠিক রাখবার জন্য একটা কালো মিহি জাল জড়ানো থাকতো তাতে।

আপাদমস্তক পোশাক দিয়ে ঢাকা আরবীয় সেনা।

দেশবিদেশের বেশভূষাঃ

[আপাদমস্তক পোশাক দিয়ে ঢাকা আরবীয় সেনা]

পৃথিবীতে নানা দেশ। সেই সব দেশের বেশভূষাও নানা ধরনের। শীতের দেশে একরকম পোশাকপরিচ্ছদ, গরমের দেশে অন্য রকম। পাহাড়ীরা একরকম পোশাক পরে, মরুভূমির আশেপাশের মানুষ অন্য ধরনের পোশাক পরে।

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরবের বেশির ভাগই মরুভূমি। প্রচন্ড গরম সেখানে। বেশী গরমের দিনে আমরা গায়ের জামা খুলে আলগা গায়ে থাকি। কিন্তু মরুভূমি অঞ্চলের লোকেরা আপাদমস্তক ঢেকে রাখে। এর কারণ গরম হাওয়া বালির ঝড় সহ্য করতে গেলে খালি গায়ে থাকা চলে না। মোটা পোশাকপরিচ্ছদে শরীরকে ঢেকে রাখতে হয়। তাই সেখানকার লোকেরা গরম হাওয়া ও বালির ঝড় থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সারা দেহকে পোশাক দিয়ে ঢেকে রাখে।

এখানে দেখা যাচ্ছে, দুজন আরবীয় সেনা দেহকে আপাদমস্তক পোশাক দিয়ে ঢেকে পাহারা দিচ্ছে। একজনের পিঠে বন্দুক। অন্যজনের হাতে বন্দুক। পাশে দুটি খেজুর গাছ। এই গাছই আরবের মরু অঞ্চলে বেশী দেখা যায়।

আজকাল অনেক মেয়ের লম্বা চুল নেই। তাই তারা পরচুল কিনে পরে আর খোঁপার মধ্যে বিরাট একটা কালো চুলের বল গুঁজে খোঁপাটা বিরাট করে দেখায়।

আজকালকার বাঙালী ছেলেদের পোশাকের নতুন ঢং

॥ যেমন কাজ তেমন সাজ ॥

সাজ-পোশাক শুরু হয়েছিল মানুষের প্রয়োজনে। শীত আর আতপ থেকে বাঁচবার জন্যে মানুষের দরকার হয়েছিল পোশাকের। সেই প্রথম অবস্থায় মানুষ যা কিছু সুন্দর, যা কিছু বিচিত্র দেখত তাই অঙ্গে ধারণ করত। তারপর দরকার হল বিশেষ কাজের উপযোগী পোশাক। অসভ্য অবস্থাতেও সর্দারের পোশাক ছিল এক রকম, যোদ্ধাদের পোশাক ছিল অন্য রকম। ডাক্তারের পোশাক ছিল আবার অন্য রকম। যারা মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়-ফুঁক করত তাদের পোশাক ছিল তাদের ব্যবসার অনুযায়ী। যারা শিকার করত তাদের সাজপোশাক শিকারের উপযোগী ছিল।

কঙ্গোর আদিম অধিবাসীদের যুদ্ধের সাজ

যে যা কাজ করে তার উপযোগী পোশাক তার দরকার। তার কাজে ব্যাঘাত ঘটে এমন পোশাক সে কখনই পছন্দ করতে পারে না।

তাছাড়া মানুষ যত সভ্য হতে লাগল ততই তাদের দরকার হল শালীনতা রক্ষার। সারা গা উলঙ্গ আর মাথায় জবর টুপি—এ রকম পোশাক ক্রমশঃ মানুষ ত্যাগ করতে আরম্ভ করল।

কালক্রমে পোশাক হয়ে এল দুরকম জাতের। এক হল দৈনন্দিন ব্যবহারের পোশাক আর এক হল উৎসব ইত্যাদির পোশাক। ইওরোপে নানা অনুষ্ঠানে নানা রকম পোশাকের রীতি সভ্য সমাজে

আজকালকার বাঙালী মেয়েদের পোশাকের নতুন ঢং

দেখা দিল। সকালের একরকম পোশাক, সন্ধ্যায় আর একরকম। ভোজে যাবার পোশাক আবার অন্য রকম।

এই সব চাহিদা মেটাতে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল—তাদের নাম দরজী।

সারা জগৎ ঘুরে মানুষের নানা রকম পোশাক দেখে মনে হয় শেক্সপীয়ারের কথা। তিনি তাঁর অমর নাটক 'হ্যামলেটে' এ সম্বন্ধে বড় সুন্দর কথা বলেছেন। মন্ত্রী পলোনিয়াসের ছেলে লেয়ার্টেস্ যখন বিদেশে পড়তে যাচ্ছে তখন তার বাবা তাকে বলছেন—আয় বুঝে পোশাক পরবে, পোশাক দামী হবে কিন্তু জাঁক-জমকের যেন না হয়। প্রায়ই পোশাক দেখে লোক-চরিত্র বোঝা যায়।

আজ কর্মব্যস্ত দুনিয়ায় মানুষ ক্রমশঃ জবড়-জং ঢিলেঢালা পোশাক ত্যাগ করে আঁটসাঁট পোশাক পরছে। পুরুষেরা সব দেশেই প্রায় পাৎলুন ধরছে—নারীরাও পোশাকে অনেক বাহুল্য ত্যাগ করেছে। আজকালকার বাঙালী ছেলেদের পোশাকের নতুন ঢং দেখ।

তার পরেই দেখ আজকালকার মেয়েদের পোশাকের ঢং। শাড়ি অনেকে ছেড়েছে। যারা ছাড়েনি তারা শাড়ি পরার কায়দা বদলেছে।

॥ যোদ্ধাদের পোশাক ॥

আগেকার দিনের যুদ্ধ ছিল সম্মুখ সমর। তখন বীরত্ব দেখাবার সুযোগ ছিল। তীর ধনুক, বর্শা এসব নিয়ে যোদ্ধারা যুদ্ধ করত। সাজ পোশাকের ঘটা ছিল শত্রুদের ভয় দেখাবার জন্যে। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ হচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্রের যুদ্ধ, কামান, বন্দুক, মর্টার, মেসিনগানের যুদ্ধ। এর জন্য সৈন্যদের পোশাক চাই ছিমছাম—যাতে তারা তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে চট্‌পট্ কাজ করতে পারে।

পাখির পালকের মুকুটপরা আফ্রিকার যোদ্ধা

॥ চলচ্চিত্র কি ॥

চলচ্চিত্র মানে চলন্ত ছবি—যে ছবি চলে, নড়ে-চড়ে, কাজকর্ম করে। প্রথমে একে বলা হতো বায়োস্কোপ, পরে এর নাম হয় সিনেমা। আবার, এতে মানুষ ইত্যাদিকে নড়তে দেখা যায় বলে একে 'মুভি' (movie)-ও বলা হয়। প্রথমে এতে শুধু নড়াচড়াই দেখা যেত, পরে এর সঙ্গে নতুন আকর্ষণ যোগ হয়েছে। এ ছবি কথা বলে, গান গায়। 'টকি' অর্থাৎ কথা বলা ছবিও এর আর এক নাম।

॥ আদ্যিকালের চলচ্চিত্র ॥

৭০ বছর আগে আমাদের দেশে বায়োস্কোপ বলতে বোঝাত এক রকম ছবি দেখার যন্ত্র। রাস্তার বায়োস্কোপওয়ালা ঠুনঠুন করে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বিরাট একটা কাঠের চকচকে পালিশ-করা বাক্স মাথায় নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। বাক্সটার মাথায় বসানো থাকত একটা চোঙওয়ালা গ্রামোফোন। বাক্সটার সামনে গোল গোল তিন-চারটে মুখ—সেগুলো টিনের ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা থাকত। কেউ বায়োস্কোপ দেখতে চাইলে বায়োস্কোপওয়ালা কাঠের বাক্সটি নামিয়ে তাকে পায়ার উপর দাঁড় করিয়ে দিত আর গ্রামোফোনটা চালিয়ে দিত। তারপর দর্শনার্থীদের কাছ থেকে দর্শনী আদায় করে এক-এক করে তিন-চারজনকে এক-একটা গোল ফুটোর সামনে দাঁড় করিয়ে দিত। তারপর সে খুলে দিত এক-এক করে চারটে ঢাকনা। ফুটোর সামনে একটা করে পুরু কাচ। এই কাচের সাহায্যে ভিতরের ছবি বড়ো করে দেখা যেত।

বাক্সের মধ্যে শেষ প্রান্তে থাকত একটা লম্বা ফিতের মতো জড়ানো কাগজে অনেকগুলো ছবি। হাতল ঘুরিয়ে সেই সব ছবি একের পর এক দেখানো হত। সেগুলি সব রঙিন ছবি; দেখার সঙ্গে সঙ্গে বায়োস্কোপওয়ালা সুর করে ছবির বিষয়গুলো বর্ণনা করত, যথা—'দিল্লীকা দরবার দেখো, হাঁথি-পর-হাওদা দেখো', ইত্যাদি। তাতে থাকত আগ্রার তাজমহল, বিদেশী নর্তকী, সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার প্রভৃতি নানা ধরনের ছবি।

॥ ম্যাজিক লণ্ঠন ॥

এর পরে এল ম্যাজিক লণ্ঠন। তার প্রধান অংশ ছিল লম্বা লম্বা কাচের পাতের (Slide) ওপর আঁকা

রাস্তার বায়োস্কোপ

ছবি। কোন কাহিনীর ধারাবাহিক ছবি দিয়ে গল্পটা ফুটিয়ে তোলা হত। তীব্র আলো পিছনে দিলে কাচের উপর আঁকা ছবির ছায়া সামনের পর্দায় বা দেওয়ালে পড়ত। এই ছিল চলচ্চিত্রের আগেকার দিনের আমোদ।

॥ চলচ্চিত্রের আদিপর্ব ॥

সাধারণ ফটো হচ্ছে স্থির (still) চিত্র। তাতে নড়াচড়া দেখানো যায় না। তা দেখাবার জন্য ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডবলিউ. জি. হর্নার নামে একজন ইংরেজ গণিতজ্ঞ জোয়িট্রোপ (zœtrope) বা জীবনচক্র (the wheel of life) নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। যন্ত্রটি একটা ফাঁপা নলের মতো জিনিস। এর উপর দিকে ছিল ছোট ছোট কতকগুলি গর্ত করা। আর নীচের দিকে ভিতরে গোল করে পর্যায়ক্রমে একটা ছুটন্ত ঘোড়ার এক একটি ভঙ্গীর ছবি আঁকা। চোঙ ঘোরালে উপরের ফুটো দিয়ে দেখা যেত ঘোড়াগুলি ছুটছে। এটা এক রকম চোখের ধাঁধা। তা হয় এইভাবে। একটা ছবি দেখা শেষ হয়ে গেলেও তারপর এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় পর্যন্ত আমাদের চোখে তার ছায়া থাকে। ঐ সময়ের মধ্যেই যদি আর একটা ছবি চোখে পড়ে, তবে তাকে আর আলাদা ছবি বলে মনে হয় না—মনে হয় যে

আগেকার দেখা ছবিটার এটা একটা সচল রূপ। এইভাবে তাড়াতাড়ি পরপর কতকগুলি আলাদা ভঙ্গীর ছবি দেখলে গতিশীল সজীব একটি ছবি দেখছি বলে মনে হয়।

এটাই বর্তমান ছায়াছবি বা চলচ্চিত্রের আদি। এ রকম যন্ত্র আরও তৈরী হতে লাগল। এই রকম অন্য একটি যন্ত্রের নাম praxinoscope. এইসব যন্ত্র গতির ধাঁধা সৃষ্টি করে লোককে প্রচুর আমোদ দিতে লাগল।

॥ এডওয়ার্ড ময়ব্রিজ ॥

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এর সঙ্গে ফটোগ্রাফিকে জুড়ে দেবার কথা একজনের মাথায় এল। একজন বিদেশী আমেরিকার সান্‌ফ্রান্সিসকোতে থাকতেন। তাঁর নাম এডওয়ার্ড ময়ব্রিজ (Edward Muybridge). ইনি একটা পথের ধারে ২৪টি ফটো ক্যামেরা একটু তফাত তফাত সাজিয়ে দিলেন। ২৪টি ক্যামেরায় সাটার (ঢাকনা)-র সঙ্গে সুতো বেঁধে সেই সুতো টান করে রাস্তার এপাশ পর্যন্ত এনে বেঁধে রাখলেন।

এবার রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়া ছোটানো হল। ঘোড়া এক একটা সুতো ছিঁড়ে চলে যাবার সময়ে এক একটা ক্যামেরার সাটার খুলে দিয়ে যেতে লাগল আর সেই অবস্থায় ঘোড়ার ছবি ক্যামেরায় উঠে যেতে লাগল। এর ফলে ২৪টি বিভিন্ন ছবি পাওয়া গেল। এগুলি একটি ঘোড়ার ছুটন্ত অবস্থার পর পর বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি। ওই ছবি দেখে লোকে
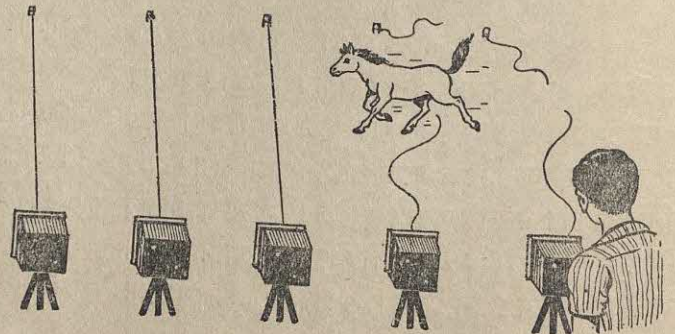
ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি তোলা

ধন্য ধন্য করতে লাগল। কিন্তু এভাবে তো দীর্ঘ ছবি তোলা সম্ভব নয়, তাতে যে হাজার হাজার ক্যামেরা লেগে যাবে! কাজেই এই পর্যন্ত এগিয়ে চলচ্চিত্রকে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হল।

প্রোজেক্টর

॥ এডিসন ॥

ইতিমধ্যে ফটো তোলার ফিল্ম (movie-film) আবিষ্কৃত হল। ইস্টম্যান ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সেলুলয়েডের ফিল্ম আবিষ্কার করে ফটোগ্রাফিতে যুগান্তর এনে দিলেন। উইলিয়ম ফ্রিজ গ্রীন (William Friese Green) নামে একজন ইংরেজ ১৮৮৫ খ্রীঃ চলন্ত ছবি তোলার ক্যামেরা উদ্ভাবন করেন। এর ফলে আমেরিকান বিজ্ঞানী টমাস এলভা এডিসন (Thomas Alva Edison—১৮৪৭-১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ) আবিষ্কার করলেন কাইনেটোস্কোপ (Kinetoscope). এই যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়ে আমরা প্রথমে দেখতে পেলুম চলন্ত ছবি, যাকে বলে চলচ্চিত্র। তাতে প্রথম ফিল্ম্ দেখানো হল যে এডিসনের সহকারী ফ্রেড অট্ ক্রমাগত-হেঁচে চলেছে।

॥ প্রোজেক্টর ॥

পর্দার উপর আগে যে ছবি পড়ত তা খুব অস্পষ্ট। ছবি স্পষ্ট করার সমস্যা সমাধানের জন্যে অনেকেই চেষ্টা করতে লাগলেন। এই অসুবিধে দূর করলেন টমাস আর্শাট তাঁর ভাইটাস্কোপ, আর রবার্ট ডবলিউ পল (Robert W. Paul) তাঁর থিয়েটারগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করে। এ হল ১৮৯৪ আর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ দুটো হল আধুনিক প্রোজেক্টর (projector) বা উৎক্ষেপণ যন্ত্রের প্রথম রূপ।
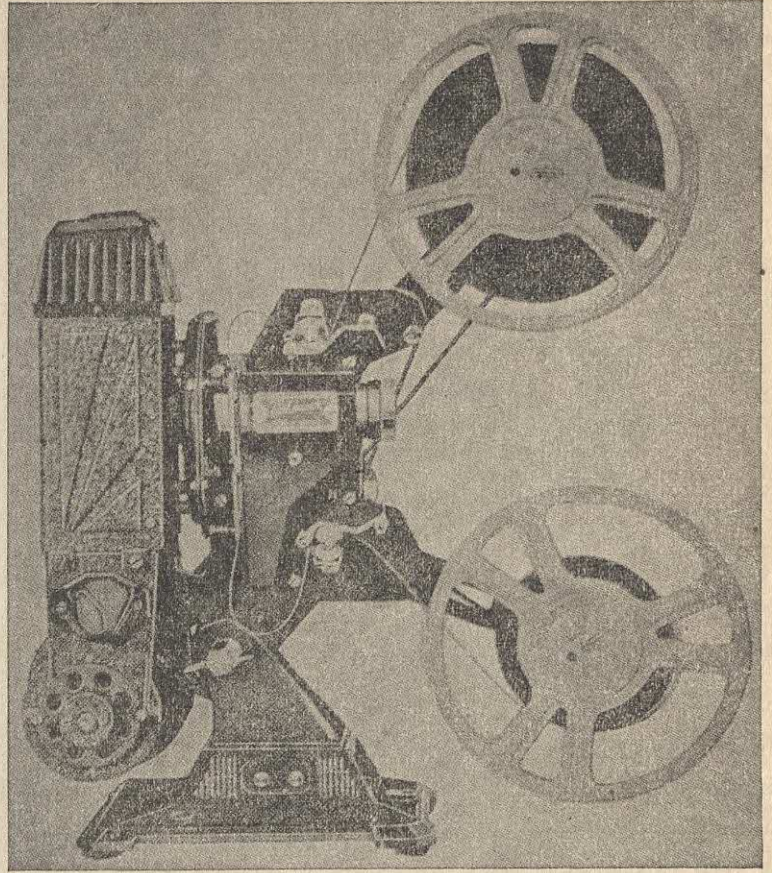
॥ প্রথম সিনেমা গৃহ ॥

এর দশ বছর বাদে যুক্তরাষ্ট্রে পিটসবার্গে হ্যারী ডেভিস প্রথম চলচ্চিত্র-গৃহ করলেন। তার নাম দিলেন নিকেলোডিয়ন (Nickelodion), কেননা তাতে প্রবেশমূল্য ধার্য হয়েছিল নিকেল ধাতুর তৈরী মুদ্রা এক সেন্ট্। তাতে যে ছবি প্রথম দেখানো হল তার নাম 'দি গ্রেট ট্রেন রবারী'। তাতে অভিনয় করেছিলেন মে মারে।

॥ ভারতে প্রথম ॥

এরপর নানা দেশে ছায়াছবি তৈরী হতে থাকে আর চিত্রগৃহে তা দেখানো হতে থাকে। ভারতে

প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতা বলে ধরা হয় দাদাসাহেব ফাল্‌কে-কে। তাঁর প্রথম ছবি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয়। এর আগে ইওরোপীয়রা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু ছবি করেছিলেন। ভারতের প্রথম সিনেমা-গৃহ হল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায়।

॥ সবাক ছবির সমস্যা ॥

চলন্ত দুনিয়ার চলন্ত রূপকে ছবিতে দেখিয়েই বিজ্ঞানীরা থামলেন না। এবার তাঁদের চেষ্টা হল শব্দভরা জগতের বিচিত্র সব শব্দও কি করে ছবি দেখানোর সঙ্গে শোনানো যায়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফনটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে লিয়োঁ স্কট শব্দ-তরঙ্গকে ধরতে পারলেন, কিন্তু সেই শব্দ-তরঙ্গকে পুনর্ধ্বনিত করতে পারলেন না। টমাস্ এলভা এডিসন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ফনোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করে শব্দ-তরঙ্গকে ধরে রাখতে ও তাকে বাজিয়ে শোনাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন তিনি কাইনেটোস্কোপ ও ফনোগ্রাফ জুড়ে মানুষকে চলতে ফিরতে ও কথা কইতে বা গান গাইতে দেখানোর কাজে কিছুটা সফল হলেন।

কিন্তু মানুষের চলাফেরা ও ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে কথা বলা বা গান গাওয়ার ঠিক মিল হচ্ছিল না। ফ্রান্সের চার্লস প্যাথে, জার্মানীর মেস্টার ও

ফিল্মে স্পেনের টলেডো শহর দেখাবার জন্য সাজিয়ে গুজিয়ে তৈরী করা দৃশ্য

ইংল্যাণ্ডের ওয়ারউইক কোম্পানি নানা চেষ্টা করেও কেউই পুরোপুরি সফল হলেন না।

শব্দকে খুব বেশী স্পষ্ট করে তোলবার জন্য ফটো-ইলেকট্রিক সেলের সাহায্যে অ্যাম্ব্রোজ ফ্লেমিং-এর 'টু এলিমেণ্ট ভ্যাকুয়াম টিউব', আর ডক্টর লী ফরেস্টের উদ্ভাবন অডিওন মিলিয়ে তৈরী হল অ্যামপ্লিফায়ার। এই যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনিকে জোরদার করে দেবার ক্ষমতা এসে গেল মানুষের হাতে।

॥ ইউজিন লস্টি ॥

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউজিন লস্টি নামে এক ইংরেজ শব্দ-তরঙ্গকে ফিল্মের উপর রেকর্ড করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেললেন। ছবি ও শব্দ দুইই এক সঙ্গে ফিল্মের উপর ধরা পড়ার ফলে উভয়ের নিখুঁত মিল হয়ে গেল। একে বলে synchronize বা সমলয় করা।

ইতিমধ্যে নির্বাক্ চলচ্চিত্রের বাজারে মন্দা পড়ে এসেছে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ ভীটাফোন কর্পোরেশন ও আমেরিকার ওয়ার্নার ব্রাদার্স মিলে প্রথম সবাক্ ছবি (talkie) আমদানি করলেন—'দি জাজ-সিঙ্গার' (The Jazz-Singer). চলচ্চিত্রে এল এক নতুন যুগ। কারও কারও মতে প্রথম সবাক্ চিত্র হল 'দি সিঙিং ফুল' (The Singing Fool).

॥ ছবি তোলার কায়দা-কানুন ॥

ছবি তোলার কাজ এখন পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত অর্থকরী একটি ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক কোম্পানি এই ব্যবসায়ে নেমে পড়েছেন। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রচুর টাকা দিতে হচ্ছে। তা ছাড়া রয়েছেন প্রোডিউসার বা প্রযোজক। সিনেমার গল্প যিনি লেখেন তাঁকে বলে সিনারিও-রাইটার। তাঁকেও বহু টাকা দিতে হয়। এ ছাড়া যাঁরা গান করেন তাঁরাও প্রচুর টাকা নেন। গান গাওয়ারও দর ও কদর আছে। তার উপর রয়েছেন ফটোগ্রাফার। এছাড়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অঙ্গসজ্জা করার জন্যে লোক থাকে, পোশাক করবার

জন্যে দরজী। তাছাড়া দৃশ্যাবলী সাজাবার জন্যে অনেক লোক দরকার হয়। তেমন তেমন ছবির জন্যে ক্যানভাসে এঁকে একটা গোটা শহরই তৈরি করে নিতে হয়। আজকাল ভাল ভাল প্রাকৃতিক দৃশ্য তোলবার জন্যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নানা মনোহর জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাজানো স্টুডিওই ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার সবচেয়ে বড় স্টুডিও হচ্ছে 'হলিউড' নামক জায়গায়। বম্বেতে এমনি স্টুডিও আছে। কলকাতায় টালিগঞ্জে অনেক স্টুডিও আছে।

॥ প্রথম বাংলা ছবি ॥

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাংলা ছবি হলো, তার নাম "বিল্বমঙ্গল"। প্রথম বাংলা টকী বা সবাক্ চিত্র দেখানো হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, তার নাম ছিল "জামাই ষষ্ঠী"।

॥ নানা রঙের ছবি ॥

সাধারণ ফটোফিল্ম থেকে যে ছবি তোলা হয় তা এক রঙের। তাতে স্বাভাবিক রং দেখা যায় না—সবই ছায়ার রঙের। যাতে স্বাভাবিক বহু রঙের ছবি তোলা যায় তার জন্যে বহুদিন ধরে চেষ্টা চলতে থাকে। একে বলে টেকনিকলার (techni-colour) ছবি। প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্ম আবিষ্কার হওয়ায় এরকম বহু রঙের ছবি আজকাল অনেক তোলা হচ্ছে।

॥ শিক্ষামূলক ছবি ॥

আজকাল জনশিক্ষার জন্যে বহু ছবি তোলা হচ্ছে। বড় বড় কলকারখানার কাজকর্ম সিনেমার পর্দায় দেখানো হচ্ছে—গভীর জঙ্গলের জীবজন্তু—তাদের হালচাল—ছোট ছোট পতঙ্গের জীবনযাত্রাও ছবিতে তুলে তা দেখিয়ে কত সহজ উপায়ে প্রাণি-বিজ্ঞান শেখানো হয়। তা ছাড়া বহু দুর্গম স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখাবারও ব্যবস্থা আছে। ফলে সিনেমার ছবি দেখে আজকাল ভূগোল শেখা যায়, এছাড়া ইতিহাসকেও জীবন্ত করে তোলা যায়। দৈনিক সংবাদপত্রের বড় বড় খবর—বিখ্যাত খেলাধুলা, বক্সিং, মল্লযুদ্ধ সবই আমরা আজ সিনেমার কল্যাণে দেখতে পাই। অ্যাকোয়েরিয়াম থেকেও ছবি তুলে ছোটদের আনন্দ ও শিক্ষার কাজে লাগানো হয়।

॥ ছবি তোলার কৌশল ॥

ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদির যে সব ছবি দেখে আমরা অবাক্ হয়ে যাই, তার বহু ছবিই স্টুডিওতে নানা কৌশলে তোলা হয়ে থাকে। মেরু অঞ্চলে বরফের উপর দিয়ে স্লেজ গাড়ি চলছে দেখে আমরা যখন অবাক্ হয়ে যাই তখন এর ভেতরের কৌশল, কি করে এ দৃশ্য তোলা হয়েছে, জানলে আমরা পরিকল্পনাকারীর বুদ্ধির তারিফ না করে থাকতে পারি না। এই রকম একটা মেরু অঞ্চলের দৃশ্য তুলতে তুষারের জন্যে ১৫ টন লবণ আর বরফের জন্যে ৮০০ পাউণ্ড প্যারাফিন মোম লেগেছিল।

ঝড় বইছে—প্রবল বাতাস—ঘরের চাল উড়ে যাচ্ছে—এ সব দৃশ্য তুলতে দরকার শুধু বুদ্ধি আর কৌশল। একটা এরোপ্লেনের প্রোপেলারকে দারুণ জোরে ঘুরিয়ে তার জোরে একটা পর্দায় আঁকা দৃশ্যটাকে কাঁপিয়ে এরকম ছবি তোলা হয়। আবার হয়তো দেখানো হল একটা চোর ২২ তলা একটা বাড়ির বৃষ্টির জলনিকাশের নল বেয়ে উঠছে। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখি। কিন্তু ছবিটা তোলার সময়ে একটা কৌশল করা হয়। মাটিতে শোয়ানো একটা বাইশ তলা বাড়ির ছবিতে আঁকা বৃষ্টির জলনিকাশের নল বেয়ে চোরটা গুঁড়ি মেরে সামনে এগুতে থাকে
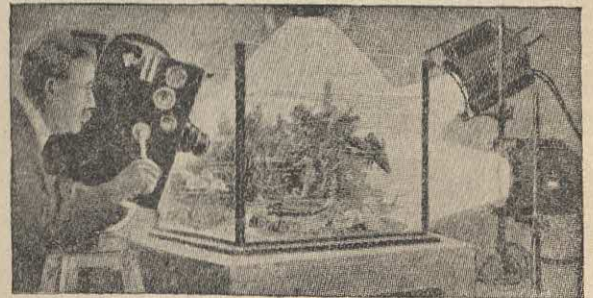
অ্যাকোয়েরিয়াম থেকে শিক্ষামূলক ছবি তোলা হচ্ছে
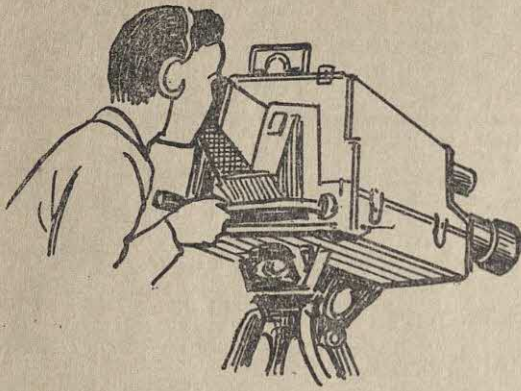
ছবি তোলা হচ্ছে

আর ক্যামেরাম্যান ক্যামেরার মুখ নীচু করে তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলতে তুলতে এগোন। এই ছবি দাঁড় করিয়ে দেখালেই আমাদের তাক লেগে যায়।

॥ ফিল্মের ছবি ডেভেলপ করা ॥

সিনেমা শিল্পের কর্মীদের কোটি কোটি ফুট ফিল্মের উপর ছবি ডেভেলপ করতে হয়। এজন্য বিরাট বিরাট সব যন্ত্রের দরকার। মেসিনের মধ্য থেকে ছবি ডেভেলপ হয়ে বেরিয়ে আসে। আর একটা বিরাট যন্ত্রে সেগুলো শুকিয়ে নিয়ে রীলে জড়ানো হয়।

॥ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কথা ॥

চলচ্চিত্রে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত অ্যাডভেঞ্চারাস ছিলেন রুডল্ফ ভ্যালেনটিনো ও ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্। হাস্যরসিক হ্যারল্ড লয়েড কাচহীন চশমা পরে কতই না মজার দৃশ্য দেখিয়েছেন! তারপর সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক এলেন চার্লি (এখন স্যার চার্লি) চ্যাপলিন। তাঁর মুখে ছোট্ট ছাঁটা গোঁফ, মাথায় আড় করে পরা টুপি, হাতে ছড়ি আর পা ঘষে ঘষে চলা দেখে কতই না হেসেছি! কিন্তু তাঁর ছবির মধ্যে হাসি ও অশ্রু ওতপ্রোত ভাবে মেশানো। আর একজনের কথা বলতেই হবে—তিনি ছিলেন মেক্-আপ্ অর্থাৎ অঙ্গসজ্জার রাজা লন চেনী (Lon Chaney). তাঁকে হাজার মুখের মানুষ (দি ম্যান উইথ এ থাউজ্যাণ্ড ফেসেস) বলে অভিহিত করা যায়। অভিনেত্রীদের মধ্যে লিলিয়ান গিশ, ডরথি গিশ, গ্রেটা গার্বো, পোলা নেগ্রী, ক্লারা বো প্রভৃতির নাম বিখ্যাত ছিল আগেকার দিনে।

কলকাতায় যাঁরা সিনেমা অভিনয়ে নাম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সীতাদেবী, পেসেন্স কুপার, উমাশশী দেবী, কাননবালা, চন্দ্রাবতী, প্রমথেশ বড়ুয়া, দুর্গাদাস ব্যানার্জি, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধামোহন ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এখনকার শিল্পীদের মধ্যে বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, সৌমিত্র চ্যাটার্জি, সুচিত্রা সেন, মলিনাদেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অপর্ণা সেন—এসব নাম সকলের জানা।

॥ কয়েকজন বিখ্যাত পরিচালক ॥

পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। এছাড়া ধীরেন গাঙ্গুলী ('ডি. জি'.), প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকীকুমার বসু, বিমল রায়, নীতিন বোস, মৃণাল সেন, নীরেন লাহিড়ী, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদারেরও পরিচালক হিসেবে বেশ নাম রয়েছে।

॥ ছবি দেখাবার পদ্ধতি ॥

ক্যামেরার সাহায্যে দ্রুত অনেক ছবি পরপর তুলে সেগুলো প্রোজেক্টর বা উৎক্ষেপণ যন্ত্রের মধ্যে আলোর

অত্যন্ত জোরে একটি এরোপ্লেনের প্রোপেলার ঘুরিয়ে এই ঘূর্ণিঝড়ের দৃশ্য তোলা হচ্ছে।

সামনে দ্রুতগতিতে একের পর এক দেখে গেলে দূরে টাঙানো পর্দায় আমরা সিনেমার ছবি দেখতে পাই। যে ফিল্মগুলোর সাহায্যে গতিশীল ছবি দেখানো হয় সেগুলো এক একটা অনড় ছবি—চলার বিভিন্ন ভঙ্গী পরপর একে একে ছবিতে ওঠে। প্রত্যেকটা কিন্তু অনড়। দ্রুত পর্যায়ক্রমে দেখালে গতিশীল বলে মনে হয়। সিনেমা ক্যামেরায় প্রতি সেকেণ্ডে ২৪টি আলাদা ছবি ওঠে। দ্রুত দেখানোর ফলে ওরা পরপর মিশে যায় ও আমরা চলন্ত ছবি দেখি।

॥ ওয়াল্ট ডিসনে ও মিকি মাউস ॥

চলচ্চিত্রের কথা বলতে গেলে মিকি মাউসের কথা বাদ দেওয়া চলে না। একদিকে যখন মানুষের অভিনয় দেখানোর জন্যে সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র জগৎ সচেষ্ট তখন শিশুদের আনন্দের এক অদ্ভুত আয়োজন করে বসলেন একজন খেয়ালী শিল্পী। তাঁর নাম ওয়াল্ট ডিসনে (Walt Disney—১৯০১-১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

তিনি সত্যিকারের জীবন্ত মানুষ বা জীবজন্তুদের ছেড়ে তাঁর আঁকা ছবির সাহায্যে চলচ্চিত্রের গল্প সাজাতে বসলেন। আধুনিক ক্যামেরা ও তার সব সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করেও তিনি যেন ফিরে গেলেন সেই আদ্যিকালের জোয়িট্রোপের যুগে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র হল মিকি মাউস আর মিনি মাউস। এরা সত্যিকারের ইঁদুর নয়। আঁকা চিত্র মাত্র। এই সব আঁকা ছবি ক্যামেরায় তুলে তিনি অতি যত্নে এক মজার অথচ নতুন ধরনের শিল্প সৃষ্টি করে পৃথিবীর লোকদের স্তম্ভিত করে দিলেন।

যে ভদ্রলোক জোয়িট্রোপ করেছিলেন তিনি একটা ঘোড়ার ছোটার পরপর ভঙ্গীগুলো এঁকে ছবিগুলো দ্রুত ঘুরিয়ে ছুটন্ত ঘোড়া দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। মিকি মাউস ছবির স্রষ্টাকর্তা ওয়াল্ট ডিসনে এই পদ্ধতিতে ছবি তুলেছেন। মিকি মাউসে এমনি লাখ লাখ আঁকা ছবি পরপর সাজিয়ে ক্যামেরায় উঠিয়ে প্রোজেক্টরের সাহায্যে চলমান ছবি দেখানো হয়।
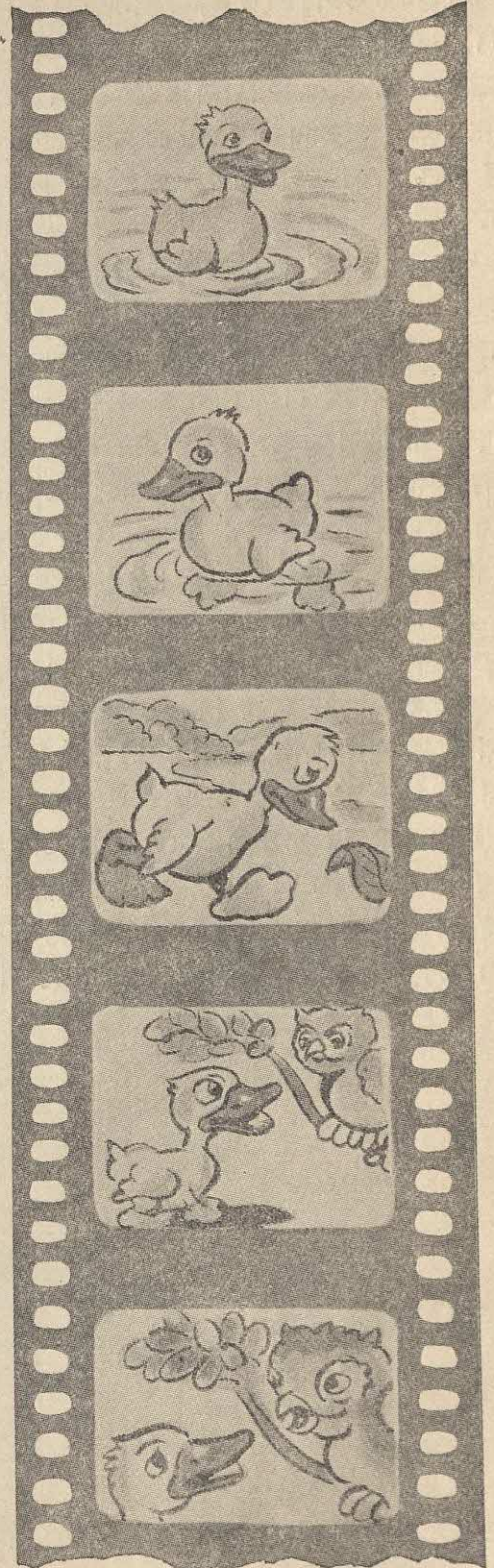
মিকি মাউসের ছবিতে ডোনাল্ড ডাক

প্রত্যেকটি ভঙ্গীর জন্যে অনেকগুলো ছবি আঁকতে হয়। একটা সিনেমা ছবির উপযুক্ত চিত্র আঁকতে ৩০০ চিত্রকরকে ৩ বছর পরিশ্রম করতে হয়। ওয়াল্ট ডিসনে এক জায়গায় বলেছেন যে যদি তাঁকে একা এই সব ছবি আঁকতে হত তো তাঁর ২৩০ বছর সময় লেগে যেত।

কাজটা খুব সহজ নয়। একটু নড়ার ভঙ্গী দেখাতে ডজন খানেক ছবি আঁকতে হয়। দৃশ্যটি সাজাবার সময়ে ঘরের আসবাব বা পটভূমি এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে জীবন্ত ছবিটির সঙ্গে আশপাশের দৃশ্য জড়িয়ে না যায়। প্রত্যেকটি ভঙ্গীর সঙ্গে পরবর্তী ভঙ্গীর সামান্য তফাত থাকে। চলাটা একটু একটু করে অনেক ছবিতে এঁকে দেখাতে হয়। তারপর সব মিলিয়ে ফুটে ওঠে একটা গতি।

এই সব ছবি আঁকা বড় কঠিন। এই ছবি আঁকার জন্যে একটা পদ্ধতি বার করেছেন ডিসনে। একটা ছবির সঙ্গে পরবর্তী ছবির মিল করার জন্যে তলায় ইলেকট্রিক বাতি জ্বালা একটা কাচের টেবিল ব্যবহার করা হয়। আগেকার ছবিটা তার উপর রেখে তার যে রেখা আলোর সাহায্যে ফুটে ওঠে তার সঙ্গে হুবহু মিল করে পরের ছবিটা আঁকতে হয়। তার সঙ্গে তফাতটুকু শুধু যোগ হয়। এক সিরিজ ছবি আঁকতে হলে সেলুলয়েডের সীটে তাদের ট্রেস করে নিয়ে রং লাগাতে হয়। সবশেষে সেগুলো পরপর সাজিয়ে ক্যামেরার সাহায্যে ফটো তোলা হয়।

ছোটখাট এমনি একটা ফিল্ম তুলতে ৯ মাস থেকে এক বছর সময় লেগে যায়।

॥ ডিসনে ল্যাণ্ড ॥

এইভাবে 'জীবন্ত ছবি' (animated pictures) উদ্ভাবন করা ছাড়াও আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার করে গিয়েছেন ওয়াল্ট ডিসনে। সেটা হলো ডিসনে ল্যাণ্ড (Disney Land) নামে প্রকাণ্ড একটি রূপকথার বাগান। আমেরিকার লস্ এন্‌জেলিস্ শহরের কিছু দূরে প্রায় ১০৫ একর জমির ওপর কয়েক কোটি টাকা খরচ করে এই বাগানটি করা হয়। এর মধ্যে কেল্লা, মাঠ, নদী, পুকুর, বন ইত্যাদি তৈরি করে রূপকথার আর অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের নানা মানুষ, জীবজন্তু আর জিনিস যেটি যেখানে থাকবার, সেটিকে সেখানে রাখা হয়েছে। যেমন—পরী, জলদস্যু, কুমীর, হিপ্পো, গণ্ডার। আবার এর মধ্যে ঘুরে বেড়াবার ক্ষুদে রেল লাইন, জলে সেকেলে চাকাওয়ালা ক্ষুদে জাহাজ ইত্যাদি কত কী যে আছে, কী বলব! ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এটা প্রথম খোলা হয়। এটা ছোটদের আর বড়দেরও একটা দেখবার মত জায়গা।

॥ গোড়ার কথা ॥

ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, গান গাওয়া—এ সবের আগেই মানুষ নাচতে শিখেছিল। আদি মানুষ শিকার থেকে ফিরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে গুহার সামনে নাচ শুরু করত। প্রথম যুগে সে নাচ ছিল এলোমেলো—শুধুই আনন্দের প্রকাশ। ক্রমশঃ এই নাচের সঙ্গে এল তাল মান আর বাজনা। তারপর সাজসজ্জা, মুখোশ ইত্যাদির চলন হল। সব দেশেই এইভাবে নৃতকলার শুরু। একটু সভ্য হলে মানুষ দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবলি দিত। দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এই পশুবলির সঙ্গে নৃত্যের প্রথা প্রচলিত হল।

॥ নৃত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ॥

নৃত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য দেহভঙ্গীর সাহায্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি। আদিম মানুষ যখন জীবনযাত্রা নির্বাহের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াত তখন তাদের স্বভাবজাত আনন্দের অনুভূতি তারা নৃত্যে প্রকাশ করত। ভাষা তখন আকার পায় নি। গলায় শুধু একটু সুর এসেছে, আর পায়ে এসেছে তাল। এ নাচ মিমিক্রি (mimicry) বা অনুকরণ। আরিস্টটলের মতে শিল্পসৃষ্টির এটাই আদি প্রবৃত্তি।

॥ প্রাচীনকালের নৃত্য ॥

প্রাচীনকালে ইগরট্ জাতির মধ্যে 'বিজয় নৃত্য' প্রচলিত ছিল। এ বিজয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে, হিংস্র জীবজন্তুর বিরুদ্ধে বা শত্রুদলের বিরুদ্ধে। এসব প্রস্তরযুগের আগের কথা।

এই নৃত্য ক্রমশঃ শিকার-নৃত্য, যৌথ সমর-নৃত্য ইত্যাদি রূপ পরিগ্রহ করে। অনেক আদিম জাতির মধ্যে মৃত্যুর সময়ে ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে শোক প্রকাশ করার জন্যে একরকম নৃত্যের প্রচলন ছিল।

প্রাচীন মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত নৃত্যমূর্তি

প্রাচীন মিশর, আসিরিয়া ও ভারতের মন্দির-গুলির ধ্বংসাবশেষ ভাল করে লক্ষ্য করলে এই সব মন্দিরে পুরোহিত ও দেবদাসীদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। দেবদাসী প্রথার সূচনা প্রাচীন মিশরে—সেখান থেকে গ্রীস, রোম ও ভারতে এ প্রথা ছড়িয়ে পড়ে। মন্দিরে দেবতার সামনে নাচবার জন্য নির্দিষ্ট নর্তকীদের বলা হয় দেবদাসী। এরা শুধু মন্দিরেই নাচতো।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে (বর্তমানে পাকিস্তানে) সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জো-দারোতে ও পাঞ্জাবে হরপ্পায় ৫০০০ বছর আগেকার যে সব দেবদাসী ও নর্তকীর ভগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে বহু বাদ্যযন্ত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এসব থেকে বেশ অনুমান করা যায় যে সেখানে দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল।

॥ ইওরোপীয় নৃত্য-কলা ॥

ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন গ্রাম্যনাচ মরিস (morris) ও স্কটল্যাণ্ডের তরবারি নৃত্য এখন একেবারে উঠে গেছে। সেস্থান অধিকার করেছে সামাজিক 'বল' নৃত্য। একা একা নাচের মধ্যে স্টেপ ডান্স্ (step dance), জিগ্ আর ইন্‌পাইপও কিছু কিছু এখনও চলে। যুগ্ম নৃত্য (মানে দু'জনে মিলে নাচ) রূপে ওয়াল্জ্, ফক্সট্রট্, ওয়ান স্টেপ ইত্যাদি কতকটা আধুনিক। গ্রাম্য নৃত্য হিসেবে চতুষ্কোণ (square) নৃত্য খুব প্রাচীন। তাছাড়া কোয়াড্রিল, রীল, মাজুরকা ইত্যাদিও খুব প্রচলিত। ১৭শ-১৮-শ শতাব্দীতে মিনুয়েট, গ্যাভোটিজ, কোটিলিয়ান ইত্যাদি প্রচলিত

রুশ নর্তকী আনা প্যাভলোভা ও ভারতীয় নর্তক উদয়শংকর

ছিল। বর্তমান কালে ট্যাংগো বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আর আধুনিক উদ্দাম নৃত্য হচ্ছে 'টুইস্ট', 'শেক' ইত্যাদি। এগুলি সামাজিক নৃত্য হিসেবে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

॥ ব্যালে ॥

বর্তমান ইওরোপে যা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা হচ্ছে ব্যালে (ballet) নৃত্য। এককালে এই নৃত্য গ্রীসে ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গ ছিল। রোমানরা তাঁদের মূক অভিনয়ে ব্যালের ব্যবহার করতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে এ নৃত্য খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অপেরাতে (opera) এই নাচের বেশী ব্যবহার হত। এ নাচের বৈশিষ্ট্য হল আবেগপূর্ণ অঙ্গ-সঞ্চালন। রাশিয়ায় এ নাচের খুব আদর। রাশিয়ান নৃত্যশিল্পী আনা প্যাভলোভা (১৮৮৫-১৯৩১ খ্রীঃ) এই নাচ দেখিয়ে জগৎজোড়া যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষেও নাচ দেখাতে এসেছিলেন। ভারতীয় নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের (জন্ম ১৯০০ খ্রীঃ) সঙ্গেও তিনি কয়েকটি নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

॥ ক্যাবারে ॥

বর্তমানে হোটেল, রেস্তোরাঁয় অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্যে একপ্রকার নৃত্যের চলন হয়েছে। এ নাচকে জিম্‌নাস্টিকও বলা যায়। এর অদ্ভুত কৌশল ও অঙ্গভঙ্গী এক প্রকার তরল আমোদ পরিবেশন করে। এটা প্রধানতঃ উদ্দাম প্রকৃতির নাচ।

॥ ভারতীয় নৃত্য ॥

ভারতীয় নৃত্যের উদ্দেশ্য ইওরোপীয় নৃত্যের ন্যায় শুধু আনন্দ করা ও আনন্দ দেওয়া নয়। এর মধ্যে ভারতের আত্মার পরিচয় মেলে। ভারতের ধর্ম, দর্শন, চিত্র, সংগীত সব কিছুর মধ্যেই অন্তরের চিন্তা স্থান পেয়েছে।

নৃত্য সম্বন্ধে ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র একখানি বহু প্রাচীন বই। মহামুনি ভরতের মতে শিব হচ্ছেন স্বয়ং নটরাজ। শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করে কালিয়নাগকে দমন করেন ও গোপিনীদের সঙ্গে রাসনৃত্যে মেতে থাকেন। এই সব নৃত্য নানা অঞ্চলে আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রভাবে নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। এগুলি হচ্ছে ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য। এর চারটি প্রধান ধারা—ভরত নাট্যম্, কথাকলি, মণিপুরী ও কথক। লাস্য নৃত্য বলে মেয়েদের নাচের ভঙ্গীকে, আর পুরুষের নাচ হল তাণ্ডব।

॥ ভরতনাট্যম্ ॥

দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর হচ্ছে এই নৃত্যের উৎপত্তিস্থান। এই নৃত্যের মধ্যে মাধুর্য ও সৌন্দর্য এসে একে কোমল ও মনোহর করে তুলেছে। এ নাচের সঙ্গে গান আছে। নাচ আর গান ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। একটা থেকে আর একটাকে তফাত করা সম্ভব নয়। এতে নৃত্যকলা ও অভিনয় কলা মিশে এক হয়ে গেছে। 'ভরত' কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। (ভ=ভাব; র=রস; ত=তাল।) এই ভাব, রস ও তালের আদ্যক্ষর নিয়ে ভরতনাট্যম্। আসলে এই নৃত্যানুষ্ঠান ঈশ্বরের আরাধনা ছাড়া আর কিছু নয়। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান হল ঘাড়, কাঁধ, হাত ও চোখের নানাপ্রকার সঞ্চালন।

॥ কথাকলি নৃত্য ॥

কথাকলি নৃত্যের জন্ম দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে। এ নৃত্যে নাচের চেয়ে অভিনয়ই প্রধান। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ থেকে এর বিষয়বস্তু নেওয়া হয়। সমান দক্ষতার সঙ্গে চলে নৃত্য ও অভিনয়। যা কিছু প্রকাশ সব মুখভঙ্গী ও হাতের মুদ্রা দ্বারা করতে হয়। আবহ সংগীত এর অপরিহার্য অঙ্গ। সব মিলে এক মাধুর্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দু'জন কণ্ঠসংগীত গায়, তিনচারজন যন্ত্রসংগীত বাজায়। তার সঙ্গে চলে নৃত্য ও অভিনয়। এতে

সাজপোশাক ও প্রসাধনের খুব জাঁকজমক আছে।

॥ মণিপুরী নৃত্য ॥

মণিপুরীদের বিখ্যাত নাচ হল "লাই হারাওবা"। এটি শিব ও পার্বতীর মিলন নিয়ে রচিত। এই নাচের তিনটি স্তর। মণিপুরী নৃত্যে সাহিত্য, সংগীত আর নৃত্যকলার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এতে একরকম আশ্চর্য শিল্পসুষমা দেখা যায়। এই নাচের দু'টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা হচ্ছে মন্দিরা নৃত্য ও চোদ্দমাদল। মণিপুরী নাচ সাতদিন ধরে চলে।

॥ কথক নৃত্য ॥

এই নাচের উৎপত্তি-স্থান ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে। একে কাব্যাভিনয়ও বলা হয়ে থাকে।

কথাকলি নৃত্যের সজ্জা

ভরতনাট্যমে শান্তা রাও

কথক নৃত্যে শিল্পী-উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী এবং মুখচোখের ভাব প্রকাশের দ্বারা একটি বিষয়কে নৃত্যের আকারে রূপায়িত করে তোলেন। কথক নৃত্যে পায়ের কাজ, তবলার বোলের সঙ্গে পায়ে বাঁধা ঘুঙরগুচ্ছের কাজ অন্যান্য নাচের চেয়ে অনেক বেশী।

॥ কুচিপুড়ি ॥

কুচিপুড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের ক্লাসিক্যাল নৃত্য। এটি অবশ্য ভরতনাট্যমের স্থানীয় রূপান্তর। কুচিপুড়ি নাচের সঙ্গে কর্ণাটক সংগীত যুক্ত হয়ে একে অতিশয়

হরপার্বতী নৃত্যে উদয়শংকর ও সিমকি

মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে। ভরতনাট্যমের সঙ্গে এর বহু সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ভঙ্গিমা অনেকটা স্বাধীন, দ্রুত ও ব্যঞ্জনাময়।

॥ ওড়িষি নৃত্য ॥

এই নৃত্যের প্রচলন উত্তর ভারতে। এর সঙ্গেও কর্ণাটক সংগীত যুক্ত হয়েছে। ভরতনাট্যমের 'ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী' এতে নেই। কোমর পিঠ ও ঘাড় নাচের সময়ে একেবারে সোজা থাকে। সেজন্যে ওড়িষি নাচে শরীরের অজস্র বাঁক ও ভঙ্গিমা তাকে সৌন্দর্যে মনোহর করে তোলে।

॥ উদয়শংকর ॥

নৃত্যশিল্পে ঝালোয়ার-প্রবাসী বাঙালী উদয়শংকর (জন্ম ১৯০০) এক বিশিষ্ট প্রতিভার অধিকারী। তিনি সবরকম নৃত্যকলা শিক্ষা করে একটা নতুন রীতির প্রবর্তন করেছেন। তিনি একজন চিত্রশিল্পী। অজন্তা, ইলোরার শিল্প থেকেই তিনি নানা ভঙ্গিমা আয়ত্ত করে নৃত্য-কলায় এক নব ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর দলে ফরাসী নর্তকী সিমকি, তাঁর বোন কনকলতা, তাঁর স্ত্রী অমলাশংকর ও ভাই দেবেন্দ্রশংকরও নৃত্য-কলায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর নৃত্যকে বলা হয় নৃত্য-নাট্য (dance-drama). সমগ্র নৃত্যটিতে একটি কাহিনী রূপায়িত হয়ে ওঠে, সঙ্গে অবশ্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গত চলতে থাকে। তাঁর গজাসুর বধ, হরপার্বতী নৃত্য, মুরলীধ্বনি ইত্যাদি নৃত্য অবিস্মরণীয়।

॥ লোক-নৃত্য (folk dance) ॥

বাঙলায় যে প্রাচীন লোক-নৃত্য প্রচলিত ছিল তা ছিল বীররসপ্রধান। তাতে স্ত্রীলোকদের স্থান ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে এসব নাচ ক্রমশঃ লাস্যপ্রধান হয়ে উঠেছে।

লোক-নৃত্য পৃথিবীর সকল দেশেই আছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের নাচে বিভিন্ন রকম ভঙ্গী।

হাত তুলে নাচের ভঙ্গী

॥ কাঠি-নৃত্য ॥

পশ্চিম বাঙলায় একদিন বহু সামন্ত রাজা, জমিদার প্রভৃতি ছিলেন। তাঁদের অধীনে লাঠিয়াল থাকত। এরা সৈন্যদের মতো লাঠিখেলা শিখত আর প্রয়োজন হলে অন্য জমিদার বা রাজার লাঠিয়ালদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জমি দখল করত। এরা বার্ষিক উৎসবে লাঠি খেলা দেখাত। কোম্পানির আমলেও লাঠিয়াল ছিল। পরে স্থায়ী সরকার গঠিত হলে লাঠিয়ালদের বিক্রম খর্ব হয়ে যায়। কিন্তু খেলাটা থেকে যায়। পরে বৈষ্ণব আমলে লাঠির বদলে কাঠি আসে এবং তারপর কাঠির বদলে আসে বাঁশি। যে খেলা ছিল বীরত্বের প্রকাশ তাই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে স্ত্রীলোকদের নিয়ে বা পুরুষদের স্ত্রীলোক সাজিয়ে গোপিনী-নৃত্য।

বিভিন্ন দেশে উপজাতিদের মধ্যে লাঠি ও কাঠি নিয়ে নানারকম নাচের প্রচলন আছে।

॥ ঢালী নৃত্য ॥

এ নাচও আগে যুদ্ধের নাচ ছিল। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার সামন্ত রাজাদের পাইকরা এ নৃত্য দেখাত। বীররস এখন আর নেই, এখন সামাজিক উৎসবে খেলার মতো এ নাচ দেখানো হয়। হাতে ঢালের বদলে চেঁচাড়ির চেঙারি ধরে এ যুদ্ধ-নৃত্য দেখানো হয়ে থাকে।

॥ নাটুয়া নাচ ॥

পুরুলিয়া জেলায় এই নাচের প্রচলন আছে। এতে যুদ্ধকালে ব্যূহরচনা ও নানা রকম যুদ্ধকৌশল দেখানো হয়। সঙ্গে ধামসা নামে চামড়ার বাদ্যযন্ত্র বাজে। বিবাহ ও সামাজিক উৎসবে এ নাচ দেখানো হয়।

॥ রায়বেঁশে নৃত্য ॥

'রায়বাঁশ' নামে একজাতের বাঁশ থেকে তৈরী লাঠি নিয়ে এক সময়ে সৈন্যরা যুদ্ধ করত। লম্বা লাঠি এক হাতে, অন্য হাতে ঢাল নিয়ে খালি গায়ে মালকোঁচা বেঁধে পাইকরা এ নাচ দেখাত। এ নাচ এখন বীরত্বপূর্ণ নাচ নেই, কিন্তু এতে হাঁকডাক, লাফঝাঁপ আছে অনেক। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক এবং সরোজনলিনী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশে নাচকে তাঁর দলে স্থান দিয়েছেন।

দক্ষিণ সাগরের দ্বীপের অধিবাসীদের নৃত্য

জাঁকজমকপূর্ণ বেশভূষা পরে জাপানীদের নৃত্য।

নৃত্যকলার কথাঃ

[জাঁকজমকপূর্ণ বেশভূষা পরে
জাপানীদের নৃত্য]

জাপান এশিয়া মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র। জাপানের লোকদের বলা হয় জাপানী। অন্যান্য দেশের মতো জাপানীরাও বেশ নৃত্যপ্রিয়। এখানে যে দুটি ছবি দেখা যাচ্ছে, তাতে জাপানীরা যে নৃত্যকালে জাঁকজমকপূর্ণ বেশভূষা পরে তা বোঝা যাচ্ছে। নাচের সময় জাপানীরা বহু ক্ষেত্রে মুখোশ এবং লম্বা হাতাওয়ালা জামা পরে।

প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একজন বসে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে, একজন জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে নৃত্য করে চলেছে। তার হাতে একটি পাখা। দূরে দেখা যাচ্ছে একটি প্যাগোডা অর্থাৎ বৌদ্ধমন্দির।

দ্বিতীয় ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, কাবুকী নর্তক-নর্তকী থিয়েটারে নাচ দেখাচ্ছে। কাবুকীদের নাচ সারা জাপানে দেখা যায়।

এখানেও দেখা যাচ্ছে, নর্তকের হাতে একটি পাখা। নর্তক-নর্তকী—দুজনেরই বেশভূষা জাঁকজমকপূর্ণ।

রঙ্গমঞ্চের মাত্র একাংশই ছবিতে দেখা যাচ্ছে। দর্শকদের আসনসমেত গোটা রঙ্গ-ভবন দেখা যাচ্ছে না।

॥ জারী নৃত্য ॥

পূর্ব বাঙলায় (বর্তমান বাংলাদেশে) মুসলমানরা কারবালা যুদ্ধের বৃত্তান্ত নিয়ে জারী গান ও তার উপর নির্ভর করে জারী নৃত্যের প্রবর্তন করেন। এ নাচ এককালে বীররস-প্রধান ছিল। এখন বীররসের স্থানে করুণ রস এসে গেছে।

বর্মীদের নৃত্য

॥ ছৌ-নৃত্য ॥

এটি বাঙলায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বীররস-প্রধান নৃত্য। এ নাচের ধারা অব্যাহত ভাবে বয়ে এসেছে। এর কোন পরিবর্তন হয় নি। পুরুলিয়া জেলা এবং বাকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অংশে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজনের উৎসবে এ নাচ দেখানো হয়। এর মধ্যে রামায়ণ, মহাভারতের বিষয়বস্তু এসে গেছে। বিশেষ করে যেসব অংশে যুদ্ধবৃত্তান্ত প্রধান সেই সব কাহিনী নিয়ে ছৌ-নৃত্য দেখানো হয়। এই নৃত্য পুরুষদের নৃত্য। এ পদ্ধতিকে তাণ্ডব পদ্ধতি বলা হয়।

॥ অন্যান্য নাচ ॥

যে সব দেশে সাঁওতাল আছে তারা এক রকম নাচ নাচে যা আমরা সাওতালী নাচ বলে থাকি।

বর্মার ওজি (Ozi) নৃত্য

স্ত্রী-পুরুষ দল বেঁধে মাথায় লাল ফুল গুঁজে মাদল বাজিয়ে আর তার সঙ্গে বাঁশির সুর তুলে তালে তালে বৃত্তাকারে নাচে। তাদের সরল অঙ্গভঙ্গী ও মিলিত কণ্ঠে গানের সুর সমস্ত স্থানটাকে মাতিয়ে আনন্দমুখর করে তোলে।

বর্মা দেশের মেয়েরা নৃত্য খুব ভালবাসে। ভারতের প্রতিবেশী বলে ভারতীয় অনেক নাচের অঙ্গভঙ্গী ও ধাঁচ বর্মীদের নাচের সঙ্গে মিশেছে। বর্মার ওজি (Ozi) নৃত্য শুধু নিজেদের দেশেই নয় —অন্যান্য বহু দেশে বিশেষ জনপ্রিয়। বর্মার আর একটি প্রসিদ্ধ নাচ হচ্ছে 'পোয়ে' নাচ।

এরকম নিজস্ব নাচের পদ্ধতি পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে। স্পেনে ট্যাঙ্গো, আমেরিকান নিগ্রোদের জাজ্ (Jazz), হাওয়াই দ্বীপে হুলা ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ভারতেরও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ নাচ দেখা যায়। যেমন, গুজরাটে মেয়েদের গরবা, পঞ্জাবে পুরুষদের ভাংরা, বিহারের গ্রামাঞ্চলে হো-হো আর ছক্করবাজি নাচও এর মধ্যে পড়ে।

জাপানে নর্তকীদের বলে গেইশা (geisha) আর মিশরে তাদের বলা হয় আলমী।

॥ সাহিত্য কাকে বলে ? ॥

সাহিত্যের বিষয়বস্তু হল ভাব। ভাষায় তার প্রকাশ। ভাবপূর্ণ ভাষাই সাহিত্য। সুন্দর সুন্দর ভাব ভাষায় ব্যক্ত হয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হলে তাকে আমরা বলি সাহিত্য।

প্রথম যুগের সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান। গদ্যেরও যে একটা শ্রী আছে তা সৃষ্টি করতে অনেক বছর লেগেছে।

পৃথিবীর সব দেশের আদি সাহিত্য কাব্য রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। লিপি আবিষ্কার হবার পর থেকেই এর প্রকাশ, তারপর মুদ্রণ আবিষ্কারের পর থেকেই হয় এর সাধারণ্যে প্রচার।

॥ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য—বেদ ॥

ভারতের আর্যদের বই 'বেদ' হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম বই। তবে, এই বই কোনও মানুষের লেখা নয় বলেই হিন্দুদের বিশ্বাস। বেদ কথাটার মানে হল জ্ঞান। এই জ্ঞান ভগবান আর্য ঋষিদের দিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের তা মুখে মুখে শিখিয়ে দিতেন। শুনে শুনে শিখতে হত বলে এর নাম ছিল 'শ্রুতি'। বহুদিন ধরে এরকম মুখে মুখে চলবার পর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সব বেদ সংগ্রহ করে সেগুলি চার ভাগে সাজিয়ে দেন, তাই তাঁর নাম হয় বেদব্যাস। আর সেই চার ভাগের নাম হয় ঋক্, যজু, সাম আর অথর্ব। এ সব কাজ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ বছরেরও আগে হয়ে গিয়েছিল—কেউ কেউ বলেন, তারও ঢের আগে।
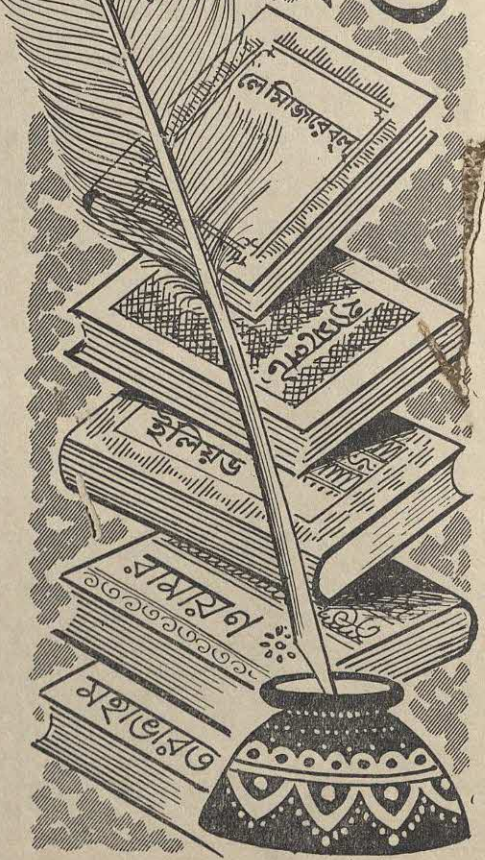
বেদগুলির মধ্য দিয়ে প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের পরিচয়টি অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তখনকার দিনের মানুষের দেবদেবীর পুজো, জীবনযাপন, সমাজের নিয়ম, খেলাধুলো ইত্যাদি অনেক কথাই বেদের মধ্যে লেখা আছে।

॥ উপনিষদ্ ॥

বেদের অংশ বলে মনে করা হয়, এমন কতকগুলো বই আছে। তাদের বলে 'উপনিষদ্'।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ছয়শো থেকে সাতশো বছর আগে ভাল ভাল সব কটি 'উপনিষদ্' রচিত হয়েছিল।

বেদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা করা হয়েছে, উপনিষদে তেমন করা হয় নি। উপনিষদে একমাত্র 'ব্রহ্ম'কে ধ্যান করা হয়েছে। এই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। ইনিই একমাত্র সত্য।

প্রধান উপনিষদ হচ্ছে ১৮ খানা। তার মধ্যে ১২ খানার নাম এইঃ—(১) ঈশ উপনিষদ্ (২) কেন উপনিষদ্ (৩) কঠ উপনিষদ্ (৪) প্রশ্ন উপনিষদ্ (৫) মুণ্ডক উপনিষদ্ (৬) মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ (৭) তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (৮) ঐতরেয় উপনিষদ্ (৯) ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (১০) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (১১) কৌষীতকি উপনিষদ্ (১২) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।

॥ সূত্র সাহিত্য ॥

বৈদিক যুগের শেষদিকে কতকগুলি বই রচিত হয়েছিল, তাদের বলে বেদাঙ্গ বা সূত্র। এ হচ্ছে ছয় রকমের। যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। বেদের বিভিন্ন বিষয়বস্তু বুঝতে ছাত্রদের সাহায্য করাই হচ্ছে এদের উদ্দেশ্য।

॥ স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র ॥

উপনিষদের পর কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যেগুলোকে বলা হয় স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র। এতে আছে

ঋষিরা বেদগান করছেন

মানুষের জীবনযাত্রা ও ধর্ম আচরণ সম্বন্ধে নির্দেশ। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, ঔশনাঃ, অঙ্গিরাঃ ইত্যাদি ১৮ জন মুনি ২০ খানা স্মৃতি লিখে রেখে গিয়েছেন। তাঁদের নাম দিয়েই তাঁদের লেখা বইয়ের নাম। যেমন, মনু লিখেছিলেন মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য রচনা করেন যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ইত্যাদি। সাধারণতঃ এগুলোকে মনু-সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ইত্যাদিও বলা হয়।

॥ পুরাণ ও উপপুরাণ ॥

এরপর আর এক রকমের সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে বলা হয় পৌরাণিক সাহিত্য। আঠারোখানি মহাপুরাণ আঠারোখানি উপপুরাণ নিয়ে এই বিশাল পৌরাণিক সাহিত্য গঠিত হয়েছিল।

এই পুরাণগুলির অধিকাংশ প্রথম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছে। প্রতিটি পুরাণে এক একজন শক্তিমান্ দেবতার আরাধনা ও মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। যেমন ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মের আরাধনা, শিবপুরাণে শিবের, অগ্নিপুরাণে অগ্নিদেবতার কথা বলা হয়েছে। এই পুরাণগুলি হচ্ছে একাধারে ইতিহাস আর ধর্ম-সাহিত্য।

॥ মহাকাব্যদ্বয় ঃ রামায়ণ ও মহাভারত ॥

রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই মহাকাব্য ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্। শত শত বছর ধরে

বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করছেন

এই দুই মহাকাব্য ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে এক আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে আসছে।

॥ রামায়ণ ॥

আদি কবি মহামুনি বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় 'রামায়ণ' মহাকাব্য রচনা করেন। পণ্ডিতরা বলেন যে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চারশো বছর আগে রামায়ণ রচিত হয়েছে।

রামায়ণের মধ্যে আছে সাতটি কাণ্ড। প্রায় চব্বিশ হাজার শ্লোকে এই মহাকাব্যটি রচিত হয়।

রামসীতার পুণ্য কাহিনী রামায়ণের উপজীব্য এবং আজো রামায়ণের কাহিনী আরো বহু কাব্যের উপজীব্য হয়ে আছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়াতে রামায়ণের ওপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুহর্ত বাল্মীকিকে তাঁদের জাতীয় কবি ও রাম-সীতাকে জাতীয় নায়ক-নায়িকা বলে ঘোষণা করেন।

তখনকার দিনে আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের বিবাদ-বিসংবাদ লেগে থাকত। রামচন্দ্র ও রাবণের যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়ে সেই সব কথাই বলা হয়েছে। বাল্মীকি তাঁর আশ্চর্য কবি-প্রতিভায় তখনকার দিনের জীবনধারা অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

॥ মহাভারত ॥

রামায়ণের মতো 'মহাভারত' ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য। এটি আকৃতিতে রামায়ণের চেয়ে অনেক বড়। এর মধ্যে আছে আঠারোটি পর্ব এবং প্রায় এক লক্ষ শ্লোক। এই সুবিশাল মহাকাব্য রচনা করেন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

পণ্ডিতদের অনুমান, যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের বর্ণনাছলে এই মহাকাব্য। এটিকে ইতিহাসও বলা চলে।

॥ হরিবংশ ও গীতা ॥

মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে আর একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটির নাম খিল-হরিবংশ। এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

এগুলি ছাড়া আর একটি গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষে অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করা হয়। তার নাম শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বা সংক্ষেপে গীতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে মহাবীর অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অপর পক্ষে আত্মীয় ও বন্ধুদের চোখে দেখে তিনি ঠিক করলেন যুদ্ধ করবেন না। তখন তাঁর সারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নানা উদাহরণ সহযোগে

ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করছেন আর গণপতি তা লিখছেন

বুঝিয়ে দিলেন যে ভগবান্ এদের আগেই মেরে রেখেছেন। অর্জুন উপলক্ষ্য মাত্র। অতএব ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে অর্জুনের আপন কর্তব্য পালন করে যাওয়া দরকার। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও নানা উপদেশ দিলেন যাকে বলা যায় হিন্দুধর্মের সার কথা। শ্রীকৃষ্ণের এই সব উপদেশ সংকলন করে গীতা রচিত হয়েছে। গীতা মহাভারতেরই অংশ। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকালে দেশ-প্রেমিক যুবকদের উপর 'গীতা'র গভীর প্রভাব ছিল।

সংস্কৃত কাব্য ও নাটক ॥

রামায়ণ ও মহাভারতের পর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মহাকবি ভাস-এর বিখ্যাত কাব্যগুলি। ভাস বোধহয় ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন।

ভাসের লেখা মোট ১৩ খানা নাটকের কথা জানা গিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'স্বপ্নবাসবদত্তা'। এতে বৎসরাজ উদয়ন ও তাঁর পত্নী বাসবদত্তার গল্প বলা হয়েছে।

ভাসের পর বিখ্যাত কবি অশ্বঘোষ। তাঁর লেখা 'বুদ্ধচরিত', 'সৌন্দরানন্দ' ইত্যাদি কাব্য প্রসিদ্ধ। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষের লোক। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাধু ছিলেন।

॥ কালিদাস ॥

অশ্বঘোষের পর এলেন কালিদাস।

সংস্কৃত কাব্য ও নাটক-রচয়িতারূপে এঁর নাম সবচেয়ে বেশী করে সবার জানা আছে। শোনা যায়, তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। গল্প আছে, প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত মূর্খ ছিলেন। পরবর্তী কালে দেবী সরস্বতীর কৃপায় ও আপন সাধনা বলে তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারের সম্মান লাভ করেন।

কালিদাস চারটি অমর কাব্য রচনা করেন। এগুলি হচ্ছে 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ', 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূত'। 'কুমারসম্ভব' কাব্যে দেবসেনাপতি কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। 'রঘুবংশ' কাব্যে সূর্যবংশের মোট ত্রিশজন রাজার ক্রিয়াকলাপের বিবরণ আছে। 'ঋতুসংহার' হচ্ছে প্রকৃতি-প্রেমমূলক কাব্য। 'মেঘদূত' খণ্ডকাব্যে নির্বাসিত যক্ষ ও তাঁর পত্নীর বিরহবেদনার করুণ সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই বইটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা।

নাটক রচনায়ও কালিদাস অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকের নাম 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'। এই নাটকের মধ্যে কণ্বমুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্তের বিবাহ-বিরহমিলনের ঘটনাবলী অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এটি ছাড়া কালিদাস আর দুটি নাটক রচনা করেন: 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ও 'বিক্রমোর্বশী'।

কালিদাসের কিছু আগে রাজা শূদ্রকের লেখা 'মৃচ্ছকটিক' নাটকখানা খুব প্রসিদ্ধ বই।

তখনকার দিনে আর যে সকল নাট্যকার ছিলেন তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান্ হলেন কনৌজরাজ শ্রীহর্ষ, ভবভূতি, ভট্টনারায়ণ, বিশাখদত্ত, রাজা যশোবর্মন, পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন ও রাজশেখর।

কনৌজরাজ শ্রীহর্ষবর্ধন 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'নাগানন্দ' নামে তিনটি নাটক রচনা করেন।

ভবভূতি হলেন কালিদাসের পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইনি সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইনি তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন। এদের নামঃ 'মহাবীর চরিত', 'উত্তর-রামচরিত' ও 'মালতীমাধব'।

কালিদাস তাঁর কাব্য রচনা করছেন

এছাড়া ভট্টনারায়ণ রচিত 'বেণীসংহার' নাটক, বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক, রাজা যশোবর্মন্ রচিত 'রামাভ্যুদয়' নাটক, মহেন্দ্রবর্মন্ রচিত 'মত্তবিলাস' নাটক, রাজশেখর রচিত চারিটি নাটক : 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা', 'কর্পূরমঞ্জরী', 'বালরামায়ণ', 'বালমহাভারত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একাদশ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণমিশ্র নামে বিখ্যাত নাট্যকার 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামে একটি রূপকধর্মী নাটক রচনা করেন।

আর্যশূর, নাগার্জুন, আর্যদেব ও অসঙ্গ—এই চারজন কবি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতা... মধ্যে জীবিত ছিলেন। আর্যশূরের কাব্যগ্রন্থের নাম : 'জাতকমালা'। নাগার্জুন 'মধ্যমকারিকা' ও 'সুহৃল্লেখ' নামে দু'টি কাব্য রচনা করেছিলেন। আর্যদেবের কাব্যের নাম 'চতুঃশতিকা'। অসঙ্গের কাব্যগ্রন্থ : 'মহাযান সূত্রালংকার'।

জয়দেব

আর দু'জন বিখ্যাত কবির নাম হল : ভারবি ও মাঘ। ভারবি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ : 'কিরাতার্জুনীয়ম্'। মাঘের কাব্যগ্রন্থের নাম 'শিশুপালবধ'।

মাঘের সমসাময়িক কবি ভট্টি 'ভট্টিকাব্য' রচনা করে যশোলাভ করেন। শোনা যায়, মুখ্যতঃ ব্যাকরণ শেখাবার জন্যই নাকি এটি রচিত হয়েছিল—কিন্তু কবিত্বের গুণে তা স্থায়ী কাব্য-সাহিত্যের রূপ পেয়েছে।

কাহিনী-কাব্য ছাড়া গীতিকাব্যও তখনকার কা... বেশ কিছু লেখা হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীর ক... ভর্তৃহরি 'শৃঙ্গারশতক', 'নীতিশতক' ও 'বৈরাগ্যশত... নামে তিনখানি কাব্য রচনা করেন। রাজা ল... সেনের সভাকবি জয়দেব (খ্রীঃ ...২শ শতা... সুললিত ছন্দে 'গীতগোবিন্দ' নামে কাব্য ...এর করে যুগযুগ ধরে ভারতবাসীর ...য়েছে। আসছেন।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে ...তবর্ষে প্রাচীনকালে রচিত হয়েছি... তা... নাম কহ্লন রচিত 'রাজতরঙ্গিণী' ...খ্যা... ক্ষেত্রের বিখ্যাত। এর মধ্যে কাশ্মীরের ...উপস্থিত কাব্যাকারে বর্ণিত। এছাড়া ... বন্ধুদের 'গৌড়বহ', সন্ধ্যাকর নন্দীর ...। তখন সোমেশ্বর দত্তের 'কীর্তি-কৌমুদী' ...যোগে ঐতিহাসিক কাব্যগুলিরও নাম ক... পারে।

॥ প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস ॥

সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য ছিল প্রধানতঃ পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেশের সাধারণ লোকের জন্য ছিল 'প্রাকৃত' ভাষা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। যেমন মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, বাঙলাদেশে মাগধী প্রাকৃত। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম শাস্ত্রগুলির অনেকাংশই প্রাকৃতে রচিত। অনেক সংস্কৃত নাটকে সাধারণ

লোকের কথাবার্তায় ও মেয়েদের কথাবার্তায় প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এমন কি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকেও এরকম আছে।

সাতবাহন বংশীয় রাজপুত্র হাল চতুর্থ শতকে 'গাথাসপ্তশতী' নামে একখানি [illegible]াব্যগ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন। গুণাঢ্য নামে একজন কবি 'বৃহৎকথা' নামক কাব্যগ্রন্থ [illegible]তার পৈশাচ ভাষায় রচনা করেন।

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে [illegible]নকগুলি প্রাকৃত গ্রন্থও রচিত [illegible]য়েছিল।

[illegible]পালি সাহিত্যের কথা [illegible]

[illegible]পালি' হ[illegible] তখনকার অশিক্ষিত লোক ও [illegible]দের ক[illegible] ভাষা। অধিকাংশ বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ [illegible]য় রচিত। প্রধান পালি গ্রন্থটির নাম [illegible] সূত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম এর এই তিনটি [illegible]

[illegible] শতাব্দী থেকে পালি ভাষা ধীরে ধীরে [illegible]কে পরবর্তী কালে এই ভাষা একেবারে [illegible] হয়ে যায়।

বাঙলা সাহিত্য

[illegible] যুগ ঃ চর্যাপদ ॥

[illegible]া ভাষায় সবচেয়ে পুরোনো যে পুঁথির সন্ধান [illegible] গেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' [illegible]ংক্ষেপে চর্যাপদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩২ খ্রীঃ) নেপাল রাজদরবারের পুঁথিপত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে এই বাংলা পুঁথি আবিষ্কার করেন। এর মধ্যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ বা কবিতা আছে। প্রায় তেইশজন বৌদ্ধ সহজিয়া কবি এই সকল পদ রচনা করেছিলেন। এই পদগুলির মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম সম্পর্কে নানা কথা বলা হয়েছে। হাজার বছর আগেকার বাঙলা দেশের নানা বর্ণনা, বাঙালীদের আচার-আচরণ প্রভৃতির পরিচয়ও এর মধ্যে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পদগুলি এই পুঁথিতে সংকলিত হয়েছিল। এর ভাষা এইরকম ঃ

> কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
> চঞ্চল চিএ পইঠো কাল॥
> দিট করি অ মহাসুহ পরিমাণ।
> লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ॥

॥ মধ্যযুগ ॥

[illegible]দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত সময় [illegible] বাঙলা সাহিত্যের আদি যুগ। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হচ্ছে মধ্যযুগ।

মধ্যযুগের প্রথম বই যা পাওয়া গিয়েছে, তা ছেঁড়া-খোঁড়া বলে তাতে তার নাম পাওয়া যায় নি। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে বই বলে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এর লেখক বড়ু চণ্ডীদাস।

মধ্যযুগের সাহিত্য সত্যই বিরাট। এই যুগে বিভিন্ন ধর্মে নানা বিষয় নিয়ে বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যকে প্রধানতঃ পাঁচটি শাখায় ভাগ করা হয়ঃ ১। মঙ্গলকাব্য সাহিত্য ২। অনুবাদ সাহিত্য ৩। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য ৪। চৈতন্য-জীবনী সাহিত্য ৫। শাক্তপদ সাহিত্য।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

॥ মঙ্গলকাব্য সাহিত্য ॥

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে কতকগুলি দেবদেবীকে নিয়ে তাঁদের মাহাত্ম্যসূচক কাব্য রচিত হয়েছিল। দেবদেবীর উপাখ্যানমূলক এই কাব্যগুলোকে বলা হয় মঙ্গলকাব্য। তার মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিই প্রধান। তাছাড়া শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল ইত্যাদি নানারকম মঙ্গলকাব্যও ছিল।

॥ মনসামঙ্গল ॥

সর্পের দেবী মনসাকে নিয়ে যে কাহিনী রচিত হল, তার নাম মনসামঙ্গল কাব্য। এর মধ্যে চাঁদ সওদাগর ও মনসার বিবাদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। চাঁদ সওদাগর ছিলেন খুব তেজস্বী। তিনি শিবের ভক্ত ছিলেন, কিছুতেই মনসাকে দেবী বলে স্বীকার করবেন না। মনসা রেগে গেলেন। তিনি চাঁদের ছেলেদের মেরে ফেললেন। চাঁদও নানা বিপদে পড়লেন। তাঁর ছোট ছেলে লখীন্দর বিয়ের রাত্রে সাপের কামড়ে মারা গেলেন। লখীন্দরের পত্নী বেহুলা একা একা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেলায় চড়ে যাত্রা করলেন। অনেক দুঃখকষ্টের পর তিনি দেবতার কৃপায় স্বামীকে বাঁচিয়ে ঘরে ফিরলেন। দেবতাদের অনুরোধে বেহুলা চাঁদকে মনসার পূজা করতে রাজী করালেন।

বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেলায় চড়ে যাত্রা করলেন

অনেক কবি মনসামঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত, হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস এবং দ্বিজ বংশীদাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

॥ চণ্ডীমঙ্গল ॥

চণ্ডীদেবীকে নিয়ে যে মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছিল, তাকে বলা হয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। যে সকল কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। এতে প্রথমে [illegible] কালকেতুর, আর তারপর ধনপতি সওদাগরের কাহিনী আছে।

॥ ধর্মমঙ্গল ॥

ধর্মঠাকুর হচ্ছেন রাঢ় অঞ্চলের দেবতা। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তন করে যেসব মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছিল, তাদের নাম হল ধর্মমঙ্গল। এর কাব্যের মধ্যে লাউসেন নামে একটি যুবকের [illegible] বীরত্বের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ধর্মমঙ্গল [illegible]তবর্ষে [illegible] কবিদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী, মাণিকরাম [illegible] নাম [illegible]রাম চক্রবর্তী প্রভৃতি বিখ্যাত। [illegible] ক্ষেত্রের [illegible] উপস্থিত [illegible] বন্ধুদের

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে [illegible]। তখন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে সংস্কৃত পুরাণ মহাকা[illegible] যোগে বাঙলায় অনুবাদ করা হল। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত হল এই শ্রেণীর অনুবাদ সাহিত্য।

বাল্মীকির রামায়ণের কাহিনী [illegible] পদ্যে লিখলেন চতুর্দশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস ওঝা (১৩৮৫-১৪৪৪ খ্রীঃ)। তাতে তিনি এমন কথাও লিখেছেন যা বাল্মীকি লেখেন নি।

এরপর কবি কাশীরাম দাস ১৭শ শতাব্দীতে বাংলায় পদ্যছন্দে মহাভারত লিখলেন। তিনি খানিকটা লিখে মারা গেলে তাঁর ভাইপো নন্দরাম বাকীটা লেখেন। তবু একে কাশীরাম দাসের মহাভারতই বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত

কীর্তনরত চৈতন্যদেব

...বিজয়' ... লিখেছিলেন ১৪৭০- ...ধর বসু। তাঁর উপাধি ছিল
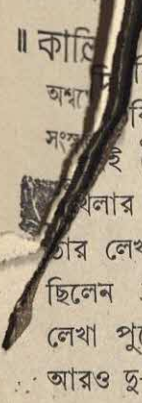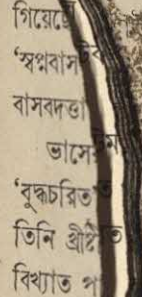
॥ ... পদাবলী সাহিত্য ॥

... সম্প্রদায়ের দেবতা। রাধা আর ... লীলা নিয়ে অনেক কবি অপূর্ব বৈচিত্র্য ... করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা ... মূল্য সম্পদ্।

... পদাবলী রচয়িতাদের মধ্যে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস ... বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে ... বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস (১৪১৭-১৪৭... খ্রীঃ), ...ই চৈতন্যদেবের আগেকার কবি। বিদ্যাপতি ...থিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। ...ার লেখার ভাষা একটু অন্যরকম ছিল। চণ্ডীদাস ছিলেন বীরভূমের নান্নুর গ্রামের লোক, তাঁর লেখা পুরোপুরি বাংলা। চণ্ডীদাস নামে ইনি ছাড়া আরও দু-একজন কবি ছিলেন।

॥ চৈতন্য জীবনী সাহিত্য ॥

চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীঃ) বাল্যনাম ছিল নিমাই। বড় হয়ে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং বাঙলাদেশে, উড়িষ্যায় ও দক্ষিণ ভারতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসা ছিল তাঁর জীবনধর্ম।

চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বন করে অনেক কবি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৫১৭-১৬১৬ খ্রীঃ) তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর লেখা 'চৈতন্য-চরিতামৃত'র মত বই বাংলায় কমই আছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, আর গোবিন্দদাসের কড়চা।

॥ শাক্ত পদাবলী সাহিত্য ॥

শক্তির দেবতা কালিকা ও দুর্গাকে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে এক রকম গান রচিত হয়েছিল, একে বলা হয় শাক্ত পদাবলী। হালিশহরের সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-৭৫ খ্রীঃ) শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত গান পল্লীগীতির মত সর্বত্র গীত হয়।

॥ উইলিয়ম কেরী ॥

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রীঃ) শ্রীরামপুরে ছাপাখানা করলেন। তিনি একজন খ্রীস্টান মিশনারী ছিলেন। পঞ্চানন কর্মকার

উইলিয়ম কেরী

সেই ছাপাখানার অক্ষর খোদাই করতেন। সেইখান থেকে বাইবেলের অনুবাদ ছাপা হতে লাগল।

কেরীসাহেব দেশী পণ্ডিতদের দিয়ে বাঙলা বই লিখিয়ে সেগুলি প্রচার করতে লাগলেন। 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালা' বলে দু'খানা বই কেরীর নামে প্রকাশিত হলেও এগুলির মধ্যে পণ্ডিতদের হাত আছে বলে মনে হয়। কেরী ইংরেজীতে বাঙলা ব্যাকরণ ও বাঙলা-ইংরেজী অভিধান প্রকাশ করেন। তাঁর উদ্যোগে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ বাল্মীকি রামায়ণ প্রকাশিত হয়।

॥ রাজা রামমোহন রায় ॥

মিশনারীরা 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' নামে দু'টি সাময়িক পত্র প্রকাশ করে হিন্দুধর্মের দোষত্রুটির কথা তাতে প্রকাশ করতে থাকেন। রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রীঃ) এই সব সমালোচনার উত্তর দেবার জন্য লিখতে শুরু করেন। 'বেদান্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার' ইত্যাদি বই লিখে রামমোহন বাঙলা গদ্যকে সাহিত্যের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন।

॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২৩-১৮৯১ খ্রীঃ) ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় বিরাট পণ্ডিত। তিনি বাঙলা ভাষার উন্নতির জন্যে মন দিলেন। তিনি ইংরেজী থেকে (যেমন—ভ্রান্তি-বিলাস) ও সংস্কৃত থেকে (যেমন—সীতার বনবাস, শকুন্তলা) অনুবাদ করে এবং মৌলিক রচনা করে (যেমন—বর্ণ-পরিচয়, কথামালা, আখ্যান-মঞ্জরী) বাঙলা ভাষাকে রূপ দিতে লাগলেন। বাক্যমধ্যে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কমা, সেমিকোলন মনসামঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন। এঁদের
তিনি ভাষাকে সহজে হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস এবং
দিলেন। এর ফলে ভা নাম উল্লেখযোগ্য।
স্পন্দন।

॥ টেকচাঁদ ঠাকুর ॥

য়ে যে মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছিল, মঙ্গল কাব্য। যে সকল কবি

টেকচাঁদ ঠাকুরের [illegible] লেন তাঁদের মধ্যে কবি-
(১৮১৪-৮৩ খ্রীঃ)। তিনি [illegible] লেখা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য
একখানা বই লিখলেন। বই [illegible] কালকেতুর, আর
[illegible] এটিকে বাংলা ভাষার [illegible] হিনী আছে।
হয়ে থাকে।

॥ প্রবন্ধ সাহিত্য ॥

দেবতা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮[illegible] বোধিনী পত্রিকা' বের করলেন। এই [illegible] হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২১-[illegible] পত্রিকায় ধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া [illegible] দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব বিষয়ে না[illegible] লাগল। অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উ[illegible] 'চা[illegible]পাঠ' (তিন খণ্ড), 'পদার্থবিদ্যা', '[illegible] লি[illegible] গদ্যরীতির অনেক উন্নতি করে[illegible] ভূদে[illegible]ন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪ খ্রী[illegible] 'পারি[illegible]রিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচা[illegible] 'সফল স্বপ্ন' ও 'স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য। এর পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো[illegible] 'বঙ্গদর্শন' নামে মাসিক পত্র প্রকাশ করে [illegible] ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পথ সুগম করেছেন।

বৈষ্ণব মঙ্গল হল ধর্মমঙ্গল এর একটি যুবক রয়েছে। ধর্মমঙ্গ রতবর্ষে মাণিকরা নাম ক্ষেত্রের উপস্থিত বন্ধুদের। তখন যোগে

॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥

অক্ষয়কুমার যে প্রবন্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি করলেন সেই পথ ধরেই এলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯ খ্রীঃ)। তিনি বিজ্ঞানের জটিল বিষয়কে সরল করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি 'চরিত কথা' গ্রন্থের ভিতর দিয়ে দেশের মনীষীদের জীবনের সার কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছেন। তাঁর লেখা 'জিজ্ঞাসা', 'বিচিত্রজগৎ',

সুন্দর ত্রিবেদী

প্রবন্ধের আদর্শ বলা যেতে

ক ॥

আইস্মিনকালে সংস্কৃত নাটক অভিনয়

ক্ত আলকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের

চীর উৎসাহে আবার নাটক অভিন

টকের প্রভাবে বাঙলাদেশে নাট্

খা গেল। ক্রমে এদেশের সাহেবদের

য়েকটি নাট্যশালা গড়ে উঠল। এখানে

ইংরেজী নাটক অভিনয় হত—দু'একটি

টকের ইংরেজী অনুবাদও এতে অভিনীত

রপর হেরাসিম লেবেডেফ (Herasim

eff) নামে একজন রুশ ভদ্রলোক দু'টি ইংরেজী

কের বাঙলা অনুবাদ একটি নাট্যমঞ্চে অভিনয়

ন। এরপর দেশীয় ভদ্রলোকরা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করে নাটক অভিনয় করাতে উৎসাহী হলেন।

এই সব রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যে বাঙলা ভাষায় নাটক লেখা হতে লাগল। তারাচাঁদ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন' পাশ্চাত্য রীতিতে লেখা প্রথম বাংলা নাটক।

॥ নাটুকে রামনারায়ণ ॥

রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা 'কুলীনকুলসর্বস্ব' বাংলা ভাষার প্রথম সামাজিক নাটক। লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল নাটুকে রামনারায়ণ। 'নবনাটক', 'যেমন কর্ম তেমন ফল', 'চক্ষুদান' ইত্যাদি বহু নাটক তাঁরই লেখা।

॥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ॥

বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ অভিনীত হয়। মধুসূদন সেই ইংরেজী অনুবাদ-কার্যে উৎসাহী ছিলেন। এরপর তিনি নিজেই বাঙলা নাটক লেখার কাজে নেমে পড়লেন। তিনি তাঁর লেখা 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ১৮৫৯ সালে বেলগাছিয়ায় অভিনয় করালেন। তারপর লিখলেন 'পদ্মাবতী নাটক' (১৮৬০)। এই নাটকে তিনি প্রথম ইংরেজী মিলহীন blank verse (ব্ল্যাঙ্ক ভার্স)-এর রীতিতে 'অমিত্রাক্ষর ছন্দের' প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। এর পর তিনি 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'মায়া-কানন' নাটক লেখেন। বাঙলা সামাজিক নাটক হিসেবে তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নানা দিক্ দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

॥ দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) ॥

'নীলদর্পণ' নাটক দীনবন্ধু মিত্রের লেখা অতি বিখ্যাত বই। এর ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন বোধ

দীনবন্ধু মিত্র

হয় মধুসূদন। নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে লেখা এই নাটক দেশে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর পরে শেষ পর্যন্ত নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীনবন্ধু এ ছাড়া 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'কমলে কামিনী', 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' প্রভৃতি নাটক লিখেছিলেন। 'সধবার একাদশী' নাটকের নিমচাঁদ দত্তের চরিত্র সৃষ্টি করে ধনী বাঙালীর নৈতিক অধঃপতনের ছবিটি তিনি সর্বসাধারণ্যে প্রচার করেছিলেন।

॥ গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) ॥

গিরিশচন্দ্র নিজে অভিনয় করতেন, অভিনয় শেখাতেন, রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা করতেন এবং নাটক লিখতেন।

গিরিশচন্দ্র তিন শ্রেণীর নাটক লিখেছিলেন: পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক। 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'পাণ্ডব গৌরব' ইত্যাদি পৌরাণিক নাটক। 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি' ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাটক আর 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি' ইত্যাদি সামাজিক নাটক।

॥ অমৃতলাল বসু ॥

এই আমলের আর একজন প্রতিভাবান নট ও নাট্যকার ছিলেন 'রসরাজ' অমৃতলাল বসু (১২৬০-

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন। এঁদের
...ত্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস এবং
উল্লেখযোগ্য।
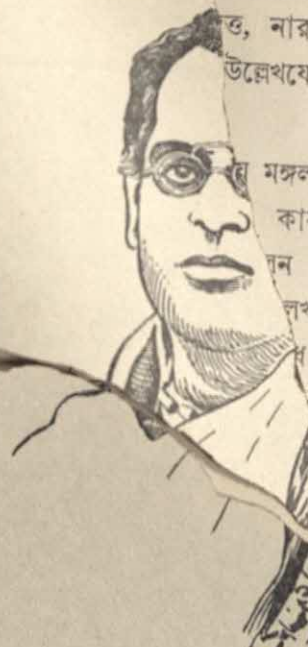
... মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছিল,
... কাব্য। যে সকল কবি
...ন তাঁদের মধ্যে কবি-
...লেখা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য
... কালকেতুর, আর
...হিনী আছে।

... দেবতা।
...ব মঙ্গল...
... ধর্মমঙ্গল এর
... যুবক...রেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

...৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। তাঁর লেখা অনে... করা... নাম
...ইগুলি খুব প্রসিদ্ধ—'বিবাহবিভ্র... ক্ষেত্রের
...পিকা বিদায়'। ... উপস্থিত

॥ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ॥

...বন্ধুদের ... ...ণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ... তখন ১৩... বঙ্গাব্দ) ছিলেন একজন বিখ্যাত ...গে তাঁর ...লেখা 'আলিবাবা', 'প্রতাপাদিত্য', 'মিশ...' ইত্যাদি নাটক এক সময় খুব সাড়া জাগিয়েছি...

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ॥

গীতিকার ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'ডি. এল. রায়' নামেই বেশী পরিচিত। তিনি কয়েকটি প্রহসন (farce) রচনা করে বাঙলা নাটকে নতুনত্ব আমদানি করেন। 'কল্কি অবতার', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পুনর্জন্ম' ইত্যাদি নাটক সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা।

তারপর তিনি পৌরাণিক নাটক রচনায় হাত দেন। 'পাষাণী', 'সীতা', 'ভীষ্ম' ইত্যাদি পৌরাণিক নাটক খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

নাটক লিখতে শুরু
ক উচ্ছ্বাসপূর্ণ। তাঁর
তাপসিংহ', 'দুর্গাদাস',
'চন্দ্রগুপ্ত' ইত্যাদি
ধারা ও স্বাদেশিকতা

মধ্যভাগে বাঙলার উপন্যাস-
ত করতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র
দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত,
ধ্যাপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
-সাহিত্যের উন্নতির সূচনা করেন।

ধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪) ॥

ম্রাট্ বলা হয়ে থাকে।
ত্য চিরকাল স্মরণীয়
প্রাচীন বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের সার্থক লেখক।
র এই শাখাকে জনপ্রিয় করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ', 'দেবী-চৌধুরাণী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস।

॥ রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮–১৯০৯) ॥

উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্র ইতিহাসকে পটভূমি করেন। 'বঙ্গ-বিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত'—সবগুলিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। এছাড়া তিনি 'সমাজ', 'সংসার' প্রভৃতি কয়েকখানি সামাজিক উপন্যাসও লেখেন।

॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩–১৯৩২) ॥

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কয়েকখানি সুন্দর উপন্যাস রচনা করেছিলেন। 'রমাসুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ', 'সিন্দূরকৌটা'র মধ্যে খল চরিত্রের চিত্রণে তিনি বেশ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প-লেখক।

॥ ছোটগল্প ॥

উপন্যাসের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব ঘটে। এর পরিধি ছোট এবং এর মধ্যে একটি মাত্র ঘটনাকে অবলম্বন করে কয়েকটি চরিত্রের চিত্র দেওয়া হয়। ছোটগল্প জীবনের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র।

ছোটগল্পকে সার্থক রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রভাতকুমারের ছোটগল্পও বিখ্যাত। তাঁর লেখা 'দেশীবিলাতী', 'নবকথা', 'ষোড়শী' ইত্যাদি গল্পসংগ্রহ একদা বাঙালী পাঠকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৮) ॥

শরৎচন্দ্র ছোটগল্প দিয়ে সাহিত্য-জীবন শুরু করেন। কিন্তু উপন্যাস-রচনায় তাঁর সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির উপাদান

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে সংগ্রহ করা। নিত্যদিনের স্বার্থ, বিদ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, লোভ, ভালবাসা ইত্যাদি নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর লেখা উপন্যাসের মধ্যে 'পণ্ডিতমশাই', 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', 'গৃহদাহ', 'পরিণীতা', 'দত্তা', 'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি' সমধিক প্রসিদ্ধ।

॥ ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা কাব্যে নতুন সুর শোনা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত যদিও খুব আধুনিক কবি ছিলেন তবুও তিনি নতুনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি পুরাতনকে আঁকড়েই ছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্তকে সাময়িক চিন্তার কবি বলা যায়। তিনি স্বভাবকবির মতো যে কোন বিষয়ে কবিতা রচনা করতে পারতেন। শব্দ-ঝংকার, শ্লেষ, অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদি প্রয়োগে তাঁর কাব্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে বিশেষ গভীরতা ছিল না।

॥ রঙ্গলাল বন্দ্যোপ মঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন। এঁদের

রঙ্গলাল স্বাধীনতা দত্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস এবং উল্লেখযোগ্য।
মনের মধ্যে স্বাধীন হ
ছিল তাই তিনি তাঁর কা
ছিলেন। তাঁর কাব্যগুলি যে মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছিল,
'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' ও কাব্য। যে সকল কবি
স্বাধীনতা হারানোর জন্যে লেন তাঁদের মধ্যে কবি-
সব কাব্যে প্রকাশিত হয়েছিল লেখা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য
ধ কালকেতুর, আর

॥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ॥ হিনী আছে।

মধুসূদনের নী প্রতিভার ক
হয়েছে। তিনি বাঙলা কাব্যেও নতু
ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে ইংরে দেবতা।
সাহিত্য এবং ইংরেজী সংস্কৃতির অ ব মঙ্গল
অল্প বয়সেই তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নে ধর্মমঙ্গল এর
বাঙলা নাটক লেখার পর টি যুব য়েছে।
সম্ভব' নামে একখানি বাঙলা কা ধর্মমঙ্গ রতবর্ষে
এই কাব্যে গ্রীকপ্রভাব খুব স্পষ্টণকরা নাম
কলে বছরে বাঙলা সাহিত্যকে অমূল ক্ষেত্রের
যানপা তিনি আধুনিকতার প্রথম ধারব উপস্থিত
গনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'মেঘনাদবধ' বন্ধুদের
মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। এ কাব্যে তখন
যাগে

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

। তিনি এর নাম
ছন্দে ভাবের ঢেউ
পংক্তিতে চলে আসায়
চ্ছাস প্রকাশ পেয়েছে
ও নেই।
ছন্দে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য
সূদনই প্রথম গীতিকবিতা
ইতালীয়ান 'সনেট'-এর
শপদী কবিতাবলী' বাংলা
ন।

ন ও বিহারীলাল ॥

র হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১৮৩৮-
রকমের কাব্য রচনা করেন।
খণ্ডকাব্য, গীতি-কবিতা ইত্যাদি
গিয়েছে ন করেন।
'স্বপ্নবাস মধ্যে 'চিন্তা-তরঙ্গিণী', 'বীরবাহু',
বাসবদত্তা 'আশা-কানন', 'দশমহাবিদ্যা' র
ভাসে পারে।
'বুদ্ধচরিত আর একজন কবি হলেন নবীনচন্দ্র
তিনি খ্রীষ্ট ৯০৯ খ্রীঃ)। তাঁর লেখা কাব্য বহু। তাঁর
বিখ্যাত র যুদ্ধ', 'অমিতাভ', 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র'
॥ কালি প্রসিদ্ধ।
অশ্ব লাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪ খ্রীঃ) বাংলা
সং তন যুগ আনতে সাহায্য করেন। তিনি
ভাবুকতার কবি। তাঁর রচনাগুলি প্রকৃত গীতি-

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনচন্দ্র সেন

কবিতা। তাঁর 'সারদামঙ্গল' ও 'বঙ্গসুন্দরী'র মধ্যে তাঁর প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছিল।

তাঁর কাব্য রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ॥

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ। 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর পিতামহ, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর পিতা। তাঁর কাব্য যখন একে একে প্রকাশিত হতে লাগল তখন তাঁর প্রতিভার দিকে সকলের দৃষ্টি পড়ল। তাঁর ভাষার জাদু, ছন্দের মাধুর্য ও ভাবের বিচিত্রতা সকলকে মুগ্ধ করল।

বিহারীলাল চক্রবর্তী
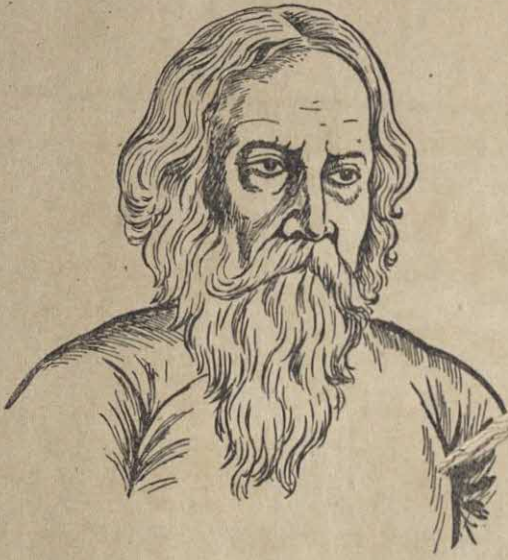
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইওরোপে তাঁর খ্যাতি পৌঁছল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সুইডিশ একাডেমী তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিলেন। সারা জগৎ ক্রমশঃ তাঁর কাব্যের অনুবাদ পড়ে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ল। এমন জগৎজোড়া নাম বোধ করি কোন কবির ভাগ্যে জোটে নি।

অতি বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে শুরু করেন। 'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'ভানুসিংহের পদাবলী' ও 'শৈশব সঙ্গীত' তাঁর প্রথম জীবনের লেখা কাব্য। তারপর তিনি লিখলেন 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল'। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কথা', 'কল্পনা' ইত্যাদি তারও পরের লেখা। তাঁর কাব্যে ছিল এক অপূর্ব অধ্যাত্মচেতনা। 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'র ভেতর দিয়ে সেই চেতনা ফুটে উঠল।

তাঁর শেষের দিকের রচনা, 'বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া', 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি' প্রভৃতি কাব্য সাহিত্যে অতুলনীয়।

বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিম যে উপন্যাসের রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা থেকে নতুন ধরনের মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস সৃষ্টি করলেন। লিখলেন 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি',

'গোরা', 'ঘরে বাইঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন। এঁদের 'যোগাযোগ', 'শেষেন্দু, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস এবং এগুলি এক নতুন ধরউল্লেখযোগ্য।

ছোটগল্পে রবীন্দ্র অন্যতম। তাঁর লেখা মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছিল, পোস্টমাস্টার, ছুটি, খো কাব্য। যে সকল কবি ওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, নষ্ট ন তাঁদের মধ্যে কবি-

তাঁর লেখা প্রথম দিকের লেখা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য এই নাটক ও 'কালমৃগয়া' ধ কালকেতুর, আর গীতিনাট্য গানের মধ্য দি হিনী আছে। প্রকাশিত হয়েছে। তারপর তিনি রচনা করলেন 'রাজা ও 'মালিনী'।

দেবতা।

এর পর তিনি আর এক জাতের ব মঙ্গল করলেন। এগুলিকে রূপক বা ধর্মমঙ্গল এর বলে। 'রাজা', 'অরূপরতন', ট যুবক য়েছে। 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'কালের ধর্মমঙ্গ রতবর্ষে য় কবি সংকেতে জীবন ও সমা করা নাম কথা বলেছেন।

তিনি কয়েকখানি সামাজিক নাটক ক্ষেত্রের 'প্রায়শ্চিত্ত', 'গৃহপ্রবেশ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' উপস্থিত সঙ্গে 'শেষরক্ষা' নানা দিক দিয়ে সুন্দর বন্ধুদের নাটক। 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' তখন দেশে নৃত্যনাট্য হিসেবে রঙ্গমঞ্চে এখনও আগে অভিনীত হয়।

প্রবন্ধ-রচনায়ও রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট রয়েছে। সাহিত্য, ছন্দ, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব সব নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখে মানুষের জ্ঞান ও মননশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন। সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, লোক সাহিত্য, শব্দতত্ত্ব, ছন্দ, বিশ্বপরিচয়, শিক্ষা, বিচিত্র প্রবন্ধ, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য দান। তাঁর লেখা ভ্রমণকাহিনী-গুলিও অপূর্ব।

শিশুদের জন্যেও তিনি কিছু সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তাঁর 'খাপছাড়া', 'গল্পসল্প', 'সে' ও শিশুপাঠ্য
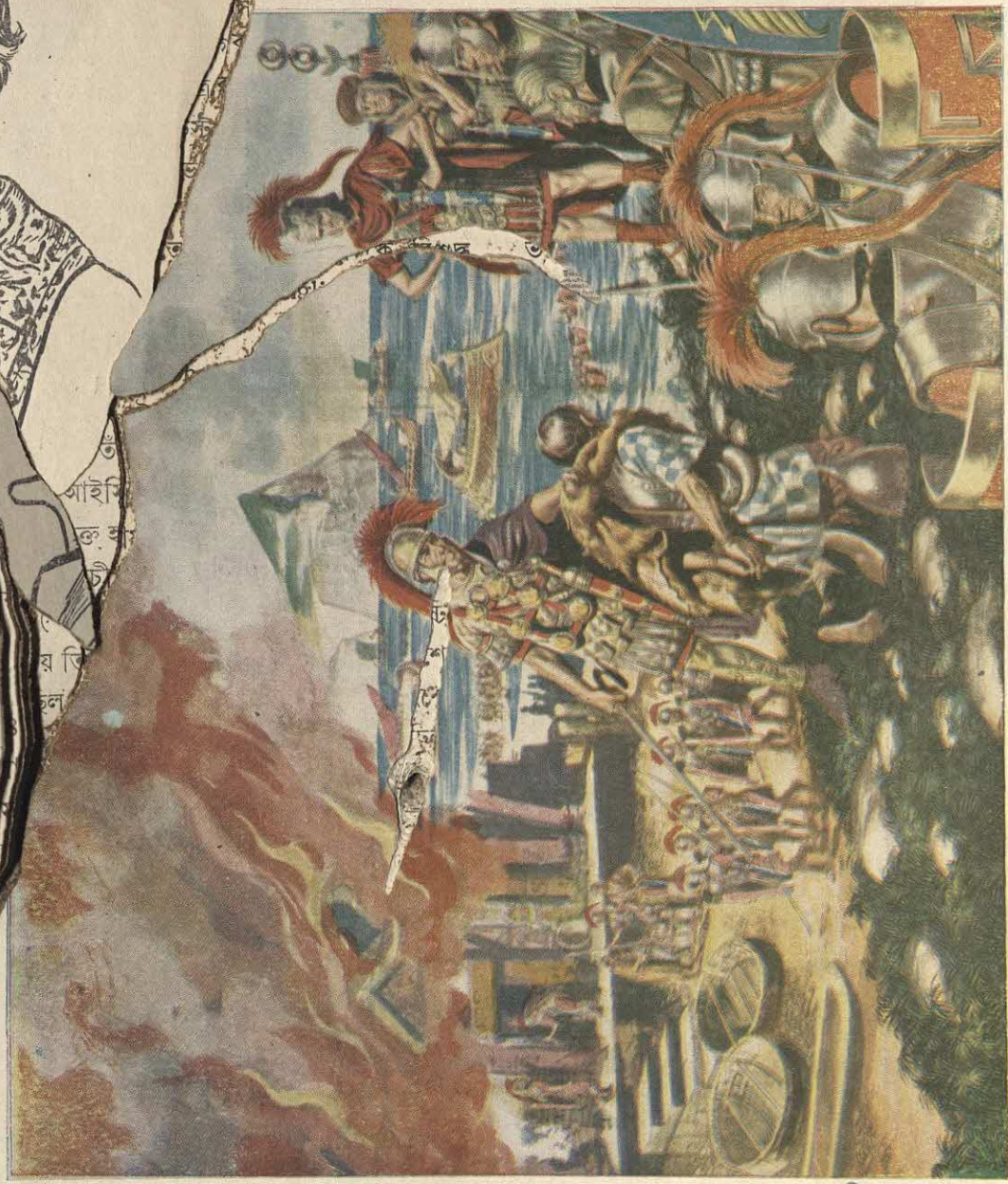
আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্য বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ল কাব্য লিখেছিলেন। এঁদের
নারায়ণদেব, বিপ্রদাস এবং
ল্লখযোগ্য।

মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছিল,
কাব্য। যে সকল কবি
তাঁদের মধ্যে কবি-
খা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য
কালকেতুর, আর
হিনী আছে।

দেবতা।

বিশ্বসাহিত্যের কথাঃ

[আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্য বিনষ্ট হয়ে য[illegible]।]

গ্রীস ইওরোপ মহাদেশের অন্তর্গত একটি দেশ। এই দেশ প্রাচীনকালে অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ম্যাসিডন (Macedon) এই রকম একটি ছোট রাজ্য। রাজা ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার ৩৫৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মাত্র বিশ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইতিহাসে আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট (Alexander the Great) নামে পরিচিত।

তিনি রাজা হয়ে দিগ্বিজয়ে বার হ[illegible] পারস্য (ইরান), ডামস্কস, ব্যাবিলন, মিশর, সিরিয়া, ফি[illegible]সিয়া প্রভৃতি তিনি অধিকার করেন। তিনি টায়ার নগরী[illegible]রস্কের রাজধানী পার্সিপলিস নগর ধ্বংস করেন, আ[illegible]কজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপিত করেন। ৩২৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তিনি ভারতে এসে পুরুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ভারত থেকে ফেরবার পথে ব্যাবিলনে ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

এখানে যে ছবি দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্যের বহু নিদর্শন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

...দি শিশু-মনে প্রচুর

... বাংলা সাহিত্যে নব ...নাথ আর কিছু না ...লি লিখতেন তা হলেও সমস্ত বিশ্বে এত গান ...য়োজন তাঁর মত আর কেউ ... বাঙালীকে গানের রাজা

...না...

...জীব...

...লা সাহিত্য

...জন্মা...

...মন, বাংলা ...হিত্য বহুবিচিত্র খাতে

মা... ...হাস ...ছোট গল্পে, ভ্রমণ কাহিনীতে,

৩... ভাষা ...চনায়ও তা মনোহর হয়ে উঠেছে।

...পাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়,

গিয়েছে ... আই... ...বোধ সান্যাল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত,

'স্বপ্নবাস... ...নিক বন্দ্যোপাধ্যায়,—নামের পর

বাসবদত্তা ... ...র বৈচিত্র্য। জগতের কোন সাহিত্য

ভাসে ... অল্প সময়ের মধ্যে এত সমৃদ্ধিশালী

'বুদ্ধচরিত ... য় তি...

তিনি খ্রীষ্ট... ...ছিল

বিখ্যাত প...

॥ কালি...

কাব্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে—এনেছেন নূতনত্বের সুর। তাছাড়া অতি আধুনিকরাও বুনে চলেছেন তাঁদের প্রতীক-ধর্মী কবিতার মায়াজাল।

॥ শিশু সাহিত্য ॥

শিশুদের জন্যও বাংলা সাহিত্যে বিরাট আয়োজন হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোরের রামায়ণ, মহাভারত, টুনটুনির বই, সুকুমার রায় (চৌধুরীর) আবোল তাবোল, হযবরল, পাগ্‌লা দাশু ইত্যাদি বই, যোগীন্দ্র সরকারের মনোহর শিশু-মনোরঞ্জক বই হাসিখুসি, হাসিরাশি, হিজিবিজি ইত্যাদি; সুখলতা রাও-এর গল্পের বই, আরো গল্প ইত্যাদি। দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি ইত্যাদি, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যখের ধন, আবার যখের ধন ইত্যাদি রোমাঞ্চকর উপন্যাস, হাসির রাজা শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প ইত্যাদি—শিশুদের জন্যে রাজভোগের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া দেব সাহিত্য কুটিরের বার্ষিকীগুলো প্রতি বৎসর শিশুসাহিত্যের রত্নভাণ্ডার বাড়িয়ে চলেছে।

আরবী সাহিত্য

...বী সভ্যতা অতি প্রাচীন। পণ্ডিতরা অনুমান ...যে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বছর ... আরব দেশে সভ্যতার আলো ছড়িয়ে ...ছিল। তবে এই সময়ের কোন সাহিত্যের ...ন্ধান পাওয়া যায় না। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সাতশো বছর পরে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল, শুধু তারই সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই সাহিত্য হচ্ছে—কাব্য সাহিত্য। আদি আরবী কবিরা সুর-সহযোগে তাঁদের কবিতা গান করতেন। এই সব কবিদের বলা হত রাউই। তাঁদের কবিতাকে বলা হত কাশিদা।

আরবী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হল কোরান শরীফ। ইসলাম ধর্মের স্রষ্টা হজরত মোহাম্মদ বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সব বাণী পেয়েছিলেন, সেগুলি সংকলন করা হয়েছে 'কোরান শরীফ' গ্রন্থে। তাঁর নিজের বাণী সংগ্রহ করে রচিত হয়েছিল 'হাদিশ'।

কোরানের ব্যাখ্যা করে অনেকগুলি বই রচিত হয়েছিল।

ইরানীয় সাহিত্য

ইরান দেশের এখনকার ভাষা সাধারণভাবে পারসিক বা ফারসী ভাষা নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে মোগলসম্রাটদের আমলে এই ভাষা রাজভাষা হয়, আর তা ইংরেজ আমলেরও প্রথম দিকে এই ফারসী ভাষার বহুল চর্চা ছিল। অনেক ভারতীয় লেখক ফারসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

পণ্ডিতগণের অনুমান, অতি প্রাচীনকালে বৈদিক আর্যগণ ও ইরানীয় আর্যগণ প্রায় এক ধরনের ভাষায় কথা বলতেন।

ইরানীয় সাহিত্যের সবচেয়ে পুরোনো গ্রন্থের নাম হল জেন্দ্‌ আবেস্তা। এটি তখনকার জেন্দ্‌ ভাষায় রচিত হয়েছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার থেকে ছয়শো বছর আগে।

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্যের নিদর্শন নষ্ট হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি সেলুক... ইরান রাজ্যের অধিকার লাভ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০ অব্দে সেলুকাসের বংশধরদের কাছ থেকে রাজা

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্য বিনষ্ট হয়ে যায়

মিথ্রিদাতেস ইরান দ... কাব্য লিখেছিলেন। এঁদের ইরানের ভাষা হয় পহ্‌... নারায়ণদেব, বিপ্রদাস এবং আসলে পহ্‌লবী ভা... খযোগ্য। হয়েছিল।

কিন্তু পরবর্তী যুগে ...ঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছিল, এমন কয়েকজন কবি ...াব্য। যে সকল কবি কাব্য বিশ্বসাহিত্যের অন্য... তাঁদের মধ্যে কবি- পেয়েছে। এঁরা হলেন ওম... 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য খ্রীঃ), হাফিজ (আসল ন... কালকেতুর, আর খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী) ও... নী আছে। নাম মুশাররফউদ্দীন, ১১৮৪-১২... একজন গণিতবিদ্‌ ছিলেন। ... হাফিজের 'দিওয়ান' এবং ... দেবতা। ও 'বুস্তান' প্রসিদ্ধ। ...ব মঙ্গলে জালালউদ্দিন রুমী। ... মঙ্গল-এর মহাকবি ফিরদৌসীর (... যুবক... য়েছে। কাশিম মনসুর, ৯৪০-১... মঙ্গ... রতবর্ষে বিখ্যাত।

তবে, অনুবাদের মধ্য দি... রা... নাম সবচেয়ে বেশী পরিচিত ...ক্ষেত্রের 'আলিফ-লায়লা' অর্থাৎ 'এক ...উপস্থিত রজনী'। এর ইংরেজী অনুব... ন্দুদের Arabian Nights. আর বাংল... তখন বলে 'আরব্য উপন্যাস'। এর ম... গে পঠিত জনপ্রিয় বই খুব কম ...

গ্রীক সাহিত্য

॥ মহাকাব্য ॥

গ্রীস দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ হচ্ছে 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি' নামে দুখানি মহাকাব্য। এই মহাকাব্য দু'খানির রচয়িতা হলেন মহাকবি হোমার। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, হোমার যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৯০০ বছর আগে এই মহাকাব্য দু'খানি রচনা করেছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি অন্ধ ছিলেন।

'ইলিয়াড' মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই রকম:

ট্রয় (ইলিয়াম) নগরের রাজকুমার প্যারিস স্পার্টার রাজা মেনেলাউসের অতিথি হন। দেশে ফেরবার সময় তিনি মেনেলাউসের সুন্দরী পত্নী হেলেনকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। তখন মেনেলাউস ও তাঁর ভাই অ্যাগামেমনন গ্রীসদেশের অন্যান্য

অবরোধ
য়বাসীদের
গ অবশেষে
মেনেলাউস
কালেন।
তে ট্রয়ের
থাকার রাজা
কর অভিজ্ঞতার
র কাহিনী বর্ণিত

স না য়নের গীতি-
হল।
নার তাঁ জন্মের কয়েক শ' বছর
পালি ইসি গদ্য-সাহিত্য সৃষ্ট
ত্রিপিট দের নিয়ে নীতি গল্প
ভাগ। প (Aesop), তিনি
অষ্টম ক্রীতদাস মাত্র। তাঁর
লুপ্ত হতে য় Aesop's Fables) পৃথিবীর
অপ্রচলিত ছিল খনও আদর পেয়ে আসছে।
দ্য-লেখকদের মধ্যে থেলিজ

॥ আদি
বা
পাণ্ড
বা

হোমার

থেলিজ (Thales)

(৬৪০-৫৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), অ্যানাক্সিমাণ্ডার (Anaximander—৬১১-৫৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), হেরাক্লিটাস (Heraclitus) উল্লেখযোগ্য।

॥ গ্রীক নাট্যসাহিত্য ॥

অতি প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে নাট্যসাহিত্যের চরম উন্নতি হয়েছিল। এসকাইলাস (Aeschylus—৫২৫-৪৫৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), সফক্লিজ (Sophocles—৪৯৫-৪০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), ইউরিপিডিজ (Euripides—৪৮০-৪০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ট্র্যাজেডি (বিয়োগান্ত) নাটকে চরম উৎকর্ষ নিয়ে এসেছিলেন।

এসকাইলাস ৯০ খানি, সফক্লিজ ১৩০ খানি আর ইউরিপিডিজ ৯২ খানি নাটক লিখেছিলেন। সবই ট্র্যাজেডি। আর কমেডি (মিলনান্ত) নাট্যকার হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন অ্যারিস্টফ্যানিজ (Aristophanes—

ইউরিপিডিজ

প্লেটো
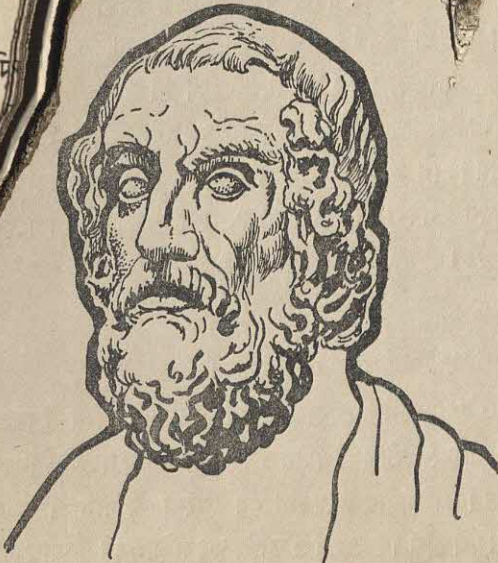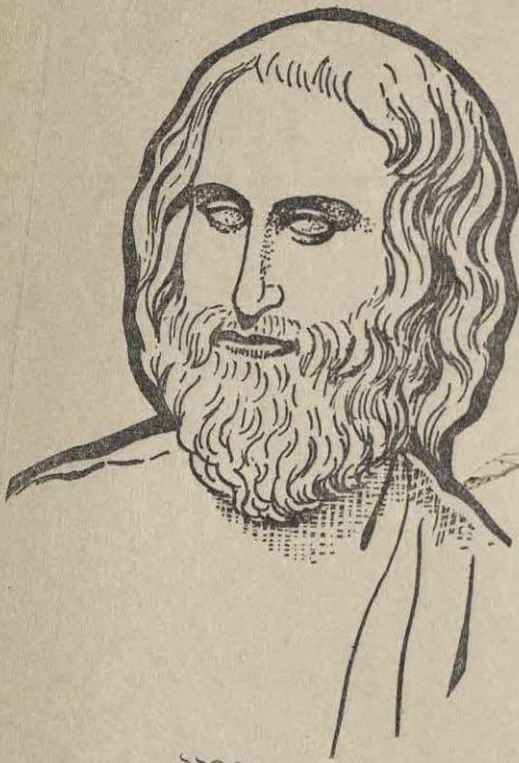
৪৫৪-৩৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তিনি ৪৪ খানি নাটক রচনা করেন। এসব নাটকগুলির মধ্যে বহু নাটক এখন আর পাওয়া যায় না।

কাব্য ও নাটক ছাড়া দর্শন সাহিত্যেও প্রাচীন গ্রীসের অবদান অতুলনীয়। প্রসিদ্ধ জ্ঞানী সক্রেটিজ (Socrates—৪৭০-৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) তাঁর সত্যানুসন্ধানী দর্শনের জন্য রাজরোষে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন প্লেটো (Plato—৪২৭-৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তিনি মোট ৩৬ খানি মহামূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

অ্যারিস্টটল (Aristotle—৩৮৪-৩২২ ... ছিলে প্লেটোর শিষ্য। তিনি ছিলেন অসাধা... তিনি ... কত বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচনা ক... তার ...য়ত্তা নেই। তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, অ... শাস্ত্র, সাহিত্য-সমালোচনা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ... শারীরতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ... বিষয়ে তিনি অসংখ্য বই লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থাব... সর্বযুগে সকল দেশের পণ্ডিতদের কাছে বিস্ময়ের সামগ্রী।

প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্য

মিশর দেশের প্রাচীনতম সাহিত্য হচ্ছে লোক-সাহিত্য বা লোকগাথা। এগুলি মিশরীয় চারণ কবিরা বিভিন্ন স্থানে গেয়ে বেড়াতেন। এঁদের কারোরই নাম জানা যায় না। শুধু তাঁদের কবিতা বা গানের টুকরো টুকরো অংশগুলি পাওয়া গিয়েছে।

এই ধরনের একটি লোকগাথা মিশরীয় দেবতা 'রা' এবং তাঁর বিভিন্ন সন্তানদের কাহিনী নিয়ে রচিত। মিশরীয় দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 'রা'। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন। আর সব দেবদেবী তাঁর পুত্রকন্যা। তাঁর শক্তির উৎস ছিল

...মটি কেউ ...লেন অত্যন্ত ...'রা'-এর সব ...একদিন তিনি ...র সাপ তৈরি ... রেখে দিলেন। ... গল্প করছিলেন, ...কামড়াল। যন্ত্রণায় ...। তখন আইসিস ... 'রা' যদি ... তাঁর ...দেন, তবে তাঁর সকল ব্যবস্থা করা হবে। 'রা' ... হয়ে তাঁর গোপন নামটি ... তাঁর সমস্ত শক্তি আর ক্ষমতা সঙ্গে ...আইসিসের মধ্যে চলে গেল। তিনি তাঁর ...গন।

...চীনকালে বহু রাজবংশের রাজা রাজত্ব ...করে ৩০টি রাজবংশ)। যীশু খ্রীষ্টের ...য় তিন হাজার বছর আগে প্রথম রাজবংশের ...ছিল বলে জানা যায়। দ্বাদশ রাজবংশের ...রীয় সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

সাপটি তাঁকে কামড়াল

সমাধির গায়ে খোদাই করা অসংখ্য প্রশস্তি, কবিতা ও সংগীত, কফিনের উপর উৎকীর্ণ কবিতা বা প্যাপাইরাসের পাতে লেখা অসংখ্য কবিতা ও কাহিনী থেকে এ যুগের সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মিশরীয় সম্রাট্ চতুর্থ আমেন-হোটেপ (Amen-Hotep) একজন ভালো কবি ছিলেন। তিনি সূর্য দেবতা অ্যাটনের উদ্দেশে অনেকগুলি ভালো ভালো স্তোত্র লিখেছিলেন। এগুলি মিশরীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

প্রাচী[illegible] রোমান সাহিত্য

...দেশের সাহিত্যে গ্রীস দেশের সাহিত্যের খুব ...পড়েছে। গ্রীক নাট্যকলার আদর্শে রোম দেশে ...প্রথম নাট্যসাহিত্যের ধারাটি গড়ে ওঠে। লিভিয়াস অ্যাণ্ড্রোনিকাস হচ্ছেন আদি রোমান নাট্যকার। তিনি সম্ভবতঃ যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পৌনে তিনশো বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রীক নাটকের ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

ঐ সময়ের আর একজন নাট্যকারের নাম হল নেভিয়াস। তিনি শুধু অনুবাদ করেন নি, অনেকগুলি মৌলিক নাটকও রচনা করেছিলেন।

নেভিয়াসের পরবর্তী কবি ও নাট্যকার হিসেবে এন্নিয়াসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২৩৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তিনি রোমান বীরদের নিয়ে ১৮ খণ্ডে বিভক্ত 'অ্যানাল্স্' নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

কমেডি বা মিলনান্তক নাট্যকার হিসেবে বিখ্যাত হলেন প্লটাস (Plautus—২৫৪-১৮৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ও টেরেন্স (Terence—১৯০-১৫৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন প্লটাস। তিনি ১৩০ খানিরও বেশী নাটক রচনা করেছিলেন।

রোমান গদ্য-সাহিত্যও প্রাচীনকালে বিশেষ উন্নত হয়েছিল। কেটো (Cato—২৩৪-১৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) হলেন আদি গদ্য-লেখক। তিনি সাত খণ্ডে বিভক্ত রোমের ইতিহাস লেখেন।

প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও দার্শনিক সিসেরোর (Cicero

লেজ

—১০৬-৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) চেষ্টায় রোমান গদ্য সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। তিনি ছিলেন রোমান সম্রাট্ জুলিয়াস সীজারের আমলের লোক। জুলিয়াস সীজারও ভালো গদ্য-লেখক ছিলেন।

॥ ভার্জিল ॥

রোমান কাব্যসাহিত্য প্রধানতঃ ল্যাটিন ভাষার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছিল। ল্যাটিন ভাষার বিখ্যাত কবি হলেন ভার্জিল (Virgil—৭০-১৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ)। তিনি তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে 'ইনিড' (Aeneid) কাব্য। ট্রয়ের বীর যোদ্ধা ঈনিয়াসের (Aeneas) কাহিনী অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পরেও রোমান সাহিত্যে অনেক বড় বড় লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথমেই নাম করা যেতে পারে ঐতিহাসিক টাইটাস লিভিয়াসের (Titus Livius—খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯-১৭)। ইনি সংক্ষেপে লিভি (Livy) নামে পরিচিত। ইনি ১৪২ খণ্ডে রোমের সমগ্র ইতিহাস রচনা করেন। প্লিনি (Pliny —২৩-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক। তিনি যে সব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে 'ন্যাচারালিস হিস্টোরিয়া'

ভার্জিল

কাব্য লিখেছিলেন। এঁদের
নারায়ণদেব, বিপ্রদাস এবং
খযোগ্য।

ঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছিল,
কাব্য। যে সকল কবি
তাঁদের মধ্যে কবি-
'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য
কালকেতুর, আর
নী আছে।

দেবতা।
ব মঙ্গল
ধর্মমঙ্গল-এর
যুব রেছে।
র্মমঙ্গ রতবর্ষে
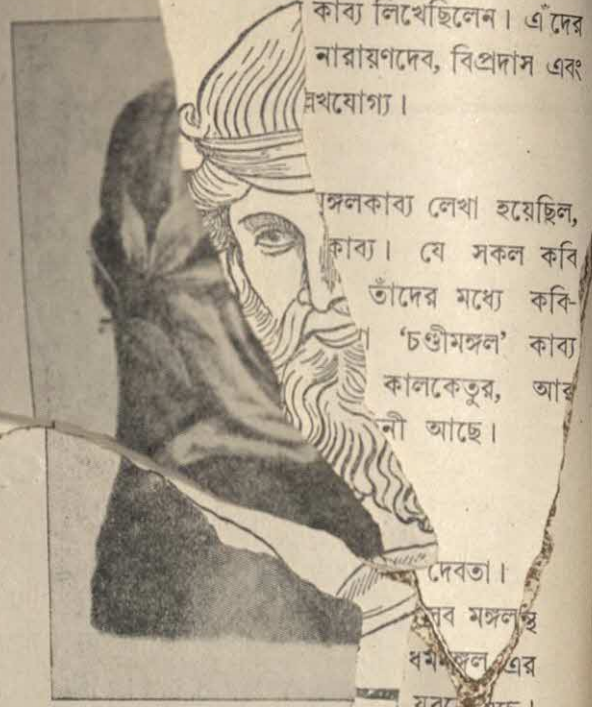
পেত্রার্ক

বিশ্বসাহিত্যে এক অমর সৃষ্টি। এই রা নাম খণ্ডে বিভক্ত। এর মধ্যে তিনি সা ক্ষেত্রের বিষয় সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা উপস্থিত

খ্রীষ্টীয় যুগের প্রধান কবি হলেন ওভিড ... দের —(খ্রীষ্টপূর্বাব্দ—১৭ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি ... তখন কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন।

মধ্যযুগে বিখ্যাত কবি ছিলেন দান্তে আ... (Alighieri Dante, ১২৬৫-১৩২১), (Francisco Petrarch, ১৩০৪-১৩৭৪), আর গিওভা বোকাচিও (Giovanni Boccacio, ১৩১৩-১৩৭৫)। দান্তের বিখ্যাত বই 'ডিভাইন কমেডি' (La Divina Commedia). পেত্রার্ক ছিলেন চতুর্দশপদী কবিতার বা সনেটের প্রথম লেখক। আর বোকাচিও-র 'ডেকামিরণ' (Decameron) বিখ্যাত রসমধুর গল্প-সংগ্রহ।

দান্তে

হিব্রু সাহিত্য

...ত্যকে বলা হয় হিব্রু ... ঘটেছিল যীশু খ্রীষ্টের ...পের

...ত্র ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে 'বাইবেল'। ...টেস্টামেণ্ট' অংশের মোট ৩৯ ...ব্রু ভাষায় লেখা। Pentateuch ...গুলি ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ ও ...নীতে মানুষের সৃষ্টি, ...জেসের ...দেশ থেকে ইহুদীদের স্থানান্তর ...দের অনুশাসন ...হ, ইজরিয়েলিদের ...নি বর্ণিত হয়েছে। আসল বাইবেল ...লে বলে হিব্রুভাষা শেখা খ্রীষ্টান ...ন করেন। হিব্রুতে ...র এক পাহাড়ের গুহা ...মুক্ত ...লি সহসা আবিষ্কৃত হয়। এগুলি ...প্রাচী...ত ছিল। কতক কতক ছিন্ন অবস্থায় ...(কম... পণ্ডিতদের মতে এগুলি ২০০ খ্রীষ্ট-...য় লি...হয়েছিল।

...দ ॥

...মহাগ্রন্থের পরে যে গ্রন্থগুলি হিব্রু সাহিত্যের ...সম্পদ্ সেগুলি হল তালমুদ (Talmud) নামে ...। এগুলি নানা ধরনের লেখা একত্র গ্রথিত ... কেহ কেহ মনে করেন এগুলি মোজেসের লেখা ...আর কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে এজরা এগুলি লিখেছিলেন। এর দুই ভাগ বা খণ্ড। এক খণ্ডের নাম মিস্‌নাহ্ (Mishnah). এতে কিছু আইন-কানুন ও চিরাচরিত কর্তব্যের কথা আছে। অন্য খণ্ডটির নাম জেমারা (Gemara)—এগুলি এক রকমের সমালোচনা। তালমুদ আবার দুরকমের আছে। জেরুজালেমের ও ব্যাবিলনের। উভয়ের জেমারা কিন্তু ভিন্ন। ইহুদীরা অবশ্য ব্যাবিলনের তালমুদ-ই মেনে চলেন। এর প্রভাব ইহুদীদের মধ্যে সর্বাধিক। বাইবেলের পরেই এর স্থান।

মোজেস

ইংরেজী সাহিত্য

॥ অ্যাংলো-স্যাক্সন ইংরেজী সাহিত্য ॥

ইংল্যাণ্ডের আগেকার নাম হল 'ব্রিটেন'। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আগে বা তার সমকালে এখানকার সাহিত্য কি রকম ছিল সে সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশো বছর পর জার্মান দেশ থেকে অ্যাঙ্গল্‌স্, স্যাক্সন এবং জুট—এই তিনটি জাতি এসে ব্রিটেন জয় করে নেয়। এঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, তাকে বলা হয় অ্যাংলো-স্যাক্সন ইংরেজী সাহিত্য।

রাজা আলফ্রেড (Alfred —৮৪৯-৯০১ খ্রীষ্টাব্দ)

এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'বেউলফ' (Beowulf) মহাকাব্য। এছাড়া আছে 'জুডিথ'-এর কিছু অংশ, সীডমনের (Caedmon) ধর্মীয় কবিতাবলী ও ভার্সেলিতে প্রাপ্ত পুঁথি।

এই 'বেউলফ' মহাকাব্য বিশাল না হলেও এর মধ্যে প্রাচীন কালের ইংরেজ জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বহু লোক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিলেন। তখন সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়তে লাগল। যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমাসুন্দর রূপের ছবি আঁকা হল। সপ্তম শতাব্দীর কবি সীডমনের মধ্যে এই ভাবধারা দেখা গিয়েছে। তিনি ঈশ্বরের করুণা ও আনন্দের কথা তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

এই সময়ে গদ্য রচনারও সূত্রপাত হল। প্রথম গদ্য-লেখক হলেন বীড (Bede)। তাঁর রচিত 'ইংরেজ জাতির ধর্মসমাজ সম্পর্কিত ইতিহাস' একখানি মূল্যবান্ গদ্যগ্রন্থ (এটি ল্যাটিন ভাষায় রচিত হয়েছিল)।

রাজা আলফ্রেডের চেষ্টায় ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। তিনি বিভিন্ন ভাষার পুঁথি ইংরেজীতে অনুবাদ করান। 'দি ইংলিশ' অথবা 'অ্যাংলো-স্যাক্সন ক্রনিকল' তাঁর সময়ে রচিত হয়। রাজা আলফ্রেডকে বলা হয় ইংরেজী গদ্য-সাহিত্যের জনক।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নর্মান জাতি ইংল্যাণ্ড অধিকার করে নিল। অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি হল পরাধীন। এই পরাধীন অবস্থার মধ্যে তাদের সাহিত্য সাধনা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এল।

॥ অ্যাংলো-নর্মান ইংরেজী সাহিত্য ॥

নর্মানরা একাদশ শতকে ইংল্যাণ্ড জয় করে সেখানে বাস করতে থাকে। তারা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য গ্রহণ করল। ইংরেজী সাহিত্যে নতুন ভাবধারা এল। খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক বিষয়গুলি নিয়ে ইংরেজী গ্রন্থ রচিত হল।

রাজা আর্থার ও তাঁর নাইটদের নিয়ে এই যুগে কতকগুলি সুন্দর আখ্যান রচিত হয়েছিল।

[illegible]দশ শতকে ইংরে[illegible] ভাষায় অনেকগুলি গীতিকবিতাও [illegible]চিত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দী[illegible] 'হ্যাভলক' ও 'হর্ন'-এর উপাখ্যা[illegible] নিয়ে ইংরেজীতে কাব্য [illegible] করা হয়।

॥ চসার ॥

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংরেজী [illegible]ব্যে নতুন ভাব ও সৌন্দর্য-সুষমা এনে দিলেন মহা[illegible]বি জেফ্রি চসার (Geoffrey Chaucer—১৩৪০-১৪০[illegible] খ্রীষ্টাব্দ)। প্রথম জীবনে তিনি কতকগুলি সুন্দর কা[illegible] রচনা করেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত হল 'ট্রয়লাস্ [illegible]্যাণ্ড ক্রেসিডা'

চসার

কাব্য। তাঁর আর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'ক্যানটারবারী টেল্‌স্'। এই বইয়ে অনেক মজার মজার গল্প আছে। বইটিতে ২৩টি গল্প এবং একটি প্রস্তাবনা (Prologue) আছে। ৩০ জন তীর্থযাত্রী ক্যান্টার-বারীর সাধু সেণ্ট টমাসের কবরস্থান দেখতে যাবার পথে প্রত্যেকে একটা করে গল্প বলবে এইরূপ পরি-কল্পনা ছিল চসারের। প্রস্তাবনায় প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর এমন নিখুঁত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন যে তারা সবাই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গল্পগুলি রসাল এবং ভাষাটি বিশুদ্ধ ইংরেজী বুলিতে পূর্ণ। তাই চসারকে বিশুদ্ধ ইংরেজীর জনক (the father of English undefiled) বলা হয়।

জন ওয়াইক্লিফ (John Wycliffe—১৩২০-১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন এই যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট এবং ওল্ড টেস্টা-মেণ্টের কিছু অংশ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

চসারের সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত কবি হলেন ল্যাংল্যাণ্ড (Langland—১৩৩০-১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি 'The Vision of Piers Plowman' নামে একখানি কাব্যে সাধারণ লোকের দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করে গেছেন।

জন্ গাওয়ার (John Gower—১৩৩০-১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দ) নামে অপর একজন কবি এই যুগে অনেক-গুলি উপাখ্যান-কাব্য রচনা করেন। তাঁর একটি বিখ্যাত রচনার নাম 'কনফেসিও অ্যামানটিস' (লাভার্স কনফেসন)।

॥ রেনেসাঁসের যুগ ॥

চসারের পর প্রায় দেড়শ' বছর ধরে ইংরেজী সাহিত্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হয় নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল দখল করল। পণ্ডিতেরা তাঁদের দুর্লভ পুঁথিপত্রগুলি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সেগুলি নিয়ে ইতালি এবং ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। ইওরোপে নতুন করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচনা দেখা দিল। এই নব জাগরণকে বলা হয় 'রেনেসাঁস'।

রেনেসাঁসের ফলে ইংরেজী সাহিত্যে অভূতপূর্ব উন্নতি হল। এর পরই এল রানী এলিজাবেথের রাজত্বকাল। এই যুগের সাহিত্যকে বলা হয় এলিজাবেথীয় সাহিত্য।

এলিজাবেথীয় যুগের কবিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন এডমণ্ড স্পেন্সার (Edmund Spenser—১৫৫২-১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি 'শেফার্ডস ক্যালেণ্ডার', 'এপিথ্যালমিয়ন', 'প্রোথালমিয়ন', 'দি ফেয়ারী কুইন' প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর কাব্য রচনা করেন। তাঁর ভাষার পরিপাট্য কাব্যধর্মী।

স্যার ফিলিপ সিডনী (Sir Philip Sidney—১৫৫৪-১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) গদ্য-কাব্য 'আর্কেডিয়া', সমালোচনা গ্রন্থ 'অ্যাপলজি ফর পোয়েটি' এবং 'অ্যাস্ট্রেফেল অ্যাণ্ড স্টেলা' নামে আশ্চর্য সনেটগুচ্ছ রচনা করেন।

এলিজাবেথীয় যুগে ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছিল। এই যুগের ক্রিস্টোফার মার্লো, রবার্ট গ্রীন (Robert Greene—১৫৬০-১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দ), উইলিয়াম শেক্সপীয়ার, বেন জনসন প্রভৃতি নাট্যকারগণের রচিত নাটকে ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয়েছে।

॥ ক্রিস্টোফার মার্লো ॥

ক্রিস্টোফার মার্লো (Christopher Marlowe—১৫৬৪-১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান্ নাট্যকার। এঁর চারখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি হল 'ট্যাম্বারলেন', 'ডক্টর ফস্টাস', 'জু অফ মালটা' ও 'দ্বিতীয় এডওয়ার্ড'। ডক্টর ফস্টাস নামে একজন পণ্ডিত কিভাবে নিজেকে শয়তানের কাছে বিক্রয় করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন, তারই করুণ কাহিনী 'ডক্টর ফস্টাস'। মার্লোর ভাষা ছিল কাব্যধর্মী ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ।

॥ উইলিয়াম শেক্সপীয়ার ॥

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার (William Shakespeare—১৫৬৪-১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ) হলেন এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ

নাট্যকার। শুধু এই যুগের কেন, তিনি সম্ভবতঃ সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তিনি সবসুদ্ধ ৩৭ খানি নাটক রচনা করেন। এদের মধ্যে অনেকগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকরূপে পরিচিত। তাঁর রচিত কমেডি বা মিলনান্তক নাটকগুলির মধ্যে 'কমেডি অব এররস্', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'মিড্-সামার নাইট্স্ ড্রিম্', 'অ্যাজ ইউ লাইক্ ইট্' প্রভৃতি নাটক বিখ্যাত। ট্র্যাজেডি বা করুণ রসাত্মক নাটকাবলীর মধ্যে 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'কিং লীয়ার', 'জুলিয়াস সীজার', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি শেক্সপীয়ারের অমর সৃষ্টি।

শেক্সপীয়ারের নাটকের চরিত্রগুলি যেন বিশেষ কোন দেশকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এরা সর্বযুগের সর্বদেশের নরনারীর প্রতিনিধি। অকৃত্রিম সহানুভূতি নিয়ে তিনি সর্বস্তরের মানুষের রূপচিত্র এঁকেছেন। ফলে তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। 'ভেনাস অ্যাণ্ড এডনিস' নামে তাঁর একখানি কাব্যগ্রন্থও আছে। 'সনেট' বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনায়ও তিনি সুদক্ষ ছিলেন।

॥ শেক্সপীয়ারের জীবন-কথা ॥

এত বড় একজন নাট্যকার—বোধ হয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের জীবনী কিন্তু সঠিক জানা যায় না।

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার

২৩শে এপ্রিল ১৫৬৪ সালে স্ট্র্যাট্ফোর্ড আপ্ অন্ অ্যাভন-এ শেক্সপীয়ারের জন্ম হয়েছিল। তাঁর ঠাকুরদা আগে স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে চার মাইল উত্তরে স্নিটার ফিল্ডে বাস করতেন। শেক্সপীয়ারের বাবা জন শেক্সপীয়ার চলে আসেন স্ট্র্যাটফোর্ডে।

শেক্সপীয়াররা চার ভাই, চার বোন ছিলেন। শেক্সপীয়ার বাপ-মার তৃতীয় সন্তান।

শেক্সপীয়ার কিছুকাল স্ট্র্যাটফোর্ডে কাটান। এ সময়ের কোন সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তিনি অভিনেতাদলের নাটক অভিনয় দেখে আর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে দল বেঁধে হইহই করে বেড়াতেন আর নিত্য নতুন হাঙ্গামা বাধাতেন। লেখাপড়া যা করেন তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁর সমসাময়িক একজন নাট্যকার বেন্ জন্সন লিখে গেছেন যে শেক্সপীয়ার সামান্য লাতিন জানতেন আর গ্রীক জানতেন তার চেয়েও কম। তা হলে তাঁর শিক্ষা হয়েছিল প্রকৃতির পাঠশালা থেকে।

শেক্সপীয়ারের কাল বা যুগ ছিল ইংল্যাণ্ডের বড় সমৃদ্ধির যুগ। তখন ইংরেজ প্রতিভা শত ধারায় শত ক্ষেত্রে বিকশিত হয়ে উঠছিল। সে যুগের দীপ্তিও নিশ্চয় শেক্সপীয়ারের মনকে আলোকিত করে তুলেছিল!

উনিশ বছর বয়সে অ্যান হ্যাথাওয়ে নাম্নী একটি মেয়েকে তিনি বিয়ে করেন। ইনি শেক্সপীয়ারের চেয়ে বয়সে আট বছরের বড় ছিলেন। কেউ কেউ বলেন বিয়ের পর শেক্সপীয়ার কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন। কিন্তু মাস্টারী করলেও শেক্সপীয়ারের আসল ঝোঁক ছিল লণ্ডন শহরের দিকে। জাদুর শহর লণ্ডন যেন তাঁকে নিয়ত ডাকত!

এই সময়ে স্থানীয় জমিদার স্যার টমাস লুসীর সংরক্ষিত জঙ্গলে বে-আইনী ভাবে হরিণ শিকার করার অপরাধে শেক্সপীয়ার ও তাঁর সঙ্গীরা অভিযুক্ত হলেন। শাস্তি ও অপমান এড়াতে শেক্সপীয়ার রাতারাতি পালালেন লণ্ডনে।

ভাগ্য এইভাবে তাঁকে এনে ফেলল লণ্ডনে। এখানে এসে পূর্বপরিচিত নাটুকে বন্ধুদের সন্ধান করে শেক্সপীয়ার এক রঙ্গালয়ে একটি চাকরি যোগাড় করলেন। অতি সামান্য চাকরি—মোটেই সম্মানের নয়। যে সব বড়লোক ঘোড়ার গাড়ি করে থিয়েটার দেখতে আসতেন, তাঁদের ঘোড়াদের হেফাজত করাই ছিল শেক্সপীয়ারের কাজ। সেই কাজেই শেক্সপীয়ারের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

শেক্সপীয়ার নাটকের অভিনয় দেখেন আর ঘোড়ার হেফাজত করেন। ক্রমশঃ পেলেন মঞ্চের কাজ। অভিনেতাদের সময়মতো হাজির করার ভার পেলেন তিনি। অর্থাৎ Call-boy-এর কাজ। এর পরে ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয়, তারপরে বড় ভূমিকায় অভিনয়। ক্রমশঃ তিনি পেলেন সহকারী ম্যানেজারের পদ। তারপর পুরোনো নাটক সংস্কার করতে লাগলেন। আবার অপরের সঙ্গে মিলে যৌথ ভাবে নাটকও লিখলেন।

শেষে ধরলেন স্বয়ং নাটক লেখা। প্রতিভা হচ্ছে ছাই-চাপা আগুন। তাঁর প্রতিভা এবার জ্বলে উঠল। নাটকের পর নাটক লিখে তিনি দর্শকদের মুগ্ধ করে ফেললেন।

১৬১০ সালে তিনি লণ্ডন ছেড়ে স্ট্র্যাটফোর্ডে ফিরে গেলেন। ১৬১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল শেক্সপীয়ার মারা যান। তাঁর বাসস্থান এখন বিশ্বের সাহিত্যিকদের এক মহাতীর্থ।

॥ বেন জনসন ॥

শেক্সপীয়ারের পরবর্তী শক্তিমান্ নাট্যকারের নাম বেন (বেঞ্জামিন) জনসন (Ben Jonson—১৫৭২-১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি সমসাময়িক সমাজ ও মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও আচার-আচরণের প্রতি ব্যঙ্গ করে অনেকগুলি নাটক রচনা করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'এভ্রি ম্যান্ ইন্ হিজ্ হিউমার', 'এভ্রি ম্যান্ আউট্ অব হিজ্ হিউমার', 'সিন্‌থিয়াস্ রেভেল্‌স্', 'ভলপোন অব দি ফক্স্', 'দি অ্যাল্‌কেমিস্ট্'।

বেন জনসন

এঁরা ছাড়াও আর যে সব নাট্যকার তখন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন বোমণ্ট (Beaumont—১৫৮৪-১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ), ফ্লেচার (Fletcher—১৫৭৯-১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ), জন ওয়েবস্টার (John Webster—১৫৮০-১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ), জর্জ চ্যাপম্যান (George Chapman—১৫৫৯-১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ), টমাস মিডলটন (Thomas Middleton—১৫৭০-১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি। সেটা ছিল নাটকের যুগ। এত নাট্যকার এক সঙ্গে মিলে বোধহয় আর কোন সময়ে নাটক লেখেন নি।

ইংরেজী সাহিত্যের আধুনিক যুগ

॥ ফ্রান্সিস বেকন ॥

এলিজাবেথের সময়ে গদ্যসাহিত্যও অনেক উন্নতি করে। ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon—১৫৬১-১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর প্রবন্ধগুলি লিখে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে 'এসেজ্', 'নোভাস অর্গানাম' এবং 'অ্যাটলান্টিস' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী (Lord Chancellor) ছিলেন। অনেকে মনে করতেন যে, শেক্সপীয়ারের নামে যে নাটকগুলি লেখা হয়েছিল সেগুলি বেকনের রচনা। এ ধারণা অবশ্য ভুল।

॥ বাইব্‌লের অনুবাদ ॥

খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইব্‌ল্ (Bible). এর প্রথম দিকের ওল্ড টেস্টামেণ্ট অংশ হিব্রু ভাষায়, এবং শেষ অংশ নিউ টেস্টামেণ্ট হচ্ছে গ্রীক ভাষায় লেখা।

এলিজাবেথের উত্তরাধিকারী রাজা প্রথম জেমসের নির্দেশে ৪৭ জন পণ্ডিত মিলে বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদ করেন ও ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদের ভাষা যেমন সরল তেমনি স্বচ্ছন্দ। এই বাইবেলের ভাষা ইংরেজী সাহিত্যকে প্রচুর প্রভাবিত করে। এর নাম হচ্ছে Authorised Version of the Holy Bible. ইংরেজী সাহিত্যে এর স্থান অতি উচ্চে।

॥ মিলটন ॥

ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম হলেন জন মিলটন (John Milton—১৬০৮-১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি বাল্যকাল থেকেই কাব্য রচনা করলেও বড় হয়ে পিউরিট্যান হিসেবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। পরে তিনি অন্ধ হয়ে যান। অন্ধ হবার পরই তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য দুটির নাম 'প্যারাডাইজ লস্ট' ও 'প্যারাডাইজ রিগেণ্ড্'।

এ ছাড়া 'ল্যালেগ্রো', 'ইল্‌পেনসেরোসো' নামক কাব্য ও 'স্যামসন অ্যাগোনিসটেস' নামক গ্রীক আঙ্গিকে একটি নাটকও তিনি লিখেছিলেন।

॥ ড্রাইডেন ॥

জন ড্রাইডেন (John Dryden—১৬৩১-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রধানতঃ ব্যঙ্গ-কবিতা লিখে যশ অর্জন করেন। মহাকাব্যের গাম্ভীর্য বজায় রেখে তিনি ব্যঙ্গ কবিতাকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর লেখা ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে 'ম্যাক্‌ফ্লেক্‌নো' ও 'অ্যাবসালোম অ্যাণ্ড এসিটোফেল্' বিখ্যাত। এছাড়া তিনি অনেক কবিতা ও নাটক লিখেছিলেন। তাঁর লেখা 'অল্ ফর লাভ' অ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে লেখা এক অপূর্ব নাটক।

জন মিলটন

॥ অন্যান্য নাট্যকার ॥

উইলিয়াম উইচারলি (William Wycherly—১৬৪০-১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ) কয়েকটি কমেডি লিখে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সময়ে উইলিয়াম কংগ্রীভ (William Congreve—১৬৭০-১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ) কমেডি রচনায় উইচারলির চেয়েও সার্থকতা অর্জন করেন। এছাড়া উইলিয়াম ড্যাভেন্যাণ্ট (William Davenant—১৬০৬-১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ), জন ভ্যানব্রু (John Vanbrugh—১৬৬৪-১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ), জর্জ ফার্কার (George Farquhar—১৬৭৮-১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি নাট্যকারের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ পোপ ॥

পরবর্তী যুগের কবি হলেন আলেকজাণ্ডার পোপ (Alexander Pope—১৬৮৮-১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)। পোপ ছিলেন একরকম স্বভাব-কবি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'এসে অন ম্যান'। তিনি হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি'র অনুবাদও করেছিলেন।

ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁর হাত ছিল। তাঁর লেখা 'দি রেপ অফ দি লক' ও 'ডানসিয়াড' (Dunciad) ব্যঙ্গ কবিতা হিসাবে বিখ্যাত।

॥ সুইফ্‌ট্ ॥

জোনাথন সুইফ্‌ট্ (Jonathan Swift—১৬৬৭-১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যঙ্গকার হিসাবে সাহিত্যে আবির্ভূত হন। 'গালিভারস ট্র্যাভেলস্' তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি। এই বই ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

জোনাথন সুইফ্‌ট্‌

॥ উপন্যাস সাহিত্য ॥

জন বানিয়ানের (John Bunyan ১৬২৮ - ১৬৮৮—খ্রীষ্টাব্দ) লেখা 'দি পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস ফ্রম দিস ওআর্লড টু দ্যাট হুইচ ইজ টু কাম' একখানি রূপক উপন্যাস।

হেনরি ফিল্ডিং

এর পর ডানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe—১৬৬০-১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দ) লিখলেন 'রবিনসন ক্রুসো'। এটি সারা পৃথিবীর সব ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

তারপর স্যামুয়েল রিচার্ডসন (Samuel Richardson—১৬৮৯-১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ), হেনরি ফিলডিং (Henry Fielding—১৭০৭-১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ), টোবিয়াস স্মলেট্‌ (Tobias Smollet—১৭২১-১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ) ও লরেন্স স্টার্ন (Laurence Sterne—১৭১৩-১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসের পর উপন্যাস লেখেন। অলিভার গোল্ডস্মিথ ও ডাক্তার জনসনও কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছিলেন।

এই সব উপন্যাসের মধ্যে রিচার্ডসনের 'পামেলা', ফিলডিং-এর 'টম জোনস' ও 'জোসেফ অ্যাণ্ড্রুস'; স্মলেটের 'পেরিগ্রিন পিক্‌ল্‌',গোল্ডস্মিথের 'দি ভিকার অব ওয়েকফিল্ড', ডাক্তার জনসনের 'র্যাসেলাস' খ্যাতি অর্জন করে।

॥ ডাক্তার জনসন ॥

স্যামুয়েল জনসন (Samuel Johnson—১৭০৯-১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) এই যুগের একজন দিক্‌পাল সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্য বিচার এবং ইংরেজী ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁর লেখা 'দি লাইফস অব দি পোয়েটস্‌' বইয়ে ২২ জন কবির জীবনী প্রকাশিত হয়। তিনি প্রথম ইংরেজী ভাষায় একখানি অভিধান প্রকাশ করেন।

॥ অলিভার গোল্ডস্মিথ ॥

অলিভার গোল্ডস্মিথের (Oliver Goldsmith—১৭৩০-১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) লেখা 'দি সিটিজেন অব দি ওয়ার্লড' একটি বিখ্যাত রচনা। এই ব্যঙ্গ কাহিনীতে কয়েকটি অমর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ইনি কিছু সার্থক কাব্যও রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা উপন্যাস 'দি ভিকার অফ ওয়েকফীল্ড' এবং নাটক 'শী স্টুপ্‌স্‌ টু কঙ্কার'ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়া তিনি বহু কাব্যও লিখে গেছেন।

॥ এডওয়ার্ড গিবন ॥

এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon—১৭৩৭-১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) ইতিহাসকে সাহিত্য শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তাঁর লেখা বিরাট গ্রন্থ 'দি ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অব দি রোম্যান এম্পায়ার' ইংরেজী সাহিত্যের একটি বিরাট স্তম্ভ।

॥ নাটক ও নাট্য সাহিত্য ॥

শেরিড্যান Sheridan—১৭৫১-১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ)

টোবিয়াস স্মলেট্‌

নাট্যকার হিসেবে এ যুগে খুব নাম করেছিলেন। তাঁর লেখা 'দি রাইভ্যালস' ও 'দি স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল' ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটিয়ে লোককে আনন্দ দিয়েছিল।

॥ প্রাক-রোমাণ্টিক কাব্য ॥

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ইংরেজী কাব্যে একটা নতুন সুর শোনা যেতে লাগল। জেমস্ টমসন (James Thomson—১৭০০-১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ), টমাস গ্রে (Thomas Gray—১৭১৬-১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ), উইলিয়াম কলিন্স (William Collins—১৭২১-১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতির কাব্যে সৌন্দর্যপ্রীতি, প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা, আত্মনিষ্ঠা আর অকারণ বিষণ্ণতা প্রভৃতি নতুন লক্ষণ দেখা গেল। এঁদের সঙ্গে সুর মেলালেন উইলিয়াম কুপার (William Cowper—১৭৩১-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) ও টমাস চ্যাটারটন (Thomas Chatterton—১৭৫২-১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ)।

এই সময়ে স্কটল্যাণ্ডের এক কৃষক কবি তাঁর গ্রাম্য ভাষায় কবিতা লিখতে শুরু করলেন। কৃষক কবির সরল অনাড়ম্বর ভাব পাঠকদের মুগ্ধ করে দিল। এই কবির নাম রবার্ট বার্নস (Robert Burns—১৭৫৯-১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর কাব্যে মানুষের মহত্বের কাহিনী প্রচারিত হল এবং সাম্যের বাণী সকলের হৃদয় স্পর্শ করল। তাঁর একটি সুপরিচিত কবিতা 'The Cottar's Saturday Night.'

॥ রোমাণ্টিক যুগ ॥

১৭৮৯-১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব ঘটে। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ যুগ্মভাবে 'লিরিক্যাল ব্যালাডস' নামক কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখন থেকে রোমাণ্টিক যুগ শুরু হয়। উইলিয়াম ব্লেক (William Blake—১৭৫৭-১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ) এক নতুন ভাবের কবিতাবলী প্রকাশ করেন।

॥ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ॥

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (William Wordsworth—১৭৭০-১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) বলতেন কবিতার ভাষা জনসাধারণের মুখের ভাষার মতো সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর হওয়া উচিত। এই তত্ত্ব নিয়ে কবিতার আসরে নামলেন দু' জন কবি—ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ

তাঁর বহু সুমধুর কবিতার মধ্যে 'লুসী গ্রে', 'দি সলিটারী রীপার', 'ড্যাফোডিল্‌স্' খুবই সুপরিচিত। প্রকৃতি প্রেমিক এই কবি বহু কাব্য লিখেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ কাব্যগুলি পড়লে এই ধারণা হয় যে প্রকৃতিরও একটি সত্তা আছে। তা মানব মনে প্রভাব বিস্তার করে মানবচরিত্র মহান্ ও উন্নত করতে পারে।

॥ স্যামুয়েল টেলার কোলরিজ ॥

স্যামুয়েল টেলার কোলরিজ (Samuel Taylor Coleridge—১৭৭২-১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) যা লিখে গেছেন তার মধ্যে 'কুবলা খান', 'দি রাইম অব দি এনসেণ্ট মেরিনার' ও 'ক্রিস্টাবেল' বিখ্যাত রচনা। কুবলা খান ও ক্রিস্টাবেল অসমাপ্ত। 'কুবলা খান' কবিতাটি স্বপ্নে পাওয়া। ঘুমের ওষুধ খেয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়ে কুবলা খানের রাজপ্রাসাদের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন জেগে উঠে তাই লিখে ফেলেন। তাঁর ধারণা যে কবিতাটি তিনি ঘুমের ঘোরেই লিখেছিলেন।

কোলরিজ

॥ স্যার ওয়াল্টার স্কট ॥

এই সময়ে কাহিনী কাব্য লিখে স্যার ওয়াল্টার স্কট (Sir

স্যার ওয়াল্টার স্কট

Walter Scott—১৭৭১-১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) খুব নাম করেছিলেন। স্কটের 'দি লে অব দি লাস্ট মিনস্ট্রেল', 'দি লেডি অব দি লেক' ও 'মারমিয়ন' কাব্য-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য দান। তাঁর কাব্যকাহিনীগুলির মধ্যে যেমন নানা ঘটনার সমাবেশ তেমনি অপূর্ব কল্পনার মনোহর লীলা। ঔপন্যাসিক হিসেবেও স্কট প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এই সময়ে রবার্ট সাউদি (Robert Southey—১৭৭৪—১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ), টমাস মূর (Thomas Moore—১৭৭৯-১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ), টমাস ক্যাম্বেল Thomas Campbell—১৭৭৭-১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) ও ল্যাণ্ডরও (Walter Savage Landor—১৭৭৫-১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এঁরা কেউই খুব শক্তিশালী কবি ছিলেন না। কিন্তু সকলে মিলে নানা ললিত কাব্যে ইংরেজী সাহিত্যের কুঞ্জ পিক-কলরবে মুখর করে তুলে ছিলেন। সাউদি ও ল্যাণ্ডর গদ্য রচনাতেও সমান পারদর্শী ছিলেন। সাউদির Life of Nelson আর ল্যাণ্ডরের Imaginary Conversation (কাল্পনিক কথোপকথন) ইংরেজী গদ্য সাহিত্যে সার্থক সৃষ্টি।

রবার্ট সাউদি

শেলি

॥ পার্সি বিশ শেলি ॥

পার্সি বিশ শেলি (Percy Bysshe Shelley—১৭৯২-১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ) গীতি-কবিতা, কাব্যনাট্য ও কাহিনী-কাব্য লিখে জনচিত্ত জয় করে ছিলেন। তাঁর 'অ্যালাস্টার', 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড্' এবং 'স্কাইলার্ক', 'ওয়েস্ট উইণ্ড' ইত্যাদি 'ওড' জাতীয় কবিতা কাব্যকলার আশ্চর্য নিদর্শন। শেলীর কাব্যে কল্পনার যে সূক্ষ্ম লীলা আর শব্দ ব্যবহারের চাতুর্য—তা বিশ্বের কবিদের বিস্ময়। বক্তব্য সঠিক ভাবে প্রকাশ করার ব্যাকুল প্রচেষ্টা তাঁর কাব্যকে এক অপূর্ব সুষমা-মণ্ডিত করেছিল।

॥ জন কীটস ॥

জন কীটস (John Keats—১৭৯৫-১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ) ছাব্বিশ বছর বয়সে মারা যান। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে সব কাব্য রচনা করে যান সেগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ্। তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'এনডিমিয়ন' (Endymion) নানা দোষ-ত্রুটিপূর্ণ হলেও মহা

কীটস

সম্ভাবনার ইঙ্গিত তাতে ছিল। কাহিনী-কাব্য 'লেমিআ', 'ইসাবেলা অর দ্য পট অব বেসিল' ও 'দ্য ইভ অব সেণ্ট অ্যাগনেস' তাঁর সৌন্দর্যপ্রীতি ও আশ্চর্য বাক্য-প্রয়োগ-পদ্ধতির পরিচয় বহন করে রেখেছে। এ ছাড়া তাঁর কয়েকটি 'ওড' বা প্রশস্তি-জাতীয় কবিতা, যথা—'নাইটিংগেল', 'অটাম', 'গ্রীসিয়ান আর্ন' এবং কিছু সনেট অমর সাহিত্য হয়ে আছে। কীটস্ ছিলেন এক বিরল প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। তাঁর কাব্য দ্যুতিমান হীরকের ন্যায় বর্ণালি-সমৃদ্ধ। অনেকে বলে থাকেন যে শব্দচয়ন ও প্রয়োগে তিনি শেক্স-পীয়ারের সমকক্ষ ছিলেন।

॥ জর্জ গর্ডন বায়রন ॥

জর্জ গর্ডন বায়রন (George Gordon Byron—১৭৮৮-১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ) বেঁচে থাকতে থাকতে প্রভূত যশ লাভ করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীমূলক কাব্য 'চাইল্ড হ্যারলডস পিলগ্রিমেজ' (Childe Harold's Pil-grimage) চার সর্গে প্রকাশিত হয়ে তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দেয়। 'দ্য গাওয়ার' (The Giaour), 'দ্য ব্রাইড অব অ্যাবিডস', 'লারা' ইত্যাদি খুব জনপ্রিয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'ডন জুয়ান' ষোল সর্গে লেখা। এটি ব্যঙ্গাত্মক (satire) কবিতা।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করে গ্রীক শিবিরে বায়রনের মৃত্যু হয়। তিনি গ্রীস দেশকে ভালবাসতেন, ভালবাসতেন স্বাধীনতা।

॥ রোমাণ্টিক যুগের গদ্য ॥

বায়রন

ডি কুইনসি (De Quincey—১৭৮৫-১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ), হ্যাজলিট (Hazlitt—১৭৭৮-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ), ল্যাম (Charles Lamb—১৭৭৫-১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) এই যুগের বিখ্যাত গদ্য-লেখক। ডি কুইনসির 'কনফেসনস অব অ্যান ওপিয়াম ইটার' (Confessions of an Opium Eater), হ্যাজলিট-এর প্রবন্ধ এবং ল্যামের 'এসেস অব ইলিয়া' (দুই খণ্ডে প্রকাশিত) ইংরেজী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

॥ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট ॥

স্কটের কবিতার কথা আগে বলা হয়েছে। কাব্য জগতে বায়রনের আবির্ভাবের পর স্কটের কাহিনীকাব্য লোককে কিছুটা মুগ্ধ করলেও এতে স্কটের মন ভরল না। তাই কবিতা লেখা ছেড়ে তিনি উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ওয়েভার্লি' তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলল। তারপর তিনি লিখে চললেন 'ওল্ড মরট্যালিটি', 'রব রয়', 'আইভ্যানহো', 'ট্যালিসম্যান', 'রেড গণ্টলেট্', 'কেনিলওয়ার্থ', 'ব্রাইড অব ল্যামারমুর' ইত্যাদি উপন্যাস। ইতিহাস তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠল।

স্কটের উপন্যাসগুলি যেমন ঘটনা-বহুল, বর্ণিত চরিত্রগুলি তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। সেগুলিকে রক্ত মাংসের মানুষ করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর বাস্তবধর্মী কল্পনার সাহায্যে। উপন্যাসে তিনি এক নতুন রসের আমদানি করেছিলেন—তা ঐতিহাসিক রস—প্রাচীনতার স্বাদ।

॥ [illegible]ন অস্টেন ॥

সেই সময়ের মহিলা ঔপন্যাসিক জেন অস্টেন (Jane Austen—১৭৭৫-১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনিই পারিবারিক উপন্যাসের প্রবর্তন করেন। তাঁর 'সেন্স অ্যাণ্ড সেন্সিবিলিটি', 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস', 'ম্যানসফিল্ড পার্ক', 'এমা' ইত্যাদি সামাজিক উপন্যাসের এক নতুন আদর্শ।

জেন অস্টেন

॥ কাব্য ঃ টেনিসন ও ব্রাউনিং ॥

রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে (১৮৩৭-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ) বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এই যুগের দুই বিরাট প্রতিভা অ্যালফ্রেড টেনিসন (Alfred Tennyson—১৮০৯-১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ) ও রবার্ট ব্রাউনিং (Robert Browning—১৮১২-১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

টেনিসন প্রথম জীবনে সৌন্দর্যপ্রেমিক ও প্রকৃতির প্রতি আসক্ত ছিলেন। পরে তিনি সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং 'লক্সলি হল' (Locksley Hall) কবিতায় বহু সামাজিক সমস্যার অবতারণা করেছেন। তাঁর লেখা 'ইন্ মেমোরিয়াম' একটি কালজয়ী কাব্য। তিনি লর্ড উপাধি পেয়েছিলেন। টেনিসনের কাব্যসম্ভার বিরাট। তিনি 'The Princess' নামক এক দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। তাছাড়া কাহিনীমূলক বহু কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন। ছোট ছোট গীতি-কবিতাগুলি ছন্দমধুর ও অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়। তাঁর কবিতার মধ্যে সেই যুগের ভাবধারা মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

ব্রাউনিং-এর 'পিপা পাসেস' গীতিকাব্যধর্মী অসাধারণ কবিতা। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মনোলোগ' (Monologue)-জাতীয় কাব্য রচনা। এইসব 'মনোলোগ' তিনি ব্যক্তিদের মুখ থেকে তাদের মনের কথা অপূর্ব দক্ষতায় প্রকাশ করেছিলেন। কি মনস্তত্ত্বে, কি কবি-কল্পনায় এমন অনবদ্য সুন্দর কাব্যগুচ্ছ বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। তাঁর কবিতা আপাত-দৃষ্টিতে কঠিন কিন্তু একটু মন দিয়ে পড়লে মনে হবে যে পাহাড় বেয়ে ঝর্ণার ধারা বইছে। তাঁর দীর্ঘতম রচনা বোধহয় 'দ্য রিং অ্যাণ্ড দি বুক'।

॥ অন্যান্য কবি ॥

ব্রাউনিং-এর স্ত্রী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (Elizabeth Barrett Browning—১৮০৬-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ)-ও একজন প্রতিভাময়ী কবি ছিলেন। তাঁর লেখা 'দ্য সনেট্স ফ্রম দ্য পোর্টুগিজ' বিখ্যাত। ম্যাথু আর্নল্ড (Matthew Arnold—১৮২২-১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ), আর্থার হিউ ক্লাও (Arthur Hugh Clough—১৮১৯-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

জর্জ মেরেডিথ (George Meredith—১৮২৮-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ), টমাস হার্ডি (Thomas Hardy—১৮৪০-১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। এছাড়া রাডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling—১৮৬৫-১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)-এর 'ব্যারাক রুম ব্যালাডস'ও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

রসেটি—ভ্রাতা ও ভগ্নী (ভ্রাতা—D. G. Rossetti—১৮২৮-১৮৮২; ভগ্নী—Christina Rossetti—১৮৩০-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, সুইনবার্ন (Swinburne—১৮৩৭-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ) ও মরিস (Morris—১৮৩৪-১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) একটি কবিদল সৃষ্টি করেন। রসেটি কবি ও চিত্রশিল্পী ছিলেন। ডি. জি. রসেটির 'দ্য ব্লেসেড ড্যামোজেল' ইত্যাদি চিত্রধর্মী গীতি-কবিতা, মরিসের 'দি আর্থলি প্যারাডাইজ' ও সুইনবার্নের 'পোএমস অ্যাণ্ড ব্যালাডস' বিখ্যাত। তাঁর নাট্যকাব্য 'অ্যাটলাণ্টা ইন ক্যালিডন' বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

॥ গদ্য সাহিত্য ॥

কার্লাইল (Carlyle—১৭৯৫-১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ)-এর 'সার্টর রিসার্টাস', 'পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট', 'হিরোজ অ্যাণ্ড হিরো ওয়ারশিপ' ও 'দ্য ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন' গুরুত্বপূর্ণ গদ্য সাহিত্য।

কার্ডিন্যাল নিউম্যানের (Cardinal Newman—১৮০১-১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ) 'দি আইডিয়া অব এ ইউনিভার্সিটি ডিফাইণ্ড' চিন্তা-জগতে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। ম্যাথু আর্নল্ড 'কালচার অ্যাণ্ড এনার্কি', গ্রন্থ ও 'দি এসেজ ইন ক্রিটিসিজম' লিখে ইংরেজী গদ্য সাহিত্য ও চিন্তা-জগতে নতুন ভাবের ঢেউ তোলেন।

॥ উপন্যাস ॥

ভিক্টোরিয়ান যুগের উপন্যাস-সাহিত্যে দুই মহান্ শক্তিধর ছিলেন চার্লস ডিকেন্স (Charles Dickens—১৮১২-১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ) ও উইলিয়ম মেকপীস

চার্লস ডিকেন্স

থ্যাকারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দ্য ভ্যানিটি ফেয়ার'। এই উপন্যাসের কোন নায়ক নেই। থ্যাকারে জন্মেছিলেন কলকাতায়।

উইলিয়াম থ্যাকারে

থ্যাকারে (William Makepeace Thackeray—১৮১১-১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁরা দু'জন আর জর্জ এলিয়ট (George Eliot—১৮১৯-১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ) নামে মহিলাও উপন্যাসে অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

জর্জ এলিয়টের আসল নাম মেরী অ্যান ইভান্স। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে 'অ্যাডাম বীড', 'দ্য মিল অন দ্য ফ্লস' আর 'সাইলাস মার্নার' বিখ্যাত।

চার্লস ডিকেন্স ছিলেন একজন সাংবাদিক। তিনি 'পিকউইক পেপারস', 'অলিভার টুইস্ট', 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'ওল্ড কিউরিঅসিটি সপ', 'এ টেল অব টু সিটিজ' ইত্যাদি লিখে প্রভূত যশ অর্জন করেন। তাঁর উপন্যাসে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক বহু কদর্য প্রথার তীব্র সমালোচনা আছে। তাঁর রচিত চরিত্রগুলি প্রাণবান্। তাঁর উপন্যাসে প্রচুর হাস্যরসের উপাদানও আছে।

জর্জ এলিয়ট
(মেরী অ্যান ইভান্স)

এই যুগের আর একটি অতি বিখ্যাত বই হচ্ছে 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড'। তার লেখক লিউইস ক্যারল (Lewis Carroll—১৮৩২-১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) আরও একটি বই লেখেন, 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস'। তাঁর সত্যিকার নাম ছিল সি. এল. ডজসন। ইংরেজী সাহিত্যে তিনি 'ননসেন্সের' (আজগুবি, অর্থহীন মজার ব্যাপারের) আমদানি করেন। তাঁর সাহিত্য ছেলেবুড়ো সকলের মনোরঞ্জন করেছিল। উদার কল্পনার রাজ্য হচ্ছে উদ্ভটের রাজ্য—এখানে সব কিছুই সম্ভব। সব কিছুই খাপছাড়া, খেয়ালী কল্পনার সৃষ্টি। বাস্তবের নিয়ম-বাঁধা রাজ্যের বাইরে, এখানে মানুষ এসে একটু হাঁফ ছাড়তে পারে, হাসতে পারে অবাধে।

॥ টমাস হার্ডি ॥

টমাস হার্ডির জনপ্রিয়তার মূলে তাঁর ট্র্যাজেডী-মূলক মনোভাব। তিনি দুঃখবাদী। ভগবানের অমোঘ বিধানে মানুষ যে কষ্ট পায় তা তিনি বারবার

লিউইস ক্যারল

অতি মর্মন্তুদ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর লেখা 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড', 'দ্য রিটার্ন অব দ্য নেটিভ', 'টেস অব দ্য ডি-আর্বারভিল্স্' ইত্যাদি বই সাহিত্যে তাঁকে অমর করে রাখবে।

॥ আর. এল. স্টিভেনসন ॥

আর. এল. স্টিভেনসন (Robert Louis Stevenson—১৮৫০-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) কবিতা ও উপন্যাস লিখে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের স্যামোয়া দ্বীপে থাকতেন। তাঁকে দ্বীপবাসীরা "টুসিটালা" (গল্পকথক) আখ্যা দিয়েছিল।

তাঁর লেখা অমর শিশু-সাহিত্য হচ্ছে 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড', 'কিড্‌ন্যাপড' ও 'ব্ল্যাক অ্যারো'। তাঁর লেখা 'ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড' রহস্য উপন্যাস হিসেবে পৃথিবীতে আলোড়ন এনেছিল।

॥ নাটক ॥

নাটকে সবচেয়ে যিনি কৃতিত্ব দেখিয়ে সারা পৃথিবীকে আশ্চর্য করেছেন তিনি হলেন আইরিশ লেখক জর্জ বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw)। তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম G. B. S. (জি. বি. এস.—১৮৫৬-১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি তাঁর নাটকগুলিতে নানা সাময়িক সমস্যা তুলে ধরেছেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান'। তাঁর নাটকগুলির প্রথমেই তাঁর ভূমিকাটি দীর্ঘ। নাটকের সমস্যাগুলি তিনি এই ভূমিকায় আলোচনা করে প্রথমেই লোকের বুদ্ধিকে উসকে দেন। সমস্যামূলক নাটক লিখলেও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে।

আর. এল. স্টিভেনসন

টি. এস. এলিয়ট (T. S. Eliot—১৮৮৮-১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)-এর 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' একটি সুন্দর নাটক। এলিয়ট একজন শ্রেষ্ঠ কবিও।

জন গলসওয়ার্দিও (John Galsworthy—১৮৬৭-১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) কিছু সমস্যামূলক নাটক লিখেছেন। যেমন, দ্য স্টাইক্, জাষ্টিস্ ইত্যাদি।

॥ উপন্যাস ॥

উপন্যাস সাহিত্যে যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে জোসেফ কনরাড (Joseph Conrad—১৮৫৭-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ), এইচ. জি. ওয়েলস (H. G. Wells—১৮৬৬-১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ), ডি. এইচ. লরেন্স (D. H. Lawrence — ১৮৮৫-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) ও জন গল্স্‌ওয়ার্দি (John Galsworthy—১৮৬৭-১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) বিখ্যাত। গল্স্‌ওয়ার্দির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে 'দ্য ফরসাইট সাগা' নামক এপিক উপন্যাস গুচ্ছ।

জন গলসওয়ার্দি

এইচ. জি. ওয়েলস বহু বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্পগুলি (যথা—দ্য ইনভিজিব্‌ল ম্যান, দ্য টাইম মেশিন, দ্য শেপ অব থিংস টু কাম) সর্বদেশে

এইচ. জি. ওয়েলস

জি. কে. চেস্টারটন

আদর পেয়েছে। তাঁর 'দ্য আউটলাইন অব হিস্ট্রী' এবং 'ওঅর্ক ওয়েল্থ্ অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস অব ম্যানকাইণ্ড' বিখ্যাত বই। ওয়েলস ছিলেন একাধারে ভবিষ্যদ্বক্তা, প্রচারক, বিজ্ঞানের সূত্র আবিষ্কারক, কাল্পনিক স্বর্গ-নির্মাতা আর ইতিহাসের কথক। উদার কল্পনা একদিকে আর একদিকে সূক্ষ্ম তালমান জ্ঞান—দুটিকে সামঞ্জস্য করে তিনি এক বিরাট সাহিত্য-সৌধ নির্মাণ করে গেছেন।

রহস্য উপন্যাস লিখে জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (Sir Arthur Conan Doyle—১৮৫৯-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর 'দ্য হাউণ্ড অব দ্য বাস্কারভিলস', 'লস্ট ওয়ার্লড্', 'শার্লক হোমস'-এর গল্পগুলি সারা পৃথিবীর পাঠকদের প্রচুর আনন্দ দান করেছে।

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

জি. কে. চেস্টারটন (১৮৭২-১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) এ যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিভা। তিনি কিছু কাব্য লিখেছেন কিন্তু গদ্য লেখক হিসাবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। তাঁর ভাষা বর্ণাঢ্য এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমলে। তিনি বহু সমালোচনা গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর ছোট গল্পগুলি, বিশেষ করে ফাদার ব্রাউনের রহস্যমূলক কাহিনী জনচিত্ত জয় করেছিল। কোনান ডয়েলের গোয়েন্দা যেমন শার্লক হোমস তেমনি জি. কে. চেস্টারটনের গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউন। উভয়েরই বুদ্ধি কুশাগ্র, উভয়েই মনস্তাত্ত্বিক।

ফরাসী সাহিত্যের কথা

ফরাসী সাহিত্যের শুরু হয় কতকগুলি গল্প দিয়ে। মধ্যযুগের ফ্রান্সে ফরাসী মায়েরা সেণ্ট মেরীর অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। সাধু-সজ্জনদের জীবনের অলৌকিক কাহিনী তাঁরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। এই সময়ে ফরাসী ভাষায় তাঁদের অমর বীরদের কাহিনী স্থান পেতে লাগল। ইসলামের ভয়ে ফ্রান্স তখন থরহরি কম্পমান। ঠিক সেই সময়ে আবির্ভূত হলেন শার্লেমেন (Charlemagne). তাঁর অদ্ভুত কীর্তিকাহিনীতে ভরে উঠল ফরাসী সাহিত্য। 'সঙ্ অব রোলাণ্ড' এই সময়কার এক অপূর্ব সাহিত্য।

কিন্তু এসব পুরোনো গান ও কাহিনী বেশীদিন লোকের মন ভোলাতে পারল না। গ্রীস ও রোমের বীরদের কথা তাদের কানে এসে পৌঁছতে লাগল। জুলিয়াস সীজার, আলেকজাণ্ডার, হেক্টর বা ঈনিয়াসের কাহিনী আজগুবি ঘটনায় পূর্ণ হলেও তারা বিনা বিচারে মেনে নিতে লাগল। তখন ফরাসী সাহিত্য রূপকথার পর্যায় কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ঈশপের গল্প নতুন রূপে নতুন রসে যুক্ত হয়ে ফ্রান্সের সাহিত্যকে আনন্দোচ্ছল করে তুলল। সেকালের 'রেনার্ড দ্য ফক্স' একটি মজাদার ও বিখ্যাত গল্প। ক্রমে ক্রমে ফরাসী সাহিত্যে এল ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুর। কিন্তু ভালবাসার মনোরম কাহিনী ফরাসী সাহিত্যিকরা ত্যাগ করতে পারলেন না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'দ্য রোমান্স অব দ্য রোজ' (The

Romance of the Rose) নামে যে কাব্য লেখা হল তাতে ভালবাসার মহান্ আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হল।

এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন ফ্রয়সার্ট (Froissart—১৩৩৩-১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর বইটি ইতিহাস জাতীয়। এর আগে যে রূপকথা ও কাল্পনিক গল্পের ধারা চলছিল তাতে এল বৈচিত্র্য। হালকা হলেও এ সাহিত্য দেশের সাহিত্যের মোড় ঘোরালো।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে এলেন ফিলিপ ডি কমিন্স (Phillippe de Comines—১৪৪৭-১৫১১ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনিই মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক। ইনি প্রতিভাবান্ ও ভবঘুরে প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু খুব মিষ্টি মধুর সব গান তিনি রচনা করেছেন। গানগুলি দুঃখের গান। তাঁর গানে কোন নীতি-কথা নেই, তবু সেগুলি সকলের অন্তরকে স্পর্শ করল।

এঁর পরেই আর এক বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব হল ফরাসী সাহিত্যে। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মেছিলেন। তাঁর নাম ছিল ফ্রাঁসেয়া র‍্যাবেলে (Frahcois Rabelais—১৪৯৪-১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)। দীর্ঘকাল মঠে কাটালেও ইনি বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চা করতেন। মঠের হাজার রকমের কুসংস্কারে

রেনার্ড দি ফক্স গল্পের পশুদের চরিত্র

র‍্যাবেলে

তিনি তিতিবিরক্ত হয়ে মঠ ছেড়ে দেন। তিনি ক্ষুব্ধ হৃদয়ের শ্লেষ, বিদ্রূপ ও সমালোচনার তীক্ষ্ণ আঘাতে ধর্মজীবনের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন।

তাঁর লেখা গার্গান্টুয়া (Gargantua) ও প্যান্টা গ্রুয়েল (Panta gruel) একটু কঠিন বই। স্পষ্ট কথা আছে সেগুলিতে, ভাষাও অমার্জিত কিন্তু ছলচাতুরি নেই।

এবার এলেন কবি রঁসার (Ronsard—১৫২৪-১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কবির আবির্ভাব ঘটল—সাহিত্য এবার হয়ে উঠল শিল্পকলামণ্ডিত।

তারপর এলেন মাইকেল ডি মঁতেন (Michael de Montaigne—১৫৩৩-১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি একজন প্রবন্ধকার। তাঁর প্রবন্ধগুলো যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি শ্রুতিমধুর। তাঁর রচনা-রীতি সুন্দর। তাঁর মহান্ ভাবগুলির জন্য ফরাসীরা তাঁকে বলতে লাগলেন 'ফরাসীদের সক্রেটিস'।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে আরও বড় বড় দিক্‌পালের আবির্ভাব হল। দেকার্ত (Descartes)

ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার ফ্রান্সের রাজা ফ্রেডারিককে তাঁর লেখা পড়ে শোনাচ্ছেন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন ফরাসী লেখক ও দার্শনিক ভলতেয়ার (Voltaire—১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁর বিদ্রোহ ধর্মজগতে রোমের আধিপত্যের বিরুদ্ধে। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন আর মানবাত্মার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আস্থাবান্ ছিলেন। তাঁর সময়ে আর এক ক্ষমতাশালী লেখকের আবির্ভাব ঘটল। তাঁর নাম জাঁ জ্যাক্‌স্ রুশো (Jean Jacques Rousseau, ১৭১২-১৭৭৮). তিনি অতীতের পূজারী ছিলেন। বর্তমান যুগকে তিনি দাসত্বের যুগ বলে অভিহিত করলেন। তাঁর Le Contract Social বইখানা পরবর্তী ফরাসী বিপ্লবের অবলম্বনস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এই বইয়ের প্রথম বাক্য, Man is born free, but everywhere he is in chains—একটি অবিস্মরণীয় উক্তি।

ফরাসীদের মধ্যে নব ভাবের বন্যা এল—পুরোনকে ছেড়ে নতুনকে আহ্বান করে নেবার এল এক দুর্বার আবেগ। এই সময়ে এক ঘড়িওয়ালার ছেলে রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয় করিয়ে ফরাসীদের নবযুগ এনে দিলেন। তাঁর নাম বো মারশে (Beaumarchais). তিনি ফরাসীদের মধ্যে প্রচার করলেন যে, তারা মানুষ হয়েও আচারের অধীন হয়ে আত্মস্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছে।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত La Marseillaise লেখা হল। সংগীত রচয়িতার নাম রুঝে ডি লিল (Rouget de Lisle). তারপর এল ফরাসী বিপ্লব, ফরাসীদের ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দাবি ঘোষিত হল। ইওরোপ এ ভাবের বন্যায় ভেসে গেল।

তারপর এলেন দার্শনিক আগস্তে কোঁত (Auguste Comte, ১৭৯৮-১৮৫৭). কোঁতের ভাব যত চমকপ্রদ হোক না কেন ফ্রান্সকে তা বেশীদিন অভিভূত করতে পারল না। আবির্ভূত হলেন বড় বড় প্রতিভাধর

ও পাসক্যাল (Pascal) ছিলেন চিন্তাবীর। এঁদের সঙ্গে আবির্ভূত হলেন মলিয়ের (Moliere), রাসিন (Racine), কর্নেইল (Corneille), ডিডেরো (Diderot), মনটেসকো (Montesquieu), বয়লো-দেপ্রিও (Boileau-Despreaux), মাদাম দ্য সেভিনে (Madame de Sevigne) এবং লা ব্রুয়ের (La Bruyere).

এঁদের মধ্যে পাসক্যাল ও দেকার্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা উভয়েই ছিলেন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। দেকার্ত ভাবের জগতে নব চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন।

মলিয়ের (Moliere, ১৬২২-১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন শ্লেষবিদ্রূপাত্মক নাটকের স্রষ্টিকর্তা। তিনি একজন অভিনেতা ছিলেন। এক অথর্ব লোকের ভূমিকা অভিনয় করতে করতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরে মারা যান। তাঁর মিলনান্তক নাটক ফরাসী জাতিকে হাসতে শিখিয়েছে। তার পরে এলেন রাসিন (Racine) আর লা ফঁতেন (La Fontaine). লা ফঁতেনের ফেবল (fable)-গুলি পশুপাখিদের সম্বন্ধে লেখা। মানুষের মতো তাদের হাবভাব ও কথাবার্তা ফরাসী জাতকে প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষা দিয়েছিল।

লেখক। ভিক্টর হুগো (Victor Hugo—১৮০২-১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) অনবদ্য সৃষ্টি 'দি হাঞ্চব্যাক অব নোৎরদাম্' তাঁকে বিশ্বসাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন করে দিয়েছে।

পরবর্তী ফরাসী সাহিত্যের অন্যান্য দিক্‌পালদের মধ্যে আছেন—বালজাক (Honore de Balzac, ১৭৯৯-১৮৫১ খ্রীঃ), যাঁর একখানা বিখ্যাত বই 'দি হিউম্যান কমেডী' ; ডুমা (Alexandre Dumas, ১৮০২-১৮৭০) যাঁর থ্রী মাস্কেটীয়ার্স, ইত্যাদি বই বিখ্যাত ; মেরিমে (Prosper Merimee, ১৮০৩-১৮৭০ খ্রীঃ) যাঁর 'কলোঁবা' ও 'ব্যার্মন' সুপ্রসিদ্ধ ; সাঁদ (George Sand, ১৮০৪-১৮৭৬ খ্রীঃ) এঁর আসল নাম Amandine Dudevants. তিনি একজন মহিলা ছিলেন ; ফ্লবেয়া (Gustave Flaubert, ১৮২১-১৮৮০ খ্রীঃ) ; জোলা (১৮৪০-১৮৯২ খ্রীঃ), গল্পলেখক ; দোদে (Alphonse Daudet, ১৮৪০-১৮৯৭ খ্রীঃ) ; নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আনাতোল ফ্রাঁস (Anatole France, ১৮৪৪-১৯২৪ খ্রীঃ), যাঁর প্রসিদ্ধ বই Thaise ; গী দ্য মোপাসাঁ (Hessez Rene Albert Guy de Maupassant, ১৮৫০-১৮৯০ খ্রীঃ), যিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক ; এবং রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland, ১৮৬৬- খ্রীঃ), যাঁর লেখা বিরাট উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ্' বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস

জার্মানদের পুরাণের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন সিগফ্রিড্। তাঁকে নিয়ে তাদের অনেক প্রাচীন গান আছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে একজন অজ্ঞাত অস্ট্রিয়ান কবি 'দ্য সং অব দ্য নিবেলংস্' The song of the Nibelungs) নামে একটা কাব্য লিখেছিলেন। এই কাব্যে জার্মান জাতির প্রকৃতি-পূজার কথা আমরা জানতে পারি।

এরপর ধর্মসংস্কার আন্দোলন ইওরোপকে একেবারে বদলে দিল। মার্টিন লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করলেন। জার্মানরা ইওরোপকে উচ্চতর আদর্শ দেখাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হ্যান্স স্যাক্স নামে এক মুচী উৎকৃষ্ট নাটক লিখে লোকের ভাবধারা বদলে দিলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্লপস্টক (১৭২৪-১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ) নামে এক কবির আবির্ভাব হল। তিনি জার্মান সাহিত্যে স্বচ্ছতা আর সরলতা আনলেন।

এর পর গট্‌হোল্ড এফ্রাইম লেসিং (১৭২৯-১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ) এক মহান্ উচ্চ রচনা-রীতির প্রবর্তন করলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ বই 'লাওকুন'—সমালোচনা সাহিত্যের এক স্তম্ভ বললেও হয়।

এর পর এলেন জোহান উলফগ্যাং গয়টে বা গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁকে জার্মান সাহিত্যের মুকুটমণি বলা যায়। মহাকবি গ্যেটে ছিলেন বিজ্ঞানী, ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকার। তিনি লোক-সাহিত্যের গাথা, গান এসব সংগ্রহ করতে ভালবাসতেন।

গ্যেটের অমর নাটক ফাউস্টের (Faust) কাহিনীটি এইরূপ :—ফাউস্ট শয়তানের সঙ্গে এই শর্তে অনন্ত-কালের জন্য তাঁর আত্মা বিক্রয় করতে রাজী হলেন যে শয়তান তাঁকে যা দেবে তাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন, আর অন্য কিছুর চাহিদা তাঁর থাকবে না। শয়তান ফাউস্টকে নতুন যৌবন দিল, ফাউস্ট যা আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলেন শয়তান তাঁকে সে সবই দিতে লাগল, কিন্তু কোন সময়েই ফাউস্ট বললেন না, "থাক,

দ্য সং অব দ্য নিবেলংস-এর একটি দৃশ্য

যথেষ্ট হয়েছে, আমার আর কিছু চাই না।" নানা রকম পাপে ডুবে গেলেও ফাউস্ট্ কল্যাণ, সুন্দর ও সত্য খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু শয়তান এসব তাঁকে দিতে পারল না। কাজেই শয়তান ফাউস্টের আত্মা দখল করতে পারল না।

গ্যেটে মরবার সময়ে বলে উঠেছিলেন, "আলো, আরো আলো।" তিনি সারা-জীবন ছিলেন সৌন্দর্য, জ্ঞান আর আলোর পূজারী।

এর পর জার্মান সাহিত্যে এলেন আর এক শক্তিধর—শিলার (Schiller, ১৭৫৯-১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ)। ইনি ২২ বছর বয়সেই 'দ্য রবার' (Die Rauber) নামে একটি নাটক লিখে ফেললেন। নাটকটি জগৎকে স্তম্ভিত করে দিল। এছাড়া তিনি 'ওয়ালেনস্টাইন', 'ডি যুংফ্রাউ' ইত্যাদি আরো কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন মানুষের স্বাধীনতার কবি।

হাইনরিখ্ হাইনে (Heine, ১৭৯৭-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) জাতিতে ইহুদী ছিলেন। তিনি দুঃখের গান দিয়ে কবিতা লেখা

ঐতিহাসিক থিওডোর মমসেন

শুরু করেছিলেন কিন্তু তাঁর পরবর্তী গান ও কাব্য অতি মধুর ও ব্যঙ্গ-পরিহাসে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

জার্মান নাট্যকার গ্যেটে

জার্মান কাব্য সাহিত্যে গ্যেটে, শিলার আর হাইনে—এই তিনটি নামই সবার উপরে। অন্য কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন থিওডোর স্টর্ম (১৮১৭-১৮৮৮)। আধুনিককালে বিখ্যাত কবি হলেন রিল্‌কে (Rilke).

দার্শনিকদের মধ্যে ইমানুয়েল কাণ্ট আর নীট্‌শের নাম আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া ছিলেন ফিখ্‌টে (Fichte, ১৭৬২-১৮১৪ খ্রীঃ)।

ফ্রেডারিক ফন শিলার

জার্মান সাহিত্যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ফন র‍্যাঙ্কে (Von Ranke, ১৭৬৩-১৮২৩) ও রোমের ইতিহাস প্রণেতা থিওডোর মমসেন (Mom[illegible]en, ১৮১৭-১৯০৩) এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার ছিলেন হেরমান সুডারমান (১৮৫৭-১৯২৮) ও হাউপ্টমান (১৮৬২-১৯৪৬)।

বিংশ শতাব্দীতে উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হয়েছেন এরিখ মারিয়া রিমার্ক (Remarque, জন্ম ১৮৯৬), টমাস ম্যান এবং স্টেফান ৎসোয়াইগ (Zweig). রেমার্ক-এর 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' বইটি বিখ্যাত।

জার্মান শিশুসাহিত্যে দুই ভাই জ্যাকব গ্রিম (Grimm, ১৭৮৫-১৮৬৩ খ্রীঃ), আর হ্বিল্‌হেলম্ গ্রিম (Wilhelm Grimm, ১৭৮৬-১৮৫৯ খ্রীঃ) গ্রিম-দের রূপকথাগুলি জগৎ-প্রসিদ্ধ।

কবি হাইনরিথ্ হাইনে

ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের সাহিত্য

ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের ভাষা একটি সাধারণ ভাষা থেকে হাজার বছর ধরে একটু একটু করে বদলাতে বদলাতে অনেক তফাত হয়ে গেছে। যে আদি ভাষা এদের সকলের এককালে মাতৃভাষা ছিল তা এখন আইসল্যাণ্ডের লোকেরা ব্যবহার করে। দীর্ঘকাল এ-ভাষা মুখে মুখে বলা হত।

তারপর যখন ইংল্যাণ্ডে রাজা উইলিয়ম রাজত্ব করছেন তখন এ ভাষা পশুর চামড়ার উপর লেখা হতে লাগল।

এই পশুর চামড়ায় লেখা কাহিনীগুলোর নাম সাগা (Saga). এখনকার ভাষা এদের ভাষা থেকে অনেক তফাত হয়ে গেছে। পণ্ডিত ছাড়া সে-ভাষা সাধারণ লোক এখন বুঝতে পারে না। কিন্তু নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের বর্তমান ভাষার সঙ্গে তফাত হয়ে গেলেও আইসল্যাণ্ডের ভাষা এক রকমই রয়ে গেছে। সাগা-সাহিত্য এই চার দেশের পুরানো সাহিত্য।

তারপর খ্রীষ্টধর্ম ইওরোপে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এল লাতিন ভাষা। কিন্তু অনেক জাত তাদের মাতৃভাষা ত্যাগ করল না। ইংল্যাণ্ডের কবি চসার

যে ভাষায় তাঁর কাব্য লিখলেন তা ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ একটি সাহিত্য-শ্রীসম্পন্ন ভাষা হয়ে উঠল। সেটার নাম ইংরেজী ভাষা।

সুইডেনের দুজন শক্তিধর লেখক লাতিন ভাষাতেই বই লিখে গেলেন। তাঁদের নাম সুইডেনবর্গ ও লিনেউস্।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহাগেন ছিল তখন সংস্কৃতির কেন্দ্র। নরওয়ের বহু লেখক এই কোপেনহাগেনে এসে জুটলেন এবং তাঁদের রচিত সাহিত্যই ডেনমার্কের সাহিত্য নামে জগতে প্রচারিত হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সাহিত্য বলতে কিছু গাথা ও গান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ডেনমার্কের সাহিত্যে অন্য কোন ফসল ফলে নি। ডেনমার্কের কোন ভদ্রলোকের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তখন এরকম প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে তিনি বন্ধুবান্ধবদের পত্র লিখতেন লাতিন ভাষায়, মহিলাদের সঙ্গে কথা কইতেন ফরাসী ভাষায়, কুকুরদের আদর করে ডাকতেন জার্মান ভাষায় আর চাকরবাকরদের আদেশ করতেন ড্যানিশ ভাষায়।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডেনমার্কের সাহিত্য খুব উন্নত হয়ে উঠেছিল। গীতি-কবিতা, নাটক ইত্যাদি প্রচুর লেখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ান টুলিন, জেন্স ব্যাগিসন, অ্যাডাম ওহ্লেন শ্লেজার ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

যদিও ডেনমার্কের সাহিত্যিকরা রঙ্গমঞ্চকে বেশী করে পছন্দ করতেন এবং নাটক লিখতে উৎসাহ দেখিয়েছেন তবুও বিজ্ঞানে ডেনমার্কের বিশিষ্ট দান ছিল। হ্যানস ক্রিশ্চিয়ান ওয়েরস্টেড ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিজমের আবিষ্কর্তা। তিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু মনোজ্ঞ পুস্তক রচনা করে গেছেন। এই সময়ে উপন্যাস সাহিত্যও খুব উন্নত হয়ে উঠেছিল।

॥ হ্যান্স্ অ্যানডারসেন ॥

শিশুসাহিত্যে হ্যান্স্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যানডারসেন (Hans Christian Andersen—১৮০৫-১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)-এর নাম অমর হয়ে থাকবে। ডেনমার্কের অতি দরিদ্র ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি একাদিক্রমে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে হাত দেন। কিন্তু শিশুদের জন্যে লেখা তাঁর রূপকথাগুলিতে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়। সারা পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা আজ তাঁর এই রূপকথার জাদুতে মুগ্ধ।

প্রবন্ধকার ব্রাণ্ডেস্

॥ ব্রাণ্ডেস্ ॥

জর্জ ব্রাণ্ডেস্ সমালোচক হিসেবে আন্তর্জাতিক যশ অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখা সেক্সপীয়ারের নাট্য সমালোচনা অতি উচ্চাঙ্গের মানসিকতার দ্যোতক।

॥ ইবসেন ॥

নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক ইবসেন (Henrik Ibsen—১৮২৮-১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ) নাটক লিখে ইওরোপে নব-নাট্যকলার সৃষ্টি করেন। সরল
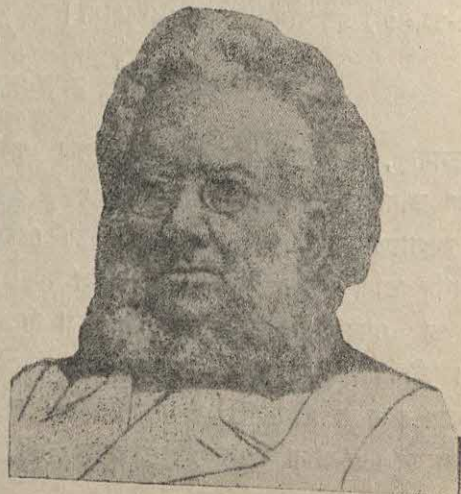
নাট্যকার ইবসেন

ভাষায় নাটকীয় উক্তি যে কত জোরালো করা যায় তার উদাহরণ ইবসেনের নাটক। তাঁর 'ডলস হাউস' আর 'গোস্টস্' নাট্য-সাহিত্যের দুটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।

ইবসেন তাঁর সমাজের মানুষদের দোষত্রুটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাদের অন্যায়, তাদের সব রকমের নীচাশয়তাকে তিনি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। কাজেই কেউ তাঁকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু বিদেশীরা তাঁকে পছন্দ করলেন। বিদেশীদের প্রশংসা করতে শুনে শেষ পর্যন্ত নরওয়ের লোকেরা তাঁকে বুঝতে পারল। তাঁর নাটকগুলি আধুনিক নাটকগুলির মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল।

॥ উপন্যাসের কথা ॥

ইবসেনের পরই নাম করা যায় নরওয়ের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ব্যোর্নস্টার্ন ব্যোর্নসন (Bjornsterne Bjornson—১৮৩২-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি ছিলেন একাধারে একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ্, বক্তা ও নাট্যশালার পরিচালক।

খ্যাতির দিক্ দিয়ে বেশী ছিল জোনাস লাই-এর নাম। তাঁর উপন্যাসগুলি সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। তার কারণ তাঁর বস্তুনিষ্ঠা। কৃষক-জীবনের এমন হুবহু চিত্র এর আগে আর কোন লেখকের লেখায় ফুটে ওঠে নি।

আরো আধুনিককালে উঠলেন নরওয়ের নুট হামসুন (Knut Hamsun—১৮৫৯-১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ)। ইনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেনোবেল পুরস্কার পেলেন। তাঁর 'ক্ষুধা' (Hunger) ইওরোপের প্রায় সব ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দ্য গ্রোথ অব দ্য সয়েল' (The Growth of the Soil) —নরওয়ের কৃষক-জীবনের কাহিনী।

ব্যোর্নসন

সিগ্রিড উণ্ড্সেট

নরওয়ের সিগ্রিড উণ্ড্সেট (Sigrid Undset) ছিলেন একজন জনপ্রিয় মহিলা ঔপন্যাসিক।

গ্রীনল্যাণ্ড ও মেরু অঞ্চলে অভিযানকারী ডাক্তার ন্যানসেনও সাহিত্য-খ্যাতি লাভ করেন। তিনি একজন বিজ্ঞানী ছিলেন এবং তাঁর অভিযানের কথা তিনি লিখে প্রকাশ করেন।

সুইডেনে উচ্চবিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকা উপন্যাস লিখে নোবেল প্রাইজ পান। তাঁর নাম সেলমা লাগেরলফ (Miss Selma Lagerlof) (১৮৫৮-১৯৪০ খ্রীঃ)। তিনিই প্রথম মহিলা-ঔপন্যাসিক যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। এছাড়া তিনি অনেক গল্পও লিখেছিলেন। তাঁর লেখা ইওরোপের বহুদেশে পঠিত হত।

সেলমা লাগেরলফ

আমেরিকান সাহিত্য

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে ছিল ইংরেজদের অধীন।

এর পর শুরু হয়ে গেল স্বাধীনতার যুদ্ধ। এইজন্যে এই সময়কার সাহিত্যের অধিকাংশ হল রাজনীতিভিত্তিক। এই সময় যে সকল ব্যক্তির সাহিত্য কর্ম দ্বারা আমেরিকার সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রথমে নাম করা চলে বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের (১৭০৬-১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁর লেখা 'আত্মজীবনী' নামক গ্রন্থ থেকে সমকালীন অনেক ঘটনার কথা জানতে পারা যায়। তাঁর আর একখানি বিখ্যাত বইয়ের নাম 'ওয়ে টু ওয়েলথ'।

স্বাধীন হবার পর আমেরিকার প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়াশিংটন আর্ভিং (১৭৮৩-১৮৫৯), জেমস ফেনিমোর কুপার (১৭৮৯-১৮৫১), এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯), রালফ ওয়ালডো এমারসন (১৮০৩-১৮৮২), হেনরি ডেভিড থোরো (Thoreau, ১৮১৭-১৮৬২), ন্যাথানিয়েল হথর্ন (১৮০৪-১৮৬৪), হারম্যান মেলভিল (১৮১৯-১৮৯১), ওয়াল্ট হুইটম্যান (১৮১৯-১৮৯২), হেনরি ওয়াড্স্ওয়ার্থ লংফেলো (১৮০৭-১৮৮২), জেমস রাসেল লোয়েল (১৮১৯-১৮৯১), অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস্ (১৮৪১-১৯৩৫), উইলিয়াম হিকলিং প্রেসকট (১৭৯৬-১৮৫৯), জন লোথ্রপ মটলি (১৮১৪-১৮৭৭), ফ্রান্সিস পার্কম্যান (১৮২৩-১৮৯৩)।

ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর রচিত গ্রন্থাবলী : দ্য স্কেচবুক অব জিওফ্রে ক্রেয়ন—জেণ্ট, ব্রেসব্রিজ হল, টেলস অব এ ট্র্যাভেলার, এ ক্রনিকল অব দ্য কনকোয়েস্ট অব গ্রানাডা, দি আলহাম্ব্রা প্রভৃতি। তাঁর লেখা রিপ ভ্যান উইংকলের গল্পও বিখ্যাত। এর মধ্যে সর্বাধিক পঠিত 'দি লিজেণ্ড অব দি স্লিপী হলো'।

জেমস ফেনিমোর কুপার অনেকগুলি উপন্যাস ও ইতিহাস রচনা করেন। এদের মধ্যে সুপরিচিত হল : দ্য পায়োনিয়ার্স, দ্য পাইলট, দ্য লাস্ট অব্ দ্য মোহিকানস, দ্য প্রেরি, দ্য রেড রোভার, গ্লিনিং ইন ইওরোপ, হোমওয়ার্ড বাউণ্ড, হোম অ্যাজ ফাউণ্ড, দ্য ডীয়ারস্লেয়ার. ইত্যাদি।
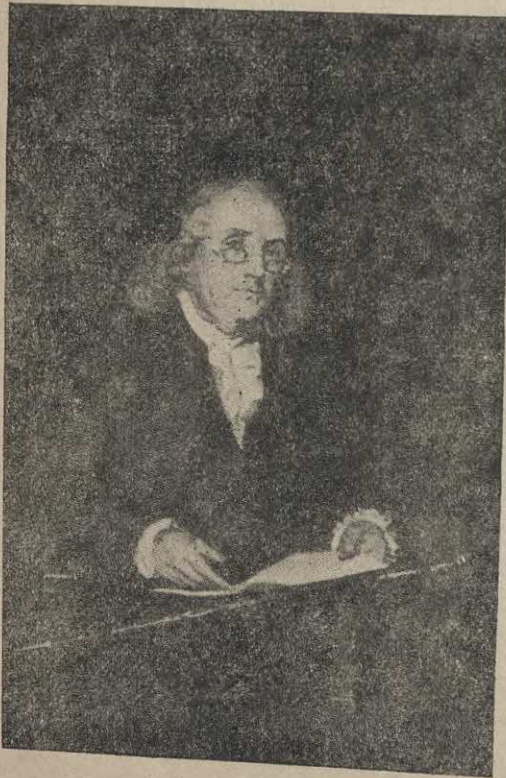
বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

ওয়াশিংটন আর্ভিং

এডগার অ্যালান পো'র সাহিত্যকর্ম বিচিত্র ধরনের। তাঁর ছোট গল্পের সংকলন: টেলস অব দ্য গ্রোটেস্ক অ্যাণ্ড অ্যারাবেস্ক। অন্যান্য গ্রন্থাবলী: ইউরেকা, এ প্রোজ পোয়েম। তাঁর রহস্যতত্ত্বময় ছোট গল্প বিশ্বসাহিত্যের মূল্যবান্ সম্পদ্। তাঁর রচিত ছোট গল্পের মধ্যে দ্য ব্ল্যাক ক্যাট, দ্য কাস্ক অব অ্যামনটিলাডো, দ্য ফল অব দ্য হাউস অব আশার, লিজিয়া, ও দ্য গোল্ড বাগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হারম্যান মেলভিলের জীবনে অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছিল। তিনি সেই সব ঘটনা নিয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। সবচেয়ে বিখ্যাত হল একটা সাদা তিমি আর একজন মানুষের মধ্যে শত্রুতার গল্প—'মোবি ডিক'। এছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের নাম: টাইপী, ওমু, মার্ডি, রেডবার্ন, হোয়াইট জ্যাকেট, পিয়ের, উজরেল পটার ও দ্য কনফিডেন্স ম্যান।

ওয়াল্ট হুইটম্যানের প্রধান পরিচয় তিনি আমেরিকার জাতীয় কবি। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলি 'লীভ্স্ অব গ্রাস্' নামক কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এগুলি গদ্যছন্দে লিখিত। এর মধ্যে আমেরিকার জাতীয়ভাবগুলি উদার কণ্ঠে গীত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলী: 'ড্রাম ট্যাপস', 'ডেমোক্র্যাটিক ভিস্টাস্'।

ওয়াল্ট হুইটম্যান

র‍্যালফ ওয়ালডো এমারসন অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর দিনপঞ্জী সাহিত্যরসিকগণের কাছে পরম আদরের। তাঁর লেখা বইগুলো হল: 'নেচার', 'রিপ্রেজেণ্টেটিভ মেন', 'ইংলিশ ট্রেট্স্', 'দ্য কনডাক্ট্ অব লাইফ', 'মে ডে', 'সোসাইটি অ্যাণ্ড সলিটিউড', 'লেটারস অ্যাণ্ড সোস্যাল এম্স্'।
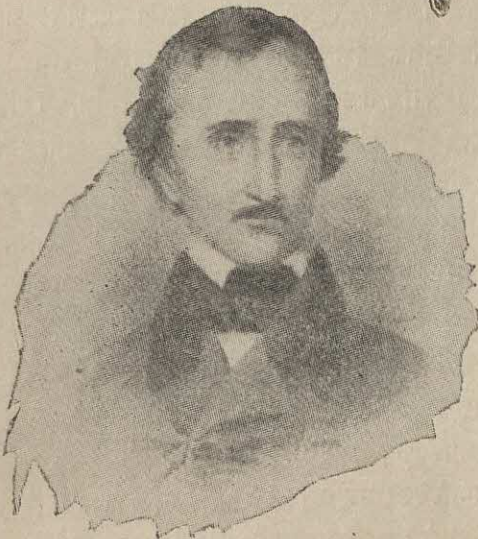
এডগার অ্যালান পো

র‍্যালফ ওয়ালডো এমারসন

হেনরি ডেভিড থোরো ছিলেন বেশ খেয়ালী প্রকৃতির। সারা জীবন নিজের খেয়ালে কাটিয়ে 'ওয়ালডেন' ও 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স' নামে দু'খানি বই তিনি লেখেন। তাঁর ভাষা ও যুক্তিজাল জনচিত্ত মুগ্ধ করেছিল।

ন্যাথানিয়েল হথর্ন অনেকগুলি উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখে আমেরিকান সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসঃ 'দ্য স্কারলেট লেটার'। অন্যান্য উপন্যাসগুলি হলঃ 'দ্য হাউস অব দ্য সেভেন নোব্‌ল্‌স্', 'দ্য ব্লাইদ্‌ভেল রোমান্স', 'দ্য মার্বল ফন্'। ছোট গল্পের বইঃ 'দ্য স্নো ইমেজ্', 'টোয়াইস্ টোল্ড্ টেল্‌স্'। এগুলি এমন কৌতূহলোদ্দীপক যে বহু দেশে এগুলির অনুবাদ হয়েছে।

হেনরি ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ লংফেলো অনেকগুলি কাব্য গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। এগুলির মধ্যে 'সং অব হায়াওয়াথা', 'ভয়েসেস অব দ্য নাইট', 'দ্য স্প্যানিশ স্টুডেন্ট', 'এভাঞ্জেলিন', 'দ্য কোর্টশিপ অব মাইলস স্টাণ্ডিস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জেমস রাসেল লোয়েল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক প্রবন্ধ গ্রন্থ লেখেন। 'এ ফেবল ফর ক্রিটিকস', 'বিগ্লো পেপারস' তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস্-এর খ্যাতি ঔপন্যাসিক এবং কবি হিসেবে। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে 'দ্য অটোক্র্যাট অব দ্য ব্রেকফাস্ট টেবল', 'দ্য প্রোফেসর অ্যাট দ্য ব্রেকফাস্ট টেবল', 'দ্য পোয়েট অ্যাট দ্য ব্রেকফাস্ট টেবল' বিখ্যাত। তাঁর লেখা বিখ্যাত কবিতাঃ 'দ্য ডিকনস্ মাস্টারপীস' বা 'দ্য ওয়াণ্ডারফুল ওয়ান হোস সে' (The Wonderful One Hoss Shay), 'দ্য চেম্বার্ড নটিলাস'।
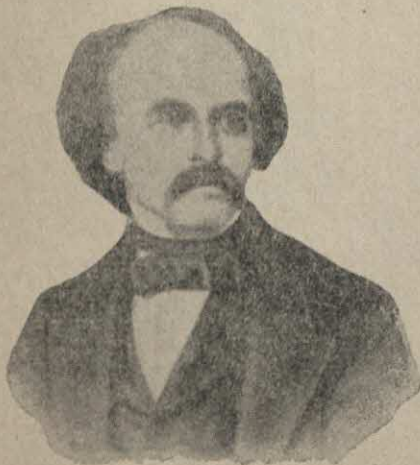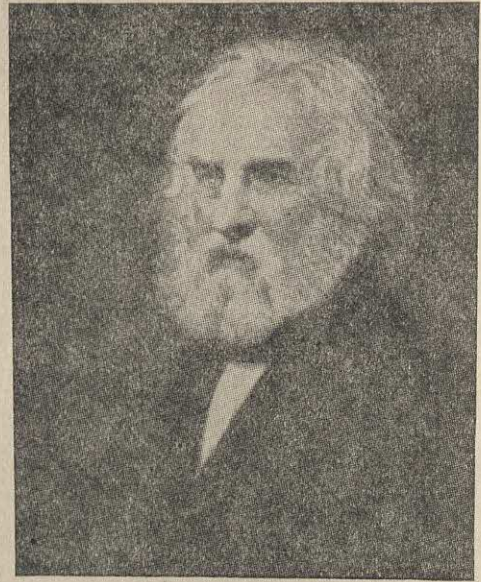
ন্যাথানিয়েল হথর্ন

হেনরি ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ লংফেলো

উইলিয়াম হিকলিং প্রেসকটের প্রধান পরিচয় ঐতিহাসিক হিসেবে। তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলার ইতিহাস, মেক্সিকো জয়ের ইতিহাস ও পেরু-বিজয় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল।

এ সময়ের আর একজন অসাধারণ প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক হলেন স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লেমেন্স (১৮৩৫-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ)। ইনি 'মার্ক টোয়েন' ছদ্মনামেই বিখ্যাত। প্রধানতঃ রঙ্গরসাত্মক রচনাকর্মে ইনি বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। তিনি অনেকগুলি অ্যাডভেঞ্চারমূলক ভ্রমণকাহিনীও রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা বইগুলোর নামঃ 'দি অ্যাডভেঞ্চারস অব টম সইয়ার', 'দ্য অ্যাডভেঞ্চারস অব হাকলবেরি ফিন', 'দ্য ইনোসেন্টস অ্যাব্রড', 'দ্য গিলডেড এজ', 'এ

ট্র্যাম্প অ্যাব্রড', 'দ্য প্রিন্স অ্যাণ্ড দ্য পপার', 'এ কনেকটিকাট ইয়াংকী ইন কিং আর্থারস কোর্ট', 'দ্য পার্সোনাল রেকলেকসন অব জোয়ান অব আর্ক'।

ইতিমধ্যে দাসপ্রথা বিলোপ নিয়ে আমেরিকার উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হল।

গৃহযুদ্ধের যুগে যাঁদের সাহিত্য আমেরিকার সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছিল, তাঁরা হলেন : জর্জ ওয়াশিংটন কেবল (১৮৪৪-১৯২৫), হ্যারিয়েট বীচার স্টৌ (১৮১১-১৮৯৬), এমিলি ডিকিনসন (১৮৩০-১৮৮৬)।

হ্যারিয়েট বীচার স্টৌ'র বিখ্যাত উপন্যাস 'আংকল টমস্ কেবিন'। দাসব্যবসায়ের উপর লেখা এই উপন্যাসখানি পড়েই লোকে দাসব্যবসায়ের বীভৎসতার দিক্‌টি উপলব্ধি করে এবং এর অপসারণে চেষ্টিত হয়েছিল।

ও'হেনরী নামে যিনি আমেরিকার সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত তাঁর আসল নাম উইলিয়াম সিডনি পোর্টার (১৮৬২-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ)। ছোট গল্প রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'ক্যাবেজেস এণ্ড কিংস' নামে তাঁর অনেকগুলি গল্প এক সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে।

এমিলি ডিকিনসন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। তিনি দুই হাজারেরও বেশী উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করেছিলেন।
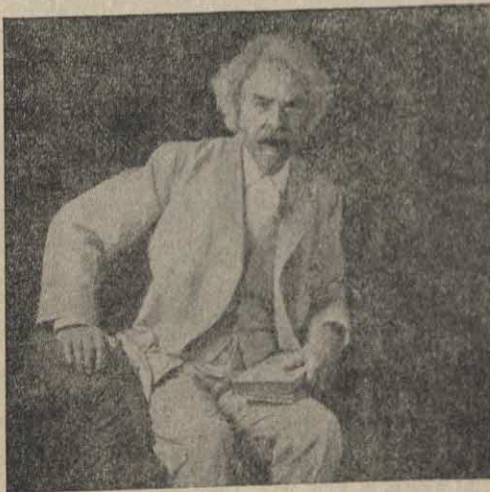
মার্ক টোয়েন (স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লেমেন্স)

ও'হেনরী

আমেরিকান সাহিত্যে 'বস্তুবাদ' নিয়ে এসেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন : উইলিয়াম ডীন হাওয়েলস (১৮৩৭-১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ), হ্যামলিন গারল্যাণ্ড (১৮৬০-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ), স্টিফেন ক্রেন (১৮৭১-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ), ফ্র্যাঙ্ক নরিস (১৮৭০-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ), জ্যাক লণ্ডন (১৮৭৬-১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

আধুনিক কালের আমেরিকান কবিদের মধ্যে খ্যাতিমান হলেন : কার্ল স্যাণ্ডবার্গ (১৮৭৮-১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ), রবার্ট ফ্রস্ট (১৮৭৪-১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ), এজরা পাউণ্ড (১৮৮৫- খ্রীষ্টাব্দ), ওয়ালেস স্টীভেনস (১৮৭৯-১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি।

কার্ল স্যাণ্ডবার্গের বিখ্যাত কবিতা-গ্রন্থ : 'শিকাগো পোয়েমস্', 'স্মোক অ্যাণ্ড স্টীল' প্রভৃতি।

অনেকের মতে রবার্ট ফ্রস্ট বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আমেরিকান কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলী : 'এ বয়েজ উইল', 'নর্থ অব বোস্টন' প্রভৃতি।

আধুনিক কালের শক্তিশালী কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শেরউড অ্যাণ্ডারসন (১৮৭৬-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ), সিনক্লেয়ার লিউইস্ (১৮৮৫-১৯৫১

খ্রীষ্টাব্দ), এফ, স্কট ফিটজেরাল্ড (১৮৯৬-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ), জন স্টাইনবেক (১৯০২- খ্রীষ্টাব্দ), উইলিয়াম ফকনার (১৮৯৭-১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ), টমাস উলফ (১৯০০-১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ), আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৮-১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ)।

শেরউড অ্যাণ্ডারসনের উপন্যাস : 'ওয়াইনবার্গ, ও হায়ো', 'মেইন স্ট্রীট' ও 'ব্যাবিট'।

মহিলা ঔপন্যাসিক পার্ল বাক্ (১৮৯২-১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। 'গুড্ আর্থ' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

পার্ল বাক্

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের প্রধান উপন্যাস : 'ফিয়েস্তা'। এ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থ : 'গ্রীন হিলস্ অব আফ্রিকা', 'ইন আওয়ার টাইম', 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সি', 'মেন উইদাউট উইমেন', 'ফর হুম দ্য বেল টোলস' প্রভৃতি।

ফিটজেরাল্ড ঔপন্যাসিক রূপে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসগুলির নাম : 'দিস সাইড অব প্যারাডাইস্', 'দ্য বিউটিফুল অ্যাণ্ড দ্য ড্যাম্ড', 'দ্য গ্রেট গ্যাটসবি', 'দ্য লাস্ট টাইকুন' প্রভৃতি। ওমর খৈয়ামের কাব্যগুলি তিনি ইংরেজী পদ্যে প্রকাশ করেছিলেন।

আধুনিক কালের আমেরিকান সাহিত্যে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলার ফলে নতুন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে।

রাশিয়ান সাহিত্য

রুশ সাহিত্যের একেবারে প্রথমে হল 'ক্রনিক্‌ল্‌স্ অব লস্টর' (১১০০ খ্রীঃ)।

ইওরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাহিত্য অতি প্রাচীনকালেই যেমন যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল, রাশিয়ায় এমনটি হয় নি। প্রকৃতপক্ষে একাদশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় খ্রীস্টধর্ম প্রচারের পর থেকে এখানে সাহিত্য বিকশিত হতে শুরু হয়েছিল।

প্রাচীনকালে রাশিয়ান চারণ-কবিরা পৌরাণিক বা

ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে গান বেঁধে গেয়ে বেড়াতেন। এই ধরনের লোক-সংগীতকে বলা হত 'বাইলিনি'। ঐতিহাসিক চরিত্র প্রিন্স ইগোরকে নিয়ে যে সকল ইগোরগাথা (যেমন, ১২শ শতাব্দীর 'ক্যাম্পেন্স অব প্রিন্স ইগোর') রচিত হয়েছিল, সেগুলি খুব জনপ্রিয় ছিল। 'লেটোপিশি' নামে আর এক রকমের প্রাচীন রাশিয়ান সাহিত্যের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এগুলির মধ্যে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক উপাদান আছে।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ান সাহিত্য উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে থাকে। এই সময় ইওরোপ থেকে ল্যাটিন সংস্কৃতি রাশিয়ায় প্রবেশ করায় পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার খুলে গিয়েছিল। এই সময়ের মিখাইল লোমোনোসফকে বলা হয় রুশ সাহিত্যের জনক।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হল, তার ফলে সেখানকার রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে যুগান্তরকারী পরিবর্তন দেখা দিল। এতদিন রাশিয়ার সম্রাট্

আলেকজাণ্ডার পুশকিন

নিকোলাই গোগোল

(জার) দেশ শাসন করতেন। সেই সময় জনসাধারণের অবস্থা ছিল শোচনীয়।

সেই সময়কার সাধারণ লোকের জীবনকথা যে সকল সাহিত্যিক নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আলেকজাণ্ডার পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ), নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ), লার-মন্‌টভ (১৮১৪-১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ), আইভান টুর্গেনিভ (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ), লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ), ফিডর ডস্টয়েভ্‌স্কী (১৮২১-১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ) ও অ্যান্টন চেখভ বা শেখভ (১৮৬০-১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁরা সকলেই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। উপন্যাস ও ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে এঁরা রাশিয়ান সাহিত্যকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন।

আলেকজাণ্ডার পুশকিন ছিলেন গল্পকার, কবি ও নাট্যকার। তাঁর রচনা রাশিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয়।

নিকোলাই গোগোল তখনকার সমাজ-জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে বিদ্রূপাত্মক নাটক লিখেছিলেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 'গভর্নমেণ্ট ইন্‌স্‌পেকটর' ও 'তারাস বুল্‌বা' খুব বিখ্যাত।

আইভ্যান টুর্গেনিভ অনেকগুলি ভালো ভালো ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তখনকার বিপ্লবের একটা চেহারা পাওয়া যায়। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলি হলঃ 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্‌স্‌', 'ভার্জিন সয়েল', 'লিজা', 'রুদিন'।

ফিডর ডস্টয়েভ্‌স্কী (ফেদর দস্তয়েভ্‌স্কি) লিখেছিলেন নির্যাতিত মজুরদের দুঃখের কাহিনী। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে সাধারণ লোকের মানবিকতার দিক্‌টা অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসঃ 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট', 'দ্য ব্রাদার্স কারামাজোভ', 'দ্য ইডিয়ট', 'দ্য পজেস্‌ড্‌', 'দ্য হাউস অব দ্য ডেড', 'দ্য গ্যাম্বলার'।

এঁদের মধ্যে সবার সেরা হলেন কাউণ্ট লিও টলস্টয় (তল্‌স্তয়)। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে তখনকার জার-শাসিত রাশিয়ার সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার ছবি অতি সুন্দরভাবে ও জীবন্তরূপে ফুটে

আইভান টুর্গেনিভ

ডস্টয়েভ্‌স্কী

উঠেছে। তাঁর সহজ সরল জীবনধারা ও দার্শনিক মনোভাবের জন্যে তাঁকে 'ঋষি' আখ্যা দেওয়া হয়। টলস্টয়ের বিখ্যাত উপন্যাসগুলির নামঃ 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস', 'অ্যানা ক্যারেনিনা', 'রেজারেকসন'। টলস্টয় অনেকগুলি ভালো নীতিমূলক ছোট গল্পও রচনা করেছিলেন।

বিপ্লবের পরবর্তী কালে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ম্যাক্সিম গর্কী (১৮৬৮-১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁর আসল নাম আলেক্সী ম্যাক্সিমোভিচ পেসকভ। কিন্তু তিনি 'গর্কী' এই ছদ্মনামে পৃথিবীবিখ্যাত। 'গর্কী' কথাটির অর্থ তিক্ত। তিনি যা লিখেছেন তা তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার ফল। বোধহয় এ জন্যেই তিনি এই ছদ্ম নাম নিয়েছিলেন। তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নাম 'মাদার'। এই বইয়ের মধ্যে জারের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের আন্দোলনের সুন্দর চিত্র আঁকা হয়েছে। তাঁর অন্যান্য বই এবং তাঁর লেখা ছোট গল্পগুলিও বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌।
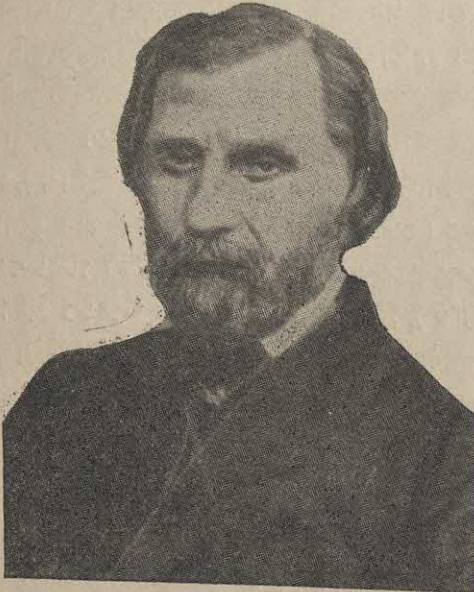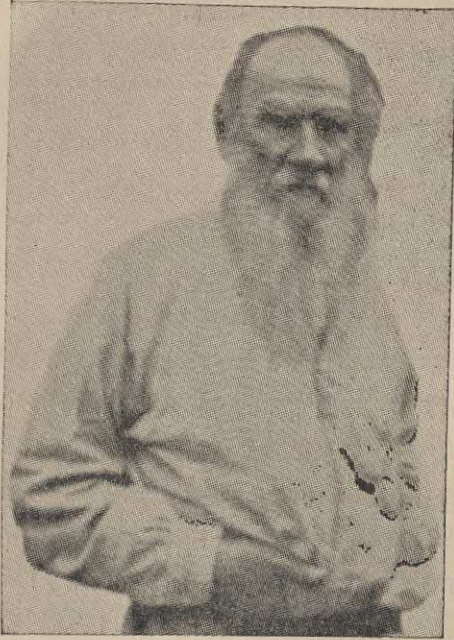
ঋষি টলস্টয়

আলেক্সী টলস্টয় নামে আর একজন ঔপন্যাসিকের রচনায় বিপ্লবের আগেকার নানা ছবি পাওয়া যায়। তাঁর তিনটি উপন্যাস 'রোড টু ক্যালভেরী', 'পিটার দ্য গ্রেট' ও 'ডার্কনেস অ্যাণ্ড ডন'।

মিখাইল সলোকভ রাশিয়ার খুব বিখ্যাত লেখক। এঁর উপন্যাসগুলিতে রাশিয়ার বিপ্লবের নানা বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে বিখ্যাত হলঃ 'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন্', 'ফ্লোজ ফ্রম হোম টু সি', 'ভার্জিন সয়েল আপ্‌টার্নাড্'।

ফেডর গ্লাডকভ ও ফেডর প্যানফেরভ—এই দু'জন বর্তমানের শক্তিশালী সাহিত্যিক। মায়াকোভস্কী হলেন রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর অজস্র কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি বিপ্লবের আগুন দেশময় ছড়িয়ে গিয়েছেন। নিকোলাই টিখোনভ আর একজন বিখ্যাত কবি।

সলঝেনিৎসিনের নামও আজ বিশ্ববিখ্যাত।

চীনা সাহিত্য

চীনদেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্বে এখানে সভ্যতা ও সাহিত্যের বিকাশ লাভ ঘটেছিল। অনেকে বলেন, চীনের সাহিত্য শুরু হয়েছে মহাত্মা কনফুসির সময় থেকে। আবার কেউ কেউ বলেন, কনফুসির অনেক কাল আগেই চীনদেশে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। চৈনিক সাহিত্যকে সাধারণতঃ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

॥ কনফুসীয় সাহিত্য ॥

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'ই-কিং' নামক একখানি গ্রন্থ চীন দেশে রচিত হয়েছিল। শোনা যায়, এই গ্রন্থখানি নাকি পীতনদীর জলে ভাসতে ভাসতে তীরে পৌঁছে একটি ড্রাগনের পিঠে চেপে বসেছিল। তারপর দেখা গেল সেই জীবটির পিঠে দিব্যি নানা কথা লেখা হয়ে গেছে। এটি ছাড়া আরও চারখানা পবিত্র গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। এগুলি হলঃ সু-কিং, সি-কিং, লি-কিং, চুন বিউ। এগুলি রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে। এগুলোর মধ্যে এক 'চুন বিউ' (বসন্ত ও শরৎ) বইখানা পুরোপুরি মহাজ্ঞানী কনফুসির লেখা।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের আগে কনফুসির শিষ্যবর্গ চারখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যথা—লুন-ইউ,

ড্রাগনের পিঠে 'ই-কিং' গ্রন্থ

তা-শুচ, কুং-চি, মেন-সি। আর, কনফুসির উপদেশ সংগ্রহ করে বই হয়েছিল 'লুন্-ইআই'।

॥ তাও-পন্থী সাহিত্য ॥

মহাত্মা লাওৎসে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে 'তাও' ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই ধর্ম অনেকটা আমাদের দেশের তন্ত্রসাধন-ধর্মের মতো। লাওৎসে 'তাও-তে-কিং' নামে একখানি গ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন মতবাদ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

লাওৎসের শিষ্যবর্গের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কোয়াং-সে। ইনি আবার অনেকগুলি শিষ্য তৈরি করেছিলেন যাঁদের মধ্যে হান-ফেই-সে, লিউ-আন, ৎসমা-খিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা 'তাও' ধর্মমতের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

॥ চৈনিক বৌদ্ধ সাহিত্য ॥

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পর বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। ভারতবর্ষ থেকে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত চীনদেশে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলি চীনা-ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করে চীনদেশের সাহিত্য সৃষ্টি হতে লাগল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মহাত্মা সে-কাও অনেকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এই সময়ে বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়ান দলবল নিয়ে ভারতবর্ষ যাত্রা করেছিলেন। অনেক বিপদ-আপদের পর তিনি একা ভারতবর্ষে পৌঁছতে পেরেছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি যে অমূল্য গ্রন্থ লিখেছিলেন তার নামঃ ফো-বু-কি। আর একজন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পৌঁছান। তিনি ৭৪ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি 'সি-ইউ-কি' নামে মহামূল্যবান্ গ্রন্থ লিখেছেন।

ভারতবর্ষ থেকে যে সকল পণ্ডিত চীনদেশে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ কুমারজীব সংঘভূতি, গৌতম সংঘদেব, পুণ্যত্রাত, বিমলাক্ষ বুদ্ধজীব, ধর্মমিত্র, ধর্মযশ, গুণবর্মা, জিনগুপ্ত, পরমার্থ, ধর্মগুপ্ত, প্রভাকর মিত্র, বজ্রবোধি প্রভৃতি। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের ফলে ৫৪০০ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

॥ চীনা নাটক ॥

প্রাচীনকালে চীনদেশে ভালো ভালো অনেকগুলি নাটক রচিত হয়েছিল। ৭২০-৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাং রাজত্বকালে রচিত অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটকের নাম পাওয়া যায়। ১১২৭-১৩৬৭ খ্রীষ্টাব্দে য়ুনান রাজত্বকালে সবচেয়ে বেশী নাটক রচিত হয়েছিল। পণ্ডিতরা বলেন, এই যুগে প্রায় ৮৫ জন নাট্যকার পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ছ'শো নাটক লিখেছিলেন। এই নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল পি-পা-কি (বা বাঁশির কাহিনী)। আর একটি জনপ্রিয় নাটকঃ হানের দুঃখ। এই নাটকের কাহিনীতে আছে যে তাতাররা খুব দুর্ধর্ষ জাতি। তাদের রাজা চীন-সম্রাটের কাছে একটি সুন্দরী কন্যা চেয়ে পাঠান। সম্রাট্ মন্ত্রীর উপর ভার দিলেন, একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বের করার জন্যে। মন্ত্রী খুঁজেপেতে একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে এলেন। মেয়েটি সম্রাট্‌কে খুব ভালোবেসে ফেলল। এদিকে তাতারদের রাজা সেই মেয়েটিকেই চেয়ে বসল। ভয় দেখাল যে না দিলে চীনদেশ আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলবে। তখন চীন সম্রাট্ খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে মেয়েটি স্বেচ্ছায় তাতারদের রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল।

তাতারদের রাজা এতে খুব দুঃখ পেয়ে চিরদিনের জন্যে চীন সম্রাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল।

॥ চীনা কাব্য ॥

চৌ-রাজবংশের রাজত্বকালে মুখে মুখে গাওয়া গানগুলিকে একটি গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছিল। নামঃ সি-কিং। তাং রাজত্বকালে চৈনিক কাব্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। ওয়াং-উই ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি। অষ্টম শতাব্দীর কবি হলেন

মেয়েটি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল

লি-তাই-পো। ইনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া আর কয়েকজন বিখ্যাত কবির নাম : তু-ফু, পো-চিন-ই, সু-মা-কুয়াং, ওন-ইয়াং-সিং, ওয়াং-আন-সি। মাঞ্চু বংশীয় সম্রাট্ কাং-শি ও চিয়েন-লুংও কবি ছিলেন।

চীনদেশে প্রাচীনকালেই ইতিহাসের চর্চা করা হত। মহাত্মা কনফুসি 'চুন-বিউ' গ্রন্থে তাঁর নিজের অঞ্চলের বিবরণ লিখে গেছেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সু-মা-চিউ নামক ঐতিহাসিক 'সে-চি' নামে গ্রন্থে চীনদেশের বিস্তৃত ইতিহাস লিখেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে আর একখানি ইতিহাসের বই লেখা হয়। এর নাম : ৎসু-চি-তুংচিয়েন।

মঙ্গোল আমলে 'সান-কুয়ো-চি-ইয়েন-ই' নামে একটি উপন্যাসও রচিত হয়েছিল।

জাপানী সাহিত্য

জাপানের সাহিত্য ও সভ্যতার উপর চৈনিক সাহিত্য ও সভ্যতার প্রভাব খুব বেশী করেই পড়েছিল। ফলে এই দুই দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য দেখা যায়। চীন দেশের মাধ্যমে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও জাপানে 'শিণ্টো' নামে একটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল।

॥ জাপানী কাব্য-সাহিত্য ॥

প্রাচীনতম জাপানী সাহিত্যের নিদর্শন তিনখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই তিনখানি গ্রন্থ হল : কোজিকি, নিহোঙ্গী এবং যুদোকি। 'কোজিকি' গ্রন্থের রচনাকাল ৭১২ খ্রীস্টাব্দ। জাপানী নাট্যকলা কি রকম করে সৃষ্ট হল, এই গ্রন্থের মধ্যে তা বর্ণনা করা হয়েছে। শোনা যায়, জাপানের আলোর দেবী আমতেরসু-ও-মিকমি-নো-মিকোতো একবার রাগ করে গুহার মধ্যে ঢুকে যান। ফলে চারদিক্ অন্ধকার হয়ে যায়। তখন অমৎসু-উজুমে-নো-মিকিতো নামে একজন দেবতা সেই গুহার বাইরে একখানি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন। আলোর দেবী কৌতূহলী হয়ে তা দেখতে বাইরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক্ আবার আলোয় ভরে গেল।

'নিহোঙ্গী' রচিত হয়েছিল ৭২০ খ্রীস্টাব্দে। 'যুদোকি'র সঠিক রচনাকাল জানা যায় না। এগুলি সবই লোকসংগীত আকারে পাওয়া গেছে।

সবচেয়ে পুরোনো জাপানী কাব্যগ্রন্থের নাম 'মান্যোসু'। এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল ৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে। এর মধ্যে ৪৫০ জন কবির ৪৫০০ কবিতা সংকলিত হয়েছে। সেই যুগের জাপানী কবিদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন মহাকবি কাকিনোমোটো-নো-হিতোমারো (৬৫৫-৬৭১ খ্রীস্টাব্দ), ইয়ানবে-নো-

আলোর দেবী বাইরে এলেন

আকাহিতো (৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ), ওতোমো-নো-তাবিতি (৬৫৫-৭৩১ খ্রীষ্টাব্দ), ভামানোই-নো-ওকুরা (৬৫৯-৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)। এঁরা সকলেই 'ওয়াকা' নামে জনপ্রিয় ছন্দে কবিতা রচনা করেছিলেন। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'কাইফুসু' নামে আর একখানি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জাপানের সাহিত্য উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। ৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কোকিলসু' নামে যে কাব্যগ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল তাতে অনেক কবির উৎকৃষ্ট কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের কয়েকজনের নাম হলঃ কি-নো-ৎসুরাই (৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ), চি-নো-মিৎসুনে (৮৫৯-৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ), মিলুলো-তদামিনে (৮৬৭-৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ), কি-নো-তোমোনোরি। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'শিংকেকিনমু' নামে আর একখানি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল।

॥ জাপানী গদ্য সাহিত্য ॥

জাপানী গদ্য সাহিত্য বিকাশলাভ করেছে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পর। শিণ্টোধর্মের প্রার্থনাবলী নিয়ে 'নরিটো' নামে একখানি গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অষ্টম শতকে লেখা আর একখানি বইয়ের নাম 'সেম্মো'।

৮০০ থেকে ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুখানি গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। নামঃ 'তাকে তোরি মনোগাতারি' ও 'আইসে মনোগাতারি'। ৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কি-নো-ৎসুরায়ুকি নামে এক ব্যক্তি 'তোরানিক্কি' নামে একখানি ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন।

প্রাচীনকাল থেকেই জাপানী নরনারী ডায়েরী বা দিনপঞ্জী রচনা করতে ভালোবাসতেন। এইভাবে জাপানে ডায়েরী বা 'জার্নাল' সাহিত্য নামে একশ্রেণীর সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। এইরকম একখানি জার্নালের নাম 'কগেরোনিক্কি'। এখানি রচিত হয়েছিল ৯৭৪-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

১০১০ খ্রীষ্টাব্দে মারাসাকি সিকিলু নামে একজন মহিলা 'গেঞ্জি মনোগাতারি' নামে এত ভালো একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন যে বহুকাল যাবৎ নাকি আর কেউ উপন্যাস লিখতে সাহসই করেন নি।

দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে যে সকল গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ হেইকি মনোগাতারি, হোজোকি, ৎসুরেজুরেগুসা।

সাহিত্য মনের ফসল। মানুষ যা ভাবে, যা কল্পনা করে তাই ফুটে ওঠে তার সাহিত্যে। কাজেই সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনা না করে পারেন না।

জাপানে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বহু সাহিত্য রচনা হয়েছিল। সে সাহিত্য জাপানীদের মনের বহু মূল্যবান্ খোরাক যুগিয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যের মহান্ শক্তিধর লেখকদের সাহিত্যের তুলনায় তাদের মূল্য খুব বেশী নয়।

এই সব সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফল ফলেছিল বিংশ শতাব্দীতে।

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী ঔপন্যাসিক ইয়াসুনারি (Yasunari Kawabata) বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (নোবেল পুরস্কার) লাভ করেন। তিনি

এশিয়ার মহা গৌরব। জাপান দেশও যে সাহিত্যে মহৎ কিছু সৃষ্টি করিতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তিনি দিয়েছেন।

॥ জাপানী নাট্য সাহিত্য ॥

জাপানে নাট্য সাহিত্যের বিকাশলাভ ঘটেছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর। প্রধানতঃ বৌদ্ধ প্রভাবে জাপানে 'নো' নাটক নামে একশ্রেণীর নাটক প্রচুর লেখা হয়েছিল। বিষয়বস্তুর দিক্ দিয়ে 'নো' নাটকগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়। (১) কামি-নো: এই ধরনের নাটকে দেবতাদের কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে। (২) সুগেন-নো: সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব নিয়ে এই নাটকগুলি রচিত। (৩) ইউরেই-নো: ভূতপ্রেতের কাহিনীমূলক নাটক। (৪) গেনজাই-নো: বিভিন্ন সমস্যামূলক নাটক। এইসব নাটক প্রধানতঃ উচ্চ সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইজুমো-নো-ওকুনি নামে একজন মহিলা ধর্মকে বাদ দিয়ে সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে লাগলেন। সাধারণ লোক এই সকল নাটক দেখতে যেত। প্রথমে এই সকল নাটকের নাম ছিল 'শিবাই'। পরে এগুলি 'কাবুকি' নামে পরিচিত হয়। 'কাবুকি' এক ধরনের জাতীয় নাটক। এতে গান আছে, নাচ আছে আর আছে অভিনয়। এগুলো ৩০০ বছরের উপর জাপানে চলছে। এর মধ্যে মূকাভিনয় আছে আর আছে অতি উচ্চাঙ্গের নৃত্য। এই নাটকের গতি অতি ধীর। পোশাক ও সাজসজ্জা অতি দামী—সিল্ক ও ব্রোকেডের ভারী ভারী ঝলমলে পোশাক পরে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অবতীর্ণ হয়। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মুখ প্রসাধন করা ও ভঙ্গীহীন। বিশেষ করে ঐতিহাসিক 'কাবুকি'তে মেক-আপ ভারী জবরর।

এতে বাজনা হিসাবে বাঁশী, ছোট ছোট ঢাক ও তিন তারের জাপানী গীটার বাজানো হয়। অনেক সময় সূত্রধর সারা নাটকের আখ্যান ভাগ সংগীতময় সুরে বাজনা সহযোগে বলে যায়। বাদ্যকররা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের পিছন দিকে সারবন্দী হয়ে বসেন। ইজুমো-নো-ওকুনি অত্যন্ত উচ্চস্তরের অভিনেত্রী ছিলেন। তিনি যে সকল নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন তার কোন লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। ওতা নবুনাগা নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় ওনো-নো-ও-ৎসু নামে একজন মহিলা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি উপাখ্যান লিখে যান।

১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সোগা-নো-যুবান-কিরি' নামে একটি কাবুকি নাটক প্রদর্শিত হয়েছিল। আর একখানি বিখ্যাত কাবুকির নাম: সোগা-নো-কিয়োজেন। রচয়িতা কাওয়ারা জোনোসুকে।

জাপানে এখন 'কাবুকি' খুব জনপ্রিয় হয়েছে। এর রস একটু উচ্চাঙ্গের হলেও ক্রমশঃ জাপানী জনসাধারণ এর রস উপলব্ধি করতে পারছে।

———

॥ রঙ্গালয় কাকে বলে ॥

রঙ্গালয় হলো থিয়েটার অর্থাৎ নাটক অভিনয়ের স্থান, অভিনয় দেখার জায়গা। এর মধ্যে প্রধানতঃ দুটো ভাগ থাকে—একটা মঞ্চ বা স্টেজ থাকে অভিনেতাদের জন্যে, আর তারই সামনে একটা প্রেক্ষাগৃহ বা অডিটোরিয়াম (auditorium) থাকে দর্শকদের জন্যে। যাতে শ্রোতারা বা দর্শকরা সব শুনতে ও দেখতে পায় তার ভাল ব্যবস্থা রাখতে হয়; এজন্যে মঞ্চটা একটু উঁচু হলেই ভাল করে দেখার সুবিধে হয়। এছাড়া একটা যবনিকা (পর্দা) থাকে আর থাকে দৃশ্যপট বা সীন।

॥ অভিনয়ের আরম্ভ গ্রীসে ॥

যতদূর জানা যায়, প্রায় তিন হাজার বছর আগে গ্রীসদেশে ডায়োনিসাস দেবতার সম্মানে উৎসব হত। তাতে লোকেরা উৎসব-সাজে সেজে নাচগান ও অভিনয় করত। হাসি আমোদ ভরা এইসব নাচগানের সবই ছিল মিলনান্ত যাকে ইংরেজীতে বলে কমেডী। তারপর ট্র্যাজেডী বা বিয়োগান্ত নাটক শুরু হয়। ট্র্যাজেডী কথাটা গ্রীক। এর আক্ষরিক অর্থ হল 'ছাগলের গান'। এরকম অদ্ভুত নামের একটা ইতিহাস আছে। ট্র্যাজেডী যারা অভিনয় করত তারা ছাগলের চামড়ার পোশাক পরত। নাটক নাম দিলেও এগুলি ঠিক নাটক নয়। আসলে এগুলি ছিল ছন্দোবদ্ধ স্তব (dithyramb).

॥ গ্রীক রঙ্গালয় ॥

কোন পাহাড়ের পাদদেশে একটা গোল বেদীর উপর এই সব নাটক দেখানো হত। পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে আসন করা থাকত। সেই পাথরের আসনে সারি সারি বসে দর্শকরা নাটক অভিনয় দেখত ও শুনত। পরে রঙ্গমঞ্চ তৈরী হলে এমনি ব্যবস্থাই তাতেও করা হয়েছিল। গ্রীসে প্রথম রঙ্গমঞ্চ হল আন্দাজ ৫০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে, এথেনসের অ্যাক্রোপলিস দুর্গের পাশে। তার নাম হল ডায়োনিসাসের রঙ্গালয়। তাতে ৩০ হাজার দর্শকের স্থান ছিল। এসব রঙ্গমঞ্চ হত খোলা জায়গায়। কোন আচ্ছাদনের ব্যবস্থা তাতে ছিল না। বেদীর ধারের গোলাকার স্থান থেকে গায়কদল গান এবং অভিনেতারা অভিনয় করত। এই বৃত্ত থেকে একটু দূরে থাকত
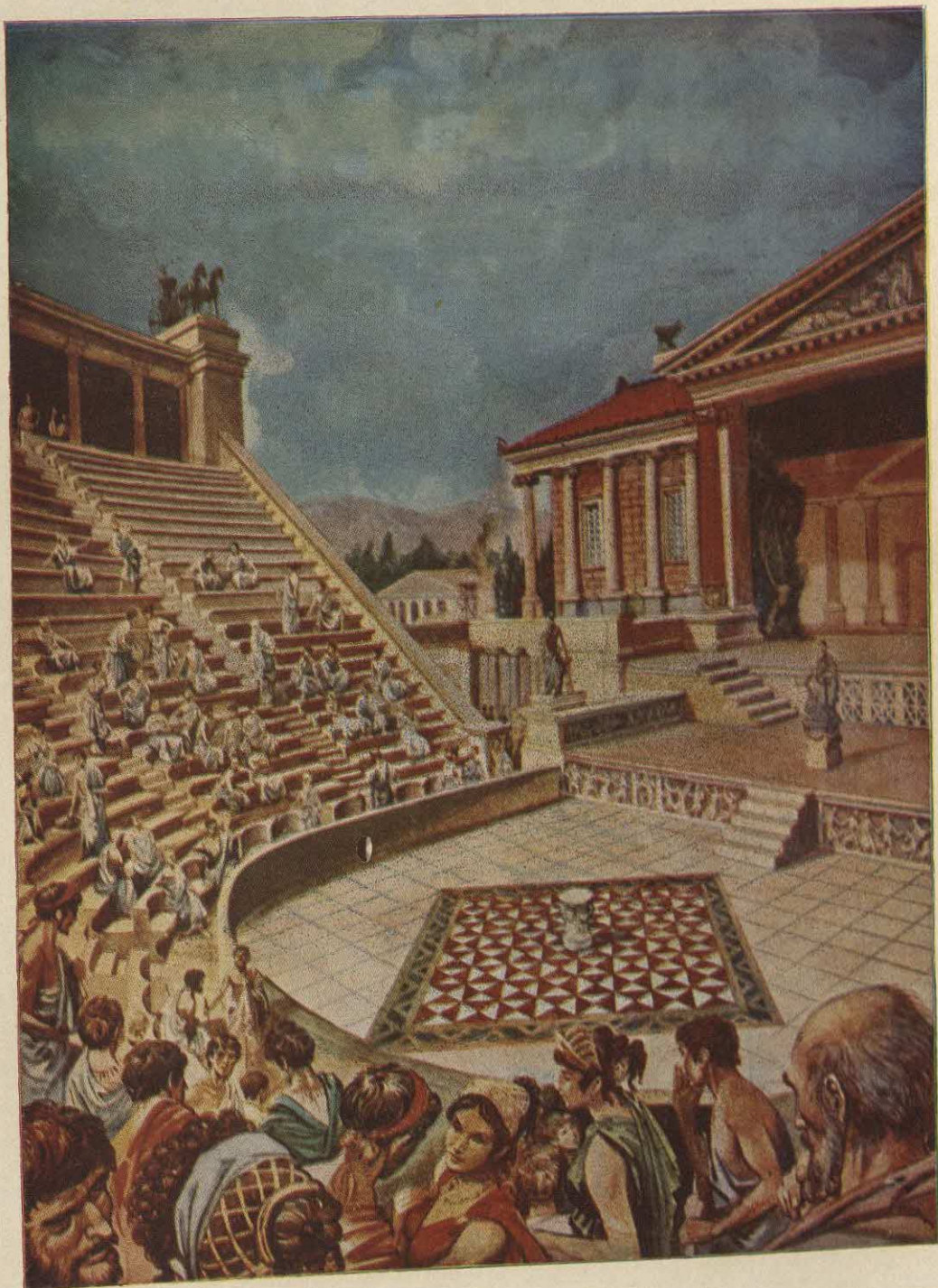
উন্মুক্ত স্থানে গ্রীসের রঙ্গালয়।

রঙ্গালয়ের কথাঃ

[উন্মুক্ত স্থানে গ্রীসের রঙ্গালয়]

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রঙ্গালয় দেখতে পাওয়া যায়। আগেকার দিনেও নানা দেশে নানা ধরনের রঙ্গালয় ছিল। আজকাল প্রায় সব দেশেই উন্নত ধরনের রঙ্গালয় আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছাদ-আঁটা ঘরের মধ্যে নাচ-গান-থিয়েটার হয়ে থাকে।

গ্রীস (Greece) ইওরোপের একটি সুপ্রাচীন সভ্য দেশ। এর রাজধানী এথেন্স। বিখ্যাত গ্রীক পুরাণ যার কাহিনী পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকই জানে এই গ্রীসেই তার উদ্ভব। এখানে বহু মনীষীর জন্ম হয়েছে।

এদেশে খ্রীষ্টজন্মের বহু শত বৎসর আগেও রঙ্গালয় ছিল। তখনকার দিনের একটি রঙ্গালয়ের দৃশ্য এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। এখানে উন্মুক্ত স্থানে বসে অভিনয় দেখবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ছবি দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে, এখনো অভিনয় শুরু হয় নি। দর্শকেরা এসে গ্যালারিতে বসছে।

একে রঙ্গালয় বলা হলেও, মল্লক্রীড়ালয় বলা চলে। গ্যালারির সামনের খোলা জায়গায় কখনও কখনও মল্লক্রীড়াও চলত।

মুখোশ পরা অভিনেতারা

সাজঘর। গ্রীক মঞ্চে সাদাসিধেভাবে আঁকা দৃশ্যপট ব্যবহার করা হত। দেবদেবীদের কপিকলের সাহায্যে নামানো ও ওঠানো হত। কারণ, তাঁরা যে অলিম্পাস (Olympus) থেকে নেমে আসতেন আবার সেখানে চলে যেতেন, তা তো দেখানো চাই!

গ্রীক নাটকে কোন অভিনেত্রী অভিনয় করত না। পুরুষরাই স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করত। পোশাকের রং দেখে দর্শক বা শ্রোতারা বুঝতেন পাত্র-পাত্রী অভিজাত বংশের না সামান্য শ্রেণীর লোক। রানীরা লাল পোশাক পরতেন, রাজাদের মাথায় মুকুট থাকত। অভিনেতারা উঁচু হিলওলা জুতো বা রণপা পরতেন, আর মাথায় উঁচু টুপি পরতেন। তাছাড়া অভিনেতাদের মুখে মুখোশ পরা থাকত। মুখোশে নানা রকম ভাব ব্যক্ত করা থাকত। মুখোশ দেখে বোঝা যেত নাটক মিলনান্তক (comedy) না বিয়োগান্তক (tragedy).

॥ ভারতীয় নাটকের উপর গ্রীক প্রভাব ॥

পণ্ডিতদের মধ্যে নানা তর্কবিতর্ক থাকলেও সংস্কৃত নাটক ও ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের উপর গ্রীক প্রভাবের কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। আলেকজাণ্ডার ভারতের যতটুকু অধিকার করেছিলেন সে সব জায়গায় গ্রীক নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। তখন আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ছিল গ্রীক শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। ভারতের এবং আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক যোগও স্থাপিত হয়েছিল। কাজেই গ্রীক নাট্য অভিনয়ের দেখাদেখি সংস্কৃত নাটক অভিনয় দেশময় ছড়িয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

॥ ইংল্যাণ্ডে রঙ্গালয়ের আদি পর্ব ॥

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের অনেক বছর পরে ইংল্যাণ্ডে নাটক অভিনয় শুরু হয়। ঈস্টারের উৎসব উপলক্ষ্যে প্রথমে একটা শোভাযাত্রা বেরোত। সেই শোভাযাত্রায় যীশু খ্রীষ্টের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা অভিনয় করে দেখানো হত। এইসব উৎসবের ধর্মীয় ঝোঁকটা ক্রমশঃ কেটে যেতে লাগল। যতদিন গির্জের সিঁড়িতে এসব দেখানো হত ততদিন ধর্মের একটু স্পর্শ রইল, তারপরেই এর জন্যে তৈরী হল রঙ্গমঞ্চ বা অভিনয় দেখাবার আলাদা বাড়ি।

প্রথম রঙ্গমঞ্চ ছিল একটা কাঠের উঁচু বেদীর উপর বসানো বাক্সের মতো কয়েকটা ঘর। এক একটা বাক্সকে এক একটা দৃশ্য কল্পনা করা হত। একটা বাক্স স্বর্গ, একটা পৃথিবী, আরেকটা নরক। সবচেয়ে দেখবার মতো ছিল নরকটা। তাতে ধোঁয়া আর আগুন দেখানো হত। ভূতপ্রেতরা নৃত্য করত

প্রথম রঙ্গমঞ্চ

আগুনের কুণ্ড ঘিরে। এছাড়া কোথাও কোথাও একটা ঘোড়ায় টানা মালগাড়ির উপর রঙ্গমঞ্চ বসানো হত। রাস্তার এক এক জায়গায় থেমে থেমে অভিনেতারা অভিনয় করে যেত! পরে এক এক দৃশ্যের জন্যে এক এক গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল। দর্শকরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পর্যায়ক্রমে অভিনয় দেখত।

॥ ইতালীয় ও রোমান রঙ্গালয় ॥

১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইতালীয় নাট্যকাররা গ্রীক ও রোমান নাটকের সঙ্গে মধ্যযুগীয় নাটক মিশিয়ে নতুন এক ধরনের নাটক লিখতে লাগলেন। এই সময়টা হল রেনেসাঁস বা নবজন্মের কাল। রঙ্গমঞ্চের নানা কলা-কৌশলের ক্রমশঃ উদ্ভব হতে লাগল। রঙ্গমঞ্চের জন্যে বিশেষ একরকমের বাড়িও তৈরী হল। সেগুলো বাতি জ্বেলে আলোকিত করা থাকত।

ইতালীয় নাট্যকাররা তিন রকম নাটক অভিনয় করতেন—মাস্ক, অপেরা আর কমেডী। মাস্কে মুখোশ-পরা অভিনেতাদের অভিনয়, নাচ, গান আর জাঁকজমকের দৃশ্য দেখানো হত। অপেরায় গান-বাজনার ভাগ বেশী থাকত। আর কমেডীতে দেখানো হত শোভাযাত্রা; আজকাল সার্কাসে যে সব ক্লাউনের হাস্যকর ব্যাপার দেখানো হয়, কমেডীতে সেই সব বেশী করে দেখানো হত।

নাচ গান আর জাঁকজমকের দৃশ্য

॥ স্পেনের রঙ্গমঞ্চ ॥

স্পেন আর ইংল্যাণ্ডে প্রথম প্রথম লোকের বাড়ির উঠোনেও অভিনয় দেখানো হত। পরে যখন রঙ্গমঞ্চ তৈরী হল তখন একটা উঁচু মঞ্চের উপর অভিনয় দেখাবার ব্যবস্থা হল। মঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে কতক দর্শক দেখত, দূরে অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো আসনে বসে অধিকাংশ লোক অভিনয় দেখত। এই আসনগুলো একটু উঁচু হতো।

॥ রঙ্গমঞ্চের উন্নতি ॥

সেক্সপীয়ারের সময়ে রঙ্গমঞ্চের তেমন কিছু উন্নতি হয় নি। সেই সময়কার রঙ্গমঞ্চের একটা প্রাচীন ছবি পাওয়া গেছে। এক ওলন্দাজ চিত্রকর এটা এঁকেছিলেন। চিত্রকরের নাম জোহান্‌স্ দ্য উইট (Johannes de Witt). তখন দৃশ্যপট সরানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। যে মঞ্চে অভিনয় হত তার তিনটি অংশ ছিল। মঞ্চের সম্মুখভাগ (front stage): এখানে কোন খোলা জায়গা, যেমন রাজপথ, পার্ক বা মাঠ দেখানো হত। ছবিতে যে থাম দেখা যাচ্ছে তার ভিতরের অংশে কিছু সাধারণ আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে কক্ষ, রাজপ্রাসাদের একাংশ, মন্ত্রণাসভা বা কোন ভিতরের কক্ষ দেখানো হত। এর নাম ছিল মঞ্চের পশ্চাৎ ভাগ (back stage). এই মঞ্চের উপরের অংশ, যা অভিনেতাদের মাথার উপর থাকত তার নাম ছিল উপরের মঞ্চ (upper stage). এখানে দুর্গের দেওয়ালের উপরের অংশ, দোতলার জানালা বা কক্ষ দেখানো হত। এতে অভিনয় খুব দ্রুত শেষ হত। আধুনিক মঞ্চের দৃশ্যপট সাজানোর জটিল সমস্যা এতে ছিল না। নাটক দেখার ঝোঁক জনসাধারণের মধ্যে যত বাড়তে লাগল তত গজিয়ে উঠতে লাগল নতুন নতুন রঙ্গালয়। The Globe (দ্য গ্লোব), the Fortune (দ্য ফরচুন), the Rose (দ্য রোজ), the Swan (দ্য সোয়ান) —রঙ্গালয়গুলির এমনি সব সুন্দর সুন্দর নাম
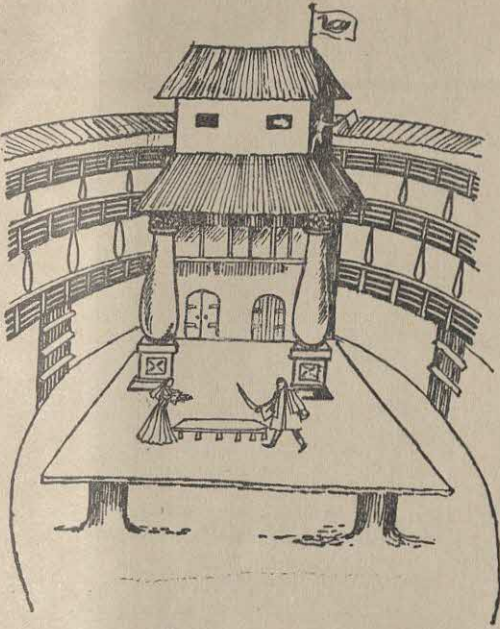
সেক্সপীয়ারের সময়কার রঙ্গমঞ্চ

ছিল। অভিনেতাদেরও নানা রকম সাজ পোশাকের ঘটা ছিল।

ক্রমওয়েলের সময়ে রঙ্গালয় আর অভিনয় দেখানো একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর লণ্ডনের ড্রুরি লেনে (Drury Lane) থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতেই প্রথম অভিনেত্রীরা স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রঙ্গালয়ে দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার আরও উন্নতি হয়। কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী নাট্যকলা দেখিয়ে খুব নাম করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সিবার (Cibber), ডগেট (Doggett), মিসেস্ ওল্ডফিল্ড (Mrs. Oldfield) এবং পরবর্তী সময়ে গ্যারিক (Garrick), ম্যাকলিন (Macklin) ও মিসেস সারা সিডন্স (Mrs. Sarah Siddons) খুব খ্যাতি অর্জন করেন। ইতিমধ্যে দৃশ্যপট ও পাদপীঠের আলো (footlight) প্রবর্তন হওয়ায় রঙ্গালয় বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

॥ ফরাসী রঙ্গালয় ॥

ইংল্যাণ্ডে যখন রঙ্গালয় ক্রমশঃ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তখন ফরাসীরা প্রাচীন গ্রীক নাটকের আদর্শ অবলম্বন করে নব ক্লাসিক (neo-classic) আন্দোলন শুরু করলেন। নতুন রীতিতে নাটক লিখে পিয়ের কর্নেইল (১৬০৬-১৬৮৪) ও জাঁ রাসিন (১৬৩৯-১৬৯৯) প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই সময়ে আরেকজন নাট্যকার মলিয়ের (১৬২২-১৬৭৩) কয়েকটি প্রহসন ও কমেডী লিখে ফরাসী রঙ্গালয়গুলি আমোদিত করে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন সেক্সপীয়ারের মতো একজন অভিনেতা।

॥ জার্মানী ও রাশিয়ার রঙ্গালয় ॥

জার্মানীর রোমান্টিক নাট্যকার হলেন ফ্রেডরিক শিলার আর জোহান উলফ্‌গ্যাং গ্যেটে। এঁদের নাটকগুলি জার্মান রঙ্গালয়গুলিকে দর্শকে পূর্ণ করে রাখত।

রাশিয়ায় নবনাট্যের স্বাদ এনে দিলেন নিকোলাই গোগোল। উনবিংশ শতাব্দী এসে গেল। মঞ্চশিল্প, সাজ-পোশাক, পাদপীঠের আলো, ফোকাসিং আর নতুন নতুন চমকপ্রদ দৃশ্যের ব্যবস্থা করে রঙ্গালয়গুলি খুব আকর্ষণের স্থান হয়ে উঠল।

॥ নব ধারায় নাটক ও মঞ্চশিল্পের উন্নতি ॥

নাট্যকাররা ক্রমশঃ অবাস্তব কাল্পনিক আখ্যায়িকা ছেড়ে বাস্তব বিষয় অবলম্বন করে নাটক লিখতে শুরু করলেন। আধুনিক জীবনের নানা সমস্যা প্রতিফলিত হতে লাগল নাটকে। এর সূত্রপাত হল নরওয়েতে। হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) নাটকের মধ্যে জীবনের আধুনিকতম সমস্যার আমদানি করলেন তাঁর ডলস হাউস (Doll's House) নাটকে। ইংল্যাণ্ডের আর্থার উইং পিনেরো (১৮৫৫-১৯৩৪) সেই ধারায় নাটক লিখে ইংল্যাণ্ডের রঙ্গমঞ্চে সাড়া জাগালেন। জর্জ বার্নার্ড শ নাটকের ইতিহাসে আরেক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর নাটক লোকশিক্ষার বাহন হয়ে দেখা দিল। নাটকে ফিরে এল স্বাভাবিক সুস্থ পরিবেশ। মঞ্চের জাঁকজমক অনেক সাদাসিধে হয়ে এল। আয়ারল্যাণ্ডে এল নব ভাবের বন্যা। সিঙ্গ, ওকেসি ও ইয়েট্‌স্ (William Butler Yeats, জন্ম ১৮৬৬ খ্রীঃ) স্বীয় প্রতিভায় রঙ্গালয়গুলি আলোকিত

করে তুললেন। এই প্রসঙ্গে বেলজিয়ামের নাট্যকার নোবেল পুরস্কার-জয়ী মেটারলিঙ্ক-এর (Maurice Maeterlinck, জন্ম ১৮৬২ খ্রীঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর অদ্ভুত ধরনের প্রতীকধর্মী রহস্য নাটক রঙ্গালয়ে এক নতুন সাড়া জাগিয়ে তুলল।

॥ কলকাতায় রঙ্গালয়ের ইতিহাস ॥

পলাশীর যুদ্ধের কিছু পরেই সাহেবরা এদেশে প্রথম থিয়েটার স্থাপন করেছিলেন। তার নাম ছিল 'প্লে হাউস'। তারপর হয় ক্যালকাটা থিয়েটার (১৭৭৮-১৮০৮) এবং 'মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার' (১৮৮৭-৯০)। আরও দু একটা সাহেবদের রঙ্গালয় হয়েছিল, কিন্তু সবগুলোতেই ইংরেজী নাটকেরই অভিনয় হত।

প্রথম বাংলা নাটক অভিনয় করিয়েছিলেন একজন রুশ ভদ্রলোক হেরাসিম লেবেডেফ, তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে। নাটকখানা ছিল ইংরেজী থেকে অনুবাদ-করা, তার নাম 'ছদ্মবেশ'।

বাঙালীদের প্রথম অভিনয় হল ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে। এখানেও ইংরেজী বইই অভিনীত হল। শেষে, বাগ-বাজারে নবীন বসুর বাড়িতে বাঙালীরা বাঙলা বইয়ের

অমৃতলাল বসু

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী

প্রথম অভিনয় করলেন—'বিদ্যাসুন্দর'। তাতে স্টেজ, সীন কিছু ছিল না, গাছতলার দৃশ্য দেখাবার জন্যে সবসুদ্ধ বাগানে গিয়ে অভিনয় করতে আর দেখতে হত। এর পর বাঙালীদের অভিনয় করা ক্রমেই বাড়তে লাগল কিন্তু বাঁধা রঙ্গালয়ও ছিল না, আর অভিনয়ও হত ইংরেজী আর সংস্কৃত নাটক নিয়ে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চড়কডাঙ্গায় জয়রাম বসাকের বাড়িতে অভিনীত হয়েছিল।

প্রথম জাতীয় নাট্যশালা হলো 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' (১৮৫৮ খ্রীঃ)। এতে প্রথম নাটক অভিনীত হয় রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'।

॥ বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয় ॥

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর চিৎপুর রোডের উপর জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে অস্থায়ী মঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়েছিল। এটিই কলকাতার প্রথম পেশাদারী রঙ্গালয়।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অমৃতলাল বসু এবং আরো অনেকে এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সংস্থার নাম দেওয়া হয় ন্যাশনাল থিয়েটার। এর সভাপতি হন বেণীমাধব মিত্র। উদ্যোক্তা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী (১৮৫১-১৯০৮ খ্রীঃ), মতিলাল সুর, মহেন্দ্র বসু, অমৃতলাল বসু (১৮৫০-১৯২৫ খ্রীঃ), অবিনাশচন্দ্র কর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কিন্তু নীলদর্পণের অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ন্যাশনাল থিয়েটারে দলাদলি শুরু হয়ে তা ভেঙে পড়বার উপক্রম করল। তখন সর্বসম্মতিক্রমে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪২-১৯১১ খ্রীঃ) এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৩-১৯১১ খ্রীঃ) এই সংস্থার ডিরেক্টর নির্বাচিত হলেন (জানুয়ারি, ১৮৭৩)। মহাত্মা শিশিরকুমার এ সংস্থার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকতে না পারলেও তাঁর প্রভাব এই সংস্থাকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। শিশিরকুমারের অনুপ্রেরণায় এই রঙ্গালয়ে প্রথম রূপকনাট্য (masque) 'ভারতমাতা' অভিনীত হয়েছিল।

॥ গিরিশ ঘোষ ॥

গিরিশচন্দ্র ছিলেন একাধারে নট, নাট্য-শিক্ষক, নাট্য-পরিচালক, নাট্যকার এবং রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। তাঁর প্রচেষ্টাতেই বাংলার রঙ্গালয়ে নতুন যুগ সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত থেকে অজস্র নাটক নিজে লিখে মঞ্চস্থ করে জনসাধারণের মধ্যে নাটক দেখার উৎসাহ জাগিয়ে তোলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গিরিশচন্দ্রের পর এলেন তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) আর গিরিশচন্দ্রের শিষ্যা তারা-সুন্দরী। এঁদের সঙ্গে যোগ দেন জনপ্রিয় নট অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬ খ্রীঃ)।

॥ আর্ট থিয়েটার্স লিঃ ॥

এবার নাট্যরসিক গোষ্ঠী একদল নতুন ডাইরেকটরের অধীনে আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেডের পত্তন করে স্টার থিয়েটারের পরিচালন-ভার তাঁদের উপরই ন্যস্ত করলেন। অন্যান্য থিয়েটার ও যাত্রাদল থেকে কয়েকজন প্রতিভাবান নট সংগৃহীত হল, যেমন—তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি। শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৭— খ্রীঃ) ম্যাডান কোম্পানি পরিচালিত বেঙ্গলী থিয়েট্রিকাল কোম্পানিতে তখন সবে যোগদান করেছেন।

॥ শিশিরকুমার ভাদুড়ী ॥

ভাদুড়ী ছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। ইনি কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে ইংরেজী ও বাংলা নাটক অভিনয়ে নাট্যপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করায় তাঁর দেখাদেখি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চের দিকে আকৃষ্ট হন। নরেশচন্দ্র মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় এসে জুটলেন। আরো এলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, ভূমেন রায়, রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৯২১ থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চে যে নতুন যুগ এলো তাকে 'শিশিরযুগ' বলা যেতে পারে।

॥ কর্ণার্জুন ॥

আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড যখন তাঁদের নাটক 'কর্ণার্জুন' মঞ্চস্থ করলেন তখন থিয়েটারের ভোল বদলে গেছে। উজ্জ্বল ফুট-লাইটের পিছনে কাটাকাটা দৃশ্যপট (scene), তার সঙ্গে উইংস (wings) ও স্পট লাইটের আমদানী হল। নাটকে এল আবহসংগীত।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

যোগেশ চৌধুরী রচিত 'সীতা' নাটকের আশ্চর্য প্রয়োগ কৌশলে সারা দেশে শিশিরকুমারের জয়জয়কার পড়ে গেল। তিনি প্রয়োগাচার্য রূপে অভিনন্দিত হলেন।

॥ সতু সেন ॥

সতু সেন আমেরিকা ভ্রমণ করে বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে ঘূর্ণ্যমান মঞ্চের (revolving stage) ব্যবস্থা প্রবর্তন করে রঙ্গজগতে যুগান্তর এনে দিলেন। এর পরে দৃশ্যান্তর ব্যবস্থা হল ত্বরান্বিত। 'মহানিশা' নাটকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল প্রথম রিভলভিং স্টেজের প্রবর্তন হল।

॥ শিশুরঙমহল, অবন মহল ॥

শিশুরঙমহলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শিশু অভিনেতাদের নিয়ে ইওরোপ ভ্রমণ করে এসেছেন। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বয়স আঠারোর বেশী নয়। কুমারী আরতি চট্টোপাধ্যায় একটি স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষিকা ছিলেন। ২০ বছর আগে এঁর মাথায় শিশুরঙ্গালয় বা শিশুরঙমহল প্রতিষ্ঠার কল্পনা আসে। ইনি সমরবাবুর আত্মীয়া। তিনি তাঁর কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে ইংরেজী নার্সারি রাইম (ছেলে-ভুলানো ছড়া) সুরে তালে গান করবার ব্যবস্থা করেন—সঙ্গে বাজনার সংগতও ছিল।

এখন সমরবাবু তাঁর সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এই কাজে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর দুই নাতনী সুকন্যা ও বিদিশা নৃত্যকলা শিখে এই রঙ্গালয়ে যোগ দিয়েছে। সুরশিল্পী তিমিরবরণ সুর দিয়ে এখানকার নাটকের গানগুলি শেখান।

বর্তমানে শিশুরঙমহলের নিজস্ব রঙ্গালয়ও হয়েছে—নাম তার 'অবন মহল'।

অবন মহল

দেশবিদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্যে মানুষকে অনেক কিছু শিখতে হয়, তাকেই বলে শিক্ষা। সব দেশেই অতি আদিমকাল থেকেই মানুষকে নানারকম কাজ কর্ম শেখানো হত। কিন্তু লিপি বা সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কারের পর থেকেই আক্ষরিক বিদ্যা শেখানোর জন্য বিদ্যালয় তৈরী হতে লাগল।

প্রাচীন সুমেরীয়দের মন্দিরের আশেপাশে বহু স্কুলের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। গ্রীসে প্লেটো, সক্রেটিস, অ্যারিস্টটলের আমলে স্কুল ছিল। মিশরেও মন্দিরের পুরোহিতরা ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগে প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা ও নালন্দা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নস্তূপ মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে লণ্ডনে 'গ্রামার স্কুল' নামে একশ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। ইটালী ও জার্মানীতেও এরকম স্কুল স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ ইটালীতে বড় বড় বংশের ছেলেদের শিক্ষার জন্যে আবাসিক বিদ্যালয় (residential school) স্থাপিত হতে থাকে।

যীশু খ্রীস্টের সমসাময়িক কুইনটিলিয়ান (Quintilian) নামে একজন স্পেনীয় রোমে প্রথমে বক্তৃতা শেখাবার একটি স্কুল করেছিলেন। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বইও লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হওয়া চাই, জোর জবরদস্তি করে তাদের শেখালে চলবে না।

এর পর অ্যালকুইন (Alcuin) নামে এক ব্যক্তি গির্জার সংলগ্ন স্কুলগুলির কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এঁর মৃত্যুর ৭০০ বছর পরে ডেসিডেরিয়াস ইরেসমাস (Desiderius Erasmus, ১৪৬৬-১৫৩৬ খ্রীঃ) নামে একজন ওলন্দাজ জনশিক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ২৮ বছর বয়সে তিনি একজন বিশপের কেরানী হয়ে প্যারিসে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর একজন ইংরেজ বন্ধু তাঁকে মাসিক কিছু ভাতা দিয়ে ইংল্যাণ্ডে আহ্বান করেন। ইংল্যাণ্ডে এসে তিনি জন কলেট (John Colet) এবং 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক স্যার টমাস মোর (Sir Thomas More, ১৪৭৮-১৫৩৫ খ্রীঃ) এর সঙ্গে মিলে যান।

অ্যারিস্টটল ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছেন

জন কলেট-এর উৎসাহে ইরেসমাস গ্রীক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করবার জন্যে সারা ইওরোপ ঘুরে বহু বিদ্যা অর্জন করেন। কলেট সেণ্ট পলস স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই আজ বহুস্থানে সেই আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে এবং ছোটদের বাইবেল পড়ানো সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষার মূল কি? কিভাবে শিক্ষা দিলে তা সবচেয়ে কার্যকর হবে, কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া দরকার সে সম্বন্ধে যে তিনজন সেকালে সব চেয়ে বেশী ভেবেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন জন অ্যামন কোমেনস্কি, জন হেনরি পেস্তালৎসি (Pastalozzi) এবং ফ্রেডরিক ফ্রোবেল (Froebel)।

কোমেনস্কি বা কোমেনিয়াস (১৫৯২-১৬৭০ খ্রীস্টাব্দ) মোরেভিয়ার অধিবাসী। তিনি হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষা লাভ করেন জার্মানীতে। তিনি বইয়ের ভাষা থেকে শব্দ না শিখিয়ে মৌখিক ভাষা থেকে শব্দ শেখাবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনিই প্রথম ছবিওয়ালা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই বই ফরাসী ভাষায় লেখা। সে বই এত জনপ্রিয় হয় যে তার অনুবাদ ১৫টি ভাষায় বার হয়েছিল।

পেস্তালৎসি জাতিতে সুইস ছিলেন। তিনি সব সময়ে একটু বেশী ভাবতেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কেউ বোঝে না। এর দ্বারা দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। কিন্তু তাঁর মতি স্থির ছিল না। কখনো ভাবতেন যে তিনি মন্ত্রী হবেন, আবার কখনো ভাবতেন যে উকিল হবেন। তারপর বিয়ে করে জমিজমা কিনে চাষবাস শুরু করে শেষ পর্যন্ত সব কিছু লোকসান দিলেন। তখন তাঁর বয়স ২৯ বছর। তিনি কুড়িটি ছাত্র নিয়ে তাঁর গোলাবাড়িতে স্কুল খুললেন। সব ক'টিই গরিবের ছেলে। তাদের খেতে পরতে থাকতে দিতেন আর পড়াতেন। তারা তাঁর হয়ে খাটত। এটিই প্রথম শিল্প বিদ্যালয়। তাঁর স্ত্রীর সব টাকাকড়ি ব্যয় করে তিনি এ বিষয়ে যে প্রথম পরীক্ষা চালালেন তাতে বহু লোকের দৃষ্টি এদিকে পড়ল কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি ব্যর্থ হল।

১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ফরাসীরা যখন সুইজারল্যাণ্ড আক্রমণ করল এবং অনেক ছেলেমেয়ে গৃহহীন হল তখন পেস্তালৎসি তাদের নিয়ে স্টানৎসে একটা আবাসিক স্কুল খুললেন। তিনি সুইজারল্যাণ্ডের বহু স্থানে বহু স্কুল খোলেন, বহু লোক পৃথিবীর নানা স্থান

ওয়ারস'র বিদ্যালয়ে হিব্রু বালকেরা বাইবেল পড়া শুনছে

থেকে সেই সব স্কুল দেখতে যেত। ৮২ বছর বয়সে পেস্তালৎসি মারা যান।

তাঁর চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর ছাত্র ফ্রেডরিক উইলহেলম অগাস্ট ফ্রোবেল (Friedrich Wilhelm August Froebel) তাঁর অসমাপ্ত কাজ হাতে তুলে নেন।

কাম্বোডিয়ার বিদ্যালয়ে বালকেরা গান বাজনা করছে

॥ কিণ্ডারগার্টেন ॥

ফ্রোবেলের জন্ম ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি জাতিতে জার্মান ছিলেন। তিনি একজন মন্ত্রীর পুত্র ছিলেন। শৈশবে তাঁর মা মারা যান। তিনি অনাদৃতভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। এই সময়ে তাঁর মধ্যে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা বাড়তে থাকে। প্রথমে তিনি একজন অরণ্যরক্ষকের শিক্ষানবিস হন। পরে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে তিনি শিক্ষক হন।

তিনি তিনটি বালকের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। তাদের নিয়ে তিনি পেস্তালৎসির স্কুলে তাঁর শিক্ষার ধরন দেখতে যান। পেস্তালৎসি তখন সুইজারল্যাণ্ডের ইভারডান-এ বিদ্যালয় খুলেছেন। তিনি ও তাঁর ছাত্র তিনজন পেস্তালৎসির শিক্ষা-পদ্ধতি দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু পরে ফ্রোবেল পেস্তালৎসির শিক্ষাপদ্ধতির চেয়ে সরল একটি শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি এই শিক্ষার নাম দেন কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি। জার্মান ভাষায় এই 'কিণ্ডারগার্টেন' কথাটার অর্থ হচ্ছে 'ছোটদের বাগান'। জার্মানির যে থুরিঙ্গিয়ান বনাঞ্চলে তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল বলে, তিনি বিদ্যালয়টির এই নামই দেন (The Garden of Children). তাঁর মতে শিশুরা বাগানের চারা গাছের মতো, ঈশ্বরের ও প্রকৃতির নিয়মে তাদের বেড়ে ওঠা দরকার।

ফ্রোবেলের পদ্ধতি আধুনিক। তিনি খেলার মধ্য দিয়ে বালকদের কোন্‌দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক তা লক্ষ্য করে সেই অনুযায়ী তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর পদ্ধতিটি বহু পরবর্তী শিক্ষক দ্বারা একটু আধটু পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার স্কুলে অবলম্বন করা হচ্ছে।

॥ পড়ার মধ্যে আনন্দ ॥

পড়তে পড়তে ছেলেমেয়েদের যাতে বিরক্তি না আসে সেজন্যে অনেক বিদ্যালয়েই গান শেখানো হয়।

কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে

ছবিতে কাম্বোডিয়ার বিদ্যালয়ে ছেলেদের গানবাজনা করতে দেখা যাচ্ছে।

॥ মনিটরিয়াল পদ্ধতি ॥

শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটি ছাত্রকে monitor (সর্দার-পড়ো) করে সমস্ত শ্রেণীর কাজে শিক্ষককে সাহায্য করার জন্যে যে পদ্ধতি এখন বহু স্কুলে গ্রহণ করা হয়, তা শুরু করেন জোসেফ ল্যাঙ্কাস্টার ও অ্যাণ্ড্রু বেল। এই পদ্ধতিতে ছেলেদের দ্বারাই ছেলেদের শেখানো হয়। অ্যাণ্ড্রু বেল ভারতবর্ষ থেকে এই পদ্ধতি শিখে যান। মাদ্রাজের পাঠশালায় সর্দার পড়ো ছাত্রদের পড়াচ্ছে দেখে তিনি এর কার্যকারিতা বুঝে স্বদেশে ফিরে গিয়ে তা প্রচলন করেন।

ঐ সময়ে লণ্ডনের দক্ষিণে জোসেফ ল্যাঙ্কাস্টার ঠিক ঐ পদ্ধতিতে ছাত্রদের দ্বারা ছাত্র পড়ানো শুরু করেন। তাঁর পদ্ধতি এত কার্যকর হয় যে তাঁর মতো পদ্ধতিতে চালানো স্কুলের নাম দেওয়া হত ল্যাঙ্কাস্টার স্কুল।

॥ মন্তেসরী পদ্ধতি ॥

ডাক্তার মারিয়া মন্তেসরীর জন্ম হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর অন্তর্গত অ্যানকোনার নিকটে চিয়ারিভেল অঞ্চলে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিলা এম-ডি হবার গৌরব অর্জন করেন। তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিশু হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার নিযুক্ত হন। ইনি জড়বুদ্ধি বালকদের শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে এক অভিনব শিশুশিক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই শিক্ষাপদ্ধতি 'দি মন্টেসরী পদ্ধতি' নামে খ্যাত। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বোধকে জাগানো। তাকে নানারকম হাতের কাজ দিয়ে, খেলাধুলো ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে, এবং যতদূর সম্ভব অপরের সাহায্য ছাড়া সব করতে শিখিয়ে দেওয়াই এই পদ্ধতির লক্ষ্য।

কাসগড়ের বিদ্যালয়

॥ শিক্ষায় ধর্ম ॥

অনেক দেশেই ছাত্রদের মনে ছোটবেলায় ধর্মভাব জাগিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তাদের মন পবিত্র থাকে এবং তারা বিপথে না যায়। ধর্মগ্রন্থ পড়িয়ে, ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, প্রার্থনার ক্লাস করে, আরও নানা-ভাবে এটা করা হয়ে থাকে। তবে, আজকাল ভারতে সরকারী স্কুলে এসব করানো হয় না।

॥ বোরস্ট্যাল স্কুল ॥

১৬ বছরের কম বয়সের শিশু অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্যে এক রকম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিশু অপরাধীকে আইনানুযায়ী দণ্ড না দিয়ে যাতে তার মন থেকে অপরাধ করার প্রবৃত্তি দূর হয়ে যায় তাকে সেই রকম শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এই সব স্কুলে অবলম্বন করা হয়। এদের সংশোধনী স্কুল বলা যেতে পারে। ইংল্যাণ্ডের কেন্ট অঞ্চলের বোরস্ট্যাল নামক স্থানে প্রথম এরকম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল বলে এই জাতীয় স্কুলের নাম বোরস্ট্যাল স্কুল। এই রকম চারটি বিদ্যালয় প্রথমে স্থাপিত হয়, তিনটি ছেলেদের এবং একটি মেয়েদের জন্যে। এখানে ২ থেকে ৩ বছর আটক রেখে অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা হত। ফলে তিন ভাগের দু'ভাগ অপরাধীরই চরিত্র সংশোধন হয়ে যেত।

অন্ধকে পড়তে শেখানো হচ্ছে

॥ ব্রেইল পদ্ধতি ॥

আগে অন্ধদের লেখাপড়া শেখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। মুখে মুখে শুনিয়ে কিছু শেখানো হত বটে, কিন্তু তাদের আক্ষরিক জ্ঞান লাভের কোন উপায়ের কথা কারুর জানা ছিল না। লুই ব্রেইল (Louis Braille, ১৮০৯-১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ) নামে একজন ফরাসী হাত দিয়ে ছুঁয়ে বোঝা যায়, এমন অক্ষর কাগজের ওপর ফুটিয়ে তোলবার উপায় বের করেন। কাগজের উপর উঁচু উঁচু লেখাগুলোর উপরে হাত বুলিয়েই অন্ধরা অনায়াসে সেরকম অক্ষরে লেখা বই ইত্যাদি পড়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে।

দুর্ঘটনার ফলে তিন বছর বয়সে লুই ব্রেইল অন্ধ হয়ে যান। তাই তিনি অন্ধদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নানা রকম গবেষণা করতে থাকেন। তিনি যে পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন, আজও তা সারা পৃথিবীতে ব্রেইল পদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

সেই পদ্ধতির বাংলা রূপায়ণ করেন কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রেভারেণ্ড লালবিহারী শাহ।

এখন কাগজের উপর অক্ষর তোলবার জন্যে যন্ত্র তৈরী হয়েছে। সেই যন্ত্রটি দেখতে টাইপরাইটার যন্ত্রের মতো।

॥ মূকবধিরদের শিক্ষা ॥

অন্ধদের শিক্ষা দেবার উপায় যেমন বেরিয়েছে, তেমনি বোবা আর কালাদের শেখাবারও বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যারা জন্ম থেকেই বধির, অর্থাৎ কানে শোনে না, তারা কথাও বলতে পারে না। কেননা আমরা শুনে-শুনেই শব্দের উচ্চারণ করতে শিখি। যারা এরকম বোবা-কালা, তাদের বলে মূক-বধির (deaf-mute). এদের বিশেষ স্কুল আছে, যেখানে তারা কানে না শুনেও শব্দের উচ্চারণ শেখে, আর মুখ দিয়ে সেই শব্দ কতকটা উচ্চারণ করতে পারে।

॥ হেলেন কেলার ॥

একজনের কথা বলব যিনি শুধু অন্ধই নন, মূকবধির হয়েও লেখাপড়া শিখে নানা কাজ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি একজন আমেরিকান মহিলা, তাঁর নাম ছিল হেলেন কেলার (জন্ম ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর অদ্ভুত অধ্যবসায়ের কথা তিনি তাঁর Story of My Life বইয়ে লিখে গেছেন।

॥ আমাদের দেশের শিক্ষা ॥

আমাদের দেশে খুব প্রাচীনকালে লেখাপড়া শিখতে হলে গুরুগৃহে গিয়ে অন্ততঃ পক্ষে বারো বছর থাকতে হত। গুরুই সব ছাত্রকে থাকতে খেতে দিতেন, তার খরচ দিতেন দেশের রাজা। শিষ্যরা গুরুর সব কাজ করে দিত। গুরুকে তারা টাকাকড়ি কিছু দিত না, শুধু চলে আসবার সময় সাধ্যমত কিছু একটা দিয়ে আসতো। তাকে বলা হতো গুরুদক্ষিণা। তখন বইটই কিছু ছিল না, মুখে মুখেই সব শিখত। পরে, বুদ্ধদেবের পরবর্তী সময়ে তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী ইত্যাদি স্থানে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় হল, তারও খরচ যোগাতেন রাজারা। নালন্দার মত বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার ছাত্র থাকত। এ সবের এত নাম হয়েছিল যে এশিয়ার সুদূর সব প্রান্ত থেকে পণ্ডিতেরা পর্যন্ত এখানে বিদ্যা শিখতে আসতেন। এগুলি নষ্ট হয়ে যাবার পর হিন্দুদের কতকগুলি শিক্ষা কেন্দ্র বড় হয়ে ওঠে—যেমন, মিথিলা। ক্রমে আমাদের দেশে পণ্ডিতেরা বিদ্যাদানের জন্য

'চতুষ্পাঠী' খোলেন, চলতি কথায় যাকে বলা হয় 'টোল'। ব্রাহ্মণরা এখানে সংস্কৃত ভাষায় নানা রকম বিষয় শেখাতেন। নবদ্বীপ হয়েছিল বাংলার এরকম একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাপীঠ।

এদেশে ইংরেজ আসার পর সংস্কৃত চর্চা কমে যেতে লাগল। মুসলমানদের 'মক্তব' আর 'মাদ্রাসা' তো মুসলমান আমল থেকে চলছিলই, এখন হিন্দুদের জন্য পাঠশালা খোলা হতে লাগল। এতে গ্রামে গ্রামে বাংলাভাষায় সামান্য কিছু অঙ্ক আর কিছু কিছু ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষককে বলা হত গুরুমশায়, ছাত্রদের বলা হত পড়ুয়া বা পড়ো। এই সব পাঠশালাতেই একজন সর্দার পড়োর ওপর ক্লাস চালাবার ভার থাকত। পড়ুয়ারা উঠতে-বসতে দোষ ত্রুটির জন্যে নানারকম অদ্ভুত শাস্তি পেতো। পাঠশালায় এবং মক্তবে ছাত্রদের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করার ব্যবস্থা এখনও একেবারে উঠে যায় নি।

এখন বিজ্ঞানের যুগ। স্কুলে স্কুলে লেবরেটরী গড়ে উঠছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে নানা ধরনের বিদ্যা এখন ছেলেমেয়েরা শিক্ষা করছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান এবং কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ আগেকার চেয়ে এখন অনেক বেশী।

এখনকার বিদ্যালয়গুলিতে লেবরেটরী ত আছেই, তাছাড়া আছে গ্রন্থাগার। সেখান থেকে নানা বই এনে ছাত্ররা পড়তে পারে। তাছাড়া আছে খেলার মাঠ আর নানা রকম খেলার ব্যবস্থা। ছুটিতে ছাত্রদের নিয়ে যাওয়া হয় নানা দেশে—নানা প্রসিদ্ধ স্থানে। এতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হয় উদার।

এখনকার স্কুলে স্কুলে লেবরেটরী গড়ে উঠেছে

———
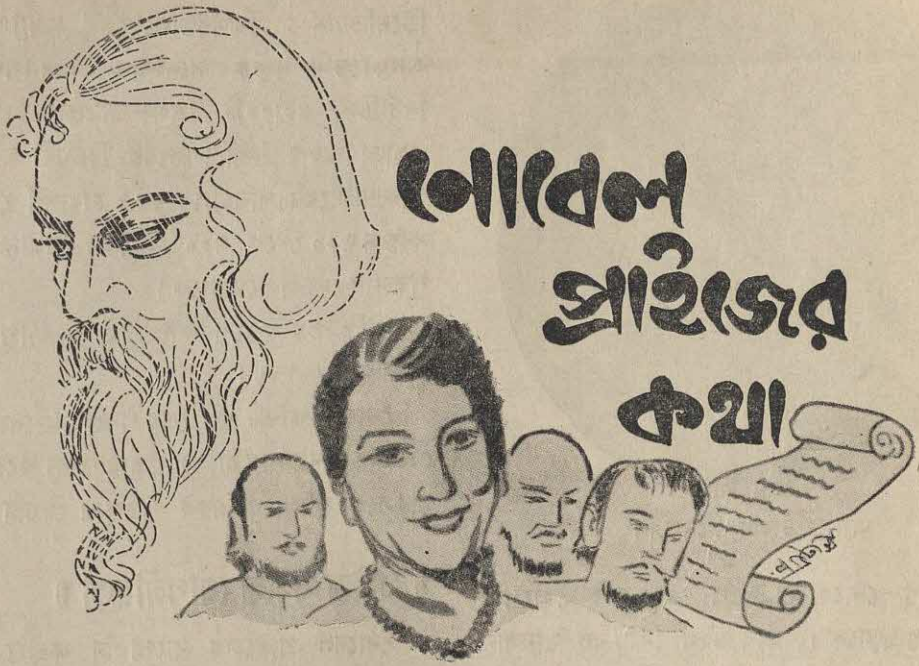
॥ নোবেল ও তাঁর দান ॥

আল্‌ফ্রেড বার্নার্ড নোবেল (Alfred Bernhard Nobel) ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত ও যন্ত্রশিল্পী। তাঁর সব চেয়ে বড় কীর্তি হল নাইট্রো-গ্লিসারিনকে বিস্ফোরিত করার পদ্ধতি আবিষ্কার, জিলেটিনকে ফাটানো, ধূমহীন চূর্ণ আর ডিনামাইট আবিষ্কার। এ থেকে তিনি অনেক টাকা রোজগার করেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি ফরাসী সংবাদপত্রে নোবেলকে ডিনামাইটের রাজা আর মৃত্যুব্যবসায়ী বলে উল্লেখ করা হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যুর এক বছর আগে, নোবেল উইল করে তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশ দিয়ে গেলেন বিশ্বজগৎকে। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৯২ লক্ষ ডলার।

তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সেই সম্পত্তির আয় থেকে সমান ভাবে পাঁচটি বার্ষিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। পুরস্কারগুলি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীর বা চিকিৎসা বিদ্যা, সাহিত্য এবং শান্তি এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর। এর প্রত্যেকটিতে প্রতি বছর যাঁর অবদান শ্রেষ্ঠ বলে মনে হবে তাঁকেই দেওয়া হবে ঐ পুরস্কার। তারপর, ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অর্থনীতির জন্যেও এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। প্রতি বিষয়ে পুরস্কারের টাকার পরিমাণ এখন হচ্ছে কিছু কমবেশী ১,২০,০০০ ডলার, অর্থাৎ এখনকার হিসেবে ৯ লক্ষ টাকা।

॥ কারা এই পুরস্কার দেবার কর্তা ॥

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কার দেবেন সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স; ঔষধ বা শারীর-বিদ্যা বিষয়ের পুরস্কার দেবেন স্টকহমের ক্যারোলিংস্কা ইনস্টিটিউট্; সাহিত্যের পুরস্কার দেবেন স্টকহমের অ্যাকাডেমি, আর শান্তির পুরস্কার দেবেন নরওয়ের স্টর্টিং (পার্লামেণ্ট)। পুরস্কার দেবার সময়ে দেশ বা জাতির বিচার করা হবে না, সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই পুরস্কার দেওয়া হবে।

॥ নোবেল ফাউণ্ডেশন ॥

আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর পর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। এত দেরি

আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল

হবার কারণ—নোবেলের সম্পত্তি ছিল ইওরোপের আটটি দেশে ছড়ানো। তাঁর উইল নিয়ে বহু মামলা-মকদ্দমা শুরু হয়ে যায়। তাঁর আত্মীয়স্বজনরা এর বিরোধিতা করে—আর কয়েকটি দেশ সেখানে অবস্থিত তাঁর সম্পত্তির উপর দাবি পেশ করে। তিনি অধিকাংশ সময়ে বিদেশে বাস করায় তাঁর উইলের সরকারী প্রমাণ নেবার এক্তিয়ার সুইডেনের আদালতের আছে কিনা সে প্রশ্নও ওঠে। তাছাড়া তিনি যে সব সংস্থার উপর পুরস্কার দেবার ভার দিয়ে যান তাঁরাও এই পবিত্র দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত একটি নতুন সংস্থা গঠন করে তার উপর এই ভার ন্যস্ত করা হয়। এই সংস্থার নাম নোবেল ফাউণ্ডেশন। এই সব সমস্যা সমাধান করতে তিনটি বছর চলে যায়। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুন 'নোবেল ফাউণ্ডেশনে'র সৃষ্টি হয়।

॥ নোবেল কমিটি ॥

অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সস্-এর সভ্যসংখ্যা ২৪০। ১৪০ জন সুইডেনবাসী আর ১০০ জন বিদেশী এই সভার সভ্য। আর যাঁরা মনোনীত করতে পারেন তাঁরা পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের নোবেল কমিটির সভ্য, পূর্বেকার পুরস্কার প্রাপক, আর আটটি স্ক্যান-ডিনেভিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ও অ্যাকাডেমি কর্তৃক মনোনীত অধ্যাপকগণ যাঁরা নির্বাচিত ৪০।৫০টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক। এছাড়া বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আর বড় বড় গবেষণাগারের পরিচালকদেরও পরামর্শ নেওয়া হয়। সবসুদ্ধ ৬০০ থেকে ৭০০ লোকের পরামর্শক্রমে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রতি বছর ৩১শে জানুয়ারি এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নোবেল কমিটি যদি শেষ পর্যন্ত দু'জনের নাম পান তো একজনের নাম বাতিল করার চেষ্টা করেন। সহজে একসঙ্গে দু'জনকে একই পুরস্কার দেওয়া হয় না।

॥ প্রাইজ সম্বন্ধে গোপনীয়তা ॥

নোবেল প্রাইজের ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয় রাখা হয় যাতে কেউ প্রাপকদের নাম আগে না জানতে পারে। বোধ হয় এই গোপনীয়তার জন্যে নোবেল প্রাইজের এত সম্মান। এর গৌরব আজও পর্যন্ত অন্য কোন পুরস্কার ম্লান করতে পারে নি। বিজ্ঞানের অন্য মূল্যবান্ পুরস্কার আছে। কিন্তু নোবেল প্রাইজের আলাদা গৌরব, আলাদা সম্মান।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কাম্য পুরস্কার হল নোবেল প্রাইজ। তা বলে যে সব বিজ্ঞানী এ পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের কেউই এ পুরস্কার পাবার আশায় তাঁদের গবেষণা চালান নি। তাঁদের মধ্যে এমন সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী আছে যাঁদের শ্রেষ্ঠতা সংশয়াতীত।

॥ মেডেল ও ডিপ্লোমা ॥

নোবেল প্রাইজের সঙ্গে যে সোনার মেডেল দেওয়া হয় তার এক পিঠে থাকে নোবেলের প্রতিকৃতি, অন্য পিঠে প্রতীক খোদাই করা থাকে। রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার মেডেলে দেখানো হচ্ছে প্রকৃতির মুখ থেকে জ্ঞানের দেবী ঘোমটা তুলে নিচ্ছেন আর শারীর-

জ্ঞানের দেবী

বিজ্ঞান ও ঔষধের মেডেলে দেখানো হয়েছে আরোগ্যদায়িনী দেবী পীড়িতকে সান্ত্বনা জানাচ্ছেন।

এছাড়া প্রত্যেক বিজয়ীকে একটি করে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়।

প্রতি বছর নোবেলের মৃত্যুর দিন ১০ই ডিসেম্বর এক সুন্দর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান স্টকহমে হয়ে থাকে।

আরোগ্যদায়িনী দেবী

॥ পদার্থবিজ্ঞান ॥

পদার্থবিজ্ঞান (Physics)-এর জন্যে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে উইলহেল্‌ম্ কনরাড ফন রোণ্টগেন নামক জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী এই পুরস্কার লাভ করেন। জার্মানীর লেনেপ শহরে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ওয়াৎস্‌বাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে তিনি একটি নলের ভিতরে গ্যাস ভরে তার মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা পরীক্ষা করছিলেন। নলটা কালো কাগজে মোড়া ছিল আর ঘরটা ছিল অন্ধকার। সেই ঘরে অন্য জায়গায় ছিল বেরিয়াম্ প্ল্যাটিনো-সায়েনাইড লবণের প্রলেপ মাখানো আলোকচিত্র নেবার কতকগুলি প্লেট। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন যে প্লেটগুলি আলোকিত হয়ে উঠেছে। তিনি বিদ্যুৎ চালনা বন্ধ করতেই প্লেটগুলির দীপ্তি নিভে গেল। তিনি এই অজানা রশ্মি কি করে বিকীর্ণ হচ্ছে তা আবিষ্কার করে ফেললেন।

তিনি এই রশ্মির নাম দিলেন X-Ray অর্থাৎ অজানা রশ্মি। এ বিষয়ে তিনি আরো পরীক্ষা চালাতে লাগলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে এই রশ্মি অন্য কোন পদার্থকে ভেদ করতে পারে। নিজের হাতের উপর পরীক্ষা করে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ভিতরের হাড় দেখা যাচ্ছে, মাংস ও চামড়া ভেদ করে যাচ্ছে এই রশ্মি। তিনি এবার তাঁর আবিষ্কার সকলের নিকট প্রকাশ করে দিলেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে এই আবিষ্কারের জন্যে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল।

রোণ্টগেন

ম্যাডাম কুরি

বর্তমানে চিকিৎসা ব্যাপারে এর ব্যাপক ব্যবহার অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থ-বিজ্ঞানের পুরস্কার তিন-জনকে ভাগ করে দেওয়া হয়। এঁরা হচ্ছেন হেনরী বেকেরেল (ফ্রান্স), পিয়েরে কুরি (ফ্রান্স) ও মেরী কুরি (পোল্যাণ্ডে জন্ম)। এঁরা রেডিয়াম ও পলো-নিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের জন্যে এই পুরস্কার পান। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পান গ্যাব্রিয়েল লিপম্যান, এঁরও বাড়ি ফ্রান্সে। ইনি ফটোগ্রাফে রঙের প্রতিলিপি আনার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বেতার বার্তা প্রেরণের প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কারের জন্যে ইটালীর মার্কোনি ও জার্মানীর কার্ল ফার্দিনান্দ ব্রন যৌথভাবে এই পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity) এবং ফটো ইলেক্ট্রিক এফেক্ট আবিষ্কারের জন্যে এই পুরস্কার পান। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে একজন ভারতীয় চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন্ তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কারের (Raman Effect) জন্যে এই পুরস্কার লাভ করেন। প্রায় প্রতি বছরেই এক বা একাধিক বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়ে আসছেন। কয়েক জনের কথাই মাত্র বলা হল।

॥ রসায়ন ॥

রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম বারের পুরস্কার (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ) পান ওলন্দাজ বিজ্ঞানী জ্যাকোবাস হেনড্রিকাস ভ্যাণ্ট হফ্। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রোটারডামে তাঁর জন্ম। ইনি ল্যাকটিক অ্যাসিডের গঠন-প্রণালী বিশ্লেষণ করে তার নিয়মকানুন আবিষ্কার করেন। তাঁর ব্যাখ্যা রাসায়নিক পদার্থের গঠন-প্রণালীর উপর আলোকপাত করে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক আর্নেস্ট রাদারফোর্ড রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ডের নেলসন শহরে তাঁর জন্ম। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে মূল তথ্যের আবিষ্কার করে তিনি বিখ্যাত হন।

মার্কোনি
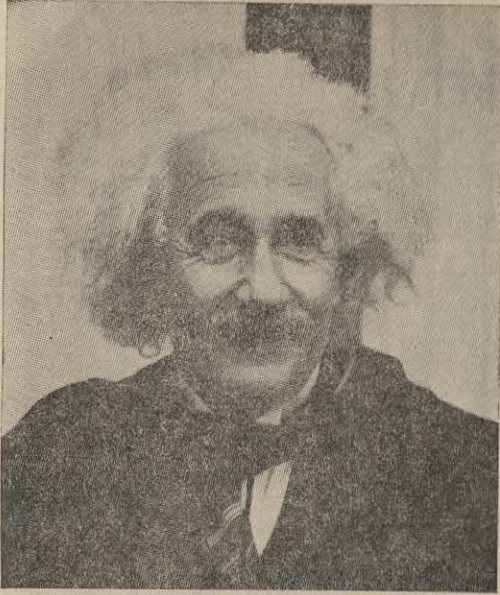
আলবার্ট আইনস্টাইন

রসায়নে আর যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে মেরী কুরি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আবার এই পুরস্কার পান। এবার রেডিয়ামের ও পলোনিয়মের উপাদান আবিষ্কারের জন্যে আর রেডিয়ামকে পৃথক্ করার জন্যে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ছোট মেয়ে ইরিন্ জোলিও-কুরি ও জামাতা ফ্রেডারিক জোলিও-কুরি কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদনের জন্যে এই পুরস্কার লাভ করেন।

॥ শারীর বিদ্যা ও চিকিৎসা ॥

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই বিদ্যায় পুরস্কার পেলেন জার্মান বিজ্ঞানী এমিল বেরিং। ইনি ডিপথিরিয়া রোগের প্রতিষেধক সিরাম আবিষ্কার করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস মশা থেকে ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণের তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্যে এই পুরস্কার পান। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ ব্যাকটিরিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কক্ এই পুরস্কারের অধিকারী হন। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞানী (বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক) শ্রীহরগোবিন্দ

সার রোনাল্ড রস

খোরানা এই পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বছর আরো দু'জন বিজ্ঞানী এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

॥ সাহিত্য ॥

সাহিত্যে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সাহিত্যিক সুলি প্রুধোম এই পুরস্কার লাভ করেন। প্রতি বছর এক-এক দেশের এক-একজন সাহিত্যিক এই পুরস্কার পেয়ে আসছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন পোল্যাণ্ডের সিংকিয়েভিচ্, ইংল্যাণ্ডের কিপলিং, জর্জ বার্নার্ড শ', জন গলস্‌ওয়ার্দি, টি. এস. এলিয়ট, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, উইনস্টন চার্চিল; সুইডেনের সেলমা

কাফ্কা ম্যানের সঙ্গে টমাস ম্যান

লাগেরলফ্, বেলজিয়ামের মেটারলিংক, ফ্রান্সের রোম্যাঁ রোঁলা, আয়ার্ল্যাণ্ডের ইয়েটস, ইটালীর গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, নরওয়ের সিগ্রিড্ উণ্ডসেট্, জার্মানীর টমাস ম্যান, যুক্তরাষ্ট্রের সিনক্লেয়ার লিউইস্ ইত্যাদি। জাপানের ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বিশ্ববন্দিত পুরস্কার পান। ইনি পরে আত্মহত্যা করেন। আমাদের ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

॥ শান্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ॥

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই পুরস্কার দু'জনকে ভাগ করে দেওয়া হয়। একজন হলেন রেড ক্রস্-এর প্রবর্তক সুইজার্ল্যাণ্ডের হেনরি ডুনান্ট (আঁরি দুনাঁ) ও অন্যজন ফ্রান্সের ফ্রেডারিক প্যাসি। যুক্তরাষ্ট্রের রুজভেল্ট ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উডরো উইলসন এই পুরস্কার পান। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড নেশন্স্-এর মহাসচিব সুইডেনবাসী দাগ হামারশিল্ড (Dag Hammarskjold) এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো জাতির ডঃ মার্টিন লুথার কিং এই পুরস্কার অর্জন করেন।

দাগ হামারশিল্ড

॥ অর্থবিদ্যা ॥

অর্থবিদ্যা সম্বন্ধে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় ১৯৬৯ থেকে। সে বছর এটা পান জার্মানীর রাগনার ফ্রিশ আর হল্যাণ্ডের জান টিনবের্গেন। তারপর ১৯৭০-এ পান আমেরিকার স্যামুয়েলসন, ১৯৭১-এ সাইমন কুজ্‌নেট্‌স্, ১৯৭২ সনে জন হিক্স্ এবং কেনেথ অ্যারো, আর ১৯৭৩-এ ভ্যাসিলি লিওন্টিয়েফ।

ডঃ মার্টিন লুথার কিং

ইতিহাসের কথা

॥ ইতিহাস কাকে বলে ॥

ইতি-হ-আস—এই তিনটে শব্দ জুড়ে ইতিহাস কথাটা হয়েছে, তার অর্থ, এইই ছিল। কিন্তু সব দেশেই এমন একটা সময় ছিল, যার আগেকার কথা ভাল করে জানা যায় না। সেই আগেকার সময়কে বলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ। তার পরের সময়—যখন থেকে খবর বেশী করে পাওয়া যেতে থাকে, তখন থেকেই প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভ।

॥ প্রাচীন সভ্যতা ঃ সুমেরীয় সভ্যতা ॥

প্রাচীন সভ্যতার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সুমেরের কথা। দক্ষিণ ইরাকে টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানে পাঁচ-সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এই প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। দুই নদীর মাঝখানে অবস্থিত ছিল বলে জমি খুব উর্বরা ছিল। কম পরিশ্রমে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। এই স্থানে ক্রমে সুমেরীয়রা বসবাস করতে আরম্ভ করে। বড় বড় মন্দির তখন তৈরী হয়েছিল। সেই মন্দিরে দেবতার পূজা হত। নানা সময়ে নানা জায়গায় এদের বিভিন্ন দেবতার নাম ছিল আদাদ, এনলিল, বেল, মার্ডুক, ইশ্‌তার ইত্যাদি।

সুমেরীয় সভ্যতার বড় কৃতিত্ব হচ্ছে—লিপি আবিষ্কার। সাংকেতিক অঙ্ক চিহ্ন, সাল গণনা করার পদ্ধতি অথবা মাস নির্ধারণ করার উপায়ও তখন মানুষের জানা ছিল। বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন ছিল প্রচুর। মাটি খুঁড়ে কয়েকটি বিদ্যালয়ের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে।

প্রথম দিকে উর শহরের রাজারা শক্তিশালী রাজবংশ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ২৩৭০ বছর আগে সারগন নামে সেমাইট জাতির এক সাহসী নেতা সমস্ত নগর রাজ্যগুলিকে জয় করে আক্কাদীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আক্কাদীয় শাসকদের অধীনে ভারত আর মিশরের সঙ্গে সুমেরের ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ বেড়ে যায়। এর পরে কোনও শক্তিশালী রাজার নাম করতে গেলে হামুরাবির কথা বলতে হয়। তিনি যে আইন প্রণয়ন করে গিয়েছেন, তা যেমন কঠোর তেমনি উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক।

হামুরাবি যে জাতির লোক, সেই জাতির লোকেরা ছোট শহর ব্যাবিলন থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই তাঁকে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি রাজ্যের উদ্ভব হয়—তার নাম আসিরিয় রাজ্য। আসিরিয়ানরাও সেমিটিক জাতির লোক—অসুর

সুমেরীয় সভ্যতার কৃতিত্ব—লিপি আবিষ্কার

আর নিনেভ (Nineveh) শহরে ছিল এদের আস্তানা। মধ্যে মধ্যে ব্যাবিলনীয়দের কাছে পরাজিত হলেও এদের দমিয়ে রাখা যায় নি। ক্রমে ব্যাবিলনীয় রাজাদের সঙ্গে আসিরিয়ান রাজাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। আসিরিয়ান রাজারা অন্য-দিকেও নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। পরাক্রান্ত অ্যাসিরিয় রাজাদের মধ্যে বিখ্যাত প্রথম ও চতুর্থ টিগ্‌লাথ-পিলেসার, শালমানেসার, সেনাকেরিব, এসারহাড্ডন আর অসুরবানিপাল। এসারহাড্ডন মিশর জয় করেন। অসুরবানিপালের মস্ত লাইব্রেরী ছিল—সবই ইটের ওপর লেখা বই।

কিন্তু আসিরিয়ান সাম্রাজ্য বেশীদিন রইল না। ৬০৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রাজা নবপোলাসার-এর নেতৃত্বাধীনে কলদীয় (Chaldaean) জাতি নিনেভ শহর দখল করে ফেলল। এইভাবে স্থাপিত হল কলদিয়ান সাম্রাজ্য—তার রাজধানী করা হল ব্যাবিলন নগরীতে। ইতিহাসে এই সাম্রাজ্যকে দ্বিতীয় ব্যাবিলন সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই বংশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন নেবুচাডনেজার। ইনি তাঁর রানীকে খুশি করবার জন্যে একটি প্রাসাদের ধাপে ধাপে একটি উদ্যান তৈরি করেন। তা ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান নামে বিখ্যাত।

যীশু খ্রীস্টের জন্মের ৫৩৯ বছর আগে এই কলদীয় বংশের পতন ঘটে। পারসিয়ান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কাইরাস (Cyrus) কলদিয়ান রাজাকে হারিয়ে তাঁর রাজ্য দখল করে নেন।

॥ মিশর বা ইজিপ্ট ॥

ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস নদীর ধারে যেমন গড়ে উঠেছিল সুমেরীয় সভ্যতা, তেমন নীলনদের অববাহিকাতে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। নীল-নদের ধারে বহু জাতি জীবিকার প্রয়োজনে বসবাস শুরু করে। মিশরীয় সভ্যতা তাদেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার দু'শ বছর আগে মিশরের রাজা নারমার প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মিশরের রাজাদের বলা হত ফ্যারাও (Pharaoh). এই রাজাদের মধ্যে নারমার, খুফু, মেনকাউরে, তৃতীয় আমেন-এম-হেট, তৃতীয় আমেন-হোটেপ, সেটি, রামেসিস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই ফ্যারাওদের আমলে সভ্যতার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তাঁদের কবরের জন্য যে সব পিরামিড বা সমাধি-মন্দির তৈরী হয়েছিল, তা এখনও সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। প্রাচীন মিশরীয়রা মৃতদেহ সংরক্ষণের এক অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করেছিল। হাজার হাজার বছরেও ঐ মৃতদেহ পচে যেত না। এই রকম সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলা হয় 'মামী'।

ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

মনের কথা ব্যক্ত করবার জন্যে মিশরীয়রা নিজেদের লিপি হায়রোগ্লীফ আবিষ্কার করে। এ একরকম সাংকেতিক লিপি। লেখবার জন্যে বিশেষ রকমের কালিও তারা তৈরি করেছিল। ক্ষেতে জল দেবার জন্যে খাল কেটে তারা অতি প্রাচীনকালেই চাষের উন্নতির ব্যবস্থা করেছিল।

ক্রমে মিশরের রাজশক্তি দুর্বল হয়ে আসে, আর সেই সুযোগ নিয়ে পারস্য-সম্রাট্ কাম্বিসেস মিশর জয় করে নেন। এটা প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার ঘটনা। তারপরে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের অভিযান পর্যন্ত মিশরে পারসিক শাসন চলে। আলেকজাণ্ডার মিশর ও পারস্য জয় করে উত্তর মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া শহর স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি টলেমী শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। টলেমী বংশের শেষ শাসক ছিলেন রানী ক্লিওপেট্রা—ইনি রোমক সেনাপতি অ্যাণ্টনিকে বিয়ে করেছিলেন। রানী ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পর রোমের প্রথম সম্রাট্ অগস্টাস মিশর জয় করেন।

মামী

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মিশরের আধিপত্য নিয়ে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। সপ্তম শতাব্দীতে আরবে ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটল। নতুন

ক্লিওপেট্রা ও অ্যাণ্টনি

ধর্ম প্রচারের প্রেরণায় মুসলমানরা মিশর আক্রমণ করে দখল করে নিল। এইভাবে শুরু হল মিশরে মুসলমান ধর্মের বিস্তার আর বাগদাদের খলিফাদের শাসন। কিন্তু নবম শতাব্দীর মধ্যেই বাগদাদের খলিফারা শক্তিহীন হয়ে পড়লে মিশরের শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবে মিশর শাসন করতে লাগলেন।

১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সেলজুক তুর্কী সুলতান সালাদিন মিশরের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। ইনিই প্রথম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে অংশ নেন। সালাদিনের মৃত্যুর কিছু পরে (১২৫০ খ্রীঃ) শ্বেতকায় তুর্কী ক্রীতদাসরা মিশরের ক্ষমতা দখল করে নিয়ে তাদেরই একজনকে সুলতান পদে নিয়োগ করে। এই শাসনকে বলা হয় মামলুক্‌দের শাসন। এই
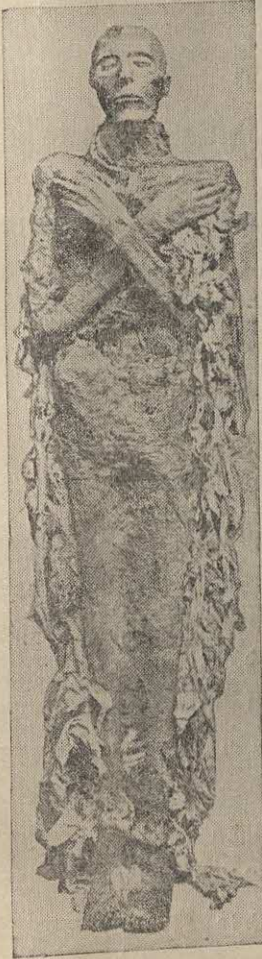
ক্রীতদাস বংশ পাঁচশ বছর ধরে মিশর শাসন করে। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে মিশর তুর্কী বা অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে যায়। তা সত্ত্বেও মামলুকদের প্রভূত ক্ষমতা থাকে।

ইংরেজের ক্ষমতা খর্ব করার জন্যে নেপোলিয়ন মিশর জয় করেছিলেন, কিন্তু বেশীদিন রাখতে পারেন নি। তুর্কী সুলতান ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলীকে শাসনকর্তা বা 'খেদিভ' নিযুক্ত করলেন। মহম্মদ আলী সুদান জয় করলেন। তাঁর সময়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয় এবং মিশরের উপর বিদেশী আধিপত্য অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। পরবর্তী খেদিভ ইসমাইল পাশার সময় (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) বিখ্যাত সুয়েজ খাল কাটা হয়। এই খাল কাটার খরচ তোলবার জন্যে ইসমাইল পাশা ইংরেজদের অংশীদার করে নেন। এইভাবে মিশরে ইংরেজদের আধিপত্য শুরু হয়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ইংল্যাণ্ডের শত্রু জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বসে। এর ফলে ইংরেজরা মিশরের ভার নিজ হাতে তুলে নেয়। এমন কি, যুদ্ধের শেষেও তারা মিশর ছেড়ে যেতে রাজী হয় না। ওয়াফদ দলের নেতা জগলুল পাশার (সাআদ জগলুল, ১৮৫২-১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ) নেতৃত্বে মিশরে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হল। চাপে পড়ে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড মিশরকে স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হল। কিন্তু বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করার অজুহাতে ব্রিটিশ সৈন্য মিশরে রয়ে গেল।

নাগিব

নাসের

এই ঘোষণায় স্বাধীনতাকামীরা খুশী হল না। আন্দোলন চলতে থাকল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নতুন এক সন্ধিতে ইংরেজরা মিশর থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে রাজী হল। কিন্তু সুয়েজ খাল অঞ্চল থেকে সৈন্য সরানো হল না। আর স্থির হল, বৈদেশিক ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড পরামর্শ দিতে পারবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজদের অন্যতম ঘাঁটি ছিল মিশরের রাজধানী কায়রো।

যুদ্ধের শেষে মিশরীয়রা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করল। আর ইংরেজকে জানিয়ে দিল, সুয়েজ খাল আর সুদান অঞ্চল থেকে তাদের সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু মিশরের রাজা ফারুক গোপনে ব্রিটিশদেরই সাহায্য করলেন। ফলে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সৈন্যবাহিনীর জেনারেল নাগিব অতর্কিত বিপ্লবে ক্ষমতা দখল করলেন। ফারুককে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে হল।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মিশর প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষিত হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গামাল আবদুল নাসের (১৯১৮-১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ) ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে

অধিষ্ঠিত হন। ইংরেজরা ক্রমে ক্রমে সুদান থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যায়।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নাসের সুয়েজ খাল দখল করে নিলেন। খালের আয় থেকে মিশরের আসোয়ান বাঁধ তৈরি করার জন্মেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হল। ইংরেজ ও ফরাসীর স্বার্থের এতে ক্ষতি হল, তাই তারা চুপ করে বসে রইল না। মিশরের শত্রু দেশ ইজরেলকে তারা মিশর আক্রমণে সাহায্য করল। বিশ্বের অনেক জাতি এতে প্রতিবাদ জানাল।

অবশেষে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে ইংরেজ ও ফরাসীরা তাদের সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যায়। সুয়েজ খাল মিশরের অধীনে থাকে।

আজকাল মিশর আর সীরিয়া একত্রিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে, তার নাম হয়েছে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক (U. A. R).

॥ চীনের সভ্যতা ॥

চীনদেশের ইতিহাস অতি প্রাচীন। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকেই চীনে বহু রাজবংশ শাসন করেছে। এর মধ্যে শিয়া (Hsia) বংশ চার'শ, চিন (Tsin) বংশ ছ'শ ও চৌবংশ ন'শ বছর রাজত্ব করে। চৌবংশের পর আবার চিন বংশের রাজার হাতে ক্ষমতা চলে যায়। শি-হুয়াংতি (রাজত্ব-কাল খ্রীস্টপূর্ব ২৪৬-২১০) ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্। তাঁর সময়ে (২১৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) বাইরের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে চীনের প্রাচীর তৈরির কাজ আরম্ভ হয়। এইসব রাজাদের অধীনে শিল্প, সাহিত্য, জ্যোতিষচর্চা ও দর্শনচর্চার বিশেষ উন্নতি ঘটে। চৌবংশের রাজত্বকালেই দার্শনিক কনফুসিয়াস এবং লাওৎসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

চিন বংশের পর হান বংশের রাজত্ব শুরু হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা উ-তি। তাঁরই উদ্যোগে চীন ও রোমের মধ্যে বাণিজ্য আরম্ভ হয়। চীনে এই সময়েই বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে।

হান বংশের পর আসে তাং যুগ। এই যুগকে চীনের স্বর্ণযুগ বলা যায়। ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই তাং রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের সময়ে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ও চিত্রকলার উন্নতি হয়। এই যুগে ভারত থেকে বহু ধর্মপ্রচারক চীনে যান, আবার চীন থেকেও ইউআন-চোআং বা হিউ-এন-সাঙ ভারতে এসেছিলেন।

তাং রাজারা দুর্বল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুং রাজবংশ ক্ষমতা কেড়ে নেয়। কিন্তু কিছুদিন পর তাতাররা চীনের রাজধানী পিকিং দখল করে। ইতিমধ্যে চীনের উত্তরদিকে বসবাসকারী মঙ্গোলজাতি বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে চেংগিস খাঁর নেতৃত্বে তারা চীন আক্রমণ করে। চীনের রাজা পালিয়ে যান। চেংগিস খাঁ চীন দখল করেন। মঙ্গোল রাজাদের শ্রেষ্ঠ রাজা কুবলাই খাঁ (১২১৪-১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) সম্পূর্ণভাবে চীন জয় করেন। তাঁর সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার লাভ করে। ভেনিসের পর্যটক মার্কো পোলো তাঁর দরবারে এসেছিল।

মিং (Ming) বংশ চীনে রাজত্ব করে ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর পরেই আসে বিদেশী মাঞ্চু রাজবংশ। তারা রাজত্ব করে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে ইওরোপীয়ানরা বাণিজ্য করবার জন্যে চীনে আসতে আরম্ভ করে। চীনের রাজা এই বিদেশীদের আসা নিয়ে অনেক নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। কিন্তু অন্য জাতিকে সরানো গেলেও ইংরেজদের সরানো সম্ভব হল না। তারা চীনে আফিম চালান দিতে লাগল। চীনবাসীরা আফিমের নেশায় ক্রমশঃ বুঁদ হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়ল। মাঞ্চু রাজারা তখন আইন করে আফিম বিক্রয় বন্ধ করে দিলেন।

ইংরেজরা ব্যবসায়ে ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী না হয়ে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল। এর নাম 'আফিং যুদ্ধ' (Opium war). দু'বছরের পর মাঞ্চু-রাজা হার মেনে হংকং দ্বীপটি ইংল্যাণ্ডকে দিতে বাধ্য হলেন এবং আরও পাঁচটি বন্দরে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিতে স্বীকৃত হলেন। চীন ক্রমশঃই হীনবল হতে লাগল।

জাপান তখন উদীয়মান শক্তি। ইওরোপীয় জাতিদের মতো জাপানও চীনে হস্তক্ষেপ করতে শুরু

কুবলাই খাঁর দরবারে মার্কো পোলো

করে। কোরিয়া আর মাঞ্চুরিয়ার কর্তৃত্ব নিয়ে ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বাধে। জাপান চীনকে হারিয়ে তাইওয়ান বা ফরমোজা দ্বীপ দখল করে নেয়। চীনের এই পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে পশ্চিমী দেশগুলো চীন দেশটাকে ভাগ করে নিতে শুরু করে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনারা বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ বক্সার বিদ্রোহ (Boxer Rebellion) নামে পরিচিত। পশ্চিমী দেশগুলি সমবেতভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। এই বিদ্রোহ সফল না হওয়ায় চীনাদের রাজবংশের উপর আর আস্থা রইল না। দেশে এক বিপ্লবী দল গড়ে উঠল—তার নাম 'কুয়োমিণ্টাং' দল। ডঃ সান-ইয়াৎ-সেনের (১৮৬৭-১৯২৫ খ্রীঃ) নেতৃত্বে তারা মাঞ্চুরাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে চীনে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করল। ডঃ সান-ইয়াৎ সেন হলেন রাষ্ট্রপতি।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং কাই-শেক কুয়োমিণ্টাং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ধনীলোকদের স্বার্থ বেশী করে দেখতেন। ফলে, সাধারণ লোকের দুঃখকষ্ট বাড়তেই লাগল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গোপনে সৃষ্টি হল কম্যুনিস্ট পার্টি। কুয়োমিণ্টাং দলের

বক্সার বিদ্রোহ

গজনীর মামুদ ভারতের একটি দুর্গ ভাঙবার চেষ্টা করছেন।

ইতিহাসের কথাঃ

[গজনীর মামুদ ভারতের একটি দুর্গ ভাঙবার চেষ্টা করছেন]

সুলতান মামুদ (৯৭১—১০৩০ খ্রীঃ) গজনীর রাজা ও বিখ্যাত সেনাপতি। তাঁর পিতার নাম সবুক্তগীন। মুসলমান ইতিহাসে মামুদই প্রথম 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি সতের বার ভারত আক্রমণ করেন। ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুজরাটের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সোমনাথদেবের মন্দির ধ্বংস করে বহু মূল্যবান্ দ্রব্য লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। প্রসিদ্ধ কবি ফেরদৌসী ও আনসারী, বিখ্যাত পণ্ডিত আলবেরুনি তাঁর সভারত্ন ছিলেন।

সুলতান মামুদ ভারতে এসে কি পরিমাণ ভারতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করেছেন, তাঁর আক্রমণে কত ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না।

হিন্দু রাজারা তাঁকে বার বার বাধা দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সুলতান মামুদকেও বহু ক্ষতির ধাক্কা সামলাতে হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে বার বার ভারত আক্রমণ করেছেন।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মামুদ তাঁর সৈন্যদল নিয়ে ভারতের হিন্দু রাজার একটি সুরক্ষিত দুর্গ ভাঙবার চেষ্টা করছেন।

মামুদ অবশ্য সব জায়গায় কৃতকার্য হন নি। বহু দুর্গ তাঁর কাছে অজেয় রয়ে গিয়েছিল।

সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধ তীব্র হয়ে উঠল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শক্তিশালী জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে চীন আক্রমণ করে। কম্যুনিস্ট আর কুয়োমিণ্টাং দল একসঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই জাপানের বিরুদ্ধে চীন মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দেয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর চীনে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। কম্যুনিস্ট নেতা মাও-সে-তুং-এর পরিচালনায় কম্যুনিস্ট বাহিনী চিয়াং-এর সৈন্যবাহিনীকে ক্রমাগত হারাতে শুরু করে। অবশেষে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর কম্যুনিস্ট সরকারের অধীনে চীনে লোক-সাধারণ-তন্ত্র স্থাপিত হয়। চিয়াং-কাইশেক ফরমোজাতে (এখনকার নাম তাইওয়ান) আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তির জন্যে অনেক বছর কম্যুনিস্ট চীন রাষ্ট্রসংঘের সভ্য হতে পারে নি। বর্তমানে চীন রাষ্ট্রসংঘের সভ্য।

পঞ্চাশ দশকে চীন কম্যুনিস্ট রাশিয়ার সঙ্গে সব

সান-ইয়াৎ-সেন

মাও-সে-তুং

বিষয়ে সহযোগিতা করে চলছিল, কিন্তু তার পরেই ক্ষমতার লড়াই আর আদর্শগত বিরোধ শুরু হয়। কম্যুনিস্ট চীন ক্রমশঃ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব গ্রহণ করে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে চীন তিব্বত অধিকার করে নেয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে চীন ভারত ভূখণ্ডের নেফা অঞ্চলের (বর্তমানে অরুণাচলের) এক বিরাট অংশ দখল করে।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক ভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পৃথিবীর পাঁচটি বৃহৎ শক্তির অন্যতম বলে পরিগণিত হয়েছে।

॥ প্রাচীন গ্রীস ॥

সুমের, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, চীন, ভারত ও মিশরে যখন সভ্যতার বিকাশ হয়, তখন গ্রীসের পাশে ইজিয়ান সমুদ্র অঞ্চলে ক্রীট দ্বীপটিকে কেন্দ্র করে এক উচ্চ শ্রেণীর সভ্যতা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে। এই সভ্যতাকে মিনোয়ান সভ্যতা বলে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন কুসস (Cnossus) শহরে 'মিনসের

রাজপ্রাসাদ' নামে এক অপূর্ব সুন্দর রাজপ্রাসাদ, সুন্দর দেওয়াল চিত্র, রাস্তা, ঘরবাড়ি প্রভৃতি অনেক কিছু আবিষ্কার করা হয়েছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে ক্রমে এই সভ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রায় যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগেকার কথা।

ইজিয়ান সাগর অঞ্চলের এই সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে দক্ষিণ গ্রীসে প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দ নাগাদ মাইসিনিয়ান (Mycenaean) সভ্যতা গড়ে ওঠে। মিনোয়ান সভ্যতার প্রভাব এই সভ্যতার উপর প্রচুর পরিমাণে ছিল। এই সভ্যতা মূলতঃ তাম্রযুগের সভ্যতা। মাটি খুঁড়ে এই সময়কার বহু ঘরবাড়ি, অস্ত্রশস্ত্র, সোনারুপো ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। হোমারের 'ইলিয়াড' বইয়ে বর্ণিত যুদ্ধে গ্রীসের সম্মিলিত সেনাদলের নেতা হয়েছিলেন মাইসেনীর রাজা অ্যাগামেমনন।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দ্বাদশ শতকে উত্তর গ্রীস থেকে আগত দোরিয়ানদের আক্রমণে প্রাচীন গ্রীসের সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যায়—শুধু মাত্র মধ্য গ্রীসে অ্যাটিকাতেই এই সংস্কৃতির ধারা কোন ক্রমে রক্ষা পায়। গ্রীস থেকে আয়োনিয়ান জাতির লোকরা এশিয়ার উপকূলে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই অঞ্চলের নাম হল আইয়োনিয়া। গ্রীকদের সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য স্পেন, ইটালী, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে সমস্ত ভূমধ্যসাগর অঞ্চল গ্রীকসভ্যতার আওতায় চলে আসে।

ট্রয়ের যুদ্ধ

রাজা দরায়ুস

মধ্য গ্রীসে অ্যাটিকাতে এথেন্স নগরী। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যে এথেন্স প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করে। ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সোলন নামে এক বিজ্ঞ শাসক বহু সংস্কার প্রবর্তন করে এথেন্সের সমৃদ্ধির সূচনা করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে গ্রীসে এক নতুন বিপদাশঙ্কা দেখা দেয়। শক্তিশালী পারস্য সাম্রাজ্য ইতিপূর্বেই এশিয়ার তীরে আইয়োনিয়ার রাজ্যগুলি দখল করে নিয়েছিল; এখন পারস্য-সম্রাট্ দরায়ুস (Darius) মূল গ্রীস আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। মারাথনের যুদ্ধে (৪৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এথেন্সের বীর গ্রীকবাহিনী এক পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করে পারসিক আক্রমণ প্রতিহত করে। কিন্তু দরায়ুসের পুত্র জেরক্সেস

(Xerxes) বিশাল আয়োজন করে গ্রীস আক্রমণ করেন। এখন গ্রীসের দেশগুলি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ভুলে গিয়ে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্র ধরে। থার্মোপীলির (Thermopylae) গিরিপথের যুদ্ধে (৪৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) স্পার্টান সৈন্যরা অসীম বীরত্ব দেখিয়েও পরাজিত হয়। কিন্তু সালামিসের নৌযুদ্ধে থিমিস্টোক্লিজের নেতৃত্বে পারসিক নৌ-বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। শেষে প্লাতিয়ার (Plataea) যুদ্ধেও পারসিক সৈন্যদের চরম পরাজয় ঘটে। মূল গ্রীস ছেড়ে পারস্যবাহিনী নিজ দেশে ফিরে যায়।

থার্মোপীলির যুদ্ধ

পারসিক আক্রমণকারীদের হারিয়ে দেবার ফলে গ্রীসে এথেন্সের মর্যাদা চরমে ওঠে। এথেন্স পেরিক্লিসের (৪৯৯-৪২৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) অধীনে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে। তাঁর শাসনকালে শিল্পে ও অন্যান্য বিষয়ে এথেন্সের চরম উন্নতি হয়েছিল। এথেন্সের এই শক্তিবৃদ্ধি স্পার্টার ও অন্য বহু গ্রীক-রাষ্ট্রের শত্রুতা ডেকে আনে। ফলে শুরু হয় এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার যুদ্ধ। ৪০৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে এথেন্সের পরাজয় ঘটে।

৩৭১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে স্পার্টাকে হারিয়ে দিয়ে গ্রীসের অন্য একটি রাষ্ট্র থিবস্ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এযুদ্ধে থিবসের নেতা ছিলেন এপামিনোণ্ডাস। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তাঁর পতন হয়। এবার শুরু হয় ম্যাসিডন রাজ্যের উত্থানের যুগ।

গ্রীসের উত্তর-পশ্চিম দিকে ম্যাসিডন রাজ্য রাজা ফিলিপের অধীনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাঁর ছেলে আলেকজাণ্ডার প্রায় সমস্ত গ্রীস জয় করে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে পারসিক সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। ক্রমশঃ সমস্ত পারসিক সাম্রাজ্য আলেকজাণ্ডারের অধীন হল। রাজধানী পার্সিপলিস নগরী গ্রীক সৈন্যরা পুড়িয়ে দিল। এর পর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। উত্তর ভারত জয় করার মুখে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা দেশে ফিরে যেতে চাইল। ফেরবার পথে ব্যাবিলনে এসে আলেকজাণ্ডার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন (৩২১ খ্রীস্টপূর্ব)।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর শুরু হল গ্রীসের পতন। অবশেষে রোমানরা গ্রীসদেশ তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

গ্রীকদের সভ্যতা ছিল উন্নত। রোমানদের অধীনে যাবার আগে গ্রীসে বহু নামকরা মনীষী ও দার্শনিকের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রীস্টপূর্ব), প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রীস্টপূর্ব) ও অ্যারিস্টটল-এর (৩৮৪-৩২২ খ্রীস্টপূর্ব) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে অটোমান তুর্কীরা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য জয় করে নেয়। ফলে গ্রীসও তাদের অধীনে চলে যায়। গ্রীকরা তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিদ্রোহ করে শেষে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে। এইভাবে গ্রীসে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
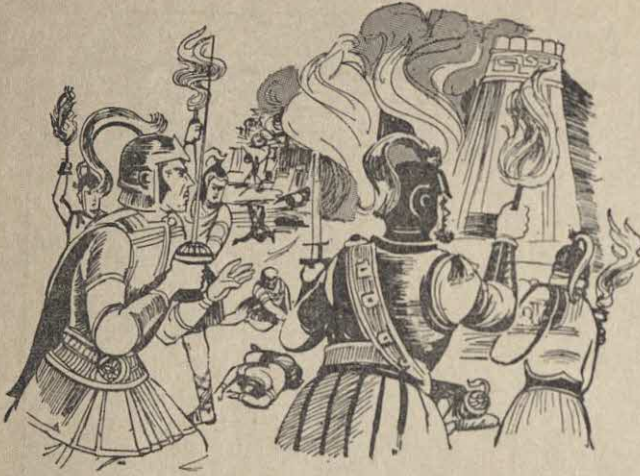
পার্সিপলিস নগরী গ্রীকসৈন্যরা পুড়িয়ে দিল

প্রায় একশো বছর ধরে রাজাদের শাসন চলবার পর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে একবার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সৈন্যরা গ্রীস দখল করে। হিটলারের পতনের পর গ্রীস আবার স্বাধীনতা ফিরে পেল।

॥ রোমান সাম্রাজ্য ॥

প্রবাদ আছে, রোমুলাস ও রেমাস নামে দুই ভাই ৭৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রোম নগরী স্থাপন করেছিলেন। রোমুলাস প্রথম রাজা হন। এই বংশের শেষ রাজা টারকুইন অত্যাচারী ছিলেন। ৫১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁকে সরিয়ে সাধারণতন্ত্র স্থাপন করা হয়। সাধারণতন্ত্রের দু'শ বছর শুধু প্যাট্রিসিয়ান, অর্থাৎ অভিজাত, আর প্লিবিয়ানদের, অর্থাৎ সাধারণ মানুষদের বিবাদের ইতিহাস। অবশেষে দ্বাদশ দফা আইনের সাহায্যে প্লিবিয়ানরা সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়ে ওঠে। নিজেদের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা ও শাসন-ক্ষমতার অধিকার নিয়ে বিবাদ থাকলেও রোমানরা কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ করে সমগ্র ইতালির প্রভু হয়ে ওঠে।

কার্থেজ নগরী ছিল তখন উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত নগরী। এশিয়াবাসী ফিনিসিয়দের (Phoenicians) শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ ছিল এই কার্থেজ। রোমের রাজ্য-বিস্তারের পথে কার্থেজ ছিল বড় বাধা। ফলে, লড়াই আরম্ভ হল। ইতিহাসে একে বলে পিউনিক যুদ্ধ। কার্থেজের সেনাপতি হ্যানিবল (২৪৭-১৮৩ খ্রীঃ পূঃ) আর রোমের সেনাপতি সিপিও অ্যাফ্রিকেনাস মাইনরের (১৮৫-১২৯ খ্রীঃ পূঃ) নাম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। শেষে কার্থেজ হেরে গেল, কার্থেজকে ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল (১৪৬ খ্রীঃ পূঃ)। রোমের অগ্রগতির পথে কোন বাধাই রইল না। ম্যাসিডোনিয়া, গ্রীস, স্পেন, মিশর, প্যালেস্টাইন রোমের পদানত হল।

এই যুগে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন রোমান সিনেট। জ্ঞানবৃদ্ধ, সু-অভিজ্ঞ রোমানদের নিয়ে এই সিনেট গঠিত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে ধন সম্পত্তি আসতে আরম্ভ করল। ফলে, প্রজাতন্ত্র ক্রমে অভিজাত-তন্ত্রে রূপান্তরিত হল। রোমে দেখা দিল অন্তর্বিরোধ, দলাদলি, রাজনৈতিক হত্যা। এই সুযোগে সামরিক নেতা সুল্লা সব ক্ষমতা দখল করলেন (৮২ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)।
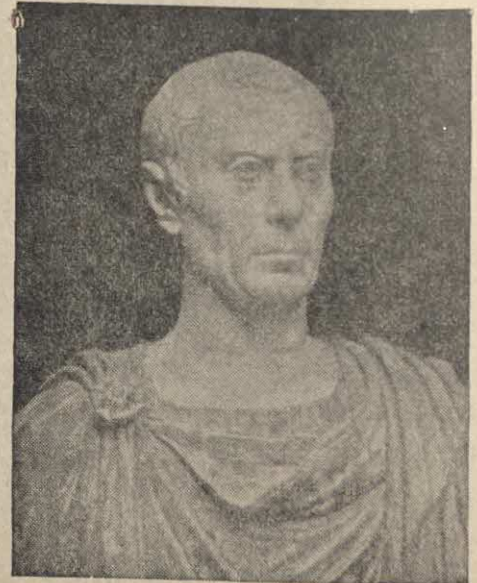
জুলিয়াস সীজার

তার পরে রোমের রাজনীতিতে পম্পী (Pompey) আর জুলিয়াস সীজারের প্রাধান্য শুরু হয়। যুদ্ধবিদ্যায় জুলিয়াস সীজারের মতো পারদর্শী তখন রোমে পম্পী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। সীজার ফ্রান্স আর জার্মানীর কিছুটা অংশ দখল করেছিলেন। তিনি দুবার ব্রিটেনে অভিযান করে ব্রিটেনকে রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

সেপ্টিমাস নামে তাঁরই এক সৈনিকের হাতে পম্পীর মৃত্যু ঘটলে সীজার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তিনি বুঝলেন যে, সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হলে সাধারণতন্ত্রের অবসান প্রয়োজন। এইজন্যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হল। ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াসের উদ্যোগে সীজার নিহত হলেন (৪৪ খ্রীষ্টপূর্ব)। এর ফলে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল আর তারই পরিণামে রাজবংশ স্থাপিত হল।

সীজারের ভাগিনেয়ীর ছেলে অক্টেভিয়াস (৬৩-১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন প্রথম রোম-সম্রাট্। তিনি অগস্টাস সীজার উপাধি গ্রহণ করেন। সীজারের সেনাপতি অ্যাণ্টনী ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সীজারের সময়ে রোমান শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। অগস্টাস

রোম পুড়ছে, সম্রাট্ নীরো তাই দেখছেন

সম্রাট্ অরেলিয়াস

সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ঐতিহাসিক লিভি, কবি ভার্জিল, হোরেস, ওভিড প্রমুখ তাঁর সময়ে সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম তাঁরই রাজত্বকালে। এর পরে উল্লেখযোগ্য সম্রাট্ নীরো। তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর আর দুশ্চরিত্র সম্রাট্ (৩৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর সময় এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডে রোমের প্রায় অর্ধেক পুড়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, বেহালায় দুঃখের সুর ফুটিয়ে তোলার জন্যে সম্রাট্ নীরোর নির্দেশেই আগুন লাগানো হয়েছিল। সম্রাট্ হাড্রিয়ান (৭৬-১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) রোমের সমৃদ্ধি আবার ফিরিয়ে আনেন।

জ্ঞানী সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াসের সময় (১২১-১৮০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে লোকে মনে করল এসব দৈব-অভিশাপের ফল। দেবতাকে তুষ্ট করতে তারা খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করল। এভাবে খ্রীষ্টান আর রোমানদের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ শুরু হল। সম্রাট্ ডাইঅক্লিশানের সময় (২৪৫-৩১৩ খ্রীষ্টাব্দ) এই বিবাদ চরমে ওঠে। তিনি আদেশ করেন যে সব প্রজাকে তাঁর পুজো করতে হবে। খ্রীষ্টানরা স্বভাবতঃই রাজী হল না। ফলে হাজার হাজার খ্রীষ্টানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল।

রোমসম্রাট্ কনস্টানটাইন (৩০৬-৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। তখন খ্রীষ্টানরা একটু শান্তিতে থাকতে পেল। কৃষ্ণসাগরের তীরে তিনি বাইজান্টিয়াম শহর স্থাপন করেন আর তাঁর নামানুসারে এই শহরের নাম হয় কনস্টান্টিনোপল।

সিংহাসনে সম্রাট্ কনস্টানটাইন

এই সময়ে রোমান সাম্রাজ্য এত বিশাল আকার ধারণ করেছিল যে একজনের পক্ষে এক রাজধানী থেকে এত বড় রাজ্য শাসন করা সম্ভব ছিল না। ফলে এই সাম্রাজ্য দু-ভাগে ভাগ করা হল। রোম হল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী, আর কনস্টান্টি-নোপল হল পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী।

রোম সাম্রাজ্য বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। কনস্টানটাইনের পর তেমন কোনও শক্তিশালী রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন নি। এক যা সম্রাট্ জাস্টিনিয়ান কয়েক বছরের জন্যে পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, গথ, ভিসিগথ, লম্বার্ড প্রভৃতি উপজাতির বর্বর লোকেরা অনবরত রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে থাকে। শেষে ভিসিগথদের রাজা অ্যালারিক ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রোম শহর ধ্বংস করেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের এই ভাবে পতন হল।

॥ ইতালী ॥

ভিসিগথদের শেষ আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল। ফ্রাঙ্করা ফ্রান্স জয় করল, ভ্যাণ্ডালরা স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা জয় করে নিল এবং অ্যাঙ্গ্‌ল্ ও স্যাক্সনরা হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ব্রিটেন অধিকার করে নিল। এভাবে ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংল্যাণ্ড এই কয়টি দেশ রোমান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে গেল। রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে ইতালী অবশিষ্ট রইল বটে, কিন্তু তারও একতা নষ্ট হয়ে গেল। প্রভাব-শালী সামন্ত জমিদারেরা ছোট ছোট রাজ্য গড়ে সেখানেই রাজত্ব করতে লাগলেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। বহুকাল ধরে ইতালী এরকম ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটাল। মধ্যে ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন এসে ইতালী জয় করে সমগ্র ইতালীকে সংঘবদ্ধ করে তোলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার ফল স্থায়ী হয় নি।

শেষে ইতালী এক হল তিন জনের চেষ্টায়ঃ মাৎসিনি (১৮০৫-১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ), গ্যারিবল্ডি (১৮০৭-১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং কাভুর (১৮১০-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ)।

মাৎসিনির লেখা ও বক্তৃতায় ইতালীর লোকদের মনে একতাবোধ উদ্দীপ্ত হল। রাজনীতিবিদ্ কাভুরের চেষ্টায়, আর সেনাপতি গ্যারিবল্ডির রণদক্ষতায় সব বাধা দূর হয়ে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে রাজা মেনে নিয়ে সমস্ত ইতালী আবার এক হল।

মাৎসিনি

প্রথম মহা-যুদ্ধের পর

গ্যারিবল্ডি

ইতালীতে বেনিতো মুসোলিনির (১৮৮৩-১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) আবির্ভাব হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের নিয়ে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি শক্তিশালী দল গড়ে তুললেন। এই দলের নাম ফ্যাসিস্ট দল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি ক্ষমতা অধিকার করে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হলেন। পরে তিনি ইতালীর সর্বময় প্রভু হয়ে বসলেন। তাঁর উপাধি হল 'ইল ডুচে' (Il Duce).

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে ইতালীর চুক্তি হওয়ার ফলে ব্রিটিশ হল ইতালীর প্রধান শত্রু। ইতালীর নগর ও বন্দরের উপর শুরু হল ব্রিটিশ বিমান আক্রমণ। আফ্রিকায় আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইংরেজ সেনার হাতে ভীষণভাবে পরাজিত হয়ে ইতালীয়রা ফিরে এল।

কাভুর

ইতালী আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইতালীর জনসাধারণ মুসোলিনির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাদের চাপে পড়ে মুসোলিনি কর্তৃত্ব ত্যাগ করলেন।

বেনিতো মুসোলিনি

ইংরেজ অষ্টম বাহিনী এসে ইতালীর মূল ভূখণ্ডে অবতরণ করল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর ইতালীয়ান গভর্নমেণ্ট আত্মসমর্পণ করল।

ইতিমধ্যে ইতালীতে 'ইতালীয় পার্টিজান' নামে এক জাতীয় বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল। সেই দল ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠল।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল মুসোলিনি সুইজারল্যাণ্ডে পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। জাতীয় বাহিনীর লোক তাঁকে ধরে গুলি করে মারল।

ইতালীর রাজা সিংহাসন ত্যাগ করলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন ইতালীতে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল। প্রধানমন্ত্রী গ্যাসপেরি শাসনতন্ত্রের প্রধান হলেন। এনরিকো ডি-নিকোলা নির্বাচিত হলেন প্রথম রাষ্ট্রপতি।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এক সাধারণ নির্বাচনে 'খ্রীষ্টান গণতান্ত্রিক দল' ইতালীর শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনের ফলে সিনর পেলা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি খ্রীষ্টান ডেমোক্রাট দলের অ্যাণ্টোনিও সেগনি প্রধানমন্ত্রী হন।

॥ ফ্রান্স ॥

রোমান শাসনে ফ্রান্স গল (Gaul) নামে পরিচিত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এই দেশ ফ্রাঙ্ক জাতির নেতৃত্বের অধীনে চলে যায়। এর রাজা ক্লোভিস (রাজত্বকাল ৪৮১-৫১১ খ্রীঃ) নিজ বাহুবলে রাজ্য বিস্তার করেন। ফ্রাঙ্ক জাতি থেকেই পরবর্তী কালে ফ্রান্স নামের উৎপত্তি হয়।

ক্লোভিসের পর চার্লস 'মার্টেলে'র নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সের টুরস রণক্ষেত্রে আরবদের পরাজিত করে পশ্চিম ইওরোপকে ইসলাম শক্তির প্রভাব থেকে রক্ষা করেন। তাই তাঁকে 'মার্টেল' অর্থাৎ 'হাতুড়ি' আখ্যা দেওয়া হয়।

ফ্রাঙ্ক রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়েছিলেন পেপিনের ছেলে শার্লমেন বা চার্লস দি গ্রেট (Charlemagne, ৭৪২-৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি প্রায় অর্ধেক ইওরোপ জয় করে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

শার্লমেনের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্যে ভাঙন ধরে। ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যালয় (Valois) বংশ ফ্রান্সে রাজ্য বিস্তার শুরু করে। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এই রাজবংশের সময়েই হয়েছিল। ফ্রান্সের চরম দুর্দশার দিনে জোয়ান অব আর্ক (১৪১২-১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ) নামে এক কৃষক বালিকা ফরাসী জাতির মধ্যে জাতীয়তা বোধ উজ্জীবিত করেন। কিন্তু জোয়ান ইংরেজদের হাতে বন্দী হন। তাঁকে তারা পুড়িয়ে মেরেছিল।

এর পরে বুরবন বা বোর্বোঁ (Bourbon) রাজবংশ সিংহাসন অধিকার করে। এই রাজবংশের ত্রয়োদশ লুই-এর সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ রিশল্যু (Cardinal Richelieu). পরের রাজা চতুর্দশ লুই (১৬৪৩-১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর সময়কার ইওরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ ছিলেন। ক্ষমতা ও জাঁকজমকের জন্য তিনি 'মহামহিম সম্রাট্' (Grand Monarque) এবং 'সূর্য রাজ' (le roi soleil) আখ্যা পেয়েছিলেন।

চতুর্দশ লুইয়ের বিলাসিতা আর অপব্যয়ের ফল ফলতে বেশী দেরি হল না। রাজা ষোড়শ লুই-এর সময়ে প্রজাদের দুর্দশা চরমে উঠল। এর ফলে শুরু হল ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯২)।

ফরাসী বিপ্লবের নেতারা ছিলেন মিরাবো, দাঁতোঁ, রোবসপীয়র ইত্যাদি। এঁদের নেতৃত্বে রাজবংশের উচ্ছেদ হল। রাজা চতুর্দশ লুই ও রানী আন্তোনিয়েতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ইওরোপের অন্য স্বৈরাচারী দেশগুলো ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের কর্তৃত্ব নেতাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল। দাঁতোঁ এবং রোবসপীয়রও গিলোটিন-যন্ত্রে প্রাণ হারালেন। অবশেষে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রীঃ) নামে একজন সেনাপতিকে ফরাসীরা ফ্রান্সের প্রথম কনসাল বলে মেনে

শার্লমেন
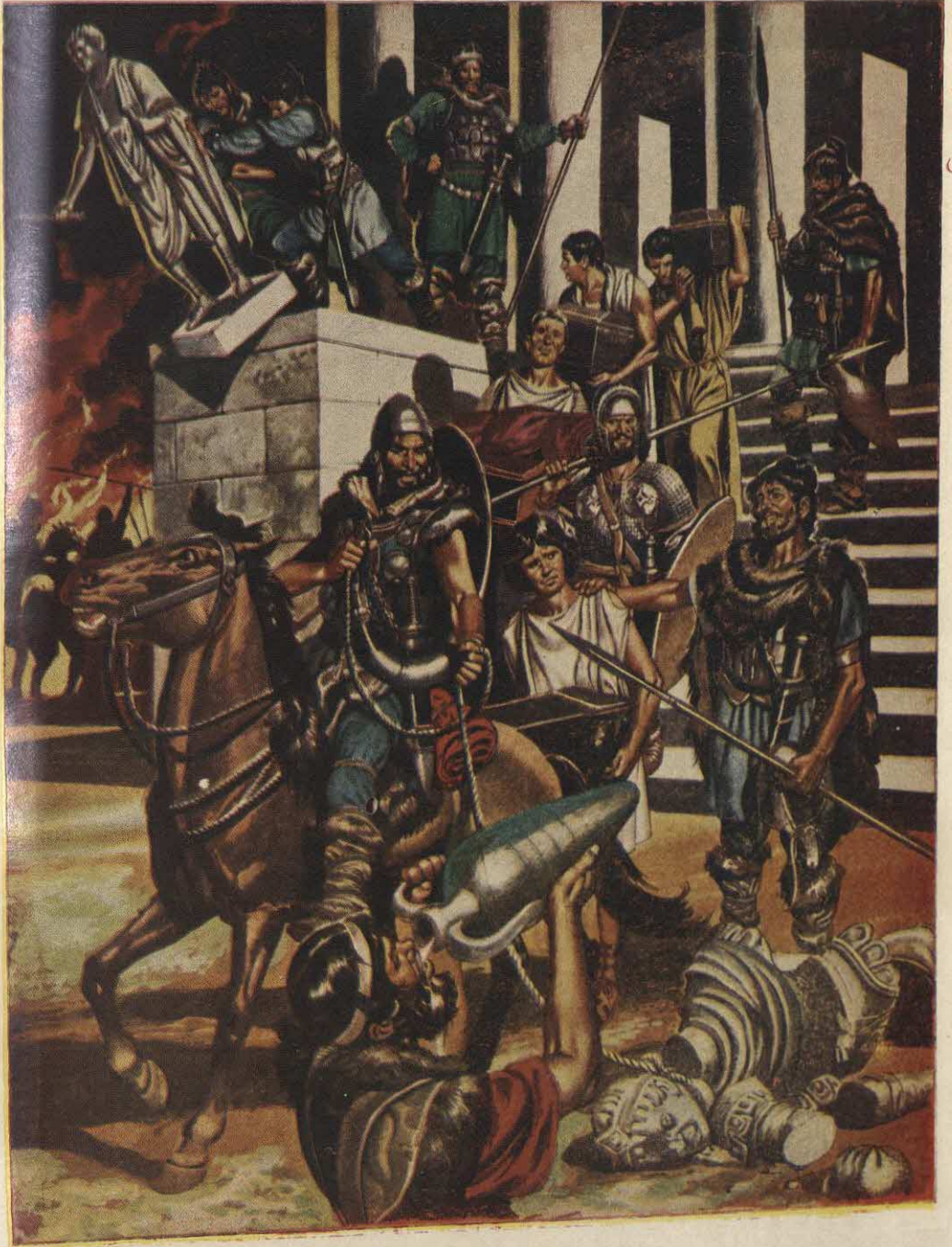
রোম সাম্রাজ্যের পতন।

ইতিহাসের কথাঃ

[রোম সাম্রাজ্যের পতন]

ইওরোপের দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীরে ইতালী রাজ্য। তার রাজধানী রোম।

আগেকার দিনে রোমকে কেন্দ্র করে একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। রোমকরা ইওরোপের নানা দেশের উপর আধিপত্য করত।

রোম সাম্রাজ্য বহু দূর স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রোমকদের নামে তখন সারা ইওরোপ ও এশিয়া কাঁপত। কেউ ভাবতে পারে নি, এত বড় যে রোম সাম্রাজ্য তার পতন হবে। কিন্তু তাও একদিন সম্ভব হয়েছিল। পৃথিবীতে যেমন কিছুই চির-স্থায়ী নয়, রোম সাম্রাজ্যও চিরস্থায়ী হয় নি। আজকাল রোমকে কেন্দ্র করে সেই সাম্রাজ্যও নেই, রোম যে-দেশের রাজধানী সেই ইটালী ইওরোপের একটি দেশ মাত্র।

ভিসিগথ (Visigoth) প্রাচীন যুগের এক দুর্ধর্ষ জাতি। তাদের রাজা অ্যালারিকের (৩৭০—৪১০ খ্রীঃ) সঙ্গে যুদ্ধে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রোমকরা ভীষণভাবে পরাজিত হয়। সেই থেকেই সে-যুগের রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

এখানে রোম সাম্রাজ্যের পতনের এক দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

ফ্রান্সের রানী মেরি আন্তোনিয়েতের প্রাণদণ্ড

নিল। ১৮০৪ গ্রীষ্টাব্দে এক গণভোটের পর নেপোলিয়ন নিজেকে ফরাসী সম্রাট্ বলে ঘোষণা করলেন।

বাইরের শত্রু দেশগুলির সঙ্গে নেপোলিয়নকে সারা জীবন যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাঁর বহু যুদ্ধের মধ্যে অস্টারলিৎসের যুদ্ধ (১৮০৫ গ্রীষ্টাব্দ), জেনার যুদ্ধ (১৮০৬ গ্রীষ্টাব্দ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজরা ও প্রুশিয়ানরা মিলে নেপোলিয়নকে ১৮১৫ গ্রীষ্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধে হারিয়ে দিল। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে তিনি নির্বাসিত হলেন। সেখানে ১৮২১ গ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য নষ্ট হয়ে গেলে ফ্রান্সের রাজা হলেন বুরবন বংশের অষ্টাদশ লুই। কিছুকাল পরে ফরাসীরা প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে। সম্রাট্ নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন হলেন তার রাষ্ট্রপতি। কিন্তু ১৮৫২ গ্রীষ্টাব্দে লুই নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট্ বলে ঘোষণা করে আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম হল তৃতীয় নেপোলিয়ন।

সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দিয়ে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলেন। দেশের মধ্যে অনেক আভ্যন্তরীণ সংস্কারের কাজও তিনি করেছিলেন। কিন্তু পরে ১৮৭০ গ্রীষ্টাব্দে প্রুশিয়ার সঙ্গে তিনি যুদ্ধে হেরে বন্দী হলেন। এবার প্যারিসে আবার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল।

এই তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসনবিধিতে স্থির হল সাত বছরের জন্যে একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন আর তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে এক মন্ত্রী-পরিষদ থাকবে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে এই তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসনে ফ্রান্স জার্মানীকে হারিয়ে দেয়। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের সৈন্যবাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করে, আর প্যারিস অধিকার করে। ভিচীতে মার্শাল পেঁত্যা হিটলারের অধীনে এক তাঁবেদার সরকার স্থাপন করেন। অপরদিকে শক্তিশালী ফরাসী-নেতা দ্য-গল ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিত ফরাসীদের সংঘবদ্ধ করে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। ১৯৪৫ গ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর পতন হয়। ফ্রান্স আবার স্বাধীনতা ফিরে পায়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

অবশেষে দ্য-গল ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হন ও পঞ্চম প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স, ভিয়েৎনাম, ভারত, আলজেরিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে নিজ প্রভাব সরিয়ে নিয়েছিল। ফ্রান্স এখন ধীরে ধীরে আবার ইওরোপের অন্যতম শক্তিশালী দেশ বলে পরিগণিত হচ্ছে।

দ্য-গল

॥ রাশিয়া ॥

ইওরোপীয় দেশ হলেও বহু শতাব্দী ধরে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতায় রাশিয়া পিছিয়ে ছিল। ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনবাসী রুরিক ফিনল্যাণ্ডউপসাগরের কাছে রাশিয়া রাজ্যের প্রথম সূচনা করেন। রুরিকের বংশধররা ক্রমে রাজ্য-বিস্তার করতে থাকে আর বিজিত স্লাভ-জাতির সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষায় এক হয়ে যায়। রুরিকের বংশধর ভ্লাদিমির ছিলেন এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং শ্রেষ্ঠ আইন-প্রণেতা। ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবার পর থেকে রাশিয়ায় খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার শুরু হয়। খ্রীষ্টধর্মের এ শাখাটি ইওরোপে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের থেকে আলাদা —এর নাম গ্রীক বা ঈস্টার্ন চার্চ। অবশেষে মস্কোর শক্তিশালী সামন্ত জমিদার আইভান দি গ্রেট ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর পৌত্র আইভান দি টেরিব্‌ল্ নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন। রাশিয়ার সম্রাট্‌দের বলা হয় জার (Czar বা Tsar).

১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে রোমানফ্ বংশের পিটার

আইভান দি টেরিব্‌ল্

দি গ্রেটের সিংহাসনে আরোহণের পর রাশিয়ার উন্নতি হয়। তিনিই রাশিয়াতে ইওরোপীয় সভ্যতা, আইন-কানুন, আচার-ব্যবহার প্রবর্তন করবার সক্রিয় চেষ্টা করেন। রাজদরবার 'সেন্ট-পিটার্সবার্গ'-এ স্থাপন করা হয়। ফরাসী ভাষা দরবারের ভাষা করা হয়। পিটার তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বলকান অঞ্চলে অগ্রসর নীতির সূচনা করেন। পরবর্তী সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দি গ্রেট পিটারের অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার চেষ্টা করেন। তিনি ইওরোপীয় আদব-কায়দা রাজদরবারে প্রচলিত করেন। অস্ট্রিয়া আর প্রুশিয়ার সহযোগে তিনি দুর্বল পোল্যাণ্ডের এক বিশাল অংশ রাশিয়ার মধ্যে নিয়ে আসেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি বলকান অঞ্চলে অনেক স্থান লাভ করেন। কিন্তু কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি বা দাস-প্রথা দূর করবার চেষ্টা তিনি করেন নি।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়ার অধিকার নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধে এবং এই যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়। ফলে দেশের লোকদের দুরবস্থা আরও বেড়ে যায়। রাশিয়াতে নিহিলিস্ট দল নামে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দল আগেই ছিল। এখন গড়ে ওঠে এক সমাজতান্ত্রিক দল। এদের দলের নেতা ছিলেন লেনিন (১৮৭০-১৯২৪ খ্রীঃ)। তাঁর সহচর ছিলেন ট্রটস্কি (১৮৭৯-১৯৪৩ খ্রীঃ), স্ট্যালিন (১৮৭৯-১৯৫৩ খ্রীঃ) ইত্যাদি। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এঁরা সেন্ট পিটার্সবার্গে এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা বিফল হয়। সমাজ-তান্ত্রিক দল বলশেভিক আর মেনশেভিক নামে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। লেনিন (আসল নাম ভ্লাদিমির ইলিইচ উলিয়ানভ) ছিলেন বলশেভিক দলের নেতা। বলশেভিকরা জনসাধারণকে জারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন রাশিয়া ইংরেজদের পক্ষে জার্মানীর বিরুদ্ধে যোগ দেয়। এই যুদ্ধের ফলে লোকের কষ্ট আরও বেড়ে গেল। দেখা দিল শ্রমিক ধর্মঘট। অবশেষে দেশব্যাপী জনজাগরণের পর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর বলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে দেশের সব ক্ষমতা হস্তগত করল। জার নিকোলাসকে সপরিবারে গুলি করে হত্যা করা হল। এক নতুন কম্যুনিস্ট শাসন স্থাপিত হল। সরকারের নাম হল সোভিয়েট সরকার। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু হয়। স্ট্যালিন হলেন দেশের সর্বময় কর্তা। ট্রটস্কি হলেন নির্বাসিত।

পিটার দি গ্রেট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে স্ট্যালিন হিটলারের সঙ্গে দশ বছরের জন্যে এক অনাক্রমণ চুক্তি করেন। কিন্তু সেই চুক্তি ভঙ্গ করে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন। প্রথম দিকে জার্মান বাহিনীর জয় হলেও স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধের পর রুশসৈন্য এগুতে আরম্ভ করে। অবশেষে রুশসৈন্য বার্লিন প্রবেশ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পূর্ব জার্মানীতে রাশিয়া কম্যুনিস্ট সরকার স্থাপন করে।

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মার্চ স্ট্যালিন মারা যান। ম্যালেনকভ তাঁর পদে আসেন, কিন্তু তিনি বেশীদিন সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন নি। উচ্চ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের পর ক্রুশ্চেভ প্রধানমন্ত্রী হন। ক্রুশ্চেভের সময় রাশিয়া সহ-অস্তিত্বের নীতি ঘোষণা করে। বর্তমানে রাশিয়ার নেতা হলেন ব্রেজনেভ।

লেনিন

স্ট্যালিন

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাশিয়া বিস্ময়কর উন্নতি করেছে। মহাকাশে রাশিয়াই প্রথম উপগ্রহ প্রেরণ করে। রাশিয়ান য়ুরী গ্যাগারিন প্রথম মহাকাশ-যাত্রী। পারমাণবিক বোমা নির্মাণ ও বিস্ফোরণের ব্যাপারেও রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

॥ স্পেন ॥

স্পেন দু'শ বছর রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। রোমানদের পতনের পর ভ্যাণ্ডাল, ভিসিগথ প্রভৃতি বর্বর জাতি স্পেন অধিকার করে। ৭১১ খ্রীস্টাব্দে আরব মুসলমানরা ভিসিগথদের হাত থেকে স্পেন দখল করে নেয়। স্পেনের আরবদের মুর বলা হত। এরা প্রায় সাতশ বছর স্পেন শাসন করে। কর্ডোভা ছিল এদের রাজধানী। এই সময় আরব এবং ইওরোপীয় সভ্যতার সংযোগে এক উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়। দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্যচর্চা, ইতিহাস, বিজ্ঞান—নানাদিকে সভ্যতার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্যাস্টিলের রাজা করডোভা জয় করে নেন। আরবরা স্পেনের দক্ষিণে গ্রানাডা রাজ্যের পত্তন করে। এখানে তারা দু'শ বছর রাজত্ব করেছিল।

গ্রানাডার আলহামব্রা প্রাসাদ আজও সে যুগের স্থাপত্য শিল্পের উন্নতির পরিচয় দিচ্ছে। অবশেষে পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে ফার্দিনান্দ আর তাঁর রানী ইসাবেলার রাজত্বকালে সমগ্র স্পেনে খ্রীষ্টান আধিপত্য স্থাপিত হয়।

অলহামব্রার প্রাসাদ

ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা সমগ্র স্পেন জয় করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তাঁদের সময়েই কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন ও ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সম্রাট্ পঞ্চম চার্লসের (১৫০০-১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) সময় স্পেনের সাহসী যোদ্ধারা গিয়ে প্রায় সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সব দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা আর রুপো নিয়ে আসার ফলে স্পেন ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় ফিলিপ পর্তুগাল জয় করেন। তিনিই ইংল্যাণ্ড জয়ের জন্যে আর্মাডা বা নৌবাহিনী পাঠিয়েছিলেন—ইংরেজ নৌ-বহরের কাছে এই আর্মাডার পরাজয় ঘটেছিল (১৫৮৮ খ্রীঃ)।

ফিলিপের ধর্মান্ধতার জন্যে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তাঁর মৃত্যুর পর কোনো যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীতে স্পেন অবশ্য প্রজাতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার জন্যে তারা আবার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। ওদিকে, দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত উপনিবেশ স্পেনের হাতছাড়া হয়ে যায়।
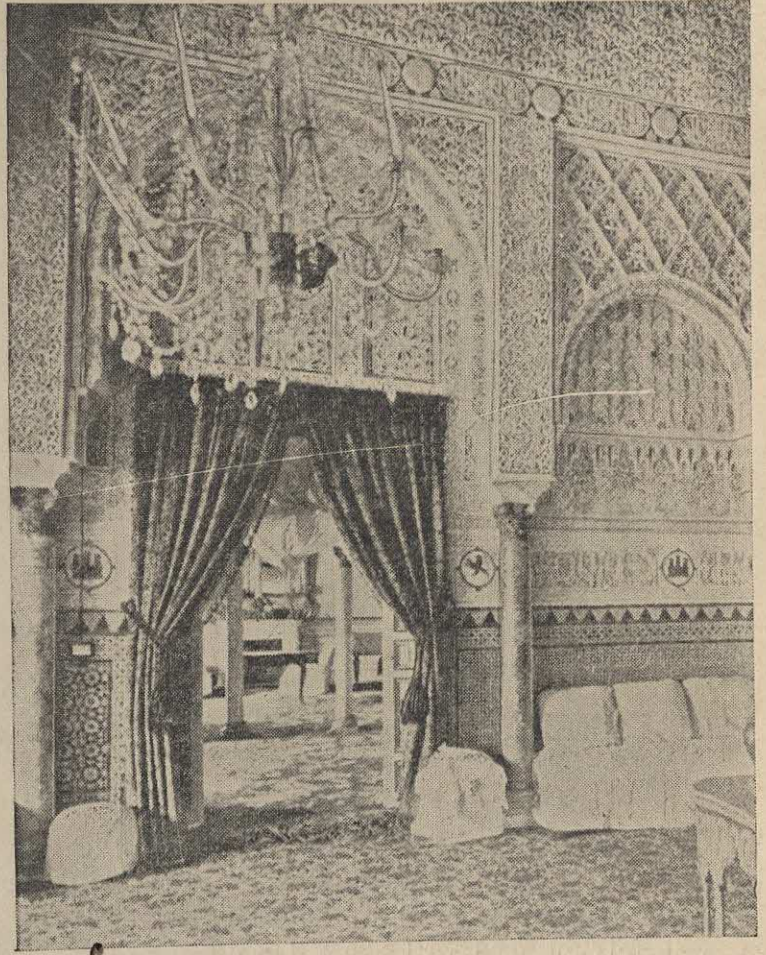
প্রাইমো ডি রিভেরা নামে এক সেনাধ্যক্ষ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সব ক্ষমতা দখল করে নিজেকে স্পেনের 'ডিক্টেটার' ঘোষণা করেন। তিনি প্রথমেই মরক্কোকে আবার স্পেনের অধীনে আনেন। তারপর আভ্যন্তরীণ সংস্কারের কাজে হাত দেন। শ্রমিক মালিক উভয় পক্ষকেই তিনি সুযোগ-সুবিধে করে দিয়েছিলেন। কিন্তু, তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচারী ডিক্টেটার। বহু বাধা-নিষেধ আরোপের ফলে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

ফার্দিনান্দ

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজার আদেশে রিভেরা পদত্যাগ করেন।

রাজা আলফন্সো আবার ক্ষমতা হাতে তুলে নিলেও দেশে অসন্তোষ বেড়েই চলল। সৈন্যদল রাজাকে অমান্য করতে শুরু করল। রাজা বিপ্লবী নেতাদের কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনে রাজার প্রার্থীরা হেরে যায় ও বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করে। রাজা আলফন্সো দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিনা রক্তপাতে স্পেনে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়।

বিপ্লবীদের মধ্যে দুটো দল ছিল—সমাজতন্ত্রবাদী আর প্রজাতান্ত্রিক। ফলে শুরু হয় নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ফ্রাঙ্কো সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মুসোলিনি আর হিটলার ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করেছিলেন, আর সমাজতান্ত্রিকরা রাশিয়ার সাহায্য পেয়েছিল। অবশেষে ফ্রাঙ্কো স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ অধিকার

জেনারেল ফ্রাঙ্কো

করে নেন ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তিনি নিজেকে 'ডিক্টেটার' বলে ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কো স্পেনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন। ফ্রাঙ্কো ক্রমে জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতা হয়ে ওঠেন।

॥ জার্মানী ॥

একেবারে প্রথমে জার্মানী বলে কোন একটা দেশ ছিল না, সেই অঞ্চলে ছোট ছোট আলাদা রাজ্যে ফ্রাঙ্ক, স্যাক্সন, গথ, ভিসিগথ প্রভৃতি অর্ধসভ্য বীর জাতির বাস ছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষে শার্লমেনই প্রথম সমস্ত জাতিগুলিকে জয় করে এক শাসনে এনেছিলেন। পরে আবার এই অঞ্চল অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের জার্মান রাজ্য বলা যেতে পারে।

পঞ্চদশ শতকে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে জার্মানীর মার্টিন লুথার প্রোটেস্টান্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেন। জার্মান রাজ্যগুলির প্রায় অর্ধেক লোক প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু ক্যাথলিকরা সহজে এই ধর্ম-সংস্কার মেনে নেয় না। ফলে যুদ্ধ (১৬১৮-১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) দেখা দেয়। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্টফেলিয়ার

সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধ বন্ধ হয় বটে, কিন্তু জার্মানী তিন'শর উপর ছোটো ছোটো সামন্ত রাজ্যে ভাগ হয়ে যায়।

এই সব ছোটো ছোটো দেশের মধ্যে প্রধান ছিল ব্রাণ্ডেনবুর্গ। এখানে রাজত্ব করত হোহেনৎসোলার্ন রাজবংশ। এই রাজ্যটি আয়তনে বাড়তে আরম্ভ করে আর অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কালক্রমে এর নাম হয় প্রুশিয়া। এর রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট (১৭১২-১৭৮৬ খ্রীঃ)।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন অটো ফন বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্। গণতন্ত্রবিরোধী হলেও তিনি জার্মানীর ঐক্য প্রচেষ্টা সার্থক করে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দুটি সামন্ত রাজ্যের মালিকানার প্রশ্নে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রুশিয়ার যুদ্ধ বাধে ও অস্ট্রিয়া হেরে যায়। এই যুদ্ধজয়ের ফলে তিনি জার্মানীর উত্তরভাগের রাজ্যগুলিকে প্রুশিয়ার অধীনে নিয়ে আসেন। কিন্তু

বিসমার্কের বিদায় সম্বন্ধে ব্যঙ্গচিত্র : 'কর্ণধার-বিতাড়ন' (Dropping the Pilot)
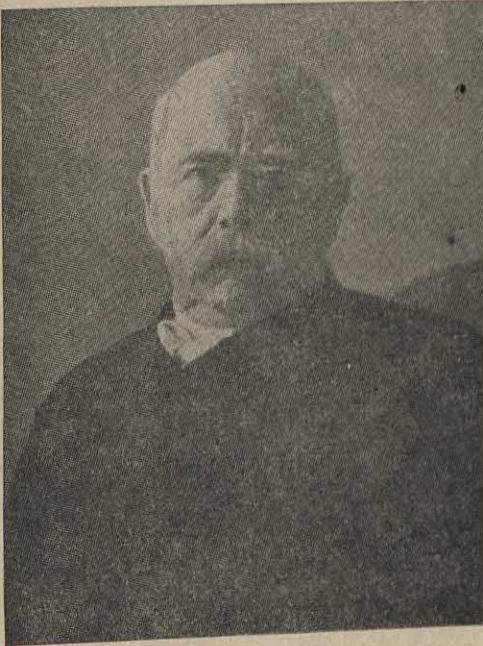
বিসমার্ক

বিসমার্ক জানতেন ফ্রান্সকে পরাজিত না করলে জার্মানীর দক্ষিণভাগের দেশগুলো আয়ত্তে আনা যাবে না।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে প্রুশিয়ার কাছে ফ্রান্সের পরাজয় হয়। বিসমার্ক আলসেস-লোরেন ফ্রান্সের কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। বাকী জার্মান রাজ্যগুলো প্রুশিয়ার অধীনে চলে এল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি সম্মিলিত জার্মানীর সৃষ্টি হল। প্রুশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ম (Wilhelm) সম্মিলিত জার্মানী দেশের প্রথম সম্রাট্ ('কাইজার') হলেন। বিসমার্ক হলেন চ্যান্সেলার।

প্রথম উইলিয়মের পর দ্বিতীয় উইলিয়ম (Wilhelm II) 'কাইজার' বা সম্রাট্ হলেন। তাঁর সঙ্গে বিসমার্কের মতের মিল হল না। ফলে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ককে চ্যান্সেলর পদ হতে অবসর নিতে হল। দ্বিতীয় উইলিয়ম

জার্মানীর সমরোপকরণ বাড়াতে আরম্ভ করলেন, আর সমগ্র পৃথিবীজোড়া জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এর ফলে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের পক্ষে কাইজারের জার্মানী ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয়ায় অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্য করে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হল। জার্মানীর পক্ষে ছিল অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক আর বুলগেরিয়া ; বিপক্ষে ছিল ২৩টি দেশ। জার্মানী অবশেষে পরাজিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী পরাজয় স্বীকার করে ফ্রান্সের ভার্সাই (Versailles) শহরে সন্ধিপত্র সই করে।

জার্মানীতে হিটলারের অধীনে ন্যাশনাল (Nazionale) সোস্যালিস্ট দল বলে এক দল সংগঠিত হল। এদের সংক্ষেপে 'নাৎসী' (Nazi) দলও বলা হত। এদের উদ্দেশ্য ছিল ভার্সাই চুক্তি বাতিল করা, ইহুদীদের জার্মানী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া আর জার্মানী দেশের বিস্তার। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাডল্‌ফ্‌ হিট্‌লার (১৮৮৯-১৯৪৫ খ্রীঃ) জার্মানীর চ্যান্সেলর হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার নিজে রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন আর 'ফুরার' (Fuhrer) উপাধি গ্রহণ করেন।

হিটলার

হিটলার প্রথম থেকেই ভার্সাই সন্ধির চুক্তি ভাঙতে শুরু করলেন। নতুনভাবে সমরসজ্জা শুরু হল। ইহুদীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল কিংবা হত্যা করা হল।

হিটলার দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি করলেন—দেশে কোন বেকার রইল না। দেশের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোনও কথা বলতে পারত না। এইভাবে, নিজের দেশকে শক্ত করে হিটলার ঘোষণা করলেন যে, দেশের বাইরে যে সব জার্মান আছে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি অস্ট্রিয়া দখল করলেন। মিউনিক চুক্তির পর তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করলেন। এরপর হিটলার চুক্তি করলেন স্ট্যালিনের সঙ্গে। পোল্যাণ্ড দখল করতে যাওয়ার সময় ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফ্রান্সও ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যোগ দিল। আরম্ভ হল দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ।

১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হিটলার পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফ্রান্স দখল করলেন। ইতিমধ্যে মুসোলিনির ইটালী হিটলারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। পরে যোগ দিল জাপান। জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করলে আমেরিকা মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেয়।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন হিটলার চুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করেন। প্রথম দিকে জয়লাভ করলেও স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধে রুশবাহিনী জয়লাভ করে। জার্মানীর ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। ইংরেজবাহিনী ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী আক্রমণ করে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স আবার জার্মান বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হয়। আমেরিকার নৌবাহিনী জার্মানীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। চারদিক দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে রাজধানী বার্লিন বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে (৮ই মে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে)। হিটলার আত্মহত্যা করেন বলে শোনা যায়। বার্লিন শহর সহ সমগ্র জার্মানীকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী আর রাশিয়ান এই চারজনের ভাগে চার অংশ
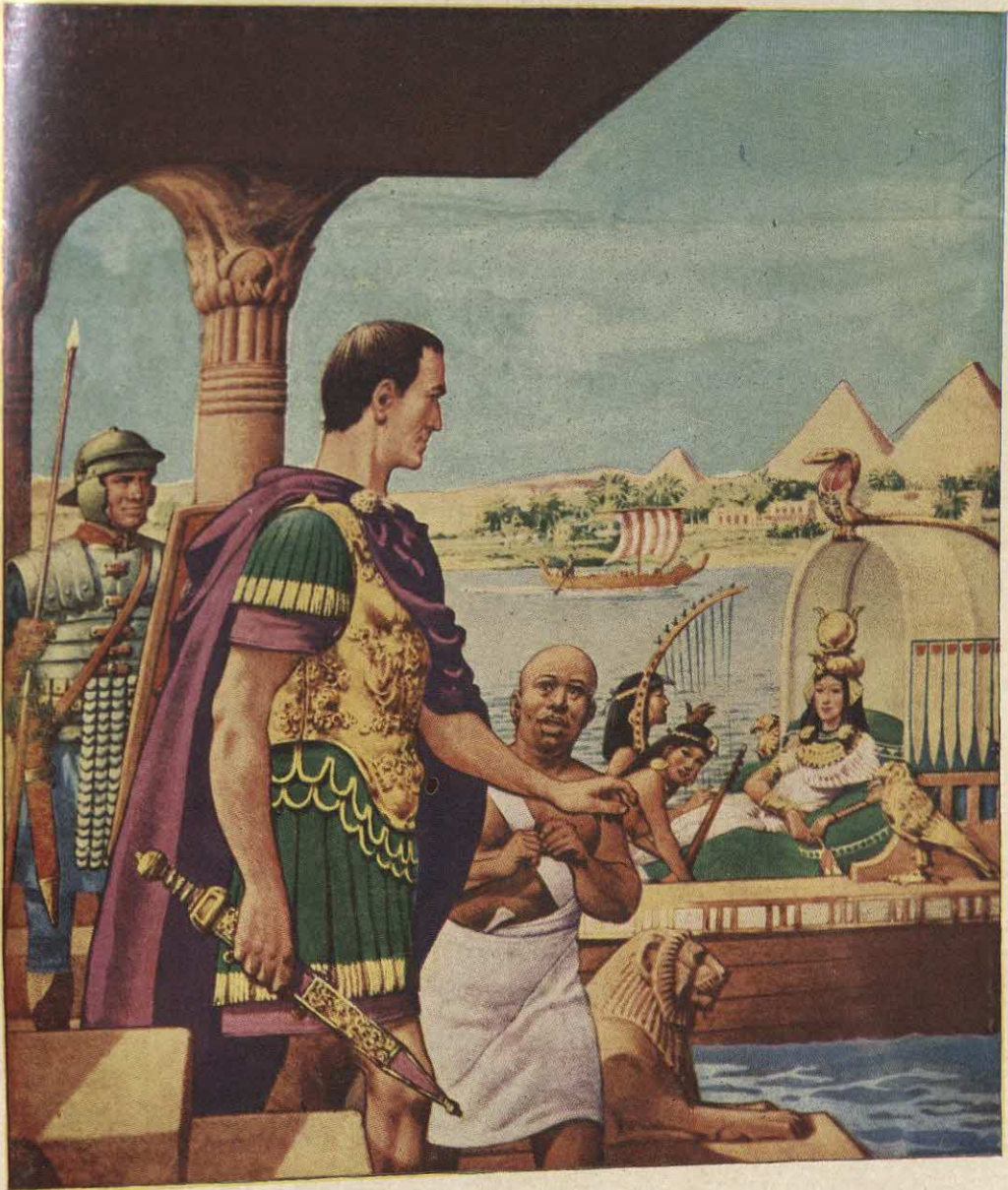
ক্লিওপেট্রার সঙ্গে জুলিয়াস সীজারের সাক্ষাৎ।

ইতিহাসের কথাঃ

[ক্লিওপেট্রার সঙ্গে জুলিয়াস সীজারের সাক্ষাৎ]

জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar) প্রাচীন রোমের একজন প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনেতা ও সেনাপতি। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০ অব্দে তাঁর জন্ম হয়, মৃত্যু হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪ অব্দে। তিনি মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে বিবাহ করেন।

ক্লিওপেট্রা (Cleopetra) ছিলেন মিশরের রানী। ৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর জন্ম হয়, মৃত্যু হয় ৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি প্রথমে জুলিয়াস সীজারকে বিবাহ করেন। সীজারের মৃত্যুর পর মার্ক অ্যান্টনির সঙ্গে তিনি বাস করতে থাকেন। মার্ক অ্যান্টনি (Mark Antony) ছিলেন জুলিয়াস সীজারের একজন সেনাপতি। অক্টেভিয়াস অগাস্টাস কর্তৃক তিনি যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেন। তখন ক্লিওপেট্রা অ্যাস্প-নামে বিষধর সাপ নিজের বুকে রেখে তার কামড়ে মারা যান।

এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্লিওপেট্রা নৌকোতে বসে আছেন। জুলিয়াস সীজার তাঁর দিকে তাকিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

পড়ে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স নিজেদের অংশ মিশিয়ে সংযুক্ত পশ্চিম জার্মানী (Federal Republic of Germany) গঠন করে। বন্ হয় এই নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী। রাশিয়ান অঞ্চলে স্থাপিত হয় 'জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' (German Democratic Republic).

প্রাচীনকালের ইংল্যাণ্ড

॥ ইংল্যাণ্ড ॥
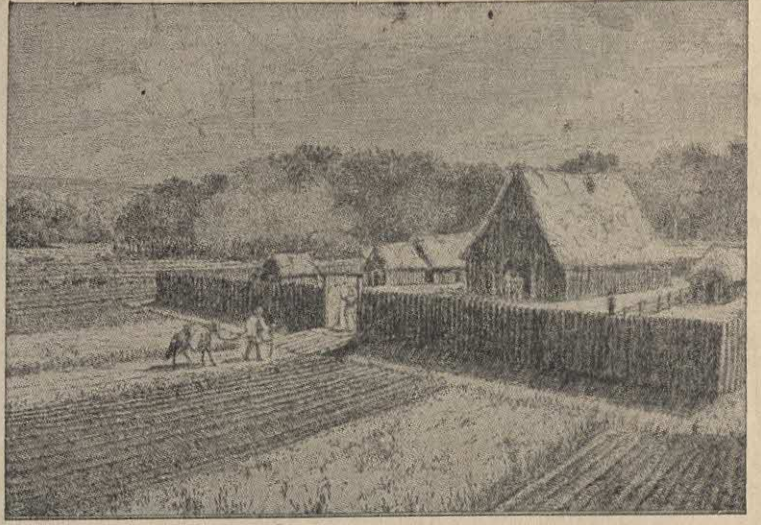
ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সুমের, চীন বা ভারতের মতো অত প্রাচীন নয়। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইংল্যাণ্ডের নাম ছিল ব্রিটেন, অধিবাসীদের বলা হত ব্রিটন। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে তারা থাকত, তবে অন্য দেশের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫ অব্দে রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সীজার ব্রিটেন আক্রমণ করেন এবং অনেক কর ও উপঢৌকন আদায় করে ফিরে যান। চারশ বছর ধরে ব্রিটেন রোমানদের অধীনে রইল। বর্বর জাতির আক্রমণে যখন রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন রোমানরা নিজ থেকেই ব্রিটেন ছেড়ে চলে গেল। ব্রিটনরা স্বাধীন হল।

ব্রিটনরা যুদ্ধবিদ্যা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সুযোগ বুঝে পিক্ট, স্কট, জুট, অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন প্রভৃতি অসভ্য জাতির লোকেরা তাদের উপর আক্রমণ আর অত্যাচার করতে লাগলো। এদের মধ্যে অ্যাঙ্গল আর স্যাক্সনরাই অধিকাংশ স্থানে নিজেদের ক্ষমতাও বিস্তার করে ফেলে। রাজা আলফ্রেড দ্য গ্রেট (৮৪৯-৯০১) ডেনমার্কের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রায় সারাজীবন যুদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁর পর ডেনমার্কের রাজাই ইংল্যাণ্ড জয় করেন। ইংল্যাণ্ডের ডেন রাজাদের মধ্যে ক্যানিউট বিখ্যাত (একাদশ শতাব্দীর প্রথমে)।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের উত্তর উপকূলের নরম্যাণ্ডির রাজা উইলিয়ম ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজা হ্যারল্ডের সঙ্গে হেস্টিংসে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে উইলিয়ম জয়ী হন ও ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন দখল করেন। তিনি ইংল্যাণ্ড আর নরম্যাণ্ডি —দুটো জায়গাই শাসন করতে থাকেন। নিজের শক্তি বাড়াবার জন্যে তিনি জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করেন। ইতিহাসে তাঁকে 'বিজয়ী উইলিয়ম' (William the Conqueror) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর পর দ্বিতীয় হেনরী আর প্রথম রিচার্ড রাজত্ব করেন।

প্রথম রিচার্ড ধর্মযুদ্ধে বা ক্রুসেডে প্রচণ্ড বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। তাই তাঁকে বলা হয় 'সিংহ-হৃদয় রিচার্ড' (Richard the Lion-Hearted). তারপরে তাঁর ছোট ভাই জন সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন অত্যাচারী আর খামখেয়ালী। ফলে অভিজাত সম্প্রদায় একজোট হয়ে রাজার কাছ থেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা দাবি করে। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তিনি 'ম্যাগনা কার্টা' বা 'মহাসনন্দ' স্বাক্ষর করে অভিজাত সম্প্রদায়ের দাবি স্বীকার করে নেন।

রাজা জন ম্যাগনা কার্টায় সই করছেন

তৃতীয় হেনরীর (১২০৭-১২৭২ খ্রীষ্টাব্দ) সময় ইংল্যাণ্ডে হাউস অব কমন্স বা গণপ্রতিনিধি সভার (পার্লামেণ্টের) সূচনা হয়। পরে তাঁর পুত্র প্রথম এডওয়ার্ড (১২৩৯-১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দ) পার্লামেণ্টের উন্নতি বিধান করেন। এই সময় ওয়েলসও ইংল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের সময় ফ্রান্সের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ চলে পঞ্চম হেনরী আর ষষ্ঠ হেনরীর রাজত্বকালে। অবশেষে ইংল্যাণ্ডকে ফ্রান্স ছেড়ে আসতে হয়।

১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। টিউডর বংশের সপ্তম হেনরী তৃতীয় রিচার্ডকে বসওয়ার্থের যুদ্ধে হারিয়ে সিংহাসনে বসেন। অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব করে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে তিনি তাঁর শক্তি সুদৃঢ় করেন। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ড রোমের পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করেন।

রানী এলিজাবেথের (১৫৬৩-১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বকাল নানা দিক্ দিয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সময়ে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ বিশাল নৌবহর (আর্মাডা) নিয়ে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। ইংরেজ নৌবাহিনী সেই আর্মাডা বিনষ্ট করে দেয়। এলিজাবেথের সময় ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদিতে ইংল্যাণ্ড প্রভূত উন্নতি লাভ করে। সেক্সপীয়র এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। এই সময়ে পার্লামেণ্টেরও অনেক উন্নতি হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এলিজাবেথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে টিউডর বংশ শেষ হয় ও স্টুয়ার্ট বংশ আরম্ভ হয়।

রানী প্রথম এলিজাবেথ

রাজা প্রথম জেমসের সময়ে পার্লামেণ্টের সঙ্গে রাজার বিরোধ শুরু হয়। প্রথম চার্লসের সময়ে এই বিরোধ চরমে ওঠে। রাজা নিজের ইচ্ছামতো ক্ষমতা ব্যবহার করতে চাইলে পার্লামেণ্ট তাতে বাধা দেয়। ফলে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ছ'বছর যুদ্ধের পর অলিভার ক্রমওয়েলের (১৫৯৯-১৬৫৮ খ্রীঃ) নেতৃত্বে রাজ-বিরোধীরা রাজাকে পরাজিত করে। বিচারে প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হয়। ক্রমওয়েল প্রটেক্টর উপাধি নিয়ে রাজ্যশাসন শুরু করলেন। ক্রমওয়েলের সময়ে বৈদেশিক ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের সম্মান অনেক বেড়ে যায়।

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর কিছু পরেই আবার রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়, প্রথম চার্লসের ছেলে দ্বিতীয় চার্লস রাজা হন।

এরপর ইংল্যাণ্ড আর কখনও রাজাকে মারে নি, বা প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে নি। রাজাকে বজায় রেখে ক্রমাগত তাঁর ক্ষমতা কমিয়ে আর প্রজার ক্ষমতা বাড়িয়ে এসেছে।

অলিভার ক্রমওয়েল

অষ্টম এড্ওয়ার্ড

সেই নিয়ম অনুসারে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এক রক্ত-পাতহীন বিপ্লব করে রাজা দ্বিতীয় জেম্‌স্‌কে তাড়ানো হয়। কিন্তু তখনই রাজা ও রানী করে নিয়ে আসা হল অরেঞ্জ-বার উইলিয়াম ও তাঁর রানী মেরীকে। তাঁদের থেকে আরও কতকগুলি অধিকার প্রজাদের জন্যে আদায় করে নেওয়া হল। এই অধিকারপত্র "বিল অব রাইট্‌স্" নামে খ্যাত।

ক্রমে জার্মানীর হ্যানোভারের রাজবংশ এসে ইংল্যাণ্ডে রাজত্ব লাভ করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতির ইতিহাসে বড় বড় রাজনীতিবিদ্‌দের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে প্রথমে ওয়ালপোল এবং পিটের নাম উল্লেখযোগ্য। ওয়ালপোলকে (১৬৭৬-১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) ইংল্যাণ্ডের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলা হয়।

ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড ভারতে প্রভাব বিস্তার করে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন শুরু হয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ড যেমন ভারত অধিকার করে, তেমনি জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে এক বিপ্লবের ফলে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের হাতছাড়া হয়ে যায়।

ইংল্যাণ্ড যে পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে বেশী শক্তির অধিকারী হয়েছিল তার প্রধান কারণ ইংল্যাণ্ডে অনেক বড় বড় যোদ্ধা এবং নাবিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের নাবিকদের মধ্যে জলযুদ্ধে যাঁরা বেশী বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে লর্ড নেলসনের (১৭৫৮-১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ) নাম উল্লেখযোগ্য।

নেলসনের সময়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরাট এক যুদ্ধ বেধে যায়। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে প্রথমে হল ফরাসী-বিপ্লব এবং তার কিছুকাল পরেই বিখ্যাত যোদ্ধা নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান হল। নেপোলিয়নের ভয়ে তখন সারা ইওরোপ কম্পমান। নেলসন ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধে (১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ) নেপোলিয়নের নৌবাহিনীকে হারিয়ে দেন। ডিউক অব ওয়েলিংটন ওয়াটারলুর যুদ্ধে (১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ) নেপোলিয়নকে পরাস্ত করেন। এর ফলেই নেপোলিয়নের পতন ঘটে।

রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

নেলসন

এর পরে চলে ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধির যুগ। শিল্প, সাহিত্য, শক্তি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংল্যাণ্ড উন্নতির চরম সীমায় ওঠে।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার চৌষট্টি বছর রাজত্বকালে (১৮৩৭-১৯০১) ইংরেজরা এক শান্তিময় যুগে বাস করে। দুই বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন আর ডিসরেলী (লর্ড বীকনসফীল্ড) এই সময়েরই লোক।

পঞ্চম জর্জের রাজত্বকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়।

রাজা পঞ্চম জর্জের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে অষ্টম এড্ওয়ার্ড ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পার্লামেণ্টের নির্দিষ্ট রাজ-আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে তিনি মিসেস ওয়ালিস ওয়ারফীল্ড নামে

এক বিধবা আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে করেন বলে তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। তখন তাঁর নাম হয় ডিউক অফ উইণ্ডসর। পরবর্তী রাজা ষষ্ঠ জর্জের সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) হয়েছিল। এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড আর মিত্রশক্তি জার্মানী ও জাপানকে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ী হয়। এই সময়ে স্যার উইনস্টন চার্চিল (১৮৭৪-১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

এদিকে অনেককাল থেকেই ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দু'শ বছর রাজত্ব করার পর ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যায়।

ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথমা কন্যা এলিজাবেথ দ্বিতীয় এলিজাবেথ নামে সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক উৎসব মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়।

ডি. ভ্যালেরা

॥ আয়ারল্যাণ্ড ॥

আয়ারল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের অধীনে থাকলেও অনেকখানি স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ-সুবিধে ভোগ করত। কিন্তু অনবরত বিদ্রোহ এইখানে লেগেই ছিল। স্টুয়ার্ট বংশের রাজা প্রথম চার্লস যখন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে, তখন দেশের মধ্যে গোলযোগের সুযোগে আইরিশরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু অলিভার ক্রমওয়েল আয়ারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ কঠোর-হাতে দমন করেন।

আয়ারল্যাণ্ডের যুদ্ধ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আয়ারল্যাণ্ডকে আলাদা পার্লামেণ্ট রাখবার অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও বিদ্রোহ থামল না। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ শুরু হল। এবার বিদ্রোহ দমন করা হল ও পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হল এবং ঠিক হল যে, আইরিশ প্রতিনিধিরা ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে আসবেন। কিন্তু আইরিশরা চাইল পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে "আইরিশ স্বায়ত্তশাসন সংঘ" স্থাপিত হল, আর চাপে পড়ে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড 'আইরিশ স্বায়ত্তশাসন আইন' পাস করতে বাধ্য হল।

এর ফলে ঠিক হল আয়ারল্যাণ্ডে আলাদা পার্লামেণ্ট থাকবে। সেই পার্লামেণ্টের সদস্য থেকেই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে, তবে ইংল্যাণ্ডের রাজার একজন প্রতিনিধি সেই মন্ত্রিসভায় থাকবেন। কিন্তু আইরিশদের একান্ত ইচ্ছে যে তারা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ফলে গড়ে উঠল 'সিন্‌ফিন্‌' (Sinnfein) দল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সিন্‌ফিন্‌ দলের নেতৃত্বে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ড এই বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করে। কিন্তু আইরিশরা এবার গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। তারা নিজ উদ্যোগে পালটা সরকার স্থাপন করে। ডি-ভ্যালেরার (Eamon De Valera) নেতৃত্বে আইরিশরা নিজ সংকল্পে অটুট থাকে।

অবশেষে ইংল্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ডকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। তবে ইংল্যাণ্ডের রাজার একজন প্রতিনিধি আয়ারল্যাণ্ডে থাকবেন এইরূপ চুক্তি হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নতুন শাসনতন্ত্র চালু হয়। এতে রাজপ্রতিনিধির পদ তুলে দিয়ে রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আয়ারল্যাণ্ড নিরপেক্ষ ছিল।

॥ স্কটল্যাণ্ড ॥

ইংল্যাণ্ডের উত্তরে স্কটল্যাণ্ড দেশ। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড গ্রেটব্রিটেন নামে একই দ্বীপের দুটি অংশ। আজকাল এই দুটি দেশ একেবারে এক হয়ে গেছে বটে, কিন্তু অতীতে এদের মধ্যে অনেকদিন শত্রুতা চলেছিল। স্কটল্যাণ্ডে কেল্ট, পিক্ট ও স্কটরা বাস করত।

স্কটল্যাণ্ড জয় করে তাকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসবার ইচ্ছে ইংল্যাণ্ডের অনেক রাজাদেরই ছিল।

১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম এড্‌ওয়ার্ড স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ করে বসলেন। সেই সময় স্কটদের নিজেদের মধ্যে বিশেষ একতা ছিল না। কিন্তু দেশের এই বিপদে দেশের সমস্ত লোক পরস্পরের শত্রুতা ভুলে গিয়ে এক হয়ে গেল। উইলিয়ম ওয়ালেস (১২৭০-১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দ) নামে এক স্বদেশ-প্রেমিক বীর স্কটদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের নেতা হলেন। তিনি ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'স্টার্লিং ব্রিজের' যুদ্ধে অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে ইংরেজদের হারিয়ে দিলেন। কিন্তু এক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে তিনি ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লেন এবং নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন।

রবার্ট ব্রুস

এর পরেও স্কটজাতি দমল না, তারা নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে স্কটবীর রবার্ট ব্রুসের নাম অমর হয়ে আছে। তিনি প্রায় সমস্ত জীবন ধরে ইংরেজদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যানকবার্নের যুদ্ধে স্কটদের কাছে ইংরেজদের খুব বড় পরাজয় হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের পরস্পর বিবাদের মধ্যেও তাদের দুই রাজবংশের ছেলেমেয়েদের বিয়েতে কোন বাধা হয় নি। ইংল্যাণ্ডের টিউডর বংশের শেষ রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ইংল্যাণ্ডের লোকেরা ঠিক করল যে এলিজাবেথের দূর সম্পর্কের বোন স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরী স্টুয়ার্টের ছেলে ষষ্ঠ জেমসকেই সিংহাসনে বসাবে। ষষ্ঠ জেমস তখন স্কটল্যাণ্ডের রাজ। ষষ্ঠ জেমস ইংল্যাণ্ডে এসে 'প্রথম জেমস' নাম ধারণ করলেন। তাঁর থেকেই ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হল। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড দুই দেশই ইংল্যাণ্ডের রাজার অধীনে এল, তবে স্কটল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হল না।

তার অনেককাল পরে রানী অ্যানের সময় ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে বসে ঠিক করলেন দুটি দেশ মিলিত হয়ে গ্রেট ব্রিটেন নামে পরিচিত হবে। স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট থাকবে না, স্কটরা ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবে। এই ব্যবস্থায় দুই দেশেরই লাভ হয়েছে।

॥ অস্ট্রিয়া ॥

অস্ট্রিয়া শব্দটির মানে পূর্বদিকের রাজ্য। নবম শতাব্দীতে অস্ট্রিয়া এই নামেই পরিচিত হত। অস্ট্রিয়া প্রথমে ছিল ছোট একটি 'মার্ক' বা জমিদারি, পরে ধীরে ধীরে এর চার পাশে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। দুটি রাজবংশ এই দেশকে প্রথমে অতি সাধারণ অবস্থা থেকে পরে বিরাট সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করে। এই দুটির নাম যথাক্রমে ব্যাবেনবুর্গ এবং হ্যাপসবুর্গ বংশ।

সম্রাট্ শার্লমেন (৭৪২-৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ) স্লাভদের হাত থেকে তাঁর সাম্রাজ্যরক্ষার জন্যে রক্ষা-ঘাঁটি হিসাবে

মেরী স্টুয়ার্ট

অস্ট্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে হ্যাপসবুর্গ বংশ এই স্থানটি লাভ করে দক্ষতার সঙ্গে শাসন চালায়। হোলি রোমান এম্পায়ারের 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের' অন্তর্ভুক্ত হলেও অস্ট্রিয়া প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করতে থাকে।

অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ বংশীয় সম্রাট্রা বিবাহের যৌতুকস্বরূপ হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি বহু দেশ লাভ করেন। সম্রাট্ ম্যাক্সিমিলিয়ানের (রাজত্বকাল ১৪৯৯-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ) সময় অস্ট্রিয়ার শক্তি প্রচণ্ড রূপে বৃদ্ধি হয়। ম্যাক্সিমিলিয়ানের পুত্র স্পেনের রাজকুমারী জোয়ানকে বিবাহ করবার ফলে স্পেনেও হ্যাপসবুর্গদের অধিকার স্থাপিত হয়। ইওরোপের বিশাল অংশ জুড়ে এইভাবে স্থাপিত হয় অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য।

অস্ট্রিয়ার এই শক্তিবৃদ্ধির ফলে ফ্রান্সের সঙ্গে ক্রমেই তার বিরোধ বাড়ছিল। অবশেষে শুরু হয়

ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধ। ১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে ওয়েস্ট-ফেলিয়ার সন্ধিতে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সকে আলসেস অঞ্চল ছেড়ে দেয়।

এবার আর এক দিক্ থেকে বিপদ আসে। তুর্কী সাম্রাজ্য উত্তর দিকে রাজ্য বিস্তার শুরু করলে ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা অবরুদ্ধ হয়। অবশেষে পোল্যাণ্ডের রাজা সোবিয়েস্কি তুর্কীদের হারিয়ে দেন।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধে (War of Spanish Succession) ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে যোগদান করে। ইউট্রেক্টের সন্ধিতে (১৭১৩ খ্রীস্টাব্দ) ইতালীর নেপলস্, মিলান এবং বেলজিয়ামে অস্ট্রিয়ার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে ষষ্ঠ চার্লস মারা যাবার পর তাঁর কন্যা মেরিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করলে প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক অস্ট্রিয়ার নিকট হতে সাইলেশিয়া দখলের

মেরিয়া থেরেসা

জন্যে যুদ্ধ শুরু করেন। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও প্রুশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যোগ দেয়; ইংল্যাণ্ড অস্ট্রিয়ার পক্ষে ছিল। এই যুদ্ধ 'অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ' নামে পরিচিত। যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটে। আই-লা-স্যাপেলের সন্ধিতে (১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দ) অস্ট্রিয়া প্রুশিয়াকে সাইলেশিয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে অস্ট্রিয়ার ইতিহাস এগিয়ে চলতে থাকে। ইতালীর স্বাধীনতা আর ঐক্য আন্দোলনের ফলে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইতালীতে অস্ট্রিয়া সব অধিকার হারায়। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে বিসমার্ক স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে দিলেন। ফলে জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার প্রভাব বিনষ্ট হল। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীকে স্বাধীনতা দিল। ফলে

গাস্টেভাস ভাসা
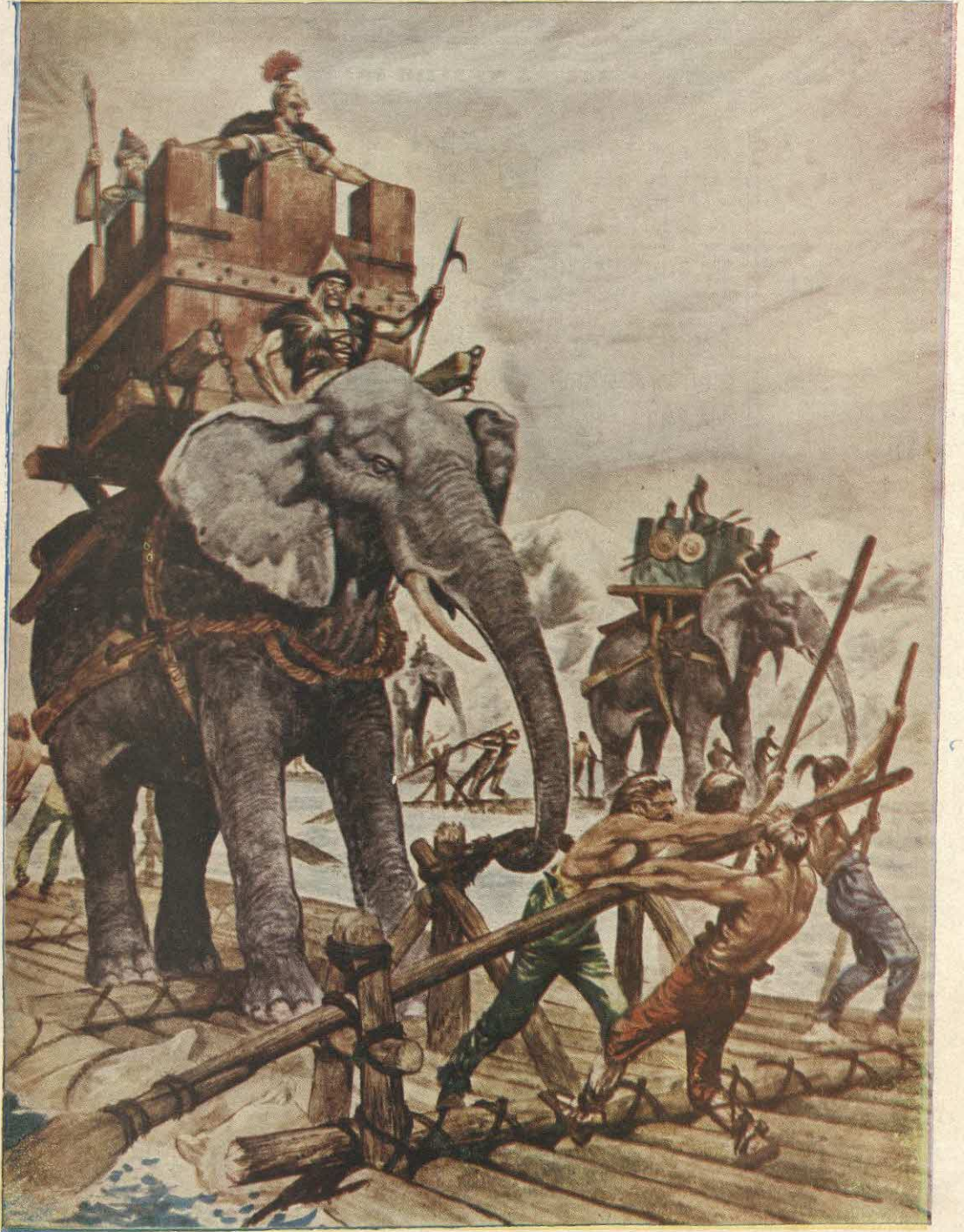
হাতীর দল নিয়ে হানিবলের রোম বিজয়ে যাত্রা।

ইতিহাসের কথাঃ

[হাতির দল নিয়ে হানিবলের রোম বিজয়ে যাত্রা]

হানিবল প্রাচীন যুগের একজন বিখ্যাত বীর সেনাপতি (খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৭—১৮৩ অব্দ)। তিনি ছিলেন কার্থেজ নগরের লোক। তিনি আল্পস পর্বত পেরিয়ে রোমবিজয়ে যান। সঙ্গে নিয়ে যান অসংখ্য হাতী ও সৈন্যদল। পরে ইটালিয়ানরা কার্থেজ আক্রমণ করলে তিনি স্বদেশ রক্ষার জন্যে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি 'জামা'র যুদ্ধে Scipio কর্তৃক পরাজিত হন ও নির্বাসিত অবস্থায় বিষপানে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন।

রোমে যাবার পথে পড়ল নদী। যে-সব কাঠ জলে ভালভাবে ভাসে সেই সব কাঠের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভেলায় করে হাতীদের ও সৈন্যদের পার করার ব্যবস্থা করা হল। তারপরে পথে পড়ল তুষারে-ঢাকা আল্পস পর্বত। বহু কষ্টে আল্পস পর্বত পেরোবার পর পার্বত্য জাতির লোকে হানিবলের লোকজনকে আক্রমণ করল। তিনি সেই আক্রমণকে প্রতিহত করলেন।

যখন তিনি রোমে পৌঁছলেন, তখন দারুণ শীতে ও দুঃসহ কষ্টে বেশির ভাগ হাতীই মারা গেছে।

আজকালকার যুদ্ধে হাতীর ব্যবহারের তেমন রেওয়াজ নেই কিন্তু হাতীরা আগেকার দিনে যুদ্ধে কি রকম অসম্ভব সব সাহায্য করত তা হানিবলের রোমবিজয়ে যাত্রার ইতিহাস পড়ে জানা যায়।

অস্ট্রিয়ার পূর্ব গৌরব অন্তর্হিত হল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ সার্বিয়াদেশীয় এক যুবকের গুলিতে নিহত হন। ফলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানী অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দেয় আর বিপক্ষে থাকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ। এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হল তখন প্যারিসের শান্তি চুক্তিতে অস্ট্রিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসান হল—অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ভেঙে ছোট ছোট বহু দেশ গঠিত হল। অস্ট্রিয়া একটি ছোট প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হল।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করে নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রিয়া জার্মানীর অধীনেই ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়াতে মিত্রশক্তির শাসন স্থাপিত হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে অস্ট্রিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

রানী ক্রিস্টিনা

॥ সুইডেন ॥

সুইডেনের প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। সুইডিশরা প্রধানতঃ দেশের উত্তর অঞ্চলেই বাস করত। দক্ষিণদিকের উর্বর উপদ্বীপ অঞ্চলে দিনেমারদের বসতি ছিল। সুইডিশরা ধীরে ধীরে দেশের মধ্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমে তারা বালটিক সাগরের পূর্বদিকে, এমন কি ফিনল্যাণ্ডের উপকূল ভাগে বিস্তৃত হতে থাকে।

সুইডেনে প্রাচীনকালে বিশেষ ঐক্য ছিল না। সুযোগ বুঝে জার্মানরা সুইডেনে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ক্রিশ্চিয়ান সুইডেন দখল করে নেন। কিন্তু সুইস নেতা গাস্টেভাস ভাসার নেতৃত্বে সুইডিশরা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে এবং অবশেষে সুইডেন স্বাধীন হয়। ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে গাস্টেভাস ভাসা রাজা হন।

মধ্যযুগে সুইডেনের বিখ্যাত রাজা ছিলেন গাস্টেভাস

অ্যাডলফাস (১৫৯৪-১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি দেশের আইন সংস্কার করে রাজশক্তি সুদৃঢ় করেন। ডেনমার্ক, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিজ দেশের আয়তন বৃদ্ধি করেন।

১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জার্মানীতে প্রসিদ্ধ 'ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ' চলছিল। এই যুদ্ধে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের পক্ষ হয়ে সুইডেন যোগদান করে। অ্যাডলফাসের বীরত্বে ইওরোপে সুইডেনের সম্মান অনেক বেড়ে যায়।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ লুট্‌জেনের (Lutzen) যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধজয়ের কালেই হঠাৎ তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তারপর দেশের রানী হন তাঁর কন্যা ক্রিস্টিনা।

দ্বাদশ চার্লসের সময়ে (১৬৮২-১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ) সুইডেন আবার ইওরোপের মধ্যে নিজ সামরিক শক্তির জোরে বিশেষ স্থান অধিকার করে। কিন্তু বহু যুদ্ধে জয়লাভ করলেও চার্লস রাশিয়া আক্রমণ করতে গিয়ে পরাজিত হলেন। দেশে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তারপর সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধেও সুইডেন প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিশেষভাবে অপদস্থ হল। তৃতীয় গাস্টেভাস বহুকষ্টে কোন মতে সুইডেনের রাজশক্তি বাঁচিয়ে রাখলেন।

বার্নাদোত

এরপর চতুর্থ গাস্টেভাস ও ত্রয়োদশ চার্লস ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পর পর রাজত্ব করেন। এই সময়ে ফরাসীবীর নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে সুইডেনের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এরপর সুইডেনের সিংহাসনে আসেন নেপোলিয়নের একজন ফরাসী সেনানায়ক বার্নাদোত।

তারপর সুইডেনের ইতিহাস শান্তিপূর্ণ প্রগতির ইতিহাস। বার্নাদোতের সময় থেকে এবং তাঁর পরবর্তী কালের রাজাদের রাজত্বকালে সুইডেন নানাদিক্ থেকে উন্নত হয়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীতে সুইডেন দুটি বিশ্বযুদ্ধেই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিল এবং তার ফলে দেশের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি বর্তমানে সুইডেনে ইংল্যাণ্ডের মত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

॥ ডেনমার্ক ॥

ডেনমার্কে প্রাচীনকাল হতে রাজতন্ত্র বর্তমান। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের প্রতিষ্ঠা করেন বিশপ অ্যাবস্যালন (১১২৮-১২০১ খ্রীষ্টাব্দ)। ডেনমার্কের এলসিনোর নামে এক স্থানে রাজা হ্যামলেটের কবর আছে। হ্যামলেট্‌কে নিয়ে একখানা বই আছে শেক্‌স্‌পীয়ারের লেখা।

মধ্যযুগে ডেনমার্ক বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সুইডেনও দখল করে নেয়। অবশ্য সুইডেনকে বেশীদিন ডেনমার্ক নিজ অধীনে রাখতে পারে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডেনমার্ক হিটলারের অধীনে চলে যায়। বর্তমানে ডেনমার্কে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

॥ নরওয়ে ॥

বহু শতাব্দীকাল স্বাধীন থাকার পর চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে নরওয়ে স্বাধীনতা হারিয়ে ডেনমার্কের অধীনে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নরওয়েতে সুইডেনের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ে ও সুইডেন পৃথক্ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী নরওয়ে দখল করে। যুদ্ধের পর অবশ্য নরওয়ে আবার লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে।

॥ পোর্তুগাল ॥

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পোর্তুগাল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে এক বিদ্রোহ হয়। তখন দেশবাসী রাজা দ্বিতীয় মানোয়েলকে অপসারিত করে। সেই থেকে পোর্তুগাল প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

পোর্তুগিজরা এক সময়ে ভারতে ব্যবসায় করতে আসে এবং ভারতবাসীদের উপর নানা অত্যাচার চালায়। পোর্তুগিজ জলদস্যুরা ('হার্মাদ') সেই সময়ে ভারতবাসীদের কাছে এক বিভীষিকার বস্তু ছিল। পোর্তুগিজরা স্পেনীয়, ব্রিটিশ, ফরাসী প্রভৃতিদের মতো আফ্রিকা ও এশিয়ার নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতের গোয়া, দমন ও দিউ পোর্তুগিজদের অধিকারে ছিল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ তিনটি উপনিবেশ ভারত-সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়।

॥ পোল্যাণ্ড ॥

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পোল্যাণ্ড ইওরোপের একটি শক্তিশালী দেশ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও জার্মানী পোল্যাণ্ডের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে দেশটি ভাগ করে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড আবার স্বাধীনতা ফিরে পায় এবং একটি মাত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের পর পোল্যাণ্ডের সীমানা নিয়ে বহু মতবিরোধ দেখা দেয়। অবশেষে কম্যুনিস্টরা দেশের শাসনভার গ্রহণ করে।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী মেরী কুরি জাতিতে পোল।

॥ সুইজারল্যাণ্ড ॥

সুইজারল্যাণ্ড মধ্য ইওরোপের একটি পর্বতবহুল দেশ। এ দেশ এক সময় রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এদেশ স্বাধীন হয়।

নিকোলাস কোপার্নিকাস

তারপর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সুইজারল্যাণ্ড একটি নিরপেক্ষ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এ দেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয়।

॥ ফিনল্যাণ্ড ॥

মধ্যযুগে ফিনল্যাণ্ড সুইডেনের অধীনে ছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এর এক বিশাল অংশ অধিকার করে নেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলেও ফিনল্যাণ্ড সেই স্থান ফেরত পায় না। তবে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এক মৈত্রী চুক্তি অনুসারে ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়া পরস্পরকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়। রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডকে কতকগুলি সামরিক ঘাঁটি ফেরত দেয়।

॥ বেলজিয়াম ॥

বেলজিয়াম বহুবার বিদেশী শক্তির অধীনে গিয়েছে। স্পেন, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স বহুবার বেলজিয়াম অধিকার করেছে। এজন্য বেলজিয়ামকে ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্র (The Cockpit of Europe) বলে। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম নেদারল্যাণ্ডের অধীনে চলে যায়।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামে স্বাধীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সৈন্য বেলজিয়ামে প্রবেশ করে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণ করে দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তবু ক্ষতির পরিমাণ কম হয় নি। বেলজিয়ামে এখনও রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

॥ হল্যাণ্ড ॥

নেদারল্যাণ্ডস হল্যাণ্ডের বর্তমান নাম। আগে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্ল্যাণ্ডার্সকে একসঙ্গে নেদারল্যাণ্ডস বলা হত। হল্যাণ্ড এক সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের সম্রাট্ পঞ্চম চার্লস তাঁর বাপ-ঠাকুরদার বৈবাহিক সূত্রে অস্ট্রিয়া, স্পেন প্রভৃতি সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তাঁর রাজত্বের পর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। হল্যাণ্ড

দ্বিতীয় ফিলিপ

তাঁর ছেলে স্পেনের শক্তিমান সম্রাট্ দ্বিতীয় ফিলিপের অংশে পড়ে। সেই সময়ে হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। তার ফলে গোঁড়া ক্যাথলিক দ্বিতীয় ফিলিপ ভয়ানক ক্ষুব্ধ হন এবং ডিউক আলভা নামে এক নির্মম অত্যাচারী ব্যক্তিকে সেখানে প্রধান শাসনকর্তা করে পাঠান।

ডিউক আলভা ওলন্দাজদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করতে লাগলেন। এর ফলে দেখা দিল হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম। প্রিন্স উইলিয়মের অধীনে হল্যাণ্ডবাসীরা স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। ইংল্যাণ্ড আর কিছু প্রোটেস্ট্যাণ্ট জার্মান রাষ্ট্র উইলিয়ামকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। এর ফলে স্পেন হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হল। হল্যাণ্ডে স্থাপিত হল সাধারণ-তান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা।

এর পর নানাদিক্ দিয়ে হল্যাণ্ডের উন্নতি শুরু হয়। তার নৌশক্তি সুদৃঢ় হয় আর পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা হয়। ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য শুরু করে। আন্তর্জাতিক আইনের জনক হিউগো গ্রোশিয়াস হল্যাণ্ডের অধিবাসী। সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজ চিত্রকর রেমব্রাণ্ড্ট্ (১৬০৬-১৬৬৯ খ্রীঃ) হল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার হল্যাণ্ড দখল করেন। যুদ্ধশেষে হল্যাণ্ড আবার স্বাধীনতা ফিরে পায়, কিন্তু পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তার উপনিবেশগুলি তাকে হারাতে হয়।

॥ আইসল্যাণ্ড ॥

আইসল্যাণ্ড উত্তর আটলাণ্টিকের একটি দ্বীপ-রাজ্য। মধ্যযুগে আইসল্যাণ্ড ডেনমার্কের অধীনে ছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ড আংশিক স্বাধীনতা ও ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

আইসল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। প্রায় এক হাজার ষাট বছর আগে এই পার্লামেণ্ট গঠিত হয়।

চিত্রকর রেমব্রাণ্ড্ট

॥ বলকান রাজ্যসমূহ ॥

কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম প্রান্তে বলকান পর্বতমালার নাম হতেই বলকান অঞ্চল নামের উৎপত্তি হয়েছে। এক রুমানিয়া বাদে অপরাপর বলকান দেশগুলি দানিয়ুব নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বলকান উপদ্বীপে এত বিভিন্ন জাতি, ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্ম ও জাতীয় আদর্শের সমাবেশ হয়েছে যে পৃথিবীতে বোধহয় আর কোন অংশে এরূপ দেখা যায় না।

প্রাচীনকালে বলকান অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এক শাসনাধীন রাজ্য ছিল। প্রথমে এই অঞ্চল বর্বর জাতিরা আক্রমণ করে। পরে উত্তর ইওরোপ থেকে সাভজাতীয় আক্রমণকারীরা আসে। প্রথমে সার্বরা এবং পরে সপ্তম শতাব্দীতে বুলগাররা এসে কিছু স্থান দখল করে নেয়। বলকান অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির মধ্যে কলহ ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তুর্কী জাতিরা চতুর্দশ শতাব্দীতে বলকান দেশগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমগ্র বলকান অঞ্চল তুরস্কের অধীনে চলে যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডের কতক স্থানও তুরস্কের অধিকারে আসে। কিন্তু তারপর থেকেই উদীয়মান রাশিয়ান শক্তির কাছে তুর্কীরা পরাজিত হতে আরম্ভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সার্বিয়া ও গ্রীস স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করে। রাশিয়া বলকান অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বাধা দেয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সূত্রে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার পরাজয়ে এই যুদ্ধ শেষ হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালেচিয়া ও মোল্ডাভিয়া এই দুটি প্রদেশ সংযুক্ত হয়ে রুমানিয়া নাম ধারণ করে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রুমানিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

ইতিমধ্যে বোসনিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং বুলগেরিয়াতে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা নির্দয়ভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। রাশিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে স্লাভজাতির পক্ষে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তুরস্ক রাশিয়ার সঙ্গে পেরে উঠল না। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধির শর্ত অনুসারে কয়েকটি বলকান রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকৃত হল। রাশিয়ার তাঁবেদারিতে নূতন প্রসারিত রাজ্য বুলগেরিয়া সৃষ্টি হল।

এই সন্ধিতে কিন্তু ইওরোপীয় অন্যান্য দেশ খুশী হল না। বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার ক্ষমতা বেড়ে যাক—এটা কেউ চাইল না। ফলে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর চাপে বার্লিনে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বৈঠক হয়। রাশিয়াকে দেওয়া হয় ককেসাস অঞ্চলের কিছু অংশ। সার্বিয়া আর মন্টিনিগ্রোর স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়। বুলগেরিয়াকে আয়তনে ছোট করে তার এক অংশের উপর তুরস্কের কর্তৃত্ব মেনে

নেওয়া হয়। ইংল্যাণ্ড সাইপ্রাস দ্বীপ লাভ করে। বোসনিয়া আর হার্জিগোভিনা অস্ট্রিয়ার অধিকারে চলে যায়।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বলকান অঞ্চলের ঘটনা জটিল। সার্বিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার বিরোধ বৃদ্ধি পায়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এদিকে ক্রীট-নেতা ভেনিজিলসের নেতৃত্বে বলকান-সংঘ গঠিত হয়। তুরস্কবিরোধী এই সংঘে গ্রীস, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও বুলগেরিয়া যোগদান করে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে বলকান-সংঘের যুদ্ধ বাধে। তুরস্ক একের পর এক যুদ্ধে হেরে যেতে থাকে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ বোসনিয়ার রাজধানী সিরাজিভো নগরীতে এক সার্ব বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। বুলগেরিয়া, তুরস্ক, জার্মানী অস্ট্রিয়ার পক্ষে আর সার্বিয়া, রুমানিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই শান্তি-চুক্তি দ্বারা মূল বলকান অঞ্চলে যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া ও গ্রীস এই তিনটি বড় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সার্বিয়া, বোসনিয়া, হার্জিগোভিনা প্রভৃতি রাষ্ট্র পড়ে। এছাড়া চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। হাঙ্গেরী আর অস্ট্রিয়া ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। পোল্যাণ্ড আবার স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর বলকান অঞ্চলের সব দেশই হিটলারের অধীনে চলে যায়। যুদ্ধের শেষ দিকে যখন জার্মানী পরাজয়ের মুখে তখন আবার সোভিয়েট-বাহিনী এই সব দেশ জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত করে। কিন্তু তারা কম্যুনিস্ট শাসন-ব্যবস্থা প্রচলন করবার চেষ্টা করে। বলকান অঞ্চলে শাসন-ব্যবস্থা নিয়ে শুরু হয় আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য।

মার্শাল টিটো

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে যুগোশ্লাভিয়া জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত হয় এবং ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্শাল টিটো যুগোশ্লাভিয়ার শাসনভার গ্রহণ করেন। যুগোশ্লাভিয়ায় কম্যুনিস্ট শাসন হলেও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তাদের ভাল নয়। এই দেশ ওয়ার-স চুক্তির সদস্য নয়।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চেকোশ্লোভাকিয়ায় এক কম্যুনিস্ট শাসন-ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। অ্যাণ্টোনিন নভোটনি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চেক-রাষ্ট্রের সভাপতি হন। ১৯৬৭-১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সরিয়ে আলেকজাণ্ডার ডুশেচককে শাসনভার দেওয়া হয়। ডুশেচক ছিলেন উদারপন্থী। তিনি শাসন-নীতির সংস্কার শুরু করলে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে রাশিয়া সৈন্য পাঠিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে আবার পুরনো নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করায়।

রুমানিয়ায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই কম্যুনিস্ট

শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরেই সেটি রাশিয়ার ওয়ার-স চুক্তি-ভুক্ত একটি দেশে পরিণত হয়।

আলবানিয়াতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কম্যুনিস্ট শাসন শুরু হয়। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে সে-দেশের সদ্ভাব নেই। আলবানিয়া চীন-পন্থী কম্যুনিস্ট চিন্তাধারায় বিশ্বাসী।

বুলগেরিয়ায় কম্যুনিস্ট শাসন প্রচলিত এবং এদেশ ওয়ার-স চুক্তিভুক্ত একটি রাষ্ট্র।

হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার ধরনে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে এক প্রচণ্ড জন-বিক্ষোভ হয়। রাশিয়া বিশাল ট্যাঙ্কবাহিনী পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করে। হাঙ্গেরী বর্তমানে ওয়ার-স চুক্তি পক্ষভুক্ত একটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র।

যোরিতোমো

॥ জাপান ॥

এশিয়া মহাদেশের পূর্ব সীমান্তে জাপান। নিজেদের দেশকে জাপানীরা 'দাই নিপ্পন' বা 'উদীয়মান সূর্যের দেশ' বলে অভিহিত করে। জাপানের প্রাচীন ধর্মের নাম 'শিন্তো ধর্ম'। পরে বৌদ্ধধর্মও জাপানে প্রচলিত হয়। ওদের সম্রাট্‌কে বলা হয় 'তেন্নো' বা 'মিকাডো'। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাকি জিম্মু তেন্নো (৬৬০ খ্রীঃ পূঃ)।

জাপানে প্রথমে শাসন করেছে শোজা বংশ, এরপর ফুজিওয়ারা বংশ শাসন শুরু করে। কিন্তু জাপানের প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল 'দাইমিও' আর 'সামুরাই' নামক যোদ্ধাদের হাতে। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'যোরিতোমো' নামে একজন দাইমিও খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলে সম্রাট্ তাকে 'শোগান' বা প্রধান সেনাপতি উপাধি দান করেন। এই 'শোগান' উপাধি উত্তরাধিকার-সূত্রে চলতে থাকে। প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা শোগানের হাতে চলে আসে। বিভিন্ন বংশের 'শোগান'রা জাপান শাসন শুরু করেন। এঁদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'ইযেজাশু'র প্রতিষ্ঠিত 'তোকুগাওয়া' শোগান বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বংশেরই একজন শোগান নিয়ম করেছিলেন যে, কোনও বিদেশী জাপানে ঢুকতে পারবে না এবং কোনও জাপানী বিদেশে যেতে পারবে না। এইভাবে জাপান বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দেশের মধ্যে শান্তি অবশ্য বজায় থাকে।
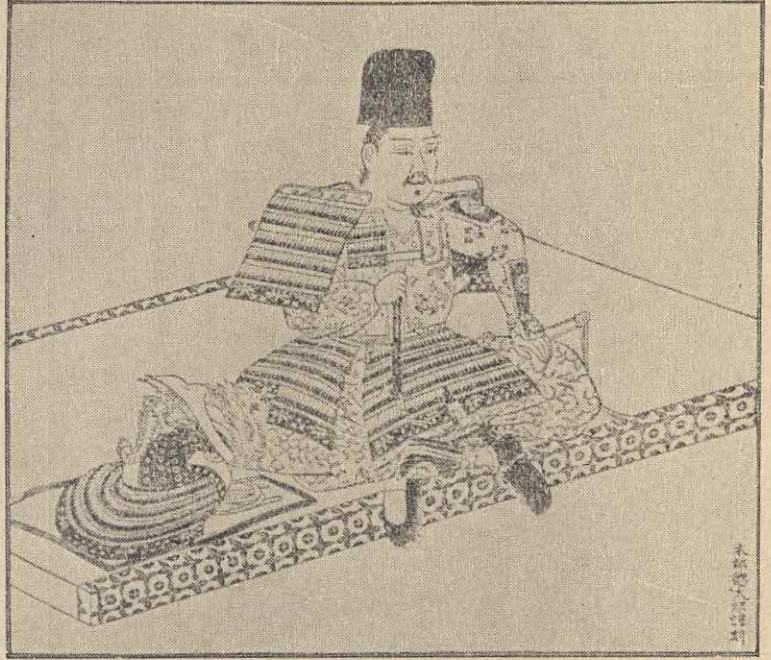
১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার এক নৌ-সেনাপতি, কমোডোর পেরী, জোর করে জাপানে অবতরণ করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পেরী জাপানের সঙ্গে এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করেন। দেখাদেখি অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলি জাপানে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধে নিতে আরম্ভ করে। দেশের মধ্যে শোগান-শাসনে অর্থনৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি হয় এবং জনসাধারণের অসন্তোষও বেড়ে চলে। ফলে

মুৎসুহিতো

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শোগান ক্ষমতা ত্যাগ করেন ও সম্রাট্ পূর্ণ ক্ষমতায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। সঙ্গে সঙ্গে জাপানে শুরু হয় 'মেইজি' বা নবযুগ। এই যুগের প্রথম সম্রাট্ মুৎসুহিতো (১৮৬৭-১৯১২)।

১৮৯৪-১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার উপর আধিপত্যের প্রশ্ন নিয়ে জাপানের সঙ্গে চীনের এক যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে জাপান সহজেই জয়লাভ করে। এর ফলে ফরমোজা বা তাইওয়ান দ্বীপে জাপানী অধিকার স্থাপিত হয়। জাপানের এই শক্তিবৃদ্ধি রাশিয়া কিন্তু ভাল চোখে দেখে নি। জাপান যাতে চীনের কাছ থেকে বেশী সুযোগ-সুবিধে না পায় সেইদিকে রাশিয়ার দৃষ্টি ছিল। জাপানও বুঝতে পারে যে রাশিয়া জাপানের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯০৪-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়ার উপর অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও জাপান জয়লাভ করে। এর ফলে পোর্ট আর্থার দ্বীপ জাপানের অধিকারে আসে আর কোরিয়াতে জাপানী প্রভাব স্থাপিত হয়।

পর পর দুটো যুদ্ধে জয়লাভ করে জাপান এবার রাজ্যজয়ের স্বপ্নে মেতে ওঠে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের উপর '২১ দফা' দাবি চাপায় ও তার অনেক দাবি চীনকে মেনে নিতে বাধ্য করে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন কনফারেন্সে জাপানের অগ্রসরনীতি বন্ধ করবার এক চেষ্টা করা হয়। সে চেষ্টা সাময়িকভাবে সফল হলেও জাপান আবার ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। বহুদেশের মৌখিক নিন্দা সত্ত্বেও জাপান কয়েক বছরের মধ্যেই মাঞ্চুরিয়া দখল করে তথায় তাঁবেদার 'মাঞ্চুকুয়ো' সরকার স্থাপন করে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। একের পর এক চীনা প্রদেশগুলি জাপানী অধিকারে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর জাপান অতর্কিতে আমেরিকার অধিকারভুক্ত প্রশান্ত মহাসাগরের পার্ল হারবার বন্দরে বোমা বর্ষণ করে। জাপান ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে ব্রিটেন ও আমেরিকা একযোগে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে। জাপানীরা প্রথম দিকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রায় সব দেশই দখল করে নেয়। এমন কি, জাপানী বিমান কলকাতাতেও বোমা বর্ষণ করে।

পলাশীর যুদ্ধ।

ইতিহাসের কথাঃ

[পলাশীর যুদ্ধ]

ইংলণ্ড থেকে একদল ইংরেজ ভারতে আসে বাণিজ্য করতে। তাদের কোম্পানির নাম ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।

প্রথম প্রথম তারা বাণিজ্য নিয়ে মেতে থাকলেও ক্রমশঃ তাদের মনে এ দেশ জয় করে শাসন করার স্পৃহা জাগে।

বাংলার শেষ নবাবের নাম সিরাজ-উদ্দৌলা। তিনি ইংরেজদের বাধা দিতে মনস্থ করেন।

তাঁর সৈন্যদলের সঙ্গে পলাশীতে ইংরেজ-দের যুদ্ধ হয়। পলাশী বর্তমানে নদীয়া জেলার একটি স্থান। সিরাজউদ্দৌলার আমলে পলাশী মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ছিল।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীতে যুদ্ধ বাধে। ইংরেজ পক্ষে সেনাপতি ছিলেন লর্ড ক্লাইভ। যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন।

এই থেকে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হয়।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পলাশীতে যুদ্ধ চলছে।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর পতনের পর অবশ্য জাপানী সৈন্যদলের দ্রুত পরাজয় ঘটতে থাকে। অবশেষে রাশিয়াও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আমেরিকা হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলে জাপান ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে।

যুদ্ধ বিরতির পর জাপানের সম্রাট্‌কে সিংহাসনে রাখা হয়, তবে, যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাঁর মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার জেনারেল ম্যাক-আর্থারের নির্দেশে এক নতুন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র জাপানে প্রচলিত হয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে এপ্রিল জাপান আবার স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। সে রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে জাপান বিশ্ব-যুদ্ধের ধ্বংসের পরে দেশের উন্নতিসাধন করেছে ও করছে।

॥ ব্রহ্মদেশ ॥

প্রাচীনকালে ব্রহ্মদেশ দুটি ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই দুই রাজ্যের মধ্যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না, তবে শক্তিশালী রাজারা উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্ম একত্র করে শাসন করেছেন। ভারতের পূর্ব-সীমান্তে ব্রহ্মদেশের রাজারা হানা দিয়েছেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে পোর্তুগিজদের সাহায্যে এক শক্তিশালী রাজবংশ ব্রহ্মের সিংহাসনে বসে। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে নতুন এক রাজবংশের নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ভারতের আসাম অঞ্চলে হানা দেবার জন্য ১৮২৪-১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ হয় ও ব্রহ্মদেশ পরাজিত হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় এক যুদ্ধের পর পেগু ব্রিটিশ অধিকারে আসে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ব্রিটিশ-বার্মা যুদ্ধের ফলে রাজা থিবোকে সিংহাসনচ্যুত করে সমস্ত বার্মা ব্রিটিশরা অধিকার করল।

বার্মা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা বার্মা অধিকার করে নেয়, যুদ্ধের শেষে জাপান পরাজিত হলেও আবার পূর্বের মতো ব্রিটিশ অধিকার স্থাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জানুয়ারি ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশে নানারূপ বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক শাসনও প্রবর্তিত হয়েছিল। এই ভাবে বিভিন্ন গোলযোগের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মদেশের শাসনকার্য এগিয়ে চলেছে।

॥ শ্রীলঙ্কা (সিংহল) ॥

ভারতের মহাকাব্যে সিংহলের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীনকালে গাঙ্গেয় উপত্যকা ও দক্ষিণ ভারত থেকে বহু লোক গিয়ে সিংহলে বসবাস শুরু করে। তারাই বর্তমান সিংহলীদের পূর্বপুরুষ। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসের বইয়ে লেখা আছে যে ভারতের রাঢ়দেশ থেকে রাজা সিংহবাহুর ছেলে বিজয়সিংহ বুদ্ধদেবের সময়ে সাতশো সঙ্গীসহ এসে সিংহল জয় করে রাজা হয়েছিলেন। ষোড়শ শতকে পোর্তুগিজ ও ওলন্দাজরা সিংহলের একাংশ অধিকার করে। ইংরেজরাও লোভ সামলাতে পারে না। সিংহলের উপর প্রভাব বিস্তার করে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলকে তারা ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

ভারত. ইংরেজ-শাসনমুক্ত হওয়ার পরও সিংহল কয়েক বছর ইংরেজের অধীনে ছিল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সিংহল স্বাধীনতা অর্জন করে। এই দেশ ভারতের মতো সাধারণতন্ত্রী হলেও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য। সিংহল বর্তমানে 'শ্রীলঙ্কা' নামে পরিচিত।

॥ নেপাল ॥

নেপাল প্রাচীনকাল থেকেই এক স্বাধীন হিন্দু রাজ্য হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নেপালে রাজতন্ত্র বর্তমান। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের সঙ্গে ইংরেজের এক চুক্তি হয় ও তার শর্ত অনুযায়ী নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে

একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি রাখতে নেপাল সম্মত হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নেপালের শাসনভার ছিল 'জংবাহাদুর রানা' উপাধিধারী প্রধান-মন্ত্রীর হাতে। এই প্রধানমন্ত্রীকে বলা হত "মহারাজা" আর রাজাকে বলা হত "মহারাজাধিরাজ"। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি রাজা ত্রিভুবন নেপালে এক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তাঁর পুত্র রাজা মহেন্দ্র ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলন করেন। তখন থেকে রানাশাহীর অবসান ঘটে।

॥ মঙ্গোলিয়া ॥

চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গোলিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। চতুর্দশ শতকে মঙ্গোলিয়া দুর্বল হয়ে চীনের আধিপত্য মেনে নেয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়া প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্তমানে মঙ্গোলিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব প্রচুর।

॥ আফগানিস্তান ॥

পারস্য ও ভারতবর্ষের মধ্যে আফগানিস্তান অবস্থিত বলে আফগানিস্তানের সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট। প্রাচীনকালে আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মধ্যযুগে আফগানিস্তানে মুসলমান শাসন স্থাপিত হয়। ঐ অঞ্চলের গজনী রাজ্যের সুলতান মামুদ আজ থেকে প্রায় ৯৫০ বছর আগে ১৭ বার উত্তর ও পশ্চিম ভারতে লুটপাট করেছিলেন। তারপর ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ওখানকার ঘুর-রাজ্যের রাজা শিহাবুদ্দিন মুহম্মদ ঘুরী উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করেন, যার ফলে ক্রমে ক্রমে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন স্থাপিত হলে লর্ড অকল্যাণ্ড আফগানিস্তানকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু যুদ্ধে ইংরেজবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। লর্ড লিটনের সময় আর একবার আফগানিস্তানকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করবার বিফল চেষ্টা করা হয়। অবশেষে আমীর আবদুর রহমান কাবুলে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখতে

লর্ড লিটন

সম্মত হন। আবদুর রহমানের পর আমানুল্লা আফগানিস্তানের রাজা হন। তাঁর সময় ইংরেজদের সঙ্গে আবার বিবাদ বাধে। তবে আফগানিস্তান এবার পরাজিত হয়। আমানুল্লাকে তাড়িয়ে বাচ্চা-ই-সাকো অল্পদিন রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু তিনিও বিতাড়িত হন। বর্তমানে আফগানিস্তান পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে।

॥ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ॥

১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপাইনে স্পেনীয় শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্পেনের মধ্যে এক শান্তি-চুক্তির ফলে ফিলিপাইন আমেরিকার অধীনে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান এই অঞ্চল দখল করে। জাপান পরাজিত হলে আমেরিকা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ফিলিপাইনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইহা প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

॥ নিউ-জীল্যাণ্ড ॥

নিউ-জীল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীদের নাম মাওরি। ১৭৬৯-১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন কুক নিউ-

জীল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন। এরপর ইংরেজরা এসে এখানে বসবাস শুরু করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউ-জীল্যাণ্ড ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে নিউ-জীল্যাণ্ড ব্রিটিশ সরকারের ডোমিনিয়ন মর্যাদাভুক্ত দেশের মধ্যে অন্যতম।

॥ অস্ট্রেলিয়া ॥

১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকজন ওলন্দাজ নাবিক অস্ট্রেলিয়ার সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন কুক অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করে আরও অনেক তথ্য জানতে পারেন। ক্রমে এখানে ব্রিটিশ উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্যতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া সিয়েটো (SEATO) এবং অ্যানজুস চুক্তি (ANZUS PACT)-র অন্যতম সদস্য।

॥ ইরাক ॥

ইরাক দেশটাকে গ্রীকরা নাম দিয়েছিল 'মেসোপোটেমিয়া' অর্থাৎ "(দুই) নদীর মাঝখানের (দেশ)"। এই দুই নদী হল টাইগ্রিস (দজলা) আর ইউফ্রেটিস (ফোরাত)। খ্রীষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগে এর দক্ষিণ অংশের উর, ব্যাবিলন প্রভৃতি শহরকে কেন্দ্র করে সুমেরীয় সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল।

আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে বিস্তীর্ণ আরব সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বাগদাদ শহর এই ইরাকেরই মধ্যে অবস্থিত ছিল। আব্বাসীয়রা দুর্বল হয়ে পড়লে তুর্কী-সম্রাট্ সুলেমান ইরাক জয় করে এই রাজ্যকে তুরস্কের অধীনে নিয়ে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইরাককে তুরস্কের অধীনতা থেকে মুক্ত করে ইংল্যাণ্ডের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফৈজল ইরাকের রাজা হন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রীসহ ফৈজল নিহত হন। জেনারেল কাসেম ক্ষমতা অধিকার করেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থানের ফলে কাসেমও প্রাণ হারান। ইরাকে সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় দ্রুত শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইরাকের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট আহমেদ আব্বাস আল-বক্‌র্ ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই পদে আছেন।

॥ জর্ডন ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জর্ডনও অটোমান (তুর্কী) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্ডন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হুসেন জর্ডনের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তখনও দেশের

দ্বিতীয় ফৈজল

রাজা হুসেন

মধ্যে বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে। দলাদলি, রাজনৈতিক হত্যা প্রভৃতিতে বিব্রত হয়ে হুসেন ইংরেজের সাহায্য চান। ফলে ব্রিটিশ সৈন্যদলকে শান্তিরক্ষার জন্য জর্ডনে নিযুক্ত করা হয়।

পুরাতন জেরুজালেম নগরী জর্ডনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল কিন্তু ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর ইহা ইজরেলের অধীনে চলে যায়। জর্ডন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়। বর্তমানে ইরাকের সঙ্গে জর্ডন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

॥ ইজরেল ॥

ইহুদী (Jew) জাতির দেশ ছিল প্যালেস্টাইনে। আরবজাতীয় মুসলমানরা সে দেশ নিয়ে নেয়, ইহুদীরা পৃথিবীর নানাদেশে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু নিজেদের দেশ ফিরে পাবার জন্যে তারা এক আন্দোলন শুরু করে (Zionist Movement). ওয়াইজম্যান বলে একজন ইহুদী বৈজ্ঞানিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সমস্ত ইংরেজ জাতির একটা মস্ত উপকার করেন। তিনি ইংরেজ গভনমেণ্টকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে ইংরেজ সরকার এ বিষয়ে ইহুদীদের সাহায্য করবে। যুদ্ধ শেষে ইংরেজের সাহায্যে প্যালেস্টাইনের খানিকটা জায়গা ইহুদীদের দেওয়া হল। নানাদেশ থেকে দলে দলে ইহুদী সেখানে এসে একটি নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুললো। তার নাম হল ইজ্‌রেল (Israel). এ হলো ১৯৪৮-এর ১২ই মে তারিখে। কিন্তু আরবরা কখনও এটাকে মেনে নেয় নি। ফলে সিরিয়া, ইজিপ্ট, ইরাক, লেবানন, সৌদি-আরব ও জর্ডন একযোগে ইজরেল আক্রমণ করে। কিন্তু যুদ্ধে তারা জয়লাভ করতে পারে না। রাষ্ট্র-সংঘের হস্তক্ষেপের ফলে সাময়িকভাবে শান্তি ফিরে আসে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইজরেল ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের প্ররোচনায় হঠাৎ মিশরের সিনাই আর গাজা অঞ্চল দখল করে নেয়, কিন্তু অন্যান্য দেশের প্রতিবাদে এবং রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের ফলে এসব ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় তারা। আবার আরবদের সঙ্গে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে যুদ্ধ বাধে। সমস্ত আরব দেশগুলি একজোট হয়ে ইজরেল আক্রমণ করে। এবারও তারা ইজরেলের কাছে পরাজিত হয়। জর্ডনের কাছ থেকে জেরুজালেম, মিশরের কাছ থেকে সিনাই ও গাজা ইজরেল দখল করে নেয়। আরব-ইজরেল বিবাদ এখনও থামে নি।

॥ ইরান ॥

ইরানের আর এক নাম ফার্স (পারস্য)। ৫৪৯ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে কাইরাস বা সাইরাস বা কুরুষ (Cyrus) নামে এক বিখ্যাত যোদ্ধা পারস্য জয় করে একিমিনিড বংশ স্থাপন করেন। কাইরাস এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু অংশ দখল করেন।

রাজা দরায়ুসের (Darius) সময় পারস্য সাম্রাজ্য আরও বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল এক বিস্ময়ের বস্তু। দরায়ুসের ও তাঁর ছেলে জারেকসেসের গ্রীস জয়ের বৃথা চেষ্টার কথা গ্রীসের কথায় বলেছি।

গ্রীসদেশ জয় করা আর পারসিকদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। বরং এর দেড়শো বছর বাদে ৩৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করে তার রাজধানী পার্সিপলিস শহর জ্বালিয়ে ধ্বংস করেন।

একিমিনিড বংশের রাজত্বকালে পারস্যে শিল্প-সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। এর পর আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকস ইরানে এক গ্রীক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সময়ে পারসিক সভ্যতা গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে উন্নততর হয়। এরপর স্থাপিত হয় সাসানিড রাজবংশ। এই রাজবংশের সময় পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্যের সঙ্গে বহুকালব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে।

ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থানের পর ইরান আরব অধিকারে চলে যায়। এর পর তুর্কীরা এসে ইরান অধিকার করে। তুর্কী শাসনের সময়ে পারসিক সাহিত্য খুব উন্নতি লাভ করেছিল। ওমর খৈয়াম, হাফেজ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কবির আবির্ভাব খুবই উল্লেখযোগ্য। এঁদের

ওমর খৈয়াম

কথা 'বিশ্বসাহিত্যের কথা' অধ্যায়ে বলা হয়েছে। তৈমুর এবং তাঁর বংশধরদের শাসনের সময়েও পারসিক শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি অব্যাহত থাকে।

১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে সাফাভি বংশ ইরানের সিংহাসনে বসে। সেই সময়ে ইরানের চরম উন্নতি হয়েছিল। সেই বংশের পতনের পর পরম অত্যাচারী ও নৃশংস নাদির কুলি খাঁ নাদির শাহ্ নাম নিয়ে সিংহাসন দখল করেন। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ভীষণ অত্যাচার করেছিলেন এবং অনেক ধনরত্ন ও ময়ূর সিংহাসন নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশীদিন রাজত্ব করা নাদির শাহের পক্ষে সম্ভব হয় নি —নিজের অনুচরদের হাতেই তিনি নিহত হন।

পরবর্তী কালের পারস্যের ইতিহাস শুধু গৃহবিবাদ ও দুর্নীতির কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ইতিমধ্যে ইরানে অনেকগুলি তৈলখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় ইংরেজদের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে। দুর্বল শাসনের সুযোগ নিয়ে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা ইরানের দক্ষিণ দিক্ অধিকার করে নেয়। রাশিয়া নিজ স্বার্থে ইরানের উত্তর দিক্ দখল করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরানের নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও ইরানবাসীরা শান্তিতে থাকতে পারল না। ইতিমধ্যে ইংরেজরা ইঙ্গ-ইরানীয় তৈল কোম্পানি গঠন করে ইরানকে শোষণ করতে লাগল।

জাতির এই চরম দুর্দিনে রেজা খাঁ ইরানের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি বাতিল করে দিলেন। রাশিয়াও ইরানের উত্তর ভাগ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। রেজা খাঁ ইরানের শাহ্ নির্বাচিত হলেন। সিংহাসনে

নাদির শাহ্

রেজা খাঁ
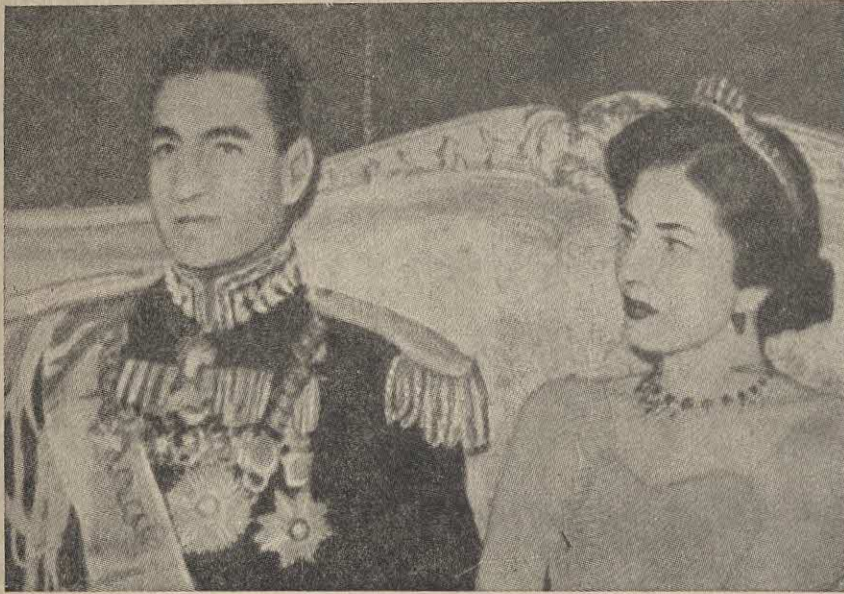
বসবার পর তাঁর নাম হল মহম্মদ রেজা শাহ্ পাহ্লবী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী প্রবল হয়ে উঠলে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া ইরানে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিল। তাদের উদ্দেশ্য জার্মানী যাতে ইরানকে কবলিত করতে না পারে এবং এখানে তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। রেজা শাহ্ তাতে বাধা দিয়ে ব্যর্থ হলে সিংহাসন ত্যাগ করলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নানারকম গোলমাল দেখা দেয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইরান তার সমস্ত তৈলখনি জাতীয়করণ করে। এর ফলে গোলমাল আরও বেড়ে যায়। কম্যুনিস্ট-ভাবাপন্ন দল আর কম্যুনিস্ট-বিরোধী দলের মধ্যে ক্ষমতা অধিকার করার জন্য দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ইরান বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

॥ আরব দেশ ॥

সম্পূর্ণ আরব দেশটাই মরুভূমি। অনেককাল এই দেশ অন্য সব দেশ থেকে পিছিয়ে ছিল। আরবের অধিবাসীরা বিভিন্ন জাতি, দল ও উপদলে বিভক্ত ছিল। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ দেহত্যাগ করেন। তারপর আরবের ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক সব ক্ষমতাই খলিফাদের হাতে চলে যায়। মুসলমানদের ধর্মগুরুকে বলা হত 'খলিফা'। জেরুজালেম, সিরিয়া, মিশর—প্রায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান ধর্ম স্থাপিত হয়। স্পেন ও পর্তুগালও তারা জয় করে। ফ্রান্সে তারা ঢুকতে পারে নি—ফ্রান্সের বীর চার্লস মার্টেলের কাছে টুরসের যুদ্ধে ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তারা পরাজিত হয়। এর ফলে সমস্ত ইওরোপ মুসলমান অধিকারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চলও আরবদের অধিকারে চলে যায়। বিশাল অঞ্চল জুড়ে আরব বা সারাসেন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।

প্রথমে উম্মায়েদ বংশ ও পরে আব্বাসিদ বা আব্বাসীয় বংশ এই রাজ্য শাসন করে। আব্বাসীয় আমলে সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী হয় ইরাকের বাগদাদ। খলিফাদের মধ্যে হারুন-অল্-রসিদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। শাসনকার্য পরিচালনায় তাঁর খুব সুনাম ছিল। তাঁকে এবং তাঁর সময়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরব্য উপন্যাসের অনেক গল্প গড়ে উঠেছে।

খলিফাদের শাসনকালে মধ্য এশিয়ায় ও মুসলমান অধিকৃত ইওরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছিল।

হারুন-অল্-রসিদের মৃত্যুর পর আরব সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে সেলজুক-তুর্কীরা আরব দখল করে। তুর্কী সুলতানই খলিফা হন।

হারুন-অল্-রসিদ

এসে বসবাস শুরু করে। তার দক্ষিণেই আরবদের দেশ। আরবরা মুসলমান, তাদের সংস্পর্শে এসে তুর্কীরাও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। তারা নিজ ক্ষমতাবলে ধীরে ধীরে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। যে তুর্কীরা বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে তাদের নাম অটোমান-তুর্কী। তার আগে যারা আরবদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিল তারা হল সেলজুক-তুর্কী।

অষ্টাদশ শতকে তুরস্কের পতন আরম্ভ হয়। রাশিয়া তুরস্কের একাংশ অধিকারের চেষ্টা করে। ফলে রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের বার বার বিরোধ বাধে। ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলি রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি সুনজরে দেখত না—ফলে তারা তুরস্ককে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই তুরস্কের একাংশের উপর রাশিয়ার কর্তৃত্ব নিয়ে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তুরস্কের

এদের মধ্যে সুলতান সালাদিন (১১৩৭-১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণে সেলজুক-তুর্কীর অধিকার নষ্ট হয়।

এর পরেই আরব সাম্রাজ্য অটোমান তুর্কীদের অধীনে চলে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলেছিল। বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় আরবরা তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও সিরিয়া জয় করে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজদের সাহায্যে ইবন সৌদ সমগ্র আরবদেশ অধিকার করে নেন। ইবন সৌদ বিচ্ছিন্ন আরবকে ঐক্যবদ্ধ করেন ও তার নাম দেন সৌদি-আরব। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইবন সৌদ মারা যান। বর্তমানে তাঁর বংশধররা আরবদেশ শাসন করছেন।

॥ তুরস্ক ॥

তুর্কী নামক একটা যাযাবর জাতি নানা জায়গায় বাস করার পর ভূমধ্যসাগরের তীরে আনাতোলিয়ায়

ইবন সৌদ

পক্ষে যোগদান করার ফলে রাশিয়া এই যুদ্ধে বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি। কিন্তু তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে তার অধীন বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, বোসনিয়া, হার্জিগোভিনা সব স্বাধীন হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বলকান-সংঘ স্থাপিত হয়। এই বলকান সংঘের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তুরস্কের বিরোধ বাধে ও তুরস্ক পরাজিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয়। তখন ইংরেজসৈন্য তুরস্ক-অধিকৃত আরব অঞ্চলে গিয়ে তা তুর্কী অধিকার মুক্ত করে। ইংরেজরা কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের চেষ্টা করলে তুর্কীরা ইংরেজদের সঙ্গে সেভাসের সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এর ফলে মিশর আর আরব দেশগুলির উপর তুরস্কের সব অধিকার চলে গেল। ইওরোপেও তুরস্ক বহুস্থান হারাল।

জাতির এই দুর্দিনে মুস্তাফা কামাল (১৮৮০-১৯৩৮ খ্রীঃ) নামে এক যুবক দেশ উদ্ধারে এগিয়ে এলেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে আনকারা শহরে এক সরকার স্থাপন করে তুরস্কের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এতে খুব খুশী হল না। তারা গ্রীসকে তুরস্ক আক্রমণ করবার জন্য চাপ দিতে লাগল। গ্রীকরা তুরস্ক আক্রমণ করে আনকারা জয়ের আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু মুস্তাফা কামাল নিজের গঠিত সৈন্যদের নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে গ্রীকদের হারিয়ে দিলেন।

মুস্তাফা কামাল

এরপর কামাল জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে দেশের সংস্কার সাধন করতে শুরু করলেন। সুলতান দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রী দেশ বলে ঘোষিত হল। জাতীয় পরিষদের চাপে মিত্রশক্তিবর্গ সেভার্সের সন্ধি পালটাতে বাধ্য হল। আলবানিয়া, থ্রেস, কনস্টান্টিনোপল তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত—তা না মেনেও মিত্রশক্তির উপায় রইল না। এ ছাড়া কামাল নিজে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বহু শাসনতান্ত্রিক আর উদারনৈতিক সংস্কার করলেন। তুরস্ক মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে এসে পড়ল। কৃতজ্ঞ দেশবাসীরা কামালকে বলতো 'আতাতুর্ক' অর্থাৎ তুর্কী জাতির পিতা। সাধারণতঃ তিনি কামাল পাশা নামে প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক প্রথম দিকে কোনও পক্ষ অবলম্বন করে নি। তবে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সে জার্মানী আর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।
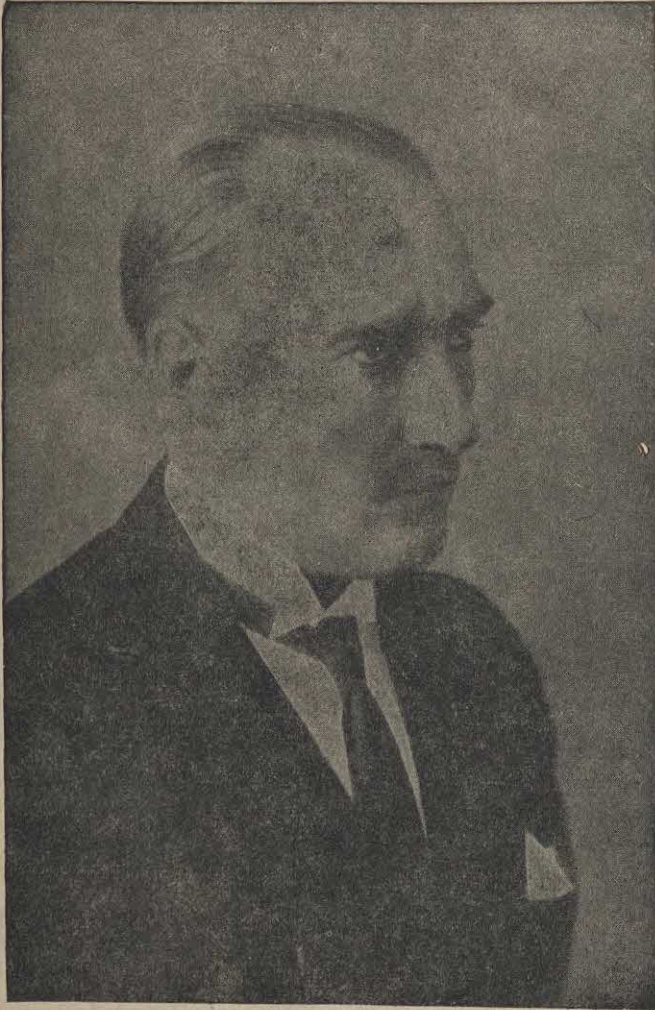
মহাযুদ্ধের পরে তুরস্কে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতালাভের চেষ্টা করলে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুমান এক ঘোষণার দ্বারা তুরস্ককে বহু অর্থ সাহায্য করেন। বর্তমানে তুরস্ক উত্তর আটলান্টিক চুক্তি-সংস্থার সদস্য ও কম্যুনিস্টবিরোধী একটি রাষ্ট্র।

আঙ্কোরভাট

॥ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ॥

যুগে যুগে ভারতীয় বণিক আর ধর্মপ্রচারকেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে গিয়েছে। ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই সেখানে বসতি স্থাপন করে ও সেখানকার বাসিন্দা হয়ে যায়। ফলে ঐ সব স্থানের সভ্যতার উপর হিন্দুসভ্যতার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে।

ভারতীয় ঔপনিবেশিকরা অনেক বড় বড় সাম্রাজ্যও স্থাপন করেছিল। এর মধ্যে ইন্দোচীন, চম্পা ও কম্বোজ রাজ্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কম্বোজ রাজ্য ষষ্ঠ শতকে প্রাধান্য লাভ করে। কম্বোজ রাজাদের সময়েই বিশ্ববিখ্যাত আঙ্কোরভাট মন্দির আর আঙ্কোরথোমের বায়ন মন্দির নির্মিত হয়।

ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ এবং সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলিকে ভারতবাসীরা সুবর্ণভূমি নামে অভিহিত করত। অষ্টম শতাব্দীতে সুবর্ণভূমির এক বিশাল অংশে শৈলেন্দ্র রাজবংশ ক্ষমতায় আসে। এই বংশের রাজাদের সঙ্গে বাংলার পাল রাজাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। চীনের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজাদের বহু দূত বিনিময় হয়েছে। নবম ও দশম শতাব্দীতে চোল রাজাদের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজাদের বিরোধ বাধে—দক্ষিণ ভারতের চোল রাজারা সুবর্ণভূমির বহুস্থানে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করেন। এর পরেও শৈলেন্দ্র রাজবংশ কয়েক শতাব্দী টিকে ছিল। তবে চতুর্দশ শতকে থাই জাতির আক্রমণে তাদের পতন ঘটে। শেষ হিন্দু রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। শৈলেন্দ্র রাজাদের আমলে শিল্পের চরম উন্নতি হয়। যবদ্বীপের বিশ্ববিখ্যাত বোরোবুদুর মন্দির ঐ রাজত্বকালেই নির্মিত হয়।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুরাজ্যগুলির পতনের সুযোগ নিয়ে মুসলমানগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজ ক্ষমতা ও ধর্ম বিস্তার করে। ক্রমে সুমাত্রা ও মালাক্কার অধিবাসীরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু মুসলমানরা বেশীদিন রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে রাখতে পারল না। পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজরা এসে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ ক্ষমতা স্থাপন করতে লাগল। ইংরেজ ও পর্তুগিজরা শেষ পর্যন্ত বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। ফলে ওলন্দাজরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে শাসন শুরু করল। তাদের সম্মিলিত নাম হল ডাচ্ ঈস্ট ইণ্ডিজ, অর্থাৎ ওলন্দাজ পূর্ব-ভারত।

বিংশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদ ঐ অঞ্চলে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান এই সব স্থান দখল করে। জাপানের পতনের পর স্থানীয় অধিবাসীরা আরও দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সুকর্ণর নেতৃত্বে ওলন্দাজ উপনিবেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বিভিন্ন যুদ্ধের পর
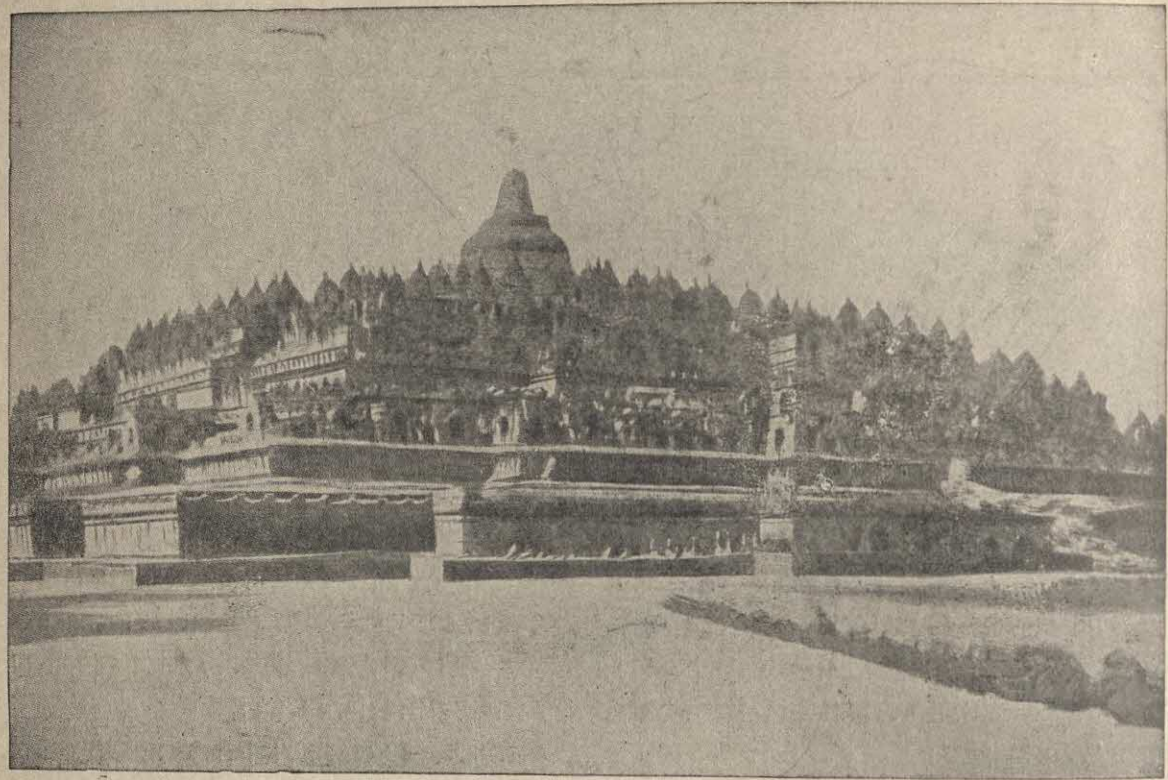
বোরোবুদুর

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর ওলন্দাজ উপনিবেশের অবসান হয়—নতুন রাষ্ট্রের নাম হয় ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র। এর রাষ্ট্রপতি হন ডঃ সুকর্ণ। ইন্দোনেশিয়া এশীয়-আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সংহতি আনবার চেষ্টা করিতে থাকেন। পরবর্তী কালে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি হন কর্নেল সুহার্তো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বর্তমান লাওস, কম্বোডিয়া, কোচীন-চীন নিয়ে ফ্রান্সের ইন্দোচীন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ইন্দোচীন অধিকার করে নেয়। ইতিমধ্যে ফরাসী অধিকারের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনে জাতীয়তাবাদী চেতনা শক্তিলাভ করতে থাকে। জাপানীরা চলে গেলে ডঃ হো চি-মিন (১৮৯২-১৯৬৯ খ্রীঃ) ইন্দোচীনে (বর্তমান ভিয়েতনাম) এক কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রান্স ইন্দোচীনকে স্বাধীনতা দিতে রাজী হয় না, ফলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জেনেভাতে এক যুদ্ধবিরতি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে ইন্দোচীনকে ভাগ করে উত্তর ভিয়েতনাম আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম—দু'টি রাজ্য স্থাপিত হয়। ফ্রান্স সব কর্তৃত্ব ত্যাগ করে। স্থির হয় পরে গণভোটের সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামকে এক করে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

উত্তর ভিয়েতনামে ডঃ হো চি-মিন কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন ও দক্ষতার সঙ্গে শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। দক্ষিণে অ-কম্যুনিস্ট সরকার স্থাপিত হয় এবং আমেরিকা তাকে অর্থ-সাহায্য করতে থাকে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার নানা অজুহাতে নির্বাচনে রাজী হয় নি বলে কম্যুনিস্ট গেরিলা বাহিনী সেখানে অনবরত আক্রমণ চালাতে থাকে।

অবশেষে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার কম্যুনিস্ট গেরিলাদের দমন করার জন্য আমেরিকার সাহায্য

ডঃ সুকর্ণ

চেয়ে পাঠাল। আমেরিকা সৈন্য পাঠাতে শুরু করলেই যুদ্ধের গতি তীব্রতর হতে লাগল। এর পর শুরু হল উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ। আমেরিকার বোমারুবিমান উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে বারবার বোমাবর্ষণ করে। এক বিভীষিকার যুগ শুরু হয়। উত্তর ভিয়েতনাম বীরবিক্রমে তার প্রতিরোধ করতে থাকে।

উত্তর ভিয়েতনামের সংগ্রামীদের সাহসিকতায় এবং নানা দেশের প্রতিবাদের ফলে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকা আক্রমণ বন্ধ করে ও সৈন্য সরিয়ে নিতে রাজী হয়।

কম্বোডিয়া আর লাওস ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী অধিকারে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লাওস স্বাধীনতা লাভ করে। লাওসে রাজতন্ত্র বর্তমান। কম্বোডিয়া ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কম্বোডিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। লাওস ও কম্বোডিয়া এই দুটি রাষ্ট্রই রাষ্ট্রসংঘের সদস্য।

পুরনো শ্যাম (Siam) দেশের নাম বর্তমানে থাইল্যাণ্ড হয়েছে কারণ সে দেশের লোকেরা থাই জাতের লোক। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় থাইল্যাণ্ড নিজ স্বাধীনতা কোনরূপে বজায় রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থাইল্যাণ্ডে কম্যুনিস্ট বিদ্রোহ দেখা দেয়, ফলে শাসন-ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়।

॥ কিউবা ॥

কিউবা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস ইহা আবিষ্কার করেন।

কর্নেল সুহার্তো

১৭৬২-১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল। পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা স্পেনের অধীনে থাকে।

স্পেনীয়গণ কিউবার অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাত। তার ফলে বিভিন্ন সময়ে দেশ-ব্যাপী প্রবল বিদ্রোহ দেখা দেয়।

হাভানা বন্দরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ ডুবে গেলে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। স্পেন পরাজিত হয়। তার ফলে স্পেন কিউবার কর্তৃত্ব ত্যাগ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে কিউবা থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়। কিউবায় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মেজর জেনারেল ফুলগেনসিও ব্যাটিস্টা জালদিভার ডিক্টেটরী শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর শাসনকালে নানা দুর্নীতি দেখা দেয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ ফিডেল ক্যাস্ট্রোর অধিনায়কত্বে বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ব্যাটিস্টা পদত্যাগ করে লিসবনে পলায়ন করলে ডঃ ক্যাস্ট্রো ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হন।

কিউবার ইক্ষুচাষের বিস্তৃত ভূখণ্ড ও বিরাট চিনির কারখানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে ছিল। কিউবার কর্তৃপক্ষ লক্ষ লক্ষ একর জমি দখল করে ও নানাভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। সোভিয়েট রাশিয়া সুযোগ বুঝে কিউবাকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিনি কেনা বন্ধ করে দেয়।

॥ আফ্রিকা ॥

আফ্রিকা মহাদেশ প্রাচীনকালে মিশরীয় সভ্যতা আর কার্থেজীয় সভ্যতার জন্মস্থান ছিল। এই দুই সভ্যতার পতনের পর আফ্রিকা বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ক্রমে আফ্রিকা 'অন্ধকার মহাদেশ' বা Dark Continent নামে অভিহিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইওরোপীয় পর্যটক আর ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের অক্লান্ত চেষ্টায় আফ্রিকা বাইরের পৃথিবীর কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই পর্যটক আর ভৌগোলিকদের মধ্যে স্পেক, স্ট্যানলী, লিভিংস্টোন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কথা বলা হয়েছে 'ভৌগোলিক আবিষ্কার' অধ্যায়ে।

আফ্রিকার ইতিহাসের পরের অধ্যায় হচ্ছে ইওরোপীয় উপনিবেশবাদ বিস্তারের ইতিহাস। রাজা লিওপোল্ডের নেতৃত্বে বেলজিয়াম আফ্রিকার কঙ্গো রাজ্য অধিকার করে 'স্বাধীন কঙ্গো রাজ্য' স্থাপন করে। ফ্রান্স আফ্রিকার উত্তর দিকের আলজিরিয়া অধিকার করে নেয়। টিউনিস ও মরক্কোও ফ্রান্সের দখলে আসে। ক্রমে ফ্রান্স সাহারা, সেনিগাল, কঙ্গো নদী, আইভরি উপকূল প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতালী এরিট্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, ট্রিপলি ও লিবিয়া দখল করে নেয়। বিংশ শতাব্দীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইতালী বলপূর্বক আবিসিনিয়া গ্রাস করে। পর্তুগাল এবং স্পেনও

ডঃ হো চি-মিন

কিছু কিছু স্থান দখল করে নেয়। জার্মানরাও কিছু অংশে উপনিবেশ স্থাপন করে। তবে ইংল্যাণ্ড দখল করে আফ্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। উত্তর দিকে কায়রো থেকে দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত বহু দেশই ইংল্যাণ্ডের অধীনে বা প্রভাবাধীনে আসে।

বিদেশী অধিকারে আফ্রিকা বহু বৎসর শোষিত হয়েছে। তবে শিক্ষার প্রসার হওয়ার ফলে আফ্রিকার জাতীয়তাবোধ জেগে উঠতে আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে আফ্রিকার দেশগুলি বিদেশী অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়া ইতালীর কবল থেকে মুক্ত হয়। পূর্বতন শাসক সম্রাট্ হাইলে সেলাসি আবার শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন (১৯৭৫-এ ইনি বিতাড়িত হয়েছেন)। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লিবিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘানা স্বাধীন হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গিনি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে কঙ্গো স্বাধীন হয়। আলজিরিয়া ছিল ফ্রান্সের অধীনে। এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে বহু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। ফ্রান্স দ্য-গল-এর ক্ষমতায় এলে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে এক গণভোটের পর আলজিরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মরক্কো স্পেন ও ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য ছিল। ঐ খ্রীষ্টাব্দেই মরক্কো স্বাধীন হয়। টিউনিসিয়া, মাদাগাস্কার, আইভরি কোস্ট, উগাণ্ডা, নাইজিরিয়া, তানজানিয়া, কেনিয়া, সেনিগাল প্রভৃতি আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্র এখন স্বাধীন হয়েছে।

॥ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ॥

পঞ্চদশ শতকে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তারপর থেকেই ইওরোপ থেকে বিভিন্ন জাতির লোক বিভিন্ন কারণে আমেরিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। এরাই সকলে মিলে আমেরিকান বলে পরিচিত। আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ ছিল ইংরেজদের অধীনে আর কানাডা ছিল ফরাসীদের হাতে। ১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্স হেরে যাওয়ার ফলে কানাডা ইংরেজ অধিকারে চলে আসে।
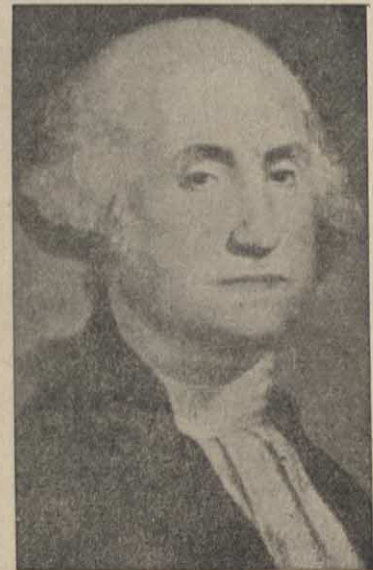
জর্জ ওয়াশিংটন

হাইলে সেলাসি
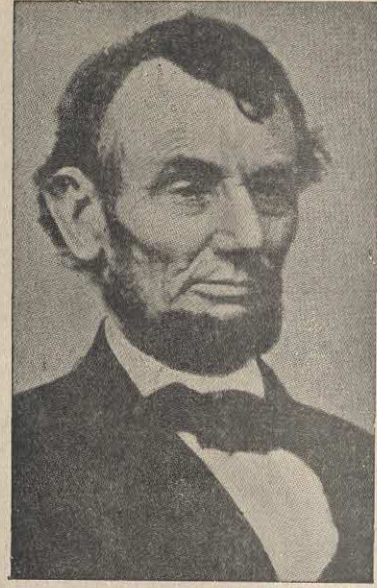
আব্রাহাম লিংকন

এর পর আমেরিকাবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকানরা জয়লাভ করতে থাকে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকার ১০টি ইংরেজ উপনিবেশ পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এদের সম্মিলিত নাম হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র-সমূহ (United States of America).

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন জর্জ ওয়াশিংটন। ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৭ পর্যন্ত তাঁর শাসনে আমেরিকার যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ইতিহাসে এক সংকট ঘনিয়ে আসে। ঐ বৎসর আব্রাহাম লিংকন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন ক্রীতদাসপ্রথা অবসানের পক্ষপাতী। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরের দেশগুলিতে এই প্রথা লুপ্ত হলেও দক্ষিণের দেশগুলিতে এ প্রথা চলছিল। লিঙ্কন দাসপ্রথা লোপ করতে চাইলে দক্ষিণাংশের

স্টালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিল

রাজ্যগুলি—জর্জিয়া, আলাবামা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, লুসিয়ানা, টেকসাস আর সাউথ কেরোলিনা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। লিংকন এ মেনে নিতে রাজী ছিলেন না, তাই গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি লিংকন ক্রীতদাসদের স্বাধীন নাগরিক মর্যাদা দান করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী উপনিবেশগুলি হার মেনে নেয়। লিংকন এর পরেই এক আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে জার্মানীর বিপক্ষে যোগদান করে। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন প্যারিসের শান্তি-চুক্তিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁরই প্রস্তাবিত চোদ্দ-দফা নীতির উপর ভিত্তি করে লীগ-অব-নেশনস নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তাঁর সময় আমেরিকা সব ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা প্রথম দিকে যুদ্ধে যোগদান করে নি। কিন্তু জাপান ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর হঠাৎ পার্লহারবার বন্দর আক্রমণ করে আমেরিকার নৌবহরের প্রচুর ক্ষতি করে। ফলে আমেরিকা মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেয়।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী

উড্রো উইলসন

জার্মানীর পতনের পর বার্লিন নগরীর একাংশ আমেরিকার অধিকারে আসে। জাপান যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল, সেজন্য আমেরিকা আণবিক বোমা ফেলে হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামে জাপানের ছুটো শহরকে ধ্বংস করে দেয়। জাপান ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় ইংল্যাণ্ডের চার্চিল, রাশিয়ার স্টালিন আর আমেরিকার রুজভেল্ট মিলে ইউনাইটেড নেশনস নামে একটি রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা আর শান্তিরক্ষার জন্য ইউনাইটেড নেশনস (U. N.) গঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। আমেরিকা ধনতান্ত্রিক দেশ, আর অপর একটি বৃহত্তম শক্তি

রাশিয়া সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক দেশ। এই দুই দেশের মধ্যে বহুকাল ঠাণ্ডা লড়াই চলতে থাকে। প্রেসিডেন্ট কেনেডীর শাসনকালে আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শান্তিমৈত্রী স্থাপন করে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কেনেডী আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জনসনের আমলে আমেরিকা ভিয়েতনামে কম্যুনিস্ট প্রভাব বিস্তার বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়। বহুকাল ধরে সেখানে যুদ্ধ চলতে থাকে। প্রেসিডেন্ট নিকসনের আমলে ১৯৭৩ সালে আমেরিকা ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধে বিরত হয়। নিকসনের পর এখন (১৯৭৫) প্রেসিডেন্ট হয়েছেন মিঃ ফোর্ড।

॥ কানাডা ॥

কানাডা উত্তর আমেরিকার একটি বিশাল দেশ। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় নাবিকেরা এদেশের নানাস্থানে আগমন করে। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা কানাডায় গিয়ে ব্যবসায় শুরু করে দেয়। তারপর নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ফরাসীরা ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর কানাডা ব্রিটিশের অধিকারে আসে।

বর্তমানে কানাডা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে স্বাধীন রাষ্ট্র।

॥ মেক্সিকো ॥

কলম্বসের বহু পূর্বে এখানে একটি উন্নত সভ্যতার অধিকারী জাতির বাস ছিল। এই আজটেক (Aztec) সভ্যতার বহু নিদর্শন আজও মেক্সিকোর নানাস্থানে দেখতে পাওয়া যায়।

যখন ইওরোপীয় জাতিরা আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে তখন মেক্সিকো স্পেনীয়দের অধিকারে চলে যায়। স্পেনীয়রা পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এখানে রাজত্ব চালায়। ফরাসীরাও স্পেনীয়দের এই উপনিবেশ রাখতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু স্থানীয় বিদ্রোহের ফলে আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চাপে মেক্সিকো থেকে বাইরের উপনিবেশবাদ চলে যায়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোতে নতুন শাসনতন্ত্র স্থাপিত হয়। বর্তমানে এটি একটি সংযুক্ত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

মায়া-সভ্যতার নিদর্শন

॥ দক্ষিণ আমেরিকা ॥

মেক্সিকোতে আজটেক সভ্যতা ছাড়াও মধ্য আমেরিকায় য়ুকাটান অঞ্চলে 'মায়া-সভ্যতা' নামে একটি উচ্চ ধরনের সভ্যতা ছিল। আর দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলে ছিল ইন্‌কাদের রাজত্ব—সেখানে প্রচুর সোনা ছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয় লুণ্ঠনকারী পিজারো, কর্টেজ প্রভৃতির

সাইমন বলিভার

আক্রমণে এই সব সভ্যতা ও রাজ্যের পতন ঘটে। ব্রেজিল ছাড়া সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা স্পেনের অধীনে চলে যায়। একমাত্র ব্রেজিল ছিল পর্তুগালের অধীন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাইমন বলিভার নামে এক দৃঢ়চেতা নেতার অধীনে স্পেনের উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সাইমনের নেতৃত্বে ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, পেরু, ইকুয়েডর ও বর্তমান বলিভিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। দক্ষিণ আমেরিকার অপরাপর দেশগুলি এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করতে থাকে। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে ব্রেজিল স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ক্রমে ক্রমে ঊনবিংশ শতকে আর্জেন্টিনা, চিলি, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, গোয়াটেমালা প্রভৃতি স্পেনের শাসন অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

বর্তমানে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, গিনি, ব্রেজিল, উরুগুয়ে, পেরু, কলম্বিয়া, চিলি, পানামা, কোস্টারিকা প্রভৃতি রাষ্ট্র রয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকাংশ দেশই প্রচুর সাহায্য পায়। এই সব রাষ্ট্রে যাতে কম্যুনিস্ট প্রভাব বিস্তার লাভ করতে না পারে সেদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে।

॥ ভারতবর্ষ ॥

ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা জেনেছেন ভারতের সবচেয়ে পুরনো সভ্যতা হচ্ছে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা (Indus Valley Civilisation). সিন্ধু-প্রদেশের মহেন্‌জোদারো এবং পশ্চিম পঞ্জাবের হরপ্পার ভূগর্ভ থেকে দু'টি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন এই দু'টি শহর আর্য-সভ্যতারও আগেকার। মাটি খুঁড়তে খুড়তে সাতটি স্তরে সাতটি শহরের চিহ্ন দেখা গেছে। সবচেয়ে তলায় যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, পণ্ডিতদের অনুমানে ঐটিই সবচেয়ে পুরনো। খ্রীস্টজন্মের অন্ততঃ তিন হাজার বছর আগে ঐ শহরটি তৈরী হয়েছিল।

সিন্ধু সভ্যতা ছিল অনার্য সভ্যতা। তারপর আর্যরা এসে আর্য সভ্যতার সৃষ্টি করল। আনুমানিক খ্রীস্টজন্মের প্রায় দুই কি আড়াই হাজার বছর আগে আর্যরা মধ্য এসিয়া থেকে ভারতে এসেছিল।
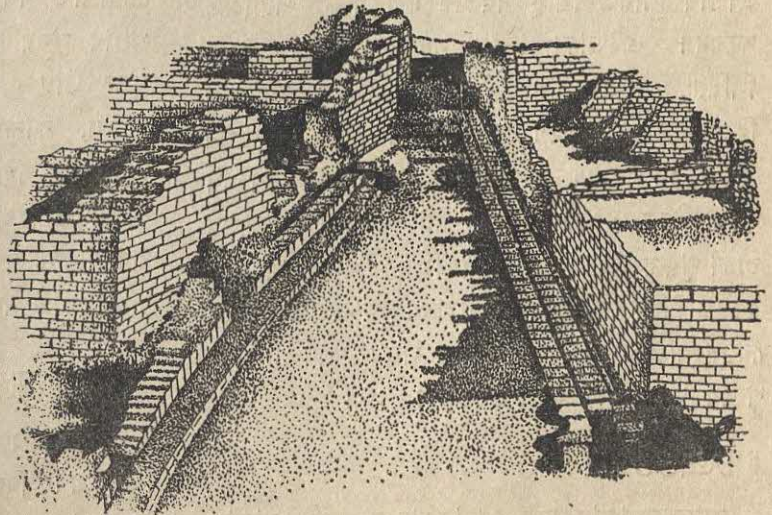
মহেন্‌জোদারোর একটি ধ্বংসাবশেষ

আগন্তুক আর্যদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধল। আর্যরা তাদের হারিয়ে দিতে পেরেছিল।

আর্যরা সূর্য, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার পুজো করত। তাদের সাহিত্যগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। উপনিষদ্ হচ্ছে বৈদিক সাহিত্যের অংশ।

বৈদিক যুগের শেষ দিকে হিন্দু ধর্মের যাগযজ্ঞ, বলিদান ইত্যাদি বাইরের আচার-অনুষ্ঠান খুব বেড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া পুরোহিত বা ব্রাহ্মণরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে সমাজের নিম্নবর্ণদের উপর আধিপত্য দেখাতে লাগলেন। এরই প্রতিবাদ হিসেবে বহু ধর্মমত দেখা দিল। এদের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম হচ্ছে প্রধান। বৈদিক ধর্মের নেতৃত্ব ছিল যেমন ব্রাহ্মণদের হাতে, নতুন ধর্মমতে সেই নেতৃত্ব নিলেন ক্ষত্রিয়রা। বুদ্ধদেব হলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক এবং পার্শ্বনাথ ও মহাবীর হলেন জৈনধর্মের প্রবর্তক। এঁরা সবাই ক্ষত্রিয়।

আলেকজাণ্ডার

॥ বিদেশী আক্রমণ—আলেকজাণ্ডার ॥

খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে পারসিকরাজ প্রথম দরায়ুস উত্তর-পশ্চিম ভারতের কতক অংশ জয় করেছিলেন। এর প্রায় তিন শতাব্দী পরে গ্রীসের রাজা আলেকজাণ্ডার পারস্য-সম্রাট্ দ্বিতীয় দরায়ুসকে পরাজিত করেন। এইভাবে তিনি সমস্ত এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, মিশর জয় করে ভারতের দিকে এলেন (৩২৭ খ্রীঃ পূঃ)। সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাব জয় করে তিনি এগিয়ে আসতে লাগলেন। তবে তিনি খুব বেশীদূর এগিয়ে আসতে পারেন নি। ভারতের রাজা পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর রাজ্য অধিকার করেও তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দু'বছর ভারতবর্ষে থেকে আলেকজাণ্ডার ফিরে চলে যান। পথে ব্যাবিলন শহরে তাঁর মৃত্যু হয় (৩২৩ খ্রীঃ পূঃ)।

॥ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ॥

আলেকজাণ্ডার চলে যাবার পর নন্দবংশীয় রাজার বংশধরদের বিতাড়িত করে ক্ষত্রিয় মৌর্যবংশের বীর চন্দ্রগুপ্ত (রাজত্ব ৩২১-২৯৭ খ্রীঃ পূঃ) মগধের সিংহাসনে বসেন। মগধ তখন ছিল ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য। গ্রীকদের পরাজিত করে তিনি পঞ্জাব অধিকার করেন্। সেলুকস নামে আলেকজাণ্ডারের এক সেনাপতি সিরিয়ার অধিপতি হয়েছিলেন। তিনি পঞ্জাব পুনরধিকার করতে চেষ্টা করলে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়। সেলুকস পরাজিত হয়ে কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট এই তিনটি অঞ্চল চন্দ্রগুপ্তকে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজনীতি বিখ্যাত হয়ে আছে তাঁর মন্ত্রী কৌটিল্য বা চাণক্যের জন্যে। তিনি ছিলেন কূটনীতিবিদ্। তাঁর রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ।

॥ রাজা অশোক ॥

চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র বিন্দুসার। বিন্দুসারের পুত্র অশোক (২৭৪-২৩৭ খ্রীঃ পূঃ) প্রথমে ছিলেন দুর্দান্ত প্রকৃতির। তিনি তাঁর অন্যান্য ভাইদের হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসে-

অশোকস্তম্ভ
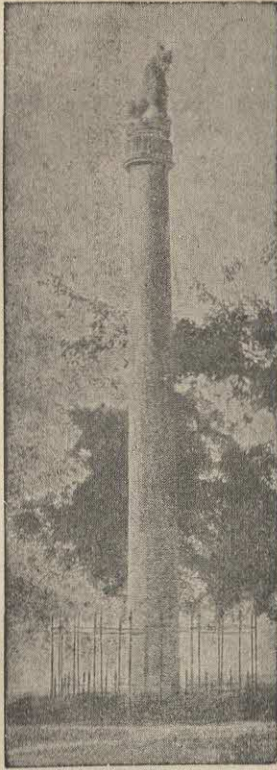
ছিলেন। রাজা হয়ে অশোক যুদ্ধযাত্রা করে কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করলেন। এই যুদ্ধের ভয়াবহ করুণ দৃশ্য, রক্ত-পাত ও মৃত্যু তাঁর মনকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত দিল। অশোক বুঝতে পারলেন যুদ্ধ নয়, অহিংসা আর শান্তির পথই একমাত্র পথ। এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন।

যুদ্ধযাত্রার পরিবর্তে অশোক বৌদ্ধ সম্মেলন, ধর্মলিপি এবং ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করলেন। ভারতের দিকে দিকে বুদ্ধদেবের বাণী পৌঁছে দেবার জন্যে তিনি অপূর্ব ব্যবস্থা করলেন। আজও তাঁর তৈরী অসংখ্য স্তূপ, লিপি, স্তম্ভ সে-সবের সাক্ষ্য হয়ে আছে।

অশোকের সময়ে শিল্পকলার খুব উন্নতি হয়েছিল। তাঁর শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে সারনাথ স্তম্ভের উপরে সিংহমূর্তি ও অশোকচক্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সেই অশোকচক্র বর্তমানে ভারতের জাতীয় প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হয়।

অশোকের মৃত্যুর পর সুযোগ্য শাসকের অভাবে মৌর্যবংশের পতন হয়। এর পর মগধে শুঙ্গ, কাণ্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাহ্লীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। কুষাণদের আদিগোষ্ঠী হল চীনের বিতাড়িত ইউ-চি জাতি। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কণিষ্ক। তিনি বাহুবলে রাজ্যবিস্তার করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী।

॥ গুপ্তযুগ ॥

কণিষ্ক পর্যন্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগ ছিল। ভারতের ইতিহাসে এর পর গুপ্তযুগের সূচনা হয়—যাকে ভারতের সুবর্ণযুগও বলা হয়েছে। গুপ্তযুগে এদেশে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান হয়। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত পরে রাজা হয়ে (৩৩৫ খ্রীঃ) প্রায় আসমুদ্র হিমাচল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত শুধু সুশাসক বা বীরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে সুকবি, সংগীতজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী।

এর পর রাজা হলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৩ খ্রীঃ)। বিক্রমাদিত্য নামে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য এবং মহাকবি কালিদাসের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে এসেছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় ছিলেন 'নবরত্ন', অর্থাৎ ন'জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি—কালিদাস,

বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভা

বরাহমিহির, বররুচি, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর ও শঙ্কু।

॥ গুপ্তসাম্রাজ্যের ভাঙন— নতুন নতুন রাজ্যের উদ্ভব ॥

জগতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যেরও ভাঙন ধরল। বিরাট সাম্রাজ্য কালক্রমে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। উত্তর ভারতে তখন ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছে। থানেশ্বর এমনি একটি রাজ্য। এই রাজ্যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষে পুষ্যভূতি বংশের প্রতিষ্ঠা হল। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা প্রভাকর বর্ধন। প্রভাকর বর্ধনের শত্রুপক্ষ ছিলেন কনৌজের মৌখরিরাজ। কিন্তু শেষে প্রভাকর বর্ধন মৌখরিরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে তাঁর মেয়ে রাজ্যশ্রীর বিবাহও দিয়েছিলেন। থানেশ্বরের সঙ্গে কনৌজের এই বন্ধুত্ব বাংলা বা গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্তকে শঙ্কিত করে তুলল। ফলে তাঁরা পরস্পর মৈত্রীবদ্ধ হলেন।

অন্যদিকে পশ্চিমের হুনজাতির সঙ্গে প্রভাকর বর্ধনের যুদ্ধ বাধলো। যুদ্ধে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন হুনদের পরাজিত করলেন। কিন্তু থানেশ্বরে ফেরার আগেই প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যু হল। এর অল্পকাল

রাজা হর্ষবর্ধন

পরে গৌড়রাজ শশাঙ্ক আর মালবরাজ দেবগুপ্ত একসঙ্গে কনৌজ আক্রমণ করলেন। কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের মৃত্যু হল। রাজমহিষী রাজ্যশ্রী মালবরাজের হাতে বন্দিনী হলেন। ভগ্নীকে উদ্ধার করবার জন্যে রাজ্যবর্ধন এগিয়ে এলেন। তাঁর কাছে মালবরাজ পরাজিত হলেও শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হল। রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পালিয়ে বিন্ধ্যারণ্যে আশ্রয় নিলেন।

এই সময়ে থানেশ্বরের রাজা হলেন রাজ্যবর্ধনের ভাই হর্ষবর্ধন। তিনি খুঁজে পেতে রাজ্যশ্রীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন। হর্ষবর্ধনের উপাধি হল শিলাদিত্য। তিনি ছিলেন উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী এবং শেষ হিন্দু রাজা। তাঁর সময়ে চীনা পর্যটক হিউএন সাঙ ভারতে এসেছিলেন।

॥ দক্ষিণ ভারত ॥

গুপ্ত যুগে দক্ষিণ ভারতে কিছু স্বাধীন রাজ্য ছিল। গুপ্ত যুগের পর সেখানে আরও দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হল—বাতাপির চালুক্য ও কাঞ্চীর পল্লব-রাজ্য। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষকে যুদ্ধে হারিয়ে দেন। চালুক্যদের পতনের সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রকূটরা শক্তিশালী হয়ে উঠল. তাদের রাজাদের মধ্যে ধ্রুব আর গোবিন্দ প্রধান। পল্লবদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সামন্তরাজ চোলরাও স্বাধীনতা ঘোষণা করল। চোল রাজাদের মধ্যে রাজেন্দ্র বিখ্যাত। এই সময় দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। রাষ্ট্রকূট বংশের আমলে ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির তৈরী হয়েছিল। চোলদের সময়েও স্থাপত্যের উন্নতি হয়। তার নিদর্শন হল তাঞ্জোর ও গঙ্গাইকোণ্ড-চোলপুরের মন্দিরগুলি।

॥ মুসলিম-আক্রমণ ॥

আরবে ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থানের পর আরবরা আরব সাগর পেরিয়ে দক্ষিণ ভারতে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেখানে অধিকার বিস্তার করতে না পেরে তারা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। সিন্ধুদেশে তখন হিন্দুরাজা দাহির রাজত্ব করছিলেন। দু'বার তিনি

আরব আক্রমণ প্রতিরোধ করেও তৃতীয় বারে পরাজিত ও নিহত হলেন। আরবরা সিন্ধুদেশে রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করল (৭১১ খ্রীঃ)।

আফগানিস্তানে সুলেমান পর্বত অঞ্চলে গজনী রাজ্য। সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন সবুক্তগীন। সবুক্তগীনের সঙ্গে ভারতের শাহীবংশীয় হিন্দু রাজা জয়পালের যুদ্ধ হয়। সবুক্তগীনের পর গজনীর রাজা হন সুলতান মামুদ। তিনি সতেরবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে বিপুল ঐশ্বর্য ও কীর্তির ধ্বংসসাধন করেন। সোমনাথের মন্দির তাঁর দ্বারা লুণ্ঠিত হয় (১০২৬ খ্রীঃ)। কালিঞ্জর ও কনৌজ তিনি বিধ্বস্ত করেন। তা ছাড়া মথুরা, নগরকোট ও থানেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন করে অনেক ধনরত্ন তিনি নিয়ে যান।

কালক্রমে গজনীরও পতন হয়। আফগানিস্তানে তখন ঘুর বা ঘোররাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময় ঘোরবংশীয় শিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘুরী বা ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দিল্লী তাঁর দ্বারা অধিকৃত হয়। মুসলিম অধিকৃত ভারতের রাজধানী হয় দিল্লী।

॥ মুসলমান রাজত্ব শুরু ঃ দাসবংশ ॥

মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হলে (১২০৬ খ্রীঃ) দিল্লীর সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেন তাঁর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন। কুতুব প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন, তাই

মহম্মদ ঘোরী

কুতুবুদ্দিন

তাঁর বংশকে বলে দাস-রাজবংশ। কুতুবুদ্দিন মাত্র চার বছর রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান।

এরপর সুলতান হলেন ইলতুৎমিস্। ইনিও ক্রীতদাস ছিলেন। সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে কুতুবুদ্দিন এঁকে কিনেছিলেন এবং নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়েছিলেন। ইলতুৎমিস্ মোগল আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিলেন। দিল্লীর কুতুবমিনার তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী হয়েছিল। ইলতুৎমিসের পরে তাঁর কন্যা সুলতানা রিজিয়া সিংহাসনে বসেন। মুসলমান সুলতানদের মধ্যে আর কোনও রমণী দিল্লীর সিংহাসনে বসেন নি। কিন্তু

সুলতানা রিজিয়া

রিজিয়া বেশীদিন রাজত্ব করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত আমীর ওমরাহদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

দাসবংশের পতনের পর খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। খিলজী বংশের আলাউদ্দীন খিলজী বিখ্যাত সম্রাট্ (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)। তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুরের সাহায্যে তিনি দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তারপর শুরু হয় তুঘলক বংশের রাজত্ব (১৩২১-১৪১৩ খ্রীঃ)। ভাল এবং মন্দ নানা কারণে তুঘলক বংশের রাজা মহম্মদ তুঘলকের নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

হুমায়ুন

॥ ভারতে মুসলমান-আধিপত্য ॥

তুঘলক বংশের রাজত্বকালে মধ্য এসিয়ার তাতারদের সম্রাট্ (Great Khan) তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। দিল্লীর রাজপথে ও ঘরে ঘরে রক্তের স্রোত বইয়ে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে তৈমুরলঙ্গ চলে গেলেন। দিল্লীর সিংহাসনে এরপর রাজত্ব করল সৈয়দ বংশ আর লোদী বংশ। এই লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে যুদ্ধে হারিয়ে তৈমুরলঙ্গের বংশের বাবর দিল্লীর সম্রাট্ হলেন।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) বাবর জয়লাভ করেন। বাবরের ছিল কামান, যার ব্যবহার ইব্রাহিম লোদীর অজানা ছিল। তাই যুদ্ধে জয়লাভ করতে বাবরের অসুবিধে হয় নি।

বাবর

বাবরের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র হুমায়ুন। গল্প আছে, হুমায়ুনের একবার খুব অসুখ 'হয়। হাকিম-বদ্যি সবাই তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। জীবনের আর কোন আশা নেই দেখে ছেলের মৃত্যু-শয্যায় বসে বাবর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন: "হে খোদা, আমার আয়ু নিয়ে তুমি হুমায়ুনের জীবন দান করো!" এর পর ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। বাবরের মৃত্যু হল, আর হুমায়ুন সুস্থ হয়ে উঠলেন।

হুমায়ুন বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। শেরশাহের কাছে হেরে গিয়ে তিনি পারস্যে চলে যান।

বাবর ছিলেন মোগল আর শেরশাহ হলেন পাঠান। তিনি ছিলেন বিহারের সাসারামের সামান্য জায়গির-দারের ছেলে। নাম ছিল ফরিদ খাঁ। তিনি বিহারের শাসনকর্তা বাহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকরি পান। এই সময়ে ফরিদ খাঁ একটি শের বা বাঘকে মেরে শের খাঁ উপাধি পান। ক্রমে ক্রমে শের খাঁ বিহারের শাসন ব্যাপারে সর্বে-সর্বা হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন।

শেরশাহ

মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্বকালে শেরশাহ

আকবর

অনেক কিছু কাজ করে গিয়েছেন। বিখ্যাত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তাঁরই চেষ্টায় তৈরী। ডাক-ব্যবস্থার সুবিধের জন্যে ঘোড়ায় চড়ে ডাক নিয়ে যাবার ব্যবস্থা তিনিই প্রথম করেন। রুপোর টাকা তিনিই প্রথম চালান।

শেরশাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন পারস্য থেকে ভারতে এসে, পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রীঃ) জয়ী হয়ে, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে আবার মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন।

হুমায়ুনের পর সম্রাট্ হলেন তাঁর পুত্র আকবর। আকবরের সময় (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) মোগল সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। অবশ্য দাক্ষিণাত্য মোগলদের অধিকারে আসে নি। হিন্দুদের প্রতি তিনি বন্ধুত্বের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। নানা ধর্মের ধর্মগুরুদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্ত ধর্মের সার সংগ্রহ করে আকবর এক নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। এই ধর্মের নাম দীন-ইলাহী। তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে ছিলেন রাজা মানসিংহ, তোডরমল্ল, জয়সিংহ প্রভৃতি। সভাসদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বীরবল। বিখ্যাত গায়ক তানসেনও তাঁর সভাসদ্ ছিলেন। রাজর্ষি অশোকের মত আকবরও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম। ইনি ছিলেন রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথের সমকালীন।

॥ রানা প্রতাপ ॥

আকবর যদিও রাজপুতানার মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোর জয় করেছিলেন, তবুও সমস্ত মেবারের উপর অধিকার রাখতে পারেন নি। মেবারের রানা উদয়সিংহের মৃত্যুর পর রানা প্রতাপসিংহ মোগলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। মোগলদের তুলনায় সৈন্য বা যুদ্ধের রসদও ছিল তাঁর সামান্য। তাই নিয়েই তিনি মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। হলদিঘাটে তুমুল যুদ্ধের পর প্রতাপ পরাজিত হলেন, তবু মোগলের কাছে তাঁর মাথা নীচু করলেন না। পাহাড়ের গায়ে এক বনে গিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন। সেই সময়ে তাঁর ক্ষুধায় খাদ্য জোটে নি। শিশু-সন্তানদের খাওয়াবার জন্যে তৈরী ঘাসের রুটিও একদিন কাঠবেড়ালী নিয়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে রানা প্রতাপ দিন কাটিয়েছেন। পাতায় তৈরী বিছানায় তিনি শুয়ে থাকতেন আর স্বপ্ন দেখতেন মেবার উদ্ধারের। শুধু স্বপ্নই দেখতেন না, মেবার উদ্ধারের জন্যে তিনি চেষ্টাও করতেন। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর আগে মোগলের হাত থেকে চিতোর ছাড়া, প্রায় সমস্ত মেবারই তিনি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

রানা প্রতাপ

জাহাঙ্গীর

॥ জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান ॥

আকবরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসলেন তাঁর পুত্র সেলিম। ইতিহাসে তিনি জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। বিদ্রোহ করার অপরাধে তিনি নিজের পুত্রের চোখ অন্ধ করে তাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিলেন। বাংলার বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগানকে হত্যা করে তাঁর অপূর্ব সুন্দরী পত্নী মেহেরউন্নিসাকে তিনি বিবাহ করেন। ইনিই ইতিহাস-বিখ্যাত নূরজাহান। নূরজাহান শব্দের অর্থ 'জগতের আলো'। তাঁর অশেষ গুণও ছিল। অন্তরালে থেকে এই রূপসী ও বুদ্ধিমতী মহিলাই জাহাঙ্গীরকে রাজ্যশাসনে সহায়তা করেছেন।

॥ শাহ্‌জাহান ॥

জাহাঙ্গীর তাঁর এক ছেলে খুরমের নাম দিয়েছেন শাহ্‌জাহান। এই নাম নিয়েই খুরম পরে সিংহাসনে বসলেন।

শাহ্‌জাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রীঃ) খুব আড়ম্বরপ্রিয় এবং শিল্পানুরাগী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁর রাজত্বে দেশে শিল্পকলার অনেক উন্নতি হয়। প্রিয়পত্নী মমতাজমহলের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে তিনি তাঁর সমাধির উপর তাজমহল তৈরি করিয়েছিলেন। তাজমহল আজও পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে অন্যতম। ওটি তৈরি করতে বহু কোটি টাকা খরচ হয়েছিল আর বাইশ বছর সময় লেগেছিল। তা ছাড়া মোতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, শিশ্‌মহল এসবও তিনি করিয়েছিলেন। শাহ্‌জাহানের আরও একটি স্মরণীয় কীর্তি ময়ূর সিংহাসন। এর নির্মাণে ব্যয় পড়েছিল প্রায় ৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। বহু মূল্যবান্ এই সিংহাসন মোগল সাম্রাজ্যের আড়ম্বর আর ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য। পারস্যসম্রাট্ নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করে এটি নিয়ে গিয়েছিলেন।

শাহ্‌জাহানের শেষ জীবন বড় দুঃখের। নিজের পুত্র ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দিদশায় তাঁর শেষ জীবন কাটে।

॥ ঔরঙ্গজেব ॥

শাহ্‌জাহানের চার পুত্র দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব এবং মুরাদের মধ্যে ঔরঙ্গজেব ছিলেন সব চেয়ে সাহসী ও বুদ্ধিমান। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। মুরাদকে হত্যা করতেও তিনি

শাহ্‌জাহান

লীগ অব নেশন থেকে
ইউ,এন
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯

ইতিহাসের কথা

(লীগ অব নেশনস থেকে ইউ এন)

(১) ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থামে।

(২) পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লীগ অব নেশনস বা জাতি-সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। উডরো উইলসনের শান্তির চৌদ্দ দফা শর্ত সকলে মেনে নেয়।

(৩) জেনেভায় জাতি-সংঘের বাড়ি তৈয়ারী হয়।

(৪) ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী লীগ অব নেশনসের চুক্তি ভঙ্গ করে আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) আক্রমণ করে।

(৫) ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার চেকো-শ্লোভাকিয়া ও পোলান্ড আক্রমণ করেন।

(৬) ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ালটায় চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন শান্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আলোচনায় বসেন। রাষ্ট্র সংঘ বা ইউ. এন. গঠিত হয়।

(৭) ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধবিরতি ঘটে।

(৮) রাষ্ট্রসংঘের লোকেরা বিভিন্ন ভাবে মানুষের সেবাকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন।

(৯) রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল দাগ হ্যামারশিলড্ আফ্রিকান যুদ্ধের সময় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিমান-দুর্ঘটনায় মারা যান।

ঔরঙ্গজেব

কুণ্ঠিত হন নি। সুজা আরাকানে পলায়ন করেন এবং সেখানেই মারা যান।

আলমগীর নাম নিয়ে ঔরঙ্গজেব প্রায় পঞ্চাশ বছর (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বে মোগল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত হয়, আবার তাঁর সময়েই তার পতন শুরু হয়। তিনি ছিলেন গোঁড়া মুসলমান। আকবর যে জিজিয়া কর হিন্দুদের উপর থেকে তুলে নিয়েছিলেন, ঔরঙ্গজেব আবার তা বসালেন। তাঁর আদেশে শত শত হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে ফেলে তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কাশীর বিখ্যাত বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার কেশবদেবের মন্দির তিনিই ধ্বংস করেন। তাঁর কৃতকর্মের ফলে চারদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। শিখ, মারাঠা, রাজপুত, জাঠ সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। অত বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও ঔরঙ্গজেবের জীবনে শান্তি ছিল না।

॥ শিবাজীর অভ্যুত্থান ॥

মারাঠারা ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল-ভাবে বিদ্রোহ করতে লাগল। শিবাজী (১৬২৭-১৬৮০) হলেন এই বিদ্রোহীদের নেতা।

ছোটবেলা থেকেই শিবাজীর মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে ওঠে। অল্প বয়সেই তিনি তাঁর মাওয়ালী কৃষক বন্ধুদের নিয়ে এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলে-ছিলেন। প্রথমেই এদের সাহায্যে তিনি বিজাপুর দখল করে নিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে মোগলদের সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত হয়। বিজাপুররাজ শিবাজীকে হত্যা করবার জন্যে আফজল খাঁকে পাঠালেন। চতুর শিবাজী আঙুলে লোহার বাঘনখ পরে তৈরী হয়ে রইলেন। আফজল খাঁ আলিঙ্গন করার ছলে শিবাজীর বুকে ছুরি বসাতে যাবেন, তখনই বাঘনখের আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। আফজল খাঁর মৃত্যু হল।

এবার স্বয়ং ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করবার জন্যে শায়েস্তা খাঁকে পাঠালেন। শিবাজী খবর পেয়ে কয়েকজন অনুচর নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে শায়েস্তা খাঁর শিবিরে ঢুকলেন। শায়েস্তা খাঁর পুত্র আর প্রায় চল্লিশজন দেহরক্ষী প্রাণ হারাল। পালাতে গিয়ে শায়েস্তা খাঁর একটি আঙুল কেটে গেল। এর পর ঔরঙ্গজেব জয়সিংহ ও দিলির খাঁকে পাঠিয়ে শিবাজীর পুরন্দর দুর্গ অবরুদ্ধ করলেন। এর পর শিবাজীকে আমন্ত্রণ করে আগ্রায় আনা হল। এখানে তাঁকে

শিবাজী

বন্দী করা হল। শিবাজী অভূতপূর্ব কৌশলে সম্রাট্‌কে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন।

শিবাজী পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে একটি অখণ্ড স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প করেছিলেন। তিনি বাহুবলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন নি, উন্নত শাসন-পদ্ধতিরও প্রবর্তন করেছিলেন। প্রজার মঙ্গলসাধনই শিবাজীর রাজ্য-শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল। অকালে তাঁর পরলোক গমনের ফলে ভারতে অখণ্ড হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল!

॥ ইওরোপীয়দের আগমন ॥

ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীরা কেউ যোগ্য ছিল না। ফলে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে ফাটল ধরল। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হল আর তার ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পর ১৭৫৭ সালে হল পলাশীর যুদ্ধ।

ভারতবর্ষে এল ইংরেজ। বণিক হয়ে তারা এল, কিন্তু বণিকের মানদণ্ড ক্রমশঃ রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল।

ইংরেজরা বাণিজ্য করতে আসার আগে এদেশে এসেছিল পোর্তুগিজ। পোর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা নতুন জলপথ আবিষ্কার করে ভারতের কালিকট বন্দরে এলেন। পোর্তুগিজ বণিকরা গোয়া, দমন, দিউ, বোম্বাই, বেসিন, সলসেট, চট্টগ্রাম এই সব জায়গায় বাণিজ্য-কুঠি তৈরি করল। পরবর্তী কালে ইংরেজ ও মারাঠাদের সঙ্গে বিবাদের ফলে শেষ পর্যন্ত পোর্তুগিজ অধিকারে রইল শুধু গোয়া, দমন আর দিউ।

এর পর এল ইংরেজ বণিকদল, যার নাম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি—সংক্ষেপে, কোম্পানি। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়েই তাঁর কাছ থেকে ইংরেজরা বাণিজ্য করার কিছু সুযোগ-সুবিধে আদায় করেছিল। সুরাট, আগ্রা ও আমেদাবাদে এ সময় ইংরেজদের ব্যবসায়ের কুঠী তৈরী হয়। ঔরঙ্গজেবের সময় মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধ বাধলে ইংরেজরা কলকাতায় এসে কুঠি তৈরি করে। ইংরেজদের সামান্য কিছু পরে এল ফরাসী বণিকের দল। বাণিজ্যের ব্যাপার নিয়ে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানির মধ্যে সংঘর্ষ বাধল। শীঘ্রই এই সংঘর্ষ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্যে পরস্পর দ্বন্দ্বে পরিণত হল। ফরাসী-নায়ক ডুপ্লে ভারতে ফরাসী-সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প করেছিলেন, দাক্ষিণাত্যে তিনি অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু নানা কারণে, বিশেষতঃ ক্লাইভ নামক একজন ইংরেজ সেনাপতির আবির্ভাবে, ডুপ্লের সংকল্প ব্যর্থ হয়।

॥ সিরাজউদ্দৌল্লা ও পলাশীর যুদ্ধ ॥

বাংলা দেশে ইংরেজের আধিপত্য বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা সহ্য করতে পারলেন না। তাই ইংরেজকে কলকাতায় দুর্গ তৈরি করতে তিনি অনুমতি দিলেন না। এই নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধল।

পলাশীর প্রান্তরে দু'পক্ষে হল তুমুল যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রীঃ)। এ যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় ঘটে। পলায়ন-কালে তাঁকে বন্দী করে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বাংলার নতুন নবাব মীরজাফর ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দিলেন। মীরজাফরের পরবর্তী নবাব মীরকাশেমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধল। সেই যুদ্ধে মীরকাশেমের পরাজয়ের ফলে ইংরেজ শক্তি পূর্ব ও উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল।

॥ ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস ॥

ক্লাইভ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়াপত্তন করলেন। তখনও দিল্লীতে নামেমাত্র একজন বাদশাহ

সিরাজউদ্দৌল্লা

ছিলেন, ইংরেজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁর কাছ থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার আদায় করল (১৭৬৫ খ্রীঃ)। সওদাগররা হল দেশের মালিক। এর পর ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এলেন। প্রথমে তাঁর উপাধি ছিল গভর্নর, পরে তিনি রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে 'গভর্নর জেনারেল' বা বড়লাট আখ্যা লাভ করেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস শাসনপদ্ধতি সংস্কার করার এবং সরকারী কোষাগারের অর্থাভাব দূর করার জন্যে মনোযোগী হলেন। হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে হেস্টিংস-এর দান অপরিসীম। হিন্দুদের শাস্ত্র ও সাহিত্য উদ্ধারকল্পে তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই পরবর্তী ভারতীয় নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে সব চেয়ে বেশী মনোযোগ দেন লর্ড ওয়েলেসলি। একে একে বহু রাজ্য ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মহীশূরের টিপু সুলতানকে এবং মারাঠা রাজ্য-

ক্লাইভ

লর্ড ওয়েলেসলি

গুলিকে পরাজিত করতে ওয়েলেসলিকে খুব বেগ পেতে হয়েছিল।

বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের শাসনকাল নানাবিধ সমাজ-সংস্কারের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর সময়ে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন হয়। তাছাড়াও বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা এবং ঠগীদের অত্যাচার নিবারণ করেন। রাজা রামমোহন রায় এই সময়ে ভারতে নবযুগের সূচনা করেন।

এর পর ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের বিবাদ বাধে। পঞ্জাবের শিখরা ছিল স্বাধীন। কিন্তু তাদের মধ্যে একতার অভাব ছিল। শিখনেতা পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং যখন তাঁর রাজ্যবিস্তার করলেন তখন শিখরা ইংরেজদের শরণাপন্ন হল। অমৃতসরের সন্ধিতে ঠিক হল রণজিতের আধিপত্য শুধু শতদ্রুর পশ্চিমপারে থাকবে। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর পঞ্জাবের অধিকার নিয়ে শিখদের সঙ্গে ইংরেজদের দুটি যুদ্ধ হল। প্রথম দিকে শিখরা জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই বিজয়ী হল।

লর্ড ডালহৌসি যখন গভর্নর জেনারেল হলেন তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সমস্ত ভারতবর্ষেই বিস্তার লাভ করে-ছিল। তবে বিভিন্ন রাজ্যে ছিল ভিন্ন ভিন্ন রাজা। এই রাজাদের মধ্যে একটা প্রথা ছিল ; যাঁদের ছেলে থাকতো না তাঁরা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করতেন। সেই

পোষ্যপুত্রই পিতার অবর্তমানে সিংহাসনের অধিকারী হত।

লর্ড ডালহৌসি সেই পোষ্য নেবার প্রথা তুলে দিলেন। সেই অজুহাতে অযোধ্যা, ঝাঁসী প্রভৃতি রাজ্য ইংরেজদের দখলে এল। ডালহৌসির এই নীতি দেশীয় রাজাদের অসন্তোষের কারণ হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে জ্বলে উঠল সিপাহী বিদ্রোহের আগুন।

॥ সিপাহী বিদ্রোহ ॥

এই সময়ে ইংরেজরা সৈন্যদলে এনফিল্ড-রাইফেল নামে উন্নত ধরনের বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ করে। এই রাইফেলে টোটা ভরবার সময় সেটা দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হত। সৈন্যদের মধ্যে গুজব রটে গেল যে, হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম নষ্ট করার জন্যে খ্রীষ্টান সাহেবেরা টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশিয়ে দিয়েছে।

গুজব রটার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরের সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

সিপাহী বিদ্রোহ
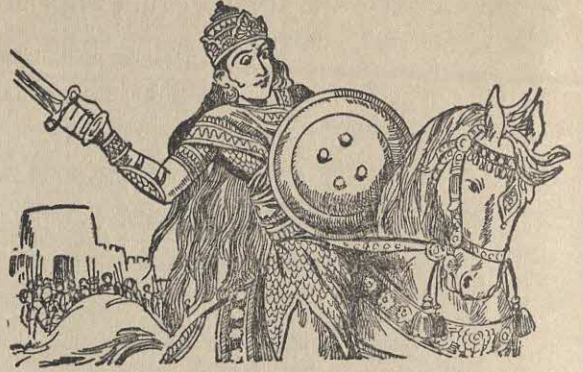
ঝাঁসীর রানী

মীরাট এবং লক্ষ্মৌর বিদ্রোহী সৈন্যরা শহরের অনেক ইংরেজ অধিবাসীদের হত্যা করে দিল্লীতে উপস্থিত হল। আরও কয়েকদল বিদ্রোহী মিলে শেষ মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে ভারতের সম্রাট্ বলে ঘোষণা করল। দিল্লী, লক্ষ্মৌ, কানপুর, বেরিলী ও ঝাঁসী হয়ে উঠল বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কেন্দ্র।

বিদ্রোহের প্রথম দিকে ইংরেজরা সুবিধে করতে পারে নি, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা সৈন্য সংগ্রহ করে বিদ্রোহ দমনে মন দিল। এই সময়ে বিদ্রোহী নায়কদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বীরত্বের পরিচয় দেন ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ, মারাঠী বীর তাঁতিয়া টোপী ও কানপুরের নানাসাহেব। ঝাঁসীতে বিদ্রোহ দমন করার জন্যে ইংরেজরা যখন উপস্থিত হল তখন রানী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষের বেশে তরবারি হাতে যুদ্ধ করেন।

ঝাঁসীর রাজার মৃত্যুর পর ঐ রাজ্য ইংরেজরা খাস অধিকারভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তাতে ঝাঁসীর বিধবা রানী ক্ষুব্ধ হয়ে রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তিনি রাজ্য রক্ষা করতে পারলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি প্রাণ দিলেন। নানা সাহেবের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাঁতিয়া টোপী ধরা পড়লেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হল। বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এতদিনের রাজত্বের অবসান হল। ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হল।

॥ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ॥

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব, তা ছাড়া ইওরোপের ফরাসী বিপ্লব, ইতালীর ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতীয়দের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলল। ভারতীয়রা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে লাগল। শাসনক্ষেত্রে এবার তারা অংশগ্রহণের দাবি করল।

এর প্রতিক্রিয়া শুরু হতে দেরি হল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫ খ্রীঃ) মতো কৃতী ও প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে সামান্য কারণে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে সরান হল। এবার সুরেন্দ্রনাথ নেতৃত্ব নিলেন। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রসার লাভ করল। এরই ফলে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন বিখ্যাত আইনজীবী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কংগ্রেসে প্রথমে অল্পসংখ্যক সদস্য ছিল। পরে সদস্য-সংখ্যা বাড়তে লাগল। ক্রমে কংগ্রেসের মধ্যে সৃষ্টি হল দু'টি দল। একদল আবেদন-নিবেদনের পথে চলতে চাইলেন—এঁরা নরমপন্থী। এঁদের মধ্যে ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। আর একদল সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করতে চাইলেন—তাঁরা হলেন চরমপন্থী। এঁদের মধ্যে ছিলেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ (অরবিন্দ ঘোষ), বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায় এবং আরও অনেকে।

ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা দেশকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। এর মূলে ছিল বাঙালীকে দুর্বল করার মতলব। এই ব্যবস্থা রোধ করার জন্য সারা বাংলা দেশে তাই আন্দোলন ('বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন') শুরু হল। তাতে অংশ গ্রহণ করলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ঋষি শ্রীঅরবিন্দ এবং আরও অনেক বিশিষ্ট নেতা। রবীন্দ্রনাথ এক শোভাযাত্রা বের করে হিন্দু-মুসলমানের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন। প্রবল আন্দোলনের ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হল। কিন্তু কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী নিয়ে যাওয়া হল দিল্লীতে।

ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

দেশে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমশঃই তীব্র হতে লাগল। গভর্নর লর্ড মিণ্টো শাসন-ব্যবস্থার কিছু সংস্কার করলেন। একে বলা হয় মর্লি-মিণ্টো সংস্কার। মর্লি ছিলেন ভারত-সচিব এবং মিণ্টো ছিলেন তখনকার বড়লাট। কিন্তু এই শাসন-সংস্কারেও ভারতকে বিশেষ কিছু রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় নি বলে অনেক রাজনৈতিক নেতারাই সন্তুষ্ট হলেন না।

॥ বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী দল ॥

এদিকে দেশের একদল তরুণ অন্যভাবে ইংরেজদের বিরোধিতা করতে চাইলেন। এঁরা হলেন বিপ্লবী দল। এঁরা বোমা তৈরি করতে লাগলেন। এই বিপ্লবীদলকে উৎসাহ দিতে লাগল সন্ধ্যা, বন্দে মাতরম্, যুগান্তর এই সব পত্রিকা।

ইংরেজ রাজপুরুষ কিংসফোর্ড নানা ভাবে বিপ্লবীদের নির্যাতন করলে বিপ্লবী দলের ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দুই তরুণ কিংসফোর্ডের উপর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন। কিংসফোর্ডকে তখন মজঃফরপুরে বদলী করা হয়েছে। ক্ষুদিরাম

বাঘা যতীন

আর প্রফুল্ল চাকী সেখানে গিয়ে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ফেললেন। কিন্তু কিংসফোর্ড সে-গাড়িতে ছিলেন না, অন্য দুজন ইংরেজ মহিলা ছিলেন, তাঁরা মারা গেলেন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী পালাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পুলিস তাঁদের ধরে ফেলল। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন, এবং বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল। কিন্তু বিপ্লব আন্দোলন সেখানেই থেমে গেল না। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি নেতৃবর্গ ধরা পড়লেন। শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত তাঁদের কঠোর শাস্তি হল।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে শুরু হল পৃথিবীব্যাপী মহাসমর—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। একদল স্বাধীনতাকামী তরুণ এর সুযোগ নিয়ে জার্মানদের দেওয়া অস্ত্রের সাহায্যে ইংরেজদের তাড়াবার সংকল্প করলেন। বালেশ্বরে বুড়ীবালামের তীরে সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) ও তাঁর সঙ্গীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। বীরের মতো তাঁরা প্রাণ দিলেন।

॥ জালিয়ানওয়ালাবাগ, গান্ধীজী ও অসহযোগ আন্দোলন ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতার জায়গায় এল দমননীতিমূলক আইন রাউলাট অ্যাক্ট। সারা দেশে এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হল ও নানা জায়গায় ধর্মঘট চলল। পুলিসও গুলি চালাতে দ্বিধা করল না। পঞ্জাবের অমৃতসর শহরের জালিয়ান-ওয়ালাবাগের শান্তিপূর্ণ বৈশাখী মেলায় শত শত নিরস্ত্র লোককে গুলি করে মারা হল। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারা দেশ রাগে ও ঘৃণায় ফেটে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ এরই প্রতিবাদে ইংরেজের দেওয়া স্যর উপাধি ত্যাগ করলেন।

ভারতময় এক বিপুল আন্দোলন শুরু হল যাঁর নেতা রূপে আবির্ভূত হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মহাত্মা গান্ধী (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। তিনি নির্দেশ দিলেন, সমস্ত সরকারী খেতাব ও সম্মান বর্জন করতে হবে, স্কুল, কলেজ, আদালত ত্যাগ করতে হবে। বিলিতি কাপড় পরা চলবে না। তার বদলে পরতে হবে চরকায় সুতো কেটে হাতে বোনা তাঁতের কাপড়। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আদালত ছেড়ে গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিলেন। এলেন লালা লাজপত রায়, শৌকৎ আলী, মহম্মদ আলী, বল্লভভাই প্যাটেল। তারপর একে একে জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি তরুণের দলও আসতে লাগলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল, কলেজ ছেড়ে দিতে লাগল। দেশ জুড়ে শুরু হল বর্জন আর অসহযোগ আন্দোলন। পুলিসের অত্যাচার চলল। হাজার হাজার লোক কারাবরণ করল।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করা হল। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু হল লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন। সেই বছরে সূর্য সেনের বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

মহাত্মা গান্ধী

তাঁদের অভাবনীয় অভিযান শুরু করলেন। সেখানকার অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হল। বারদৌলি তালুকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে প্রজারা সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করল।

ভারতীয়দের রাজনৈতিক জাগরণকে ব্রিটিশ সরকার আর উপেক্ষা করতে পারল না। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন (গান্ধী-আরউইন চুক্তি)।

লণ্ডনে তখন ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতি-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Conference) চলছিল। মহাত্মা গান্ধী লণ্ডনে গিয়ে সেই বৈঠকে যোগ দিলেন। কিন্তু আলোচনা করে বুঝতে পারলেন এর ফলে ভারতবর্ষের কোন লাভ হবে না। তাই তিনি দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আবার আন্দোলন শুরু হল।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হল নতুন ভারত-শাসন আইন। সেই আইনের বলে নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেস ভারতের আটটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করতে সমর্থ হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কংগ্রেস স্থির করে যে, যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে ব্রিটিশ একথা ঘোষণা না করলে তাদের যুদ্ধে সাহায্য করা হবে না। ব্রিটিশ ঐরূপ ঘোষণা করতে রাজী না হওয়ায় সমস্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন। ব্রিটিশ মন্ত্রী ক্রিপস ভারতে এলেন স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে। কংগ্রেস সেই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল।

॥ অগস্ট বিপ্লব ॥

এবার আরও চরম বিপ্লব। ১৯৪২-এর অগস্ট মাস। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব নিলেন —ইংরেজকে ভারত ছাড়তে হবে। গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারা বন্দী হলেন। সারা ভারতব্যাপী শুরু হল স্বতঃস্ফূর্ত প্রবল বিক্ষোভ। তরুণরা ধ্বংসাত্মক কাজে মেতে উঠল। ভারতের ইতিহাসে তা 'অগস্ট বিপ্লব' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। ইংরেজ সরকার অতি নির্মমভাবে জনগণের এই অভ্যুত্থানকে দমন করল।

॥ নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ॥

কংগ্রেসের মধ্যে বাম ও দক্ষিণ দু' ধরনের চিন্তাধারা ছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন বামপন্থী দলের। স্বাধীনতার জন্যে হিংসা অহিংসা যে কোন পথই গ্রহণ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হওয়ায় তিনি এক নতুন দল গঠন করলেন—

নেতাজী

ফরোয়ার্ড ব্লক। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে তাঁর বাড়িতে আটক করে রাখলেন। কিন্তু পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন। জাপান ও জার্মানীর সাহায্য নিয়ে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরামর্শে জেনারেল মোহন সিং-এর গড়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বাহিনীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। সুভাষচন্দ্র হলেন সকলের 'নেতাজী'। তাঁর বাহিনী আসাম সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হল। কোহিমা দখল করে ভারতের মাটিতে প্রোথিত করল স্বাধীনতার পতাকা। কিন্তু তারপর যুদ্ধে জাপানের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। তারপর খবর রটে গেল বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী নিহত হয়েছেন (১৯৪৫ খ্রীঃ)।

॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ॥

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হল। ইংল্যাণ্ডের নির্বাচনে জয়ী হল শ্রমিক দল আর ভারতে কংগ্রেস পেল সবচেয়ে বেশী ভোট। তারা ন'টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করল। ভারতের সঙ্গে আলোচনার জন্যে শ্রমিকদের কয়েকজন সদস্য এলেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে স্থাপন করলেন গণপরিষদ্। কিন্তু মুসলিম লীগ এই গণপরিষদে যোগ দিল না।

জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠিত হল। এই সভায় মুসলিম লীগ শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছিল। এদের দাবি ছিল পাকিস্তান। সেই দাবি আদায়ের জন্যে তারা তৎপর হয়ে উঠল। দেখা দিল দেশ জুড়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। লক্ষ লক্ষ মানুষ ধনপ্রাণ হারাল। শেষ পর্যন্ত ভারত বিভক্ত হল। সৃষ্টি হল দুটি রাষ্ট্রের স্বাধীন ভারত আর পাকিস্তান।

॥ স্বাধীনতা লাভ ॥

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অগস্ট ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ভারতীয় ইউনিয়ন রিপাব্লিক বা প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষিত হল। স্বাধীন ভারতে প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আর প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহরু। জওহরলালের মৃত্যুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হলে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলেন নেহরু-কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। শ্রীমতী ইন্দিরা পৃথিবীর দ্বিতীয়

ইন্দিরা গান্ধী

জওহরলাল

মহিলা প্রধানমন্ত্রী আর বর্তমান পৃথিবীতে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ইনি যে কেবল বর্তমান কালেরই শ্রেষ্ঠ নায়িকা তা নয়—ইনি সর্বকালের একজন মহীয়সী নেত্রী রূপে চিহ্নিত হবার যোগ্যা।

॥ পাকিস্তান ॥

ইংরেজের ভেদনীতির ফলে ভারতবর্ষে মুসলিম জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পর পর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার ফলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট ভারতের এক অংশকে পাকিস্তান নাম দিয়ে মুসলমান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের রাজধানী হয় রাওয়ালপিণ্ডি (পরে ইসলামাবাদ)।

বহুদূরের ব্যবধানে স্থিত দুই অংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। পশ্চিম পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে পশ্চিম-পাকিস্তান গঠিত হয়। পূর্ব-বাংলার অঞ্চলগুলি নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব-পাকিস্তান। কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল আর লিয়াকৎ আলী খাঁ প্রধানমন্ত্রী হন। লিয়াকৎ আলী ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। এর পর পাকিস্তান মন্ত্রিসভার ঘন ঘন রদবদল হতে থাকে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর আয়ুব খাঁ ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর আমলেই পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা পশ্চিম-পাকিস্তানের অধীনতা অস্বীকার করে বিদ্রোহ করে। তারই ফলে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক বিভাগের অধিনায়ক ইয়াহিয়া খাঁর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে আয়ুব খাঁ অন্তরালে চলে যান।

পাকিস্তান আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বহু অর্থ সাহায্য লাভ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পরেই পাকিস্তান কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু কাশ্মীরের রাজা ভারতে যোগ দেবার ফলে ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তানী হানাদারদের হারিয়ে দেয়। এরপর পাকিস্তান বহু বার রাষ্ট্রসংঘে ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মীর নিয়ে অপপ্রচার করেছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান আবার কাশ্মীর আক্রমণ করলে ভারত পালটা আঘাত হানে। অবশেষে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে শান্তি স্থাপিত হয়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে রুশ প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের তত্ত্বাবধানে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাশিয়ার তাসখন্দ (Tashkent) শহরে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে সাময়িক-ভাবে সদ্ভাব স্থাপিত হলেও পাকিস্তান চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ চালাতে থাকে।

ওদিকে পূর্ববঙ্গে বা পূর্ব-পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের দুর্ব্যবহার ও অন্যায় কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। বাঙালী পুলিস, সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ মানুষদের নিয়ে পূর্ববঙ্গে মুক্তিফৌজ গঠিত হয়। তাদের সঙ্গে পাকিস্তানী বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। মুক্তিফৌজের ডাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীও তাদের সাহায্যে এগিয়ে যায়। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। স্বাধীন হয়ে পূর্ব-পাকিস্তান নতুন নাম নেয় 'বাংলাদেশ'। ইয়াহিয়া খাঁকেও সরে যেতে হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হন। আর, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, এবং পরে প্রেসিডেণ্ট হন 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবুর রহমান।

॥ বঙ্গদেশ ও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ॥

এতকাল বাংলাদেশ বলতে সমস্ত বঙ্গদেশটাকেই বোঝাতো, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলা, পূর্ববাংলা সবই ছিল। কিন্তু এখন পূর্ব-পাকিস্তান স্বতন্ত্র হয়ে গিয়ে 'বাংলাদেশ' নাম নেওয়ায়, আর অখণ্ড বঙ্গদেশকে 'বাংলা দেশ' বলা চলবে না। তাকে বঙ্গদেশই বলব।

প্রাচীন বঙ্গদেশের এখনকার মতো বিশেষ কোন একটা নাম ছিল না। এখনকার বাংলা দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ ছিল বঙ্গ আর উত্তর অংশ ছিল পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল রাঢ়। তা ছাড়া প্রাচীনকালে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গকেও বলা হত গৌড়।

॥ সম্রাট্ শশাঙ্ক ॥

গুপ্তযুগের আগে বঙ্গদেশের ইতিহাস প্রায় কিছুই জানা যায় নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হবার ফলে সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। তার একটির নাম গৌড়। ঐ সময় ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব নামে তিনজন রাজার নাম জানা যায়। ষষ্ঠ শতকে কনৌজরাজ ঈশান বর্মন বঙ্গদেশ আক্রমণ করলেন। তার ফলে এই দেশ দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে মহাবীর রাজা শশাঙ্কের আমলে গৌড় আবার শক্তিশালী হয়ে উঠল।

শশাঙ্ক ছিলেন সর্বপ্রথম বাঙালী সম্রাট্। তাঁর সময় গৌড় শুধু শক্তিশালীই হয় নি, মগধও তাঁর অধিকারে এসেছিল। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি। হর্ষবর্ধনের সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল।

॥ রাজা গোপাল ॥

শশাঙ্কের আমলে বঙ্গদেশ স্বাধীন ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর গৌড়ের ইতিহাস অন্ধকারে ঢাকা। তবে সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ তখন হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মনের অধিকারে ছিল। পরবর্তী সময়টা ছিল অরাজকতা ও 'মাৎস্যন্যায়' যুগ। বড় মাছ যেমন ছোট মাছদের খেয়ে ফেলে তেমনি সেই সময়ে শক্তিমান্ লোকেরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করত। যাই হোক, কোনও অরাজকতাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দেশের লোকেরা একজন বীরকে রাজা নির্বাচিত করল। তাঁর নাম গোপাল দেব। ইনি দেশে অনেক পরিমাণে শান্তিশৃঙ্খলা এনেছিলেন। গোপাল হলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ও তাঁর বংশধরেরা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ। ওদন্তপুরের বৌদ্ধ বিহারটি তিনিই তৈরি করিয়েছিলেন।

॥ পাল রাজত্ব ॥

গোপাল দেবের সময় থেকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধযুগের সূচনা হয়। গোপালের পুত্র ধর্মপালকে পালবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা বলা যায়। তাঁর আমলে বঙ্গদেশের সীমা মধ্যভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাটলীপুত্রে তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপিত হয়। ধর্মপালের উপাধি ছিল 'বিক্রমশীল'। মগধের বৌদ্ধ-বিহার বিক্রমশীলা তাঁরই কীর্তি। কালে এই বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাস্থান হিসেবে নালন্দা ও তক্ষশিলার প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠে।

ধর্মপালের ছেলে দেবপালের সময় বঙ্গদেশের রাজ্য আসাম ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দেবপালের পরে পালরাজ্যের গৌরব রক্ষা হয় নি। তবে প্রথম মহীপালের সময় পালবংশ আবার জেগে উঠেছিল। সেই সময়ে বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে তিব্বতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর নাম হয় অতিশা (অতীশ)।

॥ সেন বংশ ॥

দুর্বল পাল রাজবংশের হাত থেকে বঙ্গদেশ সেন রাজাদের হাতে চলে যায়। এঁরা ছিলেন আদিতে দক্ষিণ ভারতের কর্নাটক অঞ্চলের লোক। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন। বিজয় সেনের সময়ে রাজ্যের

লক্ষ্মণ সেন

কিছুটা উন্নতি হয়। তাঁর ছেলে বিজয় সেনের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র বল্লাল সেন। এই সময় বঙ্গদেশের সীমা বিস্তৃত হয়। সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু। বিজয় সেনের ছেলে রাজা বল্লাল সেন হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। তিনিই বঙ্গদেশে কৌলিন্যপ্রথার প্রবর্তন করেন, অর্থাৎ বাঙালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন্ বংশ শ্রেষ্ঠ আর কোন্ বংশ তা নয়, তা ঠিক করে দেন। তাঁর সময়ে প্রধানতঃ যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের বীরত্বে বঙ্গদেশের রাজ্যসীমা আবার উত্তর ভারতের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

বল্লাল সেনের পর রাজা হলেন লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষ ভাগে মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খিলজি—অর্থাৎ, বক্তিয়ার খিলজির ছেলে মহম্মদ নদীয়া আক্রমণ করেন (১২০২ খ্রীঃ)। আশি বছরের বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন তখন নদীয়ায় ছিলেন। তবে, একথা মিথ্যা যে মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহী বঙ্গদেশ জয় করেছিল। আসলে সতেরো জন অশ্বারোহী লক্ষ্মণ সেনের পুরীতে অতর্কিতে প্রবেশ করেছিল আর বাইরে অপেক্ষা করছিল বিশাল বাহিনী। মহম্মদ নদীয়া জয় করে পরে সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকার করে নিলেন।

সেনবংশের আমলে সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল। সেন রাজারা বাংলা ভাষা জানতেন না। সংস্কৃত ছিল তাঁদের ভাষা। তাই সে সময় সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল। বল্লাল সেন নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত। 'দান সাগর' এবং 'অদ্ভুত সাগর' নামে তাঁর দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব এবং পবনদূত-রচয়িতা কবি ধোয়ী তাঁর সভাকবি ছিলেন। তা ছাড়াও ছিলেন উমাপতি ধর, শরণ ও গোবর্ধন। মনস্বী হলায়ুধও তাঁর সভারত্ন ছিলেন।

॥ মুসলিম রাজত্ব ॥

সেন বংশের অবসানের পর বঙ্গদেশ মুসলমানের অধিকারে এল। বঙ্গদেশের মুসলমান শাসনকর্তা সব সময় দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করতেন না। তাঁরা স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করতেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্। তাঁর নাম থেকে হল ইলিয়াস্ শাহী রাজবংশ। তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ্ পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। সিকন্দরের পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজম। বাংলার এই সুলতানও সাহিত্য-প্রীতির জন্য সুপরিচিত। বিখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র বিনিময় হত। চীন সম্রাটের কাছেও তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। গৌড়ে ইলিয়াসশাহী বংশের রাজত্বকাল হচ্ছে ১৩৪৫ থেকে ১৪১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত।

॥ রাজা গণেশ ॥

১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে একজন পরাক্রান্ত হিন্দু জমিদার শেষ ইলিয়াস শাহী সুলতানের হাত থেকে গৌড় রাজ্য কেড়ে নেন। তিনি বোধহয় দনুজমর্দন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। গণেশ ছিলেন হিন্দু। কিন্তু তাঁর ছেলে যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ্ নাম নিয়েছিলেন। তিনি পরে রাজা হন। জালালুদ্দিন রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখলেও হিন্দুদের উপর অনেক অত্যাচার করেছিলেন। পাণ্ডুয়ার একলাখী মসজিদ তাঁরই তৈরী। তাঁর পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ ছিলেন আরও অত্যাচারী এবং অযোগ্য শাসক। ইলিয়াস্ শাহী বংশের সুলতান নাসিরুদ্দিন শাহ্ ও তাঁর
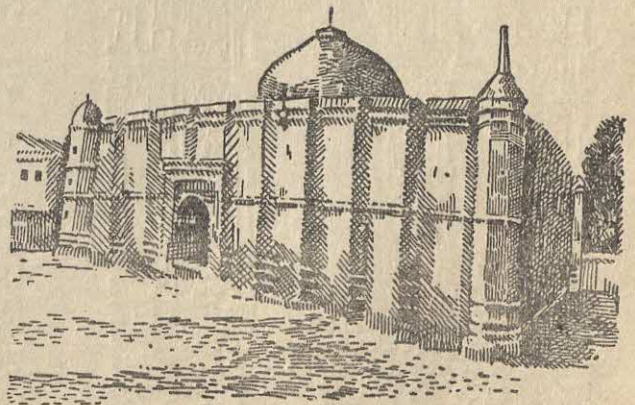
পাণ্ডুয়ার একলাখী মসজিদ

পরবর্তী রুকনুদ্দিন ছিলেন কৃতী পুরুষ। রুকনুদ্দিন আফ্রিকা থেকে বহু হাবসী ক্রীতদাস এনেছিলেন। ইলিয়াস্ শাহী বংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একজন হাবসী শামসুদ্দিন মুজফ্‌ফর শাহ্ নাম নিয়ে বাংলার সুলতান হয়ে বসে।

এই অত্যাচারী সুলতানের আমলে বাংলা দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীদের হাতে হাবসী সুলতানের মৃত্যু হলে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ বাংলার সিংহাসনে বসেন (১৪৯০ খ্রীঃ)।

॥ সুলতান হুসেন শাহের আমল ॥

বাংলাদেশে হুসেন শাহী আমল নানা কারণে গৌরবময়। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক এই সময়ে গড়ে ওঠে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন।

হুসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ যখন গৌড়ের সুলতান ছিলেন সেই সময়ে ছোট সোনা মসজিদ ও
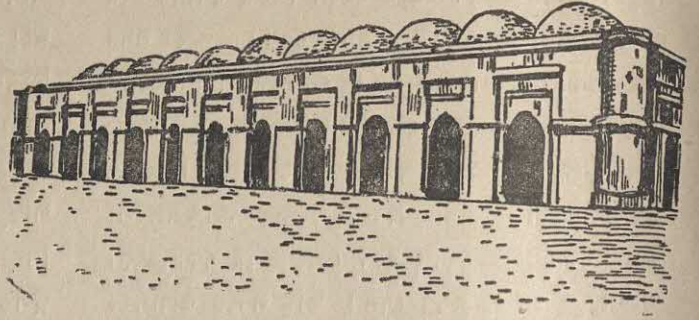
ছোট সোনা মসজিদ

বড় সোনা মসজিদ

বড় সোনা মসজিদ নামে দুটি বিখ্যাত মসজিদ নির্মিত হয়। সুলতানী যুগে বাংলাদেশে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতির পরিচয় এই সব কীর্তির মধ্য দিয়ে জানা যায়।

॥ গৌড় আবার দিল্লীর অধীন ॥

শের শাহ্ যখন দিল্লীর সম্রাট্ হলেন তখন বঙ্গদেশ আবার দিল্লীর অধীনে আসে। শাহ্‌জাহানের সময় তাঁর পুত্র সুজা ছিলেন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা। সুজার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আবির্ভাব ॥

বঙ্গদেশে এর পর ইংরেজ আমল শুরু হয়। শাহ্‌জাহানের আমলে সুজা যখন বাংলার শাসনকর্তা তখন এক আদেশনামার সাহায্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশে ব্যবসা করতে আরম্ভ করে।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রাম নিয়ে কলকাতা নগরীর পত্তন করলেন। জব চার্নক ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ। কলকাতা তখন ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর জায়গা। কেউ ভাবতেও পারে নি, এই শহরই পরবর্তী কালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হয়ে উঠবে। সুতানুটির কুঠিতে ক্রমে তৈরী হল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। কলকাতা হল তখন ইংরেজদের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র।

ইংরেজদের কিছু পরে ফরাসী বণিকেরা বঙ্গদেশে

এসে চন্দননগরে কুঠি স্থাপন করলেন। ডুপ্লে হলেন এখানকার শাসনকর্তা। ফরাসীরা তখন ইংরেজদের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

নবাব আলিবর্দি খাঁ বঙ্গের নবাব হবার পর ইংরেজদের দুর্গ স্থাপন করতে বাধা দিলেন। তখন থেকেই বঙ্গের নবাবদের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ বাধে। আলিবর্দির পর সিরাজউদ্দৌল্লা যখন নবাব হলেন তখন সেই বিবাদ আরও জোরালো হয়ে উঠল। তাঁর হুকুমে ফরাসীরা অস্ত্রসংগ্রহ ও দুর্গ নির্মাণ বন্ধ রাখলো, কিন্তু ইংরেজরা তাঁর হুকুম গ্রাহ্য করল না। সিরাজউদ্দৌল্লা তখন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করলেন।

॥ পলাশীর যুদ্ধ ॥

এবার ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ বাধল। এদিকে সিরাজের বিরুদ্ধে চলল ষড়যন্ত্র। উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, সেনাপতি রায়দুর্লভ এবং মীরজাফরও এই চক্রান্তে যোগ দিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর আমবাগানে ইংরেজদের সৈন্যরা ও নবাবের সৈন্যরা মুখোমুখি হল। যুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা ও রণকুশলতার অভাবে সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় ঘটল। বঙ্গদেশে শুরু হল ইংরেজ শাসন।

বঙ্গদেশের পরবর্তী ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসেরই অংশ।

॥ বঙ্গদেশে নব জাগরণ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দী বঙ্গদেশে এক নবজাগরণের যুগ, যাকে বলা চলে রেনেসাঁস। এর মূলে ছিল অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব।

কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হল। সেই কলেজের অধ্যক্ষ হলেন উইলিয়াম কেরী। তিনি ছাপাখানা স্থাপন করলেন, সেখান থেকেই ছাপা হল বাংলা ভাষার প্রথম বই। এই সময়ে দিগ্‌দর্শন, সমাচারদর্পণ, সমাচারচন্দ্রিকা প্রভৃতি বাংলা সাময়িক পত্রও প্রকাশিত হতে লাগল।

রামমোহন রায় আনলেন বাংলায় নবযুগ। ডেভিড হেয়ারের সাহায্য নিয়ে তিনি এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করলেন। সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। সতীদাহ প্রথা নিবারণ ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচলন তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বিদ্যাসাগরও এদেশে নবযুগ আনার কাজে সাহায্য করলেন। বিধবা বিবাহের তিনি প্রচলন করলেন।

॥ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার দান ॥

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম যে আন্দোলন হয়, তার নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন বাঙালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারতের স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা দেশের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলা দেশে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী দল। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দুঃসাহসিক কীর্তিও বাঙালীর গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি বাঙালী ত্যাগী ও কর্মীদের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

॥ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ ॥

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের হিংসানীতির ফলে দেশ ভাগ হয়ে যায়। বঙ্গদেশ দু'ভাগ হয়ে পূর্ববঙ্গ (পূর্ব-পাকিস্তান) ও পশ্চিমবঙ্গে পরিণত হয়। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ স্বাধীন বাংলাদেশ ॥

বাংলাদেশ আগে পূর্ববঙ্গ নামে অভিহিত ছিল। ভারত বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তান নাম ধারণ করে। পাকিস্তানের অধীনে থেকে পূর্ববঙ্গ ক্রমশঃ নিপীড়িত হতে থাকে এবং বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীদের উপর জোর করে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে পূর্ববঙ্গের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং আন্দোলন শুরু করে। এই ভাষা আন্দোলনে অনেক ছাত্র নিহত হয়। পাকিস্তানী শাসনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য পূর্ববঙ্গবাসীরা আন্দোলন করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এই আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠে।

মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহকর্মীদের গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। গণ-আন্দোলনের চাপে পড়ে পাকিস্তান সরকার তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ কঠোরভাবে এ আন্দোলন দমন করবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ইয়াহিয়া খাঁর উপর শাসনভার দিয়ে তিনি অন্তরালে চলে যান।

ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ববঙ্গের আন্দোলন দমন করার জন্য নৃশংস অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাতেও জাগ্রত জনতার কণ্ঠরোধ করা সম্ভবপর হয় না। যোদ্ধারা অস্ত্র সংগ্রহ করে অত্যাচারী পাকিস্তান-বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

ইয়াহিয়া খাঁর সেনাবাহিনী পূর্ববঙ্গবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে হত্যা করে। প্রায় এক কোটি মানুষ গৃহহারা হয়ে ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নেয়। পূর্ব-বাংলার এই বিপদে তাদের অনুরোধে ভারতবর্ষ বন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতের সেনাবাহিনী পাকিস্তান জঙ্গীবাহিনীর অত্যাচার দমন করার জন্য এগিয়ে যায়। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানীবাহিনী আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক

মুজিবুর রহমান

ভারতীয় জওয়ানদের বাংলাদেশে প্রবেশ

ছিন্ন করে জন্ম নেয় স্বাধীন গণতন্ত্রী বাংলাদেশ।

ইয়াহিয়া খাঁ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে পাকিস্তানে আটক রেখেছিলেন। বিশ্বজনমত এবং বিশেষ ভাবে ভারতের চাপে তখনকার পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

মুজিব দেশের স্বার্থে প্রধান-মন্ত্রীর আসনে বসেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গণ-নির্বাচনে মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। মুজিব দ্বিতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেণ্ট হন।

কিন্তু গত ১৫ই আগস্ট প্রত্যুষে এক সামরিক ক্যু দেতার (Coup d'e'tat) ফলে মুজিবর নিহত হন এবং তাঁর সরকারের পতন ঘটে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নূতন রাষ্ট্রপতি হিসাবে খোন্দকার মুস্তাক আমেদ শপথ গ্রহণ করেন।

উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে মহম্মদুল্লাহ শপথ গ্রহণ করেন।

এইভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ'-এর সৃষ্টি হয়।

ইতিহাসের ঘটনা ঘটে চলেছে বছরের পর বছর ধরে—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। কতক ঘটনা ভবিষ্যতের ইতিহাসকে বদলে নতুন করে দিয়েছে। এসব ঘটনা নানা কারণে স্মরণীয়। যত সময় যাচ্ছে ততই তারা পুরোনো হচ্ছে কিন্তু তাদের মূল্য একটুও কমছে না। মানুষের ইতিহাসে তারা কালজয়ী হয়ে রয়েছে এবং থাকবে।

॥ ম্যারাথন ও থার্মোপীলির যুদ্ধ ॥

গ্রীসে যখন এথেনস্, স্পার্টা ইত্যাদি নগর-রাষ্ট্র গড়ে উঠছে ঠিক সেই সময় পারসিক সম্রাট্ এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাষ্ট্রগুলি এক এক করে দখল করে নিতে লাগলেন। এই পারসিক সম্রাট্দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন রাজা দরায়ুস। দরায়ুসের আমলে এশিয়া মাইনরের গ্রীক উপনিবেশবাসীরা এক বিদ্রোহ করে বসল। এথেন্স এবং আরো কিছু গ্রীক নগরী এই বিদ্রোহকে সমর্থন করল, এ বিদ্রোহে তারাও যোগ দিল। এথেন্সবাসীরা পারসিক সাম্রাজ্যের এশিয়া মাইনরের রাজধানী সারদিস নগরে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

দরায়ুস প্রতিজ্ঞা করলেন এথেন্সকে শাস্তি দিতে হবে। জয় করতে হবে এথেন্স। এই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুত হল দু'শো জাহাজ। এই জাহাজে করে চল্লিশ হাজার সৈন্য চলল এথেন্স অভিমুখে।

এথেন্সের বাইশ-মাইল উত্তর-পূর্বে ম্যারাথন বলে একটি জায়গায় দরায়ুসের সৈন্যরা যুদ্ধের তাঁবু বসাল।

এথেন্সের মিলটিয়াডিস নামে একজন সেনাপতি মোট দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ম্যারাথনের যুদ্ধক্ষেত্রে পারসিকদের আক্রমণ করলেন। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণ পারসিকরা সহ্য করতে পারল না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল ও শেষ পর্যন্ত কোনও রকমে দেশে ফিরে এল (৪৯০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)।

এর অল্পদিন পরেই দরায়ুস মারা গেলেন। এবার পারস্যের সম্রাট্ হলেন তাঁর ছেলে জেরেক্সেস (Xerxes).

জেরেক্সেস পিতার উপযুক্ত পুত্র। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তিনি নিজেই চললেন এথেন্সে। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে পারস্যরাজ এসে পৌঁছলেন থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়ার ভিতর দিয়ে থার্মোপীলি গিরিবর্ত্মের কাছে।

ম্যারাথনের যুদ্ধ

থার্মোপীলি জায়গাটা পাহাড়ের মধ্যে একটা সরু পথ। সেই পথে স্পার্টার রাজা লিওনিডাসের অধীনে সাত হাজার গ্রীক সৈন্য জেরেক্সেসের অগণ্য সেনার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই খবর পোঁছল জেরেক্সেসের কাছে। পারস্য-সম্রাট্ অল্প কয়েকজন সৈন্যকে গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। তারা হেরে গিয়ে ভয়ে পালিয়ে এল। বারবার তিনবার এরকম হল।

জেরেক্সেস ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলেন। থার্মোপীলির ঐটুকু গিরিপথে বেশী সৈন্য নিয়েও ঢোকা যায় না, আবার অল্প সৈন্যকে গ্রীকরা অনায়াসেই হারিয়ে দেয়। জেরেক্সেস ন'শো জাহাজ নিয়ে এসেছিলেন, আর গ্রীকদের ছিল মাত্র তিনশো জাহাজ। ঐ জাহাজে করে অন্য পথে জেরেক্সেস সৈন্য পাঠাতে চেষ্টা করলেন। এবারও গ্রীকরা প্রাণপণে বাধা দিল। শুধু তাই নয়, একদিন রাত্রে দারুণ ঝড়ে পারস্যরাজের অনেক জাহাজ ডুবে গেল।

এমন সময় তাঁর কাছে এল একজন বিশ্বাসঘাতক গ্রীক। সে জানাল যে থার্মোপীলি ছাড়া অন্য পথ দিয়ে সে পারসিক সৈন্যদের নিয়ে যেতে পারবে। পারস্য-সম্রাট্ খুশী হয়ে শুধু রাজীই হলেন না, সঙ্গে সঙ্গে একদল সৈন্যকেও পাঠিয়ে দিলেন। তারা অনেক ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে ঘুরপথে,

যুদ্ধক্ষেত্রে দরায়ুস

পিছন দিক্ থেকে থার্মোপীলিতে গ্রীকদের আক্রমণ করল।

গ্রীকরা বুঝল আর উপায় নেই। তাদের নেতা লিওনিডাস গ্রীকদের রক্ষা করার জন্য অধিকাংশ সৈন্যকে পেছনে পাঠিয়ে দিলেন। মাত্র তিনশো স্পার্টান সৈন্য নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই মরণপণ যুদ্ধে। সামনে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, তবু তারা যুদ্ধ করছে নির্ভীকভাবে। পারসিকদের অনেক সৈন্য তাদের হাতে মারা পড়ল। তবু শেষ পর্যন্ত এরা সবাই মৃত্যু বরণ করল।

থার্মোপীলির যুদ্ধে গ্রীকদের হার হয়েছে খবর পেয়েই গ্রীক জাহাজগুলো চলে গেল এথেন্সে। সেখান থেকে সমস্ত নারী, শিশু আর বৃদ্ধদের তারা সরিয়ে দিতে লাগল আশপাশের দ্বীপগুলোতে। জেরেক্সেস যখন এথেন্সে এসে পৌঁছলেন, তখন সারা শহর অন্ধকার। শুধু পাহাড়ের উপর একটি মন্দির ছিল। সেই মন্দির থেকে কয়েকজন গ্রীক সমবেতভাবে এবার বাধা দিল পারসিকদের। তাদের হাতে সবাই নিহত হল। জেরেক্সেস এথেন্স শহরকে ধ্বংস করার হুকুম দিলেন।

বেশির ভাগ গ্রীক তখন সালামিস দ্বীপে চলে গিয়েছিল। পারস্যরাজ এই দ্বীপের গ্রীকদের আক্রমণ করার জন্য তাঁর সব জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন। এবারে জাহাজে-জাহাজে অর্থাৎ গ্রীক জাহাজের সঙ্গে পারসিক জাহাজের যুদ্ধ চলল। এই যুদ্ধে কিন্তু গ্রীকরা জয়ী হয়েছিল। আর এথেন্সের কাছে এক পাহাড়ের উপর মার্বেল পাথরের সিংহাসনে বসে পারস্য-সম্রাট্ জেরেক্সেস সেই যুদ্ধ দেখে-ছিলেন।

॥ যীশুর জন্ম ও ধর্ম-প্রচার ॥

পরাধীন ইহুদী জাতিকে নানাভাবে উপদেশ দিয়ে আশার কথা বলে বেড়াতেন একজন ইহুদী। তাঁর নাম জন। তিনি বলতেন, তোমাদের রক্ষাকর্তা আসছেন, তোমরা তাঁকে মেনে নেবার জন্যে তৈরী হও।

জন দি ব্যাপ্‌টিস্ট এই উপদেশ দিতেন আর কত লোক আসত সেই উপদেশ শুনতে! একদিন একটি অল্পবয়সী ছেলে তাঁর উপদেশ শুনতে এল। সে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করত। বয়সে বালক হলেও ইহুদীদের ভালো ভালো বইগুলি তার পড়া হয়ে গেছে। তার সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করলেন জন। দেখলেন বালক হলেও তার জ্ঞান অনেক বৃদ্ধের চেয়েও বেশী। কী আকর্ষণ এই বালকের! জন তাকে যেতে দিতে চাইলেন না।

এই বালক আর কেউ নন, স্বয়ং যীশু। জনের সঙ্গে যীশু কিছুদিন নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করলেন। তারপর তাঁর মনে হল প্যালেস্টাইনের মুক্তির জন্যই ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছেন। প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করে তাঁকেই হতে হবে সেখানকার রাজা। যীশু ভাবতে লাগলেন। হ্যাঁ, দেশকে রোমানদের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। নইলে স্বাধীনতা আসবে না। অথচ এও তো দেখা গেছে, যুদ্ধ করে যে স্বাধীনতা লাভ হয়, তাকে বেশী দিন বজায় রাখা যায় না। পৃথিবীর অনেক দেশের ইতিহাসই তার প্রমাণ দিয়েছে। যীশু আরো ভাবতে লাগলেন।

এবার তাঁর ঠিক পথটির কথা মনে হল—ভগবানের

প্রাণ খুলে আলাপ করলেন জন

বাণী প্রচার করে আর মানুষের মনে ভ্রাতৃভাব জাগিয়ে তুলে, পৃথিবীর এক পবিত্র সভ্যতার সৃষ্টি করতে হবে। কেউ কারুর দেশ কেড়ে নেবে না। কোথাও থাকবে না হিংসার হানাহানি। এই পথেই তিনি রোমানদের জয় করবেন; প্যালেস্টাইনের মুক্তি আনবেন।

দেশের মানুষদের ডেকে যীশু বলতে লাগলেন, "মানুষকে ভালবাস। নিজের মতো করেই মানুষকে ক্ষমা কর। যারা তোমাদের ক্ষতি করে, যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদেরও ভালবাস। তাহলে ভগবান্ তোমাদের ভালবাসবেন।"

যীশুর উপদেশ শুনে অনেকেই আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে এল। আবার তিনি ইহুদীদের উদ্ধার করবেন শুনে অনেকেই চটে গেল। সকলের চেনা-জানা সেই মিস্ত্রীর ছেলে তাদের উদ্ধারকর্তা হবে, এ তারা সহ্য করতে পারল না। তারা যীশুকে তাঁর জন্মস্থান নাজারেথ থেকে তাড়িয়ে দিল।

যীশু এবার অন্য জায়গায় ভগবানের বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

সে সময় প্রতি বছর জেরুজালেম শহরে উৎসব বসত। মন্দিরে ইহুদীরা পুজো দিতে আসত। সেখানে বলি দেওয়া হত। বলির জন্য পশু এনে মন্দিরের সামনে বিক্রয় করা হত। যীশু এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। চাবুক হাতে সেই পশু-বিক্রেতাদের তিনি তাড়িয়ে দিলেন। যীশুর শিষ্যরা তাদের দোকান পাট ভেঙে দিলেন।

জেরুজালেমের লোকেরা যীশুর বিরুদ্ধে তবুও কিছু বলতে পারে নি। তারা চুপচাপ ঘটনাটা দেখছিল। কিন্তু লোভী ব্যবসায়ীর দল যীশুর উপর রেগে উঠল। রেগে উঠল রোমানরাও। তারা কড়া নজর রাখল তাঁর উপর।

মন্দিরে এসে তবুও যীশু বাণী প্রচার করছেন। পুরোহিতরা যীশুকে কিছু বলল না, কিন্তু গোপনে যীশুর বিরুদ্ধে লোকের মন বিষাক্ত করে তুলতে লাগল।

যীশুর শত্রুসংখ্যা ক্রমে বাড়তে লাগল। বারজন শিষ্য সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন। এঁদের তিনি খুব ভালবাসতেন। এই শিষ্যদেরই একজন জুডাস।

পাঁচজনের কথায় তার ভক্তি কমে এল। আর গুরুভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাল সে। কিছু টাকার লোভে যীশুকে সে রোমানদের হাতে ধরিয়ে দিল। জুডাসের এই বিশ্বাসঘাতকতা পৃথিবীর ইতিহাসে এক কলঙ্কিত ঘটনা।

পুরোহিতরা ধরে নিয়ে এল যীশুকে। জুডিয়ার প্রোকিউরেটার পন্টিয়াস পাইলেট যীশুর মৃত্যু-দণ্ডের হুকুম দিলেন। নগরের সীমানার বাইরে ক্যালভারি পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে ক্রুশকাঠে ঝুলিয়ে হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে তাঁকে মারা হল। সেই ক্রুশকাঠ বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে দিয়ে। এইভাবে নিকৃষ্ট একদল মানুষের হাতে নির্যাতিত হলেন ঈশ্বরের দূত।

ভালবাসার দেবতা যীশুও মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে শত্রুদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন: "পিতা, তুমি এদের ক্ষমা কর। এরা জানে না এরা কি করছে!"

যীশুর প্রেমের ধর্ম ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করতে লাগ্ল! এই ক্ষমাসুন্দর, শান্ত ভগবদ্ভক্তের আদর্শ জগতের মানুষদের এক নতুন ধর্মের সন্ধান দিল। তাঁর ভক্তসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে লাগ্ল। প্রথম প্রথম খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের উপর নিদারুণ অত্যাচার হতে লাগল। কিন্তু যার মূলে সত্য আছে তা কোন দিন লুপ্ত হয় না। খৃষ্ট ভক্তদের বিশ্বাস ও সহন-শীলতা লোকের মনে অনুপ্রেরণা জাগাতে লাগ্ল। এইভাবে যীশুর প্রচারিত ধর্ম আজ পৃথিবীতে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

॥ জোআন অব আর্ক ॥

চতুর্দশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ভ্যালয় রাজবংশের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের একশো বছরের যুদ্ধ শুরু হল।

ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তখন রাজা পঞ্চম হেনরী। অনেকগুলো যুদ্ধে ফরাসীদের হারিয়ে তিনি ফ্রান্স

দখল করে নিলেন। ফ্রান্সের সিংহাসনে বসলেন তাঁর ছেলে ষষ্ঠ হেনরী।

ফ্রান্সের সেই অন্ধকার দিনগুলিতে প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠল একটি কৃষক-বালিকা—Jeanne d' Arc, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় জোআন অব আর্ক। "আবার আমরা স্বাধীন হব। তোমরা নিরাশ হয়ো না" —ডেকে ডেকে মানুষকে জানাতে লাগল জোআন।

কৃষকের মেয়ে জোআন। সারাদিন মাঠে মাঠে ভেড়া চরানো তার প্রতিদিনের কাজ। ইংরেজ এসে, —অন্য দেশের মানুষ এসে তার নিজের দেশ কেড়ে নিয়েছে—একথা ভাবলেই তার বুকের ভেতর টনটন করে উঠত। একদিন ভেড়ার পাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে, একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জোআন আপন মনে ভাবছে। ভাবছে তার নিজের দেশের কথা। এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল যে, তার সামনে যেন এসে দাঁড়ালেন তলোয়ার-হাতে এক দেবদূত। সেই দেবদূত যেন জোআনের হাতে তলোয়ার তুলে দিয়ে তাকে বললেন—"সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে যাও, ইংরেজের হাত থেকে ফ্রান্সকে স্বাধীন করার ভার নাও।"

তারপর মিলিয়ে গেলেন দেবদূত। নিষ্পাপ, সরল কৃষক-বালিকার মনে বিশ্বাস জন্মাল—সত্যিই দেবদূত এসেছিলেন, আর ভগবানের ইচ্ছের কথা তিনিই তাকে জানিয়ে গিয়েছেন। জোআন অনেক যোগাড়যন্ত্র করে ফ্রান্সের পলাতক রাজপুত্রের (Dauphin) কাছে গেল। যুবরাজ আগে জোআনকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য খুব সাধারণ পোশাক পরে অন্যান্য লোকজনদের সঙ্গে তাঁর ঘরে বসে রইলেন। কিন্তু জোআন ঠিক চিনে নিল রাজাকে। চারদিক তাকিয়ে সে রাজার কাছে এসে বসল নীচু হয়ে। রাজা অবাক্ হয়ে গেলেন। কেমন করে এই সামান্য বালিকা তাঁকে সকলের মাঝখান থেকে চিনে নিল!

এক দেবদূত জোআনের হাতে তলোয়ার তুলে দিচ্ছেন

জোআন রাজার কাছে সৈন্য ভিক্ষা করল। ভগবান্ তাকে ফরাসী দেশের স্বাধীনতা আনার ভার দিয়েছেন। সৈন্য পেলে সে বিদেশী শত্রুদের তাড়িয়ে দেবে।

রাজা তাকে ফিরিয়ে দিলেন না। একটি সাদা ঘোড়া দিলেন আর দিলেন একটি সাদা নিশান। সৈন্যদের আদেশ দিলেন জোআনকে সাহায্য করতে।

জোআনের কথা মিথ্যে হল না। তার নেতৃত্বে একদল সৈন্য ইংরেজের অধিকৃত একটি শহর আক্রমণ করে, সেটা দখল করে নিল। তারপর সে এক আশ্চর্য ঘটনা! জোআনের সৈন্যদল একটার পর একটা শহর দখল করে চলল। ক্রমাগত জয় হতে লাগল তাদের। ইংরেজ সৈন্যরা ভয় পেয়ে দলে দলে পালাতে লাগল।

কিন্তু একটা সামান্য গ্রামের মেয়ে যুদ্ধ করছে! ইংরেজ ভাবল এ তো মানুষ নয়! এ নিশ্চয় ডাইনী!

ফরাসীদের সিংহাসনে আবার বসলেন ফ্রান্সের রাজা। জোআন কোনও কিছুই চাইল না। তার স্বপ্ন সফল হয়েছে। রাজার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠেছিল। জোআন রাজসভায় এসে দাঁড়াল, এক হাতে খোলা তলোয়ার, অন্য হাতে নিশান। এ নিশান সে রাজার হাতেই তুলে দেবে।

ইংরেজ তাকে ভুলতে পারে নি। ফরাসী

যুদ্ধে তাদের জয় হতে লাগল

দেশের রাজার এক শত্রু তাকে ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দিল।

জোআনের বিচার হল। একজন পাদরী আর কয়েকজন বিচারক ছিলেন সেই সভায়। সমবেতভাবে রায় দেওয়া হয়ঃ জোআন মানুষ নয়, সে ডাইনী। আর সে যুগে ডাইনী বলে যাদের সন্দেহ করা হত তাদের পুড়িয়ে মারা হত। জোআনেরও সেই মৃত্যুদণ্ড হল।

কিন্তু আশ্চর্য! একটুও সে ভয় পেল না! একটুও সে চোখের জল ফেলল না! বাজারের কাছে যেখানে অনেক লোকের যাতায়াত, সেইখানে একটা কাঠের দণ্ডের সাথে তাকে বেঁধে রাখা হল শক্ত করে, যাতে সে পালাতে না পারে। তার হাতে তুলে দেওয়া হল ভারী ক্রুশ। তারপর চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হল এই অসমসাহসিকা মেয়েটিকে। মৃত্যুর সময় সে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা জানালে ভগবানের কাছে। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস সে কোনও দিন হারায় নি। এই বিশ্বাসের জোরেই সে অমন অসম্ভব কাজ করতে পেরেছিল।

জোআনের মৃত্যুর পর ফরাসীরা ইংরেজদের এই বর্বরতার শোধ নিয়েছিল। ইংরেজদের হাত থেকে চিরদিনের জন্য চলে গিয়েছিল ফ্রান্স। এখন জোআনকে বলা হয় সেন্ট জোআন—কি না সাধ্বী জোআন।

জোআন ছিল স্বাধীনতার পূজারিনী। সে ছিল পরাধীন ফ্রান্সের প্রেরণাদাত্রী দেবী। ঈশ্বরের নির্দেশে সে ক্ষুদ্র হয়েও মহান কাজ করতে পেরেছিল। বিশ্বাস আর বিশুদ্ধ স্বার্থহীনতার বলে সে সমগ্র ফ্রান্সকে জাগিয়েছিল। তার আদর্শ আজ তাবৎ পরাধীন দেশের মন্ত্র হয়ে উঠেছে।

॥ নেপোলিয়নের গল্প ॥

"অসম্ভব শব্দটি আছে কেবল মূর্খের অভিধানে।"

—একথা নেপোলিয়ন বলেছিলেন। নেপোলিয়নই বলতে পারেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম একটি মানুষ আর জন্মেছিলেন কি না সন্দেহ! দুনিয়ায় তাঁর অসাধ্য কিছু ছিল না। ফ্রান্সের মানুষ যে নামের আকর্ষণে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সে নাম 'নেপোলিয়ন'।

নেপোলিয়ন হয়ে উঠেছিলেন সারা ইওরোপের আতঙ্ক। ছেলেমেয়েরা না ঘুমিয়ে হই হই করলে তাদের মাতারা ভয় দেখাতেন, 'চুপ, ঐ বোনা আসছে!' (Hush, Bona s coming).

তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তার কথা আজো পৃথিবীর লোক প্রবাদ বাক্যের মত স্মরণ করে। একবার তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী আল্‌প্‌স্ পর্বতের দুর্গম স্থানে বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে যায়। নেপোলিয়ন একথা শুনে তাদের বললেন, আল্পস্ থাকবে না, থাকা উচিত নয় (There shall be no Alps) অর্থাৎ আল্পসের বাধা ডিঙিয়ে যাও। এমনি মানসিক বল ছিল তাঁর আর সে বল তিনি সৈন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করতেও পারতেন। তিনি হুকুম দিলেন, এগিয়ে যাও (Press on)—সৈন্যদল যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে গেল।

ফ্রান্সে নেপোলিয়নের রাজত্ব শেষ হল। ইওরোপের রাজারা একজোট হয়ে নেপোলিয়নের নির্বাসনের ব্যবস্থা করলেন। ভূমধ্যসাগরের একটি ছোট দ্বীপ এলবা। ঐ দ্বীপে বন্দী করে রাখা হল

নেপোলিয়নকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হল

তাঁকে। প্যারিস থেকে যাবার সময় ফরাসী জনগণ রাজার মতো করে বিদায় দিলো নেপোলিয়নকে।

কিন্তু এলবা দ্বীপ সেই পুরুষসিংহকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারে নি। মাত্র একশো দিন পরেই তিনি জনকয়েক অনুচর আর সৈন্য নিয়ে একদিন রাতে জাহাজে চেপে বসলেন। এলবার চারদিকে ইংরেজ আর ফরাসীদের যুদ্ধ-জাহাজ। যে-কোনও মুহূর্তে তারা খবর পেতে পারে, আর কোনও রকমে একবার যদি তারা খবর পায় তাহলে নেপোলিয়নকে আর জীবিত থাকতে হবে না।

নেপোলিয়নের জাহাজ চলেছে। পথে এক ফরাসী জাহাজের সঙ্গে দেখা। এলবার জাহাজ দেখে ফরাসী জাহাজের লোকজন প্রশ্ন করল, "নেপোলিয়ন কেমন আছে? এলবার খবর কি?"

নিজের লোকজনদের লুকিয়ে ফেললেন নেপোলিয়ন। ঠাট্টার মতো করে জবাব দিলেন—"খবর ভাল। তোফা আছেন নেপোলিয়ন।" ধীরে ধীরে চলে গেল জাহাজ। ফরাসীরা জানতেও পারল না খাঁচা ভেঙে পাখি পালিয়ে গেল।

জাহাজে বসেই ফ্রান্সের অধিবাসীদের উদ্দেশে নেপোলিয়ন এক ভাষণ তৈরি করে ফেললেন। তারপর তাঁরা এসে নামলেন ফ্রান্সের মাটিতে। আনন্দে তাঁর মন ভরে উঠল। নেপোলিয়ন চলেছেন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস দখল করতে। সঙ্গে লোকজন, সৈন্য-সামন্ত অস্ত্রশস্ত্র তেমন কিছুই নেই। শুধু পথে কয়েকটা ঘোড়া তিনি কিনে ছিলেন।

নেপোলিয়ন আসছেন শুনে পথে ফ্রান্সের গ্রামের লোক, চাষাভুষোর দল ছুটে এল। তাদের কাছে নেপোলিয়ন তখনও সম্রাট্। তারা সবাই তাঁর দলে এসে যোগ দিল। তারপর দলবল নিয়ে নেপোলিয়ন এলেন গ্রেনোব্‌ল্ শহরে। সেখানে তখনকার ফরাসী রাজার সৈন্যরা তৈরী হয়ে ছিল। কয়েক শো লোক নিয়ে নেপোলিয়নকে আসতে দেখে ছ'হাজার সৈন্য ছুটে এল তাঁদের দিকে। নেপোলিয়ন লোকজনদের থামিয়ে দিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলে এলেন সেই শত্রু সৈন্যদের মধ্যে।

সৈন্যরা এক সঙ্গে বন্দুক তুলে ধরল তাঁর দিকে। নেপোলিয়ন স্তব্ধ, নির্ভীক, বীর। গায়ের জামা খুলে তিনি সৈন্যদের সামনে বুক পেতে দিলেন।

"তোমাদের মধ্যে যে তার সম্রাট্কে গুলি করতে পারো, সে গুলি কর। আমি বুক পেতে দিলাম।"

সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক নামিয়ে নিল। কী এক আশ্চর্য মায়ায় তারা এখন অবশ হয়ে গেল।
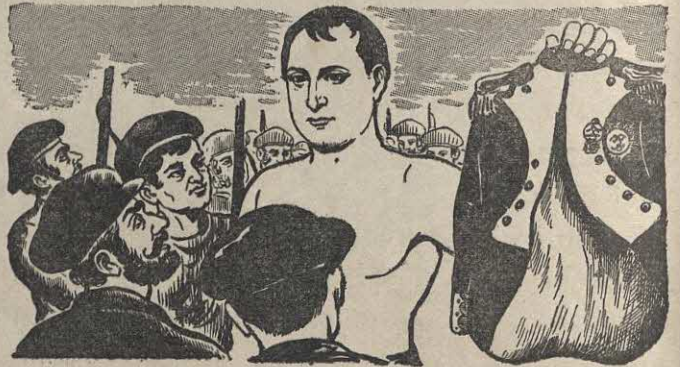
নেপোলিয়ন গায়ের জামা খুলে বুক পেতে দিলেন

'সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হোন!' বলে তারা এসে তাদের প্রাণপ্রিয় সম্রাটের পেছনে দাঁড়াল। আর পালিয়ে গেল এই সৈন্যদলের সেনাপতি। সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

বিনা বাধায় এগিয়ে নেপোলিয়ন প্যারিস অধিকার করলেন। নেপোলিয়নের নামের আকর্ষণেই দলে দলে ফরাসী মানুষ যোগ দিল তাঁর সঙ্গে। নেপোলিয়ন তো প্যারিস জয় করবেন তাঁর ঘোড়ার চাবুকের জোরে—জনগণের মনে এই অদ্ভুত বিশ্বাস।

ঠাকুমা বকুনি দিলেন

তাই হল। সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে, নেপোলিয়ন প্যারিস জয় করলেন। রক্তপাত হল না, কারণ নতুন রাজা তাঁর দলবল নিয়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অসম্ভব ঘটনা বলা যায়।

॥ নেলসন ও ট্রাফালগারের যুদ্ধ ॥

ট্রাফালগারের যুদ্ধে যে দিনটিতে নেলসন জয়ী হয়েছিলেন, এখনও প্রতিবছর সেই তারিখে ইংল্যাণ্ডে ভিক্টরী জাহাজের মাস্তুলের উপর নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ভিক্টরী জাহাজে করেই নেলসন যুদ্ধ করেছিলেন। জাহাজটা পুরনো হয়ে গেছে, তবুও নেলসনের স্মৃতিরক্ষা করার জন্য ইংরেজরা তাকে পোর্টসমাউথ বন্দরে তুলে রেখেছে। বীরের প্রতি তাদের কী অসামান্য শ্রদ্ধা!

শ্রদ্ধা হবারই কথা। ইংল্যাণ্ডের বড় বড় বীর ও নাবিক যোদ্ধাদের সঙ্গে হোরেসিও নেলসনের নামও মনে রাখার মতো।

নেলসনের ছোটবেলার গল্প খুব মজার। তিনি মানুষ হয়েছিলেন তাঁর ঠাকুমার কাছে। এদিকে তাঁর যত বুদ্ধি আর যত সাহসই থাক না কেন, তিনি খুব রোগা আর দুর্বল ছিলেন। নাতির জন্য ঠাকুমার চিন্তা-ভাবনার অন্ত নেই। একদিন নেলসন একা বাইরে বেরিয়েছেন! ঠাকুমা চাকর পাঠিয়ে নাতিকে ডেকে আনলেন। খুব বকুনি দিলেন: এতক্ষণ ধরে একা একা বাইরে থাকা, ভয় বলেও কি কিছু নেই?

অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করল নাতি, "ভয়? সে আবার কে? তাকে তো কখনও দেখি নি!"

এই রকম ছিলেন নেলসন। বারো বছর বয়সেই তিনি গেলেন নাবিক হতে। আর মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়ে বসলেন।

তারপর নেলসনের জীবনের উপর দিয়ে ঘটনার স্রোত বয়ে গেল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধ বাধলে সমস্ত নৌযুদ্ধের ভার পড়ল তাঁরই উপর। এদিকে ফরাসী দেশে তখন নেপোলিয়ন জেগে উঠেছেন। তাঁর ভয়ে সারা ইওরোপ ত্রস্ত। নেলসনের দায়িত্ব এল প্রচুর। অনেকগুলো জলযুদ্ধে তিনি ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজগুলোকে হারিয়ে দিলেন। নিজের একটি চোখ ও একটি হাত হারিয়েও দমতে চাইলেন না নেলসন।

ফরাসীপক্ষীয় ডেনদের সঙ্গে যুদ্ধে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখানোর জন্য ইংল্যাণ্ডের রাজা তাঁকে লর্ড উপাধি দিলেন; আর দিলেন নৌ-বিভাগের সবচেয়ে বড় অ্যাডমিরালের সম্মানজনক পদ।

নেলসনের জীবনের শেষ যুদ্ধ হচ্ছে ট্রাফালগারের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ হয়েছিল ফ্রান্স এবং স্পেনের মিলিত নৌ-বহরের সঙ্গে। স্পেনের উপকূলে ট্রাফালগার

অন্তরীপ। যুদ্ধের ঘাঁটি ছিল সেইটাই। তাই এ যুদ্ধের নাম ট্রাফালগারের যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে সেনানায়ক ছিলেন নেলসন। শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিলেন তিনি। জয়ের পূর্ব মুহূর্তে একটা গুলি এসে তাঁর গায়ে বিঁধল। কিন্তু তখনও বেঁচে রইলেন তিনি। যতক্ষণ না যুদ্ধ শেষ হল তিনি বেঁচে রইলেন। যুদ্ধ শেষ হলে তাঁর লোকজন তাঁকে জয়ের খবর দিল। ঠিক এইটি শোনার জন্যই যেন বেঁচে ছিলেন নেলসন। তাঁর কর্তব্য শেষ করতে পেরেছেন বলে তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।

একটু পরেই মারা গেলেন নেলসন।

নেলসনের মৃত্যুদিন ইংরেজদের জাতীয় শোক দিবস। সবাই নেলসনকে হারিয়ে আত্মীয় বন্ধু বিয়োগের দুঃখ অনুভব করতে লাগলেন। এ যেন তাদের ব্যক্তিগত দুঃখ। এই দুঃখের মধ্যে কোন স্বার্থপরতা ছিল না। ইংল্যাণ্ড তার সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ-অ্যাডমিরাল হারালো সত্য কিন্তু নৌযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ইওরোপের সব দেশকে চিরকালের জন্য বুঝিয়ে দিল যে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে নৌযুদ্ধে পাঞ্জা কষার সাধ্য কারো নেই। অন্য সব দেশের নৌশক্তিকে ইংল্যাণ্ড চিরকালের জন্য নষ্ট করে দিয়েছিল।

॥ নেতাজীর কাহিনী ॥

নেতাজীর ভারতবর্ষ থেকে পালানোর ঘটনাটা ভাবলে গল্প বলেই মনে হয়। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি পুলিস তাঁকে চিনত ও তাঁর খোঁজ খবর রাখত। অথচ এই সব পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি কলকাতা থেকে কাবুল পালিয়ে গেলেন। কারুর মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগল না!

সুভাষচন্দ্র জেলে বন্দী অবস্থায় মুক্তির জন্য অনশন শুরু করলেন। মুখ-ভরতি দাড়ি। কামানো হয় নি। অনশনের জন্যে তাঁকে জেল থেকে এনে বাড়িতে রাখা হল। ইংরেজ অবশ্য বাড়িতে সতর্ক পাহারাদার বসাল। তাদের তীক্ষ্ণ নজর এড়ানো মুশকিল।

এই সব ব্যাপারকে বিশেষ পরোয়া করতেন না সুভাষচন্দ্র। আগে থেকেই তিনি সব যোগাড়-যন্ত্র করে রেখেছিলেন। জেলে বসে দাড়ি রাখার উদ্দেশ্যটা এবার বেশ বোঝা গেল। দাড়িওয়ালা শিখের বেশ ধরে তিনি যখন পাহারাদারদের সঙ্গেই দেখা করে বাড়ি থেকে বের হলেন, সে বেচারারা তখন বুঝতেই পারল না শিকার পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের বোকা বানিয়ে তিনি এলেন পেশোয়ারে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে কাবুলে গেলেন এবং লালা উত্তমচাঁদের বাড়িতে উঠলেন। আসলে এইটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। দেশে বসে পদে পদে পুলিসের ভয়। অথচ তাঁর মতো মানুষকে দেশের কাজ করতেই হবে। তাঁর স্বপ্ন আজাদ-হিন্দকে সার্থক করে তুলতেই হবে।

কাবুল থেকে মস্কো। তারপর বার্লিন। ব্যাপারটা শুনতে যত সহজ কাজে মোটেই তেমন ছিল না। পদে পদে গুপ্তচরের চোখ এড়িয়ে চলতে হয়েছিল তাঁকে। বার্লিনে এসে নেতাজী হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে-সব ভারতীয় সৈন্য জার্মান ও ইটালীয়ানদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তাদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র এক বাহিনী গড়ে তুললেন। পঁয়ত্রিশ হাজার লোক নিয়ে তৈরী হল ফৌজ। জার্মান

নেতাজী হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন

সেনাপতিরা এই বাহিনীকে শিক্ষিত করবার ভার নিলেন। এই বাহিনীকে হিটলার বলেছিলেন 'ফ্রীস্ ইণ্ডিয়েন—'

বছর দুই বাদে সুভাষ গেলেন সিঙ্গাপুর। শ্যাম, যবদ্বীপ, মালয় ইত্যাদি দেশ থেকে ভারতীয়রা তাঁর সঙ্গে দেখা করল। নেতাজীকে সাহায্য করার জন্য তারা প্রস্তুত। গড়ে উঠল বিরাট বাহিনী। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর স্বাধীন ভারত সরকার গঠিত হল। রাষ্ট্রপতি ও সৈনিকদের সর্বাধিনায়ক হলেন 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্র বসু। জার্মানী, ইটালী, জাপান, শ্যাম ইত্যাদি ন'টি রাজ্য মেনে নিল এই নতুন সরকারকে। সর্বত্র গভর্নমেণ্টের শাখা ছড়িয়ে পড়ল। আজাদ-হিন্দ রেডিও স্টেশন বসল, আজাদ-হিন্দ ডাক-টিকিট বেরুল।

নেতাজী এবার শুরু করলেন আক্রমণ। 'চলো দিল্লী' হুংকার উঠল। সৈন্যদলের মধ্যে একদল চলল ইম্ফলের দিকে, অন্য দল কোহিমার পথে। ইম্ফল ও কোহিমার খানিকটা তারা দখল করল। ভারতের মাটিতে স্বাধীন ভারতের বাঘমার্কা নিশান উড়িয়ে দিলেন তাদের সেনাপতি শাহ্‌নওয়াজ।

কিন্তু আজাদ-হিন্দ দল বেশীদূর এগোতে পারে নি। জাপান সাহায্য করবে বলে আশা দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে রকম সাহায্য পাওয়া গেল না। খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই ভাল নেই নেতাজীর সেনাদের। ছিল শুধু মনের জোর। তাই নিয়েই লড়াই চলল। কিন্তু ব্রিটিশদের বোমারু বিমানের কাছে কি করে তারা দাঁড়াবে? এর উপর আবার বর্ষা নামল। পিছু হটতে লাগল নেতাজীর বাহিনী। বাধ্য হয়ে কর্নেল সেহগল আত্মসমর্পণ করলেন, আর শাহ্‌নওয়াজ বন্দী হলেন।

কিন্তু আশা ছাড়লেন না নেতাজী। তাঁর প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হল। একদিন সফল তিনি হবেনই, এ বিশ্বাস তাঁর মনে আছে। ওদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী হেরে গেছে, জাপানীরা আত্মসমর্পণ করেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে নেতাজী

এ দুটি দেশ থেকেই সাহায্য পেয়েছিলেন নেতাজী। তিনি চললেন টোকিওর পথে। শোনা যায়, টোকিও যাবার পথে তাইওয়ান দ্বীপের তাইহোকু বিমানঘাঁটিতে এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে তিনি মারা যান। হয়ত নেতাজীর শেষ জীবনটা আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। তবু এখনও বহু লোক বিশ্বাস করে, নেতাজী বেঁচে আছেন, একদিন তিনি ফিরে আসবেনই।

॥ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ॥

আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হবার পর ইওরোপীয় দেশগুলি সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে এবং বাণিজ্য করতে দলে দলে লোক পাঠাতে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদে আমেরিকা একটি সমৃদ্ধ দেশ। পূর্ব আমেরিকায় ব্রিটিশরা উপনিবেশ স্থাপন করল। এখানে তারা বাণিজ্যেরও সুবিধে পেতে লাগল। চা, তামাক, আলু, চিনি এসবের চাষ করতে লাগল। ভার্জিনিয়া ও দক্ষিণের উপনিবেশগুলিতে ইংরেজরা ক্রীতদাস দিয়ে চাষ করিয়ে নিত। প্রথম দিকে দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদের দিয়ে তারা সেই কাজ করাত। তারা এ ব্যাপারে আপত্তি জানাল। তাদের উপর কম অত্যাচার করা হয় নি! তারা ব্রিটিশের দাসত্ব স্বীকার করল না। তখন তাদের বদলে এই সব কাজ করার জন্য আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস নিয়ে আসা হল।

জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধযাত্রা করছেন

আমেরিকায় ইংরেজদের উপনিবেশ ছিল তেরোটি। ঔপনিবেশিকরা যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধে পেত তা ইংল্যাণ্ডের স্বার্থেই ব্যবহৃত হত। আমেরিকার উপনিবেশকারীদের এতে কোনই লাভ হত না। তার উপর ইংল্যাণ্ডের নতুন আইন হল। তাতে বলা হল উপনিবেশের এই সব পণ্য জিনিস একমাত্র ইংল্যাণ্ডের জাহাজেই রপ্তানি করা চলবে। কতকগুলি বিশেষ পণ্য আবার শুধু ইংল্যাণ্ডেই পাঠাতে হবে। বস্ত্রশিল্পে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য ছিল একচেটিয়া। পাছে এ ব্যাপারে তাদের ক্ষতি হয় তাই আমেরিকায় কার্পাসের জিনিস তৈরী নিষিদ্ধ ছিল। আমেরিকাবাসীরা নিজেদের দেশের সম্পদ্ ব্যবহার করতে পারত না। তাদের উপর করের বোঝা চাপানো হতে লাগল। এই সব ব্যাপারে এরা ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে উঠল। তাদের মনে তখন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। ইংল্যাণ্ড মনে করত আমেরিকার এই ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই একটা অঙ্গ। ইংল্যাণ্ড তাই শাসন-ব্যাপারেও এদের উপর কর্তৃত্ব করত। ফলে ঔপনিবেশিকরা ইংল্যাণ্ডের অধীনতা থেকে মুক্তি পেতে চাইল। তারা কিন্তু আমেরিকার আদিবাসী নয়, ইওরোপেরই নানা দেশ থেকে আগত সাদা চামড়ার লোক—বেশির ভাগই ইংরেজ।

এদিকে দীর্ঘদিন নানা যুদ্ধের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের ঋণের বোঝা বেড়ে গেছে। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রী গ্রেনভিল ঔপনিবেশিকদের উপর স্ট্যাম্প কর বসালেন। আমেরিকাবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে উঠল এই করের প্রতিবাদে। অবশেষে এই কর তুলে নেওয়া হল বটে, কিন্তু জানিয়ে দেওয়া হল উপনিবেশের উপর কর স্থাপনের ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আছে। এই ঘোষণাই দেশের মধ্যে একটা গোলযোগ সৃষ্টি করেছে, এমন সময় মন্ত্রী টাউনসেণ্ড চা, কাচ, সীসা, চিনি—এই সব জিনিসের উপর নতুন করে ট্যাক্স বসালেন। লোকজন ক্ষেপে উঠল। বোস্টন বন্দরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চা-বোঝাই জাহাজ এসে পৌঁছতেই রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে ঔপনিবেশিকরা সেই চায়ের বাক্স জলে ফেলে দিল। তখন ইংরেজ সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দিল। স্বায়ত্তশাসনও কিছু কেড়ে নিল। সেখানে সৈন্য মোতায়েন রইল।

এর পর আমেরিকার উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিরা ফিলাডেলফিয়া শহরে মিলিত হলেন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধতা করার জন্য তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

দিন এল। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে বোস্টন বন্দরের কাছে লেক্সিংটনে বিদ্রোহীদের উপর ইংরেজ সৈন্য গুলি চালাল। শুরু হল স্বাধীনতার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের নেতা হলেন জর্জ ওয়াশিংটন।

প্রথম দিকে এদের ভারী অসুবিধে ছিল। ইংরেজ সৈন্যের মতো সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী এদের ছিল না। তা সত্ত্বেও লেক্সিংটনের যুদ্ধে ইংরেজদের হার হল। বাংকারহিলের যুদ্ধে আবার জিতল ইংরেজরা। ওয়াশিংটন প্রস্তুত হলেন। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম হো পরাজিত হলেন ও সেই সঙ্গে ত্যাগ করে গেলেন ম্যাসাচুসেট্স্। এর পরের বছর স্যারাটোগায় ইংরেজ সেনাপতি আত্মসমর্পণ করলেন। এই বছর ৪ঠা জুলাই আমেরিকার কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা

করল। যুদ্ধ কিন্তু তখনও চলছে। ফ্রান্স আর স্পেন আমেরিকার পক্ষ নিয়ে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। হল্যাণ্ডও যোগ দিল তাতে। তারপর ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি কর্ণওয়ালিস ইয়র্ক টাউনে আত্মসমর্পণ করলে যুদ্ধও শেষ হল। স্বাধীন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন জর্জ ওয়াশিংটন।

॥ ফরাসী বিপ্লব ॥

ইওরোপের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব একটি উন্মাদনাকর অধ্যায়। পৃথিবীর অনেক পরাধীন জাতিকে জেগে ওঠার প্রেরণা দিয়েছে এই ফরাসী বিপ্লব। মনে রাখতে হবে যে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নয়, ফরাসী বিপ্লব হয়েছিল দেশের অক্ষম শাসক বুরবন রাজাদের উচ্ছেদ করবার জন্যে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এঁরা ছিলেন অত্যাচারী। আর একদল অভিজাত লোক রাজাকে প্রায় কিনে রাখত। এরা যাকে খুশী বন্দী করত। এরা মানুষের উপর অত্যাচার করত। তার উপর তখনকার সমাজে গরিব ও ধনীলোকের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। একদল লোক সব রকম সুখসুবিধে পেত। আর সমাজে যারা সত্যিকার গুণী সেই সব শিক্ষিত মানুষের অবস্থা একটুও ভাল ছিল না। সমাজে সুবিধে পেত শুধু ধনীলোক, জমিদার আর পুরোহিতরা। শ্রমিক ও চাষীদের অবস্থা ছিল আরো খারাপ। তাদের উপর অত্যাচার, অবিচারের সীমা ছিল না। তাদের অবস্থা খারাপ, অথচ তাদের বিরাট করের বোঝা বইতে হত। এই সব কারণে ফরাসীদেশের সাধারণ মানুষ যখন ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে উঠেছে তখন একদল মনীষী তাঁদের চিন্তা ও লেখার মধ্য দিয়ে দেশের লোককে জাগিয়ে তুললেন। এঁদের মধ্যে রুশো আর ভলতেয়ারের নাম উল্লেখযোগ্য। রুশো আনলেন সাম্য আর মৈত্রীর বাণী। ভলতেয়ার সমাজের অন্যায় কাজের সমালোচনা করে মানুষকে সচেতন করে তুললেন।

জনগণের মনে যখন বিক্ষোভ জমে উঠেছে তখন তারা শুনলো সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতার বাণী।

ফ্রান্সের রাজা তখন ষোড়শ লুই। ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভায় পুরোহিত আর অভিজাতরা ছাড়া অন্য কোনও সম্প্রদায় ভোট দিতে পারত না। যারা ভোট দিতে পারত না তারা তাদের ভোটাধিকার দাবি করল। তারা শপথ করল নতুন আইন ও সংবিধান না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। জনসাধারণের নেতা হলেন মিরাবো। তিনি প্রতিনিধি সভাকে জাতীয় সভা বলে ঘোষণা করলেন।

বাস্তিল ছিল ফ্রান্সের কারাগার। এখানে বহু নির্দোষ মানুষকে বন্দী করে রাখা হত। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই একদল উত্তেজিত জনতা বাস্তিল কারাদুর্গ ভেঙে দিল। বন্দী বেশী ছিল না। যারা ছিল মুক্তি পেল। তবু এই দিনটি মুক্তির প্রতীক হয়ে আছে। আজও ফরাসী জনগণ এ দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

বাস্তিলের পতন হবার অল্পদিন পরে একদল ক্ষুধার্ত মানুষ ভার্সাই নগরে এল। তারা রাজা ও রানীকে প্রায় বন্দী করে নিয়ে এল প্যারিসে।

এদিকে নতুন সংবিধান তৈরী হয় ও রাজা লুইকে সে সংবিধান মেনে নিতে বাধ্য করা হয়। এই সংবিধানে রাজার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। তাঁর সম্পত্তি-জমি সব বাজেয়াপ্ত করা হয়। চার্চেরও যাবতীয় ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং চার্চকে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হয়। ফ্রান্স থেকে দাসপ্রথা তুলে দেওয়া হয়।

ওদিকে রাজা ষোড়শ লুই ও রানী ফ্রান্স থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জনসাধারণের হাতে ধরা পড়ে তাঁরা বন্দী হলেন। তাঁদের প্যারিসে রাজপ্রাসাদে রাখা হল। দেশে তখন বিপ্লব চলছে। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের অগস্ট মাসে ক্ষিপ্ত জনতা রাজ-প্রাসাদ লুঠ করে আবার রাজা রানীকে বন্দী করল। সেই বছর সেপ্টেম্বরে ক্ষিপ্ত জনতা বহু লোককে হত্যা করল। একে বলা হয় সেপ্টেম্বরের হত্যাকাণ্ড। এই

সময় জাতীয় সভার অধিবেশন বসল। এই সভায় ফ্রান্সকে একটি প্রজাতন্ত্র দেশ বলে ঘোষণা করা হল। আইনের দৃষ্টিতে সকলের ক্ষমতা স্বীকার করা হল। রাজা ষোড়শ লুইয়ের এবং তাঁর রানী মারী আঁতোয়ানেতের প্রাণদণ্ড দেওয়া হল।

ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্রোহ করল। তখন ফ্রান্সের শাসনভার নিলেন রোবস্‌পীয়র নামে একজন চরমপন্থী। দেশে এই সময় সন্ত্রাসবাদের রাজত্ব চলল। রোবস্‌পীয়র হয়ে উঠলেন স্বৈরাচারী। সন্দেহ হলেই তিনি মানুষের প্রাণদণ্ড দিতে লাগলেন। গিলোটিন যন্ত্রে কত মানুষ প্রাণ হারাল!

ম্যাৎসিনি অনুচরদের নিয়ে আন্দোলনে নামলেন

সন্ত্রাসবাদের রাজত্বও বেশিদিন চলতে পারে না। ফ্রান্সে রোবস্‌পীয়রের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ দেখা দিল। রোবস্‌পীয়রকে গিলোটিনে হত্যা করা হল। ফ্রান্সে এবার তৈরী হলো নতুন সংবিধান। এই নতুন শাসনতন্ত্রের নাম ডাইরেক্টরী। পাঁচজন ডাইরেক্টর শাসন-ব্যাপারের কর্তা হলেন। এইভাবে ফরাসী বিপ্লব দেশের রাজনীতি বদলে দিল।

॥ ইটালীর ঐক্য আন্দোলন ॥

ইটালীর ঐক্য আন্দোলন ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতা লাভের যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

ষোড়শ লুইয়ের উপর প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হল

নেপোলিয়ন ইটালীবাসীর মনে ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা প্রথম জাগিয়ে তুললেন। তার আগে ইটালীতে কোনও ঐক্য ছিল না। কালক্রমে নেপোলিয়নের পতন হল। ভিয়েনা কংগ্রেসের পর ইটালীতে নতুন শাসন-ব্যবস্থার সূত্রপাত হল। এদিকে ইটালীর অধিবাসীদের মনে তখন ফরাসী বিপ্লবের স্মৃতি। এর ভাবধারায় তারা প্রভাবিত হয়েছে। মনে তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। তারা চায় সমস্ত ইটালী ঐক্যবদ্ধ হোক। নতুন শাসন-ব্যবস্থা মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। দেশের মধ্যে তৈরী হল কারবোনারী নামে গুপ্ত সমিতি। এরা চাইত দেশে বিদেশী অস্ট্রিয়ান শাসনের অবসান হোক, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হোক। এরা নানা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ করতে লাগল। নেপ্‌ল্‌স্‌, পীয়েডমেণ্ট, লম্বার্ডিতে বিদ্রোহ দেখা দিল। দলাদলির জন্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল আন্দোলন। বিপ্লবী নেতারা সব কারারুদ্ধ হলেন। এর পর বিদ্রোহ দেখা দিল মধ্য ইটালীতে। অস্ট্রিয়া এই বিদ্রোহও দমন করল।

তারপর আন্দোলন শুরু হল অন্যভাবে। ম্যাৎসিনি তাঁর অনুচরদের নিয়ে আন্দোলনে নামলেন। ১৮৪৮

খ্রীষ্টাব্দে দেশে গণ-অভ্যুত্থান হল। প্রথমে হল মিলান শহরে। পাঁচদিন ধরে চলল যুদ্ধ। ভেনিসেও ঠিক সেই রকম বিদ্রোহ হওয়ার পর সেখানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনে এবার যোগ দিলেন ইটালীর বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আবার শুরু হল সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নিলেন। আন্দোলন ব্যর্থ হল।

জনগণ রাজতন্ত্রী দলগুলির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলল। সাধারণতন্ত্রী দল হয়ে উঠল জনপ্রিয়। এবার এলেন ম্যাৎসিনি। তিনি জনসাধারণকে ডাক দিলেন দেশের মুক্তিসংগ্রামে। জনগণও সাড়া দিল সেই ডাকে। ম্যাৎসিনির সহকর্মী ছিলেন গ্যারিবল্ডি। এঁরা রোমে আন্দোলন চালালেন। পোপ কিছু শাসনসংস্কার করলেন, কিন্তু তিনি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে নারাজ। পোপের ব্যবহারে দেশের লোক তখন ক্ষেপে উঠেছে। এদিকে নেপ্‌ল্‌স্‌-এর রাজা হয়ে উঠলেন স্বেচ্ছাচারী। তিনি নানা ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু করলেন। জনসাধারণ আর দেরি করল না। তারা ম্যাৎসিনি আর গ্যারিবল্ডিকে নেতা করে রোমে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করল। পোপ বাধ্য হয়ে রোম ত্যাগ করলেন। ঠিক এই রকম সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হলো টাস্কানীতেও।

এদিকে রোমে পোপের পতন দেখে ফরাসী সৈন্য-বাহিনী এল ইটালীতে। গ্যারিবল্ডির সৈন্যদল দুমাস ধরে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করল। ফরাসী বাহিনীকে আবার পোপই রোমে এনে বসালেন। ইটালীর আন্দোলন ব্যর্থ হল। রাজতন্ত্রই জয়ী হল সেখানে।

ইটালীর ঐক্য আন্দোলন কিন্তু এর পরই থেমে গেল না। নতুন করে আন্দোলন শুরু হল পীয়েডমণ্ট রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কাউণ্ট কাভুরের নেতৃত্বে। কাভুর ম্যাৎসিনির পথ নিলেন না। তিনি ছিলেন কূটনীতি-বিদ্। তাঁর চেষ্টায় ইটালীর সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র ইটালীর সমস্যা নিয়ে ভাবতে লাগল।

কাভুর অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। যুদ্ধে তিনি ফরাসী-সম্রাট্‌ তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্য পেলেন। অস্ট্রিয়ার সৈন্য-বাহিনী দুটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হল। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি হল আবার।

মধ্য-ইটালীতে গণভোট হবার পর সারডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল উত্তর ও মধ্য ইটালীর রাজা হলেন। দক্ষিণ ইটালী তখনও এক হয় নি। ম্যাৎসিনির শিষ্য লালকোর্তা দলের অধিনায়ক গ্যারিবল্ডি আবার আন্দোলনে নামলেন। এক হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি এলেন সিসিলিতে। সিসিলিবাসীরা দলে দলে তাঁর পতাকাতলে এসে দাঁড়াল। বুরবোঁ রাজার সৈন্যবাহিনীকে হারিয়ে তিনি সিসিলি অধিকার করলেন। তারপর ব্রিটিশ নৌবহরের সাহায্যে গ্যারিবল্ডি নেপ্‌ল্‌স্‌ অধিকার করলেন। গ্যারিবল্ডির অগ্রগতি কাভুরকে চিন্তিত করে তুলল। তিনি ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে গ্যারিবল্ডির বিরুদ্ধে পাঠালেন। তিনি রোম অধিকার করলেন। গণভোটের ফলে দক্ষিণ ইটালীর অধিবাসীরা তাঁর পক্ষে যোগ দিল। বাধ্য হয়ে গ্যারিবল্ডি নতি স্বীকার করলেন।

এর পর ভিক্টর ইম্যানুয়েলের অধীনে সমস্ত স্বাধীন ইটালী এক হল।

যুদ্ধক্ষেত্রে গ্যারিবল্ডি

॥ রাশিয়ার বিপ্লব ॥

ফ্রান্সের মতো রাশিয়ার রাজতন্ত্রও ছিল স্বৈরাচারী। রাশিয়ার রাজাদের বলা হত জার (Tsar, Czar). জাররা শুধু অত্যাচারী ছিলেন না, অকর্মণ্যও ছিলেন। সারা ইওরোপে রাশিয়ার মতো খারাপ সামাজিক অবস্থা আর কোথাও ছিল না। সমাজে ছিল দু'রকম মানুষ। একদল খুব ধনী—তারা অভিজাত। আর অন্যরা হচ্ছে সার্ফ (দাস)। এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। রাশিয়ার বেশির ভাগ জমি ছিল ঐ অভিজাত-মহলের দখলে। বলতে গেলে, কৃষক ছিল ভূমিহীন। তারা 'মির' বলে এক ধরনের গ্রাম্য সমিতির অধীন ছিল। এদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার ও অবিচার হত। আর ছিল রাশিয়ার শ্রমিকরা। এরা সার্ফদের মতোই দুর্দশাগ্রস্ত। এজন্য রাশিয়ার বড় বড় শহরে প্রায়ই শ্রমিক আন্দোলন লেগে থাকত। দেশের আর্থিক অবস্থাও মোটেই ভাল ছিল না।

রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মনে এই সব কারণে ক্ষোভ আর অসন্তোষ ক্রমাগত জমতে লাগল। রাশিয়ার লেখকরাও এ বিষয়ে সহায়তা করেছিলেন। টলস্টয়, ডটস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ—এঁদের লেখায় এই স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ পেতে লাগল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া যখন বারবার পরাজিত হতে থাকে তখন দেশের লোকের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল জারের ওপর। চাষীরা বিদ্রোহ করল, শ্রমিকরা ধর্মঘট করল আর সৈন্যরা দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে লাগল। এর উপর দেশে তখন খাদ্যাভাব।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেট্রোগাড শহরে শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। সৈন্যবাহিনী তাদের সমর্থন করল। তারা সম্মিলিতভাবে রাজধানীতে একটি সোভিয়েট অর্থাৎ পরিষদ্ গঠন করল। সেই সময়ে জার আসবেন পেট্রোগ্রাড শহর দেখতে। শ্রমিকরা রেল-লাইন তুলে তাঁর আসবার পথ বন্ধ করে দিল। বিদ্রোহ চলল। কোনও মতেই আপস হল না। জনসাধারণের দাবি অনুযায়ী জার সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। রাশিয়ায় রোমানফ বংশের অবসান ঘটল। ডুমা বা জাতীয় পরিষদ্ একটি অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট স্থাপন করলেন। এরপর জারকে সপরিবারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।

এই অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সাহায্যে। এই সরকার কিছু রাজনৈতিক সংস্কার করেছিল।

কিন্তু জনসাধারণ এতে খুশী হয় নি। তাদের দাবি আর্থিক সচ্ছলতা আর শান্তি। অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট সে দাবি মেটাতে পারল না। রাশিয়ার সর্বত্র শ্রমিক ও সৈনিকেরা গণ-পরিষদ্ গড়ে তুলল। প্রচার চলতে লাগল। শ্রমিক ও সৈন্যরা ধর্মঘট করল। কৃষকরা জোর করে জমি দখল করে নিল। এই অবস্থায় মেনশেভিক দল গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব নিল। তখন জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে। মেনশেভিক দল এই যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিল। অন্যদিকে বলশেভিক নামে যে দ্বিতীয় দল ছিল তারা যুদ্ধ বন্ধ করার

রাশিয়ার শ্রমিকদের ধর্মঘট

পক্ষপাতী। বলশেভিক দল সৈন্যদের প্রভাবিত করল। সৈন্যরা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল। দেশে তখন ঘোরতর অশান্তি। এই অবস্থায় বলশেভিক নেতা লেনিন তাঁর সহকর্মী ট্রট্স্কী আর স্টালিনের সাহায্য নিয়ে গভর্নমেণ্ট দখল করলেন। রাশিয়ায় প্রোলেটেরিয়েটদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। নতুন গভর্নমেণ্টে লেনিন হলেন প্রেসিডেণ্ট।

মাথায় হাতুড়ির আঘাত করল

॥ রাশিয়ার বিপ্লবী ট্রট্স্কী ॥

লেনিনের মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রট্স্কীর ভাগ্যের চাকাও ঘুরে যায়। স্টালিন, জিনোভিফ, কামেনেভ, ট্রট্স্কী—এঁদের মধ্যে কে লেনিনের স্থান অধিকার করবেন তাই নিয়ে রাশিয়ায় গোলোযোগ বাধল। ট্রট্স্কীর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে বাকী তিনজন গভর্নমেণ্টের সর্বেসর্বা হয়ে বসলেন। তারপর কূট-কৌশলী স্টালিন সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন। ট্রট্স্কীকে তিনি দল থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ট্রট্স্কী বুঝতে পারলেন রাশিয়ায় থাকা আর তাঁর চলবে না। স্টালিনের লোকের হাতে তাহলে তাঁকে প্রাণ হারাতে হবে।

সপরিবারে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ট্রট্স্কী। প্রাণের ভয়ে সব সময় সতর্ক হয়ে থাকেন। কোনও দেশই বেশী দিন তাঁকে রাখতে সাহস পায় না। যাযাবরের মতো তিনি জায়গা বদলে চলেন। অবশেষে এসে পৌঁছলেন মেক্সিকোতে। তিনি জানতে পারলেন না গুপ্ত-ঘাতকের দল সেখানেও তাঁকে অনুসন্ধান করে ফিরছে। শেষ পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধও হল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। একদিন একজন যুবক এল ট্রট্স্কীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। দুজনে কথা বলছেন। হঠাৎ সেই যুবক ট্রট্স্কীর মাথায় হাতুড়ির আঘাত করল। সেই আঘাত সহ্য করতে পারলেন না তিনি। এইভাবে মৃত্যু হল তাঁর।

যুদ্ধে ট্রট্স্কী জিতলেন

॥ চীনের বিপ্লব আন্দোলন ॥

চীন হচ্ছে এক বিরাট দেশ। ভারতের প্রতিবেশী এই দেশের সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে একটি।

ভারতের মতো চীনেও বাণিজ্য করতে এসেছিল বিদেশীরা। তাদের মধ্যে ইংরেজরাই প্রধান। এরাই শেষ পর্যন্ত সেখানে টিঁকে রইল। এই ইংরেজ বণিকরা আফিংএর ব্যবসা করত। এখানে আফিং-এর চালান দিয়ে তারা প্রচুর লাভ করত। চীন সরকার আফিং-এর

ব্যবসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিলেন, তবুও গোপনে বাণিজ্য চলতে লাগল।

তারপর চীন-সম্রাট্ কড়া নিয়ম করলেন। বণিক্‌দের জাহাজ তল্লাশ করে কুড়ি জাহাজ আফিং-এর বাক্স এনে পোড়ানো হল। ক্যাণ্টন নদীতে ইংরেজদের জাহাজ থেকে চীনে জাহাজের উপর গুলি চালানো হল। এতে ব্যাপার আরো জটিল হয়ে উঠল। ইংরেজ আর চীনাদের মধ্যে শুরু হল যুদ্ধ—যাকে বলা হয় প্রথম আফিং-এর যুদ্ধ; কেন না, আফিংকে কেন্দ্র করেই এই বিবাদ। যুদ্ধে চীনের হার হল। নানকিং-এর সন্ধি অনুযায়ী চীন গভর্নমেণ্ট হংকং ইংল্যাণ্ডকে ছেড়ে দিল। আর ক্যাণ্টন, সাংহাই ইত্যাদি পাঁচটি বন্দরে ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার রইল। তারপর আবার হল চীন-ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ। এবারেও ঐ আফিং নিয়েই যুদ্ধ। এ যুদ্ধেও চীন হারলো। চীন-সম্রাটের রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হল। তিয়েনসিনের সন্ধিতে যুদ্ধ শেষ হল। চীন সরকার ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিল। ইওরোপীয়রা চীনে বাণিজ্যের আরো অনেক সুবিধে পেল।

পরপর দুটি যুদ্ধে হেরে গিয়ে চীন ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়ল। বিদেশীরা একে একে চীন গ্রাস করতে লাগল। এইভাবে বিদেশী শক্তিরা চীনের প্রায় একশটি বন্দর নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল।

এবার চীনের জাগরণ শুরু হল। বিদেশীদের হাত থেকে মুক্তির জন্য বক্সার বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহ-পরিচালকরা গড়ে তুললেন বক্সার অর্থাৎ মুষ্টিযোদ্ধার ভ্রাতৃসংঘ নামে একটি দল। তাঁদের নীতি হল বিদেশীদের হাত থেকে সাম্রাজ্য বাঁচানো। বিদ্রোহ সারা চীনে ছড়িয়ে পড়ল। সৈন্যরাও এতে যোগ দিল। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তির সম্মিলিত বাহিনী বিদ্রোহ দমন করল। চীনসরকারকে আবার ক্ষতিপূরণ দিতে হল।

এদিকে পাশ্চাত্য প্রভাবে চীনেও দেখা দিল জনজাগরণ। এর আগেই চীনা তরুণদের আন্দোলন শুরু হয়েছে। চীনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার হতে লাগল। কিন্তু নানা সংস্কার হলেও চীনের তরুণ দল খুশী হল না। তারা আরও তীব্র আন্দোলন শুরু করল। চীনের অকর্মণ্যতার জন্য তারা দায়ী করল মাঞ্চু রাজবংশকে। তাদের দাবি এই বংশের রাজত্বের অবসান আর পার্লামেণ্টারী শাসন। দক্ষিণ চীনে মাঞ্চুবিরোধী সাধারণতন্ত্রের আন্দোলন আরম্ভ হল। আন্দোলনের নেতা হলেন ডঃ সান-ইয়াৎ-সেন। এই আন্দোলনের জয় হল, চীনে প্রতিষ্ঠিত হল সাধারণতন্ত্র। ডঃ সান-ইয়াৎ-সেন হলেন তার প্রেসিডেণ্ট। তাঁর দলের নাম কুয়ো-মিন্-টাং। পরে মাও-সে-তুংএর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট দল কুয়োমিন্‌টাং দলের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছে।

॥ তুরস্কের বিপ্লব ॥

তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদও ছিলেন স্বৈরাচারী। নিজের বিলাসের দিকে নজর দেওয়া ছাড়া প্রজাদের কোনও উন্নতির দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না, উপরন্তু পাছে প্রজারা বিদ্রোহ করে বসে এজন্য তিনি সারা দেশে গুপ্তচরের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। সামান্য অপরাধেই দেশের লোককে গ্রেফতার করে জেলে দেওয়া হত।

এই অবিচারের বিরুদ্ধে দেশের তরুণ দল সক্রিয় হয়ে উঠল। তারা মুক্তিসংঘ নামে এক দল গড়ে তুলল। দলের একটি পত্রিকায় তাদের কাজকর্ম, উদ্দেশ্য ইত্যাদি জানানো হত। এ সব লিখতেন মুস্তাফা কামাল নামে সামরিক স্কুলের একজন ছাত্র।

এ খবর রাজার অগোচর রইল না। কামালকে কলেজ ছাড়তে হল। কিন্তু তিনি দলের কাজ বন্ধ করলেন না। সেখানেও গুপ্তচরের হাতে তিনি ধরা পড়লেন। ফলে তাঁর জেল হল।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি সিরিয়ায় সেনানায়কের চাকরি নিলেন। সে কাজ ভাল না লাগায় তিনি ছুটি নিয়ে এলেন। ছদ্মবেশে সালনিকায় এসে গড়ে তুললেন গুপ্ত সমিতি। ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়তে আবার তিনি সিরিয়ায় ফিরে গেলেন।

কিছুদিন বাদে আবার তুরস্কে এলেন কামাল। সেখানে তখন অনেক বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছে। তাদের এক করে কামাল গড়ে তুললেন একটি বড় দল—সোসাইটি অফ ইউনিয়ন অ্যাণ্ড প্রগ্রেস।

এদিকে তুরস্ক ছিল দুর্বল রাষ্ট্র। এই দুর্বলতার সুযোগে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী এই সব বিদেশী রাষ্ট্র তুরস্ককে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার মতলব করছে। কামাল পাশার দল তাদের আতঙ্কিত করে তুলল এবং এদের দমন করতে চাইল।

কামাল পাশার সৈন্যদলের সঙ্গে সুলতানের সৈন্যদের যুদ্ধ

ইতিমধ্যে তরুণ দল বিদ্রোহ করল। সুলতানের সেনাদল হেরে গেলে আব্দুল হামিদের জায়গায় সিংহাসনে তাঁর ভাই বসলেন।

এদিকে ইওরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগ দিয়েছে। চারটি যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে কামাল হটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার হল জার্মানীর। মিত্রশক্তি তুরস্কের অস্ত্রশস্ত্র ফেরত চাইল। কামাল বুঝলেন এ হচ্ছে আত্মসমর্পণ করানোর প্রস্তাব। তিনি সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাজির হলেন আনাটোলিয়ায়। ফরাসীরা যে অঞ্চল দখল করেছিল সেখান থেকে তাদের হটিয়ে দিলেন।

তারপর জাতীয় নেতাদের নিয়ে কংগ্রেস বসল। গড়ে উঠল এক জাতীয় পরিষদ্। বিদেশীদের কাছে তারা মাথা নত করবে না। সুলতানকে বলা হল যে, প্রধানমন্ত্রী দামাদ ফরিদকে তাড়াতে হবে। বিদেশীরা চমকে উঠল। কামালের সৈন্যদল কনস্টান্টি-নোপল দখল করে নিল। সুলতান সন্ধি করতে চাইলেও কামালের দল তা মানল না। কুড়ি দিন যুদ্ধ চলার পর ইংরেজ বিতাড়িত হল। গ্রীক-অধিকৃত এলাকা থেকেও তাদের তাড়ানো হল। তুর্কীরা কামালকে গাজী ও পাশা উপাধি দিল। ১৯২৩ সালের ১৯শে অক্টোবর তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। সভাপতি হলেন গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা। পরে তাঁকে কামাল আতাতুর্ক (তুরস্কের জনক) বলা হত।

———

॥ দ্রব্য বিনিময় ॥

যে সময় থেকে মানুষ মিলেমিশে বসবাস করতে শুরু করেছে, সমাজ গড়ে উঠেছে, সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে, তখন থেকেই মানুষে মানুষে একে অপরের সঙ্গে জিনিসপত্রের লেন-দেন শুরু করেছে।

॥ বিনিময়-ব্যবস্থার অসুবিধে ॥

কিন্তু এ ব্যবস্থায় দেখা গেল অসুবিধে অনেক। কোনও চাষী যদি তার ধান দিয়ে কাপড় পেতে চায় তাহলে ধান নিয়ে এমন তাঁতীর কাছে তাকে যেতে হবে যার আবার ধানেরই প্রয়োজন। যে তাঁতীর গোলায় ধান মজুত আছে সে আর ধান নিয়ে কাপড় দিতে না চাইলেই ফ্যাসাদ। সে হয়ত কলুর কাছ থেকে তেল নিয়ে কাপড় দিতে চায়। তখন তাকে যেতে হবে এমন কলুর সন্ধানে যার ধানের দরকার। তার সঙ্গে ধান বদলে তেল এনে সেই তেল বদলে তবে কাপড় পাওয়া যেতে পারবে।

তা ছাড়া কোন্ জিনিসের কতখানির পরিবর্তে অপর কোন্ জিনিসের কতখানি পাওয়া যাবে তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। চাষীর গরজ বুঝে তাঁতী হয়ত বলে বসত—একখানা কাপড় নিলে এক বস্তা ধান দিতে হবে। আবার তাঁতীর যদি বেশী গরজ থাকত, চাষী চেপে যেত, বলত আধবস্তার বেশী ধান পাবে না।

ক্রমে গরু, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর মাধ্যমে লেন-দেন হতে লাগল। কিন্তু তাতেও আর এক ফ্যাসাদ। একটা গরু কেটে আধটুকরা দিয়ে কোনও জিনিসের প্রয়োজনীয় অল্প পরিমাণ নেওয়া সম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে হালের গরু বা দুধালো গাইয়ের বদলে ছোট বাছুরের সন্ধান করতে হত। যাই হোক, গরুকে যে মানুষ এক সময়ে ধন হিসেবে মনে করত গোধন কথাটির মধ্যেই তার ইঙ্গিতটুকু রয়ে গেছে।

॥ কড়ি ও টাকার প্রচলন ॥

ক্রমে জিনিসপত্র বিনিময়ের পরিবর্তে কড়ির মধ্যস্থতা গ্রহণ করা হতে লাগল।
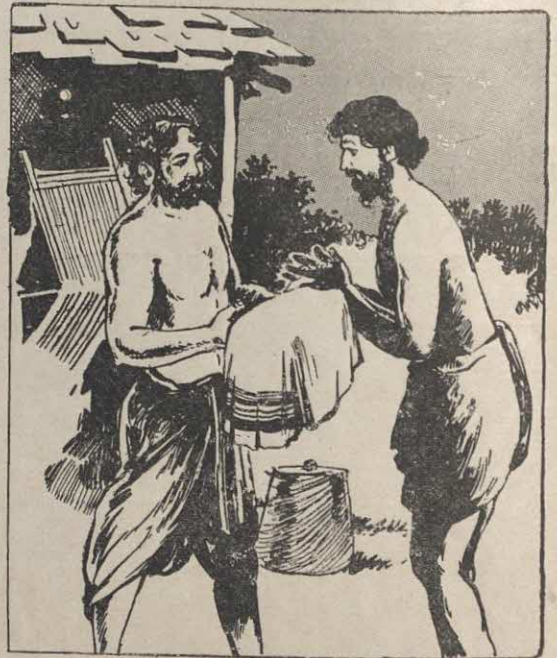
কড়ির বদলে কাপড় নেওয়া

॥ টাকা ॥

বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে টাকার ব্যবহার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের লেন-দেন খুব সহজ হয়ে গেল, কারণ টাকা টেঁকসই, তাই তা সঞ্চয় করে রাখা চলে। টাকার নানারকম আংশিক মূল্যের মুদ্রাও ব্যবহৃত হয়। ফলে যে কোন রকম আংশিক দাম দেওয়া সহজ। টাকা স্থানান্তরে নেওয়া যায়, টাকার বিনিময়ে তাই যে কোন রকম জিনিস যেখানে খুশী কেনা যায়।

আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের টাকার বিভাজন-ব্যবস্থা দশমিকক্রমে প্রচলিত হয়েছে, যার ফলে একশত পয়সায় এক টাকা এবং পঞ্চাশ, পঁচিশ, কুড়ি, দশ, পাঁচ, তিন, দুই এবং এক পয়সার নতুন মুদ্রা চালু হয়েছে। দশমিক বিভাজনে হিসাব-পত্র খুবই দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করা যায়, তাই জিনিসপত্রের মাপও মন-সের-ছটাকের পরিবর্তে কুইনটাল, কিলোগ্রাম (কেজি) ইত্যাদি করা হয়েছে।

॥ চেক ও নোটের প্রচলন ॥

যাই হোক্, বর্তমান অর্থনীতিতে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সম্প্রসারণে মুদ্রার পরিবর্তে কাগজের নোট এবং তার থেকেও ব্যাঙ্কের চেকের মাধ্যমে লেন-দেন আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। এখন লক্ষ লক্ষ টাকার দেনা-পাওনা সামান্য এক টুকরা কাগজের চেক দিয়ে সেরে ফেলা হচ্ছে, যার ফলে অর্থের সচলতা সহস্রগুণ বেড়ে গেছে।

॥ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥

সভ্যতার শুরু থেকেই যখন মানুষ পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় করেছে, বলতে গেলে তখন থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সূত্রপাত। ক্রমে এক পাড়ার জিনিস অপর পাড়ায় বিকিয়েছে, এক গাঁ থেকে অপর গাঁয়ের গঞ্জে গেছে মানুষ কেনা-বেচা করতে। এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এক দেশের পণ্য নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে বাণিজ্য করতে গেছে মানুষ। আমাদের দেশে চাঁদসদাগর, শ্রীমন্ত সদাগরের কাহিনী আছে। একদিন ভারতের বিবিধ পণ্য, সুগন্ধি মসলা, সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র প্রভৃতি সুদূর বোগদাদ রোম চীন প্রভৃতি দেশেও যেত। জলপথে পাল-তোলা নৌকোয়, মরুপথে উটের পিঠে চাপিয়ে, দুর্গম পার্বত্য-পথে ঘোড়া-খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে ভারতের পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। আবার তেমনি করেই আমদানি হয়েছে পারস্যের গালিচা, আরবের খেজুর, চীনের সিঁদুর—এমন কত কি জিনিস। এমনভাবে দেশে দেশে যে বাণিজ্য হয় তাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। এখন দেশে দেশে বড় বড় জাহাজ এবং বিমান নিয়মিত চলাচলের ফলে জলপথে এবং আকাশ-পথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের খুব প্রসার হয়েছে।

॥ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ॥

আধুনিক সভ্যতার যে সুবর্ণযুগে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হল তখন থেকেই বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে শিল্প-বাণিজ্যের চেহারাও দ্রুত পরিবর্তিত

সাগর পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য করতে যাচ্ছে
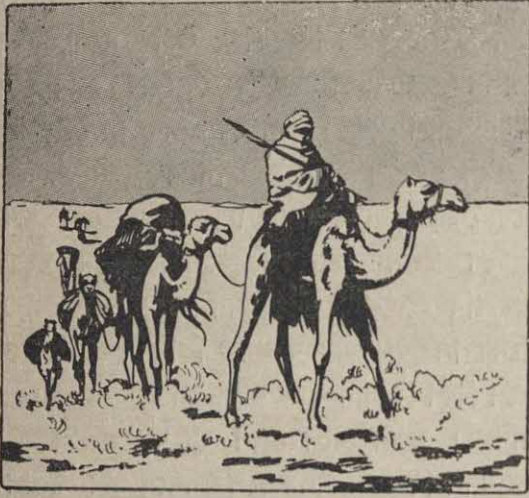
মরুপথে উটের পিঠে পণ্য চলেছে

হতে লাগল। ক্রমশঃ মানুষ বাষ্পশক্তি, তৈলশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, তারপর ক্রমে ক্রমে আণবিক শক্তির ব্যবহারও আয়ত্ত করল। সেই শক্তিকে কাজে লাগানোর ফলে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে। যন্ত্রযুগের সূত্রপাত থেকেই তাই মানুষ চেষ্টা করছে, কি করে মানুষের ব্যবহার্য বস্তু বেশী পরিমাণে সহজে উৎপাদন করা যায়। আগে যেখানে একজন তাঁতী হাতে তাঁত বুনে দিনে একজোড়া কাপড় তৈরি করতে হিমশিম খেয়ে যেত, এখন সেখানে শত শত বৈদ্যুতিক তাঁতে (power loom) এক একটি কারখানায় দৈনিক হাজার হাজার জোড়া কাপড় তৈরী হচ্ছে। এই ভাবেই এক সময়ে ম্যাঞ্চেস্টারে কাপড়ের কল এত বেশী কাপড় তৈরি করতে লাগল যে ইংল্যাণ্ডের সব চাহিদা মিটিয়েও লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড় সে বিদেশে রপ্তানি করতে শুরু করল।

॥ ঢাকাই মসলিন ॥

আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কাল হতে যে তাঁতের কাপড় তৈরী হত তার চমৎকার নকশা, মনোরম রং আর সূক্ষ্ম বুনুনির খ্যাতি সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত ছিল। তারমধ্যে ঢাকাই মসলিন। তা এত পাতলা হত যে একখানা গোটা শাড়ি একটি দেশলাইয়ের বাক্সে ভরে রাখা যেত, কিংবা হাতের একটি আংটির মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে টেনে বের করা যেত। জলে ফেললে আর চোখে দেখা যেত না, সাতপুরু করে পরলেও গা দেখা যেত—এমন মিহি মসলিনও তৈরী হতো। চীনে, রোমে, পারস্যে শৌখিন নরনারী এই মসলিন পাবার জন্যে আকুল হতো।

কিন্তু হলে হবে কি? বিলাতী কাপড়ের দাম এত কম আর এত বেশী পরিমাণে বিলাতী কাপড় আমদানি হতে লাগল, যার ফলে আমাদের দেশে সেই বিস্ময়কর কুটিরশিল্প ধ্বংস হতে বসল। মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলনে তাই সর্বপ্রথম সূচী হয়েছিল—বিলাতী বর্জন এবং খাদির প্রচলন।

॥ প্রচার ও বিজ্ঞাপন ॥

কলকারখানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশেই শিল্পবিপ্লব দেখা দিল। তখন শুধু কাপড় নয়, বিবিধ ভোগ্যবস্তু—যা কিছু মানুষের কাজে লাগে, সবই যান্ত্রিক উপায়ে প্রচুর পরিমাণে তৈরী হতে লাগল। তার ফলে তৈরী মাল কাটাবার জন্যে প্রতিটি

সাজানো দোকান

শিল্পব্যবসায়ী ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। শুরু হল—প্রচার ও বিজ্ঞাপন।

সব ব্যবসায়েরই অল্পবিস্তর বিজ্ঞাপন দরকার হয় এবং জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সব ব্যবসায়ীই কমবেশী বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। সব দোকানদারই তার জিনিসপত্র এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে যাতে তা সহজেই খদ্দেরের নজরে পড়ে।

হাটে বাজারে সর্বত্রই ব্যবসায়ীরা তাই এইভাবে তাদের পণ্য সাজিয়ে গুছিয়ে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দোকান সাজানো এখন একটি শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

দোকানে বাইরের সাজগোজে কত রকম বিচিত্র বস্তুর ব্যবহার হচ্ছে। বাইরে নিওন সাইন (neon sign) জ্বলজ্বল করছে বা জ্বলছে ও নিভছে। ব্যবহৃত হচ্ছে রংবেরং-এর সাইনবোর্ড। খরিদ্দারকে আরাম দেওয়ার জন্য দোকান-ঘরটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। দোকান-বিশেষে খরিদ্দারের আরাম করে বসবার আয়োজন করা হচ্ছে। যেমন গানবাজনার দোকানে রেকর্ড বা রেডিও বাজিয়ে শোনানোরই বা কত রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে! আবার বৃহৎ আকৃতির ফাউনটেন, চশমা বা ঘড়ি দোকানের সুমুখে ঝুলিয়ে ঐ ঐ বস্তুর বিজ্ঞাপন করতে দেখা যায়।

॥ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ॥

খবরের কাগজ খুললেই অনেক বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে।

নানা রকম সুন্দর সুন্দর ছবি এবং কথা দিয়ে বিজ্ঞাপনকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার প্রচেষ্টা সব বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়। এই বিজ্ঞাপনগুলির বিভাগীয় নাম সজ্জিত বিজ্ঞাপন (display advertisement). বিজ্ঞাপন এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

আজকাল যখন কোন পণ্যবস্তু তৈরী হয় তখন তার জন্য যেমন কাঁচা মাল, মজুরী ও অন্যান্য ব্যয় হিসেবে ধরা হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার বিজ্ঞাপনের ব্যয়টাও ধরা হয়।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন

সচরাচর কোনও ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের জন্য কি পরিমাণ ব্যয় হবে তার একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া থাকে এবং পরিচালকেরা সেই টাকার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য তাঁদের উৎপাদনের পরিমাণ, সম্ভাব্য বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থের পরিমাণ প্রভৃতি হিসেব করে তার উপরে একটা শতাংশ বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করেন।

সচরাচর যে সব পণ্যের প্রতিযোগিতা বেশী তার জন্য বিজ্ঞাপনও বেশী পরিমাণে দরকার হয়। অপর পক্ষে যে সব পণ্যের প্রতিযোগিতা কম তার বিজ্ঞাপন-ব্যয় কম হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না।

যখন বিজ্ঞাপনের জন্য একটা অঙ্কের টাকা মঞ্জুরী পাওয়া যায় তখনই বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ শুরু হয়। বিভাগীয় পরিচালক ভাবতে বসেন, কি কি খাতে তিনি এই টাকাটা বণ্টন করবেন যাতে তাঁর পণ্য-গুলির বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে, কিংবা জনসাধারণের মনে গোটা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট সমীহবোধ জাগানো যাবে, যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে—এই প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণে আগ্রহী, সুতরাং এদের তৈরী পণ্যও নির্ভরযোগ্য হবে।

মঞ্জুরী টাকাটা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতার দরকার হয়। তাই সব বড় বড় বিজ্ঞাপনদাতার পক্ষেই বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করা হয়।

খবরের কাগজে এলোপাতাড়ি বিজ্ঞাপন দিয়ে,

বা যখন যেমন খুশী সিনেমায় ছোট ফিল্ম কিংবা স্লাইড (slide) দেখিয়ে টাকা খরচ করলেই সুফল পাওয়া যায় না। বিজ্ঞাপন ফলপ্রদ করতে হলে তার জন্য বিশেষভাবে তৈরী হতে হয় এবং সব দিক্ বিবেচনা করে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করলে তবেই সুফল পাওয়ার আশা করা যায়।

॥ বাজারের হালচাল ॥

কোনও পণ্য যখন তৈরি করা হয় তার আগেই কোন্ বাজারে, কাদের কাছে, কি দামে তা বিক্রি হবে সে সম্বন্ধে, একটা সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে হয়। যে দেশে যে বস্তুর চাহিদা নেই সেখানে তার চাহিদা সৃষ্টি করা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ।

কোন কোন রেলস্টেশনে চায়ের স্টলে বড় বড় সাইনবোর্ডে চা-পানের উপকারিতা এবং চা-তৈরির পদ্ধতি লেখা থাকত। এ সম্পর্কে একটি ছড়ায় চা-পানের উপকারিতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'যাহাতে নাহিক মাদকতা দোষ
কিন্তু পানে করে চিত্ত পরিতোষ।'

কোনও পণ্য বাজারে দেওয়ার আগে দেখতে হয় তার সম্ভাব্য খরিদ্দার কারা এবং বাজারে সেই শ্রেণীর মাল আর আছে কিনা। যদি থাকে তবে সেই মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে সে কথাও ভেবে স্থির করতে হবে।

এখানেই দরকার বাজারের হালচাল জানা, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় মার্কেট রিসার্চ (market research)। আজকাল পণ্য-প্রস্তুতকারকেরা কোন পণ্য তৈরি করার আগেই সে সম্বন্ধে সম্ভাব্য খরিদ্দারের মতামত সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

সব কিছু সুযোগ সন্ধান জেনে যখন পণ্যটি তৈরী হবে তখন তার প্রচারের কথা ভাবতে হবে।

সম্ভাব্য বিক্রয়ের একটি শতাংশ বিজ্ঞাপনের বা প্রচারের জন্য ব্যয় নির্ধারিত করে নেওয়াই সাধারণ নিয়ম। তবে কোন কোন সময় নতুন কোনও মাল বাজারে ধরাবার জন্য প্রথমে বেশী পরিমাণে বিজ্ঞাপন করা প্রয়োজন হতে পারে।

তবে যা-ই করা হোক্-না-কেন, সে খরচ আসবে শেষ পর্যন্ত পণ্য-প্রস্তুতকারকের পকেট থেকেই এবং আবার সে টাকা পণ্য-প্রস্তুত-খরচের সঙ্গে যোগ দিয়ে তবেই মোট খরচের হিসেবে পৌঁছনো যায় এবং তাতেই পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হতে পারে।

বিজ্ঞাপনের ফলে কাটতি বাড়ে, কাটতি বাড়লে উৎপাদন বাড়াতে হয়, বিপুল সংখ্যায় উৎপাদন (large scale manufacturing) করার ফলে খরচের পড়তা কমে যায়। ফলে, বড় উৎপাদকরা যে দামে যে জিনিস দিতে পারেন ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে সেই দামে সেই উৎকৃষ্ট মানের মাল তৈরি করাও সম্ভব হয় না।

কাজেই, বিজ্ঞাপন ঠিকভাবে দিলে যে কেবল মাল-প্রস্তুতকারকই লাভবান্ হন তা নয়, সাধারণ ক্রেতা বা কনজিউমার (consumer)-ও লাভবান্ হন। যেমন, বহুল উৎপাদন ও প্রচারের ফলেই রেডিও এখন এত সস্তা হয়েছে যে, ঘরে ঘরে ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলেরই ব্যবহারে লাগতে পেরেছে।

॥ প্রচারবিদ্ ॥

কোনও পণ্যের প্রচারের জন্য যখন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়বরাদ্দ করা হয় তখনই প্রচারবিদের ডাক পড়ে—কিভাবে সেই অর্থ তিনি ব্যয় করবেন, যাতে সেই পণ্যটির চাহিদাই কেবল যে বজায় থাকবে তাই নয়, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিও পাবে।

প্রচারবিদ্ জানেন, কোন্ অঞ্চলে কি শ্রেণীর লোকের কাছে তাঁর পণ্যটি প্রচারের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন অনুসারে তিনি স্থির করেন, তাঁর ব্যয়বরাদ্দের কতটা অংশ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনে ব্যয় করবেন, কতটা অংশ বিক্রয়কেন্দ্রে (point of sale) ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যয় করবেন, কতটাই বা ঘরের বাইরের (outdoor) বিজ্ঞাপনে সাইনবোর্ড, বেলুন উড়িয়ে বিজ্ঞাপন, কাপড়ে লিখে বিজ্ঞাপন, হোর্ডিং (hoarding), নিওন সাইন (neon

sign), রেডিওতে বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে ব্যয় করবেন। সিনেমায় স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র কিংবা সামান্য স্লাইড দেখিয়েও লোকের মনে পণ্যটির বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে। খোলা আকাশে বিমান তুলে হাওয়ায় লিফলেট ছড়িয়ে কিংবা প্লেনের পিছন থেকে রাসায়নিক ধোঁয়া ছেড়ে পণ্যবস্তুর নাম আকাশের গায়ে লিখে দিয়ে দর্শকচিত্তে চমক লাগানো চলতে পারে।

বেলুন উড়িয়ে বিজ্ঞাপন

কাপড়ে লিখে বিজ্ঞাপন টাঙানো হয়েছে

বিজ্ঞাপনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এইরকম হরেক রকম উপায়ে পণ্যবস্তুর প্রচার বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়েছে। রেল এবং স্টীমার স্টেশনগুলি, এমন কি সিনেমার এলাকাগুলি বিজ্ঞাপনের ভাল জায়গা। তার কারণ, সেখানে লোকের আনাগোনা ও বহুলোকের ভিড় লেগেই থাকে।

সারা পৃথিবীর মধ্যে মার্কিন মুলুকই বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থায় সবার চেয়ে উন্নত। তাদের বার্ষিক বিজ্ঞাপন-ব্যয় বহু সহস্র কোটি টাকা। ভারতবর্ষে সে তুলনায় বার্ষিক ব্যয় অতি সামান্য, মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকার মতো।

॥ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ॥

কিন্তু সারা পৃথিবীতেই বিজ্ঞাপনে সবচেয়ে বেশী ব্যয় হয়—সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন-প্রচারে।

সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্র প্রবর্তনের প্রথম যুগে তাতে বিজ্ঞাপনের হার কিছু নির্ধারিত ছিল
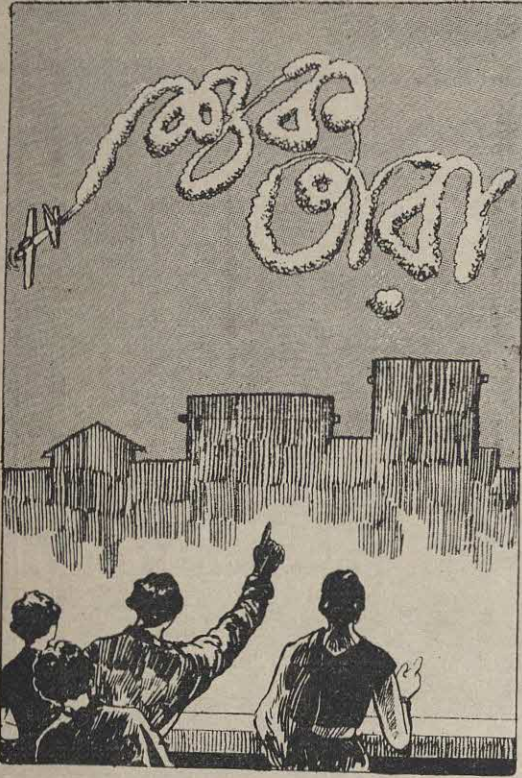
রাসায়নিক ধোঁয়া ছেড়ে আকাশের গায়ে বিজ্ঞাপন লেখা হচ্ছে

না। বিজ্ঞাপনের এজেণ্টরা এক একটি কাগজে বেশী পরিমাণে স্থান সস্তায় 'বুক' করে অর্থাৎ আগে থেকে আটকে রেখে তার দাম চড়িয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতার কাছে বিক্রয় করতেন। বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের সেই আদি যুগে বিজ্ঞাপনের এজেণ্টরা ছিলেন সংবাদপত্রের পক্ষের লোক।

কিন্তু এখন স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞাপন-প্রচার-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সমিতিও গঠিত হয়েছে যাতে সদস্য হিসেবে পত্র-পত্রিকা, বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী অর্থাৎ এজেন্সী এবং বিজ্ঞাপনদাতা সকলেই থাকতে পারেন।

॥ বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা পরিচালনা ॥

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সক্রিয় থাকায় এখন ভারতে বিজ্ঞাপন ব্যবসায় একটি মর্যাদাপূর্ণ উপার্জনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ক্রমশঃই অধিকসংখ্যক শিক্ষিত যুবক এই নতুন বিষয়ে আকৃষ্ট হচ্ছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, সারা ভারতে যত লোক বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন তার মধ্যে একটি বৃহদংশ বাঙ্গালী।

বাঙ্গালী শিল্পী, কথাকার (copy writer), লে-আউট ম্যান এবং ভিস্যুয়ালাইজার (layout man and visualizer) সারা ভারতে নানা এজেন্সীতে ছড়িয়ে আছেন। শিল্প ও সাহিত্য যাঁরা ভালবাসেন, এবং বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ে যাঁরা আগ্রহী, তেমন শিক্ষিত যুবকদের জন্য বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিবিধ কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভব।

এজেন্সীর কাজের সঙ্গেই জড়িত ব্লক তৈরী, ছাপা, ডিজাইন আঁকা প্রভৃতি আরও নানা শ্রেণীর কাজ, যাতে আরও বহুবিধ লোক নিযুক্ত আছেন।

বিজ্ঞাপনের ভাষার বাঁধুনি অতি নিপুণ অভিনিবেশের কাজ, তাতে অনেক অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

অনেক সময় 'কপি' অনুসারে চিত্রশিল্পী অলংকরণ যোগ করেন, আবার কখনও কখনও লে-আউটের ছবির সঙ্গে মানিয়ে 'কপি' লিখতে হয়।

শিল্পী নকশা করছেন

শিল্পীরা ছবির অংশ আঁকেন, ফটোগ্রাফ জুড়ে দেন, ওদিকে 'কপি'-র অংশ নির্ধারিত হরফে সাজিয়ে যে 'কপি' তুলে আনা হয়েছে সেটিও স্টুডিওতে এসে পৌঁছায়। অনুমোদিত ছাপা 'কপি' এবার কেটে-ছেঁটে লে-আউটের যথাস্থানে লাগিয়ে গোটা বিজ্ঞাপনটি পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে 'সম্পূর্ণ' (finished) করে তোলা হল, লাগানো হল তার উপর একটি পাতলা কাগজ যাতে এই অবস্থাতেও শিল্পকর্মের উপর বিজ্ঞাপনদাতা কোন নির্দেশ লিখতে চান কিংবা সামান্য কোন বিষয়ের পরিবর্তন চান, তা সবই ঐ পাতলা কাগজের উপর লেখা হয়, যাতে মূল শিল্প কাজটিতে কোন দাগ না পড়ে। শিল্পীরা পরে সেই নির্দেশমতো মূল নকশাটি সতর্কভাবে সংশোধন করতে পারেন।

সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে আর্ট ওয়ার্ক স্টুডিও থেকে যায় এজেন্সীর প্রোডাক্‌শান্ ডিপার্টমেণ্টে (production department). তাঁরা ঐ আর্ট ওয়ার্কটি পাঠান এনগ্রেভার এজেন্সীর কাছে অর্থাৎ ব্লক মেকারের কাছে। এনগ্রেভার এজেন্সীর নির্দেশ অনুসারে শিল্পকর্ম হতে ব্লক (block), ম্যাট্ (matrix, অথবা সংক্ষেপে mat), অর্থাৎ ছাঁচ এবং স্টিরিও (stereo)—যা দরকার তা তৈরি, করে আবার এজেন্সীতেই পাঠিয়ে দেন। প্রত্যেক ব্লকের সঙ্গে ছাপা কপিও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাপা হয়।

॥ বিজ্ঞাপনের নানাদিক ॥

এদেশে বিজ্ঞাপনের ব্যবসা সবে জমে উঠতে শুরু করেছে। এ ব্যবসায়ের মূলধন একদিকে যেমন মানুষের বুদ্ধি, রুচিবোধ, অর্থনীতির জ্ঞান, বাজারের হালচাল জানা, দেশ সম্পর্কে জ্ঞান, উৎসব, পাল-পার্বণ সম্পর্কে তথ্য—এক কথায় পুরোপুরি সাংসারিক, ব্যবসায়িক, সামাজিক ও জাগতিক বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা, অপরদিকে চাই ব্যক্তিগত পরিচয়, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ব্যবসায়িক সম্পর্ক, জনসংযোগ প্রভৃতি। তাই যদিও উপর থেকে দেখলে মনে হয়, কোন একটি বিজ্ঞাপনের এজেন্সী কোন কারখানাই চালায় না, কাঁচা মালও কেনে না, তৈরী মালও বেচে না—শুধুই এরা কথা বেচে, ছবি আঁকে, ছড়া শোনায়, পার্টি দেয়, এদের নগদ মূলধন তেমন কিছুই দরকার নেই, সবই একটি কৃত্রিম 'শো'-এর উপর চলছে, কিন্তু গভীরে প্রবেশ করলে বোঝা যায়, এর চেয়ে বরং কোনও একটি কারখানা খুলে তাতে কাঁচা মাল কিনে মেসিনে চাপিয়ে তৈরী মাল বাজারে বিক্রি করে পয়সা আনা ঢের বেশী সহজ। বিজ্ঞাপনের ব্যবসায়ের জটিলতা উপর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, গভীর অভিনিবেশ নিয়ে বেশ কিছুকাল হাতেকলমে না শিখলে তা অল্প কথায় মুখে বলে বোঝানো যাবে না।

॥ শিল্পরুচি ॥

বিজ্ঞাপন জগতের আর একটি বড় কাজ—ফলিত শিল্পীর। ললিত কলা হল fine art আর ফলিত কলা commercial art.

ছবি দেখতে, ছবি আঁকতে, ছবি ব্যবহার করতে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরাও সহজেই বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে পথ খুঁজে পেতে পারেন। এমন কি, যাঁরা ভাল ছবি তুলতে পারেন তাঁরাও, কারণ এখন বিজ্ঞাপনে

রেডিওর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে

গ্রামে রেডিওর প্রচার

ফটোগ্রাফের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে ভাল মডেলের চাহিদা। যাদের চেহারা ফিটফাট, যারা চটপটে এবং অভিনয়-পটু, তারাও বিজ্ঞাপনের ব্যবসায় লেগে যেতে পারেন।

যেহেতু রেডিওর মাধ্যমে এখন বিজ্ঞাপনের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তাই শিক্ষিত অভিনয়-শিল্পীদেরও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট চাহিদা দেখা দিয়েছে। ছোট ছোট বিজ্ঞাপনের চলচ্চিত্র তৈরীতেও তাঁরা অংশগ্রহণ করিতে পারেন। আমাদের দেশে সর্বত্র যখন টেলিভিশন চালু হবে তখন টেলিভিশনের মাধ্যমেও বিজ্ঞাপন প্রচারিত হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, চলচ্চিত্র নির্মাণও এখন বিজ্ঞাপনেরই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে। দেশী বিদেশী যে কোন ছবি দেখতে গেলেই প্রথমে যে ছোট ছোট রঙ্গিন এবং একরঙ্গা ছবিগুলি দেখানো হয় তা দেখতে বেশ ভাল লাগে! দেশে শিল্পব্যবসায়ের প্রসারের সঙ্গে রেডিওতে, টেলিভিশনে, চলচ্চিত্রে বিজ্ঞাপন ক্রমশঃ বাড়বে। তখন বিজ্ঞাপন আর খবরের কাগজের পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

আমাদের দেশে এখনও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব কম। যারা লেখাপড়া জানে না তাদের কাছে পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলি নিরর্থক। বরং রেডিওতে বিজ্ঞাপনের গান, কথাবার্তা, ঘোষণাগুলি তারা কানে শুনে কিছু বুঝতে পারে।

তাদের কাছে সবচেয়ে সহজে পৌঁছবার উপায় হল—বড় সাইনবোর্ড বা হোর্ডিং (hoarding)—যাতে লেখার বদলে ছবি দিয়ে বক্তব্য আরও সরল করে, সরস করে, হৃদয়গ্রাহী করে বোঝানো সম্ভব।

॥ বিজ্ঞাপনে বৈচিত্র্য ॥

দূর পল্লী অঞ্চল দূরে থাক, শহরাঞ্চলেও হোর্ডিং ব্যবস্থা এখনও এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে সুনিয়ন্ত্রিত নয়। খবরের কাগজে যেমন সবরকম বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন আছে, তথ্য, সংখ্যাতত্ত্ব সব কিছু পাওয়ার সুব্যবস্থা হয়েছে, হোর্ডিং সম্পর্কে এদেশে এখনও তা হয় নি। ফলে শুধু হোর্ডিং-এর মাধ্যমে যদি কেউ কোন একটি অঞ্চলে বা সারা দেশব্যাপী কোনও প্রচার-অভিযান চালাতে চায় তার পক্ষে তা করে ওঠা কঠিন হবে।

অথচ বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সামান্য হোর্ডিং-ও যে কত অসামান্য করে তোলা যায় তার নানা নিদর্শন আমরা অহরহ দেখতে পাই। বড় হোর্ডিং-এ নিওন টিউব রং বদলাচ্ছে, জ্বলছে, নিবছে ;

সারের বিজ্ঞাপন

কলকাতার এসপ্লানেডে তো সন্ধ্যা হতেই পাখা ঘুরছে, কেটলি থেকে চা পড়ছে, চায়ের কাপ ভরে উঠছে। হাওড়া স্টেশনে, ডালহাউসি স্কোয়ারে চলমান ছবি হোর্ডিং-এ ঘুরে ঘুরে আসছে আর যাচ্ছে। চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে একই হোর্ডিং-এ তিনবার ছবি আপনা আপনি বদল হচ্ছে। দিনে যা অস্পষ্ট, রাতে ফ্লুরোসেন্ট আলোকে তা উদ্‌ভাসিত।

হাওড়া স্টেশনে হোর্ডিং-এর বড় পর্দায় স্লাইড দিয়ে ছবি ফেলে দেখানো হচ্ছে। ভারতের নানা-স্থানে—কোন হোর্ডিং-এ প্রকাণ্ড ঘড়িতে নিঁখুত সময় দেখাচ্ছে, কোথাও প্রাত্যহিক তারিখ ও বার দেখানো হচ্ছে।

আমাদের পল্লী অঞ্চলে হোর্ডিং-এর প্রসার হলে স্বল্প ব্যয়ে নিরক্ষর ব্যক্তিকেও বিজ্ঞাপিত বস্তুটি সম্পর্কে জানানো যেতে পারে। যাঁরা চিত্রকর, হোর্ডিং আঁকতে উৎসাহী, রং ও তুলি নিয়ে কাজে নেমে পড়লে তাঁদের কাজের কোন অভাব নেই। সামান্য কাঠ, প্লাস্টিক, রং, তুলি আর আলোর ব্যবহারে একেবারে অবহেলিত স্থানও কেমন অল্প সময়ে মনোহর শোভনসুন্দর বিজ্ঞাপনের পক্ষে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, এঁরা তার প্রমাণ দেখিয়েছেন। প্রচার ব্যবস্থার দিক্ থেকে এঁদের তাই সাধুবাদ দিতে হয়।

কথায় বলে এটা বিজ্ঞানের যুগ, বস্তুতঃ এটা বিজ্ঞাপনেরও যুগ। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে সব সময়েই আমরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হরেকরকম বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থার নিদর্শন চোখে দেখি, কানে শুনি, পত্র-পত্রিকায় পড়ি। ব্যাপক জনসংযোগের উপায় হল এই সব বিবিধ প্রকার বিজ্ঞাপন। সেই জনসংযোগ কতটা কার্যকর হল, কোন একটি বিশেষ পণ্যের প্রচারে মানুষের উপর এবং সমাজের উপর তার কতটা প্রতিক্রিয়া তা জানার এবং পরীক্ষা করারও অনেক রকম পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, সুইটজার্ল্যাণ্ড এবং অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসর দেশে তার নিয়ত গবেষণাও চলছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী

॥ রেলগাড়ি ॥

জেমস ওয়াটের কথা বলা হয়েছে 'মনীষীদের ছেলেবেলা' অধ্যায়ে। তিনি অল্প বয়সেই লক্ষ করেছিলেন জলের বাষ্পের বেশ শক্তি আছে। তিনি ভাবতেন কি করে তাকে কাজে লাগানো যায়।

একদিন তাঁদের কারখানায় মেরামতের জন্য একটা পুরনো যন্ত্র এল। ওয়াট দেখলেন, এখানেও যন্ত্রটাকে চালাবার জন্য বাষ্পকে কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু কাজটা ভালভাবে করা হয় নি, তাই যন্ত্রটা তেমন কাজে আসছে না।

সেটা দেখে জেমস ওয়াটের মনে আর একটা খেয়াল জেগে উঠল। অনেক চেস্টা করার পর ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি একটা এঞ্জিন তৈরি করলেন। বাষ্পেই সেই এঞ্জিনটা চলে।

এবার ভাবনা হল, এঞ্জিনটাকে কোন্ কাজে লাগানো যায়! তখন খনি থেকে কয়লা তোলার কাজ ছিল খুব কঠিন। তাতে খরচও পড়ত অনেক। জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত এঞ্জিন সেই কাজে লাগানো হল। তাতে খনি থেকে কয়লা তোলার কাজটা খুব সহজ হয়ে গেল।

কিন্তু কয়লা বোঝাই মালগাড়ি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠানো হবে কি ভাবে? সেই সমস্যাটা রয়েই গেল।

সেই সমস্যার সমাধান করলেন আর একজন। তাঁর নাম জর্জ স্টিফেনসন। তিনি ইংল্যাণ্ডের লোক।

স্টিফেনসন ছেলেবেলায় গরু চরাতেন। পরে তিনি এক কয়লার খনিতে কয়লা বাছাইয়ের কাজ নিলেন। তখন তাঁর বয়স ষোল কিংবা সতের, কিন্তু লেখাপড়া মোটেই জানতেন না।

তাঁর কানে গেল জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত এঞ্জিনের কথা। সেই সম্বন্ধে জানবার জন্য তাঁর ভয়ানক ইচ্ছে জেগে উঠল। তখন তিনি এক রাতের স্কুলে লেখাপড়া শিখতে লাগলেন। খুব মন দিয়ে পড়া-শোনা করে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অনেক জ্ঞান হল।

তারপর ভাবতে লাগলেন, কি করে জেমস ওয়াটের এঞ্জিনকে গতিশীল করে তোলা যায়।
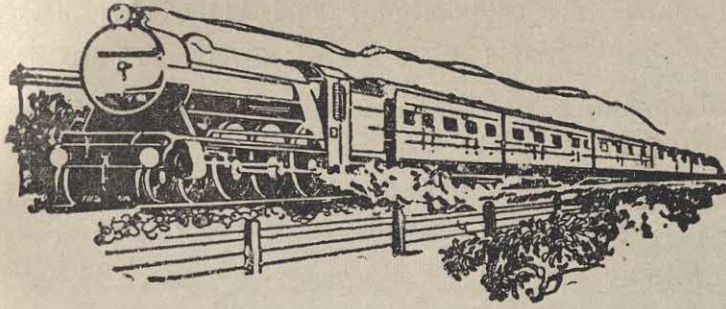
বাষ্পচালিত রেলগাড়ি

অনেক চেষ্টার পর ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐরকম একটা এঞ্জিন তৈরি করে ফেললেন, যা চলে বেড়াতে পারে। কিন্তু রাস্তা যদি ভাল না হয়, এবড়ো-খেবড়ো হয়, তা হলে ঐ এঞ্জিন কোন কাজে আসবে না। ঐ এঞ্জিনের জন্য চাই পরিষ্কার সমতল পথ।

তবে আগাগোড়া পথ সমতল না করেও যদি পাশাপাশি লোহার পাত বসিয়ে দেওয়া যায় তা হলেও চলতে পারে। ঐ লোহার পাতকেই বলা হয় রেল। তাঁর চেষ্টাতে এঞ্জিন চালাবার মত রেলপথ বসানো হল।

কয়লার খনিতে এক জায়গা থেকে কয়লা অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাবার যে অসুবিধে এতকাল ছিল তা দূর হল। কয়লা বোঝাই মালগাড়ি জুড়ে দেওয়া হল ঐ এঞ্জিনের সঙ্গে।

এবার স্টিফেনসন মানুষের যাতায়াতের জন্য রেল বসাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সেটা বসাতে হবে বাইরের রাস্তায়—খনির ভিতরে নয়।

তাই বসানো হল। তখনকার দিনে মানুষ যা ভাবতে পারত না, স্টিফেনসনের চেষ্টায় তাই সম্ভব হল। অবশেষে একদিন সত্যি সত্যি যাত্রী ও মালপত্র নিয়ে প্রথম বাষ্পচালিত গাড়ি ছুটে চলল। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গাড়ি পৌঁছল।

॥ মাধ্যাকর্ষণ ॥

আইজাক নিউটন একদিন একটি বাগানে বসে আছেন। হঠাৎ গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়ল। তিনি ভাবতে লাগলেন, আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নীচের দিকে পড়ল কেন?

এই ভাবনা থেকেই নিউটন আবিষ্কার করলেন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি। এই শক্তির জোরেই আমরা বল, ঢিল যা কিছু উপরের দিকে ছুড়ি না কেন, সব নীচে নেমে আসে।

১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের একটি ছোট্ট গ্রামে আইজাক নিউটনের জন্ম হয়।

পিতৃহারা ও মায়ের দ্বারা পরিত্যক্ত নিউটন তাঁর ঠাকুরমায়ের কাছেই মানুষ হতে থাকেন। তাঁকে স্কুলে ভরতি করিয়ে দেওয়া হয়। লেখাপড়ায় তিনি খুব ভাল ছিলেন না। তবে নানা রকম খেলনা ও যন্ত্রপাতি তৈরিতে তিনি খুব ওস্তাদ ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি একটি ছোট ময়দার কল
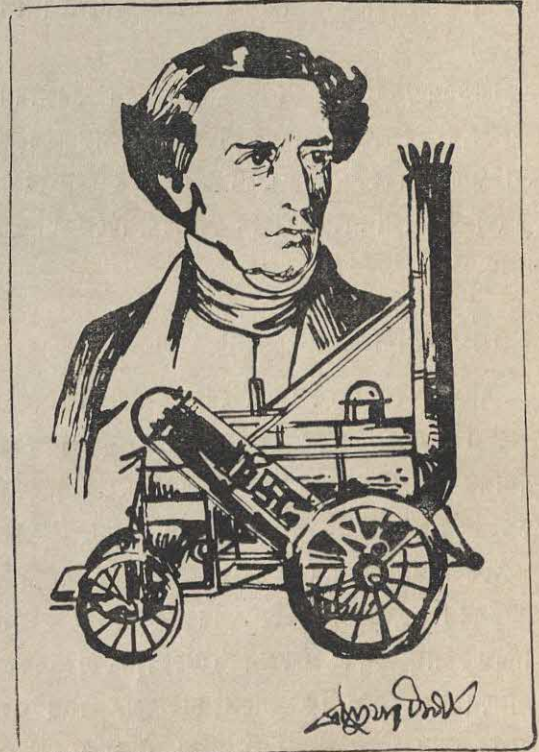
স্টিফেনসন ও তাঁর আবিষ্কৃত এঞ্জিন

তৈরি করেন। তাতে অল্প পরিমাণে গম ভাঙিয়ে ময়দা করা যেত।

ঐ বয়সেই নিউটন তৈরি করেন জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ি। জলঘড়িতে জলের ফোঁটা ফেলে সময় নির্দেশ করে চলত। সূর্যঘড়িতে সূর্যের আলোর ছায়া থেকে সময় দেখা চলত। এখনও লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে সেই সূর্যঘড়িটি সযত্নে রক্ষিত আছে।

নিউটনের মা কিছুদিন পরে আবার নিজের কাছে এনে নিউটনকে গোলাবাড়ি দেখাশোনার ভার দিলেন। কিন্তু সে কাজে নিউটনের মন বসল না। তখন তাঁকে আবার বিদ্যালয়ে এবং পরে কলেজে পাঠানো হল। গণিত ও বিজ্ঞানের দিকে দেখা দিল তাঁর বিশেষ মনোযোগ।

বিজ্ঞানসাধক নিউটন আলোকের উপর গবেষণা শুরু করলেন। সেই গবেষণার ফলেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, সূর্যের আলো সাদা। ঐ সাদা রঙের মধ্যে লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, গাঢ় নীল, বেগুনি—এই সাতটি বিভিন্ন রঙের আলো মিশে আছে।

নিউটন দূরবীনের অনেক উন্নতি সাধন করলেন। আবিষ্কার করলেন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি। গাছ থেকে ফল নীচের দিকে পড়ে কেন? নিউটন বললেন—পৃথিবী সব জিনিসকেই তার কেন্দ্রের দিকে টানছে বলেই এমন ঘটছে।

॥ টেলিফোন ॥

আমেরিকার বোস্টন শহরের সাধারণ একটা হোটেল। সেই বাড়ির চিলেকোঠায় দু'জন যুবক নানারকম যন্ত্রপাতি নিয়ে কি যেন একটা তৈরি করবার চেষ্টা করছেন। এই যুবক দুইটির মধ্যে একজন আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল অপরজন তাঁর সহকারী ওয়াটসন। কখনো একটা তার খুলছেন, কখনো আবার লাগচ্ছেন। একজন চোঙের মতো একটা জিনিসে মুখ রেখে কি বলতে চাইছেন, অপর জন তারের আর এক প্রান্তে লাগানো ঐ রকম একটা জিনিসে কান পেতে কি শুনতে চেষ্টা করছেন।

শেষে ওয়াটসনকে গ্রাহাম বেল পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। দু'ঘরে দু'জনের মধ্যে ঐ রকম পরীক্ষা চলতে লাগল।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ। ঐ তারের ভিতর দিয়ে গ্রাহাম বেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"মিঃ ওয়াটসন, দয়া করে এখানে এসো, তোমাকে আমার দরকার।"

ওয়াটসন আনন্দে নেচে উঠলেন, বললেন,—"পেয়েছি, পেয়েছি!"

দূর থেকে কথা শোনার সূত্র পাওয়া গেল। টেলিফোন যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হল।

কিন্তু এ নিয়ে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলকে কম পরিশ্রম করতে হয় নি।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা শহরে তাঁর জন্ম হয়। সেখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে তিনি জার্মানীতে গিয়ে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

এরপর গ্রাহাম বেল বিজ্ঞানের নানাদিক্ নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। যারা কিছু শুনতে পায় না, তাদের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। কথাবার্তা উচ্চারণের মধ্যেও যে একটা বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম আছে, স্বরতরঙ্গের যে বিশেষ ধরনের ওঠা-নামা আছে—এই সব নিয়ে তিনি কাজ শুরু করে দিলেন।

বেলের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ক্রমশঃ স্বীকৃতি পেল। যারা শুনতে পায় না তাদের শিক্ষাদানের সময়ে মনের ভাব আদান-প্রদানের বিষয় চিন্তা করতে করতে টেলিফোন আবিষ্কারের চিন্তা তাঁর মাথায় এল।

তাঁর স্ত্রী মাবেল হাবার্ড ছিলেন শ্রুতিশক্তি-হীন। মাবেল একদিন বললেন—ঠোঁটের নাড়াচাড়া দেখেই কালারা অপরের কথাবার্তা অনুসরণ করতে পারে। মাবেলের এই কথায় তাঁর চিন্তার মোড় ঘুরে গেল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বেলের পরীক্ষা চলতে থাকে। তিনি বুঝতে পারলেন—শব্দ

পাঠাবার সময় যদি তড়িৎ-প্রবাহের তীব্রতার তারতম্য আনা যায়, তা হলেই বৈদ্যুতিক তারের উপর দিয়ে খবর পাঠানো সম্ভব হবে। পরীক্ষা করে দেখলেন, শব্দ উচ্চারণের সময় বাতাসের গতির কি রকম পরিবর্তন হয়। তখন তিনি ভাবলেন, কানের সূক্ষ্ম পর্দার পক্ষে কানের গুরুভার শিরা-উপশিরার শৃঙ্খলকে আলোড়িত করা যদি সম্ভব হয়, তা হলে একই ভাবে তৈরী অপেক্ষাকৃত বড় একটা যান্ত্রিক পর্দা লোহার আর্মেচারে সাড়া তুলবে না কেন? যদি তোলে, আর ঐ আর্মেচার যদি বাতাসের প্রবাহের গতির সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হয়, তা হলেই কথাবার্তা পাঠানো সম্ভব হবে।

ব্রেজিলের সম্রাটের হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে গেল

তারপর এল সেই ঐতিহাসিক দিন—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ। টেলিফোন যন্ত্রের আবিষ্কার হল। সেদিন বেলের তৈরী ঐ যন্ত্র ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। তবু ওটাই আধুনিক টেলিফোন যন্ত্রের আদি।

এরপর আমেরিকার পেটেণ্ট অফিসে বেল তাঁর আবিষ্কৃত এই টেলিফোনের পেটেণ্ট নেবার জন্য দরখাস্ত করলেন। সেইদিনই মোটে ছ'ঘণ্টা বাদে শিকাগোর এলিসা গ্রে ঐরকম একটি পেটেণ্টের জন্য দরখাস্ত পাঠালেন। এডিসন, ডলবিয়ার, ড্রবাগ সকলেই ঐ একই বিষয়ে কাজ করছিলেন, টেলিফোন আবিষ্কারের কৃতিত্ব কার ভাগ্যে জোটে তা নিয়ে ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি হল।

এই সময় ফিলাডেলফিয়ায় এক শতবার্ষিকী প্রদর্শনীতে গ্রাহাম বেল তাঁর টেলিফোন যন্ত্রটা পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে যন্ত্রটাকে প্রথমে কেউ আমল দিল না। ব্রেজিলের সম্রাট্ দ্বিতীয় পেড্রো এসেছিলেন প্রদর্শনী দেখতে। তিনি রিসিভারটা হাতে তুলে নিলেন। হঠাৎ দূরের অপর প্রান্ত থেকে বেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। বেল তখন 'হ্যামলেট' থেকে উচ্চারণ করছিলেন—"টু বি অর নট টু বি—"
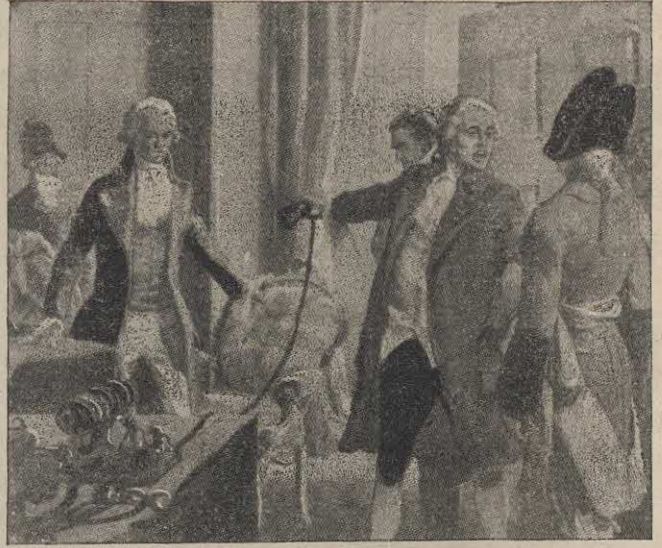
কথাটা কানে যেতেই সম্রাটের হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন—"Good Heavens, it talks!" (হায় ভগবান্, এ যে কথা বলছে!)

সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিদ্ স্যার উইলিয়ম টমসন যন্ত্রটা পরীক্ষা করে বললেন—"এটি বিশ্বের এক বিস্ময়কর বস্তু।"

শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানী মহল মেনে নিলেন, আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল-ই টেলিফোন যন্ত্রের আবিষ্কর্তা।

॥ গ্রামোফোন, বিজলীবাতি ও টেলিগ্রাফ ॥

একটি ছোট্ট ছেলে রেল-লাইনের উপর খেলা করছে। আর সেই লাইন ধরে ছুটে আসছে একটা রেলগাড়ি। ছেলেটির কিন্তু কোন দিকে হুঁশ নেই। সে খেলায় মেতে রয়েছে।

কাছেই স্টেশন। স্টেশনের লোকেরা হইহই করে উঠল। এবার নির্ঘাত মারা পড়বে ছেলেটি। রক্ষা করবার কেউ নেই। যে রক্ষা করতে যাবে সে-ই মারা পড়বে।

একটি বালক কিছুদূরে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ বিক্রি করছিল। ব্যাপার দেখে সে লাইনের দিকে ছুটে গেল। এক মুহূর্তও দেরি না করে সে লাইনের উপর থেকে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে স্টেশনে চলে এল।

হইচই শুনে স্টেশনমাস্টার সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি এসে দেখলেন, যে ছেলেটি গাড়ি চাপা পড়ে মারা যাচ্ছিল সে তাঁরই ছেলে।

যে বালক তাঁর ছেলেকে বাঁচিয়েছে তার নাম এডিসন। এডিসন স্টেশনেই একটা পরিত্যক্ত গাড়িতে ছোট্ট ছাপাখানা করেছে। সেখানে কাগজ ছাপে। আর নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে কি সব গবেষণা করে।

স্টেশনমাস্টার এডিসনকে বললেন—তুমি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছ, বল, তুমি কি পুরস্কার চাও।

এডিসন বলল—আমাকে টেলিগ্রাফি শেখার ব্যবস্থা করে দিন।

টমাস এডিসন ও তাঁর আবিষ্কৃত ফনোগ্রাফ

স্টেশনমাস্টার তাই করে দিলেন। দেখতে দেখতে ছেলেটি হয়ে উঠল অভিজ্ঞ টেলিগ্রাফ-অপারেটার। ক্রমশঃ ভাগ্য তার খুলে গেল।

টমাস আলভা এডিসনের জন্ম ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী। আমেরিকার অন্তর্গত মিলানের এক গরিবের ঘরের ছেলে তিনি।

টেলিগ্রাফ-অপারেটারের কাজ শিখে এডিসন নিউইয়র্ক চলে গেলেন। পকেটে পয়সা নেই, দু'তিন দিন অনাহারে কাটল। শোবার জায়গা করে নিলেন গোল্ড ইণ্ডিকেটর কোম্পানির ঘরে। সেই কোম্পানির ট্রান্সমিটারটা হঠাৎ একদিন বিগড়ে গেল। এডিসন দেখে শুনে নিজেই যন্ত্রটা সারিয়ে ফেললেন। তার ফলে সেই কোম্পানিতে তাঁর একটা চাকরি জুটে গেল।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে এডিসন টেলিগ্রাফ এঞ্জিনীয়ার পোপের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্যবসায়ে নামলেন। টেপ-মেশিন এবং তার নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করে তিনি বিখ্যাত হলেন। এবার তাঁর নজর পড়ল দ্বিগুণ (duplex) ও চতুর্গুণ (quadruplex) টেলিগ্রাফির উপর। ডুপ্লেক্স টেলিগ্রাফিতে একই তারের উপর দিয়ে একই সময় দুই দিকে বিপরীত দুটো খবর পাঠানো সম্ভব। এডিসনের চেষ্টায় তা সফল হয়েছিল।

গ্রাহাম বেলের আবিষ্কৃত টেলিফোন যন্ত্রের তিনি সংস্কার করলেন। তার ফলে কথাবার্তা আরও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল।

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে একটা অদ্ভুত যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করলেন। একটা সিলিণ্ডার, সঙ্গে একটা হাতল; সিলিণ্ডারের দিকে মুখ করা একটা ছুঁচলো কাঠি আর একটা চোঙা। ওটার নাম ফোনোগ্রাফ (মানে, আওয়াজ লেখবার যন্ত্র)। তারই সুসংস্কৃত রূপ আজকালকার গ্রামোফোন।

অদ্ভুত যন্ত্র! ঘরে বসেই পছন্দমতো শিল্পীর গান শুনতে পাওয়া যায়। একটা গোল সমতল চাকতির উপর মানুষের কণ্ঠস্বর ধরা হল। তারপর ওটা বৈদ্যুতিক মোটর বা হাতল ঘুরিয়ে চালিয়ে পিন দিয়ে ঘর্ষণ করে ঐ কম্পনগুলো আবার তোলা হল—শোনা গেল রেকর্ডের কণ্ঠস্বর।

ফসফরাস থেকে আলোর সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথাঃ

[ফসফরাস থেকে আলোর সৃষ্টি]

অন্ধকার ও আলো নিয়ে পৃথিবী। যখন আলো থাকে না, অন্ধকার নেমে আসে তখন মানুষের কাজেকর্মে বিশেষ অসুবিধা হয়। সেই কারণে যুগে যুগে লোকে নানা-ভাবে অন্ধকার দূর করে আলোর সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে এসেছে।

আজকাল আমরা বৈদ্যুতিক আলো, গ্যাসের আলো ইত্যাদি কতরকম আলো দেখি। কিন্তু প্রাচীন যুগে এত রকম আলোর সৃষ্টি হয় নি।

জার্মানিতে একজন অপরসায়নবিদ্ ছিলেন, তাঁর নাম হেনিং ব্র্যান্ড। তিনি নানা জিনিসের সাহায্যে আলোর সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর গবেষণা-গারে ফসফরাস থেকে আলোর সৃষ্টি করেন।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হেনিং ব্র্যান্ড তাঁর গবেষণাগারে ফসফরাস থেকে আলোর সৃষ্টি করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন।

এর পর শুরু হল তড়িৎ-শক্তির উপর এডিসনের গবেষণা। খনিজ পদার্থ ও বিভিন্ন ধাতুর আকর দিয়ে তিনি পরীক্ষা চালালেন। সুতোকে কার্বনে রূপান্তরিত করে সুতোর একটা ফাস ডোবালেন নিকেলের ছাঁচে, তারপর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ওটা চুল্লীতে ধরে রাখা হল। তারপর ছাঁচটা ঠাণ্ডা করে সুতোটা বের করে একটা বাল্ব সীল করা হল। কিন্তু কার্বন-করা সুতোটা বারবারই ছিঁড়ে যায়! অনেক চেষ্টার পর পুরো সুতোটাই বের করা সম্ভব হল।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর প্রথম বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলে উঠল। এডিসন পৃথিবীতে আলোকের বার্তা বয়ে নিয়ে এলেন।

॥ এক্স-রে ॥

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। জার্মানির এক সভায় উইলহেলম কনরাড ফন রন্টগেন নামে এক বিজ্ঞানী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে সভায় শোরগোল পড়ে গেল। এই জার্মান পদার্থবিদ্ এক্স-রশ্মি (X-ray) আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি হাতের উপর সেই রশ্মি ফেলে হাতের চামড়ার ভিতরকার হাড়ের ছবি তুলে দেখালেন।

রন্টগেন ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ প্রুশিয়ার লেনেপ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে জার্মান। হল্যাণ্ড ও পরে সুইট্জারল্যাণ্ডে পড়াশোনা করে তিনি আলোক, তাপ ও তড়িৎ বিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে জার্মানির স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

সেই সময়ে ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স্ বায়ুশূন্য কাচের নলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে তার ফলাফল পরীক্ষা করছিলেন। বায়ুশূন্য কাচের আধার, তার গায়ে দুটি ইলেকট্রোড (electrode) এর সীল-করা। ইলেকট্রোডের সঙ্গে উচ্চশক্তিসম্পন্ন তড়িতের সংযোগ ঘটিয়ে দেখা গেল, কাচের নলের মধ্যে একটি আলোক-রশ্মি উৎপন্ন হচ্ছে। নলের ঋণাত্মক (negative) প্রান্তেই এই আলোকের

এক্স-রে রশ্মির প্রথম পরীক্ষা

উৎপত্তি। দেখা গেল আলোকরশ্মিটি চুম্বক বা তড়িতাহত কোন প্লেটের প্রভাবে দিক পরিবর্তন করে। রশ্মিটি যখন কাচের গা স্পর্শ করল তখন একটা সবুজ ছটার বিকিরণ হল। এরূপ বিকিরণকে বলা হয় ফ্লোরেসেন্স। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অণুগুলো আপনা-আপনি ভাঙার সময় এরকম আলোকরশ্মি বের হয়।

রন্টগেন নিজের গবেষণাগারে ক্রুক্স্-উদ্ভাবিত এমনই একটা কাচের নল নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি একটা কালো কার্ডবোর্ডের পর্দা দিয়ে নলটি ঢেকে দেন। ঘরটাও অন্ধকার করে দেওয়া হয়। তারপর নলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠান। বেরিয়াম-প্ল্যাটিনাম দিয়ে ঢাকা একটুকরো কাগজ ঐ রশ্মির প্রভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে, আলোক-রশ্মি বিকিরিত হতে থাকে।

সেই মুহূর্তে ঘটে যায় এক আশ্চর্য আবিষ্কার। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক আলোক-রশ্মি দেখতে পাওয়া যায়। রন্টগেনের দৃঢ় ধারণা হয়—এটা ঋণাত্মক-রশ্মি (cathode ray) নয়। ঋণাত্মক-রশ্মি কাচের ভিতর দিয়ে বেরোতে পারে না। এই রশ্মি তো কাচের মধ্য দিয়ে, কাগজের মধ্য দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করছে।

দেখা গেল, তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে বা চুম্বকের প্রভাবে রশ্মিটির দিক্ পরিবর্তিত হচ্ছে না। আরও পরীক্ষা করে দেখা গেল, রশ্মিটি অ্যালুমিনিয়ামের

পাত, টিনের পাত বা রবার প্রভৃতি বস্তু ভেদ করেই প্রবেশ করতে পারে। রন্টগেন ফটোগ্রাফিক ফিল্মের একটা প্যাকেট কালো কাগজের পর্দায় ভালভাবে মুড়ে এই রশ্মির উপর ধরলেন। দেখা গেল, সেই রশ্মির প্রভাবে ফিল্মটা বেশ প্রকাশ পাচ্ছে। রন্টগেন এই রশ্মিটা আসলে কি তা ধরতে পারেন নি, তাই এর নামকরণ করলেন এক্স-রশ্মি (X-ray).

এই রশ্মির কার্যকারিতার উপর আরও পরীক্ষা চলতে থাকল। রন্টগেন দেখলেন মাংস ভেদ করে যাবার ক্ষমতা এই রশ্মির আছে। নিজের হাতটা তিনি কালো কাগজের মোড়কে ঢাকা একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর রাখলেন। তারপর ওটাকে ধরলেন এক্স-রে মেশিনের সামনে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, হাতের হাড়গুলো এই ফটোতে ফুটে উঠেছে।

রেডিয়াম-এর বিকিরণ

যুগান্তকারী এই আবিষ্কারের জন্য রন্টগেন বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

॥ রেডিয়াম ॥

একটি উত্তপ্ত পদার্থ হতে তাপ নির্গত হতে থাকলে পরে তা শীতল হয়ে যায়। এজন্য কোন পদার্থকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর উত্তপ্ত বা তেজোময় না করলে সেটা দীর্ঘকাল স্বয়ং উত্তপ্ত ও তেজোময় থাকতে পারে না। এটাই সাধারণ নিয়ম।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন জিনিসও আছে যার সম্বন্ধে এই সব নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেই রকম একটি মৌলিক পদার্থের নাম রেডিয়াম।

পৃথিবীর সব জিনিসই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মিলনে গঠিত। এই কণাগুলিকে বলে অণু। এই অণুর ক্ষুদ্রতর অংশগুলিকে বলে পরমাণু। রেডিয়ামের পরমাণুতে এমন শক্তি সঞ্চিত আছে যে, তাতে রেডিয়াম স্বয়ং উত্তপ্ত হয়ে অবস্থান করে এবং অবিরত আলোক বিকিরণ করে। রেডিয়ামের তাপ ও আলোকের ভাণ্ডার নিঃশেষ হতে হাজার হাজার বছর কেটে যায়।
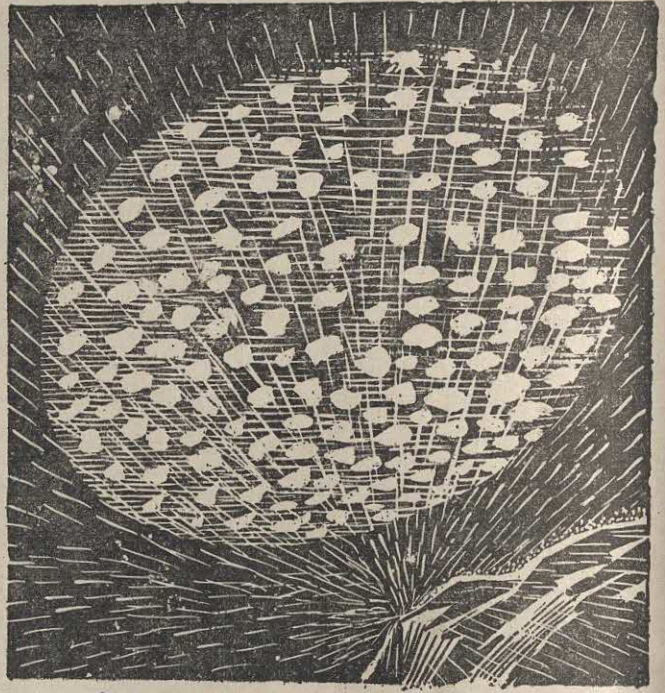
পিচব্লেণ্ড নামক খনিজ পদার্থ হতেই রেডিয়াম পাওয়া যায়। কিন্তু তার মূল্য খুবই বেশী। এক গ্রাম রেডিয়ামের মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত অতি অল্প পরিমাণ রেডিয়ামই পাওয়া গিয়েছে।

রেডিয়াম ক্যানসার বা কর্কট রোগের পক্ষে হিতকর। তাই এর আবিষ্কারের দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার যথেষ্ট উপকার হয়েছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক পিয়েরে কুরি ও তাঁর পত্নী ম্যাডাম মারী বা মেরী কুরি রেডিয়াম আবিষ্কার করেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস শহরে মেরী স্ক্লোডোভ্স্কার জন্ম হয়। তাঁর পিতা একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। পিতার নিকট থেকে সুশিক্ষা লাভ করে তিনি পোল্যাণ্ড হতে ফ্রান্সে

চলে আসেন। ফ্রান্সের প্যারিস শহরে তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক পিয়েরে কুরির বিয়ে হয়। তাই তাঁকে ম্যাডাম (মাদাম) অর্থাৎ মিসেস কুরি বলা হয়। তারপর তিনি স্বামীর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে মগ্ন থাকেন।

রণ্টগেন রঞ্জন-রশ্মি বা এক্স-রে আবিষ্কার করেছেন। এই রশ্মি এত শক্তিশালী যে অনেক পদার্থের মধ্য দিয়ে তা ভেদ করে যেতে পারে। এই সময়ে ফ্রান্সের অধ্যাপক বেকারেল পরীক্ষা করে জানতে পারলেন পিচব্লেণ্ড নামে একরকম খনিজ পদার্থ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে।

কুরি-দম্পতি পিচব্লেণ্ড বিশুদ্ধ করার কাজে হাত দিলেন। বড় গামলায় পিচব্লেণ্ড ফুটিয়ে ছাঁকা হল। বহুকাল পরিশ্রমের পর তাঁরা যৌগিক বিসমাথ ধাতু পেলেন। ইউরেনিয়াম ধাতুর চেয়ে তার শক্তি তিনশো গুণ বেশী। এবার ঐ বিসমাথ ধাতু নিয়ে মৌল পদার্থের সন্ধান শুরু করলেন এবং একটি নতুন ধাতব মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার হল। মেরী কুরির জন্মভূমি পোল্যাণ্ডের নামানুসারে ধাতুটির নামকরণ হল পোলোনিয়াম।

এবার ঐ ধাতু থেকে পোলোনিয়াম মুক্ত করার পরীক্ষা শুরু হল। দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর অজানা ধাতুটি কুরি-দম্পতির অন্ধকার গবেষণাগারকে আলোকিত করে তুলল। আবিষ্কৃত হল রেডিয়াম। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে কুরি-দম্পতি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

পিয়েরে কুরি ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের এক রাজপথে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যান। এর পর ম্যাডাম কুরি স্বামীর শূন্যপদে নিযুক্ত হয়ে প্যারিসের সরবন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা করেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ম্যাডাম কুরিকে পদার্থবিদ্যার জন্য পুনরায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

॥ রোগ-বীজাণু ॥

গ্রামের একটা ছেলেকে পাগলা কুকুরে কামড়িয়েছে। তাই ছেলেটিকে নিয়ে আসা হয়েছে একটি কামারশালায়।

বালক পাস্তুর দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে

কামার একটি লোহার সিককে পুড়িয়ে লাল টকটকে করে নিল। তারপর কয়েকজন মিলে ছেলেটিকে শক্ত করে ধরে রাখল। কামার ঐ গরম লোহার সিকটা ছেলেটির কুকুরে কামড়ানো জায়গায় চেপে ধরল। ছেলেটি যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল।

সেই করুণ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর একটি ছেলে। সে ভাবতে লাগল, এই হাতুড়ে চিকিৎসার একটা আমূল পরিবর্তন হওয়া দরকার।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সাধনার পর জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছিলেন সেই দর্শক ছেলেটি, তারই নাম লুই পাস্তুর।

১৮২২ খ্রীস্টাব্দে লুই পাস্তুর ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার দিকে তাঁর ঝোঁক বাড়তে থাকে। স্ফটিক পদার্থের উপর পাস্তুর প্রথমে পরীক্ষা শুরু করেন। টার্টারিক অ্যাসিড নিয়েও তিনি সেই সময় গবেষণা করেন। অনেক রোগই যে একরকম না একরকম জীবাণুর আক্রমণের ফলেই হয়ে থাকে, এ কথা পাস্তুরই আবিষ্কার করেন। এই জীবাণুগুলিকে সাধারণভাবে বীজাণু (germs) বলা যায়।

ফ্রান্সের রেশম-শিল্পও পাস্তুরের প্রচেষ্টায় ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। কি করে রোগবীজাণুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ভাল গুটিপোকার ডিম সংগ্রহ করা যায় পাস্তুর তার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

ইওরোপে এই সময় গরু-মহিষ প্রভৃতি পশুর 'অ্যানথ্রাক্স' নামে একপ্রকার রোগ সংক্রামক আকারে দেখা দেয়। দলে দলে গৃহপালিত পশু মারা পড়তে থাকে। পাস্তুর নিজের গবেষণাগারে এই রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। অবশেষে এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন। তার ফলে গৃহপালিত পশুরা অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। রক্ত দূষিত হওয়ার কারণও পাস্তুর নির্ণয় করেন।

তারপর জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক বের করবার জন্য তিনি গবেষণা করে সফল হন। কুকুরের উপর সেই প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করে তার ফলও পাওয়া যায়। তখন ঐ রোগাক্রান্ত মানুষকে কি করে এই প্রতিষেধক দিয়ে বাঁচানো যায় তিনি তার পরীক্ষা করতে থাকেন।

সেই সময়ে এক শিশুকে একটা পাগলা কুকুরে কামড়ায়। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে রোগীর অবস্থা দেখে ডাক্তারেরা হতাশ হয়ে পড়েন।

কিন্তু পাস্তুর বললেন, "আমাকে একটু চেষ্টা করতে দিন।"

দীর্ঘ ন'দিন ধরে পাস্তুর ছেলেটির উপর বিভিন্ন শক্তির প্রতিষেধক প্রয়োগ করলেন। তিন সপ্তাহ পরেও যখন শিশুটি বেঁচে রইল তখন পাস্তুর বললেন—"ছেলে সুস্থ হয়ে উঠবে।"

সত্যি, ছেলেটি রোগমুক্ত হয়ে গেল। লুই পাস্তুরের প্রশংসায় চারদিক্ মুখরিত হয়ে উঠল। মানবজাতির কল্যাণে তাঁর দান অক্ষয় হয়ে রইল।

॥ পেনিসিলিন ॥

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং স্কটল্যাণ্ডে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তারী পাস করে তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষণায় মন দেন।

পাস্তুর রোগবীজাণু আবিষ্কার করেছিলেন। ফ্লেমিং দেখলেন, এই সব রোগবীজাণু সকল সময়ে বাতাস, খাদ্য-পানীয় প্রভৃতির সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। তবু আমরা কি করে বেঁচে থাকি!

পাস্তুর ইনস্টিটিউটের এক অধ্যাপক গবেষণা করে বললেন, রক্তের শ্বেতকণিকারা প্রহরীর মতো সর্বক্ষণ আমাদের শরীর পাহারা দিয়ে বাইরের রোগবীজাণু ধ্বংস করে।

অপর একজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বললেন—রক্তের জলীয় অংশই রোজবীজাণু ধ্বংস করে দেয়।

প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী রাইট বললেন, শ্বেতকণিকার সঙ্গে রোগবীজাণুর সাক্ষাৎই বড় কথা নয়, রোগবীজাণু-প্রতিরোধক বস্তু ধ্বংস করবার জন্য রক্তে ঐ ধরনের রোগবীজাণু সৃষ্টি করার প্রয়োজন। ঐ বস্তুকে বলে 'অপসোনিন'। রক্তে অপসোনিন সৃষ্টি করবার জন্য ঐ রোগবীজাণুর টিকা রক্তে প্রবেশ করিয়ে দিলে অপসোনিন তৈরী হয়ে রোগবীজাণু ধ্বংসের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া যায়। কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় এই কারণেই টিকা নেওয়ার প্রয়োজন।

ফ্লেমিং-এর প্রতিভা ও নিষ্ঠা দেখে রাইট নিজের গবেষণাগারে ফ্লেমিংকে সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় শান্তভাবে গবেষণা চালানো গেল না। তখন গবেষণাগার ফ্রান্সে সরিয়ে আনা হল।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক হাসপাতালে যন্ত্রপাতি নিয়ে ফ্লেমিং পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর সামনে ছিল কাঁচের একটি প্লেট। তাতে তিনি স্ট্যাফাইলোকক্কাস নামে এক বিশেষ ধরনের রোগবীজাণু সৃষ্টি করেছিলেন। সেই বীজাণুর সংস্পর্শে ঘামাচি ও ফোড়া হয়।

অবাক্ হয়ে ফ্লেমিং দেখলেন, প্লেটে শুধু ঐ রোগবীজাণুই নেই, সবুজ ছাতার মতো আরও কি গজিয়েছে। পাত্রে রোগবীজাণু রয়েছে, বীজকণার নতুন বসতিও তৈরী হয়েছে। কিন্তু রোগবীজাণু আর বীজকণা এক সঙ্গে লেগে নেই, মাঝখানে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা।

তা দেখে ফ্লেমিং-এর মনে হল, ঐ বীজকণার

রোগবীজাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা আছে। এরপর ঐ ফাঁকা জায়গায় তিনি নানারকম রোগবীজাণু ছেড়ে দিলেন। দেখলেন, নতুন রোগবীজাণু তো জন্মাচ্ছেই না, বরং যারা ছিল তারাও আকারে অনেক ছোট হয়ে গেছে, অনেকে মরে গেছে।

ঐ সবুজ ছাতার মতো পদার্থে তা হলে এমন কিছু আছে যা রোগবীজাণুর প্রতিষেধক, এবং ওরা ওদের মেরে ফেলবার ক্ষমতা রাখে। ফ্লেমিং দেখলেন, ঐ ছাতা রোগবীজাণুর উপর নিক্ষেপ করলে ওর দেহ থেকে হলুদ রঙের এক ধরনের বিষাক্ত তরল পদার্থ বের হয়; ঐ পদার্থই রোগবীজাণু ধ্বংস করে দেয়। ফ্লেমিং সেই বিষাক্ত তরল পদার্থটির নাম দিলেন 'পেনিসিলিন', কারণ ঐ ছাতার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে পেনিসিলিয়াম নোটেটাম।

কিছুটা পেনিসিলিন অসুস্থ জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করেও আশ্চর্য সুফল পাওয়া গেল।

পেনিসিলিন আবিষ্কার করে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং মানুষের বিশেষ কল্যাণ সাধন করলেন এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

মার্কোনি ও তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্র

গবেষণায় ব্যস্ত ফ্লেমিং

॥ বেতার ॥

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মার্কোনি ইতালীর বোলনে জন্মগ্রহণ করেন। পনেরো বছর থেকেই যন্ত্রপাতির দিকে তাঁর ঝোঁক। পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের মুখে যখন তিনি তড়িৎ-তরঙ্গের কথা জানতে পারলেন, তখনই তাঁর মনে চিন্তা এল, কি করে ঐ তড়িৎ-তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীর দূর-দূরান্তরের মানুষকে কাছে টেনে আনা যায়।

শুরু করলেন তিনি পরীক্ষা ও নানা গবেষণা। মনের মতো যন্ত্রপাতি যোগাড় করতে পারেন না। যে ট্রান্সমিটার যন্ত্রটা ব্যবহার করেন সেটাও অতি সেকেলে। চেষ্টা-চরিত্র করে তিনি নিজেই ঐ যন্ত্রের ত্রুটিগুলি সারিয়ে নেন এবং যন্ত্রের উন্নতি করার চেষ্টা করেন। কি করে আরও স্পষ্ট শোনা যায় সেজন্য তিনি গবেষণা করতে থাকেন। স্পার্কগ্যাপের এক প্রান্ত এরিয়ালের সঙ্গে যুক্ত করে অপর প্রান্ত মাটিতে পুঁতে দেন। বেতার-সংকেত প্রেরণের এক কৌশল আবিষ্কৃত হয়ে যায়।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সেই পুরনো যন্ত্রপাতির সাহায্যেই মার্কোনি দু'মাইল দূরের দু'প্রান্তে বেতার-সংকেত পাঠাতে সক্ষম হলেন।

ইতালী ক্রমে ক্রমে জানতে পারল এই আবিষ্কারের কথা। স্পেজিয়ায় তাঁর পরীক্ষা চালানোর জন্য ইতালী গভর্নমেণ্ট তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনালেন।

স্পেজিয়ার স্টেশন থেকে বারো মাইল দূরে সমুদ্র-বক্ষের যুদ্ধজাহাজে সংকেত পাঠানো হল।

ইতালীর রাজা হামবার্টও রানী মার্গেরিটা এই পরীক্ষা দেখে মুগ্ধ হলেন। লণ্ডনে ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ অ্যাণ্ড সিগন্যাল কোম্পানি স্থাপিত হল। নানা স্থানে একের পর এক স্টেশন স্থাপিত হল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কোনি বাতিঘরে তাঁর বেতারযন্ত্র স্থাপন করলেন। ইস্ট গুডউইন বাতিঘরের সঙ্গে বারো মাইল দূরের সাউথ ফোরল্যাণ্ড বাতিঘরের বেতার যোগাযোগ ঘটল।

এর কিছুদিন পরে এক দুর্ঘটনা ঘটল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এক হালকা জাহাজের সঙ্গে এক স্টীমারের ধাক্কা লাগে। জাহাজটি ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট গুডউইন বাতিঘরে বেতার-সংকেত পাঠানো হয়। অনেকগুলি লাইফবোট উদ্ধারের কাজে ছুটে আসে, যাত্রীরা বেতার-সংকেতের ফলে প্রাণে বেঁচে যায়।

পৃথিবীর মানুষ এবার বেতার আবিষ্কারের সুফল বুঝতে পারল।

উচ্চ এরিয়াল ও দীর্ঘতর তরঙ্গের সাহায্যে মার্কোনি এবার আরো দূরে সংবাদ পাঠাতে সচেষ্ট হলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের কর্ণওয়ালের উপকূল থেকে আটলান্টিকের ওপারে নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ডে পল্‌ডু নামক স্থানে বেতারবার্তা পাঠাতে সক্ষম হলেন। এমনিভাবে মার্কোনির প্রচেষ্টা সফল হল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র এর আগেই বেতার আবিষ্কার করলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁকে বেতার আবিষ্কারের মহৎ গৌরব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

॥ উড়োজাহাজ ॥

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। নর্থ ক্যারোলিনার কিটিহক নামে এক জায়গায় ছোট্ট একটি মাঠ থেকে আকাশে প্রথম উড়োজাহাজ ওড়ালেন আমেরিকান দু'ভাই—উইলবার রাইট আর অরভিল রাইট।

ছোটবেলা থেকেই দু'ভাই যন্ত্রপাতি কলকবজা ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকতেন। একটু বড় হয়ে তাঁরা তৈরি করলেন সাইকেল ও ছাপাখানার যন্ত্র।

এই সময়ে জার্মানীর অটো লিলিয়েনথাল আকাশে ওড়ার যন্ত্র নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করছিলেন। কিছুটা সফল হবার আগেই তিনি মারা গেলেন। রাইট দু'ভাই তখন ভাবতে লাগলেন—বাষ্পকে কি শূন্যে জাহাজ-চালানর কাজে লাগানো যায় না? বাতাসের চাপ, বাতাসের প্রবাহ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এসবকে ঠেলে কি ভাবে আকাশযানকে আকাশে তোলা যায়—এ নিয়ে তাঁরা গবেষণা করতে লাগলেন।

দু'ভাই একটা এঞ্জিন-বিহীন বিমান (গ্লাইডার) তৈরির কাজে রত হলেন। তৈরি হল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমেত একটা দু'পাখার উড়োজাহাজ। চালকের জন্য নীচের তলায় জায়গা রাখা হল। এতে বাতাসের চাপ অনেকখানি কাটিয়ে ওঠা যাবে। সামনে পিছনে এমন কি পাশেও ভারসাম্য রাখার ব্যবস্থা করা হল। চালকের সঙ্গে তার দিয়ে পাখাগুলো বেঁধে দেওয়া হল।

পেট্রোল এঞ্জিন ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাইট দু'ভাই একটা হালকা এঞ্জিনের ব্যবস্থা করলেন।

অরভিল রাইট ও তাঁর আবিষ্কৃত প্রথম উড়োজাহাজ

তারপর এল সেই বহুপ্রত্যাশিত দিন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বরের সকাল। হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা।

অরভিল বিমানে গিয়ে উঠলেন। উইলবার প্রপেলারটা চালু করে দিলেন। দড়িটাকে টেনে বিমানটাকে কাঠের চাকার উপর ঠেলে দেওয়া হল। বিমান মাটি থেকে উপরে উঠল; বাতাসে পাক খেতে খেতে প্রায় বারো সেকেণ্ড উপরে ভেসে বেড়াল। তারপর ৫৮ ফুট দূরে গিয়ে নীচে নেমে পড়ল।

এরপর শুরু হল আরও গবেষণা। যতই দিন যায় বিমান আরও উপরে উঠে যায়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর রাইট দু'ভাইয়ের উড়ো-জাহাজ দু'ঘণ্টা ধরে আকাশে রইল ও তিনশ' ফুট উপরে উঠে গেল। ফরাসী গভর্নমেন্ট এই ব্যাপার দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। বিমান তৈরির কারখানা খোলা হল। প্রচুর টাকা দিয়ে রাইট দু'ভাইয়ের কাছ থেকে গভর্নমেন্ট পেটেন্টটা কিনে নিলেন।

এরপর যত দিন যেতে লাগল ততই উড়ো-জাহাজের উন্নতি হতে লাগল।

॥ টেলিভিশন ॥

ঘরে বসে মানুষ রেডিওতে গান, খেলার খবর ইত্যাদি শোনে। দূর-দূরান্তের অনেক কিছু তারা ঘরে বসেই শুনতে পায়। কিন্তু তাতেও মানুষ খুশী নয়। তারা গায়কের ছবি ও অঙ্গভঙ্গি দেখতে চায়, খেলাও চোখের সামনে দেখতে চায়।

জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডে এর প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। অনেক যন্ত্রবিদ্ এই ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারলেন না।

জন লোগী বেয়ার্ড নামে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গরিব ছাত্র এই ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন।

ছাত্রটি সত্যি খুব গরিব। স্কটল্যাণ্ডে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে গবেষণার কাজে তিনি ব্রতী হলেন।

টেলিভিশন

অনিয়মিত আহার ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাঁর শরীর দুর্বল, তবু তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না।

বেতারে ছবি ধরার কাজটা নিয়ে তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। একটা ঘরে তাঁর গবেষণার সব যন্ত্রপাতি ও পাশের ঘরে টাঙানো একটা পর্দা। একদিন একটা ব্যাপার দেখে তিনি চমকে উঠলেন। পর্দায় একটা যন্ত্রের ছবি উঠেছে! ওঠা ছবিটি যে পাশের ঘরের যন্ত্রের ছবি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তরুণ বিজ্ঞানী আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। বুঝতে পারলেন, আর একটু চেষ্টা করলেই সাফল্য অনিবার্য। লণ্ডনে এসে এই কাজের গবেষণার জন্য বহু লোকের কাছে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করলেন, কিন্তু কোন সাহায্যই পেলেন না। সকলেই তাঁকে পাগল বলে তাড়িয়ে দিল।

তাতেও বেয়ার্ড দমলেন না। তিনি নিজেই চেষ্টা করতে লাগলেন। গোলাকার একটা স্ক্যানিং ডিস্ক, নিয়নবাতি আর একটা ফটো ইলেকট্রিক সেল—এই নিয়েই তিনি সফলতার পথে এগিয়ে চললেন।

ঘুরন্ত স্ক্যানিং ডিস্কের অসংখ্য ছিদ্রপথে এসে যে আলোকরশ্মি কোন বস্তুর উপর পড়ছে তাকে ফটো ইলেকট্রিক সেলের মাধ্যমে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে সেই তড়িৎশক্তিকে আবার আলোক-শক্তিতে রূপান্তরিত করে তুললেন তিনি। পরে আলোক রশ্মিকে পর্দায় প্রতিফলিত করে তোলা সম্ভব হল।

সফল হল বেতারে ছবি পাঠানোর কৌশল। আধুনিক জগতের এক বিস্ময়—টেলিভিশন—আবিষ্কৃত হল।

॥ রকেট ॥

মানুষ একদিন ডানা মেলে আকাশে উড়তে চেয়েছিল। রাইট দু'ভাইয়ের চেষ্টায় সে উদ্দেশ্য সফল হয়, কিন্তু মানুষের দুরন্ত আশা তবু মেটে না। সে আরও তাড়াতাড়ি দেশ থেকে দেশান্তরে এবং গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে যেতে চায়। তাই সৃষ্টি হল রকেট।

তবে কবে থেকে এই রকেটের সৃষ্টি তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে। কেউ কেউ বলেন, চীন নাকি ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোলদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রথম রকেট ব্যবহার করে। তবে তা ছিল কম গতির রকেট।

এরপর উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম কনগ্রেভ রকেটের অনেক উন্নতি সাধন করলেন। শোনা যায়, ফ্রান্সের নেপোলিয়ন দি গ্রেটের বিরুদ্ধে ইংরেজরা রকেট ব্যবহার করে।

ডঃ রবার্ট গডার্ড

তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পরই রকেট নিয়ে ভাল ভাবে গবেষণা শুরু হয়। আমেরিকার ডঃ রবার্ট হাচিংস গডার্ড মাত্র পনেরো বছর বয়সে একটা বড় অ্যালুমিনিয়ামের বেলুন তৈরি করেন। বেলুনটা অবশ্য বেশীদূর উঠল না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে একটু পরেই মাটিতে নেমে এল।

তবু গডার্ড দমলেন না। মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে কলেজে অধ্যাপক হলেন। তিনি তখন ডক্টরেট পেয়েছেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তৈরী রকেট শূন্যে উঠল।

কিন্তু সেই রকেটের উৎকট শব্দে লোকে ভয় পেয়ে গেল। আগুন লেগেছে মনে করে দমকলের গাড়ি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ছুটে এল। তখন গডার্ড কিছু সহকর্মী নিয়ে নিউ মেক্সিকোতে চলে গেলেন।

সেখানে গিয়ে তিনি একটা নতুন ধরনের রকেট তৈরি করলেন যার পেটটা বিরাট জালার মতো। তার ভিতর দেওয়া হল প্রচুর জ্বালানি। জ্বালানিতে আগুন জ্বালানো হল। জ্বালানি পুড়ে রকেটের অভ্যন্তরে গ্যাসের প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হল। এ চাপই রকেটকে প্রচণ্ড বেগে উপরে উঠতে সাহায্য করল।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার গডার্ড আকাশে রকেট উঠালেন। রকেটটি লম্বায় ছিল প্রায় পনের ফুট ও ওজনে প্রায় পঁচাশি পাউণ্ড। সেটা মাটি থেকে ঘণ্টায় প্রায় সত্তর মাইল বেগে উপরে উঠে গেল।

ডঃ গডার্ড রকেটকে আরও উপরে উঠাবার চেষ্টায় গবেষণা করতে লাগলেন। তখন পৃথিবীর আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী রকেট নিয়ে গবেষণা করছিলেন। সেই গবেষণার খবরাখবর নিয়ে গডার্ড তরল জ্বালানির কথা চিন্তা করতে লাগলেন। গ্যাসোলিন আর নাইট্রিক অ্যাসিড, তরল রিফাইনড কেরোসিন ও তরল হাইড্রোজেন, অ্যালকোহল ও তরল অক্সিজেন এই সব নিয়ে গডার্ডের পরীক্ষা শুরু হল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ গডার্ড পরলোক গমন করায় তাঁর গবেষণা আর অগ্রসর হয়নি।

পরবর্তী কালে রকেটের আরও অনেক পরিবর্তন হয়ে তার উন্নতি হল। তার গতি নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবিত হল। মানুষ রকেটে চড়ে চাঁদে গিয়ে নামল। এর মূলে রয়েছে ডঃ গডার্ডের এবং জার্মান বৈজ্ঞানিক ওবের্থ-এর গবেষণা।

॥ পারমাণবিক বোমা ॥

নিউ ইয়র্কের ছেলে জুলিয়াস ওপেনহাইমার। জন্ম তাঁর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে তিনি ডিগ্রী পেলেন; তারপর চলে এলেন কেমব্রিজে। বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ডের অধীনে থেকে তিনি কিছুদিন গবেষণা করলেন।

প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ

কিছুকাল জার্মানীতে কাটালেন। তারপর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হলেন। তারপর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেক্সিকোর লস্ আলামস লেবরেটরীর অধ্যক্ষ হলেন।

ইতালীর বিজ্ঞানী এন্‌রিকো ফার্মি আবিষ্কার করেছেন যে, নিউট্রন ক্ষেপণে পরমাণু কেন্দ্র ভেঙে যায়। ঐ পরমাণু কেন্দ্রে বিভাজন ঘটলে প্রচণ্ড পরমাণু শক্তি বেরিয়ে আসবে। ঐ বিস্ফোরণ সুদূরপ্রসারী হবে।

এন্‌রিকো ফার্মির প্রদর্শিত পথ ধরে ওপেনহাইমার গবেষণার পথে এগিয়ে চললেন।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই। পারমাণবিক প্রচণ্ডশক্তি নির্গত হল। ওপেনহাইমারের নেতৃত্বে একদল তরুণ বিজ্ঞানী মেক্সিকোর এক জায়গায় পরমাণুকে ভেঙে তার ভেতরকার প্রচণ্ড শক্তির বাঁধন খুলে দেবার যন্ত্রটি তৈরি করলেন।

এভাবেই পারমাণবিক যুগের সূচনা হল। ওপেন-হাইমার পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করে বিখ্যাত হলেন।

কিন্তু এত খ্যাতিলাভ করেও তিনি মনে শান্তি পান নি। আমেরিকা ক্ষমতার গর্বে মত্ত হয়ে ধ্বংসের কাজে এই শক্তিকে নিয়োগ করল। জাপানে আমেরিকার পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হল। ওপেনহাইমার এই ঘটনায় ভয়ানক দুঃখ পেলেন। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন—এ ঘোরতর অন্যায়! এমন নারকীয় হত্যাকাণ্ড আমি চাই নি!

॥ অবাক্-করা ছেলে ॥

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের সমুদ্রতীরে একটি দেশ। নাম তার কেরল। প্রায় বারোশো বছর আগে সেই রাজ্যে এক শিশুর জন্ম হয়েছিল। নাম তার শংকর।

শিশুটি যত বড় হয় তত তার নানা রকম গুণ প্রকাশ পেতে থাকে। সে একবার যা শোনে চিরদিনের জন্য তার মনে তা গেঁথে যায়। মাত্র তিন বছর বয়সে সে-দেশে প্রচলিত সব ভাষার যে-কোন বই সে পড়তে পারত।

তখনকার দিনে সবাই টোলে পড়াশোনা করত। শংকরও টোলে ভরতি হল। টোলের এক কোণে বসে সে পড়াশোনা করত। গুরুমশায় অন্যদিকে উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতেন। সেখানে শাস্ত্রের নানা কঠিন বিষয়ের আলোচনা হত।

শংকরের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। একদিন তার মুখে এক অদ্ভুত কথা শুনে গুরুমশায় চমকে উঠলেন। উপরের শ্রেণীর ছাত্ররা অনেক মাথা ঘামিয়েও যা পারে না তা অতি সহজেই সে বলে দিল। বালক এক কোণে বসে কখন যে উচ্চতর শাস্ত্র আয়ত্ত করে ফেলেছে, সে খবর কেউ রাখে না। গুরুমশায় বুঝলেন, বিরাট প্রতিভা নিয়ে এ বালক জন্মগ্রহণ করেছে। সেদিনই তিনি শংকরকে উপরের শ্রেণীতে বসবার অনুমতি দিলেন।

বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করে শংকর টোল ছেড়ে ঘরে ফিরে এল। তখন তার বয়স সাত বছরও পূর্ণ হয় নি।

এই ছেলে পরবর্তী কালের মহাজ্ঞানী ও মহাসাধক শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রীঃ)।

॥ রাজার ছেলে পণ্ডিত ॥

এক হাজার বছর আগেকার কথা। পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরের রাজা ছিলেন কল্যাণশ্রী। সেই রাজার এক ছেলে ছিল—নাম চন্দ্রগর্ভ। আর এক নাম পরে হয়েছিলো দীপংকর শ্রীজ্ঞান।

দীপংকর রাজার ছেলে, তাই রাজা কল্যাণশ্রী নানা দেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিত এনে ছেলেকে নানারকম জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা শেখাতে লাগলেন। অনেক কিছু শিখেও দীপংকরের আশা মিটল না।

গুরুমশায় চমকে উঠলেন

বাঙলা দেশ ছেড়ে চললেন বোম্বাই-এর কাছাকাছি কৃষ্ণগিরি বিহারে। সেখানে রাহুলগর্ভ নামে এক মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সকল বিদ্যাই তিনি দীপকংরকে শেখালেন।

দেশে ফিরে এসে দীপংকরের ঘরে থাকতে মন চাইল না। তিনি মগধের ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চললেন। সেখানে ছিলেন প্রবীণ পণ্ডিত শীল রক্ষিত। দীপংকরের মতো ছাত্র পেয়ে তিনি খুব খুশী হলেন। তাঁর প্রতিভা আর জ্ঞান দেখে তিনি তাঁর নাম দিলেন দীপংকর। অগাধ জ্ঞানশালী বলে তাঁর আর এক নাম হল শ্রীজ্ঞান।

এই দীপংকর (৯৮০-১০৫৩ খ্রীঃ) দুর্গম পর্বত অতিক্রম করে সুদূর তিব্বতে গিয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বেলেছিলেন। সেখানে লোকে তাঁকে বলত 'অতিশা' তা থেকে আমরা তাঁর নাম করে নিয়েছি অতীশ।

॥ যিনি রাজার মতো সম্মান পেয়েছিলেন ॥

জমিদার রামকান্ত রায়ের ছেলে রামমোহন।

অক্ষর-পরিচয় হতে রামমোহনের দু'তিন দিনের বেশী লাগল না। ফলা-বানান এবং যুক্ত-অক্ষরও তিনি দু'তিন দিনের মধ্যে শিখে ফেললেন।

সেকালে হিন্দুদের মধ্যেও আরবী ও ফারসী শেখার রেওয়াজ ছিল। ঐ ভাষা না শিখলে সরকারী কাজকর্মে খুব অসুবিধে হত। রামকান্ত তাই ছেলেকে আরবী ও ফারসী শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। রামমোহন অল্পদিনের মধ্যে ঐ দুটি ভাষা শিখে মৌলভীদের পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিলেন।

তারপর তাঁকে সংস্কৃত শেখানো হতে লাগল। কয়েক মাসের মধ্যেই রামমোহন সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

রামমোহনের বয়স তখন খুবই কম। মা তারিণী দেবী ছেলেকে নিয়ে তাঁর বাবার বাড়িতে গেলেন।

রাহুলগর্ভ সকল বিদ্যাই দীপংকরকে শেখালেন

তারিণী দেবীর বাবা শ্যাম ভট্টাচার্য শিব পূজা করতেন। তিনি একদিন পূজা শেষ করে একটি বেলপাতা রামমোহনের হাতে দিলেন। বালক রামমোহন বেলপাতাটি মাথায় না ছুঁইয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল। শ্যাম ভট্টাচার্য নাতিকে অভিশাপ দিলেন—"তুই বিধর্মী হবি।"

তারিণী দেবী সে কথা শুনে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তখন বাবা মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন—"তোর ছেলে মহাপণ্ডিত হবে, রাজার মতো সম্মান পাবে।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অভিশাপ ও আশীর্বাদ দুই-ই সফল হয়েছিল। রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং দেশের অনেক কুসংস্কার দূর করেছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন দিল্লীর বাদশার থেকে 'রাজা' উপাধি, আর দেশবাসীর কাছে রাজার মতো সম্মান। ১৭৭৪ খ্রীঃ তাঁর জন্ম ; ১৮৩৩ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

মোৎসার্ট

॥ ছয় বছরে গাইয়ে বাজিয়ে ॥

জার্মানীর ছেলে মোৎসার্ট। যখন সে কথা বলতে শিখল তখন থেকেই দেখা গেল সে গান গাইতে খুব ভালবাসে। তিন বছর যখন তার বয়স তখন থেকেই তাকে গান শেখানো হতে লাগল।

ছেলেটি চার বছর বয়সে সবাইকে অবাক্ করে দিল। তখনও সে লিখতে শেখে নি, অথচ গানের সুর তৈরি করতে লাগল। কিছুদিন পরে নিজেই সে গান লিখতে শুরু করল। শুধু গানে নয়, বাজনাতেও সে হয়ে উঠল ওস্তাদ। ছ'বছর বয়সেই গান গেয়ে ও বাজনা বাজিয়ে সারা ইওরোপ মাতিয়ে তুলল। দেশবিদেশের রাজারাজড়ারা তাকে ডেকে পাঠাতেন।

পরবর্তী কালে মোৎসার্ট (১৭৫৬-১৭৯১ খ্রীঃ) জার্মানীর বিখ্যাত সংগীত-রচয়িতা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন।

॥ শিশু শিল্পী ॥

ইতালীর মাইকেল এঞ্জেলোর (মিকেলেঞ্জেলো বুওনারোত্তি) কাহিনী শুনেও অবাক্ হতে হয়। তখন তার বয়স ছয় কি সাত। স্কুলে পড়ে। খাতায় আঁক কষতে গিয়ে পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকে।

একদিন শিক্ষক খুব বকুনি দিলেন। কিন্তু তিনিই পরে ছাত্রের ছবি আঁকার ক্ষমতা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। বয়স্ক শিল্পীরাও এত সুন্দর ছবি আঁকতে পারে না।

ক্রমশঃ সব শিক্ষকের চোখেই ব্যাপারটি ধরা পড়ে গেল। এই বয়সেই এমন ছবি আঁকে! বড় হলে নিশ্চয় খুব নামকরা শিল্পী হবে!

শিক্ষকদের ধারণা মিথ্যা হয় নি। এই বালকই পরবর্তী কালের বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬০ খ্রীঃ) নামে বিশ্বজোড়া খ্যাতি পান। এঁর আঁকা ছবির আর গড়া মূর্তির আজও কোন তুলনা মেলে না।

॥ নাটক দেখে নাট্যকার ॥

স্পেনের একটি ছেলে। নাম তার কটসেবুও। ছ'বছর বয়সেই সে ভাল কবিতা লিখতে পারত।

কিন্তু তার ছিল ভয়ানক থিয়েটার দেখার শখ। বড় গরিব, তাই পয়সার অভাবে দেখতে পারত না। অনেক ভেবে ভেবে সে এক ফন্দী বের করল। থিয়েটার হলের পাশেই ছিল সারি সারি ড্রাম। যতক্ষণ না অভিনয় শুরু হয় ততক্ষণ সেই ড্রামের পিছনে সে লুকিয়ে থাকত। তারপর কৌশলে থিয়েটারের মধ্যে ঢুকে পড়ে এক অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে থিয়েটার দেখত।

অভিনয় দেখতে দেখতে তার মনে নাটক লেখার উৎসাহ জেগে উঠল। লিখতে শুরু করল নাটক। তার প্রথম নাটক যখন শৌখিন নাট্য সমিতি দ্বারা অভিনীত হয় তখনও সে ছাত্র।

কিছুকালের মধ্যেই কটসেবুও স্পেনের এক প্রতিভাশালী নাট্যকার হিসেবে পরিগণিত হলেন।

॥ শিশু কবি ॥

ইংল্যাণ্ডের রেজিন্যাল্ড হীবারের (১৭৮৩-১৮২৬ খ্রীঃ) প্রতিভাও ছিল অদ্ভুত। সাত বছর যখন তার বয়স তখন সে গোটা একটি বিদেশী কাব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করে ফেলল। তারপর ল্যাটিন ভাষায় কবিতা লিখতে শুরু করল। কবিতা লেখার জন্য যখন সে জাতীয় পুরস্কার লাভ করল তখন সে অক্সফোর্ডের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। এর আগে ঐ পুরস্কার এত কম বয়সে কেউ লাভ করে নি।

বড় হয়ে তিনি পাদরী হয়ে কলকাতায় আসেন এবং এখানেই মারা যান। তাই তিনি বিশপ হীবার নামেই বেশী পরিচিত।

॥ পণ্ডিত মশাই অবাক্ ॥

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন চার বছর পাঁচ মাস। পিতা ঠাকুরদাস তাকে পাঠশালায় ভরতি করিয়ে দিলেন। পাঠশালার পণ্ডিত কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বরবর্ণের পাতা খুলে ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন—"পড়ো অ. আ. ই. ঈ।" দু'তিনবার পড়ানোর পরই ঈশ্বরচন্দ্র সবগুলো অক্ষর শিখে ফেলল।

ঈশ্বরচন্দ্র আরও শিখতে চায়। তখন পণ্ডিত মশাই

শিক্ষক বালক মাইকেল এঞ্জেলোর আঁকা ছবি দেখে অবাক্ হলেন

ব্যঞ্জনবর্ণও তাকে শেখালেন। দু'তিনবার পড়েই সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ঈশ্বরচন্দ্রের মুখস্থ হয়ে গেল। শুধু মুখস্থ নয়—লিখতেও সে শিখে ফেলল।

পণ্ডিত মশাই অবাক্! ঈশ্বরচন্দ্র তিন বছরের মধ্যেই পাঠশালার পড়া শেষ করে ফেলল। পাঁচ-ছ'বছরেও অন্য ছেলেরা তা পারে না।

ঐ ছোট বয়সেই ঈশ্বরচন্দ্র বাবার সঙ্গে পায়ে হেঁটে কলকাতা চলল। পথে যেতে যেতে দেখতে পেল মাইলস্টোনের উপর ইংরেজী অক্ষর। তা দেখে পথের দূরত্ব জানা যায়। একবার করে দেখেই ইংরেজী সব অক্ষর সে শিখে ফেলল।

সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র আট বছর বয়সে ভরতি হল। এত কম বয়সে কোন ছেলে সংস্কৃত কলেজে এর আগে ভরতি হয় নি। তার প্রতিভা দেখে অধ্যাপকরাও অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন।

সবাই ভেবেছিলেন এই ছেলে বড় হয়ে মস্ত বড় পণ্ডিত হবে। সেই অনুমান সত্যি হয়েছিল। অতি অল্প বয়সেই ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেছিলেন। আজও সকলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১ খ্রীঃ) নামে মাথা নোয়ায়।

ঈশ্বরচন্দ্র আরও শিখতে চায়

॥ দুঃখে যে ভেঙে পড়ে নি ॥

ছেলেটি বড় গরিব। বাবা নেই, বিধবা মা কোন রকমে তাকে মানুষ করেছেন। পয়সার অভাবে বেশীদিন স্কুলে পড়ার সুযোগ সে পেল না। কোন-রকমে ইংরেজীটা একটু শিখে পয়সা রোজগারের আশায় সে বেরিয়ে পড়ল।

তখন দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগ। অনেক লোকই ইংরেজী জানত না। অথচ ইংরেজ শাসক ও বণিক্‌দের সঙ্গে ইংরেজীতে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতে হয়। সেই ছেলেটি অনেকের চিঠিপত্র লিখে দিয়ে কিছু রোজগার করে।

চিঠিপত্র লিখে দিয়ে রোজগার করে

এই বয়সে এই অবস্থায় অনেকেই ভেঙে পড়ে। কিন্তু ছেলেটি বিচলিত হয় নি। অনেক দূরে পাঠাগারে গিয়ে পড়াশোনা করত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও বক্তৃতা শোনার তার খুব আগ্রহ ছিল। ভবানীপুর থেকে পাঁচ মাইল হেঁটে মাঝে মাঝেই ডফ সাহেবের বক্তৃতা শুনতে সে হেদুয়ায় আসত।

স্কুলে কলেজে না পড়ে, এইভাবে চেষ্টা করে ছেলেটি আশ্চর্য রকমের বিদ্বান হয়েছিল।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার যা পড়তেন তা জীবনে ভুলতেন না।

শোনা যায়, তিনি পঁচাত্তর খণ্ড এডিনবরা রিভিউ আগাগোড়া পড়ে ফেলেছিলেন। শুধু পড়া নয়, কোথায় কোন্ খণ্ডে কি বিষয় আছে তা অনায়াসে বলতে পারতেন।

ইনি হলেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১ খ্রীঃ)।

॥ পড়ার পাগল ॥

এক অদ্ভুত ছেলে। চার বছরও বয়স তখন তার হয় নি। বাবা 'প্রথম ভাগ' বই এনে দিয়েছেন।

ছেলে হরিনাথের কিন্তু সবুর সয় না। সে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। তখন তার মা কয়েক পাতা পড়িয়ে দিলেন। ছেলে তবু খুশী নয়। সে মাকে বলল সবটা পড়িয়ে দিতে। তখন ক্যাত্যায়নী দেবী গোটা বইখানা একবার পড়িয়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা হরিনাথ এসে পিতা ভূতনাথের হাতে প্রথম ভাগ বইখানা তুলে দিল। তারপর গড়গড় করে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত মুখস্থ বলে গেল। শুধু তাই নয়, স্লেটের উপর অ আ ক খ সবগুলি অক্ষর লিখে ফেলল।

এই শিশুই বিখ্যাত ভাষাবিদ্ হরিনাথ দে (১৮৭৭-১৯১১ খ্রীঃ)। পৃথিবীর চৌত্রিশটি প্রধান

মা কাত্যায়নী পুত্র হরিনাথকে পড়াচ্ছেন

বালক আশুতোষ ঘরের মেঝের উপর লাইন কাটছে

প্রধান ভাষায় তার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। সারা পৃথিবীর লোক তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিল। ইনি মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বেঁচে ছিলেন।

॥ বাংলার বাঘ ॥

আশুতোষ তখন শিশু। বিদ্যালয়ের ছাত্র। এই বয়সে অনেক ছেলে পড়ায় ফাঁকি দিয়ে খেলাধুলা করতে ভালবাসে। আশুতোষের সে সব নেই। পড়াশোনায় তার বেশী মনোযোগ।

একবার তার কঠিন অসুখ হল। চিকিৎসার পর অসুখ সেরে গেল বটে, কিন্তু শরীরের দুর্বলতা কাটল না। চিকিৎসকরা বিধান দিলেন যে কিছুদিন পড়াশোনা করা চলবে না, পুরো বিশ্রাম নিতে হবে।

কিন্তু আশুতোষ পড়াশোনা ছাড়া একটি দিনও থাকতে পারে না। লুকিয়ে লুকিয়ে স্কুলের বই পড়ে। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ তা জানতে পেরে ঘর থেকে বই খাতা কলম সব সরিয়ে ফেললেন। এমন

কি এক টুকরো খড়িও ঘরে রাখতে দিলেন না। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন যাতে কোন উপায়ে ছেলে পড়াশোনা না করতে পারে।

একদিন গঙ্গাপ্রসাদ বন্ধ ঘরে ছেলে কি করছে তা দেখবার জন্য জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি দেখলেন, হাতের কাছে কোন কিছু না পেয়ে আশুতোষ এক টুকরো কয়লা নিয়ে ঘরের মেঝের উপর লাইন কাটছে। বুঝতে পারলেন, জ্যামিতির কঠিন প্রশ্নের সে সমাধান করছে। গঙ্গাপ্রসাদ অবাক্ হয়ে গেলেন।

এই বয়সেই আশুতোষের পড়াশোনায় কি আগ্রহ আর কি তার প্রতিভা! সমবয়সী ছেলেদের মধ্যে এমন বড় দেখা যায় না। আর কী অসীম তার সাহস! কোন কিছুতেই সে ভয় করে না।

এই ছেলেই 'বাংলার বাঘ'—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

॥ গরিব বলে ভয় কি! ॥

অ্যাব্রাহাম খুবই গরিবের ছেলে। স্কুলে লেখাপড়া শেখার সুযোগ তার নেই। অথচ পড়াশোনা করার আগ্রহ খুব।

বই কিনে পড়বে, সেই পয়সাও সে জোটাতে পারে না। তখন সে ধার করে এনে বই পড়তে লাগল।

একদিন একটি ছেলের কাছ থেকে নিয়ে এল একটি বই। তাড়াতাড়ি বইটি ফেরত দিতে হবে। অ্যাব্রাহাম তাই মন দিয়ে পড়তে লাগল।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! জানালার কাছে বইটি রেখে অ্যাব্রাহাম একটু বাইরে গিয়েছিল। হঠাৎ বৃষ্টি এল। অ্যাব্রাহাম ফিরে এসে দেখল, বইটি ভিজে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

এখন কি হবে! পয়সা নেই যে ছেলেটিকে বই কিনে দেবে। তখন এক ক্ষেতে মজুর খেটে অ্যাব্রাহাম পয়সা রোজগার করতে লাগল। এভাবে কয়েকদিন কাজ করে পয়সা জমিয়ে ছেলেটিকে বইয়ের দাম শোধ করে দিল।

অ্যাব্রাহাম দেখল, বইটি ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে

ছোটবেলা থেকেই ছেলেটির পড়ার দিকে কি আগ্রহ! কাজের প্রতি কি নিষ্ঠা! সে ভাবত, কি করে লোকের অভাব ঘুচানো যায়। এক জাতি আর এক জাতিকে ঘৃণা করে, কি ভাবে তা দূর করা যায়।

এই ছেলে অ্যাব্রাহাম লিংকন (১৮০৯-১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) বড় হয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

॥ শুধু কি ডানপিটে ॥

শিলারের জীবন অতি বিচিত্র। ঘন ঘন চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। বালক শিলার একটা বড় গাছের উপর গিয়ে উঠল। সে দেখবে এত সুন্দর বিদ্যুৎ কোথা থেকে আসে! কি অদ্ভুত ছেলে!

বয়স একটু বাড়তেই সে কবিতা লেখার দিকে বেশীরকম ঝুঁকে পড়ল। চোদ্দ বছর বয়স হতে

বালক শিলার একটা গাছের উপর গিয়ে উঠল

না হতেই লিখে ফেলল তার চাঞ্চল্যকর কাব্য 'Die Rauber' (ডাকাত)।

বড় হয়ে জার্মানীর একজন খ্যাতনামা কবিরূপে পরিচিত হলেন শিলার (১৭৫৯-১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

॥ সবাই তারিফ করে ॥

ইতালীর একটি ছেলে, প্যাগানিনি। আট বছর বয়সেই কি সুন্দর বেহালা বাজায়! মুগ্ধ হয়ে যায় সবাই তার বাজনা শুনে। সেই বয়সেই নিজে মাথা খেলিয়ে সে একটি গৎ বের করল। কি চমৎকার সেই গৎ! যারা শুনত তারাই তারিফ করত।

এত কম বয়সে বেহালা বাজিয়ে প্যাগানিনির (১৭৮৪-১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ) মতো নাম ইতালীতে কেউ করতে পারে নি।

॥ মাস্টারেরই ভুল ॥

গরিব মা আর তাঁর ছোট্ট ছেলে। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা নেই, ছেলেটি গেল গান শিখতে। তার গলা শুনে মাস্টার বললেন, "গানে তোর কিছু হবে না।"

মা নিজে গান জানতেন। তিনি নিজেই শিক্ষার ভার নিলেন।

সেই ছেলে এনরিকো কারুসো বড় হয়ে পাশ্চাত্য সংগীতের শ্রেষ্ঠ গায়ক হয়েছিলেন।

॥ ছোটদের মধ্যে বড় ॥

ইতালীর কবি দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খ্রীষ্টাব্দ), টাসো (১৫৪৪-১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) এবং আলফিয়েরি (১৭৪৯-১৮০৩ খ্রীঃ) তিনজনই বিখ্যাত। এই তিনজনেরই কবিপ্রতিভার বিকাশ হয় অতি অল্প বয়সে। ন'বছর বয়সেই দান্তে ভাবের আবেগে ঘুরে বেড়াত। টাসো আরো কম বয়স থেকেই কবিতা লিখত।

আলফিয়েরি অল্প বয়স থেকেই কবি ও ভাবুক। যখন তার বয়স মাত্র আট বছর তখন সে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে। বিষাক্ত মনে করে যে লতা সে খেয়েছিল, তাতে তার মৃত্যু হয় নি। তবে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার পর তার মনে এক নতুন প্রেরণা জেগেছিল। সেই প্রেরণাই তাকে বিখ্যাত করে তুলেছিল।

॥ একটা কিছু করতে হবে ॥

ছোট ছেলে আলভা। এই বয়সেই সব কিছু করার জন্য তার কি আগ্রহ! কাঠ দিয়ে ছোট ছোট গাড়ি তৈরি করে। লোহার টুকরো এনে কত রকম জিনিস তৈরি করার চেষ্টা করে।

একদিন সে দেখল, একটা মুরগী তার ডিমের উপর বসে আছে। মাকে সে জিজ্ঞেস করলো, "মা, মুরগীটা কি করছে?" মা বললেন, "ডিমে তা দিচ্ছে, বাচ্চা ফোটাবে।" সত্যি ক'দিন পরেই ডিম থেকে বেরুলো তুলতুলে বাচ্চা। তাই দেখে আলভার ঝোঁক চেপে গেল। খাবার জন্য ঘরে কতগুলো মুরগীর ডিম ছিল। সেগুলোর উপর বসে সে তা দিতে লাগল।

এতে ফল হল বিপরীত। চাপ লেগে ডিমগুলো ফেটে গেল। মা এসে আলভাকে খুব বকুনি দিলেন।

মা এসে আলভাকে খুব বকুনি দিলেন

সংসারে অভাব, দিন চলে না। একটি ছাপাখানায় সে চাকরি নিল। সেখানে খবরের কাগজ ছাপে ও কাছেই রেলস্টেশনে কাগজ বিক্রি করে।

একদিন এক বিচিত্র উপায়ে সে স্টেশন মাস্টারের নজরে পড়ে গেল। তিনি তাকে যন্ত্রপাতির কাজ শেখার সুযোগ করে দিলেন। তার ফলেই ছেলেটি পরবর্তী কালে বিজলী বাতি, গ্রামোফোন, ভোট গোনার যন্ত্র এবং আরও অনেক জিনিস আবিষ্কার করতে পেরেছিল। জগৎ জুড়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর নাম টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ)।

॥ গুণের নেই তুলনা ॥

আমাদের দেশেরই ছোট একটি ছেলে। জাতে মারাঠী। তার বয়স যখন মাত্র চার বছর, তখন তার বাবা মারা গেলেন। বড় অসহায় হয়ে পড়ল ছেলেটি। কিন্তু তার বড় ভাই তাকে বড় ভালবাসতেন। তিনি ছোট ভাইটিকে মানুষ করতে লাগলেন।

ছেলেটি যে জীবনে বড় হবে তার পরিচয় ছোট বেলাতেই পাওয়া গিয়েছিল। সে তখন স্কুলে পড়ে। একদিন শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে সবাইকে একটি অঙ্ক কষতে দিলেন।

খুব কঠিন অঙ্ক। শুধু সেই ছেলেটি ছাড়া কেউ সেই অঙ্কটি শুদ্ধভাবে করতে পারল না। শিক্ষক তাতে ছেলেটির উপর খুব খুশী হলেন। তিনি তাকে বললেন —"তুমি প্রথম বেঞ্চিতে সবার আগে গিয়ে বস।"

ছেলেটি কিন্তু নিজের আসন থেকে নড়ল না।

শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন—"একি, তুমি উপরে গিয়ে বসছ না কেন?"

ছেলেটি বলল—"স্যার, আমি কাল এই অঙ্কটি একজনের কাছ থেকে শিখে নিয়েছি। তাই আজ এটি নির্ভুলভাবে করতে পারলাম। পরের সাহায্য নিয়ে যা করেছি, তার সুযোগ নিয়ে আমি সকলের উপরে গিয়ে বসতে পারব না।"

এই ছেলেটির নাম গোপালকৃষ্ণ গোখলে। 'মহামতি গোখলে' নামেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত (১৮৬৬-১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

॥ অবাক্ কাণ্ড ॥

ছেলেটির বয়স তখন পাঁচ বছর। পিতা কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ছিলেন একজন সুগায়ক। একদিন তিনি হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইছেন। বালক দ্বিজেন্দ্রলাল একমনে শুনছে।

গাইতে গাইতে পিতা কি একটা কাজে হঠাৎ উঠে গেলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই অবসরে হারমোনিয়মটি নিয়ে বসল এবং চাবি টিপতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে পিতা ফিরে এসে শিশুপুত্রের কাণ্ড দেখে অবাক্! ছেলে তাঁর গাওয়া কঠিন গানটি ঠিক ভাবে সুর করে গাইছে।

অদ্ভুত ছেলেটির গুণ। সাত আট বছর বয়সের সময় সে একজন বক্তার অনুকরণে বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে অবাক্ করে দিয়েছিল! আর কি সুন্দর সে আবৃত্তি করতে পারত! একবার পড়েই গড়গড় করে তা বলে যেত।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়বার সময় এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। একদিন ক্লাসের বেশির ভাগ ছাত্র পড়া তৈরি করে আসে নি। তাই শিক্ষক মহাশয় তাদের বললেন—"তোমরা সব ঘরের ওধারে দাঁড়িয়ে পড়া মুখস্থ কর।"

ছাত্ররা তাই করতে লাগল।

খানিক পরে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের দিকে তাকিয়ে বললেন—"তুমি কি করছ? ও, তোমার বই নেই? তাহলে কি করে পড়বে?"

দ্বিজেন্দ্র বলল—"আমার পড়া মুখস্থ হয়ে গেছে।"

শিক্ষক মহাশয় অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কি ভাবে?"

দ্বিজেন্দ্র জবাব দিল—"ওদের পড়া শুনে শুনে।"

শিক্ষক মহাশয় পরীক্ষা করে দেখলেন সত্যিই তাই। অন্য ছেলেদের পড়া শুনেই দ্বিজেন্দ্রের সবটা মুখস্থ হয়ে গেছে। অথচ সেই সব ছাত্রদের কেউ বই দেখেও তখনও পড়া মুখস্থ করতে পারে নি।
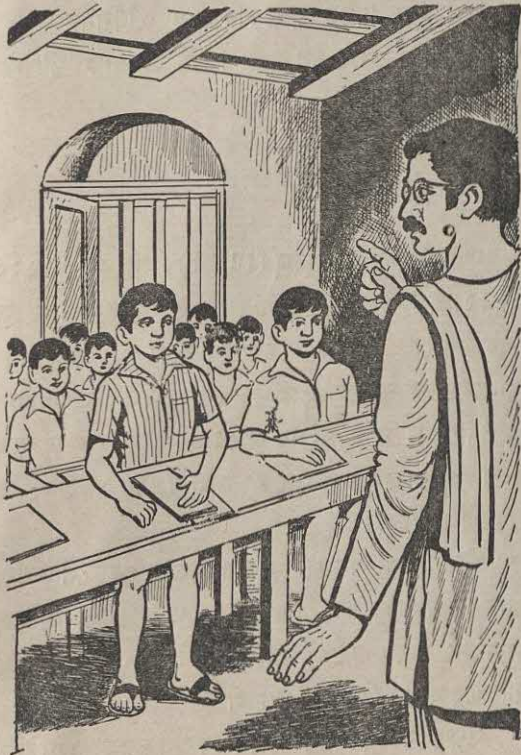
শিক্ষক মহাশয় বললেন, "তোমরা সব ঘরের ওধারে দাঁড়িয়ে পড়া মুখস্থ কর।"

এই ছেলেই বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ডি. এল. রায় নামেই তিনি বেশী পরিচিত। (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

॥ যেমন তেমন ছেলে নয় ॥

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিল একটি ছেলে। নাম ব্রজেন্দ্রনাথ। তার যখন সাত বছর বয়স তখন তার বাবা মারা গেলেন। ছেলেটি পড়ল বিপদে।

তবে লেখাপড়ায় সে ছিল খুব ভাল। তাই স্কুলে ভরতি হওয়ার সুযোগ পেতে অসুবিধে হল না।

গরমের ছুটিতে সে খুব খেটেখুটে সমস্ত বীজ-গণিতের বইটা শেষ করে ফেলল। তাই শুনে প্রধান শিক্ষক তার পরীক্ষা নিয়ে অবাক্ হয়ে গেলেন। বাস্তবিক ব্রজেন্দ্রনাথ ভালভাবেই বীজ-গণিতের সব কিছু আয়ত্ত করে ফেলেছে।

কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ কলেজে ভরতি হল। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

একদিন সাহেব অধ্যাপক ন্যায়শাস্ত্রের একখানি বই হাতে করে ক্লাসে ঢুকলেন। তাঁর হাতে বইখানি দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ বলল—"স্যার, বইটি আমি একবার পড়তে পারি?"

ছাত্রের কথা শুনে অধ্যাপক হেস্টি অবাক্। বললেন—"এটি এম. এ. ক্লাসের বই। তুমি এর কিছুই বুঝবে না।"

তবু ব্রজেন্দ্রনাথের খুব আগ্রহ দেখে তিনি বইখানি তাকে দিলেন। তিনদিন পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বইটি অধ্যাপক সাহেবকে ফেরত দিয়ে বলল—"এই নিন, আমার পড়া হয়ে গেছে।"

—"আচ্ছা দেখা যাক।" এই বলে হেস্টি সাহেব বই থেকে তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন। সবগুলো প্রশ্নের জবাবই ব্রজেন্দ্রনাথ ঠিক ঠিক দিল। অবাক্ এবং খুশী হয়ে সাহেব অধ্যাপক বললেন—"তুমি একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত হবে।"

গুরুর সে আশীর্বাদ মিথ্যা হয় নি। স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সভায় সম্মানের আসন লাভ করেছিলেন।

॥ খুদে দার্শনিক ॥

বিলেতের ছেলে জন স্টুয়ার্ট মিল। তিন বছর বয়সে সে কঠিন গ্রীক ভাষা শিখে ফেলল। গ্রীক ভাষার সমস্ত ভাল ভাল বই তার পড়া হয়ে গেল আট বছর বয়সেই।

অবাক্ হবার মতোই ব্যাপার বটে। সেই বয়সেই ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের বড় বড় পঞ্চাশ ষাটখানা বই সে শেষ করে ফেলল। ন'বছর বয়সেই সে হল বাড়ির ভাইবোনদের মাস্টার। তখন থেকেই সে দর্শনশাস্ত্র পড়তে শুরু করল। তের বছর বয়সে সে ধর্ম-বিজ্ঞান আয়ত্ত করল।

পনের বছর বয়স হবার আগেই স্টুয়ার্ট রসায়ন ও উদ্ভিদ্-বিদ্যা পড়তে শুরু করল, ভালভাবে ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করে ফেলল। এমন ছেলেকে কে না বাহবা দেবে!

স্টুয়ার্ট বড় বড় পঞ্চাশ-ষাটখানা বই শেষ করে ফেলল

ব্রিটিশ দার্শনিক ও সমাজহিতৈষী হিসেবে জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) নাম আজও অমর হয়ে আছে।

॥ আর পদ্য লিখো না ॥

ছোট ছেলে অ্যালফ্রেড একদিন এসে তার দাদুকে বললে, "দাদু, একটা পদ্য লিখেছি, শোনো।"

কবিতাটি শুনে দাদুর ভাল লাগল না। তবু তিনি ধীরে ধীরে পকেট থেকে দশটি শিলিং বের করে নাতির হাতে দিলেন; দিয়ে বললেন, "পদ্য লিখেছ, কিন্তু আর লিখো না। তাহলে এই দশ শিলিংই হবে তোমার শেষ রোজগার।"

তা কিন্তু হয় নি। কারণ, বড় হয়ে অ্যালফ্রেড হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের রাজকবি লর্ড টেনিসন। তাঁর পদ্যের প্রতিটি লাইনের জন্য তিনি এমনকি দু'পাউণ্ড পর্যন্ত পেতেন।

॥ ধন্য ছেলে ॥

ফরাসী দেশের ব্লেইজ্ (Blaise) পাসকেল (১৬২৩-১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ) ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছেলে। সেই বয়সে অনেক ছেলেই অঙ্ককে ভয় পায়। পাসকেলের স্বভাব তার উলটো। সে অঙ্ক ভয়ানক ভালবাসে। তার বাবার ঘরে ছিল অনেক রকমের বই। পাসকেল তা থেকে জ্যামিতির কতগুলি বই বেছে নিয়েছিল।

বই নিয়ে বসলে খাওয়া-দাওয়া সব সে ভুলেই যেত। যখন তখন দেখা যেত সে কঠিন জ্যামিতির সমাধান নিয়ে মেতে আছে। আঁক কেটে ভরিয়ে দিয়েছে ঘরের মেঝে ও দেয়াল।

তরুণ বয়সেই সে লিখে ফেলল দুরূহ জ্যামিতির একটা বই। আর আবিষ্কার করল সংখ্যা নিরূপণ করার যন্ত্র। ধন্য ছেলে!

॥ নতুন কিছু করবে ॥

ওয়াট কেটলির ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছে

জেমস ওয়াটের নাম সকলেই জানে। জাতে ব্রিটিশ। যে বয়সে শিশুরা খেলনা নিয়ে খেলে, সেই সময় থেকেই জেমস ভাবুক। সে কি যেন খুঁজে বেড়ায়, কি যেন করতে চায়! খেলার জিনিস নিয়ে কি সব পরীক্ষা করে!

লোকে ভাবে, এই ছেলে মাথা খেলিয়ে কোন জিনিস বের করবে। সেই আশা মিথ্যে হয় নি।

বালক ওয়াট একদিন কেটলি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে ভাবতে শুরু করে। ক্রমশঃ সে বাষ্পের ক্ষমতার কথা বুঝতে পারল।

বড় হয়ে জেমস ওয়াট (১৭৩৬-১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ) আবিষ্কার করেছিলেন স্টীম এঞ্জিন। এর ফলে পৃথিবীর মহা উপকার হয়েছে।

॥ নবদ্বীপের দু'টি ছেলে ॥

একটির নাম রঘুনাথ। মায়ের কথায় একদিন সে গিয়েছে পাশের বাড়ি থেকে একটু জ্বলন্ত কাঠের টুকরো চেয়ে আনতে। সেকালে দেশলাই ছিল না।

আগুন চাইতেই প্রতিবেশী গিন্নী এক হাতা ভরতি জ্বলন্ত আঙ্গার নিয়ে এসে বললেন, 'পাত্র তো আনিস নি, কিসে করে নিবি?"

রঘুনাথ অমনি দু'হাত ভরে একগাদা ধুলো তুলে নিয়ে বললে, "এর ওপরেই দিন!"

ইনিই হয়েছিলেন নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি।

আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম জগদীশ। বামুনের ছেলে, কিন্তু লেখাপড়ায় মনোযোগ নেই। একেবারে মুখখু।

এ ছেলে আর কী করবে? একদিন তালগাছে উঠেছে, সেখানে পাখির বাসা থেকে ছানা চুরি করবে। জানে না যে একটা সাপও আগেই উঠে এসেছে সেই মতলবেই।

তাকে দেখেই সাপ মাথা তুলেছে। আর জগদীশও তার মাথা ধরে ফেলেছে। তারপরই মুশকিল— এখন কি করা যায়?

মুহূর্তে বুদ্ধি ঠিক করে জগদীশ তালপাতার ধারালো কিনারায় সাপের মাথাটা ঘষে দিল। সাপের মাথা দুফাঁক হয়ে গেল।

এক পণ্ডিত নীচে দাঁড়িয়ে এই সাহস আর বুদ্ধির কাজ দেখছিলেন। নেমে আসতেই তিনি তাকে বললেন, "তোমার যেরকম বুদ্ধি, লেখাপড়া শিখলে তুমি খুব বড় হবে।"

জগদীশের মন ঘুরে গেল। লেখাপড়া শিখে সে হয়েছিল বিখ্যাত পণ্ডিত জগদীশ ন্যায়ালংকার।

॥ নব নায়ক ॥

"বড় হয়ে তুই কি হবি রে বিলে?"

"কোচোয়ান হবো, বাবা।"

অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্ত ছেলের কথা শুনে অবাক্! নিজে একজন আইনবিদ্ গণ্যমান্য লোক। আর ছেলে হবে কি না গাড়ির কোচোয়ান!

খেলার সাথীরাও অবাক্ হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে—"কিরে, তুই একথা বলেছিস?"

বিলে জবাব দেয়—"বলেছি তো! বাবা যে জুড়ি-গাড়ি চেপে কোর্টে যান, তার ঘোড়া দুটো দেখেছিস? কেমন তেজী। অমন ঘোড়া দুটোকে যে চালায় তার ক্ষমতা কি কম?"

সে কথা শুনে চুপ করে যায় ছেলের দল। সত্যি তো, চালানোর ক্ষমতা কজনের আছে? বিলের মতো তারাই কি পারে দলের সবাইকে ঠিক মতো চালাতে!

ছেলেদের নিয়ে দল গড়েছে বিলে। বিলেই তাদের নায়ক। বিলেই তাদের রাজা।

রাজা রাজা খেলাটিও সত্যি অদ্ভুত। ডাকাতের দলকে ধরে আনে। তাকে সাজা দেয়। ডাকাতের সর্দারকে বলে—ভাল কাজ না করে ডাকাতি করছ। দলের লোকদের ভাল কিছু না শিখিয়ে শেখাচ্ছ এই খারাপ কাজ! দোষ তোমারই বেশী, সেই অপরাধে তোমাকে ফাঁসির হুকুম দিলাম।

বিলের নিজের গায়েও জোর কম ছিল না। ডন, কুস্তি, বক্সিং সব নিজের বাড়িতে শিখত। আবার গানও গাইতে পারত ভাল।

বিলের সাহসও ছিল খুব। পাড়ার এক বাড়ির পিছনে ছিল একটা চাঁপা গাছ। পাড়ার ছোট ছেলেরা তাতে চড়ে দোল খেত। কে রটিয়ে দিল, ঐ গাছে ব্রহ্মদত্যি আছে। যে গাছে চড়বে তারই ঘাড় মটকে দেবে। সে কথা শুনে কেউ আর গাছের ধারে কাছে যেত না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, বিলে দিব্যি সেই গাছে দোল খাচ্ছে আর হাসছে। বন্ধুরা তখন সাহস করে কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—কিরে, তোর ব্রহ্মদত্যিকে ভয় নেই?

বিলে হাসতে হাসতে বলল—দূর বোকা, ব্রহ্মদত্যি থাকলে এতক্ষণ আমার ঘাড় মটকে দিত না?

বিলে নিজে যেমন ভয় করত না তেমন ভয় ভাঙানো মন্ত্রই শেখাত সবাইকে। বলত—ভয় পেয়ো না, দুশমনকে রুখে দাঁড়াও।

ছোট বয়সেই সব রকম মানুষের প্রতি তার কি দরদ ও ভালবাসা! গরিব-দুঃখী দেখলে নিজের কাছে যা কিছু থাকে তা বিলিয়ে দেয়। জাতিভেদ সে মানে না। তাই বাড়িতে নীচু জাতের লোকদের জন্য রেখে দেওয়া হুঁকোয় টান দিয়ে দেখে জাত যায় কিনা।

এই বিলেই আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ)। দেশের লোককে তিনি ধর্মে, কর্মে ও শক্তিতে বলীয়ান্ হতে শিখিয়েছেন।

॥ রোগা ছেলেটি ॥

কলকাতার হেয়ার স্কুলে পড়ে একটি ছেলে। রোগা শরীর, কিন্তু পড়াশোনা করে খুব মন দিয়ে।

ছেলেটির বড় বদ্ অভ্যাস। যখন যা পায় তাই খায়। তার উপর অতিরিক্ত পড়াশোনা করে। এতেই তার শরীর আরো খারাপ হয়ে গেছে।

একদিন রাত তিনটের সময় উঠেছে পড়াশোনা করবার জন্য। কিন্তু উঠে দেখে বাতিতে তেল নেই। মাথায় মাখবার জন্য একটি শিশিতে তেল ছিল। সেই তেল দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে সে পড়তে বসল। এর ফলে কয়েকদিন সে আর মাথায় তেল দিতে পারে নি।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ছেলেটির শরীর ভেঙে পড়ল ও তার কঠিন অসুখ হল। দু'বছরের জন্য তার স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল বটে, কিন্তু পড়াশোনা বন্ধ হল না। বাবার লাইব্রেরীতে ছিল পড়বার মতো অনেক বই। সে-সব বই সে পড়ে ফেলল।

অসুখ হয়ে ছেলেটির কিন্তু একদিকে খুব উপকার হল। যাকে বলে শাপে বর! সে বুঝতে পারল যখন তখন যা তা খাওয়া শরীরের পক্ষে অপকারক। তাই সে পণ করল যে, জীবনে আর খাওয়ার বিষয়ে কখনো অনিয়ম করবে না।

এই ছেলেটি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। স্যর পি. সি. রায় নামেও তিনি পরিচিত। দেশের লোকেরা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেজন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন।

॥ জেলের ছেলে প্রধানমন্ত্রী ॥

মাছ চাই—মাছ—

একটি ছোট ছেলে মাথায় মাছের ঝুড়ি নিয়ে পথে

পথে ঘুরে বেড়ায়। বাবা-মা বুড়ো হয়ে গেছেন। বেশী খাটতে পারেন না। তাঁরা মাছ ধরে এনে দেন। ছেলে সেগুলো বেচবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়।

মাছ বিক্রি হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি চলে আসে বাড়ি। খেয়েদেয়ে চলে যায় গাঁয়ের পাঠশালায়। এত কষ্ট করে, তবু ছেলেটি পাঠশালায় কোনদিন কামাই করে না।

স্কটল্যাণ্ডে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তার জন্ম। কিছু লেখাপড়া শিখে ছেলেটি একটু বড় হল। তখন সে গিয়ে বসল গাঁয়ের ডাকঘরের সামনে। যারা লিখতে জানে না তাদের চিঠিপত্র লিখে দেয়, টাকা পাঠাবার ফরম লিখে দেয়। তাতে যা কিছু পায় এনে দেয় বাপমায়ের হাতে।

সেই সময়ে তাদের পাড়ায় এসে বাসা বাঁধলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর ঘরে আলমারি ভরতি বই। তা দেখে ছেলেটির বই পড়ার লোভ হল। সে গিয়ে যেচে আলাপ করল ভদ্রলোকের সঙ্গে। বই পড়ায় ছেলেটির খুব আগ্রহ দেখে তিনি তাকে বই পড়তে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই অনেক ভাল ভাল বই তার পড়া হয়ে গেল। ভদ্রলোক অবাক্ হয়ে গেলেন ছেলেটির পড়ার ক্ষমতা দেখে। এ তো যেমন তেমন ছেলে নয়!

বিদ্যালয়ের শিক্ষকও বুঝতে পেরেছিলেন এই ছেলেটি জীবনে উন্নতি করবে। তাই তার দিকে খুব নজর দিতেন, তাকে ভালভাবে পড়াতেন।

এই অল্প বয়সেই সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সব ভাল ভাল বই তার পড়া হয়ে গেল। এবার সে পড়তে লাগল রাজনীতির বই। সেই সঙ্গে দেশের নানা ভাবনা তার মাথায় এসে ঢুকল। প্রথম ভাবনা —দেশকে কেমন করে ভালভাবে গড়ে তোলা যায়।

এই ছেলেটির নাম রামজে ম্যাকডোনাল্ড। বড় হয়ে তিনি বিলেতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সাধারণ জেলের ছেলে থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সহজ কথা নয়!

॥ মনের জোর ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছেলে টেডি। ছোটবেলা থেকেই হাঁপানিতে ভুগছে। শরীর বড় রোগা।

অনেক চিকিৎসা করেও কোন ফল হল না। তখন তার বাবা অন্য পথ ধরলেন। দেখলেন, দিনে দিনে হতাশ ও নিস্তেজ হয়ে পড়ছে টেডি। তখন তার মনে উৎসাহ দিতে লাগলেন। বললেন—মনের শক্তিই হলো সবচেয়ে বড়। মনের জোর থাকলে খোঁড়া লোকও পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারে।

তারপর দেখা গেল ধীরে ধীরে টেডির স্বাস্থ্যের পরিবর্তন ঘটছে। মনের জোর নিয়েই সে একা একা চলাফেরা করতে লাগল। উৎসাহ নিয়ে শরীরচর্চায় মন দিল। ক্রমে ক্রমে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগল।

যে টেডি কোনদিন খেলার মাঠের ধারে ঘেঁষত না, সে এখন মাঠে গিয়ে খেলতে শুরু করল। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে সে, অল্পদিনের মধ্যে একজন দক্ষ খেলোয়াড় হয়ে উঠল।

টেডির বই পড়ার ভয়ানক নেশা। দেশবিদেশের জ্ঞান আহরণের জন্য তার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা!

এই টেডিই হলেন থিওডোর রুজভেল্ট (১৮৫৮-১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ) যিনি পরবর্তী কালে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন।

॥ জাতে ছোট, তবু বড় ॥

বোম্বাইয়ের সাতারা শহরে এক পাঠশালায় পড়ে একটি ছেলে। ছেলেটি জাতে নীচু—তাই সে অচ্ছুত।

ঘরের এক জায়গায় সে আলাদা বসে। কেউ তাকে ছোঁয় না।

এক কোণে বসলেও ছেলেটি কিন্তু কোণ-ঠেসা হয়ে থাকে না! লেখাপড়ায় সে-ই ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল।

জলের ঘরে তার ঢোকবার অধিকার নেই। তেষ্টা পেলে কাউকে বলে। অন্য কেউ তার হাতে জল ঢেলে দেয়।

পরীক্ষায় ভাল ফল করে ছেলেটি সরকারী বৃত্তি

ছেলেটি এক জায়গায় আলাদা বসে

পেয়ে বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন হাইস্কুলে ভরতি হল। তখন ছিল অস্পৃশ্যতার যুগ। তাই সেখানেও উঁচু জাতের ছেলেরা তার ছোঁয়া কোন জিনিস খেত না।

ক্লাসে যে ব্ল্যাকবোর্ড ছিল তার পিছনে ছেলেরা তাদের টিফিন রেখে দিত। একদিন জ্যামিতির ক্লাস চলছে। একটি উপপাদ্য কোন ছাত্রই করতে পারল না। শুধু সেই ছেলেটি বলল,—আমি পারব। শিক্ষক মহাশয় তাকে ব্ল্যাকবোর্ডে এসে সেই উপপাদ্যটি বুঝিয়ে দিতে বললেন।

ছেলেটি চক হাতে এগিয়ে যেতেই ক্লাসের ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল—খাবার ছুঁয়ে ফেলবে! আমাদের খাবার ছুঁয়ে ফেলবে!

শিক্ষক অবাক্! ছেলেটিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছাত্ররা তাড়াতাড়ি তাদের খাবার সরিয়ে নিল। তারপর ছেলেটি ব্ল্যাকবোর্ডে উপপাদ্যটি বুঝিয়ে দিল। কি সুন্দর সহজভাবে বুঝিয়ে দিল ছেলেটি! সবাই অবাক্! সবার মুখ চুন!

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় পর পর ছেলেটি বৃত্তি পেলেন। আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষা নিয়ে ডক্টরেট পেলেন। ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে গিয়ে পড়াশোনা করলেন। তারপর হলেন একজন বড় ব্যারিস্টার অচ্ছুতদের উন্নতির জন্য আন্দোলন করে হয়ে উঠলেন তাদের নেতা। পরে তিনি ভারতের আইন-বিভাগের মন্ত্রী হয়েছিলেন।

নাম তাঁর ডাঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর।

॥ শিশু রবি ॥

পাঁচ বছর বয়সে শিশু রবির হাতে খড়ি হল। বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে প্রথম পড়া শুরু হল। তাকে কিছুদিন পর স্কুলে ভরতি করিয়ে দেওয়া হল।

সাত বছর বয়সেই কবিতা লিখতে শুরু করল রবি। সে কথা বাড়ির অনেকেই জেনে গেল। জেনে গেল স্কুলের ছেলেরাও। স্কুলের বাংলা-শিক্ষক সেকথা জানতে পেরে রবিকে কাছে ডাকলেন। বললেন—"দেখ, 'বর্ষা' সম্বন্ধে দু'ছত্র কবিতা বলছি, খাতায় লিখে নাও। কাল ওর সঙ্গে মিল করে আর দু'ছত্র কবিতা লিখে এনো দেখি। দেখব কেমন কবিতা লিখতে পার তুমি।" লাইন দু'টি হলো—

'রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।'

রবি বাড়ি গিয়ে লিখলো দু'ছত্র কবিতা। পরদিন স্কুলে সে কবিতা নিয়ে এল—

'মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।'

কবিতা দেখে শিক্ষক মহাশয় অবাক্ হয়ে গেলেন। বললেন—ভারী সুন্দর কবিতা লিখেছ তো! লেখ, আরো লেখ। ভবিষ্যতে ভাল কবিতা লিখতে পারবে তুমি।

রবি আর একটু বড় হয়ে গানও লিখতে শুরু করল। পিতা দেবেন্দ্রনাথের কানে সেকথা যেতে বাকী

রইল না। তিনি ছেলেকে কাছে ডেকে নিজের লেখা গান তাকে গাইতে বললেন। রবি পরপর কয়েকটি নিজের রচিত গান পিতাকে গেয়ে শোনাল। কি সুন্দর গানের ভাষা আর কি মধুর গানের সুর!

দেবেন্দ্রনাথ বালক রবিকে পুরস্কার দিচ্ছেন

এত অল্প বয়সে ছেলের প্রতিভা দেখে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—দেশের রাজা যদি এই ভাষা জানত আর সাহিত্যের আদর বুঝত তবে এই কবিকে তারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক্ থেকে যখন তার কোন সম্ভাবনা নেই, তখন আমাকেই সে কাজ করতে হবে।

এই বলে দেবেন্দ্রনাথ ছেলেকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দিলেন।

এই ছেলেটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ)।

॥ সাবাস মেয়ে ॥

ছোট্ট একটি মেয়ে, নাম সরোজিনী। লেখাপড়ার দিকে তার খুব মন।

পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মেয়েকে নিজে পড়ান। একদিন মেয়েকে অঙ্ক কষতে দিলেন। অঙ্ক কষতে তার মোটেই ভাল লাগল না। সে হিজি-বিজি কি সব লিখতে লাগলো। অঘোরনাথ মেয়ের অঙ্কের খাতা দেখতে চাইলেন। সেই খাতায় দেখলেন কবিতা লেখা। দেখে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এ সব কার কবিতা তুমি লিখেছ?

মাথা নীচু করে সরোজিনী জবাব দিল—এ কবিতা আমারই লেখা। অঘোরনাথ আরও অবাক্ হয়ে গেলেন। মেয়েকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—খুব ভাল হয়েছে। তুমি কবিতা লেখ।

সেই থেকে মেয়েটি কবিতা লিখতে শুরু করল। লেখাপড়াও করতে লাগল ভালভাবে। মাত্র বারো বছর বয়সে এনট্রান্স পরীক্ষা দিল। পাস করল খুব ভাল নম্বর পেয়ে।

কিন্তু বড় রোগা মেয়েটি। বার বছর হয়ে গেল, শরীর ভাল হয় না। বাবা ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার এসে সব দেখে শুনে বললেন—কিছুদিন লেখাপড়া বন্ধ রাখো।

মেয়েটি দু'চারদিন চুপ করে রইল। কিন্তু আবার বসল লেখা নিয়ে। দুদিনে তেরোশো লাইনের এক কবিতা লিখে ফেলল। তারপর আর এক সপ্তাহের মধ্যে লিখল দু'হাজার লাইনের একটি নাটক।

এই খাটুনির ফলে তার শরীর ভেঙে পড়ল। বাবা তাকে জোর করে শুইয়ে দিলেন একটি ঘরে। তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। কোন কাগজ-কলমও মেয়ের সঙ্গে দিলেন না। কিন্তু ঘরে বই ছিল, বাবা খেয়াল করেন নি। মেয়ে বই পড়তে লাগল।

বাবা তাকে আর একবার ঘরে বন্দী করে রেখেছিলেন। তখন তার বয়স ছিল ন'বছর। বাড়িতে ইংরেজী কথা বলার প্রচলন। সে শুদ্ধভাবে ইংরেজী বলতে পারে নি বলে বাবা তাকে বকুনি

মেয়ে বই পড়তে লাগল

দিয়ে ঘরে আটকে রেখেছিলেন। তারপর থেকে সে ভাল ইংরেজী শিখেছে।

পরবর্তী কালে এই মেয়েটি হয়েছিলেন বিখ্যাত কবি। শুধু কবি নয়, দেশনেত্রী হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। নাম তাঁর সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়। বিয়ের পর নাম হয়েছিল সরোজিনী নাইডু। (১৮৭৯-১৯৪৯ খ্রীঃ)।

॥ এমন ছেলে ক'জন হয় ॥

ছেলেটির নাম মোহন। স্কুলের শিক্ষকরা তাকে ভালবাসেন। কারণ সে সত্যবাদী। তা ছাড়া সে বিনয়ী, ভারী মধুর তার আচার-ব্যবহার।

একবার স্কুলের পরিদর্শক স্কুল দেখতে এলেন। জাতে তিনি ইংরেজ। ছাত্রদের তিনি কয়েকটি ইংরেজী কথা লিখতে দিলেন।

ছাত্ররা লিখতে লাগল। সবগুলি কথাই তারা ঠিকমতো লিখল। মোহন একটি বানান কিছুতেই ঠিক লিখতে পারছিল না। মাস্টার মশাই তা বুঝতে পেরে কাছে এগিয়ে গিয়ে জুতোর শব্দ করলেন। সেই শব্দ শুনে মোহন ফিরে তাকাল। মাস্টার মশাই তাকে পাশের ছাত্রটির খাতা দেখে লিখতে ইশারা করলেন।

মোহন সেকথা কানেও তুলল না। সে নিজে যা পারলো তাই লিখল। সব ছাত্রেরই পাঁচটি বানানই শুদ্ধ হল। শুধু মোহনেরই একটি ভুল হল।

পরিদর্শক চলে গেলেন। মাস্টার মশাই মোহনকে বললেন—তুমি একেবারে বোকা। এত করে তোমাকে বললাম, তুমি কানেই তুললে না?

মোহন বলল—পাশের ছাত্রের খাতা দেখে নকল করে লিখতে আমার মন চাইল না।

মাস্টার মশাই চুপ করে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, সব ছাত্রের মতো এই ছাত্র নয়। সে নিজে যা লিখতে পারে সেটাই তার কাছে বড়। নকল করে লিখতে সে চায় না।

এই মোহন আমাদের মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী —আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

॥ গরিব বলে দুঃখ নেই ॥

খুব গরিব ঘরের ছেলে। নাম লালবাহাদুর শ্রীবাস্তব। দেড় বছর বয়সের সময় তার বাবা মারা গেলেন। বিধবা মা ছেলেকে নিয়ে বড় অসহায় হয়ে পড়লেন। এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাদের আশ্রয় নিতে হল। অনেক লোককে ধরাধরি করে মা ছেলেটিকে ভরতি করিয়ে দিলেন নদীর ওপারে এক বিদ্যালয়ে। অনেক দূরের পথ। নদী পার হয়ে যেতে হয়। হাঁটতেও হয় অনেক।

মায়ের কাছে যেদিন পয়সা থাকে সেদিন ছেলেকে দুটি পয়সা দেন। তাই দিয়ে লালবাহাদুর নদী পার হয়। যাবার সময় লাগে এক পয়সা আর আসবার সময় লাগে এক পয়সা। যেদিন পয়সা না থাকে সেদিন সাঁতার কেটেই সে নদী পার হয়।

পয়সার অভাবে সে বই কিনতে পারে না।
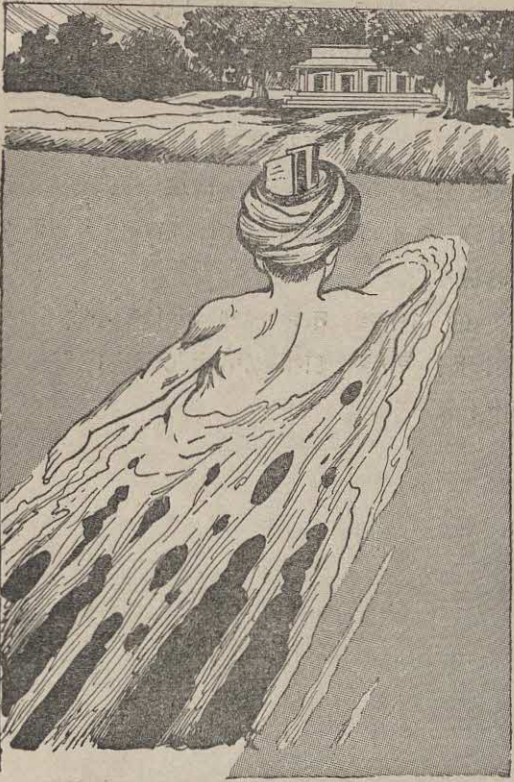
লালবাহাদুর সাঁতরাতে সাঁতরাতে ওপারে গিয়ে উঠল

লোকের কাছ থেকে বই ধার করে ও অন্য ছেলেদের কাছ থেকে চেয়ে এনে সে পড়াশোনা করে।

এত কষ্ট করেও অনেক লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছিলেন লালবাহাদুর। বিদ্যার জন্যে পেয়েছিলেন শাস্ত্রী উপাধি। এই লালবাহাদুর শাস্ত্রীই ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

॥ ধন্যি মেয়ে ॥

ফুটফুটে একটি মেয়ে, নাম হেলেন কেলার। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তার জন্ম। দেড়বছর বয়সে তাকে হঠাৎ এক দুরন্ত রোগে ধরল। সে হয়ে গেল অন্ধ, বোবা এবং কালা। সারা পৃথিবী যেন তার কাছে বন্ধ হয়ে গেল।

মেয়েটি যতই বড় হতে লাগল ততই তার মন শক্ত হতে লাগল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—মানুষের মতই সে বেঁচে থাকবে—সে বড় হবে।

বড় হতে লাগলেন হেলেন। আশ্চর্য তাঁর প্রতিভা। অন্ধদের রীতিতে পড়াশোনা করে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হলেন। লিখতে লাগলেন গল্প ও কাহিনী। দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। প্রচার করতে লাগলেন মানবতার বাণী—ভালবাসার বাণী।

অন্ধ মূক ও বধির হয়েও জীবনে কোনদিন নিজেকে অসহায় বোধ করেন নি হেলেন। আমেরিকার একজন খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকা হিসাবে তিনি পরিগণিতা হয়েছিলেন। জীবনে যত অর্থ উপার্জন করতেন সবই ব্যয় করতেন মানব-কল্যাণে।

॥ ছেলের মতো ছেলে ॥

জানকীনাথ জাতে বাঙালী। কিন্তু বাস করে উড়িষ্যা প্রদেশের কটক শহরে। সেখানকার তিনি একজন নামকরা উকিল। বড়লোক; আচারে ও চালচলনে একেবারে সাহেব।

সুভাষচন্দ্র তাঁরই ছেলে। কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলে তাকে ভরতি করিয়ে দেওয়া হল। ছোট্ট ছেলেটিকে দেখে সেদিন অবাক্ হয়ে গেল অনেকেই। কি সুন্দর ফুটফুটে চেহারা আর কি সুন্দর কথাবার্তা!

কয়েকদিন পর স্কুলের ছেলেরা অবাক্ হয়ে দেখল, সাহেব জানকীনাথের ছেলে কাপড়জামা পরে স্কুলে এসেছে। একজন জিজ্ঞেস করল—তুমি সাহেবী পোশাক পরে আস নি কেন?

সুভাষ জবাব দিল—তোমরা সবাই বিদেশী পোশাক পরে আস। তাই আমার সাহেবী পোশাক পরতে ভাল লাগে না।

ছেলেরা মুগ্ধ হয় ওর কথাবার্তায়, ওর ব্যবহারে। কেউ ওর কথা না মেনে পারে না। ধীরে ধীরে সুভাষ ছাত্রদের নিয়ে একটি দল গড়ে তোলে।

কটকে একবার ভীষণ মহামারী হল। সুভাষ তার দল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। তখন তার বাবা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। কাজেই ওষুধ-

পত্র যোগাড় করতে তাকে খুব বেগ পেতে হল না। সুভাষ তার দলের ছেলেদের নিয়ে ঘরে ঘরে ওষুধ বিলিয়ে দিতে লাগল, রোগীদের সেবা করতে লাগল।

সত্যি, আশ্চর্য ছেলে সুভাষ! মানুষের উপকার করার, দেশের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা তার ছোটবেলা থেকেই। আর কি দলগড়ার ক্ষমতা! নিজে ধনী বলে বা দলপতি বলে গর্ব করে না। সবার সঙ্গে সমান হয়ে সে থাকতে চায়।

একবার একটি ছেলে তাকে বলল—আমরা গরিব, তোমাদের বাড়ি যেতে ভয়ানক লজ্জা করে।

সুভাষ বলল—বড়লোকের ঘরে জন্মেছি বলে আমাকে লজ্জা দিলে! কিন্তু আমার কি অপরাধ বল তো!

এমন ছেলে ক'জন আছে? ধনীর সন্তান হয়েও, সুখে লালিতপালিত হয়েও তিনি দেশের মানুষের দুঃখের কথা ভাবতেন—দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখতেন।

এই শিশুর সঙ্গে অন্য সাধারণ শিশুর কত প্রভেদ! ইনিই বাঙালীর গৌরব 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্র বসু।

———

ভারতের নদনদী

॥ দেশের বন্ধু নদী ॥

যে কোনও দেশের নদনদী হচ্ছে সেদেশের মানুষের মস্ত উপকারী বন্ধু। কত দিক্ দিয়ে যে তারা মানুষের উপকার করে, তার আর ইয়ত্তা নেই। নদী থেকে খাবার জল পাওয়া যায়, চাষের জন্য জলও দেয় নদী, আবার, পলিমাটি নিয়ে এসে জমিকে উর্বরা করে। মানুষের একটা প্রধান খাদ্য হচ্ছে মাছ, তা নদীতেই বেশী হয়। এক দেশ থেকে আর এক জায়গায় মানুষের চলাচল করতে হলে, কিংবা জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হলে, নদীগুলি সেই চলাচলের পথ হতে পারে।

॥ সিন্ধু আর ব্রহ্মপুত্র ॥

ভারত, পাকিস্তান আর এখনকার বাংলাদেশ যখন এক ছিল, তখন গোটা ভারতবর্ষে সব চাইতে বড় নদী ছিল সিন্ধু (ইণ্ডাস) আর ব্রহ্মপুত্র। দুটোই ১,৮০০ মাইল করে লম্বা। কিন্তু এখন সিন্ধুর পুরোটাই পড়েছে পাকিস্তানের মধ্যে, তাকে আর স্বাধীন ভারতের নদী বলা চলে না। আর ব্রহ্মপুত্রের প্রথম দিক্‌টা হল তিব্বতের মধ্যে, আর তার শেষের দিকটা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছে। ভারতের মধ্যে তার যেটুকু পড়েছে, তার দৈর্ঘ্য ৫০০ মাইলও নয়।

ব্রহ্মপুত্রের জন্ম তিব্বত দেশে ; তার প্রথম ৯০০ মাইল তিব্বতের মধ্যেই, কাজেই সে আসলে হচ্ছে তিব্বতী নদী। আর, তিব্বতে তার সে দেশী নাম হচ্ছে ৎসাং-পো (Tsang-Po)। সেই নদী যখন হিমালয়ের পুবপ্রান্তে একটা ফাঁক দিয়ে নীচে নেমে এসে আসামের শেষ মাথায় পৌঁছল তখন সেখানে তার নাম হল ডিহিং। সেখান থেকে সে যখন খোলা জায়গায় এসে পড়ল, তখন থেকে তার নাম হল ব্রহ্মপুত্র।

॥ ব্রহ্মপুত্রের জন্মকাহিনী ॥

এ নাম তাঁর কেন হল, তার একটা গল্প আছে। ইনি নাকি সত্যি ব্রহ্মার পুত্র। ইনি যখন হলেন, তখন দেখা গেল যে এঁর শরীরটা দেবতার বা মানুষের মতো নয়—জলের তৈরী শরীর। তাই এঁকে চারপাহাড়ের মাঝখানে একটা বিরাট গর্তে রাখা হল। তার নাম ব্রহ্মকুণ্ড। তিনি সেখানে আছেন, এমন সময় পরশুরাম মুনি একদিন সেখানে এসে তাতে স্নান করে দেখলেন যে তাঁর একটা পাপ নষ্ট হয়ে গেল। তিনি তখন ভাবলেন যে এমন পবিত্র জল এরকম দুর্গম জায়গায় থাকা তো ঠিক নয়। যাতে সবাই এই জলে স্নান করে পুণ্য লাভ করতে পারে, তাই তিনি তাঁর হাতের কুড়ুলখানা দিয়ে একদিকে পাহাড় কেটে পথ করে দিলেন—অমনি সেই বদ্ধ জল নদী হয়ে হুহু করে ছুটে চলল পশ্চিম দিকে।

সে তো পুরাণের কথা। আর এই থেকে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি ঐ যেখানে ব্রহ্মকুণ্ড, তারই কাছাকাছি কোথাও। ব্রহ্মকুণ্ড বা

পরশুরামতীর্থ এখনও আছে, তা হল আসামের সদিয়া জেলার পাহাড়জঙ্গলে, হিংস্র আবরজাতের লোকদের এলাকায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে শোনা যেতে লাগল যে, এ নদীর আরম্ভ আবরদের দেশে নয়, আরও ওদিকে। কিন্তু তা দেখতে যাবে কে? আবররাও তাদের মুল্লুকে কাউকে ঢুকতে দেবে না, আর ওধারে তিব্বতীরা তো সে বিষয়ে আরও কড়া। শেষে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা এক কাজ করল। দার্জিলিং-এ এক পাহাড়ী দরজী ছিল, তার নাম কিন্থাপ। কি করতে হবে না হবে, সেসব শিখিয়ে ছদ্মবেশে তাকে পাঠানো হল আবর-মুল্লুকে। সেখানে সে যে কত বিপদে পড়েছিল, সে এক কাহিনী। যা হোক, সাহস, বুদ্ধি আর ভাগ্যবলে রক্ষা পেয়ে সে ফিরে এল অনেক খবর নিয়ে। তারপর সে আবার গেল, এবার আবর দেশ হয়ে তিব্বতে। এবার সে একজন চীনা তীর্থযাত্রীর সঙ্গে গিয়েছিল বলে তিব্বতীরা তাকে সন্দেহ করে নি। কিন্তু তার সঙ্গী একদিন এক তিব্বতীর কাছে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে তাকে বেচে দিল। অনেক কষ্ট পেয়ে তিন বছর বাদে সে তিব্বত থেকে ফিরে এল।

ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস সন্ধানে কিন্থাপের যাত্রা

কিন্তু সে স্বচক্ষে দেখে এল যে ৎসাং-পো আর ব্রহ্মপুত্র একই নদীর বিভিন্ন অংশের নাম।

কিন্তু ব্রহ্মপুত্র অথবা ৎসাং-পো যে কোথা থেকে বেরিয়েছে, তা কিন্থাপ দেখে আসতে পারে নি। পরে তিব্বতে গিয়ে বারবার খোঁজ করে জানা গিয়েছে যে তিব্বতে মানসসরোবরের কাছাকাছি এক জায়গায় বরফ-গলা জল থেকে ৎসাং-পো নদী প্রথম বেরিয়েছে।

ভারতে প্রবেশ করবার পর ব্রহ্মপুত্রের ধারে প্রথম শহর সদিয়া। তারপর সে পশ্চিমে যেতে যেতে ডিবরুগড়, তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী ছাড়িয়ে, গারো পাহাড়ের পাশ দিয়ে এসে পড়েছে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়। সেখান থেকে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র আর তার শাখানদী যমুনা গিয়ে পদ্মায় মিশেছে।

এই পদ্মানদী হল ভারতের গঙ্গানদীর শেষ অংশ। তাকে নিয়ে গঙ্গার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১,৫৫৭ মাইল। কিন্তু পদ্মাকে বাদ দিলেও গঙ্গাই আজকাল ভারতের সব চাইতে লম্বা নদী।

॥ গঙ্গার কাহিনী ॥

সব চাইতে পবিত্র নদীও এই গঙ্গা। আমাদের পুরাণে ও রামায়ণে বলে যে গঙ্গা আসলে হচ্ছেন স্বর্গের নদী, দেবতাদের নদী। শুধু রাজা ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি পৃথিবীতে নেমে আসেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর পা-ধোয়া জল।

ভগীরথের এই গঙ্গাকে আনবার কাহিনী আগে বলা হয়েছে। ভগীরথ গঙ্গাকে আনেন বলে গঙ্গার এক নাম হয় ভাগীরথী। পথে জহ্নুমুনি গঙ্গাকে খেয়ে ফেলেন, তারপর আবার হাঁটু থেকে তাকে বের করে দেন, তাই গঙ্গাকে জাহ্নবীও বলা হয়। তারপর অনেক দূর এসে ভগীরথ পিছন ফিরে দেখেন, গঙ্গা নেই—তিনি অন্য পথে চলে গিয়েছেন। ভগীরথ খুঁজে বার করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, কিন্তু গঙ্গার খানিকটা জল যে ভুল পথে চলে গিয়েছিল, সে-ধারাটা সেদিকেই চলে গেল। তাকে ভগীরথ শাপ দিলেন যে, সে-নদী গঙ্গার ধারা হলেও ত

জহ্নু মুনির হাঁটু হতে গঙ্গার মুক্তি

জল পবিত্র বলে ধরা হবে না। সে-ই ধারাটাই পদ্মা। আর, ভগীরথের সঙ্গে যে ধারাটা এল, সে হল ভাগীরথী—কলকাতার বড় গঙ্গা—ইংরেজদের 'হুগলী রিভার'। পদ্মা ও হুগলী দু-ই গিয়ে সাগরে পড়েছে। কিন্তু গঙ্গার আসল ধারাই হল পদ্মা, হুগলী নদী বা ভাগীরথী একটা ছোট শাখানদী মাত্র।

॥ পদ্মা নাম হল কেন ॥

পদ্মা নাম কেন হল? পদ্মা হল মা-লক্ষ্মীর নাম। লক্ষ্মী, সরস্বতী আর গঙ্গা একদিন স্বর্গে বসে খুব ঝগড়া করে পরস্পরকে শাপ দেন যাতে তিনজনকেই মর্ত্যে এসে নদী হয়ে থাকতে হয়। এই পদ্মানদীই সেই মা-লক্ষ্মী। মা-গঙ্গা তো আছেনই, আর সরস্বতীও ছোট্ট একটি নদী হয়ে আছেন এই বাংলায়। তবে, শাস্ত্রে আছে যে, তাঁরা কলিকালের পাঁচ হাজার বছর কেটে গেলেই স্বর্গে ফিরে যাবেন, চিরকাল পৃথিবীতে থাকবেন না।

আবার, বিজ্ঞানীরা বলেন যে গঙ্গা-টঙ্গা যে চিরকাল ধরেই আছে, এমনও নয়। লাখদশেক বছর আগেও গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র এরা ছিল না। তারপর, আজ থেকে পাঁচ-ছ' লাখ বছর আগে হিমালয় পাহাড়টা এমনভাবে বদলে গেল যে তার একদিক্‌কার বরফ গলে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা আর অন্য দিক্ থেকে ব্রহ্মপুত্র বেরোল।

গঙ্গা ও যমুনা ভারতবর্ষের মধ্যেই হিমালয় থেকে বেরিয়েছে বলে অনেকে সেই দুটো জায়গা দেখতে যায়। গঙ্গা যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে পাহাড়ের গা একটা গরুর মাথার মতো দেখতে, তাই তাকে বলে গোমুখী। সেখান থেকে সরু জলের ধারা পাহাড়ের কোলে কোলে এসে পড়েছে এক জায়গায়, তার নাম গঙ্গোত্তরী বা গঙ্গোত্রী। যতই এগোয়, ততই দু'পাশ থেকে ছোট ছোট নদী এসে গঙ্গায় পড়ে। শেষে দেবপ্রয়াগ বলে একটা জায়গায় ওখানকার গঙ্গারই মতো আর একটা নদী অলকানন্দা এসে গঙ্গায় পড়ে। তারপর খানিকটা এসে হরিদ্বার। গঙ্গা এতক্ষণ হিমালয় পাহাড়ের ভিতর দিয়েই দক্ষিণদিকে আসছিল, এবার সে সমতল জায়গায় এসে পড়ল। তারপর ছুটে চলল পুবদিকে। মীরাট, কানপুর

গোমুখীর পার্শ্বদৃশ্য

ছাড়িয়ে এলাহাবাদে আসতেই যমুনা নদী এসে পড়ল গঙ্গায়। তার আগে ওপাশ থেকে গোমতী নদী লখনউ শহর হয়ে অনেকটা পথ এসে গঙ্গায় যোগ দিয়েছে।

এলাহাবাদকে প্রয়াগও বলা হয়। সেখান থেকে গঙ্গা এসেছে কাশী বা বারাণসীতে। তারপর উত্তর-প্রদেশ ছাড়িয়ে বিহার রাজ্যে। এখানে একে একে শোণ, সরযূ বা ঘর্ঘরা, গণ্ডকী আর কোশী নদী এসে মিলেছে গঙ্গায়। গঙ্গা এখন প্রকাণ্ড চওড়া নদী। বিহারে পাটনা, ভাগলপুর, রাজমহল পার হয়ে পূর্বদিকে চলতে চলতে গঙ্গা প্রবেশ করেছে পশ্চিম বাংলায়। স্থতি বলে একটা জায়গায় এসে গঙ্গা থেকে একটা শাখা বেরিয়ে দক্ষিণে নেমে গেল, সেটাই ভাগীরথী বা হুগলী নদী। মুরশিদাবাদ, বহরমপুর, নবদ্বীপ, কলকাতা, হাওড়া, ডায়মণ্ড হারবার হয়ে সেটা গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

কলকাতা থেকে গঙ্গা এখন যে পথে গিয়েছে, সেটা তার নতুন পথ। কালীঘাটের মন্দিরের পাশ দিয়ে যে ছোট গঙ্গা, আড়াইশো বছর আগে গঙ্গা সেখান দিয়েই যেত। পরে সে এখনকার এই পথটা ধরে; আগেকার পথটা শুকিয়ে যায়। তখন তাকে আবার খানিকদূর পর্যন্ত কেটে খুঁড়ে এই পুরোনো শুকনো নালাটায় (আদিগঙ্গা বা ছোটগঙ্গা) জল আনা হয়। তাই কালীঘাটের এই গঙ্গাকে কাটিগঙ্গাও বলে, আর হুগলী নদীর নতুন ধারাকে বলা হয় বড় গঙ্গা।

এবার পদ্মা নদীর, অর্থাৎ, আসল গঙ্গানদীর কথায় আসা যাক। সে এখন আমাদের পর হয়ে গিয়েছে, আর ভারতের নদী নেই। সে এক বিরাট নদী, বর্ষায় পাঁচ সাত মাইল চওড়া হয়ে যায়। ব্রহ্মপুত্র আর যমুনা (এ দিল্লী মথুরার যমুনা নয়, ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা) এসে তাতে পড়বার পর প্রায় সমুদ্রের মতো তার চেহারা হয়েছে, সেখান থেকে তার নাম মেঘনা। তারপর খানিক এগিয়ে গিয়েই তার চলা শেষ হয়েছে, সে গিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

॥ দুই যমুনা ॥

তাহলে, দুটো যমুনা নদীর কথা হল। একটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের শাখা, পদ্মায় এসে পড়েছে বাংলাদেশের মধ্যে। অন্য যেটা এলাহাবাদে এসে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে, সেটাই আসল ও বিখ্যাত যমুনা নদী। গঙ্গার যেমন গঙ্গোত্রী, তেমনি হিমালয়ের মধ্যে গঙ্গোত্রীর কাছে যমুনার যমুনোত্রী—সেখানেই যমুনার আরম্ভ। যমুনার আর এক নাম কালিন্দী, কেননা হিন্দুদের পুরাণ বলে যে এর উৎপত্তি হয়েছে কলিন্দ পর্বতে। হিমালয়ের মধ্য দিয়ে অনেকটা নেমে এসে সেও সমতল ক্ষেত্রে বেরিয়ে দক্ষিণ হয়ে পুবদিকে চলে গিয়েছে। ক্রমে দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা পার হয়ে সে এলাহাবাদে এসে গঙ্গায় মিশেছে। তাতে তার মোট দৈর্ঘ্য হল ৮৬০ মাইল। চম্বল বলে যে একটা নদীর নাম ওখানকার ডাকাতদের জন্য বিখ্যাত হয়েছে, সেই চম্বল আগ্রার কিছু দূরে যমুনায় এসে যোগ দিয়েছে।

যমুনা নাকি যমরাজার আপন বোন। ভাই-ফোঁটার দিন তিনি দাদাকে ফোঁটা দেন। সূর্য এঁদের বাবা। সূর্যের এক নাম কলিন্দ, তাই যমুনার নাম কালিন্দী, মানে, সূর্যের মেয়ে। যমুনার জলের রংও একটু কালচে ধরনের। এলাহাবাদে গঙ্গা ও যমুনা যেখানে মিশেছে, সেখানে গঙ্গার মেটে রঙের ধারা আর যমুনার কালচে জলের ধারার তফাতটা বোঝা যায়।

॥ উত্তর ভারতের অন্য নদী ॥

উত্তর ভারতে আর নাম করবার মতো নদী আছে তা রয়েছে কাশ্মীরে—বিপাশা, বিতস্তা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা আর শতদ্রু। এদেশ চলতি নাম যথাক্রমে বিয়াস, ঝিলম, রাভি, চেনাব ও সাট্‌লেজ। এদের প্রত্যেকেরই খানিকটা অংশ ভারতের মধ্যে আছে। এদের জল গিয়ে মিশেছে পাকিস্তানের সিন্ধুনদীতে।

তাছাড়া, শোণ, সরযূ (ঘর্ঘরা), গণ্ডকী আর কোশীর নাম আগে বলা হয়েছে। ডিহরী বলে একটা জায়গায় শোণের উপর একটা পোল আছে, ভারতে সবচেয়ে বড় পোল সেটা। সরযূ নদীর উপর অযোধ্যা, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র রাজত্ব করতেন।

॥ গণ্ডকী নদীর কথা ॥

গণ্ডকীর বিষয়ে একটা গল্প আছে। একবার ভগবান্ বিষ্ণু শনিকে এড়াবার জন্য পাথর হ[illegible]

গণ্ডকী নদীর জন্ম

এক জায়গায় লুকিয়ে ছিলেন। শনি তাঁকে খুঁজে বের করে কুরে কুরে ফুটো করে দেয়। কষ্টের চোটে বিষ্ণুর গা ঘামতে থাকে, তা থেকে গণ্ডকী নদী জন্মায়। তারপর বিষ্ণু চলে যান, পাথরখানা জলে পড়ে থাকে। নদীর জলে সেই পাথর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেইসব টুকরোই হচ্ছে যাকে বলে শালগ্রাম শিলা। সব পুজোয় পুরুত ঠাকুররা যে শালগ্রাম শিলা নিয়ে আসেন, তা শুধু ঐ গণ্ডকী নদীতেই পাওয়া যায়।

॥ নর্মদা আর তাপ্তী ॥

নর্মদা আর তাপ্তী নদী মধ্যভারতের পাহাড় থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে গিয়ে আরব সাগরে পড়েছে। নর্মদাই বেশী লম্বা, প্রায় ৮০০ মাইল। নর্মদার পথে অনেক জলপ্রপাত আছে, তার মধ্যে জব্বলপুরের কাছে মার্বেল পাথরের পাহাড়ের (Marble Rocks) ধুঁয়াধার প্রপাত প্রসিদ্ধ। নর্মদা নদীর আর এক নাম রেবা। তাপ্তীর পুরনো নাম তাপী, সে ৪৫০ মাইল লম্বা। অজন্তা গুহা ও বাঘগুহার পাশ দিয়ে সে সুরাট শহর পার হয়ে গিয়ে সাগরে পড়েছে।

॥ দক্ষিণ ভারতের তিনটি বড় নদী ॥

দক্ষিণ ভারতের বড় তিন নদী হচ্ছে গোদাবরী, কৃষ্ণা আর কাবেরী। কাবেরীই সবার দক্ষিণে, সে মোটে ৪৭৫ মাইল লম্বা। সে বেরিয়েছে পশ্চিমঘাট পাহাড় থেকে। মহীশূর রাজ্যে শিবসমুদ্রম, শ্রীরঙ্গপত্তনম, শ্রীরঙ্গম হয়ে সে তামিলনাড়ু রাজ্য পেরিয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কেউ কেউ বলে যে, সে হল কাবের মুনির মেয়ে, তাই তার নাম কাবেরী। কেউ বা বলে যে, এক মুনির শাপে তার জল ঘোলা হয়ে যাওয়ায় তাকে বলা হয় কাবেরী, কেননা কাবেরী মানে কুৎসিত শরীর যার।

কৃষ্ণা নদীও সেই পশ্চিমঘাট পাহাড় থেকেই বেরিয়েছে। আরবসাগর সেখান হতে ৫০ মাইলও নয়। কিন্তু পাহাড়ের ঢাল পূর্বদিকে বলে কৃষ্ণাকে পুবদিকে ৮০০ মাইল দূরে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়তে হয়েছে।

গোদাবরী দক্ষিণের সবচেয়ে বড় নদী। নাসিকের কাছে এক পাহাড় থেকে বেরিয়ে এই নদীটি ৯০০ মাইল ছুটে এসে পুবদিকে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

গোদাবরীও গঙ্গার মতোই পবিত্র। হবে না? গোদাবরী তো গঙ্গাই। কি করে? সে কথা পুরাণে আছে। গঙ্গা যখন ভগীরথের তপস্যায় স্বর্গ থেকে নামেন, তখন মহাদেবের মাথায় নেমে তাঁর জটায় আটকে যান। গঙ্গাকে তিনি মাথায় করে রেখেছেন দেখে তাঁর স্ত্রী মা-দুর্গার মনে দুঃখ হয়। তা দেখে মা-দুর্গার দুই ছেলে কার্তিক ও গণেশ গঙ্গাকে বাবার মাথা থেকে নামাবার এক ফন্দী বের করেন। এক বড় মুনি ছিলেন গৌতম। তাঁর আশ্রমে গিয়ে কার্তিক গরু সেজে বাগানে ঢুকে পড়লেন। গৌতম তাঁকে তাড়া দিতেই কার্তিক পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেন মরে গেছেন, এই রকম ভান করলেন। সর্বনাশ! গরু মারার জন্য মহাপাপ হয়েছে ভেবে গৌতম তো আকুল। গণেশ এসে পরামর্শ দিলেন, গঙ্গাকে আনুন, গরু বেঁচে উঠবে, আপনারও পাপ দূর হবে। গৌতম তখন তপস্যা করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলেন। মহাদেব জটা ছিঁড়ে গঙ্গাকে গৌতমের আশ্রমের দিকে ছেড়ে দিলেন। সেই জন্য গঙ্গার নাম হল গৌতমী গঙ্গা। তার জল গায়ে লাগলে স্বর্গলাভ হয় বলে তার আর এক নাম হল গোদাবরী।

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

॥ স্থাপত্য আর ভাস্কর্য কি ॥

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ঘরবাড়ি বানাবার বিদ্যাকে বলে স্থাপত্য। আর, কোনও কিছু কেটে বা খোদাই করে কিছু বানানোকে বলা যেতে পারে ভাস্কর্য। এ দুই কাজ যারা চালায় কিংবা করে তাদের যথাক্রমে বলা হয় স্থপতি আর ভাস্কর।

॥ ভারতে স্থাপত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন ॥

মহেনজোদারো প্রভৃতি জায়গায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার যেসব ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকেই ভারতের স্থপতিদের কৃতিত্বের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। তারপরকার প্রায় আড়াই হাজার বছরের কোনও বাড়িঘরের চিহ্ন এখনও পাওয়া যায় নি।

॥ মৌর্য যুগ ॥

তারপর মৌর্যযুগ অর্থাৎ মৌর্যরাজাদের আমল এল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। সে সময়কার সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত আর সম্রাট অশোকের রাজপ্রাসাদ বহুযুগ হলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে সময়কার বিদেশী ভ্রমণকারী সে সব দেখে লিখে গিয়েছেন যে, এমন প্রাসাদ মানুষের তৈরী হতেই পারে না। সম্রাট্ অশোক তাঁর প্রজাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর সাম্রাজ্যের সবখানেই বহু স্তম্ভ, স্তূপ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন।

অশোকের স্তম্ভগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল, বারাণসীর কাছে সারনাথ স্তম্ভ। এই সারনাথ স্তম্ভ নির্মাণে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য শিল্পীরা যে অপূর্ব দক্ষতা ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে আছে চারটি সিংহমূর্তি—প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে পিছন করে, আর তাদের পায়ের নীচে আরও কয়েকটি ছোট প্রাণীর মাঝখানে একটি চক্র। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে সম্রাট্ অশোকের সারনাথ স্তম্ভের এই সিংহমূর্তি ও চক্রকে ভারতের জাতীয়তার চিহ্নরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সারনাথ স্তম্ভ ছাড়াও অনেক সুন্দর স্তম্ভ অশোক নির্মাণ করেছিলেন। সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে লৌরিয় নন্দনগড়ের স্তম্ভ। অশোকের নির্মিত স্তূপগুলিও প্রাচীন ভারতের শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন। শোনা যায়, সম্রাট্ অশোক তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৮৪,০০০ হাজার স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। গোলাকার জায়গার উপর গম্বুজের মতো করে ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী হত স্তূপ। স্তূপের চারপাশে থাকত নানারকম নকশা-করা পাথরের রেলিং, তার মধ্যে থাকত আবার দু-একটি দরজা।

॥ সাঁচী, ভারহুত ও অন্যান্য স্তূপ ॥

স্তূপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত হল সাঁচীস্তূপ। এই স্তূপটি মধ্যপ্রদেশে ভূপালের কাছাকাছি। এই স্তূপের চারদিকের বেষ্টনীর মাপ হল ১২১২ ফুট আর এর উচ্চতা হল ৭৭২ ফুট। এই স্তূপের ইট ও পাথরের শিল্পকাজ ও সৌন্দর্য দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। অশোক অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠও তৈরি করেছিলেন। এগুলির নাম চৈত্য। অশোকের যুগের এই সব স্তম্ভ, স্তূপ ও চৈত্য দেখলে আমরা বুঝতে পারি সেই যুগ ধর্ম, দর্শন ও শিল্পদক্ষতায় যথেষ্ট উন্নত ছিল।

এর পরবর্তী যুগে শুঙ্গ রাজাদের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল আর একটি বড় স্তূপ—এর নাম ভারহুত স্তূপ। এই বিরাট স্তূপের শুধু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই যুগের বিহারের বুদ্ধগয়া ও দাক্ষিণাত্যের অমরাবতী-স্তূপ প্রাচীন ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তি। বুদ্ধগয়া ও অমরাবতী-স্তূপের বাইরের ও ভিতরের সূক্ষ্ম পাথরের কারুকার্য অতুলনীয়। অমরাবতী-স্তূপের পাথরের শিল্পের কাজ এক বিশেষ শিল্পযুগের প্রবর্তন করে। পাথর কেটে কেটে গাছ, লতাপাতা ও পদ্মফুলের অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে এই স্তূপের গায়ে।

এ যুগের আর এক আশ্চর্য সৃষ্টি নাগার্জুন কোণ্ডা বৌদ্ধস্তূপ, চৈত্য ও মঠ। এই স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গেছে ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর সতীর্থদের অপরূপ সুন্দর পাথরের মূর্তি। দু'হাজার বছর আগেকার এই স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও পাওয়া গেছে এক অপরূপ শিল্পকর্ম।

॥ গুহামন্দির ॥

পর্বতের গুহার মধ্যেও প্রাচীন ভারতে সৃষ্টি হয়েছিল এক বিশেষ ধরনের চৈত্য ও মঠ। পাথর কেটে কেটে এই গুহার গায়ে শিল্পীরা সৃষ্টি করেছিলেন সুন্দর মূর্তি ও বিগ্রহ। নাসিক, ভাজা,
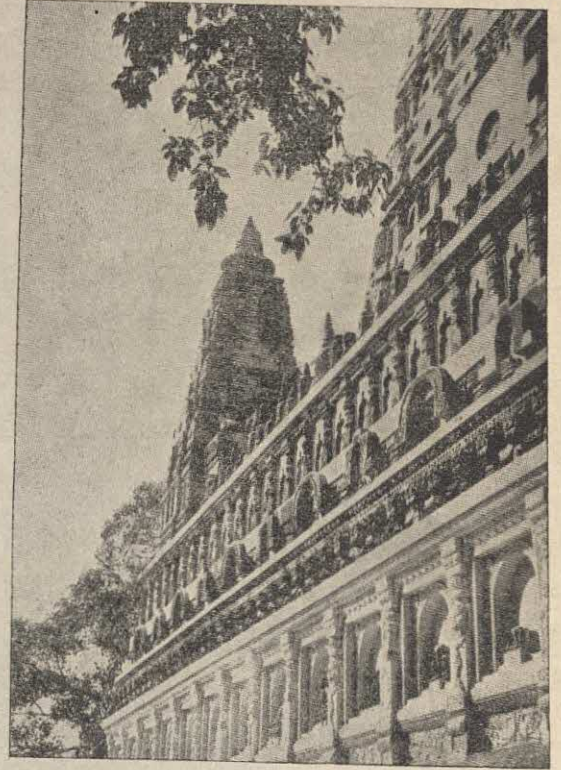
বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পাশের দেওয়ালের কারুকার্য

বেদসা ও কার্লে গুহার চৈত্য ও স্তূপ শিল্পসৌন্দর্যে বিশিষ্ট। বোম্বাইয়ের কাছে কার্লে গুহার সামনের দেওয়াল-গাত্রের সুন্দর ভাস্কর্য, হলঘরের ভিতরের সারি সারি স্তম্ভ আর চারদিকের অনুপম শিল্পসৌন্দর্য প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়।

॥ গুপ্তযুগের উৎকর্ষ ॥

গুপ্তযুগে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মীয় বহু সুন্দর মূর্তি ও বিগ্রহ তৈরী হয়েছিল। ঝান্সী জেলার দেওগড় নামক জায়গার দশাবতার মন্দিরের শিব, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে ভারতীয় শিল্পীরা অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। নালন্দা গুহার ৮০ ফুট উঁচু বুদ্ধ-মূর্তিটি এক বিরাট শিল্পকর্ম। অজন্তা গুহার অভ্যন্তরের মূর্তিগুলির সৌন্দর্য বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে। অজন্তার গুহার গায়ে আঁকা ছবি তো জগদ্বিখ্যাত।

অজন্তা গুহাগুলি পুণা থেকে বেশী দূরে নয়।
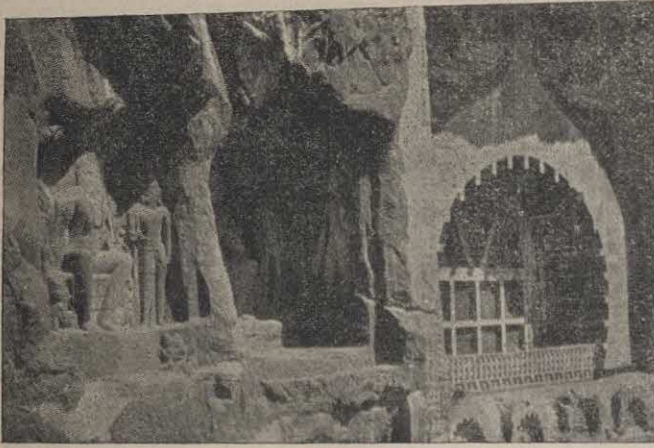
ইলোরা

ওরই কাছাকাছি ইলোরায় পাহাড় কেটে হিন্দু ও জৈন রাজারা যে ইন্দ্রসভা, কৈলাসনাথের মন্দির, চৈত্য ইত্যাদি অপরূপ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সৃষ্টি করে গেছেন, তারও তুলনা নেই।

॥ দাক্ষিণাত্যের মন্দির ॥

ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন যুগে দাক্ষিণাত্যের মঠ-মন্দিরগুলিতে এক বিশেষ ধরনের শিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। এই শিল্প-রীতিকে বলা হয় দ্রাবিড়ীয় রীতি। মহাবলীপুরমের রথ বা প্যাগোডা এক উন্নত শিল্পকর্ম। এগুলি পর্বত-গাত্রের পাথর কেটে কেটে তৈরি করা হয়েছিল। পল্লবরীতির শিল্পীরা তৈরি করেছিলেন তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দির। দক্ষিণ ভারতের আর একটি বিখ্যাত মন্দির শিখারা। ষোলতলা এই বিরাট মন্দিরটির গম্বুজ ১৯০ ফুট উঁচু ছিল। এই বিরাট প্রাসাদের মতো মন্দিরটি স্থাপত্যশিল্পের এক পরম বিস্ময়।

উড়িষ্যা (ওড়িশা) রাজ্যটি মন্দিরের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। এই রাজ্যের বহু মন্দিরের মধ্যে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ও কোনারকের সূর্যমন্দির শিল্পসৌন্দর্যে বিশেষ খ্যাত।

উৎকলরাজ যযাতি কেশরীর রাজত্বকালে পুরীতে জগন্নাথের মন্দির প্রথম নির্মিত হয়। গঙ্গবংশীয় রাজা চোড়গঙ্গদেব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। পুরীর মন্দির পুরীধাম বা শ্রীক্ষেত্র নামে তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। এই তীর্থে পূজিত দেবতা হলেন —জগন্নাথ, সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রা। দেবমূর্তিগুলি হস্তপদহীন ও কাঠের তৈরী। ওড়িশার লোকগীতিতে জগন্নাথ ও বুদ্ধকে অভিন্ন মনে করা হয়। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতীক। পুরীমন্দিরের ভিতরে বিমলামন্দির আর একটি তীর্থস্থান। হাত-পাশূন্য কাঠের মূর্তিকে সুন্দর বেশভূষায় সাজিয়ে অনেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাঝে মাঝে এই কাঠের মূর্তিকে সমাধিস্থ করে নতুন মূর্তি স্থাপন করা হয়। একে 'নবকলেবর উৎসব' বলে। পুরীর মন্দিরের ভিতর ও বাইরের স্থাপত্য-শিল্প বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আষাঢ় মাসে পুরীতে জগন্নাথের রথযাত্রা ও রথটানা উৎসবটি সমস্ত ভারতের একটি বিরাট ধর্মীয় উৎসব।

ওড়িশার ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির পুরীর মন্দিরের চেয়ে অনেক প্রাচীন। সম্ভবতঃ ৬৫৭

দাক্ষিণাত্যের মহাবলীপুরমের মন্দির

তাঞ্জোরের মন্দির

খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের অশোকাষ্টমীর মেলা বিখ্যাত উৎসব। ভুবনেশ্বরকে পুরাণে 'দ্বিতীয় বারাণসী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। লিঙ্গরাজ শিবের মূর্তি এই মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ। বিভিন্ন ভঙ্গীতে নরনারীর বিচিত্র মূর্তিগুলি অপরূপ সুন্দর। সু-উচ্চ এই মন্দিরের গম্বুজে চূড়া থেকে পাদদেশ পর্যন্ত পাথরের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়। বাইরের ও ভিতরের দেওয়ালগুলিতে ক্ষোদিত মূর্তিগুলির সৌন্দর্য দেখলে অভিভূত হতে হয়। ভুবনেশ্বরের মুক্তকেশীর মন্দির ভাস্কর্য-প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন।

ওড়িশার কোনারক সূর্যমন্দিরের জন্য বিখ্যাত। ওড়িশার রাজা নরসিংহদেব ১২৫০-৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করেন। মধ্য এশিয়ার শাকদ্বীপ থেকে আগত 'মগ' নামধারী ব্রাহ্মণেরা এই সূর্যপূজার প্রচলন করেন। পরবর্তী কালে সূর্যপূজা বিষ্ণুপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এই মন্দিরের প্রধান মুখ পুবদিকে। পরবর্তী কালে মন্দিরের সামনে নাটমন্দির নির্মিত হয়েছিল। মাঝখানে উন্মুক্ত জায়গায় সূর্যের সারথি অরুণের মূর্তিযুক্ত সুন্দর স্তম্ভ ছিল। মন্দিরের চারদিকে চারটি দরজা, পুবে সিংহদ্বারে বিরাট সিংহমূর্তি, দক্ষিণে অতিকায় দু'টি ঘোড়া, উত্তরে দু'টি হাতি এখনও রয়েছে। মন্দিরে আছে তিনটি গম্বুজ, তিনটি থাক, ছ'টি কার্নিশ। কার্নিশগুলি অতি-সুন্দররূপে খোদাই-করা। মন্দিরের গায়ে দাঁড়ানো নর্তকী মূর্তি। মন্দিরটি সূর্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত। মন্দিরের গায়ের স্ত্রীমূর্তি ও শিশুমূর্তি-গুলি পরম সুন্দর। কোনারকের মূর্তিগুলির সৌন্দর্য অপরূপ।

কোনারকের সমস্ত মন্দির কারুকার্য-খচিত।

ভুবনেশ্বরের মুক্তকেশীর মন্দির

কোনারকের সূর্যমন্দিরের রথের চাকা

নীচের থাকে সৈনিক, গুরুশিষ্য, রাজসভা, বিবাহসভা; দেবমন্দিরে শোভাযাত্রা, জীবজন্তু, নরনারীর মূর্তি দেখা যায়। মন্দিরের উপরের দিকে নৃত্যরত দেবতা ও নর্তকীর অনেক মূর্তি দেখা যায়। কোনারক ভারতীয় শিল্পদক্ষতার এক মহান্ তীর্থ। সূর্যদেব সমগ্র জগতের জীবনের দেবতা। তাই শিল্পীরা বিশ্বের জীবনপ্রবাহের বৈচিত্র্যকে ক্ষোদিত করে রেখেছেন মন্দিরের গায়ে বিভিন্ন মূর্তির মধ্য দিয়ে। শুধু দেবতাকে নিয়ে নয়, জগৎ-সংসারের মানুষ ও জীবলোকের বিচিত্র সৌন্দর্যকে নিয়ে শিল্পীরা এক মহাসুন্দর রূপ সৃষ্টি করেছেন কোনারকের মন্দিরের গায়ে।

॥ উড়িষ্যার (ওড়িশার) গুহাস্থাপত্য ॥

ওড়িশায় মহারাজ অশোকের শিলালিপি, উদয়-গিরি ও খণ্ডগিরির প্রাচীন জৈন গুহামন্দিরগুলিও স্থাপত্যশিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন।

॥ খাজুরাহো ॥

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন খাজুরাহো নগর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকে এই খাজুরাহো নগরে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে ২৫টি মন্দির এখনও রয়েছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল চতুঃষষ্ঠি যোগিনী মন্দির। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে এই মন্দির নির্মিত হয়। মাঝখানে একটি উচ্চ প্রাঙ্গণের চারদিক্ ঘিরে নির্মিত হয়েছিল ছোট ছোট মন্দিরগুলি। মন্দিরগুলির মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত হল কন্দরীয় মহাদেব মন্দির। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি হল চিত্রগুপ্ত, পার্শ্বনাথ, আদিনাথ, লক্ষ্মণ, জগদম্বী, বামন, বিশ্বনাথ, চতুর্ভুজ ও দুলাদেও। মন্দিরগুলির চারটি বিভাগ—অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ ও গর্ভগৃহ। এর

কোনারকের মন্দিরের ভাস্কর্য

প্রত্যেকটি বিভাগের উপরে রয়েছে শিখর। এই চারটি শিখরের শোভা অপরূপ। মন্দিরগুলির গর্ভগৃহ ও মহামণ্ডপ দেবদেবীর মূর্তি, নায়ক-নায়িকার মূর্তি, জীবজন্তুর মূর্তি, নৃত্যগীত ইত্যাদির বহু মূর্তিতে সুশোভিত। নরনারীর মূর্তিও অনেক রয়েছে। দেবতা, মানুষ, জীবজন্তু, প্রকৃতি, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, নাগ ইত্যাদি বহু প্রতিকৃতিতে খাজুরাহোর মন্দিরের গায়ে যেন স্বর্গ-মর্ত্যের অপরূপ সুন্দর সমাবেশ ঘটেছে। এ এক মহান্ শিল্পসমারোহ, জগৎ-সংসারের বৈচিত্র্য এইসবের মধ্যে এক বিস্ময়কর সৌন্দর্যে আলোকিত হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিশ্বে খাজুরাহোর শিল্পসম্পদ্ এক বিরাট খ্যাতি লাভ করেছে।

যুগ যুগ ধরে আমাদের এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধর্মের ও জাতির মানুষ এসেছিল। তাদের ধর্ম, দর্শন ও জীবনযাপনের চিত্র বুকে করে রেখেছে এই অসংখ্য মন্দির ও মঠ।

খাজুরাহোর বিশ্বনাথ মন্দির

০ ———

॥ সার্কাস কি ॥

'সার্কাস' কথাটির অর্থ রোমানদের আমোদ-প্রমোদ দেখাবার জায়গা। জায়গাটা বৃত্তাকার—প্রথমে এখানে ('চ্যারিয়ট') অশ্ববাহিত রথের দৌড় দেখানো হত। সবচেয়ে বড় জায়গা ছিল রোমে—তার নাম ছিল সার্কাস ম্যাক্সিমাস্। এটি প্রায় ২,০০০ ফুট দীর্ঘ ছিল। এখনও এর ভগ্নাবশেষ বর্তমান। তাকে বলে কলোসিয়াম্ (Collosseum).

১৮শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে সার্কাসের খেলা বলতে প্রধানতঃ ঘোড়সওয়ারের নানারকম অশ্বচালন কৌশল দেখানো হত। এ ছাড়া সার্কাসের খেলা মোটেই জমত না। পরে এতে নানা রকম শারীরিক কৌশল (Gymnastics) দেখানো হত এবং ক্রমে ক্লাউনের আবির্ভাব হল এতে। এখনকার সার্কাসে ক্লাউন অপরিহার্য। ইংলণ্ডের বিখ্যাত সার্কাস দলগুলির মধ্যে এসলির (পরে স্যাঙ্গারের) দল, হেংলারের দল এবং বর্ণোমের দল বিশেষ নাম করেছিল। সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিল বার্টাম মিলসের সার্কাস দল।

॥ জীবজন্তুর খেলা ॥

সার্কাসের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ—জীবজন্তুদের খেলা। বনের হিংস্র জানোয়ার সিংহ, বাঘ, ভালুক, জলহস্তীদের পোষ মানিয়ে শিক্ষা দিয়ে তাদের দিয়ে নানারকম খেলা দেখানো সার্কাসের একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব।

বড় বড় দাঁতাল হাতি পোষা ইঁদুরের মত আজ্ঞা পালন করছে—কত রকম অদ্ভুত খেলা দেখাচ্ছে! তাছাড়া বানর, শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ভালুক, কুকুর, ঘোড়া এদের কত সব খেলা! হাঁ করে দেখতে হয়।

॥ মেনাজারি (Menageria) ॥

জীবজন্তুর সংগ্রহশালা থাকে প্রতি সার্কাস পার্টিতে। এদের খাঁচার মধ্যে রাখা হয় আর প্রত্যহ খেলা দেখানো হয়। এই জীবজন্তুদের খাঁচার সামনে সর্বদা লোকের ভিড় জমে থাকে।
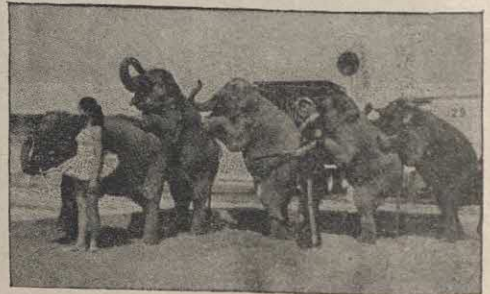
সার্কাসে হাতির খেলা

এদের নানারকমের খেলা শেখানো হয়। সেই সব খেলা অভ্যাস করানোর জন্য দক্ষ শিক্ষক থাকে।

॥ জিম্‌নাস্টিক বা শারীরিক কসরত ॥

সার্কাসের দলের খেলার প্রধান আকর্ষণ জিমনাস্টিক জাতীয় অদ্ভুত খেলা। দড়ি বা তারের উপর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে হাঁটা, এমনকি এর উপর দিয়ে সাইকেল চালানো এবং নানা অদ্ভুত অদ্ভুত সাহসের কাজ করা, লাফানো, ঝাঁপানো, নৃত্য—এ সবই সার্কাসের প্রধান আকর্ষণ।

রাশিয়ান সার্কাসে মহিলাদের খেলা

॥ ক্লাউনের খেলা ॥

ক্লাউনের বেশটি বড় জবর রকম। মুখে মুখোশ, পরনে ঢিলেঢালা রঙীন ফোলানো পাজামা, মাথায় ঘুন্টি দেওয়া টুপি। তার কাজ কেবল লোককে হাসানো আর নানারকম মজা করা। দর্শকদের আমোদ যোগানো তার কাজ।

॥ কয়েকটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন সার্কাসের দল ॥

জার্মান হেগেন-বেকের সার্কাস, হার্মস্টানের সার্কাস, কার্লেকার সার্কাস ইত্যাদি কলকাতায় আশ্চর্য আশ্চর্য খেলা দেখিয়ে গেছে। এছাড়া এসেছিল রাশিয়ান সার্কাস দল। প্রতিদিন তাদের আশ্চর্য খেলা দেখবার জন্য হাজার হাজার লোক ভিড় করত। সারা শহরে এদের খেলা দেখবার জন্য জনতা উন্মুখ হয়ে থাকত।

॥ বাঙালীদের সার্কাস ॥

(অখণ্ড) বাংলা দেশও এককালে সার্কাসে বেশ সুনাম করে ছিল। প্রোফেসার বোসের সার্কাসের কথা ৫০-৬০ বছর আগে শোনা গেছিল। এই সার্কাসের দল পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে

ক্লাউন

ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। এঁরাই প্রথম রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে খেলা দেখিয়ে নাম করেন। বাঙালীরা সার্কাসে নিজেদের কৃতিত্বের বহু পরিচয় রেখে গেছে।

নবগোপাল মিত্র প্রায় ৮০ বৎসর আগে হিন্দু মেলায় প্রথম সার্কাস দেখান। তারপর শুরু হয় প্রিয়নাথ বোসের নেতৃত্বে বোসের সার্কাস। এরপর রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র হরিমোহন রায়ের সার্কাস। তারপর কৃষ্ণলালের হিপোড্রোম সার্কাস।

॥ কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস (১৮৬১-১৯০৫ খ্রীঃ) ॥

ইনি সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিলের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে অসমসাহসিকতা দেখান। তিনি প্রথম জীবনে সার্কাসের একজন খেলোয়াড় ছিলেন। সতেরো বছর বয়সে তিনি একটি জাহাজের স্টুয়ার্ড (Steward) হয়ে লণ্ডনে যান। সেখান থেকে সার্কাস দলের সঙ্গে তিনি জার্মানী ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন।

নদীয়া জেলায় নাথপুর গ্রামে তাঁর পৈতৃক ভিটা—জন্ম রানাঘাটে মাতুলালয়ে।

ছেলেবেলা থেকেই সুরেশচন্দ্র ডাকাবুকো ছিলেন। সতেরো বছর বয়সে খ্রীষ্টান ধর্মে তিনি দীক্ষিত হন। বি. এস্. এন. জাহাজ কোম্পানির কাপ্তেনের সঙ্গে আলাপ করে জাহাজে স্টুয়ার্ডের কাজ নিয়ে লণ্ডনে পৌঁছলেন। লণ্ডনে নানা হীন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছিল তাঁকে। একদিন সহসা কেন্ট্ (Kent) অঞ্চলে সার্কাসের তাঁবু দেখে তার ম্যানেজারের কাছে চাকরি প্রার্থী হলেন। তিনি জিম্‌নাস্টিকের খেলা জানতেন—তিনি বার ও রিং-এর খেলা দেখিয়ে যশ অর্জন করলেন। তাঁর চেহারা ছিল দৈত্যের মত। সপ্তাহে ১৫ শিলিং বেতনে তিনি চাকরি করতে লাগলেন।

জামবাক্ নামে এক সাহেব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ থেকে হিংস্র সিংহ, ব্যাঘ্র আমদানী করে, পোষ মানিয়ে সার্কাসের দলে বিক্রি করতেন। সুরেশচন্দ্রকে তিনি তাঁর পশুদের শিক্ষার ভার দিলেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে বন্য পশুদের এক প্রদর্শনী

কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস

হয়। সুরেশচন্দ্র এতে বাঘ-সিংহের খেলা দেখিয়ে খুব খ্যাতি অর্জন করেন।

এই সময়ে ইওরোপে জার্মান সাহেব গাজেনবাগ তাঁকে তাঁর পশুশালায় নিযুক্ত করলেন। পরে তিনি আমেরিকা গিয়ে ওয়েল সাহেবের সার্কাসের দলে যোগ দিলেন এবং মেক্সিকোতে এলেন। এখানে নানা সাহসের খেলা দেখিয়ে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন।

এরপর সুরেশচন্দ্র ব্রেজিলের সৈন্য বিভাগে যোগ দিয়ে কর্পোরাল পদে নিযুক্ত হন। ক্রমান্বয়ে তিনি সৈন্যবিভাগের উচ্চতম পদে (কর্নেল পদে) অধিষ্ঠিত হন। বিদেশে গিয়ে সে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি যে বীরত্ব দেখিয়ে ছিলেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

॥ শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮–১৯২৫ খ্রীঃ) ॥

ইনি একজন ভারতবিখ্যাত ব্যায়ামবীর ছিলেন। এঁর যেমন ছিল দৈহিক শক্তি, তেমন ছিল কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান। ইনি বুনো বাঘ ধরে এনে তাদের দিয়ে খেলা দেখাতেন। তাঁর খেলা দেখবার জন্য এক সময়ে হাজার হাজার লোক জমত! তাঁর দৈহিক শক্তি দেখে লোক মনে করত তিনি ঐশ্বরিক বলে বলী। পরে ইনি সংসার ত্যাগ করে সোহহংস্বামী নাম গ্রহণ করে হিমালয়ে ভাওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

॥ আধুনিক সার্কাসের আকর্ষণ ॥

আধুনিক সার্কাসের প্রধান আকর্ষণ তার ব্যাণ্ড আর বিচিত্র আলোকসজ্জা। তারপর শিক্ষিত জন্তু-জানোয়ার হাতি, সিংহ, বাঘ, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ঘোড়া, কুকুর আর তাদের সব আশ্চর্য খেলা—এর উপর দেখানো হয় নানা রকম সুসজ্জিত খেলোয়াড় (স্ত্রী ও পুরুষ)-দের ট্র্যাপিজের খেলা, ঘোড়দৌড়, মৃত্যু-ঝাঁপ ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে আসে বিচিত্র-বেশী ক্লাউন তার অদ্ভুত সব হাস্যকর খেলা দেখাতে। আলোয়, ব্যাণ্ডে আর জাঁকজমকে সার্কাসের ক্রীড়াস্থল হয়ে ওঠে এক জাদুপুরী বা মায়ালোক।

জোড়া-ঘোড়া ছোটানো

॥ রাশিয়ান সার্কাসের ক্রীড়াকৌশল ॥

রাশিয়ান সার্কাসের ব্যায়ামবিদ্ বা জিমন্যাস্টরা (gymnasts) দৈহিক কসরত কুশলী বা অ্যাক্রোব্যাটরা

গোলাকার বিরাট চাকা থেকে শূন্যে ঝুলে থাকা

(acrobats), ভারসাম্যের খেলা যারা দেখায় তারা ঘোড়ার খালি পিঠের ওপর চড়ে বসে। সে ঘোড়ার পিঠে জিন থাকে না, মুখে লাগাম থাকে না। সে সব খেলা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়।

এ ছাড়া ক্লাউনের খেলাগুলি প্রচুর হাসির খোরাক যোগায়। জিমন্যাস্টরা স্ত্রী-পুরুষে জুটি হয়ে নানা সাবলীল খেলা দেখিয়ে দর্শকদের প্রচুর হাত-তালি পায়। সবাই নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে তাদের খেলা দেখে।

দড়ির খেলাগুলো সত্যিই দেখবার মত। সরু দড়ির উপর দিয়ে নেচে ছুটে যাওয়া যে কী অপূর্ব ভারসাম্যের ব্যাপার তা ত বুঝতেই পারা যায়।

আরেকটি খেলা জোড়া-ঘোড়া ছোটানোর খেলা। এ ঘোড়ার মুখে থাকে লাগাম। কিন্তু সওয়ার তাদের চালায় দুটি ঘোড়ার পিঠে পা রেখে অপূর্ব দক্ষতায়।
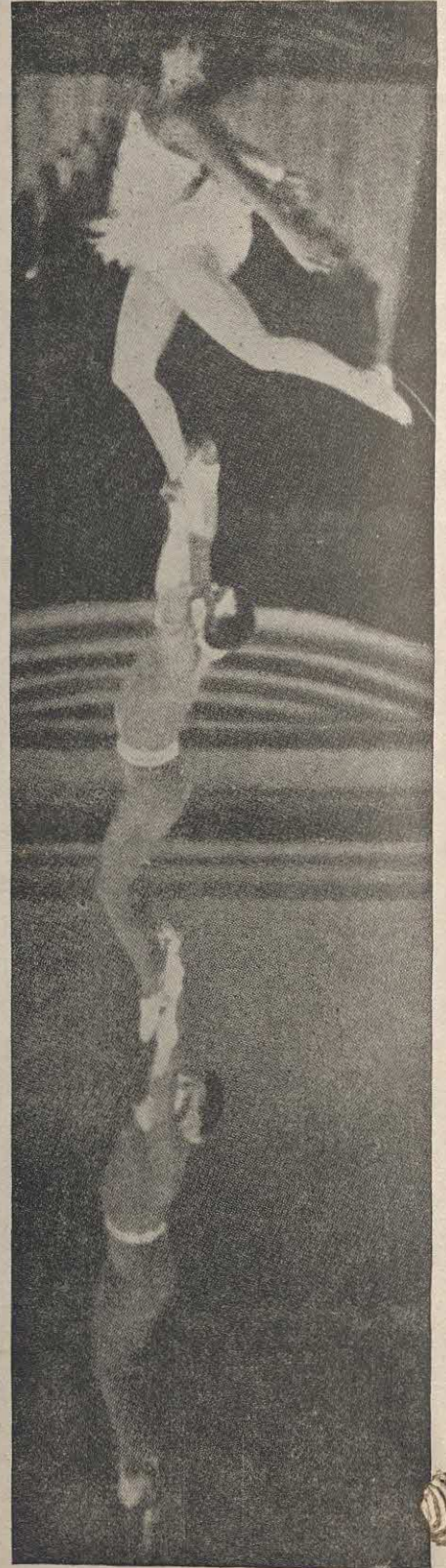
এরপর দেখা যায় দশ জন ডিগবাজি খেলোয়াড়ের দল। এদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই থাকে। এরা একটা গোলাকার বিরাট চাকা থেকে শূন্যে ঝুলে নানারকম কসরত দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।

এ ছাড়া আছে পশুদের নিয়ে খেলা দেখানো। বাঘ, সিংহ, ভালুক, হাতির খেলা যেমন ভয় ও উত্তেজনা জন্মায় আবার তেমনি আনন্দও দেয়।

ট্রাপিজ থেকে ঝুলে খেলোয়াড়রা যে সব খেলা দেখায় তা দেখলে তাক লেগে যায়। তাদের যেন শরীরে হাড় বলে কিছু নেই—সমস্ত শরীরটা রবারের মত নরম, দোমড়ানো মোচড়ানো যায়। তারা পা উপরে করে ঝোলে আর তাদের হাত ধরে অপর খেলোয়াড় ঝুলে পড়ে। এমনি করে তৈরি করে তারা একটি মানুষের শিকল। তারপর শুরু হয় তাদের খেলা। দুলে, ঝুলে, পাক খেয়ে, ঘুরে তারা সাহসের যা খেলা দেখায় তাতে দর্শকদের মুহূর্মুহু রোমাঞ্চ জাগে।

শিম্পাঞ্জির খেলা

বাঘের খেলা

॥ জন্তুদের নতুন নতুন খেলা ॥

শিক্ষিত কুকুর, শিম্পাঞ্জি, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, সিংহ ইত্যাদির খেলা দেখতেই প্রধানতঃ লোকেরা সার্কাসে যায়। গরিলার মত হিংস্র বন্য প্রাণীর খেলা দেখতে নিঃশ্বাস বন্ধ করতে হয়। এ ছাড়া বন্য বাঘ ও সিংহের পোষা কুকুর-বেড়ালের মত আদেশপালনও অদ্ভুত খেলা। এইসব সার্কাসের আসল আকর্ষণ।

॥ সাহসের খেলা ॥

সার্কাস হচ্ছে সাহসের খেলা। এতে সাহস চাই, কসরত জানাও চাই। সব-কিছু এতে তড়িঘড়ি করতে হয়। মানুষ অভ্যাসের ফলে যে কত ভাল ভাল আশ্চর্য খেলা দেখাতে পারে সার্কাসে না গেলে বোঝা যায় না।

কৃষি ও কৃষিসম্পদের কথা

এমন এক সময় ছিল যখন মানব কৃষিকাজ জানত না। চেষ্টা করলেই যে খাদ্যশস্য ফলানো যায় সে কথা তার অজানা ছিল। তাই সে যাযাবর হয়ে বনে বনে খাদ্যের সন্ধানে পশুর মতো ঘুরে বেড়াত। কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে আবিষ্কার করল যে তার ঘরের সামনের মাটিতে সুন্দর ফসল ফলতে পারে, সেই ফসল থেকেই তার আর তার আপনজনের ক্ষুধার অন্ন তৈরী হতে পারে। মানুষ তখন যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করল, তার কৃষির জমির কাছেই তার থাকবার ঘর তৈরি করল, সে কৃষিকাজে মন দিল, সামাজিক জীবন শুরু করল। কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার গোড়াপত্তন হল, তার অর্থনৈতিক চিন্তা ও উন্নতির পথও তার সামনে খুলে গেল কৃষির মধ্য দিয়ে। তাই কৃষিকাজ মানুষের সমাজ-সভ্যতা ও আর্থিক উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ। ধীরে ধীরে কৃষি মানুষের খাদ্যসমস্যা ও আর্থিক সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়াল। আজকের বিশ্বে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের জন্য ও আর্থিক প্রগতির জন্য কৃষির গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

মাটি, উর্বরতা, উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, জলসেচ প্রভৃতির উপর কৃষিকাজ নির্ভরশীল। উর্বরতা মাটির বড় গুণ। কৃষিকাজের উপযুক্ত উর্বর মাটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা, উষ্ণতা, বায়ু, জৈবপদার্থ ও জীবাণু থাকা দরকার।

সমভূমি অঞ্চলে কৃষিকাজ যেমন ভাল হয়, পার্বত্য অঞ্চলে তেমন হয় না। প্রাকৃতিক অবস্থাও সব জায়গায় সমান নয়। সেইজন্য সব জায়গায় কৃষির ফসলও সমান নয়। প্রাকৃতিক অবস্থা ছাড়াও পণ্য পরিবহণের জন্য রাস্তাঘাট ও যানবাহন, সরবরাহ ও শ্রমিকের দক্ষতা, কাছাকাছি হাটবাজার থাকা, কৃষিপণ্যের চাহিদা ইত্যাদি কারণগুলো কৃষির উন্নতির জন্য দরকার।

আধুনিক যুগে কৃষিকাজ একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিতেরা গবেষণা ও পরীক্ষা করে স্থির করেছেন, কোন্ মাটিতে কি রকম শস্যের চাষ ও ফসল ভাল হবে, কি রকম সার দিলে ও জলসেচের ব্যবস্থা করলে যতদূর সম্ভব বেশী ও উৎকৃষ্ট শস্য পাওয়া যাবে। অধিক ও উৎকৃষ্ট ফসল পেতে হলে এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পথে কৃষিকাজ করতে হবে।

শস্যের পোকা মারবার জন্য যন্ত্রে ওষুধ ছিট[illegible]া হচ্ছে

তা না হলে কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে [illegible]র মানুষের খাদ্য-সমস্যা ও আর্থিক সমস্যা মেটানো যাবে না। আমেরিকা ও ইওরোপের উন্নত দেশগুলি এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকাজ করে দেশের খাদ্য ও আর্থিক সমস্যার সমাধান করেছে।

কৃষির শত্রু হচ্ছে পোকা ও পতঙ্গ। এরা শস্য খেয়ে নষ্ট করে দেয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ওষুধ ছিটিয়ে তাদের মেরে ফেলা দরকার।

আমাদের ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতের ৩২·৮০ কোটি হেক্টার আয়তনের মধ্যে মোট আবাদী জমির পরিমাণ হল ১৫·৯৬ কোটি হেক্টার। দেশের জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশ কৃষি থেকে পাওয়া যায়। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। ভারতের প্রায় ১২ কোটি হেক্টার জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ করা হয়। [illegible] ছাড়া কার্পাসশিল্প, পাটশিল্প, চিনিশিল্প প্রভৃতি [illegible]রতের বৃহৎ শিল্পের জন্য কাঁচামাল তৈরী হয় কৃষি থেকেই। চা, কফি, রবার, তৈলবীজ প্রভৃতিও ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভারত কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বছরে ৩১০ কোটি বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে।

আমাদের ভারতে কৃষি এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কৃষির আশানুরূপ উন্নতি হয় নি। ভারতে এখনও খাদ্যশস্যের, বিদেশে রপ্তানি করবার উপযোগী কৃষিপণ্যের ও শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব রয়েছে। ভারতের মানুষের মাথা পিছু দৈনিক খাদ্যের যোগান মাত্র ১২·৪ আউন্স—স্বাস্থ্যবান্ একটি মানুষের ক্ষুধা মেটাবার পক্ষে এটা খুবই কম।

॥ খাদ্যশস্যের চাষ ॥

ধান, গম, ভুট্টা, রাই, জোয়ার, ওট, যব ও বাজরা হচ্ছে মানুষের প্রধান খাদ্য। সেই কারণে খাদ্যের জন্য বিভিন্ন দেশে এই সব ফসলের ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। এদের মধ্যে ধান ও

প্রথম যুগের চাষ

জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল

গম খাদ্যশস্য হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে প্রায় ১,৯০০ মিলিয়ন একর জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ হয়। গম চাষ হয় ৪৩৭ মিলিয়ন একর জমিতে ও ধান চাষ করা হয় ২৯৪ মিলিয়ন একর জমিতে। গমের বাৎসরিক গড় উৎপাদন ২৭৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন আর ধানের বাৎসরিক উৎপাদন ২৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

॥ গম ॥

গম নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের প্রধান ফসল। উর্বর, নরম কাদামাটি অথবা ভারী দো-আঁশ মাটি গম চাষের পক্ষে ভাল। সোভিয়েত রাশিয়া, উত্তর-আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে ভাল জাতের প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। আমাদের ভারতে বর্তমানে প্রায় ৩৩·৫ মিলিয়ন একর জমিতে গম চাষ হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২৪ মিলিয়ন একর জমিতে গম চাষ হত। ভারতে গম উৎপাদনের মোট পরিমাণ প্রায় ২·৫ কোটি মেট্রিক টন (১৯৭২-১৯৭৩ খ্রীঃ)। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩·৩৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ভারতে একর প্রতি গম উৎপাদনের পরিমাণ ৬৯৫ পাউণ্ড।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়া নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে প্রচুর গম রপ্তানি করে। কিন্তু ইওরোপের অনেকগুলি দেশে গমের অভাব রয়েছে, তারা বিদেশ থেকে গম আমদানি করে। তা ছাড়া জাপান, ভারত প্রভৃতি এশিয়ার কতকগুলি দেশও বিদেশ থেকে গম আমদানি করে।

॥ ধান ॥

ধান পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্যশস্য। সমগ্র পৃথিবীতে ২৯৪ মিলিয়ন একর জমিতে ধান চাষ হয়। পৃথিবীর বার্ষিক ধান উৎপাদনের পরিমাণ ২৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এই উৎপাদনের ৯০ শতাংশই উৎপন্ন হয় এশিয়ার দেশগুলিতে। ভারত, চীন, জাপান, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপিন, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানগুলি প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ।

ধান চাষের জন্য উন্নত ও আর্দ্র জমির দরকার। বৃষ্টিপাত কম হলে জলসেচের প্রয়োজন হয়।

ধান উৎপাদনে চীন বিশ্বে প্রথম স্থানের

ভুট্টার চাষ

অধিকারী ; দ্বিতীয় স্থান ভারতের। চীন, ভারত, জাপান ও বাংলাদেশ এই চারটি দেশ সমগ্র পৃথিবীর মোট ধানের ৭০ শতাংশ উৎপাদন করে।

ভারতে ৮৩·৬৭ মিলিয়ন একর জমিতে ধান চাষ হয়। ১৯৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ধান উৎপন্ন হয়েছিল ৩·৮৬ কোটি মেট্রিক টন। একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ হল ১,১৮৮ পাউণ্ড। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ধান উৎপাদনে প্রথম স্থানের অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ বৎসরে ৪·৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন চাল উৎপাদন করে। ভারতের চাল উৎপাদনের পরিমাণ ভারতের জনগণের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। ভারতকে বিদেশ থেকে প্রায় ৩ লক্ষ টন চাল আমদানি করতে হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব সাধারণ-তন্ত্র ও ইটালীতে যে ধান উৎপাদন হয় তা সে সব দেশের প্রয়োজন মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানি করবার পক্ষে যথেষ্ট।

ভারতে ধান উৎপাদনের হার [illegible]বই [illegible]। কিন্তু ভারতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির [illegible] সম্ভাবনা আছে। উন্নত মানের বীজ, উপযুক্ত [illegible] জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য দ্বারা ভারতের ধান উৎপাদন কমপক্ষে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব। আশার কথা ভারত সম্প্রতি উন্নত বীজ ব্যবহার করে ও জাপানী প্রথায় চাষ করে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির পথে খানিকটা অগ্রসর হয়েছে।

উদ্বৃত্ত গম রপ্তানি

ধান উৎপাদনে বিভিন্ন দেশ

অন্যান্য খাদ্যশস্যের মধ্যে ভুট্টা, রাই, ওট, মিলেট্স (বাজরা, জানার ইত্যাদি) উল্লেখযোগ্য। উত্তর ভারতে ভুট্টা ও যব প্রধান খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

॥ নানারকম কৃষিসম্পদ্ ॥

অন্যান্য কৃষিসম্পদের মধ্যে কফি, চা, রবার, কাজু বাদাম (Cashew nuts), কোকো, আখ, বীট, কার্পাস ও পাট বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্রাজিল কফি উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী। ব্রাজিল অন্যান্য দেশে প্রচুর কফি রপ্তানি করে। ভারতে তিন লক্ষ একর জমিতে কফির চাষ হয়। ভারতের কফি উৎপাদনের পরিমাণ ৭০ হাজার টন।

॥ চা ॥

ভারত চা উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ভারতে মোট ৮ লক্ষ একর জমিতে চায়ের চাষ হয়। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু,

কেরালা, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর, হিমাচল প্রদেশ ও বিহার রাজ্যে চা-এর চাষ হয়। ভারতে বার্ষিক চায়ের উৎপাদনের পরিমাণ হল ৮৫০ মিলিয়ন পাউণ্ডের মতো। এই উৎপাদন প্রায়ই ওঠানামা করে। ভারত প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক অর্থ আয় করে।

চা-বাগানে চায়ের পাতা সংগ্রহ করা হচ্ছে

॥ এই নাম কোথা থেকে এল ॥

'টী' (Tea) বা 'চা' নামের উৎপত্তি চীনা ভাষায় থি (Thea Sinensis) বা দী (Thee) থেকে। চীন দেশেই প্রথম পানীয় হিসাবে চা ব্যবহৃত হয়। পরে ভারতে ও অন্যান্য দেশেও ওর আবাদ এবং ব্যবহার শুরু হয়। একজন ওলন্দাজ ভদ্রলোক ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এর ব্যবহার প্রচলন করেন।

॥ চা-গাছ ॥

চায়ের গাছগুলি চিরসবুজ (evergreen). চা চাষ করতে উষ্ণ অথচ আর্দ্র জলবায়ুর দরকার হয়। চা চাষের জমি খুব উর্বর হওয়া চাই। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় উৎকৃষ্ট বীজ চা লাগাতে হয়। ছ মাস থেকে দেড় বছরে ঐ বীজ থেকে উৎপন্ন চারা খানিক খানিক অন্তর অন্তর সারবন্দী করে বসাতে হয়। একর প্রতি তিন হাজার চারা লাগানোই প্রচলিত প্রথা। গাছগুলিতে যাতে বেশি রোদ্দুর না লাগে সে দিকে নজর রাখা উচিত। চা গাছগুলির মধ্যে মধ্যে অন্য গাছ লাগালে রোদ্দুরের হাত থেকে গাছগুলি রক্ষা পায়।

চা-গাছের চারা পোঁতা হচ্ছে

॥ চা-এর পাতা সংগ্রহ ॥

গাছগুলি ২০ ফুটেরও বেশি উঁচু হয়। কিন্তু তার আগেই শুরু হয় এদের পাতা ছাঁটা। এই ছাঁটা পাতাই চা-পাতা। তিন-চার ফুট উঁচু ঝাঁটি ঝাঁটি গাছই চা বাগান আলো করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু দিন অন্তর অন্তর পাতা ছেঁটে ছেঁটে গাছগুলোকে ঝোপের মত করে ফেলতে হয়।

চা-শ্রমিকদের কাজ শুরু হয় চা গাছ লাগাবার কয়েক বছর পর থেকে।

শ্রমিকরা (স্ত্রী-পুরুষ) কাঁধে ঝুড়ি বেঁধে চা-এর পাতা সংগ্রহ করতে নামে। তারা দুটি কচিপাতা ও একটি কুঁড়ি (পাতার কোরক) তুলতে শুরু করে।

এই সব গাছ ৪০।৫০ বছর পাতা যোগায়। একর প্রতি চা গাছ থেকে উৎপন্ন চা-পাতার পরিমাণ ৫ মণ থেকে ২০ মণ।

॥ চায়ের রকম ॥

চা নানা রকমের হয়। কালো রঙের চায়ের চাহিদা ও ব্যবহার সর্বাধিক। এই চা কারখানায় বিশেষ প্রক্রিয়ায় অল্প উত্তাপে শুকিয়ে নিয়ে তৈরী হয়।

প্রথমে চা পাতাগুলো ছড়িয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর বড় বড় ছাঁকনি করে এদের চেলে নেওয়া হয়।

ছাঁকনি করে চা-পাতা ছাঁকা হচ্ছে

তার ফলে গুঁড়ো চা নীচে পড়ে। এইভাবে পাতা চা আলাদা করা হয়। তারপর তাদের কলের মধ্যে সামান্য তাপে আরো শুষ্ক করা হয়।

॥ চায়ের ইতিহাস ॥

একশ বছর আগে এদেশে চা-[illegible]র [illegible]ষের জন্যে ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৮৩৪ খ্রীঃ ত[illegible] গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নে[illegible] এক চা-সমিতি (Tea Society) গঠিত হয়। এই চা-সমিতির উদ্যোগে ভারতে চা জন্মানোর জন্যে চীন দেশ থেকে প্রথম বীজ আনা হয়। এই চা-বীজ সর্ব প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনে পোঁতা হয়েছিল। এই বীজ থেকে জন্মানো চারা নিয়ে গিয়ে মুসৌরী, মাদ্রাজ ও আসামে লাগানো হয়েছিল। এই ভাবেই এদেশে চা-চাষের আরম্ভ হয়।

॥ ভারতে চা ॥

ভারতে মোট উৎপন্ন চায়ের তিন-চতুর্থাংশই ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে—উত্তর বাংলা ও আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জন্মায়।

চায়ের পাতা শুকানো হচ্ছে

ভারতের চায়ের মধ্যে সেরা হচ্ছে দার্জিলিং চা। এ চায়ের যেমন স্বাদ তেমনি গন্ধ। আসামের চায়ে লিকার বেশী হয়। ভাল চা তৈরী হয় চা-এর মিশ্রণে (blending). এজন্য আলাদা বিশেষজ্ঞ লাগে। তাঁরা নানা রকম চা দরকার মত মিশিয়ে উৎকৃষ্ট চা তৈরি করেন। লিপটন, ব্রুক বণ্ড ইত্যাদি কোম্পানির চা এইসব বিশেষজ্ঞের উৎকৃষ্ট blending এর ফলে এত সুন্দর ও লোভনীয়।
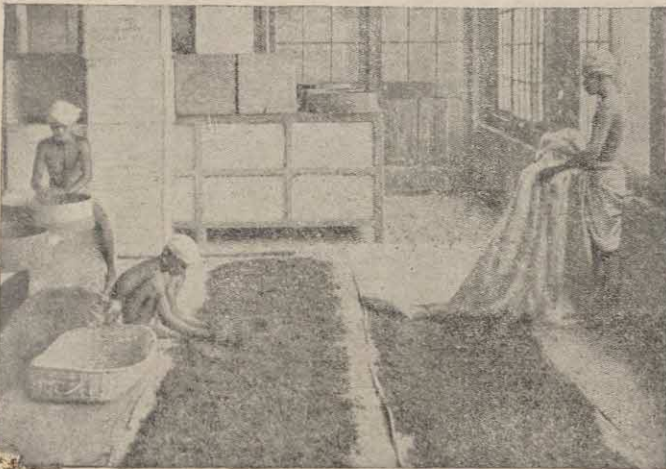
কলের মধ্যে উত্তাপ দিয়ে চা-পাতা সেঁকা হচ্ছে

॥ কফি ॥

কফি গাছের জন্মস্থান আবিসিনিয়া। এখান থেকে কফির প্রচার ও ব্যবহার জগতে বিস্তার লাভ করে। কফির বীজ সিদ্ধ করে, সেই জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হত। ইহা এক রকম উত্তেজক পানীয়। ক্রমে আরব, পারস্য, তুরস্ক হয়ে এই পানীয়ের ব্যবহার ইওরোপে প্রচারিত হল। বর্তমানে ইহা প্রাতরাশের অঙ্গ হয়েছে। চা-এর বদলে অনেকেই কফি ব্যবহার করছেন।

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫ লক্ষ টন কফি উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আমেরিকা একাই চার লক্ষ টন কফি উৎপন্ন করে। ভারতে ৬০ হাজার টন কফি উৎপন্ন হয়।

কফি গাছ বীজ থেকে জন্মায়। এক একটি গাছের আয়ু ৫০ বছর। এই গাছে সাদা সুগন্ধি ফুল ফোটে। ফুলের পাপড়ি ঝরে ফল দেখা দেয়। সাত আট মাসে ফল পাকে।

পাকা কফি-ফল তুলে রোদে শুকোতে হয়। তারপর খোলা ছাড়িয়ে বীজ বার করে নিতে হয়। এই বীজগুলিই কফি।

॥ অন্যান্য কৃষিসম্পদ্ ॥

রবার, কোকো, বীট, কার্পাস ইত্যাদি আরো অনেক রকম কৃষিসম্পদ্ উল্লেখযোগ্য।

॥ আখ ॥

আখের উৎপাদন এবং চিনিশিল্পেও ভারতের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আখ ও চিনি উৎপাদনে কিউবা বিশ্বে প্রথম। ভারতে ইক্ষু-চিনির উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক ৩·৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

॥ পাট ॥

ভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রধান কৃষি-সম্পদ্ পাট। ভারত ও বাংলাদেশে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৯৬ শতাংশ পাট উৎপন্ন হয়।

ভারতে [illegible] চাষ হয় প্রায় ১০ লক্ষ একর জমিতে। ভারতে পাট উৎপন্ন হয় ৬৩ লক্ষ বেল (bale) বা গাঁট। আর মেস্তা (খেলো পাট) উৎপন্ন হয় ১৭ লক্ষ বেল। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে পাট উৎপাদনে
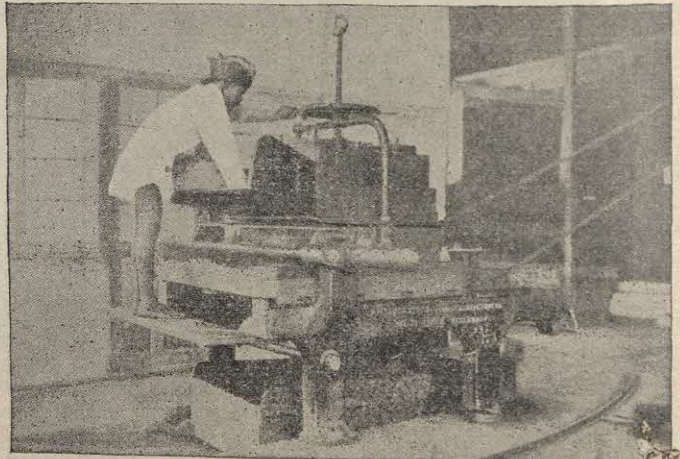
চা-পাতা এবার বাক্সে ভরে বিক্রীর জন্য চালান দেওয়া হচ্ছে

প্রথম স্থানের অধিকারী। সমগ্র ভারতের ৫০ শতাংশ পাট পশ্চিমবঙ্গেই হয়।

॥ নগ্‌দা ফসল ॥

পাটকে বলা হয় নগ্‌দা ফসল (cash crops). খাদ্য শস্য খাবার জন্যেই প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। কিন্তু পাট সেরকম নয়। এ চাষ চাষীকে নগদ টাকা এনে দেয়। পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

তুলা, পাট, ইক্ষু আর তৈলবীজকেও নগ্‌দা ফসল বলে। ইক্ষু যদিও খাদ্য তথাপি চিনি শিল্পের এটা একটা উপাদান। চাষীদের কাছে এই সব নগ্‌দা ফসলের বড় বেশি প্রয়োজন। সব চাষীদেরই কাপড় পরতে হয়। তূলা উৎপন্ন না হলে তাদের আগেকার দিনের মতো চামড়া পরতে হত। চিনি না থাকলে জগতের হাল কি হত একবার ভেবেছ কি? এই রকম তৈলবীজও খুব দরকারী। রান্নাবান্না করতে হলে এটা চাইই। এই সব নগ্‌দা সফলের চাষ করে চাষী নগদ টাকা হাতে পায়। তাতেই তাদের সংসার চলে।

পাট আছড়ানো হচ্ছে

ভারতে আরও অনেক রকম জিনিসের চাষ হয়ে থাকে। ওপরে শুধু প্রধান কয়েকটির কথা বলা হলো। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের উৎপাদন এখনও বড় কম। উৎপাদন যাতে বাড়ানো যায়, সে চেষ্টা চলছে। কিন্তু মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে যে কিছুতেই যেন আর কুলিয়ে উঠছে না!
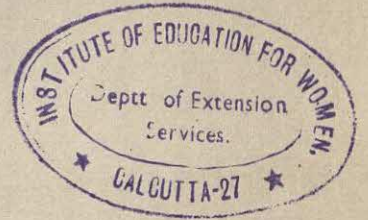
খনি ও খনিজসম্পদের কথা

পৃথিবীর বুক খুঁড়লে নানা জায়গায় কয়লা, লোহা, তামা, অভ্র, খানজ তৈল প্রভৃতি নানারকম পদার্থ পাওয়া যায়। যে সব জায়গা থেকে এই সব জিনিস পাওয়া যায়, ভূ-গর্ভের সেই সব জায়গাকেই আমরা খনি বলি। আর খনিতে পাওয়া যায় বলেই এদের বলা হয় খনিজ দ্রব্য।

এই সব খনিজ দ্রব্য পৃথিবীর প্রকৃত সম্পদ্ ও যে দেশে যত বেশী খনিজ দ্রব্য আছে সেই দেশ তত বেশী ভাগ্যবান। কেননা এগুলো মানুষের অনেক কাজে লাগে।

কয়েকটি প্রধান খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক ঃ

॥ কয়লা কি ॥

জঙ্গলের দীর্ঘ গাছপালাগুলো সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে বছরের পর বছর ধরে সূর্যের আলো পান করেছিল। তারপর ভূমিকম্পের ফলে তারা সব মাটিচাপা পড়ে যায়। কোটি কোটি বছর মানুষ তাদের কথা জানতে পারে না। তারপর ভূগর্ভে কয়লার সন্ধান পেয়ে তা খুঁড়ে তুলে জ্বালানী হিসাবে মানুষ ব্যবহার করতে থাকে। এরা তখন তাদের সূর্য থেকে ধার-করা উত্তাপ আবার পৃথিবীকে ফিরিয়ে দেয়। কয়লা খনি তা হলে বহু বর্ষ ধরে মাটি চাপা জঙ্গলের রূপান্তর—গাছের ফসিল বলা যায় কয়লাকে।

॥ খনিতে কয়লা কি ভাবে থাকে ॥

মানুষ নানা রকম পরীক্ষা করে যখন জানতে পারে যে কোথাও কয়লার খনি আছে তখনই শুরু হয়ে যায় সেই কয়লা উপরে তুলে আনবার প্রচেষ্টা। একে বলে মাইনিং। কিন্তু কাজটা বড় সহজ নয়। মাটির তলায় বহু গভীরে কয়লা থাকে। এজন্য মাটির উপর থেকে সুড়ঙ্গ করে [illegible]ন পৌঁছতে হয়। তারপর সেই কয়লা তো[illegible] ব্যবস্থা করতে হয়। এ বিষয়ে খনি-বিশেষজ্ঞ ও এঞ্জিনীয়ারদের সাহায্য দরকার হয়।

খনি-বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানা যায় যে ভূগর্ভে কয়লার স্তরের নীচে যা থাকে তাকে বলে fire-clay. কয়লার স্তরের উপরে Sand stone বা Shale থাকে। এ একরকম শক্ত পাথরের মত পোড়া মাটি—তার মধ্যে গাছের কাণ্ড, ডাল ইত্যাদির চিহ্ন পাওয়া যায়।

এই সব থেকে আমরা জানতে পারি যে খনকরা যখন কয়লা খুঁড়ে বার করে তখন আসলে তারা জঙ্গলের মধ্যে কাজ করে—প্রাচীনকালের জঙ্গল।

কয়লা খনিতে স্তরের পর স্তর কয়লা পাওয়া যায়—এদের মধ্যে পুরু পাথরের স্তর থাকে। এক এক স্তরের কয়লা এক এক জঙ্গলের গাছপালার কঙ্কাল বা ফসিল। পাথরের স্তরগুলো থেকে [illegible] যায় যে একদা এই জঙ্গল মাটি চাপা পড়ে তার উপর

পলি জমতে দিয়েছিল। পাথর-গুলো জমাট-বাঁধা পলি।

॥ খনি থেকে কয়লা তোলা ॥

কয়লাকে বলা হয় কালো হীরে (Black diamond). কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। এই কালো পদার্থটি কিন্তু নিজ গুণে জগৎ মোহিত করেছে।

খনিতে নামবার সুড়ঙ্গ-পথের মুখে Cage বা খাঁচার মতো একটা কুঠরী—একবার উপরে উঠে আসে আবার নীচে নেমে যায়—ঠিক আজকালকার লিফটের মত। এতে করে খনি-শ্রমিকরা খনির মধ্যে নেমে যায় এবং দরকার হলে উঠে আসে। এই খাঁচায় এসে ঢুকলে একটা ঘণ্টা বাজে। তারপর খাঁচাটা নেমে যায় অন্ধকার খনিগর্ভে।

খনিতে নামবার 'কেজ' বা খাঁচা

সেখানে বিশেষ ভাবে তৈরী আলো হাতে তারা কাজ করে। এই আলোকে বলে মাইনারস্ সেফটি ল্যাম্প (Miners' Safety Lamp). এই আলো থেকে খনিগর্ভে আগুন লাগার কোন ভয় থাকে না।

এইভাবে খনিগর্ভে নেমে শ্রমিকরা বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনীয়ারদের নির্দেশ মত স্থান থেকে চাপ চাপ কয়লা কেটে বার করে। শুনলে মনে হয় কাজটা অতি সহজ। কিন্তু এ কাজ বড় কঠিন। এতে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। সেই বিপদের হাত থেকে শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনীয়াররা সর্বদা প্রস্তুত থাকেন।

কয়লা কেটে বার করে নিলে সে জায়গায় একটা [illegible] সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ কয়লা কাটতে কাটতে ফাঁকটা [illegible]য় দাঁড়ায় বিরাট একটা সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গের উপর থাকে চাপ চাপ কয়লা। মাটির তলায় এখানে ভীষণ চাপ সৃষ্টি হয়। উপর থেকে কয়লার স্তর যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। এই বিপদ যাতে না ঘটে সেজন্য এঞ্জিনীয়াররা এদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বড় বড় শাল কাঠের খুঁটি দিয়ে তার উপর মোটা কাঠের তক্তা সাজিয়ে উপরের স্তরটাকে ঠেলে রাখা হয়।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে কাঠের ঠেকনোর তলায় নির্ভয়ে শ্রমিক কাজ করছে।

কিন্তু ধস নামা ছাড়া আরো অনেক বিপদ ঘটতে পারে। হঠাৎ ভূগর্ভ থেকে জল বেরিয়ে খাদগুলো ভরিয়ে দিতে পারে। এ অবস্থায় সময়মত খাদ থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে শ্রমিকদের মৃত্যু অবধারিত।

খনি শ্রমিকরা কয়লা কাটছে

কয়লা উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। সমগ্র পৃথিবীর মোট কয়লার ৩৪.৪ শতাংশ একা যুক্তরাষ্ট্র উৎপাদন করে। যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ ১৭২৩.৪ বিলিয়ন মেট্রিক টন। গ্রেট ব্রিটেনেও প্রচুর কয়লা উৎপন্ন হয়। গ্রেট ব্রিটেনে বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ১৭৭.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। আমাদের ভারতবর্ষেও প্রচুর কয়লাখনি আছে। ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ (১৯৭২ খ্রীঃ) ৭৪.৩৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এই পরিমাণের শতকরা ৮০ ভাগ কয়লা সঞ্চিত রয়েছে দামোদর উপত্যকায়—রানীগঞ্জ, ঝরিয়া, গিরিডি ও বোকারো অঞ্চলসমূহের কয়লা খনিতে। ভারতের

উপর থেকে বিরাট চাঁই ধসে পড়ে শ্রমিককে থেঁত্‌লে মেরে ফেলা ত' খনির নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

এ ছাড়া কয়লা খনির মধ্যে প্রায়ই বিষাক্ত গ্যাস শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটায়। তাই অধিকাংশ শ্রমিক গ্যাস মুখোস পরে এই সব বিপজ্জনক এলাকায় কাজ করে।

কয়লা খনিতে Iron man নামক একরকম যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে কয়লার চাঁই কাটা হয়। এই যন্ত্র ১৫।২০ জন লোকের কাজ করতে পারে।

কাটা কয়লা ঘোড়ায় টানা মালগাড়ি করে খাঁচার নীচে নিয়ে যাওয়া হয়। যারা গাড়ির মধ্যে কয়লা ভরে তাদের বলে filler (ভর্তিকারী)।

॥ পৃথিবীর সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ॥

পৃথিবীর মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৫,০০৮.৬ বিলিয়ন মেট্রিক টন। মোট কয়লার শতকরা ৪৬ ভাগ উৎপন্ন হয় এশিয়া মহাদেশে, ৩৮.২ ভাগ উত্তর আমেরিকায়, ১৩.১ ভাগ ইওরোপে, ১.৪ ভাগ আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় ১.১ ভাগ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ০.২ ভাগ।

কাঠের ঠেক্‌নোর তলায় শ্রমিক কাজ করছে

ঘোড়ায় টানা মালগাড়ী করে খনির মধ্যে কয়লা স্থানান্তরিত করা হয়

কয়লার বার্ষিক উৎপাদন ৭০·১ মিলিয়ন মেট্রিক টন। সোভিয়েত রাশিয়াও প্রচুর কয়লা উৎপাদন করে। রাশিয়ার বার্ষিক কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ৫৮৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন। কয়লা উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।

কয়লা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ্। কয়লা থেকে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। কলকারখানা, জাহাজ, স্টীমার, রেলগাড়ি প্রভৃতিতে ব্যাপকভবে কয়লার ব্যবহার হয়। জ্বালানী গ্যাস, তেল, পিচ, কোক, অ্যামোনিয়া, আলকাতরা, ন্যাফথালিন, স্যাকারিন ইত্যাদি কয়লা থেকে পাওয়া যায়। ইস্পাত তৈরির জন্যও কয়লা বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

কয়লা বোঝাই ঠেলাগাড়ী

খনিজ তৈল

॥ খনিজ তৈলের কার্যকারিতা ॥

খনিজ তৈলকে বলা হয় (Liquid gold) তরল সোনা। তার কারণ জিনিসটা বর্তমান জগতে মহা-মূল্যবান। এ তেল ছিল ভূগর্ভে লুকিয়ে। মানুষ এর সন্ধান পেয়ে এর দ্বারা কত কাজই না করিয়ে নিচ্ছে! এ যেন মানুষের অনিচ্ছুক ভৃত্য—ক্রীতদাস (Unwilling slave).

খনি থেকে তোলা পেট্রোলিয়াম দ্বারা বিশেষ কিছু কাজ হয় না। একে বিশুদ্ধ করে নিতে হয় নানা প্রক্রিয়ায়। তবেই এর দ্বারা মোটর চলে, এরোপ্লেন চলে, বড় বড় জাহাজ চলে আর চলে তামাম দুনিয়ার যত সব এঞ্জিন আর কলকারখানা।

এ ছাড়া ঘর্ষণে ইস্পাতের যন্ত্রের ক্ষয় নিবারণের জন্য তেলের দরকার হয়। এই তেলের সাহায্যেই আজ সৈন্য-বাহিনীকে যান্ত্রিক করা সম্ভব হয়েছে।

তাছাড়া বহু উৎপাদনের ব্যাপারে তেল এসে মহা সাহায্য করছে। যেমন মোমবাতি, বিজলী আলো,
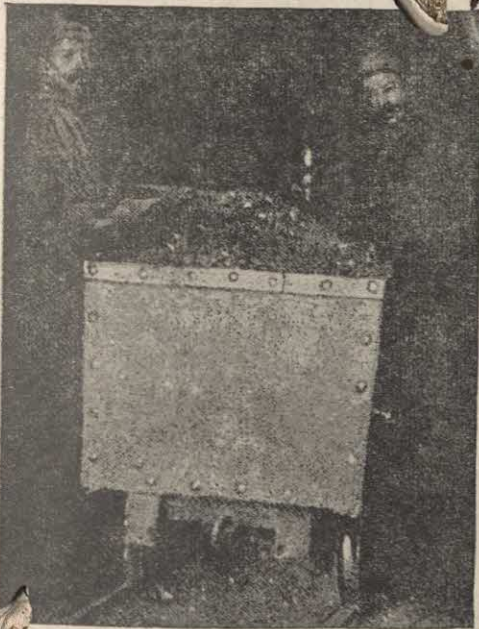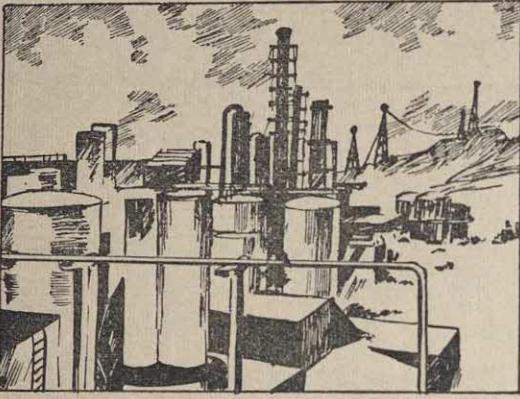
আসাম রাজ্যের তৈল-খনি

বিজলী পাখার কার্বন, ছাপার কালি, নানা রকম রং (পেণ্ট), গন্ধদ্রব্য, প্রসাধন দ্রব্য, এলিউমিনিয়াম্, টেনিস বল ও রাবারের টায়ার।

॥ প্রথম তৈলকূপ খনন ॥

এক শতাব্দীরও কম সময় পূর্বে এর এত উপযোগিতা কেউ বুঝতে পারেনি। প্রথম তৈলকূপ যে খনন করা হয়েছিল তা একশ বছরের বেশি আগে নয়। খনিজ তৈল পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছে, এনে দিয়েছে মানুষের কাছে এক অপূর্ব শক্তির সন্ধান।

গত শতাব্দীর মাঝা-মাঝি লর্ড প্লেফেয়ার (Lord Playfair) প্রথম দেখিয়ে দেন যে খনি থেকে তোলা পেট্রোলিয়াম বিশুদ্ধ করা যায়। এ খবর পেয়ে দুনিয়ার মানুষ পাগল হয়ে উঠল কি করে এই তেল উদ্ধার করা যাবে তাই ভেবে।

কর্ণেল ই. এল. ড্রেক এক রকম বিশেষ ড্রিল যন্ত্রের উদ্ভাবন করে ফেললেন। এই ড্রিলের সাহায্যে আটশ চল্লিশ গ্যালন তেল প্রত্যহ তোলা সম্ভব হল। কিন্তু এর আয়ু ছিল এক বছর মাত্র।

তৈল খনির মধ্যে মেক্সিকো, টেক্সাস, ক্যালিফর্নিয়া, পেনিসিলভানিয়া বিখ্যাত। যুক্তরাষ্ট্র পেট্রোলের মালিক হিসাবে বিশিষ্টস্থান অধিকার করে আছে। এ ছাড়া রুমানিয়া, রাশিয়া, ইরাক, ইরান, বর্মা ও ভিয়েৎনামে তৈল খনি প্রচুর আছে।

॥ কি করে তৈল তোলা হয় ॥

এই লোভনীয় তৈলের জন্য ড্রিল যন্ত্র অপরিহার্য। এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথায় এই ড্রিল যন্ত্রের ছবি দেওয়া হয়েছে। যেখানে খুঁড়লে তেল পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দেন সেখানে কাঠের তৈরী চতুষ্কোণ ডেরিক (Derrick) নির্মাণ করা হয়। এই ডেরিক ১৩০ থেকে ১৫০ ফুট উঁচু করা হয়। বিরাট একটা পুলি থেকে তেলের পাইপ ঝোলানো থাকে। এর মুখে কাটবার অস্ত্র লাগানো থাকে। ড্রিল পাইপ ইস্পাতের তৈরী আর অত্যন্ত ভারী—এর বাইরের বেড় চার থেকে ছ ইঞ্চি। এক একটা পাইপ ত্রিশ ফুট লম্বা। একটা পাইপের সঙ্গে আরেকটা পাইপ প্যাঁচ কষে আটকে দেওয়া হয়। সব প্রথমের পাইপের মুখে কাট[illegible]র যন্ত্র লাগানো থাকে। সেটাকে মাটিতে বসিয়ে [illegible]ুরে ঘোরালে পাইপটা মাটি কেটে ক্রমশঃ নী[illegible] দিকে যেতে থাকে। এর সঙ্গে পর পর পাইপ জুড়ে দিলে তা ক্রমশঃ মাটির গভীরে যেতে
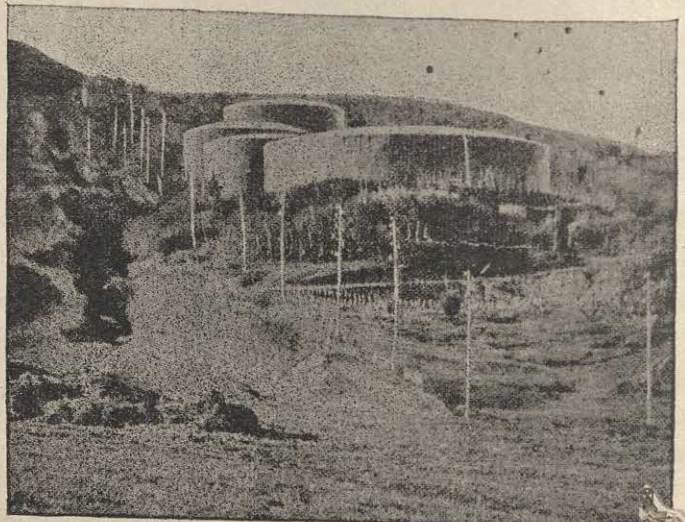
তৈল খনির উপরক ার দৃ

থাকে। ঠিক যে ভাবে নলকূপ খনন করা হয় সেই ভাবে তেলের নল ভূগর্ভে চালানো হয়।

পাইপের মুখ দিয়ে প্রথমে কাদা ও জল উঠতে থাকে। পাথর পড়লে তাও কেটে যায়। পাইপের ছিদ্র দিয়ে কাদা, পাথর কুচো যা কিছু ওঠে তা ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা করে দেখেন। এই ভাবে ড্রিলিং চলতে থাকে, যতক্ষণ না পাইপ তৈল স্তরে পৌঁছয়। ঈপ্সিত তেলের সন্ধান মেলে কয়েক শ ফুট গভীরতায় কিম্বা হয়ত কয়েক হাজার ফুট নীচেও। তখন আরো কূপ খনন করা হয়। এই সব কূপ থেকে যন্ত্রের সাহায্যে পাইপ দিয়ে তেল তুলে আনার ব্যবস্থা করা হয়। ক্যালিফর্নিয়ার তৈলকূপ দু মাইল গভীর।

পাইপে করে তেল বহু দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
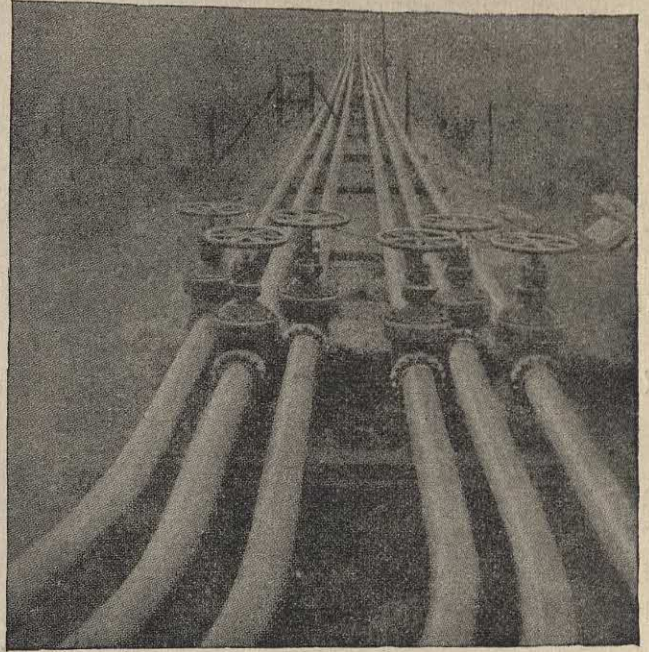
॥ আগুনের কাণ্ড ॥

এই তেল তোলার দারুণ বিঘ্ন অ[illegible]ন। যখন প্রবল বেগে পাইপের মুখ দিয়ে খনি[illegible]ন আসতে থাকে তখন তার মধ্যে বালি থাকে। [illegible]ঞ্জিনিয়ারকে তা সরিয়ে দিতে হয়। তখন সব চেয়ে ভয় আগুনের।

ড্রিল করে তেল তোলবার সময়ে তার সঙ্গে পাথরের চাঁই বেরিয়ে আসে, এদের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। তার ফলে সমস্ত তৈল কূপে আগুন লেগে যেতে পারে অথবা কাছাকাছি এঞ্জিন থেকে আগুনের ফুলকি এসে তেলে পড়তে পারে, জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা কেউ অসাবধানে এর মধ্যে ফেলে দিতে পারে। ফলে কাছাকাছি সব কূপে আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

মেক্সিকোর Dos Bocans তৈল খনিতে একবার আগুন লেগে ১৫০০ ফুট পর্যন্ত শিখা উঠেছিল—কয়েক মাইল দূর থেকে সে আগুনের গর্জন শোনা গিয়েছিল। ধোঁয়ায় সূর্যকে প্রায় ঢেকে দিয়েছিল। আরেকবার রুমানিয়ার Moreni তৈল কূপে যে দারুণ অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল তা আড়াই বছর ধরে জ্বলেছিল।

এই তেল পাইপে করে বহু দূরে নিয়ে যাওয়া হয়। ইরাকে তেল পাওয়া গেল মোসালের কাছে কিরকাকে (Kirkuk). সেই তেল শোধনের জন্য পাইপের মধ্য দিয়ে মরুভূমি পেরিয়ে প্যালেস্টাইনের হাইফা (Haifa) বন্দরে, সিরিয়ার ট্রিপলিতে ভূমধ্যসাগরের তীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আজকাল কয়লা থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পেট্রল তৈরী হচ্ছে। ডাক্তার বারজিয়াস (Bargius) নামক একজন জার্মান রাসায়নিক এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা।

খনিজ তৈল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম স্থানের অধিকারী। আমেরিকার বার্ষিক খনিজ তৈল উৎপাদনের পরিমাণ ৪০৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, বার্ষিক উৎপাদন ২৬৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এশিয়ার ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশেও প্রচুর খনিজ তৈল উৎপন্ন হয়। আমাদের ভারতের বার্ষিক খনিজ তৈল উৎপাদনের পরিমাণ ৫.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ভারতের আসাম রাজ্য তৈল-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ।

আসামের লখিমপুরের ডিগবয়, নাহারকাটিয়া, মোরান, বাপ্পাপাং, হানসানপাং, হুগীরজং প্রভৃতি স্থানে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। ডিগবয় ভারতের বৃহত্তম তৈলক্ষেত্র। এখানে বছরে ৪ লক্ষ টন তৈল পাওয়া যায়। ভারতের আরও অনেক জায়গায় খুঁজে খুঁজে মাটির নীচে তেল পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে বোম্বাইয়ের কাছে সমুদ্রতলের নীচে Bombay High নামক স্থান উল্লেখযোগ্য।

॥ লৌহ ॥

মানুষের সমাজে লোহার ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। খনি থেকে বা পাহাড় কেটে লোহা-পাথর বা আকরিক লোহা (Iron Ore) তুলে এনে প্রচণ্ড উত্তাপে তাকে গলিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঢালাই লোহা উৎপন্ন হয়। তারপর এতে অঙ্গার মিশিয়ে ইস্পাত তৈরী হয়।

আকরিক লোহা উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী। রাশিয়ার বার্ষিক আকরিক লোহা উৎপাদনের পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন মেটিক টন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোহা উৎপাদনের পরিমাণ ৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

ভারতের আকরিক লোহার বার্ষিক উৎপাদন ১৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ভারত প্রচুর আকরিক লৌহ বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বিহারের সিংভূম, ওড়িশার কেওনঝড়, ময়ূরভঞ্জ, মহীশূরের কেমানগুণ্ডি, মহারাষ্ট্রের চন্দা, মধ্যপ্রদেশের বৈলাডিলা, ডাল্লি ও বস্তার, তামিলনাড়ুর সালেম ও তিরুচিরাপল্লী, অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দরাবাদ, গোয়া ও পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে আকরিক লোহা পাওয়া যায়।

আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লোহার ব্যবহার

॥ ম্যাঙ্গানীজ ॥

ম্যাঙ্গানীজ প্রধানতঃ ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। প্রতি টন ইস্পাত উৎপাদন করতে গড়ে ১৪ পাউণ্ড ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন। এ ছাড়া কিছু ম্যাঙ্গানীজ ব্যবহৃত হয় এনামেল, ড্রাই ব্যাটারি, প্লাস্টিক, বার্নিশ, কাচ ও রাসায়নিক শিল্পে। সোভিয়েত রাশিয়া ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে বিশ্বের প্রথম স্থানের অধিকারী। রাশিয়া বার্ষিক ২·৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদন করে। ভারত ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতের বার্ষিক উৎপাদন ৫ লক্ষ মেট্রিক টন। তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, গোয়া ও মহীশূরে উচ্চশ্রেণীর ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়।

॥ তামা ॥

তামা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাতু। দস্তা, টিন ও নিকেলের সঙ্গে তামা মিশিয়ে পিতল, ব্রোঞ্জ ও 'জার্মান সিলভার' তৈরী হয়। তামা তাপ ও বিদ্যুতের ভাল বাহক বলে বৈদ্যুতিক তার তৈরীতে বেশী করে ব্যবহৃত হয়।

তামা উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী। আমেরিকার বার্ষিক তামা উৎপাদনের পরিমাণ ১·২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ভারতে আকরিক তামার বার্ষিক গড় উৎপাদন ৪·৭ লক্ষ মেট্রিক টন। তা পাওয়া যায় প্রধানতঃ বিহারের ঘাটশিলা আর রাজস্থানের খেতরি অঞ্চলে। ভারতে আরও বেশী তামার প্রয়োজন। সেইজন্য বিদেশ থেকে তামা আমদানী করতে হয়।

॥ অভ্র ॥

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য অভ্রের ব্যবহার বেশী হয়। বিমান, মোটর, বার্নিশ ও ঔষধের জন্য অভ্র বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

অভ্র উৎপাদনে বিশ্বে ভারত প্রথম স্থানের অধিকারী। বিশ্বের উৎপন্ন অভ্রের ৮০ শতাংশ ভারতে উৎপন্ন হয়। বিহারের গয়া, হাজারীবাগ, রাজস্থানের আজমীর, জয়পুর ও অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর ভারতে প্রধান অভ্র-উৎপাদক অঞ্চল। অভ্র বিদেশে রপ্তানী করে ভারত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

ব্রাজিল, মালাগাসি ও কানাডা কিছু কিছু অভ্র উৎপাদন করে।

॥ স্বর্ণ ॥

সোনা অত্যন্ত মূল্যবান্ ধাতু। সোনাকে ধনসম্পদ্ ও সমৃদ্ধির চিহ্ন বলে মনে করা হয়। অলংকার, ঔষধ ও বিলাসদ্রব্য তৈরীতে সোনার ব্যবহার যথেষ্ট। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিলে সোনা দিয়ে তা পূরণ করতে হয়।

আগ্নেয় শিলা ও নদীর বালির মধ্য থেকে সোনা পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকা সোনা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম। পৃথিবীর মোট সোনার [illegible] এই দক্ষিণ আফ্রিকা উৎপাদন করে।

কানাডা সোনা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ভারতে সোনার উৎপাদন সামান্যই। পৃথিবীর মোট সোনার মাত্র ০·৫ শতাংশ ভারত উৎপাদন করে। মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনিই ভারতের একমাত্র স্বর্ণ-উৎপাদন ক্ষেত্র।

॥ অ্যাস্‌ফাল্ট (Asphalt) কি ও কোথায় পাওয়া যায় ॥

অ্যাস্‌ফাল্ট আলকাতরা-জাতীয় প্রকৃতিজ পদার্থ এবং প্রধানতঃ পাওয়া যায় 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজের'
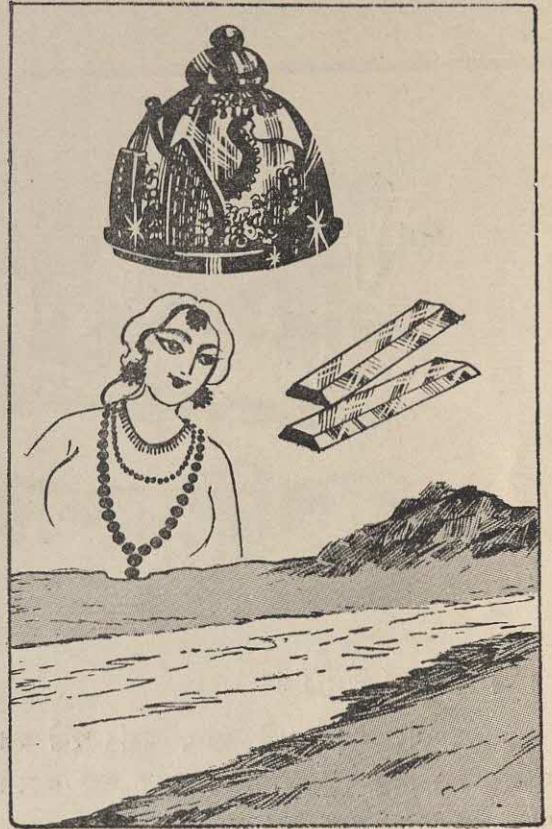
মুকুট ও গহনাদিতে সোনা ব্যবহৃত হয়

ত্রিনিদাদ নামক একটি দ্বীপে। সেখানে এই জিনিসের 'হ্রদ' (Asphalt Lakes) আছে। কিউবা, সুইট্‌জার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সিসিলি, জার্মানী এবং ভেনিজুয়েলাতে পর্বতজাত অ্যাস্‌ফাল্ট পাওয়া যায়। এ ছাড়া পেট্রোলিয়াম বিশোধনের পর যা পড়ে থাকে তা থেকেও অ্যাস্‌ফাল্ট পাওয়া যায়।

পৃথিবীর খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এছাড়া অনেক প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ খনিজ দ্রব্য আছে; যেমন—নিকেল, ক্রোমিয়াম, সীসা, দস্তা, বক্সাইট, টিন, রৌপ্য প্রভৃতি।
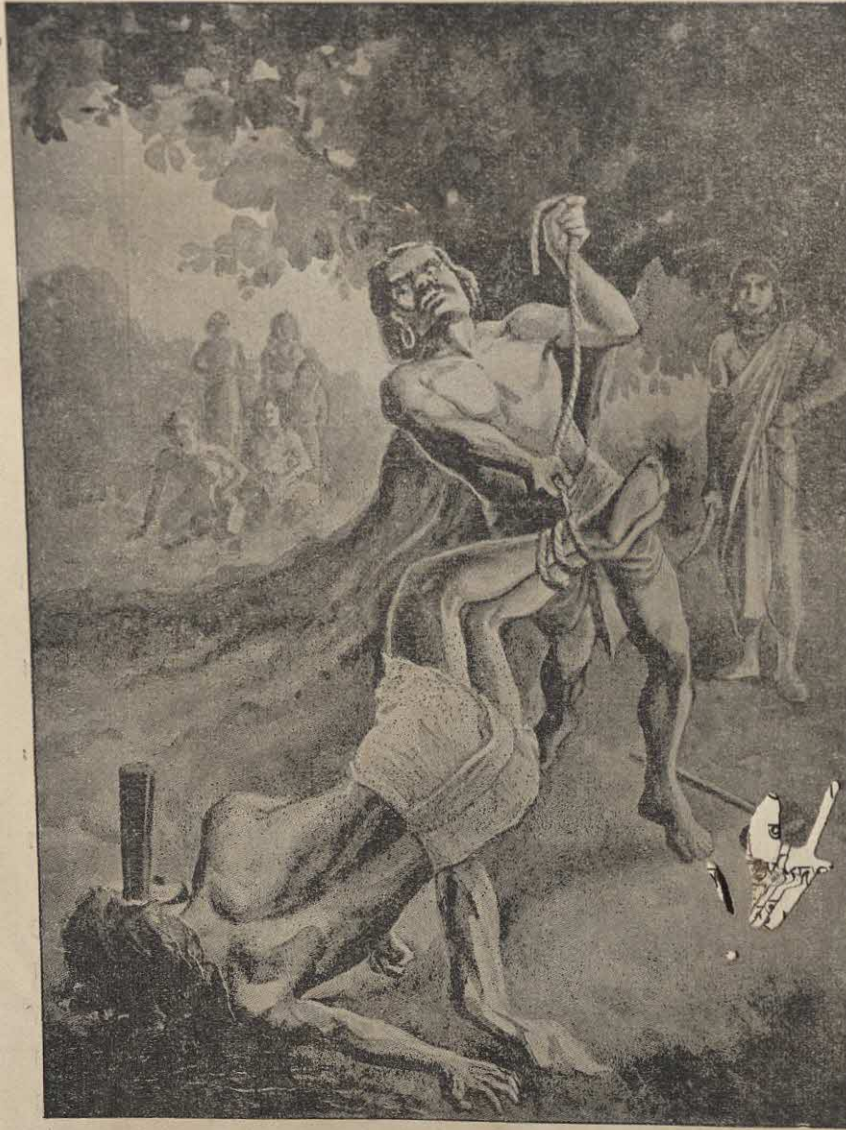
বৌদ্ধযুগের পালিখ পরিবর্ত্তিক শাস্তি

মধ্য দিয়ে চালিয়ে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত। তারপর দুই পা ধরে তাকে ঘোরানো হত।

॥ ইংলণ্ডের শাস্তির ব্যবস্থা ॥

কয়েদ, শিরশ্ছেদ ও দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এসব সব দেশেই ছিল। কয়েদীদের দিয়ে নানা রকম কাজ করানো হত। ঘানী ঘোরানো, মাটি কোপানো ইত্যাদির জন্য অপরাধীদের নিযুক্ত করা হত। কোন কোন দেশে অপরাধীদের দ্বারা বড় বড় পালের জাহাজে দাঁড় টানানোও হত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আইন করে ইংলণ্ডে ডাইনীদের শাস্তি দেওয়া হয় এবং এই সব ডাইনীদের সন্দেহ ক্রমে পুড়িয়ে মারা হত। অনেক নিরপরাধ লোককে ডাইন বা ডাইনী মনে করে সে সময়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। লোকে মনে করত যে এই সব লোকের শয়তানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং তারা শয়তানের ক্ষমতায় শক্তিশালী হয়ে লোকের মন্দ করতে পারত।

লঘু অপরাধের জন্য ছিল স্টকস (বা তুড়ুং-কল)। এ একরকম কাঠের যন্ত্র। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে এর খুব প্রচলন ছিল। দুটো কাঠের মধ্যে পা গলাবার ফুটো থাকত। তাতে পা দুটো আটকে অপরাধীকে রাজপথের ধারে বসিয়ে রাখা হত।

এছাড়া আর এক রকমের কাঠের যন্ত্র ছিল। তার নাম পিলরী (Pillory). এতে অপরাধীর দুটি হাত ও মাথা আটকে তাকে রাজপথের ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা হত। রাষ্ট্রের শত্রুদের এইভাবে শাস্তি দেওয়া হত। সাহিত্যিক ডি-ফোকে (De Foe) [illegible] শাস্তি নিতে হয়েছিল। ১৮৩৭ সাল থেকে

প্রাচীন রোমে এই ভাবে অপরাধীদের সাজা দেওয়া হত।

দেশবিদেশের শাস্তির ব্যবস্থা

[প্রাচীন রোমে এই ভাবে অপরাধীদের সাজা দেওয়া হত।]

বর্তমানে রোম ইওরোপের দক্ষিণস্থ ইটালীর রাজধানী। প্রাচীনকালে এই রোমকে ঘিরে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তাকে বলা হত রোমক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য রোম ছাড়িয়ে ইটালী ছাড়িয়ে ইওরোপের নানাস্থানে বিস্তৃত ছিল।

এখন যেমন পৃথিবীর সব দেশেই অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হয়, রোমক সাম্রাজ্যেও সেই রকম অপরাধীদের দণ্ড দেওয়া হত। তবে সব দে[illegible] স[illegible] কালে যেমন অপরাধীদের সাজা এক[illegible]নি ও এখনও হয় না, রোমক সাম্রাজ্যে[illegible]রাধীদের এমন ভাবে সাজা দেওয়া হত [illegible] তখনকার দিনে সব দেশে দেওয়া হত না, এখনও হয় না।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রোমক বিচারকের আদেশে এক ব্যক্তির দু হাত ও দু পা দড়ি দিয়ে বেঁধে সেই দড়ি চারটি ঘোড়ার গলায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অশ্বারোহী চারজন চার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। এর ফলে অপরাধীর দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

বর্তমানে কোন দেশে এ ধরনের অতি নৃশংস সাজা দেওয়া হয় না।
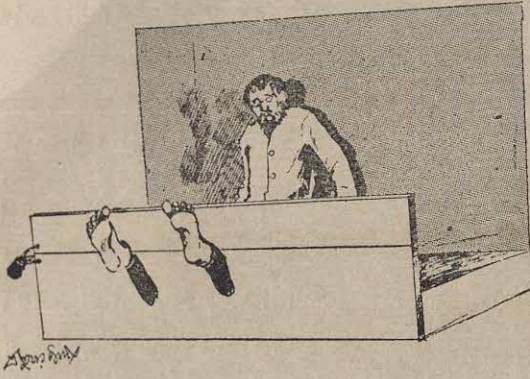
স্টক্‌স ঃ তুড়ুংকল।
এই যন্ত্রে পা আটকে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হত।

আইন করে এই সব শাস্তির ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়।

পিলরী ঃ এ একরকম স্টক্‌স (তুড়ুংকল)। এতে গলা ও দু হাত আটকে অপরাধীকে দাঁড় করিয়ে রাখা হত।

॥ মোঘল আমলের শাস্তি ॥

মোঘল আমলে নাক, কান কাটা, দাড়িতে আগুন লাগানো, গর্দান নেওয়া—এসব শাস্তি ত ছিল, অধিকন্তু লঘু অপরাধের জন্য অপরাধীদের দুজনের পরস্পরের দাড়িতে বেশ করে বেঁধে নাকে ন[illegible]ওয়া হত। হাঁচির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের দাড়ি[illegible]টান পড়ত আর দর্শকরা অপরাধীদের অবস্থা দেখে হাসত।

॥ ফরাসী বিপ্লবের সময়ে অপরাধীদের শাস্তি ॥

ফরাসী বিপ্লবের প্রথমে রাজা লুই আর তাঁর

॥ রোমান আমলের শাস্তি ॥

রোমান আমলে ভয়ংকর অপরাধীকে সত্ত ধরে আনা সিংহের সম্মুখে ছেড়ে দেওয়া হত। অপরাধীরা প্রাণে বাঁচবার জন্যে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করত। সে যুদ্ধ দেখবার জন্য বহু লোক কা[illegible]চার দিয়ে বসে থাকত। [illegible] অপরাধী জয়ী হলে [illegible]কে খালাস দেওয়া হত।

উল্টো গাধায় চাপিয়ে অপরাধীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে

মোগল আমলের শাস্তি। অপরাধীদের দাড়িতে দাড়িতে বেঁধে নাকে নস্য দেওয়া

মুণ্ড দেহ থেকে আলাদা করে দিত।

॥ আধুনিক শাস্তি ॥

প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে এমন অপরাধীকে ফাঁসিতে লটকে মারা হয়। ক্ষুদিরামকে রাজদ্রোহের অপরাধে ফাঁসিতে লটকানো হয়েছিল। মহারাজ নন্দ-কুমারেরও ফাঁসি হয়েছিল। এমনি ফাঁসিতে বহু স্বদেশ-প্রেমিককে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

রানীকে গিলোটিন যন্ত্রে হত্যা করা হয়। এই বিপ্লবের অপরাধীদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে তাদের শিরশ্ছেদের জন্য একটি যন্ত্র তৈরি করতে হয়েছিল। এর মধ্যে মাথা গলিয়ে দিলে উপর থেকে ধারালো ফলা নেমে গলাটি কচ করে কেটে দিত।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইগ্‌নেস গিলোটিন (Ignace Guillotin) নামক এক ফরাসী ডাক্তার এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এর ধারালো ফলাটি তিন-কোণা। দড়ি ধরে টানলে, ফলাটা নেমে এসে মুহূর্তে অপরাধীর

বন্য পশুর সামনে অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া হত

মাটিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে বুলডগ দিয়ে খাওয়ানো

এছাড়া শাস্তি ছিল দ্বীপান্তরে পাঠানো। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু স্বদেশ-প্রেমিককে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করা হয়।

ইউরোপে গ্যাস চেম্বারে অপরাধীকে মারা হত। বহু ইহুদী হিটলারের রাজত্বে এমনি ভাবে [illegible] দিয়েছে। অপরাধীকে একটা ঘরে আটক করে [illegible]

ঘরে নাইট্রোজেন গ্যাস চালিয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হত।

আর ছিল বৈদ্যুতিক চেয়ার। অপরাধীকে একটা চেয়ারে বসিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছেড়ে তখনি তার মৃত্যু ঘটানো হত।

অপরাধের শাস্তি দেবার কত না ব্যবস্থা ছিল দেশে-বিদেশে। কিন্তু তার ফলে অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা কি কমেছে? না, বোধ হয় বেড়েছে। তাই একদল জ্ঞানীর ধারণা যে সৎ উপদেশ দিয়ে মানুষের মন থেকে অপরাধ করার প্রবৃত্তি দূর করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

জোন অ্ব আর্ককে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে

গিলোটিন

॥ কয়েকটি ইতিহাস-বিখ্যাত শাস্তি ॥

মহাত্মা যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশ কাঠে বিদ্ধ করে তাঁর মৃত্যু ঘটানো হয়েছিল। ক্যালভারী নামক স্থানে এই ভয়ানক কাণ্ড করা হয়। যীশুকে দিয়ে ভারী ক্রুশ কাঠটিও বহন করানো হয়েছিল।

সক্রেটিসকে হেমলক বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

ফ্রান্সের মুক্তিদাত্রী জোন অ্ব আর্ককে ডাইনী সাব্যস্ত করে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

বহু খ্রীষ্টান সাধুকে অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সাধু সেবাস্টিয়ানকে গাছের সঙ্গে বেঁধে তীর মেরে হত্যা করা হয়েছিল।

———

ডুবুরীদের কথা

॥ ডুবুরীদের কাজ ॥

কবি মধুসূদন দত্তের কবিতায় তোমরা পড়েছ,

"মুকুতা ফলের লোভে ডুবেরে
অতল জলে, যতনে ধীবর।"

ডুবুরীরা সাগরের বুক থেকে মুক্তো আহরণের জন্য অতল জলের তলায় ডুব দেয়। তুলে আনে শুক্তি। তার মধ্যে থাকে মহামূল্যবান্ টল্‌টলে মুক্তো।

যখন বিজ্ঞানের কোন উন্নতি হয়নি তখন ডুবুরীরা জলের তলায় ডুবে যতক্ষণ তাদের দম থাকতো ততক্ষণের মধ্যে সাগরের তলা থেকে ঝুলি ভরে মুক্তো তুলে আনতো। এ কাজে বহু বিপদের সম্ভাবনা থাকতো, দম ফুরিয়ে যাওয়া, জলজ শৈবালে বা গাছগাছড়ায় আটকে যাওয়া, জল-জন্তুদের দ্বারা আক্রমণ হওয়া। এসব অগ্রাহ্য করে তারা এ কাজ করত।

॥ ডুবুরীদের পোশাক ॥

ক্রমশঃ ডুবুরীদের উপযোগী পোশাক হ'ল। তাদের সঙ্গে অক্সিজেন-বহনকারী বাক্স হল, টেনে
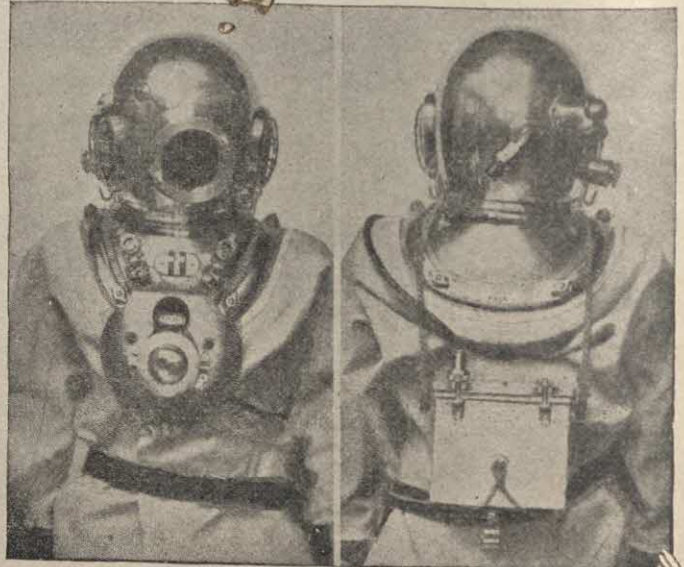
ডুবুরীদের পোশাক : সামনের গোলাকার বস্তুটি ইলেকট্রিক ল্যাম্প। পিছনের বাক্সটি অক্সিজেনের আধার

তুলবার দড়ি বা চেন হল, নীচে যাতে সব তারা দেখতে পায় সেজন্য তাদের শক্তিশালী টর্চ দিয়ে দেখার ব্যবস্থা হল। সব দিক থেকে তাদের নিরাপদ করবার ব্যবস্থার কোন ত্রুটি রইল না। ফলে মুক্তা সংগ্রহের ব্যবসা ক্রমশঃ জেঁকে উঠতে লাগলো।

যে সব সমুদ্রে মুক্তো পাওয়া যায় সেখানে প্রায়ই জাহাজে করে ডুবুরীদের নিয়ে গিয়ে জলের তলায় নামিয়ে দেওয়া হত।

জাহাজ থেকে ডুবুরীদের নামানো হচ্ছে

॥ ডুবুরীদের অন্যান্য কাজ ॥

ক্রমশঃ ডুবুরীদের সঙ্গে ওপর থেকে টেলিফোনে কথাবার্তা বলাও সম্ভব হয়েছে।

এখন ডুবুরীরা সমুদ্রের তলার বহু তথ্য সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছে। সেখানকার ফটো পর্যন্ত তারা উঠিয়ে আনছে। সাগরের কথায় পড়েছ যে তারা সমুদ্রের তলায় গিয়ে বইও পড়ছে, ছবিও আঁকছে তেল রং দিয়ে।

ডুবুরীরা জলের তলায় নামছে।

॥ জখমী ডুবো জাহাজ উদ্ধার ॥

জলের তলায় ডুবে-যাওয়া জাহাজ উদ্ধার করাকে ইংরাজীতে বলে Salvage.

১৬শ শতাব্দী থেকে এ কাজ চলে আসছে। স্পেনের আর্মাডা জাহাজের মধ্যে একটি Isle of Mull-এর কাছে জলের তলায় ডুবে যায়। তখন নানা উপায়ে সেই মহামূল্যবান জাহাজটিকে তুলে আবার জলের উপর ভাসানো হয়েছিল। তারপর থেকে ক্রমশঃ এই চেষ্টায় মানুষ লেগে পড়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা মানুষকে এই কাজে নিয়ত নানারকমে সাহায্য করতে লাগল।

প্রথম মহাসমরে বহু মিত্রপক্ষীয় জাহাজ জার্মানদের ভাসমান মাইনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এইসব জাহাজে বহু দামী কলকবজা ছিল। এত দামী জিনিস নষ্ট হতে দিতে পারল না মানুষ। ভেবে ভেবে এদের উদ্ধারের উপায় বার করে ফেলল।
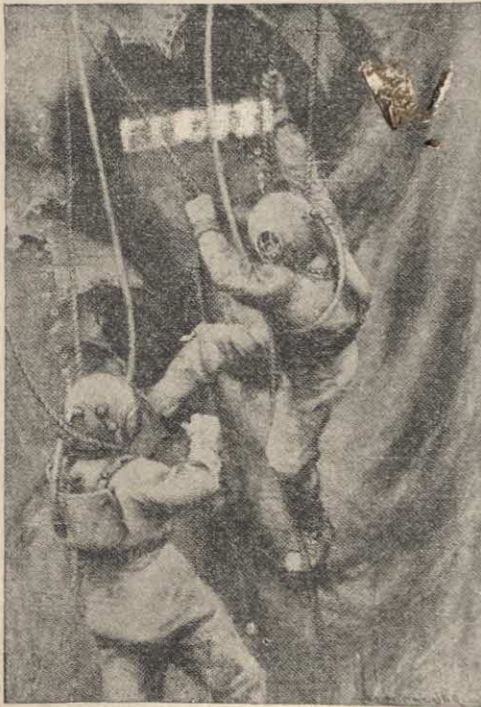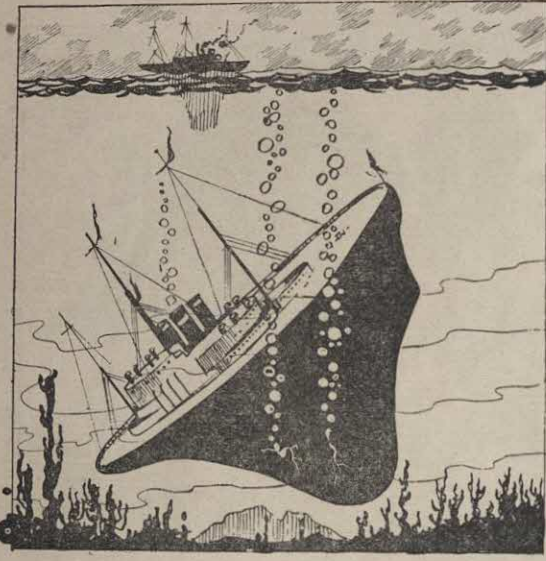
জখমী জাহাজ জলের তলায় তলিয়ে গেছে
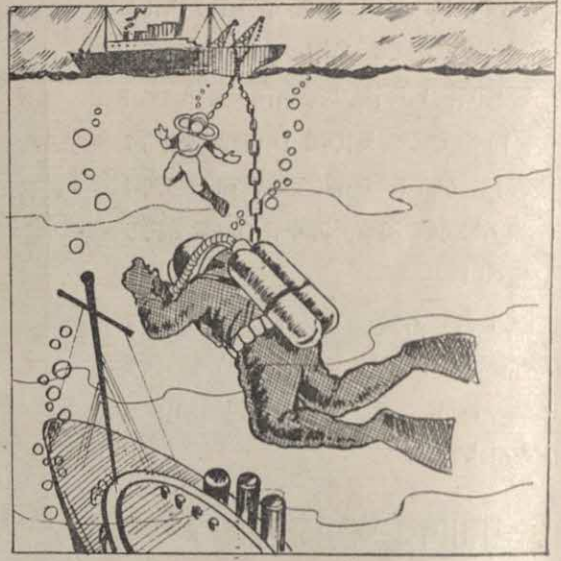
উপর থেকে সাজ-পোশাক সহ ডুবুরীদের নামিয়ে দেওয়া হল।
এরা টেলিফোনে জখমের বিবরণ জানিয়ে দিল
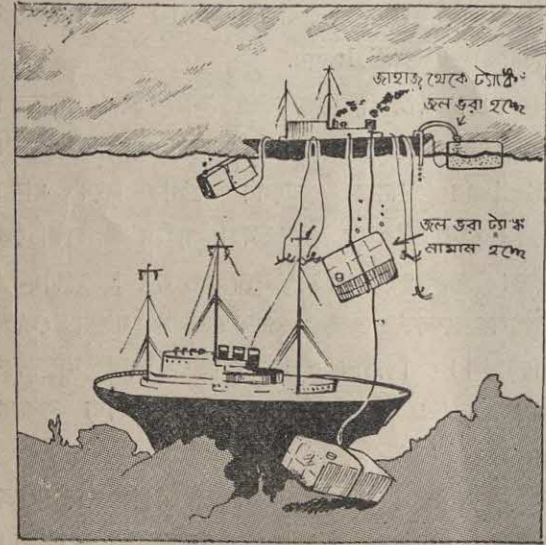
ডুবে যাওয়া জাহাজ উদ্ধারের জন্য জলভর্তি ভারী ভারী ইস্পাতের ট্যাঙ্ক ডুবে যাওয়া জাহাজের দুপাশে নামিয়ে দেওয়া হল
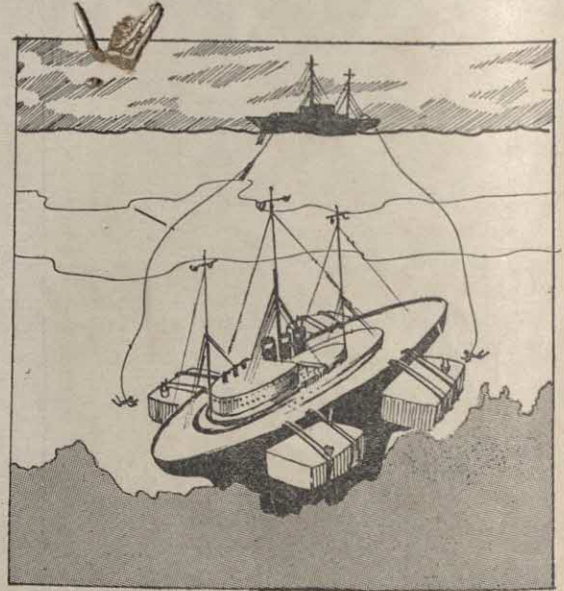
দরকার মতো আরো জল-ভরা ট্যাঙ্ক নামিয়ে সেইসব ট্যাঙ্কের সঙ্গে ডুবে-যাওয়া জাহাজ বাঁধা হল

এবার এসব ট্যাঙ্কের-জল পাইপ দিয়ে পাম্প করে খালি করা হল
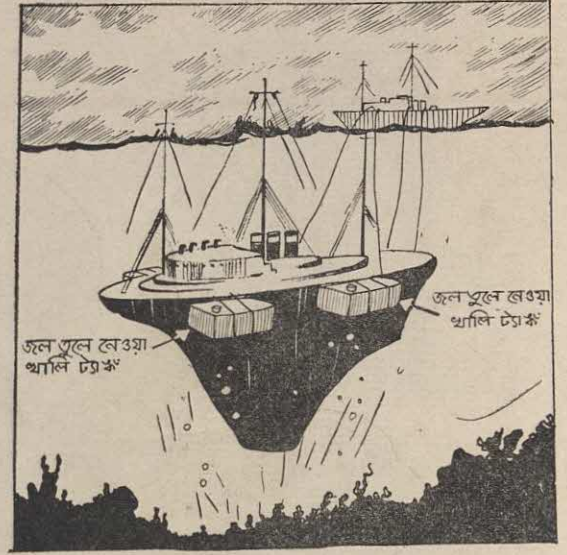
হালকা হয়ে ট্যাঙ্কগুলো জলের উপর ভেসে ওঠবার সময় ডুবে যাওয়া জাহাজটাকে টেনে জলের উপর ভাসিয়ে দিল
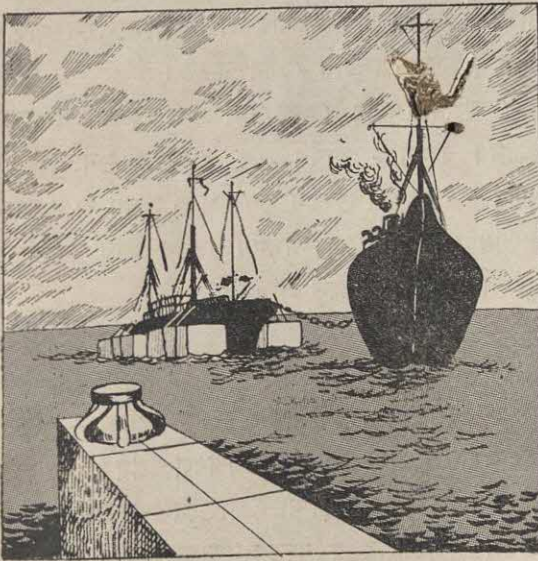
অন্য একটা জাহাজ এসে জখমী জাহাজটাকে টেনে নিয়ে চলল ডকের দিকে
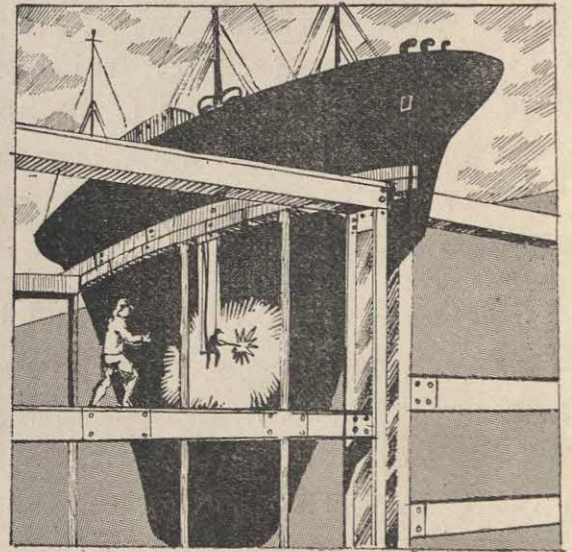
ডকে এনে তার মেরামত শুরু হল। আবার যাতে এ জাহাজ জলে ভেসে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে

দেশলাইয়ের কথা

॥ আগুনের প্রয়োজনীয়তা ॥

আগুন যদি হঠাৎ পৃথিবী থেকে মিলিয়ে যায় তা হলে পৃথিবীর অবস্থা কি হবে একবার ভেবেছ কি ?

পৃথিবী ফিরে যাবে সেই আদিম বর্বর যুগে। তখন মানুষ আগুনের ব্যবহার জানত না। তারা সব জিনিস কাঁচা খেত। শীত করলে গাছের শুকনো পাতা জড়ো করে তার মধ্যে ঢুকে থাকতো বা পশুর চামড়া দিয়ে গা ঢাকা দিত।

॥ কি করে মানুষ আগুন জ্বালতে শিখল ॥

কি করে মানুষ প্রথম আগুনের উপকারিতা বুঝেছিল তা আমরা জানি না। হয়ত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দেখে মানুষ আগুনের সন্ধান পেয়েছিল। কিংবা হয়ত বাজপড়ার ফলে আগুন জ্বলতে দেখে বা বনে গাছের ডালে ডালে ঘর্ষণের ফলে দাবানল জ্বলতে দেখে তার মাথায় আগুন জ্বালবার উপায় সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়।

দাবানল কি করে হয় তা লক্ষ করে মানুষ দুটো শুকনো কাঠ ঘষে আগুন উৎপাদন করতে শিখল।

॥ চকমকি পাথরের আবিষ্কার ॥

কিন্তু কাঠ ঘষে আগুন করা বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। তাই একবার আগুন জ্বাললে সে আগুন তারা জ্বালিয়ে রাখবার চেষ্টা করত।

তারপর দৈবাৎ পেয়ে গেল তারা চকমকি পাথরের সন্ধান। চকমকি পাথর ঠুকে তারা আগুন জ্বালতে শিখে সেই আগুন শুকনো শ্যাওলা বা তুলো বা শুকনো পাতায় ধরিয়ে নিতে লাগল। তখন তারা আগুনের ব্যবহার ক্রমশঃ শিখতে লাগল।

॥ আগুনের ব্যবহার ॥

আগুনের ব্যবহার শিখে তারা মাংস আগুনে পুড়িয়ে সেই পোড়ানো মাংস খেতে শিখল আর শিখল রান্না করে খাওয়া। এ ছাড়া মাটি আগুনে পুড়িয়ে দরকারী তৈজসপত্র তৈরি করে নিতে লাগল তারা। তারপর ধাতু গলিয়ে আলাদা করা ইত্যাদি আগুনের বহু ব্যবহার ক্রমশঃ তারা শিখল। ক্রমশঃ রাতের অন্ধকার আগুনের আভায় আলোকিত করে তারা রাতকে [illegible] করে তুলল।

আদিম মানুষ আগুন তৈরী করছে

চকমকি পাথরের সঙ্গে লোহার ঘর্ষণে আগুন জ্বালানো হচ্ছে

॥ দেশলাই আবিষ্কারের চেষ্টা ॥

কিন্তু এত প্রয়োজনীয় আগুন তৈরী করতে এত হ্যাঙ্গামা পোয়াতে তারা রাজী ছিল না। তাই আগুন জ্বালবার সহজ উপায়ের কথা তারা ভাবতে লাগল।

একটা বাক্সের মধ্যে আধ-পোড়া ন্যাকড়া থাকত। তাকে বলত Tinder. চকমকি ঠুকে তার স্ফুলিঙ্গ সেই বাক্সের মধ্যকার ন্যাকড়ায় ফেলে তাকে জ্বালানো হত। সেই বাক্সের মধ্যে ন্যাকড়া ও চকমকি রাখা হত বলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল Tinder Box. এই টিণ্ডার বক্স একশ বছর আগেও বে[illegible]হার করা হত। বাক্সের মধ্যে চকমকি ঠোকা হত বলে বাইরের বাতাস সে স্ফুলিঙ্গ নেভাতে পারত না।

কিন্তু অত হ্যাঙ্গামা সব সময়ে করা সম্ভব হত না। তাই মানুষ অন্য উপায়ের কথা ভাবতে লাগল।

॥ প্রথম দেশলাই ॥

এবার টিণ্ডারের বদলে তৈরী হল গন্ধকে ডোবানো সরু সরু কাঠি। এই সব কাঠির মাথায় গন্ধক লাগানো থাকত। চকমকির আগুনের ফুলকি এর উপর ফেললে ফোঁস্ করে কাঠি জ্বলে উঠত।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে Chancel নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক অন্য উপায়ে জ্বালা দেশলাই আবিষ্কার করে ফেললেন। কাঠির মাথায় রসায়ন মাখানো থাকৃত। ব্যবহারকারী সঙ্গে অ্যাসিডের বোতল রাখতেন। দেশলাই কাঠির ডগা অ্যাসিডে ডোবালে আগুন জ্বলে উঠত।

দুটো কাঠ ঘষে মানুষ আগুন জ্বালত

বাঁশের মধ্যে গর্ত করে তার মধ্যে অন্য কাঠ দিয়ে ঘষলেই আগুন বেরুত

টিণ্ডার বক্স

এর কিছুকাল পরে দেশলাইয়ের কাঠির মাথায় কাচের ছোট গোলকে অ্যাসিড থাকত। সাঁড়াশি দিয়ে চিপে কাচের গোলক ভাঙলেই আগুন জ্বলে উঠত। কাচের গোলকের মধ্যকার অ্যাসিড দেশলাইয়ের মাথার রাসায়নিকের সঙ্গে মিশে আগুন জ্বেলে দিত।

॥ জন ওয়াকারের দেশলাই ॥

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন ওয়াকার নামক এক ইংরেজ ভদ্রলোক যে দেশলাই আবিষ্কার করেছিলেন সে দেশলাইয়ের নাম (Congreve) কংগ্রীভ দেশলাই। সেই দেশলাইয়ের বাক্সের সঙ্গে একটা সিরিস কাগজ দেওয়া থাকত। কাঠির ডগায় লাগানো থাকত রসায়ন। সিরিস কাগজে কাঠির ডগা ঘষলেই কাঠি জ্বলে উঠত।

চ্যানসেলের দেশলাই
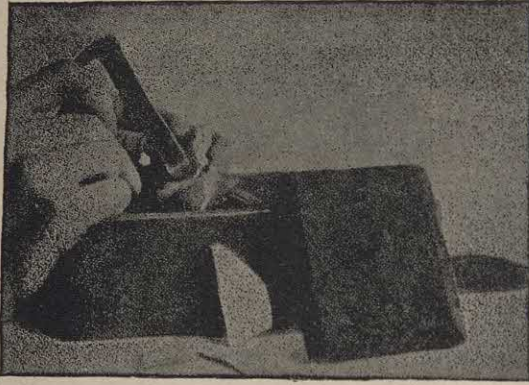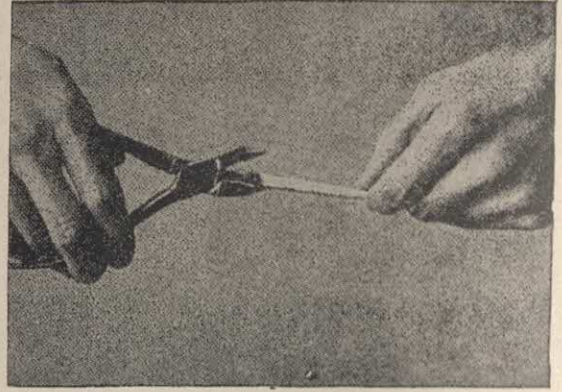
সাঁড়াশি দিয়ে টিপে দেশলাই জ্বালানো হচ্ছে

॥ লুসিফার ম্যাচ ॥

ঠিক এমনি দেশলাই তৈরী করলেন স্যামুয়েল জোন্‌স নামে আরেকজন ভদ্রলোক। তার নাম দেওয়া হল লুসিফার ম্যাচ।

লুসিফার ম্যাচ ও কংগ্রীভ ম্যাচের দোষ ছিল। দারুণ শব্দ করে কাঠি জ্বলত আর আগুনের ফুলকি চারিদিকে ছড়াতো। এর থেকে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া বাক্সের গায়ে লেখা থাকৃত, গন্ধ শুঁকবেন না; গন্ধটা বিষাক্ত।

এখন আমরা যে দেশলাই ব্যবহার করি তা যেমন সহজে জ্বালা যায় তেমনি নিরাপদ। কিন্তু এই আবিষ্কারের জন্য মানুষকে শত শত বছর ধরে নানারকমে মাথা খাটাতে হয়েছে, নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে।

এখনকার নিরাপদ দেশলাই

॥ ফস্‌ফরাস মাখানো দেশলাই ॥

নিরাপদ দেশলাই কি করে তৈরী করা যায় তা নিয়ে অনেকেই ভাবছিলেন। ইতিমধ্যে ফসফরাস আবিষ্কার হয়েছিল। কিন্তু একটুতেই আগুন ধরে যাবার সম্ভাবনা থাকায় এটা দিয়ে কোন কিছু করা যাচ্ছিল না।

ফসফরাসের আগুন হঠাৎ জ্বলে ওঠা ও তার আগুনের বিস্তার সীমাবদ্ধ করার জন্য তাকে অন্য জিনিসের সঙ্গে মেশাবার ব্যবস্থা করা হল। এতে আগুন জ্বালানো সহজ ও নিরাপদ হল। সঙ্গে সঙ্গে ফসফরাস ম্যাচ তৈরির ধুম পড়ে গেল।

কলে তৈরী কাঠি সাজানো হয়েছে। এবার বারুদ মাখানো হবে

॥ লোকোফোকো ॥

খসখসে জায়গায় ফসফরাস দেশলাইয়ের কাঠি ঘষলেই আগুন জ্বলে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রে অ্যালঞ্জো ফিলিপস ম্যাসাচুসেটস্ প্রথম এই রকম দেশলাই তৈরি করলেন। এর নাম হলো (Locofoco) লোকোফোকো।

কলে তৈরী রাশিকৃত দেশলাই বাক্স
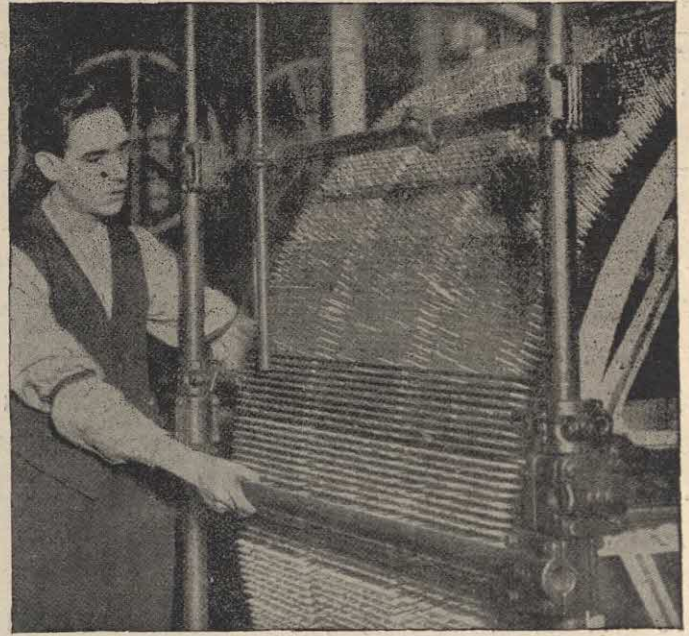
কিন্তু ফস্‌ফরাস বিষ। যারা কারখানায় এই দেশলাই তৈরি করত তাদের শরীরে বিষ ঢুকে নানা রোগ দেখা দিতে লাগল।

তাদের বাঁচাবার জন্যে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ই. ডি. কোহেন (E. D. Cohen) ও এইচ সেভেনে (H. Sevene) অনেক গবেষণা করে বার করলেন যে অবিষাক্ত ফসফরাস সেসকুইসালফাইড দিয়ে ঐ একই কাজ হতে পারে। তাই আর বিষাক্ত ফসফরাস ব্যবহারের দরকার রইল না।

আজকালকার দেশলাইয়ে তোমরা দেখেছ যে কাঠির মাথায় একটা মশলা মাখানো থাকে। এই মশলা ফসফরাস সেসকুইসালফাইডের। মাথার তলায় কাঠির খানিকটা প্যারাফিন মাখানো থাকে। এর ফলে কাঠি তাড়াতাড়ি জ্বলে আর আগুনটা কিছুক্ষণ থাকে।

॥ দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স ॥

তামাম দুনিয়ায় আজ লোকের পকেটে পকেটে দেশলাই ঘুরছে। এত দেশলাই তৈরী করছে

দেশলাই ফ্যাক্টরীগুলো। আজকাল সব কিছু যন্ত্রে তৈরি হচ্ছে। মানুষকে শুধু হাত লাগাতে হচ্ছে গোছানো আর বাক্সে ভর্তির জন্যে।

প্রত্যেক বছর জগতের দেশলাইয়ের চাহিদা মেটাতে বনকে বন সাফ হয়ে যাচ্ছে। দেশলাই তৈরির কারখানার জন্য নিয়ত কাঠের জোগান দরকার। কাঠ চিরে সরু সরু কাঠি করতে হয় আর পাৎলা কাঠের তৈরী হয় দেশলাই বাক্স। এসব তৈরী করবার জন্যে বিশেষ ধরণের চেরাই যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। প্রধানতঃ Pine ও Fir গাছ থেকে এই সব কাজ হয়। অতি পাৎলা করে কাঠ চেরাই হয়ে এলে তা থেকে সাইজ মত কাঠি ও খোল তৈরী হয়।

কলে কাঠি সাজিয়ে তার ডগায় মশলা মাখানো হয়, কলে দেশলাইয়ের বাক্স তৈরী হয়। কিন্তু মানুষের হাত ছাড়া এই রাশীকৃত কাঠি গোছানো হবে কি করে? সেগুলো গুণে বাক্সে ভরতেও মানুষের দরকার। তাই আজ দেশলাই কলে এত মানুষ কাজ করে।

॥ সিগারেট্ লাইটার ॥

আজকাল অনেক ভদ্রলোকের পকেটে সুদৃশ্য সিগারেট্-লাইটার দেখা যায়। এগুলি কাঠিভরা দেশলাইয়ের মত নয়। এতে একটা ছোট্ট ইস্পাতের চাকা থাকে। হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সে চাকা ঘোরালে ভিতরের চকমকি পাথরের সঙ্গে তার ঘষা লাগে। আর তা থেকে আগুনের ফুলকি বেরোয়। এরসঙ্গে লাগানো থাকে পেট্রোলে ভেজা একটা পলতে। আগুনের ফুলকি সেই পলতেটা জ্বালিয়ে দেয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই আধুনিক সিগারেট লাইটার প্রাচীনকালের টিণ্ডার বক্সের আধুনিক সংস্করণ।

॥ সংবাদপত্রের চাহিদা ॥

সকালবেলা ঘুম ভাঙলেই আমরা চাই এক পেয়ালা গরম চা আর তার সাথে সেদিনকার টাট্‌কা খবরের কাগজ। চা না হলেও হয়ত চলে, কিন্তু খবরের কাগজ আমাদের চাইই।

খবর পড়া আজকাল মানুষের একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈনিক সংবাদপত্রে থাকে [illegible] বিশ্বের খবর। দুনিয়ার কোথায় কি হচ্ছে তা না জানা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি থাকে না।

এসব খবর জানার দরকারও রয়েছে। আজ আমাদের ভাগ্য বিশ্বের সঙ্গে জড়িত। এখন আর পৃথিবীর দেশগুলি বিচ্ছিন্ন ও একক নয়। সকলের সঙ্গে সকলের নানা রকম সম্বন্ধ রয়েছে। তাই বিশ্বের খবরে আমাদের দরকার।

॥ সংবাদপত্র প্রকাশের পূর্বেকার অবস্থা ॥

লিপি ও মুদ্রণ আবিষ্কারের আগে সংবাদ পাঠানো খুব কঠিন ছিল। লিপি আবিষ্কারের পর নানা জায়গায় পাথরে নানা উপদেশ ইত্যাদি খোদাই করে দেওয়া হত জন-সাধারণের জন্যে। অশোকের অনুশাসনের কথা তোমরা পড়েছ।

প্রাচীন মিশরে মন্দিরের গায়ে আর সমাধি মন্দিরের উপর ছবি এঁকে ও অক্ষর খোদাই করে অনেক ইতিহাসের কথা লিখে রাখত। পর পৃষ্ঠার লম্বা ছবিটি একটি সমাধি মন্দিরের গায়ে দেয়ালে খোদাই করা চিত্র ও লিপি। হাজার হাজার বছর আগে লেখা হলেও এর রং এখনো টাট্‌কা রয়েছে, আবছা হয়ে যায়নি।

পরের পাতার ছবিটি একটি পাথরের খোদাই করা লিপি। এ লিপি মিশরের চিত্রলিপি (Hyroglyfic). এই পাথরটির নাম রসেটা স্টোন (Rosetta Stone). এতে তিন রকম অক্ষরে একই খবর লেখা হয়েছিল। মানুষ বহু চেষ্টায় এই লিপি উদ্ধার করেছে।

এছাড়া নরম কাদার উপর লেখা কীলকলিপিও পাওয়া গেছে। ফলকটা পোড়ানো ইটের মত।

কাগজ আবিষ্কারের আগে মিশরে প্যাপাই-রাস পাতার উপর লেখা বাণী অনেক পাওয়া গেছে। এ সব এখন বৃটিশ জাদুঘরে আছে।

॥ সংবাদপত্রের ইতিহাস ॥

১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিসে প্রথম গেজেট (Gazette) বা সংবাদপত্র বার হয়েছিল। এক
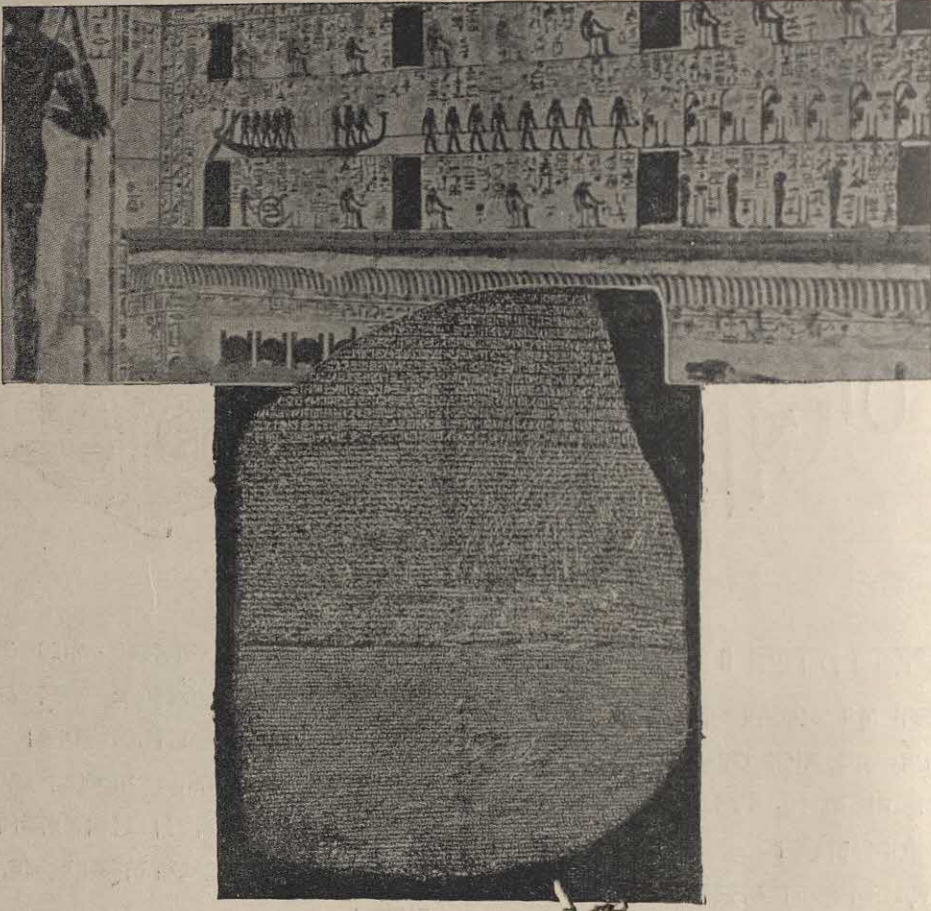
সমাধি মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই চিত্র ও লিপি

ফার্দিং-এর চেয়েও কম মূল্য ছিল এক গেজেট মুদ্রার। ভেনিসের এই সংবাদপত্রটির মূল্য ধার্য হয়েছিল এক গেজেট। তাই থেকে সংবাদপত্রের নাম হয়েছিল গেজেট্।

১৬শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইটালি ও জার্মানিতে সংবাদ ছাপা কাগজ বিক্রী করা হত। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রজার লে'স্ট্রেঞ্জ (Sir Roger Lestrange) সব প্রথম দি পাবলিক ইনটেলিজেন্স (The Public Intelligence) নামে রীতিমত সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেছিলেন। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজী সাপ্তাহিক বার হয়। তার নাম ছিল Weekly News. সেটি London থেকে প্রতি সপ্তাহে বেরুত। এতে থাকত কেবল বিদেশী খবর।

রোমের রাজকীয় বাহিনীর অধিনায়কদের প্রতি সরকারী আদেশ (Acta Diurna বা Daily Doings) ছাপানো অবস্থায় পাঠানো হত।

সংবাদপত্র বলতে আজকাল আমরা যা বুঝি তা ১৭শ শতাব্দীর আগেই ছোট ছোট খবর সম্বলিত চিঠির আকারে প্রথম দেখা দেয়। এই রকম চিঠি লণ্ডনের কফি হাউসে ও ক্লাবে সরবরাহ করা হত। এদের জন্য দাম দিতে হত।

এইসব সংবাদ সম্বলিত কাগজ ডাকবাহী ঘোড়ার গাড়ি (Mail Coach) করে লণ্ডন থেকে মফঃস্বলেও পাঠান হত।

১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যাম্প অ্যাক্ট (Stamp A[illegible] প্রচলিত হওয়ায় এই রকম একটি সংবাদসহ চি[illegible]

সুদূর মেক্সিকোতে সংবাদপত্রের জন্য আগ্রহান্বিত লোক

পাঠাতে আধ-পেনী ডাক-ব্যয় পড়ে যেত। ফলে এরকম সংবাদ পাঠানো অনেকটা কমে গেল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রীতিমত সংবাদপত্র সব প্রথম প্রকাশিত হল, তার নাম মর্নিংপোষ্ট।

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে Daily Universal Ragister নামে আরেকটি সংবাদপত্র বেরুল। এই কাগজ পরে নাম বদলে হ'ল The Times. ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই কাগজ বাষ্পীয় শক্তিতে চালিত ছাপাখানায় ছাপা হতে থাকে।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে The Globe নামে প্রথম সান্ধ্য কাগজ বার হয়।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জনপ্রিয় সস্তা সংবাদপত্র হয়েছিল, তার মূল্য ছিল আধ-পেনী মাত্র।

তারপর বার হল ছবিওলা দৈনিক পত্র ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে বেরুল Daily Mail, তার পরে বেরুল Daily Express.

এরপর পার্লামেণ্টের শ্রমিকদলের মুখপত্র হয়ে বেরুল Daily Herald. তারপর বন্যার বাঁধ ভেঙে বেরুতে লাগ্‌ল নানা সংবাদপত্র নানা দেশে।

॥ ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ইতিহাস ॥

ভারতবর্ষে মোগল আমলে রাজা বাদ্‌শাদের চর—বড় বড় শহরে ঘুরে ঘুরে খবর সংগ্রহ করে মাসে মাসে বা দরকার হলে সপ্তাহে সপ্তাহে সে সব লিখে রাজধানীতে পাঠাতো। এই সব সংবাদলিপির নাম ছিল 'আখ্‌বার' বা 'আখ্‌ বারাৎ'। এগুলি ফারসী ভাষায় লেখা হত।

ভারতবর্ষে প্রথম ছাপা যে সংবাদপত্র ইংরাজীতে বার হয়, তার নাম 'বেঙ্গল গেজেট'। এরপর ইণ্ডিয়া গেজেট্‌, ক্যালকাটা গেজেট্‌ ও হরকরা নামক অনেক কাগজ বার হয়।

বাংলা ভাষায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেট্‌' বার হয়েছিল। এ দুটি সাপ্তাহিক পত্র। ঐ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা 'দিগ্‌দর্শন' নামে একটা বাংলা মাসিক পত্র বার করেন। এটিই প্রথম বাংলা মাসিক পত্র।

জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা

যুদ্ধের সময়ে কাগজের চাহিদা

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন 'সমাচার দর্পণ'কে দ্বিভাষিক করেন (বাংলা ও ইংরেজী)। ১৮৩২ সাল থেকে এই কাগজ সপ্তাহে দুবার করে প্রকাশিত হতে থাকে।

'সংবাদ প্রভাকর' বাংলায় প্রথম দৈনিক পত্র। ১৮৩৯ সালে এই কাগজ দৈনিক হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। ইহা প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক, পরে সপ্তাহে তিনবার বেরুত এবং শেষে ইহা দৈনিক হয়।

প্রথমে সংবাদ, পরে সমসাময়িক কালের বৃত্তান্ত, দেশের ও সমাজের অবস্থা, ব্যক্তি-পরিচয়, কৃতিত্বের সংবাদ ইত্যাদি ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, নানা আলোচনা ও মন্তব্য, বাদ-প্রতিবাদ ও রাজনীতির সংবাদ এই পত্রিকায় স্থান পেতে লাগল।

এই ভাবে দৈনিক সংবাদপত্র গণজীবন গঠনের উপাদান সরবরাহ করে উত্তম নাগরিক গঠনে সাহায্য করে আসছে।

॥ সাংবাদিকতা বা জার্নালিজম্ ॥

সংবাদ সরবরাহ কি ভাবে করতে হয়, কিভাবে নানা সংবাদ পরিবেশন করে সে সবের দ্বারা জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা যায়, কি ভাবে তারা ঠিকঠিক ভাবে চিন্তা করতে পারে তা এখন সভ্য সমাজের একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥ সংবাদ আহরণ ॥

বহু উপায়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজ করতে হয়। যে সব খবর পাওয়া গেল তা থেকে বেছে গুছিয়ে খবর দিতে হবে; কাজেই সংকলন ও নির্বাচন দরকার। সাধারণ জ্ঞান দ্বারা সংবাদগুলি বাছাই করা দরকার। এইসব কারণে সংবাদ আহরণ, পরিবেশন ইত্যাদি একটি বিশেষ বিদ্যা রূপে পরিগণিত হয় এবং এই বিদ্যা রীতিমত শিক্ষা করা দরকার।

॥ আধুনিক সংবাদপত্রের নানা বিভাগ ॥

একটি সংবাদপত্রের একজন মূল সম্পাদক থাকেন। তাছাড়া বহু বিভাগের একজন বা একাধিক সহ-সম্পাদক থাকেন। তাঁরা একযোগে কাজ করে দৈনিক সংবাদপত্রটি প্রত্যহ প্রকাশ করেন।

সম্পাদকীয়, সংবাদ (স্বদেশী বিদেশী), খেলাধুলা,

যুদ্ধ অঞ্চলের ছবি তোলা হচ্ছে

ব্যবসা-বাণিজ্য, আবহ-সংবাদ, আমোদ-প্রমোদ, বিজ্ঞাপন, নানা রূপ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ এগুলি একটি সংবাদপত্রের নিয়মিত বিভাগ। এদের জন্যে নির্দিষ্ট পাতা ও স্থান থাকে।

এই মুদ্রাযন্ত্রে এক মিনিটে এক পাতা সংবাদ ঢালাই হয়ে তৈরী হয়। সব পাতাটা একটা ধাতুর ফলক হয়ে যায়

॥ কি করে খবর আসে ॥

সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহ করবার জন্যে সারা দুনিয়ায় বহু সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আছে। কোন সংবাদপত্র এদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হলে এরা তাদের খবর পাঠায়। এদের বলে নিউজ এজেন্সী। রয়টার, এসোসিয়েটেড্ প্রেস, পি. টি. আই., ইউ. এন. আই., এ. এফ্. আই., টাস এজেন্সী এইরূপ বহু প্রতিষ্ঠান আছে। তারা Telegram করে বড় বড় খবর পাঠায়। তাছাড়া প্রত্যেক কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা (Special correspondent) থাকে। তাঁরা তাঁদের এলাকার খবর নিজেরা কাগজে পাঠিয়ে দেন। তাছাড়া যে কোন লোক তার জানা বা প্রত্যক্ষ করা খবর পাঠায়। প্রকাশযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হলে কা[illegible] সে খবর ছাপা হয়। ডাক ও তার বিভাগ দ্রুত [illegible]সব খবর পাঠাবার বহু ব্যবস্থা করে রেখেছেন। Teleprint, Cablegram, Wireless ইত্যাদিতে নিত্য প্রতিমুহূর্তে দৈনিক সংবাদপত্রে খবর আসছে। স্থানীয় সংবাদের জন্য প্রতি সংবাদপত্রের নিযুক্ত লোকদের Staff-reporter বলে।

ছাপাখানার কাজ শেষ হবার পরে দেরিতে কোন জরুরী খবর এলে—ছাপা থামিয়ে কোন একস্থানে "Stop Press" হেডিং দিয়ে সে খবর ছাপানো হয়। এর মানে সর্বশেষে প্রাপ্ত সংবাদ।

যিনি সংবাদপত্রে ছাপানোর জন্য কোন প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠান তাকে বলে Contributor.

দৈনিক কাগজ মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসছে

সম্পাদকীয় স্তম্ভে যা ছাপা হয় তা যাঁরা লেখেন তাঁদের বলে Leader writer.

Printer হিসাবে যাঁর নাম ছাপা হয় তিনি সমুদায় মুদ্রণ সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য দায়ী থাকেন।

॥ বিশেষ ধরনের সংবাদ ॥

যুদ্ধ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিশেষ খবর সংগ্রহ করার জন্য প্রত্যেক সংবাদপত্র তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিকে সেইসব স্থানে পাঠায়। তারা নানা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ফটো তোলে আর নানা
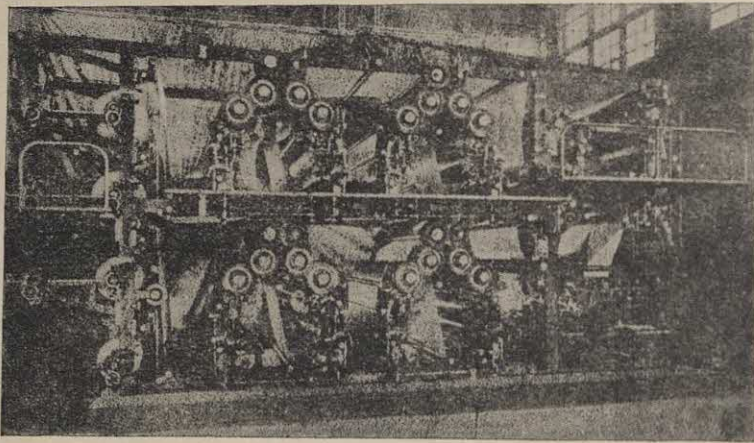
এটি সংবাদপত্র মুদ্রণের আধুনিক এক মুদ্রাযন্ত্র। ঘণ্টায় ৭৩০০০ কাগজ এতে ছাপা হয়। একদিকে কাগজের রোলে ৫ মাইল দীর্ঘ সংবাদপত্র ছাপার উপযোগী কাগজ পাকানো থাকে। ঘণ্টায় ১৪ মাইল বেগে মেসিন চলে ও কাগজ সরবরাহ হয়। এই যন্ত্র থেকে কাগজ ছাপা হয়ে কেটে ভাঁজ হয়ে দিস্তা হিসাবে গুণে পৃথক্ হয়ে বেরিয়ে আসে

খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করে পাঠায়। এইসব খবর ও ছবির Copyright থাকে। অন্য সংবাদপত্র যে সব ছবি বা খবর ছাপতে পারে না। ৮৩২ পৃষ্ঠায় দেখ কিভাবে যুদ্ধস্থলে সাংবাদিক যুদ্ধের ফটো তুলছেন। এ কাজ বড় বিপদের। এ কাজে অনেক সময় সাংবাদিকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। সাংবাদিককে বন্দীও করা হতে পারে। তবুও দুনিয়ার লোকের খবর সংগ্রহের চাহিদা মেটাতে এঁদের এ কাজ করতে হয়। এ ব্যাপারটি একটু ভাবলেই সহজে বুঝতে পারবে সাংবাদিকের কাজ যেমন বিপজ্জনক তেমনি জন-সংযোগমূলক।

অস্ত্র শস্ত্র

॥ মানুষ অস্ত্র-ব্যবহারকারী প্রাণী ॥

মানুষকে একজন ইংরেজ লেখক অস্ত্র-ব্যবহারকারী প্রাণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন (Man is a tool-using animal). বাস্তবিক অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া মানুষের শক্তি কি? হাতিয়ার ছাড়া মানুষ পিঁপড়ের চেয়েও অসহায়। অন্য জানোয়ারদের বল মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। তার উপর কারো আছে বড় বড় দাঁত, কারো আছে ধারালো নখ, কারো মাথায় শিং, কারো নাকের উপর খড়গ, কারো বা পায়ে শক্ত খুর, কারো বা দাঁতে আছে ভয়ংকর বিষ। কিন্তু মানুষের এমন একটা জিনিস আছে যা জন্তুদের কারো নেই। তা হচ্ছে মস্তিষ্ক বা মাথার ঘিলু। তার উপর তার হাতের আঙুল তার বশে।

মানুষ তার ঘিলুর সাহায্যে এমন সব অস্ত্র তৈরি করেছে যা জন্তুদের সব শক্তিকে আজ হারিয়ে দিয়েছে।

॥ হাতিয়ার প্রধানতঃ দুরকমের ঃ অস্ত্র আর শস্ত্র ॥

আদিম মানুষ দেখল যে পৃথিবীতে সে কত অসহায়! তার চারদিকে যেসব জন্তু তাদের একটার কবলে পড়লে তার আর উদ্ধার নেই। বাঁচতে হবে এদের হাত থেকে। সে লেগে গেল অস্ত্র তৈরি করতে। পাথর ঘষে ঠুকে ঠুকে সে এমন সব অস্ত্র তৈরি করল যা দিয়ে বন্য হিংস্র জন্তুদের ঘায়েল করা যায়। তাদের কতককে ত তার চাই খাদ্য হিসাবে, নইলে খাবে কি? তাদের মাংস আর বুনো ফলমূল ছাড়া ত তার প্রাণ বাঁচানই দায়!

রাত দিন চলতে লাগল অস্ত্র তৈরি। দুরকম অস্ত্র, এক হাতে ধরে লড়াই করার জন্য—তাকে বলা যেতে পারে শস্ত্র; আর যা ছুঁড়ে জন্তুদের মারা হত তার নাম দেওয়া যেতে পারে অস্ত্র।

আদিম মানুষ পাথর দিয়ে অস্ত্র তৈরি করছে

॥ প্রস্তর যুগের অস্ত্র ॥

প্রস্তর যুগে পাথর ছাড়া মানুষের আর কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। বড় বড় পাথর ছুঁড়ে মারা—আর তা থেকে ঘষে-মেজে, ফুটো করে নানা রকম হাতিয়ার তৈরি। সে সব পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে করতে তার মাথা খুলে গেল। কত বিচিত্র কাজের জন্যে কত অদ্ভুত সব হাতিয়ার সে তৈরি করতে লাগল।

পাথরে ফুটো করতে শিখে তার হাতল তৈরি করতে লাগল কাঠ দিয়ে। কাঠও কেটে-ছেঁটে সাইজ মত করতে হবে। তাই তৈরি করে বসল পাথরের বাইস বা কাঠ চাঁচার অস্ত্র।

॥ চকমকি আবিষ্কার ॥

পাথর ঘাঁটতে ঘাঁটতে, পাথর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন সে পেয়ে গেল চকমকি পাথর। এ পাথর ঠুকলে আগুনের ফুলকি বেরোয়। দৈবাৎ শুকনো পাতায় আগুন ধরে গেল চকমকির আগুন থেকে। মানুষ শিখে গেল আগুন জ্বালতে।

আগুনের উপকারিতা ক্রমশঃ সে বুঝল।

॥ আগুনের ব্যবহার ॥

সে দাবানল দেখেছে বনে। তাছাড়া বাজ পড়ে গাছ জ্বলতে দেখেছে। আগ্নেয়গিরি থেকে আগুন বেরুতে দেখেছে। তখন সে ভয় পেত, ছুটে পালাত। আজ সে আর ভয় পেল না। সে এই আগুনের নানা ব্যবহার শিখল। কাঁচা মাংস খাওয়া ছাড়ল। রান্না করতে শিখল। এইভাবে সে সভ্যতার সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠে গেল।

পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার পাথরের তৈরী হাত-কুড়ুলের ফলা

॥ ধাতু আবিষ্কার ॥

আগুনের ব্যবহার শিখে ক্রমশঃ সে তামার চুর পেল মাটি পোড়াতে পোড়াতে, তার পর পেল রাঙ্। তামার অস্ত্র বানালো, রাঙের অস্ত্র বানালো। আর দুটো মিশিয়ে বানালো ব্রোঞ্জের অস্ত্র। ব্রোঞ্জ তামার চেয়ে শক্ত। সে ব্রোঞ্জ নিয়ে মেতে উঠল।

ব্রোঞ্জের কত রকম হাতিয়ার সে তৈরি করে ফেলল। সেই সব হাতিয়ারের সাহায্যে পশু মারা চলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে থাকবার উপযোগী বাসস্থান তৈরি করতে লাগল কাঠ বাঁশ দিয়ে আর শীতাতপ নিবারণের জন্য তৈরি করতে লাগল পশুর চামড়ার পোশাক।

নানারকমের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র

॥ কৃষিকর্মের আবিষ্কার ॥

ইতিমধ্যে মানুষ পাথর বা ব্রোঞ্জের হাতিয়ার দিয়ে মাটি খুঁড়ে চাষ করতে শিখেছে। চাষ করতে শেখার ফলে সে আর বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় না। তার খাদ্য এখন তার চার পাশের জমিতে সে উৎপাদন করে নেয়। তাছাড়া সে কিছু পশুকে পালন করতে শিখেছে। তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, আবার দরকার পড়লে তাদের মাংসও খায়।
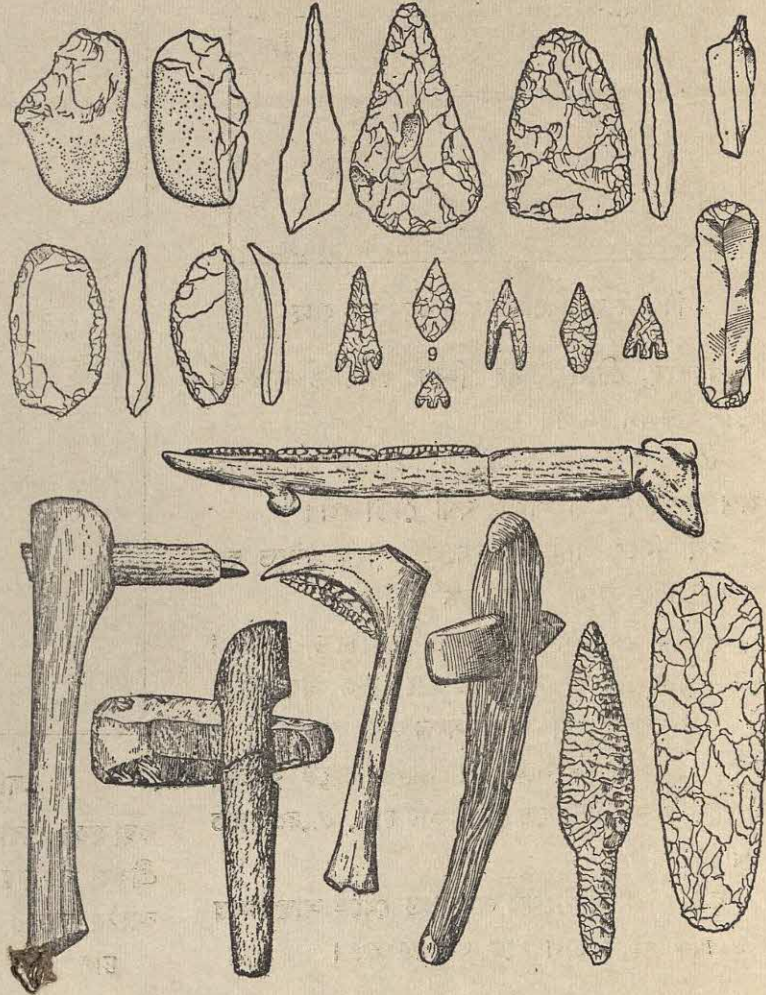
হাওয়াই দ্বীপে পাওয়া পাথরের বাইস

দলে দলে ভাগ হয়ে মানুষ এখন এক একটা ঘাঁটি গড়েছে। তাদের মধ্যে এক রকম সমাজও পত্তন হয়েছে। স্বার্থ তাদের বেঁধেছে এক এক জায়গায়।

॥ লৌহ আবিষ্কার ॥

যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার হাজার বছর আগেই মানুষ লোহা আবিষ্কার করে তা দিয়ে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে যুদ্ধবিগ্রহ চালানো, কৃষিকর্ম চালানো ও নানা ঘরকন্নার কাজ করতে শুরু করেছিল।
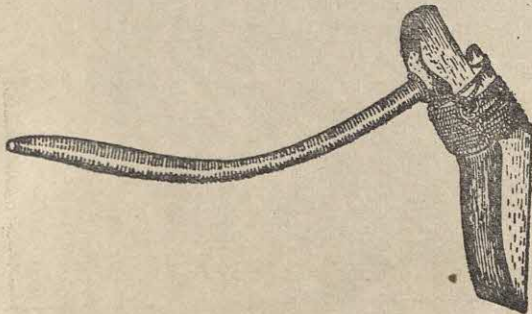
মিশরীয় কামারশালায় ধাতু ওজন করা হচ্ছে

মিশরে, গ্রীসে এসব নিয়ে রীতিমত কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এবার মানুষের চেষ্টা হল কি করে আরো দূরে অস্ত্র নিক্ষেপ করা যায়। বর্শা তৈরী হল।

বর্শা নিয়ে আদিম মানুষকে প্রায়ই ছুটতে হত অন্য দলের মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

ছবিতে দেখ দ্রুতগামী ক্যানুতে চড়ে অসভ্যরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে—সবাইয়ের হাতে ঢাল আর বর্শা।

পরের পাতার ছবিটিতে দলবদ্ধ হয়ে বন্যরা বর্শা ও ঢাল হাতে শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছে। আগেকার দলের হাতে গোলাকার ঢাল, এদের হাতে লম্বা ঢাল।

যুদ্ধের সময় বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এক হাতে ঢাল ধরে থাকতে হত।

॥ ঢালের কথা ॥

ঢাল এক রকম হাতিয়ার। এ ঢাল প্রথমে তৈরী হত পশুর শক্ত চামড়ায়। পরে কাঠের ঢাল ব্যবহার

গ্রীক আমলের কামারশালায় লোহা পিটিয়ে অস্ত্র তৈরী হচ্ছে
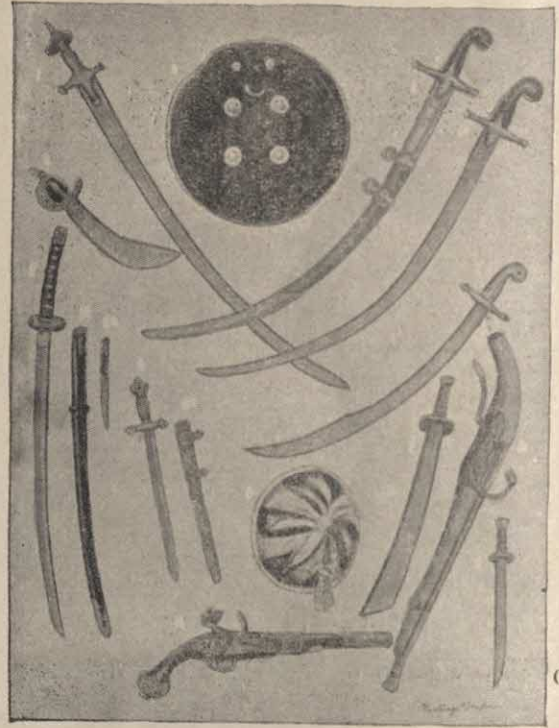
লোহার তৈরী নানারকম অস্ত্রশস্ত্র

করা হত। রোমানরা কাঠের ঢাল ব্যবহার করত কিন্তু গ্রীকরা ব্যবহার করত ব্রোঞ্জের ঢাল। রোমানদের কাঠের ঢালের উপর পশুর চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকত।

ঢাল ও মাথা বাঁচাবার জন্য শিরস্ত্রাণ ছিল সবচেয়ে পুরানো অস্ত্র।

॥ তীর-ধনুক ॥

শস্ত্র কতদূর ছোড়া যায় তার পরীক্ষা করতে করতে মানুষ তীর ধনুক আবিষ্কার করেছিল। আদিম

ক্যানুতে চড়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে

অবস্থায় এই তীর-ধনুক ছিল পশু শিকারের পক্ষে সবচেয়ে আবশ্যকীয় অস্ত্র। রামায়ণ ও মহাভারতে ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ হয়েছিল। গাণ্ডীবধনু, বিজয়ধনু, বৈষ্ণবধনু, অর্ধচন্দ্রবাণ, আঞ্চলিকবাণ, অন্তর্বাণ, ক্ষুর-প্রবাণ, নারাচ, নালিক, বরুণবাণ ইত্যাদি বহু বাণের উল্লেখ রামায়ণে ও মহাভারতে আছে।

অসভ্য মানুষ ঢাল ও বর্শা নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছে

বীরেরা বাণ মেরে ঝড়, বৃষ্টি ও আগুন উৎপাদন করতে পারতেন।

অর্জুনের ধনুর নাম ছিল গাণ্ডীব, শিবের ধনুর নাম ছিল পিনাক। এছাড়া ছিল শব্দভেদীবাণ—শব্দ শুনে যেখান থেকে শব্দ আসছে সেখানে বাণ মারতে পারতেন বীরেরা।

হরধনু ভঙ্গ করে রাম সীতাকে বিবাহ করেন। অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলেন।

পরশুরাম বিজয়ধনু দিয়ে ২১ বার পৃথিবী জয় করেছিলেন। রামের ব্রহ্মবাণ রাবণকে বধ করে আবার তূণে ফিরে এসেছিল।

অর্জুনের অস্ত্রগুরু ছিলেন দ্রোণ। অর্জুন দু হাতে বাণ নিক্ষেপ করতে পারতেন। তাই [illegible] অপর নাম ছিল সব্যসাচী।

গুহাচিত্রে তীর-ধনুক নিয়ে পশু শিকারের বহু প্রাচীন চিত্র আছে।

বন্য বালকরা তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করছে

একলব্যের তীর ছোঁড়ার অদ্ভুত কায়দার কথা মহাভারতে লেখা আছে।

সুইট্জারল্যাণ্ডের বীর তীরন্দাজ উইলিয়াম টেলের অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদ কিংবদন্তী হয়ে আছে। আশ্চর্য বীর রবিনহুডের তীর ছোঁড়ার অদ্ভুত কাহিনী আজ জগতের সকলের জানা।

গ্রীক বীর ইউলিসিসের ধনু ছিল আইবেক্স হরিণের শিঙ দিয়ে তৈরী। সেই ধনুক ইউলিসিস ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করতে পারতো না।

ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হয় তাতে লং-বো (long-bow) নামক একরকম দীর্ঘ ধনু ব্যবহার করা হয়েছিল। তার আগে ব্যবহার করা হত (cross-bow) ক্রশ-বো নামক ধনু। ক্রশ-বো'তে বাঁকানো দিকটার মাঝামাঝি একটা কাঠের নল আটকানো থাকে। তীর থাকে এই নলের মধ্যে। ধনুকের ছিলা টেনে ছেড়ে দিলে এই নলের মধ্য থেকে তীর বেরিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছয়।

লং-বো বা দীর্ঘ ধনু তৈরী হতে ক্রশ-বোর ব্যবহার উঠে যায়।

ক্রেশী, পইটিয়াস্ ও এজিনকোর্টের যুদ্ধে তীর ধনুকের ব্যবহার একচেটিয়া ছিল।

পণ্ডিতেরা বলেন যে ধনুকের জ্যা আকর্ষণ করতে যোদ্ধার ৪৫ পাউণ্ড ভার উত্তোলনের পরিশ্রম হয়।

এশিয়া মহাদেশ, পারথিয়া ও সিদিয়া ধনুর্বাণে দক্ষ ছিল।

রাজা জারেকসেসের সৈন্যবাহিনীতে বহু ভারতীয় তীরন্দাজ ছিল।

মুঘলরা ধনুর্বাণে এত দক্ষ ছিল যে তারা তীর মেরে বিপক্ষের অশ্বের খুর ক্ষতবিক্ষত করে তাদের খোঁড়া করে দিতে পারত।

তীর-ধনুক বহু শতাব্দী ধরে যুদ্ধের একমাত্র হাতিয়ার ছিল।

॥ তরোয়াল, বর্শা ইত্যাদি ॥

সম্মুখযুদ্ধে বীরেরা তখন তরবারি ও ঢাল ব্যবহার করত। সে সব তরবারি নানারকমের হত। ভারতের যোদ্ধারা বাঁকানো তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করত। বীরের কোমরে খাপ বা কোষের মধ্যে তরোয়াল ঝোলানো থাকত।

॥ ক্রুসেডারদের যুদ্ধ ॥

সপ্তম শতাব্দীতে স্যারাসীনরা প্যালেস্টাইন দখল করে। কিন্তু ইউরোপ থেকে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা জেরুজালেম অভিমুখে দলে দলে যেতে থাকে। তুর্কীরা তাদের উপর নানা অত্যাচার করত। এর ফলে প্রথম ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড) শুরু হয়।

১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন ইওরোপীয় রাজপুত্র একটি সেনাদল গঠন করে নাইটদের (বীরপুরুষদের) নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে কিছু কিছু স্থান পুনর্দখল করে। তুর্কীরা সেসব আবার কেড়ে নেয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সৈনিকদের ব্যবহৃত ক্রশ-বো

দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। ফ্রান্সের সপ্তম লুই এই যুদ্ধ চালান। কিন্তু এ যুদ্ধ নিষ্ফল হয়। (১১৪৭ খ্রীঃ)।

১১৮৭ খ্রীঃ সালাডিন আবার জেরুজালেম দখল করেন। তখন প্রথম রিচার্ডের নেতৃত্বে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। ১১৯২ খ্রীঃ স্যারাসীনদের সঙ্গে সন্ধি হয় ও তীর্থযাত্রীদের এই পবিত্র ভূমিতে তীর্থ করার সব বাধা দূর হয়।

লোহার বর্মপরা যোদ্ধা

এই ধর্মযুদ্ধের যোদ্ধারা এক রকম লোহার বর্ম পরতেন।

॥ টুর্নামেন্ট ॥

মধ্যযুগে সশস্ত্র ও বর্মপরিহিত নাইটরা প্রায়ই দ্বন্দ্বযুদ্ধ চালাত। ঘোড়ায় চড়ে বা মাটিতে দাঁড়িয়ে তারা এই সব যুদ্ধ চালাত।

বর্শা বা তরবারি নিয়ে এই সব যুদ্ধ হত। এই যুদ্ধ দেখবার মঞ্চে বহু দর্শক জমায়েত হত। এই যুদ্ধে জিতলে বিজেতার নাম চতর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত।

ক্রুসেডারদের যুদ্ধ

রেড ইণ্ডিয়ানরা এই ভাবে ল্যাসোর সাহায্যে বুনো ঘোড়া ধরত।

[রেড ইণ্ডিয়ানরা এই ভাবে ল্যাসোর সাহায্যে বুনো ঘোড়া ধরত।]

কলম্বাসের আগে ইওরোপের লোকেরা আমেরিকার কথা জানত না। কলম্বাস ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্য বেরিয়ে আমেরিকায় গিয়ে পেঁছান। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি ভারতবর্ষ অর্থাৎ ইণ্ডিয়ায় পেঁছেছেন। সেখানকার আদিম অধিবাসীদের গায়ের রং ছিল লাল। তাই থেকে বিদেশীরা তাদের রেড ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত করতে থাকে। রেড ইণ্ডিয়ানরা বর্তমানে সংখ্যায় কমে গেলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশে বাস করে।

ল্যাসো (Lasso) হচ্ছে এক রকম ফাঁস-ওয়ালা দড়ি। রেড ইণ্ডিয়ানরা এই ল্যাসো ছুড়ে দিত। সেই ল্যাসোর ফাঁস বুনো ঘোড়ার গলায় আটকে যেত। ঘোড়া ছুটে পালাতে গেলে তার গলায় সেই দড়ি নিবিড়-ভাবে আটকে যেত। তারপর শক্তিশালী রেড ইণ্ডিয়ানরা সকলে মিলে ঘোড়াকে ধরে ফেলত। পরে তারা সেই ঘোড়াকে বশ মানাত।

ল্যাসোর সাহায্যে ঘোড়া ইত্যাদি নানা বুনো জন্তু ধরবার প্রথা আমেরিকার নানা দেশে আজও প্রচলিত আছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এক দল রেড ইণ্ডিয়ান বুনো ঘোড়া ধরতে বেরিয়েছে। একজন অশ্বারোহী রেড ইণ্ডিয়ান এক বুনো ঘোড়াকে লক্ষ্য করে ল্যাসো ছুড়ে দিয়েছে।

মধ্যযুগের টুর্ণামেণ্ট

প্রথম প্রথম টুর্ণামেণ্ট ছিল নকল যুদ্ধ। এতে নানা রকম কৌশল দেখানো হত। মধ্যযুগে এই টুর্ণামেণ্টে বীরত্ব দেখানো হত। এর নানা রকম নিয়ম-কানুন ছিল। একজন যোদ্ধা (Knight) অপর সকলকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতেন। তিনি তাঁর হাতের বর্ম (gauntlet) ছুড়ে দিতেন। যে যোদ্ধা সেটা কুড়িয়ে নিত তাকেই এই আহ্বানকারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত। এসব যুদ্ধ মোটেই রক্তপাতহীন হত না। অনেক সময় একজনের মৃত্যুও ঘটত।

একজন মহিলাকে সৌন্দর্য ও ভালবাসার রানী করা হত। বিজয়ী যোদ্ধার মাথায় তিনি মুকুট পরিয়ে সম্মানিত করতেন।

১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই জাতীয় টুর্ণামেণ্ট উঠে যায়।

টুর্ণামেণ্টের যোদ্ধারা নানা রকম বর্ম পরে যুদ্ধ করতেন।
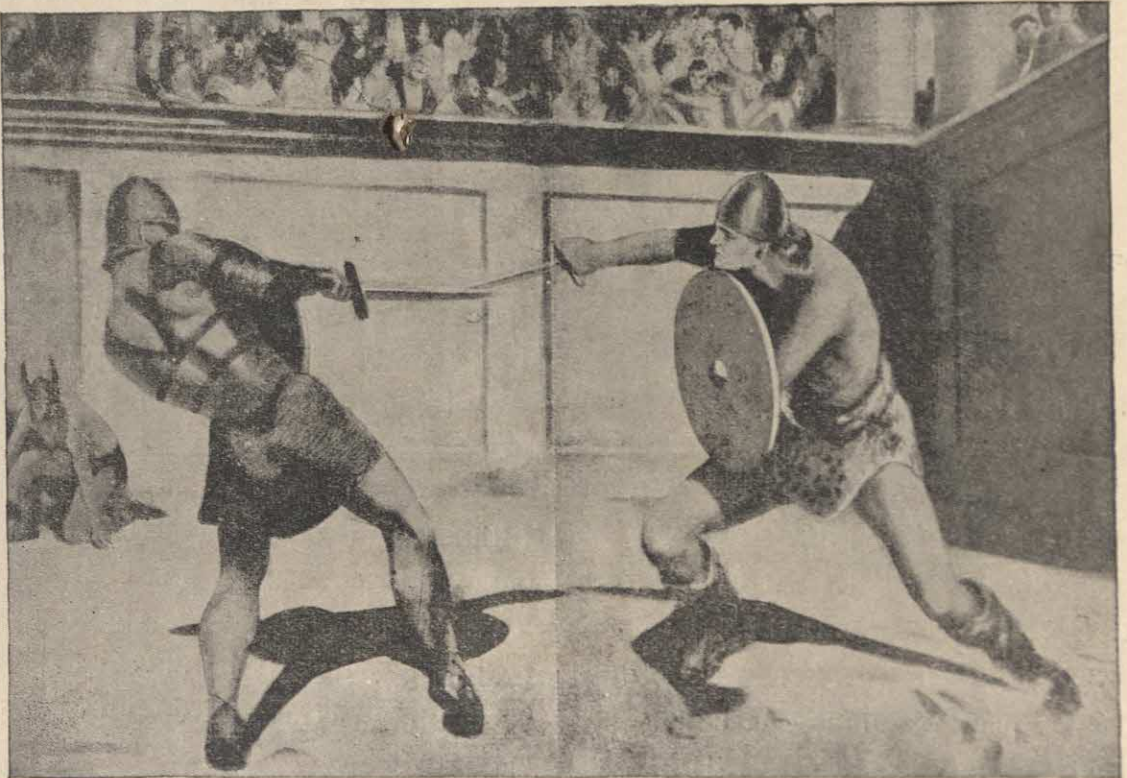
মাটিতে দাঁড়িয়ে নাইটরা টুর্ণামেণ্ট লড়ছে
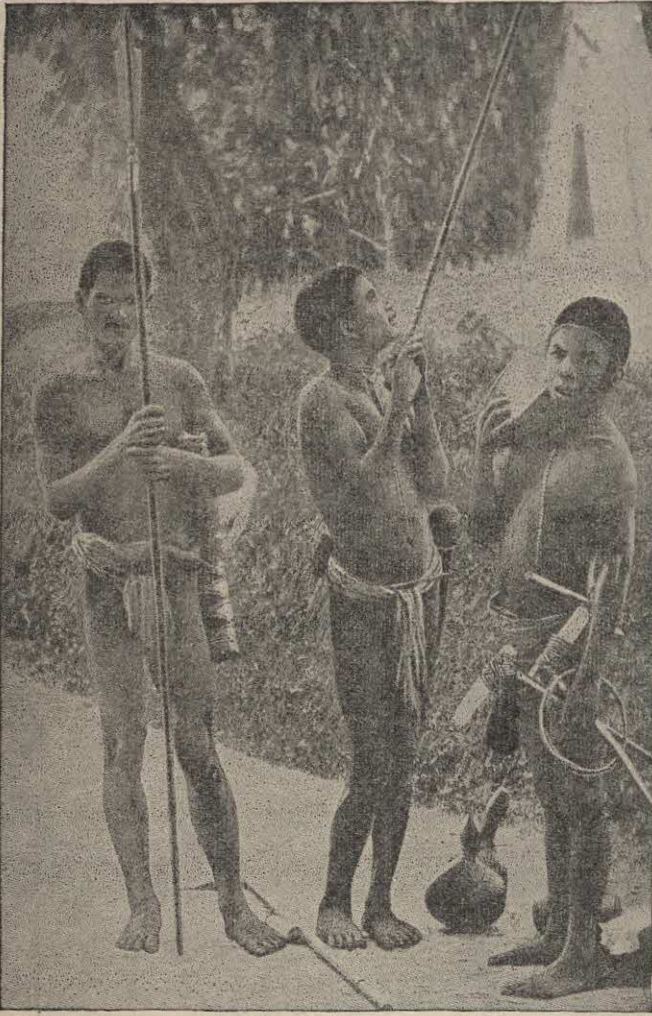
অসভ্যরা তাদের আদিম অস্ত্র নিয়ে বনে বনে পাখি শিকার করছে

॥ অসভ্য মানুষদের অস্ত্রশস্ত্র ॥

সভ্য মানুষরা অস্ত্রশস্ত্রে প্রচুর উন্নতি করলেও আদিম মানুষরা বনে বনে তাদের সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই শিকার করে বেড়াত। নল ইত্যাদি থেকে তীর ছুড়ে তারা পাখি ও জন্তু শিকার করত।

এজন্য বনে বনে তারা ঘুরে বেড়াতো শিকারের সন্ধানে। তাদের তীর-ধনুক ছিল, বর্শা ছিল আর ছিল হরেক রকম অস্ত্র ও কৌশল। এসব ব্যাপারে তারা সহজে আদিম অস্ত্র ত্যাগ করত না। দিন দিন তারা একই অস্ত্র ব্যবহারে খুব পটু হয়ে উঠত।

সভ্য মানুষদের কাছে শিকার একটা খেলা কিন্তু এদের কাছে এটা একটা বাঁচবার উপায়। শিকার না করলে এদের অনাহারে থাকতে হত। তাই শিকার ছিল তাদের পেশা বা জীবিকা।

ব্যাধজাতীয় মানুষরা এই কাজ করে জীবিকা অর্জন করত। তাদের অস্ত্রশস্ত্র যেমন বিচিত্র ছিল—তেমনি বিচিত্র ছিল তাদের কৌশল।

জন্তু মারার চেয়ে জন্তু ও পাখি ধরায় তারা ছিল ওস্তাদ। কত রকমের ফাঁদ ও ফাঁস তারা পাততে জানত!

॥ পশুপাখি ধরার কয়েকটি আজব কায়দা ॥

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা একরকম কাঠের বাঁকানো অস্ত্র ব্যবহার করত। তার নাম ব্যুমেরাং। এর মধ্যে ধাতুর ফলা লাগানো থাকত। লক্ষ্য করে কোন জন্তুর উদ্দেশ্যে সেটা ছুড়ে মারলে তা সেই জন্তুকে আহত করে আবার নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসত।

'ল্যাসো' নামক একরকম শক্ত দড়ির ফাঁস লটকে আমেরিকার লোকেরা বুনো ঘোড়া ধরত। তেমনি কৌশলে গাছে চড়া লিমার ইত্যাদিকেও কৌশলী সাহসী শিকারীরা ধরে ফেলে। ফাঁসে আটকা পড়ে জন্তুটা নির্জীব হয়ে পড়লে ওরা তাকে কায়দা করে।

এ ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকায় ইণ্ডিয়ানরা রিয়া (Rhea) পাখি ধরার জন্যে দুটো বল লাগানো একরকম ফাঁস ব্যবহার করত। তাকে বলে 'বোলা'। ঘোড়ায় চড়ে এই বোলা কায়দা করে ছুড়ে দিলে বল দুটি রিয়া পাখির গলায় জড়িয়ে যায়। তখন আর সে উড়ে পালাতে পারে না।

ল্যাসো ছুড়ে লিমার ধরছে

আধুনিক হারপুণ হাতে তিমি-শিকারী

রিয়া পাখি আকৃতিতে বিরাট। এর পালক খুব নরম।

ল্যাসো ছুড়ে হরিণ ধরছে

ল্যাসোর ফাঁস দিয়ে জন্তু জানোয়ার ধরার কৌশল বহু অভ্যাসে শিখতে হয়। যে ল্যাসো ছোড়ে তার শরীরে বেশ বল থাকা দরকার। জন্তুটা ফাঁসে আটকালে প্রথমটা সেটা মরণ পণ করে পালাবার চেষ্টা করে। ভীষণ জোরে টানাটানি করে। কিন্তু একটু বাদেই ফাঁসটা যখন গলায় লেগে ধীরে ধীরে তার শ্বাসরোধ করে তখনই সে কাবু হয়ে পড়ে। সেই সময় শিকারী তাকে কায়দা করে। তার পায়ে দড়ি বেঁধে এমন অবস্থা করে যে তার আর পালাবার পথ থাকে না।
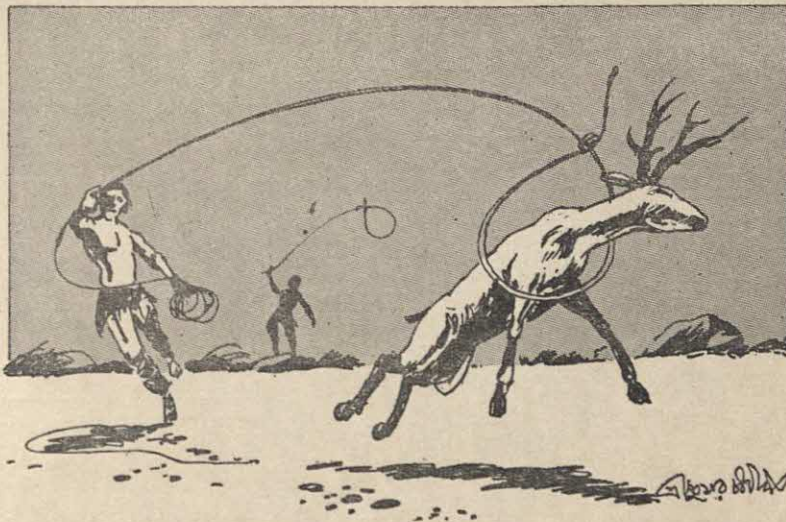
আদিম মানুষরা তীর নিয়ে শিকারে বেরিয়েছে

তিমি জলের প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ। তিমির শক্তিও ভীষণ। এক ধাক্কায় নৌকো ত ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে, অনেক সময় জাহাজকেও ঘায়েল করে দেয়।

এই তিমি ধরার জন্যে প্রথমে পিছনে শক্ত দড়ি বাঁধা তীরের ফলা ব্যবহার করা হত। নৌকা থেকে তিমিকে লক্ষ্য করে চারদিক থেকে হারপুণ ছোড়া হত। অনেক হারপুণ তিমির পিঠে বিঁধলে তাকে চারদিক থেকে টেনে এনে ঘায়েল করা হত।

বর্তমানে কামান থেকে হারপুণ ছোড়া হয়। এই হারপুণের মাথায় থাকে বিস্ফোরক। তিমির শরীরে সেটা ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তিমির মৃত্যু ঘটায়। এই নতুন ধরনের হারপুণ আবিষ্কার করেন স্বেন ফয়েন (Sven Foyne) নামক একজন নরওয়েবাসী (১৮৭০ খ্রীঃ)।

॥ বারুদ আবিষ্কার ॥

তারপর বারুদ আবিষ্কারের পর অস্ত্রশস্ত্রে এল এক নবযুগ। ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্তাম্বুলে গ্রীক অগ্নি (Greek Fire) নামে এক রকম অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল। এই আগুন শত্রুপুরীতে পাঠিয়ে সর্বত্র আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। কি করে তা শত্রুপুরীতে পাঠানো হত তা আজো অজ্ঞাত।

১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের রোজার বেকন বারুদের সঠিক সূত্র বার করলেন।

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী ব্যুমেরাং ছুড়ে মহিষ মারছে

আধুনিক যুদ্ধে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে একযোগে চালানো হচ্ছে আক্রমণ

বোলা ছুড়ে উট পাখি ধরছে

সেকালের কামান

১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের Black Prince ফরাসীদের বিরুদ্ধে ক্রেসীর যুদ্ধে তিনটি কামান ব্যবহার করেছিলেন।

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ কনস্ট্যান্টিনোপলে ৬৮টি কামান একত্র করেছিলেন। সবচেয়ে ভারী কামানটা বয়ে নিয়ে যেতে ৬০টি ষাঁড় আর ২০০ লোকের সাহায্যের দরকার হয়েছিল।

যুদ্ধে বারুদ ব্যবহার এক বিরাট সমস্যার সমাধান করে সমগ্র যুদ্ধ-ব্যবস্থা একেবারে পরিবর্তিত করে দিল।

এই নতুন বস্তুটির সন্ধান পেয়ে মানুষ নিত্য নতুন যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করতে লাগল।

বোমাবর্ষী যুদ্ধবিমান থেকে বোমা বর্ষণ হচ্ছে
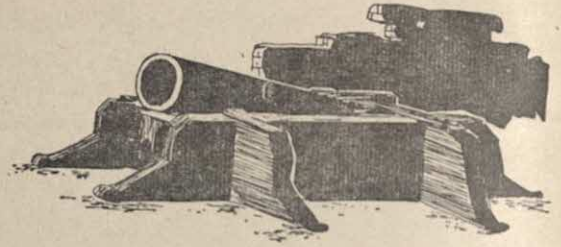
॥ আধুনিক যুদ্ধ ॥

সেকালের যুদ্ধ ছিল ছলে, বলে ও কৌশলে শত্রু-সংহার। তাতে ন্যায় ছিল না, ছিল না কোন নীতি। তখনকার নীতি ছিল 'জোর যার, মুল্লুক তার'। প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা। দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ।

তারপর মধ্যযুগে এল নিয়মকানুন, সম্মুখ সমর। শত্রুর সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ। তার নানারকম নিয়মও হল। বীররা হাতাহাতি যুদ্ধ করতেন। তরোয়াল বা বর্শা নিয়ে বিক্রম দেখাতেন। অন্যায় সুযোগ নিতেন না।

কিন্তু আধুনিক যুগের যুদ্ধ হল বৈজ্ঞানিক। কামান বন্দুক ইত্যাদি হাজারো মারণাস্ত্র তৈরী হল। উদ্দেশ্য শত্রুকে ঘায়েল করা—দুর্বল করা। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যুদ্ধ চলে আধুনিক কালে।

আধুনিক কালে পর পর দুটি বিশ্ব-সমর হয়ে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কত নতুন অস্ত্র তৈরী হয়েছে। কামানের দূরত্ব বেড়েছে, আকাশ থেকে বোমা-বৃষ্টি করেছে এরোপ্লেন, ভাসমান মাইন, ডুবোজাহাজ কত কী!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তৈরী হয়েছে U-boat, V_2, হাইড্রোজেন বোমা, অ্যাটম বোমা।

এখনও অস্ত্র তৈরী থামে নি। পৃথিবীর দুই মহা শক্তিশালী দেশ আমেরিকা ও রাশিয়া

কেবলি নতুন নতুন মারণাস্ত্র তৈরি করে চলেছে।

॥ আমেরিকার কয়েকটি শক্তিশালী মারণাস্ত্র ॥

অ্যাসবারি পার্ক (Asbury Park), নিউ জার্সির ওয়াল্টার রীড় নামক এঞ্জিনীয়ার 'উভচর বিমান' (flying submarine) মারণাস্ত্রটি উদ্ভাবনে সাহায্য করেছেন। এটির নাম 'উড়ন্ত ডুবো-জাহাজ'ও দেওয়া যায়। রীড এই আট মিটার যন্ত্রটিকে ২৫ মিটার উর্ধ্বতায় চালাতে পেরেছেন। এটা যে কোন মুহূর্তে জলে ডুবে ডুবোজাহাজের মত চলতে পারে আবার ইচ্ছামাত্র একে আকাশপথে উড়ানো যায়।
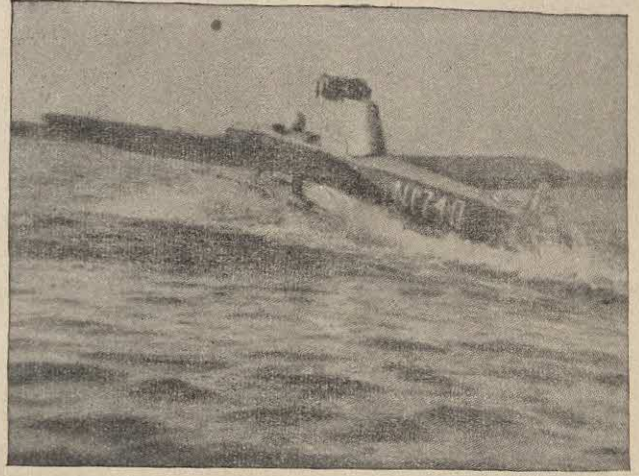
উভচর বিমান। ইহা জলে ও আকাশে চলে। (ফ্লাইং সাবমেরিণ)

আমেরিকার নূতনতম বিমানবাহী জাহাজ

এর নাম ইউ. এস্. এস. নিমিজ (Nimitz). ভার্জিনিয়ার নিকটবর্তী নিউপোর্ট নিউজ্ থেকে একে উড়িয়ে দেখানো হয়েছিল। আমেরিকার নৌবিভাগে এটাকে নেওয়া হয়েছে। এটি এই জাতীয় যুদ্ধাস্ত্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র।

বোমারু বিমান নানাদিক থেকে, নানা উচ্চতা থেকে আক্রমণ চালাতে পারে। ক্ষেপণাস্ত্র তা পারে না। বোমারুগুলি একবারের অভিযানে অনেকগুলি লক্ষ্যস্থলের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। এরা নানারকম অস্ত্রও বহন করতে পারে। লক্ষ্যস্থল এরা খুঁজে নিতে পারে। স্থলবাহিনীকে সাহায্য করা এদের অন্যতম কাজ।
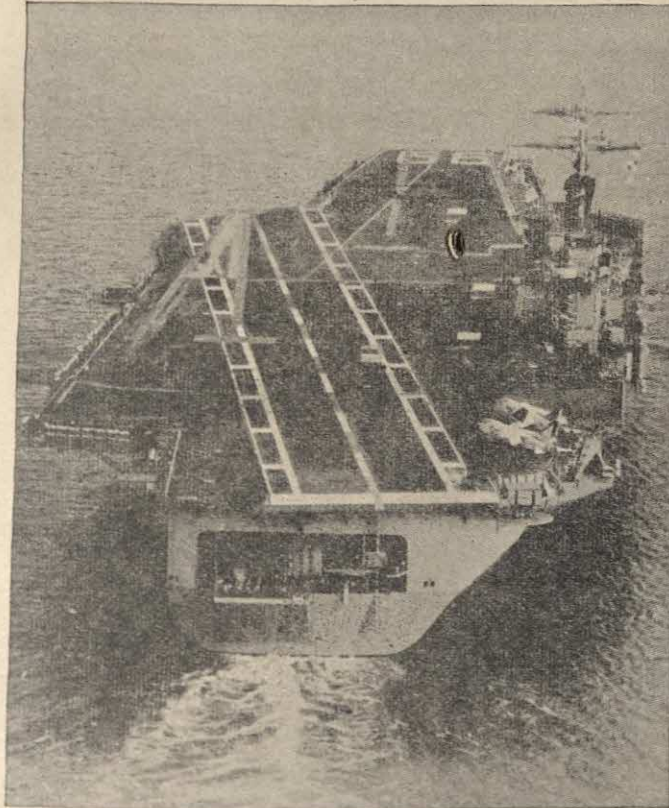
নতুন এরোপ্লেন ধ্বংসী হারপুণ যন্ত্রটির উন্নতি করেন আমেরিকান নৌবিভাগের ম্যাকডোনেল ডগলাস। এই হারপুণ ভাসমান যুদ্ধ জাহাজ, ডুবো জাহাজ বা উড়ো জাহাজ থেকে ছোড়া যায়। এর মত মারাত্মক অস্ত্র খুব কম আছে।

ভয়ংকর ড্রাগন—ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী
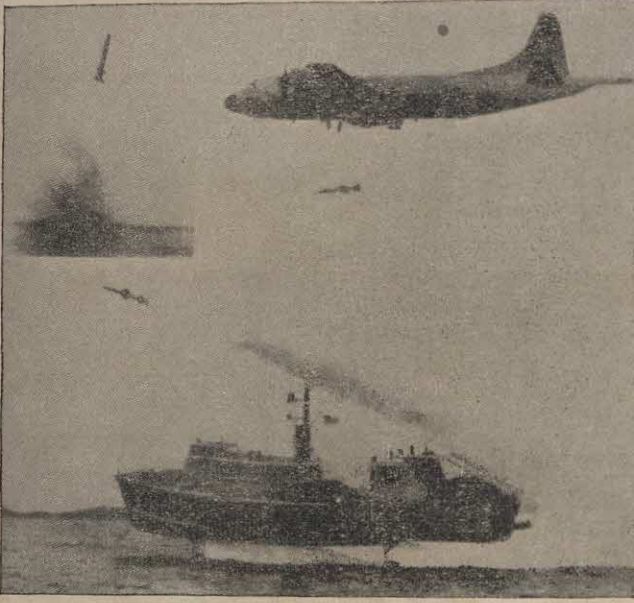
আমেরিকার সর্বাধুনিক যুদ্ধবিমান ও যুদ্ধজাহাজ

তারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই যুদ্ধাস্ত্রটি অতি মারাত্মক। চলন্ত বা অচল লক্ষ্যবস্তুকে ১০০০ মিটার দূর থেকে এ ঘায়েল করতে পারে। যে কোন বর্ম বা বাধা এ ভেদ করে যেতে পারে।

আমেরিকার আরেকটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হল ৬৪৭ কৃত্রিম উপগ্রহ। হাজার হাজার মাইল উপরে অবস্থান করে এই উপগ্রহ ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া বা কৃত্রিম উপগ্রহ ছোড়ার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে। যুদ্ধে এর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য।

॥ আধুনিক রাশিয়ান অস্ত্রশস্ত্র ॥

আমেরিকা যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় প্রচুর উন্নতি করেছে, রাশিয়াও সে দিক দিয়ে পিছিয়ে নেই।

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে রাশিয়ার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিশারদরা রাতদিন মাথা খাটাচ্ছে। নকলগ্রহ আসলে অস্ত্র ছোড়বার ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হবার উপযোগী। সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দেবার মত যুদ্ধাস্ত্র রাশিয়ারও কম নেই।

এখন চলছে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা—কে সকলকে টেক্কা দিতে পারে! হায়, দুর্বলজাতরা আজ ভয়ে দিশেহারা।

যুদ্ধ মানুষের একটা আদিম প্রবৃত্তি। সভ্য মানুষ এই যুদ্ধ এড়িয়ে চলবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কিন্তু তবু যুদ্ধ আমাদের উপর এসে পড়ছে। সেই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে যুদ্ধের জন্য তৈরী থাকাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে Preparedness for war is the best security of peace. তাই সারা বিশ্বে যুদ্ধের জন্য এত তোড়জোড়।

তারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ড্রাগন ট্যাঙ্ক. ধ্বংসকারী আমেরিকার যুদ্ধাস্ত্র

আগেকার দিনের ঘোড়ায়-টানা দমকল

দমকলের কথাঃ

(আগেকার দিনের ঘোড়ায়-টানা দমকল)

আজকাল কোথাও আগুন লাগলে দমকলের লোকজন গাড়ি নিয়ে আগুন নেভাতে যায়। রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ি চলে তখন ঘণ্টা বাজতে থাকে। সেই ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনে লোকে বুঝতে পারে, কোথাও আগুন লেগেছে, দমকলের লোকজন আগুন নেভাতে চলেছে। সকলে তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দেয়।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আগেকার দিনের দমকলের লোকেরা আগুন নেভাতে চলেছে। তাদের গাড়ি টানছে দুটি ঘোড়া।

মেরিওয়েদার (Merryweather) লণ্ডনের এক নাম-করা পরিবারের লোক। তিনি ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে দমকলের সাহায্যে আগুন নেভানোর প্রথা চালু করেন। তিনি সমাজসেবার জন্যে নিজের টাকাতেই এই কাজ চালান। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দেও দেখা যায়, ওই পরিবারের লোকেরাই দমকল চালু রেখেছেন। গভর্নমেণ্ট সেই প্রথা তখনও মেনে নেন নি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে গভর্নমেণ্ট দমকলের সাহায্যে আগুন নেভানোর প্রথা মেনে নেন।

কয়েকটি আধুনিক রাশিয়ান যুদ্ধাস্ত্র
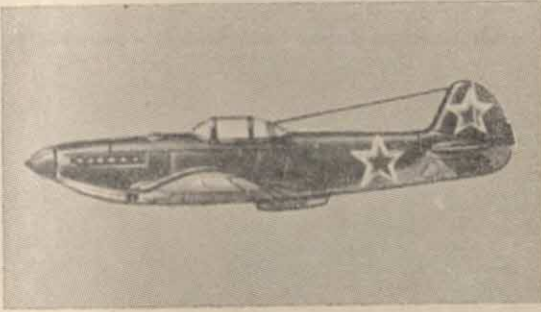
'ইয়াক—৩' ফাইটার এরোপ্লেন
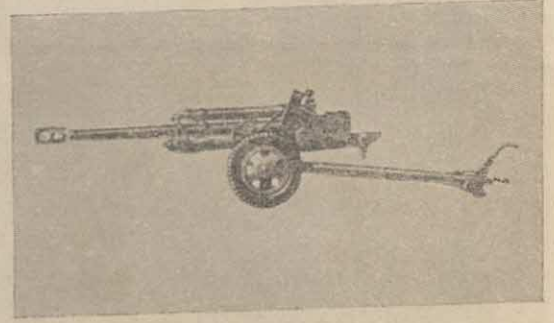
১৯৪২ মডেলের ৭৬ মিলিমিটার কামান
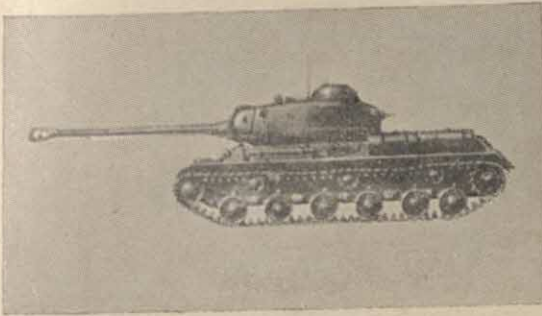
'ই. এস.—২' ভারী ট্যাঙ্ক
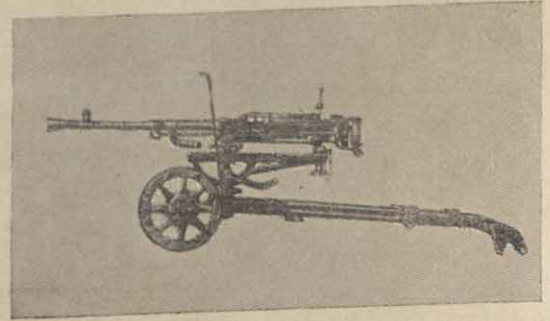
হাতে বহনযোগ্য আগ্নেয়াস্ত্র—গরিউনোভ মেসিনগান

আণবিক যুগের যুদ্ধ-কুঠার

॥ আগুন মানুষের বন্ধু ও শত্রু ॥

আগুন কি করে জ্বালতে হয় তা আবিষ্কার করতে মানুষের অনেক কাল লেগেছিল। প্রথম প্রথম তারা আগুন দেখে দারুণ ভয় পেত। বাজ পড়ে আগুন জ্বললে তারা ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাত। তার উপর যখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হত তখন ত তাদের ভয়ের সীমা-পরিসীমা থাকত না! মাঝে মাঝে বনের বড় বড় গাছের ডালে ডালে ঘষা লেগে দাবানল জ্বলত। এসব দেখে মানুষ ভয় পেত। কি করে কি হয় তা নিয়ে মানুষ ক্রমশঃ ভাবতে শিখল। তারপর ব্যাপার বুঝে আগুন জ্বালতে শিখল। তখন তারা রান্না করে খাবার খেতে লাগল আর রাতের অন্ধকারে আলোও জ্বালতে শিখল।

কিন্তু আগুন তাদের শত্রু একথাও তাদের বুঝতে বেশি দেরি হল না। আগুন যেমন উপকার করে আবার তেমনি অপকারও করে। হঠাৎ আগুন লেগে ঘর-বাড়ি জিনিসপত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

॥ কারফিউ বা আগুন নেভাবার আইন ॥

ইংলণ্ডে এক সময়ে সব বাড়ি কাঠের তৈরী ছিল। এই সব কাঠের বাড়িতে প্রায়ই আগুন লাগত। তাই একটা আইন করে দেওয়া হল যে সন্ধ্যা ছ'টা হলেই বাড়ির সব আলো নিভিয়ে রাখতে হবে। সময় জানাবার জন্যে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হত। এই ঘণ্টার নাম কারফিউ (curfew). এই সাবধানতার দরকার ছিল। লোক আগুন জ্বেলে ঘুমিয়ে পড়লে সেই আগুনে ঘর-বাড়ি পুড়ে যেতে পারে। এজন্য সরকার নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা নিলেন। উইলিয়াম দ্য কঙ্কারারের (১০২৭-৮৭ খ্রীঃ) আমলে এই বিধান হয়েছিল।

এত সব সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও লণ্ডন শহরে ১৬৬৬ সালে ব্যাপক এক অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত। এক রুটিসেঁকার দোকান (Bakery) ছিল পুডিং লেনে। সেখান থেকে আগুন বিস্তার লাভ করে ৪০০ রাস্তায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সরকারী হিসেবে ১৩,২০০ বাড়ি পুড়ে যায়। কত গির্জা পুড়ল, কত বাজার-হাট,
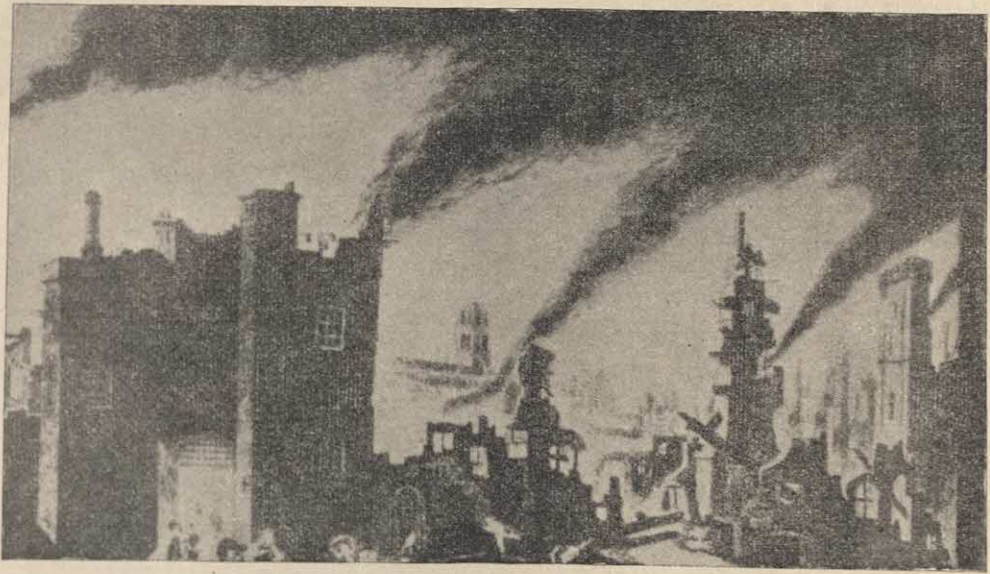
লণ্ডনের বিরাট অগ্নিকাণ্ড

আর জেলখানাই না পুড়ল! আগুন শহরের মধ্যে ৩৭৩ একর এলাকার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল আর শহরের বাইরে ৬৩ একর এলাকায়। ২ লক্ষ লোক এর ফলে গৃহহারা হয়েছিল। কত যে সম্পত্তি পুড়ে ছাই হয়েছিল তার হিসেব নেই।

॥ দমকলের ইতিহাস ॥

দু হাজার বছর আগে রোমে আগুন নেভাবার জন্যে ব্যবস্থা ছিল। রাস্তায় রাস্তায় রাতে লোক খুঁজে বেড়াতো কোথায় আগুন লেগেছে। তাদের বলা হত নকটার্নস (nocturnes)। তারা আগুন দেখলেই চিৎকার করে সংকেত করত। অন্যান্য সবাই আগুন-লাগা বাড়িতে এসে জুটত। তারপর গাড়ি আসত আগুন নেভাতে আর সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হত অনুসন্ধানী। এর কাজ কি করে আগুন লাগল তার বিবরণ সংগ্রহকরা। যার দোষ বা অসাবধানতার ফলে আগুন লাগত তাকে সরকার শাস্তি দিতেন।

মধ্যযুগে আগুন নেভাবার দায়িত্ব নেয় অগ্নিবীমাকারী কোম্পানিগুলি। আগুন লেগে সম্পত্তি নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ করতে হত এই সব বীমা কোম্পানিদের। তাই যাতে না আগুন লাগে তা তারা দেখত এবং আগুন লাগলে সম্পত্তির ক্ষতি নিবারণ করার জন্য তাদেরই ব্যবস্থা করতে হত।

নিউ অ্যামস্টারডামে পিটার স্টুভেসাণ্ট নামে একজন লোক মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে একটি অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে বালতি, মই, হুক ইত্যাদি সরঞ্জাম সর্বদা প্রস্তুত থাকত। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বোস্টন শহরে তেরজন বেতনভোগী অগ্নি-নির্বাপক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ার বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলীন 'ইউনিয়ান ফায়ার কোম্পানি' নামে একটি অগ্নিনির্বাপক সংস্থা গঠন করেছিলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এই ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। পাম্পযন্ত্রের শক্তি কি করে বাড়ানো যায় সে বিষয়ে গবেষণা চলতে থাকে, মোটর ট্রাকের ব্যবহার করা হয় আগুন-লাগা অঞ্চলে দ্রুত নির্বাপক দলকে নিয়ে যাবার জন্যে আর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারে কি করে দ্রুত আগুন নেভানো যায় তারও ব্যবস্থা শুরু হয়। এ ছাড়া অগ্নি নির্বাপক দলের কর্মীদের জন্য fire-proof পোশাকেরও ব্যবস্থা করা হয়।

॥ দমকলের ব্যবস্থা ॥

আগুন লাগলে সেটা যদি আগে-ভাগেই শীঘ্র নেভানো না যায় ত সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মানুষ পোড়ে, কত টাকার সম্পত্তি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। সভ্য মানুষ এত ক্ষতি সহ্য করতে পারে না। তাই অনেকদিন ধরেই মাথা খাটিয়ে আগুন তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলার ব্যবস্থার কথা মানুষ ভাবতে আরম্ভ করেছিল।

এজন্যে শিক্ষা চাই, অভিজ্ঞতা চাই, সাহসও চাই। আর চাই কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান। এই সব শিক্ষা দিয়ে, সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে দল তৈরি করা বড় সহজ কথা নয়। দমকল বাহিনী সেই শক্ত কাজটা করতে পেরেছে। এ দলের কাজ শুধু আগুন নেভানো নয়, অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে আটক শিশু, নারী ও অসহায় লোকদের উদ্ধার করাও বটে।

দমকল বাহিনীর গাড়ি এসে অগ্নিকাণ্ড সামলাচ্ছে

॥ দমকলের গাড়ি ॥

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে বীমা কোম্পানিগুলো আগুন নেভাবার ব্যবস্থা করত। তখন ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে অগ্নি-নির্বাপক দল সাজ-সরঞ্জামসহ আগুন নেভাতে যেত। তারপর 'দি লণ্ডন ফায়ার এঞ্জিন এস্টাবলিশমেণ্ট'-এর পত্তন হয়। এর পরে 'ফায়ার-ব্রিগেড' স্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে ফায়ার ব্রিগেডের (দমকল বাহিনী) কাজ খুব দ্রুত উন্নত হয়ে উঠেছে। এখন মোটর গাড়ি হয়েছে। এ গাড়ির সাজ-সরঞ্জাম আলাদা। এতে দীর্ঘ হোস পাইপ থাকে, লোহার ভাঁজ-করা মই থাকে। সব অগ্নিনির্বাপক দলটি বিশেষ ধরনের fire-proof পোশাকে সজ্জিত থাকে। তাদের মুখে বিশেষ ধরনের তৈরী মুখোশ আঁটা থাকে।

বর্মপরা দমকল বাহিনীর লোক

॥ পল্লী-অঞ্চলে আগুন নেভাবার ব্যবস্থা ॥

শহরে শহরে দমকল বাহিনী থাকে।

কিন্তু গ্রামে ত এ সব থাকে না। সেখানে দমকলের গাড়ি চালাবার মত রাস্তা-ঘাটও নেই। অথচ সেখানে ত প্রায়ই আগুন লাগে।

সেখানে অধিকাংশ মাটির বাড়ি। সে সব বাড়ির খড়ের, গোলপাতার বা উলু ঘাসের চাল। কাঠ বাঁশ দিয়ে সে সব বাড়ি তৈরী। তার উপর এক এক পাড়ায় লাগালাগি ঘেঁষাঘেঁষি বিস্তর বাড়ি। একটা বাড়িতে আগুন লাগলে সব পাড়াটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কাজেই আগুনের ভয় ওদের খুব। ঘরের চাল ছাওয়া হলে ওরা ঘটি ঘটি জল ঢেলে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ও পূজা ও নৈবেদ্য দেয়।

তবুও গৃহস্থের অসাবধানতার ফলে এখানে মাঝে মাঝে আগুন লাগে। তখন পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক ছুটে আসে সে আগুন নেভাতে। লোক আসে বালতি, কলসী, হাঁড়ি ইত্যাদি নিয়ে। কাছাকাছি পুকুর থেকে জল তুলে তারা হাতফিরি করে সেই জল লাইন বন্দী হয়ে পর্যায়ক্রমে বয়ে নিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করে। মই দিয়ে কাছাকাছি বাড়ির চালে উঠে জল ঢেলে চাল ভিজিয়ে দেয়, যাতে সে বাড়িতে আগুন না লাগতে পারে। অনেক সময় পাশের বাড়ির চাল কেটে নামিয়েও দেয়। এতে সে সব বাড়ি আগুনের হাত থেকে বেঁচে যায়। পল্লী

পল্লীগ্রামে আগুন নেভানো

অঞ্চলে আগুন নেভাবার উদ্যম দেখলে মনে হয় মানুষের সহযোগিতায় কী না হতে পারে।

॥ শহরে আগুন লাগলে কি করতে হয় ॥

শহরের রাস্তার ধারে লাল একটা করে থাম্বা থাকে! এগুলো অনেকটা চিঠি ফেলার বাক্সের মতো। এর সামনে একটা গোল কাচ লাগানো থাকে। ভিতরে একটা হাতল দেখা যায়। এই থামের সঙ্গে দমকল অফিসের যোগ আছে। তারা জানে কোন এলাকার থাম কোনটা। আগুন লাগলে ছুটে এসে এই গোল কাচ ভেঙে ভিতরের হাতল ঘোরালেই দমকল অফিসে ঘণ্টা বেজে ওঠে।

দমকল বাহিনীর লোক হোস পাইপ দিয়ে জল ছেড়ে আগুন নেভাচ্ছে

সেই ঘণ্টার শব্দ শুনে ওরা বুঝতে পারে কোন এলাকা থেকে সংকেত আসছে। সঙ্গে সঙ্গে কর্মীরা গাড়ি ও সরঞ্জাম নিয়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হয়।

এ ছাড়া টেলিফোনেও খবর দেওয়া যায়।

দমকল থেকে মই লাগানো হচ্ছে আগুন লাগা বাড়িতে

॥ দমকল বাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম ॥

একটা ট্রাকের উপর একটা পাম্পের এঞ্জিন থাকে আর থাকে ভাঁজকরা বিরাট একটা লোহার মই। এই গাড়িতে একজন ড্রাইভার থাকে আর থাকে হোস-পাইপ ও মুখোশ-পরা দমকলের কর্মীরা। তাছাড়া কাছিদড়ি থাকে একটা—কিছু শক্ত হ্যাঙ্গার আর একটা ত্রিপলও থাকে।

একটা গাড়ি চলে গেলেই আরেকটা গাড়ি তৈরি থাকে ঐ গাড়িকে সাহায্য করার জন্য। যদি অগ্নিকাণ্ড বিরাট হয় তবে টেলিফোনে খবর দিয়ে আরেকটা গাড়িও ডাকা হয়।

হোস পাইপ নিয়ে দমকলের গাড়ি এলেই কালো মুখোশ পরা কর্মীরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে হোস-পাইপ নামিয়ে নিকটবর্তী হাইড্র্যান্টের কাছে নিয়ে পাইপটা হাইড্র্যান্টের সঙ্গে জুড়ে দেয় ও পাইপের মুখ

দিয়ে আগুনলাগা বাড়িতে জল দিতে থাকে। আগুন উপরের তলায় লাগলে মই খাড়া করে তার উপর চড়ে কর্মীরা জল দেয়। যদি কোন বাসিন্দা আগুনের মধ্যে আটকে থাকে ত fire-proof পোশাক পরে কর্মীরা তাকে উদ্ধার করতে যায়। এজন্যে দড়ির জাল থাকে। তার মধ্যে লোকটিকে শুইয়ে আঙটা দিয়ে কাছি দড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হয়। এই দড়ি নীচ পর্যন্ত হেলানো ভাবে টানা দেওয়া থাকে। উপর থেকে ছেড়ে দিলে দড়ির জালের মধ্যকার লোক নীচে চলে আসে। সেখানে একটা ত্রিপল পেতে তাকে ধরে নেওয়া হয়।
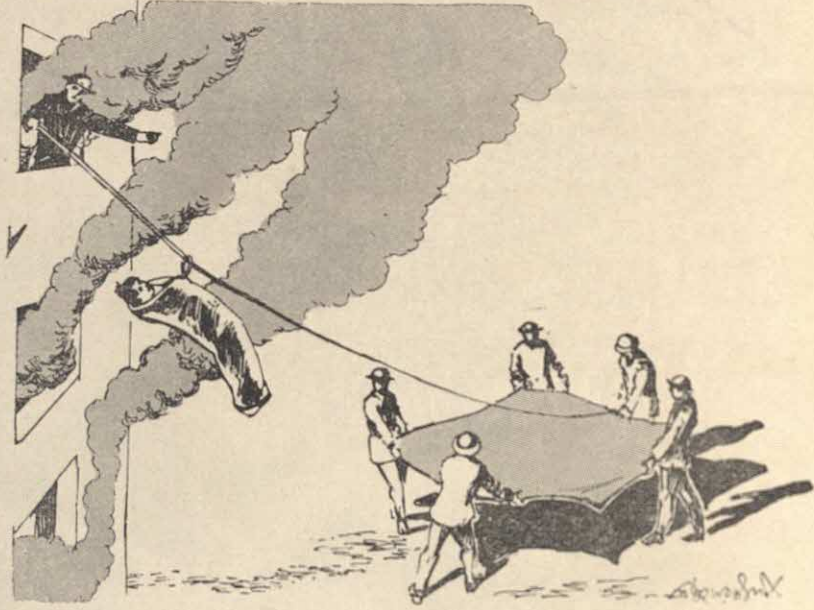
নীচে চারদিকে ত্রিপল টান করে ধরে উপরের বিপন্ন লোককে উদ্ধার করা হচ্ছে

নীচে একটা ত্রিপল চারদিক থেকে টান করে ধরে থাকে—উপর থেকে অনেক সময় বিপন্ন লোককে তার উপর ফেলে দেওয়া হয়। তাতে তার কোন ক্ষতি হয় না।

ম্যাজিকের কথা

॥ ম্যাজিক ॥

ম্যাজিক দেখতে কার না ভাল লাগে ? ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে শুনে হাজার হাজার লোক জড় হয়ে যায়।

'ম্যাজিক' শব্দটি ইংরাজী। কথাটি নাকি Magi (মেজাই) শব্দ থেকে এসেছে। মিশরের পুরোহিতরা প্রথমে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করেন। তখন বলা হত যে দেবদেবীর ক্ষমতায় পুরোহিতরা এই সব আশ্চর্য খেলা দেখাচ্ছেন। এক দল পারস্যের অগ্নি উপাসকদের নাম ছিল, মেজাই (Magi). এঁরা ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন। এঁরাই যীশুখ্রীস্টের জন্মের কথা প্রথমে প্রচার করেন।

মধ্যযুগে ম্যাজিক-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইওরোপে লোক অনেক কষ্ট স্বীকার করতেন। লোকের ধারণা ছিল অপদেবতারা মানুষকে খারাপ ক্ষমতা দিত আর দেবতারা মানুষকে লোকের উপকার করবার ক্ষমতা দিত।

খারাপ প্রভাব বিস্তার করে লোকের ক্ষতি করার ক্ষমতা জাদুকররা অর্জন করত বলে ম্যাজিককে Black Art হিসাবে নিষিদ্ধ করা হয়।

এক কালে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এই বিদ্যা দেখানো হত বলে এর নাম ইন্দ্রজাল। রাজা ভোজ এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলে এর অপর নাম ভোজ বিদ্যা। ভোজরাজের স্ত্রী ভানুমতী এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলে এর অপর নাম ভানুমতীর খেলা।

এক সময়ে আসামের কামাখ্যা এই বিদ্যার কেন্দ্র ছিল। সেখানকার লোকেরা নাকি জাদুবিদ্যার প্রভাবে মানুষকে ভেড়া বানাতে পারত!

॥ সাধারণ ভোজবিদ্যা ॥

আজকাল পথে-ঘাটে অনেক ভোজবিদ্যা দেখানো হয়। বেদে-সম্প্রদায়ের লোক ডুগডুগি বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে ভোজবিদ্যা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে। এ বিষয়ে বেদে মেয়েরাও খুব পারদশা।

বেদের মেয়ে পথের মাঝে ভানুমতীর খেলা দেখাচ্ছে

বিনা স্টেজে পথে-ঘাটে অনেক বিদেশী জাদুকর জাদুর খেলা দেখিয়ে লোককে অবাক্ করে দেয়।

তারা মানুষকে অদৃশ্য করে, ঝুড়ির মধ্যে মানুষ পুরে চার দিক থেকে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে শেষে মানুষটাকে অক্ষত অবস্থায় বার করে। তাদের কাছে থাকে একটা করোটি (মড়ার মাথার খুলি) আর একটা হাড়। তারা বলে যে এই ভানুমতীর হাড় দিয়ে তারা অসাধ্য সাধন করে। পারস্যে ও আরবে এককালে এর খুব প্রচলন ছিল। আরব্য রজনীর গল্পে Flying Carpet, Flying Horse (উড়ন্ত গালচে ও উড়ন্ত ঘোড়া) সবাই এসব পড়েছ।

সংস্কৃত নাটকেও বহু জাদুবিদ্যার কথা সকলে পড়েছ।

॥ বর্তমান কালের ম্যাজিক ॥

বর্তমান কালে যে সব ম্যাজিক দেখানো হয় তার জন্যে বিশেষ মঞ্চ দরকার। এই মঞ্চ থেকে সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে জাদুকর তাঁর যথার্থ ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়ে লোককে মোহিত করে।

সকলেই জানে এগুলি কৌশলের খেলা। কিন্তু সে সব কৌশল কেউ বুঝতে পারে না। অবাক্ হয়ে ভাবে কী কুশলী জাদুকরই না তাদের সামনে খেলা দেখালেন!

॥ হুডিনী (১৮৭৪-১৯২৬ খ্রীঃ) ॥

জাদুবিদ্যা দেখিয়ে যাঁরা সেকালে সুনাম কিনেছিলেন তাঁদের মধ্যে হুডিনী বিখ্যাত। এঁর পোশাকী নাম ছিল হ্যারি ওয়েলস্ হুডিনী আসল নাম ছিল এরিক ওয়াইস্ (Ehrich Weiss)। ইনি হাঙ্গারী দেশের জাদুকর ছিলেন। এঁর জন্ম হয় উইসকনসিনের অ্যাপলটনে। নিউইয়র্কে ডাইম মিউজিয়ামে তিনি প্রত্যহ কুড়িটা খেলা দেখাতেন। কিন্তু ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে আসার পর তিনি জাদুকর হিসাবে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। লণ্ডনের 'আল হামব্রায়' আশ্চর্য সব কৌশল দেখিয়ে তিনি সে সময়কার শ্রেষ্ঠ জাদুকর বলে স্বীকৃত হন।

হাত-কড়া বা অন্য যে কোন রকম বন্ধন থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করে খ্যাতি অর্জন করেন।

॥ গণপতি সরকার ॥

বাঙালী জাদুবিদ্যা-বিশারদদের মধ্যে গণপতি সরকারের নাম বিশেষ বিখ্যাত। তিনি নানা রকম খেলা দেখাতেন এবং হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার কৌশল দেখিয়ে লোককে অবাক্ করে দিতেন।

॥ জাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার ॥

বর্তমান কালে দেশ-বিদেশে ম্যাজিক দেখিয়ে পি. সি. সরকার জাদুসম্রাট্ আখ্যা লাভ করেন।

সহস্র সহস্র দর্শকের সামনে তিনি একজন জীবন্ত নারীকে দ্বিখণ্ডিত করে আবার তাঁর দ্বিখণ্ডিত দেহ অখণ্ড দেখিয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করেন। ইওরোপ ও জাপানে গিয়ে তিনি জাদুবিদ্যা দেখিয়ে ভারতের জন্য যশের মুকুট এনেছিলেন।

॥ ম্যাজিক দেখাবার ইচ্ছা সকলের হয় ॥

এ ইচ্ছা সকলেরই অল্প বিস্তর আছে। কিন্তু দামী দামী উপকরণ দরকার বলে এ পথে এগুতে তাঁরা সাহস পান না। কিন্তু এমন অনেক জাদুবিদ্যার কৌশল থাকে যাতে দামী সাজ-সরঞ্জামের একেবারেই দরকার লাগে না। তবে এতে জাদুকর দর্শকদের কিছু সময় বেশ খানিকটা নির্মল আমোদ দিতে পারেন। এসব সামান্য অভ্যাসে শিখে নেওয়া যায়।

অ-পেশাদার জাদুকরকে বেশ কিছু বক্‌বক্‌ করার অভ্যাস করতে হয়। বক্তৃতা দিতে দিতে বা গল্প করতে করতে তিনি দর্শকদের বেশ খানিকটা অন্যমনস্ক করে দিতে পারেন। তিনি যদি হঠাৎ উপরে আঙুল দেখান, সবাই সেই দিকে তাকাবে—এটাই ত স্বাভাবিক। এই অবসরে জাদুকর অনেক কিছু কৌশল করে নিতে পারবেন।

দর্শকের টানা তাস না দেখে জাদুকর বলে দেন

চোখবাঁধা অবস্থায় জাদুকর সাইকেল চালাচ্ছেন

॥ ম্যাজিকের খেলার রকমফের ॥

ম্যাজিকের খেলার মধ্যে প্রধান হচ্ছে তাসের খেলা। এ খেলা হরেক রকম হতে পারে। সব দর্শককে দিয়ে একটি প্যাকের একটি মাত্র তাস টানানো একটি আশ্চর্য তাসের খেলা—একে বলে Forcing Card. এ ছাড়া দর্শকদের টানা তাস না দেখে বলে দেওয়া আর একটি আশ্চর্য কৌশল।

দ্রব্যাদি অদৃশ্য করা আরেকটি আশ্চর্য কৌশল।

অদৃশ্য বস্তুর বদলে অন্য বস্তু আনয়নও একটি আশ্চর্য খেলা।

কতকগুলি ডিম রেখে টুপি চাপা দেওয়া হল। একটু বাদে টুপি তুলে দেখান হল ডিম নেই।

আবার সেখানে টুপি চাপা দেওয়া হল। টুপি উঠিয়ে দেখানো হল যে সেখানে কয়েকটি পায়রা রয়েছে।

এমনি সব খেলা দেখে দর্শকরা মোহিত হয়ে যায়। জাদুকরের কৌশল ধরবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে সবাই।

এ ছাড়া গোটা মানুষ অদৃশ্য করে দিতে পারেন জাদুকর।

চোখবাঁধা অবস্থায় জাদুকর সাইকেল চালাতে পারেন, বীজ থেকে তখনি গাছ জন্মাতে পারেন। মানুষের মাথার উপর রাঁধতে পারেন জ্বলন্ত উনানে। আরো কত কী খেলা তিনি দেখাতে পারেন!

॥ কয়েকটি অদ্ভুত ম্যাজিক ॥

দেহের মধ্যে তরবারি প্রবেশ করিয়ে জাদুকর লোককে তাক লাগিয়ে দেন। আসলে কিন্তু তরবারিটি নকল। তরবারিটা ভাঁজে ভাঁজে খাপের মধ্যে পেছিয়ে ঢুকে আসে। আর তাই দেখে মনে হয় তরবারিটা দেহের মধ্যে ঢুকে গেল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে শেশল (Sheshal) নামে এক জাদুকর মাদ্রাজে একটি খেলা দেখান। তিনি শূন্যে বসে থাকতে পারতেন। আসলে তাঁর সামনে যে দণ্ড মাটিতে পোঁতা থাকত তার

দেহের মধ্যে তরবারি প্রবেশ করিয়ে জাদুকর দর্শকদের তাক লাগান

জ্যান্ত মানুষ কাটা

সঙ্গে কৌশলে একটা লোহার ফ্রেম আটকানো থাকত। এই ফ্রেমটি জাদুকরের কোমরের সঙ্গে যুক্ত থাকত। ইংলণ্ডের জাদুকর Sylvesterও এই খেলাটি দেখান।

॥ জ্যান্ত মানুষ কাটা ॥

কাঠের বাক্সের মধ্যে একটি জ্যান্ত মানুষকে শুইয়ে জাদুকর সেই বাক্সটি করাত দিয়ে চিরে দুখানা করে ফেলেন। পরে দেখানো হয় মানুষটি গোটাই আছে এবং সম্পূর্ণ জ্যান্ত আছে। এই খেলা দেখাবার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী কাঠের বাক্স থাকে। সমস্ত ব্যাপারটি এমনি কৌশলে দেখানো হয় যে লোকে কিছুতেই এর রহস্য ভেদ করতে পারে না।

দেশবিদেশের খাদ্য
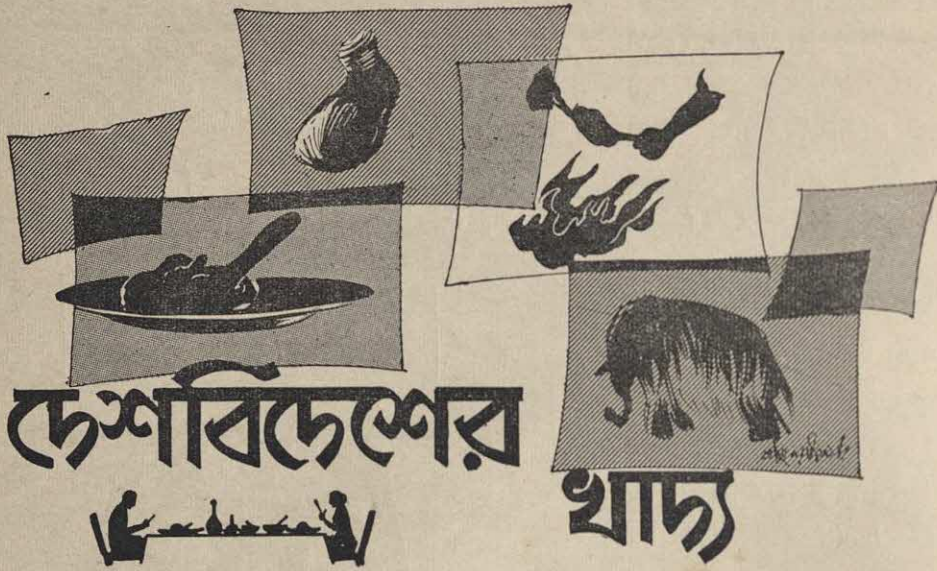
॥ আপ রুচি খানা ॥

আমরা আমাদের রুচি বা পছন্দ অনুযায়ী খাই। কেউ একটা জিনিস খায় না, আবার কেউ সেটা পেলে মহা আগ্রহে খায়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে One man's meat is another man's poison —এর অর্থ হল যা একজনের কাছে উপাদেয় সুখাদ্য তাই আবার আরেকজনের কাছে বিষের মত। তাই যার যা ভাল লাগে তাই সে খায়। কেউ মাছ মাংস ভালবাসে, কেউ শাক-সবজি, কেউ মিষ্টি পেলে আর কিছু চায় না, কেউ বা খুব ঝাল খেতে ভালবাসে। কেউ ভালবাসে ফল-মেওয়া, কেউ বা জ্যাম জেলী আচার।

॥ নানা দেশের অদ্ভুত খাদ্য ॥

চীন দেশের লোকেরা শোয়ালো জাতীয় একরকম ছোট পাখির বাসা খায়। উত্তর আফ্রিকার অসভ্য লোকেরা দুটি প্রধান খানার মধ্যে মুঠো মুঠো পঙ্গপাল চিবিয়ে খায়। আফ্রিকার এক অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা পিঁপড়ের ডিম খায়। আমাদের দেশেই কত লোক ব্যাঙের ছাতা খায়। ফরাসী দেশে ব্যাঙের চাহিদা খুব। সে দেশে ব্যাঙ একটি সুখাদ্য। ইওরোপের লোকেরা Oyster খায়। Oyster একরকম সামুদ্রিক ঝিনুকের মাংস। বর্মার লোকেরা ঞাপ্পি নামক একরকম খাদ্য খায়—এর দারুণ দুর্গন্ধ। এটা নাকি অনেকদিন মাটিতে পুঁতে রাখলে খেতে খুব সুস্বাদু হয়।

॥ কাঁচা খাদ্য আর রান্না করা খাদ্য ॥

মানুষ যখন আগুনের ব্যবহার জানত না তখন সবকিছুই তারা কাঁচা খেত। মাছ, মাংস, তরকারি, কন্দ এসব চিবিয়ে কাঁচাই খেয়ে নিত। তারপর তারা আগুনের ব্যবহার শিখল। তখন প্রথমে পোড়ানো শুরু হল। তারপর স্বাদের জন্য তাতে যোগ করতে লাগল নানা রকম মসলা, নুন, ঝাল, টক, মিষ্টি।

শুধু পুড়িয়ে এখনও আমরা বহু জিনিস খাই। তরকারির মধ্যে বেগুন আমরা পুড়িয়ে খাই। এছাড়া খই, মুড়ি আমরা ভেজে খাই। কাঁচা ভুট্টা পুড়িয়ে খাই। রান্না মাংসের মধ্যে শিক-কাবাব ভারী সুস্বাদু। প্রাচীনকালে একে বলা হত শূল-পক্ক মাংস। চীনে কি করে ঝলসানো শূকরের মাংস খাওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল সে কথা ইংরেজ

ঘোড়া দিয়ে জমি চাষ হচ্ছে

চাষ করা জমি

লেখক চার্লস ল্যাম একটি সুন্দর প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন। রুটি, চাপাটি, পরোটা—এসব ত সেঁকেই খাওয়া হয়। পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট, পনীর এসব নানা কৌশলে বানাতে হয়।

॥ কৃষিকার্য ॥

মানুষ যখন কৃষিকাজ শেখেনি তখন বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে ফলমূল, জন্তুজানোয়ার যোগাড় করে খেত। সে বড় হ্যাঙ্গামের ব্যাপার ছিল। তারপর হঠাৎ মানুষ চাষ করতে শিখল। তখন ইচ্ছা মত ফসল সে নিজেই তৈরি করে নিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সে পশুপালনও শিখল। কতক পশু দিয়ে সে কৃষিকাজ করাতো, তাদের দুধ খেত আবার দরকার হলে তাদের মেরে মাংসও খেত।

ধান জনার বার্লি

গম গাছ

॥ মাছ ॥

আদিম অবস্থা থেকে মানুষ মাছ ও মাংস খাওয়া ধরেছিল। আগে সব কিছুই তারা কাঁচা খেত। পরে আগুনের ব্যবহার শিখে তারা ক্রমশঃ রান্না করে খেতে শিখল। পুকুর, নদী, হ্রদ ও সাগর থেকে মাছ ধরে সে তার উদর পূর্ণ করত।

মাছ ধরবার নানা কৌশলও সে শিখে নিল। জাল তৈরি করার পর মাছ ধরা তার কাছে অতি সহজ হয়ে পড়ল।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই লোক মাছ খায়। আজকাল বড় বড় জাহাজ সমুদ্রে ও নদীতে যায় মাছ ধরতে। বিরাট জালে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনা হয়।

এছাড়া বাড়ির কাছে পুকুরে মানুষ মাছের পোনা ছেড়ে মাছ জন্মায়। সেই মাছ বড় হলে তা ধরে খায়।

চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদিও মানুষ মাছের সঙ্গে খেয়ে থাকে।

॥ মাংস ॥

শীতপ্রধান দেশের লোকেরা মাংস খেতেই বেশী অভ্যস্ত। এতে তাদের শরীর গরম থাকে।

ইওরোপে বিরাট বিরাট মাংসের চাংড়া খাওয়াই রীতি। তারা টেবিলে ঐ মাংস রেখে তা থেকে
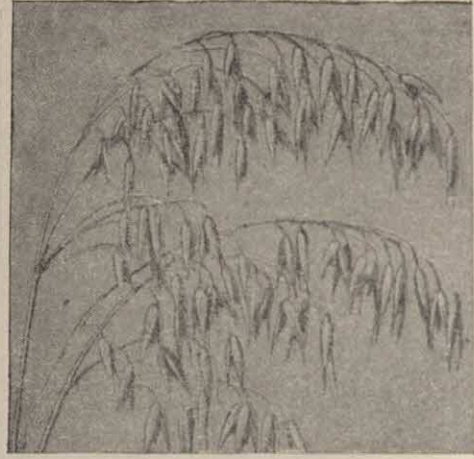
ওট বা জই

ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খায়। ভারতবর্ষে মাংস কেটে টুকরো টুকরো করে সেই মাংস রান্না করে খায়। এই মাংস রান্না করবার সময়ে এতে নানা রকম মসলা দিয়ে একে সুস্বাদু করা হয়।

মাংস থুড়ে ছোট ছোট করে কিমা তৈরী হয়। রান্নার কৌশলে সেই কিমা দিয়ে চপ, কাট্‌লেট্ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ইংরেজদের খানায় এইসব রান্না-করা মাংসের খাবারের কত রকম নাম! ডেভিল, গ্রেভি, গ্রিল ইত্যাদি।

সাধারণতঃ যে সব পশুর মাংস মানুষ ওদেশে খায়

রাই (Rye)
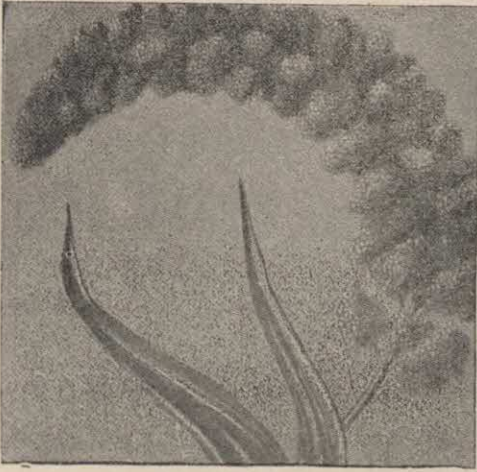
মিলেট্ বা জোয়ার

তাদের নাম হ'ল, ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ, হরিণ, শূকর ইত্যাদি। এছাড়া নানা রকম পাখির মাংস মানুষ খায়। যেমন, হাঁস, মুরগী, ঘুঘু, পানকৌড়ি, টার্কী মোরগ ইত্যাদি। মাছ ছাড়া জলের জন্তু কচ্ছপ ও কাঠার বা কাছিমের মাংসও মানুষের কাছে খুব সুখাদ্য।

মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা গরু ও মহিষের মাংস খায় কিন্তু সাহেবদের কাছে শূকর ও বাছুরের মাংস (Veal) অতি সুখাদ্য। মুসলমান ও ইহুদীরা শূকর মাংস খান না। ইওরোপে পশুর জিভ সুন্দর মসলা দিয়ে রাঁধা হয়। ষাঁড়ের জিভ ওদেশে মহা সুখাদ্য।

'সসেজ' নামক এক রকম রান্না-করা মাংস পশুর নাড়ির মধ্যে ভরে দুধারে বেঁধে পরিবেশন করা হয়। সে সব ওদেশের লোকের কাছে মহা সুখাদ্য।

॥ কাঁচা মাছ ॥

আগেই বলা হয়েছে, এক রকম সামুদ্রিক ঝিনুকের শাঁস (Oyster) ইওরোপের লোকদের কাছে খুব সুখাদ্য।

এছাড়া জাপানের লোক কাঁচা মাছও খায়। এদের বলে সাশিমি (Sashimi). ওরা কাঠি দিয়ে কাঁচা মাছ সসে ডুবিয়ে খায়। হাওয়াই দ্বীপে আবার কাঁচা মাছ লেবু বা টম্যাটোর রসে ডুবিয়ে খায়,—এর নাম লোমি লোমি (lomi lomi). ইতালীয়রা ঈল (কুঁচে মাছ) খেতে খুব ভালবাসে।

॥ শস্য, ফসল, ফল ও মেওয়া ॥

আদিম অবস্থায় মানুষ বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নানা সুস্বাদু ফল সংগ্রহ করে খেত।

পরে তারা চাষ করার পদ্ধতি শিখল। তখন তারা ঘরের কাছেই জঙ্গল বানালো। তারপর শুরু হল আবাদ করা।

মানুষের কৃষিকার্য তিন ধারায় বইতে লাগল। তারা জমি চাষ করে ফলাতে লাগল নানা রকম খাদ্যশস্য, ধান, গম, যব, জনার, ভুট্টা, ডাল, কড়াই ইত্যাদি। গাছ লাগালো আম, কাঁঠাল, নারকেল, তাল, লেবু ইত্যাদির এই সঙ্গে কাঁচা সবজিরও চাষ শুরু হল, আলু, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, বেগুন, তরকারি ও শাক।

আবার ফল ও মেওয়ারও চাষ শুরু হল। আঙুর, বেদানা, আখরোট, কিশমিশ। নানাদেশে আবহাওয়া অনুযায়ী নানা রকম সুস্বাদু ফল ও মেওয়া জন্মাতে লাগল।

সে সব খেয়ে মানুষের স্বাদ মিটল না। তারা নানা রকম রান্না করে স্বাদের তৃপ্তি করতে লাগল।

আম, কলা, আনারস চাষ করে তারা প্রচুর খেতে লাগল। যা বাড়তি হত তা বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর রোজগার করতে লাগল। সে সব ফল ও ফসলের চাহিদা বিদেশেও ক্রমশঃ বাড়তে লাগল।

ভুট্টা

নারকেল গাছ

॥ সংরক্ষিত খাবার ॥

প্রকৃতি আমাদের জন্যে কত রকম ফল, ফসল ও শস্য তৈরি করে দিচ্ছে, কিন্তু তা খেয়ে মানুষের স্বাদ মিটছে না। মানুষ সে সব দিয়ে রান্না করে নানা রকম স্বাদের খাবার তৈরি করছে।

দুধ থেকে ওদেশে পনীর তৈরি করে। দুধ থেকে পনীর তৈরি করলে তা কিছুদিন রাখা যায়। খাবারকে অনেকদিন রাখাকে বলে সংরক্ষিত করা। এই রকম সংরক্ষিত করা খাবার কত বিভিন্ন রকমের হয়।

॥ পনীর ॥

পনীর এই রকম সংরক্ষিত খাবার। অনেকটা আমাদের দেশের খোওয়া ক্ষীরের মত।

নরওয়ের লোকেরা পনীরকে বলে গে টোস্ট (Gje tost). এগুলো দেখতে বাদামী রঙের আর খেতে মিষ্টি। গরুর দুধ আর ছাগলের দুধ মিশিয়ে এই পনীর তৈরী হয়।

ওলন্দাজরা যে পনীর খায় তার আকৃতি কামানের গোলার মতো। তাদের নাম এডাম ও গাউডা (Edam and Gouda).

ফরাসীদের পনীর বিখ্যাত। এদের নাম ব্রি (brie). গোল গোল ও নরম-নরম। এদের গন্ধটা একটু কড়া। একশ পাউণ্ড দুধে মোটে চৌদ্দ পাউণ্ড পনীর হয়।

গ্রীকরা ছাগলের দুধের পনীর ব্যবহার করে। এগুলো দেখতে তুষারের মতো ধবধবে সাদা। এগুলো বেশ শক্ত। এদের নাম ফেটা (feta).

সুইট্জারল্যাণ্ডের পনীর দেখতে সবুজ। এগুলোর আকৃতি তেকোনা। এদের নাম স্যাপস্যাগো (Sapsago). রেফ্রিজারেটর আবিষ্কৃত হবার আগে ইওরোপের নানা দেশে এইভাবে দুধকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা হত।

জলের উপর দিয়ে নারকেল ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

(এগুলি একরকম রসাল সুস্বাদু ফল) স্ট্রবেরি

॥ রসাল ফলের কথা ॥

কৃষিজাত ফলের মধ্যে দুনিয়ার মানুষ পছন্দ করে আম, আনারস, আঙুর, আপেল, তরমুজ, খেজুর, আখরোট, নাসপাতি, বিলাতী ডুমুর, বেদানা, কিশমিশ, কলা ইত্যাদি।

এদের মধ্যে মেওয়ার আদর সবচেয়ে বেশী। বাদাম, পেস্তা, কিশমিশ, আঙুর এগুলিকে বলে মেওয়া।

ফলের বাজারে এরা অভিজাত। সাধারণ লোক রোগে ভোগে কদাচিৎ এসব খেতে পায়। এদের দাম এত বেশী যে সাধারণ লোক তা কিনে খেতে পারে না। রাজারাজড়া ও ধনীসম্প্রদায় ছাড়া এসব কিনে খাওয়া সম্ভব নয়।

এক এক দেশে এসব প্রচুর জন্মায়। সেসব দেশ থেকে ঐসব ফল ও মেওয়া দুনিয়ার বাজারে চালান দেওয়া হয়।

তরমুজ

বিলাতী ডুমুর (fig)

নাসপাতি

খেজুর
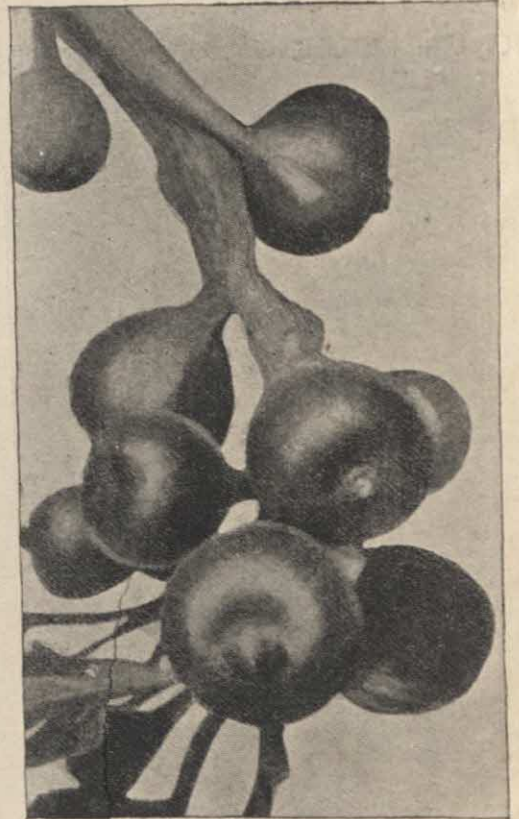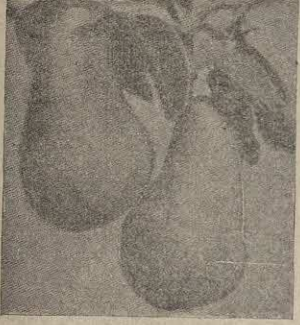
॥ খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ॥

ডাক্তারী শাস্ত্রে বর্তমানে খাদ্যের মধ্যে এ, বী, সী, ডী ইত্যাদি খাদ্যপ্রাণের উপস্থিতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে সব খাদ্যে সমান খাদ্যপ্রাণ নেই। কোন্‌টিতে কী পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ আছে তা বর্তমানে অনেকেই জানে। সেই দিকে নজর রেখে এখন খাদ্য নির্বাচন করা দরকার। কারণ খাদ্য-প্রাণের সুষম বণ্টন খাদ্য ব্যবস্থায় না থাকলে নানা রোগ হবার সম্ভাবনা।

গুজ্‌বেরী
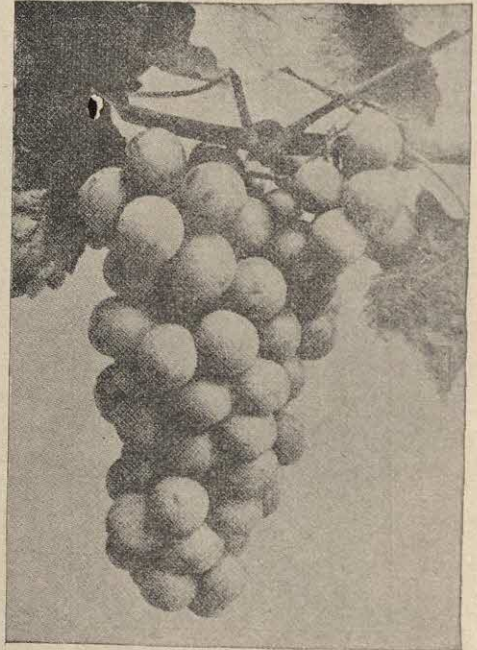
আঙুর

লাল কিশমিশ

আনারস

সাদা কিশমিশ

কলা

মাছের ঝাঁক

॥ আচার-জ্যাম-জেলী ॥

সব খাবার টাটকা খেয়ে ফেলা যায় না। অসময়ের জন্যে রেখে খেতে হয়। তাই খাদ্য নানাভাবে সংরক্ষিত করে রাখার অনেক রকম বৈজ্ঞানিক প্রথা আবিষ্কৃত হয়েছে।

জ্যাম, জেলী, চাটনি, আচার—এসব সংরক্ষিত খাদ্য। অসময়ের জন্য এদের টিন বা শিশিতে করে রাখা হয়।

আমাদের দেশে ফুলকপি, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি, সজনা ফুল—অল্প নুন মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে বয়ামে ভরতি করে রাখা হয় অসময়ের জন্যে।

॥ টিনে ভরা খাদ্য ॥

আজকাল বহুদেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফল টিনে ভরতি করে দেশ-বিদেশে পাঠান হয়। সেসব ফলের স্বাদ একটুও খারাপ হয় না। টিন কাটলেই তাজা ফল আমরা খেতে পারি। এইভাবে রান্না-করা মাছমাংসও টিনে ভরতি হয়ে দেশবিদেশে চালান হচ্ছে। বিদেশে ভ্রমণ করতে গেলে সঙ্গে এমনি কয়েক টিন খাদ্য নিলে রান্নার হাঙ্গাম আর পোহাতে হয় না।

॥ নানা দেশের খাবার ॥

আমাদের দেশে নানা রকম মণ্ডা মেঠাই, খাজা, গজা তৈরী হয়। ছানা থেকে, নারকেল থেকে, আটা ও ময়দা থেকে এসব তৈরী হয়। এদের স্বাদ যেমন, গন্ধও তেমন।

বিলেতে পুডিং, কেক, ডামলিং ইত্যাদি নানা রকমের হয়।

দক্ষিণ ভারতে ইডলী, ধোসা ইত্যাদি নানা সুখাদ্য তৈরী হয়।

আমরা ভাত খাই—অন্যদেশের লোকেরা গমজাতীয় খাদ্য খায়। আয়ারল্যাণ্ডের লোকদের প্রধান খাদ্য আলু।

জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়েছে

ছোট্ট ছেলে রবি। নিউ আলিপুরে থাকে। সে আর তার দিদি জয়তী একদিন বাবার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। দেখতে তার বেশ ভালই লাগছিল, কিন্তু মোটে আড়াই ঘণ্টা যেতে না যেতেই ছবি শেষ হয়ে গেল। অমনি একটা বাজনা বাজতে লাগল, রবির বাবা আর সকলে উঠে দাঁড়াল। কেউ কেউ আবার মাথা নীচু করে রইল যতক্ষণ না বাজনাটা থামল। রবি তো অবাক্! এ আবার কি!

বাড়ি ফিরে এসে সে পিকলুকে বললে কথাটা। পিকলু 'ছোটদের বুক অব নলেজ' পড়ে, অনেক কিছু জানে। সে বললে, আরে, এ তো সোজা কথা। যে গানটা বাজানো হচ্ছে তা হল ভারতের জাতীয় সংগীত। জাতীয় পতাকার মতো জাতীয় সংগীতকেও খুব সম্মান দেখাতে হয়। সে গান যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকে সেই গানকে সম্মান দেখাতে হয়।

পৃথিবীতে সব স্বাধীন আর সভ্য দেশেরই নিজের নিজের জাতীয় সংগীত আছে। কোন কোন দেশে এমন গানকে জাতীয় সংগীত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে যে গান সেদেশে লোকেদের মুখে মুখে খুব বেশিরকম চলত। আবার কোথাও বা সে দেশের কর্তারা অনেক দেখে শুনে বেছে কোনও একটি গানকে ঠিক করে দেন, আর দেশবাসী সবাই সেটাকে তাঁদের জাতীয় সংগীত বলে মেনে নেন।

আমাদের ভারতের জাতীয় সংগীতের বেলায় ঠিক তাই হয়েছিল। যে দেশে একটি মোটে ভাষা, সেখানে হয়তো এমন দু'একটি গান থাকা সম্ভব যেটি দেশের বেশির ভাগ লোকেই জানে। কিন্তু ভারতে তো তা নয়। এখানে প্রধান ভাষাই আছে চোদ্দ-পনেরোটা। তাতে ঢের ভাল ভাল গান আছে, কিন্তু ভারতের সবাই জানে এমন গান একটিও নেই। তবু তো একটা জাতীয় সংগীত চাই-ই! দেশটা তখন স্বাধীন হয়েছে, তার জাতীয় পতাকাও ঠিক হয়ে গিয়েছে। বাকী শুধু জাতীয় সংগীত কি হবে, তা ঠিক করা।

॥ ভারতের জাতীয় সংগীত ॥

একটি সভা করে ঠিক করা হচ্ছিল যে স্বাধীন ভারতের শাসন-ব্যবস্থা কি রকম হবে। সেই সভাতেই জাতীয় সংগীতের কথা বিবেচনা করা হল। অনেকেই বললেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বন্দে মাতরম্' গানটিকেই নেওয়া হোক।

অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটিই ভারতের প্রধান জাতীয় সংগীত হবে। তবে, গানটা একটু বড় বলে শুধু ওর প্রথম স্তবক বা স্ট্যান্জাটিই জাতীয় সংগীত হিসেবে গাইতে বা বাজাতে হবে।

সেই প্রথম স্তবকটি হল এই ঃ

"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য-হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে!"

তবে এটাও ঠিক হল যে 'বন্দে মাতরম্' এর প্রথম স্তবকও জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পাবে। ১৯৪৯ খ্রীঃ ২৬শে নভেম্বর কন্‌স্টিট্যুয়েন্ট এসেম্বলির সভাপতি ও

সিনেমার শেষে জাতীয় সংগীত বাজানো হচ্ছে

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই ঘোষণা করেন।

॥ 'জনগণমন-অধিনায়ক' কে ? ॥

রবীন্দ্রনাথ এই গানখানা লিখেছিলেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। তার কিছুকাল বাদেই তখনকার ভারতের ইংরেজ সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ দিল্লীতে এসে এক দরবার করেন এবং তাতে খুব ধুমধাম হয়েছিল। ব্যস, আর যাবে কোথা! একদল লোক রটিয়ে দিল যে, গানখানা সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ-এর উদ্দেশেই লেখা। কথাটা যে মোটে ঠিক নয়, তা গানটি পড়লেই বোঝা যায়। তাছাড়া, গানটি যখন প্রথম ছাপা হল, তখন রবীন্দ্রনাথ একে ব্রহ্ম-সংগীত (অর্থাৎ, ভগবানের নামগান) বলেই লিখেছিলেন। আর, এ গানখানা প্রথম গাওয়া হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে।

॥ গানের ভাষার পরিবর্তন ॥

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা'। কিন্তু জাতীয়-সংগীত বলে ঠিক করবার সময় তা নিয়ে একটু আপত্তি উঠল। সিন্ধু প্রদেশটি আগে ভারতের মধ্যে ছিল বটে, কিন্তু ভারত যখন স্বাধীন হল, তখন সিন্ধু আর তার মধ্যে রইল না—চলে গেল পাকিস্তানের মধ্যে। কাজেই ভারতের জাতীয় সংগীতের মধ্যে তাকে রাখা চলে না। আবার এদিকে আসাম রাজ্যের নামটি গানের মধ্যে নেই বলে অসমীয়াদের আপত্তি। তাই শেষে 'সিন্ধু' বাদ দিয়ে আসামের নাম 'কামরূপ' বসিয়ে ঐ লাইনটিকে বদলে দেওয়ার কথা উঠেছিল। কিন্তু গানে 'কামরূপ' কথাটির ব্যবহার হয় নি।

॥ বন্দে মাতরম্ সংগীত ॥

এই গানটি আমাদের প্রধান জাতীয় সংগীত হল বটে, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' গানটিও আর একটি জাতীয় সংগীত বলে একই সঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছিল। এ গানটি লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর
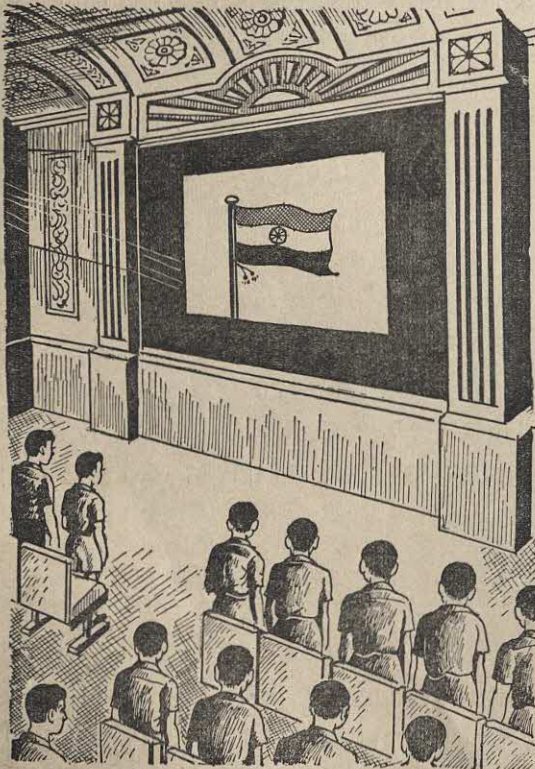
'আনন্দমঠ' বইয়ে। 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটির প্রায় ত্রিশ বছর আগে এটি লেখা হয়েছিল। গানখানা ছাব্বিশ লাইনের। তার মধ্যে কুড়ি লাইনই সংস্কৃত—মোটে ছ'লাইন বাংলায়। প্রথম লাইনই তো সংস্কৃত—'বন্দে মাতরম্!' যার অর্থ হচ্ছে, 'মাকে বন্দনা করি।' তার পরও অনেক লাইন সংস্কৃতে লেখা—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

এর অর্থ কি, তা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ থেকে বুঝতে পারবে:

"বন্দনা করি মায়—
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা চন্দন-শীতলায়।
যাঁহার জ্যোৎস্নাপুলকিত রাতি,
যাঁহার ভূষণ বনফুলপাঁতি,
সুহাসিনী সেই মধুরভাষিণী
সুখদায়, বরদায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই যে 'বন্দে মাতরম্' শব্দ দু'টি দিয়ে গেলেন, ভারতের প্রতি প্রান্তে তা একদিন আগুনের মতো ছড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য দীর্ঘকাল যে সংগ্রাম চলেছিল, তাতে এই কথাটি হাজার কণ্ঠে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হত, হাজার প্রাণে উৎসাহ এনে দিত।

ভারতের এই দু'টি জাতীয় সংগীতই খুব জনপ্রিয় লেখকের লেখা, আর, দু'টি গানই আগে থেকেই খুব বিখ্যাত গান ছিল। কিন্তু খুব কম দেশের জাতীয় সংগীতই জনপ্রিয় লেখকের লেখা। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকার জাতীয় সংগীত যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা তো জীবনে আর কোনও কবিতা লেখেন নি, এঁরা তিনজনই অতি সাধারণ মানুষ ছিলেন।

॥ ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত ॥

ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জাতীয় সংগীত। এর নাম 'লা মার্সাইয়েজ' (La Marseillaise).

১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের কথা। ফরাসী বিপ্লবের সময়। অল্প কয়েকদিন আগে ফ্রান্স রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। স্ট্রাসবুর্গ শহরে এক ভোজসভায় কথা উঠল যে ফরাসীদের মনমাতানো একটা যুদ্ধ-সংগীত নেই। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ফরাসী সেনাদলের এক ক্যাপটেন, তাঁর নাম রুজে দ্য লীল (Rouget de Lisle). বাড়ি ফিরে এসেও তাঁর মাথায় কথাটা ঘুরতে লাগল। তিনি একটু কবিতা লিখতে পারতেন, আবার গানও গাইতে জানতেন। তিনি তখনই ঝোঁকের মাথায় এক ঘণ্টার মধ্যে একটি গান লিখে তাতে সুর দিলেন। তারপর তার নাম দিলেন 'রাইন বাহিনীর রণসংগীত'। গানটি ক্রমে ক্রমে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। শেষে হল কি, ঐ ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দেরই শেষ দিকে যখন একদল বিপ্লবী মার্সাই (Marseilles) শহর থেকে এসে প্যারিসে তুইলেরিজ (Tuileries) প্রাসাদ আক্রমণ করল, তখন তাদের মুখেও ছিল ঐ গান। তখন থেকেই ওর নাম হয়ে গেল 'লা মার্সাইয়েজ'।

'লা মার্সাইয়েজ' গানটির কথাগুলো যেমন প্রাণ-মাতানো, সুরটিও তেমনিই উদ্দীপনাময়। গানটি অবশ্য ফরাসী ভাষায় লেখা। গানটির প্রথম দু'ছত্র হচ্ছে:

'Allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrive—

এর বাংলা মানে হল:

'পিতৃভূমির সব সন্তান আয়।
কীর্তিলাভের ক্ষণ সমাগতপ্রায়।'

॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতটির নাম 'দি স্টার-স্প্যাঙ্গ্‌ল্‌ড্ ব্যানার' (তারার চুমকি-বসানো

নিশান)। সেই নিশান হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা। কেননা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চাশটি রাষ্ট্র আছে, তাদের জাতীয় পতাকার উপরকার বাঁদিকের কোণে পঞ্চাশটি চকচকে তারা আঁকা থাকে।

এই জাতীয় সংগীতও সাধারণ একজন সৈনিকের লেখা। তিনিও হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায় এই গানটি লেখেন। তার কাহিনীটা এই ঃ

সেটা ছিল ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজদের একটা যুদ্ধ চলছিল। আমেরিকানদের একটি দুর্গ—ফোর্ট ম্যাক্‌হেনরী—ছিল চেসাপীক উপসাগরের ধারে। ইংরেজদের যুদ্ধ-জাহাজ এসে সেই কেল্লা আক্রমণ করল। ইংরেজরা সেই জাহাজে কয়েকজন আমেরিকানকে বন্দী করে রেখেছিল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ফ্রান্সিস স্কট কী (Francis Scott Key). তিনি একজন সাধারণ সৈন্য, এর আগেকার কোনও এক যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন।

ইংরেজদের জাহাজ থেকে গোলাবৃষ্টি শুরু হল ফোর্ট ম্যাক্‌হেনরীর উপর। অসহায় ফ্রান্সিস দেখতে লাগলেন যে, সেই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে ফোর্ট ম্যাক্‌হেনরী খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ছে। সারারাত ধরে এই রকম চলল, আর তিনি বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে লাগলেন যে, সব শেষ হয়ে যাবে, সকালবেলা আর ফোর্ট ম্যাক্‌হেনরীর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

রাতটা অন্ধকার ছিল, তাই সারারাত বোঝা যায় নি যে কতটা কি হল। তারপর রাত শেষ হয়ে এল, আস্তে আস্তে আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠতে লাগল। সেই আলোয় ফ্রান্সিস স্কট কী দেখতে পেলেন যে দুর্গটি ভেঙে গিয়েছে বটে, কিন্তু তার চূড়ায় বসানো আমেরিকান জাতীয় পতাকাটি ঠিক আছে. সে যেন সব আক্রমণ তুচ্ছ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে স্কট কী-র মনে একটা উদ্দীপনা এল। তিনি তখনই একটা গান লিখে ফেললেন ঃ

ফ্রান্সিস স্কট লিখেছিলেন ঃ

'O say ! Can you see by the dawn's
early light
What so proudly we hailed at the
twilight's first gleaming ?
Whose broad stripes and bright stars
through the perilous fight
O'er the ramparts we watched
were so gallantly streaming ?'

এটির বাংলা অনুবাদ হল ঃ

'বল, বল, দেখেছ কি প্রথম আলোকে প্রভাতের,
গর্বে নন্দিলাম কারে নব রক্তরাগে উষসীর ?
কার তারা আর ডোরা ওড়ে ঊর্ধ্বে দুর্গ প্রাকারের ?
ভীষণ আহবমাঝে হেরিলাম দৃপ্ত কার শির ?'

॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি খুব জনপ্রিয় সংগীত ॥

তারপর এ গানটি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু জাতীয় সংগীত বলে এটিকে গণ্য করা হয় ১১৭ বছর বাদে। কারণ, আমেরিকাতে আরও দু'টি গান খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল—তাদের নাম 'আমেরিকা' আর 'হেইল্ কলাম্বিয়া!' (Hail, Columbia!)। এই তিনটির মধ্যে শেষে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় সংগীত বলে ঘোষণা করা হল ফ্রান্সিস স্কট কী-র লেখা গানটিকে। এর নাম আগেই বলা হয়েছে—স্টার-স্প্যাঙ্গ্‌ল্‌ড্ ব্যানার।

॥ ইংরেজদের জাতীয় সংগীত ॥

ইংরেজদের জাতীয় সংগীত হচ্ছে 'গড সেভ দি কিং' (God Save the King)। আজকাল যেমন সিনেমার শেষে, কিংবা সরকারী কোনও উৎসবে, জনগণমন-অধিনায়ক গানটি বাজানো হয়, ত্রিশ বছর আগেও তা ছিল না। তখন ছিল এদেশে ইংরেজদের রাজত্ব, তাই এসব ব্যাপারে বাজানো হত ইংরেজদেরই জাতীয় সংগীত। এটি যে কবে কে লিখেছিলেন, তা ঠিক করে জানা যায় নি। কেউ বলে ১৭৪৩

খ্রীষ্টাব্দে ডেটিংগেন-এর যুদ্ধে ইংরেজরা যখন জয়লাভ করেছিল, হেনরী কেরী এ গানখানা তখন রচনা করেছিলেন। আবার কেউ বা বলে যে, এটা জন বুল নামে একজন লোকের লেখা। তাঁরা কে, তাও ভাল করে জানা যায় না। তবে একথা বেশ বোঝা যায় যে তাঁরা বিশিষ্ট কোনও কবি ছিলেন না। কেননা, ইংরেজদের এই জাতীয় সংগীতটি এতই সাধারণ যে এটি যে কোন্ গুণে জাতীয় সংগীত হবার সম্মান পেল, তা বোঝা মুশকিল। গানটির প্রথম দিক্‌টা এই রকম :

"God save our Gracious King!
Send him victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us—
God save the King!"

॥ জাপানের জাতীয় সংগীত ॥

ইংরেজরা তাঁদের জাতীয় সংগীতকে বলেন 'ন্যাশনাল অ্যান্থেম'। কিন্তু এতে জাতির কথা কিংবা দেশের কথা নেই, আছে শুধু রাজার কথা। এরকম শুধু রাজারই কথা আছে আরও কয়েকটি দেশের জাতীয় সংগীতে। যেমন, জাপানের জাতীয় সংগীত। সে গানটির নাম 'কিমিগায়ো'। কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদ করেছেন। তার প্রথমটা এইরকম :

'অযুত যুগ ধরি বিরাজো, মহারাজ!
রাজ্য হোক তব অক্ষয়,
উপল যতদিন না হয় মহীধর
প্রভূত শৈবালে শোভাময়।'

॥ চেকোস্লোভাকিয়ার দু'টি জাতীয় সংগীত ॥

চেক আর স্লোভাক হচ্ছে দুটো আলাদা জাতির নাম। সেই দু'জাতের লোককে নিয়েই এই দেশটা গড়া হয়েছিল বলে এর নাম হয় চেকোস্লোভাকিয়া। দু'জাতের দেশ একটা হল বটে, কিন্তু তাদের আলাদা আলাদা জাতীয় সংগীত ছিল—তা তারা কেউ ছাড়ল না। চেকদের প্রিয় গান ছিল 'কোথা দেশ মোর?' (Kde domor muj), আর স্লোভাকরা গাইত 'শৈলমালার শিরে বিজলী ঝলে' (Nad tatrou se Blyska)। তাই ঠিক করে দেওয়া হল যে, দুটো গানই চেকো-স্লোভাকিয়ার জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া চলবে।

॥ সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডের তিনটি জাতীয় সংগীত ॥

ছোট্ট দেশ সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডের জাতীয় সংগীত হচ্ছে তিন-তিনটে। সে দেশে দুটো ভাষা চলে—ফরাসী আর জার্মান। জার্মান-ভাষা যারা বলে, তাদের পছন্দ একটি জার্মান গান। আর ফরাসী-ভাষার লোকেরা ভালবাসে দু'টি গানকে। তার মধ্যে একটিকে হয়তো জাতীয় সংগীত করে নেওয়া হত, কিন্তু মুশকিল বাধল তার সুর নিয়ে। জাতীয় সংগীত ব্যাণ্ডবাজনার উপযোগী হওয়া দরকার, কিন্তু ঐ গানটি ব্যাণ্ডের বাজনায় ভাল খাপ খায় নি। কাজেই পাকাপাকি কিছু ঠিক হয় নি—সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে জাতীয় সংগীত হিসেবে তিনটি গানই চলে আসছে। তবে, যেটি বেশী চলে, তা হল 'সুইস্ গীতি' (Cantique Suisse)।

॥ নরওয়ের জাতীয় সংগীত ॥

ভারতবর্ষ ছাড়া আর মাত্র একটি দেশের কথা বলা যেতে পারে যার জাতীয় সংগীত রচনা করেছিলেন নোবেল-পুরস্কার পাওয়া একজন মহাকবি। সে দেশ হল নরওয়ে। সে দেশের জাতীয় সংগীতটি লিখে দিয়েছিলেন ব্যোর্নস্টার্ন ব্যোর্নসন। গানটিকে বলা হয় 'নরওয়ের সংগীত'। তার আরম্ভ হয়েছে এই বলে : 'হাঁ, আমি এই দেশকেই ভালবাসি'।

॥ সুইডেনের জাতীয় সংগীত ॥

নরওয়ের পাশেই সুইডেন, তার জাতীয় সংগীতের নাম হল 'সুইডেনের এই হৃদয় হতে'।

॥ বেলজিয়াম ও গ্রীসের জাতীয় সংগীত ॥

. বেলজিয়ামের জাতীয় সংগীত হচ্ছে 'লা ব্রাবাঁসন', আর গ্রীসের হল 'এথ্‌নিকস্ ইম্নস্', মানে, জাতীয় গাথা।

॥ রাশিয়ার জাতীয় সংগীত ॥

ইংরেজদের আর অন্য কোনও কোনও জাতির জাতীয় সংগীত অনেকদিন ধরে আছে বটে, কিন্তু কোনও কোনও দেশে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে জাতীয় সংগীতও বদলে গিয়েছে। জার্মানীতে যখন রাজার রাজত্ব ছিল, তখন সে দেশের জাতীয় সংগীত ছিল রাজাকেই নিয়ে। রাশিয়াতেও যতদিন রাজা ছিলেন, ততদিন সেখানেও ছিল তাই। তারপর জার্মানীর রাজা কাইজারও গেলেন, রাশিয়ার সম্রাট্ জারও থাকলেন না। তখন জার্মান জাতীয় সংগীত হলঃ 'পিতৃভূমি জগতের সকলের সেরা' (Deutsch-uberalles, uberalles in der welt). আর, রাশিয়ার হলঃ 'ইন্টারন্যাশনাল'।

॥ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ॥

এবার আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী, পৃথিবীর সব চাইতে নতুন রাষ্ট্র, বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের কথা বলা হচ্ছে। পাকিস্তানের অধীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে আগেকার দিনের পূর্ব-বাংলা নতুন নাম নিল 'বাংলাদেশ'—এই মোটে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন তার নতুন জাতীয় সংগীত বলে নির্ধারিত হল রবীন্দ্রনাথেরই লেখা আর একটি গান—

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'।

এ গানটিও বেশ বড়, তার প্রথম পাঁচ লাইন হচ্ছে এইঃ

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায় হায় রে—
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি!'

গানটি অনেকদিন আগেকার, কিন্তু জাতীয় সংগীত হিসেবে এর বয়স পৃথিবীর আর সব জাতীয় সংগীতের চাইতে কম।
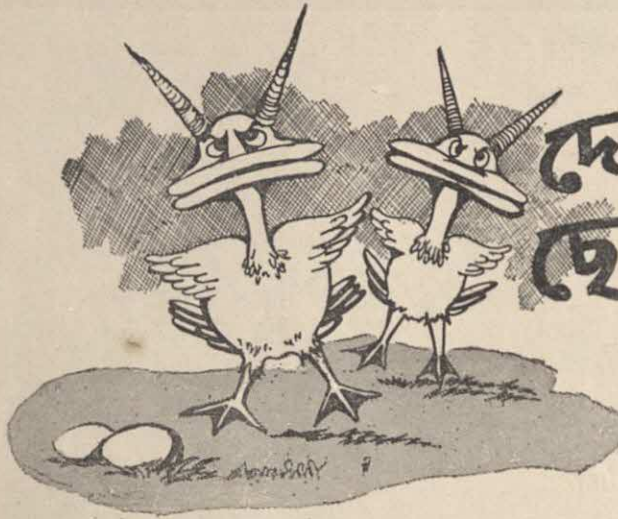
পৃথিবীতে এমন দেশ নেই যেখানে ছেলেভুলানো ছড়া নেই, আর এমন ছোট ছেলেমেয়েও নেই যে কোনও ছড়া শোনে নি কিংবা জানে না। আমাদের বাঙালী ঘরের শিশুরা তাদের জ্ঞান হবার আগে শুনেছে তাদের মা, ঠাকুমা বা দিদির মুখে ঘুম-পাড়ানী ছড়া।

সব ছড়াই বেশ শুনতেও মজা, বলতেও মজা। তারই মধ্যে আবার কতকগুলো আছে, সেগুলো হচ্ছে খেলার ছড়া। অনেক খেলা আছে যেগুলি ছড়া বলে বলে খেলতে হয়। যেমন, 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে', কিংবা 'ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি, চামে কাটা মজুমদার'। মেয়েদের খেলার একটিতে 'কি খবর আয়ী লো? রাজার একটি বালিকা চাইলো!' বলে দু'পক্ষকে ছড়া কাটতে হয়। আবার তাদের ঘুঁটি খেলার সময় 'কুসুম কুসুম কুসুমটি' বলে একটি ছড়া বলে যেতে হয় যেন সেটি একটি মন্ত্র।

॥ নার্সারী রাইম ॥

এ কি শুধু আমাদের দেশে? যার মধ্যে উলটো-পালটা কয়েকটা কথা আছে, যার হয়তো মানে নেই, কিন্তু যাতে মজা আছে, অদ্ভুত আর উদ্ভট সব কথা আছে—এমন সব ছেলেভুলানো ছড়ার অভাব নেই কোনও দেশে।

ইংরেজীতে এগুলোকে বলা হয় 'নার্সারী রাইম'। এসব ছড়া যে কে কবে লিখেছিলেন, কিংবা কতকাল থেকে চলে আসছে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। ইংরেজী ছড়ার মধ্যে বেশির ভাগকে বলা হয় Mother Goose's Rhymes, মানে 'গুজ ঠাকরুনের ছড়া'। কিন্তু গুজ ঠাকরুন আবার কে?

কেউ বলে যে তাঁর আসল নাম ছিল কুঈন গুজফুট। প্রায় তিনশো বছর আগে ফ্রান্স দেশে তাঁর নাম দিয়ে এক ভদ্রলোক একটা ছোটদের গল্পের বই বের করেন। সে তো হল রূপকথা। কিন্তু ছড়া? ছড়া এল তার তিরিশ বছর বাদে।

॥ মাদার গুজ মেলডিজ ॥

এবার ফ্রান্স দেশে নয়, ইংল্যাণ্ডে বের হল এক-খানা ছড়ার বই—তার নাম 'মাদার গুজ মেলডিজ'। তারপর এই গুজ ঠাকরুনের নাম দিয়েই অনেক ছড়ার বই বেরোতে লাগল। আর, সেই ছড়াগুলো ছড়াতে ছড়াতে পৌঁছলো গিয়ে সাগরপার হয়ে আমেরিকাতে।

॥ গুজ ঠাকরুনের ছড়া ॥

শুধু ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা নয়, পৃথিবীর যে সব দেশে ইংরেজীই প্রধান ভাষা, সেখানে এই গুজ ঠাকরুনের ছড়া ছোটদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাদের সংখ্যা বড় কম নয়। কয়েকটার নমুনা দেওয়া যাক:

(১)

Jack and Jill
Went up the hill
To fetch a pail of water—
Jack fell down,
And broke his crown,
And Jill came tumbling after.

মানে—

জ্যাক আর জিল, দু'য়ে
পাহাড়েতে উঠল গিয়ে
এক বালতি জল আনবে বলে—
জ্যাক গেল পড়ে,
তার চাঁদি গেল উড়ে,
উলটে পালটে জিল পিছে এল চলে।

(২)

Humpty-dumpty sat on a wall,
Humpty-dumpty had a great fall.
And all the king's horses and all the king's men
Could not set up Humpty-dumpty again.

অর্থাৎ

হাম্পটি-ডাম্পটি বসে দেয়ালেতে চড়ে,
হাম্পটি-ডাম্পটি গেল ধুপ্ করে পড়ে।
তখন রাজার যত সিপাই-সৈন্য, আর রাজার যত ঘোড়া
হাম্পটি-ডাম্পটিকে করতে পারল না ক' খাড়া।

(৩)

Little Boy Blue, come, blow your horn,
The sheep's in the meadow,
the cow is in the corn.

জ্যাক গেল পড়ে

'Where's the little boy that looks after
the sheep?'
'He's under the haystack, fast asleep.'

এর মানে হল:

নীল নীল নীলু, আয় তোর ভেঁপুতে ফুঁ দে,
ভেড়া ঢুকল মাঠে, গরু ক্ষেতে ঢুকেছে।
যে ছেলেটা ভেড়া চরায়, কোথায় গেল সে?
পোয়ালগাদার তলায় সে তো ঘুমিয়ে রয়েছে।

(৪)

Little Miss Muffet sat on a tuffet,
Eating her curds and whey—
Along came a spider,
And sat down beside her,
And frightened Miss Muffet away.

বাংলায় এর মানে করা যায় এই রকম:

ছোট্ট মিস্ মাফেট্, সে গদীর উপর উঠে বসে
খাচ্ছিল তার পান্তাভাত আর গুড়।
মাকড়শা এক এগিয়ে এসে, বসল যে তার গায়ে ঘেঁষে,
মিস্ মাফেট্ ভয়ের চোটে দিল চোঁচা দৌড়।

॥ ফরাসী ছড়া ॥

এবার ইংরেজীর পর একটি ফরাসী ছড়ার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হচ্ছে—

আমার লক্ষ্মী কোলিন ভাই!
ছি ছি, অত কাঁদতে নাই।
শোন, শোন, মা করেছেন কত রকম পিঠে,
তোমারই তো জন্যে সে সব, খেতে কত মিঠে।
বাবা রেখেছেন কত ভাল ভাল মিঠাই—
কান্না রেখে এখন সে সব খাবে চল যাই!
ছি ছি, আর কেঁদো না ভাই!

তারপর, জার্মানীর ছেলেমেয়েদের একটি ছড়া ঃ

চাঁদামামার কাছে
একটা ভেড়ার ছানা আছে।
তাকে নিয়ে চাঁদামামা থাকে তারার দেশে।
কখনও বা এসে,
উঁকি মেরে যায়
মোদের ছাদের কিনারায়।
তবু তাকে পারবে না কো, পারবে না কো ছুঁতে,
চাঁদামামা নীল আকাশে অনেক উঁচুতে।
লক্ষ তারা তাকে ঘিরে হাসে, শুধুই হাসে,
ঝগড়াবিবাদ নেইকো সেথা ভালবাসার দেশে।

এবার রাশিয়ার ছোটদের একটি ছড়ার বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া গেল ঃ

খুকুরানী গেল কোথায়? দেখ'সে বাগানে,
গালচে পাতা সবুজ ঘন ঘাসের যেখানে,
তারই পাশে গাছে গাছে দুলছে কত ফুল,
তারই মধ্যে দেখছি খুকুর ঝাঁকড়া মাথার চুল।
কাজের মেয়ে, সাঁঝের রাঙা আলোয় আপন মনে,
রাঙা জামা বোনে।

॥ মহারাষ্ট্রের ছড়া ॥

বিদেশের এতগুলো ছড়া তো হল, এখন দেখা যাক ভারতেরই মধ্যে নানা রাজ্যে কি রকমের ছড়া কোথায় বলে। প্রথমেই বলি মহারাষ্ট্রের ছেলে-মেয়েদের মুখে কি রকম ছড়া শোনা যায়।

চাঁদামামার কাছে
একটা ভেড়ার ছানা আছে

মহারাষ্ট্রের ভাষা হল মারাঠী। আগে আসল মারাঠী ছড়াটি দেওয়া হচ্ছে, তারপর বাংলায় তার মানে ঃ

য়ে রে য়ে রে পাউসা।
তুলা দেতো প্যায়সা।
প্যায়সা ঝালা খোটা।
পাউস আলা মোটা।

পাউস পড়লা ঝিম ঝিম ঝিম
অঙ্গন ঝালে ওলে চিম্ব
পাউস পড়লা মুসল ধার
রাস ঝালে হিরবেগার।

(বাংলা)

আয়রে আয়রে বর্ষা,
তোকে দেবো পয়সা,
কড়িগুলো কানা,
বিষ্টি দিল হানা।

পড়লো বিষ্টি ঝিম ঝিম,
উঠোন ভিজে তিমতিম,
ঝরলো বিষ্টি মুষল ধারে,
সবুজ ক্ষেত গেল ভরে।

(২)

দিন দিন দিবালী।
গাই ম্হোশী ওবালী।
গাই ম্হোশী কুণাচ্যা ?
লক্ষ্মণাচ্যা।
লক্ষুমণ কুণাচ্যা ?
আইবাপাচ্যা।
দে মাই খোরাব্যাচী বাটী।
বাঘাট্যা পাটীত ঘালীন কাটী ॥

(বাংলা)

দিন দিন দেওয়ালী।
গরু মহিষ ওয়ালী।
গরু মহিষ কার ?
লক্ষুমণ নাম যার।
লক্ষুমণ সে কাদের ?
মায়ের আর বাপের।
দে একমালা নারকোল,
বাঘার পিঠের ছাল তোল।

॥ গুজরাটের ছড়া ॥

মহারাষ্ট্রের উত্তরেই গুজরাট, সেখানকার ভাষা গুজরাটী। গুজরাটের ছেলেমেয়েরাও ছড়া কাটতে ওস্তাদ। যেমনঃ

(১)

এক মুরখমে এভী টেব।
পত্থর এটলা পুঝে দেব।
পাণী দেখী করে স্নান।
তুলসী দেখী তোড়ে পান।

(বাংলা)

এক যে বোকা, তার এমনি মজা।
পাথর পেলেই করবে পূজা।
জল দেখলেই ধোবে মাথা।
তুলসী পেলেই ছিঁড়বে পাতা ॥

(২)

মামানু ঘর কেটলে ?
দীবো জুড়ে এটলে।
দীবো তো মেঁ দীঠো।
মামো লাগে মীঠো।

(বাংলা)

মামার বাড়ী কোথা ?
জ্বলছে আলো যেথা।
আলোয় পড়ল দিষ্টি,
মামা বড় মিষ্টি।

(৩)

তানী পাড়ো ছোকরা।
মামা লাবে টোপরা।
টোপরা তো ভাবে নহিঁ।
মামা টোপরা লাবে নহিঁ।

(বাংলা)

হাততালি দাও খোকন সোনা,
নারকেল নিয়ে আসবে মামা।
নারকেল খেতে ভাল না।
মামা তবে আনবে না।

তুলসী পেলেই ছিঁড়বে পাতা

॥ তামিল ছড়া ॥

এইবার তামিল ছড়া। তামিল হল দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষা। মাদ্রাজ বা তামিলনাড়ু রাজ্যের মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। নীচে যা দেওয়া হল, তা শুধু আসল তামিলের বাংলা অনুবাদ :

(১)

কালো কাক, কালো কাক,
মিছেই চেঁচাও,
খোকনকে চোখের কাজল
এনে দিয়ে যাও।
ছোট পাখি, ছোট পাখি,
নিয়ে এস ফুল।
সাতরঙা ফুলে খোকার
সাজিয়ে দেব চুল।
সারস, সারস, ঠোঁট ভরে
মধু এনে দেবে।
টিয়া পাখি, দুধ এনে দাও,
খোকনমণি খাবে।

(২)

খোকনমানিক চলে,
হাত দু'খানা দোলে।

খোকনমানিক চলে

খোকা গেল দোকানে,
খাবার বানায় যেখানে।
দোকান খোলো, খোকন খাবে
মণ্ডা মিঠাই যা যা পাবে।
হাত দু'খানা তুলতুল
দোলে দোলে দোদুলদুল।

॥ হিন্দী ছড়া ॥

হিন্দী ছড়াও আছে অসংখ্য। তা' থেকে দু'চারটির নমুনা দেওয়া হল :

(১)

চন্দামামা দূরকে।
পুএ পাকায়েঁ পূরকে।
আপ খায়েঁ থালীমে।
বচ্চো কো দেঁ প্যালীমে।
প্যালী গয়ী টুট।
চন্দা গয়া রুঠ।

(বাংলা)

চাঁদা মামা অনেক দূর।
পিঠে বানান ভরে পুর।
নিজে তা খান থালায়।
ছেলেদের দেন পেয়ালায়।
পেয়ালা গেল টুটে।
চাঁদা রেগে ওঠে।

(২)

রাজা বেটা নিকলা ঘর সে।
রাজা বেটা চলা মদরসে।
দুখী জাতা হসতা হসতা।
লিয়ে হাথ মে অপনা বস্তা।

(বাংলা)

রাজার বেটা বাড়ি থেকে বেরোলো।
রাজার বেটা পাঠশালে চললো।
হাসতে হাসতে দুখীরাম যায়।
নিজের বস্তা নিয়ে মাথায়।

(৩)

অম্মা অম্মা রোটী দে।
আজ হুঁ মৈঁ ছুটী লে।
মীঠা মীঠা দুধ পিলা।
দের ন কর মা জলদী আ।

(বাংলা)

মা গো মা গো দাও রুটি,
আমি তো আজ নিলাম ছুটি।
মিষ্টি দুধ খাওয়াও, মা!
দেরি মোটে করবে না।

(৪)

গুড়িয়া জায়গী সসুরাল
মেরী রো রো কে।
একজনী তরকারী ছোকো,
এক বনাও পুরী,
খাতে খাতে থক জায়গী
সাঁস কী ঘর কে তুরী,
হো সাঁস কী ঘরকে তুরী।

(বাংলা)

পুতুল যাবে শ্বশুরবাড়ি
তাই কাঁদতে লেগেছে।
কেউ তোরা তরকারী কোট,
কেউ লুচি ভেজে দে।
খেতে খেতে হাঁপিয়ে যাবে
শ্বশুরবাড়িতে।

॥ বাংলা ছড়া ॥

এবার আমাদের নিজেদের বাংলা ছড়া কয়েকটা দেওয়া হল :

(১)

আয় আয় চাঁদামামা টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব, ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গরুর দুধ দেব, দুধ খাবার বাটী দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥

(২)

ও পাড়ার ময়রা বুড়ো,
রথ করেছে তেরো চুড়ো।
তোদের হলুদ-মাখা গা।
তোরা রথ দেখতে যা।
আমরা পয়সা কোথা পাব,
আমরা উলটো রথে যাব।

(৩)

হট্টিমা টিম টিম,
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং,
তারা হট্টিমা টিম টিম।

॥ ছড়ার মাধ্যমে নানা জ্ঞানের কথা শেখা ॥

একরকম ছড়া আছে, যা থেকে উপদেশ পাওয়া যায়। ছড়ার মাধ্যমে শিশুরা নানা জ্ঞানের কথা শেখে। যেমন :

(১)

সকাল সকাল উঠব,
কত বই পড়ব।
বাবার কথা মানব,
মায়ের কথা শুনব।
হব অনেক বড়।
সকল কাজে দড়।
বলবে সবাই বেশ,
বড় হবে দেশ।

পুতুল যাবে শ্বশুরবাড়ি

(২)

উঠবে ঝড়, উঠুক রে,
দুলবে তরী, দুলুক রে
পড়বে বাজ, পড়ুক রে,
ঝরবে জল, ঝরুক রে.
এগিয়ে যাব, যাবই রে,
কূলের দেখা পাবই রে,
সমুখ পানে এগিয়ে চল্,
চল্ এগিয়ে, এগিয়ে চল্।

॥ বাংলা ঘুমপাড়ানী ছড়া ॥

ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে অন্য ধরনের ছড়া হচ্ছে ঘুমপাড়ানী ছড়া। বেশির ভাগ সময়েই তাতে ঘুমের কথা থাকে, আর সে-ছড়াগুলি বেশ বড় হয় যাতে খানিকক্ষণ ধরে ছড়াটা বলা যায়। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ

ঘুমপাড়ানী মাসীপিসী আমাদের বাড়ি এসো।
খাট নেই, পালঙ্ক নেই, জাদুর চোখ পেতে বসো।
ইত্যাদি—

চাঁদ উঠেছে, ঘুমো রে তুই
সোনার চাঁদের মতো

কিংবা—

খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?
ইত্যাদি—

॥ মাওরি জাতির ঘুমপাড়ানী ছড়া ॥

এখন অন্য দেশের দুটি ঘুমপাড়ানী ছড়া দেওয়া হচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে মাওরি বলে এক জাতির ঘুমপাড়ানী ছড়া। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে নিউ জীল্যাণ্ড দেশ একটা দ্বীপপুঞ্জ. তার আদিবাসীদের নাম মাওরি। অন্যটি হচ্ছে জাপানীদের ঘুমপাড়ানী ছড়া। এখানেও আসল ছড়া দুটি দেওয়া হল না, বাংলা অনুবাদই শুধু দেওয়া হল। অনুবাদ করেছেন বিখ্যাত কবি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মাওরিদের ছড়াটি এই—

খোকা আমার, খোকা আমার,
'তুল' তুলসীর পাতা।
বেনামুলের গুচ্ছ আমার,
রাখ রে বুকে মাথা।
মৃগনাভির কৌটা আমার,
খোকা ঘুম যায়।
গুগ্‌গুলু ধুপ ধুনার আবেশ
খোকার চোখে আয়।

॥ জাপানী ছড়ার বাংলা অনুবাদ ॥

জাপানীদের একটি ছড়া বেশ বড়, তাই তার শুধু প্রথম কয়েক লাইন দেওয়া হল ঃ

ঘুমো আমার সোনার খোকা,
ঘুমো মায়ের বুকে।
আকাশ জুড়ে উঠলো তারা,
ঘুমো রে তুই সুখে।
হাত পা নেড়ে কান্না কেন,
কান্না কেন এত?
চাঁদ উঠেছে, ঘুমো রে তুই
সোনার চাঁদের মতো।
একটি দিয়ে চুমো—
ঘুমো রে তুই ঘুমো।

॥ ইংরেজ ভারত ছাড়ল ॥

১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। দীর্ঘ পরাধীনতার পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দিনটিতে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

বহুকাল ধরে ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষ অধিকার করে রেখেছিল। একদিন তারা এদেশে এসেছিল বণিকের বেশে বাণিজ্য করতে। পরে ছলেবলে-কৌশলে এদেশটা অধিকার করে নিয়ে এখানকার কোটি কোটি টাকার সম্পদ্ নিজেদের দেশে পাঠাতে লাগল। এখানকার লোকের উপর চালাতে লাগল ভীষণ অত্যাচার, উৎপীড়ন।

ইংরেজ জাতির শাসন শোষণ অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন ভারতের নির্ভীক সন্তানবৃন্দ। তাঁরা শুরু করলেন স্বাধীনতা আন্দোলন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল কোটি কোটি দেশবাসী। ইংরেজ সরকার স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করতে প্রাণপণে চেষ্টা করল—স্বাধীনতার বীর যোদ্ধাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করল—তাদের ধরে ধরে ফাঁসি দিল—তবু তারা স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করতে পারল না। দিনে দিনে তা দুর্বার হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর নেতৃবৃন্দ ও যোদ্ধাদের কাছে ইংরেজকে মাথা নত করতে হল—তারা ভারত ছাড়ল। ভারতের আকাশে উড়ল স্বাধীন তেরঙ্গা পতাকা। যে সকল নেতা ও বীর যোদ্ধার অক্লান্ত পরিশ্রম ও মহান্ আত্মত্যাগে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তাঁদের কয়েক জনের জীবনকথা বর্ণিত হল।

॥ রাজা রামমোহন রায় ॥

আঠার শতাব্দী। সমস্ত দেশটা ডুবে আছে অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার অন্ধকারে। সেই সময় আবির্ভূত হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩)। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার পথ খুলে গেল—আইন করা হল অভিশপ্ত 'সতীদাহ'র মতো বীভৎস সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে—ধর্মের ক্ষেত্রে এল নতুন জোয়ার। তিনিই সর্বপ্রথম বিলেতে গিয়ে ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র ইংরেজজাতির সামনে তুলে ধরলেন। তাঁর অক্লান্ত সাধনায় ভারতবাসী জাতীয় উন্নতির পথের সন্ধান পেল।

॥ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

ভারতের দিকে দিকে জ্বলে উঠল অসংখ্য উজ্জ্বল দীপ। শিক্ষার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে এল নতুন জোয়ার। উনবিংশ শতকে দেশের মধ্যে সে এক আশ্চর্য নবজাগরণ। কবি **রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮২৬-১৮৮৭ খ্রীঃ) গাইলেন—

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়!

॥ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৪-১৯০৩ খ্রীঃ) একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি তাঁর বহু কবিতার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। তিনি দুঃখ করে লিখলেন 'ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়'।

॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রীঃ) 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্যে জাতীয় বিপ্লবের কথা লিখলেন—জাতিকে দিলেন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র।

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ॥

দক্ষিণেশ্বরের নিভৃত আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করতে লাগলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২ খ্রীঃ)। তিনি জাগরণী মন্ত্র দিয়ে জাতির বুকে চেতনা জাগাতে লাগলেন।

॥ সিপাহী বিদ্রোহ ॥

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হল সিপাহী বিদ্রোহ। ভারতীয় সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মীরাট প্রভৃতি জায়গায় বিপ্লবের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠল। ইংরেজ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে সিপাহীদের দমন করল। সিপাহীরা পরাজিত হল বটে, কিন্তু জাতির মনে রেখে গেল গভীর ছাপ। 'ইতিহাসের কথা' অধ্যায়ে এর কথা বলা হয়েছে।

ভারতবাসী নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হল। ঋষি **রাজনারায়ণ বসু** (১৮২৬—১৮৯৯) প্রতিষ্ঠা করলেন "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারণী" নামে এক প্রতিষ্ঠান। **মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ** (১৮৪২—১৯১১) প্রতিষ্ঠা করলেন "ইণ্ডিয়া লীগ"। রাজনীতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৪৮—১৯২৫), **আনন্দমোহন বসু** (১৮৪৭—১৯০৬) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

॥ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

সুরেন্দ্রনাথ ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ দেখিয়েছিলেন। বিলেত থেকে আই. সি. এস. পাস করে তিনি এদেশে ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিলেন। কিন্তু ইংরেজের চক্রান্তে তাঁর সে চাকরি গেল। তিনি দেশের সেবায় মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন "ভারত সভা" (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। এই "ভারত সভা"র প্রেরণা থেকে দু'বছর পরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর সংক্ষেপে "কংগ্রেসের" জন্ম হয়েছিল।) 'কংগ্রেস' সংগঠিত হলে সুরেন্দ্রনাথ সেখানে যোগ দিয়ে দীর্ঘকাল নানাভাবে ভারতবাসীর সেবা করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালান অকটেভিয়ান হিউম নামে এক ইংরেজ সিভিলিয়ানের প্রচেষ্টায় "ভারতের জাতীয় **কংগ্রেসে"র** জন্ম হল। প্রথম অধিবেশন হল বোম্বাই-এ। সভাপতি হলেন **উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৪৪—১৯০৬)।

॥ কংগ্রেস—ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল ॥

ধীরে ধীরে কংগ্রেস ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। ভারতের চিন্তাশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে যোগদান করে ভারতবাসীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করতে লাগলেন। কংগ্রেস হয়ে উঠল সমগ্র ভারত-বাসীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলনের প্রতীক।

কালক্রমে কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে দুটো দল দেখা দিল। এক দলকে বলা হত 'নরমপন্থী' ও অন্য দল ছিল 'চরমপন্থী'। নরমপন্থী দল ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন লাভ করার পক্ষপাতী ছিলেন। আর

লালা লাজপত রায়

বালগঙ্গাধর তিলক

'চরমপন্থী' দল আবেদন-নিবেদনের পথে না গিয়ে প্রয়োজন হলে অস্ত্রের সাহায্যে নিজেদের অধিকার অর্জন করতে চেয়েছিলেন। নরমপন্থী দলের সঙ্গে চরমপন্থী দলের মতভেদ লেগেই থাকত। চরমপন্থী দলে ছিলেন 'লাল-বাল-পাল' অর্থাৎ লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক (লোকমান্য তিলক) ও বিপিনচন্দ্র পাল। এ দলে শ্রীঅরবিন্দও ছিলেন।

॥ লালা লাজপত রায় ॥

লালা লাজপত রায় (১৮৬৫—১৯২৮) পঞ্জাবের জননায়ক। বাঘের মতো বিক্রম তাঁর। যৌবনে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। কংগ্রেসে এসে দেখলেন, সেখানে কাজের কাজ কিছু হয় না, শুধু বড় বড় নেতার বক্তৃতার ফুলঝুরি। তিনি সাত বছর কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখলেন না। পরে তিনিই কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান স্তম্ভে পরিণত হয়েছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনিই ছিলেন সভাপতি। দেশের জন্য তিনি দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন।

॥ বালগঙ্গাধর তিলক ॥

বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৭—১৯২০) মহারাষ্ট্রের

মুকুটহীন রাজা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিলক (সঠিক উচ্চারণ 'টিড়ক') মহারাষ্ট্রের মানুষের মনে নতুন চেতনা এনে দিলেন 'শিবাজী উৎসব' ও 'গণপতি উৎসব' প্রবর্তন করে। দেশের মানুষ বীরধর্মে দীক্ষা নিল। তিলক ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি একদিকে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশবাসীর অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, অন্যদিকে সাধারণ লোক যাতে মন থেকে কুসংস্কার দূর করে সত্যসাধনায় ব্রতী হয়, সেজন্যও তিনি চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজ সরকারের রোষে পড়ে তাঁকে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

॥ বিপিনচন্দ্র পাল ॥

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৫—১৯৩২) ছিলেন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং অসামান্য বাগ্মী। দেশের কল্যাণের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ইংরেজ সরকারের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি অগ্নিবর্ষী ভাষায় দেশবাসীকে উদ্দীপিত করে তুলতেন। তাঁর ভাষণ লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে

বিপিনচন্দ্র পাল

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

শুনত। তাঁর আহ্বানে বাংলার হাজার হাজার যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

॥ গোপালকৃষ্ণ গোখলে ॥

তখনকার দিনে স্বাধীনতা আন্দোলনের আর একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন **গোপালকৃষ্ণ গোখলে** (১৮৬৬—১৯১৫)। তিনি জাতিতে মারাঠী। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী শিক্ষক। শিক্ষকতা-সূত্রে তিনি একদল সত্য ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শবাদী যুবক সৃষ্টি করেছিলেন। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর ইংরেজরা নির্মম অত্যাচার শুরু করলে তিনি সেখানে গিয়ে তার প্রতিকার করেছিলেন।

॥ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ॥

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে শুরু হল **বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।** লর্ড কার্জন বাংলা দেশকে ভেঙে টুকরো করেছিলেন। সমস্ত দেশ তাঁর এই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। দেশের মধ্যে একনাগাড়ে সভাসমিতি মিছিল আন্দোলন চলতে লাগল। এই

উপলক্ষে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করল।

॥ দাদাভাই নওরোজী ॥

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি **দাদাভাই নওরোজী** (১৮২৫—১৯১৭) বললেন যে স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য। নরমপন্থীরা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস পরিত্যাগ করে "অল ইণ্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন" নামে একটি দল গঠন করলেন।

॥ মহাত্মা গান্ধী ॥

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী ও অরবিন্দ ঘোষের আবির্ভাব ঘটল।

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯—১৯৪৮) দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্যাতিত ভারতীয়দের জন্য সংগ্রাম করে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফিরে এসে তিনি পুরোপুরিভাবে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি আমেদাবাদে 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করলেন। বিহারের নীলকরদের বিরুদ্ধে 'চম্পারণ আন্দোলন' করে তিনি নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ডায়ার অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালা বাগ নামে একটি মাঠের মধ্যে নিরস্ত্র হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল। মহাত্মা গান্ধী শুরু করলেন ইংরেজ সরকারের সঙ্গে 'অসহযোগ আন্দোলন'। কংগ্রেসও এই আন্দোলন সমর্থন করল।

গান্ধীজীর আহ্বানে পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ খ্যাতনামা আইন-বিদ্‌গণ আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হাজার হাজার ভারতবাসী সরকারী চাকরি ত্যাগ করলেন। 'আইন অমান্য আন্দোলন', 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' প্রভৃতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী ইংরেজ সরকারের প্রাণে দারুণ ভীতি জাগিয়ে তুললেন। ইংরেজ সরকার কতবার যে তাঁকে জেলে পুরেছে, তার ঠিক নেই। গান্ধীজী একদিকে যেমন ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, অন্যদিকে জাতির চিত্তকে শুদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। রাজনৈতিক অশান্তি বা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দূর করার জন্য তিনি উপবাস করে চিত্তকে শান্ত রেখেছেন ও মানুষকে শান্ত হবার উপদেশ দিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন পথে পরিচালনা করেছিলেন।

॥ পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু ॥

পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু (১৮৬১—১৯৩১) এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী। গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি দু'বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'স্বরাজ্য পার্টি' গঠনের তিনি প্রধান সহায়ক ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁকে কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। মতিলালের সুযোগ্য পুত্র জহরলাল নেহ্‌রু পরবর্তী কালে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

॥ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০—১৯২৫) বাল্যকাল থেকেই দেশকে ভালবাসতে শিখেছিলেন। বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়বার সময়ই তিনি সুবক্তা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আলিপুর বোমার মামলায় যখন অরবিন্দ, বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের কারারুদ্ধ করা হল, তখন চিত্তরঞ্জন তাঁদের পক্ষ সমর্থন করে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে যেভাবে সওয়াল করলেন, তাতে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। ব্যারিস্টারিতে তিনি দৈনিক হাজার হাজার টাকা উপায় করতেন। গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি সব ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর মহান্ ত্যাগে দেশবাসী তাঁর নাম দিলেন 'দেশবন্ধু'।

একদিকে চলছিল বিপ্লববাদী আন্দোলন, অন্য-দিকে চলছিল কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। চিত্তরঞ্জন দাশ 'স্বরাজ্য দল' গঠন করে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে লাগলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত অন্যতম।

॥ শ্রীঅরবিন্দ ॥

এর আগেই দেশের মধ্যে শুরু হয়েছিল বিপ্লবী আন্দোলন। এই বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন **শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ** (১৮৭২—১৯৫০)। অরবিন্দের শিক্ষা-দীক্ষা সব বিলেতে। বরোদার মহারাজা তাঁকে উচ্চ বেতনের চাকরি দিয়ে ভারতে নিয়ে এলেন। বরোদায় চাকরি করার সময়ই তিনি বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠন করলেন।

আলিপুর জেলে থাকার সময় অরবিন্দের মনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। মুক্তি লাভ করে তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি 'শ্রীঅরবিন্দ' বলেই বেশী পরিচিত।

॥ বারীন ঘোষ ॥

বারীন ঘোষ শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই। ছোটবেলা থেকেই তিনি দুঃসাহসী। বাংলার বিপ্লবীদের সংগঠনে তিনি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ক্ষুদিরাম ধরা পড়ার পর পুলিস মাণিকতলা বাগানে অন্যান্য বিপ্লবীর সঙ্গে বারীন ঘোষকে গ্রেফতার করে।

পুলিস মাণিকতলা বাগান থেকে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ সেন, হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের গ্রেফতার করল।

বাগবাজার থেকে গ্রেফতার করল কানাইলাল দত্তকে, মেদিনীপুর থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে এবং শ্রীরামপুর থেকে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে।

বারীনের বিচার হল। প্রথমে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল কিন্তু পরে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। বারীন ঘোষ দেশের জন্য হাসিমুখে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে গেলেন।

॥ ক্ষুদিরাম বসু ॥

ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯—১৯০৮) বাংলার বীর শহীদ। সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম কিশোর বয়সেই মনে-প্রাণে বিপ্লবী হয়ে পড়লেন। কলকাতায় এসে বারীন ঘোষের কাছ থেকে বোমা নিয়ে তিনি আর প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে যাত্রা করলেন কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য।

মজঃফরপুরে এসে তাঁরা কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুড়লেন। প্রচণ্ড শব্দ করে বোমা ফাটল ও গাড়িতে আগুন ধরে গেল। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী দৌড়ে পালালেন।

॥ প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা ॥

পরে জানা গেল কিংসফোর্ড মারা যান নি। কিংসফোর্ড সেই ফিটনে সেদিন ছিলেন না। দু'জন নিরীহ মেমসাহেব ছিলেন।

পুলিস ক্ষুদিরামকে ধরে ফেলল। প্রফুল্ল চাকী নিজের পিস্তলে আত্মহত্যা করলেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি (১৯০৮, ১১ই অগস্ট) হল।

॥ কানাইলাল দত্ত ॥

কানাইলাল দত্ত (১৮৮৭—১৯০৮) চন্দননগরের ছেলে। বাল্যকাল থেকেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের

প্রফুল্ল চাকী
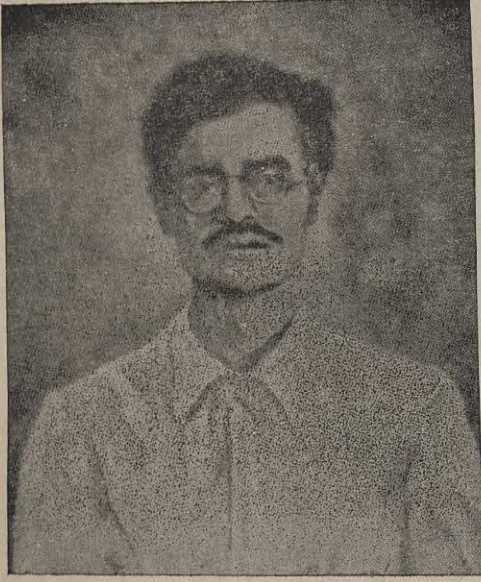
শহীদ কানাইলাল দত্ত

আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। দেশপ্রেম ছিল তাঁর অস্থিমজ্জায়। একটু বড় হয়েই তিনি কলকাতা এসে বারীন ঘোষের দলে যোগ দেন। ক্ষুদিরাম গ্রেফতার হবার পর অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে কানাইলালকেও গ্রেফতার করা হয়। দলের সকলের সঙ্গে তাঁরও বিচার শুরু হয়।

এদিকে হয়েছে কি, নরেন্দ্র গোস্বামী বা নরেন গোসাঁই নামে একজন বিপ্লবীকে পুলিস হাত করে ফেলে। নরেন গোসাঁই মানিকতলার মামলায় সরকারের পক্ষে সাক্ষী হয়ে যান।

কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু দু'জনে মিলে ঠিক করলেন যে এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে হবে।

কানাইলাল গোপনে একটি রিভলভার যোগাড় করেন। তারপর, তিনিও রাজসাক্ষী হবেন বলে নরেন গোসাঁইকে ডেকে আনেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল তাঁকে জেলের মধ্যেই হত্যা করেন।

বিচারে কানাইলালের ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির খবর শুনে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়—শরীরের ওজন বেড়ে যায়। বিচারের সময় বিচারক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: রিভলভার পেয়েছেন কোথা থেকে?

কানাইলাল নির্ভীককণ্ঠে বলেছিলেন: ক্ষুদিরামের আত্মা এসে ওটি আমায় দিয়ে গেছে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর কানাইলালের ফাঁসি হল।

॥ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ॥

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২—১৯০৮) ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভাইয়ের ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি দেশকে ভালবাসতে শিখেছিলেন। যৌবনে তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন আর উপযুক্ত ছাত্র পেলে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিতেন। ক্ষুদিরাম তাঁরই ছাত্র। সত্যেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের বহু যুবককে বিপ্লবের জন্য তৈরি করেছিলেন।

তিনি স্কুলের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় বারীন ঘোষের দলে যোগ দেন। পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করে। জেলে কানাইলালের সঙ্গে তিনিও নরেন গোসাঁই-এর হত্যার অংশ নেন।

কানাইলালের সঙ্গে তাঁরও ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির দিন জল্লাদ যখন তাঁর চোখ বেঁধে দেয়,

শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

তখন তিনি হেসে উঠে বললেন—হে ভগবান্, আমাকে শান্তিতে প্রাণত্যাগ করতে শিক্ষা দাও!

দেশের সব জায়গায় বিপ্লববাদী আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ সরকার হাজার হাজার যুবককে নানা জায়গা থেকে গ্রেফতার করে জেলে পোরে।

॥ বিনায়ক সাভারকর ॥

বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮৩—১৯৬৬) মারাঠাবীর। ছেলেবেলা থেকেই ইংরেজ-বিদ্রোহী। তিনি এমন সব দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন যার জন্য ইংরেজ তাঁর উপর কড়া নজর রাখে। যৌবনে তিনি বৃত্তি নিয়ে পড়াশুনা করতে বিলেত যান। বিলেতে তিনি ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লব আদর্শ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে বিলেতে স্যার কার্জন ওয়াইলীকে হত্যার জন্য মদনমোহন ধিংড়ার ফাঁসি হয়। পুলিসের ধারণা, এর সঙ্গে দামোদরের যোগ আছে। তাঁকে গ্রেফতার করে জাহাজে করে ভারতে পাঠানো হয়। দামোদর জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে ফ্রান্সের মার্সাই উপকূলে ওঠেন। ফরাসী পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করে ভারতে পাঠিয়ে দেয়। ভারতে তাঁর বিচার হয়। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। জাহাজে আন্দামান আসার পথে তিনি আবার সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, কিন্তু পুলিস আবার তাঁকে গ্রেফতার করে। চোদ্দ বছর তাঁকে আন্দামানে জেল খাটতে হয়। মুক্তি পাবার পর তিনি ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন।

॥ ভগৎ সিং ॥

ভগৎ সিং পঞ্জাবের বীর সন্তান। ছেলেবয়স থেকেই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে তিনি বিভোর। পঞ্জাবে তিনি নিজের চেষ্টায় যুবকদের নিয়ে "নওজোয়ান ভারত সভা" নামে একটি দল গড়েন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে বিরাট মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন পঞ্জাবকেশরী লাজপত রায়। মিস্টার স্যাণ্ডার্সের পরিচালনায় এক পুলিস দল লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। একটা পুলিস লাঠি দিয়ে মারতে থাকে লালাজীর মাথায়। লালাজী আহত হলেন। পরে তাঁর মৃত্যু হল। ভগৎ সিং ক্ষেপে গেলেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য দলবল নিয়ে তিনি মিস্টার স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করেন।

শহীদ ভগৎ সিং

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে যখন পরিষদ ভবনে আলোচনা চলছিল, ভগৎ সিং তাঁর সঙ্গী বটুকেশ্বর দত্তের সঙ্গে বোমা বিস্ফোরণকালে পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

॥ যতীন দাস ॥

যতীন দাস (১৯০৪—১৯২৯) জীবনের গোড়ার দিকে ইংরেজ সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়ে কয়েকবার জেল খাটেন। প্রথম দিকে কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী হলেও পরে বিপ্লবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েন। লাহোরে গিয়ে তিনি বিপ্লবীদের সাহায্য করেন। ভগৎ সিংকে তিনিই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যান্য বিপ্লবীর সঙ্গে যতীন দাসকে জেলে পোরা হয়। জেলের মধ্যে বিপ্লবীরা অনশন

শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাস

শুরু করেন। পুলিস অকথ্য অত্যাচার করে তাদের উপর। যতীন দাস এক নাগাড়ে অনশন করে চলেন। পুলিস অত্যাচার করে জোর করে তাঁকে খাওয়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই পারে না। ৬৩ দিন অনশন করার পর যতীন দাসের জীবনদীপ নিভে যায়।

॥ রাসবিহারী বসু ॥

রাসবিহারী বসু (১৮৮০—১৯৪৪) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহান্ বীর যোদ্ধা। আগে ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা, পরে হয় দিল্লী। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হাতির পিঠে চড়ে সস্ত্রীক মহাসমারোহে নতুন রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। চারদিকে হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত ও লোক-লশকর। রাসবিহারী তারই মধ্যে তাঁকে লক্ষ করে বোমা ছুড়লেন। প্রচণ্ড শব্দ করে বোমাটি ফেটে গেল। হস্তিচালক সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। বড়লাট-পত্নী গড়িয়ে পড়লেন হাতির পিঠ থেকে। বড়লাটও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অনেক করেও পুলিস রাসবিহারীকে ধরতে পারল না। তাঁকে ধরার জন্য কুড়ি হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল।

পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনামে রাসবিহারী চলে গেলেন জাপানে। জাপানে গিয়েও তিনি বৈপ্লবিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নেতাজী সুভাষের হাতে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

॥ বাঘা যতীন ॥

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) (১৮৮০—১৯১৫) ছেলেবেলা থেকেই অসাধারণ সাহসী ছিলেন। অল্প বয়সেই একটি বাঘ মেরে তাঁর নাম হয় 'বাঘা যতীন'।

ইংরেজ-জার্মানে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বিরাট এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজন করলেন। জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। জার্মানী দুই জাহাজ ভরতি অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ পাঠাতে রাজী হল। একটি জাহাজ রওনা হল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। ঠিক ছিল, উড়িষ্যার বালেশ্বর উপকূলে এই অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)

দেওয়া হবে। যতীন্দ্রনাথ তিনজন সঙ্গী নিয়ে বালেশ্বর চলে গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ক্রমে পুলিস তাঁর সন্ধান পেয়ে গেল। পুলিস কমিশনার সার্ চার্লস টেগার্ট তিনশো পুলিস নিয়ে এলেন তাঁকে ধরতে। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা বুড়ীবালামের তীরে বীরের মতো যুদ্ধ করলেন।

সকলকে বন্দী ও আহত অবস্থায় বালেশ্বরের হাসপাতালে ভরতি করা হল। যতীন্দ্রনাথের তখন শেষ অবস্থা। মৃত্যুর আগে তিনি এক গ্লাস জল চাইলেন। স্বয়ং চার্লস টেগার্ট জল এগিয়ে দিলেন। যতীন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়েও জলের গ্লাস নিলেন না। বললেনঃ "যার রক্তপান করব বলে পণ করেছিলাম, তার হাত থেকে জল পান করব না।"

যতীন্দ্রনাথের ঐ শেষ কথা। তাঁর অসাধারণ বীরত্বে টেগার্ট সাহেব মুগ্ধকণ্ঠে বলেছিলেনঃ "যতীন্দ্রনাথকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ট্রেঞ্চের মধ্যে যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করেছেন।"

যতীন্দ্রনাথের তিন সহকর্মীর মধ্যে দু'জনের ফাঁসি হল, একজনের হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

॥ "এম. এন. রায়" ॥

যতীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন **নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য** (১৮৯৩—১৯৫৪)। ইনি পরবর্তী কালে মানবেন্দ্রনাথ রায় (সংক্ষেপে "এম. এন. রায়") নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এঁর অবদানও যথেষ্ট। ইনি ভারত থেকে চীন, আমেরিকা ও মেক্সিকোতে যান। সেখানে 'কম্যুনিস্ট পার্টি' সংগঠনে প্রধান ভূমিকা নেন। লেনিন তাঁকে রাশিয়ায় ডেকে পাঠান এবং তাঁর উপর নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেন।

॥ গোপীনাথ সাহা ॥

গোপীনাথ সাহা নামে একজন তরুণ যুবক পুলিস কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করতে সংকল্প করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর। টেগার্ট সাহেবের বদলে তিনি হত্যা করলেন অন্য একজন সাহেবকে। পুলিসের হাতে ধরা পড়ে তাঁর ফাঁসি হল।
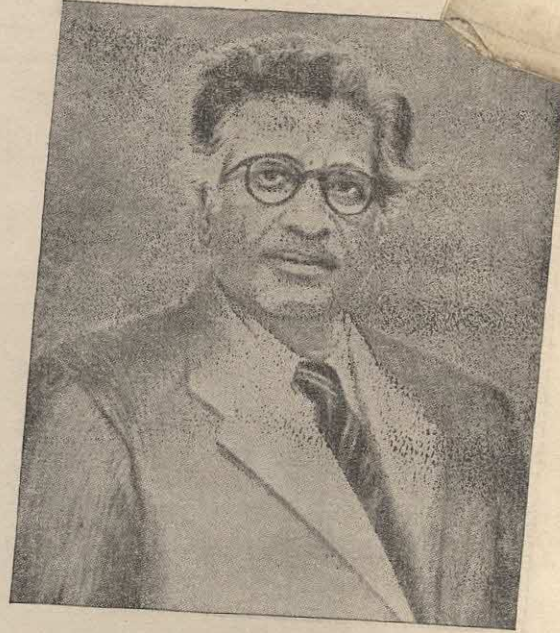
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
(মানবেন্দ্রনাথ রায়)

॥ সূর্য সেন ॥

সূর্য সেন ছিলেন ইস্কুলের শিক্ষক—দেখতে শান্তশিষ্ট নিরীহ। কিন্তু এই শান্তশিষ্ট নিরীহ ইস্কুল শিক্ষকটি একদিন সারা বাংলাদেশ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সূর্য সেন বিপ্লববাদে আস্থা পোষণ করতেন। চট্টগ্রামের সাহসী তরুণ-দলকে নিয়ে তিনি একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। পুলিস তাঁর সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘোরে, কিন্তু তাঁকে ধরতে পারে না।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল। রাত্রি ৯-৪৫ মিনিট। সূর্য সেনের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী দল চট্টগ্রাম পাহাড়ের উপর সরকারী অস্ত্রাগার দখল করে নিলেন। অন্য একটি দল লোকনাথ বলের নেতৃত্বে আর একটি অস্ত্রাগার দখল করলেন। যাঁদের উপর যে যে কাজের ভার ছিল, তাঁরা তা শেষ করে—হেড কোয়ার্টার্সে এসে সূর্য সেনকে সামরিক কায়দায় গার্ড অব অনার দিলেন। সূর্য সেন বললেনঃ অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দাও।

শহীদ সূর্য সেন

বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে শহর দখল করতে ছুটলেন। ইংরেজরা ভয় পেয়ে পালাতে লাগল।

ইতিমধ্যে ইংরেজরা শহরের দিক্ থেকে মেসিন-গানে গুলি বর্ষণ করতে শুরু করেছিল। সূর্য সেন তাঁর দলবল নিয়ে শহরের কাছাকাছি জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিরাট দুই সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এল। এসেই তারা মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়তে লাগল। এগারোজন বিপ্লবী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। ইংরেজ দলেও অনেক লোক মারা গেল। যুদ্ধ চলার সময় সূর্য সেন তাঁর সহকর্মীদের সুবিধেমতো সরে পড়তে আদেশ দিলেন। নিজেও তিনি পাহাড় থেকে নেমে এক বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সূর্য সেন ধরা পড়ে গেলেন। তাঁকে ও তাঁর সহকর্মী তারকেশ্বরকে ইংরেজ সরকার ফাঁসি দিল।

॥ বিনয়-বাদল-দীনেশ ॥

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ঘটল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত নামে তিনজন যুবক রিভলভার নিয়ে সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত চত্বরে ঢুকে পড়লেন। কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। কারণ জেলে রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের জন্য দায়ী এই সিম্পসন।

বিপ্লবীরা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধন করলেন। গুলির আওয়াজ হতেই সারা রাইটার্স বিল্ডিংস সচকিত হয়ে উঠল। লালবাজার থেকে ছুটে গেল সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্য। তাদের সঙ্গে তিন বিপ্লবী-যুবকের লড়াই হল। আরও কয়েকজন ইংরেজ অফিসার নিহত হলেন।

বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়ে এসেছিল। কাজেই তাঁরা শেষ গুলিতে নিজেদের জীবন বিসর্জন দেবার সংকল্প করলেন। বাদল গুপ্ত পটাসিয়াম সাইয়্যানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। বিনয় ও দীনেশকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হল। পাঁচদিন পরে বিনয় সেখানে মারা গেলেন। দীনেশ গুপ্ত সুস্থ হয়ে উঠলেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হল।
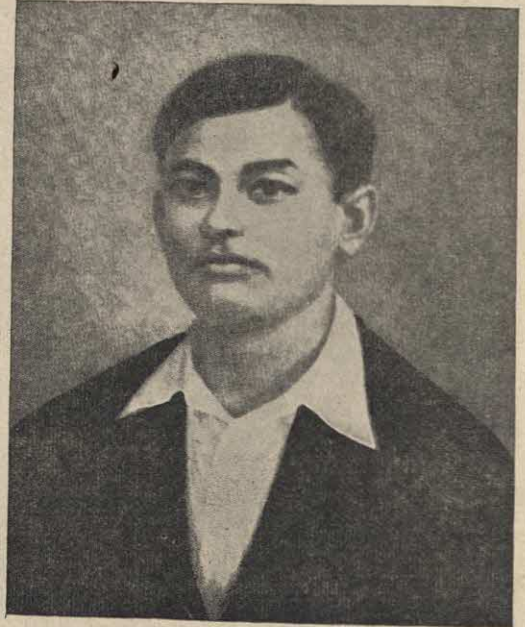
বিনয় বসু

বাদল গুপ্ত

॥ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ॥

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫—১৯৩৩) মহাত্মাজীর আহ্বানে ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দেশের জন্য ইনি বহুবার কারাবরণ করেন। ইনি পাঁচবার কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন।

॥ অশ্বিনীকুমার দত্ত ॥

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬—১৯২৩) ছিলেন মনে প্রাণে স্বদেশী। তিনি ছিলেন বরিশালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের ঢাকা অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। নানাপ্রকার সমাজসেবামূলক ও শিক্ষামূলক কাজের তিনি ছিলেন পুরোধা। শুধু রাজনীতি নয়, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি চিরদিন সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

॥ জওহরলাল নেহরু ॥

জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯—১৯৬৪) পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সুযোগ্য সন্তান। ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে এসে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলেন। প্রথমে হোমরুল আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, পরে গান্ধীজীর মতবাদে প্রভাবিত হলেন। দেশের গরিব কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি বেদনার্ত হয়ে তাদের জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন, জওহরলাল এসে দাঁড়ালেন সে আন্দোলনের পুরোভাগে। ইংরেজ পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করল। এরপর জওহরলাল হয়ে পড়লেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সেনাপতি। তিনি অনেকবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বকালে কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করে আটটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। দেশের জন্য জওহরলালকে বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বড়লাট ওয়াভেলের আমন্ত্রণে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করলেন। তিনিই ছিলেন এই সরকারের প্রধান। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হলে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু এই পদে থেকে দেশের সেবা করে গিয়েছেন।

দীনেশ গুপ্ত

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

॥ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ॥

রাজেন্দ্রপ্রসাদ (১৮৮৪—১৯৬৩) বিহারের ছেলে —পড়াশুনা করেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় পড়বার সময় তিনি জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। গান্ধীজী তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেন। গান্ধীজীর ডাকে তিনি চম্পারণে গিয়ে অত্যাচারিত কৃষকদের স্বপক্ষে আন্দোলন শুরু করলেন। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সংগঠক। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনেও তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভারত স্বাধীন হবার পর নতুন যে সংবিধান রচিত হল, সেই সংবিধান অনুসারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ হলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

॥ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ॥

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (১৮৭৫—১৯৫০) মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ববান্ নেতা। বর্দৌলীতে কৃষক সত্যাগ্রহে তিনি অসাধারণ নেতৃত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে করাচী কংগ্রেসে তিনি ছিলেন সভাপতি। প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ। ভারত স্বাধীন হবার পর দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ব্যাপারে তিনি যে শক্তিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার তুলনা নেই।

॥ সুভাষচন্দ্র বসু ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে **নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর** (১৮৯৭—   ) নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সুভাষচন্দ্র বিলেত থেকে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু সরকারী চাকরি নিলেন না। তিনি জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করে দেশের সেবা করতে লাগলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে নিজের আদর্শে গড়ে তুললেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে অন্যান্য নেতার সঙ্গে তাঁকেও গ্রেফতার করল পুলিস। দেশবন্ধু যখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন, তখন সুভাষচন্দ্র হলেন তার প্রধান কর্মকর্তা। কিছুকাল এখানে কাজ করার পর ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে মান্দালয় জেলে পাঠিয়ে দিল। এখানে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল।

এরপর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য বারবার তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। পরের বছরও তাঁকে সভাপতির পদে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে বিরক্ত হয়ে তিনি পদত্যাগ করে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। এই দলের মাধ্যমে তিনি আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। পুলিস আবার তাঁকে গ্রেফতার করল এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। সুভাষচন্দ্র বাড়িতে অন্তরীণ হয়ে থাকলেন। তাঁর বাড়ির সামনে দিবারাত্র পুলিসের পাহারা বসল।

এরই মধ্যে থেকে তিনি পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে মস্কো চলে গেলেন এবং সেখান থেকে গেলেন বার্লিনে।

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে বিশাল এক সেনাবাহিনী গড়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে গিয়ে সেই সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সে কাহিনী এই বইয়ের অন্যত্র বলা হয়েছে।

নেতাজী ইংরেজ সরকারকে যে চরম আঘাত হেনেছিলেন, সেটাই তাদের ভারত ত্যাগের অন্যতম কারণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

'মসী'র শক্তি 'অসি'র চেয়েও কম নয়—তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উদ্দীপনাময়ী ভাষায় কবিতা ও গান লিখে তিনি দিনের পর দিন মানুষের মনে প্রেরণা দিয়েছেন, দেশপ্রীতি জাগিয়ে তুলেছেন।

॥ সরোজিনী নাইডু ॥

সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯—১৯৪৯) বাল্যকালেই পরাধীন জাতির বেদনা তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি স্বায়ত্তশাসনের সপক্ষে ভাষণ দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করলেন। এরপর তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ভারতে ব্রিটিশের অত্যাচার সম্বন্ধে সেখানকার লোককে সচেতন করলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করায় পুলিস তাঁকেও গ্রেফতার করে। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষের পাশাপাশি অংশ গ্রহণ করে তিনি ভারতীয় নারীর সামনে এক মহান্ আদর্শ রেখে গিয়েছেন।

॥ নেলী সেনগুপ্তা ॥

নেলী সেনগুপ্তা ইংরেজ নারী হয়েও কর্মসূত্রে পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গিয়েছেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে বিবাহ করে এদেশে চলে এসেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি এদেশকেও আপন করে নিয়েছিলেন। স্বামীর পাশে থেকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে সংগ্রাম করেছেন। একবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

॥ অ্যানি বেশান্ত ॥

অ্যানি বেশান্ত (১৮৪৭—১৯৩৩) নামে আর একজন বিদেশিনী নারী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি কংগ্রেসে যোগদান করে 'হোমরুল আন্দোলন' শুরু করেছিলেন। এই আন্দোলন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গভীর জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইংরেজ সরকার তাঁকে আমেরিকায় নির্বাসিত করে।

॥ মাতঙ্গিনী হাজরা ॥

মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০—১৯৪২) মেদিনীপুরের এক মহীয়সী বীরাঙ্গনা। ১৮ বছর বয়সে বিধবা হয়ে ইনি দেশ ও আর্তের সেবায় দিন কাটাচ্ছিলেন। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে তাঁকে কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে

মাতঙ্গিনী হাজরা

অগস্ট আন্দোলন শুরু হলে মেদিনীপুরে বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠল। মাতঙ্গিনী জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিরাট এক মিছিলের সামনে থেকে হাঁটতে লাগলেন।

ইংরেজের তাঁবেদার সেনাবাহিনী গুলি চালাল। দুটো গুলি এসে লাগল তাঁর হাতে। মাতঙ্গিনী তবু হাত থেকে পতাকা ফেলে দিলেন না। অন্য হাতে পতাকা ধরে চলতে লাগলেন। আর একটি গুলি এসে লাগল তাঁর বুকে। তিনি 'বন্দে মাতরম্' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রেখে গেলেন এক আশ্চর্য আত্মত্যাগ ও বীরত্বের আদর্শ।

॥ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ॥

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১—১৯৩২) চট্টগ্রামের বীরাঙ্গনা। বিখ্যাত বীর বিপ্লবী সূর্য সেন তাঁকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি যখন ধলঘাটে সূর্য সেনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন পুলিসদল তাঁদের ঘেরাও করে গুলি চালায়। সূর্য সেন কোনক্রমে প্রীতিলতাকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যান। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ৮ জন সঙ্গী নিয়ে প্রীতিলতা চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর ইওরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। ইংরেজরা পালাবার চেষ্টা করে। রক্ষী প্রহরীরা বোমা ছুড়তে থাকে। একটি বোমার টুকরো এসে লাগে প্রীতির বুকে। রক্তে পোশাক ভিজে যায়। এদিকে তাঁর সঙ্গীরা পালিয়ে গেছে। প্রীতিলতা তখন পটাসিয়াম সাইয়্যানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

॥ ইন্দিরা গান্ধী ॥

জওহরলাল নেহেরুর মেয়ে **শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী** (১৯১৭—) যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে-পরিবারের সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক। বাল্যকালেই ইন্দিরা জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি যখন বালিকা, তখনই অন্যান্য কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে 'চরকা সংঘ' গঠন করেন। ১৩ বছর বয়সে তিনি ছোটদের নিয়ে 'বানর সেনাদল' গঠন করেন। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে এসে তিনি ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। ভারতে তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম পুরোদমে চলছে। পুলিসের অত্যাচার, বেয়নেট ও গুলি তুচ্ছ জ্ঞান করে দলে দলে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ছে স্বাধীনতা সংগ্রামে। ইন্দিরাও সেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পর তিনি ভারতের প্রধান-মন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতের সেবা করে চলেছেন।

এতক্ষণ যাঁদের কথা বলা হল তাঁরা ছাড়া আরও অসংখ্য নরনারী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে তাঁরা হাসিমুখে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন—জীবন উৎসর্গ করেছেন। এঁরা রয়ে গেছেন লোকচক্ষুর বাহিরে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবদান কারও চেয়ে কম নয়। জানা-অজানা অসংখ্য সংগ্রামীর আত্মত্যাগ ও বীরত্বে ভারত লাভ করেছে তার ঈপ্সিত স্বাধীনতা।